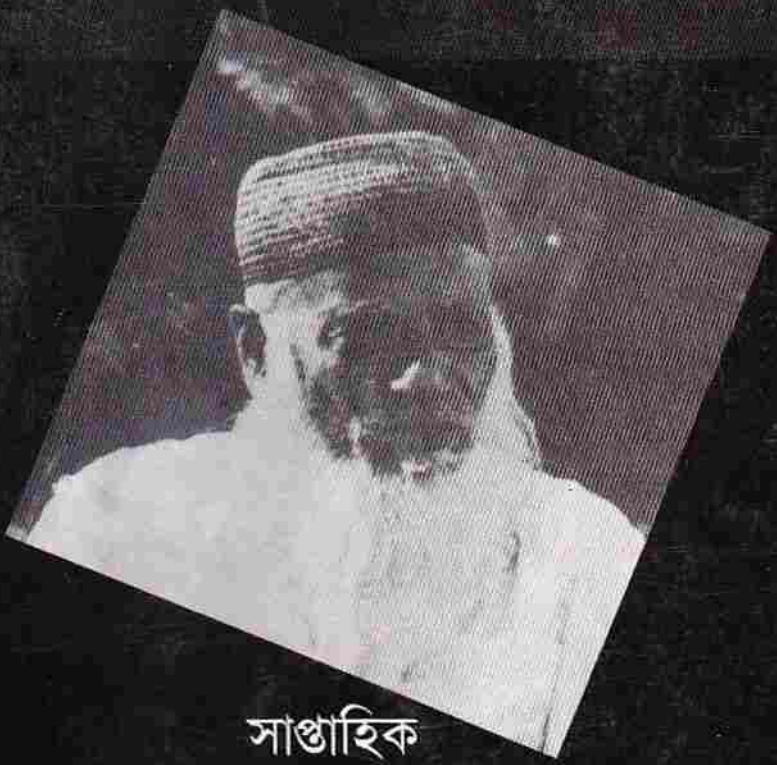
A-PDF Image To PDF Demo. Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

মওলানা ভাসানীর



সাপ্তাহিক

হক-কথা সমগ্র

প্রতি কপি পঁচিশ পয়সা সাপ্তাহিক চাঁদার হার : ষান্মাসিক-৬.০০ বার্ষিক-১২.০০

হক-কথা

(WEEKLY THE HAQ-KATHA)

প্রকাশক ও পৃষ্ঠপোষক : মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

প্রথম বর্ষ ৩৫শ তম সংখ্যা শুক্রবার ৫ই আশ্বিন ১৩৭৯ ঃ ২২শে সেপ্টেম্বর ১৯৭২ ঃ ১৩ই শাবান, ১৩৯২ ঃ সাত্তোষ, টাঙ্গাইল

১৯৭২ সালে নিষিদ্ধ ঘোষিত সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক

মওলানা ভাসানীর

সাপ্তাহিক

হক-কথা সমগ্র

সংগ্রহ ও সম্পাদনা
আবু সালেক

[illegible]

A Ghas Phul Nadi Paperback : *WEEKLY THE HAQ-KATHA ANTHOLOGY*
Edited by **Abu Saleque**
3rd Edition February 2006
Ghas Phul Nadi 84 Aziz Super Market Shahbag Dhaka-1000
Bangladesh
Price Tk. 400 US$ 25
© ঘাস ফুল নদী
প্রথম প্রকাশ : মার্চ ২০০২
দ্বিতীয় প্রকাশ : জুলাই ২০০৫
তৃতীয় প্রকাশ : অমর একুশে বই মেলা ২০০৬
ISBN 984-8215-15-18
প্রচ্ছদ : সালাহউদ্দিন খান
মূল্য : ৪০০ টাকা



ঘাস ফুল নদী : ৮৪ আজিজ সুপার মার্কেট : শাহবাগ : ঢাকা ১০০০ : বাংলাদেশ
Mobile : 0188-009049, E-mail : ghasphulnadi2004@yahoo.com

আলেমা ভাসানী
সৈয়দ আজীজ-উল হক
সৈয়দ ইরফানুল বারী
এবং
মওলানা ভাসানীর অনুসারীবৃন্দ

ভূমিকা

স্বাধীনতাযুদ্ধ-উত্তর বাংলাদেশে একজন স্বাধীনতা সংগ্রামীর সৎসাহস এবং দেশপ্রেমের অধিকার নিয়ে ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে মুজিব শাসনামলের প্রথমদিকে শাসনতন্ত্রবিহীন দেশ শাসনের এক চরম অরাজক পরিস্থিতি এবং রাষ্ট্রীয় শ্বেত সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী কণ্ঠ, মজলুম জনগণের অবিসংবাদিত নেতা মওলানা ভাসানী (১৮৮৫ - ১৯৭৬) এবং তাঁর প্রকাশিত সাপ্তাহিক সংবাদপত্র হক কথা আইনী ও গণসাংবাদিকতার ক্ষেত্রে সৃষ্টি করেছিল এক নতুন ধারা, এক অসামান্য ইতিহাস। এই সাপ্তাহিক হক কথা-র মাধ্যমে আমরা একজন ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতার পাশাপাশি সাংবাদিক মওলানা ভাসানীকে খুঁজে পাই। কবি শামসুর রাহমানের ভাষায় : '... যেন নেতা/নন, অলৌকিক স্টাফ রিপোর্টার'।

পাঠকের প্রচলিত 'অভিজাত শ্রেণীচক্র' ভেঙে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে জনপ্রিয়তা এবং প্রচার সংখ্যার মানদণ্ডে হক কথা ছিল একটা শীর্ষস্থানীয় সংবাদ সাপ্তাহিকী। কোনো নির্দিষ্ট দল বা গোষ্ঠীর মুখপত্র না-হয়েও হক কথা ছিল পুরোপুরি একটা রাজনৈতিক পত্রিকা। প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল থেকে প্রকাশিত এমন একটা আঞ্চলিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্রকে শুধু টিকে থাকা নয়, দেশব্যাপী একটা জাতীয় পত্রিকায় যে পরিণত করা যায়, হক কথা তার একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

তবে মওলানা ভাসানীর প্রকাশিত এই 'হক কথা'-র আগেও ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের জুনের দিকে ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবী দল 'অনুশীলন সমিতি'-র প্রভাবশালী নেতা পুলিন বিহারী দাসের প্রতিষ্ঠিত 'ভারত সেবক সংঘ'-এর মুখপত্র হিসেবে 'হক কথা' নামে একটা স্বল্পকালস্থায়ী পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এর সম্পাদক ছিলেন নলিনী কিশোর গুহ। গান্ধীজী এবং তাঁর অনুসারীদের প্রতি বিরূপ না হয়েও অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের অকার্যকরিতা এবং এর ভুলত্রুটি তুলে ধরে হক কথা-য় বিভিন্ন ধরনের সমালোচনামূলক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটিতে দেশাত্মবোধের ভিত্তিতে হিন্দু-মুসলমান মিলনের আহ্বানও জানানো হয়।

যাহোক, আমরা মওলানা ভাসানীর প্রকাশিত হক কথা এবং তাঁর সাংবাদিকতা প্রসঙ্গে ফিরে আসি। 'সাপ্তাহিক হক কথা' পত্রিকাটি প্রকাশের পূর্বে শুধু 'হক কথা প্রচার' বুলেটিন নয়, মওলানা ভাসানীর জীবনে পত্রিকার গ্রাহক সংগ্রহ থেকে শুরু করে পত্রিকা প্রকাশনা ও সম্পাদনার ক্ষেত্রে যে বিচিত্র ধরনের অভিজ্ঞতা ছিল, সেকথা আমরা কজনাইবা জানি। সেটা ছিল ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের ঘটনা। 'মৌলবী আবদুল হামিদ খান আসামের ধুবড়ীতে "আল এসলাম" পত্রিকার বাছাবাছা কয়েকজন গ্রাহক করে ফেললেন। কোনো কোনো উৎসাহী পাঠক পত্রিকার দাম তিন আনার স্থলে আট আনা দিয়ে কিনে পড়তে শুরু করে দিল।

মৌলবী আবদুল হামিদ খান কয়েকদিনের মধ্যেই বিশ টাকা মানি অর্ডার করে কলিকাতায় আঞ্জুমানে ওলামা অফিসে পাঠিয়ে দিয়েই অবশিষ্ট পত্রিকাগুলি নিয়ে সফরে বের হলেন।' (খন্দকার আবদুর রহিম : শতাব্দীর জননেতা মওলানা ভাসানী, ১ম খণ্ড, খন্দকার প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ জুন ১৯৯২, পৃ. ২৫৬)। কলকাতা থেকে প্রকাশিত আঞ্জুমানে ওলামার মুখপত্র 'আল এসলাম' পত্রিকার গ্রাহক সংগ্রহ ও প্রচারে তৎকালীন আসাম আঞ্জুমানে ওলামার প্রেসিডেন্ট মৌলবী আবদুল হামিদ খান যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দেন।

মওলানা ভাসানী কর্তৃক পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনার ক্ষেত্রে একটি ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করা যায়। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের কথা। টাঙ্গাইল মহকুমা প্রজা সমিতি সবেমাত্র গঠিত হয়েছে। বঙ্গ আসাম প্রজা সমিতির সেক্রেটারি হিসেবে মওলানা ভাসানী 'অল্প কিছুদিনের মধ্যে টাঙ্গাইল শহর থেকে "প্রজাশক্তি" নামে একটা সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করলেন। মওলানা ভাসানী নিজেই সাপ্তাহিক "প্রজাশক্তি"-র সম্পাদক ছিলেন। মহকুমা প্রজা সমিতির সেক্রেটারি নিজাম উদ্দীন আহমদ মোক্তার পত্রিকাটি সম্পাদনা ও পরিচালনার ব্যাপারে তাঁকে সর্বতোভাবে সহায়তা করতেন।

সেই "প্রজাশক্তি" পত্রিকার মাধ্যমে মওলানা ভাসানী জমিদার ও মহাজনদের জুলুম-অত্যাচারের খবর প্রকাশ করতে লাগলেন। সন্তোষ জমিদারের প্রজা হিসেবে নিজাম উদ্দীন আহমদ মোক্তার এত খোলাখুলিভাবে জমিদারের জুলুম সম্পর্কে খবরাখবর ছাপাতে পারতেন না। মওলানা

ভাসানী সেটা মালুম করেই নিজাম উদ্দীন সাহেবকে পাখার আড়াল করে রাখলেন। তিনি নিজ দায়িত্বে জমিদার মহাজনেরা কোন গ্রামের কোন কোন লোকের ভিটায় ঘুঘু চরিয়েছে, সেই সব খবর নিজাম উদ্দীন মোক্তার সাহেবের মাধ্যমে জোগাড় করে পত্রিকায় কাঠের হরফে হেডিং দিয়ে ছাপাতে শুরু করে দিলেন।' (খন্দকার আবদুর রহিম : শতাব্দীর জননেতা মওলানা ভাসানী, ২য় খণ্ড, খন্দকার প্রকাশনী, ২৮ জানুয়ারি ১৯৯৩, পৃ. ১৫০)। পত্রিকা জগতে মওলানা ভাসানী যে বহিরাগত নয়, পত্রিকার কাজে তাঁর যে পূর্বঅভিজ্ঞতা ছিল, 'আল এসলাম' এবং 'প্রজাশক্তি' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে তাঁর সম্পর্কে উপরোক্ত দুটি তথ্য থেকে সেটা কিছুটা বুঝতে পারা যায়।

তা ছাড়া সাপ্তাহিক ইত্তেফাক প্রকাশের কথাটাই ধরা যাক। তৎকালীন পাকিস্তানের প্রথম বিরোধী সংসদীয় দল পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের সভাপতি হিসেবে মওলানা ভাসানী দলের একটি মুখপত্র প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। 'তাই মওলানা 'ইত্তেফাক' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ নেন। জুলাই মাসে ঢাকা বার লাইব্রেরিতে এক ঘরোয়া সভায় পত্রিকা প্রকাশের কথা ঘোষণা করে তিনি উপস্থিত ব্যক্তিদের কাছে আবেদন করেন সাধ্যমতো চাঁদা দিতে। তৎক্ষণাৎ চার শ টাকার মতো ওঠে : 'ইত্তেফাক' প্রকাশের প্রথম তহবিল। দেশের অন্যান্য জায়গা ঘুরেও তিনি আরো চাঁদা তোলেন। সেই টাকায় সাপ্তাহিক ইত্তেফাক আত্মপ্রকাশ করে ১৫ আগস্ট ১৯৪৯ সালে। প্রথম অফিস ছিল ৭৭ মালিটোলা, পরে ৯৪ নবাবপুর রোডের আওয়ামী মুসলিম লীগ অফিস থেকেই বেরুতো। শুরুতে সম্পাদক, প্রকাশক ছিলেন মওলানা ভাসানী। কিছুকাল পরে প্রকাশনা ও সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন ইয়ার মোহাম্মদ খান। পরে এর সম্পাদক নিযুক্ত হন তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া)'। (সৈয়দ আবুল মকসুদ : মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, মে ১৯৯৪, পৃ. ৭৩)।

মওলানা ভাসানী তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে যেমন বিভিন্ন দল ও সংগঠন গড়ে তুলেছেন, তেমনি সেসব দল ও সংগঠনের মুখপত্র হিসেবে এবং কখনো কখনো তাঁর নিজস্ব মতামত প্রচারের প্রয়োজনে বিভিন্ন পত্রিকা, বুলেটিন, ইস্তাহার ও বিবৃতি প্রকাশ করে গেছেন। সাপ্তাহিক হক কথা হলো মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক মতাদর্শ এবং তাঁর ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক চিন্তাচেতনার এক সারৎসার। সাম্রাজ্যবাদ, সম্প্রসারণবাদ, সামন্তবাদ ও আমলা মুৎসুদ্দি পুঁজি বিরোধী রাজনৈতিক নেতা মওলানা ভাসানী, পীর ভাসানী হুজুর এবং সাংবাদিক মওলানা ভাসানী হক কথা-য় এসে একাকার হয়ে গেছেন।

আসাম থেকে প্রকাশিত সেদিনের সেই 'হক কথা প্রচার' বুলেটিন থেকে 'সাপ্তাহিক হক কথা'-য় এসে পৌঁছতে বহু দীর্ঘপথ, বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করতে হয়েছে। ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দের ১২ জানুয়ারি ৪র্থ বর্ষ ৩১ তম সংখ্যার সাপ্তাহিক হক কথা-র সম্পাদকীয়তে বলা হয় : 'মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী 'হক-কথা প্রচার' বুলেটিন অতি প্রথম প্রকাশ করেন আসাম থেকে ৩০ বছর আগে। বৃটিশ সরকার সে প্রচার বন্ধ করে দেয়। পাকিস্তান সৃষ্টির পরপরই ঢাকা থেকে তিনি প্রকাশ করেন 'হক-কথা প্রচার' বুলেটিন। মুসলিম লীগ সরকার তা বন্ধ করে দেয়। ১৯৬৭-৬৮ সালে বগুড়া জেলার মহীপুর তাঁর হক্কুল এবাদ মিশন থেকে আবার তিনি প্রকাশ করতে শুরু করেন 'হক-কথা প্রচার'। এবার আইয়ুব সরকার তা বন্ধ করে দেয়।' এরপর বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার অল্প কিছুদিন পর টাঙ্গাইল জেলার সন্তোষ থেকে ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ২৫ ফেব্রুয়ারি সরকারের আনুষ্ঠানিক অনুমোদন বা ডিক্লারেশন নিয়ে সৈয়দ ইরফানুল বারীকে সম্পাদক করে এবং মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী নিজে প্রকাশক ও পৃষ্ঠপোষক হয়ে সাপ্তাহিক হক কথা প্রকাশ করেন। শুরু থেকে নিয়মিতভাবে ৩০টি সংখ্যা প্রকাশের পর তৎকালীন মুজিব সরকার সাপ্তাহিক হক কথা-র প্রকাশনা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে এবং পাকিস্তান আমলের প্রেস এ্যান্ড পাবলিকেশনস এ্যাক্ট অনুযায়ী পত্রিকাটির ডিক্লারেশন বাতিল করে দেয়। এর আগে ১৬ জুন ১৬ তম সংখ্যা প্রকাশের পর ২০ জুন দুপুর সাড়ে ১২ টায় টাঙ্গাইলের কল্লোল প্রেস থেকে পুলিশ বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার করে হক কথা-র সম্পাদক সৈয়দ ইরফানুল বারীকে। সম্পাদক গ্রেফতার হয়ে যাওয়ায় পরবর্তী ২৩ জুন প্রকাশিতব্য ১৭তম সংখ্যা থেকে মওলানা ভাসানী সাপ্তাহিক হক কথা-র ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হিসেবে তাঁর দায়িত্ব গ্রহণের সিদ্ধান্তের

কথা ২১ জুন টাঙ্গাইলের জেলা প্রশাসককে জানিয়ে দেন। ১৭তম সংখ্যা থেকে মওলানা ভাসানী ভারপ্রাপ্ত সম্পাদকের দায়িত্বসহ হক কথা-র সামগ্রিক পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করায়, তাঁকে মাথায় রেখে, পত্রিকাটি আরো বেশি আপোসহীন, আরো বেশি নির্ভীক এবং আরো বেশি স্পষ্টভাষী হয়ে ওঠে।

এই সময়ে নিষিদ্ধ হক কথা-র শেষদিকের পরপর তিনটি সংখ্যার লিড নিউজ, সম্পাদকীয় নিবন্ধ, অন্যান্য নিবন্ধ ও রিপোর্টের হেডিংগুলোর ওপর একবার দৃষ্টি দেয়া যাক। ৮ সেপ্টেম্বর ২৮তম সংখ্যার প্রথম লিড নিউজ : 'সরকারী দলীলপত্রে জ্বীনের হাত লেগেছে/পাপের ঠেলা এবার সামলাও গোঁসাই'; দ্বিতীয় লিড নিউজ : 'অনাহারে মানুষ মরছে গদীতে থাকার অধিকার তোমাদের নেই/জনতা সাগরে জেগেছে উর্মি'; সম্পাদকীয় নিবন্ধ : 'ব্যর্থ সরকার সরে দাঁড়াও' এবং অন্য একটি নিবন্ধ : 'ওপার বাংলা দিল্লী ছাড়ো'। ১৫ সেপ্টেম্বর ২৯তম সংখ্যার প্রথম লিড নিউজ: 'সমাজতন্ত্রীদের রক্তপিপাসু ড. আদম মালিক 'এলেন-দেখলেন-জয় করে নিলেন'/ এবার সখি সোনার মৃগ/ দেয় বুঝি দেয় ধরা!'; দ্বিতীয় লিড নিউজ: 'ম্যান্ডেট নিয়ে প্রত্যাবর্তন' এবং অন্য একটি নিবন্ধ : 'দিকে দিগন্তে রক্তিম এই বিদ্রোহী মহাকাল/পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙো'। ২২ সেপ্টেম্বর ৩০তম সংখ্যার প্রথম লিড নিউজ : 'ঠগ কে তাজুদ্দিন সাহেব, জনগণ না আপনারা?/সেই গোপন ৭টি চুক্তি'; দ্বিতীয় লিড নিউজ : 'লুটপাট সমিতির বিচার না করলে জনগণ শায়েস্তা শুরু করবে/ভারত-রাশিয়ার কবর রচনা করো/ বরিশালের জনসমুদ্রে জননেতা মওলানা ভাসানীর ঘোষণা'; অন্য একটি রিপোর্ট : 'হুসিয়ার গুপ্তাশাহী' এবং অন্য একটি নিবন্ধ : 'আসুন মরা মানুষের হাড় দিয়ে আরেকটি ইন্দিরা মঞ্চ গড়ি'। এভাবে তৎকালীন সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ, বিশেষ করে ভারতের সম্প্রসারণবাদী ইন্দিরা সরকার এবং তার তাবেদার বাংলাদেশের মুজিব সরকারের বিরুদ্ধে সাপ্তাহিক হক কথা-য় অব্যাহতভাবে বিভিন্ন লিড নিউজ, সম্পাদকীয় নিবন্ধ, অন্যান্য নিবন্ধ ও রিপোর্ট প্রকাশিত হতে থাকে।

এই পরিস্থিতিতে মুজিব সরকারের পক্ষে মওলানা ভাসানীর হক কথা-র কণ্ঠস্বরকে স্তব্ধ করে দিতে একে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা এবং এর ডিক্লারেশন বাতিল করা ছাড়া সম্ভবত আর কোনো বিকল্প পথ থাকে না। সাপ্তাহিক হক কথাকে যেকোনো মুহূর্তে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হতে পারে সেটা বুঝি আগেই টের পেয়েছিল হক কথা-র কর্তৃপক্ষ। তাই নিষিদ্ধ ঘোষিত হক কথা-র ৩০তম সংখ্যার (২২ সেপ্টেম্বর ১৯৭২) সম্পাদকীয়তে বলা হয় : 'হক-কথার কণ্ঠস্বর রোধ করার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার আর ভারতপ্রেমিক মস্কোওয়ালাদের চাপে তাবেদার সরকার ও ভারতের ক্রীড়নকরা উঠেপড়ে লেগেছে। হক-কথা পত্রিকা বন্ধ হতে পারে কিন্তু হক-কথা– চিরসত্য কথার মৃত্যু হবে না'। সত্যি বলতে কি, সাপ্তাহিক হক-কথা বন্ধ হয়ে গেলেও কিন্তু মওলানা ভাসানীর বিদ্রোহী কণ্ঠকে স্তব্ধ করা যায়নি। এরপর মওলানা ভাসানী " 'ভাসানীর শেষ কথা', 'মুক্তির জেহাদ', 'ভাসানীর কথা', 'সত্য কথা', 'ভাসানীর টেলিগ্রাম', 'ভাসানীর জেহাদ', 'ভাসানীর প্রশ্ন', 'ভাসানীর আওয়াজ', ইত্যাদি নানা ধরনের বুলেটিন বের করে তিনি হক-কথার প্রচার করতেই থাকলেন"। (সম্পাদকীয়, হক-কথা, ১৪ এপ্রিল ১৯৭৮, ৭ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা)।

মুজিব সরকার শুধু সাপ্তাহিক হক-কথাই নয়, একে-একে সাপ্তাহিক 'মুখপত্র', 'স্পোকসম্যান', 'লাল পতাকা', 'নয়া যুগ', 'আমাদের কথা', 'গণশক্তি' ইত্যাদি পত্রিকাও বন্ধ করে দেয়। হক-কথা, মুখপত্র ও স্পোকসম্যান, নয়া যুগ, আমাদের কথা ইত্যাদি পত্রিকার সম্পাদকদের গ্রেফতার করা হয়। সাপ্তাহিক ইত্তেহাদ পত্রিকার বিরুদ্ধে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারী করা হয়, দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রকাশিত সাপ্তাহিক গণশক্তির তৎকালীন সম্পাদক এবং ভারপ্রাপ্ত সম্পাদকের বাসায় পুলিশ বিনা পরোয়ানায় রাতের অন্ধকারে তল্লাশী অভিযান চালায় এবং তাদের সকল স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি আটক করে। পুলিশ গণশক্তির প্রেস জব্দ করে এবং এর কার্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে দেয়। দৈনিক গণকণ্ঠ প্রকাশের অল্প কিছুদিন পর খোঁড়া যুক্তি দেখিয়ে পত্রিকাটি সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেয় মুজিব সরকার। মুজিবের শাসনামলে সাংবাদিক নির্যাতন এবং পত্রপত্রিকা বন্ধের এরকম আরো উদাহরণ দেয়া যায়।

২২ সেপ্টেম্বর ১৯৭২, ৩০তম সংখ্যা থেকে হক কথা নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়ার পর ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ তারিখে একটা সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে মুজিব নিহত হলে এবং তাঁর সরকার উৎখাত হয়ে গেলে তিন বছর তিন মাস উনিশদিন পর ১২ জানুয়ারি ১৯৭৬, ৪র্থ বর্ষ ৩১ তম সংখ্যা থেকে আবার হক কথা প্রকাশ করেন মওলানা ভাসানী। এই সংখ্যায় মওলানা ভাসানীর নাম প্রতিষ্ঠাতা ও পৃষ্ঠপোষক হিসেবে ছাপা হয়। এই পর্যায়ে ভাসানীর জীবদ্দশায় হক কথা-র সর্বশেষ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ১৪ নভেম্বর ১৯৭৬। মওলানা ভাসানীর মৃত্যু-পরবর্তী কয়েক সপ্তাহ আর হক কথা প্রকাশিত হয়নি। ২৪ ডিসেম্বর ১৯৭৬, ৫ম বর্ষ ৪১ সংখ্যা থেকে হক কথা আবার প্রকাশিত হতে থাকে। এই সংখ্যায় মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর নাম কেবলমাত্র প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে ছাপা হয়। প্রকাশক হিসেবে নাম ছাপা হয় বেগম আলেমা খাতুন ভাসানীর। সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করা হয় : 'হক-কথার ইতিহাসে আজ এর পঞ্চম পুন:প্রকাশ'। এই হিসেবে আসাম থেকে 'হক-কথা প্রচার' বুলেটিন প্রথম প্রকাশের পর পাকিস্তান আমলের শুরুতে 'হক-কথা প্রচার বুলেটিন প্রকাশ ছিল 'হক-কথা প্রচার' বুলেটিনের প্রথম পুন:প্রকাশ। ১৯৬৭-৬৮ খ্রিস্টাব্দে বগুড়ার মহীপুরের হককুল এবাদ মিশন থেকে প্রকাশিত 'হক-কথা প্রচার' বুলেটিন ছিল 'হক-কথা প্রচার' বুলেটিনের দ্বিতীয় পুন:প্রকাশ। 'হক-কথা প্রচার' বুলেটিনের তৃতীয় পুন:প্রকাশ ঘটে টাঙ্গাইলের সন্তোষ থেকে ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ তারিখে 'সাপ্তাহিক হক-কথা' প্রকাশের মাধ্যমে। আর সরকারি অনুমোদন বা ডিক্লারেশন নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে হক কথা-র এই তৃতীয় পুন:প্রচারের বছরকে সাপ্তাহিক হক কথা-র প্রকাশনার ভিত্তি বছর ধরলে ১২ জানুয়ারি ১৯৭৬, ৪র্থ বর্ষ ৩১তম সংখ্যা থেকে হয় 'হক কথা প্রচার' বুলেটিনের চতুর্থ পুন:প্রকাশ এবং একই সঙ্গে 'সাপ্তাহিক হক কথা'-রও ৪র্থ বর্ষের সূচনা। ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৭২, ১ম বর্ষ ৩০তম সংখ্যা থেকে সরকারি আদেশে নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়ার পর যখন দীর্ঘ বিরতির মধ্যদিয়ে হক কথা আবার পুন:প্রকাশ হতে থাকে তখন এর প্রকাশনার ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য ১২ জানুয়ারি ১৯৭৬, ৪র্থ বর্ষের সূচনা সংখ্যা উল্লেখ করা হয় ৩১তম সংখ্যা হিসেবে। ১২ জানুয়ারির পর ওই মাসে হক কথা-র আর কোনো সংখ্যা প্রকাশিত না হয়ে ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬, ৪র্থ বর্ষ ৩২তম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়। ১২ জানুয়ারি ১৯৭৬, ৪র্থ বর্ষ ৩১তম সংখ্যা থেকে ২৮ জুন ১৯৭৬, ৪র্থ বর্ষ ৫২তম সংখ্যা পর্যন্ত হক কথা-র ২২টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। উল্লেখ্য, ৩১ মে ১৯৭৬, ৪র্থ বর্ষ ৪৯তম সংখ্যা হলেও মাঝে হক কথা-র আর কোনো সংখ্যা প্রকাশিত না হয়ে পরবর্তী ৫০তম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৪ জুন ১৯৭৬। ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬, ৪র্থ বর্ষ ৩৫তম সংখ্যার পর ৩৬তম সংখ্যার তারিখ দেখা যায় ২৯ ফ্রেব্রুয়ারি ১৯৭৬। কত নম্বর সংখ্যা সেটা উল্লেখ না করে ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬ তারিখে 'ভাসানী হৃদরোগে আক্রান্ত/সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পি জি হাসপাতালে ভর্তি' এই লিড নিউজে হক কথা-র একটি এক পৃষ্ঠার 'টেলিগ্রাম সংখ্যা' প্রকাশিত হয়। ৫ জুলাই ১৯৭৬, ৫ম বর্ষ ২৩তম সংখ্যা প্রকাশের মধ্যদিয়ে সাপ্তাহিক হক কথা-র ৫ম বর্ষ শুরু হয়। ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে ৪র্থ বর্ষে হক কথা-র মোট ২২ টি সংখ্যা প্রকাশের পর ৫ জুলাই ১৯৭৬, ৫ম বর্ষ ২৩তম সংখ্যাটি হলো হক কথা প্রকাশনার ৪র্থ বর্ষেরই ধারাবাহিকতা। হক কথা-র এই ২৩টি সংখ্যার সঙ্গে ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত ৩০টি সংখ্যা যোগ করলে সর্বমোট সংখ্যা দাঁড়ায় ৫৩টি। এ প্রসঙ্গে হক কথা ৫ জুলাই ১৯৭৬, ৫ম বর্ষ ২৩ তম সংখ্যায় সম্পাদক কর্তৃক একটি সংশোধনী ছাপা হয়। সেখানে বলা হয় : '১৩৯২ হিজরীর ৯ মুহররম (২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২) তারিখ 'হক-কথা' বাংলাদেশে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। সেই হিসেব অনুযায়ী সরকারি অনুমতিক্রমে 'হক-কথা'র যে পুন:প্রকাশ, তাতে বর্তমান সংখ্যা প্রকাশন-ক্রম অনুসারে ৫ম বর্ষের ২৩তম সংখ্যা এবং প্রকাশনার সামগ্রিক ক্রম অনুসারে ৫৩তম সংখ্যা। পাঠকদের সুবিধার্থে আগের সংখ্যাক্রম সংশোধন করে, আমরা এখন থেকে বর্ষ-সংখ্যা ও প্রকাশনার ক্রম-সংখ্যা দুটোই ব্যবহার করবো'। যা হোক, ২৪ ডিসেম্বর ১৯৭৬, ৫ম বর্ষ ৪১তম সংখ্যা (প্রকাশনার সামগ্রিক ক্রম অনুসারে হবে ৭১তম সংখ্যা-লেখক) পর্যন্ত ৫ম বর্ষে হক কথা-র ১৯টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এরপর কয়েক সপ্তাহ বিরতির পর ২১ জানুয়ারি ১৯৭৭, ৬ষ্ঠ বর্ষ ১ম সংখ্যা (প্রকাশনার সামগ্রিক ক্রম অনুসারে হবে ৭২তম সংখ্যা-লেখক) হক কথা প্রকাশিত হয়। এরপর হক কথা প্রকাশিত হয় ১৪ এপ্রিল ১৯৭৮, ৭ম বর্ষ ১ম সংখ্যা। প্রকাশনার সামগ্রিক ক্রম অনুসারে এটি ৭৩তম সংখ্যা হওয়ায় এবং ওই বছর আর কোনো সংখ্যা প্রকাশের তথ্য পাওয়া না যাওয়ায় স্বাভাবিকভাবে ধরে নেয়া যায় ৬ষ্ঠ বর্ষে হক কথা-র একটি মাত্র সংখ্যাই প্রকাশিত হয়েছে। ১৪ এপ্রিল ১৯৭৮, ৭ম বর্ষ ১ম সংখ্যা থেকে ১ ডিসেম্বর ১৯৭৮, ৭ম বর্ষ ২৬তম সংখ্যা পর্যন্ত হক কথা প্রকাশের তথ্য আমি পেয়েছি।

তবে প্রকৃত হিসেব অনুযায়ী এটি হবে ২৭তম সংখ্যা। কেননা, ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দের ৬ অক্টোবরের সংখ্যাটি ২১তম সংখ্যা হলে স্বাভাবিকভাবে পরবর্তী ২০ অক্টোবর যে সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় সেটি হবে ২২তম সংখ্যা। কিন্তু এই সংখ্যাটিও ২১তম সংখ্যা হিসেবে ছাপা হয়েছে এবং ২২তম সংখ্যা হয়েছে ২৭ অক্টোবরের সংখ্যাটি। ১৪ জুলাই ১৯৭৮, ১১তম সংখ্যা থেকে ২০ আগস্ট ১৫তম সংখ্যার মধ্যবর্তী ২৮ দিনে ১২, ১৩ ও ১৪তম সংখ্যার কোনো কপি আমি পাইনি। ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে হক কথা-র ৭ম বর্ষ ১ম সংখ্যা থেকে ২৭তম সংখ্যাগুলো হলো প্রকাশনার সামগ্রিক ক্রম অনুসারে ৭৩ থেকে ৯৯তম সংখ্যা। প্রকাশনার সামগ্রিক ক্রম অনুসারে সাপ্তাহিক হক কথা-র এই সর্বমোট ৯৯টি সংখ্যার বেশি আর কোনো সংখ্যার খোঁজ আমি পাইনি। আমার সংগৃহীত হক কথা-র সর্বশেষ সংখ্যা এবং সংশ্লিষ্ট সূত্রে যতদূর জেনেছি ১ ডিসেম্বর ১৯৭৮, ৭ম বর্ষ ২৭তম সংখ্যার পর সাপ্তাহিক হক কথা আর প্রকাশিত হয়নি।

২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ থেকে ১ ডিসেম্বর ১৯৭৮ পর্যন্ত প্রকাশিত সাপ্তাহিক হক কথা-র সর্বমোট ৯৯টি সংখ্যার প্রকাশনাকে আমি তিনটি পর্বে ভাগ করেছি। প্রথম পর্বে রয়েছে : শেখ মুজিব এবং মওলানা ভাসানীর জীবদ্দশায় ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ২৫ ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত ১ম সংখ্যা থেকে নিষিদ্ধ ঘোষিত হক কথা-র ২২ সেপ্টেম্বর ৩০তম সংখ্যা পর্যন্ত প্রকাশিত ৩০টি সংখ্যা। দ্বিতীয় পর্বে রয়েছে: শেখ মুজিবের মৃত্যু-পরবর্তী এবং মওলানা ভাসানীর জীবদ্দশায় ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দের ১২ জানুয়ারি ৪বর্ষ ৩১তম সংখ্যা থেকে ১৪ নভেম্বর ৫ম বর্ষ ৪০তম সংখ্যা (প্রকাশনার সামগ্রিক ক্রম অনুসারে হবে ৭০তম সংখ্যা- লেখক) পর্যন্ত প্রকাশিত ৪০টি সংখ্যা। আর তৃতীয় পর্বে রয়েছে : মওলানা ভাসানীর মৃত্যু-পরবর্তী ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দের ২৪ ডিসেম্বর ৫ম বর্ষ ৪১তম সংখ্যা (প্রকাশনার সামগ্রিক ক্রম অনুসারে হবে ৭১তম সংখ্যা-লেখক) এবং ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দের ২১ জানুয়ারি ৬ষ্ঠ বর্ষ ১ম সংখ্যা (প্রকাশনার সামগ্রিক ক্রম অনুসারে হবে ৭২তম সংখ্যা-লেখক)- এই দুটি সংখ্যাসহ ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দের ১৪ এপ্রিল ৭ম বর্ষ ১ম সংখ্যা (প্রকাশনার সামগ্রিক ক্রম অনুসারে হবে ৭৩তম সংখ্যা-লেখক) থেকে ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দের ১ ডিসেম্বর ৭ম বর্ষ ২৭তম সংখ্যা (প্রকাশনার সামগ্রিক ক্রম অনুসারে হবে ৯৯তম সংখ্যা-লেখক) পর্যন্ত প্রকাশিত ২৯টি সংখ্যা।

সাপ্তাহিক হক কথা-র সামগ্রিক প্রকাশনাকে যে উপরোক্ত তিনটি পর্বে ভাগ করে দেখানো হয়েছে তারমধ্যে প্রথম পর্বে ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে মুজিবের শাসনামলের প্রথমদিকে শেখ মুজিব এবং মওলানা ভাসানীর জীবদ্দশায় সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়া পর্যন্ত প্রকাশিত ৩০টি সংখ্যার প্রকাশনাই ছিল মূলত হক কথা-র প্রকাশনার ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ সময় এবং শ্রেষ্ঠ সংখ্যা। শেখ মুজিবের মৃত্যু-পরবর্তী এবং মওলানা ভাসানীর মৃত্যু-পূর্ববর্তী দ্বিতীয় পর্বে প্রকাশিত হক কথা-র সংখ্যাগুলি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার প্রশ্নে বিশেষ ভূমিকা পালন করলেও মওলানা ভাসানীর মৃত্যু-পরবর্তী তৃতীয় পর্বে প্রকাশিত হক কথা মূলত ছিল প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বে প্রকাশিত হক কথা-র কিছু কিছু পুনর্মুদ্রণ ও চর্বিতচর্বন ছাড়া আর কিছু নয়। সত্যি বলতে কি, একটি সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে শেখ মুজিবের মৃত্যু এবং মুজিব সরকারের পতনের পর সাপ্তাহিক হক কথা-র ঐতিহাসিক প্রয়োজন যেন ফুরিয়ে যায়। তাই সবদিক বিচার-বিশ্লেষণ করে ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত সাপ্তাহিক হক কথা-র ৩০টি সংখ্যার একটি পূর্ণাঙ্গ ও অখণ্ড সংকলন প্রকাশের জন্য বেছে নেয়া হয়েছে। ১৯৯০-এর দশকের শেষদিকে সিলেট থেকে জনৈক ভাসানী অনুসারী ব্যক্তিগত উদ্যোগে সাপ্তাহিক হক কথা-র একটি পূর্ণাঙ্গ সংকলন খণ্ড-খণ্ডভাবে গ্রন্থাকারে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেন বলে মওলানা ভাসানী একাডেমীর আজাদ সুলতান জানিয়েছেন। তবে সেটা আজো আলোর মুখ দেখেনি।

ট্যাবলয়েড সাইজের ৮ পৃষ্ঠার সাপ্তাহিক হক কথা নিউজপ্রিন্ট কাগজে লেটার প্রেসে ছাপা হতো। টাঙ্গাইলের সন্তোষ থেকে প্রকাশিত হক কথা-র ডিক্লারেশনে শান্তি প্রেসের নাম থাকলেও প্রথম ৪টি সংখ্যা ছাপা হয় কল্লোল প্রেস, সদর সড়ক, টাঙ্গাইল থেকে। এই ৪টি সংখ্যার প্রতিটির মূল্য ছিল পনের পয়সা। চতুর্থ সংখ্যা পর্যন্ত কত বর্ষ তা উল্লেখ নেই। ২৪ মার্চ ১৯৭২, ১ম বর্ষ পঞ্চম সংখ্যা থেকে সাপ্তাহিক হক কথা-র মুদ্রণে শান্তি প্রেস, টাঙ্গাইল- এর নাম ছাপা হতে থাকে। এই পঞ্চম সংখ্যা থেকে প্রতি সংখ্যা হক কথা-র মূল্য রাখা হয় বিশ পয়সা। ১ম বর্ষ চতুর্দশ সংখ্যা থেকে প্রতি সংখ্যার মূল্য রাখা হয় পঁচিশ পয়সা। সাপ্তাহিক হক কথা-র সাধারণ সংখ্যা ৮ পৃষ্ঠা হলেও পঞ্চম

সংখ্যার বিশেষ পত্র ক ও খ পৃষ্ঠাসহ ১০ পৃষ্ঠা এবং এয়োদশ সংখ্যার মে সংখ্যা ক ও খ পৃষ্ঠাসহ ১০ পৃষ্ঠা ছিল। হক কথা-র প্রিন্টার্স লাইনে শান্তি প্রেস, সন্তোষ, টাঙ্গাইল-এর নাম থাকলেও পত্রিকার প্রথম ৪টি সংখ্যার প্রিন্টার্স লাইনে শান্তি প্রেসের পরিবর্তে কল্লোল প্রেস (হক কথা-য় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে 'কল্লোল মুদ্রায়ণ' নাম দেখা যায়- লেখক), সদর সড়ক, টাঙ্গাইল-এর নাম ছাপা হয়। প্রথমদিকে কল্লোল প্রেসের হাফ ডিমাই এবং তারপর পত্রিকার সার্কুলেশন বাড়লে সিঙ্গল ডিমাই মেশিনে হক কথা ছাপা হতে থাকে। ১৬তম সংখ্যা প্রকাশের পর সম্পাদক সৈয়দ ইরফানুল বারীকে সরকার গ্রেফতার করলে মওলানা ভাসানী ভারপ্রাপ্ত সম্পাদকের দায়িত্বভার গ্রহণ করে তিনি পত্রিকার ডিক্লারেশন অনুযায়ী শান্তি প্রেস, সন্তোষ, টাঙ্গাইল-এর প্রিন্টার্স লাইন বহাল রেখে ঢাকা থেকে হক কথা ছাপানোর সিদ্ধান্ত নেন। অতি গোপনে এই ছাপার কাজ চলতে থাকে। প্রথমদিকে কয়েকটি সংখ্যা আজাদ প্রেস থেকে ছাপা হয়েছে বলে হক কথা-র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দু-একটি সূত্রে জানা যায়। তবে এর সত্যাসত্য নিয়ে পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারিনি। ঢাকার বাবু বাজারে অবস্থিত রশীদিয়া প্রিন্টিং প্রেসের অটোমেটিক মেশিনে সাপ্তাহিক হক কথা নিয়মিত ছাপানো হতে থাকে। প্রেসের মালিক আবদুর রশীদ ছিলেন টাঙ্গাইলের অধিবাসী। মুজিব সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়ার আগ পর্যন্ত এই রশীদিয়া প্রিন্টিং প্রেসেই হক কথা ছাপা হতো। প্রকাশনার শুরুতে সম্পাদক সৈয়দ ইরফানুল বারী, মোহাম্মদ হোসেন এবং কল্লোল প্রেসের মালিক বুলবুল খান মাহবুবকে নিয়ে সাপ্তাহিক হক কথা-র একটি টিম গড়ে ওঠে। আর এদের সবার মাথার ওপরে তো রয়েছেন বটবৃক্ষের মতো মওলানা ভাসানী। ধীরে ধীরে হক কথা পত্রিকা পরিবারে এসে যুক্ত হয় শাহ আহমদ রেজা, অধ্যাপক শামসুল আরেফিন, নাজীমউদ্দিন মোস্তান, আবদুর রহিম আজাদ প্রমুখ। আবদুর রহিম আজাদ ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে হক কথা-র নির্বাহী সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন বলে জানা যায়। শাহ আহমদ রেজা এক পর্যায়ে হক কথা ছেড়ে সাপ্তাহিক 'নয়া যুগ' পত্রিকায় চলে আসেন। মওলানা ভাসানীর মৃত্যু-পরবর্তী প্রকাশিত হক কথা-র সঙ্গে ব্যারিস্টার বজলুস সাত্তার, অধ্যক্ষ মাসুদ খান, আলাউদ্দিন আহমদ প্রমুখ যুক্ত হন। এ ছাড়া আরো জানা-অজানা অনেকেই হক কথা-য় কাজ করেছেন, পত্রিকাটির নিয়মিত প্রকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তবে সরকারি দমন পীড়নের মধ্যে প্রকাশিত এরকম একটি রাজনৈতিক সংবাদ সাপ্তাহিকীতে কারা কীভাবে কাজ করছেন সেকথা অনেক সময় নিরাপত্তার কারণে পর্দার আড়ালে থেকে যায়। তাই হক কথা-র সঙ্গে যুক্ত সবার কথা আরো খোঁজখবর ও যাচাই না করে এখানে বিস্তারিত জানানো সম্ভব নয়। 'কমপক্ষে পনের হাজার সংবাদদাতা সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে হক-কথার সাথে সহযোগিতা করেছেন' (সম্পাদকীয়, হক-কথা, ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৭২)। তাদের সবার কথা আজো আমাদের কাছে অজানাই রয়ে গেছে। ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৭২ তারিখে নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়ার আগ পর্যন্ত হক কথা-র সর্বশেষ প্রচার সংখ্যা একলাখের ওপর ছিল বলে হক কথা-র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়। চট্টগ্রাম, খুলনা ইত্যাদি অঞ্চল থেকে একযোগে ছাপা অথবা পুনর্মুদ্রণের কথা হক কথা-র সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের বরাত দিয়ে শোনা গেলেও তৎকালীন যোগাযোগ ব্যবস্থা, ছাপাখানার প্রযুক্তিগত মান এবং সর্বোপরি নিরাপত্তাজনিত কারণে সেটা কতটুকু সম্ভবপর হতে পারে, সে প্রশ্ন থেকেই যায়! এ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য এবং তথ্যের সত্যাসত্য আমার পক্ষে যাচাই করা সম্ভব হয়নি। তবে সে সময় হক কথা নিয়ে অনেক কিংবদন্তি গড়ে উঠেছিল বলে জানা যায়।

১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত সাপ্তাহিক হক কথা-র কয়েকটি জনপ্রিয় কলাম ও বিভাগ, বিভিন্ন নিবন্ধ, লিড নিউজ ও মন্তব্য প্রতিবেদন এবং এসবের একেকটির আকর্ষণীয় নামকরণ ও শিরোনাম পড়ে একজন সাধারণ পাঠকেরও বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় পত্রিকাটি কীধরনের। সেদিনের হক কথা-য় প্রকাশিত 'মুরিদের দরবার', 'ইহা কি সত্য', 'কলকী সমাচার' এবং 'আমার জবাব' ইত্যাদি কলাম খুবই জনপ্রিয় ছিল। 'মুরিদের দরবার' কলামটি পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল মোহাম্মদ হোসেনের ওপর; 'ইহা কি সত্য' কলামটি দেখতেন মওলানা ভাসানী; 'কলকী সমাচার' কলামটি লিখতেন শামসুল আরেফিন এবং পাঠকদের বিভিন্ন প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসার জবাব দিতেন 'আমার জবাব' কলামে মওলানা ভাসানী নিজেই। নাজীমউদ্দিন মোস্তান, আবদুর রহিম আজাদ, বুলবুল খান মাহবুব, শাহ আহমদ রেজা প্রমুখ সম্পাদকীয় নিবন্ধসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধ ও রিপোর্ট লিখতেন অথবা লেখার কাজে সহায়তা করতেন বলে শাহ আহমদ রেজা এক ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় জানান। বিশেষ করে নাজীমউদ্দিন মোস্তানের লেখা 'পাগলা ঘোড়া বশ মানেনি' শিরোনামে একটি

লিড নিউজ (প্রথম লিড নিউজ, হক কথা, ৭ জুলাই ১৯৭২, ১৯তম সংখ্যা) এবং 'জো হুজুরী এবং শোষকশ্রেণীর দালালীর অপর নাম মস্কোপন্থীদের রাজনীতি (১৮ ও ১৯তম সংখ্যা) শিরোনামে একটি ধারাবাহিক প্রতিবেদন (অসম্পূর্ণ) -এর কথা বললেন শাহ আহমেদ রেজা। হক কথা-য় ছিল না কোনো তত্ত্বের কচকচানি কিংবা বুদ্ধিজীবীসুলভ কেরিকেচার। সমাজ ও রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে ঘটে যাওয়া চলমান খবর এবং খবরের পিছনের খবর সরাসরি এবং জনগণের মুখের ভাষায় বলে যেত হক কথা। অন্য পত্রিকায় যা ছাপতে সাহস করত না, হক কথা-য় তা ছাপা হতো। তবে নিউজের চেয়ে ভিউজ বেশি প্রাধান্য পেত। ফলে সংবাদ বা তথ্য পরিবেশনের ক্ষেত্রে কিছুটা যে অতিরঞ্জন হতো, তা কিন্তু অস্বীকার করা যাবে না। তখন তথ্যের অবাধ প্রবাহ যেমন ছিল না, তেমনি শাসকশ্রেণীর নানা বিধিনিষেধ ও নির্মম দমন পীড়নের মধ্যেও ছিল গুজবের ছড়াছড়ি। হক কথা-য় প্রকাশিত তথ্য ও প্রতিবেদনের ওপর এর একটা প্রভাব পড়া তাই অস্বাভাবিক কিছু নয়। যেমন- হক কথা-র ২২ সেপ্টেম্বর ৩০তম সংখ্যার লিড নিউজটার কথাই ধরা যাক : 'ঠগ কে তাজুদ্দিন সাহেব, জনগণ না আপনারা?/ সেই গোপন ৭টি চুক্তি'। ১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসে অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার এবং ভারত সরকারের মধ্যে যে গোপন চুক্তি হয়েছিল তার সত্যতা নিয়ে আজো পর্যন্ত কোনো প্রশ্ন ওঠেনি। তবে হক কথা-য় যেভাবে প্রকাশিত হয়েছে ৭টি চুক্তি, আসলে তা নয়, এটি ছিল একটি চুক্তি এবং সেখানে চুক্তির ৭টি শর্ত বা দফা ছিল বলে স্বাধীনতাযুদ্ধকালীন প্রবাসী অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের দিল্লী মিশনের প্রধান হুমায়ুন রশীদ চৌধুরীর সঙ্গে এক ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের বরাত দিয়ে মাসুদুল হক এ কথা জানান। "চুক্তির শর্তগুলো হচ্ছে: (১) যারা সক্রিয়ভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছে শুধু তারাই প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে নিয়োজিত থাকতে পারবে। বাকীদের চাকুরীচ্যুত করা হবে এবং সেই শূন্যপদ পূরণ করবে ভারতীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তারা, (২) বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভারতীয় সৈন্য বাংলাদেশে অবস্থান করবে (কতদিন অবস্থান করবে, তার সময় সীমা নির্ধারণ করা হয় না)। ১৯৭১ সালের নভেম্বর মাস থেকে আরম্ভ করে প্রতিবছর এ সম্পর্কে পুন:নিরীক্ষণের জন্য দু'দেশের মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে, (৩) বাংলাদেশের কোনো নিজস্ব সেনাবাহিনী থাকবে না, (৪) অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য মুক্তিবাহিনীকে কেন্দ্র করে একটি প্যারামিলিশিয়া বাহিনী গঠন করা হবে, (৫) সম্ভাব্য ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে অধিনায়কত্ব দেবেন ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রধান, মুক্তিবাহিনী সর্বাধিনায়ক নন এবং যুদ্ধকালীন সময়ে মুক্তিবাহিনী ভারতীয় বাহিনীর অধিনায়কত্বে থাকবে, (৬) দু'দেশের বাণিজ্য হবে খোলা বাজার (ওপেন মার্কেট) ভিত্তিক। তবে বাণিজ্যের পরিমাণ হিসাব হবে বছর-ওয়ারী এবং যার যা পাওনা, সেটা স্টার্লিং-এ পরিশোধ করা হবে, (৭) বিভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কের প্রশ্নে বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলবে। ভারত যতদূর পারে এ ব্যাপারে বাংলাদেশকে সহায়তা দেবে। ...

অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারে পক্ষে সাত দফা গোপন চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম। চুক্তিপত্রে স্বাক্ষরদানের পরপরই তিনি মূর্ছা যান।' (মাসুদুল হক : বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে 'র' এবং সি আই এ, মৌলি প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম মৌলি সংস্করণ : বইমেলা ১৯৯৭, পৃ. ৭৪)।'৭১-এর অক্টোবরে অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে ভারত সরকারের সম্পাদিত সাত দফা গোপন চুক্তিটির বিষয়বস্তু এবং অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে চুক্তিতে তাজুদ্দিনের স্বাক্ষরদানের অভিযোগ নিয়ে হক কথা-য় প্রকাশিত তথ্যের সঙ্গে মাসুদুল হকের উপরোক্ত বইয়ে প্রকাশিত তথ্যের কিছুটা গরমিল লক্ষ্য করা যায়। যাহোক, সেদিনের সেই হক কথা প্রকাশ ছিল একটি ঐতিহাসিক সময়ের দাবি, ছিল একটি ঐতিহাসিক সময়ের প্রয়োজন। হক কথা সেদিন এমন এক সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল যখন সদ্য স্বাধীনতাযুদ্ধ-উত্তর বাংলাদেশে স্বাধীনতার মস্তবড় ফাঁকি, মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের মধ্যে এক চরম পরাজয়ের গ্লানি যখন সবে ধরা পড়তে শুরু করেছে; যখন স্বাধীনতাবিরোধী দেশদ্রোহী পাকিস্তানি দালালদের পুনর্বাসন চলছে একদিকে, আর অন্যদিকে যখন প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের 'নকশাল' বলে দেখামাত্র গুলি করার নির্দেশ দিচ্ছে তৎকালীন মুজিব সরকার; এবং যখন ভারতের সম্প্রসারণবাদী ইন্দিরা সরকার বাংলাদেশকে সিকিম-ভুটান বানাবার ষড়যন্ত্র ও তৎপরতায় লিপ্ত–ঠিক তখনি দেশ ও জাতির এরকম এক ক্রান্তিকালে মওলানা ভাসানী এবং তাঁর প্রকাশিত হক কথা রুখে দাঁড়িয়েছিল, শুনিয়েছিল অভয়মন্ত্র।

হক কথা আজ একটি ইতিহাসের অংশ হয়ে গেছে। নতুন প্রজন্মের কাছে সেই ঐতিহাসিক সময়ের দলিল চিত্রকে তুলে ধরার জন্য প্রথাবিরোধী প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 'ঘাস ফুল নদী' যখন মওলানা ভাসানীর হক কথা (সেদিনের কৃষক জনতার মুখে-মুখে স্লোগান শোনা যেত : 'অনেকের অনেক কথা/ভাসানীর হক কথা')-র একটি সংকলন প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেয় তখন আমি হক কথা-র পুরনো সংখ্যাগুলি সংগ্রহ করার উদ্যোগ গ্রহণ করি। কিন্তু হক কথা-র সেই পুরনো সংখ্যাগুলি এখন কোথায় পাওয়া যায়? বিশেষ করে ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হক কথা-র সংখ্যাগুলি নিয়েই যত সমস্যা। টাঙ্গাইলের সন্তোষ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (প্রস্তাবিত) লাইব্রেরিতে নেই, কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরি, বাংলা একাডেমী লাইব্রেরিসহ দেশের অন্যান্য লাইব্রেরিতেও নেই। ন্যাশনাল আরকাইভস-এ সাপ্তাহিক হক কথা-র ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬ থেকে ১ ডিসেম্বর ১৯৭৮ পর্যন্ত প্রকাশিত সংখ্যাগুলিই শুধু পাওয়া যায়। তা হলে কি ১৯৭২-এ প্রকাশিত হক কথা-র সংখ্যাগুলি আদৌ পাওয়া যাবে না? তৎকালীন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ-ভাসানী) এবং কৃষক সমিতি করতেন এমন অনেকের কাছে ধর্ণা দিয়েছি। ভাসানীর অনেক অনুসারী এবং সেদিনের হক কথা-র পাঠক, গ্রাহক ও বিক্রয় প্রতিনিধির কাছে খোঁজ নিয়েছি। সাপ্তাহিক হক কথা-য় কাজ করতেন এমন কারো-কারো সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। কদাচিৎ দু-একজনের কাছে দু-একটা সংখ্যার হদিশ মিলেছে। কিন্তু হক কথা-র এতগুলি সংখ্যা একত্রে কীভাবে সংগ্রহ করা যাবে? এই ধরনের একটি অনিশ্চয়তার মধ্যে হক কথা-র সম্পাদক সৈয়দ ইরফানুল বারী তাঁর সাধ্যমতো সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। তাঁর মাধ্যমে যোগাযোগ ঘটে সন্তোষ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান আজীজ-উল হকের সঙ্গে। সৈয়দ আজীজ-উল হকের সহযোগিতা না পেলে সাপ্তাহিক হক কথা-র এই সংকলন প্রকাশ এত তাড়াতাড়ি সম্ভব হতো কি না, বলা কঠিন। তিনি তাঁর মূল্যবান পরামর্শ এবং সহযোগিতা দিয়ে যে-ভাবে শারীরিক অসুস্থতার মধ্যে এগিয়ে এসেছিলেন, সেটা কোনদিন ভুলবার নয়।

১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দের ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু করা সংগ্রহ অভিযানে আমি ক্রমান্বয়ে সাপ্তাহিক হক কথা-র প্রায় সব সংখ্যাই হাতে পাই। কিন্তু হক কথা-র ২৩ জুন ১৯৭২, ১ম বর্ষ সপ্তদশ সংখ্যাটি আর কিছুতেই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। অন্যদিকে ২৪ মার্চ ১৯৭২, ১ম বর্ষ পঞ্চম সংখ্যার চারটি পৃষ্ঠাও উধাও। অবশেষে দীর্ঘ অনুসন্ধান এবং অনেক সাধ্যসাধনার পর ১৯৭২-এ প্রকাশিত সাপ্তাহিক হক কথার ৩০টি সংখ্যা একত্রে গ্রন্থাকারে আপনাদের হাতে তুলে দিতে পেরে মাথার ওপর থেকে একটি ভারী বোঝা নামানোর মতো স্বস্তি অনুভব করছি।

অনেক বাধাবিঘ্ন পেরিয়ে অবশেষে এই হক কথা সংকলন প্রকাশের ব্যাপারে সহযোগিতা করার জন্য বিশেষভাবে সৈয়দ ইরফানুল বারী এবং সৈয়দ আজীজ-উল হককে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি। আর এদিকে হক কথা-র পুরনো সংখ্যা সংগ্রহ থেকে শুরু করে হক কথা এবং মওলানা ভাসানীর ওপর প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের সময়কালে, বিশেষ করে হক কথা সংকলন সম্পাদনা ও গ্রন্থনার চূড়ান্ত পর্যায়ে একটানা কাজ চলাকালে আমার ওপর অর্পিত সাংসারিক দায়িত্বভার প্রায় পুরোটাই নিজে বহন করে, উপরন্তু মাঝেমধ্যে টুকটাক আর্থিক সহযোগিতা দিয়ে এবং নানারকম অসহনীয় ঘরোয়া ঝামেলা ও কষ্ট সহ্য করে আমার বোন মর্জিনা আমাকে যে ধরনের সহযোগিতা করে গেছেন এজন্য তাঁর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

মওলানা ভাসানীর হক কথা-র এই সংকলন গ্রন্থটি শেষ পর্যন্ত প্রকাশিত হতে পেরেছে 'ঘাস ফুল নদী'-র প্রকাশকদ্বয় মাহবুব কামরান ও মুনীর মোরশেদের আন্তরিক তাগিদ ছিল বলে। মুনীর মোরশেদের অদম্য জেদ : হক কথা-র সংকলন বেরোবেই। হক কথা-র সংকলন বেরিয়েছে।

এখন এটিকে যে যার মতো করে দেখে দেখুক, যে যার মতো করে ব্যবহার করে করুক। কিন্তু কেউ যেন ভুল না বোঝে। হক কথা সংকলন প্রকাশের মধ্যদিয়ে নতুন প্রজন্মের কাছে নতুন আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠুক মওলানা ভাসানী এবং তাঁর রাজনীতি।

আবু সালেক
মার্চ ২০০২

প্রতি কপি পনের পয়সা সাপ্তাহিক

হক-কথা

(WEEKLY THE HAQ-KATHA)

প্রকাশক ও পৃষ্ঠপোষক ঃ মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

প্রথম সংখ্যা শুক্রবার ১২ই ফাল্গুণ ১৩৭৮ ২৫ শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭২ ৯ই মহরম ১৩৯২ প্রতি সংখ্যা পনের পয়সা সন্তোষ টাঙ্গাইল

গণবিপ্লব ছাড়া সমাজতন্ত্র কায়েমের নজীর নেই, তবে ——— মওলানা ভাসানী

॥ নিজস্ব সংবাদ পরিবেশক ॥

বিগত ৬ই ফেব্রুয়ারী সন্তোষে অনুষ্ঠিত ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির কার্যকরী সংসদের এক বর্ধিত সভায় মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ঘোষণা করেছেন যে গণবিপ্লব ছাড়া সমাজতন্ত্র কায়েমের কোন নজীর ইতিহাসে নেই, তবে যদি কেউ পার্লামেন্টারী পদ্ধতিতে তা প্রতিষ্ঠিত করতে চান, তাকে সময় দিয়ে পর্যবেক্ষণ করা উচিত। সভায় মওলানা সাহেব সভাপতির ভাষণ দিচ্ছিলেন।

সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ ও সামন্তবাদ বিরোধী আন্দোলনের সাথে তাঁর পার্টির সংগ্রামী একাত্মতার কথা ঘোষণা করে বৃদ্ধ মওলানা বলেন যে চীন, যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্থানসহ সব দেশেরই উচিত বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া। তিনি বলেন, দেশের পুনর্গঠনে বিনা শর্তে আমাদের বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ করা দরকার। কিন্তু তার জন্যে আত্মনির্ভরশীল ও স্বয়ংসম্পূর্ণ জাতি হিসেবে গড়ে উঠবার প্রচেষ্টা ত্যাগ করলে চলবে না।

মওলানা সাহেব তাঁর ভাষণে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির ব্যাপক সাংগঠনিক পদক্ষেপের পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করেন। তিনি পার্টির সব কমিটি বাতিল করে সর্বত্র এড-হক কমিটি গঠন করার নির্দেশ দিয়েছেন।

নিম্নে সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত প্রস্তাবাবলী পুরোপুরি দেয়া হল ঃ

১) ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি কার্যকরী সংসদের এই বর্ধিত সভা স্বাধীনতা সংগ্রামী সকল মুক্তিযোদ্ধার প্রতি আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছে এবং যাহারা শাহাদাত বরণ করিয়াছেন তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাইয়া রুহের মাগফেরাত কামনা করিতেছে।

২) শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত বাংলাদেশের বর্তমান সরকার বারবার ঘোষণা করিতেছেন ঃ তাহাদের প্রধান কর্মসূচী হইবে সত্যিকার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা — নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র নহে; ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং নিপীড়িত, নির্যাতিত, সর্বহারা মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তির একমাত্র আদর্শ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। এই ঘোষণা ও ওয়াদার মধ্যে কোন প্রকার ভাওতাবাজী রহিয়াছে বলিয়া ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির

কার্যকরী সংসদের এই বর্ধিত সভা বিশ্বাস করে না। তাই ক্ষমতাসীন সরকারকে ন্যাপের পক্ষ হইতে আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছে এবং উপরোক্ত আদর্শ প্রতিষ্ঠাকল্পে সকল প্রকার জনকল্যাণমূলক কর্মসূচীর সহিত পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দান করিতেছে।

৩) চীন, যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তানসহ যে সকল দেশ এখনও স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে নাই তাহাদের নিকট এই সভা যতশীঘ্র সম্ভব স্বীকৃতি দানের জন্য অনুরোধ জানাইতেছে। তৎসঙ্গে জাতিসঙ্ঘে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তি কার্যকরী করার দাবীও এই সভা জানাইতেছে।

৪) এই সভা সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ ও সামন্তবাদ বিরোধী সকল সংগ্রামী আন্দোলনের সহিত ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির একাত্মতা ঘোষণা করিতেছে।

৫) ধান-চাউল ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম দিন দিন এত বৃদ্ধি পাইতেছে যে জনসাধারণের পক্ষে তাহা ক্রয় করিয়া জীবন ধারণ করা মোটেই সম্ভবপর নহে। তাই এই সভা সরকারের নিকট ইহার আশু প্রতিকারের জন্য সবিশেষ অনুরোধ জানাইতেছে।

৬) বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণে ধান চাউল ইত্যাদি শস্য উৎপন্ন হইলেও প্রতি বৎসর প্রায় ত্রিশ লক্ষ টন খাদ্য বিদেশ হইতে সংগ্রহ করিতে হয়। এমতাবস্থায় বর্তমানে যে হারে ধান, চাউল, পাট, কলাই, সরিষা, মাছ, মুরগির ডিম, খাসী ও তরতরকারি সীমান্তের অপর পারে পাচার হইতেছে তাহা অবিলম্বে বন্ধ করিতে না পারিলে সত্বরই দেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে। তাই কালবিলম্ব না করিয়া প্রতিবেশী ভারত ও বার্মা সরকারের সহযোগিতার মাধ্যমে চোরাচালানী বন্ধের প্রতি সরকারের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইতেছে।

৭) বাংলাদেশ সরকার বারম্বার ঘোষণা করিয়াছেন বিনা বিচারে কাহাকেও শাস্তি দেওয়া হইবে না। তাই বাঙ্গালী— অবাঙ্গালী সে যে কোন মতাদর্শের হউক না কেন বিনা বিচারে যাহাতে তাহাকে হত্যা বা শাস্তি প্রদান না করা হয় তজ্জন্য আওয়ামী লীগ সরকারের নিকট এই সভা জোর দাবী জানাইতেছে।

৮) শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস করিয়া সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যাহাতে পূর্ণদ্যোমে চালু থাকে তৎপ্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখিতে এই সভা সরকারকে অনুরোধ জানাইতেছে।

৯) বেতার- টেলিভিশনসহ বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে সকল ধর্মের মানবিক মুল্যবোধ জনমনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ব তথা সামাজিক শান্তি স্থাপন করার প্রতি এই সভা সরকারের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছে। তাই বেতার ও টেলিভিশনে পবিত্র কোরান, বাইবেল, গীতা প্রভৃতি ধর্ম গ্রন্থের সঠিক ব্যাখ্যা ও উপযোগিতা প্রচার করা হউক।

১০) বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং উহাকে শক্তিশালী করিতে হইলে সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীকে আত্মনির্ভরশীল এবং খাদ্যশস্যে ও শিল্পজাত দ্রব্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইতে হইবে। পাকিস্তানের মত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন, রাশিয়া, ভারত প্রভৃতি দেশের নিকট ভিক্ষার ঝুলি লইয়া বেড়াইলে কোনদিনই বাংলাদেশ আত্মনির্ভরশীল ও স্বয়ংসম্পূর্ণ হইতে পারিবে না। তাই বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষাবাদ করিয়া খাদ্য ঘাটতি পূরণ করিতে হইবে এবং শিল্পজাত দ্রব্যের বহুলাংশ যাহাতে স্বদেশে উৎপন্ন করা সম্ভব হয় সেমতে পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে এই সভা সরকারের প্রতি আহবান জানাইতেছে। তৎসঙ্গে কাল বিলম্ব না করিয়া সরকারের প্রত্যেক বিভাগের বাড়তি খরচ কমাইয়া এবং অনাবশ্যক মাথাভারি শাসন কিংবা গোটা বিভাগ উঠাইয়া

দিয়া মৌলিক শিল্প স্থাপন করতঃ শিক্ষিত ও অশিক্ষিত বেকারদের রুটি-রুজির ব্যবস্থা করিতে সরকারের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইতেছে।

১১) অদ্যকার এই সভা সমস্ত দিক দিয়া গভীরভাবে চিন্তা করিয়া সম্মিলিত ভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে যে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির কেন্দ্রীয়, জেলা, মহকুমা, থানা ও ইউনিয়ন কমিটি বাতিল করিয়া নতুন ভাবে সংগঠন গড়িয়া তুলিতে এড-হক কমিটি গঠন করা হউক। আগামী এক মাসের মধ্যে প্রত্যেক জেলা, মহকুমা, থানা ও ইউনিয়নের এড-হক কমিটির নাম ঢাকাস্থ কেন্দ্রীয় অফিসে পাঠাইতে হইবে। যাহারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিপন্থী কোন কাজে লিপ্ত ছিল অথবা গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা— এই তিন মতাদর্শে অবিশ্বাসী কিংবা দলীয় নিয়মকানুন ও শৃঙ্খলা রক্ষায় অনাগ্রহী তাহাদিগকে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিতে গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল।

১২) ইতিহাসের ধারায় ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে যে গণবিপ্লব ছাড়া সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। কিন্তু ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমান বিশ্বাস করেন যে পার্লামেন্টারী পদ্ধতিতে সমাজতন্ত্র কায়েম সম্ভব হইবে। যদি তাহাদের বক্তব্য বাস্তবে প্রমাণিত হয় তবে নিঃসন্দেহে সারা দুনিয়ায় একটি নতুন আবহাওয়া প্রবাহিত হইবে। এমতাবস্থায় আমাদের অপেক্ষা ও পর্যবেক্ষণ করা উচিত। তাই এই সভা বাংলাদেশের জনসাধারণকে অনুরোধ জানাইতেছে আওয়ামী লীগ সরকারকে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা— এই তিনটি কর্মসূচী বাস্তবে রূপায়িত করিতে সময় প্রদান করা হউক।

স্বাধীন বাংলাদেশে স্বাধীনচেতা সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কি?

(ভাষ্যকার)

বাংলাদেশের ৫৪ হাজার বর্গমাইলে আজ একটি স্বাধীন সরকার ক্ষমতাসীন। স্বাধীন দেশে স্বাধীন সরকার হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু সরকারকে স্বাধীনচেতা থাকা খুবই কঠিন। আজকের দুনিয়ায় নয়া উপনিবেশবাদের হাওয়া বইছে। তাতে ক্ষুদ্র দেশগুলোর জন্যে নতুন বেড়াজাল সৃষ্টি হয়েছে। বৃহৎ শক্তির বন্ধুত্বের থাবা এড়ানো আজ অতি দুঃসাধ্য। বরণ করে নিলে হজম করাও দুঃসহ। এমনি পরিবেশে দরকার, শুধু স্বাধীনতাই নয়, সাথে সাথে স্বাধীনচেতা সরকার। বাংলাদেশে এই সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিনা সময়ই এর জবাব দিবে।

স্বাধীনচেতা সরকারের বৈশিষ্ট্য হয় তিনটি। প্রথমতঃ সরকারের প্রতিটি সদস্য হয় চরিত্রবান। কোন প্রকার দুর্নীতি তাদেরকে পেয়ে বসে না। নীতির জন্যে তারা যে কোন ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকবে। তাদের সাধনাই শুধু চরিত্রকে সমুন্নত রেখে জনগণের সেবা করে যাওয়া। সকল প্রকার বাধা বিপত্তিকে তারা বরণ করে নেয় হাসিমুখে। লোভ- লালসা, অহঙ্কার এসব থেকে তারা থাকে মুক্ত। জনগণের সন্তুষ্টিই শুধু তাদের কাম্য — নিজের বলে কিছু নেই। তাদের ভাল কাজের উদ্দেশ্য কখনও লোক দেখানোতে সীমাবদ্ধ থাকে না। লোক ভয় কিংবা প্রাণের ভয় কিছুই তাদের গতিতে লাগাম পড়াতে পারে না। তারা হয় দুঃসাহসী নির্ভীক কর্মী— সৈনিক। সময়ই বিচার করবে বাংলাদেশের স্বাধীন সরকার এই চরিত্রের সদস্য পেয়েছে কিনা।

স্বাধীনচেতা সরকারের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল নির্ভেজাল জাতীয়তা বোধ। নির্ভেজাল বলতে

হয় এইজন্যে— অধিকাংশ জাতীয়তাবাদী সরকার জনগণকে ধোঁকা দিয়ে থাকে। জাতীয়বোধের আফিমে জনগণ সরকারের উপর মাত্রাতিরিক্ত আস্থাবান হয়। সরকার এর সুযোগ গ্রহণ করে স্বেচ্ছাচারী হয়ে পড়েন। তাতেই সরকারের স্বাধীনচেতা বেশিষ্ট্য হারিয়ে যায়। নির্ভেজাল জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত স্বাধীনচেতা সরকারের একটি মাত্রই লক্ষ্য থাকে— জাতিকে আত্মনির্ভরশীল ও স্বয়ংসম্পূর্ণ করে গড়ে তোলা। জীবন ধারণের প্রয়োজনে কোন কিছুর জন্যে যাতে ভিনদেশে হাত পাততেন না হয় সেই পথ লক্ষ্য করে খামার-কারখানার উৎপাদনের প্রতি সবিশেষ নজর দেয়া হয়। সময়ই বিচার করবে বাংলাদেশের সরকার নির্ভেজাল জাতীয়তাবাদী কিনা।

তৃতীয়তঃ স্বাধীনচেতা সরকার দেশ ও জাতিকে গতিশীল মত ও পথের সন্ধান দিয়ে থাকেন। যেমত ও পথ দেশবাসী ইতিহাস ঐতিহ্য, বাস্তব পরিবেশ এবং মননশীলতাকে গতিশীল রাখতে সক্ষম একটি স্বাধীনচেতা সরকার জাতিকে সেই পথের সন্ধান দিয়ে থাকেন এমনকি যদি তাদেরকে প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ থেকে সরে পড়তে হয়। সেই সরকার জাতির গতিকে অস্বীকার করে সঙ্কীর্ণতা ও কুপমণ্ডকতায় মজে যেতে পারে না। জনগণ স্বতঃস্ফূর্ততার সাথে যা চায় সেই সরকার তাই মেনে নেন। সময়ই বিচার করবে বাংলাদেশ সরকার জাতিকে কোন পথের পথিক করছেন।

বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের শক্তিতে বলিয়ান হয়ে আজকের বাংলাদেশ সরকার ক্ষমতাসীন। সাত কোটি বাঙ্গালী যদি তাদের কল্যাণের পথে গতিশীল থাকতে গিয়ে বর্তমান সরকার কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হয় তবে নিশ্চয়ই ইতিহাসের রায় হবে — যেমনটি যুগে যুগে হয়েছে— সরকারের পতন। সরকার যদি তাদের সীমাবদ্ধতা যাচাই না করতে পেরে দমন ও নির্যাতন চালিয়ে যান তবে বিপ্লব হবে অবশ্যম্ভাবী। পাকিস্তান সরকারের ধ্যান ধারণায় যা ছিল বাঙ্গালীদের তা' ছিল না। বাঙ্গালী চেয়েছিল আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার। দাবীর এই গতিকে তারা অস্বীকার করে নয় মাসে কী নির্যাতনই না চালিয়েছে। কত হত্যা, কত ধর্ষণ হয়েছে তার হিসেব আজও আমাদের হাতে নেই। কিন্তু এর প্রতিক্রিয়া আমাদের চোখের সামনে। তা হল 'বিধ্বস্ত পাকিস্তান'। আমার আশা করব শুধু বাংলাদেশ সরকারই নয় দুনিয়ার সকল জাতি তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুক। সে শিক্ষা সংক্ষিপ্ত হলেও প্রচণ্ড বেগবান। তা হল ঃ জাতির মনের গতিকে রুদ্ধ রাখা যায় না। রাখলে রক্তের সীমানা থাকে না।

কৃষক সমিতির স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সদস্যদের প্রতি নির্দ্দেশ

॥১॥

আমার সহিত আপনারা নিশ্চয়ই একমত হইবেন যে এক শ্রেণীর দুষ্কৃতিকারী মুজিববাহিনী কিংবা মুক্তিবাহিনী বলিয়া পরিচয় দিয়া সারা বাংলাদেশে যে অরাজকতা সৃষ্টি করিয়াছে ইহার আশু প্রতিকার না হইলে অচিরেই ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হইবে। আর ছয় মাস যদি এই ভাবে লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ, বিনাবিচারে পাইকারী হত্যা অস্ত্র প্রদর্শন করিয়া অর্থ আদায় ইত্যাদি সমাজবিরোধী ও রাষ্ট্রদ্রোহীমূলক জঘন্য কাজ চলিতে থাকে, আগামী ২৫ বৎসরেরও দেশে শান্তি- শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা সরকার ও জনগণ কাহারও পক্ষে মোটেই সম্ভবপর হইবে না। ইতিমধ্যে আমি সরকার ও জনসাধারণের নিকট আকুল আবেদন জানাইয়াছি — রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা রক্ষার জন্য কালবিলম্ব না করিয়া এই সব কঠোর হস্তে দমন করুন। যাহারা সত্যি সত্যিই শত্রুর সহিত লড়াই করিয়া স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছে তাহারা এইরূপ জঘন্য কাজ করিবে, ইহা আমি মোটেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। চোর, ডাকাত, গুণ্ডা যাহারা চিরকালই দেশে অশান্তি সৃষ্টি করে তাহারাই এইরূপ জঘন্য কাজ করিয়া বেড়াইতেছে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

তাই কৃষক সমিতির সেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রতি আমার আহ্বান— যে কোন মতের কিংবা যে কোন শ্রেণীর মানুষ এই অশান্তির বীজ বপন করিতেছে তাহাদের বিরুদ্ধে দেশীয় অস্ত্র তথা লাঠি, সড়কি, বল্লম, ফালা ইত্যাদি লইয়া 'জনতার সংগ্রাম' আরম্ভ করিতে প্রস্তুত হউন। মনে রাখিবেন জনতার শক্তির সামনে এটম বোমাও কিছু নহে। আপনাদের দরকার শুধু সৎসাহস ও একতার।

কৃষক সমিতির সদস্যদের প্রতি আমার জরুরী আবেদন, যেখানে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী এখনও গড়িয়া উঠে নাই, সত্বর তাহা গঠন করুন ও সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়ুন।

॥ ২ ॥

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সকল সদস্যদের প্রতি আমার আকুল আবেদন, আপনারা পার্টির সাংগঠনিক কাজে ঝাঁপাইয়া পড়ুন। শীঘ্রই আমি প্রতিটি জেলায় ১ জন আহবায়ক ও ৬ জন সংগঠকের নাম ঘোষণা করিতেছি। এই সাতজনই স্বীয় জেলাধীন মহকুমা সমূহের ১ জন আহবায়ক ও ৬ জন করিয়া সংগঠক নিযুক্ত করিবেন। আবার মহকুমা কমিটি প্রতিটি থানায় তদ্রূপ ১ জন আহবায়ক ও ৬ জন সংগঠক মনোনীত করিবেন। প্রতি ইউনিয়নেও এমনি ১ জন আহবায়ক ও ৬ জন সংগঠক থাকিবেন। সংশ্লিষ্ট থানা কমিটি তাহাদেরকে নিয়োগ করিবেন। আমি চাই প্রতিটি ইউনিয়ন কমিটির অধীন পার্টির সদস্য সংখ্যা কমপক্ষে ৫ হাজার হউক। আগামী ৩০ শে এপ্রিলের মধ্যে ইউনিয়ন, থানা, মহকুমা ও জেলা ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির কমিটি সমূহের নির্বাচন শেষ করিতে হইবে। আর একটি জরুরী কথা—আহবায়ক ও সংগঠকবৃন্দের দায়িত্ব পালনে অবহেলা প্রদর্শনের অভিযোগ থাকিলে ১৫ দিন পরই বরখাস্ত করা হইবে।



সেদিনের শহীদান স্মৃতির মিনারে আজও তারা অনন্য নকীব

যদিও বলা হয় 'ভাষা আন্দোলন,' একুশে ফেব্রুয়ারীর গুরুত্ব কি তাতেই সীমাবদ্ধ?

১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ যে প্রশ্নের সূত্রপাত হয়েছিল তা আন্দোলনের রূপ নিয়ে ১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারী চূড়ান্ত রূপ নিয়েছিল — সংগ্রামের পরিসমাপ্তি কি ওখানেই ঘটেছিল?

আসলে ঘটনাক্রমে তেমনটি হলেও এর উৎপত্তি ও মৌলিকতা ছিল অন্যত্র। তার অনুসন্ধানেই আমাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সচেতনতার ইতিহাস হয় উদ্ঘাটিত।

পাকিস্তানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম গভর্ণর জেনারেল জনাব মোহম্মদ আলী জিন্নাহর জীবদ্দশায়ই বাংলাদেশে বিরোধী দল গঠিত হয় এবং এর নেতৃত্ব দান করেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। অনির্বাচিত প্রতিনিধি জনাব হামিদুল হক চৌধুরী কর্তৃক জাতীয় পরিষদে বাজেট পেশের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ তোলেন

তিনি। মুসলিম লীগ জিন্নাহ্ সাহেবের মোসাহেবদের পকেটে চলে গেলে বাংলাদেশে তিনি গঠন করেন আওয়ামী মুসলিম লীগ। তখন থেকেই বিশেষ করে যুব সমাজে সচেতনতাবোধ ফিরে আসে এবং তারা ভাবতে শিখেন— আমরা লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে স্বাধীনতা পাইনি।

কিন্তু এ কথা বলবার উপায় কি? এ সত্য প্রতিষ্ঠা করবার পন্থা কি? পরিবেশ তো তখন অন্যরকম।

অপেক্ষা বেশী করতে হল না। শীগ্‌গীরই প্রচন্ড আঘাত এলো ভাষার উপর। ততোধিক প্রচণ্ডতায় প্রতিবাদ জানানো হল। ঢাকার রাজপথে, সোনালী দিনের স্বাক্ষর টকটকে লাল রক্ত ঝরল। তাই ভাষা আন্দোলন শুধু ভাষা আন্দোলনই ছিল না — লাহোর প্রস্তাবকে অবচেতন মনে রেখে তা হয়েছিল প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলন।

স্বয়ং মওলানা ভাসানী রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহবায়ক হলেও একে স্বাধিকার আন্দোলনের রূপ দিয়েই ক্ষান্ত হতে বাধ্য হলেন। কারণ, তা ছিল শুধু শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আওতায় সীমাবদ্ধ। অবশ্য এই আন্দোলনই রূপান্তরিত হয়ে ব্যাপকতা লাভ করল দু'বছর পর যুক্তফ্রন্টের চূড়ান্ত বিজয়ের মাধ্যমে। আফসোস, এ বিজয়ের মুখে চুন-কালি পড়ল পাক-মার্কিন আঁতাতের ফলে। তাই বিখ্যাত কাগমারী সম্মেলনে হুঙ্কার ছাড়লেন মওলানা — আমরা তাদের জানাই আসসালামু আলাইকুম। ঢাকায় নয়, ১৯৭০ সালে নয় — কাগমারীতে ১৯৫৭ সালে স্বাধীনতার দাবী হয়ে উঠে সুস্পষ্ট।

তার পরবর্তী ইতিহাস বড়ই করুণ ও বিস্ময়কর। মওলানাকে অপেক্ষা করতেই হল। ১৯৭০ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর আবার বললেন, লাকুম দ্বীনুকুম ওয়াল ইয়া দ্বীন।

তাই বলি, শহীদ মিনার বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সর্বোচ্চ মিনার। তাই ভাবি, সেদিনের শহীদান স্মৃতির মিনারে আজও তারা অনন্য নকীব।

সপ্তাহের ভাবনা

অপ্রিয় হলেও সত্য কথা বলবে।

— হযরত মোহাম্মদ (দঃ)

আসলে 'বুর্জোয়া গণতন্ত্র' শুধুমাত্র শোষণকারীদের স্বার্থ রক্ষা করে। যে পর্যন্ত ভূমি এবং অন্যান্য উৎপাদন ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকবে, সে পর্যন্ত সবচেয়ে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অবশ্যই হবে বুর্জোয়া একনায়কত্ব এবং গুটিকয় ধনিকের হাতে থাকবে বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ মেহনতি মানুষের নিষ্পেষনের যন্ত্র।

— লেনিন

হক-কথা

সন্তোষ, শুক্রবার, ১২ই ফাল্গুন, ১৩৭৮

সম্পাদকীয়
'হক' কথা

হক কথা বলবার নিশ্চিত সম্ভাবনা নিয়ে 'হক-কথা' বের হল।

এ তো আল্লাহুর অসীম করুণা। বলিষ্ঠ কারণে সমাজের দৃষ্টি অকৃষ্ট করে তা এবার মানুষের খেদমত করে যেতে পারবে, এ ভরসা আমাদের রইল।

মফঃস্বলের কাগজ নিঃসন্দেহে প্রয়োজনের চেয়ে সখটা মিটায় বেশী। অন্ততঃ পাঠকমহল তাই আশা করে থাকেন। 'হক-কথার' লক্ষ্য আন্তরিকতার সাথে দুটাই মিটিয়ে দেয়া।

সমাজের সকল স্তরে রাজনীতি, ধর্মনীতি, অর্থনীতি, সাহিত্য ও সংস্কৃতির গতিশীল রূপরেখা তোলে ধরে সে প্রয়োজনের পরিচ্ছেদে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে চায়। তদুপরি গ্রামীণ পরিবেশে পালিত সরল ভাষ্যকার— লেখকদের প্রাণবন্ত সখটাও জুড়ে দিতে চায়। সব মিলে মানুষের দরবারে 'হক-কথা' পরিবেশ ও যুগের হক আদায় করতে বদ্ধপরিকর।

'হক-কথা' কতদূর 'হক' কথা বলতে পারবে এও একটি প্রশ্ন। কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন রাখা নিশ্চয়ই বাচালতা বৈ কিছু নয়। আমরাও সে বিষয়ে সজাগ। সাংবাদিকতার জগতে 'নির্ভীক ও স্পষ্টভাষী' বলতে যা বোঝায় আমরা তাই হতে যাচ্ছি কিনা পাঠকবর্গই এর জবাব দিবেন। সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত জাতি হিসেবে আমরা যে হিম্মত পেয়েছি তার পরশ নিশ্চয়ই এতে লাগবে। আবার নবীন দেশে প্রাচীন সমস্যা যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে, তার ছোঁয়াও আমাদের লাগবে। সব মিলে, আমরা বাস্তবানুগ হক কথা বলবার প্রয়াসী, সৌখিন কলমবাজিতে নেই।

তারপর স্বীকৃতি পাবার পালা। সমঝদারের সমাদর 'হক-কথা'র জন্যে সবকিছু না হলেও অনেক কিছু। তাই লেখক ও পাঠক মহলে 'হক-কথা' একটি স্থান করে নিবার আশা রাখে। অবশ্যি 'কার মুখপত্র হিসেবে'—আজকের দুনিয়ায় তা একটি বড় প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন। এর জবাব 'হক-কথা'-র নতুন লেখক-পাঠকের জন্যে জন্যে রয়েছে। আজ মানুষের মুক্তির যুগ। বিপ্লবের হাওয়া বইছে। কে জানে, মুখপত্রটির সকল সমঝদার কেবল ন্যায় ও সাধুতাকেই ভালবাসে কিনা, শুধু বিপ্লবের পথকেই মুক্তির নিশানা মনে করে কিনা!

এবারের মহরম

॥ লুৎফুল আজিজ ॥

সে পঁচিশ বছর আগের কথা। কোলকাতায় একবার সব আলেম মিলে আশুরার মিছিলকে না-জায়েজ করে একটি বিবৃতি খাড়া করলেন। তারপর চালালেন স্বাক্ষর অভিযান। বহু আলেম তাতে দস্তখত দিলেন। কিন্তু সর্বজনমান্য একজন বুজুর্গ তাতে স্বাক্ষর দিতে অস্বীকার করলেন। আবেদনকারী আলেমরা তো তাজ্জব বনে গেলেন। খুব পীড়াপিড়ি করা সত্ত্বেও সেই বুজুর্গ সুধী দস্তখত দিলেন না। তারপর আলেমগণ ধরলেন আশুরার মিছিলের সপক্ষেই বিবৃতি দিতে। তাতেও তিনি অস্বীকার করলেন। তবে কোনটা বিশ্বাস করেন জানতে চাইলে সেই বুজুর্গ আলেমদের বললেন, কারবালার স্মৃতি নিয়ে যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে তাতে বেদআত আছে মানি, কিন্তু আশুরার মিছিলে মুসলমানদের তেজস্বী চরিত্রের বিকৃত হলেও একটি স্বকীয় রূপ বিরাজ করে তাও সত্য। বছরে অন্ততঃ একটি দিনেও মুসলমানদের এই স্বরূপ প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা আছে বলে আমি মনে করি। তাই এর পক্ষে-বিপক্ষে কোনটাতেই আমি স্বাক্ষর দিব না।

সেই বুজুর্গের কথায় দুটি সত্য দিক ফুটে উঠেছে। প্রথমতঃ কারবালার স্মৃতিকে ভিত্তি করে মুসলিম সংস্কৃতি গড়ে উঠতে পারে এবং তা প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ মুসলমানদের তেজস্বী চরিত্র নেই, যা আছে বিকৃত এবং তাই সর্বত্র ধিকৃত। অথচ এমন একদিন ছিল, সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে মুসলমানরা আদর্শ স্থাপন করেছে।

মহরম প্রতি বছর আমাদের দুয়ারে আসে। কিন্তু আমরা এর আদর্শের কথা স্মরণ করি না। এমন কি যে সংস্কৃতি গ্রামে — শহরে একদিন গড়ে উঠেছিল আজ তাও নেই। মিছিল, লাঠিখেলা ছাড়াও ঘরে ঘরে হত

মিলাদ ও শিরণীর আয়োজন। ১লা থেকে ১০ই মহরম নাগাদ গ্রামের মেয়েরা মাথায় তৈল দিত না, সুগন্ধি ব্যবহার করত না। অনেকেই রোজা রাখত। আজও যে এসব একেবারে উঠে গেছে, তা নয়। কিন্তু খুব পরিমিত হয়ে পড়েছে।

আজও যদি আমরা সমাজ এবং রাষ্ট্রের প্রতি চেয়ে দেখি, দেখতে পাব এজিদের মত অহঙ্কারী শাসক- শোষক বেঁচে আছে। কিন্তু আফসোস, যে আদর্শের ভিত্তিতে এজিদের অন্যায় দাবী ও দর্পের বিরুদ্ধে ইমাম হোসেন যুদ্ধ করে শহীদ হয়েছিল, তা আজ আর মুসলমানদের মধ্যে নেই। আজকাল বিশ্বমুসলিম অহঙ্কারী অত্যাচারীকে ভয় পায়। তারা বিদ্রোহ করতে গিয়ে মুষড়ে পড়ে। তবে হ্যাঁ, এবারের মহরমে আমাদের বাঙ্গালী মুসলমানদের দাবী করবার কিছু আছে। পাক-ফৌজের নির্যাতন, ইয়াহিয়া-ভুট্টোর অহঙ্কার— কোনটাকেই বাঙ্গালী বরদাশত করে নাই। শুধু বিদ্রোহই নয় সংগ্রাম করে জয়ী হয়েছে। সত্য প্রতিষ্ঠিত করেছে। বেহেশতে বসে নিশ্চয় ইমাম হোসেন তৃপ্তির হাসি হাসছেন। তিনি দাবী করতে পারেন, তাঁর প্রতিষ্ঠিত আদর্শের বিজয় আজও অবশ্যম্ভাবী।

তাই এবারের মহরম শুধু চৌদ্দ শত বৎসর পূর্বের কারবালার স্মৃতিই আমাদেরকে স্মরণ করে দিবে না, গেল নয় মাসের বেদনা, আমাদের সংগ্রাম, আমাদের বিজয় — সবই মানসপটে তোলে ধরবে। এবারের মহরম সত্যিই আমাদের জন্য কত আপন।

কয়েকটি ঘোষণা ও আবেদন

১) বাংলাদেশের সর্বত্র 'হক-কথার' এজেন্ট ও সংবাদদাতা আবশ্যক। ইচ্ছুক ব্যক্তিদের সম্পাদক সমীপে দরখাস্ত পেশ করতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

২) বিজ্ঞাপন প্রকাশার্থে 'হক-কথার' 'রেট কার্ড' আমাদের কার্যালয়ে (সন্তোষ, টাঙ্গাইল) পত্র লিখে সংগ্রহ করুন। আপনার পণ্যের খবর প্রত্যন্ত গ্রামে পৌছাতে হলে 'হক-কথায়' বিজ্ঞাপন দিন।

৩) যাবতীয় পাওনা আদায় 'হক-কথা' এই নামে ক্রসড চেক কিংবা ক্রসড ড্রাফট হতে হবে।

৪) বিশেষ করে গ্রাম ও চর এলাকায় 'হক-কথাকে' জনপ্রিয় করতে আমরা সেখানকার খবরাখবর প্রকাশে অত্যন্ত আগ্রহী। সেমতে আমাদের সাথে সাধ্যমত সহযোগিতা করুন।

৫) যে কোন প্রকারের অভাব- অভিযোগ প্রকাশার্থে সম্পাদক সমীপে তা লিখে জানাতে পারেন।

৬) সকল প্রকার লেখা (খবর, চিঠিপত্র, প্রবন্ধ, ফিচার, কবিতা ইত্যাদি) এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্টভাবে নাম-ঠিকানা সমেত হতে হবে।

৭) 'হক-কথার' উপকারার্থে পাঠকদের তরফ থেকে পরামর্শ ও আলোচনা কামনা করা হচ্ছে।

৮) অচিরেই ছোটদের আসর চালু করা হবে। তাই ক্ষুদে লেখক ভাইবোনদের তরফ থেকে সকল প্রকার লেখা আহ্বান করা হচ্ছে।

সম্পাদক

হক-কথা

যদিও মাঘের শেষে বর্ষিয়াছে —

এইবার মাঘের শেষে বৃষ্টি হইয়াছে। কৃষকের মনে তাই আনন্দের সীমা নাই। প্রচলিত প্রবাদে আছে— "যদি বর্ষে মাঘের শেষ, ধন্য রাজার পুণ্য দেশ"। বাংলাদেশের কৃষকগণ এই প্রবাদ বাক্যটির সহিত সুদীর্ঘকাল যাবত পরিচিত। মাঘের শেষে বৃষ্টি হইলে চিনা, গম, যব, কলাই ইত্যাদি রবিশস্য ভাল জন্মে। অপর দিকে আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু ইত্যাদি ফলের উৎপন্নও বৃদ্ধি পায়। এই বার রবিশস্য ও ফলের চাষ ভাল হইবার সম্ভাবনাই অধিক। তাই রবিশস্যাদির দিকে তাকাইয়া কৃষকের আজ হাসি ভরা মুখ।

কিন্তু যে সব অঞ্চলে রবিশস্য উৎপন্ন হয় না মোটেই— সেই সকল স্থানের কৃষকের মুখ বিষাদ-মাখা। কারণ, তাহাদের জীবিকা অর্জনের একমাত্র সম্বল ইরি ও বোরো ধান। এইগুলি আবাদের অনুকূল পরিবেশ এইবার হয় নাই। ইরি— বোরো উৎপন্নের জন্য বৃষ্টির উপর নির্ভর করার চাইতে পানি সেচের মেশিনের উপর কৃষক নির্ভরকরে বেশী। কিন্তু এইবার পানি সেচের পাম্পিং মেশিন যথাযথ ভাবে সংশ্লিষ্ট কৃষকদের মধ্যে সরবরাহ করা হয় নাই। শুধুমাত্র যাহারা মন্ত্রী হইয়াছেন তাহাদের বসত বাটির নিকটস্থ কিছু সংখ্যক কৃষকের মধ্যে কৃষি বিভাগ সরবরাহ সীমাবদ্ধ রাখিয়াছেন। বাংলাদেশের ৬২ হাজার গ্রামের কৃষক লইয়াই কৃষক সমাজ। মুষ্টিমেয় কিছু সংখ্যক কৃষকের ভিতর কৃষি বিভাগ তাহার দায়িত্ব ও কর্তব্য সীমিত রাখিলে গোটা কৃষক সমাজের উন্নতি সম্ভব নহে। সরকারের কৃষি উন্নয়ন বিভাগ তাহার দায়িত্ব ও কর্তব্য পরিপূর্ণভাবে পালন করিতে সক্ষম হইলে বাংলাদেশের কৃষকদের সকল প্রকার শস্য উৎপন্নের পথ সুগম হইত, আর তাহাদের উৎপন্নের হার বৃদ্ধি পাইত দ্বিগুণ।

বিজ্ঞানী বিশ্বাস না করিলেও বাংলাদেশের কৃষকদের মধ্যে সুদীর্ঘ কাল যাবত আর একটি প্রবাদ প্রচলিত— "দক্ষিণে চাঁদ বাঁকা হইয়া উঠিলে দেশে দুর্ভিক্ষ হয়,— আর সোজা হইয়া উঠিলে দেশে শান্তি হয়, আবার শস্য ফলের উৎপন্ন বেশী হইলে ঝড়ও খুব প্রবল হয়"। এইবার চাঁদ সোজা হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া কৃষকেরা মনে করে স্বাধীন বাংলাদেশে শান্তি ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু তাহাদের এই ধারণাকে যখন বাস্তবের সহিত মিলাইয়া দেখিতে যায়, যখন জীবন ধারণের জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অগ্নিমূল্য দেখিতে পায়— তখন তাহারা একান্তই হতাশ হয়। তবু তাহাদের বিশ্বাস, শেখ মুজিবের সরকার তাহাদের জন্য অন্ততঃ পড়িবার মোটা কাপড় ও দুইবেলা পেট পুড়িয়া ডাল-ভাত খাইবার সংস্থান করিবেন। সেই আশায় নূতন সরকারের প্রতি তাহারা চৈতালী চাতকের মত তাকাইয়া রহিয়াছে।

শস্য-ফলের উৎপন্ন ভাল দেখা যাইতেছে। সেই সঙ্গে সরকারও খাদ্য ঘাটতি পূরণের জন্য স্বচেষ্ট রহিয়াছেন। বিদেশ হইতে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য সামগ্রী আসিলেও উহা যদি সুবিধামত দেশের সর্বত্র পৌঁছাইয়া না দেওয়া যায় তাহা হইলে দুর্ভিক্ষ দেখা দিতে বাধ্য। ঠিকমত সরবরাহের জন্য উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রয়োজন। বিগত স্বাধীনতার যুদ্ধে বাংলাদেশের রাস্তা- পুলের ক্ষতি হইয়াছে অপরিসীম। বর্ষাকালে এই সব রাস্তা- ঘাটের অবস্থা আরো শোচনীয় হইয়া পড়িবে। সরকার যদি তখন হাজার পাঁচেক নৌকা আর শত পাঁচেক লঞ্চের মাধ্যমেও সর্বত্র সরবরাহ ঠিক রাখিতে চান — তবুও আঁটিয়া উঠিবেন না।

আর এখন আলাউদ্দিনের প্রদীপের মত রাতারাতি সমস্ত রাস্তা-ঘাট পুনঃমেরামত করিবার মত সম্পদও বাংলাদেশের নাই। তাই এই সকলের প্রতি এখন হইতেই নজর দেওয়া দরকার।

দেশের খাদ্য-সামগ্রী যাহাতে ভারত ও বার্মার সীমানা দিয়া পাচার না হয় তাহার প্রতিও জনগণ ও সরকারকে রাখিতে হইবে তীক্ষ্ম দৃষ্টি। কারণ, পানি রাখার কলসি ছিদ্র রাখিয়া উহা পানি দ্বারা পরিপূর্ণ করা সম্ভব নহে।

কবিতা

শাহাদাত হোসেন

কবি তুমি কবিতা লিখেছ
ক্লিওপেট্রা— হেলেন যে
আমলে সভ্যতার ছিল
প্রতীক; যখন বৌদ্ধ
সাধনা করতেন নির্বাণের,
সক্রেটিস ভেবে মরতেন
সত্যাসত্যের, মিশরের
মমিগুলো স্মৃতির মিনার
হয়ে ধরে রাখত প্রাচীন
সভ্যতার মাপকাঠি।

এরপরও তুমি কবিতা
লিখেছ— সে তো
কালিদাসের কাল,
সাদী, হাফেজ, রুমীর
বয়াত; দেখেছ হালাকু
চেঙ্গীস লালে লাল
করছে পথঘাট প্রান্তর
— তাও তুমি থেমে
যাওনি।
যন্ত্র তোমাকে যান্ত্রিক
করতে পারেনি। আজও
তুমি লিখে যাও।

বিস্মিত হই। তুমি
কলম্বাসের মতই উদ্দাম
পথিক।

প্রথম তুমি

খালেদা পান্না

রক্তে রাঙানো বাংলাদেশে
প্রথম তুমি একুশে ফেব্রুয়ারী
এসেছ আবার বছর ঘুরে
এবার তোমায় নতুন করে স্মরণ করি।
সালাম, বরকত, জব্বার, রফিক যারা
করে গেল প্রাণ দান
লক্ষ লাশের মিছিলে আজও
তাদেরই জয়গান।

অতীতের ধারায় ইতিহাস হয়ে
আমরা হলাম স্বাধীন
ত্যাগ সাধনায় রেখে তা অটুট
গড়ব জীবন আজাদ নবীন।

মুরিদের দরবার

আল্লাহ্‌র ইচ্ছাই চরম ইচ্ছা

মোহাম্মদ হোসেন

এই বিশ্ব জগতের একমাত্র মালিক পরম করুণাময় আল্লাহ্‌। তিনি তাঁহার ইচ্ছার আয়ত্বে এই বিশ্বের সকল অস্তিত্বের নিয়ন্ত্রণ করেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত নিয়মে আকাশের গ্রহ, নক্ষত্র নিয়মিত উদিত ও নিমজ্জিত হয়। তাঁহারই ইচ্ছায় পৃথিবীতে প্রাচীন সভ্যতার ঘটে তিরোধান, নতুন সভ্যতার হয় আগমন। রাত-দিন তাঁহারই ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ। অমানিশা-পূর্ণিমা, জোয়ার-ভাটা তাঁহারই কীর্তি। মানুষের জীবনের উত্থান-পতন, সুখ-দুঃখ তাঁহারই নির্দেশের ফল। তর্ক শাস্ত্রে যাহাই থাকুক না কেন, বৈজ্ঞানিক দার্শনিক যতই যুক্তিতর্ক দিন না কেন, কোরআনের কালামে সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্য, ভাল-মন্দ মানুষের কর্মফল, এই তত্ত্ব যতই খোঁজা হউক না কেন, পরিবেশ-পরিস্থিতি, বিদ্যা-বুদ্ধি, জ্ঞান-গরিমার প্রভাব যতই দেখানো হউক না কেন যেহেতু অস্তিত্বের আধার সময় ও সীমানা একমাত্র আল্লাহ্‌রই ধারণার অধীন তাই মুহূর্তকালীন বিষয় হইতে শুরু করিয়া সকল ক্ষেত্রে চিরন্তনী ধারা বিবর্তন শুধু আল্লাহ্‌র ইচ্ছারই অধীন। কিন্তু শুধু বস্তুবাদী একমুখীন মানুষের নিকট কর্মফল তত্ত্বের বিশেষ মূল্য রহিয়াছে। তাঁহারা পৃথিবীর আকাশ, বাতাস, পানি, মাটি, গ্রহ-নক্ষত্র, ভূ-মণ্ডল, ভূ-গর্ভ, নদী-নালা, সাগর-মহাসাগর, পাহাড়-পর্ব্বত ও পরিশেষে যাবতীয় বস্তু এবং পদার্থকে নিজ আবিষ্কৃত জ্ঞান বা যুক্তির কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়া নিতে চান। তাঁহারা দুইয়ে দুইয়ে চার, তিনে তিনে ছয় ইত্যাদি জ্ঞান বা সূত্র মস্তিষ্কপ্রসূত কল্পনা হইতে আবিষ্কার করিয়াছেন। পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত যাহা কিছু আবিষ্কৃত হইয়াছে ও স্কুল-কলেজে যে পুঁথিগত বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে উহার সকল কিছুই সীমাবদ্ধ জ্ঞান। বিজ্ঞান ও দর্শন সীমাবদ্ধ জ্ঞান। ইতিহাসও সীমাবদ্ধ ঘটনার প্রতিচ্ছবি। ভূগোল সীমাবদ্ধ পৃথিবীর পরিচয়। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দর্শনই মানুষের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার হাত হইতে রেহাই পায় নাই। এক- কথায় মানুষ সীমাবদ্ধ ও সঙ্কীর্ণ পার্থিব জ্ঞানের গণ্ডীর ভিতর দিয়া অগ্রগতির দিকে চলিতেছে। অবশ্য এ কথাও ঠিক মানুষ এই সীমাবদ্ধতার হাত হইতে কখনই মুক্তি পাইবে না। মানুষ যতই জানুক তবু তাঁহার জানার অনেক কিছুই বাকি থাকিয়া যাইবে। সৃষ্টির সেরা আদম সন্তান যেমনি অপূর্ণ জ্ঞান লইয়া এই পার্থিব জগতে করিয়াছিল আগমন তেমনি বিদায়বেলায় জীবনপাতার দিকে নজর দিয়া দেখিবে তাহাকে অপূর্ণ জ্ঞান লইয়াই পরপারের পথে করিতে হইল যাত্রা।

মানব শিশু যখন ভূমিষ্ট হয় তখন তাঁহার অহংবোধ থাকে না। 'আমি' বা 'আমার' বলিয়া সে কিছুই জানে না। কারণ, তাহার সমস্ত ভাল-মন্দ, পার্থিব-অপার্থিব, বস্তু বা কর্ম সম্পর্কে জ্ঞান তখনও সুপ্ত। সে তখন অন্যের সাহায্য ব্যতীত বড়ই অসহায়। নূতন এক জগতে আসিয়া ভয়-বিহ্বল মিশ্রিত এক নব আনন্দে শিশু তখন অভিভূত হইয়া পড়ে। যে জগতে সে আসিয়াছে সেই জগতের জ্ঞান-গর্ব তখনও তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। সময়, পরিবেশ-পরিস্থিতি, জীবন-মরণ সম্পর্কে তাঁহার তখন কোন ধারণারই সূত্রপাত হয় নাই। তাই তাঁহার মন এইগুলির বাইরে বিরাজ করে।

ক্রমে ক্রমে মানব শিশু বড় হইতে থাকে। পিতা-মাতার সাহায্যে ভাষা শিখে। ধীরে ধীরে সময়, সংখ্যা, সুখ-দুঃখ প্রভৃতি সম্বন্ধে ধারণা জন্মে। ইহার পর যতই সে বাস্তব জগত সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করিতে থাকে ততই তাঁহার মন সময়, পরিবেশ-পরিস্থিতি ইত্যাদির আওতায় আসে। 'আমি' বা 'আমার' বলিয়া তাঁহার নিজস্ব একটা সত্তার সৃষ্টি করে। ফলে অহংবোধের জন্ম হয়। দুনিয়ার সীমাবদ্ধ জ্ঞান ও শিক্ষা তাঁহার মন-প্রাণকে গ্রাস করিয়া ফেলে। বাস্তব জগতের শিক্ষা ও ক্রিয়াকলাপ তাঁহাকে এক সীমাবদ্ধ সীমারেখায় আবদ্ধ করিয়া রাখে। তখন সে এই সীমাবদ্ধ জ্ঞানের উর্ধ্বে চিন্তাই করিতে পারে না। আল্লাহ্‌ সম্পর্কে ধ্যান-ধারণা বাস্তব শিক্ষার যুক্তিতে এক সীমাবদ্ধ রেখায় আবদ্ধ হইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফিরিতে থাকে। যতদিন পর্যন্ত সেই আদম সন্তান আল্লাহ্‌র ধ্যানে থাকাকে সকল কিছুর উর্ধ্বে স্থান না দেয় ও তাঁহার সকল কর্মের ভিতর আল্লাহ্‌ পাকের অনুভূতি না আসে ততদিন পর্যন্ত সে এই সীমাবদ্ধতার হাত হইতে রেহাই পায় না।

মানুষ এই প্রত্যক্ষ জগতে তিনভাবে জ্ঞান লাভ করিতে পারে ঃ দেখিয়া, যুক্তির দ্বারা প্রমাণ করিয়া ও অনুভূতির দ্বারা। সূর্য পূর্ব দিকে উদিত হয়, পশ্চিম দিকে অস্ত যায়। এই উদয়-অস্তাচলের জ্ঞান মানুষ দেখিয়াই শিখে। আবার পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘুরে উহা প্রমাণ করিয়া জানে। ভাল-মন্দ, পাপ-পুণ্য, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি অনুভূতির মাধ্যমে মানুষের উপলব্ধিতে আসে।

জ্ঞান আবার দুই প্রকারের ঃ বাস্তব জ্ঞান ও আধ্যাত্ম জ্ঞান। যে জ্ঞানের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ জগত সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা জন্মে তাহাকেই বাস্তব জ্ঞান বলা যায়। যে জ্ঞানের দ্বারা স্রষ্টা ও সৃষ্টি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট উপলব্ধি আসে এবং উভয়ের যোগাযোগে ঘনিষ্ঠতার উন্মেষ হয় তাহাকেই আধ্যাত্ম জ্ঞান বলে।

মানুষ স্রষ্টাকে চিন্তা করে তাঁহার বাস্তব ও আধ্যাত্ম জ্ঞানের মাধ্যমে। যাহার বাস্তব জ্ঞান অপরিসীম অথচ আধ্যাত্ম জ্ঞান বঞ্চিত-অর্থাৎ

যিনি শুধু বাস্তব জগতকেই চরম ও পরম সত্য বলিয়া মানেন তাহার নিকট ইহজগতের সুখই আসল সুখ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। স্রষ্টা সম্পর্কে ধ্যান-ধারণা বাস্তবতার টানে স্তিমিত হইয়া যায়।

অপর পক্ষে যাহার আধ্যাত্মিক জ্ঞান বাস্তব জ্ঞানের চেয়ে গভীর, আল্লাহ্ ও রসূল (সঃ) সম্পর্কে তাঁহার ধ্যান-ধারণা দৃঢ় ও সহজ হয়। অদৃশ্য এক মহাশক্তির টানে হৃদয় তাঁহার আল্লাহ্ প্রেমে আপ্লুত হইয়া উঠে। সংসারের শত আকর্ষণে থাকিয়াও সত্য পথে থাকিতে বক্ষ তাহার স্ফীত। বাস্তব শিক্ষা তাহাকে সংসারের কোন মোহে আটকাইয়া রাখিতে পারে না। সেই মানুষই জগতে ইনসান-ই-কামেল বলিয়া পরিচিত হন। তাঁহার কথায়-বার্তায়, চাল-চলনে, বেশ-ভূষায় অসাধারণত্ব ফুটিয়া উঠে। সাধারণ মানুষের মধ্যে থাকিয়াও তিনি যেন অসাধারণ। মানুষ তাঁহার কথা মুগ্ধ হইয়া শুনে। তাঁহার অহংবোধ শিশুদের মতই বিলুপ্ত হয়। সত্য সাধনায় শিশুর মতই তিনি সহজ ও সরল। তাই তিনি 'আমি' বা 'আমার' বলিয়া কিছুই জানেন না। 'আমি'কে তিনি সর্বশক্তিমানের পদপ্রান্তে উৎসর্গ করিয়াছেন। তাই সংসারে যাহা কিছু তিনি 'আমার' বলিয়া পাইয়াছেন তাহা তিনি সকলের তরে বিলাইয়া দিতেই উৎকণ্ঠিত। জগতের সমস্ত মানুষের সুখ-দুঃখ, প্রেম-ভালবাসাকে তিনি নিজের বলিয়া মনে করেন। যাহা কিছু 'আমার' বলিয়া আহরণ করেন তাহাই আবার জগতের বৃহৎ স্বার্থে ছাড়িয়া দেন। তাঁহার এই চারিত্রিক মহত্ত্বে সাধারণ মানুষ আপনা আপনিই তাঁহার প্রতি স্বশ্রদ্ধ হইয়া পড়ে।

কিন্তু জগতের অধিকাংশ মানুষই বাস্তব অভিজ্ঞতা ও বাস্তব জ্ঞানের আলোকে আল্লাহকে চিন্তা করেন। আল্লাহ্ পাক মানুষের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের উর্ধ্বে। সর্বশক্তিমানের নিকট সময় বলিতে কিছু নাই। তাঁহার নিকট দিন-রাত সকলই সমান। সময় মানুষের ধারণার সৃষ্টি। অতএব এক ঘণ্টা, এক বৎসর বা হাজার বৎসর ইত্যাদি বলিয়া সৃষ্টিকর্তার নিকট কোন হিসাব নাই।

আল্লাহ্ পাক এই বিশ্বজগতের একমাত্র বাদশাহ্ ও একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী। তাহার ইচ্ছাই চরম ইচ্ছা–নবীর (দঃ) আরাফাতের শেষ ভাষণেই উহা মূর্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে ঃ "আল্লাহ যাহাকে সৎপথে চালিত করেন তাহাকে কেউ বিপথে পরিচালিত করিতে পারে না এবং তিনি যাহাকে বিপথে চালিত করেন তাহাকে সৎপথে চালিত করিবার কেহই নাই।" "মানুষে মানুষে কোন প্রভেদ নাই"– নবীর (দঃ) এই অমর বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য। উপাদানগত ভাবে সকল মানুষ একই ভাবে সৃষ্টি। কিন্তু একটি কথা অতি সত্য তাহা হইতেছে স্রষ্টা কাহাকে জ্ঞানাদ্রীয় তীক্ষ্ম, বুদ্ধিমত্তা প্রখর, কর্মক্ষমতা প্রগাঢ়, কাহারো বুঝিবার ক্ষমতা বেশী, কাহাকেও কম, কাহাকেও অনুশোচনা-অনুতাপ, সুখ-দুঃখের অনুভূতি ও তাঁহার প্রতি আনুগত্য গভীর করিয়াছেন, আবার কাহাকেও বা পাপ-পথে আসক্তি জন্মাইয়া তাহার জিন্দেগী ব্যর্থতায় পর্যবসিত করিয়া দুঃখের সাগরে ভাসাইয়াছেন, কাহাকেও সৎপথে রাখিয়া সফলতার মঞ্চে বসাইয়া সুখের মুকুট পড়াইয়া আনন্দ দান করিতেছেন। অনেকেই মনে করেন এবং মহাগ্রন্থ কোরআনেও রহিয়াছে মানুষের কর্মফলই তাঁহার জীবনে সুখ-দুঃখের কারণ। ইহার বিপক্ষে আবার এ যুক্তিও বিদ্যমান আল্লাহর ইচ্ছার উপরই সকল কিছু ঘটিতেছে। তিনি ইচ্ছা করিলে মেষের রাখালকে পয়গম্বর, পিতৃ-মাতৃহীন অসহায় বালককে মহানবীতে (দঃ) পরিণত করিতে পারেন। আল্লাহর নাম কেহ জোর করিয়া লইতে পারে না। তাঁহার দিকে বলপূর্বক মনকে নিবদ্ধ করা যায় না। যাঁহার প্রতি

করুণাময়ের দয়া হয় তিনি স্বতস্ফূর্তভাবেই তাঁহার প্রতি আনুগত্য স্বীকার করেন। আনুগত্য দোজখের ভয়ে নয়, বেহেস্তের জন্যে নয়, প্রয়োজনের তাগিদেও নয়–হৃদয়ের টানে নদী যেমন সাগরের দিকে ছুটিয়া যায় মানুষও তেমনি স্বতঃস্ফূর্তভাবেই সর্বশক্তিমানের পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়ে।

মানুষের চিন্তার স্বাধীনতাই বলুন আর জ্ঞান ও কর্মের স্বাধীনতা যাহাই বলুন না কেন–এগুলি মানুষ স্বচেষ্টায় প্রাপ্ত হয় নাই। এগুলি স্রষ্টা প্রদত্ত। অতএব, সকল কিছুর উর্ধ্বে অন্তর্যামীর ইচ্ছা। তাঁহার ইচ্ছা যদি না থাকে তাহা হইলে ভাল চিন্তা, ভাল কর্ম কোনক্রমেই আপনার মধ্যে আসিবে না। আর ইচ্ছা থাকিলে শত দুঃখ-কষ্টের মধ্যে থাকিয়াও আপনি মানুষের মত মানুষ হইবেন। উত্তম চিন্তা ও বড় হইবার স্পৃহা আপনার মধ্যে আপনার অগোচরেই জন্ম নিবে। আপনি ভাবিতেও পারিবেন না। অতীতে কি ছিলেন আর ভবিষ্যতে কিইবা হইতে চলিয়াছেন। আপনি হয়ত বা বলিবেন, মানুষকে খোদা পাক জ্ঞান দিয়াছেন, ইচ্ছা ও কর্মের স্বাধীনতা দিয়াছেন, পাপ-পুণ্য বুঝিবার ও উপলব্ধি করিবার অনুভূতি দিয়াছেন। প্রেরিত মহাপুরুষদের দ্বারা কোরআন-হাদিসের বাণী শোনাইয়াছেন ; সহজ-সরল ও সত্য পথের সন্ধান দিয়াছেন ; বেহেস্ত–দোজখের ভয় দেখাইয়াছেন–তবু মানুষ কেন খারাপ কাজ করে, ভ্রান্ত পথে যাইয়া ধ্বংস হয় ? আপনি তার্কিক আপনার কথায় যুক্তি আছে–কোরআন-হাদিসের ব্যাখ্যা আছে–মহাপুরুষদের আদেশ নিষেধ আছে–কিন্তু আল্লাহ্ পাকই যে মানুষের সকল কাজের উৎস–মানুষ তাঁহার নিকট হইতেই আসিয়াছে আবার তাঁহার দিকেই ফিরিয়া যাইবে ; আল্লাহ্ পাক অসীম ক্ষমতাবান ও ন্যায়পরায়ণ, মহাগ্রন্থ কোরআনে আল্লাহ্ পাকের ন্যায়পরায়ণতার কথা মূর্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, এই কথাগুলি উপেক্ষা করিয়া যাইতেছেন।

মহাগ্রন্থ কোরআন আল্লাহ পাকের এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। একমাত্র মহানবী (দঃ) ব্যতীত সেই কোরআনের বাহ্যিক ও অন্তর্নিহিত তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা ও তত্ত্বের যথার্থতা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আজ পর্যন্ত কেহ বুঝিতে পারেন নাই। যখন মহানবীর (দঃ) উপর এই মহাগ্রন্থ নাযেল হইয়াছিল তখন তাঁহার অন্তরে কি ভাবের, কি ভীতির অথবা কি অনুভূতির সঞ্চার হইয়াছিল তাহা কে জানে ? কোরআনের অর্থ শুধু বুঝিলে চলিবে না–উপলব্ধি করিতে হইবে–শুধু উপলব্ধিই নয়–আমল করিতে হইবে–আবার শুধু আমল করিলেই চলিবে না উহাকে বাস্তব জীবনে মানিয়া চলিতে হইবে। মানুষের জন্য ইহা যে উদ্দেশ্য ও আদর্শ লইয়া আসিয়াছে–সেই আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে সার্থক করিয়া তুলিলে–মানুষের জীবন সুন্দর, সমাজ সুন্দর এবং সর্বোপরি এ বিশ্বসংসারই সুন্দর হইয়া উঠিবে। কিন্তু আমাদের মধ্যে কোরআনের সেই সঠিক উপলব্ধি আর আমলের অদৃশ্য ঐশী শক্তির প্রভাব এখনো আসে নাই–তার কারণ আমরা মুখে বলি বেশী কাজ করি কম। তাই সমাজে আজ বিভেদের সৃষ্টি হইয়াছে। মানুষও মিথ্যার আশ্রয় লইয়া সত্যকে করিয়াছে কৃত্রিম।

মানুষ দুঃখ-কষ্টের আতিশয্যে অধৈর্য্য হইয়া আল্লাহ্ পাকের ন্যায়পরায়ণতার কথা অস্বীকার করিয়া বসে। জগতে একই মানুষ কেহ ধনী কেহ গরীব হইয়া রহিয়াছে। বিধিলিপি অখণ্ডনীয় এ কথাকে একেবারে হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। তবে গভীরভাবে উপলব্ধি করিলে দেখা যায়–আল্লাহ্ পাক সত্যি ন্যায়পরায়ণ–তিনিই চরম ও পরম সত্য যেহেতু আল্লাহর নিকট সময় ও সংখ্যা বলিতে কিছু নাই, রাত-দিন সকলই তাঁহার নিকট একই রূপ। (চলবে)

কৃষক সমিতিতে শ্রেণী সংগঠন হবে কি?

পর্যবেক্ষক মহল এবার চোখ কান পেতে আছেন—'কৃষক সমিতির' পরিণতি কিংবা উন্নতি কী হয়।

১৯৫৭ সালের ফুলছুরি ঘাটের কৃষক সম্মেলনে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী যখন কৃষক সমিতি গঠন করেন- বাংলাদেশের বহু প্রগতিশীল নেতাও তখন শ্রেণী-সংগঠনের মাধ্যমে শ্রেণী সংগ্রাম শুরু করবার কথা ভাবেননি। মওলানা সাহেব তত্ত্বের বই পড়ে রাজনীতি করেন না, তবে তথ্যের ভিত্তিতে কর্মসূচী নির্ধারণ করেন। তাই পনের বৎসর পূর্বেই তিনি উপলব্ধি করলেন, শুধু মধ্যবিত্ত সমাজকেন্দ্রিক রাজনৈতিক পার্টি থাকলে অর্থনৈতিক মুক্তি আসবে না-তার জন্যে দরকার সত্যিকারের শোষিত-বঞ্চিত শ্রেণী তথা কৃষক, মজুর, কামার, কুমার, জেলে, মাঝি, তাঁতী প্রভৃতি সর্বহারা মানুষের সংগঠন। এই সংগঠনই তাদেরকে সজাগ করে দিবে, কি তাদের অধিকার আর কি তারা পায়।

কৃষক ও কৃষক সম্মেলন দিয়ে কৃষি-প্রধান দেশে সকল স্তরের রাজনৈতিক কর্মসূচী নির্ধারণ করা যায় কিংবা করা উচিত মওলানা সাহেব জীবনের অসংখ্য সম্মেলনের মাধ্যমে তা প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। কেও স্বীকার করুক বা না করুক ভাসানী চর সম্মেলন, কাগমারীর সম্মেলন, সিরাজগঞ্জের সম্মেলন, ফুলছুরি ঘাটের সম্মেলন, অবশেষে পাকশী-সন্তোষ-মহিপুর সম্মেলনে, আসাম-বাংলার সর্বহারা শ্রেণীর মানুষের দাবী ও চেতনায় নিয়ন্ত্রিত হয়ে প্রগতিশীল রাজনীতি গড়ে উঠেছে। আফোসোস, এর সুযোগ গ্রহণ করেছে শুধু শহরকেন্দ্রিক রাজনৈতিক দলগুলো। কৃষক ও কৃষক সমিতির চূড়ান্ত বিজয় আজও হয়নি। আমরা জানি, 'যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না। 'সেদিনই মওলানা ক্ষান্ত হবেন। তাই আগামী ২৬ শে ফেব্রুয়ারী তিনি ডেকেছেন কৃষক কর্মী সম্মেলন। ৬ই ফেব্রুয়ারী হয়ে গেছে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির ভাগ্য-নির্ধারণী সভা। এর তাৎপর্য আপতত সংগঠনেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। কিন্তু এবার প্রশ্ন, কৃষক সমিতির বৈশিষ্ট্য ও সীমানা কোথাও সীমিত হয়ে থাকবে কি?

কলা পাতার কাফন

১৯৭০ সালের ১২ই নভেম্বর থেকে বাংলাদেশের ইতিহাস—বেআব্রু লাশের ইতিহাস। সেই মহাসাইক্লোন গেল-কত লাশ পানিতে ভাসিয়ে, কত লাশ প্রান্তরে তপোবনে ছড়িয়ে। তারপর রক্তের স্রোত এল। আকাশ-বাতাস স্তব্ধ হল গন্ধময় আর্তনাদে। এবার সোনার বাংলায় তাই অভাব নেই শুধু অভাবের। কি- শহর, কি- গ্রাম সবখানের অবস্থা একই। হাহাকার আর হাহুতাশ।

কিন্তু আর কতদিন কাফনের অভাবে দাফন বিলম্বিত হবে। আর কতদিন কলা পাতায় কাফন পড়ানো হবে?

অবিশ্বাস কেউ করবেন কিনা জানি না, এমনও পরিবার আছে যাদের সামর্থ নেই কাফনের কাপড় কিনার। আর চাঁদা তোলেই বা কি হবে? বাজারে তো কাপড়ও নেই। তাই বেশী দূরে নয় ধলেশ্বরী তীরে দেখেছি কলা পাতায় কাফন সেরে মৃতের দাফন হয়েছে। আরও দেখেছি দলে দলে লোক ছুটে চলছে উত্তরবঙ্গের দিকে। দিনাজপুর যাবে। সেখানে নাকি কামলা খাটলে পয়সা না দিলেও অন্তত দুবেলা ভাত দেয়। কিন্তু তারা তো জানে না, আজিকার উত্তরবঙ্গ পঞ্চাশ বছর আগের আসাম নয়।

সর্বনাশা সখ

রাসায়নিক বোমা ফাটাইয়া মাছ ধরার সখটি এইবার উৎপাতে পরিণত হইয়াছে।

গৃহকর্তার অনুমতি ব্যতিরেকেই পুকুর হইতে মাছ লইয়া যাওয়া আজ একটি স্বাভাবিক ও সহজ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জেলেদেরও একই অভিযোগ। জবরদস্তিমূলক আচরণে গরীব জেলেদের মাছও বোমা মারিয়া লইয়া যাইতেছে। ইহাতে সামাজিক অশান্তি দেখা দিয়াছে।

অবিলম্বেই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের তরফ হইতে এই উৎপাত বন্ধ করা দরকার।

ইহা কি সত্য?

টাঙ্গাইলবাসীর মনে আজ প্রশ্ন—ব্যাপারটা কি সত্য?

অবিশ্বাস্য হলেও এমনটি নাকি ঘটে গেছে ঃ টাঙ্গাইলে জনৈক এমসিএ এখানকার শুল্ক বিভাগীয় কর্মকর্তার মাধ্যমে মাত্র তের হাজার টাকা ঘুষের বিনিময়ে একটি মদের লাইসেন্স ইস্যু করে দিয়েছেন। সেমতে ব্যবসায়ী মহোদয় শহরে দোকান খুলে বসবার উপক্রম করছিলেন। কিন্তু বাধ সাধলেন বেরসিক মুক্তিসেনার দল। দুর্নীতি দমন অভিযানের ওয়াদার কথা তাঁরা ভুলে যাননি। বোধকরি এরই জ্বলন্ত প্রমাণস্বরূপ তারা দোকানটি উৎখাত করে দেন। লাইসেন্সের অধিকারী স্বাভাবিকভাবেই ধর্ণা দেন তের হাজার টাকা মূল্যের এমসিএ সাহেবের দুয়ারে। বিহিত কি করা যায়।

এদিকে এমসিএ সাহেব 'আনলাকী থার্টিন' থেকে নয় হাজার টাকায় একটি জিপ কিনে ফেলেছেন। তদুপরি সাহসও নেই—সত্যিকারের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মোকাবিলা করে এর কিছু সুরাহ করেন।

।। ২ ।।

এ ঘটনায় শুধু টাঙ্গাইলবাসী নয়, গোটা বাংলাদেশবাসী বিস্মিত।

ব্যাপারটা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রশাসক নিয়োগ নিয়ে স্বজনপ্রীতি ইতিমধ্যেই জেঁকে বসেছে। পরাধীনতার নয় মাসে দালালীর অভিযোগ থাকলেও আওয়ামী আত্মীয়তার খোশ নসীবে শুধু ভবের তরীই পার হচ্ছেন না অনেকে আখেরের কামাইও করে নিচ্ছেন।

এমনি একটি নিয়োগ ঘটেছে মূলার এ্যাণ্ড পিপ্‌নে। যিনি এই কয়দিন আগেও ছিলেন জল্লাদ বাহিনীর দোস্ত তিনিই আজ হর্তাকর্তা। এই ব্যক্তিই বিগত জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে কোম্পানীর খুলনাস্থ অফিসের এক লাখ টাকার ঔষধ পঁচিশ হাজার টাকায় চুরি করে বিক্রি করে দেয়। আত্মীয়তার আবরণে সব সত্যই কি ঢাকা পড়ে যাবে?

।। ৩ ।।

কুলাঙ্গার ইয়াহিয়া খানের আমলে (আইয়ুব আমলে তো বটেই) যে সব ব্যবসায়ী সেনাপতিদের লাল পানি ও যুবতী মেয়ে যোগাত তদের মত বাঙ্গালী বুঝি আর কেউ হতে পারছেন না। আজ তারা শুধু প্রোডাকশনেই নয়, জানে প্রাণেও বাঙ্গালী। অথচ খুব বেশী দিনের কথা নয়, জল্লাদদের সন্তুষ্টির জন্যে কেউ উপহার দিয়েছেন গাড়ী, কেউ বা নগদ রুপিয়া, কেউ বা আবার খাস মেহমানী সম্মান। এদের কে বিচার চায়? মুঠো মুঠো টাকায় কি সব দেশপ্রেমিকের মুখ চেপে ধরা যায়?

।। ৪ ।।

ঘোষিত '৩০৩' — এর দণ্ডপ্রাপ্ত বাঙ্গালী অফিসারদের কুশলাদি আজকাল ইডেন বিল্ডিং-এর আশেপাশেই নাকি জানা যায়। কারণ, এদের অনেকেই 'ডিজ অনেষ্ট' হলেও বাঙ্গালী হিসেবে পরীক্ষিত হয়েছেন। তাই কেউ হয়েছেন প্রশাসক, কেউ প্রধান কার্য নির্বাহক, কেউ বা আবার 'কর্ণধারের' সেবক।

সম্পাদক ঃ সৈয়দ ইরফানুল বারী। মুদ্রণে- কল্লোল প্রেস, সদর সড়ক, টাঙ্গাইল।

সাপ্তাহিক

হক-কথা

(WEEKLY THE HAQ-KATHA)

প্রকাশক ও পৃষ্ঠপোষক ঃ মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

দ্বিতীয় সংখ্যা শুক্রবার ১৯ শে ফাল্গুন ১৩৭৮ ৩রা মার্চ ১৯৭২, ১৬ই মহরম ১৩৯২, প্রতি সংখ্যা পনের পয়সা সন্তোষ টাঙ্গাইল

প্রয়োজন হইলে ভুখা মিছিল বাহির হইবে

স্বাধীনতা কার? সর্বহারা জনতার না মোসাহেব আমলার ?

বিগত ২৬ শে ফেব্রুয়ারী সন্তোষে অনুষ্ঠিত কৃষক সমিতির কর্মী সম্মেলনে ভাষণদান কালে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এক জটিল প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন — "রক্তের বিনিময়ে আমরা যে স্বাধীনতা অর্জন করেছি তা কার জন্যে? জোতদার, মহাজন, ঘুষখোর আমলাদের না সর্বহারা কৃষক-মজুরদের জন্যে?"

সরকার ও তার মোসাহেবদের কার্য-কলাপে বিগত দুই মাসে আর যাহাই ফুটিয়া উঠুক না কেন অন্তত ঃ কৃষক-মজুরদের নিমিত্ত স্বাধীনতার বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে নাই।

মওলানা সাহেব বলেন, "বাংলাদেশে শতকরা ৯০ জনেরও বেশী হল কৃষক, শ্রমিক, জেলে, মাঝি, তাঁতী প্রভৃতি শ্রেণীর সর্বহারা মানুষ। এই স্বাধীনতা যদি তাদের কল্যাণ সাধন না করে দুর্নীতি, অবিচার, শোষণ অব্যাহত থাকে তবে তারা গণবিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে কৃষক-মজুর রাজ কায়েম করবে।"

তিনি বলেন, "যারা ভোট দিয়ে প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছে, যারা সর্বস্ব হারিয়েও স্বাধীনতার পথে রক্ত দিয়েছে তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে অশুভ শক্তিকে উৎখাতও করতে পারে।" মওলানা বলেন, "কাঁটাযুক্ত লাগাম না থাকলে ঘোড়ার গতিকে ঠিক রাখা যায় না। ঘোড়-সোয়ার জনগণের আর তার চাবুক গণশক্তির প্রতীক। গণপ্রতিনিধিদেরকেও ঠিক তেমনি গণশক্তির শাসনে নিয়ন্ত্রিত রাখতে হবে।"

সমাজের অর্থনৈতিক চিত্র তুলে ধরে মওলানা সাহেব বলেন, "আজ মানুষ রোগযন্ত্রণায় আত্মহত্যা করতে চায়, শিক্ষার অভাবে পশুর মত জীবন কাটায়, অভাব- অনটনে অখাদ্য-কুখাদ্য খায়, মরে গেলে কলা-পাতায় কাফন পায়— অথচ সেই মানুষই ধান-পাটের উৎপাদন বাড়ায়, রাস্তা-ঘাট থেকে সুপারির পর্যন্ত ট্যাক্স দেয়। ঠিক এমনি অবস্থায় দেশের সম্পদ চোরাচালান হয়ে যাচ্ছে, ভুয়া মুক্তিবাহিনী ও স্বেচ্ছাসেবক সেজে সর্বহারা মানুষের উপর জুলুম করা হচ্ছে। আজ তাই দরকার কৃষক-মজুরের একতার। ওয়োর যেমন মক্কা—বাংলা নির্বিশেষে হারাম ঠিক তেমনি শোষকের চরিত্র বাঙ্গালী- অবাঙ্গালী

সবারই সমান। তাই স্বাধীনতা পেয়ে উৎফুল্ল হলে চলবে না, শুধু গর্ব করলে চলবে না; স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সকল প্রকার অবিচার, শোষণ বন্ধ করে জনশক্তিকে কাজে লাগাতে হবে।"

এমতাবস্থায় মওলানা সাহেব আহবান জানান, "সর্বত্র কৃষক সমিতি গঠন কর। সকল শ্রেণীর সমিতি আছে কিন্তু কৃষকের শ্রেণী—ভিত্তিক সত্যিকারের কোন সংগঠন নাই। সভা-সমিতি করে আজ কৃষককেই বাঁচার পথ বাতলিয়ে দিতে হবে। চোরাচালান বন্ধের জন্যে সরকারকে শুধু সীমান্ত প্রহরী রাখলেই চলবে না, জনগণের সহযোগিতাও গ্রহণ করতে হবে। শুধু উৎপাদন বাড়ানোর জন্য নসিহত করলেই চলবে না, কৃষককে ন্যায্যমূল্য দান করতে হবে। আর যদি সরকার এসবে মনোযোগ দান না করে সমাজবিরোধী কার্যকলাপকে প্রশ্রয় দান করেন, কৃষকের বাঁচার সংস্থান না করেন, গ্রামের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে কর্মসূচী গ্রহণ না করেন তবে বাংলাদেশের সর্বত্র ভুখা মিছিল বের হয়ে পড়বে।"

মওলানা সাহেব সরকারকে সাবধান করে ঘোষণা করেন, "পলাশীর যুদ্ধের পর এবার বাঙ্গালী যুদ্ধ শিখেছে, মরতে জেনেছে— তাই জনগণকে ক্ষ্যাপা করে লাভ নেই। পাগলা কুকুর ক্ষিপ্ত হলে একাই কত জনের সর্বনাশ সাধন করে। ঠিক তেমনি মানুষও পাগল হলে শিকলকে ভয় করে না— ক্রোধে ফেটে পড়ে।"

তিনি বলেন, "জনমত ছাড়া কোন শাসক টিকতে পারে না। ফেরাউন, নমরুদ, রাবন, এজিদ যেমন টিকতে পারেনি — ইয়াহিয়াও তেমনি ধ্বংস হয়েছে। ইতিহাস থেকে সরকারকে শিক্ষা গ্রহণ করে তাই অতি সত্বর দেশে আইন- শৃঙ্খলা কায়েম করে জুলুম বন্ধ করা উচিত। তা না হলে আওয়ামী লীগ সরকারকেও সেই পরিণতি ভোগ করতে হবে।"

সভায় সর্বসম্মতিক্রমে কৃষক সমিতির সকল কমিটি বাতিল ঘোষণা করে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীকে আহবায়ক ও ১৯ জন কেন্দ্রীয় সংগঠক রেখে সমিতিকে পুনর্গঠিত করবার দৃঢ় সঙ্কল্প গ্রহণ করা হয়। ১৯ জন সংগঠকের মধ্যে ১০ জনের নাম সভায় ঘোষণা করা হয়। তারা হচ্ছেন — রাশেদ খান মেনন, আবদুল মান্নান ভূঁইয়া, আজাদ সুলতান, বদিউল আলম, রফিক উদ্দিন ভূঁইয়া, কাজী আফতাবুল ইসলাম, শান্তি সেন, জালাল, লুৎফর রহমান মিয়া ও মাহবুব উল্লাহ। পরে আরও ৯ জনের নাম ঘোষণা করা হবে।

সভায় কৃষক নেতাদের মধ্যে বক্তব্য দান করেন রাশেদ খান মেনন, মাহবুব উল্লাহ ও আবদুল মান্নান ভূঁইয়া। তাহারা কৃষক সংগঠনকে জোরদার ও মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে আন্দোলনকে দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে দৃঢ় সংকল্প ঘোষণা করেন। সভায় কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। তন্মধ্যে টেষ্ট রিলিফের কাজে মজুরদের জন্য রোজ ৩ টাকা ধার্য করার দাবী এবং কলকারখানার শ্রমিকদের বেতন দানের দাবী জানানো হয়।

নিম্নে গৃহীত প্রস্তাবাবলী পুরাপুরি তুলিয়া দেওয়া হইল ঃ

১) কৃষক সমিতি আন্তরিকভাবে শ্রেণী চরিত্র ও শ্রেণী সংগ্রাম বিশ্বাস করে। বাংলাদেশের শতকরা ৯৫ জন লোক কৃষক, ক্ষেত মজুর ও কলকারখানার শ্রমিক। ইহারাই সকল শ্রেণীর চেয়ে নির্যাতিত ও শোষিত মানুষ। দেশকে শোষণমুক্ত করিতে ও সুখী সমৃদ্ধশালী করিয়া গড়িয়া তুলিতে একমাত্র কৃষক-শ্রমিকরাই সক্ষম। অতএব এই সভা কৃষক, ক্ষেতমজুর ও কলকারখানার মজুরদিগকে ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম করিয়া কৃষক-মজুর রাজ অর্থাৎ সত্যিকারের শোষণমুক্ত সমাজ কায়েম করিতে বিশেষ অনুরোধ ও আহ্বান জানাইতেছে।

২) কৃষক সমিতির অদ্যকার এই সভা কেন্দ্রীয়, জেলা, মহকুমা, থানা ও ইউনিয়ন কমিটি বাতিল ঘোষণা করিতেছে এবং আগামী এক মাসের মধ্যে সারা দেশব্যাপী কৃষক সমিতি গঠন করার জন্য এড-হক কমিটির নাম প্রকাশ করিতে কৃষক সমিতির সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীকে সর্বময় ক্ষমতা প্রদান করিতেছে। কেন্দ্রীয় কমিটিতে ১ জন আহবায়ক ও ১৯ জন সংগঠক নিযুক্ত হইবে। জেলা, মহকুমা, থানা ও ইউনিয়ন কমিটিতেও আহ্বায়ক ও ৬জন সংগঠক নিযুক্ত হইবে।

৩) কৃষক সমিতিকে ধ্বংস করিবার জন্য অথবা কুক্ষিগত করিয়া পথভ্রষ্ট করিবার জন্য এক শ্রেণীর স্বার্থপর লোক নানাভাবে চেষ্টা করিতেছে। তাই কাল বিলম্ব না করিয়া সত্বর দেশের সর্বত্র কৃষক সমিতি স্থাপন করিয়া এই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিবার জন্য সত্যিকারের কৃষক দরদীদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাইতেছে।

৪) ধান, চাউল, তরিতরকারি, মুরগী, হাঁস, ডিম, মাছ ইত্যাদি সীমান্ত এলাকায় কোন বাধা না থাকায় দিবারাত্রি সীমান্তের অপর পারে চলিয়া যাইতেছে। ইহার ফলে মাত্র দুই মাস পূর্বে যে চাউল ২৮/ ২৯ টাকা মণ ছিল বর্তমানে উহার দর হইয়াছে ৫০/৫৫ টাকা। তদ্রূপ অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য ৩/৪ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার আশু প্রতিকার না হইলে অল্প দিনের মধ্যেই বাংলাদেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে। অতএব কৃষক সমিতির এই সভা সীমান্ত এলাকায় চোরাচালান কঠোর হস্তে দমন করিবার জন্য সরকারের প্রতি দাবী জানাইতেছে।

৫) দেশকে সর্বপ্রকার জোটমুক্ত রাখিতে বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বহুদিন যাবত দাবী উত্থাপন করিয়া আসিতেছে। অতএব এই সভা বাংলাদেশকে কমনওয়েলথসহ অন্যান্য সকল প্রকার বেড়াজাল হইতে মুক্ত রাখার জন্য জোর দাবী জানাইতেছে।

৬) চীন, যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তানসহ যে সমস্ত দেশ এখনও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় নাই তাহাদের নিকট এই সভা স্বীকৃতি দানের অনুরোধ জানাইতেছে; তৎসঙ্গে জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যপদ প্রাপ্তির দাবীও বিশ্ববিবেকের নিকট পেশ করিতেছে।

৭) আওয়ামী লীগ সরকার অল্প দিনের মধ্যেই বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে নূতন শাসনতন্ত্র প্রদান করিবে বলিয়া এই সভা আশা প্রকাশ করিতেছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে দাবী করা হইতেছে যে উক্ত শাসনতন্ত্রের খসড়া প্রকাশ হওয়ার পর প্রত্যেক জেলা, মহকুমা ও থানায় শাসনতন্ত্র পর্যালোচনার জন্য সর্বদলীয় সমন্বয় কমিটি স্থাপনের মাধ্যমে উহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিবার সুযোগ প্রদান করিয়া দেশের শতকরা ৯৫ জন নির্যাতিত, নিপীড়িত, সর্বহারা মানুষের অধিকার যাহাতে শাসনতন্ত্রে বিশেষভাবে স্থান পায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৮) বর্তমানে বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির শুধু দুর্মূল্যই নহে, দুষ্প্রাপ্যও বটে। কাপড়, লবণ, ঔষধ, কেরোসিন তৈল, সাবান, নিউজপ্রিন্ট ও অন্যান্য কাগজ ইত্যাদি দিন দিন অত্যাধিক বৃদ্ধি পাইতেছে। টিন, সিমেন্ট, লোহা, ইত্যাদি মোটেই পাওয়া যাইতেছে না। অতি সত্বর এই সমস্ত জরুরী জিনিষ যাহাতে দেশের সর্বত্র ন্যায্যমূল্যে সরবরাহ হয় তাহার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে সরকারের প্রতি দাবী জানাইতেছে।

৯) দেশে আইন-শৃঙ্খলা বহাল করিতে না পারিলে সরকার ও জনসাধারণের পক্ষে গঠনমূলক কাজ করা মোটেই সম্ভব হইবে না। এদিকে এক শ্রেণীর তথাকথিত স্বেচ্ছাসেবক অথবা মুক্তিবাহিনী নিরীহ কৃষকদের নিকট হইতে নানারূপ ভয়ভীতি দেখাইয়া অজস্র টাকা আদায় করিতেছে। শুধু তাহাই নহে, শহরে-বন্দরে তাহারা দিবালোকে রাহাজানি ও লুটতরাজ করিয়া বেড়াইতেছে। এমতাবস্থায় এই সভা সরকার ও প্রশাসনের নিকট রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা সত্বর বহাল করিতে বিশেষ দাবী জানাইতেছে।

১০) আওয়ামী লীগ সরকারের কোন কোন সদস্য ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য ঘুষ, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও ক্ষেত্র বিশেষে হুমকির আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে বলিয়া জানা যাইতেছে। সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে অনেকেই পূর্বের ন্যায় কৃষকদের নিকট হইতে ঘুষ আদায় ও অযথা হয়রানি করিতেছে। এই সকল জঘন্য সমাজবিরোধী কাজ হইতে বিরত থাকার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতি এই সভা জোর দাবী জানাইতেছে। তৎসঙ্গে ইহাও ঘোষণা করিতেছে যে কৃষক, মজুর সকল শ্রেণীর সর্বহারা মানুষের আবেদন-নিবেদন অগ্রাহ্য হইলে গণবিপ্লবের দ্বারা সমাজবিরোধী লোকদিগকে কঠোর শাস্তি প্রদান করিতে বাধ্য হইবে।

১১) কৃষক, কামার, কুমার, জেলে, মাঝি, চামার প্রভৃতি শ্রেণীর লক্ষ লক্ষ বেকার কাজের অভাবে রুটি-রুজির ব্যবস্থা করিতে না পারিয়া দিন দিন মৃত্যুর দিকে যাইতেছে। এই বেকার সমস্যার আশু প্রতিকার করে দেশে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কলকারখানা নির্মাণ করিতে এই সভা সরকারের নিকট বিশেষ দাবী জানাইতেছে।

১২) স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসায় ছাত্রবেতন প্রদানের ক্ষমতা কৃষকদের মোটেই নাই। তাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশেষ করিয়া কৃষক-সন্তানদের যাহাতে প্রয়োজন মাফিক ফ্রি, হাফ ফ্রি প্রদান করা হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে এই সভা সরকারের নিকট দাবী জানাইতেছে।

১৩) বাস্তত্যাগী লোকদের রিলিফ বাবদ যাহা দেওয়া হইতেছে তাহা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। তাহাদের হালের গরু, বুনানীর বীজ এক কথায় সার্বিক পুনর্বাসনের জন্য আরও রিলিফ দরকার। অতএব এই সভা উপযুক্ত পরিমাণ রিলিফ প্রদানের জন্য এবং শহরে যে মূল্যে রেশনের চাল প্রদান করা হয় অনুরূপ প্রত্যেক ইউনিয়নে রেশনের ব্যবস্থা করিতে এই সভা সরকারের নিকট দাবী জানাইতেছে।

১৪) চাষীদের হালের বলদ ক্রয় করার জন্য ভারত হইতে বলদ ক্রয় করার ব্যবস্থা হইতেছে ইহার দ্বারা চাষীদের মোটেই কল্যাণ হইবে না। কারণ, হিন্দুস্থানের পশ্চিমাঞ্চলের গরু বাংলাদেশের জল-হাওয়ায় বিশেষ করিয়া বর্ষাকালে মোটেই টিকে না। এবং উহা দ্বারা হরি ধান, রোয়া ধান ইত্যাদি বপন করিতে পানির মধ্যে চাষ করাও সম্ভব নহে। এক বৎসরের মধ্যে ঐ সমস্ত বলদ মারা যায়। তাই পশ্চিমবঙ্গ হইতে ছোট ছোট মহিষ ও গরু ক্রয় করিয়া চাষীদিগকে প্রদান করিতে এই সভা অনুরোধ জানাইতেছে এবং হালকা ট্রাক্টর বিদেশ হইতে আনিয়া জমি চাষের ব্যবস্থা করিতে সরকারের প্রতি এই সভা দাবী জানাইতেছে।

চাপিয়া যাওয়ার রহস্য কি?

বিগত জানুয়ারী মাসের তৃতীয় সপ্তাহে বৃটিশ পার্লামেন্টের লর্ড ব্রকওয়ে, লর্ড ও হ্যাগেন, লর্ড বোমন্ট (হইটলীস্থ), রবার্ট হিউগস, রে কার্টার, লেনাজেগার এবং জন মেনডেলসন বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্র দফতরের মাধ্যমে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীকে বৃটেন সফরের আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু দুর্বোধ্য কারণে সংশ্লিষ্ট দফতর দাওয়াতপত্র চাপিয়া যান। বৃটেনস্থ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির জেনারেল সেক্রেটারী মিসেস বারবারা হক সেখানকার প্রবাসী বাঙ্গালী ও উপরোক্ত পার্লামেন্ট

সদস্যদের তরফ হইতে মওলানা সাহেবকে পুনরায় আমন্ত্রণ জানাইতে সন্তোষ আসিলে প্রথমোক্ত দাওয়াতের কথা তিনি জানিতে পারেন। বৃটেন সফরের এই আমন্ত্রণ মওলানা সাহেব সহৃদয়ে বিবেচনা করিতেছেন বলিয়া জানাইয়াছেন।

'বাংলাদেশের সমাজতন্ত্র' কোন পথে?

বাংলাদেশে সমাজতন্ত্র কায়েমের কোন আলামত এ পর্যন্ত দেখা দিয়েছে কি?

সরকার দরাজ দিলে সমাজতন্ত্রের কথা বলছেন — তা সখে সখেই হউক আর সত্যিসত্যিই হউক। ভারতেও নাকি সমাজতন্ত্র কায়েম হয়ে গেল বলে অবস্থা দাঁড়িয়েছে। রাশিয়ার সহব্বতে সিরিয়া, ইরাক, আলজিরিয়া এমন আরও কয়টি রাষ্ট্র দাবী করে থাকে — সমাজতন্ত্র কায়েম হয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশও সেই কাতারে শামিল হয়েছে। তাই ঘটে যাই হউক হাঁক-ডাকটা ঠিকই আছে।

অবশ্যি স্বাধীনতার দুটি মাস কোন ক্ষেত্রেই কিছু না, নিতান্ত নগন্য সময়। তবে একটি প্রবাদ আছে, সকালই দিনের ইশারা দেয়। আজাদীর ভোর আজও কাটেনি। কিন্তু দিবাভাগের খবর আমরা এ থেকেই জানতে চাই। বাংলার মাটিতে সমাজতন্ত্র আসবে কি?

বাংলাদেশে যারা দাবী করছেন, সমাজতন্ত্র কায়েম করবেন, তাদের শ্রেণী চরিত্র কি? এমন কিছু কি তারা করতে যাবেন যা তাদের বৈষয়িক লোকশান ডেকে আনবে? তাদের সঞ্চয় অঢেল। তাদের আয়াস অপরিসীম। কি করে এই চরিত্র নিয়ে বাংলাদেশ সরকার সমাজতন্ত্র কায়েম করবেন যেখানে বেহুদা ভোগের কোন অবকাশ নেই, যেখানে নেতৃত্ব থাকছে শুধু সর্বহারা জনতার—কৃষক, মজুর, শ্রমিক, জেলে, মাঝি, তাঁতীর।

ব্যাঙ্ক-বীমায় সরকারী প্রশাসক নিয়োগে সমাজতন্ত্রের আদর্শ কতটুকু ফুটে উঠেছে? এতে কি গ্রামের কৃষক যারা জনসংখ্যার শতকরা ৮০ জন লাভবান হবেন? ভূমি ব্যবস্থার কি হবে? জোতদার-মহাজনদের দাপট খতম হবে কি? ইতিমধ্যে অধিকাংশ এলাকায় অসন্তোষ জমে উঠেছে। যুব সমাজ উচ্ছৃঙ্খল হয়ে যাচ্ছে। অস্ত্রও তাদের হাতে পড়েছে। তাই এসবের সমাধানে সামগ্রিক নীতি নির্ধারণ করা জরুরী হয়ে পড়েছে। কিন্তু সে নীতি ? পুলিশ বাহিনীর নিকট দিয়ে দেয়া? কিছুতেই নয়। একমাত্র সমাধান সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা অবলম্বন।

বলা হয়েছে, সমাজতন্ত্রই প্রতিষ্ঠা করা হবে। কিন্তু তার জন্য সবুর করতে হবে। মেওয়াটা ফলবে এসেম্বলীতে। তখনই তো প্রশ্ন আসে— গণপ্রতিনিধি হয়ে যারা এসেছেন তাদের তো সে শ্রেণী চরিত্র নেই। জনতার দেয়া ক্ষমতা তারা খাটাবেন কিন্তু নিজেদের ষ্টাইলে। ভোটারদের বোঝাবেন এই ষ্টাইল তো সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া পছন্দ করেন।

দুষ্ট লোকে বলে, এদেরই উৎসাহ যুগিয়ে যাচ্ছেন, একটি বৃহৎ শক্তি- ইউক্রেনের গম আর কেজিবি-র কৌশল যার সম্বল।

প্রশংসনীয়

দাইন্যা (টাঙ্গাইল), ১লা মার্চ– দাইন্যা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে এখানকার জনাব মোহাম্মদ আলী পোণে চারি বিঘা জমি দান করিয়াছেন। গতকাল ইহার দলিলপত্রের কাজ সম্পন্ন করা হয়।

উল্লেখযোগ্য যে স্কুলটি উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতির জন্য একটি শক্তিশালী এডহক কমিটি গঠন করা হইয়াছে। ইহার সদস্যবর্গ হইতেছেন জনাব উমেদ আলী মিয়া, জনাব আসাদ উল্লাহ, জনাব আবদুর রাজ্জাক, জনাব মোরসেদ আলী, জনাব জহুরুল হক।

একশত ও পাঁচশত টাকার নোট গ্রামবাসীর ভাগ্য অচল করিয়াছে

স্বাধীনতা প্রাপ্তির কয়েক মাস আগে ইসলামাবাদের সরকার একশত ও পাঁচশত টাকার সকল নোট অচল ঘোষণা করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহা ব্যাঙ্কে তিনদিনের মধ্যে জমা দিতে জনসাধারণকে নির্দেশ দেন। বাংলাদেশের জনসাধারণের মন তখন ছিল দোদুল্যমান অবস্থায়। তাহারা নোট জমা দিবে কি দিবে না ইহা লইয়া জল্পনা-কল্পনা করিতেছিলেন। তখনই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র পাকিস্তান সরকারকে নোট ফেরৎ না দিতে উপদেশ দেন। শহরের অধিকাংশ লোকই একশত ও পাঁচশত টাকার নোট জমা দিয়া সচল নোট গ্রহণ করেন। কিন্তু বাংলাদেশের গ্রামের কৃষক, মজুর স্বাধীন বাংলা বেতারের উপদেশ মানিয়া দেশপ্রেমের নজীর প্রতিষ্ঠা করিলেন। স্বাধীন বাংলা বেতার প্রচার করিয়াছিলেন, একশত-পাঁচশত টাকার নোট চালু থাকবে। তাই বাংলাদেশের ৬২ হাজার গ্রামের অধিবাসীর অধিকাংশ এই কথার উপরই আস্থা রাখিলেন। এদের কেহ কেহ হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটিয়া প্রতিদিনের আয় হইতে অতি কষ্টে কিছু কিছু জমা করিয়া একশত টাকার নোট ঘরে আনিয়াছিলেন। কেহ রাখিয়াছিলেন বড় ছেলেটাকে বিবাহ করাইতে, কেহ বা কিছু জমি রাখিতে, কেহ বা ঋণ পরিশোধ করিতে, কেহ বা আবার হালের জন্য দুইটি বলদ কিনিতে।

কতদিন অর্দ্ধাহারে-অনাহারে দিন কাটিয়াছে, ঈদের দিনে ছেলে-মেয়েরা নূতন কাপড় ও কিছু ভাল খাবারের জন্য বায়না ধরিয়াছে। কিন্তু তথাপি কৃষক-মজুর সেই টাকা খরচ করে নাই। আজ বড়ই মর্মান্তিক ব্যাপার তাহাদের সকল আশাই বালির ইমারতের মত ধ্বসিয়া পড়িয়াছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হইল — কিন্তু তাহাদের স্বযত্নে ঘরে রাখা সেই নোট আর চলিল না — পাকিস্তান সরকারের আদেশই বলবৎ রহিল। গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে অগণিত মেহনতি মানুষ মাথায় হাত দিয়া তাই চোখের পানিতে বুক ভাসাইতেছে। তাহাদের রক্ত পানি করিয়া যাহা সঞ্চয় করিয়াছিল তাহাই আজ অচল। এই দুঃখ তাহারা কাহাকে জানাইবে? আর কেই বা শুনবে।

আমরা এখানে মাত্র একটি নজীর তুলিয়া ধরিতেছি। বাঘিল ইউনিয়নের (থানা টাঙ্গাইল) কান্দা পাড়া গ্রামের আস্তাজ আলী মিয়া টাকা-পাঁচসিকায় কামলা খাটিয়া কয়েক বৎসরে দুই শত টাকা জমা করেন। ইচ্ছা ছিল সারা জীবনের সঞ্চয়ে শেষ বয়সে নিজের বলিতে একটু জায়গা কিনিবেন। কিন্তু তাহার একশত টাকার নোট দুইটি (ডি বি ৭৫৮০৭৮ এবং সি এল ৫১১৪০১) আজ অচল। পাকিস্তান সরকারের আবেদনে আস্তাজ আলী মিয়া প্রথমতঃ নোট দুইটি ব্যাঙ্কে জমা দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু স্বাধীন বাংলা বেতারের নির্দেশকে বেশী নির্ভরযোগ্য মনে করিয়া জমাদানে বিরত রহিলেন।

এক টাঙ্গাইল জেলায়ই এমনি শত শত আস্তাজ আলী রহিয়াছে। তাহাদের সর্বনাশের অংশীদার হইতে কে রাজী হইবে। বাংলাদেশের এই হতভাগ্যদের দুর্দশা একটি বিখ্যাত গল্পের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়: তাহা হইল মোপাসাঁর 'নেকলেস'। আজ বাংলাদেশে এমনি গল্পের হাজার হাজার উপকরণ রহিয়াছে কিন্তু মোপাসাঁ বলিতে কেহ নাই।

মাত্র দুই মাইল সড়কের জন্য

সন্তোষ হইতে চারাবারি পর্যন্ত মাত্র দুই মাইলের সড়কটি বহু দিন যাবত যেমনি গুরুত্বপূর্ণ তেমনি অবহেলিত।

উত্তরবঙ্গের সহিত দেশের দক্ষিণাঞ্চলের সহজতম যোগাযোগ ব্যবস্থা চারাবারি ঘাটের মাধ্যমে করা যাইতে পারে। অনুন্নত ব্যবস্থায়ও জিনিষপত্রের লেনদেন চারাবারি পথে হইয়া থাকে। কিন্তু মাত্র দুই মাইল সড়কের অসুবিধাটুকু বরাবরই রহিয়া গেল। এর কোন হিল্লা হইল না। দ্বিতীয়তঃ দরকার চারাবারি ও এলাসিনের নিকটে নদী খনন। তাহা হইলে নদীপথে উত্তরবঙ্গের সহিত ঢাকার অত্যন্ত সুবিধাজনক একটি যোগাযোগ পথ খুলিয়া যাইবে। কিন্তু বিষয়টি হিসাব করিয়া কেহ দেখিতেছেন না।

সন্তোষ হইতে চারাবারি পর্যন্ত মাঝখানের দুটি পুলসহ গোটা সড়কটি সকল যানবাহন চলার উপযোগী করিতে পারিলে এই পথে ব্যবসা বাণিজ্য খুবই জমিয়া উঠিত। ইহাতে জনসাধারণ বেশ উপকৃত হইত। ব্রহ্মপুত্রের ব্রীজ কোনদিন সমাপ্ত হইলেও এই পথের প্রয়োজনীয়তা কমিবে না। এইবার অসংখ্য পুল ভাঙ্গা অবস্থায় পড়িয়া থাকিবে বলিয়াই মনে হইতেছে। তাই বর্ষার পূর্বেই উপরোক্ত সড়কটি চলাচল উপযোগী করিয়া নদীপথে ব্যবসা প্রসারের পথ সুগম করার খুবই প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে।

সন্তোষে আশুরা উদযাপিত

বিগত ১০ই মহরম শনিবার সন্তোষে বিশেষ শান শওকতে আশুরা উদযাপিত হয়। এই উপলক্ষে ভোর হইতে শেষ রাত পর্যন্ত এক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়।

আশুরার পূর্ব দিনেই মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর হাজার হাজার মুরিদ সন্তোষে সমবেত হন। সুদূর আসাম হইতেও ইহাতে অনেকে যোগদান করেন। প্রত্যেকেই মুসাফিরখানার জন্য সাধ্যানুযায়ী চাউল, ডাল, মুরগী, খাসি, লাউ, বেগুন, লবণ, মরিচ ইত্যাদি সঙ্গে লইয়া আসেন। আশুরার দিন অনেকেই রোজা রাখেন। দুপুর বারটা হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত মোট ১৩টি দলের লাঠিখেলা অনুষ্ঠিত হয়। অপরাহ্ন ৩টায় মিলাদ মাহফিল বসে। উহা পরিচালনা করেন স্বয়ং মওলানা ভাসানী। মিলাদ শেষে বাংলাদেশের উন্নতিকল্পে ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের রুহের মাগফেরাতের জন্য বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

এদের বরাতে কি জুটিবে?

বাংলাদেশ স্বাধীন হইয়াছে। কিন্তু সেই সঙ্গে বাংলার ৬২ হাজার পল্লীর কৃষক, মজুর, কামার, কুমার, জেলে, মাঝি, তাঁতী তথা সকল শ্রেণীর শোষিত ও বঞ্চিত মানুষের মধ্যে সাম্য-শান্তি ও মুক্তির সত্যিকার পথ উন্মুক্ত হইয়াছে কি?

না, তাহা হয় নাই। বাংলাদেশের ৬২ হাজার গ্রামের মানুষ যে আশা উদ্দীপনা লইয়া স্বাধীনতার পূর্ব হইতে আজ পর্যন্ত পরিশ্রম করিয়াছে তাহা স্বপ্নের মতই রহিয়াছে। স্বাধীনতা সংগ্রামে শহরের চাইতে বাংলাদেশের ৬২ হাজার গ্রামের অধিবাসীদের দান বেশী। মুক্তিযোদ্ধাদের সব রকমের সাহায্য-সহযোগিতা করিয়াছে—তাহাদের অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করিয়া দিয়াছে — এই সব গ্রামের কৃষক, মজুর, তাঁতী, জেলে, মাঝি প্রভৃতি শ্রেণীর লোকেরাই। স্বাধীনতা অর্জনের পর হইতেই আমরা দেখিতে পাইতেছি কিছু সংখ্যক ক্ষমতালিপ্সু লোক রাতারাতি আঙ্গুল ফুলিয়া কলা গাছ হইয়াছে— অপর পক্ষে গ্রামের যে সকল কৃষক, মজুর চৈত্রে—বৈশাখের রোদে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া, আষাঢ়-শ্রাবণের বৃষ্টিতে জোঁকের কামড় খাইয়া শস্যাদি উৎপন্ন করিয়া সকল শ্রেণীর মানুষের রুটি-রুজির ব্যবস্থা করে সেই কৃষক মজুরের অবস্থা আজ অবনতির শেষ সীমায় পৌঁছিয়াছে। আমাদের দেশের গরীব মানুষ

আশা করিয়াছিল — স্বাধীনতা তাহাদের জন্য লইয়া আসিবে সাম্য, শান্তি আর মুক্তির বাণী। শেখ মুজিবর রহমান দেশে ফিরিয়া রেসকোর্সের ভাষণে কৃষকের প্রাণের কথা বলিয়াছেন সত্য — কিন্তু মুখের বাণী আর বাস্তবতার সহিত আকাশ-জমিন তফাত তাহা আজ দরিদ্র জনতা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করিতেছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষের দাম এই সকল মেহনতি মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। শুনিতেছি — সরকার কৃষকদের সাহায্যের জন্য হালের বলদ দিবেন। ইহা বড় ভাল প্রস্তাব, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের দেশের দরিদ্র কৃষকই কি এই সাহায্য পাইবে? যদি পায়, তাহা হইলে কৃষকরা বিশেষ উপকৃত হইবে। কিন্তু তৎসঙ্গে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে আমাদের দেশের অধিকাংশ কৃষকই ভূমিহীন। হালের গরুর সহিত ভূমির বন্টন অপরিহার্য। তবেই হইবে সমস্যার সমাধান, নচেৎ নহে।

সরকার যেরূপ কৃষকদের সাহায্য করিবার পরিকল্পনা হাতে লইয়াছেন সেইরূপ কামার, কুমার, তাঁতী, জেলে, মাঝি তথা সকল শ্রেণীর মেহনতি মজলুম মানুষের রুটি-রুজি করিয়া খাইবার ব্যবস্থা না করিলে সত্যিকারের সাম্য-শান্তি আর মুক্তির বাস্তবায়ন সম্ভবপর হইবে না। বিশেষ করিয়া বাংলাদেশের জেলে-মাঝিদের জীবন বড়ই দুর্বিসহ। তাহাদের থাকিবার ঘর, বসিবার স্থান পর্যন্ত নাই। তাহাদের মাছ ধরার নৌকা বা জাল নাই। একদিন বাংলাদেশের নদীতে ভরা মাছ ছিল। সেই মাছ আজ কোথায় যেন বিলীন হইয়া গিয়াছে। কারণ, নদীগুলি ভরাট হইয়াছে। সেগুলি সংস্কারের কোন ব্যবস্থা নাই। সরকার যদি দয়াপরবশ হইয়া তাহাদের সাহায্যের জন্য কিছু নৌকা তৈরীর কাঠের ব্যবস্থা করিতেন তবে জেলে-মাঝিদের বিশেষ উপকার হইত। কারণ, জেলেদের জীবন-ধারনের প্রধান সম্বল হইল একখানি নৌকা আর একটি জাল। জালখানি আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া তাহারা যোগাড় করিতে পারে — কিন্তু নৌকা বানাইবার কাঠ সংগ্রহ করা তাহাদের সাধ্যের বাইরেই থাকিয়া যায়।

সরকার যদি নিঃস্বার্থ সেবা ও সংবেদনশীল মনোবৃত্তি লইয়া এইসব লোকদের দুঃখ-কষ্ট লাঘবের চেষ্টা করেন তবে অবশ্যই শোষিত মেহনতি মানুষের শান্তি ফিরিয়া আসিবে।

নতুন যাত্রা

বুলবুল খান মাহবুব

যদিও আকাশে জমেছে অনেক মেঘ
নতুন সূর্য্য আড়ালে পড়েছে ঢাকা।
বাতাসে জেগেছে দুর্ব্বার গতিবেগ
ঝড় তোলে ঐ জিবরাইলের পাখা।

তরুণ পথিক, ভয় নাই ভয় নাই
আরো দূরে ওই, বহুদূর যেতে হবে।
তোমার চলায় আমরা সাহস পাই।
কতদিন আর এই ঝড় জেগে রবে?

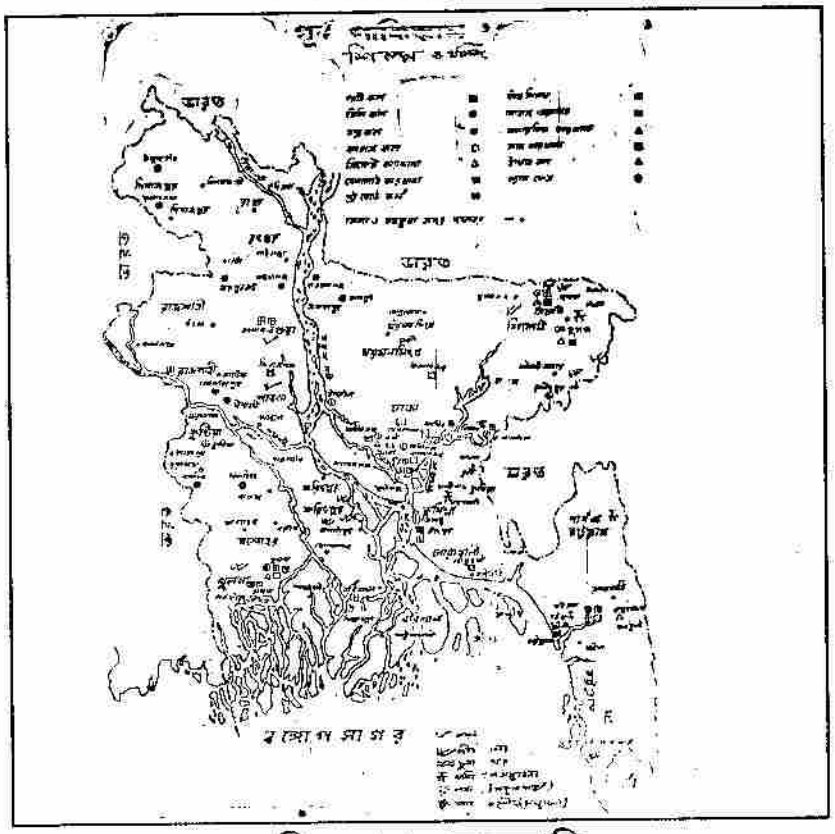
পথের দু'পাশে লুকায়িত লোলুপতা
হাতছানি দিয়ে ডাকবে তোমায় তবু
নিয়েছ যে পণ; কোরোনাকো অন্যথা
জীবনের গান ভুলোনা তরুণ কভু।

মৃত্যু তোমার হয়তো বা পরিণতি
মানুষের মনে অমর তোমার নাম
তরুণ পথিক তুচ্ছ সে ক্ষয়ক্ষতি
দেশের মুক্তি, লাখো প্রাণ তার দাম।

লাখো তরুণের লাল তাজা খুন দিয়ে
মুছে তো ফেলেছি জন্মভূমির
এবার যাত্রা সর্বহারাকে নিয়ে
দুপাশে তোমার লাঞ্ছিতদের ভীড়।

এবার তোমার নতুন যাত্রা রক্ত পিছল পথে
ভুলোনা শপথ, সরোনা তরুণ নিজের সত্য হতে।

আমার সোনার বাঙলা



আমি তোমায় ভালবাসি -

এতে কোন সন্দেহ নেই—বাঙলা সোনার বাঙলা। আর এতেও কোন সন্দেহ নেই—একে ভালবাসতে হয়। মাতৃভূমিকে কে না ভালবাসে। আরবে বেদুইন তার স্বদেশকে তামাটে পেয়েছে। কিন্তু ভালবাসায় তার ভাটা পড়েনি। আমাদের দেশপ্রেম এবার কবির কবিতায় নয়, প্রমাণিত হয়েছে আত্মত্যাগে। তাই এর আকাশ-বাতাসের সাথে সম্পর্কটা হয়েছে নিবিড়তর। কিন্তু এর সম্পদকে কি আমরা পুরাপুরি চিনেছি? যোগ্যতা কি অর্জন করেছি কাজে লাগাবার ? এর ৬২ হাজার গ্রামের অবস্থার সাথে নিজেকে কি পরিচিত করেছি? এই বাঙলায় আছে ৫৬ হাজার বাজার। কখনো ভাবতে চেয়েছি কি এর ক্রমবনতির কথা? ৯৬ হাজার উপাসনালয় নিয়ে এই দেশ। কখনো কি নৈতিক উন্নতির (?) মাত্রা যাচাই করেছি। সাড়ে সাত কোটি মানুষ এর ৫৪ হাজার বর্গমাইলের ভেতর থাকে। এদের অধিকাংশই যে পোড়া কপাল নিয়ে জন্ম নেয় আর কংকালসার হয়ে মৃত্যুবরণ করে — কখনো কি অনুভব করে দেখেছি? হায়! যদি দেশপ্রেমটুকু একই ছাঁচে একই অনুভূতিতে পুষ্ট হয়ে উঠত। তাহলে আমরা হতাম সোনার বাঙলার সোনালী মানুষ। দেশপ্রেমের নামে গ্রাম্য টাউট তাদের অনেকে আজ সমাজের মাতবর। দেশপ্রেমের নামে যারা বকধার্মিক তারাই আজ 'ক্যাবার খাদেম'।

কয়েকটি তারিখ ও ইতিহাস

১৯৪৭ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর ঃ 'তমুদ্দুন মজলিস' কর্তৃক পুস্তিকা প্রকাশ। নাম 'পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা বাংলা না উর্দু?' বইটির প্রস্তাব ঃ বাংলা ভাষাই হবে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষার বাহন, আদালতের ভাষা, অফিসাদির ভাষা। অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকারের ভাষা হবে দু'টিঃ উর্দু ও বাংলা।

১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন।

১৯৪৮ সালের ২৩ শে ফেব্রুয়ারী ঃ পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে গণপরিষদের অন্যতম ভাষা হিসাবে বাংলা ব্যবহারের দাবী পেশ।

১৯৪৮ সালের ২রা মার্চ ঃ ফজলুল হক হলে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত।

১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ ঃ পুলিশ-ছাত্র-জনতার সংঘর্ষ ও জনকয়েক গ্রেফতার।

১৯৪৮ সালের ১৩ই মার্চ ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং শহরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পূর্ণ ধর্মঘট পালন।

১৯৪৮ সালের ২১শে মার্চ ঃ রেসকোর্স ময়দানে মুহম্মদ আলী জিন্নাহর বক্তৃতা- উর্দু হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।

১৯৪৯ সালের ৯ই মার্চ ঃ পূর্ব বাংলা সরকারের 'পূর্ব বাংলা ভাষা কমিটি' গঠন।

১৯৫২ সালের ২৬ শে জানুয়ারী ঃ পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নাজিমউদ্দিনের পল্টন ময়দানে ঘোষণা উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।

১৯৫২ সালের ৩০ শে জানুয়ারী ঃ ঢাকার বার লাইব্রেরী হলে 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ' গঠিত।

১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারী ঃ সালাম, জব্বার, রফিক ও বরকতের শাহাদাৎ।

বিশেষ ঘোষণা

পাঠক - পাঠিকাদের প্রতি অনুরোধ জানানো হচ্ছে — আপনারা রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্মনীতি (শরিয়ত ও মারিফত), দেহতত্ত্ব, শিক্ষানীতি, সংসার-জীবন, ব্যক্তিগত-জীবন প্রভৃতি সকল বিষয়ে ছোট ছোট প্রশ্ন আমাদের নিকট পাঠাবেন। এসব প্রশ্নের উত্তর 'হক-কথার' মাধ্যমে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী দিবেন। প্রশ্নকর্তার নাম — ঠিকানা সঙ্গে দিয়ে দিতে হবে।— সম্পাদক।

হক-কথা

৩রা মার্চ, শুক্রবার, ১৯ শে ফাল্গুন ১৩৭৮

কৃষি বিপ্লব

প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমান সম্প্রতি উপর্যপুরি কয়েকটি সভায় কৃষি বিপ্লবের কথা বলিয়াছেন। বলাই স্বাভাবিক। কারণ, দুনিয়ার যে কয়টি দেশে রক্তাক্ত বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছে তাহাতে হয় কৃষি নয় তো কারিগরি বিপ্লবের পথ খুলিয়াছে। যে দেশে রক্তপাত ঘটিয়া যায় তাহার জনগণ নূতন অনুভূতিতে জগৎ ও জীবনকে দেখিতে পায়। আজ প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে আমরা দুইটি বিষয় যাচাই করিতে পারি। প্রথমতঃ আমাদের চরিত্রের প্রকৃতি। দ্বিতীয়তঃ কৃষি বিপ্লব সফল করিবার পটভূমি। প্রধানমন্ত্রীর ক্ষেত্রে বাহ্যতঃ যাহা দেখা গিয়াছে তাহাতে আমাদের গদগদ হইবার কিছুই নাই। স্বহস্তে দুই মিনিট কোদাল চালাইয়া বাহবা পাওয়া যায় কিন্তু কৃষি বিপ্লবের তাহাতে কিছুই আসে যায় না। প্রেসিডেন্ট আইয়ুবও এককালে এমনি করিতেন আর মোসাহেবের দল টুকরি হাতে দাঁড়াইয়া থাকিতেন। অবশ্য প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা ও আহ্বানে আন্তরিকতার অভাব রহিয়াছে, আমরা তাহা বলিতে চাহি না,

বিশ্বাসও করি না। কৃষি বিপ্লব একার কাজ নয়। আর এক অঞ্চলের কাজও নয়। তজ্জন্য সমগ্র দেশকে, গোটা জাতিকে সব দিক দিয়া তৈরী করিয়া লইতে হইবে। বাংলাদেশবাসীর শতকরা ৮০ জন কৃষক। তাই এই দেশ কৃষি বিপ্লবের উপযুক্ত ক্ষেত্র ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু যাহারা পরিকল্পনা গ্রহণ করেন তাহারা এককালের গ্রামের ছেলে হইয়াও গ্রামে যান না। রাজধানীর কোলাহলে থাকিয়া ছক কাটেন আর বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেন। ফলে ব্যাপারটা সীমাবদ্ধ হইয়া যায় পত্রপত্রিকার বিশেষ সংখ্যায় আর অহেতুক আত্মসন্তুষ্টিতে। কিন্তু কৃষকের দুঃখ থাকিয়াই যায়। বরং বিপ্লবের নামে গ্রামে গ্রামে মুখরা টাউটের জন্ম নেয় যারা সদরের সহিত যোগাযোগ রাখিয়া শোষণের নূতন পদ্ধতি গ্রহণ করে। আইয়ুব আমলে আসলে তাহাই হইয়াছে।

এইবার এমনটি আমরা আশা করি না দুইটি কারণে। প্রথমতঃ জনগণ সচেতন হইয়া উঠিয়াছে। কৃষি বিপ্লবের ধূয়া তুলিয়া জনগণকে আর ধোঁকা দেওয়া যাইবে না। দ্বিতীয়ত ঃ সরকার সচেষ্ট হইয়াছেন জাতিকে আত্মনির্ভরশীল করিয়া তুলিতে। আমরা এতটুকুই আশা রাখি, জনগণের সচেতনতা আর সরকারের আন্তরিকতা বাংলাদেশকে কৃষি বিপ্লবের পথে লইয়া যাইবে।

আমাদের জমা-জমি এত খণ্ড-বিখণ্ড যে যৌথ খামার না করিলে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে চাষাবাদই করা যাইবে না। কৃষি যন্ত্রের ব্যবহার আমাদের কৃষকদের শিখাইয়া যৌথ উৎপাদনের উপযোগিতা বুঝাইতে হইবে। তজ্জন্য প্রথমে কৃষকের সহিত মিশিয়া যাইতে হইবে। তাহাদের অন্তরে সৎসাহস ও সহযোগিতার মনোভাব ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। কৃষককে মানসিক দিক দিয়া প্রস্তুত করিয়া যৌথ খামারে যান্ত্রিক পদ্ধতি চাষাবাদের প্রবর্তন করিলে কৃষিক্ষেত্রে তড়িৎ পরিবর্তন সাধিত হইবে। পানি সেচের ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া সর্বত্র কার্যকরি করিতে হইবে। আমাদের দেশে ঝড়, বন্যা, জলোচ্ছাস, লবণাক্ততা লাগিয়াই রহিয়াছে। প্রত্যেকটি প্রাকৃতিক দুর্যোগের মোকাবিলা করিবার জন্য কৃষক সমাজকে সকল দিক দিয়া তৈরী করিয়া দিতে হইবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমান কৃষি বিপ্লব কামনা করিলেও ইহার রূপরেখা কিংবা অগ্রগতি সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু বলেন নাই। ইরানে কৃষি বিপ্লব হইয়া গিয়াছে বলিয়া দাবী করা হয়। কিন্তু সেখানে এমন স্থানও রহিয়াছে যেখানে মানুষ একটি উটের পেটের নাড়ি-ভুরি সিদ্ধ করিয়া মাসাধিক কাল খাইয়া থাকে। বিদেশী সাংবাদিক কিংবা কূটনীতিককে সন্তুষ্ট ও বিস্মিত করিবার জন্য দেশের কিছু অংশ ফুলাইয়া ফাঁপাইয়া তুলিলেই বিপ্লব সাধিত হয় না — আশা করি জনগণের নির্বাচিত সরকার তাহা বুঝিতে পারিবেন।



সাম্প্রদায়িকতার অভিশাপ থেকে মুক্তি পেয়েছি কি?

বাংলাদেশে অনেক কালের অভিশাপ সাম্প্রদায়িকতার স্বরূপ আমাদেরকে আর কখনো দেখতে হবে কি? যাদের অন্তঃকরণে বিন্দুমাত্র ন্যায় ও সত্যের আলো আছে তাদের কেউ তা আশা করবেন না বটে কিন্তু আশঙ্কা করতে পারেন। কারণ, সাম্প্রদায়িকতার নেপথ্য উপকরণ অর্থাৎ সামাজিক — অর্থনৈতিক সংঘাত আজও আমরা কাটিয়ে উঠিনি।

১৮৫৭ সালের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের পর থেকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও হিন্দু জাতীয়তাবাদের চালে এদেশে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়গত সম্পর্কের অবনতি ঘটে। তখন থেকেই হিন্দুরা হয়ে যায় জমিদার, মুসলমানরা প্রজা; হিন্দুরা মহাজন, মুসলমানরা খাতক; হিন্দু ব্যবসায়ী, মুসলমান খরিদদার; হিন্দু অফিসার, মুসলমান পিয়ন। এক কথায় নানা কৌশলে বাংলাদেশে উচ্চ শ্রেণী বলতে হিন্দু আর নিম্ন শ্রেণী মুসলমান হয়ে যায়। এই দুইয়ের অর্থনৈতিক — সামাজিক বৈষম্য বৃটিশের উস্কানিতে ধর্মীয় উন্মত্ততায় ঢালাই হওয়াতে দাঙ্গা ও শোষণ চলতে থাকে। হিন্দু-মুসলমান উভয়ের মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে সাম্প্রদায়িকতার বীজ ঢোকানো হয় শতাব্দীর প্রথম দশকে বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের মাধ্যমে। তাছাড়া পরবর্তীকালে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে আদর্শের বদলে ধর্মীয় প্রাধান্যে রাজনৈতিক চেতনা ফুটে উঠায় সর্বত্র সাম্প্রদায়িকতার শিকড় মজবুত হয়ে বসে। এসবের পরিণতি জঘন্য রূপ ধারণ করে গ্রামে-গঞ্জে শহর-বন্দরে কতবার যে দাঙ্গা হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই।

বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িকতার সর্বশেষ পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে আমরা যা পাই তাতে উদ্বিগ্ন হওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। মওলানা ভাসানী বহুদিন ধরে বলে আসছেন, দেশে যতদিন ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদ না হবে ততদিন অর্থনৈতিক সংঘাত ধর্মীয় বিভেদে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। তাঁর ভাষায়, পকেট যতদিন থাকবে ততদিন পকেট মারও থাকবে। যদিও দাবী করা হয়, বাংলাদেশে রক্তাক্ত বিপ্লব ঘটে গেছে, আসলে কিন্তু রক্তপাতই শুধু হয়েছে — মানসিকতার পরিবর্তন ঘটেনি। তাই স্বাধীনতার পরপর যা ঘটেছে তা হল আত্মপ্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে। হিন্দু শরনার্থীরা শহরে-গ্রামে ফিরে আসছে, নিজেদের দোকান-বাড়ীতে বটে, কিন্তু বীতশ্রদ্ধ মন নিয়ে। নয়টি মাসে মানুষের পক্ষে যা সহ্য করার নয় তাই তারা সয়েছে। এর জন্যে যারা দায়ী তাদের তারা নিজের হাতে সাজা দিতে পারেনি। তাই ঝালটা মিটাচ্ছে যারা এতদিন তাদের সহায়-সম্পদ ভোগ করেছে তাদের উপর। অবশ্য স্বার্থপর ও সুযোগ সন্ধানী ছাড়া এসব কেউ ভোগ করতে যায়নি। কিন্তু এমনও ঘটনা ঘটেছে, এক চতুর্থাংশ মূল্য হলেও পথ খরচ দিয়ে মুসলমানরা হিন্দুদের সীমান্ত পার করে দিয়েছে। পাক-ফৌজের হামলার প্রথম দু'মাস হিন্দু-মুসলমানে অত্যন্ত সুন্দর সম্পর্ক বিরাজ করছিল। সমান বিপদে পড়ে সবাই বিভেদ ভুলে গিয়েছিল। কিন্তু বর্বর বাহিনী কতিপয় মুসলমানকে লোভ দেখিয়ে হাত করে হিন্দুদের সর্বনাশ করে। আজ হিন্দুরা এসব লোভীদের 'সুবিধাবাদী' হিসেবে না দেখে 'মুসলমানের পা-চাটা মুসলমান' বলে ধরে নিচ্ছে। গ্রামে গ্রামে হিন্দুদের এই মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। এই টান্সাইলেরই কোথাও জনৈক হিন্দু ভদ্রলোকের একটি মন্তব্য নিয়ে তুমুল বচসা শুরু হয়ে যায়। ভদ্রলোক বলেছিলেন, মুক্তিযোদ্ধারা 'জয় বাংলা' শিখেছে ইন্দিরা দেবীর সেনাবাহিনীর কাছে। ঢাকার একটি মহল্লার ঘটনাবলী দেখে জনৈক সাংবাদিক একজন রাজনৈতিক নেতার কাছে বলেছেন, এই মহল্লায় সত্য কথা বলা যেত না যদি পাশে একজন বিহারী থাকত আজও বলা যায় না যদি একজন হিন্দু থাকেন। সংঘাতটা একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে। তা হল, মুসলমানরা সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে বাঙ্গালী হতে পেরেছেন। কিন্তু হিন্দুরা 'হিন্দু-বাঙ্গালী' রয়েছেন। মুসলমানরা অনেক হিন্দুর সব পেয়ে সারা জনম ভোগের স্বপ্ন দেখেছে। আর প্রতিটি নিঃস্ব হিন্দু অভিশাপ দিতে দিতে ফিরে এসেছে।

মোট কথা অর্থনৈতিক তথা বৈষয়িক কারণে হিন্দু-মুসলমানের বিভেদ কোন কোন অঞ্চলে প্রকট হয়ে উঠেছে। এর সমাধান যত তাড়াতাড়ি সম্ভব করতে হবে। স্থায়ীভাবে এর

সমাধানের একমাত্র পথ হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদ সাধন। কিন্তু বাংলাদেশের বর্তমান সরকারের জন্যে তা সুদূর পরাহত। তারা চান এমসিএ ও অফিসারদের দেমাগ প্রসূত সমাজতন্ত্র কায়েম করতে। এত বড় আত্মত্যাগের কাজে দেয়া। তা না হলে একে হাত দিবার মত প্রতিনিধি রয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। থাকলেও অতি অল্প কয়েক জন। অবিলম্বে আর একটি কার্যধারা রোধ করতে হবে। গ্রামে- গঞ্জে হিন্দু-মুসলমানের নতুন ধরনের প্রত্যক্ষ সংঘাতের সুযোগে কতিপয় টাউট দুই পয়সা কামাই করছে। টাউটের আবার ধর্ম নেই। সে উভয়কে দুর্বল করে নিজের স্বার্থ উদ্ধার করে। তাই সরকারের উচিত হিন্দু-মুসলমান স্বার্থ জড়িত বিষয়গুলি বিশেষ মনোযোগের সাথে সমাধা করে। অন্যকে দাপট দেখাতে গিয়ে সামাজিক অশান্তি শুধু বাড়াতে। হিন্দু বলে এবং মুসলমানকে মুসলমান বলে আজকাল কোন প্রগতিশীল লেখক কিংবা বিপ্লবী চিন্তাবিদ নিবন্ধ রচনা করেন না। কারণ, এতে সাম্প্রদায়িক সচেতনতা ফুটে উঠে যার পরিণতি খুবই ক্ষতিকর। এতে আমরা সত্যিই একমত। কিন্তু তত্ত্বে দোহাইয়ে 'হক' কথাটি ঢাকা পড়লে সংঘাত আরও জটিল হয়। তাই আজ বাঙ্গালীর স্থলে দুটো সম্প্রদায়ের বাস্তব পরিচয় টেনে আনা হল।

সপ্তাহের ভাবনা

স্বৈরাচারীর নির্যাতনের যুগ থেকেও নির্যাতিতের প্রতিহিংসার যুগ অধিকতর ভয়ঙ্কর। —হযরত আলী (রাঃ)

শ্রেণী সমাজে বিপ্লব ও বিপ্লবী যুদ্ধ অপরিহার্য। তাদের বাদ দিয়ে সমাজ বিকাশের দ্রুত-অতিক্রমণ সম্পন্ন করা এবং প্রতিক্রিয়াশীল শাসক শ্রেণীকে উৎখাত করা অসম্ভব; অতএব জনগণের পক্ষে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করা অসম্ভব।

— মাও সেতুঙ

মুরিদের দরবার

আল্লাহ্‌র ইচ্ছাই চরম ইচ্ছা

॥ মোহাম্মদ হোসেন ॥

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সময় ও সংখ্যা যেমন মানুষের ধারণার সৃষ্টি তেমনই সুখ-দুঃখও মানুষের অনুভূতির সৃষ্টি। কেহ শত দুঃখে থাকিয়াও আল্লাহ্‌র হাজার শুকরিয়া আদায় করেন-আবার কেহ মহা সুখে থাকিয়াও শান্তি পান না, অকৃতজ্ঞ থাকেন। ইহা ছাড়া আল্লাহ পাকের সুখানুভূতি দুঃখানুভূতি বলিতে কিছু নাই। সকল বান্দাই আল্লাহ্‌র চোখে সমান। শিক্ষিত-অশিক্ষিত বলিতে তিনি কিছু জানেন না। মানুষ আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্য স্বীকার করুক বা না করুক ইহাতেও সর্বশক্তিমানের কিছু যাইবে আসিবে না। তিনি বিশ্বের 'রব'। পাপী-তাপী, আস্তিক-নাস্তিক ও পরিশেষে সকল প্রাণীরই তিনি প্রতিপালক। সমাজ শ্রেণী বিভাগ-(ধনী-গরীব) এগুলি মানুষের সৃষ্টি। অতিরিক্ত লোভ মানুষকে স্বার্থান্ধ করে-স্বার্থের টানে মানুষ সমাজের বৃহত্তর কল্যাণ ও নিজের মনুষ্যত্বকে বিসর্জন দেয়। আর তারই ফলস্বরূপ সমাজে দেখা দেয় শ্রেণী বিভাগ। অতএব আল্লাহ পাক ন্যায়পরায়ণ। তাঁহার চোখে সকল বান্দাই সমান। ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু এ যুক্তির পিছনেও ঐ এক কথা। আল্লাহ্‌র ইচ্ছাতে একই মানুষের ভিতর ভিন্ন ভিন্ন ভাব বা অনুভূতির জন্ম হয় যার ফলে কেহ স্বার্থবাদী কেহ বা নিঃস্বার্থ কর্মী। আবার আপনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে আল্লাহ্-রসূলের (দঃ) প্রতি আনুগত্য স্বীকার করিতেছেন, আল্লাহ রাসূলের (দঃ) প্রেম বিচ্ছেদে কাঁদিতেছেন, অন্তর আপনার বিচ্ছেদ বেদনায় জরাজীর্ণ। তবু আপনি সত্যসন্ধানে পাগল হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন; আপনার জ্ঞানাদ্রীয় সত্যকে আবিষ্কারও করিয়াছে; তাই অল্প কথায় স্বল্প ব্যাখ্যায় আপনার হৃদয়ে যে ভাবের সৃষ্টি হয় সে উপলব্ধি আসে তাহা আমাতে আসে না। কারণ, আপনাকে পরম করুণাময় যে ভাবে যে পরিবেশ ও পরিস্থিতির ভিতর দিয়া যেরূপ অনুভূতি দান করিয়াছেন-পাপ-পুণ্য, সত্য-মিথ্যা যার সামর্থ্য দিয়াছেন বুঝি আমাকে তাহা দেন নাই। যদি দিতেন তবে ঐ সকল গুণাবলী স্বতঃস্ফূর্তভাবেই আমাতে আসিত। কারণ, আল্লাহ্ পাক নিজেই বলিয়াছেন তিনি যাহাকে ইচ্ছা সত্য পথে রাখেন, যাহাকে ইচ্ছা অসৎ পথে রাখেন, যাহাকে ইচ্ছা সম্মানের অধিকারী করেন-যাহাকে ইচ্ছা অসম্মানের অধিকার করেন। অতএব, এখানে এক অসীম অদৃশ্য ঐশী শক্তির অনিবার্য প্রভাবের কথা মূর্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ফরাসি চিন্তাবিদ বাফন ধুমকেতুর সংঘর্ষে সূর্য হইতে খণ্ড বিচ্যুত হইয়া গ্রহ-উপগ্রহ সৃষ্টির তত্ত্ব, বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক এমানুয়েল কান্ট ও ফরাসি অঙ্কবিদ লাপলাসের নিহারিকা তত্ত্বে গ্রহ-উপগ্রহ ও জীবের সৃষ্টি, বৃটিশ জ্যোতিষ্ক-পদার্থবিদ হুইলির 'সমজতার' ও 'নিহারিকা' কল্পনা, ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্ব, ইহা ছাড়া নিউটন-আইনেস্টাইন প্রভৃতি চিন্তাবিদ ও বিজ্ঞানীগণ সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে অনেক রহস্য উদঘাটন করিয়াছেন। কিন্তু সৃষ্টির সঠিক ব্যাখ্যা কেহই দিতে পারেন নাই। তাঁহাদের মস্তিষ্ক প্রসূত কল্পনা হইয়া রহিয়াছে। আধুনিককালের বিজ্ঞানীগণ মানুষের সৃষ্টির রহস্য লইয়াও অনেক গবেষণা করিতেছেন। তাঁহারা স্পষ্ট প্রমাণ দিয়া বুঝাইয়াছেন-কতক লোক বুদ্ধিমান অথবা ধার্মিক। কতক লোক নির্বোধ অথবা অধার্মিক। এইগুলি 'জীনের' গুণেই হয় (পিতা-মাতার শুক্র হইতে জীনের উৎপত্তি)। মাতৃগর্ভে যে 'জীনের' নিয়ন্ত্রণ পড়িয়াছে আপনি সেই প্রকৃতিরই হইবেন। এই জন্যই বৈজ্ঞানিকেরা পিতা ও পুত্রের জীন পরীক্ষা করিয়া পিতা-পুত্রকে বাছিয়া বাহির করিতে পারেন। কিন্তু 'জীন' বা 'ক্রমোজম' কে সৃষ্টি করিয়াছেন? বৈজ্ঞানিক হয়ত উত্তর দিবেন উহা প্রকৃতিগতভাবে সৃষ্টি হইয়াছে। প্রকৃতি কে সৃষ্টি করিয়াছেন?

এইভাবে প্রশ্ন করিতে থাকিলে এক সময় দেখা যাইবে (নাস্তিক) বৈজ্ঞানিকের যুক্তি শেষ হইয়াছে। যেখানে বিজ্ঞানীর যুক্তি স্থগিত, দর্শনের যাত্রা শেষ সেখান হইতেই আল্লাহ্‌র অদৃশ্য মহাশক্তি ও ক্ষমতা অপরিসীম। সেই জন্যই তো সর্বশক্তিমান মানুষের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

প্রত্যক্ষ জগতে বাস্তবজ্ঞান যুক্তির উপর নির্ভরশীল। যুক্তি আবার একটি নির্দিষ্ট সীমায় আবদ্ধ। যুক্তি যেখানে প্রমাণ খুঁজিয়া পায় না সেখানেই এই জ্ঞান নিস্তেজ। বাস্তব জগতের সীমাবদ্ধ শিক্ষা স্রষ্টা ও সৃষ্টি সম্বন্ধে সঠিক উপলব্ধি দিতে যথেষ্ট সাহায্য করে সত্য, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই জ্ঞান বিদ্যার্থীদের মধ্যে অহংকার ও অতিরিক্ত লোভের সৃষ্টি করে। মাটির মানুষের যে অহংকার সাজে না-সমস্ত প্রশংসার একমাত্র মালিকই যে সৃষ্টিকর্তা, এই অতি সত্য কথাটিও আদম সন্তান ভুলিয়া যায়। ভুলিয়া যায়-মানুষ হিসাবে মানুষের প্রতি তাঁহার কিই-বা দায়িত্ব আর কিই-বা কর্তব্য। ফলে গোটা মানব সমাজে নামিয়া আসে অহংবোধের সর্বনাশা সীমাবদ্ধতা।

মানুষকে আল্লাহ্ পাক নিজের সাদৃশ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন সত্য কিন্তু তাহার মধ্যে এমন কতকগুলি ইন্দ্রিয়ও দিয়াছেন যেগুলি তাহাদের নিজ নিজ স্বভাব অনুযায়ী মানুষকে আকর্ষণ-বিকর্ষণ করিতেছে। যেমন চোখ সুন্দর জিনিষ দেখিতে, কান সুর-সঙ্গীত শুনিতে, জিহ্বা সুমিষ্ট খাদ্যের আস্বাদ লইতে, নাক সুবাস

পাইতে ইচ্ছুক। মানুষ যদি এইগুলির তাড়নায় অতিরিক্ত প্রলুব্ধ হয় ও হিতাহিত জ্ঞান হারায় তবে মানুষ মানুষের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য হারাইয়া ফেলে। কিন্তু যে মানুষ এই প্রবৃত্তিগুলির উপর নিজ আধিপত্য স্থাপন করিয়া সত্য সাধনায় উদ্বুদ্ধ রহিয়াছেন তিনি তো আল্লাহ্‌র গুণে গুনান্বিত, তিনিই তো আল্লাহ প্রেমের অমৃতের সন্ধান পাইয়াছেন। যিনি সেই প্রেমের অমৃত সাগরে ডুবিয়া রহিয়াছেন–তাঁহাকে সংসার বিভ্রান্ত করিতে পারে না। এই মানুষই জগতে কালের গর্ভে অমর হইয়া থাকেন। আল্লাহ্ প্রেমের সেই অমৃত ধারা তাঁহাদের মধ্যে কি ভাবের, কি অনুভূতির, কি উপলব্ধির সৃষ্টি করিয়াছে তাহা লিখিয়া প্রকাশ করিবার নয় যে লিখিয়া প্রকাশ করিবে, বলিবার নয় যে বলিয়া প্রকাশ করিবে, দেখাইবার নয় যে দেখাইয়া বুঝাইবে–তাহা যিনি পাইয়াছেন কেবলমাত্র তিনি বুঝিয়াছেন। সেই প্রেম, সেই উপলব্ধি, সেই অনুভূতি আল্লাহ্ পাক স্বতঃস্ফূর্তভাবে না দিলে মানুষের পাইবার উপায় নাই–আর মানুষও যদি স্বতঃস্ফূর্তভাবে না ডাকে তাহা হইলে আল্লাহ্ পাকও সাড়া দিবেন না। তিনি আছেন ভক্তের দুয়ারে দুয়ারে। তিনি অতি নিকটে আবার মনের ধোঁকায় বহু দূরে।

যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে জ্ঞানের প্রসার হয় সত্য কিন্তু স্রষ্টার সাধনায় সফলতা আসে না। সত্য সাধনায় সফলতার জন্য আমলের প্রয়োজন–আমলের জন্য আবার নির্জ্জন তপস্যার দরকার। সর্বশক্তিমানের করুণা ব্যতীত কাহার সাধ্য তাঁহাকে পায়। সকল কিছুতেই তাঁহার অদৃশ্য এক মহাশক্তির প্রভাব মানুষের উপর প্রভাবিত হইতেছে। তাই সর্বশক্তিমানের নিকট আমাদের আকুল আবেদন, করুণ মিনতি, হে বিশ্বের 'রব'! তোমার ইচ্ছাই চরম ইচ্ছা! তুমিই চরম ও পরম সত্য! তুমি তোমার 'রহিম' ও 'রহমান' নামের গুণে ভ্রান্ত হইতে দূরে রাখ, সরল সঠিক পথে পরিচালিত কর– সত্য ও সম্পর্কে সঠিক উপলব্ধি দাও– ধৈর্য্য দাও! ত্যাগ ও তিতীক্ষা দাও! আর ইহকাল ও পরকালের মঙ্গল দান কর! (সমাপ্ত)

মুরিদদের প্রতি আমার নির্দেশ

১) আল্লাহর হক আদায় করিবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের (সে যে কোন ধর্ম বা বর্ণের হউক না কেন) হকও আদায় করিয়া যাইবে। আল্লাহ্‌র ইবাদত ও সংসার ধর্ম পালন দুইটিই করিতে হইবে।

২) মানুষের মঙ্গলের একমাত্র পথ সমাজতন্ত্র কায়েম করিতে আমার আহ্বানে সম্মেলনে ও আন্দোলনে যোগদান করিবে।

৩) এক আল্লাহ ছাড়া দুনিয়ার কোন প্রাণীকে ভয় করিবে না। যেকোন অন্যায়, অবিচার ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবে।

৪) ঘুষ দেওয়া, নেশা করা, অন্যের সম্পদ নিজের স্বার্থে আত্মসাৎ করা ইত্যাদি কাজ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিবে।

৫) গ্রামে-গ্রামে বড়দের জন্য নৈশ বিদ্যালয় এবং ছোটদের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিবে।

৬) ভণ্ড ফকিরদের সংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া মানুষকে পথভ্রষ্ট হইতে বাধা দান করিবে।

৭) অবসর সময়ে 'ঠুলি বৈঠক' করিবে। তাহাতে আল্লাহর নিয়ামত, রহমত ও আজরত সম্পর্কে আলাপ করিবে। তৎসঙ্গে সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থা আলোচনা করিয়া নিজেদের কর্তব্য স্থির করিবে।

৮) প্রতি চাঁদের ১১ তারিখ রাত্রিতে আল্লাহর জিকির করিবে।

৯) সন্তোষে আমার সহিত যোগাযোগ রাখিবে।



জামুকীতে ন্যাপ কমিটি গঠিত

মির্জাপুর, ১ লা মার্চ — কাজী মোঃ হাতেমকে আহ্বায়ক নিযুক্ত করিয়া এবং নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের সদস্য হিসাবে লইয়া মির্জাপুর থানাধীন জামুকী ইউনিয়নে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সাংগঠনিক কমিটি গঠিত হইয়াছে। সদস্যবর্গ হইতেছেন ঃ মুনসী ইয়াসিন আলী, মোঃ মোশরকতে হোসেন মাষ্টার, মৌঃ হবিবর রহমান, কাজী মোজাফফর হোসেন, মোঃ নওয়াব আলী, জসিমউদ্দীন মিয়া, নূর মোঃ খাঁ মাষ্টার, আবদুর রশিদ খাঁ, মোঃ তারা খলিফা, শাহ মোঃ কায়কোবাদ, মুনসী সিরাজউদ্দিন এবং আবদুর রশীদ ড্রাইভার।

আটজনকেই মরিতে হইত

চর রক্ষিত বেলতা (টাংগাইল), ১ লা মার্চ।— গত ২২ শে ফেব্রুয়ারী এখানকার একটি পরিবারের প্রায় সকল সদস্যকে একই সঙ্গে মৃত্যুপথযাত্রী হইতে হইয়াছিল।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, বেশ কয়েকদিন যাবত সংশ্লিষ্ট পরিবারটি একরকম অনাহারে কাটাইতেছিল। অবশেষে কোন উপায় না পাইয়া মৃত্যু অবধারিত জানিয়াও কেওর আলুর বীজ খাইয়া বসে। ইহাতে শীঘ্রই তাহাদের পাকস্থলীতে বিষাক্ত প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং মরিয়া যাইবার উপক্রম ঘটে। উল্লেখযোগ্য যে, উক্ত আলুর বীজ মানুষের খাদ্যের যোগ্য নহে। কিন্তু ক্ষুধার তাড়নায় বাধ্য হইয়া তাহারা সুলভে প্রাপ্ত বীজগুলি খাইয়া ফেলে।

গোটা পরিবারটির এহেন অবস্থায় গ্রামবাসী আগাইয়া আসেন এবং তাহাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। সংশ্লিষ্ট ভুক্তভোগীদের মধ্যে রহিয়াছেন আব্বাতন নেসা, ফুলে, জাহানারা, জামেলা, মজিরন, বাহারজান, হাবিল এবং হানিফা।

এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে বাংলাদেশের ৬২ হাজার গ্রামের লক্ষ লক্ষ পরিবার আজ এমনি অবস্থার সম্মুখীন। অভাব- অনটনে তাহারা শুধু কুখাদ্যই খাইতেছে না, অখাদ্যও আহার করিয়া পরোক্ষভাবে আত্মহত্যা করিতে বাধ্য হইতেছে। এই সব অখাদ্যের মধ্যে রহিয়াছে ঘেচু (শুয়োর যাহা খায়) কচুরী পানা (মহিষ যাহা পছন্দ করে) এবং তেতুলের বিচি ইত্যাদি।

আলকাতরা প্রস্তুতকারকদের সভা

ঢাকা, ১লা মার্চ— সম্প্রতি তেজগাঁও শিল্প এলাকায় 'পূর্বপাকিস্তান আলকাতরা ম্যানুফ্যাকচারারস গ্রুপের' এক সভা সমিতির কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন এম, জামান। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে শহীদদের রুহের মাগফেরাত কামনা করিয়া সভায় অন্যান্য প্রস্তাব গৃহীত হয়। সমিতির পূর্বের নাম পাল্টাইয়া 'বাংলাদেশ আলকাতরা প্রস্তুতকারক সমিতি' নামকরণ করা হয়। আগের কার্য-নির্বাহক কমিটি বহাল থাকিয়া কাজ করিয়া যাইবার

এবং নূতন সদস্য গ্রহণের ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার সিদ্ধান্তও এই সভায় গৃহীত হয়।

রুখে দাঁড়ান

চোরাচালান দেশকে ফতুর করে দিল

বাংলাদেশকে ফতুর করতে আর বাকী রয়েছে কি, আমরা ভেবেই পাই না। পাক-সরকার ২৩ বৎসর যাবত লুণ্ঠন করে এই দেশকে ভিখারী করতে পারেনি। কিন্তু নয়টি মাসে একে আর সোনার বাংলা রাখেনি। পোড়া মাটি এবং বিরান ভাণ্ডার ছাড়া আমাদের আজ কিছুই নেই। আফসোস, এতেও বাংলার কপালে দুঃখ ঘুচল না। স্বাধীনতার পর বিধ্বস্ত বাংলা থেকে হাজার হাজার মণ ধান, চাউল, পাট, সরিষা, কলাই, শত শত খাসী, মুরগী, ডিম, মাছ ইত্যাদি সব ভারতে-বার্মায় চলে যাচ্ছে। ট্রাকের পর ট্রাক বোঝাই করে বাংলাদেশের অভ্যন্তর থেকেও মালামাল কিনে নেয়া হচ্ছে। এ কাণ্ড ভারত-বার্মা সরকারের

টাঙ্গাইলের বাজার দর

	ফাল্গুন, ১৩৭৭	ফাল্গুন, ১৩৭৮	মূল্যবৃদ্ধি
ধান প্রতি মণ –	২৭ টাকা	৩৩ টাকা	২০%
চাউল প্রতি মণ–	৪০ টাকা	৫৩ টাকা	৩০%
আটা প্রতি মণ –	২৮ টাকা	৪২ টাকা	৫০%
মাশকলাই প্রতি সের –	০.৭৫ টাকা	১.৫০ টাকা	১০০%
মশুরী কলাই প্রতি সের –	১ টাকা	১.৭৫ টাকা	৭৫%
খেসারী কলাই প্রতি সের	০.৫০ টাকা	১ টাকা	১০০%
খাসীর মাংস "	৪ টাকা	৫ টাকা	২৫%
বেগুন "	০.২৫ টাকা	০.৫০ টাকা	১০০%
আলু "	০.৩৭ টাকা	০.৭৫ টাকা	১০০%
শুকনা মরিচ "	৪.৫০ টাকা	৬ টাকা	৩৩%
পিয়াজ "	০.৫০ টাকা	১ টাকা	১০০%
সরিষার তৈল "	৫ টাকা	৭ টাকা	৪৫%
নারিকেল তৈল "	৫ টাকা	৯ টাকা	৮০%
কেরোসিন তৈল "	০.৬২ টাকা	১.৫৫ টাকা	১২০%
সাবান "	২.২৫ টাকা	৩.২৫ টাকা	৫০%
সাদা কাগজ প্রতি দিস্তা	১ টাকা	২ টাকা	১০০%
লুঙ্গী ১ টি	৬ টাকা	১০ টাকা	৬৬%
শাড়ী ১টি	১২ টাকা	২০ টাকা	৬৬%
ঔষধ ১ ফাইল	৫ টাকা	৭.২৫ টাকা	৫০%
মাছ	১ টাকা	২ টাকা	১০০%

মত সুহৃদের পক্ষে বরদাশত করা হবে, আমরা তা বিশ্বাস করি না। উভয় দেশের অসাধু ব্যবসায়ীরা এই ভয়ঙ্কর কাজে লিপ্ত হয়েছে। বাংলাদেশের সরকার হয় তা নজরে নিয়েও গুরুত্ব দিচ্ছেন না, নয়তো বাধা দানের চেষ্টা করেও বলতে হবে ব্যর্থ হচ্ছেন। সীমান্তে আমাদের প্রহরী নেই সত্য। কিন্তু বন্ধুদেশ ভারতের রয়েছে। আর আমাদের স্বঘোষিত প্রহরী অনেক দাঁড়িয়েও গেছে। তারা কপট কিংবা ভূয়া মুক্তিবাহিনী। দু'পয়সা কামাই করাই তাদের কাজ। এদিকে কোটি কোটি টাকার সম্পদ বিদেশে পাচার করে 'জাতীয়তাবাদের পরাকাষ্ঠা' প্রদর্শন করছে।

স্বাধীন হবার আগে যখন ব্যবসা-বাণিজ্য এক-রকম অচল হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল তখনও ধান, চাউল, মশলা, তরিতরকারি, কাপড়, ঔষধ ইত্যাদির মূল্য এত অধিক ছিল না। যদিও যোগাযোগ ব্যবস্থার পুনরুদ্ধার সম্ভব হয়নি, কিন্তু স্বাধীনতা পেয়ে সবার মনে একটি স্বতঃস্ফূর্ত কর্মচাঞ্চল্য ফিরে এসেছে। এর মধ্যে কেন বাজারে জিনিষপত্রের এত অভাব, কেনই বা এত দুর্মূল্য? অনেক কারণের মধ্যে অন্যতম কারণ হল অবাধ চোরাচালান।একটি হিসেবে আমরা পেয়েছি চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, সিলেট, হালুয়াঘাট (ময়মনসিংহ), রংপুর এই কয়টি এলাকা থেকে প্রকাশ্যে মালামাল নিয়ে দৈনিক গড়পরতা ২৫টি ভারতীয় ও ১০টি বার্মীজ ট্রাক সীমান্তের অপর পারে চলে যাচ্ছে। প্রতিটি ট্রাক এক এক যাত্রায় বিশেষ করে খাদ্যদ্রব্য, তরিতরকারি ও মাছ নিয়ে যাচ্ছে। আবার রাজশাহী, দিনাজপুর, বগুড়া, যশোহর এবং খুলনা থেকে প্রতিদিন গড়পরতায় ৩০ ট্রাক জিনিষপত্র চোরাচালান হচ্ছে। খুলনার দক্ষিণাংশ ও বরিশাল জেলায় লঞ্চ যোগে চোরাচালানের কারবার চলছে। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় ট্রাকগুলো বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সদর শহরে চলে আসে এবং খোশ হালতে বোঝাই হয়ে ফিরে যায়। মজার ব্যাপার, প্রায়শঃ বাংলাদেশে বেতারে ঘোষণা করা হয়, ভারত আমাদেরকে এই—সেই কত সাহায্য দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যোগে-বিয়োগে যে বিয়োগই হচ্ছে এর হিসেব আমরা কেউ করে দেখছি না।

চোরাচালানের ব্যবসাগত প্রতিক্রিয়া দেখানোর জন্য দু'বৎসরের বাজার দর এখানে দেয়া হল। বিশেষ করে টাঙ্গাইলে চোরাচালানের জন্যে দায়ী ট্রাকগুলোর পরিচয়ও তুলে দেয়া হল।

যে সব ভারতীয় ট্রাক কেবল টাঙ্গাইল জেলায় চোরাচালানের কাজে নিয়োজিত রয়েছে এদের নম্বর ঃ ডব্লিউ বি কে ৪৯৭৯, ৮৭২৯, ১৩৭৮, ৩৬৫৫, ৮৭২০; ও আরও ২২৮৩, ডব্লিউ বি ও ৪২১৪ এবং এ সিএ ৬৭৮৭

ইহা কি সত্য?

(ইতিমধ্যে এই কলাম সম্পর্কে পাঠকদের তরফ থেকে আমরা অসংখ্য চিঠিপত্র পেয়েছি। স্বনামে অভিযোগ লিখে সবাই মিনতি করছেন গোপনীয়তা বজায় রাখতে। আর যারা বেনামে লিখছেন তাদের অভিযোগ তদন্ত করে আমাদের ছাপতে হবে। তাই সবার কাছে অনুরোধ ঃ আপনারা দ্বিধাহীনচিত্তে নাম- ঠিকানা সমেত লিখবেন। হ্যাঁ, আমাদের এই কলাম নিয়মিত চলবে। তবে ইহাও সত্য, যত তাড়াতাড়ি এই কলাম বন্ধ হবে ততই মঙ্গল)।

॥ ১ ॥

নেহেরু ছাটে 'মুজিব-কোট' আজকাল রাজনৈতিক কর্মীর চেয়ে কতিপয় অফিসারের

কাছে বেশী প্রিয়। কারণ সোজা, দালালত্ব ঢেকে ভবের পুলসেরাত পার হবার কসরত করা যায়। দেশের এমন কোন বিভাগ নেই যেখানে এমনি কতক চিড়িয়া না পাওয়া যাবে।

টাঙ্গাইলের এমনি একটি বিভাগ ঃ শিক্ষা বিভাগ। আর এরই জনৈক উর্ধ্বতন অফিসার সম্প্রতি চকচকে 'মুজিব-কোট' পরিধান করতে শুরু করেছেন। উদ্দেশ্য দালালীর গ্লানি ঢেকে রাখা। স্বাধীনতা সংগ্রামের নয় মাসে তিনি রীতিমত হুমকির মুখে ঘুষ আদায় করেছেন। চাকুরীর জন্যে দরখাস্ত নিয়ে গেলেই— বিশেষ করে প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষকদের নিয়োগের ব্যাপারে — ঘুষ চাই, এটা তার অতি পুরাতন শ্লোগান। চাকুরী যারা খোঁজ করেন তারাও তেমনি ঘরের টিন কিংবা বাবার হালের গরু বিক্রি করে ঘুষের টাকা যোগাড় করেন — সোনালী স্বপ্ন থাকে চাকুরী পেয়ে সব শোধ করে দেবেন। ঘুষের টাকা সেই অফিসারের হাতে দিয়ে এসে নিয়োগপত্র পাবার জন্যে দিন গুণতে থাকেন। পাক-সামরিক শাসক চক্রের আমলে এমনি অবস্থায় পড়ে জনৈক ভুক্তভোগী নিয়োগপত্র প্রাপ্তির তাগিদ দিতে গেলে উক্ত শিক্ষা অফিসার তাকে বর্বর ফৌজের হাতে ধরিয়ে দেয়ার হুমকি দেখান। এমনিভাবে আজকের মুজিব কোটধারী এই অফিসারটি বহু প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষকের সর্বনাশ করেছেন। স্বাধীনতার পরও অফিসারটি কমপক্ষে তিনজন শিক্ষকের নিকট থেকে ঘুষ আদায় করেছেন। এদের একজনকে এখনও নিয়োগপত্র দান করেননি।

॥ ৬ ॥

'আল্লাহর শ্রেষ্ঠ' সৃষ্টি ইনসানও হাইওয়ানের কাজ করতে পারে এর অসংখ্য নজীর টাঙ্গাইল এলাকায় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। মইসানন্দলাল গ্রামের জনৈক ব্যক্তির নিকট থেকে মাত্র সাড়ে পাঁচ শত টাকা আদায়ের কাহিনী বড়ই বিস্ময়কর। লোভাতুর এক এমসিএ উক্ত ব্যক্তিকে মুক্তিবাহিনী মেরে ফেলবে ভয় দেখিয়ে এই টাকা আদায় করেছেন। টাকাটা এমসিএ সাহেবের বাসায়ই প্রদান করা হয়।

॥ ৭ ॥

টাঙ্গাইল জেলারই আর একজন এমসিএ সমাচার বয়ান করছি। তিনি সম্প্রতি পারমিটে প্রচুর পরিমাণ কেরোসিন বাগিয়েছেন। কিন্তু বাজারে ন্যায্য দামে বিক্রি করতে হবে বলে কালোবাজারী করছেন। ফলে টাঙ্গাইল ও মির্জাপুরে কেরোসিনের দাম কমছে না।

॥ ৮ ॥

কয়েকজন এমসিএ সাহেব কোহিনুর ক্যামিক্যালস্-এর গুদামজাত মালপত্র ভাগ-বাটোয়ারা করে নিয়েছেন। একসঙ্গে বাজারে ছাড়লে মাত্রাতিরিক্ত লাভ করা যাবে না বলে মালপত্র নিজস্ব গুদামে রেখেছিলেন। তা থেকে আবার কতিপয় ভূয়া স্বেচ্ছাসেবক বিগত নবমী তিথিতে কিছু লুণ্ঠন করে নিয়ে গেছেন। শুধু কোহিনুর ক্যামিক্যালসই নয় এমনি আরও শিল্প প্রতিষ্ঠানের সম্পদ কয়েকজন 'প্রতাপশালীর' মধ্যে বন্টনের ফিরিস্তি আমাদের হাতে রয়েছে।

সম্পাদক ঃ সৈয়দ ইরফানুল বারী। মুদ্রণে– কল্লোল প্রেস, সদর সড়ক, টাঙ্গাইল।

সাপ্তাহিক

হক-কথা

(WEEKLY THE HAQ-KATHA)

প্রকাশক ও পৃষ্ঠপোষক ঃ মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

তৃতীয় সংখ্যা শুক্রবার ২৬শে ফাল্গুণ ১৩৭৮ ১০ই মার্চ ১৯৭২ ২৩ শে মহরম ১৩৯২ প্রতি সংখ্যা ঃ পনের পয়সা সন্তোষ, টাঙ্গাইল

চট্টগ্রাম বন্দরের গুরুত্ব নস্যাৎ করতে

আন্তর্জাতিক চক্রান্ত চলছে?

বাংলাদেশের অর্থনীতিকে ধ্বংস করে প্রতিবেশী-নির্ভর করতে যা দরকার — চট্টগ্রাম সামুদ্রিক বন্দরের গুরুত্বকে নস্যাৎ করবার আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র চলছে। দলিল-দস্তাবেজে কম হলেও চাণক্য মারপ্যাঁচে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বন্দর-নগরী চট্টগ্রাম আজ কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন। বাংলাদেশে নয়, ভারতে শুধু নয়, দুনিয়ার সর্বত্র একটি ভিনদেশী মহল প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন। কার্যতঃ প্রমাণ করতেও চেষ্টা করছেন, চট্টগ্রাম আজ আর সে বন্দর নেই। কিন্তু এই মিথ্যা প্রচারের রহস্য কি?

চট্টগ্রাম বন্দরের ১৭টি জেটির মধ্যে ৫টি পূর্ব থেকেই আর ২টি সাম্প্রতিক যুদ্ধকালে অকেজো হয়েছে; ২টি ক্রেন বিনষ্ট হয়েছে; সমুদ্রমুখে ৩টি, জেটিতে ২টি জাহাজ ডুবে রয়েছে। কিন্তু এতে এমন কিছু ঘটে যায়নি যে গোটা বন্দরটিই কাজের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। বিশেষজ্ঞ মহল বারবার দাবী করছেন, চট্টগ্রাম বন্দরে জাহাজ চলাচল বা অবস্থান কিংবা মাল-যাত্রী উঠা-নামায় কোন অসুবিধা নেই। অথচ বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে আমাদের প্রতিবেশী একটি রাষ্ট্র এই সত্যকে ঢেকে রেখে হরদম প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন, বন্দরটি আন্তর্জাতিক গুরুত্ব বজায় রাখবার সব বৈশিষ্ট্য খুইয়ে ফেলেছে। সঙ্গে সঙ্গে তাই পাল্টা প্রস্তাব জানাচ্ছে, তাদেরই একটি বন্দরের মাধ্যমে বাংলাদেশের কাজকাম চালিয়ে যেতে।

এহেন দুরভিসন্ধিতে চট্টগ্রাম বন্দর সত্যিই আজ আন্তর্জাতিক মর্যাদা হারাতে বসেছে। বিভিন্ন জাহাজ চলাচল সংস্থা এই সুযোগে ভাড়া ও বীমার হার বাড়িয়ে দেবার প্রয়াস পাচ্ছে। এই বাড়তি চার্জ বাংলাদেশগামী মালপত্রের উপরই বর্তাবে। আর যদি চক্রান্তকারীরা এতে কৃতকার্যই হয় তবে অচিরেই অধিকাংশ শিল্প-কারখানা বন্ধ হয়ে যাবে, উৎপাদনের ব্যয় বেড়ে যাবে, তৎসঙ্গে দ্রব্যমূল্যও অত্যধিক বেড়ে যাবে।

দুনিয়ার জাহাজ চলাচল সংস্থাগুলোকে মাইনের ভয় ও অন্যান্য অসুবিধার কথা জানিয়ে চক্রান্তকারী গোষ্ঠী পরিস্থিতিকে জটিল ও ঘোরালো করে তুলছে। গত ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে বঙ্গোপসাগরে একটি বীমাকৃত ভারতীয় জাহাজ মাইন বিস্ফোরণে বিধ্বস্ত হয়। আবার একই সঙ্গে

চট্টগ্রাম বন্দরে রহস্যজনক কারণে ২টি ট্যাঙ্কারেও বিস্ফোরণ ঘটে। এসবে ইচ্ছাকৃত কোন পরিকল্পনা রয়েছে কিনা তা আজ তলিয়ে দেখে কে? ঘটনাক্রম এখানেই শেষ হয়ে যায়নি। বিগত ২৬ শে ফেব্রুয়ারী বাংলাদেশের সকল প্রচার মাধ্যমে ঘোষণা করা হয় যে 'মুহম্মদী' জাহাজে হাজীবৃন্দ চট্টগ্রাম বন্দরে পৌছবেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় বিনা কৈফিয়তে সেই জাহাজ নিয়ে যাওয়া হয় চালনা বন্দরে। চালনার মত যোগাযোগবিহীন এলাকা থেকে হাজীরা কত কষ্ট করে যে নিজেদের বাড়ী পৌঁছেছেন, এর খবর কেউ নেননি। অপরদিকে বড়ই বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে উপরোক্ত 'মুহম্মদী' জাহাজের চেয়ে অনেক বড়-১০ হাজার টনের একটি ভারতীয় জাহাজ এম, ভি, হুগলী চট্টগ্রাম বন্দরে ভিড়ে পাকিস্তানী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যায়। তাছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের 'ক্লাউড' এবং কয়েকটি রুশ জাহাজও গোপনে চট্টগ্রাম বন্দর এসে গেছে। অথচ এগুলোর চেয়ে ছোট জাহাজ 'মুহম্মদীকে' অজ্ঞাত কারণে ঘোষণার পরও চট্টগ্রামে ভিড়তে না দিয়ে চালনা পাঠিয়ে দেয়া হল।

স্বাভাবিক অবস্থায় চট্টগ্রাম বন্দরে প্রতি বৎসর সাড়ে পাঁচ মিলিয়ন টন মাল উঠানামা করত। বর্তমানে এই হার বজায় রাখতে যান্ত্রিক কোন অসুবিধা নেই। শ্রমিকরাও কাজের জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরছে। কিন্তু বন্দরে মাল উঠানামার মাত্রা স্বাভাবিকের পঁচিশ ভাগের এক ভাগ। এর কারণ মাত্র দুটি। প্রথমতঃ বিভিন্ন দেশের সাথে আজও আমাদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠেনি। দ্বিতীয়তঃ এর মধ্যেও যে সব জাহাজ চট্টগ্রামে ভিড়বার সম্ভাবনা ছিল আমাদের প্রতিবেশী একটি রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যপূর্ণ অপপ্রচারে তা স্থগিত থাকছে।

মোটকথা চট্টগ্রাম বন্দরে হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্যে আমাদেরকে সচেতন হতে হবে। বন্দরের চেয়ারম্যান সাহেব কাজেকামে দক্ষ হলেও শিপিং-এর ডাইরেক্টর জেনারেল মহোদয় একেবারে আনাড়ী। কারণ, জীবনে তিনি কখনো সামুদ্রিক বন্দরে কাজ করে দেখেননি।

যাহোক, চট্টগ্রাম বন্দরটিকে সবদিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলতে দু'টি কাজে অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করতে হবে। প্রথমতঃ নিমগ্ন জাহাজগুলোর স্যালভেজ বা উত্তোলন সমাধা-করণ। বর্ষার পূর্বেই তা বৈদেশিক সাহায্যে হলেও সেরে ফেলতে হবে। দ্বিতীয়তঃ ২৫/৩০ ফুটের জাহাজও যাতে আসা-যাওয়া করতে পারে তজ্জন্য উচ্চ ক্ষমতা-সম্পন্ন ড্রেজার দিয়ে কর্ণফুলী খনন করাতে হবে। সরকার যদি মাত্র দেড় কোটি টাকায় একটি ড্রেজার ক্রয় করে এই খননকার্য সমাধা করেন তবে হিসেবে দেখা যায় প্রতি বৎসর আমাদের সাড়ে আট কোটি টাকা বেঁচে যাবে।

এতদসঙ্গে এও ভুললে চলবে না — বিশ্ব বাজারে চট্টগ্রাম বন্দর সম্পর্কে অপপ্রচারের মোকাবিলা করতে হবে তা যে কোন প্রতিবেশী দেশের তরফ থেকেই হউক না কেন। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় সম্প্রতি চট্টগ্রাম বন্দর সফর করে এসেছেন। কিন্তু তিনিও চক্রান্তের প্রভাব কাটতে পারবেন কি?

হক-কথা -র

পরর্তী কোন এক সংখ্যায় পাবেন—বাংলাদেশ নিয়ে নাগা-মিজোরা কিছু ভাবছে কি ?

যান্ত্রিক চাষাবাদ বনাম বাঙলার চাষী

॥ এ, কে, এম, ফজলুর রহমান ॥

বাঙলাকে কলোনী করে রাখার ষড়যন্ত্রের এক প্রতিক্রিয়া থেকে আমাদের কলের লাঙ্গল-

দমকল সমিতির জন্ম। এটা নিছক বাঁচার তাগিদে এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জন্যই গঠিত হয়েছিল। অধিক খাদ্য ফলাও আন্দোলনের ব্যাপক প্রচারে আকৃষ্ট হয়ে কিছু সংখ্যক আগ্রহী চাষী আধুনিক যন্ত্রাদি দিয়ে চাষাবাদের উদ্যোগ নেন। অর্থ বা সামর্থ তাদের নেই তবু সদিচ্ছা যথেষ্ট। কৃষি উন্নয়নের জন্য সরকারী ঋণ দেয়া হল কৃষকদেরকে। আর তাও জমি বন্ধক রেখে, যে জমির প্রতিটি ধূলিকণা চাষীদের প্রাণের চেয়ে প্রিয়। ঋণ নগদে দেয়া হয়নি—ব্যাঙ্ক কর্মচারীর সঙ্গে যৌথচুক্তিতে আবদ্ধ নির্দিষ্ট কোম্পানীর বাক্সবন্দী মেশিন তাদের হাতে

কলেজ লাঙ্গল ও দমকল ঃ কৃষকের জন্য আজ শাঁখের করাত

দেয়া হল। এই লটারীর বাক্স খুলে দেখা গেল প্রায়গুলো বিকল ও অপূর্ণ। ব্যাঙ্ক আর কোন দায়িত্ব বহন করতে রাজী নয়।

কোম্পানীর বক্তব্য 'আমরা মেশিন ব্যাঙ্ককে দিয়েছি' এই টানাপোড়নে পড়ে কৃষকের অবস্থা হল ত্রিশঙ্কু। কারিগর মেলে না। খুচরা অংশের মূল্য তারা যা বলে তাই। তিন দিনের বেশী কোন পাম্প বা টিলার একটানা কাজ করে না। এসব যন্ত্রের পাল্লায় পড়ে হাজার হাজার একর জমির ফসল নষ্ট হচ্ছে। গরু বাছুর ও অন্যান্য অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করে খরচ যোগালেন অনেকে। কেউ কেউ জমি বিক্রি করে ক্ষতিগ্রস্থ জমির ফসলের মূল্য জরিমানা দিয়েছেন। সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও কোম্পানীর কর্মচারীদের আচরণে তাঁরা হতাশ হলেন। যে সব শিক্ষিত কৃষক চাকুরী বা অন্য পেশা ছেড়ে এখানে এসেছিলেন তাঁদের অনেকে যন্ত্র ডাঙ্গায় ফেলে রেখে আবার পূর্ব পেশায় চলে গেলেন। বহু পরিবার নিঃস্ব হল, কত মেধাবী ছাত্র পড়াশুনা ত্যাগ করতে বাধ্য হল অভিভাবকের অবস্থার চাপে। আর কৃষকদের জন্য স্থাপিত ব্যাঙ্ক সুদের পাই হিসেব করতেই ব্যস্ত থাকলো; 'টিলার না কিলার, কৃষি যন্ত্র কৃষকের গলার কাঁটা' 'বেকো কোম্পানী এ দেশের কৃষকদের মেরুদণ্ড ভাঙ্গার মোক্ষম অস্ত্র' প্রভৃতি শিরোনামে বিভিন্ন পত্রিকায় সিলেট, রংপুর, কুমিল্লা, নোয়াখালী, যশোহর ও ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলায় কৃষি যন্ত্র এবং কৃষকদের দুরবস্থা সম্পর্কে করুণ চিত্রাবলী প্রকাশিত হতে থাকে। সরকারের বধিরতা আমাদের ধৈর্যের বাধ ভেঙ্গে দেয়। আমরা সঙ্ঘবদ্ধ হলাম, গঠন করলাম কলের লাঙ্গল, দমকল মালিক সমিতি। আমরা দাবী জানালাম—

ক) অবিলম্বে বন্ধকী জমি ফেরৎ দিয়ে ঋণ থেকে মুক্তি দেয়া হোক।

খ) কৃষকদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হোক।

গ) একটা নিরপেক্ষ তদন্ত চালিয়ে দোষী ব্যক্তিদের সাজা দেয়া হোক।

উচ্চপদস্থ কৃষি কর্মচারীদের সঙ্গে দেন-দরবার করা হল, আবেদন জানানো হল সুধীমহলের কাছে। পত্র-পত্রিকায় সাংবাদিকরা জোর সমর্থন জানিয়ে দাবী মেনে নেবার জন্য সরকারকে অনুরোধ জানালেন। ১৩৭৬ সালের ১৮ই চৈত্রের দৈনিক ইত্তেফাকে কৃষিযন্ত্র এবং সার্বিক কৃষি উন্নয়ন সম্পর্কে কয়েকটি গঠনমূলক প্রস্তাব পেশ করা হল সরকারের কাছে। ২৯শে জৈষ্ঠ্য তারিখে আমরা সাধারণ অধিবেশনের আয়োজন করলাম। বিভিন্ন পত্রিকার প্রতিনিধিরা এতে উপস্থিত থেকে বিস্তারিত জানালেন এবং প্রথম পৃষ্ঠায় প্রথম খবর হিসাবে ফলাও করে ছাপলেন যান্ত্রিক চাষের ব্যর্থতার ইতিহাস।

কিন্তু কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙ্গলো না; বরং

'কমুনিষ্টপন্থী বলে পাবলিক ক্ষেপিয়ে তুলেছি' এই সূত্র আবিষ্কার করে লাগানো হল টিকটিকি।

আমরা দমিনি। কারণ, এটা ছিল আমাদের বাঁচার তাগিদ। আমরা আশা করেছিলাম 'অধিক খাদ্য ফলাও' অভিযানের অংশ হিসাবে ঋণটা মাফ করা হবেই। কৃষি বিশেষজ্ঞদের ধারণাও তাই ছিল। কারণ, সমস্ত ঋণ মাফ করে দিলে যে অর্থ ব্যয় হবে তা অন্য কিছুর তুলনায় নগণ্য। তবুও স্বাভাবিক পরিস্থিতিটা ঘটলো না। এ দেশে স্বাভাবিকটা অনেক সময় স্বাভাবিকভাবে ঘটে না এবং অস্বাভাবিক বিষয়ও অস্বাভাবিক দ্রুততার সাথে সহজে ঘটে। এ কথা আমাদের অজানা নয়, আমরা তৈরী হলাম। স্থির সিদ্ধান্ত নিলাম একটি পয়সাও আমরা ঋণের কিস্তি হিসেবে দেব না এবং প্রয়োজন হলে যে কোন প্রকার ত্যাগে কুণ্ঠিত হবো না।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।)

আমাদের স্বাধীনতা দিবস কবে?

আমাদের স্বাধীনতা দিবস সত্যিই কি ২৬ শে মার্চ? অন্ততঃ বাংলাদেশ সরকার তাই বলছেন ও চাপিয়ে দিতে চাচ্ছেন। বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের ঘটনাপ্রবাহ পর্যালোচনা করে নিশ্চয়ই একটি সঠিক তারিখ সম্পর্কে সবাই একমত হবেন। কিন্তু তা নিয়ে পর্যালোচনার সুযোগ না দিয়ে একটি তারিখ ঘোষণা করে ফেলা হয়েছে।

আগামী ২৬শে মার্চ সরকারীভাবে ছুটি দেওয়া হচ্ছে— স্বাধীনতা দিবস পালন করতে হবে।

১৯৭০ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর এ দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা আদায়ের প্রস্তাব মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে গৃহীত হয় ঢাকার পল্টনে। এরপর আমার মনে আছে, জনৈক সাংবাদিক মওলানাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমাদের স্বাধীনতা দিবস বলতে কি ৪ঠা ডিসেম্বরই হবে মনে করেন? মওলানা সাহেব তখন জবাব দিয়েছিলেন, '১২ই নভেম্বরের মহাসাইক্লোন স্বাধীনতার জন্যে আমাদের অন্তঃচক্ষু উন্মোচিত করে দিয়েছে। তাই বা নয় কেন?' এটা সুস্পষ্ট যে মওলানা সাহেব রাজনৈতিক প্রশ্নটিকে মানবতাধর্মী জবাব দিয়ে এড়িয়ে গেছেন। কিন্তু রাজনৈতিক দর্শনে এর সত্যতা রয়েছে, এতে কোন সন্দেহ নেই।

১৯৭১ সালের ১লা মার্চ দুপুর একটার পর বোধকরি বাংলাদেশের একটি দেশপ্রেমিক প্রাণীও বাদ ছিল না যে অন্তর দিয়ে স্বাধীনতা কামনা করেনি। তারই অনিবার্য পরিণতি স্বরূপ শেখ মুজিবর রহমান সাহেব ৭ই মার্চ রেসকোর্সে বিশ মিনিটের বক্তব্যে বলতে বাধ্য হলেন, এবারের সংগ্রাম-মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম-স্বাধীনতার সংগ্রাম। অবশেষে যে সংগ্রামে দুনিয়ার কোথাও স্বাধীনতা আসেনি অর্থাৎ অহিংসা অসহযোগ আন্দোলন চালালেন। ৯ই মার্চ পল্টনে মওলানা সাহেব স্বাধীনতা সংগ্রামকে সর্বতোমুখী করে দিলেন। তারপর এলো ২৩শে মার্চ। মওলানা সাহেবের দরকার ছিল স্বাধীনতা — এর আনুষ্ঠানিকতা নয়। তা শেখ সাহেবই স্বহস্তে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করলেন যদিও আজ সে পতাকা সংশোধন করা হয়েছে কিন্তু তাই-ই ছিল নয় মাসব্যাপী সশস্ত্র সংগ্রামের সম্মানিত ঝাণ্ডা! ২৬ শে মার্চ। প্রত্যক্ষ স্বাধীনতা সংগ্রামে শাহাদাতের দিবস, প্রত্যক্ষ কাপুরুষতা প্রদর্শনেরও দিবস।

১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭১— এতো আত্মসমর্পণের দিবস। তাও মিত্র বাহিনীর কাছে নয়— কেবল ভারতীয় বাহিনী সমীপে। তাই স্বাধীনতা দিবস আমাদের কোনটি?

শুক্রবার

ছাত্র-শিক্ষকের মতামত যাচাই করুন কেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাপ্তাহিক ছুটি হবে না?

কোন রাজনৈতিক যুক্তিতে কোন অর্থনৈতিক কারণে, কোন শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের তাগিদে কিংবা কোন মহলকে খুশী রাখার প্রয়োজনে বাংলাদেশ সরকার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাপ্তাহিক ছুটি রোববার ধার্য করলেন, তা আমরা বুঝে উঠতে পারছি না। স্বাধীনতার পূর্বে একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে সাপ্তাহিক ছুটি ছিল রোববার। মিশনারী স্কুল-কলেজগুলো বাদে আর সব প্রতিষ্ঠানে শুক্রবারই ছিল সাপ্তাহিক ছুটির দিন। এতে কোনদিন প্রশাসনিক অসুবিধা দেখা দেয়নি, কোন তরফ থেকেই অসন্তোষ প্রকাশ পায় নি। বরং পরিসংখ্যানে দেখা যাবে বাংলাদেশের শতকরা নব্বই জন ছাত্র-ছাত্রী শুক্রবারেই সাপ্তাহিক ছুটি ভোগে অভ্যস্ত হয়ে আছে। কিন্তু হঠাৎ করে সরকার কি কারণে এই রদ-বদলের প্রয়োজনীয়তা বোধ করলেন, ছাত্র-শিক্ষক মহল কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছেন না। ব্যাঙ্ক ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানকে যে কারণে রোববার বন্ধ রাখতে হয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে সে প্রশ্ন আসতে পারে না। অন্ততঃ সদিচ্ছা থাকলে কোন অসুবিধাই ঠেকিয়ে রাখে না। কিন্তু সদিচ্ছার এতই অভাব হয়ে পড়ল, শতকরা ১০ জন ছাত্র-ছাত্রীর দিবসটি বদল না করে ৯০ জনের ঐতিহ্যে হস্তক্ষেপ করা হল। অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন, এ নগণ্য বিষয়টিকে বড় করে দেখা হচ্ছে কেন? সঙ্গে সঙ্গে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে, শুক্রবারটিকেই এত অপছন্দ করা হল কেন? তবে হ্যাঁ, সরকার এর সহজ ও পছন্দসই সমাধান করতে পারেন। তা হল দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-শিক্ষকের মতামত যাচাইকরণ। যদি অধিকাংশ ছাত্র-শিক্ষক রোববারকে সাপ্তাহিক ছুটির দিবস হিসেবে বেছে নেন, তবে কারো কিছু বলার থাকবে না। আর যদি সরকার মনে করে থাকেন, মুসলমানদের পছন্দসই বলে পরিচিত দিবসটিকে এড়িয়ে বিপ্লবী সংস্কারক সাজতে পারেন, তবে নিঃসন্দেহে বলা চলে, তারা আহাম্মকের বেহেশতে আছেন। কারণ, এদেশের মানুষ কি চায় তারা তলিয়ে দেখেন নি।

একথা তো অস্বীকার করবার জো নেই যে শুক্রবার গোটা দিনটাই একটি মুসলিম পরিবারের জন্য বিশেষ কর্মসূচীর দিন। ছাত্রাবস্থায় এই সব কর্মসূচীতে স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বাভাবিক মানসিকতায় যদি অংশগ্রহণ না করা যায় তবে অবশিষ্ট জীবনে এর গুরুত্ব উপলব্ধি করা যাবে না। মনোবিজ্ঞানীরাও বিশ্বাস করেন, শৈশবের অনুশীলনই পরিপূর্ণ মানুষটির ছাঁচ তৈরী করে। কিন্তু আজ ছাত্র-ছাত্রীরা শুক্রবারে অর্ধেক দিন স্কুল-কলেজেই কাটায় যেখানে ঐতিহ্যপূর্ণ মননশীলতা গড়ে উঠবার কোন ব্যবস্থাই নেই।

টাঙ্গাইল জেলা কৃষক সমিতি সংসদ

বাংলাদেশ কৃষক সমিতির আহবায়ক মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী টাঙ্গাইল জেলা কৃষক সমিতি অর্গানাইজিং কমিটির নাম নিম্নরূপ ঘোষণা করিয়াছেন ঃ

১। জনাব বুলবুল খান মাহবুব
২। জনাব আঃ মালেক
৩। জনাব মোঃ ছলিম উদ্দিন
৪। জনাব তোরাব ফকির
৫। জনাব নুরুল ইসলাম
৬। জনাব আতোয়ার রহমান
৭। খন্দকার মুসা চৌধুরী
৮। জনাব লুৎফর রহমান খান (আহবায়ক)

হক-কথা -র

চাঁদার হার

ষান্মাষিক (সডাক)-পাঁচ টাকা

বাৎসরিক (") - নয় টাকা

বিজ্ঞাপনের হার

এক কলাম এক ইঞ্চি-বার টাকা (প্রথম পৃষ্ঠায় শতকরা পঞ্চাশ ও শেষ পৃষ্ঠায় শতকরা পঁচিশ ভাগ অতিরিক্ত)

পূর্ণ এক পৃষ্ঠা- এক হাজার টাকা

অর্ধ পৃষ্ঠা - ছয় শত টাকা

-ঃ যোগাযোগ করুন ঃ-

কর্মাধ্যক্ষ, হক-কথা, সন্তোষ, টাঙ্গাইল।

ভাসানীর বাণী

জালেম শোষক যে কোন দেশের যে কোন বর্ণের বা ধর্মের, যে কোন মতবাদের হোক না কেন তারা সবাই এক শ্রেণীভুক্ত এবং তাদের স্বার্থ অভিন্ন। মজলুম শোষিত মানুষ যে যেখানেই বাস করুক না কেন তারা সবাই এক শ্রেণীভুক্ত এবং তাদের স্বার্থ অভিন্ন। দুনিয়াব্যাপী মজলুম জনতার ঐক্যই জালেম শোষক শ্রেণীকে ধ্বংস করতে পারে।

হক-কথা

২৬শে ফাল্গুন শুক্রবার

বাংলাদেশ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া

মাত্র ৫৪ হাজার বর্গমাইলের ছোট্ট একটি দেশ হইলেও ভৌগোলিক অবস্থানের দরুণ বাংলাদেশের গুরুত্ব অপরিসীম। যে আভ্যন্তরীণ ও আর্ন্তাতিক পটভূমিকায় দেশটি স্বাধীন হইয়াছে তাহা ইহাকে আরও গুরুত্বপূর্ণ করিয়াছে। তাই শুধু ভারত মহাসাগরীয়ই নয়, প্রশান্ত মহাসাগরীয় রাজনীতি, সমরনীতি আমাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে প্রভাব খাটাইবে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

ভারত প্রত্যক্ষভাবে এবং রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, চীন পরোক্ষভাবে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে জড়িত হওয়ার পর আমরা স্বাধীন হইয়াছি। ভারত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বিগত দশকে না হইলেও চলতি দশকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হইবার দাবীদার। হিমালয় ডিঙাইয়া রাশিয়া ইহাতে যোগাল খাটিবে এই চুক্তি খুব বেশী দিনের নয় বটে কিন্তু ইহার প্রতিক্রিয়া ইতিমধ্যে দেখা দিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্র বিগত দুই দশক যাবত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সম্পর্কে যে হিসাবনিকাশ করিয়া আসিতেছিল আজ তাহা ভুল প্রমাণিত হইয়াছে। ভদ্রলোকের মত তাইওয়ান হইতে গোটা সৈন্য সরাইয়া চীন বিরোধী চক্র গঠনে পিছপা হইয়াছে। এদিকে অবশ্য জাপান, দক্ষিণ ভিয়েৎনাম ও ফিলিপাইনকে বশংবদ রাখিতে যাহা করিবার যুক্তরাষ্ট্র তাহাই করিতেছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শ্লোগানের প্রয়োজন ফুরাইয়া যায় নাই এবং কম্বোডিয়া, উত্তর ভিয়েৎনামের কথা ভুলিয়া যায় নাই ইত্যাদি বুঝাইতে চীন যার পর নাই চেষ্টা চালাইতেছে।

এর মধ্যে আমাদের বাংলাদেশ কোথায় তাহা ভাবিয়া দেখিবার অতিশয় প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। খুব সম্ভব বর্তমানে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বিরাট পরিবর্তনধর্মী হইলেও পর্যবেক্ষণের রাজনীতি চলিতেছে যাহা ধীর-স্থির গতি সম্পন্ন। উহার পরিপ্রেক্ষিতে নিজেদের অবস্থান যাচাই এবং পথ বাছাই করা সুকঠিন। কোন বিশেষ দেশের পরামর্শে একটা কিছু করিয়া ফেলা যায়। কিন্তু সেই বন্ধু দেশের কিংবা বৃহৎ শক্তির যে মাথায় যে ব্যথা রহিয়াছে আমাদের সেই মাথাও নাই, ব্যথাটুকুর অংশীদার হইবার প্রয়োজনীয়তাও নাই। কিন্তু দুর্দিনের রাজনৈতিক বন্ধুত্ব ও সুদিনের অর্থনৈতিক পসুত্বের সুযোগে যদি তাহারা আমাদের ঘাড়ে সেই ডামি মাথা চাপাইয়া দেন তবে আমাদিগকে শরমরাঙা বিনয়ী না হইয়া দৃঢ়চেতা কৌশলী হইতে হইবে। বাংলাদেশকে পুনর্গঠিত করিয়া দেশ ও জাতিকে সুখী ও সমৃদ্ধশালী করিতে হইবে সত্য, কিন্তু কোন্ বোকারাম বৃহত্তর চাপ মাথায় লইয়া তাহা করিতে যাইবে?

এমতবস্থায় আজ প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে জনগণের প্রত্যক্ষ চিন্তা-ভাবনার। যে জনতা হিন্দু-রুশ চুক্তির মর্ম, নৌবহরের ধর্ম বুঝিতে পারিয়াছে আজ যদি 'ফরেন পলিসির তাহারা কি বোঝে' বলিয়া এড়াইয়া যাওয়া হয় তবে অচিরেই গণআদালতে জনে জনে জওয়াবদিহি করিতে হইবে।

কলকী সমাচার

॥ গাঁজাবাবা ॥

জিনিষটির নাম উচ্চারণ করিব কি? না করিব না। তবে অভয় দিলে বলিতে পারি। আর কিছুর জন্যে ভয় হয় না শুধু বঙ্গবন্ধুর জন্য। বঙ্গবন্ধু জিনিষটিকে পছন্দসই নহে বলিয়া লম্বা চওড়া জবরদস্ত বহুত বাংলাদেশী সাহেবগণকে ইহা হইতে বিরত থাকিতে আদেশ করিয়াছেন। সাহেবগণ অবশ্যই বিরত রহিবেন। কিন্তু আমি কম্বলকে তালাক দিলেও কম্বল তো আর আমাকে ছাড়ে না। সাহেবগণ না হয় ধরিয়া নিলাম তাহাকে ছাড়িল কিন্তু 'উহা' তো তাহাদের সনাতন সমঝদারগণকে ছাড়িবে না। কারণ, উহার নাম মদ। বোতল পরিবর্তন করিতেই শুধু সে অভ্যস্ত। আমি এই ব্যাপারে নিশ্চিন্তে দিব্যি আরামে আছি। আমার জিনিষটিকে কিন্তু কেহই অপছন্দসই তেমন কিছু বলিয়া অভিহিত করেন নাই। কেনই বা করিবেন। গাঁজার কলকী পরিবর্তন এমনটি কস্মিন কালে ঘটিয়াছে বলিয়া কেহ বলিতে পারিবেন কি? অনেক পুত্রই পিতা পরিবর্তন করিয়া অন্যের পুষ্য হইয়াছে। স্বামীর স্ত্রী পরিবর্তন, স্ত্রীর স্বামী পরিবর্তন আমাদের মত অসভ্য দেশে তেমন জোরদার না হইলেও ইংল্যান্ড, আমেরিকার মত সভ্য দেশে চা-পান-সিগারেট ব্যাপার। ভদ্রলোকের ভোল পরিবর্তন চাঁদের তিথি ও বায়ুর গতি পরিবর্তন নটীর নাগর ও আমেরিকার ফরেন পলিসি পরিবর্তন আরও কতশত কোটি কোটি পরিবর্তনের চাইতেও অতিশয় পরিচিতি হালে মানা দেওয়া মদ নামক দ্রব্যটির বোতল পরিবর্তন। কিন্তু আমি টিক্কার খাসা আগুন ধূয়ার ঊর্দ্ধগামী সুদৃশ্যকুণ্ডলীর নামে হলপ করিয়া বলিতে পারি বিশুদ্ধ গঞ্জিকা কোন কালে কলকী পরিবর্তন করিয়াছে এমনটি কেহ বলিতে পারিলে আমি আমার বর্তমান সাধুগিরি ছাড়িয়া অসাধু ব্যবসা অর্থাৎ সাধারণ ব্যবসায়ীদের মতই কাজ করিবঃ আমি আর বটের নীচে বসিব না ত্রিশূল ছাড়িয়া দিয়া, সাধুগিরি ছাড়িয়া দিয়া, দাড়িমুছ কামাইয়া ক্যাশ বাক্সের পাশে গিয়া বসিব। জানিয়া রাখুন মদ যেমন বোতল পরিবর্তন করে গাঁজা তেমনই কলকী পরিবর্তন করে না। আমি জানি আমার মত আপনাদের দিব্য দৃষ্টি খুলিয়া দিবার নিমিত্ত কোন প্রকার দ্রব্য সাহায্য করিতে পারে না। অতএব জয়গুরু বলিয়া আমিই আর একটু ভাল করিয়া দম দিলাম। হ্যাঁ, এই অতি উত্তম সুচিত্রায়িত ধুম্রকুণ্ডলী আমার অন্তরে প্রবেশ করিয়া দিব্য জ্ঞানের এক একটি সিসেম হাঁকিয়া হাঁকিয়া ফাঁক করিয়া দিতেছে। আপনারা এইবার চাহিয়া দেখুন ব্যাপারখানা ভাল করিয়া বুঝিয়া লউন— মদ পরিবর্তনে সিদ্ধ গাঁজা অপরিবর্তনে, আমি সাধু নিপাতনে সিদ্ধ ব্যবসায়ীরা আমার মত গঞ্জিকাসেবী ত্রিশূলধারী নহে অতএব নহে সাধু অর্থাৎ অসাধু তাহা নানা কারণে সিদ্ধ।

এইবার আসুন একটু বিশ্লেষণ করি। খুব বেশী দিনের কথা নহে। আওয়ামী লীগ একচেটিয়া

ভোট পাইয়া গদির দিকে ধাবমান হওয়ার সাথে সাথেই কতক পত্র-পত্রিকা যাহা কারণে অকারণে শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগকে চিমটি ও ঠুসি কিংবা সুযোগ মত কিল ঘুষিটি মারিতেও ছাড়িত না তাহারই প্রথম পাতায় পাকিস্তানকে ছিন্নভিন্নকারী কায়েমী স্বার্থবাদীদের দালাল বলিয়া অভিহিত তথা-কথিত মামলার আসামীর ছবিটিকেই মহামহিম করিয়া প্রচার করিতে শুরু করিল। শুধু কি তাই, সম্পাদকীয় নামক ইন্টেলেকচুয়াল ব্যাপারখানাও বোতল পরিবর্তন করিল। পত্রিকাগুলিও ডান-বাম অগ্র-পশ্চাৎ উর্দ্ধ-অধপন্থী যত প্রকার সাংবাদিক ইহলোকে ছিলেন সকলেই রাওয়ালপিণ্ডির নিকটবর্তী মারী নামক স্থানে প্রস্তুত যে ছাপ বোতল রহিয়াছে তাহা ছাড়িয়া দিয়া দর্শনার ক্যারু কোম্পানীর ছাপ লাগাইলেন। কিন্তু গাঁজা কি করিল। সে আপনার মুদ্রিত চক্ষুর সামনে কেমনই বা তান্ডব খেলা খেলিয়া নর্তন কুর্দনে প্রয়াস পাইতেছে। আরও ভাল করিয়া দম দিন ও জোর করিয়া চক্ষু মুদিয়া থাকুন। এইবার ? কি দেখিতেছেন? স্যাবর জেট, চন্দ্র, সূর্য, বৃহস্পতি গ্রহ, ধ্রুব নক্ষত্র বৃহদাকারে, টিলা, টেবি, গাঙ্গের চর, কাঞ্চনজংঘা শৃঙ্গ, হেলিকপটার নাগড়া, শংখ, বদনা কি কিছুই বুজিতেছেন না কেন, আপনাকে কি দর্জ্জি সাহেব বুঝাইয়া দেন নাই? চক্ষু খুলিয়া ফেলুন। ও! এইবার স্মরণ হইয়াছে। হ্যাঁ, ইহাকেই বাঙলাদেশের ম্যাপ বলিয়া সুনিপুণ দর্জ্জি সাহেব বলিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও পঁচিশে মার্চের আগে পর্যন্ত এবং বিষ ধারাই প্রবাহিত হইতেছিল। ইহার পর আবার বোতল পরিবর্তন; কলকী তথৈবচ! সাদা কাপড় বেশী বিক্রয় হইল। ইহাকে শুধু লালের উপর লাগান হইল। এখন চানতারা বিষম ঠিক।

সাংবাদিকের মদ বোতল বদলায়।
ব্যবসায়ীর গাঁজা কলকী বদলায় না।

কলকী পরিবর্তন করিল না। ব্যবসায়ীরা ব্যবসা ঠিকই রাখিলেন। মার্চ মাসের পঁচিশ তারিখ পর্যন্ত একই প্রকারে জয় বাংলা বাংলাদেশের ম্যাপ আর শেখ মুজিবের ছবিতে কি পত্র কি পত্রিকা সব কিছুই যেন আওয়ামী লীগে আওয়ামীলীগকার হইয়া রহিল। ইতিমধ্যে কাপড় ব্যবসায়ীরা গাঢ় সবুজ লাল আর সোনালীতে ব্যবসায়ী রং ধরাইলেন। ইহাই সবুজ ইহাই লাল আর এইটাই কিনা সোনালী বলিয়া যেই সব রং-এর কাপড় জয় বাংলার নিশান বানাইতে বিক্রয় করিলেন সেই সকল রং আপনাকে অতি সহজে আমি প্রদর্শন করাইতে পারি। আপনি শুধু একটি বারের মত আমার কলকীতে খেঁচিয়া দম দিন অতঃপর অবলোকন করিলে দেখিবেন ব্যবসায়ী কর্তৃক সনাক্তকৃত তিনটি রং কি প্রকারে 'বেনীয়াসহকলা' সাজিয়া গিয়াছে এবং দর্জ্জি সাহেব নিশান বানাইবার জন্য পয়সা নিলেন না কিন্তু অন্যটির জন্য একটু বেশী ধার্য করিলেন। বাঁচিয়া যাওয়া বাকী সাদা টুকরা দিয়া টুপি বানানোর রেওয়াজও ইহারাই করিলেন এবং যেহেতু টুপির বুলেট ফিরাইবার কিঞ্চিৎ ক্ষমতা ছিল সেই হেতু হাকুমতের নিশান বানাইয়া আজুরা লইলে নিশান খর্ব হয় বলিয়া কিস্তি মার্কা বর্মের উপর দিয়াই খলিফা সাহেব আজুরা উঠাইতে লাগিলেন।

এইভাবে যতই দেখিবেন যতই বিশ্লেষণ করিবেন ততই আপনি দেখিবেন বঙ্গবন্ধু খাঁটি কথাই বলিতেছেন যে পরিবর্তনশীল জিনিষটি ছাড়িয়া দাও। কিন্তু কাহারা ছাড়িবে? ইহাদিগকে তো ছাড়ে না। তবে বঙ্গবন্ধু আমাকে এই ভূত ছাড়ানোর ওঝা নিয়োগ করুন বা নাই করুন অন্ততঃ তাঁহার হইয়া আমি কিছু ঝাড়-মন্ত্র পড়িতে চেষ্টা করিব।

অন্যথায় জিনিষটি কেবল বোতলই পরিবর্তন করিতে থাকিবে। যেমন দেখিয়াছি এককালের দুষ্কৃতিকারী কাদের সিদ্দিকীকে ধলাপাড়ার জংগে নিহত করিয়া যে অধ্যাপকটি এম.এন.এ হইয়াছিল তাহাকে সম্বর্ধনা জানাইতে যাহারা যেই সকল শব্দ প্রয়োগ করিয়া যেই সব দ্রব্য দিয়া বাধাইয়া যেই ভাবে নবনির্বাচিত এমএনএ -কে দিয়াছিল পুনরায় তাহারাই সেই সকল অর্থবহ শব্দাবলী প্রয়োগ করিয়া সেই আগের কাদের সিদ্দিকীকেও সম্বর্ধনা জানাইতেছে। আমি আর আপনাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিব না। আপনারা এইবার সজ্ঞানে উপলব্ধি করুন মদ কত নীচ আর বিশ্বস্ত গাঁজা কত অভিজাত। কে, কোথায়, কেমন করিয়া পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয় তা বুঝিয়া লউন তবে এই কথাটি নিতান্তই হক- কথা যে গাঁজা কলকী বদলায় না আর সেই জন্যই কিনা আমি গাঁজা ধরিয়াছি। জয়তু কলকী জয়তু!

আপনার চিঠি

জনাব সম্পাদক সাহেব,

প্রথমেই আপনার 'হক-কথা'র আবির্ভাবকে অভিনন্দন জানাই।

আল্লাহ 'হক-কথার' হায়াত-দরাজ করুন ইহাই কামনা করি।

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকাগুলি সরকারকে যেভাবে সমর্থন জানাইতে শুরু করিয়াছেন, যেভাবে প্রশংসা করিয়া যাইতেছেন, মনে হইতেছে সুহৃদ হিসাবে নহে, আড়ালে দুশমন সাজিয়া সাংবাদিক—ভাষ্যকারগণ এই অভিযান চালাইয়াছেন। তোষামোদ করিতে করিতে একজন নেতাকে স্বেচ্ছাচারী একনায়ক বানাইয়া ফেলা যায়। ইহার অনিবার্য পরিণতি পতন। বাংলাদেশ সরকার তাহা কি করিয়া কামনা করিতে পারেন। তবে হ্যাঁ, তোষামোদের রসে সিঞ্চিত হইবার খায়েশ লইয়া যদি শেখ-সৈয়দ-খন্দকার সাহেবরা ক্ষমতায় আসিয়া থাকেন তবে আমাদের কিছুই বলিবার নাই। আমাদের ভাবিতে আশ্চর্য লাগে এত বড় দেশপ্রেমিক একটি পার্টি ক্ষমতায় থাকা সত্ত্বেও কি করিয়া চোরাচালানে বাংলাদেশ ফতুর হইয়া যাইতেছে? আমরা বুঝিয়া উঠিতে পরিতেছি না কি করিয়া এত রক্তপাতের পরও আওয়ামী লীগ ও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী মানুষকে অযথা হয়রানি করিতে পারিতেছে, টাউট সাজিয়া অপরের সম্পদ আত্মসাত করিতেছে।

আবার মোনাজাত করি, আল্লাহ 'হক-কথার' মাধ্যমে সত্য ও ন্যায়ের বাণী জনসমক্ষে তুলিয়া ধরুন। ইতি—

আহম্মদ সোবহান

কালিহাতী, টাঙ্গাইল।

মুক্তিসেনা নিয়ে টালবাহানা কবে অবসান হবে?

বাংলার যে দামাল মুক্তিসেনারা নিজের জীবন তুচ্ছ করে দীর্ঘ নয় মাস সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জন্মভূমিকে মুক্ত করেছে, স্বাধীন বাঙলা বেতার প্রতিদিন যাদের প্রশংসায় উচ্ছসিত থাকতো, স্বাধীনতার পর যাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি প্রতিদিন বেতারে ধ্বনিত হতো, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তাদের ভবিষ্যৎ কি সত্যিই নতুন উষার আলোকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠবে নাকি হতাশা আর বঞ্চনার অন্ধকারে আবার তাদেরকে হাবুডুবু খেয়ে মরতে হবে এই জিজ্ঞাসাই আজ প্রতিটি মুক্তিসেনার মনে বিরাট প্রশ্ন আকারে দেখা দিয়েছে। একবার মিলিশিয়া, একবার গণরক্ষী বাহিনী অথবা জাতীয় রক্ষীবাহিনী ইত্যাদি নামের মারপ্যাঁচ এবং পরবর্তী পর্যায়ে অনেকের চাকুরী বাতিল প্রভৃতি সমস্যায় আজ তারা দিশাহারা। যে দেশে এখনো অজস্র দালাল, টাউটরা নির্বিঘ্নে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এমসিএ এবং বড় বড় দুর্নীতিবাজ কর্তারা

পারমিট-লাইসেন্স বাগিয়ে দু'পয়সা করে নিচ্ছে সেই দেশের বুকের রক্ত দিয়ে যারা স্বাধীনতা এনেছিল সেই সব মুক্তিসেনারা অনাহারে দিন কাটাবে, চাকুরী থেকে বঞ্চিত হবে, স্কুল-কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্যে নিম্নতম আর্থিক সাহায্য পাবে না, এই নির্মম সত্যকে গ্রহণ করার মানসিকতা হয়তো রণক্লান্ত মানুষগুলোর নেই। শুধুমাত্র মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেওয়ার অপরাধে এদের প্রায় সবারই ঘর-বাড়ী, সহায়-সম্পত্তি বর্বর পাক-সেনারা ধ্বংস করে দিয়েছে, বাপ-মা, ভাই-বোনদের নির্মমভাবে হত্যা করেছে। সব ত্যাগ হাসিমুখে স্বীকার করে নিয়ে এই দুঃসাহসী অভিযাত্রীরা যখন দেশকে স্বাধীনতার সুবর্ণতোরণে এনে দিল তখন এরা নিজেরাই হবে তার সুফল থেকে বঞ্চিত?

দেশ স্বাধীন হয়েছে মাত্র তিন মাস। দেশের অর্থনীতি এখন দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ। সব সমস্যার সমাধানই এই মুহূর্তে সম্ভব নয়—তবুও যেটুকু সম্পদ আছে তার সবটুকুই সেই পুরনো চোরাগলির পথে সুবিধাবাদীরা চেটেপুটে নিঃশেষ করবে আর দেশের জন্য যারা সর্বস্ব ত্যাগ করেছিল তাদের ধুঁকে ধুঁকে মরতে হবে, স্কুল-কলেজের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হতে হবে — এই দুঃখজনক ঘটনা, পরিক্রমা কবে বন্ধ হবে?

না-হক কাজের নজীর

গণতন্ত্রের যারা দাবীদার, বাক-স্বাধীনতার যারা প্রবক্তা—বাংলাদেশ সরকার— ক্ষেত্র বিশেষে আইয়ুব আমলের প্রশাসনিক তরীকা 'ফলো' করতে পারেন, এর নজীর প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।

স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশে অসংখ্য পত্র-পত্রিকা বের হয়েছে সত্য কিন্তু যেগুলো সর্বহারা জনতার বিপ্লবী চেতনাকে উজ্জীবিত করে তুলতে ব্রত, সে সবের উপর একে একে নেমে আসছে প্রশাসনিক প্রশ্ন। পত্রিকা প্রকাশনার অনুমতি দানেও নানাবিধ টালবাহানা করা হচ্ছে। শুধু একটি কৈফিয়ত, খোঁজখবর নেয়া শেষ হয়নি, যাচাই করবার কিছু রয়েছে।

আশ্চর্য, বিশ্বের 'আজবববাদের' সাফাই গাইলে বিনা অনুমতিতেই যা খুশী করা যায়, কিন্তু মানুষের কথা লিখবার আশঙ্কা থাকলে দফতরি রেওয়াজ বর্তায়।

সম্বর্ধনায় অভিভাবকের রক্ত ঝরে

শতাব্দীর অধিকাংশ কবির গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'রাজর্ষী' গল্পে অবুঝ শিশুমনে একটি প্রশ্ন তোলেছেনঃ এত রক্ত কেন বাবা? দেবতার পদপ্রান্তে কেন এত রক্ত ঝরে। বলি না দিলেই কি নয়? আমরা, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, দেবতারে প্রিয়জন করি। আবার প্রিয়জনকে দেবতা করি। কিন্তু তার সন্তুষ্টির জন্য দেবতারই অপছন্দসই কত কাজ করি। এমনকি রক্তও ঝরাই। একটি নিষ্পাপ মন তাই প্রলাপ বকে, এত রক্ত কেন বাবা?

স্বাধীনতা সংগ্রামী বীর যোদ্ধারা দেবতা নয়—অন্ততঃ মুসলিম সমাজে তা সাজবার কোন উপায় নেই। কিন্তু নিঃসন্দেহে তারা আমাদের প্রিয়জন। তাদের সন্তুষ্টির জন্যে তাদেরই অপছন্দসই কাজ আমরা শুরু করেছি। আর এ কাজ যারা অপছন্দ করবে না, তারা মানবপ্রেমিক স্বাধীনতা সংগ্রামী নয়। তাদেরকে আমরা খোশামোদী, তোষামোদী করে মনটাকে কুপমন্ডক করে দিচ্ছি। তাদেরকে ভয় করে দূরে ঠেলে দিচ্ছি। তাদেরকে সম্বর্ধনা দিয়ে নতুন করে মানুষের রক্ত ঝরাচ্ছি। আজ যদি রবীন্দ্রনাথ থাকতেন, নিশ্চয়ই কোন এক মাসুমের মুখে প্রশ্ন তুলতেনঃ এত রক্ত ঝরা সম্বর্ধনা কেন বাবা?

অন্য কোন জেলায় নাইবা গেলাম। টাঙ্গাইলের ১০৪টি ইউনিয়নের আর্থিক অবস্থা যে কি দাঁড়িয়েছে তা স্বচক্ষে দেখলেই শুধু বিশ্বাস করা যাবে। কৃষক, মজুর, জেলে, মাঝি, তাঁতী, কামার, কুমার এদের নিয়েই সমাজ। এমনিতেই তাদের অবস্থা কাহিল। সখ করে যে ছেলেকে স্কুলে কিংবা কলেজে পড়তে দিয়েছে তার আজ জোরপূর্বক আবদার—মুক্তিবাহিনীকে সম্বর্ধনা দেবার চাঁদা দিতে হবে। কোন কোন শিক্ষায়তনে শিক্ষকগণ কম খরচে এই সম্ভর্ধনা দিতে চেয়েছেন। কিন্তু ছাত্রনেতারা সগর্বে বলেছে, আমাদের সংসদের টাকা আমরা যেভাবে খুশী খরচ করব। কিন্তু হায়! কলেজে এসে তারা ভুলেই যায় কি হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে বাবা তার এই সংসদ ফি জুটিয়েছেন। তা থেকেই মওলানা মুহম্মদ আলী কলেজে দু'হাজার টাকা এবং সাদত কলেজে তিন হাজার টাকা ব্যয়ে রাম সম্বর্ধনা দেয়া হয়েছে। আজ দেশের যে অবস্থা, সত্যিই যদি দেশপ্রেমিক হত প্রথমেই তারা ভাবত সাধারণ মানুষের কথা—এই সম্বর্ধনার টাকায় যাদের অঢেল উপকার করা যেত। আজ কতজন কাপড়ের অভাবে ঘরের বাইরে পর্যন্ত আসতে পারে না। একটি কুঁড়ে ঘরের প্রত্যাশায় কতজন দিন গুণে। আশ্চর্য, দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধাও তাদের কথা ভেবে এই বাহুল্য খরচকে নিরুৎসাহিত করতে পারে না। এত দিন যত সম্বর্ধনা দেয়া হয়েছে, এত দিন যত অভিনন্দন জানানো হয়েছে এর দশগুণ হলেও তাদের পাওয়ার অনেক কিছু বাকী থেকে যায়। কিন্তু আমরা বুঝি না কেন তারা মানুষের অস্থিমজ্জার উপর দিয়ে এত সম্বর্ধনা খুশী মনে বরণ করে নিচ্ছেন।

ইংরেজী সাহিত্যের কবি রবার্ট ব্রাউনিং তার 'প্যাট্রিয়ট' কবিতায় বীরের দু'টি রূপই তুলে ধরেছেন। আমাদের তা ভুলে থাকলে চলবে না। প্রথমে যে বীরকে জনতা ফুলের মালা ছুঁড়ে দেয় দ্বিতীয় দশায় সেই জনতা একই বীরকে পাথর ছুঁড়ে মারে। কেন—এর জবাব এক বিন্দুতেই —মানুষ অন্তরে যা অপছন্দ করে বীর তাতেই যদি ইন্ধন যোগায়।

আসলের চেয়ে সুদ বেশী

কৃষকের পরিবারের জন্যে সরকার অনেক কিছুই ঘোষণা করেছেন। কিন্তু ভূমিহীন চাষীর জন্যে সরকার একরকম কিছুই করেননি। ফিরিস্তি টেনে লাভ নেই, রিপোর্ট তাদের দফতরে রয়েছে। দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে শুধু একটি বিষয়ের প্রতি। তা হল কো-অপারেটিভ মালটিপারপাস সোসাইটি থেকে যে সব চাষী ঋণ নিয়েছেন তাদের কি হবে?

সরকার কৃষি ব্যাঙ্কের ঋণ সম্পর্কে সুবিবেচনা করে একটি ঘোষণা জারী করেছেন। কিন্তু সমবায় ব্যাঙ্কের ঋণ সম্পর্কে কিছুই বলেননি। কৃষি ব্যাঙ্ক থেকে অবস্থাপন্ন কৃষক পরিবারগুলো ঋণ নিয়ে থাকেন। তাই তারা লাভবান হয়েছেন। কিন্তু সমবায় থেকে ঋণ যারা নেন তারা সাধারণতঃ ভূমিহীন অথবা স্বল্প ভূমির মালিক হয়ে থাকেন। আশ্চর্য, তাদের জন্যে সরকার আজও কিছু করলেন না। কয়েকটি নজীর থেকেই গোটা দেশের অবস্থাটা বোঝা যাবে।

টাঙ্গাইল থানাধীন বড় বাশালিয়ার জনাব আবদুল কুদ্দুস খান দু'শ টাকা কো-অপারেটিভ মালটিপারপাস সোসাইটি থেকে ঋণ নিয়েছিলেন। আজ এই টাকার সুদ এসে দাঁড়িয়েছে দু'শ দু' টাকায়। কেমন নিঃস্ব হলে এই চাষীকে সুদকেই আসলসম করতে হয়েছে তা সহজেই অনুমেয়। এমনি কান্দাপারার নাসিম উদ্দীন সাহেবের আসল ছিল দু'শত পঞ্চাশ টাকা, সুদ হয়েছে দু'শত আটাত্তর টাকা। সেকাম আলী সাহেবের আসল ছয় শত পঞ্চাশ টাকা আর সুদ পাঁচ শত পঁচাশি টাকা।

বাংলাদেশের সরকার কাবুলীর খাসলত পরিত্যাগ করে এ সব চাষীর জন্যে কি করবেন, আমাদের জানা নেই।

'হক-কথা' আগামী সংখ্যার
বিশেষ আকর্ষণ
মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী
কর্তৃক লিখিত নিবন্ধ
অহিংসা ও বিপ্লব

স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম
সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
"নতুন দেশ"
আগামী ২৬শে মার্চ
যশোর থেকে
পুনরায় আত্মপ্রকাশ করছে

মুরিদের দরবার

আধ্যাত্মিক জীবনের বিকাশ

সৈয়দ ইরফানুল বারী

কয়েকটি কথা ও বিষয়কে স্বতঃসিদ্ধ স্বরূপ ধরিয়া লইয়া জীবন শুরু করিলে শুধু ঝামেলাই চুকিয়া যায় না, কাজের কাজ কিছু করাও যায়। অনেকেই জীবনের শেষের দিকে তাহা উপলব্ধি করিয়া আফসোস ও তাড়াহুড়া করেন যদিও স্বতঃসিদ্ধ বিষয়গুলির সাথে যৌবনের শুরুতেই পরিচিত হওয়া যায়। জীবন সম্পর্কে যাহারা গভীর ভাব পোষণ করেন একমাত্র তাহারাই সেইগুলির সন্ধান পাইয়া থাকেন। কিন্তু সন্ধান ও উপলব্ধি এই দুইয়ে বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান। আল্লাহ যাহাকে মনোনীত করিয়াছেন তিনিই একমাত্র এহেন উপলব্ধির স্বাদ পাইয়া থাকেন।

স্বতঃসিদ্ধ ধারণাগুলিকে পাঁচটি স্তরে ভাগ করা যায়। সেইগুলি নিম্নরূপ ঃ

(১) জীবনটা হালকা কিছু নয়। ইহার আসল রূপ গভীর। তাই জগৎ ও জীবনকে গুরুত্বের সহিত যাচাই করিতে হইবে। তবে হ্যাঁ, সংসার জীবনে হালকা মুহূর্ত আসিয়া থাকে। রসবোধকে ভাব ও বিষয় বিশেষে ফুটাইয়া তুলিতে হয়। কিন্তু তখনও অন্তঃদৃষ্টিটা সেই গভীরতার দিকে নিবদ্ধ রাখিতে হয়।

(২) ভাব ও বিষয়ের গভীরতার প্রতি আকর্ষণ ও মনোযোগ লইয়া কেবল মৌলিক উপাদানে পুষ্ট নির্দিষ্ট সংখ্যক বই পড়িতে হয়। পড়াশুনা চলাকালীনই একসময় অন্তরাত্মা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জন্য পাগল হইয়া উঠে। কারণ, প্রবল মৌলিকতার মধ্যেও পাঠকের নিজস্ব একটি প্রচণ্ড উপলব্ধি মাথাচাড়া দিয়া উঠিবার প্রয়াস পায়। তাহাতে মন তো প্রশান্ত হয়ই না বরং বেসামাল হইয়া পড়ে। মন চায় তখন ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ আর প্রেরণা।

(৩) এমতাবস্থায় মানুষটিকে খুঁজিয়া ফিরিতে হয়, এমন একজনকে যার সান্নিধ্যটুকুই উত্তর ও প্রেরণা পাইবার জন্য যথেষ্ট। সুফীর সহব্বতে পরিমিত সমাধান পাইলেও প্রকৃত সন্ধানীর মন তখন উদভ্রান্ত হইয়া পড়ে। এই ভাবে পীর কিংবা গুরুর সংসর্গ পথিককে পথভ্রষ্ট হইয়া যাওয়ার আশঙ্কা হইতে রক্ষা করে মাত্র। কিন্তু খাস মুরিদ বা শিষ্যের অন্তরাত্মায় তোলপাড় চলিতেই থাকে।

(৪) এই স্তর কাটাইয়া জীবনবোধ গভীরতর করিবার জন্য দরকার সফরের। সেই সফর হইতে হইবে নিঃস্ব অবস্থায়, একাকী। কিন্তু সফল সফর মনকে আরও ব্যাপকতার দিকে টানিয়া লইয়া যায় এবং পথিকের অন্তরাত্মাকে নির্জন বাসের জন্য পাগল করিয়া তোলে তখন

দুনিয়ার নিম্নতম ঝামেলাও যতটুকু এড়ানো সম্ভব সেই অনুপাতে দৈনন্দিন জীবন কাটাইয়া প্রতিটি মুহূর্তে গভীর চিন্তায় থাকিতে হয়। এই স্তরে সাধক এলেম অর্জনে ক্ষান্ত দিয়া ইবাদতের পথে মশগুল হইয়া পড়ে।

(৫) নির্জনবাসে ধ্যানই পথিককে প্রশান্তি দিয়া থাকে। কিন্তু সেই প্রশান্তি একান্তই সাধকের সার্বিক গঠন গড়ন বৈশিষ্ট্য অনুপাতে হয়। তাই এক হাজার মানুষ যদি উপরোক্ত স্তরগুলি অতিক্রম করে তবে তাদের মধ্যে প্রশান্তি কেমন থাকলে এক হাজার রকমের প্রশান্ত মানুষ জন্ম নিবে। এই স্তরে পরে হুকুম পাইলে সাধককে আবার সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয়

গভীর জীবনবোধ, মৌলিক পড়াশুনা, সুফীর সান্নিধ্য, উদভ্রান্ত সফর, নির্জন বাস ও ধ্যান আধ্যাত্মিক জীবন বিকাশে একই চাবিকাঠি

তখন হইতে যাহা হাসিল হইয়াছে তাহার প্রভাব, প্রভাবান্বিত মূল্যবোধ সমাজ জীবনে প্রয়োগ করিয়া মানুষের উপকার করিয়া যাইতে হয়। এককথায় হক্কুল এবাদ মিশনে জীবনটা কাটাইতে হয়।

যিনি উপরোক্ত স্তরগুলি কাটাইয়া হক্কুল এবাদে নামিয়াছেন তাহার দুইটি গুণ অপরিসীম প্রবল থাকিবে। প্রথমতঃ তিনি অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সচেতন হইবেন। এবং তজ্জন্য তিনি হইবেন নির্ভীক ও সবকিছুতে পর্যবেক্ষণক্ষম। সত্য ন্যায়ের জন্য তিনি দুনিয়ার সকল শক্তির মোকাবিলা করিতেও প্রস্তুত থাকিবেন। কোন কারণেই কাজে ও কর্মে খোশামোদী কিংবা তোষামোদী করিবেন না। আর প্রতিটি বিষয়কে এমনভাবে পর্যবেক্ষণ করিবেন যে মস্তিষ্ক ও হৃদয় এই দুইয়ের আয় পাইয়াই তিনি স্বতঃস্ফূর্ত হইয়া কাজে নামিবেন।

দ্বিতীয়তঃ তিনি হইবেন চরিত্রবান। তাহার সমুন্নত চরিত্র তাহাকে করিবে (ক) সম্পূর্ণ নিরহঙ্কারী (খ) অতিশয় বিনয়ী (গ) পুরাপুরি মোনফেকীমুক্ত আর (ঘ) একেবারে প্রশংসাবিমুখ। মানুষটি এমনভাবে কাজ করিয়া যাইবেন যেন সব কয়টি কাজ করিবার জন্য দুনিয়ায় আসিয়াছেন। ইহাতে তাহার কৃতিত্ব নাই। কেউ তাহার উপর কাজ চাপাইয়াও দেয় নাই। জন্মগতভাবেই তিনি সব দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়াছেন এবং তাহা পালন না করিয়া যেন উপায় নাই। কেহ তাহার প্রশংসা করিলে তিনি বিস্মিত হইবেন, দুঃখিত হইবেন এবং লজ্জিতও হইবেন। তাহার এইসব হওয়া একান্তই আন্তরিক ও স্বতঃস্ফূর্ত।

আর একটি বক্তব্য পেশ না করিলেই ভাল হইত। কিন্তু কথা শেষ করিতে লিখিতেই হয়। তাহা হইল–হক্কুল এবাদে নিয়োজিত মানুষটি গোপনে–অতি গোপনে অদৃশ্য একজনের সাথে সময় পাইলেই প্রেমালাপ শুরু করিয়া দেন। কত করিয়া যে তিনি তাঁহার দরবারে ভালবাসা নিবেদন করেন তাহার ইয়ত্তা নাই। এই নিবেদনে ফুটিয়া উঠে আত্মসমর্পণের বৈশিষ্ট্য, না পাওয়ার বেদনামিশ্রিত ভীতি এবং সঙ্গে সঙ্গে আত্মসন্তুষ্টি প্রসূত এক অনবদ্য ঔদাসীন্য। ইহাই হইল হক্কুল্লাহ্ আদায়করণ। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার বাহ্যতঃ পরস্পর বিরোধী হইলেও আল্লাহ্র হক আদায়ের সাধনা বান্দার হক আদায়ের সংগ্রামে প্রেরণাই যোগাইবে, বৈরাগ্য নহে। অবশ্য ইহাও সত্য, হক্কুল্লাহ্ আদায়ে একটি চিরন্তনী মোকাম বা ঘাঁটি আছে যাহা অতিক্রম করা ইহজীবনে সম্ভব নহে। তাহা হইল ভালবাসার স্বীকৃতি তথা আল্লাহ্র দীদার লাভ। এই স্বীকৃতি পাওয়া-না-পাওয়ার বেদনা থাকে বলিয়াই ভীতিসঞ্জাত একটি অনিরাপত্তাবোধ বরাবর সালেকের অন্তরে বিরাজ করে। পুরাপুরি ইহার শিকার হইয়া গেলেও আবার সর্বনাশ।

ইহাতেও নৈরাশ্য চাপিয়া বসে। তাই মানুষটির অন্তরে থাকে সন্তুষ্টির উপলব্ধি এবং আশা রাখার ইচ্ছাশক্তি। এতসব আসলে তাহার কিন্তু ভাল লাগে না। সে প্রতিটি মুহূর্তে মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িতে প্রস্তুত থাকে। কিন্তু তাহাতেও পরম প্রেমিকের মর্জির উপরই নির্ভর করিতে হয় যেমনটি সকল ক্ষেত্রে তাঁহারই ইচ্ছা কায়েমের প্রত্যাশা করিতে হয়। হায়! কেউ বোঝে না, সেই সাধক পুরুষ, সেই মহান পথিক যেদিন আল্লাহ্‌র দরবারে যাওয়ার ডাক শুনিতে পান সেইদিন তিনি কত আনন্দ বোধ করেন!

পাঠকের মনে যদি প্রশ্ন জাগিয়া থাকে হক্কুল্লাহ ও হক্কুল এবাদ আদায়ে লিপ্ত এমনি মহাপুরুষ এই দুনিয়ায় কোথায় পাওয়া যাইবে তবে আমার শুধু অনুরোধ বাংলাদেশের একটি গ্রামের খোঁজ করুন যার নাম সর্বত্র সব চাইতে বেশী উচ্চারিত ও উল্লিখিত।

আমার জবাব

আবু তাহের

ঘাটাইল

আপনি পাকিস্তান আন্দোলন করিয়াছিলেন ইহা যতদূর সত্য বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করিয়াছেন ইহাও ততদূর সত্য। কিন্তু আজ যে সত্য উপলব্ধি করিয়াছেন ২৫ বৎসর আগে তাহা অনুধাবন করিতে পারিলে এত রক্তপাত হইত না। আপনি তজ্জন্য অনুতপ্ত নন কি?

উত্তর— আমি মোটেই অনুতপ্ত নই। কারণ, ২৫ বৎসর পূর্বে যে রাজনীতিতে পাকিস্তান আন্দোলন করিয়াছিলাম আজও তাহাই করিতেছি। সেই রাজনীতির ভিত্তি ছিল অর্থনীতি, ক্ষমতার টোপ নহে। হিন্দু জমিদার, মহাজন, জোতদার, প্রভৃতি শ্রেণী গরীব মুসলমান কৃষক-মজুরদের উপর যে শোষণ নির্যাতন চালাইয়াছিল ইহারই প্রতিক্রিয়ায় শোষণমুক্তি আন্দোলনের প্রতীক স্বরূপ আমরা পাকিস্তান আন্দোলন করি। কিন্তু দেখা গেল শোষকের কোন ধর্ম নাই। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর শোষণ তো গেলই না বরং শোষকের চেহারা বদলিল মাত্র। গরীব আরও গরীব হইল। ধনী আরও ধনী হইল। তাই আবার অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য স্বাধীনতা কায়েম করিয়াছি। রাজনৈতিক চেতনা ও উপলব্ধি নিঃসন্দেহে সমসাময়িক পরিবেশের আলোকে গৃহীত হয় এবং যদি তাহাতে অন্ততঃ তখনকার জন্য হইলেও সত্য ও ন্যায়ের পথে মানুষের কল্যাণের সম্ভাবনা নিহিত থাকে তবে সেই আন্দোলন ও জাগরণ কোন না কোন অর্থে স্বার্থক।



সভ্যতার অন্তরালে

॥ মোহাম্মদ হোসেন ॥

আমরা আজ সভ্য জগতের মানুষ বলিয়া পরিচিত। কিন্তু সভ্য মানুষ অর্থে যাহা বুঝায় আমরা কি তাহাই হইতে পারিয়াছি বা হইতে চলিয়াছি —ইহা একবার ভাবিয়া দেখা দরকার। সভ্য অর্থে কথাবার্তা ও চালচলনে সভ্যতাকেই বুঝায় না। কর্মের ভিতর দিয়া সভ্যতার প্রকাশ না পাইলে তাহাকে কখনো সভ্য-ভদ্র বলা যায় না। সভ্য মানেই হইতেছে ভদ্র বা সুন্দর। আর ভদ্র বা সুন্দর মানুষ অর্থে চরিত্রহীন নয় বরং চরিত্রবান মানুষকেই বুঝায়।

দুনিয়ার প্রতিটি লোকই নিজ নিজ কর্মের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে চায়—প্রকৃতি যেমন বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্নরূপে পৃথিবীকে আমাদের নিকট পরিচিত করিয়া তোলে

মুহরম ঃ বাংলাদেশ

আমীর খসরু

নিষ্ঠুর ইতিহাস আবার মেলিয়া ধরে
সীমারের পিশাচ মূর্তি মনের অঙ্গণে
আর দেখো ফোরাতের কূল ... রক্তভেজা বালুকার পর।
ধনুকের পিয়ালা তিয়াস মেটায় ... শিশুর আর্তনাদ
সন্ধ্যার আকাশতলে ভীড় জমে ম্রিয়মান আঁধার
সত্যের পাখনা মেলে ছিন্নশির
দুর্ভেদ্য সুদূরে মিলায়।
এবার বাংলার মানুষ চিনেছে এজিদ সীমার ঃ
বাংলার বুড়িগঙ্গা, ধলেশ্বরী, মেঘনার কূলে, শিবিরে, বধ্যভূমে
হোসেনদের কালচে রক্ত শহরের পীচঢালা পথে।
বাংলাদেশের মানুষ মুহরম পালন করছে হাজার বছর।
এজিদ সীমার পামরের ইতিহাস কথা কয়
ইতিহাস বোবা নয়।
কিন্তু এবার বাঙালী ইতিহাস পড়ে নয়
নিজেরই জীবন্ত ইতিহাস হয়ে
উপলব্ধির দ্বার খোলে স্বাগতঃ জানায় মুহরম

তেমনই সংসারেও মানুষ চায়—তাহার বিভিন্নমুখী কর্মের ভিতর দিয়া তাহার পরিচয় ফুটিয়া উঠুক। জগতের প্রতিটি মানুষের মনই নিজ নিজ প্রতিষ্ঠার জন্যে লালায়িত। কিন্তু মানুষের আত্মপরিচয় যে তাহার কর্মেই ফুটিয়া উঠে, তাহার চরিত্রই যে তার প্রকৃত পরিচয় বহন করিয়া থাকে ইহা যেন আজ আমরা ভুলিতে বসিয়াছি।

আর একটি বিষয় আজ লক্ষণীয় হইয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমান সভ্য জগতের অধিকাংশ লোকই ভদ্রতার মুখোশ পড়িয়া নানারূপ ভাবে নিজ নিজ কর্মের সুনাম প্রচার করিয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহাদের অন্তরে রহিয়াছে অন্যরূপ দূরভিসন্ধি। যাহারা তাহাদের সেই ভদ্রতার অন্তরালে প্রবেশ করে নাই— যাহারা তাহাদের নৈতিক চরিত্রের সাথে প্রত্যক্ষভাবে পরিচয় লাভ করিতে সক্ষম হয় নাই— তাহারা তাহাদিগকে মনে-প্রাণে ভাল মানুষ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। নেতা বলিয়া স্বীকৃতি দিয়াছে। বন্ধু বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছে। কিন্তু কার্যসিদ্ধির পর বন্ধুজী যখন তাহাদের দিকে মুখ ফিরাইয়াও তাকায় না তাহাদের ধারে কাছে যাইতে সাহস পায় না— সভ্যতার জাঁকজমক গাড়ী-বাড়ী দারোয়ান দেখিয়া গেটের বাহির হইতেই তাড়া খাইয়া ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হয়— তখনই কেবল তাহারা বুঝিতে পারে, বিশ্বাসী বন্ধু কিভাবে তাহাদের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিল, কিভাবে তাহাদের দ্বারা তাহাদেরই কর্মকর্তা হইয়া ভাল মানুষীর খোলশ বদলাইয়া অন্যরূপ ধারণ করিল। প্রকৃতির নিত্যনৈমিত্তিক লীলাখেলার সহিত বুঝি বা মানব মনেরও কিছুটা সাদৃশ্য রহিয়াছে—তাই তো ক্ষণিকে ক্ষণিকে মানুষের মনের এত পরিবর্তন হয়। প্রকৃতির প্রতিকূলতা মানুষের উপর নির্মম আঘাত হানিয়া যেমন নিষ্ঠুরভাবে পরিহাস করিয়া থাকে সেইরূপ সমাজের ধুরন্ধর জনগণের দরদী সাজিয়া কার্য সিদ্ধির পর নির্মমভাবে মুখ ফিরাইয়া থাকে। বিশেষ করিয়া পৃথিবীর সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতেই এইরূপ প্রতিক্রিয়া বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইতেছে। আর তাহাদেরই সাহচর্য পাইয়া সেই দূরভিসন্ধির বিষের ক্রিয়া বিশ্বের প্রায়

অধিকাংশ রাষ্ট্রগুলির রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়াছে।

জ্ঞানী-গুণী বিজ্ঞ চরিত্রবান ব্যক্তির সাহচর্য মানুষকে অসুন্দর পথ হইতে রক্ষা করিয়া সুন্দর পথের সন্ধান দেয়—তাহার মধ্য হইতে অসৎ-অসাধুতা বিদুরিত করিয়া তাহাকে সততা, সাধুতা, ন্যায়পরায়ণতা ও সর্বোপরি সত্যের প্রতি দৃঢ় করিয়া তোলে। কিন্তু যে দেশের অধিকাংশ লোকই চরিত্রহীন, সে দেশের মানুষের মন কখনো স্বতঃস্ফূর্তভাবে সত্যের প্রতি উদগ্রীব হইয়া উঠিবে না তাহারা যদি নিজে নিজে সংশোধিত না হয় তবে শুধু নীতি কথা শুনাইয়া সংশোধিত করা যাইবে না। সত্যের বাণী তাহাদের হৃদয়ের রুদ্ধদ্বারে আঘাত খাইয়া ফিরিয়া আসিবে। অপমানিত ও অবহেলিত হইবে সত্য প্রচারক। তাহার সকল প্রকার প্রচেষ্টা, যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া মিথ্যাকে বরণ করিয়া লইবে। কারণ, বহুদিন যাবৎ মিথ্যার আস্বাদ পাইয়া উহারা যেন ইহার সহিত মিশিয়া গিয়াছে। দুধ আর পানি একত্রিত হইলে উহা যেমন সহজে পৃথক করা যায় না— নিরীক্ষার যন্ত্র ছাড়া ধরাও যায় না দুধে পানি আছে কিনা, সেই রূপ আজকের সমাজের মানুষ সত্যকে মিথ্যার মধ্যে ডুবাইয়া রাখিয়াছে। কাজেই সত্য-মিথ্যাকে স্বতন্ত্র করিয়া উপলব্ধি করা সহজ নহে। তাই আমরা নিজেরাই যদি নিজেদিগকে মিথ্যার সংক্রামক ব্যাধি হইতে মুক্ত না করি —তাহা হইলে দুনিয়ার কোন শক্তিই আমাদিগকে সঠিক পথে উদ্বুদ্ধ করিতে পারিবে না।

ইহা অতি সত্য কথা যে, পূর্ব্ব হইতেই যদি আমরা আত্মসচেতন হইয়া প্রকৃত দরদী বন্ধুর খোঁজে নামিতাম, সাম্রাজ্যবাদী শোষক শ্রেণীর দেশগুলির সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিতাম, তাহা হইলে পশ্চিমা গোষ্ঠীর পৈচাশিক নির্যাতন শাসন ও শোষণের প্রভাবে পূর্ব্ব পাকিস্তানের অস্তিত্ব বিলোপ হইত না।

পরিতাপের বিষয় সাম্রাজ্যবাদী শোষকগোষ্ঠী আমাদের চরিত্রের উপর যে কলংকের কালিমা মাখিয়া দিয়াছে তার প্রতিক্রিয়া আজ সমাজের সকল স্তরের মানুষের মধ্যেই কম-বেশী মূর্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। দেশের ভবিষ্যৎ অগ্রগতির কর্ণধার হইল ছাত্রসমাজ। ছাত্র-ছাত্রীদের সততা-সাধুতা ও কর্ম তৎপরতার উপরই নির্ভর করে দেশের ভবিষ্যৎ গৌরব ও সমাজের সকল স্তরের উন্নতি। ছাত্র-ছাত্রীদের উন্নতি নির্ভর করে সুশিক্ষার উপর। কিন্তু মর্মান্তিক দুঃখের বিষয় আজ সেই ছাত্র সমাজেরই রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি ঢুকিয়াছ। তাহাদের মধ্যে অসাধুতার জঘন্যতম প্রবৃত্তি মাথাচারা দিয়া উঠিয়াছে। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ রহিয়াছে—যার ফলে ছাত্র—শিক্ষক সকলেই দুর্নীতির গ্রাসে পরিণত হইয়াছে। যে দেশের ছাত্র সম্প্রদায় সুশিক্ষার প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া শুধু ডিগ্রীর সার্টিফিকেট পাওয়ার আশায় যেন-তেন প্রকারে জ্ঞান আহরণ করিয়া থাকে, সে দেশের অগ্রগতি যে কি করিয়া উদ্যম গতিতে আগাইয়া যাইবে তাহা ভাবিয়াই পাই না। অসাধুতাকে বরণ করিয়া নিলে যে সৎপথে থাকিবার স্পৃহাটি চিরদিনের জন্য নির্জীব হইয়া পড়ে উহা যেন আজও আমাদের অজ্ঞাতই রহিয়াছে। তাই সন্তানের যেমনি ইচ্ছা পাশ করিলেই আমরা সন্তুষ্ট থাকি। একবার ভাবিয়াও দেখি না তাহাদের কি সর্বনাশই না হইল—বিচার করিয়াও দেখি না সুশিক্ষার নামে কি কুশিক্ষাই না সারা জীবনের জন্য তাহারা সঞ্চয় করিয়া লইল।

আমাদের এই উদাসীনতার জন্যই আজ আমরা চারিদিক হইতে সমস্যার সম্মুখীন। সকল কিছুতেই যেন আমাদের ভাসা-ভাসা দৃষ্টি। সমস্যার শুরুতেই যদি আমরা সুপরিকল্পিত-সুনিয়ন্ত্রিত পন্থার অবলম্বন করিতাম তাহা হইলে আজ দেশ অর্থনৈতিক দিক দিয়া স্বয়ংসম্পূর্ণ হইতে পারিত।

আমরা বাংলাবাসী প্রায় প্রতি বৎসরই প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পতিত হই। তন্মধ্যে বন্যা সমস্যাই আমাদের চরম সমস্যা। ইহাই অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর চরম আঘাত হানে। চাষীদের ভিটা ছাড়া করে। অনাবৃষ্টিও তো কম মসিবত আনে না। কিন্তু আজ পর্যন্ত ইহার সুষ্ঠু সমাধান হইল না। কতবার কত সরকারী পরিকল্পনা হইয়াছে, বন্যা সমস্যা লইয়া জল্পনা-কল্পনা চলিয়াছে — সকলই সিজন ফ্লাওয়ারের মত ঝড়িয়া পড়িয়াছে, ক্রুগ মিশনের রিপোর্টের মত সরকারী ফাইলের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়াছে। কিন্তু এমনটি কেন হয়? ঐ এক কথা আমাদের চরিত্রের উপর সাম্রাজ্যবাদীদের মনোভাব ছায়াপাত করিয়াছে।

স্বাধীন জাতি হিসাবে আমরা নিজেদের বুদ্ধি-সুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া চলিতে অভ্যস্ত নই। সাম্রাজ্যবাদী শোষকগোষ্ঠীর নিকট হইতে আমরা অর্থের সঙ্গে অর্থ ব্যয়ের বুদ্ধিও ধার করি — তাই তো আমাদের এই দশা।

আমরা সভ্য ও ভদ্র হইয়াছি কিন্তু ভদ্রতার অন্তরালে আসল বস্তু বলিতে কিছুই নাই — সকলই কৃত্রিম। আমাদের অন্তরে ব্যক্তিগত স্বার্থের অনিবার্য আকর্ষণ রহিয়াছে। ইহা আমাদিগকে পথ ভ্রষ্ট করে।

তাহা হইলে কি করিয়া ভাল হইব? ভাল ও সুন্দর হইবার একটি মাত্র পথ আমাদের সম্মুখে উন্মুক্ত রহিয়াছে। তাহা হইতেছে মওলানা ভাসানীর মত ও পথ অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা ছাড়া আমাদের মুক্তি নাই — জাতির কল্যাণ নাই। একমাত্র ইহার মাধ্যমেই আমরা দুর্নীতির অবসান ঘটাইয়া শোষণমুক্ত সর্বজনীন কল্যাণকর সমাজ ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে পারি।

নিষ্ঠুর বাস্তব

॥ মুজিবুর রহমান ॥

স্বপন দেখেছি কত রঙ্গীন দিনের
আর নতুন নতুন পৃথিবীর।
এখন বুঝেছি জীবন স্বপনও নয়, অলিকও নয়–
কঠিন বাস্তব রূঢ়।
মানুষেরা আসে কারখানা বিশ্বে
নতুন নতুন মেশিন হবার জন্যে।
চাঁদের চাঁদিনী আর একমুঠো নীলাকাশ
শরতের নক্ষত্র কুসুম বাসন্তী পলাশ
বর্ষার হিজল কদম
চিমনির কালো ধোঁয়ায় ফ্যাকাশ কফিন ঃ
স্বপনেরা কর্পূর বিলীন...।
মেশিনের চাকা ঃ কড়কড়-ঘর্ঘর
মনের আঙিনায় একরাশ কালি-রুদ্ধ অবসর
নিষ্ঠুর বাস্তব!!!

আসন্ন মহাদুর্ভিক্ষ রোধ করুন

—মওলানা ভাসানী

এই জীবনে কত মিছিল দেখিয়াছি। মানুষ আদর্শের জন্য মিছিল করে। মানুষ দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়া দুর্নীতি বিরোধী মিছিলে শামিল হয়। সব মিছিলের জবাব বক্তৃতায় দেওয়া যায়। কিন্তু ভুখা মিছিলের ভাত ছাড়া কোন জবাব নাই। সেই মিছিলে যে ক্ষুধার আগুন জ্বলে তাহা 'জমজমের' পানিও নিভাইতে পারে না।

স্বাধীনতার পর বাংলার গ্রামে-গঞ্জে অভুক্ত জনতা ভীড় জমাইতেছে। আশা পাইয়াছে, রিলিফের টাকা আসিতেছে। আঠারটি জেলার খবর বাদই দিলাম। টাঙ্গাইলের রিলিফের টাকা আসিয়াও কাজ হয় না। তিন টাকা

রোজে যেখানে কামলা খাটাইতেই হইবে, টাকা পাঁচসিকায় সেই কাজ উদ্ধার করা হইতেছে। এর মধ্যেও রহিয়াছে ব্যবস্থাপনায় স্বেচ্ছাচারিতা। জনগণের নির্বাচিত সরকারের আমলেও যদি এমনটি হয় তবে এ দেশের কৃষক, মজুর, জেলে, মাঝি, তাঁতী, কামার, কুমার কোথায় যাইবে, তাহা আমি ভাবিয়া পাই না। ইংরেজ আমলে জমিদার, মহাজন, খান বাহাদুর, রায় সাহেবরা যাহা করিয়াছেন পাকিস্তান আমলে চেয়ারম্যান, মেম্বার, অফিসার ও তমঘাধারীরা তাহাই করিয়াছেন। আমি সংগ্রাম করিয়াছি তাহাদের বিরুদ্ধে। সংগ্রাম করিয়াছি সেই মানুষের জন্য যারা আজও ভুখা মিছিলে ধুঁকিয়া মরে। সংগ্রামের ফলে শোষণের কায়দা বদলিয়াছে মাত্র কিন্তু শোষণ দূর হয় নাই। ঠিক তেমনি শোষিতের সংগ্রাম রূপান্তরিত হইয়া প্রত্যক্ষ মোকাবিলায় রূপ ধারণ করিয়াছে। ১৩৪৯ সালের দুর্ভিক্ষে কত মানুষকে না খাইয়া মরিতে দেখিয়াছি। কলিকাতার ফুটপাতে কত কংকালসার দেহ পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছি। কিন্তু খাবার দোকানে লুট হইবার তেমন কোন খবর শুনিতে পাই নাই। সরকারের স্মরণ রাখা উচিৎ মানুষের সেই ক্ষুধা থাকিলেও সেদিনের সমাজ-চরিত্র নাই। মানুষ এখন বুঝিতে পারিয়াছে, সর্বনাশা দুর্ভিক্ষেও এমন একটি শ্রেণী থাকে যাহাদের খাওয়া পড়ার কোন অসুবিধা হয় না। এখন হইতেই দুর্ভিক্ষ ঠেকাইবার ব্যবস্থা গ্রহণ না করিলে' ৪৯ সনের পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে এই নিয়ন্ত্রণবর্হিভূত অরাজকতা দেখা দিবে। সরকারের উচিৎ, ভুখার মিছিলে রক্ত না ঝরাইয়া প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্ত নগণ্য সাহায্যে অভুক্ত জনতাকে ক্ষিপ্ত না করিয়া সকল দল ও প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় পরিস্থিতি আয়ত্তে লইয়া আসা।

বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের শাখা

কালিহাতী, ৮ই মার্চ—গত ৭ই মার্চ কালিহাতী থানার রাজাফৈরে বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের আঞ্চলিক শাখা গঠিত হইয়াছে। জনাব মোবারক আলী ও জনাব আবুল মনসুর যথাক্রমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছেন। ঐদিন বিকালে রাজাফৈর আঞ্চলিক শাখার অফিস উদ্বোধন করেন টাঙ্গাইল জেলা বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের সভানেত্রী হাজেরা সুলতানা।

ইহা কি সত্য?

॥ ৯॥

মদারু সদয় ইয়াহিয়া আমলেই দুর্নীতির অভিযোগে যাদের চাকুরী খতম হয়েছে তারা কেমন অফিসার তা সহজেই অনুমেয়। এদের নিয়ে একটি ভাবধারাও দাঁড়িয়ে গেছে—থ্রি নট থ্রি। এই থ্রিদের বেশ ক'জন আওয়ামী আমলে 'হৃত গৌরব' ফিরে পেয়েছেন। কৃষি বিভাগীয় 'নায়েবে—শেখ' এমনি একজন। তিনি বঙ্গদেশীয় জঙ্গলের চীফ কনজারভেটর থাকাকালে যাচ্ছেতাই করে থ্রি নট থ্রি কোম্পানীর মেম্বার হন। অবশ্যি এর আগেও দুর্নীতির অভিযোগে তিনি কয়েকবার সাসপেন্ড হবার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। এত সবের মধ্যেও তাঁর একটি মূল্যবান গুণধন আছে যার ধারে সব কেটে যাচ্ছেন। তাঁর অর্ধাঙ্গে এমসিএয়ত্ব রয়েছে।

॥ ১০॥

এবারেও কৃষি সমাচার। টাঙ্গাইল জেলার কৃষি বিভাগীয় অফিসাররা বলেন, 'সরকার অঢেল সার দিচ্ছেন। দশ টাকা মণ দরেই চাষীদের পাবার কথা। কিন্তু গুদামের চাবি তো আমাদের হাতে নেই।' কালিহাতীর (টাঙ্গাইল জেলা) সেচ বিভাগীয় কর্তারা বলেছেন, 'গুদামে সার আছে'। কিন্তু চাবি তো বাঘা ভাই— এমসিএ সাবের কাছে। অবশেষে নির্ধারিত মূল্য দশ টাকা মণ দরে চাষী সার পায় না। তাদেরকে বাজারে যেতে হয়। সেখানে ৪০ টাকা মণ দরে সার বিক্রি হয়। আশ্চর্য দেশপ্রেম! এমসিএ সাহেবরা নাকি সোনার বাঙলা গড়বেন। রাতের অন্ধকারে গুদাম থেকে সার চুরি করে নিচ্ছেন আর চারগুণ দামে খোলা বাজারে বিক্রি করছেন।

॥ ১১ ॥

জামালপুরের একজন এমসিএ সাহেব স্বাধীনতা লাভের পর মুক্তিযোদ্ধা সেজে গিয়েছিলেন। চাষী ও ব্যাপারীদের হাজার হাজার মণ পাট তিনি সশস্ত্র অভিযান চালিয়ে সংগ্রহ করে ষাট টাকা মণ দরে আসামে বিক্রি করেন। জামালপুরেরই একটি সরকারী গুদামে বিভিন্ন মহাজনের ছয়শত মণ তামাক পাতা মজুদ ছিল। উক্ত এমসিএ সাহেব তাও জোরপূর্বক বিক্রি করে সম্পূর্ণ টাকা আত্মসাত করেছেন। সম্প্রতি তাঁর দ্বারা যে আওয়ামী লীগের এমসিএ-র-সুলভ কাজটি হয়েছে তা হল রিলিফের মাত্র ছয়শত মণ গম সাফল্যের সাথে উধাওকরণ।

॥ ১২ ॥

টাঙ্গাইল জেলার জনৈক এমসিএ চৌধুরী মালঞ্চের (টাঙ্গাইল থানা) কুখ্যাত ডাকাত মোস্তা সরদারের নিকট থেকে মাত্র তের শত টাকা ঘুষ গ্রহণ করে তাকে ভারতে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন। আয়নাপুর বাজারে লুটতরাজকালে এই ডাকাত ধরা পড়েন। জনৈক মুক্তিযোদ্ধা মোস্তা মিয়ার বিচার শুরু করলে উক্ত এমসিএ সাহেব (আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি) মাঝখানে বাজী মাৎ করেন।

॥ ১৩ ॥

জনাব ইনসান (আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি নহেন) এই ক'দিন আগেও মুসলিম লীগ করতেন। ভয়াবহ নয় মাসে মানুষকে কত জুলুম করেছেন তার ইয়াত্তা নেই। আজ তিনি ১৫ নং বাঘিল ইউনিয়নের (টাঙ্গাইল থানা) জনৈক আওয়ামী লীগারের দেশপ্রেমিক পিতা। পুত্রধনের আওয়ামীলীগত্বের বদৌলতে দালালীর শাস্তি থেকে রেহাই তো পেয়েছেনই বরং ব্লাকমেইলে বেশ কিছু কামাইও করেছেন। এমনি করে তিনি কৃষ্ণপুরের বাশি সেখের একমাত্র টিনের ঘরটি ভেঙ্গে নিয়ে এসেছেন। গাওরজান গ্রামের ফকির চানের দুই শত টাকা এবং বাদের গাওজানের হাতেম মিয়ার নিকট থেকে একশত পঞ্চাশ টাকা জোরপূর্বক আদায় করেছেন।

॥ ১৪॥

টাঙ্গাইল শহরের আকুর টাকুর এলাকার ৪০৫ নং হোল্ডিংএর বাসাটি ভুয়া মুক্তিবাহিনী ১২ই ফেব্রুয়ারী থেকে দখল করে বসে আছে। বিগত আট বৎসর যাবত উক্ত বাসায় যে পরিবারটি থাকতেন তাদেরকে মারধর করে জোরপূর্বক বের করে দেয়া হয়েছে। সরকার ও খাঁটি মুক্তিবাহিনী সমীপে দরখাস্ত পেশ করেও কোন ফলোদয় হয়নি।

॥ ১৫ ॥

নন্দবাল্লা গ্রামের (টাঙ্গাইল থানা) জনৈক আওয়ামী লীগ নেতা টিক্কা খানের আমলে যেসব কাপড় ও রেডিও লুট করেছিলেন গ্রামবাসী তা নিয়ে আজ নানাবিধ প্রশ্ন তুলছেন। তিনি এক কালের 'মালে গণিমত'

ঘরে রেখেই কি করে একটি ইউনিয়নের পঞ্চায়েত নিযুক্ত হতে পারলেন, গ্রামবাসীর এও একটি জিজ্ঞাসা। এই পঞ্চায়েত সাহেবই সম্প্রতি মিরপুর গ্রামের ফয়জুদ্দীন মিয়ার নিকট থেকে এগার শত টাকা ঘুষ আদায় করেছেন।

আলোকলতার দলকে উৎখাত করিতে হইবে

যেদিন হইতে আদম সন্তান কৃষক হইল সেদিন হইতেই মানুষ সভ্যতা ও শোষণের দিকে পা বাড়াইল। কালক্রমে মজুর, কামার, কুমার, তাঁতী প্রভৃতি শ্রেণীর উদ্ভব হইল। কিন্তু ইহা ছাড়া সমাজে আরও একটি শ্রেণী গজাইয়া উঠিল। তাহাদের স্বরূপ যেন আলোকলতা, পরগাছা।

কারিগরি সভ্যতার যুগে এই আলোকলতার দল সংখ্যায় নগণ্য হইলেও অতিশয় প্রবল। তাহারা সরাসরি কোন কাজ না করিয়া— কৃষক, মজুর তথা মেহনতি মানুষের শ্রমে অর্জিত পণ্য-দ্রব্যাদি নানাভাবে ভোগ করিয়া থাকে। ফলে মেহনতি মানুষের মেহনতের ফল তাহাদের ঘরে আসিয়া জমা হয়। এই শ্রেণীর লোক কৃষক-শ্রমিকের অর্জিত ফসলের বদৌলতে সমাজের সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত। তাহারাই খামার, মিল, কলকারখানার মালিক। আর আসলে যাহারা ইহার প্রকৃত মালিক, যাহাদের রক্ত-পানি করা পরিশ্রমে এই সকল খামারে শষ্যাদি জন্মে, মিল, কলকারখানায় পণ্য উৎপন্ন হয় সেই মেহনতি মানুষ নিঃসম্বল। আলোকলতা যে গাছকে অবলম্বন করিয়া বাঁচিয়া থাকে, যে গাছটি ইহার জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য উহাকেই তিলে তিলে গ্রাস করিয়া এমন এক পর্যায়ে উপনীত করে যে গাছকে আর গাছ বলা যায় না — তার সজীবতা হারাইয়া শুকনা কাঠে পরিণত হইতে থাকে। বর্তমানে বাংলাদেশে কৃষক-শ্রমিকের দশাও সেইরূপ। বাংলাদেশের শতকরা ৯৫ জনই মেহনতি মানুষ। বাকী ৫ ভাগ লোক এই ৯৫ ভাগের উপর সকল বিষয়ে নির্ভর করে। কিন্তু আজ আমরা দেখিতে পাইতেছি যে কৃষক-মজুর এই সকল লোকের অন্ন, বস্ত্র এমনকি ভোগ বিলাসের যাবতীয় উপকরণাদির সংস্থান করে— সেই কৃষক-মজুরই আজ কার্যতঃ অন্ন- বস্ত্রহীন হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের চাষের জমি নাই, থাকিবার ঘর নাই, পেটের খোরাক নাই — সকল কিছুই আলোকলতার মত এই ৫ ভাগ অলস লোক গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে।

তাই সরকার কৃষক, মজুর তথা মেহনতি মানুষকে যত সান্ত্বনাই দেন না কেন উহা কোনই কাজে আসিবে না যত দিন পর্যন্ত দেশের এই ৫ ভাগ লোকের সকল প্রকার সম্পদ সমবন্টন করা না হইবে। বাংলাদেশ স্বাধীন হইবার পর হইতে মন্ত্রীমণ্ডলী তথা শাসকচক্রের বাড়ী-গাড়ী সহায়-সম্পদ যে রূপ ভাবে ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিতেছে সেই রূপ কি কোন কৃষক-শ্রমিকের হইয়াছে? যতদিন পর্যন্ত মেহনতি মানুষ নিজেরা তাহাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের জন্য আগাইয়া না আসিবে ততদিন হইবার সম্ভাবনাও নাই।

সম্পাদক ঃ সৈয়দ ইরফানুল বারী। মুদ্রণে- কল্লোল প্রেস, সদর সড়ক, টাঙ্গাইল।

সাপ্তাহিক

হক-কথা

(WEEKLY THE HAQ-KATHA)

প্রকাশক ও পৃষ্ঠপোষক ঃ মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

চতুর্থ সংখ্যা শুক্রবার ৩রা চৈত্র ১৩৭৮; ১৭ই মার্চ, ১৯৭২; ৩০শে মহরম ১৩৯২; প্রতি সংখ্যা ঃ পনের পয়সা; সন্তোষ, টাঙ্গাইল

বনজ সম্পদ লুট হয়ে যাচ্ছে

সোনার বাংলার বনজ সম্পদ লুট হয়ে যাচ্ছে। কেউ বুঝি নেই প্রতাপশালী এই লুণ্ঠনকারীদের হাত থেকে মূল্যবান সম্পদগুলো রক্ষা করে। কারণ, যাদের সামাজিক ও বনজ সম্পদের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে সরিষায় ভূত থাকার মত তারাই লুট করে যাচ্ছে।

সবচেয়ে মারাত্মক ক্ষতি করা হচ্ছে বিস্তীর্ণ সুন্দরবনে। এর রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে সরকারী অফিসার নিয়োজিত রয়েছেন ঠিকই কিন্তু জনারণ্যে আজ যে অরাজকতা দেখা দিয়েছে তা থেকেই অনুমান করা যাবে বনে-জঙ্গলে এর মাত্রা কতদূর গড়াতে পারে। অফিসারদের হুমকি দেখিয়ে, কখনো বা আবার নির্ভরযোগ্য সমাজসেবীর নাম ভাঙ্গিয়ে মূল্যবান গাছগুলো কেটে নেয়া হচ্ছে। মাস দুয়েক আগে গুটিকতক স্বার্থপর এই ধ্বংসযজ্ঞ শুরু করেছিলেন। কিন্তু বর্তমানে একের দেখাদেখি বহু সুধী লুণ্ঠন কাজে নেমেছেন। দূর দূরান্ত থেকে কেউ গরুর গাড়ী, কেউ ট্রাক নিয়ে আসছেন আর উচ্চহারে কামলা খাটিয়ে রাত-দিন গাছের পর গাছ সাবার করছেন। সম্ভবতঃ খুলনা জেলায় পর্যাপ্ত ট্রাকের অভাবে অথবা ভারতীয় কোন ব্যবসায়ীর সাথে যোগসাজশ রেখে অ-বাংলাদেশীয় যানবাহনে সুন্দরবন থেকে গাছগুলো সরানো হচ্ছে। প্রথম দিকে কয়েকজন দেশপ্রেমিক পথে-ঘাটে বাধার সৃষ্টি করলে মুক্ত হস্তে ঘুষ দান করে তা সামলে নেয়া হয়েছে। কিছুদিন যাবত গাছ চুরি এত ব্যাপক আকারে হচ্ছে যে ঘুষ লেনদেনের বাধাটুকুও উঠে গেছে। চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহে কয়েকটি লঞ্চ সুন্দরবনের দক্ষিণাঞ্চল থেকে বহু কাঠ উঠিয়ে নিয়ে গেছে এবং সেগুলো কার জন্যে কারা নিয়ে গেল এর কোন হদিস পাওয়া যায়নি।

শুধু সুন্দরবনেই নয়, ঠিক একই রকম ঘটনা ঘটে যাচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম ও মধুপুরের গড়ে। পার্বত্য চট্টগ্রামের বনজ সম্পদও লাওয়ারিশ সম্পত্তির মত পড়ে আছে। বান্দরবন, রাঙ্গামাটি ও কাপ্তাই থেকে আমরা যা খবর সংগ্রহ করেছি তাতে সুন্দরবনের মত ব্যাপক না হলেও উপজাতীয় কয়েকটি চতুর সম্প্রদায় পরিস্থিতির সুযোগে ছোট ছোট গাছগুলো কেটে নিয়ে যাচ্ছে। মধুপুরের গড়ে যা ঘটছে তাতেও অবস্থাটা মারাত্মক ক্ষতিকর পর্যায়ে চলে যাচ্ছে। নির্ভরযোগ্য সূত্র ধরে আমরা হিসেব পেয়েছি যে বিগত কিছুদিনের মধ্যে বেরীবাড়ী, পীরগাছা, চানপুর, চুনিয়া,

শরণখোলা প্রভৃতি এলাকা থেকে মোট ৬৬০ খানা গরুর গাড়ী বোঝাই মূল্যবান গাছ নিয়ে যাওয়া হয়েছে। যেহেতু গাছ কাটার সাথে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের যোগসাজশ রয়েছে, তাই নির্বিঘ্নে এই সরকারী সম্পদ লুণ্ঠিত হচ্ছে। ইতিমধ্যে জনৈক দেশপ্রেমিক এই সর্বনাশা বিষয়টি সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয়ের গোচরীভূত করেন। প্রতিকারের আশা দিলেও আজ পর্যন্ত কোন পর্যায়েই তিনি যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি।

অবিলম্বে লুণ্ঠন-লীলা বন্ধ করে সরকার যদি বাংলাদেশের বনজ সম্পদকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা না করেন, তাহলে ব্যক্তি কিংবা পরিবার বিশেষের স্বার্থে লক্ষ লক্ষ টাকা মূল্যের গাছ অকালে অপাত্রে নিঃশেষ হয়ে যাবে।

শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করবে কারা?

ফরাসী বিপ্লবের পর শাসনতন্ত্র প্রণয়নে অনেক কসরৎ করেও শেষ রক্ষা করা যায়নি, নেপোলিয়নের অবির্ভাব ঘটেছিল। এর মূল কারণ ছিল প্রণয়নকারীদেরে নিয়ে জনগণের হতাশা। খোদা না করুন বাংলাদেশের ইতিহাসে কি তারই পুনরাবৃত্তি ঘটবে?

কিন্তু হায়! খোদা যেসব কারণে এমনটি করে বসেন, স্বাধীনতার পর শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ব্যাপারে তাই ঘটে যাচ্ছে।

ইয়াহিয়া খানের আইনগত কাঠামোর আওতায় যখন আওয়ামী লীগ নির্বাচন করে তখন এদেশের জনগণ জানতেন, এম-এন-এ সাহেবরা পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করবেন এবং তাতে ছয় দফা আদায় করে বড় জোর 'পূর্ব পাকিস্তানের' পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন অর্জিত হবে। নির্বাচনকালীন পরিবেশ জমজমাট হলেও রক্তাক্ত ছিল না। কিন্তু সেই নির্বাচনের পর কেটে গেল রক্ত ঢালা নয়টি মাস – স্বাধীনতা আন্দোলনের ভয়ঙ্কর বেশিষ্ট্যমণ্ডিত। এর মধ্যেও যারা শুধু ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে সন্তুষ্ট থাকার পাঁয়তারা করেছিলেন তারাই উড়ে এসে জুড়ে বসে গেলেন। ভাবটা এই ঃ স্বাধীনতার সংগ্রাম হয়নি, হয়েছে ক্ষমতার লড়াই। তাই মুক্তিকামী সকল দল, সম্প্রদায় ও সংস্থাকে বাদ দিয়ে নিজেরাই শাসনতন্ত্র প্রণয়নের পাইকারী দাবীদার হয়ে বসলেন। পাকিস্তানী এম-এন - এ সাহেবরা স্বাধীন বাংলাদেশের জন্যে হয়ে গেলেন এম-সি-এ। কিন্তু কৃষক-শ্রমিক-ছাত্র-ব্যবসায়ী প্রভৃতি মহল যারা সত্যি সত্যিই স্বাধীনতা সংগ্রামে জান-মাল দিয়ে সাহায্য করেছেন তাদেরকে বিশ্বাস করা হল না, অন্ততঃ মাতৃভূমির প্রথম শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ব্যাপারে তাদের মতামত পেশের সুযোগ দেয়া হল না। ছেলেপুলে যেমন সবকটা বিস্কুট নিজের কোলে জড়ো করে আঁকড়ে ধরে আওয়ামী লীগ সরকার তেমনি 'সব আমার' গোছের প্রশাসক সেজে বসেছেন। তাই শাসনতন্ত্র প্রণয়নের যোগ্যতা নেই বলে আওয়ামী লীগই যাদেরকে 'পূর্ব পাকিস্তানী' এম-পি-এ, বানিয়েছিলেন তাদেরকেও লিফট দিয়ে এম-সি-এ করে দিলেন। অবশ্য এও হতে পারে নয় মাসব্যাপী মুজিব নগরে এদের ব্রেন ওয়াশটা যুৎসই হয়েছে বলে সরকার বর্তমানে আস্থাভাজন হয়েছেন। কিন্তু জনতার প্রশ্নগুলো খুব বিদঘুটে। পাকিস্তান আমলের এম-এন-এ, এম-পি-এ-রা কি রক্তাক্ত স্বাধীন বাংলার নির্বাচনে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের যোগ্যতা বিচারে (আদৌ যদি তা ঘটত) টিকে থাকতে পারতেন?

আজ যারা শাসনতন্ত্র রচনা করতে যাচ্ছেন তাদের হাতে কি এমন কিছু বেরুবে যেখানে মানবাধিকার আর বাক-স্বাধীনতা রয়েছে আর রয়েছে অর্থনৈতিক মুক্তি নির্দেশক বাস্তব রূপরেখা?

হক-কথা'র চাঁদার হার

বার্ষিক (সডাক) – নয় টাকা
ষান্মাসিক (সডাক) – পাঁচ টাকা

তীর্যক!

জন্মদিবসটি চালু করতে হয়। মৃত্যুদিবস উদযাপনী আয়োজন দেখে যাবার তো কোন উপায় নেই। তাছাড়া একবার একটি ছুটি জুড়ে দিতে পারলে বাঙ্গালী ক্যালেণ্ডার থেকে তা মুছে দিবে কে? তাই জুড়ে দাও এ তারিখটি। অফিস-আদালতের বৎস্যগণ ছুটি ভোগ করবে।

পারিষদ দলে লেকের পাড়ে জ্বালিয়ে দেবে ৫৩টি মোমবাতি। ফুৎকারে নিভাতে হবে ৫২টি।

খোদ না করুন শেষটিও নিভে না যায়।

আলু এবার মিষ্টি

বাংলাদেশে চোরাচালান বন্ধ হয়নি। হবেই বা কি করে। সম্পদ যে আমাদের অঢেল। আমন ধান যা জন্মে ছিল দু'মাসের পাচারে এক রকম শেষ হয়ে আসছে। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে প্রকাশ, ভারত থেকে রাজশাহী, দিনাজপুর, মোমেনশাহী প্রভৃতি জেলার বড় বড় বাজারে ভারতীয় ব্যবসায়ীগণ এসে পৌঁছেই ঘোষণা করে দেন – 'বাজারদরের চেয়ে দু'টাকা বেশী হারে সব ধান-চাউল কেনা হয়ে গেল। নিজ নিজ টাকা বুঝে নিয়ে যান।' সঙ্গে সঙ্গে ট্রাক বোঝাই হয়। আজকাল ভারতীয় ট্রাকে নম্বরও থাকে না। আমাদের সীমান্তে তো প্রহরীই নেই। তাদের এলাকায় রয়েছে। কিন্তু সেলামীর রেওয়াজটা সেখানেও জনপ্রিয়। আশ্চর্য! উভয় দেশের সরকার ও জনগণ মৃত সৈনিকের অভিনয় করে যাচ্ছেন।

কিছুদিন হল আমাদের খাদ্যমন্ত্রী বলেছেন, মিলিটারীর অত্যাচারে চাষী খাদ্যশস্য উৎপাদন করতে পারেনি। তাই আজ এত দুর্ভিক্ষ। কিন্তু বেদখলের নয় মাসে তো জিনিষপত্রের দাম এত বেড়ে যায়নি। অভিজ্ঞ ব্যবসায়ীদের মতে এবার ধান যা জন্মে ছিল পাচার না হলে খুব বড় জোর আজ মণ দর ৪০ টাকা হত। চৈত্র- বৈশাখ মাসে বাংলাদেশের চর এলাকার লক্ষ লক্ষ পরিবার একবেলা শুধু মাস কলাই ভেজে খেয়ে কাটিয়ে দেয়। এবার মাস কলাইয়ের ফলন এত ভাল হয়েছিল যে আজকাল এর বাজার দর মণ প্রতি ২০/২৫ টাকা থাকার কথা। কিন্তু চোরাচালান গ্রামবাংলাকে ফতুর করে দিয়েছে। বর্তমানে মাস কলাই ৫৫/৬০ টাকা মণ দরে কেনাবেচা হচ্ছে। এ ভাগ্যের পরিহাস বৈ কিছু নয়।

বাংলার জনগণকে এবার আমরা আর একটি খাদ্যদ্রব্যের চোরাচালান সম্পর্কে সজাগ করে দিতে চাই। আউশ কাটার পূর্ব পর্যন্ত গ্রামের লক্ষ লক্ষ পরিবার মিষ্টি আলু খেয়ে দিনাতিপাত করে থাকে। এবার এই আলু বেশ ভাল জন্মেছে। কিন্তু ইতিমধ্যেই আসাম থেকে বিড়ির পাতা, বাঁশ ও ছন নিয়ে নৌকা আসা শুরু করেছে। তারা মিষ্টি আলু চায়। গ্রামের হাটে এই আলু ৭/৮ টাকা মণ দরে বিক্রি হয়ে থাকে। চোরাচালান জমে উঠলেই তা ১৬/১৭ টাকায় উঠে গরীবের নাগালের বাইরে চলে যাবে। তাও যদি না ঠেকানো যায়, না খেতে পেয়ে লক্ষ লক্ষ লোক মরে যাবে।

যে পার্টি এক সময় চাউলের দর মণ প্রতি পঞ্চাশ টাকা শুনলেই দুর্ভিক্ষাবস্থা ঘোষণা করত, জনগণের অনাহারে রাজনৈতিক চেতনা ফিরে পেত, গ্রাম-গঞ্জে মহামারীর পদধ্বনি শুনতে পেত – সেই দলের শাসনামলেই বাংলাদেশের বাজারে চাউলের নিম্নতম দর মণ প্রতি ষাট টাকা, সেই দেশেই শহরে শহরে ভুখা মিছিল, বসন্ত রোগের মহামারী। আজ

তাদের নিয়ন্ত্রিত প্রচার মাধ্যমগুলোতে জরুরী অবস্থা ঘোষণার কথা বলা হয় না যদিও মানিকগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ প্রভৃতি কয়েকটি মহকুমায় লোকজন না খেতে পেয়ে মারা যাবার উপক্রম হয়েছে। সেই একই ধারা – দুর্ভিক্ষের খবর, মহামারীর গ্রাস সব চেপে যেতে হবে। এসবে কর্তারা বিড়ম্বনা বোধ করেন।

ভূতের মুখে রাম নাম

মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার নিয়ে, দেশের বিভিন্ন সমস্যা ও যতবেশী সভা-সমিতি হয় ততই মঙ্গল। কিন্তু দেশের প্রকৃত সমস্যার প্রতি উদাসীন থেকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত জনসভা কারো কাম্য নয়।

সম্প্রতি টাঙ্গাইল জেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ এবং এম-সি-এ-গণ তাদের ভাষণে দেশের অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির উপর আলোকপাত করার চেয়ে মুক্তিসেনাদের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের প্রচেষ্টার প্রাধান্যই বেশী দিয়েছেন। ভূয়া মুক্তি বাহিনীর নামে নিরীহ জনসাধারণের উপর অত্যাচার, অন্যের জায়গা-জমি দখল প্রভৃতি বেআইনী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের বক্তব্যকে সবাই অভিনন্দিত করবে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে প্রকৃত মুক্তিবাহিনীর দীর্ঘ দিনের ত্যাগ তিতিক্ষা, দেশকে হানাদারদের হাত থেকে উদ্ধার করার যে ন্যায্য সম্মান তাদের পাওনা সেটা অবশ্যই দিতে হবে। মুক্তিবাহিনীর ভালো দিকগুলো থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে শুধু কুৎসা রটনা করা কিছুতেই ন্যায়সঙ্গত হতে পারে না। বিশেষ করে মুক্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলো থেকে বক্তাদের অনেকেই যখন মুক্ত নন তখন মুক্তিবাহিনীর কুৎসা রটনা শুধু ভূতের মুখে রাম নামের মতোই শোনায়।

হক-কথা

৩রা চৈত্র, শুক্রবার

বাংলাদেশের শিক্ষানীতি

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর বৈদেশিক নীতি নির্ধারণে ভুল করিয়া যেমন বিশটি বৎসর ইহার জের টানিতে হইয়াছে ঠিক তেমনি মারাত্মক গলদ সম্বলিত শিক্ষানীতি ও ব্যবস্থা গ্রহণ করায় শেষ পর্যন্ত সকল প্রতিষ্ঠানে অসন্তোষ বিরাজ করিয়াছে। যে শিক্ষানীতি ছাত্র-ছাত্রীদের বাস্তব জীবন হইতে দূরে লইয়া যায় তাহা পুরাপুরি পরিত্যাজ্য – অন্ততঃ এই শিক্ষাটুকু পাকিস্তান আমলে আমরা লাভ করিয়াছি।

আমাদের শিক্ষাবিদদের কেউ কেউ বিভিন্ন উপলক্ষে ইতিমধ্যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন – বাংলাদেশের শিক্ষানীতি হইবে ধর্ম নিরপেক্ষ এবং গণমুখী। কিন্তু ইহার বিস্তারিত রূপরেখা প্রকাশ না পাওয়া পর্যন্ত সবটাই অস্পষ্ট থাকিয়া যাইতেছে। তাই আজ নানা কথা ভাবিবার অবকাশ রহিয়াছে। ইসলামী শিক্ষার নামে যেমন পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী ইসলামী নয় এমন শিক্ষা ব্যবস্থা চাপাইয়া দিয়াছিলেন, ঠিক তেমনি গণমুখীনতা নাই এমন নীতিমালা নির্ধারণ করিলে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি বৈ কল্যাণকর কিছু ঘটিবে না। কথাটা মোটেই বেমানসই নয় যে বাংলাদেশে আজ বুদ্ধিজীবীর অভাব রহিয়াছে। অন্ততঃ সংখ্যায় তাঁহারা কমিয়া গিয়াছেন, ইহাতে কাহারও দ্বিমত থাকিবার কথা নহে। আবার বুদ্ধিজীবীদের কেউ কেউ রাজনৈতিক কিংবা প্রশাসনিক দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার পর যাহারা শিক্ষানীতি নির্ধারণে নিয়োজিত রহিয়াছেন তাহাদের পাণ্ডিত্যে দেশবাসীর প্রশ্নাতীত আস্থা থাকা সত্ত্বেও সুধীমনে একটি প্রশ্ন জাগিয়া উঠিয়াছে– গণমুখী শিক্ষার নামে ফরমায়েশী ফরমান উপস্থাপিত হইবে না তো! অধিকাংশ শিক্ষাবিদই দেশের গ্রামীণ মানসের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া সমাজজীবনের আসল স্বরূপকে রঙিন চশমায় দেখিয়া থাকেন বলিয়া এই আশঙ্কা অমূলক কিছু নয়। একমাত্র অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন শিক্ষাবিদই ইউরোপ-আমেরিকায় শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াও জাতির নাড়ির খবর রাখিতে পারেন। শিক্ষা কমিশনের ব্যাখ্যা সম্বলিত প্রস্তাব প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত জনমনে এই প্রশ্নটি থাকিয়া যাইবে।

শিক্ষানীতি যত উন্নতমানেরই হউক না কেন সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মান মাননসই না হইলে কোন ফলোদয় হইবে না। পারিবারিক ও স্কুলের পরিবেশকে পরস্পর নির্ভরশীল করিয়া ছাত্র-ছাত্রীর চরিত্র গঠন ও ব্যক্তিত্বের উন্মেষের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে। তজ্জন্য শিক্ষক শ্রেণীর প্রতি সরকারের তরফ হইতে নজর দিতে হইবে। শিক্ষকতাকে অত্যন্ত উন্নত শ্রেণীর কাজের মর্যাদাদান করিয়া সকল প্রতিষ্ঠানকে জীবন গড়ার উপযোগী মাল-মশলায় পরিপূর্ণ করিতে হইবে। শুধু কয়েকটি স্কুল-কলেজের প্রতি সরকারের দৃষ্টি থাকিলে চলিবে না। প্রত্যন্ত গ্রাম হইতেও যে বলিষ্ঠ নাগরিকের আবির্ভাব ঘটিতে পারে এবং তাহাকে যে সেইখানে রাখিয়া গড়িয়া তোলা চাই, সরকারকে সেই বিষয়ে সক্রিয় হইতে হইবে।

আমাদের দেশে মাদ্রাসা শিক্ষা আজ একটি বড় প্রশ্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শিক্ষাকে ধর্ম নিরপেক্ষ রাখিয়াও ইসলামের অবদানকে পরিচর্যা ও যুগোপযোগী প্রয়োগ করিতে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার কমিশনকে তাহাই করিতে হইবে। কারণ, এই পরিচর্যা ছাত্রদের মানুষ করিতে পারে ইহার বড় প্রমাণ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী উনবিংশ শতাব্দীর কয়েকটি আন্দোলন পাকিস্তান সরকার মাদ্রাসাশিক্ষার সর্বনাশ করিয়াছেন; তাই সত্যপ্রিয় বিদ্রোহী না হইয়া পাকিস্তান আমলে মাদ্রাসা শিক্ষিতরা হইয়াছেন শোষকের হাতের পুতুল। একই শিক্ষাব্যবস্থায় সামঞ্জস্যবিধান করিয়া ছাত্র-ছাত্রীদের সবরকম পড়াশুনার সুযোগ- সুবিধাদানই বাঞ্ছনীয় হইবে। কিন্তু সরকার ইহাতে অনীহা ভাব প্রকাশ করিলে আলাদা রাখিয়াও ফলপ্রসূ কিছু হইবে না। তাই দরকার, নিজ নিজ ধর্মীয় মূল্যবোধ, জাতীয় চেতনা ও বিশ্ব নাগরিকত্বের আলোকে আপন স্বত্ত্বাকে চিনিয়া জানিয়া একজন ছাত্র গড়িয়া উঠিতে পারে এমন শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন– উহাকে কেউ গণমুখী, ধর্মনিরপেক্ষ ইত্যাদি বলুক বা না বলুক।

অহিংসা ও বিপ্লব

আবদুল হামিদ খান ভাসানী

যে মত ও পথ, বিশেষ করিয়া রাজনীতির ন্যায় সদা গতিশীল বিষয়ে, মানুষের সমষ্টিগত শক্তিকে দুর্বল এবং স্থবির করিয়া ফেলে উহার সহিত আমার মানসিকতাকে কোনদিন খাপ খাওয়াইয়া নিতে পারি নাই। মানবজাতির উত্থান-পতনের ইতিহাস সম্পর্কে যতটুকু জানিতে পারিয়াছি এবং আমার সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে যতটুকু শিক্ষালাভ করিয়াছি উহাতে আমি স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছি যে অহিংসার বাণী এবং অহিংস কৌশল মানুষের বিপ্লবী চেতনাকে ভোঁতা করে মাত্র – দেশের শতকরা পঁচানব্বইজন মানুষের চিরস্থায়ী কোন কল্যাণ সাধন করিতে পারে না। তাই যখনই আমি দেখিতে পাই যে দেশবাসী অহিংসার মন্ত্রে দীক্ষা লাভ করিয়া মানবীয় কল্যাণের কথা ভাবিতেছে তখন সত্যিই আমার করুণা জাগে – কি আফিমই না তাহাদিগকে পাইয়া বসিয়াছে। দেশবাসীর এহেন বিনীত আরজের সুযোগে দেশের শতকরা মাত্র পাঁচজন লোক কি সুবিধাই না লুটিয়া থাকে! যে জনতা বিপ্লবের ঝাণ্ডা বহন করিয়া কৌশলীদের অপমৃত্যু ঘটাইয়া দিতে পারিত তাহাদিগের

চোয়ালেই লাগাম আঁটিয়া দেওয়া হয়। তাঁহারা তখন কথা বলে ঠিকই কিন্তু যাহারা কোনদিনই তাহাদের মুক্তিদান করিবে না তাহাদের দরবারেই বলে। সেই জনতা তখন একটি তত্ত্বের দিকে ধাবিত হয় বটে কিন্তু উহা তাহাদিগকে কত পিছনে লইয়া যায় তাহার খোঁজই রাখে না। মোট কথা, অহিংসা শোষণের একটি 'মহৎ' কৌশল– এই সত্যটি কেউ বুঝিয়া উঠে না। শোষণ মুক্তির বলিষ্ঠ ধাপ তথা বিপ্লবের পথে পা বাড়াইবার মানসিকতাকে নিয়ন্ত্রণ কিংবা ধ্বংস করিবার মোলায়েম মত ও পথই হইল অহিংসা। তাই পূর্বেই আমি উল্লেখ করিয়াছি যে অহিংসার মন্ত্র যতই আপাতঃ মধুর হউক না কেন, যতই দর্শনসুলভ হউক না কেন – বাস্তবে উহাকে আমি কোনদিন বরদাশত করিতে পারি নাই। অহিংসার মন্ত্রকে ঘৃণাভরে পদাঘাত করিয়া বিপ্লবের কর্মসূচী যথাযথ রাখাতেই দেশের শতকরা পঁচানব্বইজন মানুষের সার্বিক কল্যাণনিহিত বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। শুধু সমষ্টিগতভাবেই নয় ব্যক্তিগত পর্যায়েও অহিংসা মানুষের সমূহ ক্ষতিসাধন করে। অবশ্য যিনি অহিংসার মৌলিক চেতনায় গড়া প্রতিভা লইয়া জন্ম লইয়াছেন তাহার কথা আলাদা। তবে এমন প্রতিভা লইয়া প্রতি শতাব্দীতে কয়জনই বা জন্মগ্রহণ করে। তাহাদিগকে লইয়া তো আর সমাজ কিংবা রাষ্ট্র চলিতে পারে না। অহিংসা ব্যক্তির আত্মশক্তিকে খর্ব করিয়া ফেলে। অন্যায়-অবিচারের সহিত আপোষ করাটা এক সময় তাহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হইয়া দাঁড়ায়। তখন তাহার নিকট শান্তির দোহাই এবং সহ-অবস্থান নীতি অতি বড় হইয়া দেখা দেয়। এইভাবে অহিংসার বাণী ব্যক্তির বেগবান সৃজন প্রবাহকেও মারাত্মকভাবে ব্যাহত করে। ব্যক্তিগতভাবে অধঃপতিত হইয়াই সে বসিয়া থাকে না – অহিংসা বাণীর বদৌলতে নিরীহ জনসাধারণকে শোষণ করিবার পথও খুঁজিয়া বেড়ায়। ধার্মিকের বেশে দুনিয়াতে যেমন বহু রকমের ভণ্ডের আবির্ভাব ঘটিয়াছে তেমনি অহিংসাপরায়ণ সাজিয়া মোনাফেক শোষক গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সকল পরিস্থিতির মোকাবিলা করিতে বিপ্লবী মহলকে সচেতন ও সক্রিয় থাকিতে হয়। অনেকে মনে করেন অহিংসার রাজ্যে বিপ্লবী মহল কাজ করিতে পারে না। আমার মতে ধারণাটা ভুল। কারণ, বিপ্লবী মন সব সময় অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মুখর – শুধু মুখের ভাষায়ই নয় – স্থান-কাল -পাত্র ভেদে অস্ত্রের ভাষায়ও। কারণ, বৃহত্তর কল্যাণের প্রয়োজনে সে আশেপাশে অপারেশন চালাইয়া থাকে যেমনটি একজন দূরদর্শী ডাক্তার রোগীর একটি চক্ষু তুলিয়া ফেলিয়া অপরটিকে অক্ষত রাখেন। অবশ্য ইহাও সত্য যে বিপ্লবের নামে উদ্দেশ্যহীন ধ্বংস সাধন করিবার জন্য মহল বিশেষের আবির্ভাব ঘটিতে পারে। তবে তাহা একান্তই ক্ষণস্থায়ী হইয়া থাকে। খাঁটি বিপ্লবী দল তাহাদিগকে অচিরেই গ্রাস করিয়া ফেলিতে সক্ষম হয়। কিন্তু অহিংসার নামে সুবিধাবাদী মহল স্বার্থ উদ্ধার করিয়া সারিয়া উঠে এবং এমন কৌশলে জনতার ঘাড়ে চাপিয়া বসে যে অনেক মাশুলদান করিয়া তাহার কবল হইতে মুক্তি পাইতে হয়। তাই অহিংসায় ভালবাসার বাণী থাকিলেও তাহা কোনদিন বাস্তবায়িত হয় না। বিশেষ করিয়া ধনতন্ত্রবাদী সমাজব্যবস্থায় তাহা তো সম্ভব নয়ই। পক্ষান্তরে বিপ্লব যে আবেদন আর শক্তি লইয়া মানব সমাজে উপস্থিত হয়, তাহা আর কিছু বহন করুক বা না করুক – কুসংস্কার এবং শোষণের ধ্বংস প্রত্যক্ষভাবে লইয়া আসিবেই। তাই বিপ্লবে ভাওতাবাজীর কোন দ্বার খোলা থাকে না – থাকে শুধু ব্যবস্থা বিশেষের মূল্যোৎপাটন– তা যে কৌশলেই হউক।

রাজনৈতিক আন্দোলনে গান্ধীর অহিংসা নীতি প্রসঙ্গে আমরা বহুবার তর্ক-বিতর্ক করিয়াছি।

বিশেষ করিয়া কারাগারে বিভিন্ন মতাবলম্বী নেতৃবর্গের মধ্যে অহিংস তত্ত্ব লইয়া তর্ক বাধিয়া যাইতে দেখিয়াছি। অহিংসবাদী নেতাগণ বরাবরই সম্রাট অশোকের সাফল্য ও মহত্ত্বকে আমাদের সামনে তুলিয়া ধরিতেন। আমি তখন বলিতাম, আজও বলি – সম্রাট অশোক অহিংসা বলে যে সাম্রাজ্য ও শাসন কায়েম করিয়াছিলেন তাহার মৃত্যুর পর উহা কয়দিনই বা টিকিয়াছিল ? তদুপরি সম্রাট অশোক যতটুকু সাফল্য অর্জন করিয়াছিলেন তাহার অন্যতম কারণ ছিল যুগের পরিবেশ। তৎকালে একে অন্যকে শোষণ করিবার রকমারি কৌশল আবিষ্কার হয় নাই এবং প্রয়োজনও পড়ে নাই। তাছাড়া সম্রাট অশোকের নীতি ও ব্যবস্থাপনায় আন্তরিকতা এবং অভিনবত্ব ছিল বলিয়া তিনি জনসাধারণের আস্থাভাজন হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সবই ঝুট মনে হইয়াছিল। আমি এমন অনেক নেতার সাক্ষাত পাইয়াছি যাহারা ইসলামের নামে রাজনীতি করিতে নামিয়া অহিংসার দোহাই পারিয়া থাকেন। মওলানা মুহম্মদ আলী ঐসব নেতাকে লেখায় ভাষণে খুব ধোলাই করিতেন। তিনি অসংখ্য নজীর তুলিয়া ধরিয়া প্রমাণ করিতেন যে ইসলাম যুদ্ধংদেহী নীতির স্বীকৃতিদান করিয়াছে। একার মওলানার এমনি একটি বক্তব্যের জবাবে গান্ধী তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন ঃ আপনার নবী সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তলোয়ার ধরিয়াছিলেন সত্য – কিন্তু বিনা তলোয়ারে অর্থাৎ প্রেম দিয়া জয়লাভকে তিনি বেশী পছন্দ করিতেন ইহাও সত্য। প্রকৃতপক্ষে মানুষের সুকুমার বৃত্তিকে জয় করিতে অহিংসা একটি মহৎ মাধ্যম হইতে পারে। কিন্তু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আন্দোলনের সহিত মানুষের যে ধরনের বৃত্তিসমূহ জড়িত থাকে সেগুলিকে জয় করিতে অহিংসার নয় – মারমুখী কৌশলেরই প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে সফল খলীফা হযরত ওমরের চরিত্রে বিনয় ছিল বটে, কিন্তু তিনি যাহা অবলম্বন করিয়া সাফল্য অর্জন করিয়াছিলেন তাহা আদৌ বিনয় নয় – শক্তি ও কাঠিন্যই ছিল সেক্ষেত্রে সম্বল। অবশ্য শক্তি প্রয়োগের ব্যাপারে ইসলাম অত্যন্ত সূক্ষ্ম একটি নীতি নির্ধারণ করিয়া দিয়াছে। তাহা হইল বর্ণে বর্ণে ইনসাফ বজায় রাখা। স্বীয় কার্যক্রমের নিরপেক্ষ বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাহা বজায় রাখাও সম্ভব বটে। তবুও কেন যেন আমার মনে হয় রাসূলুল্লাহ (দঃ) যদি মক্কা বিজয়ের দিন নবী সুলভ ক্ষমা প্রদর্শন না করিতেন তবে ইসলামের গৌরবময় খিলাফত ত্রিশ বৎসরেই খতম হইয়া যাইত না। কারণ, এই ক্ষমার মধ্য দিয়াই মোনাফেক মুসলমান শোষণের প্রশ্রয় পায় এবং সময় বুঝিয়া মাথাচাড়া দিয়া উঠে। পক্ষান্তরে মক্কার ধনিক-বণিক এবং ক্ষমতালোভী ষড়যন্ত্রপ্রিয় সম্প্রদায় নিহত কিংবা নির্বাসিত হইলে অঙ্কুরেই সব ধ্বংসপ্রাপ্ত হইত। অনেকে মনে করেন ইসলামের বিধান হইল শুধু আক্রান্ত হইলেই পাল্টা অভিযান শুরু করা যায়। কিন্তু মোটেই তাহা সত্য হইতে পারে না যদি সত্যিই ইসলাম মানুষের কল্যাণ সাধন করিতে চায়। এই দিক দিয়া কমিউনিস্টদের কৌশল ও বিশ্লেষণ খুবই বাস্তবানুগ হইয়া থাকে। মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া মহান আদর্শ কায়েম করিতে কমিউনিস্টদের অভিযান তাই বিলম্বে হইলেও সর্বসাধারণে স্বীকৃত হয়। লেনিন ও মাও - সেতুঙ এই পরীক্ষা- নিরীক্ষায় সাফল্য অর্জন করিয়াছেন। পক্ষান্তরে গান্ধী ও টলষ্টয়ের অহিংসা দর্শন লইয়া শিক্ষিত মহলে উন্নতমানের একটি সেমিনার জমিতে পারে – সাম্রাজ্যবাদী, উপনিবেশবাদ, ধনতন্ত্রবাদী শাসন- শোষণের অবসানকল্পে সর্বহারা জনতার মুক্তিকল্পে কোন বাস্তব কর্মসূচী গ্রহণ করা যাইবে না। ডক্টর মার্টিন লুথার কিং মার্কিন নিগ্রোদিগকে প্রাণ দিয়া

ভালবাসিয়াছেন – ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার অহিংসনীতি নিগ্রোমুক্তি আন্দোলনের অনেক ক্ষতি করিয়াছে ইহাও সত্য। আমার মতে, চপেটাঘাতের বদলে পাল্টা চপেটাঘাত তো বটেই পারিলে পদাঘাতও করিতে হয়। মার্কিন ধনিক- বণিক সমাজ নিগ্রোদেরকে যেমনভাবে শাসন-শোষণ করিয়াছে তাহার দাদ উঠাইতে অহিংসার দর্শন হাস্যকর ব্যাপার বৈ কি! আব্রাহাম লিঙ্কন যত মহান প্রেসিডেন্ট হউন না কেন গৃহযুদ্ধ না বাধিলে চোখও হয়তো খুলিয়া যাইত না। ১৮৫৭ সালে এই উপমহাদেশে বিদ্রোহ সংঘটিত হইবার পর স্যার সৈয়দ আহমদ মুসলমানদিগকে শিক্ষার পথ দেখাইয়া উপকার সাধন করিয়াছেন সত্য কিন্তু তৎসঙ্গে ইহাও মানিয়া লইতে হইবে যে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ নাগাদ এই জাতিতে যে বিপ্লবী চেতনা বিরাজমান ছিল তাহা ভোঁতা হইয়া সংস্কারধর্মী চেতনায় রূপান্তরিত হইয়া পড়িয়াছিল। শিক্ষা-দীক্ষায় মুসলমানদের যতই অগ্রগতি হউক না কেন – বিপ্লবী অভিযানে তখন হইতেই তাহারা যেভাবে পশ্চাৎপদ হইয়া পড়িয়াছিল উহার প্রতিক্রিয়া আজ পর্যন্তও বর্তমান। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে সৈয়দ আহমদ বেরেলভী, শহীদ তীতুমীর, হাজী শরিয়তুল্লাহ প্রমুখ যে বিপ্লবের বাণী ছড়াইতেছিলেন তাহা সেই শতাব্দীরই শেষভাগে স্তিমিত হইয়া শান্তশিষ্ট রূপ গ্রহণ করিয়াছিল। উহা গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে মানানসই ছিল বটে কিন্তু বিপ্লবী জাগরণের জন্য মোটেই যুৎসই ছিল না। সৈয়দ আহমদ বেরেলভী পেশোয়ারে যে স্বাধীন রাষ্ট্র এবং খেলাফত কায়েম করিয়াছিলেন তাহাই হয়ত গোটা উপমহাদেশের মুক্তির জন্য কাজ করিয়া যাইত ঃ সেই সংগঠনই হয়তো সর্বত্র বিপ্লবের বাণী ছড়াইত। তাহা হইলে ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহও সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইত না এবং স্যার সৈয়দ আহমদকে সংস্কারমুখী হওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিত না। কিন্তু আফসোস, বিপ্লবী হইয়াও সৈয়দ আহমদ বেরেলভী বিশ্বাসঘাতক এবং মোনাফেকচক্রান্তকে অহিংসার বাণী শুনাইলেন এবং ক্ষমার চোখে দেখিলেন। অবশেষে মুষ্টিমেয় কয়েকজন বিশ্বাসঘাতক রাতারাতি শত শত বিপ্লবী কর্মীকে হত্যা করিয়া এই উপমহাদেশে বিপ্লবী জাগরণের কবর রচনা করিয়াছিল। যে যাহাই বলুন না কেন সৈয়দ আহমদ বেরেলভীর সাময়িক দুর্বলতা অর্থাৎ মোনাফেক আফগানদের প্রতি সহিংসা প্রদর্শন গোটা উপমহাদেশের রাজনৈতিক পটভূমি বদলাইয়া ফেলিয়াছিল বলিয়া আমি বিশ্বাস করি।

যাহোক আমি ইতিহাসবেত্তা নই, রাজনৈতিক আন্দোলনের ভাষ্যকারও নই। আমি হাড়ে হাড়ে রাজনীতিবিদ থাকিতে চাই এবং অহিংসার বাণীতে নয় বিপ্লবের মন্ত্রে উদ্দীপিত হইয়া আন্দোলন চালাইয়া যাইতে চাই। ইতিহাসের পাতায় পাতায় স্থান-কাল-পাত্র ভেদে অহিংসার বাণী যেভাবে ব্যর্থ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে এখানে তাহার প্রতি ইঙ্গিত করিলাম মাত্র। তবে যে পরিমণ্ডলে আমি রাজনীতি করি তাহার অনুসারীদের প্রতি আমার অনুরোধ – আপনারা অহিংসার মন্ত্রে গদগদ হইয়া যাইবেন না। তাহা হইলে বিপ্লবী চেতনা হারাইয়া ফেলিবেন। তখন খুব বড় জোর একজন সৌখিন দেশপ্রেমিক সাজিতে পারিবেন – সর্বহারা জনতার জন্য কাজের কাজ কিছুই করিতে পারিবেন না।

ভাসানীর বাণী

মহাদুর্ভিক্ষ অত্যাসন্ন। একে রোধ করতেই হবে। তা না হলে ১৩৪৯ সালের দুর্ভিক্ষাবস্থার সঙ্গে সঙ্গে চরম অরাজকতাও দেখা দিবে। কারণ, সে সময় মানুষ অভুক্ত থাকলেও লুটতরাজ করতে যায়নি। আজ আর সে সমাজ চরিত্র নেই। আজ মানুষ

বুঝতে পেরেছে, মহাদুর্ভিক্ষেও সমাজে এমন একটি শ্রেণী থাকে যাদের খাওয়া পড়ায় কোন অসুবিধা হয় না। সেই শ্রেণী উৎখাত করতে মানুষ অস্ত্র ধরতেও শিখেছে।

আপনার চিঠি
পরীক্ষার ফি প্রসঙ্গে

মাননীয় সম্পাদক সাহেব,

আপনার বহুল প্রচারিত নিপীড়িত, নির্যাতিত মেহনতি মানুষের কণ্ঠস্বর 'হক-কথায়' অধীনের নিম্নলিখিত বক্তব্যটুকু সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ ও সহানুভূতিশীল বিবেচনার জন্য তুলিয়া ধরিলে অত্যন্ত উপকৃত ও আনন্দবোধ করিব। স্বাধীনতা লাভের কয়েকদিন পর এক সরকারী নির্দেশে বলা হয়েছিল যে, ২৫ শে মার্চের পরও ১৬ই ডিসেম্বরের (১৯৭১ ইং) পূর্বে যে সমস্ত পরীক্ষা হয়েছিল তা বাতিল বলে ঘোষণা করা হল। সে নির্দেশে আরও বলা হয়েছিল যে পরীক্ষা বাতিল হলেও পরীক্ষার ফি বাতিল হবে না। জনগণ বিশেষ করে ছাত্রসমাজ সরকারী এ নির্দেশকে তখন অভিনন্দন জানায়। আবার গত ২রা মার্চ, ১৯৭২ উক্ত পরীক্ষার ফি সম্বন্ধে সরকার পুনরায় এক নির্দেশ জারী করেছেন। তাতে বলা হয়েছে উপরোল্লিখিত তারিখের মধ্যে অনুষ্ঠিত যাবতীয় পরীক্ষা ও দেয় যাবতীয় পরীক্ষার ফি যেগুলির পরীক্ষা ১৯৭২ সালে অনুষ্ঠিতব্য, বাতিল বলে ঘোষণা করা হল। এ প্রসঙ্গে শুধু একটি কথা বলাই যথেষ্ট মনে করি যে এমন একদিন ছিল যখন পরীক্ষা না দিলে একটি ছাত্রও হানাদারবাহিনীর বেয়নেটের হাত থেকে কোন অবস্থাতেই রেহাই পেত না, তাই প্রাণের ভয়ে ছাত্ররা পরীক্ষার ফি দিয়েছিল। তারাই আবার পরীক্ষার হলের ভিতর বোমা বিস্ফরণ ঘটিয়েছিল। তাদের মধ্যে অনেকেই ছিল প্রত্যক্ষ মুক্তিবাহিনী বা মুক্তিবাহিনীর সহায়তাকারী।

সুদীর্ঘ সংগ্রামের পর আজ দেশ স্বাধীন হয়েছে। বাংলাদেশের এমন একটিও পরিবার নেই যারা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। আজ আমরা রিক্ত, নিঃস্ব। কোনভাবে আধপেটা খেয়ে গাছের নীচে বইপত্র বিবর্জিত অবস্থায় দিন কাটাচ্ছি। এমতাবস্থায় যারা একবার ফি দিয়েছে তাদের পুনরায় ফি দিতে বলা হলে তাদেরকে লেখাপড়া ছেড়ে দিতে হবে। অথচ ছাত্রসমাজই বুকের রক্ত ঢেলে স্বাধীনতা এনেছে। এখানে আরও একটি কথা বলা প্রয়োজন যে উক্ত সরকারী নির্দেশে যে সমস্ত পরীক্ষা সংঘটিত হয়নি, এমনকি যে সব পরীক্ষার তারিখও এখন পর্যন্ত নির্দিষ্ট হয়নি সে সব পরীক্ষার দেয় ফি সম্পর্কে উক্ত সরকারী নির্দেশে সুস্পষ্ট কোন বক্তব্য নেই।

ইতি–

তাজুল ইসলাম, ঢাকা

পাঠকের অভিমত

।।১।।

আমাদের স্বাধীনতা দিবস কবে?

আমাদের 'স্বাধীনতা দিবস' সত্যিই ২৬ শে মার্চ কিনা, প্রশ্নটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখন আমরা 'স্বাধীন' এবং বলা হয় 'মুক্ত'-ও। অতএব, স্বাধীন এবং মুক্ত মানুষের উপর কোনো সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়ার পথ পরিহার করতে হবে। 'স্বাধীনতা দিবস' প্রসংগে আমাদের সপ্তাহের আলোচনা অপূর্ণাংগ থেকে গেছে বলে আমরা আলোচনা প্রয়োজন মনে করি।

গত সপ্তাহের আলোচনা থেকে জানা গেছে ঃ মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী ১৯৭০ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর পল্টনের বিশাল জনসভায় স্বাধীনতার আহ্বান জানিয়েছিলেন। আমাদের মনে হয় ঃ এইটাই চূড়ান্ত নয়। ১৯৫৭ সালের জানুয়ারীতে অনুষ্ঠিত কাগমারী সম্মেলনের কথা ভুলে যাওয়া উচিত নয়। সেই সম্মেলনে মওলানা ভাসানী সর্বপ্রথম পশ্চিম পাকিস্তানকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন ঃ 'আচ্ছালামু আলাইকুম।' আর এই দুঃসাহস প্রদর্শন একমাত্র তাঁর পক্ষেই সম্ভব ছিল। এরপর থেকে বাংলাদেশের রাজনীতিতে মওলানা ভাসানীর ঐ আহ্বানই রাজনীতিবিদদের বিভিন্ন বক্তব্যে প্রকাশিত হয়ে এসেছে এবং তার প্রথম বাস্তব প্রকাশ ঘটেছিল ১৯৭০ সালের ২২ শে ফেব্রুয়ারী পল্টনের এক জনসভায় ঃ

বাংলা শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি কাজী জাফর আহমেদ, কৃষকনেতা রাশেদ খান মেনন, ছাত্রনেতা মোস্তাফা জামাল হায়দার, বাংলা ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি মাহবুব উল্লাহ, বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান সালু প্রমুখ নেতৃবৃন্দ সেদিন পরিপূর্ণ স্বাধীনতার দাবী জানিয়েছিলেন।

প্রসঙ্গতঃ আরো একটি দিনের কথাও মনে পড়ে ঃ ১৯৭১ সালের ২রা মার্চ। এই দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত ছাত্র জনসভায় তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের এবং ডাকসুর নেতৃবৃন্দ প্রকাশ্যে পাকিস্তানের পতাকা পুড়িয়ে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করার মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার আহ্বান জানিয়েছিলেন। অবশ্য ১লা মার্চ দুপুরের পর থেকে কোটিবার স্বাধীনতার কথা উচ্চারিত হয়েছে।

স্বাধীনতা দিবস প্রসঙ্গে আমাদের গত সপ্তাহের এবং আজকের আলোচনা থেকে যে কয়টি তারিখের কথা পাওয়া গেল সেগুলো তারিখানুক্রমিকভাবে দেয়া হলো ঃ

ক) ১৯৫৭ সালের জানুয়ারী ঃ মওলানা ভাসানী।

খ) ১৯৭০ সালের ২২ শে ফেব্রুয়ারী ঃ কাজী জাফর - মেনন- জামাল হায়দার- মাহবুব উল্লাহ্- সালু গ) '৭০ সালের ২৩ শে নভেম্বরের জলোচ্ছাসের প্রতিক্রিয়ায় মওলানা ভাসানী ৭০ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর ঃ মওলানা ভাসানী। ঙ) '৭১ এর ২রা মার্চ ঃ আলম - সিরাজ- রব-মাখন চ) '৭০ এর ৭ই মার্চ ঃ শেখ মুজিব ছ) ৯ ই মার্চ ঃ মওলানা ভাসানী জ) ২৩ শে মার্চ ঃ মওলানা ভাসানী ঃ 'স্বাধীন পূর্ব বাঙলা দিবস' এবং শেখ মুজিব ঃ পতাকা উত্তোলন ঝ) ২৫ শে মার্চ ঃ ইয়াহিয়া- টিক্কার নির্লজ্জ আক্রমণ এবং প্রতিরোধ ঞ) ২৬ শে মার্চ ঃ নেতৃবৃন্দের (ভাসানী ছাড়া) কল্পিত 'মুজিবনগর' অভিমুখে পলায়ন ট) প্রকৃত তারিখের কথা নেতৃবৃন্দ জানেন ঃ শেখ মুজিবকে রাষ্ট্রপতি করে অস্থায়ী সরকার গঠন ঠ) ১৬ই ডিসেম্বর ঃ মুক্তিবাহিনীর কাছে নয়, ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছে পাকবাহিনীর আনুষ্ঠানিক আত্মসমর্পণ।

তবু আজো প্রশ্ন থেকে গেল ঃ আমাদের 'স্বাধীনতা দিবস' কবে?

আহমদ শাহ রেজা
২১, ভিক্টোরিয়া সড়ক, টাংগাইল।

॥ ২ ॥

অচল নোট

'হক-কথা'য় অচল একশত ও পাঁচশত টাকার নোট সম্পর্কে যে আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে, তার প্রতি আমাদের সমর্থন রয়েছে। কিন্তু এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় যখন পাকিস্তান সরকার ১০০ ও ৫০০ টাকার নোট বাতিল ঘোষণা করে, ঐ সময় ভারতের বিভিন্ন মাড়োয়াড়ী ব্যবসায়ীরা মানুষের অসুবিধার সুযোগ নিয়ে অনেক কম মূল্যে অসংখ্য নোট কিনে নেয়। আমার নিজেকেও আগরতলায় মাত্র ২৫ টাকার বিনিময়ে ১০০ টাকার নোট বিক্রি করতে হয়েছে। এমনিভাবে ভারতীয় মাড়োয়াড়ী ব্যবসায়ীদের হাতে কয়েক কোটি ১০০ ও ৫০০ টাকার নোট জমা হয়ে রয়েছে। বিষয়টি আমাদের ভাবার দরকার আছে। বাংলাদেশ সরকার যদি ১০০ ও ৫০০ টাকার নোট আবার চালু করেন, তাহলে মাড়োয়ারীদের কাছ থেকে কয়েক কোটি টাকা এসে আমাদের অর্থনীতিকে ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন করবে। অন্যদিকে গরীব জনগণের নোটগুলি অচল করে রাখাও অমানবিক কাজ। এমতাবস্থায় দেশের অর্থনীতি ও গরীব জনগণের স্বার্থের সমন্বয় করে জাতীয় স্বার্থের অনুকূলে একটি সুব্যবস্থা গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয় বলে আমরা মনে করি।

মুহম্মদ রফিকুল ইসলাম, ঢাকা।

॥ ৩ ॥

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাপ্তাহিক ছুটি

'হক-কথা'র তৃতীয় সংখ্যায় 'শুক্রবার কেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাপ্তাহিক ছুটি হবে না' এই বিষয়ে যুক্তিপূর্ণ আলোচনা পড়লাম। সত্যি কথা বলতে কি বক্তব্যগুলো আমরা ভাবতে ছিলাম। কিন্তু বর্তমান সরকারের যে কোন সিদ্ধান্তের পাল্টা কিছু প্রকাশ করতে গেলেই মোসাহেব-আমলারা বিনা কারণে দালালীর গ্লানি চাপিয়া দেন বলে ভয়ে ভয়ে কিছু বলতে পারছিলাম না। কিন্তু আপনার পত্রিকায় আলোচনাটি পড়ে বুকে বড় সাহস হল।

যাহোক, 'হক-কথা'র বক্তব্যকে চর্বিত-চর্বন না করে সোজাসুজি বলতে চাই, সরকারের অবিলম্বে উচিত সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রচলিত ধারা প্রবর্তন করা। তা না হলে সন্দেহ ও অবিশ্বাস এমনভাবে জেঁকে বসবে যার পরিণতি আইয়ুব আমলের শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ ডেকে আনবে। সরকারের ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে খালি মাঠে ক্ষমতায় বসেছেন বলেই জনগণ বিনা প্রতিবাদে সবকিছু মেনে নিবে। ছাত্র-ছাত্রীদের শতকরা বিশজনের সুবিধা থাকুক বা না থাকুক অসুবিধা বলতে যে কিছুই নেই, তার প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। তাই শতকরা ৮০ ভাগ ছাত্র-ছাত্রীর জন্যে যা বিশেষভাবে সুবিধাজনক তাই বহাল রাখা উচিত।

ইকরাম হোসেন
মতিঝিল, ঢাকা।

॥ ৪ ॥

বাংলাদেশের সমাজতন্ত্র কোন পথে?

'হক-কথা'র দ্বিতীয় সংখ্যার উপরোক্ত শিরোনামের প্রকাশিত ভাষ্যে হক-কথাই বলা হয়েছে।

সত্যি বলতে কি, যদিও আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবনের সবেমাত্র প্রভাতবেলা তবুও ঘটনা প্রবাহের গতি লক্ষ্য করে সমহিত হতে হয়। মানুষের জীবনে ঘটনা প্রবাহের প্রভাব অপরিসীম। এটা সবাই লক্ষ্য করেছি যে মাত্র দু'মাস আগেই এদেশের আপামর জনসাধারণের দীপ্ত চেহারা, আত্মত্যাগ ও দূর সংকল্পের আলোয় ছিল উদ্ভাসিত; যেহেতু তাদের অন্তরে ছিল এক অভূতপূর্ব মহান প্রেরণা। সে প্রেরণার মূলে ছিল দেশপ্রেম। অনাচার, অত্যাচার আর অবিচারের অবসান। বাংলার মানুষ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেছে যে, বাংলার পূর্ণ স্বাধীনতা এনে দেবে এক নতুন সমাজব্যবস্থা। যে সমাজে থাকবেনা বিশেষ শ্রেণীর অবাধ ভোগ-বিলাসের সুবিধা, যে সমাজে মানুষের বাঁচার অধিকারকে সম্মান দেওয়া হবে – সেখানে থাকবেনা আকাশচুম্বী ভোগ সম্ভারের ছড়াছড়ি।

কিন্তু বাস্তবে কি দেখতে পাচ্ছি? সেই থোড় বড়ি খাড়া আর খাড়া বড়ি থোড়। সমাজতন্ত্রের সূচনা করবে এমন কোন ব্যবস্থার ইঙ্গিত লক্ষিত হচ্ছে কি? সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন যে রাজনৈতিক প্রজ্ঞার তার প্রতিফলন সমাজ পুরহিতরা ব্যক্ত করতে পারছেন কোথায়? গোড়াতেই যদি এত গলদ তাহলে কিভাবে তাঁরা সমাজতান্ত্রিক আইন কাঠামো প্রনয়নে সক্ষম হবে? আমাদের বোঝানো হচ্ছে ট্রানজিট পিরিয়ডের কথা বলে। কিন্তু চোখের সামনে দিনে-দুপুরে যা ঘটতে দেখছি তাতে মনোবল কত দৃঢ় থাকতে পারে?

জনপ্রতিনিধিগণ যদি অনাচারে লিপ্ত থেকে জনসাধারণকে ফেরেস্তা হওয়ার উপদেশ দেন, তা কতদূর গ্রহণযোগ্য হতে পারে ? গ্রহণযোগ্য হওয়া তো দূরের কথা, বরং বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেওয়াই তো স্বাভাবিক।

ইরফান
ঢাকা।

আদর্শের অপর নাম

॥ মোহাম্মদ হোসেন॥

মানব জীবনের সার্থকতা সঠিকভাবে জীবনকে উপলব্ধি করার মধ্যেই নিহিত। জীবনের আসল উদ্দেশ্য ও কর্তব্য সম্পর্কে অচেতন না থেকে সচেতন হলে ইহার স্বাদকে পরিপূর্ণরূপে উপভোগ করা যায়। বিশ্বের সকল ঘটনার সাথে নিজেকে অবিচ্ছেদ্য রেখে চিন্তা করলে সব কিছুতেই আত্মসন্তোষের উন্মেষ হয়। অন্ধের মত আবির্ভূত হয়ে অন্তর্দ্ধান হলে জীবনের আসল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়। এ সম্পর্কে মহাগ্রন্থ কোরআনে রয়েছে ঃ যে ব্যক্তি ইহকালে অন্ধ সে পরকালেও অন্ধ থাকবে। মানুষের কৃত পরিচয় স্বীয় অভিব্যক্তির মধ্যেই মূর্ত হয়ে তার পরিচয় পাওয়া যায়। আবিষ্কারের মধ্যেই বৈজ্ঞানিকের পরিচয়-ভাবনার ভিতর ভাবুকের, কবিতার ভিতর কবির, সাহিত্যের ভিতর সাহিত্যিকের, সাধনার ভেতর সাধকের স্বরূপ ফুটে উঠে। যে যত বেশী স্রষ্টা ও সৃষ্টি সম্বন্ধে অবগত হয়েছে তার জীবনের বিকাশ ও ব্যাপ্তি ততই প্রসার লাভ করেছে। জীবনের বিকাশই মানুষকে কৃত্রিমতা থেকে অকৃত্রিমের পথে নিয়ে যেতে পারে। দুনিয়ার সকল ঘটনাবলী, পরিবেশ ও পরিস্থিতির সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার মধ্যেই ব্যক্তি বিশেষের আসল স্বরূপ প্রকাশ পায়।

ইসলাম সেইরূপ একটি জীবন দর্শন যা সত্যি সত্যি মানুষের জীবনকে প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যের বিধান রেখে পরিপূর্ণরূপে উপভোগের পন্থা নির্দেশ দেয়। ইসলাম অর্থ আত্মসমর্পণ ও শান্তি। অর্থাৎ স্বতঃস্ফূর্ত ত্যাগের মাধ্যমে দুঃখকে বরণ করে নেবার পরে আত্মসমর্পণকারীর মধ্যে যে শান্তি ও তৃপ্তির উন্মেষ ঘটে তাই হচ্ছে ইসলামের প্রকৃত শান্তি ও মুক্তির পথ। স্বতঃস্ফূর্ত নিঃস্বার্থ

মুরিদের দরবার

ত্যাগ ব্যতীত ইহার আসল আধ্যাত্মিক দিকটি উন্মোচিত করা সম্ভব নয়। ইহার নির্ভেজাল উপলব্ধিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে হযরত ইসমাইল (রাঃ) নিজের গলায় ছুরি চালাতে আবেদন জানান, হযরত ইব্রাহিম (রাঃ) আগুনে ঝাঁপ দিতে, মহানবী (দঃ) শত প্রকার বাধা বিপত্তিকে উপেক্ষা করে সত্য প্রচারে ব্রত থাকতে, মনসুর হাল্লাজ অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে হাসিমুখে মৃত্যুকে আমন্ত্রণ জানান। সত্য পথে অটল থাকতে আল্লাহর রাহে নিজের অভিলাষকে কোরবান করে-সৃষ্টির খেদমতে আত্মনিয়োগ করতে ইহা মানুষকে বাস্তবতার

কঠোর নাগপাশ থেকে মুক্ত রেখে 'রবের' গুণে গুণান্বিত করে থাকে। তাই এই আদর্শ জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল কালের সকল দেশের মানুষের উপযোগী একটি মহাকল্যাণকর আদর্শ রূপে প্রতীয়মান হচ্ছে। এই আদর্শ মানবজাতিকে নিঃস্বার্থ ত্যাগ ও স্রষ্টার সৃষ্টির জন্যে সকলকে স্বতঃস্ফূর্ত কর্মস্পৃহা দান করে মানুষকে অমৃতের আস্বাদ দেয়। মুসলিম জাতি সর্বপ্রথম এই আদর্শটিকে প্রফুল্লচিত্তে মেনে নিয়েছিল বলে আমরা মনে করি ইসলাম মুসলিম জাতির জন্যে একচেটিয়া। আসলে এই ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। ইসলামের আসল অর্থ হচ্ছে আল্লাহর সৃষ্টির কল্যাণকেই বর্দ্ধিত করা। পবিত্র কোরআনে এ সম্বন্ধে রয়েছে ঃ আতাতায়ী মূলে আমরিল্লা-আশ, শাফককাতু আলা খলকিকল্লা। অর্থাৎ আল্লাহর হুকুমকে মান্য করা-আল্লাহর সৃষ্টিকে ভালবাসা। এই দু'য়েই ইসলামের সুমহান আদর্শ রয়েছে। আল্লাহর কাজে আল্লাহর নামে আমিত্বকে বিলোপ করে-সেই করুণাময়ের হুকুমকে তামিল কর-সেই হুকুমের বিনিময়ে তুমি কিছু চেয়ো না। কারণ, তোমার জন্যে আসলে কি যে কল্যাণকর আর কি যে কল্যাণকর নয় সে সম্পর্কে তুমি অবগত নও। আদম সৃষ্টির পূর্বে ফেরেস্তাগণ আপত্তি তুললে তাই পরমকরুণাময় বলেছিলেন, "আমি যা জানি তা তোমরা জান না।" অতএব কিসে যে বান্দার উন্নতি আর কিসে যে বান্দার অবনতি সে সম্পর্কে সর্বশক্তিমানই পূর্ণ মাত্রায় ওয়াকেবহাল। তাই হৃদয়ের টানে প্রফুল্লচিত্তে নিঃস্বার্থভাবে পরমেশ্বরের হুকুম পালন করে যাওয়া আর "তুমি আমার জন্যে যা কল্যাণ ভাব তাই করো।"-এই ধারণা হৃদয়ে পোষণ করাকে বলা হয় ইবাদত। সর্বদা মনে রেখ সৃষ্টি, তাকে যত নগন্য আর কুৎসিত ও ঘৃণিতই ভাব না কেন উহাকে তুমি সৃষ্টি করতে অক্ষম। আর সৃষ্টিই হচ্ছে করুণাময়ের অসীম করুণার প্রকাশ। তাই সৃষ্টি হয়ে সৃষ্টিকে অবজ্ঞা করার অধিকার তোমার নেই। ইসলামের এই শিক্ষাই আমাদিগকে ধনী, গরীব, মুচি, মেথর, ডোম, ভদ্র-অভদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত তথা সকল শ্রেণীর মানুষকে একই আল্লাহর সৃষ্টি হিসাবে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে ঐক্য স্থাপনে অনুপ্রেরণা জোগায়। শুধু অনুপ্রেরণাই নয়, প্রেমের দ্বারা সকলকে আপন করে নেওয়ার মধ্যেই যে ইহার মূল দিকটি তা আমাদের নিকট সুস্পষ্ট করে তোলে।

ধর্মের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াদি যথাযথভাবে পালন করলেই-একটি ধর্মকে পরিপূর্ণ রূপে সম্পন্ন করা হলো বললে ভুল হবে। প্রকৃত কথা হচ্ছে-ইহার ভিতরের আসল বস্তু কি আছে তাকেই মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে হবে। যা মানুষকে শুদ্ধ রাখে, চরিত্র ও মনুষ্যত্বকে উন্নত করে মানুষে-মানুষে, জাতিতে-জাতিতে ভেদাভেদের পরিসমাপ্তি ঘটায়-অপরের সুখ-দুঃখে নিজ প্রাণে সমবেদনার ঢেউ খেলে-তাই তো আসল জিনিষ। হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, মুসলিম যে কোন ধর্মের আদর্শ নিয়েই আলোচনা করেন না কেন, প্রত্যেক ধর্মেরই আসল বিষয় ঐ-'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।' কিন্তু একটি কথা অতি সত্য তা হচ্ছে এই-ইসলামের আদর্শে সকল ধর্মের সমন্বয় সাধিত হয়েছে। তাই ইহাকে সমন্বয়ের ধর্ম বললেও অত্যুক্তি হবে না বলে মনে করি। জীবন তথা বিশ্বকে সুন্দর ও সুখী করে গড়ে তুলতে এইরূপ একটি সর্বজনীন আদর্শের প্রয়োজনীয়তা মানব জীবনে অপরিহার্য। মানব সভ্যতা সকল প্রকার তন্ত্র, মন্ত্র, আর 'ইজমের' আস্বাদ গ্রহণ করে ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে সেই সুমহান আদর্শের দিকেই ধাবিত হচ্ছে।

ইসলাম আমাদিগকে জীবন-মরণ সম্পর্কে সজাগ করে তোলে। মৃত্যুকে স্বার্থকতায় ভরে দিয়ে মানুষ যাতে পরপারের দিকে যাত্রা

করতে পারে তার জন্যে জীবনের 'জেশ্‌ট' সম্পর্কে মানুষকে করে তোলে অতিশয় উন্নতমনা। মানুষ যাতে পার্থিব ভোগে জীবনকে বিনষ্ট না করে, মৃত্যুকে কলংকিত না করে তার জন্যে ইসলাম পরকালে বিশ্বাস স্থাপন করে। কারণ–মানুষ মরে কিন্তু তার আদর্শ মরে না, কালের গর্ভে অমর হয়ে থাকে–যদি উহা মানব সমাজের জন্যে কল্যাণকর হয়। মানুষের চেয়ে মানুষের কাজ বড় এই কথাটি হৃদয়ঙ্গম না করলে মানুষ তার আসল বৈশিষ্ট্য হারিয়ে পশুদেরও নীচে চলে আসে। এই জন্যই মহানবী (সঃ) মৃত্যুকে বার বার স্মরণে রেখে কর্তব্য সম্পাদনের নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ, সমুদ্রের পানিতে পিপাসার পরিসমাপ্তি না হয়ে উহা আরও দ্বিগুণ হয়–তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি যতই সেই পানি পান করে ততই তার পানি পানের স্পৃহা বৃদ্ধি পায়, পরিশেষে দারুণ পিপাসার জ্বালা নিয়ে তাকে মৃত্যুর মুখে পতিত হতে হয়। ব্যক্তিগত ভোগের ইচ্ছাও তেমনিভাবে আমাদিগকে মৃত্যুর দুয়ারে হাজির করে–তাই তা বার বার মনে করলে এর আসল স্বরূপটি ধরা পড়ে আর আমরাও শুদ্ধ মনে বাস্তবতার সাথে লড়তে পারি। আর অম্লানবদনে প্রফুল্লচিত্তে–'জীবন ধারনের জন্যে একখানি রুটি, পড়নের জন্যে একখানি কাপড়, পানি পানের জন্যে একখানা পাত্র ব্যতীত আর কিছু রাখার অধিকার আদম সন্তানের নেই'–এই মানুষের সমধিকার প্রতিষ্ঠার এহেন বাণীকে মেনে নিতে পারি। শুধু মেনেই নয় বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগও করতে সক্ষম হই।

তাই ইসলামকে ধর্মের সাথে যোগ না করে–ইহার আদর্শে মাহাত্ম্য উপলব্ধি করলে মানব সভ্যতা সত্যি সত্যিই উন্নতির চরমে পৌঁছতে সক্ষম হবে।

আমার জবাব

শেখ আবদুল আজিজ
ঢাকা

আপনার 'হক-কথা'য় পরস্পর বিরোধী বিষয় পেশ করা হচ্ছে বলে আমরা মনে করি। আপনি প্রগতিশীল রাজনীতিকে বিপ্লবী ছাঁচে ঢালাই করে বাংলাদেশকে বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে আলোচ্য বিষয় করছেন। আপনার পত্রিকায়ও সেই আলোকে লেখা বের হচ্ছে ঠিকই কিন্তু তৎসঙ্গে ধর্ম সংক্রান্ত বিষয়াদি নিয়ে আলোচনার অবতারণা না করলেই ভাল হত। কারণ আগেই বলেছি, তা পরস্পর বিরোধী। আপনি কেন এতে ইন্টারেস্ট দেখাচ্ছেন?

উত্তর

কোনটা প্রগতিশীল, কোনটা বিপ্লবী এসব যাচাই করে আমি কোন দিন রাজনীতি করিনি। বরং আমি যা করেছি তা বিশ্লেষণ করে আপনারা যা খুশী আখ্যা দিয়েছেন। তাতে আমার কিছু আসে যায় না। কারণ, আমার আসল দ্রষ্টব্য বিষয় হচ্ছে কিসে মানুষের কল্যাণ নিহিত আর আমি ন্যায় ও সত্য পথে আছি কিনা।

ধর্মের আনুষ্ঠানিকতা ও এর প্রতি মানুষের অন্ধ আকর্ষণকে এক্সপ্লয়েট করে রাজনীতি করা আমি কোনদিন পছন্দ করিনি। যতদূর জানি, আমি তা করিও নি। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি নিরেট বস্তুবাদকে ভিত্তি করে কোন রাজনীতি-অর্থনীতিই মানুষের চূড়ান্ত স্থায়ী কল্যাণ সাধন করতে পারে না। মানুষকে যতদূর বাস্তববাদী হওয়া দরকার ততটুকু তাকে হতেই হবে। এর মানে এই নয় যে তার আত্মার অনন্ত খোরাককে অস্বীকার করবে। সাহিত্য ও ললিতকলা যেমন বস্তুভিত্তিক চেতনার উন্মেষ ঘটাতে পারে ঠিক তেমনি ভাবধর্মী মূল্যবোধ মানুষকে শক্তি এবং সমৃদ্ধি দিতে পারে বলে ইতিহাসে প্রমাণিত হয়েছে। সেই প্রমাণের অপব্যাখ্যায় ও অপপ্রয়োগে যারা রাজনীতি খাড়া করে তারা মানবতার এক নম্বরের দুশমন।

ইতিহাসে দুটি দিকই রয়েছে। একদিকে স্বার্থপর শ্রেণীর লোক জনগণকে ধোঁকা দিয়ে শোষণের কৌশল শক্তিশালী করেছে। সঙ্গে সঙ্গে সত্যিকার ধর্ম মানুষকে সরল ও সোজা পথে রেখে বিশ্বশান্তি ও বিশ্ব কল্যাণে অনস্বীকার্য অবদান প্রতিষ্ঠা করেছে। তাই প্রমাণিত হয়েছে, মাছ যেরূপ পানি ছাড়া জীবিত থাকতে পারে না, ঠিক তেমনি মানুষের আত্মা যেকোন ধর্মের মর্মবাণী অস্বীকার করতে পারে না। ভণ্ডদের ধর্মকে ঝেটিয়ে দূর করতে পারলে সত্যিকার ধর্ম মানবজাতির শুধু আত্মিক উন্নতিই সাধন করবে না, বিশ্ব শান্তি ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব ভাব কায়েম করতে যথেষ্ট সাহায্য করবে। তবে হ্যাঁ, ধর্মের মর্ম বাস্তবানুগ ও বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গীতে গবেষণা, যাচাই ও উপস্থাপন করতে হবে।

হয়ত বা আমার একক জীবনে প্রমাণ করা সম্ভব হবে না, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি কারিগরি সভ্যতা তথা বস্তুতান্ত্রিক মূল্যবোধের চরম বিকাশের ফলে মানবজাতি শেষ পর্যন্ত বাধ্য হবে ভাবধর্মী আদান-প্রদান গ্রহণ করতে। একবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই এই কথাটি দুনিয়ার সর্বত্র সত্য প্রমাণিত হবে। এর পূর্ব পর্যন্ত জনগণকে সততা ও সাধুতার পথে রাখতে হলে প্রতি দশকে সাংস্কৃতিক বিপ্লব করে যেতে হবে। ঠিক তেমনি কোন জাতিই কেবল ভাববাদী চিন্তাধারায় টিকে থাকতে পারবে না। দুনিয়ার বাস্তব পরিবেশকে মেনে নিতে হবে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় ধর্মীয় চেতনাকে যেভাবে প্রয়োগ করছে আমি যতদিন বেঁচে থাকব তার বিরোধিতা করে যাব।

প্রগতি ও বিপ্লবের সাথে, অন্ততঃ বাংলাদেশে যে হালে তা কামিয়াব হতে যাচ্ছে, মানুষের অন্তরের খোরাক অর্থাৎ সর্বহারার মুক্তি নির্ভর ধর্মীয় মর্মবাণীর বিরোধ রয়েছে বলে আমি বিশ্বাস করি না। তাই এসব আলোচনায় আমার পার্শ্ব আকর্ষণ রয়েছে।



সাম্প্রদায়িকতা শোষণকারীকে সহায়তা করে মাত্র – গরীবের হয় সর্বনাশ

।। পর্যবেক্ষক ।।

চরের হাট। দুধ বিক্রি করছেন একজন কৃষক। এক হিন্দু ভদ্রলোক দুধ কিনে টাকা দিতে গিয়ে বিপত্তি বাধে।

টাকাটা শুধু পুরানো নয়, রীতিমত ছেঁড়া। দুধওয়ালা আপত্তি করল, বাবু এটা একেবারেই চলবে না। বদলিয়ে দিন। ক্রুদ্ধ জবাব এলো, চলবে না কিরে বেটা, ' আলবৎ, চলবে।' আবার আপত্তি, 'তা হলে অন্যত্র চালান।' হিন্দু ভদ্রলোক এবারে রেগে টং।" বলিস কি বেটা। তোদের কি সেদিন রয়েছে। কথায় কথায় তর্ক করিস?"

এরপরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত। আশেপাশের ক'জন মুসলমান কৃষক এক হয়ে গেল। একজন হিন্দুর কলার ধরা হলো। তর্জন গর্জন, হৈ-চৈ। ব্যাপারটা একটা ছোটখাট সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় রূপান্তরিত হতে পারতো।

অনুরূপ আরেকটি ঘটনা। ঢাকাগামী বাসের বাস কণ্ডাক্টর যাত্রীর কাছে ভাড়া দাবী করল। বাস-যাত্রী সদ্য সীমান্ত অতিক্রান্ত একজন। স্বাধীন বাংলাদেশে সবে পা রেখেছেন। ভাড়া নিয়ে কণ্ডাক্টারের সাথে বচসা। এবং পরিশেষে ক্রুদ্ধ আস্ফালন, 'ব্যাটারা সেদিন আর নেই। মুখ সামলে কথা বলবি।'

অমন টুকরো টুকরো ঘটনা অহরহ ঘটছে এবং ঘটছে আমাদের চোখের সম্মুখেই। কিন্তু আমরা নির্বাক। আমরা স্বীকার করি দিন না বদলালেও আজ অন্ততঃ দিন বদলের পালা। কিন্তু সে কোন দিন? দিন কি উল্টোমুখী প্রবাহিত হতে পারে? ভূতের পা পেছন দিকে, কিন্তু সময় কখনও পেছনে ফিরে যায় না। সময় এগিয়ে যায় শুধু সম্মুখে।

গোড়া থেকেই শুরু করা যাক। বৃটিশ আমল থেকেই হিন্দু মধ্যবিত্তের দোর্দণ্ড প্রতাপে দেশের মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজ নিষ্পেষিত, সংকুচিত। বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্যই ছিল যাতে করে বাংলার হিন্দু মধ্যবিত্ত স্বার্থ অটুট রাখা যায়। বঙ্গভঙ্গ হলে যে হিন্দু মধ্যবিত্ত স্বার্থ রক্ষা করা যাবে না। তাই চালাও আন্দোলন। অবশেষে পাকিস্তান সৃষ্টির কল্যাণে ১৯৪৭-এ বঙ্গ আবার ভঙ্গ হল এবারে আর শেষ কূল রক্ষা করা গেল না। মুসলমান মধ্যবিত্তরা ফুলে-ফেঁপে কলাগাছ হবার সুযোগ পেল। হিন্দু মধ্যবিত্তের সৌভাগ্য। সূর্য অস্তমিত হল। বাংলাদেশ স্বাধীন হলে সেই সূর্যের নতুন উদয়ের আশায়ই কি কেউ কেউ দিন বদলে গেছে'র সুখ চিন্তায় বিভোর? কিন্তু হায়! সে আশায় গুড়েবালি।

গত ন'মাসের ইতিহাস পর্যালোচনা করে একথাটি অস্বীকার করবার উপায় নেই যে বর্বর পাকবাহিনীর তীক্ষ্ণ বেয়নেট খাড়া হয়ে নেমে এসেছে প্রধানতঃ এদেশের অসহায় হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর। জামাতি ও আলবদরী গুণ্ডাদের অকথ্য অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে এদেশের প্রায় প্রত্যেকটি হিন্দু পরিবারকেই গৃহত্যাগী, দেশত্যাগী হয়ে দুঃস্থ, অনিশ্চিত জীবনযাপন করতে হয়েছে প্রতিটি মুহূর্তে।

সেই নির্মম অত্যাচার আর নিষ্পেষণে হিন্দু সম্প্রদায় সচেতনভাবে না হলেও অন্ততঃ অসচেতনভাবে কিছুটা সাম্প্রদায়িক আজ হয়ে উঠতে পারে এই সম্ভাবনাটা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তাই কেউ কেউ হয়ত দিন বদলের নতুন থিউরী আওড়াতে পারে।

কিন্তু ব্যাপারটি সুদূরপ্রসারী সেজন্যেই এই আলোচনার অবতারণা। সাম্প্রদায়িকতা এদেশের মানুষের মনের গভীরে প্রোথিত। কোন সম্প্রদায়-বিশেষকে এজন্য দায়ী করা হলে তা হবে সত্যের অপলাপ। যুগ যুগ সঞ্চিত সংস্কার ভ্রান্ত ও আচ্ছন্ন ধ্যান-ধারণা এবং ভুল রাজনৈতিক শিক্ষা আমাদেরকে আমাদের অজান্তেই বিষ-ধোঁয়ার মত সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে আচ্ছন্ন করে। তথাকথিত পাকিস্তান রাষ্ট্রটির জন্মের আগে যখন একজন বাঙ্গালী দরিদ্র মুসলমান অত্যাচারী হিন্দু জমিদারের হাতে নিগৃহীত হতো, তখন সে জমিদারকে শুধু বিধর্মী হিসাবেই দেখেছে, প্রত্যেক জমিদারই যে অত্যাচারী এ শিক্ষা সে পায়নি। সে নিজের দুর্দশার জন্য জমিদার শ্রেণীকে দায়ী না করে দায়ী করছে হিন্দু ধর্ম ও সম্প্রদায়কে। এই ভুল শিক্ষাই তাকে যুগ যুগ দেওয়া হয়েছে এবং ফলে হিন্দু জমিদার -জোতদার -মহাজন-ব্যবসায়ী ও আমলার সত্যিকার চেহারা সে চিনতে পারেনি। পাকিস্তান হাসিলের পর হিন্দুর বদলে যখন মুসলমান জোতদার-ব্যবসায়ী কারখানার মালিকের স্থান গ্রহণ করলো, তখন অন্ততঃ আশা করা গিয়েছিল যে তাদের শ্রেণী সম্পর্কে জনসাধারণের দৃষ্টি খুলে যাবে। কার্যতঃ নতুন এক কুয়াশাজালে তাদের দৃষ্টিকে গুলিয়ে দেওয়া হল। বলা হল পশ্চিম পাকিস্তানী ব্যবসায়ী, কারখানা-মালিক ও আমলারা শোষণ করছে বাঙ্গালীদেরকে। ফলে এখানেও দৃষ্টি রয়ে গেল সেই তিমিরেই। আসলে সকল জমিদার-জোতদার-মহাজন-ব্যবসায়ী ও কারখানা-মালিকের শ্রেণী এক – সে হিন্দুই হোক, পশ্চিম পাকিস্তানী হোক অথবা বাঙ্গালী হোক এই সত্য কথাটা সত্য করে বলা হয় না। বলা হয় না সঙ্গত কারণেই। তাহলে বাঙ্গালী আর বাঙ্গালীকে শোষণ করতে পারবে না; তাহলে গরীব

বাঙ্গালী ধনী বাঙ্গালীর ভাওতাবাজীতে আর ভুলবে না। বরং কৃষক-শ্রমিক ভুখা বাঙ্গালী ধনী বাঙ্গালীর টুটি চেপে ধরে আসল অধিকার প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর হবে। অতএব যত পার ঘোলা জলে মাছ শিকার কর। সাবধান! ব্যাটাদের যেন চোখ না ফোটে। ছোটলোকের চোখ ফুটলেই যত মুছিবত।

মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ নামক এক জাতির জনক একদা বলেছিলেন, 'হিন্দু আর হিন্দু থাকবে না, মুসলমান আর মুসলমান থাকবে না। তারা সকলে পাকিস্তানী। এই হবে তাদের মুখ্য ও জাতীয় পরিচয়।' কার্যতঃ হলো উল্টো। ধর্ম নিরপেক্ষ বাংলাদেশের শ্লোগান অনেকটা একই রকম। কিন্তু কার্যতঃ মুসলমান যে মুসলমানই এবং হিন্দু হিন্দু রয়ে গেছে একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। বরং অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় এদেশে সম্প্রদায় হিসাবে অবদমিত হিন্দুদের অনেকেই আজ অতি হিন্দুত্বের জোয়ারে টালমাটাল। দৃষ্টি-ভঙ্গি ও মানসিকতা রাতারাতি পরিবর্তিত না হলেও অন্ততঃপক্ষে একথা আশা করা গিয়েছিল যে সবরকম ধর্মীয় বাড়াবাড়ি বাংলাদেশে পরিত্যাজ্য হবে। তা না হলে এই ছিদ্র পথেই নতুন করে সাম্প্রদায়িকতার চোরাগুপ্তা সাপ আবার লক্ষীন্দরের জীবন নাশ করতে পারে। বিশেষতঃ আজ যখন বাংলাদেশের দ্বারপ্রান্তে শ্রমিক-কৃষক রাজ প্রতিষ্ঠার স্বর্ণপ্রহর সমুপস্থিত, এমন সময়ে সাম্প্রদায়িকতাকে উস্কে দিয়ে আবার নতুন করে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করবার সমস্ত প্রচেষ্টাকে রুখতে হবে সর্বশক্তি দিয়ে।

আজ কৃষক-শ্রমিক সমবায়ে গঠিত জনসাধারণকে বুঝাতে হবে সাম্প্রদায়িকতা শুধুমাত্র শোষণকারীর সহায়তা করে আর গরীবের করে সর্বনাশ। বুঝাতে হবে সর্বপ্রকার শোষণকে বন্ধ করতে হলে প্রথমেই উৎখাত করতে হবে সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ও দাঙ্গা। বুঝতে হবে সকল দেশের সকল সম্প্রদায়ের শোষিত, বুভুক্ষ জনতা এক জাত, এক শ্রেণী। আর তাদের শত্রু সকল দেশের সকল সম্প্রদায়ের ধনিক-বণিক শ্রেণী।

যান্ত্রিক চাষাবাদ বনাম বাংলার চাষী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কোন কোন রাজনৈতিক নেতা আমাদেরকে দলে ভিড়বার জন্য ডাক দিলেন, আমরা তা গ্রহণ করিনি। আমাদের দাবী ন্যায্য। এর পেছনে প্রতিটি দেশদরদীর সমর্থন অনিবার্য। আমরা সবার কাছেই সমান দাবী জানলাম। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী আশ্বাস দিলেন ঋণমুক্তি, ক্ষতিপূরণ ও আমলা-এজেন্টদের বিচার অবশ্যই করতে হবে, আমরা বাধ্য করব সরকারকে।

অনেকে কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণের প্রশ্নে যৌক্তিকতার পরিমাণ খুঁজছেন, কিন্তু বিদেশী এবং কেতাবী ফরমুলার সঙ্গে বাস্তব ও বিশেষ পারিপার্শ্বিক অবস্থার সামঞ্জস্য মিলালে দেখা যাবে এদেশে যে সকল কাজে কৃষিযন্ত্র ব্যবহৃত হয় তা বেকার সমস্যা বাড়াবেনা কোন দিন। আমাদের লক্ষ্য শ্রম লাঘব নয়– নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে সর্বোচ্চ উৎপাদন হার অর্জন। অতএব যন্ত্র এদেশে আবশ্যক কিন্তু এর ব্যবস্থাপনার পরিবর্তন অপরিহার্য। এলাকাগত বৈশিষ্ট্য ও যন্ত্রের চাহিদা, সরকারী খামারে পরীক্ষিত যন্ত্রের আমদানী, মেরামত ও খুচরা অংশের নিয়মিত সরবরাহ, কৃষকদের দাবী ও পরামর্শকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিবেচনা ও আশুব্যবস্থা গ্রহণ, আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার মূল্যোৎপাটন প্রভৃতি বিষয়ে সময়ানুগ নীতি গ্রহণ করতে হবে। আইয়ুবী স্কীমের ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান করে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাকে ত্রুটিমুক্ত করতে হবে এবং যে সব ব্যবসায়ী ও সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মচারীরা জেনেশুনে বাঙ্গালীর রক্ত শোষণে

সাহায্য করেছে তাদের বিচার করতে হবে। এবং কৃষক সমাজকে সে বিচারের ফলাফল জানাতে হবে। কৃষি বিষয়ক পরিকল্পনা মাটির সঙ্গে সম্পর্কহীন কেতাবী বিদ্যার পুঁজি নিয়ে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে বসে তৈরী করলে ফল আগের মতই হবে; ওসব মাটির কাছাকাছি এসে করতে হবে এবং মাটির মানুষের মুখের ও মনের ভাষা শুনতে হবে, বুঝতে হবে।

বাংলাদেশ সরকার পাক-সরকারের উত্তরাধিকার নয়। বিপ্লবী সরকার তাই পাকিস্তানের কোন চুক্তি, কোন ঋণ বা দায়-দায়িত্ব এ সরকার নেননি। আমরাও পাক-ঋণ বা পাক-সরকারের কোন চুক্তি রক্ষার দায়িত্ব বহনে প্রস্তুত নই, ছিলাম না আগেও। এটাও জানি গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার মূলমন্ত্রে গঠিত সরকারের কাছে প্রথাগত দাবী পেশের প্রয়োজন খুব একটা নেই। তবু আমাদের দায়িত্ব পালন করতে হবে, আমাদের আশা-কল্পনা ও কর্মসূচীর সঙ্গে রাষ্ট্রীয় কর্মসূচীর সামঞ্জস্য রক্ষা করতে হবে। তাই আর বিরোধ নয়, আপোষ ও গঠনমূলক মনোভাব নিয়ে আমরা কয়েকটি প্রস্তাব পেশ করছি ঃ

(১) অবিলম্বে কৃষিঋণ মাফ সম্পর্কিত সরকারী নির্দেশ ঘোষিত হোক এবং বন্ধকী জমি ফেরৎ দেয়া হোক।

(২) ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ক্ষতিপূরণের জন্য সংশ্লিষ্ট কোম্পানী বা কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করা হোক।

(৩) কৃষি ব্যাঙ্ক ও কোম্পানীগুলির কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের বিগত বছরগুলোর কার্যকলাপ ও আয়-ব্যয়ের সুষ্ঠু তদন্ত করে দোষীদের শাস্তি দেয়া হোক।

(৪) সবগুলি কোম্পানী বা এজেন্সী সরকারী নিয়ন্ত্রণে এনে প্রয়োজনীয় অংশ আমদানী এবং সম্ভাব্য পার্টস টুলস ফ্যাক্টরীতে তৈরীর ব্যবস্থা করা হোক।

(৫) কৃষিকে একটি লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত করতে হবে। সরকারী পুঁজি নিয়োগে উৎসাহ দেয়ার জন্য অন্ততঃ দশ বছর কৃষকদেরকে ঝুঁকি গ্রহণ থেকে মুক্ত রাখা হোক এবং সরকারী তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা করা হোক।

(৬) প্রত্যেক ইউনিয়নে মোট জমির পরিমাণ সেচ ও চাষের জন্য কতটা পাম্প ও টিলার প্রয়োজন তার হিসেব করা হোক। এরপর ব্যক্তিগত মালিকানায় উক্ত এলাকায় যে কয়টা যন্ত্র আছে সেগুলো বাদে বাকী মেশিন আমদানী করে একসঙ্গে একই নিয়মে কাজে লাগাতে হবে।

(৭) প্রত্যেক ইউনিয়নে একাধিক যৌথ খামার প্রতিষ্ঠা করে জমির সীমানা প্রসারিত করে সমবায় পদ্ধতিতে কাজ করার উৎসাহ দেয়া হোক।

(৮) ইউনিয়ন পঞ্চায়েত থেকে জাতীয় স্তর পর্যন্ত পর্যবেক্ষক বা উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হোক। এতে কৃষি বিশেষজ্ঞ, কৃষি কর্মচারী ও অভিজ্ঞ কৃষকদের জন্য নির্দিষ্টসংখ্যক আসন থাকবে। পঞ্চায়েত পর্যায়েও এর দফতর ও নিয়মিত বৈঠকের ব্যবস্থা থাকবে। এসব পরিষদ কর্তৃক কৃষি ও কৃষকদের সমস্যাদি সমাধানের জন্য যে সুপারিশ পেশ করা হবে তা কার্যকরী করতে হবে। জাতীয় স্তরে দেশী-বিদেশী বিশেষজ্ঞ, রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি এবং অভিজ্ঞ সাংবাদিকদের রাখার ব্যবস্থা থাকবে।

(৯) থানা পর্যায়ে কৃষি যন্ত্রের মেরামত ও পরিচালন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, খুচরা অংশ মেকানিক তেল মবিলের সরবরাহ কেন্দ্র খোলা হোক।

(১০) কৃষি সংক্রান্ত বিভিন্ন নামের বিভাগের সংখ্যা কমিয়ে ব্যয় হ্রাস করে কৃষি বিভাগকে সুসংগঠিত করা হোক। আমলাতান্ত্রিক মানসিকতা দূরীকরণার্থে প্রত্যেক কৃষি

কর্মচারীকে বাধ্যতামূলকভাবে নির্দিষ্ট সময় কৃষকদের সঙ্গে কাজ করার ব্যবস্থা করা হোক।

(১১) কৃষিজাত দ্রব্যের সুষ্ঠু বাজারজাত করার জন্য পঞ্চায়েত পর্যায়ে ব্যবস্থা গৃহীত হোক। এবং অভাবী কৃষকদের পণ্য বেচার আগে প্রয়োজন মেটাবার জন্য ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থা চালু করা হোক।

হুঁশিয়ার পরিস্থিতি ঘোলাটে করবেন না

—ভাসানী

আজ যখন দেশে দুর্ভিক্ষাবস্থা, বসন্তের প্রকোপ, অন্নবস্ত্রহীনের মিছিল তখন রাজনৈতিক কোন্দল সৃষ্টি করে পরিস্থিতিকে ঘোলাটে করা রাষ্ট্রদ্রোহিতার নামান্তর। বাংলার স্বাধীনতা বিপন্ন হয়, পুনর্গঠন কর্মসূচী ব্যাহত হয় এমন যেকোন প্রকার উদ্যোগকে সকল শক্তি দিয়ে রুখতে হবে । যে মহলই এর পাঁয়তারা করুন না কেন শুরুতেই তাদের মুখোশ উন্মোচন করে জনতার আদালতে তাদের বিচার হওয়া উচিত।

স্বাধীনতার পর থেকেই মনযোগের সাথে আমি লক্ষ্য করে আসছি যে বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ও কৃষক সমিতির জনপ্রিয়তাকে বরদাশত করতে না পেরে প্রগতিবাদী বলে পরিচিতমহল নানা কৌশলে দল দুটোর সাংগঠনিক গতিধারাকে প্রতিহত করবার ফন্দি আঁটছেন। শুধু রাজনৈতিক কূটকৌশলই যদি তারা অবলম্বন করতেন তবে হয়ত দেশের নিরীহ জনসাধারণ এর শিকার হয়ে পড়ত না। কিন্তু তাদের ঔদ্ধত্য এতই বেড়ে গেছে যে শান্তি ও শৃঙ্খলাকে বিপন্ন করে হলেও তারা চায় বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ও কৃষক সমিতির অপ্রতিরোধ্য গতিকে রুখে দাঁড়াতে। তারা সরকারী কর্তৃপক্ষের উপর পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ চাপ সৃষ্টি করে আমাদের কর্মীদের হয়রানি কিংবা জেলে আটক করাচ্ছে। শুধু তাই নয়, আমাদের বিশিষ্ট কয়েকজন কর্মীকে গুম করে তারা সুকৌশলে গা বাঁচাবার চেষ্টা করছে। দেশপ্রেমিকদের নামে নানাবিধ মিথ্যা অভিযোগ ও কুৎসা রটিয়ে জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবার তারা প্রয়াস পাচ্ছে। এহেন মনোবৃত্তি ও ক্রিয়াকলাপকে নিন্দা করবার ভাষা আমার জানা নেই। আমি চাই না যে স্বাধীনতার প্রথম দিনগুলোতেই নিন্দার পর্যায়টুকু অরাজকতা ও হানাহানিতে পর্যবসিত হয়ে পড়ুক। আমি শুধু ধৈর্যের সাথে নিরীক্ষণ করছি আর কর্মীদের প্রতি সহনশীল ও বাস্তবে দেশপ্রেমিক হবার নির্দেশ দিচ্ছি। সরকারী কর্তৃপক্ষের অপারগতা লক্ষ্য করেও আমি বিস্মিত না হয়ে পারি না। কিন্তু তবুও আমি সরকারকে পরিস্থিতি আয়ত্বে আনতে সময় দিতে চাই আর সরকার ও বিশেষ মহল উভয়েই যদি মনে করে বসেন, এই উদারতা আমাদের দুর্বলতা কিংবা এর সুযোগ গ্রহণ করা তাদের জন্যে বাঞ্ছনীয় তবে আমি আজ শুধু হুঁশিয়ার বাণী উচ্চারণ করেই ক্ষান্ত থাকতে চাই – মানুষের দুঃখ-কষ্টকে সম্বল করে রাজনীতি করবেন না, তাহলে হতাশগ্রস্থ জনতা বিক্ষোভে ফেটে পড়বে আর ভয়াবহ দিনগুলোরই পুনরাবৃত্তি ঘটবে।

?

স্বাধীনতার পর তিন তিনটি মাসে বাংলাদেশ সরকার যাকে উত্যক্ত করবার কোন ক্লু পান নি– কতিপয় প্রগতিশীল নামধারীর চাপে রংপুর জেলা কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির অন্যতম কর্মী-নেতা জনাব মশিউর রহমানকে আটক করেছেন বলে জানা গেছে। প্রশ্ন জাগে শুধু, এদেশে কোন ঘসেটি বেগম কাজ করে যাচ্ছেন কি? কি তাদের মটো– বাদামী সমাজতন্ত্র?

মগড়ায় কৃষক সমিতি

মগড়া, টাঙ্গাইল, ১৫ই মার্চ – বাংলাদেশ কৃষক সমিতির মগড়া আঞ্চলিক শাখার এক সভায় কৃষকনেতা জনাব আবদুস সাত্তারকে আহবায়ক করে নয় সদস্য বিশিষ্ট একটি সাংগঠনিক পরিষদ গঠন করা হয়। সদস্যরা হলেন ঃ আবদুল মতিন, খোদা বক্স সরকার, ডাঃ হাবিবুর রহমান, সদর উদ্দিন আহমদ, রোস্তম আলী, হারেজ উদ্দিন আহমদ, মকবুল মুন্সী এবং শেখ মিঞা উল্লাহ।

টাঙ্গাইল ন্যাপের জনসভা

টাঙ্গাইল, ১৫ই মার্চ – সম্প্রতি জেলা ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির উদ্যোগে বিন্দুবাসিনী হাইস্কুল প্রাঙ্গণে ধান-চাউল এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য-বৃদ্ধি প্রতিরোধের দাবীতে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব আবদুর রহমান এবং বক্তৃতা করেন জেলা ন্যাপের আহবায়ক সৈয়দ আবদুল মতিন, জনাব মোহাম্মদ আলী, মুজিবুর রহমান চৌধুরী, মাহফুজুর রহমান, হাজেরা সুলতানা এবং আতোয়ার রহমান। সভায় গৃহীত বিভিন্ন প্রস্তাবে ধান-চাউল ও নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধিতে উদ্বেগ প্রকাশ এবং প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে চোরাকারবার উচ্ছেদ ও ভারতের সাথে আইনসঙ্গত বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে তোলার আহবান জানানো হয়। আসন্ন দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে জেলার সর্বত্র টেষ্ট রিলিফ, কর্মরত মজুরদের মজুরী তিন টাকা ধার্য্য ও গ্রামে-গ্রামে রেশন ব্যবস্থা চালু করার দাবী জানানো হয়।

শহরে আজ হচ্ছে কি

॥ অর্জুন কুমার বসাক ॥

শহরে আজ হচ্ছে কি ?
খবর কিছু রাখেন কি ?
দিন দুপুরে রাহাজানি
নাম পড়ে মুক্তিবাহিনী।
রিলিফের ট্রাকে চোরাই মাল
মজলুম নেতা দেন গাল
এমসিএ-রা বলে না কিছু
ঘুষের জন্য ছুটে পিছু।
করিম রহিম কালু গুন্ডা
সাথে থাকে চোরাই হুন্ডা
মুজিব কোট পরে তারা
পকেটে থাকে টাকার তোড়া
নয়টি মাস দালালী করে
শহরে আজ ঘুরে ফিরে
বলে তারা জোড়ে সোরে
কাজ করেছি দেশের তরে।
এমসিএ-রা যাদের মামা
দালালী করে পায় ক্ষমা
গরীবেরা না খেয়ে মরে
এমসিএ-রা দালান গড়ে।
এত টাকা কোথায় পায়
রিলিফের টাকা কোথায় যায় ?
শহরে আজ হচ্ছে কি
খবর কেউ রাখেন কি ?

ইহা কি সত্য ?

('ইহা কি সত্য' কলামের জন্যে আমরা অসংখ্য রিপোর্ট পাচ্ছি। প্রকাশের পূর্বে আমাদেরকে তদন্ত করে নিতে হয়। তাই সত্য হলে পাঠানো সব রিপোর্ট একে একে ছাপা হবে। জায়গার অভাবেও আমরা একসঙ্গে বেশী আইটেম ছাপতে পারছি না বলে দুঃখিত। প্রসঙ্গতঃ বলতে হচ্ছে সবরকম লেখা ও রিপোর্ট সরাসরি সন্তোষের ঠিকানায় সম্পাদকের কাছে পাঠাবেন।)

।। ১৬ ।।

স্বজনপ্রীতি কম-বেশী সব মন্ত্রণালয়ে ঢুকে পড়েছে।

হিউম্যানিটিজ গ্রুপে আই, এ পাশ করে এম.বি.বি-এস কোর্সে ভর্তি হওয়া যায় এতদিন কারো জানা ছিল না। এমনি দু'জন ছাত্রকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষ (চাটগাঁইয়া নির্দেশে) প্রথম বর্ষে নয়, একেবারে দ্বিতীয় বর্ষে ভর্তি হবার সুযোগদান করে উদারতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। মজার ব্যাপার, কলেজটিতে প্রথম বর্ষে ভর্তি না চললেও দ্বিতীয় বর্ষে তা চলছে। শুধু চলছেই না, মন্ত্রণালয়ের মনোনীত পেয়ারা-পেয়ারীদের অবাধ সুযোগও দেয়া হচ্ছে। স্বজনপ্রীতির অপারেশনে সম্ভাবনা রয়েছে অর্থনীতির (সম্মান) দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষানবীশ জনৈকার এমবিবিএসে জাম্প করার – যেন ন্যায়নীতি কিছু নেই, শুধু নীলক্ষেত থেকে বকশী বাজার। এসবের প্রতিবাদ ও প্রতিকার করতে সবল দেহের দুর্বলমনা কয়েকজন ছাত্র জনৈক মন্ত্রীর দরবারে হাজির হলে তাদেরকে বিদেশ সফরের টোপ দিয়ে সব ঘুলিয়ে ফেলা হয়। প্রতিনিধিদলের সদস্যরা তাই এখন পাসপোর্ট সাইজ ফটো তুলতে ব্যস্ত।

।। ১৭ ।।

সাগরকন্যা কক্সবাজারের সন্তান জনৈক এম.সি.এ সাহেবের বিরুদ্ধে মহকুমার জনসাধারণ মাত্র সতেরটি অভিযোগ এনে লক্ষাধিক লিফলেট ছেড়েছেন। দুঃখের বিষয় তিনি এর একটিরও জবাব দিতে পারেননি। এবং জবাব না দিয়েই যাতে ভবলীলা সাঙ্গ করা যায় তার পাঁয়তারা করছেন। অভিযোগনামায় বলা হয়েছে উক্ত এম.সি.এ সাহেব রেডক্রসের চাউল, কম্বল ইত্যাদি চুরি করেছেন, বন্দুকের লাইসেন্স রিনিউ করার নামে ভাওতা দিয়ে হাজার হাজার টাকা আত্মসাত করেছেন, গ্রামের বাড়ীতে আলশামস বাহিনীর গুপ্তচর বিভাগের মহসিন, জাফর আলম, জালাল আহম্মদ এবং আরো অনেককে আশ্রয় দিয়ে টাকা ও গাড়ী আদায় করেছেন।

।। ১৮ ।।

ময়মনসিংহের এম.সি.এ-রা বড়ই ব্যস্তসমস্ত। হালুয়াঘাট আর শেরপুর থেকে ট্রাকের পর ট্রাক ধান-চাউল পাচারে তাদের কোন সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। কিন্তু একটি অপ্রিয় সত্য কথা জানাজানি হয়ে গেছে। ভারতীয় ট্রাক মাঝে মাঝে পেট্রোলের অভাবে পড়লে নিমক হারামের মত তাদের কেউ কেউ এগিয়ে যান – দোস্তদের ন্যায্যমূল্যে পেট্রোল সরবরাহ করে থাকেন। এদিকে এক গ্যালন পেট্রোল ও কেরোসিনের জন্যে ময়মনসিংহের জনসাধারণ জনৈক এম.সিএ-র বাড়ীতে ঘন্টার পর ঘন্টা ধর্ণা দিয়েও বিফল হয়ে ফিরে আসেন।

।। ১৯ ।।

ঢাকা-ক-এর ৮১০ নং টয়োটা গাড়ীটিতে রেডক্রসের ছাপ মেরে ডাকাতি, রাহাজানি করা হচ্ছে। গত ৮ই মার্চ সকালে এই গাড়ীর সাহায্যে মিরপুরের নিকট ঢাকাগামী একটি ট্রাকযাত্রীর সর্বস্ব লুণ্ঠন করা হয়। গাড়ীটির দখলকার নিজেকে মুক্তিবাহিনীর প্রাক্তন কোম্পানী কমাণ্ডার বলে পরিচয় দিয়ে থাকে।

এমনি আর একজন কোম্পানী কমাণ্ডারশীপের দাবীদার (থানা কালিহাতী) নগরবাড়ী গ্রামের কুখ্যাত চোর ও দুর্ধর্ষ রাজাকার হবুচোরকে তেরশত টাকা ঘুষের বিনিময়ে ছেড়ে দিয়েছেন। এতে এলাকাবাসী অনিশ্চয়তা ও অনিরাপত্তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন।

সম্পাদক ঃ সৈয়দ ইরফানুল বারী সন্তোষ, টাঙ্গাইল। মুদ্রণে–কল্লোল প্রেস, সদর সড়ক।

এবারের প্রতি কপি পঁচিশ পয়সা সাপ্তাহিক রেজিস্টার্ড নং-ডিএ ১৭৭

হক-কথা

(WEEKLY THE HAQ-KATHA)

প্রকাশক ও পৃষ্ঠপোষক ঃ মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

প্রথম বর্ষ পঞ্চম সংখ্যা শুক্রবার ১০ই চৈত্র ১৩৭৮; ২৪ শে মার্চ, ১৯৭২; ৭ই সফর, ১৩৯২; প্রতি সংখ্যা ঃ বিশ পয়সা; সন্তোষ, টাঙ্গাইল

হয় ফাঁসি নয় উৎখাত

ঢাকা, ২৪ শে মার্চ – আজ বিকেলে এক জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে মওলানা ভাসানী সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন, 'দোষী সাব্যস্ত হলে আমাকে ফাঁসি দাও, নইলে সরকারকে উৎখাত করতে আমি অবিরাম আন্দোলন শুরু করবো।'

বানোয়াট কতকগুলো কাহিনী জুড়ে দিয়ে ঢাকার একটি বাংলা দৈনিকে দাবী করা হয়েছে যে মওলানা ভাসানী বাংলাদেশের স্বাধীনতা নস্যাৎ করতে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র পাকিয়েছেন। নবতিপর বৃদ্ধ মওলানা তারই জবাব দিচ্ছিলেন।

মওলানা সাহেব বলেন, 'মুসলিম লীগ আমলের সংক্রামক ব্যাধিসমূহ দুর্নীতি, দমননীতি, মিথ্যা অভিযোগ, আমলাতন্ত্র আজকের আওয়ামী লীগ সরকারকেও পেয়ে বসেছে। এসব এড়াতে না পারলে এই সরকারের পতন অনিবার্য।'

মওলানা বলেন, 'আটটি বৎসর আমি বাংলার চার হাজার ইউনিয়ন চষে বেড়ায়েছি আওয়ামী লীগ সংগঠন করতে। কিন্তু পররাষ্ট্রনীতির প্রশ্নে সিয়াটো, সেন্টো ইত্যাদি পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তির বিরোধিতা করে আমি সেই প্রাণপ্রিয় আওয়ামী লীগকে ত্যাগ করেছি। এই বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জনমত আমিই গড়ে তুলেছি। কিন্তু আমি জানি না কোন দুঃসাহসে আমাকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বন্ধু বলে সাজানো হয়েছে।'

মওলানা সাহেব তাই আবেগস্পর্শী উত্তেজিত কণ্ঠে দাবী করেছেন, 'আনীত অভিযোগ সত্য-মিথ্যা যাচাই করতে হাইকোর্টের একজন বিচারপতির নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিশন গঠন করা হউক। তাতে যদি আমি দোষী সাব্যস্ত হই এই ৯০ বৎসর বয়সেই আমাকে ফাঁসি দিন। আর যদি তা না করা হয় তবে মিথ্যাচারী দুর্নীতিপরায়ণ সরকারকে উৎখাত করতে আমি আপোষহীন সংগ্রাম শুরু করব।'

মওলানা সাহেব বলেন, 'একদিকে আমি যখন আশা করছি বাংলাদেশের এক ইঞ্চি মাটিও যুক্তরাষ্ট্রের পায়ের তলায় নাই ঠিক তখনই এসব মিথ্যা প্রচারে দুনিয়াবাসীর কাছে তোলে ধরা হল। বিদ্রোহী ষড়যন্ত্রকারীদের শক্তি কম নয়। কারণ, তাদের সাথে স্বয়ং ভাসানী রয়েছেন। আমার যেমন তেমন তাতে যে বাংলাদেশ সরকারের অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়েছে তা অভিযোগকারীরা বুঝতেই পারছে না।'

দৃপ্তকণ্ঠে মওলানা সাহেব বলেন, 'হুমকি কিংবা ফাঁসির ভয় দেখিয়ে ভাসানীকে দমানো যাবে না। গুপ্তঘাতক দিয়ে তোমাদের যেমন হত্যা করবার সাধ আছে ঠিক তেমনি আদর্শের জন্যে মরবার অধিকার আমারও ১০০ বার রয়েছে। আমি ভাসানী – ভাসানীই। তা থেকে দুনিয়ার কোন শক্তি আমাকে কমাতেও পারবে না, বাড়াতেও পারবে না।'

মওলানা বলেন, 'আমি বাংলাদেশ ও ভারতের বন্ধুত্ব কামনা করি। কিন্তু দু'দেশে সমাজতন্ত্র কায়েম না হলে বন্ধুত্ব টিকে থাকবে না। আমি বরাবরই যুদ্ধ জোটের ঘোর বিরোধী। আমি বিশ্বাস করি প্রভুত্বমূলক বন্ধুত্ব নয়, ভ্রাতৃত্বধর্মী বন্ধুত্বই টিকে থাকে। সমাজতন্ত্র কায়েম কোন মুখের কথা নয়। তার জন্যে দেশবাসীর মন তৈরী করতে হবে। আবার পুঁজিপতিদের ক্ষতিপূরণ দিয়ে জাতীয়করণ করলেই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় না। তজ্জন্য দরকার ব্যক্তিগত মালিকানার সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন করে দেশের যাবতীয় সম্পদের সমবন্টন।'

বিতর্কমূলক সমন্বয় কমিটি সম্পর্কে মওলানা সাহেব মোটমাট একটি কথাই বলেছেন, 'এই কমিটির বেঠকে আমাকে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাবটি একরকম চাপিয়ে দিতে হয়েছিল।'

ভাসানী ষড়যন্ত্রকারী: কাদের সিদ্দিকী দুষ্কৃতিকারী

'ইসলাম গেল, ইসলাম গেল', বলতে বলতে যেমনিভাবে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী আজকের বিধ্বস্ত পরিবেশে পৌঁছেছেন, আমরা জানি না বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠী তারই পুনরাবৃত্তি করতে যাচ্ছেন কিনা। তারা বলে চলছেন, স্বাধীনতা নস্যাৎ হয়ে গেল। তাই সবাই চুপচাপ থাক। আওয়ামী দুর্নীতি ও দমননীতির বিরুদ্ধে কেউ টু শব্দটি করতে পারবে না।

শেরে বাংলা ফজলুল হকের দেশপ্রেম নিয়ে একদিন যারা প্রশ্ন তোলেছিলেন তাদেরই দোসররা আজ মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক জীবনের সততা-সাধুতা সম্পর্কেও জঘন্য বক্তব্য পেশ করেছেন। মওলানা সাহেব কঠোর ভাষায় এসবের জবাব দিয়েছেন এবং নির্মম পরিণতির জন্যেও হুঁশিয়ার থাকতে বলেছেন।

এদিকে আবার অন্য একটি খেলা জমে উঠেছে যা নাকি বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষায় ও অভ্যন্তরীণ শান্তির পথে মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

বাংলাদেশ ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সংসদের পাঁচ দিনব্যাপী বর্ধিত সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করে বলা হয় যে বাংলাদেশের ভৌগলিক স্বাধীনতা লাভের পরও টাঙ্গাইল জেলার স্বঘোষিত সামরিকবাহিনীর প্রধান কাদের সিদ্দিকী ও তার বাহিনীর কতিপয় দুষ্কৃতিকারী অত্যাচার, নির্যাতন, ব্যাঙ্ক লুট, জনগণের কাছ থেকে অর্থ আদায়, যুদ্ধ-ট্যাক্স আদায়, প্রধানমন্ত্রীর নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ভয়ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে প্রশাসন যন্ত্রের উপর প্রভাব বিস্তার, ছাত্রলীগ কর্মীকে হত্যা ও মারপিট ইত্যাদির মাধ্যমে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে টাঙ্গাইলের জনগণকে স্বাধীনতার স্বাদ থেকে বঞ্চিত করেছে।

বিস্মিত হতে হয়, যারা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে থেকে ভাতা গ্রহণ করেই স্বাধীনতা সংগ্রাম সেরেছেন, যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়ে থাকে অনেক কিছু আত্মসাতের, তাদের মুখেই শুনতে হয় স্বাধীনতা সংগ্রামী কাদেরীয়া বাহিনী আজ দুষ্কৃতিকারী। মিথ্যার বেসাতিতে ভুট্টোও লজ্জা পেলেন না তো?

হক-কথার চাঁদার হার

বার্ষিক – নয় টাকা

ষান্মাষিক- পাঁচ টাকা

কে জবাব দেবে?

বাংলাদেশ সরকার জবাব দেবেন কি, কী ঘটনা প্রবাহে বিগত ১০ই মার্চ খুলনা সদর হাসপাতালে কয়েক শত আহত মানুষ আশ্রয় নিয়েছে ? খালিশপুর কলোনীতে কয়েক ঘন্টায় কত হাজার মানুষের রক্ত প্রবাহিত হয়েছে? বাগেরহাটের মঠবাড়িয়া বাজারে কেন একজন নিহত ও প্রায় একশত জন আহত হয়েছে? চট্টগ্রামের ঝাউতলায় পানির অভাবে কতগুলো শিশু প্রাণ হারাচ্ছে? মোমেনশাহীর পতিতালয়ে দুই সাবেক কমাণ্ডারের মধ্যে গুলী বিনিময়ের ফলে কতজন নিহত ও আহত হয়েছে ?

কুমুদিনী কলেজের অভ্যন্তরে

দানবীর রণদা প্রসাদ সাহার অসীম বদান্যতায় একদিন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল টাঙ্গাইলের সুপ্রাচীন মহিলা মহাবিদ্যালয় কুমুদিনী কলেজ। সমগ্র বাংলাদেশে তখন মহিলাদের উচ্চ শিক্ষার জন্য বেথুন, ইডেন ইত্যাদি দু-একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়া কোন মহিলা মহাবিদ্যালয় ছিল না। উপরন্তু কুমুদিনী মহাবিদ্যালয়ে বিনাবেতন ও বিনাখরচে শিক্ষা, আহার ও বাসস্থানের সুযোগ থাকায় দেশের প্রত্যন্ত জেলাগুলো থেকেও গরীব ছাত্রীরা এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে আসতো। বর্তমানে বাংলাদেশে মহিলাদের জন্য অনেকগুলি মহাবিদ্যালয় চালু থাকলেও কুমুদিনী মহাবিদ্যালয়ের গুরুত্ব একটুও কমেনি। কিন্তু এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে অরাজকতা ও দুর্নীতির প্রকোপ বেড়ে চলার ফলে একদিকে যেমন ছাত্রীদের দুর্ভোগ বেড়ে যাচ্ছে অন্যদিকে এর সুনামও নষ্ট হতে চলেছে দিন দিন।

রনদা প্রসাদ সাহা এই মহাবিদ্যালয় এবং ছাত্রীবাসের জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করলেও অদৃশ্য হাতের কারচুপির ফলে স্বাধীনতা পূর্বকাল থেকেই সে সুযোগ ছাত্রীদের কাছে পৌঁছতো না।

ছাত্রীদের খাওয়া এবং বিকেলের টিফিনের মান যেমনি নিকৃষ্ট তেমনি একঘেয়ে। ছাত্রীনিবাসের দৈনন্দিন জীবনের বহু সুযোগ-সুবিধা থেকে তারা বঞ্চিত হয়ে আসছে দীর্ঘদিন থেকে। কলেজ এবং ছাত্রী নিবাসের খাবার বাইরের থেকে সংগ্রহ করতে হয়। কিছুদিন আগেও মহাবিদ্যালয়ের খোলা পুকুরে একদিকে ছাত্রীদের অন্যদিকে মহাবিদ্যালয় ভবন নির্মাণরত মজুরদের গোছল করার ব্যবস্থা ছিল। প্রতি বছর ছাত্রীরা কলেজ-বার্ষিকীর জন্য নির্দিষ্ট চাঁদা দিলেও দু-তিন বছর বা আরো বেশী সময় পর পর কলেজ-বার্ষিকী প্রকাশ করা হয় এবং তার আকারও খুবই ক্ষীণ কলেবর। এই মহাবিদ্যালয়ে বহু বছর পর্যন্ত কোন অভিভাবকদের নির্বাচিত পরিচালকমণ্ডলী না থাকার দরুণ এর অভ্যন্তরে সংঘটিত দুর্নীতিগুলো বাইরের জগতে প্রকাশ পায়নি। এই মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা প্রকাশ্যেই ছাত্রীদের রাজনীতি এবং কলেজের অভ্যন্তরীণ সমস্যা নিয়ে আলোচনার বিরুদ্ধে হুমকি দেয়ায় কেউ প্রতিবাদ করার সাহস পায় না।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় এই মহাবিদ্যালয়ের কতিপয় অধ্যাপক এবং অধ্যাপিকার ভূমিকা ছিল খুবই ন্যাকারজনক। স্বাধীনতা সংগ্রামের দীর্ঘ নয় মাস এদের কেউ কেউ মুক্তিবাহিনীর সাফল্য সম্পর্কে ব্যঙ্গোক্তি করতো, বিরোধিতায় সোচ্চার হতো এবং সতর্ক গোয়েন্দাগিরির জন্য মুক্তিযুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল অধ্যাপক- অধ্যাপিকাগণের প্রতি আজ পর্যন্ত কোন বিজলী বাতি না থাকায় প্রতি মুহূর্তে সশঙ্ক দিন যাপন করতে বাধ্য হতেন। সেই দালালেরা আজো বহাল তবিয়তে পূর্বের সুযোগ সুবিধা ভোগ করছে তবে মুখোশটা একটু পাল্টে মুক্তিবাহিনীর অঙ্গ ভঙ্গ সেজে গিয়েছে এই যা তফাৎ। দেশপ্রেমিক অধ্যাপক-অধ্যাপিকাগণ আজো এই ভোল পাল্টে ফেলা সহকর্মিদের ষড়যন্ত্রের জাল থেকে রেহাই পাচ্ছে না।

স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় এই কলেজেরই একজন দেশপ্রেমিক অধ্যাপক জনাব আবদুস সাত্তার সাহেব রাজাকারদের হাতে নিষ্ঠুরভাবে নিহত হলেও পাক সরকারের পদলেহী অধ্যাপক অধ্যাপিকাদের মনে তার কোন প্রতিক্রিয়া হয়নি।

স্বাধীনতার নবীন আলোকে বাংলাদেশ যখন উদ্ভাসিত, তখনও কি সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের চোরাগোলিতে এই অন্ধকারের জীবেরা অবাধে বিচরণ করবে- শহীদ অধ্যাপক সাত্তারের রক্তের দাম কি চিরদিন বাকীর খাতায় জমা থাকবে?

কয়লার ময়লা

টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুর থানার প্রাথমিক শিক্ষকগণ গত জানুয়ারী মাস থেকে বেতন পাচ্ছেন না। সদাশয় সরকার ঘোষণা করেছিলেন যে জানুয়ারী মাসের বেতন অগ্রিম দেয়া হবে। মার্চ শেষ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশ সরকারের জানুয়ারী মাস আর আসছে না। এদিকে প্রাথমিক শিক্ষকদের অবস্থা প্রাণান্তকর। সরকার সরকারী স্বভাবটা বদলাবেন কি?

টাঙ্গাইলে বাংলা ছাত্রলীগের জনসভা

সম্প্রতি টাঙ্গাইলে বাঙলা ছাত্রলীগের উদ্যোগে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ভাষণদান করেন বাঙলা ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় সংসদের সভাপতি জনাব আল মুজাহিদী, সাপ্তাহিক 'দেশ বাংলা' পত্রিকার সম্পাদক জনাব ফেরদৌস আহমেদ কোরেশী, বাঙলা ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় সংসদের দপ্তর সম্পাদক জনাব ইব্রাহিম রহমান, নোয়াখালী জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক জয়নাল আবেদিন ফারুক, কেন্দ্রীয় সংসদ নেতা শামিম আল মামুন, টাঙ্গাইল জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক শ্রী সুরঞ্জন দাস দাসু এবং আরও অনেকে। সভায় জনাব আল মুজাহিদী তার দীর্ঘ ভাষণে দেশের বর্তমান বিশৃংখল পরিস্থিতি, গণমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা কায়েম, পূর্ণাঙ্গ সমাজতন্ত্রের বৈজ্ঞানিক প্রতিফলন প্রভৃতি বিষয়ের উপর আলোকপাত করেন। সভায় ফেরদৌস কোরেশী দেশে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি এবং ক্ষমতাসীন দলের নেতৃবর্গের ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধিতে লিপ্ত হওয়ায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি দৃপ্ত কণ্ঠে বলেন, দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতে সময়ের প্রয়োজন সত্য কিন্তু আইন শৃঙ্খলার অবনতিশীল পরিস্থিতি ও অরাজকতার অবসান করতে সরকারের সময়ের প্রয়োজন থাকতে পারে না। সভায় অন্যান্য বক্তাগণও মুক্তিবাহিনীর নামে রাহাজানি ও নিরীহ জনসাধারণকে উৎপীড়ন, ধান-চাউলের ও অন্যান্য জিনিষপত্রের অগ্নি মূল্য, চোরাচালান ও কালোবাজারী প্রভৃতির প্রতি কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেন।

সভায় সভাপতিত্ব করেন বাঙলা ছাত্রলীগের টাঙ্গাইল শাখার সভাপতি আঃ আসলাম। সভায় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সভাশেষে ঢাকা ও টাঙ্গাইলের শিল্পীবৃন্দ সমন্বয়ে এক গণসংগীতের আসর অনুষ্ঠিত হয়।

তীর্যক

এই ময়দানে আমার অনেক স্মৃতি বিজড়িত। এক 'রিটায়ার-করা-উচিত' বৃদ্ধের তাজাল্লীতে এগারতলা মামলায় খালাস পেয়ে এখানেই আমি ...। ভাগ্যের কি পরিহাস! সেই বুড়োটাই না এই ময়দানে বলে গেল, আমার নাকি 'আপার চেম্বার খালি।'

আপনারা ফলো করতে পারেননি বুঝি! সবুর করুন। বঙ্গ ভাষায় সমঝিয়ে দেয়া হচ্ছে।

সরকারীভাবে ভারতে আর নজরুল জন্মোৎসব হবে না

যে দেশ ধর্ম নিরপেক্ষতা আর গণতন্ত্রের সোচ্চার দাবীদার, যে মহল উদারতা ও প্রগতিশীল সংস্কৃতির 'আগুয়ান সমঝদার'– সেই দেশ ভারতে সেই মহল কংগ্রেস 'রবীন্দ্র সদন কমিটির' বদৌলতে বিদ্রোহী কবি নজরুলের জন্মোৎসব সরকারীভাবে পালিত হবার পথ রুদ্ধ করেছেন। শুধু তাই নয়, আমরা যে গোষ্ঠীকে নিয়ে লুফালুফি করছি তারাই কবির পরিবার-পরিজনের জীবন পর্যন্ত বিপন্ন করছেন। ভারতের শাসকমহলের অশুভ ইঙ্গিতেই চুরুলিয়া নজরুল একাডেমীর কাজ-কর্ম প্রায় বন্ধ হবার পথে। অবিশ্বাস্য হলেও কোলকাতা থেকে বিগত ১০ই মার্চের প্রকাশিত 'বাংলাদেশ'- এর বিশেষ সংখ্যায় উপরোক্ত বিষয়ে একটি রিপোর্ট পেশ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট রিপোর্টটি আমরা এখানে হুবহু তুলে দিলাম।

"রবীন্দ্র সদনে বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের জন্মোৎসব অনুষ্ঠান আর হবে না।" রবীন্দ্র সদন কমিটি এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। রবীন্দ্র সদন কমিটির অধিকাংশ সদস্যের মতে বিদ্রোহী কবি চিরন্তন আবেদনের কবি নয়, ভাবাবেগের কবি মাত্র। সুতরাং নজরুল জন্মোৎসব পালন করলে আরো বহু কবির জন্মোৎসব পালন করতে হয়। এরূপ আলোচনায় কয়েকজন সদস্য বিস্মিত হয়ে তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। সংখ্যায় তাঁরা মাত্র ৪ জন। বাকি সদস্যরা সোচ্চারে তাড়াহুড়া করে এই প্রস্তাব পাশ করে নিলেন। এই সদস্যদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তরের সেক্রেটারী শ্রী সেনগুপ্ত, তথ্য দপ্তরের ডেপুটি সেক্রেটারী অমিয় ব্যানার্জী এবং রবীন্দ্র সদনের এডমিনিস্ট্রেটর মহোদয়া অন্যতম।

এরূপ মারাত্মক এক সিদ্ধান্তের ফলে কবি নজরুল রবীন্দ্র সদন কমিটির বিচারে অপাংক্তেয় হয়ে পড়লেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, যুক্তফ্রন্ট সরকারের সময় শিক্ষামন্ত্রী শ্রী সত্যপ্রিয় রায়ের উদ্যোগে সরকারীভাবে রবীন্দ্র সদনে নজরুল জন্মোৎসব পালিত হয়েছিল বহিঃপ্রাঙ্গণে। বিশাল জনজমায়েতে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় প্রত্যেক নজরুল সঙ্গীতশিল্পী সঙ্গীত পরিবেশন করেছিলেন। সেই অনুষ্ঠানে সহযোগী ছিল পশ্চিমবঙ্গ নজরুল একাডেমী ও অগ্নিবীণা সংস্থা। যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বাতিল করার পর থেকে রবীন্দ্র সদনের মধ্যে উৎসব পালিত হচ্ছিল। এবার থেকে তাও বন্ধ হলো।

এই সিদ্ধান্ত নেবার সময় তীব্র বিরোধিতা ও সমালোচনার জন্য শেষ পর্যন্ত প্রস্তাব করায় চক্ষু লজ্জার খাতিরে বলেন, নজরুল সঙ্গীত অনুষ্ঠান হতে দিতে তাঁদের আপত্তি নাই। কিন্তু সরকারীভাবে নজরুল জন্মোৎসব হবে না।

প্রসঙ্গত আরো উল্লেখযোগ্য যে, সম্প্রতি সরকারীভাবে ও শাসক কংগ্রেসের পক্ষে নজরুলকে অবমূল্যায়নের চেষ্টা দেখা যাচ্ছে। এই সঙ্গে কাজী নজরুল ইসলামের আত্মীয়-স্বজনের ওপর আক্রমণের খবর পাওয়া যাচ্ছে। চুরুলিয়া গ্রামে কবি নজরুলের বাড়ীতে শাসক কংগ্রেসের লোকেরা কয়েক দফা আক্রমণ করেছে, কবির দু'জন ভ্রাতুষ্পুত্র প্রাণ বাঁচাবার জন্য বর্তমানে গ্রাম-ছাড়া হয়েছেন। এ সম্পর্কে কবির কাকীমার এক মর্মান্তিক চিঠি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। কবিপুত্র কাজী সব্যসাচী এরূপ হামলার প্রতিবাদে বিবৃতি প্রকাশ করেছিলেন।

চুরুলিয়া নজরুল একাডেমীর কাজকর্ম প্রায় বন্ধ হবার পথে। গত বছর চুরুলিয়ায় নজরুল একাডেমীর উদ্যোগে জন্মোৎসব পালনেও বাধা দেওয়া হয়েছিল।

এদিকে রবীন্দ্র সদনে সরকারীভাবে কবির জন্মোৎসব পালিত হচ্ছে না। অথচ পাক-ভারত যুদ্ধ আর বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য নজরুল সঙ্গীত ও কবিতা আবৃত্তি ছিল সরকারী প্রচার যন্ত্রের সহায়। আর ও বাংলায় কবি নজরুল আরো মর্যাদার সাথে প্রতিষ্ঠা লাভ করছেন। কবির পুত্রদ্বয় বর্তমানে রাষ্ট্রীয় অতিথিরূপে যখন বাংলাদেশে রয়েছেন, তখন এই বাংলায় বিদ্রোহী কবি নজরুলকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার রবীন্দ্র সদন থেকে বাতিল করে দিচ্ছেন। যিনি স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছেন, স্বাধীনতার যোদ্ধা রূপে জেলে গেছেন এবং স্বাধীনতার জন্য সঙ্গীত ও কবিতা রচনা করেছেন, সেই কবি নজরুল সম্পর্কে রবীন্দ্র সদন কমিটির সিদ্ধান্ত জাতীয় অবমাননা।

মহাদুর্ভিক্ষ অত্যাসন্ন

মওলানা ভাসানীর হুঁশিয়ারী ভাষণ কিংবা সরকারী ধামাচাপা দেয়ার পর্যায়ে নয় – আজ একটি ভয়ঙ্কর সত্য পরিসংখ্যান আমাদের সম্মুখে উপস্থিত ঃ বাংলাদেশে মহাদুর্ভিক্ষ অত্যাসন্ন।

সম্প্রতি বাংলাদেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় চাউলের দামের উর্ধগতির যে ভয়াবহ সংবাদ প্রকাশিত হচ্ছে তা উপরোক্ত আশঙ্কাকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। চলতি সপ্তাহে যশোরে খোলাবাজারে প্রতি মণ চাউল আশি টাকায়, ফরিদপুরে নব্বই টাকায় এবং রাজশাহীতে সত্তর টাকায় বিক্রি হচ্ছে। এর স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াস্বরূপ বিভিন্ন স্থানে বুভুক্ষু মানুষের ক্ষুধা মিছিল বের হওয়ার সংবাদও পাওয়া যাচ্ছে। বাংলাদেশের শস্য-ভাণ্ডার হিসেবে খ্যাত বরিশাল ও মুন্সীগঞ্জে এরই মধ্যে ক্ষুধা মিছিল বের হয়েছে। অন্যান্য জেলাগুলিতেও চাউলের দাম অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার দরুণ তা দিনদিন সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছে। এককথায় সারা দেশ জুড়ে আসন্ন দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি প্রতিটি চিন্তাশীল মানুষেরই দারুণ উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই উদ্বেগ যে মোটেই অমূলক নয় সরকারী পরিসংখ্যান নিয়ে সামান্য একটু আলোচনা করলেই তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

৭০ লক্ষ টন খাদ্য ঘাটতি

বাংলাদেশের চাউলের বাৎসরিক প্রয়োজন মোট ১ কোটি ৩০ লক্ষ টন। এর আগে প্রতি বছর ৩০ লক্ষ টন চাউলের ঘাটতি দেখা দিতো। তাই এবারও স্বাভাবিকভাবে ঘাটতির পরিমাণ ছিল। কিন্তু বেপরোয়া চোরাচালানের ফলে এই মৌশুমেই ৫০ লক্ষ টন চাউল সীমান্তের ওপারে চলে যাবার উপক্রম হয়েছে। ফলে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় (১৩০-৫০)=৮০ লক্ষ টন। এমনকি ঘাটতি পূরণের জন্য বিদেশ থেকে আমদানীকৃত চাউলও চোরাচালান হয়ে যাচ্ছে। পূর্ববর্তী বছরগুলিতে বিভিন্ন বন্ধুরাষ্ট্র থেকে আমদানীকৃত চাউল-গমের মাধ্যমে কিছুটা চাহিদা মিটানো হত। কিন্তু বর্তমান বছরে

৫০ লক্ষ টন চাউল পাচার

বিভিন্ন রাজনৈতিক কারণেই বাইরের রাষ্ট্রগুলি থেকে খুব বেশী চাউল আমদানী করা সম্ভব হচ্ছে না। সর্বমোট ৮০ লক্ষ টন চাউল ঘাটতি পূরণের জন্যে বিদেশ থেকে খুব বড় জোর আমদানী করা হচ্ছে মাত্র ১০ লক্ষ টন। বাকী (৮০ - ১০) = ৭০ লক্ষ টন চাউল যা সারা বছরের চাহিদার প্রায় অর্দ্ধেক তা আসবে কোত্থেকে? উপরন্তু পূর্ববর্তী বছরগুলিতে

মোট উৎপাদিত চাউলের এক ষষ্ঠাংশ ছিল ইরি ও বোরো ধান। উন্নত যান্ত্রিক চাষাবাদ এবং সার প্রয়োগ এই ইরি ও বোরো ধান ফলনের অন্যতম শর্ত। কিন্তু বর্তমান বছরে এই বিপুল খাদ্য ঘাটতির পাশাপাশি ইরি ও বোরো ধানের চাষও মারাত্মকভাবে হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা ইতিমধ্যেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই জাতের ধানের ফলন সম্পূর্ণ নির্ভর করে সেচ ব্যবস্থা এবং সার প্রয়োগের উপর। কিন্তু সম্প্রতি স্বয়ং কৃষিমন্ত্রী দেশে ১ লক্ষ টন সার ও ৮০ লক্ষ গ্যালন জ্বালানী তেলের ঘাটতি রয়েছে বলে যে তথ্য পরিবেশন করেছেন তাতে যেকোন সুস্থ ব্যক্তি আসন্ন মহাদুর্ভিক্ষের ভয়াবহ পরিণতি ভেবে আঁৎকে উঠবেন এটাই স্বাভাবিক। জ্বালানী তেলের অভাবে যন্ত্রচালিত নলকূপগুলি সম্পূর্ণ অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে। তদুপরি সারের অভাব; সুতরাং ২০ লক্ষ টন ইরি ও বোরো ধানের জায়গায় ৫ লক্ষ টন ধানও এবার কৃষক পাবে কিনা সন্দেহ। অতএব সরকার পরিবেশিত পরিসংখ্যানের হিসাবেও সারা বাংলাদেশে চাহিদার অনুপাতে মাত্র এক তৃতীয়াংশ চাউল সরবরাহ সম্ভব হবে। প্রতিবছর ৩০ লক্ষ টন চাউল ঘাটতির ফলেই সাধারণ মানুষ যে দুঃখকষ্টের সম্মুখীন হয় এবং বছরের তিন থেকে চার মাস অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে জীবনধারণ করে সেস্থলে ৭০ লক্ষ টন চাউল ঘাটতি পড়লে তাদের অবস্থা কতদূর শোচনীয় হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

দীর্ঘদিনের রক্তাক্ত সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের পর রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী এবং অর্থনৈতিক সমস্যাবলী প্রকট হয়ে দেখা দেয়া স্বাভাবিক। কিন্তু সেই সঙ্কটের প্রতিরোধ করার যে মানসিকতা আজ অপরিহার্য হয়ে দেখা দিয়েছে তার কোন উজ্জ্বল প্রতিশ্রুতি আছে কি? চোখের সামনে প্রতিদিন হাজার হাজার মণ চাউল পাচার হয়ে যাচ্ছে – মহাদুর্ভিক্ষের পদধ্বনি প্রতিদিন স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর– এক মহাঅন্ধকারময় হিমশীতল ভবিষ্যৎ সমগ্র বাংলাদেশে তার ভয়াবহ করাল মুখব্যাদন করে এগিয়ে আসছে– সরকার কি এখনও নিশ্চুপ দর্শকের ভূমিকায় অভিনয় করে যাবেন–?

আজও লাশ ভেসে আসে

বিগত স্বাধীনতাযুদ্ধের নয় মাসে বাঙলাদেশের পদ্মা, মেঘনা, যমুনা আর ধলেশ্বরীর পানিতে যেমন পালতোলা নৌকা এবং কচুরীপানা ভাসতে দেখা গেছে, তেমনি দেখা গেছে অসংখ্য মানুষের লাশ। শেষে এমন এক পর্যায় এসে গিয়েছিল যখন এই নদীগুলির পানিতে কোনকিছু ভেসে যেতে দেখলেই সবাই ভাবতো এও বুঝি মানুষেরই লাশ।

যুদ্ধশেষে সবাই আশা করেছিল, নৌকা দেখা যাবে, কচুরীপানা তো ভাসবেই, মানুষের লাশ আর ভাসবে না। কিন্তু এখনও প্রায়ই মানুষের লাশ ভেসে যাওয়ার দৃশ্য লক্ষ্য করতে হয়। টাঙ্গাইল জেলার এলাসিনে ধলেশ্বরীর পানিতে এমনি অনেক লাশ দেখা যাচ্ছে। পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ধলেশ্বরীর কোন কোন বাঁকের পাড়ে দাঁড়িয়ে আজো দেখা যায়, যদিও মিছিল নয়, কয়েকটি লাশ ভেসে যাচ্ছে।

জনমনে তাই প্রশ্ন জেগেছে, হত্যাগুলি কি রাজনৈতিক, সামাজিক, না নিতান্তই ব্যক্তিগত? এইসব হত্যা করছে কারা? কবে এই হত্যার লীলা শেষ হবে?

কার গোয়ালে কে ধোঁয়া দেবে?

পাকিস্তানী আমলের মত এবারো সারা বাংলাদেশে বিশেষ করে কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, মোমেনশাহী, জামালপুর, সিরাজগঞ্জ, টাঙ্গাইল এবং ঢাকার সর্বত্র

বসন্তরোগ মহামারীর আকার ধারন করেছে। দেশের অন্যান্য স্থানেও এই রোগ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

পাকিস্তানী আমলের অনাদৃত দেশবাসী স্বাধীন দেশেও একইভাবে অবহেলিত হচ্ছেন। সরকার এখনো বসন্ত প্রতিষেধক টিকা এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। ফলে প্রতি বছরের মত এবারো অসংখ্য মানুষ বিনা-চিকিৎসায় প্রাণ হারাচ্ছেন। এদিকে খোলা বাজারে অতি প্রয়োজনীয় ঔষধপত্রের দারুণ অভাব এবং মাত্রাতিরিক্ত মূল্যবৃদ্ধি দেখা দিয়েছে। কাঁচা-মালের অভাবে বাংলাদেশের সকল ঔষধ প্রস্তুত কারখানাই বর্তমানে বন্ধ রয়েছে বলে জানা গেছে। বিদেশ থেকেও অতি প্রয়োজনীয় ঔষধ আমদানীর কোন ব্যবস্থা করা হয়নি।

অবিলম্বে সরকার বসন্ত প্রতিরোধের জন্য টিকা এবং খোলাবাজারে সুলভ মূল্যে অতি প্রয়োজনীয় ঔষধ সরবরাহ করতে ব্যর্থ হলে সারাদেশে বিনা চিকিৎসায় অসংখ্য মানুষের প্রাণহানীর আশংকা রয়েছে। তাছাড়া কাঁচামাল সরবরাহের মাধ্যমে দেশের সকল ঔষধ প্রস্তুত কারখানা চালু করে এবং বিদেশ থেকে প্রচুর পরিমাণে প্রয়োজনীয় ঔষধ আমদানী করে জনগণকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করা সরকারের মহান দায়িত্ব।

কথায় হক – কাজে হচ্ছে না

স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাকবাহিনীর হাতে লাঞ্ছিতা নারীরা বিভিন্ন সভায় এবং পত্রিকায় এত বেশী বিশেষণে বিশেষিতা হচ্ছেন যা সবাইকেই আকৃষ্ট করছে। তাঁদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবতে গিয়ে বাংলাদেশের, বিশেষ করে ক্ষমতাসীন দলের নেতৃবৃন্দ এবং সমাজসেবীরা পেরেশান।

কিন্তু এখানেও চিরদিনের নিয়ম তার ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করে যাচ্ছে। এই নারীদের বিয়ে করে সমাজে সসম্মানে প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করার জন্যে সবাই আহ্বান জানাচ্ছেন, কিন্তু কেউই আজো এমন কোনো বাস্তব পদক্ষেপ নিচ্ছেন না যা অন্যের জন্যে দৃষ্টান্ত হিসেবে কাজ করতে পারে। প্রধানমন্ত্রী যেমন কৃষি-বিপ্লবের কথা বলতে গিয়ে দু'কোদাল মাটি কেটে বাংলার মাটিকে ধন্য করেছেন, তেমনি কেউ যদি এই বীরঙ্গনাদের কাউকে বিয়ে করে অথবা বিয়ের ব্যবস্থা করে দিয়ে বাস্তব দৃষ্টান্ত স্থাপন করতেন, তাহলে হয়তো আরো অনেকেই এগিয়ে আসতেন। নিষ্ফল আহ্বানে যেকোন কাজ আর হয় না– একথা সকলের স্মরণ রাখা দরকার। তাই ক্ষমতাসীল দলের নেতৃবৃন্দ এবং লাঞ্ছিতা নারীদের হিতাকাংখী সকল সমাজসেবীদের প্রতি জনগণের আহ্বান, মুখ আর কলমের পথ ত্যাগ করে আপনারা বাস্তব পথে এগিয়ে আসুন। তাহলেই এই নারীদের প্রকৃত কল্যাণ হতে পারে।

হক-কথা

১০ই চৈত্র শুক্রবার

পুনরুজ্জীবন ও পুনরাবৃত্তি

সম্প্রতি এক সাংবাদিক সম্মেলনে কৃষিমন্ত্রী জনাব শেখ আবদুল আজিজ জানাইয়াছেন যে হানাদার বাহিনীর হাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত কৃষি ব্যবস্থাকে পুনরুজ্জীবিত করার উদ্দেশ্যে তিন পর্যায়ের কর্মসূচী গ্রহণ করা হইতেছে। মন্ত্রী দুঃখ করিয়া বলেন যে, দস্যু বাহিনী কর্তৃক দেশের কৃষি যন্ত্রপাতি ধ্বংস ও বীজাগার লুণ্ঠনের ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা কাটাইয়া উঠার মত পর্যাপ্ত বীজ, সার, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি সরকারের হাতে বর্তমানে

নাই। যা ছিল সরকার ইতিমধ্যে জনসাধারণে বন্টন করিয়াছেন। সরকারী হিসাবে দেখা যাইতেছে যে চলতি মওসুমের জন্য এক লক্ষ টন সার ঘাটতি রহিয়াছে। তাছাড়া ৮০ লক্ষ গ্যালন জ্বালানী, কার্যোপযোগী পাওয়ার পাম্প এবং গভীর নলকূপ বসানোর সরঞ্জামের প্রকট অভাব রহিয়াছে। ভবিষ্যতে এই সকল অভাব দূরীকরণার্থে পোল্যাণ্ড, সুইডেন, ভারত ও বিশ্বব্যাঙ্ক সাহায্য করিবে বলিয়া জানা গিয়াছে। অবশ্য ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের মধ্যে বিতরণের জন্য ভারত হইতে গরু আমদানীর পরিকল্পনা বাতিল করা হইয়াছে। তবে কৃষি মন্ত্রী জানাইয়াছেন যে চাষীদের মধ্যে বিতরণের উদ্দেশ্যে সরকার দশ কোটি টাকার তাকাবি ঋণ মঞ্জুর করিয়াছেন। মোট কথা, বাংলাদেশের বিধ্বস্ত কৃষি ব্যবস্থাকে পুনরুজ্জীবিতকরণে সরকার ও জনসাধারণের পক্ষ হইতে এমন সব ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইতেছে যাহা কারিগরি দিক হইতে কার্যকরী এবং উৎপাদন বৃদ্ধিতে ফলপ্রসূ। কিন্তু পাকিস্তান আমলের দুই যুগে আমরা হাড়ে হাড়ে শিক্ষা লাভ করিয়াছি যে আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কৃষি ও চাষীর সত্যিকারের স্থায়ী কোন উপকার সাধিত হয় না। যতটুকু হয় তাহা অবস্থাপন্ন কৃষক কিংবা জোতদাররাই ভোগ করিয়া থাকেন। কৃষি বিভাগ ও উন্নয়ন সংস্থা এমন সব ব্যক্তিদের নিয়ন্ত্রণে রহিয়াছে যাহারা পাশ্চাত্যে শিক্ষাপ্রাপ্তি দোষে দুষ্ট। এবং তাই তাহারা ফরমুলা ও তত্ত্বের প্রতিই মনোযোগ রাখেন বেশী, স্বদেশের সঠিক সমস্যা নিরূপন করিতে বাস্তব ক্ষেত্রে দৃষ্টিদান করেন না। প্রকৃতপক্ষে নিম্নস্তর হইতে উর্ধতন মহল পর্যন্ত চাকুরী রক্ষা করিতে সবাই এত ব্যস্ত থাকেন যে নিজেদের দুর্বলতা ও অপারগতা ঢাকিয়া রাখিতে গিয়া মৌলিক সমস্যাও ধামাচাপা দিয়া থাকেন। আইয়ুব আমলে ইহা সর্বত্র ঘটিয়াছে বলিয়াই কৃষি বিপ্লবের প্রচার হইয়াছে প্রচুর কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয় নাই।

স্বাধীনতার পর তিনটি মাস কাটিয়া গেলেও সেই অনুপাতে কৃষি ও কৃষকের জন্য তেমন কিছু হয় নাই। আমরা জানি, নানাবিধ সমস্যায় এই বিভাগটিও জর্জ্জরিত। কিন্তু যে দেশ কৃষি প্রধান এবং যেখানে খাদ্য সমস্যা মারাত্মকভাবে প্রকট, সেইখানে সর্বাগ্রে কৃষি ব্যবস্থার পুনরুজ্জীবনে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা উচিত। কিন্তু আবার সেই একই কথা আসিয়া যায়। গ্রামের নাড়ির সহিত যে আমলাদের কোন যোগাযোগ নাই তাহাদিগের হাতে পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব দান করিলে পাকিস্তান আমলের পুনরাবৃত্তিই ঘটিবে। বর্গাচাষী এবং ভূমিহীন চাষীদের জন্য সরকার কি করিতে যাইতেছেন আজও তাহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। যান্ত্রিক চাষাবাদ ব্যাপকভাবে চালু করিয়া সমবায় ও খামার প্রথাকে কার্যকরী করিতে দেশবাসীকে কোন পথে অগ্রসর হইতে হইবে সরকার তাহাও নির্দেশ করিতেছেন না। স্বাধীনতার পর আমরা লক্ষ্য করিতেছি, কৃষক মহলে উৎসাহের স্থলে হতাশা স্থান করিয়া নিতেছে। বলাবাহুল্য ইহার পরিণতি মারাত্মক। কৃষক সমাজকে আত্মবিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ করিতে গ্রামে গ্রামে আজো কোন ব্যবস্থা গৃহীত হয় নাই।

সাংবাদিক সম্মেলনে কৃষিমন্ত্রীর পেশকৃত বক্তব্যে অক্ষমতার রেশ ফুটিয়া উঠিলেও তাকাবী ঋণটিতে আশাপ্রদ কিছু রহিয়াছে। কিন্তু গরু আমদানীর মতই যদি ইহার পরিণতি ঘটে অথবা রিলিফ দ্রব্য বন্টনের অব্যবস্থা ও স্বজনপ্রীতির ন্যায় 'তাকাবী তেলেসমাত' হইয়া বসে–তবে পুনরুজ্জীবনের নামে কৃষি ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা হইবে না তো কি ?

সোনার বাংলা গড়তে হলে এবার পাটের ফলন বাড়ান

বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ অর্থকরী কৃষিজাত দ্রব্য হল পাট। এখানকার শতকরা প্রায় ৮০ জন লোকেই কৃষিকার্যের ব্যয়ভার বহনের জন্য নির্ভর করে পাটের উপর। কাজেই পাটকে বাংলাদেশের কৃষকের অর্থকরী ফসল বলা হয়। এছাড়া গোটা বাংলাদেশ পাট সূত্রের বিনিময়ে বিদেশ থেকে প্রতি বছর প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করে। এজন্য একে একটি জাতীয় অর্থকরী ফসলও বলা হয়। বাংলাদেশই পাট-চাষের জন্য বেশী উপযোগী। এমনকি পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় এখানেই অধিক পাট উৎপন্ন হয়। কিন্তু কৃষকেরা উৎপাদিত পাটে বর্তমানে উপযুক্ত টাকা পাচ্ছে না। কাজেই এ পর্যায়ে কম খরচায় ভাল জাতের পাটের অধিক ফলনই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।

পাট চাষের উৎপাদন প্রণালী

ফাল্গুন ও চৈত্র মাসে পাটের বীজ বুনতে হয়। বোনার পূর্বে কৃষকের কর্তব্য হচ্ছে উৎকৃষ্ট ভাবে জমি তৈরী করা। বীজ যাতে সমভাবে এবং বেশী সংখ্যায় গজাতে পারে, সেজন্য কয়েকটি চাষ ও মই দিয়ে মাটিকে উলটে পালটে চাষ দিয়ে জমি তৈরী করতে হবে। কারণ, উত্তম চাষের উপর নির্ভর করে সমভাবে বীজ গজানোর। কাজেই গভীরভাবে চাষ করে মই দিতে হবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে যাতে করে জমি উঁচু-নিচু না থাকে। কারণ, চাষের পর জমি উঁচু-নিচু থাকলে বৃষ্টির পানি জমার সম্ভাবনা থাকে। জমিতে পানি জমে থাকলে পাটের বীজ নষ্ট হতে পারে।

উন্নত জাতের পাটের বীজ সংগ্রহ করুন

বীজের উপর নির্ভর করবে পাটের উৎপাদন। কাজেই পরিচিত লোক থেকে ভাল বীজ সংগ্রহ করতে হবে। এ ছাড়া প্রায় ইউনিয়নে সরকারী কৃষি গুদামের ব্যবস্থা থাকার কথা। এসব গুদাম থেকে অতি অল্প সময়ে ভাল বীজ সংগ্রহ করার সুযোগ রয়েছে বলে সরকার দাবী করে থাকেন। কৃষক ভাইয়ের জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই কৃষিভাণ্ডারে ভাল বীজ জমা হয়ে থাকে। কাজেই এর সদ্ব্যবহার করে প্রত্যেক চাষী ভায়েরা উপকৃত হতে পারেন। কেন্দ্রীয় পাট সংসদের কেন্দ্রীয় ইন্সটিটিউট এবং উপকেন্দ্রীয় গবেষণাগারেও ভাল বীজ থাকার কথা। সেখান থেকেও সামান্য পরিমাণে বীজ সংগ্রহ করা যায়।

সার ব্যবহার করে অধিক ফসল ফলাতে পারেন

জমিতে নির্দিষ্ট সময়ে জমির চাহিদানুসারে সার ব্যবহার করে অধিক পাট পেতে পারেন। এদেশে গোবরের সার বিনা পয়সায় পাওয়া যায়। কাজেই বীজ বোনার ১৬/১৭ দিন পূর্বে একর প্রতি ৫০ মণ গোবর ছড়িয়ে দিন। এছাড়া ইউরিয়া, ট্রিপল, সুপার ফসফেট জমিতে ব্যবহার করতে পারেন। তবে এ ব্যাপারে স্থানীয় কৃষি কর্মচারী থেকে পরামর্শ নেওয়াই হবে উত্তম কাজ। বীজ বোনার পূর্বে গোবর সার ছাড়া জমিতে অন্যান্য সারও ব্যবহার করা যায়।

নিম্নলিখিত উপায়ে একর প্রতি সার ব্যবহার করলে অধিক ফসল পাওয়া যাবে।

(ক) যে জমিতে গোবর অথবা কমপোষ্ট দেওয়া হয়েছে এবং আঁশের জন্য পাটের চাষ করা হবে ঃ

১) ইউরিয়া-১২ সের, অথবা-এমোনিয়াম সালফেট-২৬ সের।

২) ট্রিপল সুপার ফসফেট-২২ সের।

৩) মিউরেট অব পটাশ-৩২ সের, অথবা কুচুরী পানার ছাই-৩ মণ ১০ সের।

খ) যে পাটের ক্ষেতের গোবর অথবা কমপেষ্ট দেওয়া হয়নি অথবা আঁশের জন্য পাট চাষ করতে হবে–

(১) ইউরিয়া ২২সের অথবা এমোনিয়াম সালফেট ১মণ ৮সের।

(২) ট্রিপল সুপার সালফেট- ২মণ ১৬সের, মিউরেট অব পটাশ- ৩২ সের অথবা কুচরীপানার ছাই- ৩মন ১৫ সের।

(গ) যে ক্ষেতে গোবর দেওয়া হয়েছে এবং বীজের জন্য পাট চাষ করতে হবে–

(১) ইউরিয়া-১২ সের, অথবা এমোনিয়াম সালফেট-২৬ সের

(২) ট্রিপল সুপার ফসফেট-১মণ ৩ সের।

(৩) মিউরেট অব পটাশ ৩২ সের, অথবা কচুরী পানীর ছাই-৩ মণ ৩ সের।

(ঘ) যে ক্ষেতে গোবর অথবা কমপোষ্ট দেওয়া কিন্তু বীজের জন্য পাটের চাষ করতে হবেঃ-

(১) ইউরিয়া-২২ সের, অথবা এমোনিয়াম সালফেট-১মণ ৮ সের।

(২) ট্রিপল সুপার ফসফেট -১ মণ ৩ সের।

(৩) মিউরেট অব পটাশ– ৩২ সের অথবা কচুরী পানার ছাই- ৩ মণ ১০ সের।

ভাসানীর বাণী

প্রগতিশীল রাজনীতির দাবীদার একটি পার্টিকে আমি হুঁশিয়ার করিয়া দিতে চাই–রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে ঘোলাটে করিবেন না। সমস্যা জর্জরিত বাংলাদেশে আজ বুদ্ধিজীবী মহলে বিতর্ক বাধিতে পারে কিন্তু কৃষক-মজুরদের মধ্যে কোন্দলের রাজনীতি ছড়াইবেন না। তাহা হইলে অরাজকতা ও হানাহানিতে আমাদের স্বাধীনতাই বিপন্ন হইয়া পড়িবে।

আপনার চিঠি
এই ডিগবাজী কেন?

জনাব

সম্পাদক সাহেব,

আমি এখানে ঐসব সরকারী ও আধা সরকারী কর্মচারীদের দুঃখ দুর্দশার কথাই বলতে চাই যারা নিজেদের চাকুরীস্থল ত্যাগ করে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নিয়েছিল এবং দীর্ঘ নয় মাস পর বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশক্রমে কাজ যোগদান করে।

বাংলাদেশ সরকার প্রথমে এক নির্দেশে জানিয়েছিলেন যে, স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় যে সব কর্মচারী কাজে যোগদান করেনি তাদের ঐ অনুপস্থিতি কার্য্যরত বলে গণ্য হবে। এ নির্দেশবলে অনেক সরকারী, আধাসরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী তাদের গত নয় মাসের বকেয়া বেতন পেয়ে গেছেন। কিন্তু এরই মধ্যে বাংলাদেশ সরকার তার পূর্ব- ঘোষিত নির্দেশ পরিবর্তন করে নয় মাসের বকেয়া বেতনের পরিবর্তে এক মাসের বেতন দেবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এতে আরও বলা হয়েছে যে বঙ্গবন্ধু এসব সংগ্রামী কর্মচারীর ত্যাগ ও তিতিক্ষার জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

এখানে আমার বক্তব্য হল যে, যে সকল কর্মচারী তাদের স্ত্রী, পুত্র, কন্যাকে অন্নহীন, বস্ত্রহীন অবস্থায় মুক্ত আকাশের নীচে ফেলে এসেছেন তাদের জন্য এ কৃতজ্ঞতা কি পরিহাস নয়? বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশে পাক-সামরিক জান্তার সাথে সহযোগিতা না করার অপরাধে কেউ প্রিয় পরিজনকে হারিয়েছেন, কারও বা বাড়ী-ঘর পুড়িয়ে ভিখারী করা হয়েছে, কেউ বা চাকুরী ছেড়ে ঋণের বোঝা বাড়িয়েছে। এত কষ্ট স্বীকারের পেছনে তাদের উদ্দেশ্য ছিল দেশ স্বাধীন হবে আর বাংলাদেশ সরকার তাদের আর্থিক কষ্ট লাঘবে সাহায্য করবেন।

কিন্তু বাংলাদেশ সরকার শুধু এক মাসের বেতন ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে রেহাই পেলেন। এখন প্রশ্ন বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশ পালনটাই কি তাদের অপরাধ? স্বল্পবেতনভুক কর্মচারীরা তাদের ঋণের বোঝা থেকে রেহাই পাবে কি করে? গৃহহীন অবস্থায় স্ত্রী, পুত্র, কন্যাকে রাস্তায় রাস্তায় গাছ তলায় রাখাটি বোধহয় স্বাধীনতা সংগ্রামে শরীক হবার পুরস্কার? এত অল্প সময়ে স্বাধীনতার এত তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করবে জানলে হয়ত তাদের এ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হতো না। পাক-সরকারের আমলে কাজ করা কর্মচারীদের মত তারাও আরাম আয়েসে থাকতে পারত।

মোহাম্মদ আবুল নাসের
রাজশাহী।

অর্থে অনর্থ ঘটেছে

গত ৪ঠা মার্চ বাঙলাদেশ সরকার পাকিস্তানী ৫০ টাকার নোট বাতিল ঘোষণা করার পর সেগুলি জমা দেয়ার জন্যে মাত্র তিনদিন সময় দিয়েছিলেন ঃ ৬, ৭ ও ৮ই মার্চ। ঐ তিনদিন ব্যাংকের সামনে প্রচণ্ড ভীড় দেখা গেছে। মেহনতি গরীব জনগণ তাঁদের রক্ত পানি-করা পয়সা জমিয়েই মূলত ৫০ টাকার নোট ঘরে রাখতেন। সময়ের সংক্ষিপ্ততা তাঁদের ঘাবড়ে দিয়েছিল ঃ হয়তো অনেক কষ্টে সঞ্চিত এই নোটগুলি তাঁরা জমা দিতে পারবেন না। এই পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতেই মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী টাকা জমা দেয়ার তারিখ বাড়ানোর জন্যে সরকারের প্রতি দাবী জানিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর দাবী গ্রাহ্য হয়নি। ফলে ব্যাংক কর্মকর্তারা এবং সমাজের এক শ্রেণীর অর্থব্যবসায়ীরা সুযোগ পেয়ে যান। জনগণের তাড়াহুড়ার সুযোগ নিয়ে এরা ৫০ টাকার নোট ৪৫ থেকে ৩৫ টাকায়, এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে তারও চেয়ে কম মূল্যে কিনে নিয়ে প্রচুর কালো অর্থের মালিক হয়েছে। ঢাকা, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ ও জামালপুর থেকে পাওয়া খবরে প্রকাশ বাঙলাদেশ ব্যাংকের প্রশ্নের জবাবে উল্লিখিত স্থানগুলির ব্যাংক কর্মকর্তারা জমা দেয়া মোট টাকার প্রকৃত পরিমাণের চেয়ে ২০/৩০ হাজার বেশী টাকার কথা জানিয়েছে। নির্দিষ্ট তিনদিনের মাঝে যারা নোট জমা দিতে ব্যর্থ হয়েছেন তাঁদের কাছ থেকে এরা ১০ থেকে ২০ টাকায় ৫০ টাকার নোট কিনে বেশী বলা ২০/৩০ হাজার টাকার পরিমাণ পূর্ণ করে জনগণের অশেষ সর্বনাশের কারণ ঘটিয়েছে। বাঙলাদেশ সরকারের নির্দেশানুযায়ী গত ১৩ তারিখ থেকে ৫০০ পর্যন্ত জমা দেয়া টাকা ফেরত দেয়া হয়েছে। জনগণ আশা করেছিলেন যে তাঁরা হয় তো বাঙলাদেশের নতুন নোট পাবেন। কিন্তু বাতিল ঘোষিত ৫০ টাকার নোটের বিনিময়ে তাঁরা যা পাচ্ছেন সেগুলি হলো অত্যন্ত খারাপ এবং প্রায় নষ্ট হয়ে যাওয়া ৫ ও ১০ টাকার নোট। এমন অনেক নোটও দেয়া হচ্ছে যেগুলোর একপিঠ সম্পূর্ণরূপে তালিমারা। এদিকে পাকিস্তান সরকার ১০ টাকার নোট বাতিল ঘোষণা করেছে। ফলে জনগণের মনে এখন প্রবল আতংক। কেউই আর সহজে ১০ টাকার নোট নিতে চান না। বিশেষ করে অনেক সময় ব্যাংক কর্তৃপক্ষও এই জাতীয় নোট গ্রহণে আপত্তি জানান। তাছাড়া এই নোটগুলিও অল্পদিনের মাঝেই সরকার বাতিল করে দেবেন বলে আশংকা করা হচ্ছে। তখন আবার নোট জমা দেয়ার দুঃসহ যন্ত্রণা সইতে হবে। পরিণতি হয়তো এমনও হতে পারে যে, টাকা থাকতেও বহুলোক না-খেয়ে মারা যাবেন।

গত ৩রা মার্চের 'হক-কথায়' ১০০ ও ৫০০ টাকার নোটের জন্যে জনগণের লাঞ্ছনার কথা লিখা হয়েছে। এত কিছুর পরও নতুন টাকা নিয়ে টালবাহানার কারণ আমরা বুঝি না। অথচ খবরে প্রকাশ টাঙ্গালের জন্যে নাকি ৩ কোটি টাকার নতুন নোট দেয়া হয়েছে। এখন তাই জনমনে প্রশ্ন ঃ এই নতুন টাকা কি শুধু কোন বিশেষ মহলকেই দেয়া হচ্ছে ? জনগণের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলার এত সাহস কোথা থেকে আসে ?

মুক্তিযুদ্ধের তথ্য সংগ্রহ

সমাজতান্ত্রিক কর্মী শিবিরের উদ্যোগে আজাদ সুলতানের সম্পাদনায় 'স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলাদেশ' নামক বাস্তব তথ্য ও তত্ত্বসমৃদ্ধ বৃহৎ পুস্তক প্রকাশের পরিকল্পনা নেয়া

হয়েছে। এই পুস্তকটির জন্য উৎসাহী কর্মী এবং মুক্তিযোদ্ধাদের তরফ থেকে গ্রাম বা ইউনিয়ন পর্যায়ে পক্ষপাতহীন তথ্য, বিবরণ, বাস্তব অভিজ্ঞতা, ধ্বংসস্তূপের ছবি, কংকালের ছবি, বিকলাঙ্গ ব্যক্তিদের ছবি এবং মুক্তিযোদ্ধাদের ছবিসহ লেখা পাঠাবার জন্য আহ্বান করা হয়েছে। এ ব্যাপারে সমাজতান্ত্রিক কর্মী শিবির লেখা পাঠাবার নিয়মাবলীসহ একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন।

উৎসাহী লেখকেরা ২৫, লিয়াকত এভিন্যু, ঢাকা-১ এই ঠিকানায় উক্ত পুস্তিকা সংগ্রহ করতে পারেন অথবা লেখা পাঠাতে পারেন।

ওরা বলে–
'স্বাধীনতা কারে কয়'

॥ রওশন আরা রিনু॥

স্বাধীন বাংলার বাস্তব দর্পণে–
নিষ্পেষিত মানুষের আর্তচিৎকারে
কালের গতি চঞ্চল।
প্রথম ভাগ–মানুষের জয় উল্লাসে
ওরা আতংকিত হয়
চেয়ে থাকে দ্রুততর গতি দেখে।
পীচ্ গলা কালো পথের বুক বেয়ে চলছে
কতগুলো ভিক্ষুক আর দিনমুজুরের ছেলে,
ক্ষুধার অসহ্য যন্ত্রণায়–
কোটরগত চোখের জ্যোতিতে,
নতুন পৃথিবী দেখার নিষ্ফল প্রয়াস।
বুকের হাড়গুলো সারি সারি সাজানো
যেন–বিদ্রোহের প্রতিচ্ছবি।
কাকলীরত মানুষের প্রফুল্ল মনের খোঁজ নিয়ে
এগিয়ে যায়,–
কিন্তু–আশান্বিত মনের মৃত্যু হয়।
পৃথিবীর রং ওরা দেখতে পায় না
নবজন্ম স্বাধীনতা জয় উল্লাস
ওদের কানে পৌঁছায় না,
তাই–ওরা বলে,
'স্বাধীনতা কারে কয়।'

পাঠকের অভিমত

বাংলাদেশের সমাজতন্ত্র কোন্ পথে

'হক-কথা'র ২য় সংখ্যায় এবং চতুর্থ সংখ্যায় 'বাংলাদেশের সমাজতন্ত্র কোন্ পথে' এই পর্যায়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার অবতারণা করা হয়েছে। আসলে এ প্রশ্নটাও আজকাল সকলেরই।

সরকার আমাদেরকে বলেছেন, সমাজতন্ত্র হবে। কিন্তু সেটা কিভাবে কোন্ পথে কোন্ বিশেষ লগ্নে আবির্ভূত হবে তা বলা হয়নি।

বিশ্ব ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেওয়ার যদি আমাদের সদিচ্ছা থেকে থাকে তবে পৃথিবীর কোন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকেই আমরা অস্বীকার করতে পারি না এবং যে কোন বিপ্লব থেকেই শিক্ষা নেওয়ার সৎসাহস আমাদের থাকা উচিত।

মহল বিশেষ সমাজতন্ত্র শব্দটাকে নানাভাবে বিকৃত করে এদেশের সমাজতান্ত্রিক ভবিষ্যতকে ক্রমেই গোলাটে করে তুলছেন। এরা 'সমাজতন্ত্র' জিনিষটাকে আঞ্চলিকতার গণ্ডিতে আবদ্ধ করে তা থেকে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টায় আছেন। আসলে 'সমাজতন্ত্র' যে একটা বৈজ্ঞানিক মতবাদ এবং এটা যে সমগ্র বিশ্বের শোষিত-নিপীড়িত মানুষের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক মুক্তির জন্য এসেছে এটা তারা মতান্তরে বিরোধিতা করেছেন। সত্যিকার অর্থে সমাজতন্ত্রের কোন দেশ, কাল থাকতে পারে না। এটা সব দেশের জন্যই কল্যাণ। কোন একটা বিশেষ দেশকে বিরোধিতা করার জন্যই হোক কিংবা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-এর নামে জন্মগত আশঙ্কা থাকার জন্যই হোক এরা সমাজতন্ত্রের মত একটা বৈজ্ঞানিক মতবাদকে 'বাংলাদেশের সমাজতন্ত্র' 'মুজিববাদ' কিংবা 'গণতান্ত্রিক সমাজবাদ' ইত্যাদি নামে আখ্যায়িত করে এবং এর সাথে শোষণের মাধ্যমগুলিকে টিকিয়ে রাখার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। এরা শেখ মুজিব নাম ব্যবহার করেই শেখ সাহেবকে ডুবাতে চান।

স্বপন ভৌমিক
টাঙ্গাইল

মুশকিলে কোশা

হযরত লাল শাহবাজ কলন্দর

।। মোঃ ওবায়দুর রহমান ।।

সত্যিকার অর্থে আওলিয়াগণ হলেন ধর্মের ছত্রছায়া স্বরূপ। তাঁরা আল্লাহর বন্ধু। সাধারণ অর্থে বন্ধু নন বরং সে বন্ধুত্ব মকবুলি স্তরের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে এবং খোদাপ্রেমে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছে। তাঁদের মর্যাদা এবং বিরাটত্বের পরিমাণ নির্ধারণ করার কোন নিদর্শন বর্তমান না থাকলেও এমন কতকগুলি ঐশ্বরিক গুণাবলী পরিদৃষ্ট হয়, যে সবের বহিঃপ্রকাশের পর স্পষ্টতঃই বুঝা যায় যে, তাঁর ব্যক্তি সত্ত্বা 'খোদার সৃষ্টি প্রেম' এবং আকিদার এক জ্বলন্ত নিদর্শন। আল্লাহর ঘোষণা ঃ যখন আমি কোন বান্দাকে আমার নৈকট্য প্রদান করি তখন আমি মখলুকের অন্তরে তার প্রতি প্রেমের সৃষ্টি করে দেই।

বস্তুতঃপক্ষে সূফী এবং আওলিয়াগণ ইসলামের সার্বিক পথপ্রদর্শক স্বরূপ। তাঁরা সত্য এবং ন্যায়ের আলোকবর্তিকা নিয়ে দুনিয়ার প্রত্যন্ত প্রান্তরে অধ্যাত্মিকতার আলো বিস্তার করে আসছেন এবং কেয়ামত পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকবে।

হযরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর ওফাতের পর থেকে আজ পর্যন্ত পাক-ভারত উপমহাদেশে অগণিত পীর আওলিয়ার আগমন ঘটেছে। উপমহাদেশে এমন কোন স্থান নেই যেখানে এই মণীষীগণ ইসলামের মহান বিপ্লবী বাণীকে পৌঁছাননি। শুধু তাই নয় এরা এ কাজে অনেক সময় রাষ্ট্রীয় রক্তচক্ষুর শিকারে পরিণত হয়েছেন। এঁদের অনেককেই দেখা যায়, ইসলামের বিপ্লবী বাণী প্রচারের ক্ষেত্রে প্রতিকূল রাষ্ট্রীয় শক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছে। খোদাপ্রেমে নিজেদেরকে বিলিয়ে দেয়ার মাধ্যমে এরা চিনেছেন নিজেকে, চিনেছেন সৃষ্টিকে। সৃষ্টিকে চেনার মাধ্যমে এরা খুঁজে পেয়েছেন সেই মূল কেন্দ্রবিন্দুকে যে বিন্দু থেকেই এই সৃষ্টির অবতারণা।

বস্তুতঃ আওলিয়ায়ে কেরামগণ ইসলামের আলো দূর-দূরান্তরে বিস্তার এবং মানুষের অন্তরে এর রাজত্ব কায়েম করার দিক দিয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করেছেন। খোদাপ্রেমের আলো তাদেরকে 'মীনারে নূর' বানিয়ে দিয়েছেন। এবং এই আলো যখনই যে

মুরিদের দরবার

পরিস্থিতির সম্মুখীন হোক না কেন তা অবস্থা ও পরিস্থিতির সহিত সমন্বয় বিধান করে থাকে। আল্লাহ্তালার এ মহান বান্দারা তখন স্বীয় পরিবার, পরিজন, বন্ধুবান্ধব ছেড়ে দিয়ে কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ঘরের মায়া ত্যাগ করে বাহির হয়ে যান। নিঃসন্দেহে ইসলামে বৈরাগ্যের কোন স্থান নেই কিংবা দুনিয়া ত্যাগেরও কোন অবকাশ নেই। এ জন্য আওলিয়া কেরামগণ দুনিয়া এবং দুনিয়াবাসীদের নিকট হতে পৃথক থেকেও তাদের সাথে সম্পর্কহীন ছিলেন না। ইতিহাসই এর জ্বলন্ত প্রমাণ।

উল্লিখিত গুণাবলীর অধিকারী যে সমস্ত পীর আওলিয়ার এ উপমহাদেশে আগমন ঘটেছে তাঁদের মধ্যে হযরত লাল শাহবাজ কলন্দর অন্যতম। তাঁর সম্পূর্ণ নাম হচ্ছে হযরত সাইয়েদ হাফিজ হাজী মাখদুম শাইখ আল কবির মোহাম্মদ ওসমান মারওয়ানদী। ইনি

সূফীবাদের ক্ষেত্রে যে মণীষা সৃষ্টি করে গেছেন, ইতিহাসের পাতায় তা চিরদিন অক্ষয় হয়ে থাকবে।

সূফীবাদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এই মহান মণীষী হিজরী ৫৫১ এবং খৃস্টীয় ১১৭৭ অব্দে ইরানের আজারবাজান প্রদেশের মারাওয়ান্দ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা সাইয়েদ কবীর উদ্দিন আহমদ জওয়াযী একজন সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন। এবং তার মা মারওয়ান্দের শাসনকর্তা সুলতান সাহেবের কন্যা। হযরত কলন্দর সরাসরি হযরত ইমাম জাফর সাদিকের বংশোদ্ভূত।

এই মণীষী বাল্যকালে তার মার কাছে ইসলামের মৌলিক ধর্মীয় শিক্ষায় পরদর্শী হন এবং মাত্র ৭ বৎসর বয়সে তিনি কোরানে হাফেজ হন। সাথে সাথে শাইখ মনসুরের তত্ত্বাবধানে উচ্চতর ইসলামী শিক্ষায় বুৎপত্তি অর্জন করেন।

যৌবন প্রাপ্তির সাথে সাথে হযরত কলন্দর শাইখ বাবা ইব্রাহিম ওয়ালী মুকিব সাবজওয়ারের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। হযরত শাইখ ইব্রাহীম মিসরের মুফতি হযরত সাইয়েদ শাইখ মোযাররিদের শিষ্য এবং খলিফা ছিলেন। পবিত্র কোরান অধ্যয়ন এবং ব্যাপক গবেষণা দ্বারা ইসলামের মৌলিক গুণাবলীর অধিকারী হওয়ার মাধ্যমে তিনি শরিয়ত মারেফাত ও হকিকাতের উপর পান্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি ইশ্‌কে হাকিকী ও 'খিদমতে খালকের' উপর ব্যাপক শিক্ষা গ্রহণ করেন। এবং এক বৎসরের স্বল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর পীর তাঁকে খিলাফতনামা প্রদান করেন এবং তাকে ভালবাসা ও স্নেহের প্রতীক স্বরূপ একটি পাথর (সাংগে মকতুল) উপহার দেন। হযরত কলন্দর এই পাথরটি তাঁর পীরের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্য সবসময় গলায় ঝুলিয়ে রাখতেন। খেলাফতনামা প্রদান করার পর তার শাইখ তাঁকে 'শাহবাজ' উপাধী দেন যার অর্থ 'পক্ষীরাজ'। হযরত কলন্দরের চক্ষু খোদাপ্রেমের জলন্ত আকর্ষণে সবসময় অত্যন্ত লাল থাকত তাই তিনি শেষ পর্যন্ত 'লাল শাহবাজ' বলেই পরিচিত হন।

এই মহান সাধক খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষদিকে জীবনের তৃতীয় স্তরে এসে পবিত্র হজ্ব সমাধা করে আর দেশে ফিরলেন না। সত্যের সাধক সত্যের অন্বেষণে এসে পৌছলেন ভারতের তৎকালীন পীর-আওলিয়ার পীঠস্থান সিন্ধুতে। সিন্ধুর মুলতানে তখন অবস্থান করছিলেন হযরত শাইখ বাহাউদ্দিন জাকারীয়া সোহরাওয়ার্দী, হযরত বাবা ফরিদ এবং হযরত মাখদুম জালালুদ্দিন সুরখ বোখারীর মত মহান সাধকগণ। সুলতান গিয়াস উদ্দিন মুহাম্মদ বলবন তখন সিন্ধুর অধিপতি। মুলতানে অসংখ্য সূফী এবং সাধকদের সাথে লাল শাহবাজও এখানে এক খানকা প্রস্তুত করেন। কিছুদিন পর তিনি পানিপথে হযরত বুৎ আলী শরিফ উদ্দিন কলন্দরের সংস্পর্শে আসেন এবং তিনি তাঁকে সিন্ধুর সাওবানে যাওয়ার পরামর্শ দেন। সেখানে ইসলামের বিপ্লবী বাণী প্রচারের অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। তাকে সাওবানে (বর্তমানে দাদু জেলা) পাঠাবার বাস্তব কারণ এই ছিল পানিপথের আশেপাশে তিনশত কলন্দর তখনও বর্তমান ছিল। সেখানে তার থাকার কোন মানেই হয় না।

সাওবানের হিন্দু শাসক রাজা জেসার অত্যন্ত অসৎ, চরিত্রহীন এবং অত্যাচারী ছিল। সাওবান তখন মিথ্যা, ব্যভিচার, নৈতিকতাহীনতা, অত্যাচার, অনাচার এবং পুতুল পূজার কেন্দ্র ছিল। হযরত কলন্দর সেখানে শহরের কেন্দ্রস্থলের এক স্থান বেছে নিলেন। সাওবান সিন্ধু নদীর তীরে এক গুরুত্বপূর্ণ বন্দর হিসাবে বিদ্যমান ছিল।

সাওবানে হযরত কলন্দরের আগমনের পরই খোদাহীনতার পঙ্কিল আবর্তে নিমজ্জিত মানুষ আলো ও সত্যের আকর্ষণে দলে দলে এসে পতাকাতলে জমায়েত হতে লাগল। এতে

রাজা জেসারের ভীত হৃদয় কেঁপে উঠল। এবং কলন্দরের বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লেগে গেল। তাঁকে বিভিন্ন উপায়ে ষড়যন্ত্রে ফেলতে চেষ্টা করে এবং তাঁর ক্ষুদ্র মুজাহিদ বাহিনীকে উস্কানী দিতে লাগল। পরিণামে অসৎ, অন্যায় এবং প্রতিমাপূজার বিরুদ্ধে সত্য, ন্যায় ও তৌহিদের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। সুলতান নাসিরুদ্দীনের বীর বাহিনী ও শাহবাজ কলন্দরের সত্য ও ন্যায়ের নিশান বরদার মুজাহিদ বাহিনীর আক্রমণে রাজা জেসারের বাহিনী পর্যুদস্ত হয়ে যায়। ধীরে ধীরে এই সাধক ও মুজাহিদের নেতৃত্বে সাওবানসহ অন্যান্য স্থানও ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নেয়। হযরত কলন্দর সাওবানে ইসলামের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

জয়লাভের পর তিনি ইসলামের শিক্ষা দান শুরু করেন। হযরত লাল শাহবাজ কলন্দর অসাধারণ পণ্ডিত, কবি, ভাষাবিদ, বৈয়াকরণীক এবং মহান সূফী ও মুজাহিদ ছিলেন। তিনি স্রষ্টার স্মরণে গভীর অনুশীলন এবং মনোনিবেশের মাধ্যম সূফীইজমের চূড়ান্ত স্তর 'ফানা ফিল্লাহে' উত্তীর্ণ হন।

হযরত শাহ কলন্দর সবসময় গৌরবর্ণের কাপড় পরিধান করতেন। সূফী তত্ত্বের ক্ষেত্রে গভীর অনুশীলন এবং মনোনিবেশের বহিঃপ্রকাশ ঘটতো তাঁর রক্তবর্ণ চক্ষুতে। সৃষ্টিকর্তার প্রতি চিরন্তন ভালবাসায় উজ্জ্বল ছিল তার চক্ষু, তার অস্তিত্ব ছিল 'ওয়াহ্‌দাতুল অজুদের' জ্বলন্ত নিদর্শন। তিনি ইবাদত ও গভীর অনুশীলনের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক জগতের চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছেন। আত্মোপলব্ধির চরম পর্যায়ে স্রষ্টার সাথে তাঁর সম্পর্ক এবং নিজের ব্যক্তি সত্ত্বার অস্তিত্ব সম্পর্কে আত্মিক সচেতনতা লাভ করেন। নিম্নের কয়েক লাইনে এরই মূর্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

"আমি সেই, যাকে আমি ভালবাসি
এবং সে, যাকে আমি ভালবাসি,
সে-ই আমি।
আমরা এক দেহ দুটি প্রাণ।
যখন সে আমাকে দেখে–
সে তাকেই দেখে এবং শুধু তাকেই দেখে।
অথবা সে আমাদের উভয়কে দেখে।"

হযরত কলন্দরের (রাঃ) প্রতি ভালবাসা এবং শ্রদ্ধায় তাঁকে ওসমান, লাল, শাহবাজ, কলন্দর, সাইফুল লিছান, শামছুদ্দিন, মেহন্দি মখদুম, মাসৃত ও মাসৃত কলন্দর লাল ইত্যাদি নামে সম্বোধন করা হতো। তাঁর মুরশিদদের পরম্পরা হযরত শাইখ ইব্রাহিম, হযরত শাইখ সাইয়েদ মুজাররিদ, হযরত ইমাম আলী রেজা, হযরত জয়নুল আবেদীন, হযরত আলী (রাঃ) এবং হযরত মোহাম্মদ (দঃ) পর্যন্ত ছিল।

এই মহান মণীষী হিজরী ৬৭৩ অব্দের ২১শে সাবান তারিখে ১১২ বৎসর বয়সে দেহ ত্যাগ করেন। সুলতান ফিরোজশাহ তুগলকের শাসনামলে হিজরী ৭৫৭ অব্দে সাওবানের শাসক মালিক বখতিয়ার উদ্দিনের দ্বারা তার মজারে সুন্দর স্মৃতিশৌধ নির্মিত হয়। মৃত্যুর পূর্বে তিনি কলন্দরী তরিকাতে শিক্ষাদানের জন্য সাইয়েদ আলী শাহ সার মাসৃত এবং হযরত আবদুল্লাহ শাহকে খলিফা নিযুক্ত করে যান।

এই মহান সাধক এবং সূফীর বাৎসরিক ওরশ প্রতি বৎসর ১৮ই শাবান থেকে উদযাপন শুরু হয়। সেই সময় পাক-ভারত উপমহাদেশের প্রত্যন্ত গ্রাম হতে তাঁর ভক্ত অনুসারীগণ এসে সাওবান শরিফে মহাসাড়ম্বরে ওরশ উদযাপন করে থাকেন। অগণিত ভক্ত এসে শ্রদ্ধা জানিয়ে যান তাঁর পবিত্র মাজারশরীফে।

হযরত শাহ কলন্দর খোদাপ্রেমের অভিব্যক্তিমূলক যে সমস্ত মারফতী গান রচনা করেছেন তা সর্বজনবিদিত এবং স্থানীয় জনসাধারণের মুখে মুখে তা উচ্চারিত হয়ে থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ইসলামের

নামে অর্জিত পাকিস্তানে এ মহান সাধকের সত্যিকার মর্যাদা দেওয়া হয় নাই। প্রাচীন ঐতিহ্যের লীলাভূমি সিন্ধুর গ্রামে গ্রামে লোক মুখে প্রচলিত প্রসিদ্ধ একটি আধ্যাত্মিক গানকে চলচ্চিত্রগোষ্ঠী টুইষ্ট গানে রূপান্তরিত করেছে। একটি মুসলিম দেশের সিনেমাগোষ্ঠীর এহেন দৃষ্টতা সত্যিই অপ্রত্যাশিত। এর একটা প্রতিকার হোক এবং এ মহান সূফীর সত্যিকার মর্যাদা দান করা হোক, ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের এটাই কামনা।

আমার জবাব

আবদুল্লাহ্ আল মামুন
ওয়ারী, ঢাকা

বিগত ২৬শে ফেব্রুয়ারী কৃষক সমিতির সভায় আপনি বলেছেন–মানুষকে না ভালবাসলে আল্লাহ্‌কে ভালবাসা যায় না। বিশ্বমানবপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হলে আমরা কি অহিংসবাদী হয়ে যাই না? এবং তাতে কি পুঁজিপতি ও সাম্রাজ্যবাদীরা মানুষকে শোষণ করবার সুযোগ পাবে না?

উত্তর

ভালবাসাকে কখনো বিভক্ত করা যায় না। সর্বহারা ও পুঁজিপতিকে একই মন ভালবাসে। সর্বহারাকে ভালবেসে আমরা তার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। আর পুঁজিপতিকে ভালবেসে আমরা তাকে মানুষ রাখতে চাই। এই চাওয়া-পাওয়ায় কোন আপোষ নেই। প্রয়োজনে তাই আমরা হিংসাত্মক পন্থা অবলম্বন করতেও দ্বিধাবোধ করি না। তাতে আমরা মনেও করি না যে কোন অন্যায় কাজ করছি। জালেম শোষককে মানুষের কাতারে আনতে চপেটাঘাত, বেত্রাঘাত, পদাঘাত যা-ই দিতে হয় না কেন–নিশ্চয়ই তা বাঞ্ছিত। এই অর্থে মানবজাতির প্রতিটি সদস্যকে ভালবাসলেও আমরা অহিংসবাদী হয়ে পড়ি না। আমাদের অন্তরের উদ্দেশ্য বা নিয়ত শুধু আল্লাহ্‌ই জানেন এবং মনে যদি এই ভরসা থাকে যে তিনি যে ইনসাফকে পছন্দ করেন আমরা তাই করছি– তবে আর ভাবনা কিসের। সমগ্র দুনিয়া বিরোধিতা করলেও আমরা তা করে যাব। তাই ভালবাসাকে এক্সপ্লয়েট করবার কোন সুযোগ পুঁজিপতি বা সাম্রাজ্যবাদী পাবে না।

চীন ও রাশিয়ার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে বহু পুঁজিপতি-জোতদার নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে মানুষের কল্যাণে সর্বস্ব ত্যাগ করে সর্বহারা হয়েছেন। মার্কসের আদর্শ ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রচারই লাভ করতো না যদি না এঙ্গেল্‌স্ তাঁর সম্পদ উজার করে না দিতেন। বিবি খাদিজা ও হযরত উসমানের অঢেল সম্পত্তির আয় ইসলাম প্রচারে ব্যয় না হলে স্বয়ং রসূলুল্লাকেও (দঃ) মহা বিপাকে পড়তে হত। অবশ্য এই প্রসঙ্গে বৃটিশ নাট্যকার-দার্শনিক বার্ণাড শ-এর একটি কটাক্ষ আমার মনে পড়ছে। একটি নাটকে তিনি প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন, বিশ্বের বড় বড় অসৎ ব্যবসায়ীর অর্থ সাহায্য না পেলে মানবতাবাদী কোন সংস্থাই টিকে থাকতে পারবে না।



বস্ত্র-শিল্পে নতুন সমস্যা

॥ আহমদ শাহ রেজা ॥

অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষের মতো কাপড়ের বাজারেও যেন আগুন জ্বলছে। আগে যে কাপড়ের প্রতি গজ দাম ছিল ২ টাকা, এখন তা ৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। যে শাড়ী পাওয়া যেত ১০ টাকায়, তার বর্তমান দাম হয়েছে ২০ টাকা। এমনিভাবে প্রতিটি সুতি কাপড়েরই দাম এখন আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গেছে।

কাপড়ের দাম বেড়ে যাওয়ার পেছনে যে-কারণগুলো রয়েছে, তাহলো ঃ সুতা এবং রঙের দুষ্প্রাপ্যতা এবং অগ্নিমূল্য। বাঙলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর সুতা এবং রঙের দাম যথাক্রমে প্রায় শতকরা ৪০/৫০ এবং ১০০ ভাগ বেড়ে গেছে। কাঁচামালের অভাবে বাঙলাদেশের সুতাকলগুলোর বেশীর ভাগই এখন বন্ধ হয়ে গেছে, যে-কয়টি চালু আছে, তার উৎপাদন শতকরা মাত্র ১৫ থেকে ২০ ভাগ চলছে। জানা গেছে ঃ বাঙলাদেশের বিভিন্ন কলকারখানার গুদামে এখনো প্রচুর সুতা জমা থাকতেও তা সঠিকভাবে বিলি করা হচ্ছে না। এখন তাই সুতার জন্য একমাত্র ভরসা প্রতিবেশী ভারত। স্বাধীন হওয়ার পরপর ভারতের যে সুতা বিক্রি হতো ১২০ টাকায়, এখন সেই সুতার দামই বেড়ে গিয়ে হয়েছে ১৭০/১৮০ টাকা। অথচ ভারতের সুতা বাঙলাদেশের তুলনায় অনেক খারাপ। এই সুতা ব্যবহারের ফলে বাঙলাদেশ তার কাপড়ের মান অনেক হারিয়ে ফেলেছে। ভারতীয় পুঁজিপতিরা আমাদের সুতার অভাবের সুযোগে ইচ্ছেমতো দাম বাড়িয়ে দিয়ে প্রচুর মুনাফা লুট করছে। ফলে কাপড়ের দামও কমছে না।

আর একটি কারণ রঙ-বিশেষ করে পাকা রঙ। ভারত বা বাঙলাদেশের কোথাও পাকা রঙ তৈরী হয় না। রঙের জন্য তাই বিদেশের ওপর নির্ভর করতে হয়। পাকিস্তানী আমলে গণচীন, হাংগেরী, জাপান, বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশ থেকে রঙ আমদানী করা হতো। স্বাধীন হওয়ার পর বাঙলাদেশে প্রচুর রঙ জমা থাকা সত্ত্বেও দাম শতকরা প্রায় ১০০ ভাগ বেড়ে গেছে। জানা গেছে ঃ পাকিস্তানী আমলে আমদানীকৃত রঙের শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগই চোরাপথে ভারতে চলে যাওয়াতেই নাকি দাম এত বেড়ে গেছে। ফলে যে রঙ বিক্রি হতো ৪৫/৫০ টাকায়, এখন তারই দাম হয়েছে ১০০ টাকা–তাও অনেক সময় পাওয়া যায় না।

কৃত্রিম সুতা সঙ্কট
ও
ভারতের রঙ পাচার

উপরোক্ত কারণগুলোর জন্যে বাঙলাদেশের কাপড়ের দাম বেড়ে যাওয়ায় সুযোগ পেয়েছে দেশদ্রোহী চোরাকারবারীরা (জানিনা তারা শুধু বাঙলাদেশের কিনা)। এরই মাঝে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা বাঙলাদেশের অধিকাংশ জিনিষের বাজার দখল করে নিয়েছে। চোরাকারবারীদের বদৌলতে কাপড়ের বাজারও তাদের হাতে চলে যাওয়ার পথে। তাই বলে ভারতীয় কাপড়ের দাম কিন্তু কম নয়। আগে টাঙ্গাইল, পাবনা প্রভৃতি স্থানের শাড়ী কাপড়-পড়তে পেরে ভারতীয়রা গৌরব বোধ করতেন, অথচ এখন সেই ভারতেরই প্রচুর শাড়ী-কাপড় চোরাপথে এসে বাঙলাদেশ ভরে ফেলেছে। এতেও আমাদের লজ্জা হচ্ছে না, চোখ খুলছে না। আমরা নাকি তবু আত্মনির্ভরশীল হতে যাচ্ছি।

সরকারের প্রতি তাই আজ জনগণের দাবীঃ চোরাপথে ভারত থেকে সুতা, রং ও কাপড় আসা অবিলম্বে বন্ধ করুন; চোরাপথে ভারতে রঙ চলে যাওয়া বন্ধ করুন; অবিলম্বে বিদেশ থেকে উন্নতমানের তুলা এবং রঙ আমদানির ব্যবস্থা করুন; বাঙলাদেশের সকল সুতা ও বস্ত্র কল চালু করুন; সুতা-রঙের দাম

কমানোর ব্যবস্থা করুন; কম দামে অন্ততঃ পাকিস্তানী আমলের দামে অবিলম্বে সুতা ও রঙ সরবরাহের ব্যবস্থা করুন; খোলা বাজারে চোরাপথে আসা কাপড় বিক্রি বন্ধ করুন।

উপরোক্ত দাবীগুলো পূরণ করলেই কাপড়ের দাম কমতে পারবে। নাহলে চিরদিনের নিয়মানুযায়ী দাম শুধু বাড়তেই থাকবে, কোনদিনও কমবে না।

চাঁদের বয়স কত ?

চাঁদের মাটিতে কি আছে ? চাঁদের পৃষ্ঠ থেকে আলগোছা তুলে আনা এপোলো-১১ বাহিত ৫০ পাউণ্ড শিলা আর কৃষ্ণগুড়া মাটির মধ্যে কি ছিল।

শিলানুড়িগুলি ছিল সাধারণ পেঁয়াজের আকারের, বড়গুলি ছিল দৈর্ঘ্যে প্রায় ৫ ইঞ্চি। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয়েছিল, পৃথিবীর কোন স্থান থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে এ নুড়ি ও মাটি। কিন্তু নিবিড় পর্যবেক্ষণের ফলে প্রতীয়মান হয় যে, পৃথিবীর উপাদানের সাথে তার কোন মিল নেই। নুড়িগুলিতে চিকমিক করেছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাঁচতন্ত্র সিলিকা, অনেক গুলির উপর যেন কাঁচের আস্তরণ।

চন্দ্রবক্ষ থেকে আনীত দ্রব্য-এক তৃতীয়াংশ মৃত্তিকা। মৃত্তিকার অধিকাংশ কাঁচ। কাঁচ কণিকাগুলি তীক্ষ্ণ, কৌণিক, চৌকস শীর্ষে তীর্যক আলোর প্রতিফলন ফুটে ওঠে বিভিন্ন রঙ। শতকরা দশ ভাগ চৌকস কণিকা ধূসর, সবুজ, হরিৎ, লোহিত ও গোলাপী আলোর বিচ্ছুরণ ঘটায়। অথচ পৃথিবীর মাটিতে কাঁচের পরিমাণ অতি সামান্য।

ইলেকট্রনের দ্বারা যাচাই, তেজস্ক্রিয় আইসোটপের আকস্মিক ভর; বিদ্যুৎ কুণ্ডলী দ্বারা বাষ্পীভবন-- এ সকল প্রক্রিয়া চন্দ্র মৃত্তিকা বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে চাঁদের উপাদান আর পৃথিবীর উপাদান প্রায় এক, তবে মিশ্রণের অনুপাত ভিন্ন। চন্দ্র মৃত্তিকায় ইউরেনিয়াম ও পটাশিয়ামের মিশ্রণের অনুপাত পৃথিবীর মাটির চাইতে অনেক বেশী। টিটানিয়াম আছে চাঁদের মাটিতে। তবে স্বর্ণ ও রৌপ্যের পরিমাণ পৃথিবীর মতই কম।

প্রখ্যাত জীবতত্ত্ববিদ চার্লস ডারউইনের পুত্র স্যার জর্জ ডারউইন তাঁর এক থিওরীতে বলেছিলেন, সৌর জগত সৃষ্টি হওয়ার সময় পৃথিবীসহ গ্রহগুলির আকার ছিল নরম কর্দমতুল্য পদার্থের এক একটা পিণ্ড। এ সময় সূর্যের মহাকর্ষণের টানে পৃথিবী গ্রহের একটা অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে সৃষ্টি হয়েছিল আমাদের উপগ্রহ চাঁদ।

দ্বিতীয় তত্ত্বে অন্য কোন প্রান্তে জন্ম নিয়েছিল চাঁদ, মহাশূন্যে ক্ষিপ্ত গতিতে ছুটে যাবার সময় পৃথিবীর মহাকর্ষণের আওতায় ধরা পড়ে অনন্তকালের জন্য ঘুরছে পৃথিবীর চারিদিকে।

তৃতীয় তত্ত্বেও বলা হয়, চন্দ্র ও পৃথিবী একইভাবে, একই সময়ে গঠিত হয়েছিল। অনন্ত মহাশূন্যে কণিকা, গ্যাস ও ভগ্ন গ্রহ নক্ষত্রের ভগ্নস্তূপ উত্তপ্ত করাতেই পতিত ধান বা শস্যের ন্যায় নেচে নেচে বেড়াচ্ছিল। এ সকল খণ্ড ও কণিকা পরস্পরের সাথে সংঘর্ষে ক্রমান্বয়ে বড় পিণ্ডের আকার ধারণ করে। পরিণামে উদ্ভব ঘটে এই গ্রহ-উপগ্রহমালার।

জুনিয়র ডারউইনের থিওরীটি চন্দ্রশিলা পরীক্ষার পর আজ ভ্রান্ত বলে মনে হচ্ছে। তবে বাকী থিওরীগুলো ভ্রান্ত না অভ্রান্ত এ ব্যাপারে কিছু বলা যাচ্ছে না।

বিজ্ঞানীদের হিসাবে পৃথিবীর বয়স ৪৬০ কোটি বছর, তবে প্রাপ্ত সর্বপুরাতন শিলার বয়স ৩৫০ কোটি বছর বলে বিজ্ঞানীদের অনুমান। প্রথম ১০০ কোটি বৎসরের সৃষ্ট ভূতাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া ও জীবজন্তুর জীবনক্রিয়ার ফলে বিনষ্ট হয়ে গেছে, অথচ চাঁদের বৃষ্টি নেই, হাওয়া নেই, সেখানে

প্রাচীনতম শিলার অস্তিত্ব আবিষ্কার করা সম্ভব হবে। এপোলো-১১ ও ১২ বাহিত শিলাগুলি ৩৩০ হতে ৩৭০ কোটি বছরের প্রাচীন বলে অনুমিত হয়েছে। সব চাইতে বিস্ময়ের ব্যাপার লেবু আকৃতির একটি চন্দ্রশিলা পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা বলেছেন, এটার বয়স ৪৬০ কোটি বৎসর- অর্থাৎ বিজ্ঞানীদের অনুমিত পৃথিবীর বয়সের সমান।

ইহা কি সত্য?

॥ ২০॥

বাংলাদেশ সরকারের কর্তৃত্বাধীন ২৩টি চা বাগানের পরিচালনা কমিটির জনৈক উর্ধতন কর্মকর্তা মোট ৮টি বাগানের ম্যানেজার পদসহ বিভিন্ন বিভাগে নিজের অনুপযুক্ত আত্মীয়স্বজনকে নিয়োগ করে আমাদের চা শিল্পের সর্বনাশ সাধন করেছেন।

নিকটস্থ একটি চা বাগানের মালিক হওয়া সত্ত্বেও উক্ত কর্মকর্তার নন-ম্যাট্রিক এক শ্যালককে বিগত ১৭ই ফেব্রুয়ারী থেকে গাজীপুর চা বাগানের ম্যানেজার পদে নিযুক্ত করা হয়েছে। অবশ্য দৈনিক পত্রিকায় কর্তৃপক্ষ এই পদের জন্য ২৪শে ফেব্রুয়ারীর পূর্ব পর্যন্ত কমপক্ষে গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রীধারীর দরখাস্ত আহ্বান করেছিলেন।

এবার যা ঘটার তাই ঘটছে। গাজীপুর চা বাগানের অনেক কিছু শালা ম্যানেজারের নিজস্ব বাগানে উড়ে উড়ে চলে যাচ্ছে।

॥ ২১॥

টাঙ্গাইলের শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও আশ্রমটি স্বাধীনতার পরও দখলমুক্ত হয়নি। নয়টি মাস হানাদার বাহিনীর দখলে থাকার পর স্থানীয় ধর্মপ্রাণ হিন্দু জনসাধারণ আশা করেছিলেন আশ্রমে পূজা ও ভোগ দেওয়া সম্ভব হবে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় মুক্তিবাহিনী বলে পরিচয় দিয়ে সপরিবারে জনৈক ভদ্রলোক বিগত তিন মাস ধরে আশ্রমটিতে বসবাস করছেন। সংশ্লিষ্ট মহল সরকারী কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন-নিবেদন করেও কোন ফল পাননি। ধর্মনিরপেক্ষ বাঙলাদেশে এর প্রতিকার হবে কি ?

॥ ২২॥

টাঙ্গাইল জেলার খাদ্য বিভাগীয় জনৈক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মোট ১৮টি অভিযোগ সংশ্লিষ্ট উর্ধতন কর্তৃপক্ষ সমীপে পেশ করা হয়েছে। এতে বিশেষ করে তার দালালী-কাহিনী ও দুর্নীতি-গাঁথা লিপিবদ্ধ রয়েছে।

খাদ্য বিভাগীয় জেলার এই কর্মকর্তা বিগত এপ্রিল মাসে টাঙ্গাইলের গুদামজাত প্রচুর খাদ্য দ্রব্য আত্মসাত করে তা মুক্তিবাহিনীর উপর চাপিয়ে দেন। মধুপুরের গুদাম থেকেও নিজস্ব লোকজন দিয়ে খাদ্যদ্রব্য সরিয়ে নিয়ে দখলদার বাহিনীর কাছে মুক্তিবাহিনীর কাণ্ড বলে বর্ণনা করেন। মধুপুর পার্কে হানাদার বাহিনীর অফিসারদের সাথে তিনি জমজমাট এক বনভোজনে যোগ দেন এবং সরকারী গুদাম থেকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি খরচ করেন। ১৯৭১ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর মেজর জেনারেল আবদুর রহীম খানের সম্মানার্থে যে ভোজসভার আয়োজন করা হয় তার অন্যতম হোতা ছিলেন তিনিই। সার্কিট হাউজে মাঝে মাঝে হানাদারদের যে জলসা বসত তাতে তিনি নিজে বাঙালি বিরোধী গানও পরিবেশন করেছেন। আশ্চর্য, আজ তিনি দালাল নন। বরং মুজিব সরকারের একজন অফিসার। সবশেষে যা করছেন তা হল জাতিসংঘের রিলিফের কাজে প্রদত্ত ট্রাকে টাঙ্গাইল-ঢাকা রুটে ভাড়া খাটিয়ে বেশ পয়সা কামাই করছেন। রিলিফের ট্রাকে তাই প্রায়শঃ দেখা

যাবে গম বা চাউলের বস্তার বদলে এক গাদা মানুষ।

ডারউইনের বিবর্তন ?

দালাল হামিদুল হক চৌধুরীর মদদের জন্য আওয়ামী নেতাদের কেউ কেউ কি দালালী করছেন?

শতকরা দশভাগ শেয়ারের মালিক হয়েও যে ব্যক্তিটি হামিদুল হক চৌধুরীর পত্রিকার প্রশাসক নিযুক্ত হয়েছেন–অকস্মাৎ জেনেভার পথে তিনি পাড়ি জমিয়েছেন। এ যাত্রার মুনিব-বন্ধুটির জন্যে খোশ নসিবের সওগাত নিয়ে যাওয়ারই কথা। কেননা, আওয়ামী মহলের প্রশাসকটির ডাকসাহটে প্রভাব। শুধু কি তাই? ঢাকার বাজারে জোর গুজব, দালাল নেতা জহীরুদ্দীন জনৈক দেশবন্ধুর আশ্রয়ে দিন কাটাচ্ছেন। বিশেষ করে বিগত মাসখানেকের খবর নিলে দেখা যাবে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে এককালের দালালগণ বহাল তবিয়তে বিরাজ করছেন। নাকে খৎ নয়, পিঠে পদাঘাত নয়, গালে চপেটাঘাতও নয় – কিছুই তাদেরকে পেতে হয়নি। চাঁদার যাদুতে তারা সব দেশপ্রেমকে হারিয়ে দিয়েছেন। কক্সবাজারে জনৈক এমসিএ-র দুলাভাই, বরিশালের এক নেতার ভাগ্নী জামাই, মোমনশাহীর জনৈক এমসিএ-র জ্ঞাতি ভাই, ফরিদপুরের এক নেতার পড়শী ভাই ইত্যাদি সবাই আজ দেশপ্রেমে গদগদ। আজ তারা দালাল নন। তবে যারা দালাল ছিলেন না তাদেরকেই সে গুণে গুণান্বিত করছেন।

নিখোঁজ

ফজলুল হক নামে ১৩ বৎসরের একটি বালক বিগত আড়াই মাস যাবত নিখোঁজ রয়েছে। ছেলেটির নাকে একটি কাটা দাগ আছে। এর গায়ের রং ফরসা। কেউ পেয়ে থাকলে তাকে আবদুল সোবহান শেখ, গ্রাম ঃ আলীসাকান্দা, পোঃ বিন্নাফৈর, থানা ঃ টাঙ্গাইল, এই ঠিকানায় জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

পাত্রী চাই

ইংরেজীর অধ্যাপকের (কাগমারী কলেজ) সংসারে গৃহিনী হবার উপযুক্ত পাত্রী চাই।

'হক-কথা' প্রযত্নে যোগাযোগ করুণ।

সম্পাদক ঃ সৈয়দ ইরফানুল বারী মুদ্রণে ঃ শান্তি প্রেস, টাঙ্গাইল।

প্রতি কপি বিশ পয়সা সাপ্তাহিক রেজিস্টার্ড নং ডিএ ১৭৬

হক-কথা

(WEEKLY THE HAQ-KATHA)

প্রকাশক ও পৃষ্ঠপোষক ঃ মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

প্রথম বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যা রবিবার ১৯ শে চৈত্র ১৩৭৮ ; ২রা এপ্রিল, ১৯৭২; ১৬ই সফর, ১৩৯২; সন্তোষ, টাঙ্গাইল

রিলিফের নামে চোরাচালান

অবশেষে চোরাচালান জঘন্যতম রূপ নিয়ে বাংলার বন্দর–গঞ্জ ছাড়খার করে যাচ্ছে।

কোচবিহার, মেঘালয়, আগরতলা, মুর্শিদাবাদ ও পশ্চিম দিনাজপুর সীমান্ত দিয়ে ট্রাকে করে রিলিফের মাল বাংলাদেশে পৌঁছে দেয়ার নামে চোরাচালান অব্যাহত রয়েছে। পত্র-পত্রিকায় প্রচার এবং জনগণের মোটামুটি সচেতনতার ফলে চোরাচালানের পদ্ধতি বদলানো হয়েছে মাত্র, কিন্তু এর মাত্রা কমেনি।

বিগত মার্চ বিশেষ করে এর শেষার্ধ থেকে প্রতিটি রিলিফবাহী ট্রাক চোরাচালানের কাজে নিয়োজিত রয়েছে। কলকাতা বন্দরে খালাসকৃত বাংলাদেশের মালপত্র ও পুনর্বাসনের নিমিত্ত প্রাপ্ত বৈদেশিক সাহায্য পৌঁছানোর দায়িত্ব ভারত সরকারের যোগাযোগ দফতর পালন করতে থাকলেও প্রেরিত ট্রাকের সাথে অসাধু মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীগণ সম্পর্ক স্থাপন করে অবাধে চোরাচালান চালিয়ে যাচ্ছে। তাই উপরোক্ত সীমান্ত এলাকায় আজকাল দেখা যায় রিলিফের ট্রাক ধান, চাউল, পাট, কলাই, হাঁস, মুরগী, ডিম, খাসী, রং, পিতল, কাঁসা ইত্যাদি বোঝাই হয়ে ফিরে যাচ্ছে। যেহেতু এই লেনদেনের সাথে স্থানীয় প্রভাবশালী আওয়ামী নেতাদেরও সম্পর্ক বিদ্যমান তাই কোন প্রহরী কিংবা মহল এতে বাধাদান করার সাহস পাচ্ছে না। পশ্চিমবঙ্গীয় সীমান্ত দিয়ে যে কয়টি রিলিফবাহী ভারতীয় ট্রাক চোরাচালানে চুক্তিবদ্ধ রয়েছে এদের পনেরটির নম্বর নিম্নরূপ ঃ

এ, এস, জেড – ১৬৯৬
এ, এস, জেড – ২২২৭
এ, এস, জেড – ৬৪৪৯
এ, এস, জেড – ৫২৬২
এ, এস, জেড – ৭৪৯৭
এ, এস, জেড –৪৩০২
এ, এস, জেড – ৩১২৫
এ, এস, কে – ৬৭০২
ডব্লিও, জি, ডি – ৪২৫২
ডব্লিও, জি, ডি – ২৮৩৮
ডি, এল, এল – ৯২৫৬
ডব্লিও, জি, আর – ৪৫৮
পি, এল, এল – ৫২৪২
এ, এস, এইচ – ৩১৫২
বি, আর, ডি– ৩৩৫২

গত মাসের শেষার্ধে নিম্নবর্ণিত ট্রাকগুলো মেঘালয় সীমান্ত দিয়ে রিলিফের কিছু কম্বল ও

অন্যান্য জিনিষ নিয়ে একেবারে টাঙ্গাইল শহর পর্যন্ত আসে। ফিরে যাবার সময় এই ভারতীয় ট্রাকগুলো পাট, পিতল, কাঁসা ও আগে আমদানী করা বিদেশী রং নিয়ে যায়। ট্রাকগুলোর নম্বর হল ঃ

ডি, এল, এল – ৯৪৭২
এইচ, আর, এ-৩০৭৭
ডব্লিও, বি, ও- ৪০৬৭
ইউ, এস, ডি-৫৯৮৫
এ, এস, জেড-৬৯৮৫
এ, এস, জেড-৪৮১৯
এ, এস, জেড-৪৪৩৫
এ, এস, জেড-৬১৯৫
এ, এস, জেড-৪৪১

চাঁদার হার

বাৎসরিক – নয় টাকা
যান্মাষিক – পাঁচ টাকা।

মাছের চোরাচালান

ভারত-বাংলাদেশ বাণিজ্য চুক্তিতে আমাদের মাছ রপ্তানীর অবকাশ রয়েছে সত্য কিন্তু বিগত তিন মাসে কত লক্ষ টাকার মাছ চোরাপথে ভারতে চলে গেছে এর হিসেব কেউ দিতে পারবেন না। মাছের চোরাচালান শুধু ট্রাকেই নয় লঞ্চ এবং নৌকার সাহায্যেও হচ্ছে। মোমেনশাহী জেলার কুলিয়ারচর থেকে সরাসরি লঞ্চযোগে লক্ষ লক্ষ টাকার মাছ ত্রিপুরা রাজ্যের সীমান্ত পার করা হচ্ছে। ফলে মাছবহুল এলাকায়ই আজ মাছের মূল্য ত্রিগুণ হয়ে পড়েছে। তাছাড়া সিলেটের ছাতক এবং মোহনগঞ্জ থেকেও লঞ্চ ও নৌকা যোগে মাছের চোরাচালান হচ্ছে। গোয়ালন্দ এবং চাঁদপুর থেকে ট্রাকের সাহায্যে মাছ পাচার অব্যাহত রয়েছে। এই চোরা ব্যবসা আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে কত বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে সরকারও এর খতিয়ান সম্পর্কে ওয়াকেবহাল নন বলে মনে হচ্ছে।

১২০ কোটি টাকার কাঁচামাল উধাও

চট্টগ্রামের গুদামজাত প্রায় ১২০ কোটি টাকা মূল্যের কাঁচামাল স্বাধীনতা পরবর্তী মাত্র এক মাসের মধ্যে ভারত ও বার্মায় পাচার হয়ে যাবার খবর নির্ভরযোগ্য সূত্রে ফাঁস হয়ে গেছে। আজ তাই কাঁচামালের অভাবে বাংলাদেশের বহু শিল্প-কারখানা বন্ধ রয়েছে অথবা উৎপাদনের হার মারাত্মকভাবে হ্রাস পেয়েছে। ভারত-বাংলাদেশ বাণিজ্য চুক্তিতে আমাদের কাঁচামাল আমদানী করার সুযোগ রয়েছে। তাই মনে হচ্ছে, চোরাপথে পাওয়া বহু কাঁচামাল ভারতই আবার আমাদের কাছে বিক্রী করবে।

চোরাই সিনেমা

আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা রক্ষা করতে হবে বলেই হয়ত সরকার ভারতীয় জনপ্রিয় সিনেমা আমদানী করছেন না। কিন্তু দুই দেশের চোরাকারবারীদের বন্ধুত্ব প্রগাঢ়তর বলে সিনেমারও চোরাই ব্যবসা চলছে। বোধকরি চট্টগ্রামের সিনেমা হলগুলো এই ক্ষেত্রে সর্বাধিক আগুয়ান। স্বাধীনতার পর থেকে চট্টগ্রামের একটি সিনেমা হলে পুরনো ভারতীয় ছবি প্রদর্শিত হচ্ছিল। গত মাসে শহরের তিনটি হলেই একের পর এক ভারতীয় ছবি দেখানো হয়েছে। সদাশয় সরকারের চোখে কবে যে এ লীলা ধরা পড়বে তা ভবিতব্যই জানে।

রক্তপাত ঘটেছে – কিন্তু বিপ্লব হয়নি

বাংলার মাটি আরও রক্ত চায়। অনেক, সত্যিসত্যিই অ-নে-ক- রক্তপাত ঘটেছে। কিন্তু বাংলার মাটি লাল হয়নি। বাংলার পানি লোহিত হয়নি। বাংলার আকাশ রক্তিম হয়নি। প্রমাণ বাংলার রাজনৈতিক মঞ্চে যা ঘটছে তা বিপ্লব নয় – প্রতিবিপ্লব। বাংলার অর্থনৈতিক পটে যা ঘটেছে তা বৈপ্লবিক নয় — স্রেফ ধোঁকাবাজি। তাই বাংলার মাটি আরও রক্ত চায় – বিপ্লব চায়।

১৯৭০ সালে নভেম্বরের মহা সাইক্লোনে লক্ষ লক্ষ প্রাণী ভেসে গেলেও রিলিফের মাল চুরি বন্ধ করা যায়নি। বেড়াতেই ক্ষেত খেয়েছে। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের গণজাগরণকে পাশ কাটিয়ে আওয়ামী লীগের নেতৃবর্গ ক্ষমতার বাগ বাটোয়ারার অধিবেশন বসিয়েছেন। সর্ষে মাঠেই ভূত রয়েছে। তারপর নয়টি মাসে কত রক্ত ঝরেছে। অনেক কবিতা, অসংখ্য কথিকা রচিত হয়েছে। কিন্তু চরিত্র শোধন হয়নি। যাদের হয়েছিল – দেশপ্রেমিক মুক্তিবাহিনী, সবকিছু থেকে আজ বঞ্চিত। আর যারা মুজিবনগরে 'ব্রেন ওয়াশটা' খাসা করে এসেছেন – আজ তারাই মাতবর। তাই স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি, চুরি-ডাকাতি, রাহাজানি সর্বত্র এমসিএ-রা ঘুষ খেয়ে দালালী করছেন। সরকার চিরাচরিত নিয়মে সর্বহারা দাবী নস্যাৎ করছেন। মন্ত্রীবর্গ ফাঁকা বুলি আওড়াচ্ছেন। তাই প্রশ্ন জাগে বাংলাদেশে কি ঘটতে যাচ্ছিল আর কীইবা ঘটে গেল।

আমরা দেখেছি ১৯৭১ সালের মার্চের প্রথম সপ্তাহ থেকেই বাংলাদেশের জনগণ বিপ্লবের পথে আগুয়ান হচ্ছিল। কিন্তু নেতৃত্বের শ্রেণী সংঘাত তাকে বিপথে ঠেলে দেয়ার দারুণ প্রচেষ্টা চলল। মার্চের শেষ সপ্তাহে অহিংসার বীজমন্ত্রের মোহ কাটিয়ে আবার বাঙ্গালী জাতি বিপ্লবের পথ ধরল। কিন্তু সুচতুর প্রতিবেশী এর সাফল্য সম্পর্কে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন। তাই অদৃশ্য হাতের চালে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের বৈপ্লবিক পরিচ্ছেদে অকস্মাৎ যবনিকাপাত হল। গত ডিসেম্বরের শেষার্ধে 'দশ-মাসের প্রস্তুতি–সম্পন্ন–বিপ্লবকে' রূপান্তরিত করা হল। ক্ষমতালিপ্সু সরকার ও মিত্র বাহিনী জনগণের আদালতকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে মার্চের স্থিরিকৃত প্রতিবিপ্লবকে সাফল্যমন্ডিত করলেন। নয় মাসে বিপ্লব হলেও স্বাধীনতা উত্তর রক্তপাতকে বৈপ্লবিক হতে দেয়া হয়নি বলেই, আমরা বলব, বাংলাদেশে বিপ্লব সংঘটিত হয়নি।

আমাদের প্রকৃতি ও মাছের চাষ

বাংলাদেশের এমন কোন জায়গা খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর যেখানে সবুজ ধানের ক্ষেত নাই। তদ্রুপ এমন কোন স্থান নাই যেখানে খাল, বিল, নদী, নালা নাই এবং মৎস্যের চাষ হয় না। এই দেশ একটি বিস্তীর্ণ সমতল ভূমি এবং এখানে বাৎসরিক বৃষ্টিপাতও যথেষ্ট পরিমাণে হইয়া থাকে। এই দুই প্রাকৃতিক অবস্থা ধান চাষ এবং মৎস্য জন্মানোর পক্ষে খুব উপযোগী।

মৎস্য খামার

বাংলাদেশের মৎস্য খামারগুলিকে প্রধান দুই ভাগে ভাগ করা যায়– যথা ঃ (১) মিঠা পানির মৎস্য খামার (২) লবণাক্ত পানির মৎস্য খামার। মিঠা পানির কামারগুলি আবার পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা ঃ (১) পুকুর (২) বিল-বাওড় ও হাওড় (৩) নদী, নালা ও খাল (৪) প্লাবিত শস্যক্ষেত্র যথা ঃ ধানক্ষেত ও পাটক্ষেত (৫) কাপ্তাই হ্রদ। লবণাক্ত পানির খামারের মধ্যে নদীর মোহনা এবং বঙ্গোপসাগরের উপকূলই উল্লেখযোগ্য। নিম্নে এই খামার সমূহকে পৃথক পৃথকভাবে বর্ণনা করা হইল।

পুকুর

পুকুর এবং ডোবা বাংলাদেশের সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। জরিপ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, এই দেশের প্রায় ১,৬৪, ৩৫৫টি পুকুর প্রায় ৪,৬৩,৫০০ একর স্থান জুড়িয়া

আছে। কুমিল্লা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, বরিশাল এবং পটুয়াখালী জেলাতেই সব চাইতে বেশী পুকুর দেখিতে পাওয়া যায়। এই পুকুরগুলি আগেকার দিনের জমিদারগণ খনন করিয়াছিলেন। খাবার পানি সংগ্রহ করা, গোছল করা এবং নানা প্রকার ধৌত কার্যের জন্য এই সমস্ত পুকুর প্রধানত ঃ খনন করা হইয়াছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে মৎস্যেরও চাষ করা হইত।

আকৃতি এবং গভীরতার দিক দিয়া বিচার করিলে এই দেশের পুকুরগুলিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়- যথা ঃ (১) সুগভীর এবং বড় আকারের পুকুর-যেখানে সারা বৎসর পানি থাকে। এই জাতীয় পুকুরে রুই, কাতলা, মৃগেল ও কালিবাউসের চাষ ভাল হয়। এই ধরনের পুকুর প্রধানত ঃ জমিদারগণ খনন করিয়াছিলেন। (২) দ্বিতীয় প্রকারের পুকুরগুলি বেশী গভীর নহে এবং সেগুলো শীতকালে শুকাইয়া যায়। (৩) সব চাইতে নিকৃষ্টতম পুকুরগুলিকে ডোবা বলা হয়। এইগুলি সাধারণত ঃ ঘর-বাড়ীর ভিটি তৈয়ারী করিবার জন্য খনন করা হইয়াছে। ডোবায় সাধারণত ঃ বর্ষাকালে পানি থাকে।

বাংলাদেশের পুকুরগুলি মৎস্য চাষের জন্য খুব উপযোগী নহে। কারণ, বেশীর ভাগ পুকুরই কচুরিপানা, শেওলা ও অন্যান্য আগাছায় পরিপূর্ণ। পুকুরগুলিতে মৎস্যের খাদ্যের অভাব এবং সেগুলি বেশী গভীর নহে। পুকুরগুলি বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরিস্কার করা হয় না বা সার দেওয়া হয় না। আমেরিকা ও অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশে পুকুরে মৎস্যের জন্য রাসায়নিক সার ব্যবহার করা হয়। তাইওয়ান, ফিলিপাইন, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যাণ্ড ও মালয়েশিয়ায় পুকুরে নানা প্রকার সার ব্যবহার করা হয়। কিন্তু বাংলাদেশের পুকুরে মল ছিটান সম্ভব নহে। কারণ, ইহার পানি খাবার জন্য, গোছলের জন্য ও নানা প্রকার ধৌত কার্যের জন্য ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশের পুকুর, বিল, হাওড়, বাওড়, নদী ও খালে প্রধানতঃ যে সমস্ত মৎস্য পাওয়া যায়, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

রুই, কাতলা, মৃগেল, কালিবাউস, কই, খলিসা, শিঙ্গি, মাগুর, পুঁটি, সরপুঁটি, পাবদা, ফলি, চিতল, গজার, শোল, বোয়াল, আইড়, টেংরা, বেলে, বাইম, বাটা, চেলা, চান্দা প্রভৃতি। দেশে সর্বমোট ১০৭ প্রকার মিঠা পানির মৎস্য পাওয়া যায়। কই, মাগুর, শিঙ্গি, শোল, গজার প্রভৃতি মৎস্য অল্প পানিতে বাঁচিতে পারে।

শোল, গজার, বোয়াল এবং চিতল মৎস্য অন্যান্য মৎস্যের সঙ্গে একই পুকুরে চাষ করা যায় না। কারণ, এই মৎস্যগুলি অন্য মৎস্য ধরিয়া খায়। কিন্তু রুই, কাতলা, মৃগেল ও কালিবাউশ একই পুকুরে খুব ভালভাবে চাষ করা সম্ভব ঃ কাতলা মৎস্য মুখ উপর দিকে রাখে এবং পানির উপরের খাদ্য খায়। রুই মৎস্য পানির উপর হইতে তলা পর্যন্ত উঠানামা করে।

সাধারণত ঃ বাংলাদেশের মৎস্য পুকুর বা অন্য কোন বদ্ধ পানিতে ডিম পাড়ে না। এই কারণেই সরকার থাইল্যাণ্ড হইতে তেলাপিয়া মৎস্য আমদানী করিয়াছেন, তেলাপিয়া মৎস্য পুকুরে ডিম পাড়ে এবং খুব তাড়াতাড়ি বংশবৃদ্ধি করে।

মৎস্য চাষের ক্ষেত্রে পুকুরের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া যুক্তরাজ্যের বিশেষজ্ঞ ড. মাইকেল গ্রাহাম বলিয়াছেন যে, গরম দেশসমূহের পুকুরে মৎস্য চাষের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী। কারণ, পুকুরগুলি গ্রামবাসীর ঘরের কাছেই স্থাপিত। তাছাড়া ঘনবসতিপূর্ণ দেশে বেশীর ভাগ জমিতে ধান চাষ করা হয় এবং সেখানে গবাদীপশু পালনের জন্যে যথেষ্ট পরিমাণে জমি নাই। তাই মৎস্য হইতে তাহাদের আমিষ জাতীয় পদার্থ গ্রহণ করিতে হয়।

বিল, হাওড় ও বাওড়

বিল সেই সমস্ত জলাভূমিকে বলা হয় যাহার গভীরতা খুব বেশী নহে এবং সেই কারণে বিলে যথেষ্ট পরিমাণে আগাছা জন্মে। বাংলাদেশে এক হাজারেরও বেশী বিল রহিয়াছে। রংপুর, বগুড়া এবং পাবনা জেলায় প্রায় ২৮টি বড় আকারের বিল রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে চলন বিল সব চাইতে বড়। নদীর গতি পরিবর্তনের জন্যই এই সমস্ত বিলের সৃষ্টি হইয়াছে। কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা, বরিশাল, ফরিদপুর এবং ঢাকা জেলায় প্রায় ৫৫টি বড় আকারের বিল রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে গোপালগঞ্জের বিলই সব চাইতে বড়। সিলেট, ময়মনসিংহ এবং টাঙ্গাইল জেলায় কমপক্ষে ৪০০ হাওড় ও বিল রহিয়াছে। কুমিল্লা ও নোয়াখালী জেলায় প্রায় ১৪টি ছোট আকারের বিল রহিয়াছে। ইহা ছাড়া কুষ্টিয়া ও যশোহর জেলায় অনেকগুলি বাওড় দেখিতে পাওয়া যায়। এই বাওড়গুলি প্রকৃতপক্ষে মরা নদী এবং তাহাদের গভীরতা বিল অপেক্ষা বেশী এবং সেখানে সারা বৎসর পানি থাকে।

যেহেতু বিল, হাওড় ও বাওড় বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়িয়া বিদ্যমান, সেই কারণে এই সমস্ত জলাভূমিতে পুকুর ও নদী হইতে বেশী পরিমাণে মৎস্য দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ষাকালে খাল, বিল ও নদীর পানিতে ভরপুর হইয়া যায়। এই সময় মাছ ডিম পাড়ে এবং সেগুলি ২৪ ঘন্টার মধ্যে বাচ্চা ফুটায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় বেশীর ভাগ ডিমই পানির স্রোতে ভাসিয়া যায় এবং নষ্ট হইয়া যায়। যাহা হউক, অবশিষ্ট বাচ্চাগুলি বর্ষাকালে বাড়িতে থাকে তখন সেগুলি নদীতে বাহির হইবার চেষ্টা করে। এই সময় অনেক মৎস্য ধরা পড়ে। শরৎকালেই এদেশে প্রচুর পরিমাণে মৎস্য পাওয়া যায়।

(চলবে)

৮০ লক্ষ জেলেকে বাঁচাতে হলে–

(ক) জলার উপর থেকে সর্বপ্রকার ইজারাদারী প্রথা বাতিল করতে হবে।

(খ) সকল জলমহল মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি সমূহের নিকট চিরস্থায়ীভাবে পত্তন দিতে হবে।

(গ) ছোট ছোট জলমহলের জলকর মওকুফ করতে হবে।

(ঘ) মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি সমূহ এবং করপোরেশন শুধু মৎস্যজীবী সমাজের লোক দ্বারা ব্যালট ভোটে নির্বাচন অনুষ্ঠান করে গঠন ও পুনর্গঠন করতে হবে।

(ঙ) মাছের ডিম ও পোনামাছ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(চ) শহর-বন্দরে ও যানবাহনে হিমাগার স্থাপন করতে হবে।

(ছ) মাছ দ্রুত পরিবহনের জন্য দ্রুতগামী যানবাহনের ব্যবস্থা করতে হবে।

(জ) কাঁচামালের ন্যায় স্বল্প ভাড়ায় মাছ পরিবহনের ব্যবস্থা করতে হবে।

(ঝ) মৎস্য চাষ, শিল্প এবং আমদানী ও রফতানী বাণিজ্য শুধু মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি দ্বারা পরিচালনা করতে হবে।

(ঞ) মৎস্য উন্নয়ন ব্যাঙ্ক স্থাপন করতে হবে।

(ট) অগভীর জলাশয় থেকে পাওয়ার পাম্প দ্বারা জলসেচ না করে গভীর নলকূপ দ্বারা তা সম্পন্ন করতে হবে।

(ঠ) কীটনাশক ঔষধ আবদ্ধ জলাশয়ে প্রয়োগ না করে বিকল্প ব্যবস্থা দ্বারা শস্য-কীট ধ্বংস করতে হবে।

(ড) মিল-ফ্যাক্টরীর দূষিত ও বিষাক্ত পানি আবদ্ধ জলমহলে না ফেলে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(ঢ) বাস্তুত্যাগী মৎস্যজীবীগণকে এবং যে সমস্ত মৎস্যজীবী দখলকার বাহিনীর রোষানলে পড়ে জাল, নৌকা প্রভৃতি হারিয়েছে তাদেরকে উহা বিনা মূল্যে দিতে হবে।

(ন) মৎস্যজীবীগণকে সারা বৎসর স্বল্প মূল্যে সুতা, আলকাতরা, কাঠ, নৌকা, লোহা প্রভৃতি সরবরাহ করতে হবে।

(ত) ওয়াপদার বাঁধ সমূহে প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্লুইজ গেইট নির্মাণ করতে হবে।

স্বয়ংসম্পূর্ণ ও পরস্পর বিরোধী মতবাদের সমন্বয় – আজববাদ

অবশেষে আবুল হাশিম সাহেবও (যিনি এককালে মুজিবযুবাদের ওস্তাদ ছিলেন) ইন্টারপ্রিটেশন চেয়েছেন। কিছুদিন আগে একটি সেমিনারে ভাষণ দিতে গিয়ে এই বুদ্ধিজীবী অতীত দিনের ভাবশিষ্যের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন — মুজিববাদের শানে-নজুলটা বয়ান করা হউক।

প্রকৃতপক্ষে বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত কয়টি প্রধান মতবাদ কোন না কোন দিক থেকে যুগের প্রয়োজন মেটাতে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদদের বহু বছরের গবেষণা, সাধনা এবং জ্ঞানের সমন্বয়ের ফলশ্রুতি স্বরূপ আত্মপ্রকাশ করেছে। কোন ব্যক্তি বিশেষের জনপ্রিয়তা এবং ভাবাবেগ প্রসূত কয়েকটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অথবা পরস্পর বিরোধী মতবাদের জগাখিচুরীকে ব্যক্তি বিশেষের নামানুসারে বিশেষ বাদে পরিণত করে জনকয়েক অতিভক্তদের সোচ্চার প্রচারণার মাধ্যমে সাময়িকভাবে বহাল করা সম্ভব হলেও তার স্থায়িত্ব এবং বাস্তবতা যে কতটা ভঙ্গুর হতে পারে সম্প্রতি বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট চিন্তাবিদ পণ্ডিত আবুল হাশিম সাহেবের 'মুজিববাদ' সম্পর্কে ফরোয়ার্ড ব্লকের সেমিনারে উত্থাপিত মন্তব্যটিই তার উজ্জ্বল প্রমাণ।

সাধারণ নিয়ম অনুসারেই স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর বাংলাদেশেও জয়প্রিয় কোন নেতার যেকোন কথাকে অমরবাণী অথবা তার নির্দেশিত কোন মতবাদকে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মতবাদে পরিণত করার প্রচেষ্টা চালানো স্বাভাবিক। কিন্তু ভাবালুতা বা আবেগ দিয়ে কোন মতবাদের সার্থকতা প্রমাণিত হয় না – পৃথিবীর জ্ঞানী-গুণী এবং পণ্ডিত ব্যক্তিদের মতামত এবং সাধারণ মানুষের প্রয়োজনের কষ্টিপাথরে যাচাই হয়েই সেই মতবাদের স্বার্থকতা প্রমাণিত হয়। ইতিহাস, রাজনীতি এবং অর্থনৈতিক মূল্যবোধের উপাদানের উপর ভিত্তি করে সমাজ বিশ্লেষণ এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির মূল্যায়নের মাধ্যমে যে মতবাদের সৃষ্টি হয়, তত্ত্বগতদিক থেকে তা উৎরে যাবার পর ব্যবহারিক প্রয়োগের বাস্তব পরীক্ষায় তা টিকে গেলে সেই মতবাদ স্বীকৃতি পাওয়ার অপেক্ষা রাখে।

এখন আসা যাক 'মুজিববাদের' তাত্ত্বিক দিকটির বিচারে।

গভীর অনুসন্ধিৎসা, পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং বাস্তব প্রয়োগের সাফল্য এই কয়টি প্রাথমিক শর্তের একটিও পূরণ করেছে কি এই মতবাদ? মুজিববাদ সৃষ্টির উৎস হচ্ছে তার কয়জন ভক্তের চিন্তাধারা এবং শেখ মুজিবর রহমানের স্বাধীনতা পরবর্তী কয়েকটি বক্তৃতা। এই বাদের স্তম্ভ চারটি ঃ (১) গণতন্ত্র (২) সমাজতন্ত্র (৩) ধর্ম নিরপেক্ষতা এবং (৪) জাতীয়তাবাদ। গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র এমনই পরস্পর বিরোধী দুইটি মতবাদ যে রাজনীতি এবং সমাজ বিবর্তনের সামান্যতম জ্ঞান যার আছে সে কখনই এই দুইটি মতবাদের

একত্রীভূতকরণ তো দূরের কথা একই রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে এর অবস্থানও কল্পনা করতে পারে না। গণতন্ত্র শব্দটি হচ্ছে সুচতুরভাবে সমাজের একটি বিশেষ শ্রেণীর জন্য অন্য শ্রেণীর উপর শোষণের অবাধ সুযোগদানের একটি মার্জিতরূপ – অনেকটা সুগার কোটেড কুইনাইনের মতো – অন্যদিকে সমাজতন্ত্র হচ্ছে উৎপাদন যন্ত্র এবং জীবনধারণের নিত্যপ্রয়োজনীয় উপাদানগুলোর উপর সমাজের প্রতিটি মানুষের সমান অধিকার ভোগের গ্যারান্টি যদিও স্তরভেদে এর চেহারাও ভিন্নতর হতে বাধ্য। এরপর আসা যাক ধর্মনিরপেক্ষতা এবং জাতীয়তাবাদের প্রশ্নে। যদিও ধর্মনিরপেক্ষতা গণতন্ত্রের শর্তহীন অঙ্গ হওয়া উচিৎ তবুও গণতন্ত্রের সংজ্ঞা আজ আর অবিভাজ্য নয়। আগেপিছে শব্দ জুড়ে এর বিভিন্নরূপ আমরা প্রত্যক্ষ করেছি বিভিন্ন রাষ্ট্রে। মুসলিম রাষ্ট্রগুলিতে ইসলামী গণতন্ত্রের কথা প্রায়ই শোনা যায়। কিন্তু গণতন্ত্রের সংজ্ঞানুসারে ধর্মনিরপেক্ষতা এই মতবাদের অন্যতম শর্ত। সমাজতন্ত্রে প্রতিটি মানুষের ধর্মীয় স্বাধীনতার স্বীকৃতি, বিশেষ কোন ধর্মের প্রাধান্যকে পুরোপুরি অস্বীকার করে। সুতরাং এদিক থেকে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্রের পাশাপাশি ধর্মনিরপেক্ষতার উল্লেখ শুধু অতিরিক্তই নয় বরং উদ্ভটও। মুজিববাদের শেষ স্তম্ভটি হচ্ছে জাতীয়তাবাদ। কোন জাতির আত্ম সচেতনতার প্রথম পর্বে এবং জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের পটভূমিকায় জাতীয়তাবাদের প্রয়োজন অবশ্যই কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তীকালে এর উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান উগ্র জাতীয়তাবাদের সূচনা করে মাত্র। সবচেয়ে বড়ো কথা 'জাতীয়তাবাদ' নিজেই বিশ্বের একটি বহুল আলোচিত স্বয়ংসম্পূর্ণ মতবাদ।

উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনায় একটি দিক পরিষ্কার হয়ে উঠেছে যে একদিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং অন্যদিকে পরস্পর বিরোধী কয়েকটি মতবাদের সমন্বয়ে 'মুজিববাদ' প্রতিষ্ঠার যে প্রচেষ্টা চলছে তার পিছনে রয়েছে বর্তমান পৃথিবীর প্রয়োজন মিটানোর জন্য কোন নতুন দর্শনের আবির্ভাব নয়, নেয়ায়েত প্রচার সর্বস্ব একটি হাস্যকর মতবাদ চাপিয়ে দেওয়ার মনোবৃত্তি। সাধারণ অজ্ঞ মানুষকে যত ধোঁকাই দেয়া যাক, পৃথিবীর সাধক পণ্ডিত ব্যক্তিদের বাতিল কাগজের বাক্সেই এর স্থান নির্দ্ধারিত হয়ে আছে। শেখ মুজিবের ভক্তবৃন্দ নিজেদের মূর্খতার শিকারে পরিণত করেছেন স্বয়ং শেখ মুজিবকেই। পৃথিবীর সামনে তাকে হাস্যাস্পদ করে তোলার প্রচেষ্টা নিয়েছে তার রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীরা নয় বরং তার গদ্ গদ্ ভক্তবৃন্দের দল।

'মুজিববাদের' প্রথম প্রকাশ হয়েছিল শেখ মুজিব ইয়াহিয়ার কারাগার থেকে মুক্তি পাবার আগেই। অর্থাৎ তিনি নিজেই জানতেন না যে তিনি একটা মতবাদের জন্ম দিয়েছেন। তবে মুজিববাদের উপাদান চারটির সংমিশ্রণে যদি নতুন কোন মতবাদের সৃষ্টি কেউ স্বীকার করে নিতেই চান তবে এ মতবাদের স্রষ্ঠা শেখ মুজিব থাকেন না। এর প্রাথমিক পরিকল্পনা ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর। সিংহলের মহিলা প্রধানমন্ত্রী মিসেস বন্দর নায়কও বিভিন্ন সময়ে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র এবং ধর্ম নিরপেক্ষতার কথা বলেছেন। ইন্দিরা গান্ধীর মাধ্যমে সেটা একটা বক্তব্যে পরিণত হয়েছিল মাত্র। মুজিব ভক্তের দল এর সঙ্গে জাতীয়তাবাদ যোগ করে এই মতবাদের ফিনিশিং টাচ দিয়ে একে বাজারে ছেড়েছে।

সবশেষে আবুল হাশিম সাহেবের 'মুজিববাদের' ব্যাখ্যা চাওয়ার পরিপ্রেক্ষিত আমরাও বলতে চাই যে দেশের শতকরা ৫ জন বুদ্ধিজীবী, ১২ জন শিক্ষিত এবং বাকী

৮৩ জন সম্পূর্ণ অশিক্ষিতের পর্যায়ে পড়ে সে দেশে মুজিববাদের মহিমা ক'জন বুঝবেন। শতকরা ৫ জন বুদ্ধিজীবী মুজিববাদ নিয়ে আলোচনা করতে পারেন, শতকরা ১২ জন সে আলোচনা শ্রবণ করে ধন্য হতে পারেন, কিন্তু বাকী ৮৩ জন? পণ্ডিত প্রবর আবুল হাসিম যা বুঝতে পারেননি। এদেশের শতকরা ৮৩ জন হতভাগ্য মানুষের বোধগম্য হবার জন্যে এর কোন লোকায়ত সংস্করণ বের করার কথা এই স্বয়ং পণ্ডিতের দল চিন্তা করেছেন কি?

ভাসানীর বাণী

দুর্নীতি, দমননীতি, স্বজনপ্রীতি, অপবাদ ইত্যাদি মুসলিম লীগ আমলের সংক্রামক ব্যাধিসমূহ আওয়ামী লীগ সরকারকেও পেয়ে বসেছে। এসব এড়াতে না পারলে এই সরকারের পতনও অনিবার্য।

হক-কথা

১৯ শে চৈত্র, রবিবার

মুক্তিবাহিনীর মুক্তি

দেশ মুক্ত হইলেও মুক্তিবাহিনী মুক্তি লাভ করে নাই। তাহারা সন্দেহ, অপবাদ, অবহেলা, হয়রানি ইত্যাদির বেড়াজালে আবদ্ধ। সরকার ও সরকার সমর্থক মহল বিশেষ মুক্তিবাহিনীর দল উপদলের প্রতি কটাক্ষ করিয়া চলিয়াছেন, ইহা সর্বজনবিদিত। এই কটাক্ষ গুরুতর পরিণতির ইঙ্গিতদান করে কিনা, আমরা তাহা জানি না। কিন্তু উহা নিঃসন্দেহে বহু লোকের অন্তঃকরণ আহত করে।

স্বাধীনতা সংগ্রাম চলাকালে বাংলাদেশবাসী তথা বিশ্বজনতা অস্থায়ী সরকারের প্রতি নয়, বরং স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়িয়া উঠা সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের উপর আস্থাবান হইয়া আজাদীর স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। ইহার অন্যতম কারণ ছিল বাংলাদেশ বেতারসহ পৃথিবীর অন্যান্য প্রচার মাধ্যমের সহিত মুক্তিবাহিনীর সাফল্যপূর্ণ ঘটনাবলীর সামঞ্জস্য। শত্রুও অস্বীকার করিতে পারে নাই যে এই মুক্তিফৌজ গড়িয়া উঠিয়াছিল আমাদের দেশেরই যুবা-প্রৌঢ়ের সমন্বয়ে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বে মুক্তিবাহিনীর প্রায় প্রতিটি দল সততা–সাধুতার সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু দেশ মুক্ত হওয়ার পর পরই তাহাদের নামে নানা কথা ছড়াইতে থাকে। অবশ্য এই নানা কথায়ও সত্যতা ছিল এবং আছে। কিন্তু যাহাদের জন্য এইসব ছড়ায় তাহারা সশস্ত্র যুবক হইতে পারেন, কিন্তু আদৌ মুক্তিবাহিনী নহেন, ইহা আমরা ভুলিয়া যাই। যিনি মুক্তিবাহিনীর ঝাঁটি সদস্য তাহার কানে স্বগোত্রের অপবাদ পৌঁছিলে কেমন বোধ হয় একমাত্র ভুক্তভোগীই তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন। তবে ইহাও সত্য, কয়েক মাস পূর্বেও যে সশস্ত্র যুবক মুক্তিবাহিনীতে কাজ করিয়াছেন, আজ জীবনের মহান উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়া তিনিই লুটতরাজ, জবরদখল, উৎপীড়ন ও নির্যাতনে উৎসাহী হইয়া উঠিয়াছেন, এমন নজীর সর্বত্র কমবেশী রহিয়াছে। এহেন ঘটনা প্রবাহের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করিয়া সরকার অস্ত্রশস্ত্র জমা লইয়াছেন এবং মুক্তিফৌজের সকল দল উপদল ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। কিন্তু দেখা যাইতেছে সশস্ত্র ডাকাতি, রাহাজানি, কমিতেছে না বরং উত্তরোত্তর বাড়িয়া যাইতেছে। ফলে 'ভুয়া' শব্দটি যোজনা করিয়া মুক্তিবাহিনীকে নিম্নমানে ঠেলিয়া দেওয়া হইতেছে। অবস্থাটা এখন এমন দাঁড়াইতেছে ঃ ব্যক্তি বিশেষের নামে নর্তন – কুর্দনে যাহারা পারদর্শী হইবেন তাহারাই থাকিবেন মুক্তিবাহিনী নামের বাস্তব উত্তরাধিকারী। আর

যাহারা এই সার্কাস দেখাইতে পারিবেন না তত্ত্বগত দিক দিয়া তাহাদের অধিকাংশ মুক্তিযোদ্ধা হইলেও সরকারী সনদ প্রাপ্ত হইতে বাদ পড়িবেন। জনগণ যাহাদেরকে মনের কোঠায় স্থান দিয়াছে তাহাদের সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিয়া সরকার ও জনগণের মধ্যে চিন্তা এবং কর্মের দূরত্ব সৃষ্টি হইবে মাত্র। মুক্তিবাহিনীকে কেন্দ্র করিয়া এইভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামের তাত্ত্বিক পবিত্রতা বিনষ্ট হইতে পারে বলিয়া আমরা আশঙ্কা করি। আমরা আরও আশঙ্কা করি বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলন কমপক্ষে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আদর্শের প্রতীক স্বরূপ কাজ করিয়া যাওয়ার যে সম্ভাবনা ছিল সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তাহাও নস্যাৎ করিয়া দিতে সমর্থ হইবে। তাই রাগে-গোস্বায় একটা কিছু না করিয়া আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামী ভাইদের সামরিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা একান্ত প্রয়োজন। সরকার মিলিশিয়া গঠন করিবার কথা ঘোষণা করিয়াও গোটা পরিকল্পনাটিই বাদ দিয়াছেন। ফলে বিতশ্রদ্ধ হতাশাগ্রস্ত লক্ষ লক্ষ বেকার মুক্তিযোদ্ধা আজ নিজেদের অর্থনৈতিক, সামাজিক মুক্তির পথ খুঁজিয়া মরিতেছে।

সরকারের প্রতি আমাদের তাই আবেদন, জনগণের প্রতি তাই আমাদের আরজ– খোদ মুক্তিবাহিনীরই আজ মুক্তিদান করুন। সন্দেহ, অপবাদ, হয়রানি আর অবহেলার বেড়াজালে আবদ্ধ হইয়া তাহারা যেন উন্নতমানের মননশীলতাটি হারাইয়া না বসে; আত্মবিশ্বাস, দেশপ্রেম ও অন্যায়ের প্রতি বিদ্রোহী চেতনাটুকু যেন হারাইয়া না ফেলে।

প্রধানমন্ত্রীর বেতা ৳ ভাষণ বনাম বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র

মাহমুদ আলম খান

স্বাধীনতা দিবসে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমান জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বেতার ভাষণে তাঁর সরকারের কয়েকটি নীতির কথা ঘোষণা করেছেন। এই নীতিগুলিকে তিনি 'বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিক' অর্থনীতি প্রবর্তনের কয়েকটি প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

স্বরূপ

অর্থনীতিবিদরা একথা জানেন যে, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির মূল কথাটি হল সামগ্রিক উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থার সামাজিকীকরণ। প্রধানমন্ত্রী তাঁর ঘোষণায় জাতীয়করণের ভিত্তি হিসাবে 'সম্পদের সামাজিকীকরণের' কথা বলেছেন। এই বক্তব্যকেই তিনি 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের' অর্থনীতি হিসাবে বাজারে চালু করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সামগ্রিক উন্নতি নির্ভর করে সেই দেশের শিল্প ও কৃষিনীতির উপর। এই ব্যবস্থায় সামগ্রিক উৎপাদন ও বন্টনের ক্ষেত্রে অধিকার থাকে জনগণের। জনগণই এর নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করে থাকেন। অন্যদিকে একটি ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও জাতীয় ধনিকশ্রেণীর বিকাশের জন্য শিল্পের প্রসারের উদ্দেশ্যে কৃষি বিপ্লব অপরিহার্য। জাতীয় ধনিকশ্রেণী এই কাজ সমাধা করতে এগিয়ে এলে তাকে অবশ্যই সামন্ত ব্যবস্থাকে পরিপূর্ণভাবে ধ্বংস করতে হয়। সামন্ত ব্যবস্থা শোষণ এবং শাসনের অন্যতম একটি যান্ত্রিক ব্যবস্থা। তাই বিপদের ঝুঁকি নিয়ে সেপথে তারা অগ্রসর হতে পারে না। এই কারণেই বিভিন্ন দেশের জাতীয় ধনিকশ্রেণী নিজেদের শক্তিকে সুসংহত রাখার জন্য সাম্রাজ্যবাদের প্রতি নির্ভরশীল হয়ে থাকে। এবং আপোষের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী শোষণকে নিজেদের দেশে অবাধ গতিতে চলার সুযোগ দান করে।

সরকারী উদ্দেশ্য

উপরোক্ত বক্তব্যগুলিকে সম্মুখে রেখে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমানের বেতার

ভাষণকে পর্যালোচনা করলেই বর্তমান সরকারের মূল উদ্দেশ্য উপলব্ধি করা যাবে।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি প্রধানমন্ত্রী বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের নামে 'উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থার সামাজিকীকরণের' 'পরিবর্তে 'সম্পদের সামাজিকীকরণের' পর্যায় ক্রমিক ব্যবস্থা হিসাবে তিনি ১টি বিষয়কে জাতীয়করণের কথা ঘোষণা করেছেন। শোষণের মূল উৎস উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থার মধ্যে নিহিত। শেখ সাহেব অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে সেই স্থানটিতে হাত দেবার পরিবর্তে পাকিস্তান আমলে সাম্রাজ্যবাদ, একচেটিয়া পুঁজিবাদ, সামন্তবাদ এবং পূর্ব পাকিস্তানের উপর উপনিবেশবাদী শোষণের আশ্রয়ে বাংলাদেশে যে অসম সম্পদ সৃষ্টি হয়েছিল, তারই সমতা আনয়নের জন্য 'সম্পদের সামাজিকীকরণের' কথা ঘোষণা করেছেন। এই ফলশ্রুতি হিসাবে বিদেশী ব্যাঙ্ক ও বীমা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের নির্দেশ থেকে রেহাই পেয়েছে। তিনি কেবল মাত্র সকল পাটকল, বস্ত্র ও সুতাকল, চিনিকল, আভ্যন্তরীণ ও উপকূলীয় নৌযানের বৃহদাংশ, ১৫ লক্ষ টাকা মূল্যের এবং তদূর্ধ্ব সকল পরিত্যক্ত ও অনুপস্থিত মালিকানাভুক্ত সম্পত্তি জাতীয়করণের কথা ঘোষণা করেছেন। এছাড়া বাংলাদেশ বিমান ও বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশনকে সরকারী সংস্থায় রূপান্তরিত করার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। পাকিস্তান আমলেও এই দুটি সংস্থাকে সরকারী পর্যায়েই পরিচালনা করা হত। বর্হিবাণিজ্যের ক্ষেত্রেও পাকিস্তানের তৎকালীন ব্যবস্থারই পুনরুল্লেখ মাত্র। অপরদিকে বাংলাদেশের চা শিল্পকে জাতীয়করণ করা হয়নি। এর মূল কারণ হচ্ছে চা শিল্পের অধিকাংশ মালিকানা বিদেশীদের। পাট ব্যবসাকেও জাতীয়করণের আওতা থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে।

এই ব্যবস্থা থেকে পরিস্কারভাবে বলা চলে, বর্তমান সরকার বিদেশী পুঁজির গায়ে আঁচরটি পর্যন্ত কাটতে সক্ষম হননি। অপরদিকে বাংলাদেশে কার্যরত বিদেশী পুঁজিকে সংরক্ষণ এবং নতুন পুঁজির আগমন ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করেছেন মাত্র।

প্রধানমন্ত্রীর বেতার ঘোষণায় হঠাৎ করে জনগণের মধ্যে জাতীয় বণিকদের উপর চরম আঘাত বলে মনে করা হতে পারে। তাই পূর্বোল্লিখিত 'অসম সম্পদ' সম্পর্কে বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

অসম সম্পদ

দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত বিভাগের মূল উদ্দেশ্য ছিল মুসলমান ধনিকশ্রেণীর বিকাশ ঘটানো। পাকিস্তান আন্দোলনে বাঙ্গালী মুসলমান উঠতি ধনিকশ্রেণী নিজেদের একাত্মতা ঘোষণা করে। দেশ বিভাগের পর বাস্তব ক্ষেত্রে ফলটি ফললো উল্টো। বাঙ্গালী মুসলমান উঠতি ধনিকশ্রেণীর বিকাশের সমস্ত পথ রুদ্ধ হয়ে এল। এর পরিবর্তে এই অঞ্চলে একটি ভিন্নজাতির মাধ্যমে মিশ্র ধনিকশ্রেণীর সৃষ্টি হতে চলল। বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদী শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করলেই রাষ্ট্রীয়শক্তি তাদেরকে দমন করতে এগিয়ে আসে। দমননীতির ভয়ে উঠতি বাঙ্গালী মুসলমান ধনিকশ্রেণীর একাংশ অবাঙ্গালী ধনিক শ্রেণীর সাথে সহযোগিতা করে এজেন্ট হিসাবে কিছু অংশ লাভ করেছিল। জাতীয়তাবাদী শক্তি যতই শক্তিশালী হতে শুরু করল দমননীতির সঙ্গে সঙ্গে অবাঙ্গালী পুঁজির বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও কিছুটা পরিবর্তন দেখা দিল। বাঙ্গালীদের নামে পরোক্ষভাবে অবাঙ্গালী পুঁজির সংমিশ্রণ ঘটল যার মূল নিয়ন্ত্রণ ছিল অবাঙ্গালীদের হাতে। ফলে সামগ্রিভাবে বাঙ্গালী উঠতি ধনিকশ্রেণীর শ্রেণীগত কোন বিকাশ দীর্ঘ ২৪ বৎসরে হয়নি। যে সমস্ত শিল্পে এই শ্রেণীর ব্যক্তিদের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু ছিল – প্রধানমন্ত্রীর জাতীয়করণের খড়্গ তাদেরই উপর নিপতিত হয়েছে। অবাঙ্গালী, আধাবাঙ্গালী অথবা সহযোগী বাঙ্গালী শ্রেণীর পুঁজিকেই জাতীয়করণ করা হয়েছে।

অপরদিকে এই সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানে বাঙ্গালী মালিকদের স্বার্থকে সযত্নে সংরক্ষিত এবং নিয়ন্ত্রণভার তাদেরই হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। অবশ্য বাঙ্গালী মালিকদের অথবা তাদের প্রতিনিধিদের উপর একটি মাত্র শর্ত আরোপ করা হয়েছে যে, সরকারের 'বিপ্লবাত্মক' সিদ্ধান্তগুলিকে জনগণের মাঝে প্রচার করতে হবে। সহজ ভাষায় বলা যেতে পারে, রাষ্ট্রায়ত্ত এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের বাঙ্গালী মালিকদের শুদ্ধি করে নেওয়া হয়েছে এবং নির্ভেজাল বাঙ্গালী ধনিকশ্রেণীর সক্রিয় চেষ্টা চলছে।

উঠতি ধনিক শ্রেণী

গণপ্রজাতান্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের এই ব্যবস্থা বাংলাদেশের উঠতি ধনিকশ্রেণীর স্বার্থকে পরিপূর্ণভাবে রক্ষা করা এবং আপোষের মাধ্যমে বিদেশী পুঁজির সংরক্ষণ এবং আগমন ঘটানোর প্রচেষ্টা মাত্র। যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়েছে তার সবগুলোতেই বিদেশী পুঁজি নিয়োজিত। শিল্প জাতীয়করণ করার কথা ঘোষণা করা হলেও এই সমস্ত বিদেশী পুঁজি বাজেয়াপ্ত করার কথা বলা হয়নি। অপরদিকে বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের আহ্বান করা হচ্ছে। ফলে ধরে নেওয়া চলে শিল্পের ব্যবস্থাপনাগুলির নিয়ন্ত্রণ ভার সরকার গ্রহণ করেছেন মাত্র। কোন পুঁজিরই গায়ে হাত দেওয়া হয়নি।

পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত এবং নিয়ন্ত্রিত শ্রেণীর সঙ্গে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদীর নামে বাঙ্গালী উঠতি ধনিকশ্রেণীর লড়াই চলাকালীন সময়ে বাংলাদেশে বিভিন্ন শিল্পে কার্যরত শ্রমিকদের মধ্যে আওয়ামী লীগ অবাঙ্গালী ও তাদের সহযোগী মালিকদের শোষণই তাদের অভাবের মূল কারণ হিসাবে প্রচার করে। যে সমস্ত স্থানে এই জাতীয় প্রচার কার্যকরী হয়নি, সেখানে আওয়ামী লীগের অপর অংশ জাতীয় শ্রমিক লীগের মাধ্যমে শক্তি প্রয়োগ করে শ্রমিকদেরকে হয় দলে ভিড়তে বাধ্য করে অথবা শিল্প প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে বাধা দেয়। শ্রমিকদের দলে টানতে তারা অসম অর্থেরও দাবী তুলে ধরে। কিন্তু এই চোরাপথে চলতে গিয়ে আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পর নিজেরা এখন বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন। এই বিপদের ইঙ্গিত আমরা মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের বক্তব্য থেকেই দেখতে পাই। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পূর্বে শ্রমিকদেরকে শিল্পের অংশীদার করার কথা ঘোষণা করেছিলেন। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসার পর শ্রমিকদেরকে শতকরা ৩০ ভাগ মালিকানা দেবার কথা ঘোষণা করা হয়েছিল। এ ছাড়াও ৯ মাস সংগ্রামকালীন বেতন দানের সিদ্ধান্ত এবং পরে সংশোধন করে এক মাসের বেতন দান করার কথা ঘোষণা করা হয়। যে সমস্ত শিল্পে অথবা প্রতিষ্ঠানে 'কাজ করলে মজুরী' ভিত্তিতে শ্রমিক নিয়োজিত তাদের ক্ষেত্রে এখনও অচলাবস্থা বিরাজ করছে। প্রধানমন্ত্রীর বেতার বক্তৃতায় এই সমস্ত সরকারী এবং তাদের দলের বক্তব্যের কোনটিরই উল্লেখ করা হয়নি।

পরস্পর বিরোধিতা

অপরদিকে প্রধানমন্ত্রী শ্রম ও পুঁজির মধ্যে আবহমান কালের পরস্পর বিরোধিতার কথা উল্লেখ করে শ্রমিক এবং মালিকদেরকে বিরোধ থেকে নিবৃত্ত থাকার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। কারণ, শিল্পে শান্তি স্থাপনের মূল উদ্দেশ্য উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতি ঘটানো এবং পুঁজি বিনিয়োগের সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টি করা। শ্রমিকদের অবস্থার পরিবর্তনের কোন নীতি ঘোষণা না করেই শ্রমিক প্রতিনিধিদের সভা আহ্বান করার কথা বলা হয়েছে। যে সভার মূল উদ্দেশ্য সরকারী নীতির পক্ষে শ্রমিকদের সহযোগিতা কামনা করা। এর মূল

উদ্দেশ্য হচ্ছে, অসম সম্পদের সমতা বিধান করে বিদেশী পুঁজির সহায়তায় বাঙ্গালী উঠতি ধনিকশ্রেণীর বিকাশকে সুসংহত ও প্রশস্ত করা। এর সপক্ষেই কৃষি ব্যবস্থায় সামন্ত প্রথাকে বহাল রেখে কয়েকটি সংস্কারমূলক কাজের কথা ঘোষণা করা হয়েছে মাত্র। যার ফল জোতদার এবং ধনী কৃষকেরাই ভোগ করবে। জমির মালিকানা রাষ্ট্রায়ত্ব না করে কৃষিতে যান্ত্রিকরণের অর্থ জমির মালিকের লভ্যাংশকে বাড়ানোর জন্য সহায়তা করা। শতকরা ৮০ জন কৃষক এই ব্যবস্থায় লাভবান হতে পারে না।

বেতার ঘোষণায় শেখ সাহেব একদিকে বিদেশী পুঁজি বাজেয়াপ্ত করেননি। অপরদিকে তিনি বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের জন্য আহবান জানিয়েছেন। তবুও তিনি সাম্রাজ্যবাদী শোষণ থেকে দেশকে মুক্ত করার কথা বারবার ঘোষণা করেছেন। তিনি এই সাম্রাজ্যবাদ বলতে প্রকৃত অর্থে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কথা বলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার আমাদের জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের বিরোধিতা করেছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আমাদের দেশের জনগণের নিকট চিহ্নিত শোষক হিসাবে পরিচিত। প্রধানমন্ত্রী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতা কামনা করেন শর্তহীনভাবে। বাঙ্গালী জাতি হিসাবে সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে দেশ গড়ার কাজে মার্কিন সাহায্য কামনা করেছেন। ব্যাপারটি হল এই--আমাদেরকে শর্তহীন সাহায্য দাও, আমরা আপত্তি করবো না। বাংলাদেশের ব্যাপারে নাক গলিওনা; পুঁজি বিনিয়োগ কর, আপত্তি করবো না। যার সারমর্ম দাঁড়ায় নাক না গলালেই সাম্রাজ্যবাদী শোষণ বন্ধ হয়ে যাবে। সমমর্যাদার আসন দিলেই আমরা (বাঙ্গালী উঠতি ধনিকশ্রেণী) একটু শিরদাড়া করে দাঁড়াতে পারি।

বিদেশী পুঁজির মধ্যে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া অন্যান্য বিদেশী পুঁজির (যার মধ্যে মার্কিন পুঁজিও অংশীদার) বিনিয়োগ ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যেই কতকগুলি প্রগতিশীল শ্লোগানের ব্যবস্থা করেছেন। এর দ্বারা তিনি জনগণকে বিভ্রান্তির মধ্যে ঠেলে দিতে চান এবং আওয়ামী লীগের সৎ ও দেশপ্রেমিক অংশকে (যার প্রকৃত অর্থে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের বিরোধিতা করেন না) মোহগ্রস্থ রাখার উদ্দেশ্যেই উপরোক্ত ব্যবস্থাকে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র নামে বৈজ্ঞানিক পন্থাতেই সমাজতন্ত্রের বিরোধিতা করেছেন মাত্র। এই ব্যবস্থা সামগ্রিকভাবে শোষণ ব্যবস্থা উৎখাতের নামে শোষণকে নতুনভাবে অব্যাহত রাখারই একটি প্রচেষ্টা মাত্র।

আপনার চিঠি

সমবায় আন্দোলনকে জোরদার করতে হলে

জনাব সম্পাদক সাহেব,

বাংলাদেশ সরকারের কর্মচারীদের অবসরগ্রহণের জন্য যে পদ্ধতি নির্ধারণ করেছেন তা উদ্যমশীল যুবক শ্রেণীর কর্মচারীদের মনে নতুন আশার সঞ্চার করেছে। এর ফলে সৃষ্টি হবে উদ্যমশীল কর্মী, গড়ে উঠবে নতুন চেতনা। তাই আজ স্বাধীনতার উষালগ্নে নতুনতর চেতনায় যারা উদ্ভাসিত তারা উৎসাহবোধ করেছিল বিপ্লবী সরকারের এই সঠিক পদ্ধতির ঘোষণা পেয়ে। বিশেষ করে সমবায় বিভাগের কর্মচারীদের ভিতর সমবায়কে গণমানুষের আন্দোলনে রূপান্তরিত করবার জন্যে আজ সবচেয়ে বড় প্রয়োজন প্রগতিশীল নেতৃত্বের। সমবায়কে আমলাতান্ত্রিকতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে নি:স্বার্থবিহীনদের অর্থনৈতিক আন্দোলনে রূপান্তরিত করার জন্য প্রয়োজন পুরাতন চিন্তা দূর করা ও কর্মঠ উদ্যমশীল কর্মীদের হাতে তা ছেড়ে দেওয়া। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে সমবায় আন্দোলনের সবচেয়ে বেশী আমলাতান্ত্রিক প্রাসাদ ষড়যন্ত্র ও কৌশল। কতিপয় অফিসার যারা এক যুগেরও বেশী আমলাতান্ত্রিক ষড়যন্ত্রের মারফত সমবায় আন্দোলনকে পায়ের নীচে পর্যুদস্ত করে রেখেছে তাদের অচিরে সরে পড়া উচিত। তাই অবসরগ্রহণের নীতি সমবায় আন্দোলনের জন্য আর্শীবাদ হিসাবেই এসেছে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় অবসরগ্রহণের নীতি চাপা দিয়ে আর এক আমলাতান্ত্রিক ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তারা আবার পুনর্বহাল, পুনঃনিয়োগ ও চাকুরী সম্প্রসারণের চেষ্টা চালাচ্ছে। তাঁরা নাকি বিশেষজ্ঞ। তাঁদের ছাড়া নাকি আন্দোলনই চলবে না। আমরা ইহা জানি তাদের বিশেষ জ্ঞানের বদৌলতেই বিভিন্ন পরিকল্পনায় কোটি কোটি টাকার অপচয় হয়েছে। নিজেদের আত্মীয়স্বজন ও চেলাচামুণ্ডরা সমবায় আন্দোলনে রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে। তাঁরা বিশেষ বেতন, অতিরিক্ত সুবিধা লাভ করেছেন। কিন্তু যাদের জন্য পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছিল তাদের কাছে পরিকল্পনার কোন সুফল দূরের কথা, খবরটিও পৌঁছায়নি। এবার পরিকল্পনা বিশেষজ্ঞদের ধরে রাখার অর্থ হবে সমবায় আন্দোলনের মাথা টিপে ধরে রাখা। এরা পুরাতন জালেমী সরকারের তপ্পীবাহক হিসাবে কায়েমী স্বার্থকে সমবায় আন্দোলনে জোরদার করেছে। কর্মীদের প্রতিজ্ঞা বিকাশের পরিবর্তে এরা নিজেদের মনতুষ্টকারী কর্মচারীদের সুযোগ সুবিধা দিয়েছে, এদের মনতুষ্টিই ছিল যোগ্যতার মাপকাঠি। জনগণের কল্যাণ কোন কিছুর মাপকাঠি ছিল না। আমার বক্তব্য পরীক্ষা করবার জন্য সরকার এদের যে বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বলে ধরে রাখবার উদ্যোগ দেখবেন, সে সব পরিকল্পনাগুলো মুখের কথায় মূল্যায়ন না করে তথ্য অনুসন্ধান ও বাস্তব পর্যবেক্ষণের মারফত মূল্যায়ন করে তাদের অতীত কাজের হিসেব নিবেন। এবং তখনই সরকার বুঝতে পারবেন এরা সমবায় আন্দোলনের কতদূর ক্ষতি সাধন করেছেন।

এদের পুনর্বহালের আগে এদের কাজের নাম-নকশা যাচাই করা উচিত। নতুবা সমবায় আন্দোলনের সর্বস্তরের কর্মীদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রদান করে পুরাতন কাজের একটা সমালোচনামূলক সম্মেলন আহ্বান করে প্রকৃত অবস্থা অনুধাবন করার সুব্যবস্থা প্রদান গ্রহণ করা হোক। লক্ষ লক্ষ টাকা যারা দরিদ্র নিঃস্ব মানুষের নামে অপচয় করেছে, যারা সমবায়ের মূল্য আদর্শ ধূলিসাৎ করেছে, তাঁরা অন্য এক নতুন আমলার সুপারিশে বিশেষজ্ঞ বা উপদেষ্টা হতে পারে না। আমরা এখনও শুনেছি এদের অবসরগ্রহণ একেবারে রুখতে না পারলে উপদেষ্টা নিয়োগের পথ করা হবে। হায়রে দুর্ভাগ্য! আমলারাই জয়ী হবে আজও।

আমরা এও জানি সমবায় বিভাগের কতিপয় ফাইল সরকার ফেরত পাঠিয়েছেন, সে ফাইল আবার অন্যভাবে দাখিল করার চেষ্টা হচ্ছে। আমরা বাধ্য হয়ে জাতীয় প্রেসের মাধ্যমে এদের অতীতের কার্যকলাপ তুলে ধরবার জন্য সমবায়ী কর্মচারী, প্রকৃত সমবায়ীদের আহ্বান জানাই।

আমরা এ প্রসঙ্গে জাতীয় প্রেসকে এসব কাজকর্মের প্রকাশ্যে মূল্যায়নের জন্য আহ্বান জানাব। আমরা বিশ্বাস করি গণতান্ত্রিক বিতর্কের মাধ্যমেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে জাতীয় প্রতিভার বিকাশ সাধন সম্ভব হবে, জাতীয় উন্নতি সাধিত হবে।

উপসংহারে আমরা সরকারকে অনুরোধ করব, ইক্ষু, মৎস্য, দুগ্ধ, লবণ, সমবায় কর্ম পরিকল্পনার বিভিন্ন কাজ-কর্ম পরীক্ষা করে

তাদের চাকুরীর মেয়াদ সম্প্রসারণ ও উপদেষ্টা নিয়োগের কাজে সিদ্ধান্ত নেবেন।

সফিউল্লা, কুমিল্লা।

পাঠকের অভিমত
বিশ্ববিদ্যালয়ে দালালী বনাম দেশপ্রেম

সেদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রের সাথে কথা হচ্ছিল। সম্প্রতি সে লেখাপড়া ছেড়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জিজ্ঞাসা করে জানলাম, আর্থিক অবস্থা নিতান্ত কাহিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্প্রতি দেয় আর্থিক সাহায্যের কথা বলায় ছেলেটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আমি তো দালাল শ্রেণীভুক্ত। কারণ, বিগত স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় ক্লাশ করেছিলাম কয়েকদিন। তবে স্বেচ্ছায় করি নাই। বিশ্বাস করুন, রাজাকাররা আমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে না পাঠানোর জন্যে আমার বাবাকে খুব অত্যাচার করেছে।"

একটি ছেলের কথাই মাত্র বললাম। কিন্তু এমন তো শত শত আছে। এখন প্রশ্ন হল এরা আর্থিক সাহায্য পাবে না কেন? তাহলে বিগত আন্দোলনের সময় যেসব শিক্ষক ক্লাশ করেছেন তাঁরা কেন বেতন পাচ্ছেন? তাঁদের চাকুরীতে কেন পদোন্নতি হচ্ছে? আর সর্বোপরি ক্লাশ করতে এসে যেসব শিক্ষক বর্বর বাহিনীর হাতে প্রাণ দিয়েছেন তাঁদের জন্য তাহলে শোকপ্রকাশ করা হচ্ছে কেন? কারণ, ক্লাশে যোগদানকারী ছাত্ররা যদি দালালীর তালিকাভুক্ত হয়ে কোন আর্থিক সাহায্য না পায় তবে উক্ত শহীদ শিক্ষকগণও দালাল আখ্যা পাবার উপযুক্ত নয় কি? তাহলে শহীদ শিক্ষকদের প্রতি যে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়া হচ্ছে তাকে একটা ভড়ং বললে কি অত্যুক্তি হবে?

স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বোমা, গ্রেনেড প্রভৃতি বিস্ফোরণের যথেষ্ট দৃষ্টান্ত রয়েছে। মুক্তিফৌজ দেশের মধ্যে আশ্রয় পেয়েছে। বর্বর বাহিনীর গুপ্ত সংবাদ সীমান্তের ওপারেও পৌঁছেছে। প্রশ্ন এগুলো কি ফেরেস্তা এসে করেছে ? নাকি উপরোক্ত দালাল আখ্যাপ্রাপ্ত গরীব ছাত্ররাই করেছে? কর্তৃপক্ষের শুভদৃষ্টির সামনে প্রশ্নগুলি বিবেচনার জন্য রইল। দেশপ্রেমিকদের (?) শুভ বুদ্ধির উদয় হলে শহীদের আত্মা শান্তি পাবে এবং জোর করে চাপিয়ে দেয়া বিশেষণ দালাল থেকে কতগুলি নিরাপরাধ ছাত্র-ছাত্রী মুক্তি পাবে বলে আমার বদ্ধমূল ধারণা।

কে, এম, আঃ ওয়াদুদ
ফরিদপুর।

মুরিদের দরবার

পীর-কাহিনী যুক্তিবাদ
ভণ্ডামীর নামান্তর?

মোহাম্মদ হোসেন

রসূলুল্লাহ্‌র (সঃ) সময় হইতেই মানব জাতিতে আধ্যাত্মিকতার বিকাশ হইয়া আসিতেছে। হযরত আবুবকরের (রাঃ) সময় যেমনিভাবে ভণ্ড নবীর আবির্ভাব হইয়াছিল তেমনি আজ ব্যাঙের ছাতার মত অজস্র ভণ্ড পীরের উদ্ভব হইয়াছে। তাহারা ধর্মের নামে ধার্মিক মানুষকে শোষণ করিতেছে। ধর্ম সম্পর্কে আমলহীন গভীর জ্ঞান তাহাদিগকে এই পথে দ্বিধাহীনচিত্তে চলিতে বিশেষ সহায়তা করায় শিক্ষিত মানুষও তাহাদের যুক্তি-তর্কের নিকট হার মানিতেছে। মানবজীবনে আধ্যাত্মিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় অকৃত্রিমের পরম পুরুষটি কৃত্রিমের মধ্যে আত্মগোপন করায় তাঁহাকে বাছিয়া বাহির করাই দুষ্কর।

বৎসর দুই আগের কথা। আমাদের গ্রামে হঠাৎ করিয়া একজন পীর আসিলেন। অল্প দিনেই তাহার যশ-খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। তাঁহার অগণিত ভক্তের দল দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইলাম। ভক্তিতে আপ্লুত হৃদয়ে ভক্তরা সর্দা-সর্বদা তাঁহার মনতুষ্টির জন্য উৎকণ্ঠিত।

ভাবিলাম এই পীরের মধ্যে নিশ্চয়ই আধ্যাত্মিকতার চরম বিকাশ সাধিত হইয়াছে। ইতিমধ্যে আমাদের গ্রামের ধনী অথচ সরলমনা দুইজন কৃষকও তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছে। তাহারা প্রায়ই পীরের আস্তানায় যাইত-আমিও মাঝে মাঝে শরীক হইতাম আর প্রাণ ভরিয়া পীরের উপদেশ লইতাম। পীর সাহেব বলিতেন আমিত্বকে ভুলিয়া যাও, নিজেকে অনন্তের সাথে উপলব্ধি কর, আমার বাড়ী আমার গাড়ী, আমার স্ত্রী-পুত্র, আমার সহায়, আমার সম্পত্তি এই রূপ শুধু 'আমার' 'আমার' ভুলিয়া যাও, 'তোমার' বা 'আমার' বলিয়া কিছুই নাই, সবই আল্লাহ্‌র আর সকল মানুষই আল্লাহ্‌র বান্দা। সুতরাং সকল মানুষই ভাই-ভাই-কোন প্রভেদ নাই-সকলেই সমান হেতু সকলেরই সমাধিকার রহিয়াছে। কিন্তু দ্বন্দ্ব-কলহময় পৃথিবীর টানে মানুষ এই চিরসত্যকে অবহেলা করে। নিজের বলিয়া সংসারে কিছুই রাখিও না। মনে রাখিও তোমার সকল কিছুই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্যে। সংসার মানেই ফেৎনা। অতএব ফেৎনাকে এড়াইয়া চলিবে তবে তো আল্লাহ্‌কে পাইবে-ইত্যাদি আরও অনেক কিছু পীর সাহেব বলিতেন।

বৎসর খানেক আমাদের গ্রামের সেই ধর্মানুরাগী শিষ্য দুইটির কোন খবর রাখিতে পারি নাই। হঠাৎ একদিন তাহাদের একজনের সাথে দেখা হইল শহরের রাস্তায় ফকিরের বেশে। আমি আগাইয়া যাইতেই তাহার দুই চোখের অশ্রু টপ-টপ করিয়া পড়িতে লাগিল। জানিলাম পীর সাহেবের নির্দেশ মত তাহার পুরা দশ বিঘা জমি, হালের গরু, ভিটা-বাড়ী সকলই নিঃশেষ করিয়া ফেৎনার হাত হইতে বাঁচিয়াছে। তাই তাহার এই দশা। ছেলেমেয়েদের লইয়া অর্দ্ধাহারে অনাহারে দিন কাটাইতেছে-শহরে কাজ খুঁজিতেছে পেটের অন্ন সংস্থানের আশায়। শুনিলাম তাহার সাথীটির অবস্থাও একইরূপ-সদ্য বিবাহিত স্ত্রীটিকে ঘরে রাখিয়া দূরবর্তী কোন শহরে রিক্সা চালাইয়া জীবন ধারন করিতেছে। শুধু তাহাই নহে, পীর সাহেবের যাহারা সব চাইতে অনুগত ছিল তাঁহাদের সকলের অবস্থা একই রকম। বলিলাম, আল্লাহকে কি পাইয়াছ? করুণ ভাষায় উত্তর দিল পাইয়াছি 'দুঃখ' পাইতেছিও তাই। চলিয়া আসিলাম। কিছুদিন পর সেই পীর সাহেবেরই আর একজন শিষ্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ। তাহাকে তাহার অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিতেই-হাউমাউ করিয়া কাঁদিয়া পীর সাহেবকে ভৎসনা করিতে লাগিল। দেখিলাম, তাহার সাথে কংকালসার দেহ পাঁচ-ছয়টি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। ক্ষুধার তাড়না তাহাদিগকে মৃত্যুর দিকে ঠেলিয়া দিতেছে। পীর সাহেবের নিকট গিয়া তাহার জমির টাকা ফিরাইয়া চাহিতে বলিলাম। কিন্তু পুনরায় সেখানে যাইতে নারাজ। বাড়ীতে ফিরিবার পর সারা রাত্রি ঘুমাইতে পারিলাম না। শত চিন্তা আসিয়া মাথায় কষাঘাত করিতে লাগিল। ইহাই কি ধর্ম! এই কি আধ্যাত্মিকতার বিকাশ!! এই কি চৌদ্দশত বৎসর পূর্বেকার নবীর (সঃ) আদর্শ!!! না, না তাহা কখনই হইতে পারে না। সব ভণ্ডের দল-ভণ্ডামীর তো একটা সীমা আছে। ধর্মের নামে শোষণ! ধর্মানুরাগীদের সেই অনাদিকাল হইতেই ভণ্ডপীরগুলি এমনিভাবে শোষণ করিয়া আসিতেছে। শুধু শোষণই নয়, সহজ সরল পথ হইতে কন্টময়

পথে ঠেলিয়া দিয়াছে। সকালে উঠিয়াই পীর সাহেবের নিকট গেলাম। তাহার নিকট এই সম্পর্কে অভিযোগ তুলিতেই-তিনি বলিলেন, কামিল লোকের কোন কাজের সমালোচনা করিতে নাই। তিনি হযরত মুসার (সঃ) উপমা দিয়া আমাকে বুঝাইলেন। তবু ছাড়িলাম না। বুঝিয়াও বুঝিলাম না। অবুঝ শিশুর মত বায়না ধরিলাম–এসবের মানে কি আপনাকে বলিতেই হইবে। তিনি বলিতে লাগিলেন, তুমি ছেলেমানুষ এ সম্বন্ধে জানিতে চাহিও না। সে বয়স তোমার এখনো হয় নাই। সহজ সরল পথ নামমাত্র কিন্তু পথ বড়ই কঠিন। খুবই কণ্টকাকীর্ণ। সেই পথে প্রতি মুহূর্তে পরীক্ষা-নিরীক্ষা। এ যেন মহাশূন্যের উপর পারে চলার সরু একটি রাস্তা যার উপর দিয়া চলিয়া যাইতে প্রতি মুহূর্তে পড়িয়া যাইবার আশঙ্কা জাগে। মানুষ ভোগের মধ্যে থাকিয়া আল্লাহকে ডাকে। পেট পুরিয়া খাইয়া আরামে থাকিয়া আল্লাহকে স্মরণ করিতে যেরূপ মনে আনন্দ জাগে সেইরূপ যদি নিঃসহায় অবস্থায় না জাগে তাহা হইলে সেই করুণাময়কে পাওয়া যাইবে না। তাই ভোগে-অভোগে তাহাকে সমান দেখ। সুখে যিনি দূরে থাকেন, দুঃখে তিনিই আলিঙ্গন করেন। হযরত দাউদকে (সঃ) সেই জন্যই সর্বশক্তিমান রোগ দিয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন। হযরত দাউদ (সঃ) জয়ী হইলেন–রোগ যাতনায় তিনি অন্তর্যামীকে ভুলিলেন না। পীর সাহেব একটু থামিলেন–। স্ত্রীর প্রতি কোন ভক্তের মাত্রাতিরিক্ত আকর্ষণ থাকিলে তিনি তাহাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া পরম তৃপ্তি বোধ করিতেন। এই সুযোগে সেই সম্পর্কেও কথা পাড়িলাম। বলিলাম আপনার কথা বুঝিলাম, কিন্তু এমনিভাবে তাই মানুষকে স্বর্বশান্ত করিবেন। ইহাই কি মহানবীর (সঃ) আদর্শ? তিনি আবার আরম্ভ করিলেন, এই জন্যই বাবা বলিয়াছিলাম তুমি ছেলেমানুষ। এগুলি নিয়া মাথা ঘামাইও না। আল্লাহর ভালবাসার নিকট দুনিয়ার ভালবাসার পরাজয় না ঘটিলে মানুষের অহংবোধের সত্যিকারের অবসান হয় না। আর বিচ্ছেদ যাতনার ভিতর করুণাময়কে যেভাবে উপলব্ধি করা যায় তেমনটি অন্য কোনভাবে সম্ভব নয়। তাই ইহার প্রয়োজনীয়তা মানবজীবনে অপরিহার্য। ভক্ত যদি সত্যিকারেই আল্লাহপ্রেমে উৎসর্গীত হইয়া থাকে তবে নিশ্চয় দরিদ্রতার কঠোর কষাঘাতে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়াও ভক্তিতে আপ্লুত থাকিবে–আর কৃত্রিম হইলে বাস্তবতায় ফিরিয়া যাইবে। চকমকি পাথর সমুদ্রেই রাখ আর ডোবার পানিতেই ফেল–যতদিন ইচ্ছা রাখিয়া তুলিয়া ঘর্ষণ করিলেই অগ্নি প্রজ্বলিত হয়–ভক্তের পরীক্ষাও ঠিক তেমনি। তুমি সংসারসক্তই না ঈশ্বরাসক্ত ইহার মহাপরীক্ষা স্থল এই কঠোর যাতনাময় দরিদ্রতা। আমি তো মানুষকে স্বর্বশান্ত করি না। এ ধারণা তোমার ভুল। আমি মানুষকে শুদ্ধ হইবার নির্দেশ দিই। সংসার হইতে যতই দূরে থাকা যায় ততই ভাল।

আর তর্ক করিলাম না। বুঝিলাম পীর সাহেব আমলে বড় না হইলে কথায় বড় সজাগ। গ্রামের সর্বত্রই পীর সাহেবের সমালোচনা আরম্ভ হইল। কিন্তু সম্মুখে বলার সাহসী কেহই নাই। কারণ, তাহার যুক্তি-তর্কের নিকট ইতিপূর্বে প্রবীণ মুন্সী মওলানারাও হার মানিয়াছে। ভাবিয়াই পাইলাম না সংসারবিরাগী এই পুরুষটি ভক্তদিগকে সংসার ছাড়াইয়া কি ফল পান। আর তাহাদের দেয় অর্থ দিয়া কিইবা করেন। বেশী দিন আর ভাবিতে হইল না। দুইমাস পর গণআদালতে কঠোর বিচারের আশঙ্কায় এই মহাপুরুষটি হঠাৎ করিয়া উধাও হইলেন।

সোনার বাংলাকে গড়তে হলে পাটের ফলন বাড়ান

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ঠিক সময়ে বীজ বপন করুন

প্রত্যেক চাষী ভাইয়ের ঠিক সময়ে পাট বোনা উচিত। অনেক সময় দেখা যায় পাট গাছে ফুল ধরে যায়। ইহার প্রধান কারণ নির্দিষ্ট সময়ে ফসল বোনা হয়নি। কাজেই চাষী ভাইয়ের ঠিক সময় উপযোগী বীজ বোনা উচিৎ। কারণ, ফুলের পাটগাছ থেকে কোনদিনই ভাল আঁশ উপযুক্ত পরিমাণে পাওয়া সম্ভব না। সাদা বা দেশী পাটের বীজ ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি থেকে চৈত্রের শেষ নাগাদ বোনা চলে। আর তোষা পাটের বীজ বুনতে হয় বৈশাখ মাসে। একেবারে বালুময় কাঁকুড়ে অত্যাধিক লোনা এবং খুব নীচু জমিতে পাট চাষ না করাই উত্তম।

লাইন করে পাট বুনতে পারেন

আমাদের দেশে সাধারণতঃ ছিটিয়ে পাট বোনা হয়। গবেষণার পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, লাইন করে বপন করলে অধিক লাভবান হওয়া যায়। বীজ বোনার যন্ত্রের মারফত বা হাতে লাইন করে বোনার ইচ্ছা থাকলে ১ ফুট অন্তর অন্তর বীজ বুনতে হয়। চারা গজানোর অল্প কিছুদিন পর থেকে চারা এমনিভাবে তুলতে হবে যাতে করে প্রত্যেক লাইনে ২ ইঞ্চি পর পর পাট গাছ থাকে। এ ধরনের চাষে অল্প বীজে বোনার কাজ শেষ হয়। লাইনে পাট বোনলে নিড়াতে ও ঔষধ ছিটাতে অনেক সুবিধা হয়। তদুপরি আধুনিক কৃষিযন্ত্র ব্যবহার করা সম্ভব হয়।

নিড়ানি ও বাছাই

সময় মত নিড়ানির উপর নির্ভর করবে ফসলের ফলন। পাটের চারাগুলো যখন ৩/ ৪ ইঞ্চি লম্বা হবে তখনই একটা নিড়ি দেওয়া প্রয়োজন। গাছগুলো ছোট থাকতে নিড়িয়ে দিলে পাটের চারাগুলো দ্রুত বেড়ে উঠবে। তারপর চারাগুলো যখন ১ ফুট হয়ে উঠবে তখন আর একটি নিড়ানি দিতে হবে। এমনিভাবে চারা বাছাই করা উচিৎ যাতে করে পরস্পর গাছের মধ্যে ৪ ইঞ্চি ফাঁক থাকে, আর সারি করে পাট বোনা ক্ষেতে পরস্পর গাছের মধ্যে ২ ইঞ্চির মত ফাঁক রাখা প্রয়োজন।

পাটের রোগ দমন করুন

পাটের রোগ দমনের জন্য দুটো কাজ করতে পারেন। সাধারণতঃ পাট যখন ৬/৭ ইঞ্চি হয়ে উঠে ঐ সময় থেকে পূর্ণ বয়স্ক পাট গাছের পাতা বা ডাটার উপর বাদামী রঙের দাগ হয়ে উঠে। ঐগুলো পরে গাছকে মেরে ফেলতে পারে। কাজেই এ ধরনের রোগ দেখা মাত্রই পরেজেট (০.১৫ শতকরা) অথবা চুজেট (০.১৫ শতকরা) যেকোন একটা ঔষধ এক মণ পানির সাথে এক ছটাক ঔষধ মিশিয়ে সিঞ্চন যন্ত্রের মাধ্যমে ছড়িয়ে দিন, পরে স্থানীয় কৃষি অফিসারের সাথে পরামর্শ করে পাটকে রোগ থেকে রেহাই দিন।

পোকা-মাকড় ধ্বংস করে পাটের সবলতা বাড়ান

সাধারণতঃ পাটের গাছে উড়চুঙ্গা, শুয়োপোকা, চেলেপোকা ও মাইট পোকাই দেখা যায়। এদের আক্রমণ সত্যই মারাত্মক। জমিতে ২/১টি পোকা দেখা মাত্রই কীটনাশক ঔষধ ব্যবহার করবেন। তাহলে শত্রুর হাত থেকে পাটের গাছ রক্ষা করতে পারবেন।

ঠিক সময়ে পাট কাটুন জাক দিন

গাছে যখন ফল ধরতে শুরু করে তখনই পাট কাটা উচিৎ। তবে বন্যার প্রকোপ দেখলে কিছুদিন পূর্বে পাট কাটা উচিৎ। আঁশের উপর

পাটের দাম নির্ভর করে। কাজেই পাট পচানোর প্রতি খেয়াল করা উচিৎ। পর্যাপ্ত পরিষ্কার পানিতে পাট পচালে ভাল হয়। যে সব পানিতে স্রোতের টান কম হয় সে সব পানিতে পাটের আঁশ খুব ভাল হয়।

পাট ব্যবসা

পাট বেচা-কেনা একটি লাভজনক ব্যবসা। বাংলাদেশের সর্বত্রই পাটের বড় বড় আড়ত আছে। এ সকল কেন্দ্রে পাট ব্যবসায়ীরা দালালদের মারফত সস্তা দামে প্রচুর পরিমাণ পাট খরিদ করে ও গুদামজাত করে। সুবিধা ও সুযোগ মত আশাতীত লাভে তারা কোটি কোটি টাকার গুদামজাত পাট প্রতি বৎসর বাংলাদেশ হতে ইউরোপ, আমেরিকাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রফতানী করে। এ ভাবে দেশী-বিদেশী বনিকদের ধনভান্ডার ভরে উঠেছে।

গত বিশ বৎসরে প্রয়োজনের তুলনায় কম হলেও বাংলাদেশে কয়েকটি পাটকল স্থাপিত হয়েছে। এ সমস্ত পাটকলগুলিতে প্রচুর পরিমাণ পাটের দরকার হয়। চাষীরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তার যোগান দিয়ে আসছে। কিন্তু তাতে মোটা মুনাফা পায় মিল মালিকগণ। পাটজাত দ্রব্যে তারা কত যে লাভ করে একজন পাটচাষী তা অনুমানও করতে পারবেন না। তাই আজ দরকার প্রতিটি কৃষকের পাটকেন্দ্রিক অর্থনীতি মোটামুটি বুঝে নেয়া। তাহলে তারা ন্যায্য পাওনা আদায় করে নিতে পারবে।

চট্টগ্রাম জেলা ন্যাপ সাংগঠনিক কমিটির সদস্যবৃন্দ

(১) ব্যারিষ্টার সলিমুল হক খান মিল্কী – আহ্বায়ক (২) ব্যারিষ্টার আমিনুল হক – পটিয়া (৩) জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম চৌধুরী – রাউজান (৪) বাবু সত্য প্রসন্ন বড়ুয়া – রাউজান (৫) জনাব আবদুল মান্নান আনছারী –পটিয়া (৬) জনাব এ, কে, এম, নুরুল আমিন – পটিয়া (৭) জনাব এম, এ, জব্বার – রাঙ্গুনিয়া (৮) জনাব মফিজ উদ্দিন চৌধুরী – ফটিকছড়ি (৯) জনাব আবু তালেব চৌধুরী – ফটিকছড়ি (১০) অধ্যাপক ফজলুল কাদের – হাটহাজারী (১১) জনাব মোঃ জামাল উদ্দিন– হাটহাজারী (১২) এ্যাডভোকেট সামসুল হুদা – সন্দ্বীপ (১৩) বাবু ননী গোপাল নাথ – মিরশ্বরাই (১৪) জনাব ওবায়দুল হক – মিরশ্বরাই (১৫) বাবু জহরলাল তালুকদার – বাঁশখালী (১৬) জনাব তাহের উদ্দিন– আনোয়ারা (১৭) জনাব আবুল কালাম মাষ্টার – আনোয়ারা (১৮) জনাব সৈয়দ মাহবুবুল আলম – বোয়ালখালী (১৯) জনাব জালাল আহমদ খলিফা– সাতকানিয়া (২০) জনাব আবদুর রাজ্জাক – সাতকানিয়া (২১) জনাব আনোয়ারুল আজীম – কক্সবাজার (২২) জনাব নেছার আহমদ, বিএসসি- মহেশখালী (২৩) জনাব সামসুল হুদা ছিদ্দিকী –কতুবদিয়া।

চট্টগ্রাম শহর ন্যাপ সাংগঠনিক কমিটির সদস্যবৃন্দ

(১) ক্যাপ্টেন সামসুল ইসলাম – আহ্বায়ক (২) জনাব বজলুছ ছাত্তার (৩) ব্যারিষ্টার নুরুল আবছার (৪) ব্যারিষ্টার মাহবুবুল কবীর চৌধুরী (৫) বাবু বিভুতিভূষণ চৌধুরী (মানিক চৌধুরী) (৬) জনাব আবুল কাশেম এম,এ (৭) জনাব এনামুল হক চৌধুরী (৮) জনাব আব্দুল শুক্কর বিশ্বাস (৯) জনাব আব্দুল শুক্কর সওদাগর (১০) জনাব ওয়াজিউল্লা (১১) জনাব ফিরোজ আহাম্মদ (১২) জনাব তোফায়েল আহাম্মদ (১৩) জনাব মোহাম্মদ ইউনুছ (১৪) জনাব নুরুল ইসলাম (১৫) জনাব ছালেহ আহাম্মদ (১৬) জনাব আবু জলুর।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা ন্যাপের সাংগঠনিক কমিটি

জনাব সামসুল ইসলাম – আহ্বায়ক। বাবু সুখেন্দু শেখর চাকমা (খাগড়াছড়ি, বান্দরবান) ডা: খনিন্দ্র লাল চাকমা – (রাঙ্গামাটি), জনাব সুলতান আহমদ ও জনাব কতুব উদ্দিন আহমদ।

ইহা কি সত্য?

॥ ২৩ ॥

কেবল 'থ্রি নট থ্রি' হলেই নয়, খোদ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম স্থপতি হলেও বাংলাদেশ সরকার চাকুরী দিতে বেশ উৎসাহ বোধ করে থাকেন।

তমঘা পেয়ে অবসরপ্রাপ্ত ৬৪ বছর বয়স্ক এমনি এক ভদ্রলোককে বাংলাদেশ সরকার আইন ও পরিষদের উর্ধতন পদে বহাল করে তা জোরেসোরে প্রমাণ করেছেন। অথচ এই ভদ্রলোকই কিনা ১৯৬৮-৬৯ সালে শেখ মুজিবকে ফাঁসিয়ে ফেলার কসরত করেছিলেন। সুদীর্ঘ তিন বৎসর অবসর গ্রহণের পর কাকে ফাঁসানোর ওয়াদাবদ্ধ হয়ে তিনি এই চাকুরীটি পেলেন, আমাদের তা জানা নেই।

॥ ২৪ ॥

ওয়াপদা, হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন প্রভৃতি সংস্থার ষ্ট্রং রুমের ফাইল ঘাটলে আজও যার অসাধুতার কেরামতি ধরা পড়বে, এক কোদাল মাটি না কাটিয়েও যিনি লক্ষ লক্ষ টাকার বিল অবলীলাক্রমে পাশ করিয়ে অর্থ আত্মসাত করতে পারেন, শেষাঙ্কে যিনি 'থ্রি নট থ্রি' মঞ্চের অন্যতম দাগী নায়ক সেই মহাজনটি বাংলাদেশ সরকারের একটি জনকল্যাণমূলক দফতরের নায়েব সেজেছেন। কি সব দুর্বলতায় কর্ণধার এদের হাতে হাল তুলে দিচ্ছেন আমাদের মোটামুটি জানা থাকলেও মনে শুধু প্রশ্ন জাগে বখশিসটা অন্য কালারে দিলে কি চলত না?

॥ ২৫ ॥

মুন্সীগঞ্জের জনৈক দালালের ইভিকাহিনী সম্বলিত ছড়ানো হাজার হাজার লিফলেটের একটি আমাদের হাতে পড়েছে। বিজ্ঞপ্তিটিতে অবশ্য 'জনৈক' লেখা নেই–দালালের নামধাম, পেশা- পরিচয় সবই উল্লেখ আছে। কিন্তু যেহেতু তিনি স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর মহব্বত-প্রাপ্ত– পুরস্কৃতদের একজন তাই 'আকল মন্দ কে লিয়ে ইশারা কাফি হ্যায়' নীতি অবলম্বন করা হল। বিবৃতির অনেক কাহিনীর মধ্যে রয়েছে : গত জুন মাস পর্যন্ত এই দালাল সাংবাদিক ঢাকা বেতারের Plain Truth কথিকাটি অত্যন্ত মনোযোগ ও নিষ্ঠার সাথে লিখেছেন। এই দালালই পাক-মিলিটারী কর্ণেলকে মুন্সীগঞ্জে নিয়ে গিয়েছিলেন। ঢাকার কয়েকটি সংবাদপত্রে ইতিপূর্বে তা প্রকাশও পেয়েছে। কিন্তু তবুও দালালটি প্রধানমন্ত্রীর মহব্বত থেকে মুক্তি লাভ করছেন না।

॥ ২৬ ॥

টাঙ্গাইল শহরের আকুরটাকুর মৌজার অন্তর্গত ৪৬৬ নং খতিয়ান ভুক্ত ৭৪৪ নং দাগে দুই বিঘা জমির উপর অবস্থিত অনন্য সুন্দর বাড়ীটির মালিকানা নিয়ে আদালতে মামলা রজ্জু থাকা সত্ত্বেও এর ভোগ দখল নিয়ে জেলার এম.সি.এ সাহেবদের মধ্যে রিলে রেস চলছে। জনৈক সরকারী কর্মচারীর কয়েক বৎসরের ইজারাদারী নাকচ করে কর্তৃপক্ষ এক এম.সিএ-র নামে বাড়ীটি বরাদ্দ করলে আরেক এম.সি.এ চুন, ব্রাশ, বালতি ইত্যাদি

সমবিব্যবহারে তাতে উঠে পড়েন এবং সঙ্গে সঙ্গে দখলী প্রচার কার্য অর্থাৎ চুনকাম শুরু করে দেন।

আজ তাই জেলাবাসীকে মন্তব্য করতে শোনা যায়, আমরা আশা করেছিলাম এত রক্তপাতের পর আমাদের এম.সি.এ সাহেবরা হযরত আবুবকর সিদ্দিকীর (রা:) মতই নি:স্বার্থ ত্যাগী হয়ে ফিরে আসবেন। কিন্তু নামে ঠিক থাকলেও কাজে ঠন ঠন।

কারো গোলামী নয়

ঢাকা, ২রা এপ্রিল– ঘনঘটা আবহাওয়ায় তিল-ঠাঁই- নাই ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানের সুবিশাল জনসভায় নবতিপর বৃদ্ধ মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী আজ বজ্র কঠিন ভাষায় ঘোষণা করেছেন, দুনিয়ার কোন শক্তির গোলামী আমরা মেনে নেব না। বৃটেনের নয়, যুক্তরাষ্ট্রের নয়, রাশিয়ার নয়, ভারতের নয়, চীনের নয়- কোন মহাশক্তিরই অঙ্গুলী হেলনে বাংলাদেশবাসী পরিচালিত হতে রাজী নহে। শুধু তাই নয় – মওলানার ভাষায়, বুকের রক্ত ঢেলেও আমাদের স্বাধীনতাকে আওয়ামী লীগের লুটপাট সমিতি কর্তৃক নস্যাৎ করতে দেব না। প্রধানমন্ত্রীকে হুঁশিয়ার করে মওলানা সাহেব সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, বাংলার কোটি কোটি মানুষকে অনাহার আর দুর্নীতি থেকে রক্ষা করতে না পারলে আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তা ধুলিসাৎ হয়ে যাবে।

প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক ঘোষণার প্রতি ইঙ্গিত করে মওলানা সাহেব বলেছেন, নক্সালদিগকে দেখামাত্র গুলি করার ফরমায়েশ বাচালতা বৈ কিছু নয়। কারণ, নক্সালদের বুকে সীল মারা নেই। তাই, মওলানার মতে, নিরপেক্ষ তদন্ত ও বিচারের পর দোষী সাব্যস্ত হলে যে কাউকে ফাঁসী দাও, দ্বীপান্তর কর – "কিন্তু অস্ত্রের ভাষায় কথা বলে ভয় দেখাইও না। বাংলার মানুষ আর গুলি-কামানের ভয় করে না।"

মওলানা সাহেব আফসোস করে বলেন যে এই কয়মাস আগেও যে আওয়ামী লীগারের টিনের ঘর পর্যন্ত ছিল না, দুর্নীতি আর স্বজন প্রীতির বদৌলতে আজ তারাই গাড়ী-বাড়ীর মালিক হয়ে বসেছে। পক্ষান্তরে সাধারণ মানুষ চরম দুর্দিনে কালাতিপাত করছে। মওলানা সাহেব উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান জানান – যে ওয়াদা করেছ অর্থাৎ সকল আবর্জনা দূর করে সমাজতন্ত্র কায়েম কর। শ্রমিকের ধর্মঘটের অধিকার দাও, সংবাদপত্রের পূর্ণ স্বাধীনতা দাও।

স্বাধীনতার পর পল্টনে মওলানা ভাসানীর এই ছিল প্রথম জনসভা। ঢাকাবাসী ছাড়াও নারায়ণগঞ্জ, টঙ্গী,মানিকগঞ্জ, টাঙ্গাইল প্রভৃতি এলাকা থেকে মিছিল করে আসা জনতায় ময়দানটি যখন পরিপূর্ণ হয়ে যায় কৃষক-শ্রমিকের সর্বকালের নয়নমনি সভাস্থলে আগমন করেন। অসংখ্য লাল পতাকা, মুহুর্মুহু শ্লোগান আর উদ্বেল জনতার প্রাণঢালা ভালবাসায় সিক্ত হয়ে যখন বাংলার বিদ্রোহী কণ্ঠ সোচ্চারে বক্তৃতা শুরু করলেন, চৈতালী বিকালের আকাশভাঙ্গা শিলাবৃষ্টি লক্ষ লক্ষ শ্রোতাকে হতাশ করে ঘরে ফিরে যেতে বাধ্য করল।

আগামী ৯ই এপ্রিল
পল্টনে জনসভা

মওলানা সাহেব জানিয়েছেন আগামী রোববার ৯ই এপ্রিল পল্টনে অনুষ্ঠিতব্য জনসভায় আল্লা চাহে তো তাঁর অসমাপ্ত ভাষণ সমাপ্ত করবেন।

স্বাধীনতা-উত্তর ভাসানী

স্বাধীনতার পর মওলানা সাহেব অসংখ্য সাংবাদিককে সাক্ষাতদান করলেও তিনটি উপলক্ষে স্বীয় অভিমত জনসমক্ষে ব্যক্ত করেছেন। প্রথমত: সাংবাদিক সম্মেলনে বিরোধী দলীয় রাজনীতি আর প্রগতিশীল চিন্তাধারায় সমুন্নত সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর পত্তন ও প্রসার ঘটিয়ে কিভাবে জাতীয় ইতিহাসে পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদের সূচনা করেছেন তাই বলেছেন। এতে দেখা যায়– মওলানা ভাসানী হাড়ে হাড়ে সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ ও সামন্তবাদ বিরোধী। কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ডাক অতি প্রথম দান করে এও প্রমাণ করেছেন – মওলানা ভাসানী আদর্শের চেয়ে মানুষকে বেশী ভালবাসেন।

দ্বিতীয় উপলক্ষ হল গত ৩১ শে মার্চ অনুষ্ঠিত চট্টগ্রামের জনসভা। কমপক্ষে দুই লক্ষ জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে মওলানা সাহেব একটি চাপা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন – বাংলাদেশের অর্থনীতি ভিনদেশী পুঁজি বিনিয়োগকারীদের হাতে চলে যেতে পারে। এতে জাতীয়করণের বাহার সব বেস্তে যাবে। কাজের কাজ কিছুই হবে না।

তৃতীয় উপলক্ষ হল ২রা এপ্রিলের পল্টনে অনুষ্ঠিত জনসভা। এতে মওলানা সাহেব একদিকে সাম্রাজ্যবাদী বৃহৎশক্তির পাঁয়তারা অপরদিকে ক্ষমতাসীন সরকারের অস্ত্রের ভাষা সম্পর্কে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছেন। তবে হ্যাঁ, ভাসানী কখনো উৎকণ্ঠা প্রকাশেই ইতি টানার মানুষ নন, তিনি আগামী দিনের কর্মসূচীও দিয়ে থাকেন। সে কর্মসূচী বৈঠকে সীমিত থাকে না – প্রশস্ত রাজপথে বিস্তৃতি লাভ করে। খুব সম্ভব আগামী রোববার মওলানা সাহেব তারই ইঙ্গিত দান করবেন।

মর্মান্তিক বিসমিল্লাহ !

দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, অপবাদ ইত্যাদি সেরে আওয়ামী লীগ সরকার গত শুক্রবার ২২ জন হোটেল শ্রমিকের রক্তে দুই হাত রঞ্জিত করেছেন। সনাতন কায়দায় আজকের 'জনগণের সরকারও' দোষটা চাপিয়েছেন জনতার উপর, চেষ্টা করেছেন প্রেস নোট দিয়ে সত্য চেপে যাবার। কিন্তু সত্যের ঢোল আপনি বাজে।

সম্পাদক ঃ সৈয়দ ইরফানুল বারী, সন্তোষ, টাঙ্গাইল। মুদ্রণে ঃ শান্তি প্রেস, টাঙ্গাইল।

প্রতি কপি বিশ পয়সা সাপ্তাহিক রেজিস্টার্ড নং-ডি.এ ১৭৬

হক-কথা

(WEEKLY THE HAQ-KATHA)

প্রকাশক ও পৃষ্ঠপোষক ঃ মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

প্রথম বর্ষ ঃ সপ্তম সংখ্যা রবিবার ২৬শে চৈত্র ১৩৭৮ ; ৯ই এপ্রিল ১৯৭২ ; ২৩ শে সফর ১৩৯২ ; সন্তোষ, টাঙ্গাইল

শাসনতন্ত্র মানব না যদি –

ঢাকা, ৯ই এপ্রিল-'মানব না, মানব না, মানব না'– বাংলার বিদ্রোহী কণ্ঠ মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী আজ পল্টনের সুবিশাল জনসভায় ঘোষণা করেছেন, "শাসনতন্ত্রে কৃষক-মজুরের বাঁচার দাবী, বাক স্বাধীনতা এবং সকল শ্রেণীর মানুষের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠিত না হলে তা মানবই না।" মওলানা অভিমত প্রকাশ করেছেন যে সকল শ্রেণীর প্রতিনিধির পরামর্শে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করলেই ভাল হত। তবে গণ্ডগোল না পাকিয়ে প্রথমে দেখতে হবে তাতে কি আছে না আছে।

সুদীর্ঘ ভাষণের এক পর্যায়ে মওলানা প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলেছেন, "যদি গণতন্ত্র কায়েম করতে চাও, শক্তিশালী বিরোধী দল গড়তে দাও, কঠোর সমালোচনার সুযোগ দাও। যে সংবাদপত্র মানুষের মনে বিপ্লবের শিখা প্রজ্জ্বলিত করে তার বাক স্বাধীনতা দাও।"

নবতিপর বৃদ্ধ জননেতা সুস্পষ্ট ভাষায় আহ্বান জানিয়েছেন, "মুজিব তুমি লিয়াকত আলী আর নূরুল আমিনের স্বভাব পদাঘাত কর। লুটপাট সমিতির আরও সদস্য ঝাটিয়ে তাড়াও। ১২ বৎসর প্রধানমন্ত্রী থাক, আপত্তি নাই। কিন্তু চোর-বদমাশ নিয়ে একদিনও থাকতে পারবে না।"

বাংলাদেশের যুব সমাজের প্রতি আহ্বান জানিয়ে মওলানা সাহেব বলেছেন, লুটপাট সমিতির সকল সদস্যকে যাতে সরকারী শাসন থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয় তার জন্যে চাপ সৃষ্টিমূলক এক গণআন্দোলন সৃষ্টি কর। যে সকল এমসিএ জনসাধারণের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করছে ও করবে তাদের গলায় গামছা লাগিয়ে ভোট ফেরত নেবার জনমত গড়ে তোল।

রক্তাক্ত স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা উল্লেখ করে মওলানা বলেন, "প্রাণের বিনিময়ে আমাদের স্বাধীনতা টিকিয়ে রাখব। এই স্বাধীনতা আওয়ামী লীগের জমিদারী বা ন্যাপের তালুকদারী নয়। তাই প্রধানমন্ত্রীর মুখ সামলে কথা বলা উচিত কারণ তুমি আর মুজিব ভাই নও।"

মওলানা অভিযোগ উত্থাপন করেছেন, "তোমার সাথে পাক-ফৌজের সহযোগিতাকারী বহু দালাল ঘুরে বেড়াচ্ছে। তুমি আমি না জানতে পারি, কিন্তু এ দেশের সংগ্রামী জনগণ দালালদের খুব ভাল করেই চিনে। আওয়ামী লীগ ক্ষমা করলেও সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালী তাদের ক্ষমা করবে না।"

মওলানা সাহেব প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক একটি ভাষণের প্রতি ইঙ্গিত করে বলছেন, "তুমি সার্টিফিকেট দিতে শুরু করেছ– কে স্বাধীনতা এনেছে। খবরদার, পক্ষপাতিত্বমূলক কথা বলো না। তুমি সবার প্রধানমন্ত্রী, কোন সম্প্রদায় বা পার্টি বিশেষের নও। জনগণই সবচেয়ে ভাল জানে স্বাধীনতায় কার কতটুকু অবদান রয়েছে।"

মওলানা সাহেব পাকিস্তান ধ্বংসের ইতিকথা বলতে গিয়ে জনাব ভুট্টোকে তজ্জন্য দায়ী করেন। তিনি ৫ লক্ষ বাঙ্গালীকে ফিরিয়ে দেবার দাবী জানান। কারণ তারা, মওলানার মতে, রাষ্ট্রদ্রোহী হয় নাই এবং 'তোমার সৈন্যদের মত কোন অপরাধও করে নাই।' এই প্রসঙ্গে ভারত, রাশিয়াসহ দুনিয়ার সকল দেশের প্রতি বাঙ্গালীদের ফিরিয়ে দেবার দাবীতে বিশ্বব্যাপী গণআন্দোলন সৃষ্টি করার তিনি আহ্বান জানান।

মওলানা সাহেব তার ভাষণে বলেন, "ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে আমরা রুশ-হিন্দের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াব না। দুনিয়ায় ভিক্ষুকের কোন মর্যাদা নাই। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র এক পয়সা খয়রাত দিয়ে সত্তর পয়সার সওয়াব হাসিল করে নেয়।"

রিলিফের নামে চোরাচালানের পদ্ধতি উল্লেখ করে মওলানা সাহেব বলেন, "পশ্চিমবাংলা চুষে খেয়ে বহুদিন পর আবার মারোয়াড়ীরা বাংলাদেশে হানা দিয়েছে। তারা সব মালপত্র এখন মজুদ করে রাখছে এবং চড়া দামে আস্তে আস্তে আবার বাংলাদেশেই ছাড়ছে।" তাই ১৩৪৩ সালের মহাদুর্ভিক্ষবস্থার যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তার পার্টি কাজ করে যাবে বলে মওলানা উল্লেখ করেন।

ব্যাঙ্ক লুট করে অর্থকড়ি যারা বাংলাদেশ সরকারের কাছে জমা দেয়নি তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে হলেও তা আদায় করে নিতে সরকারের প্রতি তিনি আহ্বান জানান। ৫০ টাকার নোটের সম অঙ্কের টাকা ফেরত নিতে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকে ঘুষ দিতে হচ্ছে বলে মওলানা দাবী করেন। আর পুরাতন নোট খোলা বাজারে বেচাকেনা হচ্ছে বলেও তিনি জানান।

সর্বশেষে মুসলমানের ধর্মীয় শিক্ষা যে পথ ও পদ্ধতিতেই হউক চালু রাখবার দাবী এবং দোষী অবাঙ্গালীদের শাস্তি দিয়ে নির্দোষীদের মুক্তি দিতে মওলানা সাহেব জোর দাবী জানান।

দু'টি গুপ্ত বেতার কেন্দ্র

'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড' পত্রিকার ঢাকা অফিসের বরাত দিয়ে প্রকাশিত এক খবরে বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশ পুলিশ 'বিদ্রোহী বাংলা রেডিও' এবং 'স্বাধীন মুসলিম বাংলা রেডিও' নামে দু'টি গুপ্ত বেতার কেন্দ্র কোথায় রয়েছে তা বের করতে জোর তৎপরতা চালিয়েছেন। ঢাকায় কেউ কেউ নাকি ৪১০ মিটার ব্যান্ডে এই বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শুনেছেন বলে পত্রিকাটিতে উল্লেখ রয়েছে।

স্বেচ্ছাচারিতা ধর্মঘট ডেকে আনছে লে অফের রহস্য কি?

যে কোন দিন থেকে চট্টগ্রাম সামুদ্রিক বন্দরে বর্তমানে কর্মরত চার হাজার শ্রমিক একযোগে পূর্ণাঙ্গ ধর্মঘট শুরু করে দিতে পারে। কর্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাচারিতার দরুণ এই পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে বলে জানা গেছে।

চট্টগ্রাম বন্দরে স্টিভডোরিং-এর জন্যে বহুদিনের ঝানু ২১টি প্রতিষ্ঠান কাজ করে আসছিল। হঠাৎ করে সরকার ১৯ জনের অনুমতিপত্র বাতিল করে এই কাজে পুরাপুরি অনভিজ্ঞ ১০৯ জন আওয়ামী লীগারকে বহাল করেন। এদের আনাড়ী ব্যবস্থাপনার দরুণ দলমত নির্বিশেষে সকল শ্রমিক একযোগে

অসহযোগিতা শুরু করেছেন। বর্তমানে স্বয়ং শ্রমিকরাই স্টিভেডোরিং-এর কাজ সেরে যাচ্ছেন এবং নব নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গকে এই গুরু দায়িত্ব থেকে দুরে সরিয়ে রাখছেন। এমতাবস্থায় সংশ্লিষ্ট মহল অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, শ্রমিক ও বন্দর কর্তৃপক্ষের মধ্যে আপোষ-ফয়সালা না হলে যে কোন দিন থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্যে ধর্মঘট শুরু হয়ে যাবে। এই টানাপোড়নে যেমনি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ক্ষতি হচ্ছে ঠিক তেমনি শ্রমিক অসন্তোষও ধূমায়িত হয়ে উঠছে।

এদিকে কালুরঘাট শিল্প এলাকায় চট্টগ্রাম জুট ম্যানুফেকচারিং কোম্পানীর লে অফকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ হয়ে গেলে দু'টি শ্রমিক সংস্থার মধ্যে উত্তেজনার ভাব বিরাজ করছে।

উক্ত কোম্পানীর গুদামে এক কোটি ছিয়াত্তর লক্ষ টাকার হোসিয়ান মজুদ থাকা সত্ত্বেও শ্রমিকদের পাওনা ৫৫ লক্ষ টাকা পরিশোধ না করেই প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এতে শুধু কয়েক হাজার শ্রমিকই বেকার হয়নি, বাংলাদেশ কোটি কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সুযোগও হারিয়েছে। এই লে অফের কারণ দেখানো হয়েছে কাঁচামালের অভাব। কিন্তু নারায়ণগঞ্জ ও চালনায় এখনো যথেষ্ট পরিমাণে কাঁচামাল মজুদ রয়েছে বলে জানা গেছে।

বাস্তবতার নিরিখে খুলনা-বরিশালের কয়েকটি এলাকা

ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি প্রদত্ত

গত ১৩ই মার্চ থেকে ২৪শে মার্চ পর্যন্ত বরিশাল জেলার শিকারপুর, আগরপুর, বামনাইল, বাবুগঞ্জ, পিরোজপুর; পটুয়াখালী জেলার বাউফল; খুলনা জেলার বাগেরহাট, দৌলতপুর ও সাতক্ষীরা অঞ্চলে আমার এক সফরের অভিজ্ঞতা যে কোন দেশ প্রেমিক নাগরিককেই সন্ত্রস্ত করে তুলবে।

আজ সারা বাংলাদেশে এক চরম খাদ্য সঙ্কট দেখা দিয়েছে। একদিকে তীব্র অর্থনৈতিক সঙ্কট অন্যদিকে ধান, চাউল, লবণ, সাবান, কেরোসিন, পরিধেয় বস্ত্রসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অগ্নিমূল্যের ফলে মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণী ও শ্রমজীবী মানুষ বিশেষ করে গোটা বাঙ্গালী জাতির বিরাট অংশ ভূমিহীন ও গরীব কৃষকের যে কি শোচনীয় দুরবস্থা তা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। ড্রয়িং রুমের তথাকথিত পলিটিশিয়ানদের চায়ের আসরের মুখরোচক আলোচনায় বা মঞ্চের হট লেকচারে তা উপলব্ধি করাও সম্ভব নয়। বাংলাদেশের শস্য ভাণ্ডার বলে খ্যাত এক বরিশাল জেলাতেই চাউলের মন প্রতি মূল্য ৬০.০০ টাকার উর্ধে। আমার সফরকৃত অঞ্চলের কোন কোন এলাকায় মানুষ অনাহারে, অর্ধাহারে মরছে ও আত্মহত্যা পর্যন্ত করেছে। 'একটি মানুষকেও না খেয়ে মরতে দেয়া হবে না' সরকারের এই মহান ঘোষণা আজ গ্রাম বাংলার অগণিত মানুষ বিশেষ করে ভূমিহীন ও গরীব কৃষকের জীবনে চরম প্রহসনে পরিণত হতে চলেছে।

ঠিক এমতাবস্থায়ই প্রতিদিন হাজার হাজার মণ খাদ্য শস্য সীমান্ত এলাকা দিয়ে দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে। সাতক্ষীরা অঞ্চলে গাড়ী ভর্তি খাদ্যশস্য দেখে আমি যখন কয়েকজন বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলাম, এগুলো কোথায় যাচ্ছে, উত্তরে মুখে কোন কথা না বলে বন্ধুদের অনেকেই অংগুলি সংকেতে জানালেন ওপারে। এই সংকেত বুঝে নিতে আমার এতটুকুও কষ্ট হয়নি। আমি শুধু মর্মাহত হয়ে বললাম, এর জন্য আপনারা কি কিছু করছেন না? জবাবে ওরা বলল, যথেষ্ট চেষ্টা করেছি ও করছি। আলোচনায় বুঝতে পারলাম সমাজের বড় বড় ছাপ মারা ব্যক্তিদের অনেকেই ঐ সকল কালোবাজারী চোরাচালানীদের হাতকে কত মজবুত করেছে। আলোচনার এক পর্যায়ে

জানতে পারলাম চোরাচালান বা প্রকাশ্য চালান যাই বলুন তা দমন করতে গেলে স্থানীয় টাউটরা দুইজন পুলিশকে পর্যন্ত প্রহার করেছে। কিন্তু উর্ধতন কর্তৃপক্ষ নিশ্চুপ।

মোদ্দাকথা বাস্তবে অপ্রতুল সাহায্য দ্রব্যের অসম বণ্টন, রিলিফের দুর্নীতির অভিযোগ, সৎপুলিশ ও রক্ষীবাহিনীর স্বল্পতা, সরকারী প্রশাসন যন্ত্রকে দুর্নীতিবাজদের আওতায় নিয়ে আসার অসাধু প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি হিসেবেই জনজীবন আজ ক্রমশঃ বিষিয়ে উঠছে। অনেক ক্ষেত্রে অতীতের জানি দুষমন দালালরা পর্যন্ত কি করে জামিন পেয়ে ও না পেয়ে ঘুরে ফিরছে। বরিশাল জেলার কৃতীসন্তান শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম, পিরোজপুরের শহীদ মন্টু ও অন্যান্য শহীদানদের অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনায় একথা জানতে পেরে প্রথমটায় হতবাক হলেও আশ্চর্য হইনি এই ভেবে যে, এই ঘুনেধরা সমাজব্যবস্থা যতদিন টিকিয়ে রাখা হবে ততদিন অন্যায়, অবিচারের কাছে বিচারের বাণী নিভৃতেই কাঁদবে।

সবখানে একই অভিযোগ, একই সমস্যা, একই অবস্থা। হতাশা আর নৈরাজ্য যেন নিত্য সঙ্গী। প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে সর্বত্রই চুরি-ডাকাতি, রাহাজানী, লুটতরাজ, খুনখারাবী অহরহ হচ্ছে। সর্বত্রই নিরাপত্তার অভাব। কেন এই সব হচ্ছে? কারা করছে? জানি, একদল এর উত্তর দেওয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়েই আছেন। বলবেন, আলবদর, রাজাকাররাই এইসব করছে। নয়তো বলবেন-কট্টর চীন পন্থী বা নকশালীরাই এর উদগাতা। কিন্তু তাদের প্রতি জিজ্ঞাসা সব কিছুই উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপিয়ে কখনও কি সত্য ঢাকা যায়, না গেছে? স্বাধীনতার বিরুদ্ধে কোন চক্রান্তকে জনগণ অবশ্যই প্রতিহত করবে। কিন্তু কথা হলো নিখিল বাংলাদেশের লুটপাট সমিতির সদস্য কারা? জনগণ কি এদেরও ধীরে ধীরে চিনতে পারছেন না। একদিকে রাজা যত বলে পরিষদ বলে তার শতগুণ। সমিতির সদস্যদের আজগুবী ও গোয়েবেলসীয় অপপ্রচার; অন্যদিকে এই সকল অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে জনগণের সপক্ষে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারীদের সোচ্চারিত কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দিতে গণতন্ত্রের নামে কোন সে কালো হাত আজ উদ্যত? জনগণ, কেবলমাত্র জনগণই তার বিচার করবে। এ যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাকে অবশ্যই গড়ে তুলতে হবে। আর এর জন্য সময়ও নিশ্চয়ই দিতে হবে। কোন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী না নিয়ে পত্র-পত্রিকায় বক্তব্য হাজির করলেই কি দেশ গড়া যায়? না তার জন্য চাই বাস্তবমুখী কর্ম সূচীর বাস্তবায়ন? তিন দিনের কোন অনাহারী, ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে যদি বলা হয়, "কাস্তে কোদাল হাতে নাও, এসো দেশ গড়ি" এটা কি তার প্রতি নির্মম পরিহাস হয় না।

অবশ্য এও মানতে হবে, সময় নেয়ার নামে বা দেশ গড়ার অজুহাতে সব সমস্যাকে এক খাতে ফেলে বিচার করা যায় না। সমস্যার দু'টি দিক আছে। কতক সমস্যা আছে যা ক্রমে ক্রমে সমাধান করতে হবে। তা জরুরীভিত্তিক সমস্যা বা আশু সমস্যা। আজকের সবচাইতে জরুরী সমস্যা কি? নিশ্চয়ই সবাই একমত হবেন যে খাদ্য সমস্যাই আজকের সবচাইতে জরুরী সমস্যা। অবিলম্বে খাদ্য সমস্যাকেই বর্তমানের সবচাইতে জরুরী সমস্যা হিসেবে ধরে নিয়ে আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে দ্রব্য মূল্যের উর্ধগতি রোধ, স্বল্পমূল্যে জিনিষপত্র সরবরাহ, গ্রামে, গ্রামে পূর্ণ রেশনিং ব্যবস্থা চালু, দেশে ফিরে আসা ক্ষতিগ্রস্তদের আশু পুনর্বাসন, নগদ অর্থ সাহায্য প্রদান, সাহায্য সামগ্রীর সুষম বণ্টন, টেস্ট রিলিফের কাজ চালু, বিন্যমূল্যে চিকিৎসা প্রদান, সকল অনাচার-অবিচার বন্ধ কল্পে ভয়ভীতিহীন নিরপেক্ষ প্রশাসন যন্ত্র স্থাপন, দুর্নীতি মুক্ত আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থা প্রবর্তন, সৎব্যক্তি সমন্বয়ে সর্বদলীয় গণকমিটি গঠন করে সীমান্তে

চোরাচালান কঠোর হস্তে দমন ও নির্মূলকরণ, মুনাফাখোর, সুদখোর মহাজন টাউট ও অসৎ ব্যবসায়ীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি বিধানের আশু ব্যবস্থা গ্রহণ করে আসন্ন মহাদুর্ভিক্ষের কবল থেকে বিপন্ন জাতিকে রক্ষা করা হোক। নচেৎ এর যেকোন ভয়াবহ পরিণতির জন্য বাংলার জাগ্রত জনতা অবশ্যই সরকারকেই দায়ী করবে।

পৃথিবী ভীষণ কালো

কাদের শাহ

একটা লোক ঃ
জনতার ভীড়ে পা টেনে টেনে,
লাঠিতে ভর করে,
রোজই দেখি আসে–
আমাদের পাড়ায়।

মুখটা শুকনো,
গা নগ্ন; ছিন্ন একখণ্ড–
ন্যাকড়াই শুধু আলতো ভাবে
লজ্জা স্থান ঢেকে রাখে।

গতকাল তাকে দেখলাম ঃ
যেন দেখলাম বাঙলাকে–
আর দেখলাম রক্তশোষক জোঁক;
উঁচু দালানের রেলিং ঘেঁষে–
লালা গিলছে।

কোন এক দালান থেকে–
ক্লাসিক ড্যান্সের মিউজিকে;
সারা উপরতলাটা ঝলমল
নীল পরীদের মেলায়।

নীচে-ড্রেনের দুর্গন্ধে
শুধু একফোটা পানির অভাবে,
তখন সেই লোকঃ
শেষ নিঃশ্বাস ফেলতে
ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে।

দূরে দাঁড়িয়ে আমরা শুধু দেখছিই
পৃথিবীটা কি ভীষণ কালো–
আর যমকালো তার
জীবন্ত মানুষগুলো।

সামাজিক নিরাপত্তা কবে ফিরে আসবে?

হানাদার পাক-বাহিনীর শেখানো লুটতরাজ, হত্যা, জবর-দখল আর অত্যাচার এখনো সারাদেশে অপ্রতিহত গতিতে চলছে।

পাবনা থেকে পাওয়া খবরে প্রকাশ, শহরের বিশেষ করে ময়লাস্তূপীর এলাকায় প্রায়ই মানুষের লাশ পড়ে থাকতে দেখা যায়। মুক্তিবাহিনী বলে পরিচয় দিয়ে কতিপয় দুষ্কৃতিকারী এখনো সারা শহরে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে রেখেছে। এরা অবাঙালীদের ঘরবাড়ী দখলের সাথে সাথে জনগণের বিশেষ করে মওলানা ভাসানী সমর্থকদের ঘরবাড়ীও দখল করছে। এরা নারী অত্যাচারেও পাক-বাহিনীর পেছনে নয়। পাবনার এডোয়ার্ড মহাবিদ্যালয় থেকে ছাত্রী অপহরণের ঘটনা ঘটে চলছে। এদের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে জনৈকা ছাত্রী সম্প্রতি জানিয়েছেন যে, দুষ্কৃতিকারীরা তাদের উপর অকথ্য পাশবিক এবং দৈহিক অত্যাচার চালিয়েছে। ছাত্রীটি এখন হাসপাতালে।

আর এক খবরে প্রকাশ, পাবনা শহর থেকে প্রায় ১০ মাইল দূরের একদন্ত গ্রামে সম্প্রতি এই জাতীয় নয় জন দুষ্কৃতিকারী জনগণের হাতে ধরা পড়ে। এরা উক্ত গ্রামের জনৈক ব্যক্তির বাড়ী থেকে অর্থ এবং মালপত্র ট্রাকে লুট করার সময় গ্রামবাসীরা সাহসিকতার সাথে তাদের মোকাবেলা করেন। দুষ্কৃতিকারীরা পিস্তল থেকে গুলি বর্ষণ করতে থাকলেও জনগণ ভয় না পেয়ে তাদেরকে ঘিরে ফেলেন এবং ৯ জনকে আটক করেন। জনতার প্রহারে একজন দুষ্কৃতিকারী ঘটনাস্থলেই মারা যায়। বাকী সকলকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

যশোর থেকে পাওয়া খবরে প্রকাশ, যশোর শহর এবং তার আশেপাশে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঘটেছে। গত ১১ই মার্চ থেকে ১৫ই মার্চের মধ্যে পাঁচ দিনে বিভিন্ন স্থানে ১৪টি সশস্ত্র ডাকাতি অনুষ্ঠিত হয়; ফলে ৩ জন হতাহত হয়েছে। এক খবরে বলা হয়, গত ১৫ই মার্চ রাতে যশোর শহরের দক্ষিণে চাঁচড়া পুলিশ ফাঁড়ির কাছে ২০/২৫ জনের একটি সশস্ত্র দুষ্কৃতিকারী দল একই সাথে পরপর পাঁচটি বাড়ীতে হানা দেয়। দুষ্কৃতিকারীদের একটি দল সমগ্র এলাকাটি ঘিরে রাখে, অন্য দলটি সরকারী কাজে এসেছি, জানিয়ে বাড়ীগুলি থেকে লোকজনদের বাইরে এনে বেঁধে ফেলে এবং লুটপাট করে প্রায় দশ হাজার টাকার মালপত্র নিয়ে পালিয়ে যায়। জনগণের অভিযোগে প্রকাশ, সামান্য দূরে অবস্থিত চাঁচড়া পুলিশ ফাঁড়িতে বহুবার খবর দেয়া সত্ত্বেও তারা সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেনি।

আওয়ামী লীগ সরকারের কয়েকটি ডিগবাজি

জনপ্রতিনিধি সরকারের ডিগবাজি দেশবাসীর জন্যে বরাবরই দুঃখজনক। এতে গণতন্ত্রের বদলে স্বেচ্ছাচারিতা জেঁকে বসে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আওয়ামী লীগ সরকার তা এড়াতে পারছেন বলে মনে হচ্ছে না।

স্বাধীনতার পর বেশ কয়টি ডিগবাজির নজীর তারা কৃতিত্বের সাথে দেখিয়েছেন। কৃতিত্বের প্রশ্ন আসে, কারণ জনগণকে তারা বুঝিয়েছেন, এসব ডিগবাজি নয়, ভেল্কিবাজিও নয়–নিখাদ দেশপ্রেম। জনগণ তা মেনে নিয়েছে কিনা তা অদূর ভবিষ্যতেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমান মোমেনশাহীর জনসভায় অসাধু ব্যবসায়ীদের সাতদিনের সময় দিলেন–বাজার ঠিক করতে হবে। এর পাঁচদিন কেটে গেলে আওয়ামী লীগের কাউন্সিল সভায় আবার সাত দিনের কথা বললেন–দ্রব্যমূল্য নাগালের মধ্যে রাখতে হবে, নইলে সব লাইসেন্স বাতিল করা হবে। হুমকি কিংবা নির্দেশটুকু আলবৎ ভাল কিন্তু এমনিভাবে দিন বাড়াতে থাকলে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে না হলেও জনগণের জন্যে মুশকিল। পত্রপত্রিকায় ইতিমধ্যে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়া হয়েছে কেরোসিন, সাবান, মশলা, কাগজ, কালি, সিগারেট ইত্যাদি সহ সবরকম জিনিষপত্রের অভাব ও মূল্য বৃদ্ধির জন্য কোন্ বাজার ও কোন্ মহল দায়ী। কিন্তু সেই পথ লক্ষ্য করে স্বীয় কীর্তি ধ্বজা ধরে এগুলে তো খোদ আওয়ামী লীগের মহাজ্ঞানী মহাজনরাই ফেঁসে যান। তাই জনগণকে বোঝানোর জন্যে শুধু হুমকি আর নির্দেশ। বাকী সব খোদার মর্জী।

আওয়ামী লীগ সরকারের একটি জবরদস্ত ডিগবাজি হলো মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে জাতীয় মিলিশিয়া গঠন করবার কথা ঘোষণা করেও সরকার তা পাল্টে ফেললেন। অজানা অহেতুক ভয়েই হউক আর দূরদর্শীতার অভাবেই হউক তারা মিলিশিয়া গঠনের পরিকল্পনা বাতিল করলেন। অসহযোগ আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারীদের অনুপস্থিতিকালীন সময়ের বেতন দিয়ে দেয়া হবে ঘোষণা করেও সরকার তা উইথড্র করলেন। ফান্ড নেই-এটা সবাই জানে। কিন্তু ওয়াদাটি আজ হউক কাল হউক পালন করতে পারলেই কি ভাল হত না? ১০০ ও ৫০০ টাকার নোট জমা না দিতে বার বার অনুরোধের যারা মর্যাদা দিল তাদের জন্য কিছু করণীয় আছে বলে সরকার তো একবারও ভেবে দেখলেন না। মাঝখান থেকে

গ্রামের গরিব চাষী ও স্বল্প পুঁজির ব্যবসায়ীরা পথের ভিখারী হলো। ছাত্রদের জন্য মঙ্গলামঙ্গল না ভেবেই বেতনের হার বাড়িয়ে দিলেন। অবশ্য প্রবল প্রতিবাদে সরকার তা পরিবর্তন করতে বাধ্য হলেন। কৃষকদিগকে তিন লক্ষ গরু বিনামূল্যে দানের কথা ঘোষণা করে সরকার আবার তা থেকে সরে দাঁড়ালেন। একবার ঘোষণা করে বাহবা নেন। আবার বেসামাল অবস্থা দেখে চুপ করে যান। মজার ব্যাপারে হয়েছে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে। তা হলো দালাল নিয়োগ। সরকারী প্রশাসনে ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে প্রশাসক নিয়োগ করতে গিয়ে আওয়ামী লীগ সরকার কোথাও কোথাও চরম ধৃষ্টতা দেখিয়েছেন। তাই দেখা যায় কোন কোন পদে অসাধু চাটুকার কিংবা পাকিস্তান আমলের দালাল বহাল তবিয়তে বসে আছেন। এর প্রতিবাদ জানানো হচ্ছে। বিভিন্ন মহল থেকে আপত্তিও উঠেছে। কিন্তু শেখ মুজিবের জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকারকে শুধু জনসাধারণের উপর নির্ভর করলেই চলবে না–কিছু তোষামোদকারী কুটিল বুদ্ধির সমঝদারও দরকার। তাই কিছু না ভেবেই তমঘাধারীদের একটি লিস্ট করে তাদের বরখাস্তনামা ঘোষণা করবার পরও মাথাটা ঠাণ্ডা করে ফেলে দেয়া থুথু আবার চেটে নিতে হলো। মুজিব সরকার বড়ই রংবাজী করছেন। কিন্তু শতকরা ৯৮ খানা ভোট পাওয়ার মানে এই নয় যে জনগণের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলার একটা অপ্রতিরোধ্য শক্তি হস্তগত হলো। মওলানা ভাসানীর ভাষায়, এসব আবর্জনা ও সংক্রামক ব্যাধি দূর করতে না পারলে আওয়ামী লীগ সরকারের পরিণতি মুসলিম লীগ সরকারের মতই হবে।

কালিহাতি থানা ন্যাপ কমিটি

নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতী থানা ন্যাপ কমিটি গঠিত হয়েছে। তাঁদের নাম ঃ জনাব নূরুল ইসলাম খান (আহ্বায়ক), জনাব মীর ফরহাদ আলী, জনাব নজিবর রহমান খান, মৌলভী আবদুল মালেক, জনাব মোঃ হজরত আলী, জনাব মোঃ মেহের আলী, ডাঃ মহিউদ্দিন খান, জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন, জনাব ময়েজউদ্দিন মিয়া, জনাব ইছব আলী মিয়া, বাবু নগেন্দ্র কুমার নাথ।

এতিমখানার অভ্যন্তরে

টাঙ্গাইল শহরের দক্ষিণ দিকের শেষ প্রান্তে বিরাট এলাকার সামান্য কিছু স্থান জুড়ে রয়েছে মাত্র ২০ কক্ষ বিশিষ্ট একটি দ্বিতল ভবন। এখানে স্থান পাবার যোগ্য ছেলের সংখ্যা কয়েক হাজার হলেও সুযোগ পেয়েছে মাত্র ১৫০ জন এতিম। এই অর্থে এরা সৌভাগ্যবান। কিন্তু এদের দুর্ভাগ্য খুব কম লোকই অবগত।

এই এতিমখানার দ্বিতল ভবনটিতে ২০টি ঘর রয়েছে। তার মাত্র ১২টি ঘর এতিমদের থাকার জন্যে। এখানে অত্যন্ত অপরিসর প্রতিটি কামরায় গড়ে ৬জন ছেলেকে থাকতে হয়। খাবার ঘর বলে পরিচিত ঘরটিতে রয়েছে অল্পবয়েসী ৬০টি ছেলে। এরপরও স্থানাভাবে অসংখ্য ছেলেকে বারান্দায় রাত কাটাতে হয়। এমনকি পৌষ-মাঘ মাসের প্রচণ্ড শীতের মাঝেও দু'টি করে কাটা কাটা লোমের কম্বলই এদের শীত-গ্রীষ্মের সম্বল। শেষবার বালিশ এবং চাদর এরা পেয়েছিল ৫/৬ বছর আগে-তাই এখন বালিশের তুলা ঝরে, চাদর ছিঁড়ে গেছে। গোটা এতিমখানা ঘুরে অফিস ঘরগুলো ছাড়া কোথাও কোনো টেবিল বা চেয়ার দেখা যাবে না। তাই

ছেলেদের বই-খাতাগুলো বিছানায়, জানালায় অথবা মেঝেতে গড়াগড়ি খায়।

অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে, খাওয়া বাবদ প্রতিটি ছেলের জন্য সরকার মাত্র ২৫ টাকা করে দিয়ে থাকেন। এই টাকা থেকে প্রতিটি ছেলে দৈনিক ১ ছটাক মুড়ি (দুই বেলায়), ৩ ছটাক আতপ চাউলের ভাত আর ৩ ছটাক আটার রুটি পেয়ে থাকে। সোমবারে খাশির এবং শুক্র ও রোববারের সন্ধ্যায় ১ ছটাক করে গরুর মাংস পায়। মঙ্গলবারে দেয়া হয় সামান্য মাছ, বৃহস্পতিবারে ১টি করে হাঁসের ডিম আর বুধবারে পাওয়া যায় .৫ পোয়া করে পানি মিশ্রিত দুধ। বাকি প্রতি বেলায় দেয়া হয় গতানুতিক নিরামিষ। এখানে রান্নার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের দারুণ অভাব। মাত্র দু'জন বাবুর্চি থাকার ফলে ছেলেদেরকেই সব কাজ করে নিতে হয়। এতিমখানার ছেলেরা নিঃসন্দেহে করুণার পাত্র, কিন্তু তাই বলে

এখানে বিনা চিকিৎসায় ছাত্র মারা যায় ঃ চরিত্রহীন বহিষ্কৃত ছাত্র পুনঃ প্রবেশের অধিকার পায়

অবহেলার পাত্র হওয়া উচিত নয়। এ সব খাবার খেয়ে আর যাই হওয়া যাক না কেন, অন্ততঃ সুস্থ মানুষ হওয়া যায় না। আর তাই এখানে প্রতিটি ছেলে প্রচুর অপুষ্টিতে ভুগছে।

এখানে শিক্ষার জন্য দু'টি ব্যবস্থা রয়েছে ঃ সাধারণ শিক্ষা এবং ব্যবহারিক শিক্ষা। পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা এতিমখানাতেই রয়েছে। পাঁচটি শ্রেণীর জন্য মাত্র ৩ জন প্রাথমিক শিক্ষক রয়েছে। এদিকে ক্লাশের জন্য আলাদা ঘর না থাকায় ছেলেরা বিছানায় বসে বসেই শিক্ষা লাভ করে থাকে। শিক্ষকের অভাবে ক্লাশ নিয়মিত হয় না–ওদিকে আছে শিক্ষকদের অযত্ন আর অবহেলা।

পঞ্চম শ্রেণীর উপরে যারা পড়ে, তারা বাইরের যেকোন বিদ্যালয়ে পড়তে পারে। এ জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সরকার নিয়ে থাকেন। বিদ্যালয়ের বেতনের জন্য প্রতিটি ছেলে পেয়ে থাকে মাত্র ২.৫০ টাকা করে আর বই-খাতার জন্য (তেল-সাবানসহ) মাসে মাত্র ২.৫০ টাকা। ব্যাপারটা দুঃখজনক হলেও যথেষ্ট হাসির খোড়াক জোগায়। পঞ্চম শ্রেণীর ওপর কোন শ্রেণীর বেতনই ২.৫০ টাকা না–আর নবম শ্রেণীর বেতন তো ৮/৯ টাকা আর সরকার দিয়ে থাকেন মাত্র ২.৫০ টাকা।

কাগজে-কলমে নয় শুধু মুখে মুখেও বলা হয়, সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থাও এখানে আছে। এখানে ছেলেদের শেলাই শেখানো হয়, তাঁতে কাপড় তৈরী এবং কাঠের চেয়ার টেবিল তৈরী শেখানো হয়। এক্ষেত্রেও অভিযোগ। এতিমখানার ছেলেদের সবচাইতে যেটা দুর্ভাগ্যের কারণ তাহলো এদের চিকিৎসার অব্যবস্থা। এই প্রতিষ্ঠানটির কোন নিজস্ব ডাক্তার নেই। প্রতিটি ছেলের জন্য অনুমোদিত ৩০ টাকা থেকে একটা অংশ কেটে স্থানীয় একজন সরকারী ডাক্তারকে মাসিক ৫০/- টাকা হিসেবে ঠিক করা আছে। এই ডাক্তার ভদ্রলোকটি কোনদিনও এখানে পদধুলি দেন না। হঠাৎ কোন ছেলে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লে তাকে নিয়েই ছুটতে হয় ডাক্তারের সন্ধানে। একটি দুর্ঘটনার উল্লেখই এই প্রসঙ্গে যথেষ্ট। গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী বিকেলে বেলাল হোসেন নামে একটি তৃতীয় শ্রেণীর ছেলে হঠাৎ ভীষণ পেটের ব্যথায় আক্রান্ত হয় (প্রকৃত রোগের নাম বা কারণ আজো জানা যায়নি)। যথাসময়ে সুপারিন্টেন্ডেন্ট সাহেবকে খবর দেয়া হয়। তিনি পরদিন সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করার নির্দেশ দেন। ছেলেটি ঐ রাতেই বিনাচিকিৎসায় ছটফট করতে করতে মারা যায়।

এবার পোষাক প্রসঙ্গ। পাকিস্তানী আমলে ৭০ সন পর্যন্ত প্রতিটি ছেলেকে বছরে ২টি করে পাজামা দেওয়া হতো। ৭১ সনে এই নিয়ম বাতিল করে নতুন নিয়ম করা হয়-২টি সার্ট ২টি পাজামা এবং ১টি করে গামছা। কিন্তু ৭১ সনের প্রথম থেকে আজ পর্যন্তও কোন কাপড় পাওয়া যায়নি। ছেলেদের তাই পুরনো ছেঁড়া কাপড় পরে দিন কাটাতে হয়।

এই এতিমখানায় অন্যান্য অব্যবস্থাগুলোর মাঝে যেটি প্রধান তাহলো পানির। দেড়শো ছেলের খাবার পানির একমাত্র অবলম্বন হলো একটি নলকূপ। প্রায় ২০ হাজার টাকা ব্যয়ে নির্মিত একটি পানির ট্যাংক থাকা সত্ত্বেও ছেলেদের এই দুর্ভোগ পোহাতে হয়। পানি সরবরাহ কর্তৃপক্ষের গাফলতিই এজন্য দায়ী। এখানে ছেলেদের তাই গোছলের একমাত্র ভরসা একটি পুকুর-যেখানে পানির গভীরতা মাত্র দেড় ফুট। এক সাথে কয়েকজন গোছল করতে গেলে তাই শরীরে বালি আর কাদা নিয়ে ফিরতে হয়।

এতিমখানার ভবনটিতে বিদ্যুতের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু বিগত অনেক দিন যাবত কর্তৃপক্ষের ঢিলেমির জন্য ছেলেরা মোমবাতির আলোতে রাত কাটিয়েছে।

এতিমখানার দেড়শো ছেলের জন্য মোট ২২জন কর্মচারী রয়েছেন। এদের মাঝে সহকারী সুপারিন্টেন্ডেন্টের পদটি খালি পড়ে আছে ৬৯ সন থেকে। আজও ঐ পদে কাউকে নিয়োগ করা হয়নি। আইনানুযায়ী কোন শিক্ষক বা কর্মচারী ক্রমাগতভাবে চার বছরের বেশী থাকার নিয়ম নেই; অথচ এখানে এমন শিক্ষকও আছেন যিনি বারো বছর এই টাঙ্গাইলেই চাকুরী করছেন।

ছাত্রদের অভিযোগ থেকে জানা গেছে, ৩ জন বিশেষ কর্মচারীর কার্যকলাপে এই এতিমখানায় দুর্নীতি প্রশ্রয় পেয়ে আসছে। এই কর্মচারীত্রয় কতিপয় চরিত্রহীন ছেলেকে প্রশ্রয় দিয়ে থাকেন। একটি ঘটনার বিবরণে প্রকাশঃ কিছুদিন আগে চুরি এবং চরিত্রহীনতার অভিযোগে একটি ছেলেকে সমাজকল্যাণ সংগঠক সাহেব বহিষ্কার করে দিলেও পরবর্তীকালে তাঁর কর্মাবসানের সুযোগে ঐ কর্মচারীত্রয়ই ছেলেটিকে আবার এতিমখানায় ফিরিয়ে এনেছেন। ফলে ছাত্রদের মনে তীব্র অসন্তোষ দেখা দিয়েছে।

প্রেস কর্মচারী ইউনিয়নের নতুন কার্যকরী পরিষদ

সম্প্রতি টাঙ্গাইল জেলা প্রেস কর্মচারী ইউনিয়নের সাধারণ সভা ও প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলন শেষে জনাব এছরাফুল আলম বাদলকে সভাপতি, জনাব এস এম রেজাকে সাধারণ সম্পাদক এবং জনাব একেএমএ রহমান ও জনাব মোঃ সাদেককে সহ সম্পাদক করে আগামী এক বছরের জন্য একটি নতুন কার্যকরী পরিষদ গঠন করা হয়।

ভাসানীর বাণী

বিনা বিচারে কাউকে শাস্তি দেয়া চলবে না। নকসাল কিংবা অবাঙালী যেই হউক দোষী সাব্যস্ত হলে ফাঁসি কিংবা দীপান্তর পর্যন্ত দিতে পার।

হক-কথা

২৬শে চৈত্র, রবিবার

নকসাল-বধ-বয়ান

বছর কয়েক আগে পিণ্ডির জনাব আইউব খান বাংলাদেশে গৃহযুদ্ধের হুমকি দিয়া যেভাবে 'অস্ত্রের ভাষায়' কথা বলিয়াছিলেন, গত ৩১ মার্চ প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমান খুলনার জনসভায় তাহারই পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, নকসালদিগকে ধর এবং গুলি কর। ছাড়পোকার কামড়ে অতিষ্ট হইয়া মানুষ যেমন 'ধর-মার' নীতি গ্রহণ করে প্রধানমন্ত্রী তাহাই অবলম্বন করিতে অনুসারীদিগকে নির্দেশ দিয়াছেন।

শেখ সাহেবের নির্দেশটি অনেক কারণে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমতঃ তিনি প্রধানমন্ত্রী। তাই নির্দেশটি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক হত্যা সরকারী অনুমোদনের শামীল হইয়া পড়িয়াছে। দ্বিতীয়তঃ সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশে নকসালী নামে পরিচিত কোন দল বা মহল সত্যিসত্যিই অহেতুক ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ চালাইয়া যাইতে থাকিলে আওয়ামী লীগ ছাড়াও অন্যান্য দেশপ্রেমিক দলকে সজাগ তৎপর হইতে হইবে। কারণ কর্মধারার প্রচণ্ডতা মানুষকে শান্তি ও সমৃদ্ধি হইতে দূরে লইয়া যায় তাহার স্বরূপ সকল দলের উদ্যোগে জনসমক্ষে তুলিয়া ধরিয়া জনগণকে সচেতন করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ যাহারা নকসালী প্রথাকে ভালবাসেন এবং তাহার প্রতিষ্ঠার রক্তিম খোয়াব দেখেন তাহাদিগকে সাবধান, সামাল এককথায় বাস্তবানুগ হইতে হইবে। প্রধানমন্ত্রীর একটি বক্তব্যেই উপরোক্ত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। স্বাভাবিকভাবেই ধারণা পোষণ করা যাইতে পারে যে সরকার নকসাল নিধন অনুমোদনোত্তর পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করিয়া প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আগামী দিনের কর্মসূচী নির্ধারণ করিবেন। কিন্তু এই নির্দেশ কেন হইল আমরা তাহাই ভাবিয়া পাই না। বাংলাদেশে নকসালী পরিচয় দিয়া যাহারাই যাহা করিয়া থাকুন না কেন নকসালবাড়ীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ ও পদ্ধতিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত নিরবিচ্ছিন্ন কর্মসূচীর ভিত্তিতে কোন এ্যাকশন বাংলাদেশে সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া কেহই দাবী করিতে পারিবে না। কিন্তু তবুও প্রধানমন্ত্রী সেই বলিষ্ঠ আন্দোলনের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া কার্যতঃ তাহাতে উদ্যোগী হইতে বিদ্রোহী মনকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। ইহা যদি সত্য না হইয়া থাকে তবে বলিতে হইবে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী ডাকাত-বদমাশদের সাথে নকসালদের তুলনা করিলে খুশী হইবেন জানিয়া বাংলাদেশের কল্পিত শক্তির উদ্দেশ্যে এই হুমকি দান করা হইয়াছে। অথবা ইহাও যদি অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য না হইয়া থাকে তবে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে নিশ্চয়ই বামপন্থী রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের উপর (অবশ্যই বাদামী সমাজতন্ত্রীদের জন্য নহে) পরিকল্পিত গজব নাজিল করিতে একটি অজুহাত সৃষ্টির প্রচেষ্টা চলিতেছে মাত্র। তবে আমাদের বিশ্বাস, শেখ সাহেব নির্যাতন ও দমননীতির মনস্তত্ত্ব জানেন। এহেন অশুভ পরিকল্পনা শুধু তাহার সরকারের নহে গোটা বাংলাদেশবাসীর জন্য একটি অস্বস্তিকর পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটাইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কারণ, মওলানা ভাসানীর ভাষায়, কাহারও বুকে নকসাল বলিয়া কোন সীল মারা থাকে না। রাজনৈতিক খুনের অনুমোদন পাইয়া ব্যক্তিগত স্বার্থকে কেন্দ্র করিয়া সর্বত্র সশস্ত্র সংঘর্ষ দানা বাঁধিয়া উঠিলে দুনিয়ার কোন জনপ্রিয় সরকারই তাহা বিনা রক্তপাতে স্তব্ধ করিতে পারিবে না। প্রধানমন্ত্রী তাহা একবার ভাবিয়া দেখিবেন কি?

কলকী সমাচার

॥ গাঁজা বাবা ॥

ডানপন্থীরা কি করিয়া বামপন্থী হইল

ছেলেবেলায় কিভাবে পড়িয়াছিলাম সূর্যোদয়ের সময় পূর্বদিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইলে ডানদিকে দক্ষিণ, বাম দিকে উত্তর, পশ্চাতে পশ্চিম। প্রক্রিয়াটি অদ্যাবধি সঠিক রহিয়াছে বলিয়া

আমার বিশ্বাস হয় না। কি করিয়াই বা থাকিবে? সবকিছুই যে পরিবর্তনশীল। অবশ্য বলা বাহুল্য গাঁজা ব্যতিরেকে এককালের বৈজ্ঞানিকদের চ্যাম্পা পৃথিবী গ্যালিলিও বলিয়া গেলেন গোল। এককালের বৈজ্ঞানিকরা ইহাও বলিয়াছিলেন সূর্যের তেজ আস্তে আস্তে কমিয়া যাইতেছে। আবার এ্যাটমিক কিউবানওয়ালা বলিতেছেন ইহা সংঘটিত হইতেছে না। এই সকল তত্ত্ব কথা লইয়া আমি মোটেই ফিকিরগ্রস্ত নই। তবে মোদ্দা কথা এই বুঝি, ডান বাম উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম উর্ধ্ব অধঃ বলিতে কিছুই নাই। আমি ইহাই আপনাদিগকে বুঝাইয়া দিতেছি। এখন ধরুন যদি আপনি মাথা নীচে দিয়া সূর্যোদয়ের সময় পূর্বদিকে মুখ করিয়া ঠ্যাং দুইটি উপরে তুলিয়া দেন তাহা হইলে অবস্থা কি দাঁড়াইবে? এই দক্ষিণ এই উত্তর উর্ধ অধঃ বলিতে যাহা বুঝায় তাহা কি ঠিক রহিল? না, আপনি শূন্যে পা দিয়া অর্থাৎ আপনি উর্ধের উপর পায়ে ভর করিয়া অধঃ পৃথিবীকে মাথায় করিয়া দাঁড়াইবার ফলে কাহারও দক্ষিণ আপনার উত্তর, কাহারও উত্তর আপনার দক্ষিণ হইয়া গেল। কি বিষয় ভদ্র মহোদয়গণ আমাকে গাঁজাখোর বলিয়া গালি দিতেছেন কেন? তা দিন। তবে আমি নোবেল পুরস্কার আশা করিতেছি। আপনারা না বুঝিয়া থাকিলে বুঝাইয়া দিবার কিঞ্চিৎ প্রয়াস পাইতে পারি। মনে করিয়া দেখুন নোবেলমারা শায়েরী আলেমগণ কি একই কথা বলেন নাই? মার্কিনীলোক বিলাতী শায়ের সাজিয়া বলিতে শুরু করিলেন–" গেছে যে কাল আর আজকের চলন্ত বর্তমান কাল উভয়েই আগামীকাল অর্থাৎ আজই গতকাল কালই আজ আর গত পরশুই কিনা আগামীকাল। আমি কলকীর দিব্য দিয়া প্রতিজ্ঞা করিতে পারি কবি টি, এস এলিয়ট গাঁজা কলকীর চাইতে অনেক গুণে কম হর্সপাওয়ারের মাল পাইপ টোব্যাকো পান করিয়াই ইহা লিখিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে তিনি আরও বলিলেন শুরুতেই আমার শেষ শেষেতেই আমার শুরু। নবেলমারা বাংগাল শায়েরী বলছেন "সীমার মাঝে অসীম তুমি"–হাসি পায়ঃ শুনি কথা-গাঁজা ব্যতিরেকেই এতখানি? পারস্য মুল্লুকের সাদী আবার আগেই বলিয়া রাখিয়াছিলেন "আমিই তুমি তুমিই আমি।" বেলেল্লা নজরুল ইসলামও কি আর কম করিয়াছে। সে বলিয়াছে 'তাহার সে' আর আর 'অন্য কাহারও কেউ' একই। এই ধরনের কথাবার্তা লিখিয়া বা বলিয়া কেহ কেহ নবেল প্রাইজ মারিয়াছেন। কেহ কেহ ইতিহাসে নাম রাখিয়াছেন। আমি কলকীতে দম খেঁচিয়া ডানকে বাম বামকে ডান বলিয়া থাকিলে কোনও মহাচীনকে অশুভ করিয়া ফেলি নাই। বরং আবার কলকীর জন্য যাদুঘরে একটা দাগ নম্বর আশা করিতেছি।

শুন্যে পা রাখিয়া মাটির পৃথিবীকে মাথায় তুলিলে আপনি উল্টিয়া গেলেন বলিয়া ধারণা করা হইবে। আপনি যদি মাটির সঙ্গে জড়িত মানুষকে তিনতলাবাসী আদমজীদের (আদম! ওরফে জানুয়ারজী?) হইতে আলাদা করিয়া দেখিতে চাহেন তবে সেই মাটিতে বসবাসকারী তুচ্ছ ব্যক্তিবর্গের বেদনা আমার মাথায় আসিল বিধায় আপনাকে বলা হইবে বামপন্থী।

এহেন তুচ্ছ বামপন্থীরা এককালে যখন 'সমাজতন্ত্র সমাজতন্ত্র' বলিয়া আটারী ভেইন ফুলাইত, ব্যাঙ্ক, বীমা, জাতীয়করণের জন্য লাফ-ফাল পাড়িত, তখন তাহাদিগকে সেই দেশে কমিউনিস্ট বলিয়া গালি দেওয়া হইত। কিন্তু তাজ্জব বলিতে হয় সেই দেশের গালি বাংলাদেশে বুলি হইয়াছে বলিয়াই শুধু নয় বরং সম্প্রতিকালে সেই দেশেও বামের যাতায়াত পন্থাটি বেজায় ফাঁক হইয়া গিয়াছে বলিয়াই, আর তাহা সম্ভবত চীন দেশের এত কোটি লোকের সঙ্গে বেজায় অংগাঅংগি ঢলাঢলি দোস্তীর ফলেই হইয়াছে। তাহা

হউক। সুশ্রী ভুট্টো চীনাদের এহেন দোস্তীর পথ আরও সুগম করায় পাকিস্তানী ডান একেবারে বাম হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এদিকে কলকীতে দম দিয়া আমিতো আরও বেশী তাজ্জব মানি এই কথা ভাবিয়া যে ব্যাঙ্ক বীমা জাতীয়করণের নামে এককালে যাহারা দু'চার কথা বলিতেন তাহাদিগকে যাহারা বামপন্থী বলিয়া গালি দিতেন এবং এই সকল বামপন্থীদিগকে আমাদের মতই গৃহকোণে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে যাহারা খুশী হইতেন বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ায় সেই সকল ব্যক্তিরাও এই বামপন্থী কায়দাটিকে হালাল করিয়া ফেলিয়াছেন। কিংবা এই পন্থাটিকে তাহারা এখন তুচ্ছ বাম না ভাবিয়া ডান ভাবিয়াছেন। অথবা পৃথিবীর কতকাংশ মাথায় তুলিয়া লইয়াছেন। কিন্তু পুরাপুরিভাবে ঠ্যাং উপরে তুলিতেছেন না। এখন আমার বলিবার কথা শুধু এই, আপনারা যাহারা গাঁজা না খাইয়া দেরীতে বুঝেন আমি তাহা গাঁজা খাইয়া ধ্যানে বুঝি। অতএব গাঁজার নামেই বলিতেছি মাথা যখন নীচের দিকে দিয়াছেন এখন কুঁজা হইয়া মাটিতে পা রাখিতে চেষ্টা করিলে সকল নিয়মে ব্যতিক্রম হইবে। তাই আপনারা শূন্যে সম্পূর্ণ ভর দিন। যাহাদের কিছুই নাই তাহাদিগকেই সম্পূর্ণ সম্বল করুন। মাটির পৃথিবীটাকে মাথায় তুলিয়া মেরুদণ্ড সোজা করুন এবং তৎসঙ্গে আপনার সম্পূর্ণ ডানকে বাম আর দক্ষিণকে উত্তর বানাইয়া ফেলুন। অবশ্যই আরাম পাইবেন নতুবা তাহা নাও পাওয়া যাইতে পারে।

ইন্দোনেশিয়ায় অসন্তোষের পূর্বাভাষ?

৩৬০০ দ্বীপের সমাহারে ইন্দোনেশিয়া এক দ্বীপমালা। খনিজ সম্পদ আর বাগিচা শিল্পে সমৃদ্ধ প্রতিটি দ্বীপ যেন এক একটি অমূল্য মুক্তোর দানা। প্রাকৃতিক রূপ বৈচিত্র্যও কম নয়। কিন্তু দীর্ঘ ছয় বছর আগে থেকে ইন্দোনেশিয়ার চেহারা পালটাতে শুরু করেছে। প্রেসিডেন্ট শোয়েকার্ণোর দেহরক্ষী উনতুং-এর ব্যর্থ অভ্যুত্থানের পর থেকে ইন্দোনেশিয়া বিষাদগ্রস্ত। সোভিয়েত এবং চীনের আশির্বাদপুষ্ট ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির পিকে আইএর উপর নির্যাতনের খড়্গ নেমে এসেছে সেই ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে। কমিউনিস্ট উচ্ছেদের নামে আপামর জনসাধারণের ওপর সেদিনের যে নির্মম পীড়ন চলেছিল তার সঙ্গে একমাত্র হিটলার এবং ইয়াহিয়ার অপকীর্ত্তিরই তুলনা চলে।

পরবর্তীকালে ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিস্টরা নাকি আত্মানুসন্ধানে বসেছিলেন। উনতুং-এর হঠকারীতাকে সেখানে তীব্রভাবে সমালোচনা করা হয়েছে। পার্টির আন্ত যুক্তফ্রন্ট নীতি এবং সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি মোহকেও কটাক্ষ করা হয়েছে এই আত্মসমীক্ষায়। উনতুং-এর ব্যর্থ অভ্যুত্থান স্থলবাহিনীর নায়ক সুহার্তোকে ক্ষমতায় আসতে সাহায্য করেছে। দীর্ঘদিন ধরে ইন্দোনেশিয়ায় মার্কিন লবির এই মাতব্বরটি এমনি ধরনের সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। ইন্দোনেশীয় রাজনীতির 'অসুখী পরিবার' নাসাকম থেকে উগ্র জাতীয়তাবাদী এবং মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা হাত মেলালো সুহার্তোর সাথে 'জাতীয়তা বিরোধী এবং নাস্তিক্যবাদী' কমিউনিস্টদের ভিটে ছাড়া করতে।

সেদিন যুব এবং ছাত্র সমাজের এক বিরাট অংশ হাত মিলিয়ে ছিল এদের সাথে। শুধু সেনাবাহিনী নয়, যুব-ছাত্ররাও এক বিরাট ভূমিকা নিয়েছিল কমিউনিস্ট নিধনে।

সুহার্তো মূলত কয়েকটি শ্লোগান দিয়েছিলেন– ১) কমিউনিস্ট নিধন ২) অর্থনৈতিক পুনর্গঠন এবং ৩) আইন শৃঙ্খলা রক্ষা। সেদিন চাকুরীর আশায়, নিরাপত্তার আগ্রহে বহু যুবক যোগ দিয়েছিল এই প্রতিবিপ্লবে। দেশের সমস্ত

কারাগারগুলি ভর্তি করেও বিভিন্ন দ্বীপের নতুন বন্দীশালার কাতারে কমিউনিস্ট অভিযোগে জনতাকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। অনাহারে এবং দৈহিক নির্যাতনে তাদের অনেকেই আজ মৃত্যুমুখী। এদের মধ্যে আছেন ইন্দোনেশিয়ার বহু কৃতি সন্তান-ঔপন্যাসিক, অধ্যাপক, চিকিৎসক, আইনজীবী ইত্যাদি।

এই রকম একটা দম আটকানো অবস্থার মধ্যে গত বছর জুলাই মাসে ইন্দোনেশিয়ার সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো। ১৯৫৫ সালের পর ঐ দেশে এই প্রথম নির্বাচন। সুহার্তো পন্থী 'সেকবার গোলক' দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করল– অতীতের সমস্ত নির্বাচনের রেকর্ড ম্লান হয়ে গেল।

সুহার্তোর এই নির্বাচনী সাফল্য (?) এবং গত ছয় বছর ধরে তথাকথিত অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কর্মসূচীকে দেশ বিদেশের সংবাদ জগতে অনেক গুরুত্ব দিয়েই প্রচার করা হয়েছে। বলা হয়েছে ইন্দোনেশিয়া 'রাহু মুক্ত' হ'ল কিন্তু সুহার্তো শাসনের ছয় বছর এবং সাধারণ নির্বাচনের অনধিক এক বছরের মধ্যেই ইন্দোনেশিয়া আজ আবার নতুন সঙ্কটের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। যে ছাত্রসমাজ ছিল সুহার্তোর দক্ষিণ হস্ত-তারা আজ আবার ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছে। সুহার্তোর স্ত্রী তিয়েন সুহার্তো ' ছোট্ট ইন্দোনেশিয়া' নাম দিয়ে একটি উদ্যান সাজিয়েছেন। বেসরকারী অর্থেই এটি নির্মিত হয়েছে। ছাত্ররা এটিকে নিতান্তই আর্থিক অপচয় বলে গণ্য করেছেন। বেআইনী হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা পথে পথে মিছিল করেছেন। বিভিন্ন সংবাদপত্র ছাত্রদের উৎসাহ জুগিয়েছে।

ইন্দোনেশিয়ার যুবকদের অন্ধকার বেকার জীবনে একটুও আশার আলো দেখাতে পারেননি মিঃ সুহার্তো। তিনি দেখিয়েছেন মুদ্রাস্ফীতি কমেছে, বিদেশী মূলধন বিনিয়োগ বেড়েছে তথাপি-সঙ্কট যেখানে ছিল সেখানেই থেকে গেছে।

কোন কোন পশ্চিমী বিশেষজ্ঞ বলেছেন এতে চিন্তিত হবার কিছু নেই। পশ্চিমের আর পাঁচটা যুব বিদ্রোহের মতই একে মিটিয়ে নেয়া যাবে। কিন্তু প্রেসিডেন্ট সুহার্তো এতে নিশ্চিন্ত হতে পারেননি। এই ছাত্ররা একদিন অস্ত্রহাতে কমিউনিস্টদের খুন করেছে। তারা জানে সুহার্তোর আসল জোর কোথায়।

তাই চিন্তিত সামরিক নেতা সুহার্তো এবং সুমিত্রো সেনাবাহিনীকে সর্বদা তৈরী থাকতে বলেছেন। বঞ্চনার পাষাণ সরিয়ে ইন্দোনেশিয়ায় আবার যে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে সেটা কোন নয়া ইতিহাসের পূর্বাভাস নয়তো?

–স্বাধীন রায়

আপনার চিঠি

মড়ার উপর খাড়ার ঘা

জনাব সম্পাদক সাহেব,

গেল বর্ষায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ এলাকার ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর সরকারী আধা সরকারী কর্মচারীদের সমান ৬ কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য ১ মাসের আগাম বেতন দেয়ার জন্য সাবেক পূর্বপাকিস্তান সরকার সিদ্ধান্ত নেন যাহা ৩১ শে ডিসেম্বর ১৯৭১ ইং তারিখ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য। বাংলাদেশ হানাদার মুক্ত হবার পর স্বাধীন সরকার পূর্ববর্তী দখলদার সরকারের সিদ্ধান্ত বলবত রেখে উক্ত একমাসের মাহিনা আগাম গ্রহণের মেয়াদ ৩১ শে জানুয়ারী ১৯৭২ ইং পর্যন্ত বাড়িয়ে দেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় উক্ত একমাসের আগাম বেতন সমান ৬ কিস্তিতে পরিশোধের পরিবর্তে সমান ৩ কিস্তিতে পরিশোধ করার জন্য ফেব্রুয়ারী মাসের ২৯ তারিখে 'প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ' এর বরাত দিয়ে সংশ্লিষ্ট সচিবালয় এক আদেশ জারী করেন। আদেশে বলা হয় যে, ১লা মে, ৭২ অর্থাৎ এপ্রিল মাসের বেতন থেকে ৩ কিস্তি পরিশোধের আগাম মাহিনা বাদ দেয়া শুরু হবে। এছাড়াও চলতি বছরের ফেব্রুয়ারী মাসের বেতন থেকে বাধ্যতামূলকভাবে 'জেনারেল প্রভিডেন্ট ফাণ্ড হিসাবে বেতনের একাংশ কাটা হচ্ছে। বর্তমানে বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য যে হারে বেড়েছে এবং দিন দিন বেড়ে চলছে তাতে আমাদের মতো স্বল্প বেতনভুক্ত কর্মচারীদের কাছে তা অনেক আগেই ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে। এমতাবস্থায় নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার প্রশ্নেই সন্দিহান হয়ে পড়ছি। কারণ সরকারের এহেন নিষ্ঠুর সিদ্ধান্ত 'মড়ার ওপর খাড়ার ঘা' বৈ আর কি!

বর্তমান নাজুক পরিস্থিতির ওপর বাস্তব দৃষ্টি রেখে গরিব কর্মচারীদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য অন্ততঃ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য সন্তোষজনক অবস্থায় ফিরে না আসা পর্যন্ত উক্ত একমাসের আগাম বেতন ও জেনারেল প্রভিডেন্ট ফান্ড-এর টাকা কর্তন না করার জন্য সরকারকে অনুরোধ করছি। বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমান সাহেবের ব্যক্তিগত দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ইতি-

৩য়-৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের পক্ষে
মুহাম্মদ মোসারফ হোসেন।

পাঠকের অভিমত

মুজিববাদ প্রসঙ্গে

ইদানিং আমরা যথায় তথায় একটি প্রশ্নের সম্মুখীন হইতেছি। তাহা হইল একটি বাদ 'মুজিববাদ'। বিশ্বে এখন যেসব বাদ প্রচলিত আছে যথা মার্কসবাদ, লেনিনবাদ ও মাওবাদ সম্বন্ধে সংজ্ঞা নির্ধারণ করা যায়, জওয়াব দেওয়া যায়। কিন্তু মুজিববাদ সম্বন্ধে আমরা কোন জওয়াব বাহির করিতে পারি না। নানাহ লোকের নিকট নানাহ ধরনের উত্তর পাই। সেইগুলির মধ্যে অধিকাংশের মতে একটি হইল এই ঃ মুজিব যাহা চিন্তা করেন বা বলেন। উত্তরটা অসমাপ্ত থাকিয়া যায়। কারণ, তিনি কি চিন্তা করেন তাহা পরিষ্কার করিয়া ব্যক্ত করা প্রয়োজন। আমরা যতটুকু বুঝি তিনি যাহা বলেন তাহা অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, শোষণের বিরুদ্ধে অভিযান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দেওয়া, খাদ্যহীনকে খাদ্য দেয়া ইত্যাদি।

কিন্তু এখানে তো আমরা নতুনত্ব কিছু দেখিনা। অতীতে বহু মহামানবরা এই সব কথা বলিয়াছেন। সমাজতন্ত্রের কথা বলিয়াছেন কার্লমার্কস, লেনিন। উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বলিয়াছেন মাও সেতুং। এই বাংলাদেশেই তো কৃষক শ্রেণীর জন্য সংগ্রাম করিয়াছেন শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক। ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক, জেলে, মাঝি, তাঁতী, কামার-কুমার তথা মেহনতী জনতার কথা বলিয়াছেন নবতিপর বৃদ্ধ জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। নিরন্নকে অন্ন দেওয়ার কথা কতবারই না বলিয়াছেন মওলানা ভাসানী। শোষণহীন সমাজব্যবস্থা কায়েম করার কথাও বলিয়াছেন তিনি লাখো বার। তাহা হইলে জনাব শেখ মুজিবর রহমানের হইতে এমন কোন্ নতুন বাণী আছে যাহা পরবর্তী বংশধরকে অনুপ্রাণিত করিতে পারিবে? বরং এইগুলি সব অতীত পরিচ্ছেদের পুনরাবৃত্তি ঘটিতে পারে মাত্র।

কিছুদিন পূর্বে ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত জনসভায় পল্টন ময়দানে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক জনাব শাহজাহান সিরাজকে বলিতে শুনিয়াছি যে সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের সমন্বয়ই নাকি মুজিববাদ। তবু একটা সংজ্ঞা পাইয়াছিলাম। কিন্তু দেখা যায় তাহাও মুজিববাদের নামে একটা অপবাদের সামিল। কারণ, পার্শ্ববর্তী ভারতেই আমরা বলিতে শুনি সমাজতন্ত্রের কথা। আর গণতন্ত্র তো রহিয়াছেই। অন্ততঃ দাবী তো করা হয়।

যাহা হউক, সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের সমন্বয়ে যদি কোন বাদের সৃষ্টি হয় তার নাম হইতে পারে ইন্দিরাবাদ। ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলিলেও ভারতই তার কৃতিত্ব আগে পাইবে। আর জাতীয়তাবাদের সম্বন্ধে আমরা জাতীয়তাবাদী চীনের কথাও শুনিয়াছি অনেক আগেই।

তাই সবগুলি ব্যাপার বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে মুজিববাদের মধ্যে নতুন কিছু নাই যাহা অনুসরণ করা যায়। বরং শেখ মুজিব নিজেই যখন অতীতের আদর্শ অনুসরণ করিয়া কাজ করিতেছেন সেইখানে চিন্তাধারাকে নিজের নামে ঢালাও করিয়া বলার কোন মানে থাকিতে পারে না।

অতএব মুজিববাদের প্রবক্তাদের নিকট অনুরোধ যে মুজিববাদ জিনিষটা অবিলম্বে পুস্তিকাকারে ছাপাইয়া তার একটি সঠিক সংজ্ঞা আমাদের জানাইয়া দেওয়া হউক। তবে সেইখানে যেন আব্রাহাম লিঙ্কন, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, কার্লমার্কস, লেনিন, মাও সেতুং, শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শেরে বাংলা ও মওলানা ভাসানীর চিন্তাধারা ধার করিয়া আনা না হয়। যদি আনা হয় তাহা হইলে সেই দিনের কথা মনে পড়িবে যেদিন মরহুম মোনেম খান বাংলার অধ্যক্ষ জনাব আঃ হাইকে স্বরচিত রবীন্দ্রসঙ্গীত লিখিতে বলিয়াছিলেন। অনুরূপভাবে আমরাও এইটার নাম দিব শেখ মুজিব কর্তৃক স্বরচিত 'সম্মিলিতবাদ'।

ডাঃ মোঃ ইউনুস , শাহজাহানপুর, ঢাকা।

তওবা ঃ একটি মানসিক বিপ্লব

॥ শামসুল হক ॥

খোদা একজন, দুইজন বা তিনজন নয়। তাঁহার পবিত্র নাম আল্লাহ। তিনি এক, অদ্বিতীয়। তাঁহার কোন অংশ বা অংশীদার নাই।

তাঁহার কোন আয়েব বা দোষ-ত্রুটি নাই। তাঁহার কোন অভাব নাই। তিনি সকলের সব অভাব মোচনকারী। তিনি কাহারো পিতা নন, কাহারো পুত্র নন। তাঁহার কোন সঙ্গিনী নাই,তাঁহার সমশ্রেণী কেহই নাই। পাপ মোচনকারী, মুক্তি-দানকারী অন্য কেহই নাই এক আল্লাহ্ ছাড়া। বিপদ উদ্ধারকারী, সম্পদ দানকারী, সন্তান দানকারী, সম্মান দানকারী, মুক্তি দানকারী অন্য কেহ নাই, এক আল্লাহ্ ছাড়া।

পীর, পয়গম্বর, দেবতা কেহই উদ্ধারকারী, মুক্তিদানকারী নহে। মুক্তিদানকারী, বিপদ উদ্ধারকারী এক আল্লাহ্। সমস্ত পয়গম্বরগণ, সমস্ত ফেরেস্তাগণ তাঁহারই চাকর, তাঁহারই সৃষ্ট দাস। হযরত মুসা, হযরত ঈসা, হযরত মোহাম্মদ (দঃ) সকলেই আল্লাহ্র বাণী বাহক, আল্লাহ্র তরফের পথপ্রদর্শক, মুক্তিদাতা বা পাপহরণ কর্তা কেহই নহে। সর্বশেষ পথ প্রদর্শক হযরত মুহাম্মদ (সঃ)। হযরত মুহাম্মদের (সঃ) পরে আর কোন নবী নাই। এখন আছে নবীর খাস অনুসারী। তাহাকে ধর্মের ভাষায় বলা হয় নায়েবী নবী। তাই সকলেরই একজন খাঁটি নায়েবে নবী তালাশ করিয়া যাহার চরিত্র নবীর আচরণের সঙ্গে মিশে, এমন একজন নায়েবে নবী তালাশ করিয়া তাঁর কাছ থেকে ধর্মোপদেশ গ্রহণ করিয়া আপন আপন মুক্তির পথ অনুসন্ধান করিতে হইবে।

প্রসঙ্গত নায়েবে নবীর সংক্ষিপ্ত গুণাবলী নিম্নরূপ ঃ নায়েবে নবী স্বার্থপর বা অর্থলোভী হইবে না। নায়েবে নবী নবীর খেলাফ কোন কথা কহিবে না। নায়েবে নবী যাহা কিছু বলিবে, নবীর আনীত ওহী হইতে বলিবে। নিজের মনগড়া কোন কথা বলিবে না। নায়েবে নবীর জীবনের উদ্দেশ্যই হইবে নবীর সুন্নত (তরিকা) পালন করা; নবীর সুন্নত তরিকা জারী করা। নায়েবে নবীকে কোরআন হাদিসের আলেম হইতে হইবে। নায়েবে নবীকে জান, মাল, ইজ্জত, রাজা-বাদশা

সকলের উপরে স্থান দিতে হইবে কোরআন ও হাদিসকে।

এহেন চরিত্রের একজন নায়েবে নবীর (আসাওফের ভাষায় পীর) সংস্পর্শে আসিয়া সত্যসন্ধানী তওবা করিতে পাগল হইয়া পড়ে। তখন সে ফরিয়াদ জানায়– আমি একজন পাপী মানুষ। এই পাপ পঙ্কিল দুনিয়াতে আসিয়া শয়তানের ধোঁকায়, নফসের খায়েশে, প্রবৃত্তির বশে, কুসংসর্গের দোষে কত পাপ করিয়াছি ; আল্লাহর কত নেয়ামত ভোগ করিয়াছি ; আল্লাহ্ বিদ্যা দিয়াছেন, বুদ্ধি দিয়াছেন, রুজি দিয়াছেন, চোখ দিয়াছেন, কান দিয়াছেন, সম্মান দান করিয়াছেন, আরও কত অসংখ্য নেয়ামত দান করিয়াছেন, কিন্তু আল্লাহ্র শোকর করি নাই, আল্লাহ্র নিষেধ মানি নাই, আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও দয়া ব্যতীত কোন উপায় নাই অথচ আমি আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করার ও আল্লাহ্র দয়া লাভ করার যোগ্য কোন কাজ করি নাই, বরং যত কাজ করিয়াছি সবই আল্লাহ্র অসন্তুষ্টির কাজ করিয়াছি। আল্লাহ্র অসন্তুষ্টিই দোজখ, আমি দোজখের উপযুক্ত হইয়াছি। এখন আমার উপায় কি? আছে কি কোন উপায়?

মুরিদের এই ফরিয়াদ উপলব্ধি করিতে পারিয়া তাহাকে সান্ত্বনা ও প্রেরণা দেন–হতাশ হইবেন না, নিরাশ হইবেন না। শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদিগকে আশার আলো দান করিয়া গিয়াছেন।

তিনি একথাও বলেন নাই যে শরীয়তের পায়রবী করা লাগিবে না, শরীয়তের পায়রবী নিশ্চয়ই করা লাগিবে। যদি কোন পীর বা পাদ্রী ওরূপ কথা বলেন যে, শরীয়তের পায়রবী করা লাগিব না, তবে সে কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। তিনি একথাও বলেন নাই যে, আমিই তোমাদের মুক্তিদাতা, আমিই তোমাদের পাপহরণ কর্তা। তিনি একথাও বলেন নাই যে, সংসার আনন্দময় যার মনে যা লয়; আমাকে ঈশ্বরের পুত্র রূপে গ্রহণ করিয়া নিলে এবং ঈশ্বরের পুত্রকে গুলিতে মারিতে পারিলে আর কোন পাপ নাই। তিনি বলিয়াছেন, যাহারা এরূপ বলে তাহারা মিথ্যাবাদী। পাপহরণ কর্তা, মুক্তিদাতা, এক আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেহই নাই। আল্লাহ্র কোন পুত্র নাই। আল্লাহ্র পুত্র থাকার কথাও সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। আল্লাহ্র পুত্রের গুলির কথাও সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। সব নবী যে পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, এক আল্লাহ্র পথ এবং পাপ করিলে আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তনের পথ, আমিও তোমাদিগকে সেই পথই প্রদর্শন করিতেছি, সেই পথের সন্ধান দিতেছি। সেই আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন করার নামই তওবা।

সার কথা এই যে, মানুষ যতই পাপ করুক না কেন, পাপকে ঘৃণা করিতে হইবে ঠিকই, কিন্তু পাপকারীকে ঘৃণা করা যাইবে না, পাপীকে আদর করিয়া কোলে তুলিয়া নিয়া তার পাপের ময়লা ধুইয়া ফেলানোর পথ তাহাকে দেখাইতে হইবে। শুধু কিতাবী চিকিৎসা যথেষ্ট নহে, কিতাবের দ্বারা রোগের চিকিৎসার এবং ময়লা ধোয়ার প্রয়োজনীয়তাবোধটুকু জাগরিত হইতে হইবে। অনুতাপ এবং অনুশোচনা ভিতরে জাগিলে যদি একজন নিঃস্বার্থ স্নেহবান ওস্তাদ পাওয়া যায় তবে মানসিক বিপ্লবটি মনের অজানাতেই সুসম্পন্ন হয়।

তওবা করিতে হইলে চারটি কাজ করিতে হইবে। প্রথমতঃ দিলে অনুতাপ, দুঃখ, বেদনা, জ্বালাতন এবং আক্ষেপ, আফসোস জাগাইতে হইবে যে, হায়! আমি কেমন আল্লাহ্র নাফরমানি করিয়াছি, কেমন দয়াল প্রভুর মেহেরবানীর দেশ ছাড়িয়া কোথায় কোন্ দুষ্ট

শয়তানের ধোঁকায় পড়িয়া কোন্ অতল সমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়া মরার পথে চলিয়াছি, এখনও ফিরিয়া সেই দয়াল প্রভুর কাছে গিয়াই ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিৎ।

দ্বিতীয়তঃ এই পাপ কাজকে বর্জন করিতে হইবে।

তৃতীয়তঃ কাকুতি-মিনতি করিয়া আল্লাহ্‌র নিকট বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইবে। বলিতে হইবে, হে দয়াময় আল্লাহ্ অন্যায় করিয়াছি, ভুল করিয়াছি–আমি অপরাধ স্বীকার করিতেছি। আমার পাপ হইতে তোমার দয়া অনেক বেশী, আমাকে মাফ করিয়া দাও। আমাকে ক্ষমা করিয়া দাও, আমার তওবা কবুল করিয়া নাও।

চতুর্থতঃ আগামীদিনের জন্য সতর্ক ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইতে হইবে। অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে বলিবে–আর ঐ পথে যাইবে না। আর আল্লাহ্‌র নাফরমানির পথে, রসূলের খেলাফ পথে যাইবে না।

নবী দিবস উদযাপন উপলক্ষে মুরিদদের প্রতি আমার নির্দেশ

আগামী ১৪ই বৈশাখ, ২৭শে এপ্রিল মোতাবেক ১২ই রবিউল আউয়াল বৃহস্পতিবার হযরত মোহাম্মদের (দঃ) জন্ম ও ওফাত দিবস। এই উপলক্ষে বরাবরের মতো সন্তোষে নির্ধারিত কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হইবে। বাংলা ও আসামের আমার মুরিদান ও ধর্মপ্রাণ সকল মুসলমান নারী পুরুষকে আহ্বান জানাইতেছিঃ আসন্ন নবী দিবসে সন্তোষে হাজির হইয়া এখানকার কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করুন।

একটানা নয় মাসে মাত্র যে দোহাই দিয়া বাংলাদেশের প্রায় তিনটি পরিবারকে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত বা বিধ্বস্ত করা হইয়াছে তাহা হইল ইসলাম রক্ষা। আপনারা ভাল করিয়া জানেন, যেহেতু মিথ্যা ও অন্যায়ের কোনদিন বিজয় সূচীত হয় নাই, তাই ঐতিহাসিক নিয়মে পাকফৌজ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। তাহাদের ধ্বংস আমাদিগকে দিয়াছে স্বাধীনতা। কিন্তু তাই বলিয়া স্বাধীনতায় গদগদ হইয়া ইসলামের মহান বৈশিষ্ট্য ভুলিয়া গেলে চলিবে না। আপনাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে, ইসলাম সকল মানুষকে, সে মুসলমান হউক বা না হউক, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তা দান করিয়াছে। ভণ্ডরা তাহা ভুলিয়া গিয়া পরধর্মে হাত দিয়া থাকে। ইসলাম মানুষকে সততা, সাধুতা, ত্যাগ ও সাধনার পথে চলিতে বলে। কিন্তু আমরা পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীকে দেখিয়াছি, ইসলামের নামে তাহারা মানুষের উপর জুলুম করিয়াছে।

তজ্জন্য ইসলামকে জুলুমকারীর ধর্ম হিসাবে দেখিলে চলিবে না। ইসলামকে আমরা কখনও তলাইয়া দেখিতে যাই নাই। বংশানুক্রমে যাহারা মুসলমান, তাহাদের চরিত্র পর্যালোচনা করিয়াই আমরা ইসলামের স্বরূপ অনুধাবন করিতে চেষ্টা করি। কিন্তু একমাত্র হযরত মোহাম্মদের (দঃ) ব্যক্তিগত, পারিবারিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় জীবন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যবেক্ষণ করিয়া আমরা পূর্ণ ইসলামকে উপলব্ধি করিতে পারি। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর এই প্রথম ফাতেহা ইয়াজদাহাম আমাদের দুয়ারে হাজির। আমি তাই মুরিদদের প্রতি নির্দেশ দিতেছি এবং জনসাধারণের প্রতি আবেদন জানাইতেছি–আপনারা আসন্ন নবী দিবস উদযাপন করুন এবং ওয়াদাবদ্ধ হউনঃ ন্যায় ও সত্যের পথে আমরা অটল, অচল থাকিব-ভীতি, হুমকি যাহা কিছুই আসুক না কেন।



চাঁদার হার

বাৎসরিক নয় টাকা
ষান্মাষিক পাঁচ টাকা

নবী দিবস উপলক্ষে

আগামী ১২ই রবিউল আওয়াল 'হক-কথায়' বিশেষ নিবন্ধ ও গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করা হইবে।

আমাদের প্রকৃতি ও মাছের চাষ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

দেখা গিয়াছে, মৎস্য যখন দল বাধিয়া এক জলাভূমি হইতে অন্য জলাভূমিতে যাইতে শুরু করে তখন সেগুলি ধরা পড়ে। মৎস্যের এইরূপ দল বাধিয়া যাত্রার কতকগুলি কারণ রহিয়াছে।

ডিম পাড়িবার জন্য মৎস্য দল বাধিয়া নিরাপদ স্থানে যাত্রা শুরু করে। কিংবা পানি যখন শুকাইতে আরম্ভ করে মৎস্য তখন দল বাধিয়া বেশী পানিতে যাইতে শুরু করে। কারণ রুই, কাতলা, মৃগেল, কালিবাউস প্রভৃতি মৎস্য বেশী পানি ছাড়া বাঁচিতে পারে না।

বিল, হাওড় ও বাওড় জলাভূমিতে প্রচুর আগাছা থাকিবার দরুণ অক্সিজেন কম থাকে। শিঙ্গি, মাগুর, কই, টাকি, শোল, গজার, বোয়াল, চিতল প্রভৃতি মৎস্য কম অক্সিজেনে বাঁচিতে পারে। সেই জন্য উপরোক্ত জলাভূমিতে এই সব মৎস্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। শীতকালে যখন পানি শুকাইয়া যায় তখন এই জাতীয় মৎস্য ধরা পড়ে।

সিলেট ও ময়মনসিংহের হাওড় অঞ্চল দেশের একটি বিখ্যাত মৎস্য উৎপাদন কেন্দ্র। এই অঞ্চলের প্রধান প্রধান হাওড়গুলি হইতেছে রারাম, বাংকা, হাবিবপুর, মাকা, মাকালকান্দি, মুলডুবা, টেংরা, সানির, মতিয়ান, ডাকার, জিলকার, ঝিংকার, পাঠানটুলী, জামাইকাটা, মাহাই, নালুয়া, পারুয়া, হাইল, হাকালুকি, কাটালা, বার এবং হাইলকা। ইহাদের মধ্যে টেংরা হাওড় সবচাইতে বড়। বর্ষাকালে এই সমস্ত হাওড়ে প্রায় ১৫ হইতে ৩০ ফুট পানি হয় এবং সমস্ত হাওড় অঞ্চল একটা বড় সমুদ্রের রূপ ধারণ করে। শীতকালে হাওড়গুলির পানি কমিয়া যায় এবং তখনই অধিকাংশ মৎস্য ধরা পড়ে।

এই দেশে প্রায় ৩০০ লক্ষ মণ মিঠা পানির মৎস্য পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে প্রায় ৬০ হইতে ৭০ লক্ষ মণই সিলেট জেলায় পাওয়া যায়। হাওড় অঞ্চল হইতে মৎস্য চালান দেবার সুব্যবস্থা না থাকার দরুণ এবং কোন প্রকার 'কোল্ড স্টোরেজ' না থাকার দরুণ এই অঞ্চলের মৎস্য প্রধানতঃ শুকাইয়া দেশের নানা স্থানে চালান দেওয়া হয়। ভৈরব বাজার, আশুগঞ্জ, কুলিয়ারচর, সিলেট, মেহেরগঞ্জ, নীলগঞ্জ প্রভৃতি এই অঞ্চলের প্রধান প্রধান মৎস্যের বাজার। হাওড় অঞ্চলের কিছু মৎস্য রেলযোগে ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রামে চালান দেওয়া হয়।

নদী ও খাল

সমস্ত বাংলাদেশের উপর নদী ও খাল জালের মত ছড়াইয়া আছে। এত ছোট জায়গায় এত নদী ও খালের নজীর পৃথিবীর অন্য কোথাও দেখা যায় না। এই দেশের তিনটি প্রধান নদী হইতেছে পদ্মা বা গঙ্গা, যমুনা বা ব্রহ্মপুত্র এবং মেঘনা। এই প্রধান নদীর আবার অসংখ্য শাখা প্রশাখা রহিয়াছে। দিনাজপুর জেলার প্রধান প্রধান নদীর নাম হইতেছে টাঙ্গন, করতোয়া ও যমুনা, রংপুর জেলায় তিস্তা, ভুবনেশ্বর, ঘাঘট, ধরলা ও দুদকুমার, বগুড়া জেলায় বাংগাল, করতোয়া ও নাগার, রাজশাহী জেলায় মহানন্দা, শিব, আত্রাই, বারানাই, পাবনা জেলায় ইছামতী, বড়াল ও করতোয়া, কুষ্টিয়া জেলায় গড়াই, ইছামতী, যশোর জেলায় মধুমতী, কুমার, নবগঙ্গা, ও ভৈরব, খুলনা জেলায় রায়মঙ্গল, মালঞ্চ, কোংগা, পশুর,

মেলা, ভোলা, ভৈরব, বেতনা, কপোতাক্ষ প্রভৃতি। বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলায় হরিণঘাটা, বুড়িশ্বর, বিশখালি, বারনাবাদ, তেঁতুলিয়া প্রভৃতি, ফরিদপুর জেলায় মধুমতী ও আড়িয়াল খাঁ, ঢাকা জেলায় ধলেশ্বরী, বুড়িগঙ্গা ও বানার, ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলায় ব্রহ্মপুত্র, বানার, বানাস, কংসা, সোমেশ্বরী, মোগরা ও বানসাই, সিলেট জেলায় সুরমা, কুশিয়ারা, কালনী, পিয়াইন ও মনু, কুমিল্লা জেলায় তিতাস, গোমতী ও ডাকাতিয়া, নোয়াখালী জেলায় ফেনী নদী, চট্টগ্রাম জেলায় কর্ণফুলী, হালদা, সাংগু ও মাতামহুরী এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলায় কর্ণফুলী, কাছলং, রাংখিয়াং, সাংগু ও মাতামহুরী।

পুকুর, বিল, হাওড় ও বাওড়ে যে জাতীয় মৎস্য পাওয়া যায় দেশের নদী ও খালে সেই জাতীয় মৎস্য দেখিতে পাওয়া যায়। তবে মাগুর, সিঙ্গি ও কই মৎস্য নদীতে কম পাওয়া যায় এবং ইলিশ মৎস্য পুকুর, বিল, হাওড় ও বাওড়ে মোটেই পাওয়া যায় না। তাছাড়া শিলং, কোরাল ও ভেটকী মৎস্য প্রধানতঃ নদীতেই পাওয়া যায়। ইলিশ খুব সুস্বাদু মৎস্য। ইহা বাংলাদেশের সব নদীতেই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। কেবলমাত্র দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া ও পার্বত্য চট্টগ্রাম ইহা কম দেখা যায়। ইলিশ মৎস্য সাধারণতঃ বর্ষাকালে ধরা পড়ে। এই সময় দেশে অন্যান্য মৎস্য কম পাওয়া যায়। মৎস্যের চাহিদা ইলিশ দ্বারাই পূরণ হয়। ইলিশ মৎস্যকে বাংলাদেশের নদীর 'রূপালী শস্য' বলা হয়।

সমুদ্র ইলিশ মৎস্যের উৎপত্তি স্থান। ইহা ডিম পাড়িবার জন্য স্থান খোঁজে এবং নদীপথে উপরের দিকে যাত্রা শুরু করে। পদ্মা ও যমুনা নদী দিয়া এই মৎস্য যথাক্রমে দিল্লী ও আসামের জোড়াহাট পর্যন্ত চলিয়া যায়। যাত্রা পথে বাংলাদেশের বিভিন্নস্থানে ইহারা ধরা পড়ে। পদ্মা নদীর উপর স্থাপিত পাকশী, গোয়ালন্দ, ভাগ্যকুল, নারিসা, লৌহজঙ্গ প্রভৃতি। যমুনা নদীর উপর স্থাপিত আরিচা, সিরাজগঞ্জ, বাহাদুরাবাদ প্রভৃতি এবং মেঘনা নদীর উপর স্থাপিত চাঁদপুর, সাটনল, মুন্সীগঞ্জ, ভৈরব বাজার, কুলিয়ারচর প্রভৃতি স্থান ইলিশ মৎস্যের জন্য বিখ্যাত। বরিশালেও যথেষ্ট পরিমাণে মৎস্য ধরা পড়ে।

আফসোস তো একটি ক্ষেত্রেই আমরা রাজনৈতিক স্লোগানে দেশপ্রেম প্রকাশ করিয়া থাকি। কিন্তু ইহা ভালবাসিতে জানিবার কোন চেষ্টাও করি না। স্বদেশীয় মৎস্য সম্পদ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণাও দেশপ্রেমে জোগান দিতে পারে।

কৃষক সমিতি গঠিত

১৫নং বাঘিল ইউনিয়ন কৃষক সমিতির অর্গানাইজিং কমিটি নিম্নলিখিত সদস্য লইয়া গঠিত হইয়াছে। জনাব আব্দুল কাদের, জনাব কোরবান আলী, জনাব মতিয়ার রহমান, জনাব ইউনুস আলী, জনাব মোঃ বাদুল্লা, জনাব মোঃ নবাব আলী, জনাব মোঃ ইন্তাজ আলী, জনাব মোঃ লতিফ, জনাব মোঃ নওয়াব আলী, জনাব মোঃ চাঁন মিঞা, জনাব মোঃ আমজাদ হোসেন ও জনাব মোঃ রমজান আলী।

একটি খোলা চিঠি
অবশেষে ব্যাঙ্ক কর্মচারীরও শোষণ?

প্রিয় প্রধানমন্ত্রী,

আপনি সর্বত্র বলিয়া বেড়াইতেছেন, সবুর করিলেই সকল সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে। সম্বল মাত্র একটি চাতুর্যপূর্ণ যুক্তি- আপনার হাতে কোন আলাউদ্দীনের প্রদীপ নাই। খুব ভাল কথা। কিন্তু দেশ ও দশের সেবা করিতে আপনি যে সকল 'উদ্দীন' বাছিয়া লইয়াছেন তাহাদের কার্যকলাপে যদি কোন প্রদীপ টিকিয়া থাকিবার সুযোগও না পায় তবে জাগ্রত জনতা বসিয়া থাকিবে কি?

আজকের ক্ষুদ্র এই 'খোলা চিঠিতে' চোরাচালানের নজীর পেশ করিতে চাহি না, খাদ্য ও বস্ত্র সমস্যার কথা বলিতে চাহি না, কেরোসিন, সাবান, মশলা, ইত্যাদি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধগতির অন্তর্নিহিত কারণও প্রকাশ করিতে চাহি না। দুঃখজনক ঘটনা প্রবাহের শুধুমাত্র একটি দিকের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। তাহা হইল প্রচলিত নোট সম্পর্কে। জানি না ইহাতেও আপনি আলাউদ্দীনের আশ্রয় খুঁজিবেন কিনা। কিন্তু যতদূর আমরা জানি, সৎসাহস ও অদম্য আন্তরিকতা থাকিলে অন্ততঃ দুর্নীতির উচ্ছেদ সাধন করা যায়।

বেশ কয়দিন কাটিয়া গেলেও পঞ্চাশ টাকার নোট জমা দিয়া আজও গরীব কৃষক-মজুর প্রাপ্য অর্থ ফিরিয়া পায় নাই। আপনি হয়ত জানেন, হুকুম বলবৎ আছে। তাই কাজ চলিতেছে। কিন্তু আমার অভিযোগের যদি ভিত্তি জানিতে চান তবে আজই বাংলাদেশ ব্যাঙ্কের সকল শাখা-প্রশাখায় খোঁজ নিন। ব্যাঙ্কের সংশ্লিষ্ট অধিকর্তারা রীতিমত প্রতারণা, হয়রানি ও শোষণের জাল পাতিয়া বসিয়াছে। পল্লীবাসী দিনের পর দিন ঘুরিয়া টাকা ফেরত পায় না। কিন্তু অধিকর্তার নিযুক্ত দালালের মাধ্যমে আবেদন পেশ করিলে তাহা মিলিয়া যায়। তজ্জন্য একটি কমিশন শোধ করিতে হয় যাহা দালাল ও ব্যাঙ্ক কর্মচারীর মধ্যে ভাগাভাগি হইয়া থাকে। ফেরত পাওয়া নোটগুলি লইয়া সরল মানুষ মুশকিলে পড়ে। ইচ্ছাকৃতভাবে পুরাতন অচল নোট দিয়া ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা আর একবার শোষণের পথ করিয়া রাখে। তাই সেই পচা নোট লইয়া গরীব মানুষটি আবার তাহাদের শরণাপন্ন হয়। এইবারও ব্যাঙ্কের নিযুক্ত দালাল কমিশন রাখিয়া নোট বদলাইয়া দেয়। বলা বাহুল্য, ইহাতেও ব্যাঙ্কের অংশ নির্দিষ্ট রহিয়াছে। আমি নির্ভরযোগ্য সূত্রে খোঁজ লইয়া জানিয়াছি, খোদ ঢাকা শহরেও এই অবৈধ চোরাই ব্যবসা চলিতেছে। বড় কথা, এই জঘন্য জালিয়াতি সকল প্রকার লেনদেনের ক্ষেত্রেই হইতেছে। কমিশনের ভিত্তিতে তাই অচল নোট বদলানোর ব্যবসাটি বেশ ব্যাপক আকারে চলিতেছে। প্রয়োজনের তাগিদে সবাই দায় সারিয়া কাটিয়া পড়ে। কেহই চরমভাবে অগ্রসর হইতেছে না। আপনি সহজেই অনুমান করিতে পারেন, আমরা জাতীয় সম্পদ বাংলাদেশ ব্যাঙ্কের কর্মকর্তাদের এহেন কারসাজির বিচার গণআদালতেই পেশ করিতে পারিতাম। কিন্তু দুনিয়ার সকল শাসকগোষ্ঠীর মত আপনারাও এই উদ্যোগকে ব্যাঙ্ক লুটের আলামত বলিয়া প্রচার করিতেন। তাই গরীব জনসাধারণের এই দুর্ভোগটুকু, এতকালের সুনামের অধিকারী বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মচারীদের অশুভ প্রয়াসটুকু একটি চিঠিতেই তুলিয়া ধরিলাম।

তবে হ্যাঁ, দেশ ও জাতির কল্যাণমূলক সকল প্রকার কাজে ও দুর্নীতি উচ্ছেদ অভিযানে আমরা আপনার সরকারের সহিত আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করিয়া যাইতে সদা আগ্রহী।



ইহা কি সত্য?

॥ ২৭ ॥

কৃষি গবেষণার জনৈক কর্মকর্তা বিশ্বস্থতার সাথে যতটুকু সম্ভব দালালী করেছিলেন। এর পুরস্কার ইয়াহিয়া খান দিবার সময় না পেলেও আজকের চাটুপ্রিয় সরকার তা যথাযথ দিয়ে যাচ্ছেন। ভদ্রলোক আর যা-ই হউন কৃষি বিজ্ঞানে শিক্ষিত নন। কিন্তু তবুও ইয়াহিয়া খান যা-যা পছন্দ করতেন তা সাপ্লাই করে কৃষি গবেষণায় পারদর্শী হয়ে পড়েন এবং যথা নিয়মে পদটি পেয়ে যান নিমকহারাম এই দালাল মুক্তিবাহিনীর সাহায্যকারী তার ড্রাইভারকে বর্বর ফৌজের হাতে তুলে দেয় এবং তাকে হত্যা করা হয়। স্বাধীনতার পর

পরই ভোল পাল্টে ফেলে তিনি মুজিব-পছন্দদের কাতারে সামিল হয়ে যান। তাই ধান গবেষণায় গোবেচারা হলেও আওয়ামী সরকারের অনুগ্রহে বীজধান কিনতে তিনি ভারতে যাবার সুযোগ পান।

॥ ২৮ ॥

যোগসাজশ দু'টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে। একটি খুলনা জংশন সিএসডি। অপরটি মাত্র দেড় মাইলের ব্যবধানে অবস্থিত আর এ্যান্ড ডি ও। জংশন থেকে দৈনিক ১০/১২ খানা রেল ওয়াগনে গম, চাউল উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। কিন্তু দেড় মাইল যেতে যেতে প্রতি ওয়াগনে ২০/২৫ মণ খাদ্যশস্য উধাও হয়ে গেছে। উপরোক্ত দুটি বিভাগকেই দায়ী করে দাবী করা হয়েছে গত ফেব্রুয়ারী মাসে প্রায় এক হাজার মণ চাউল ও গম পাবনা জেলার কর্মকর্তা, নেতা উপনেতা ইত্যাদির ঠিকানায় চলে গেছে। সুস্থ মস্তিষ্কে গোটা মাসব্যাপী এই চোরাই কাণ্ড ঘটেছে। কারণ মাত্র একটি। বেড়াতেই ক্ষেত খেয়েছে। আবার ক্ষেতও বেড়া খেয়েছে।

॥ ২৯ ॥

স্বাধীনতা সংগ্রাম চলাকালে সিএন্ডবি-র বহু গুদামপাকফৌজ কর্তৃক লুণ্ঠিত ও বিধ্বস্ত হয়েছে, এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু স্বাধীনতার পর পরই সব গুদামে পাইকারীভাবে লুট শুরু হয়ে যায়। মজার ব্যাপার এই যে, ক্ষেত্র বিশেষে বিভাগীয় কর্মকর্তার কারসাজিতে গুদাম লুট হওয়া সত্ত্বেও দোষটা চাপানো হয়েছে মুক্তিবাহিনীর উপর। আবার এই লুণ্ঠন কাজের রিপোর্ট পেশ করার দায়িত্বও দেয়া হয়েছে একই কর্মকর্তাদের। এমনি অনেক নজীরের মধ্যে একটি হলো জামালপুর মহকুমার শেরপুরের সিএন্ডবি বিভাগ। এরই একজন কর্মকর্তা গুদাম থেকে রীতিমত ট্রাকে করে মালপত্র সরিয়ে ফেলা সত্ত্বেও ঘটনার তদন্ত ও অবশিষ্ট মালের দেখাশোনার দায়িত্ব তাকেই দেয়া হয়েছে। কথায় বলে শুকনা মাছের নৌকায় বিড়াল চৌকিদার।

॥ ৩০ ॥

টাঙ্গাইলের জেলে একজন দালাল আছেন। তবে তিনি কয়েদি নন। বরং হর্তাকর্তাদের একজন। হানাদার বাহিনীকে সন্তুষ্ট রাখতে তিনি কৃতিত্বের সাথে দালালী করেছেন। আটক দেশপ্রেমিকদিগকে বিনা কারণে অত্যাচারে জর্জরিত করেছেন। এর ভুরি ভুরি জীবন্ত নজীরও রয়েছে। জেলের কর্মচারীদিগকে তিনি অহেতুক শাস্তি দিয়েছেন। তবু আজ এই দালাল বাংলাদেশ সরকারের একজন ভাগ্নে আদর-পাওয়া অফিসার।

চলতি মাসে মওলানা ভাসানীর বিশেষ কর্মসূচী

১৩ই এপ্রিল-সন্তোষ কৃষক সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সভা। ১৪ই এপ্রিল–সন্তোষে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভা। ১৬ই এপ্রিল-ন্যাপের উদ্যোগে রাজশাহীতে জনসভা। ১৭ থেকে ১৯শে এপ্রিল- মহিপুরে (পাঁচবিবি) অবস্থান। ২০ শে এপ্রিল–দিনাজপুরে জনসভা। ২১শে এপ্রিল–ঠাকুরগাঁও-এ জনসভা। ২৩শে এপ্রিল– খুলনায় জনসভা। ২৪শে এপ্রিল - যশোরে জনসভা। ২৭শে এপ্রিল-সন্তোষে ঈদে মিলাদুন্নবী। ২৮ শে এপ্রিল–মোমেনশাহীতে জনসভা। (সন্তোষ থেকে যাবার পথে ২৮শে এপ্রিল সকাল দশটায় কালিহাতি থানা ন্যাপ অফিসের উদ্বোধন করবেন)। ২৯শে এপ্রিল-শিবপুরে কৃষক সম্মেলন।

সম্পাদক ঃ সৈয়দ ইরফানুল বারী, মুদ্রণে— শান্তি প্রেস, সন্তোষ টাঙ্গাইল।

প্রতি কপি বিশ পয়সা সাপ্তাহিক রেজিস্টার্ড নং- ডিএ ১৭৬

হক-কথা

(WEEKLY THE HAQ-KATHA)

প্রকাশক ও পৃষ্ঠপোষক ঃ মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

প্রথম বর্ষ অষ্টম সংখ্যা রবিবার ৩ রা বৈশাখ ১৩৭৯; ১৬ই এপ্রিল, ১৯৭২; ৩০ শে সফর, ১৩৯২; সন্তোষ, টাঙ্গাইল

মেজর জলিল সমাচার শ্বেতপত্র চাই

চুপ চুপ করে বাংলাদেশ সরকার মেজর এম, এ জলিলের অন্তরীণ সম্পর্কিত নানা প্রশ্নকে চেপে যাচ্ছেন। কিন্তু কী করে সম্ভব একজন দুর্বার স্বাধীনতা সংগ্রামীর ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলাকে ঢেকে রাখা?

স্বাধীনতার ১১ দিন পর গত ২৮ শে ডিসেম্বর যশোর হতে মেজর জলিলের অন্তর্ধানের পর থেকেই সারা বাংলাদেশে নানা কথার কানাঘুষা চলতে থাকে। মেজর জলিল কোথায় অন্তরীণ হয়ে থাকলে কেনইবা ইত্যাদি প্রশ্ন জনমনে জেগে উঠতে থাকে। বিশেষ করে বরিশাল, খুলনা ও যশোরে মেজর জলিলের একনিষ্ঠ ভক্তরা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। বরিশালে তার গ্রেফতারের প্রতিবাদে রীতিমত ধর্মঘটও পালিত হয়। এমন কি রাজধানী ঢাকার দেয়ালে মেজর জলিলের গ্রেফতার কিংবা অন্তরীণকে চ্যালেঞ্জ করে নানা প্রশ্নও উত্থাপিত হয়। এই স্বাধীনচেতা মেজরের মা মোসাম্মৎ রাবেয়া খাতুন বরিশালের উজিরপুর থেকে জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমানের নিকট একখানা স্মারকলিপি প্রেরণ করেন। কিন্তু তাঁর তরফ থেকে কোন প্রকার জবাব বা বিধান না পেয়ে ফেব্রুয়ারী মাসের শেষের দিকে 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী সমীপে এক দুঃখিনী মায়ের ফরিয়াদ' এই শিরোনামায় তিন পৃষ্ঠাব্যাপী মুদ্রিত একটি খোলা চিঠি বিলি করেন। তাতে তিনি লিখেছেন, "একদিকে তাঁর (মেজর জলিল) বীরত্বের অমর কাহিনী আমার বুকে যেমন আশার সঞ্চার করেছে অন্যদিকে হানাদার বাহিনীর অকথ্য জিজ্ঞাসাবাদ এমনকি জলিলের মা হওয়ার অপরাধে আমার ও আমার একমাত্র ভাইয়ের উপর শারীরিক নির্যাতন তথা খানসেনাদের ভারী বুটের কাল দাগ আমাদের ততটা দুঃখ ও বেদনা দিতে পারেনি, যতটা দুঃখ আর প্রবঞ্চনা পাচ্ছি দিনের পর দিন বৈধব্য জীবনে আমার আদরের দুলালকে হারিয়ে"। হতভাগিনী মা আরও লিখেছেন, "২৫ শে মার্চ জল্লাদ ইয়াহিয়া-টিক্কা চক্রের রক্ত চক্ষুর তথাকথিত সামরিক শাসন সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে ঐতিহ্যবাহী বাকেরগঞ্জ জেলা সদরে বাংলাদেশ সরকারের গণপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে বেসামরিক সরকার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং হাজার হাজার পুলিশ, সামরিক বাহিনী ও মুক্তিযোদ্ধাদের আপনার (শেখ মুজিব) স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাকে উদ্বুদ্ধ হয়ে অস্ত্র হাতে নিয়ে প্রচণ্ড প্রতিরোধ দুর্গ গড়ে তোলে। ২২শে জুলাই জল্লাদ বাহিনীর বর্বর সেনারা স্থল, জল ও অন্তরীক্ষে

হামলা চালিয়ে বরিশাল সদর থেকে জলিলের বাহিনীকে হটিয়ে দিতে সমর্থ হয়। ... ভারত সরকারের সক্রিয় সাহায্য, সহযোগিতা ও সহানুভূতি পেয়ে মেজর জলিল প্রথমে পশ্চিম বাংলার টাকী ও হাসানাবাদে দফতর সমূহ স্থাপন করে লক্ষ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধাদের সামরিক সাজে সজ্জিত করে দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে বর্বর পাকসেনাদের প্রতিরোধ করার জন্য এক বিশাল বাহিনীর নেতৃত্ব প্রদান করে। ... শুনেছি ৯ নম্বর সেক্টরের দুর্ভেদ্য প্রহরীরা তাদের সীমান্ত এলাকার একচুল পরিমাণ পবিত্র মাটিতে হানাদারদের অনুপ্রবেশ করতে দেয়নি। আরো শুনেছি বহু বীরত্বের কাহিনী; জলিল মিত্রবাহিনী সমভিব্যহারে নিজ হাতে ট্যাঙ্কবাহিনী পরিচালনা করে নিয়াজীর আত্মসমর্পণের বহু আগেই খানসেনাদের সুরক্ষিত যশোর ক্যান্টনমেন্টের পতন ঘটায় এবং সপ্তাহ-ধিকাল সশস্ত্র যুদ্ধের পর দক্ষিণ বাংলার সদর দফতর দখল করে।"

মেজর জলিলের মা-র শেষোক্ত বক্তব্যেই গোটা রহস্যটির রেফারেন্স নিহিত। স্বাধীনচেতা এই মেজরের অপ্রত্যাশিত বীরত্ব ও সাফল্যই তাঁকে ভারতীয় বাহিনীর কোপদৃষ্টিতে ফেলে। তখন থেকেই মেজরকে কোন ছুতায় আটক করাবার পাঁয়তারা করা হচ্ছিল। স্নায়ু সংঘর্ষটি চরমে পৌঁছল, যখন মেজর জলিল ভারতীয় বাহিনীর জিনিসপত্র সংগ্রহ অভিযানে প্রতিবাদ করে বসলেন। এ কথা সর্বজনবিদিত যে গোটা বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় বাহিনী বিশেষ করে ঘড়ি, টানজিস্টার, রেডিও, টেপরেকর্ডার, ফ্রিজ, ক্যামেরা ইত্যাদি সংগ্রহ করে নিয়ে গেছে। রাজধানী ঢাকা দখল করার পর কমপক্ষে সপ্তাহ দুই দিবালোকে তারা অনেক কাজের মধ্যে পছন্দসই দ্রব্যাদি, যা ভারতের খোলাবাজারে সস্তায় কিনতে পাওয়া যায় না, সংগ্রহ করায় অতিশয় ব্যস্ত ছিলেন। নির্ভরযোগ্য সূত্রে দাবী করা হয়েছে যে পরম দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ মেজর জলিল ভারতীয় বাহিনীর এহেন লোভাতুর অভিযানে বাধা সৃষ্টি করায় তাকে অন্যান্য অভিযোগে গ্রেফতার করে রাখা হয়েছে।

বাংলাদেশের পত্রপত্রিকায় বহুল আলোচিত হবার উপক্রম হলে প্রায় আড়াই মাস চুপচাপ থাকার পর সরকার মেজর জলিলের গ্রেফতারের কথা স্বীকার করে তার বিচার হবে বলে ঘোষণা করেন।

মেজর জলিল বাংলাদেশের জন্যে ক্ষতিকর কিংবা আইন-শৃঙ্খলার দৃষ্টিতে অমার্জনীয় অপরাধ করেছেন বলে প্রমাণিত হলে তাকে সমুচিত শাস্তি দেয়া হোক– যেকোন সচেতন নাগরিক তা দাবী করবেন। কিন্তু এর আগে তিনি নিশ্চয়ই ভেবে দেখবেন, দুঃসাহসী ত্যাগী এই স্বাধীনতা সংগ্রামী সত্যি সত্যিই অপরাধ বলতে কোথায়, কেন এবং কতটুকু করেছেন। তাঁর কাজে এমনকি গলদ হয়ে গেল যে স্বাধীনতার জন্যে নিরলস সংগ্রাম করেও আজ তিনি তার স্বাদ ভোগ করতে পারছেন না। বরং অনিশ্চিত জীবনের পথে ধিকৃত ও লাঞ্ছিত হচ্ছেন।

স্বয়ং মেজর জলিল এর জবাব জানেন কি না জানি না। কিন্তু ভারতীয় সম্মোহনীমুক্ত বাঙ্গালী মাত্রই সঠিক জবাব খুঁজে বেড়াবেন। সকল প্রকার প্রচার বন্ধ হয়ে যাবে, সব সন্দেহের নিরসন ঘটবে, যাবতীয় অপবাদ দূর হয়ে যাবে যদি বাংলাদেশ সরকার গোটা ঘটনা প্রবাহের বিশ্লেষণ করে একটি শ্বেতপত্র জনসমক্ষে প্রকাশ করেন। কেননা, শত হলেও একজন সম্মানিত, স্বীকৃত স্বাধীনতা সংগ্রামীর মা প্রধানমন্ত্রী সমীপে ফরিয়াদ জানিয়েছেন, ... "আমার জলিলকে গত ২৮ শে ডিসেম্বর (১৯৭১) হতে কে বা কাহারা ঢাকার পথে যশোর থেকে অন্যায়ভাবে অন্তরীণ করা সংক্রান্ত বিষয়টি ব্যক্তিগতভাবে পরীক্ষাপূর্বক সমস্ত চক্রান্তের অবসান ঘটিয়ে আমার নির্দোষ সন্তানকে মুক্ত বাংলার মুক্ত আলোকে ফিরিয়ে দিন।"

আমাদের চামড়াও নিয়ে যাচ্ছে

বাঙ্গালীর পেটের খোরাক একরকম শেষ করে ভারতের মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীগণ এবার আমাদের চামড়া নিতে শুরু করেছেন। আমরা জানি না বাংলাদেশ ও ভারতের সরকারদ্বয় অঘোষিত চামড়া চোরাচালান কমিটির খবর রেখেও চুপ করে আছেন কি না। তবে দিবালোকের মত একথা সত্য যে সর্বনাশা আঁতাতটিতে কংগ্রেস সমর্থক কয়েকজন ব্যবসায়ী ও খুলনা-যশোর-কুষ্টিয়ার ত্রয়োধিক এমসিএ রয়েছেন। তাদের যুক্ত কারসাজিতে উক্ত জেলাগুলোর সীমান্ত দিয়ে গড়পরতায় প্রতিদিন দশ হাজার টাকা মূল্যের চামড়া পাচার হয়ে যাচ্ছে। সাতক্ষীরা, ঝিকরগাছা, কালিগঞ্জ ও কুমারখালিতে কেবল চোরাচালান রিপোর্টে নিয়োজিত আমাদের সংবাদদাতাগণের পেশকৃত পরিসংখ্যানে দেখা যায় স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ হতে বিশ থেকে পঁচিশ লক্ষ টাকার কাঁচা ও আধা-পাক' চামড়া ভারতে চলে গেছে। ঢাকা থেকে যে দুটো ট্রাক যশোরে চামড়া পৌঁছিয়ে দিচ্ছে তাদের নম্বর হল ডব্লিওবিকে ৮৬৮২ এবং ৬৯০০।

খুলনা থেকে জনৈক সংবাদদাতা জানিয়েছেন জেলার লাইসেন্স প্রাপ্ত চামড়া ব্যবসায়ীগণ চোরাচালানের দৌরাত্মে কায়কারবার প্রায় বন্ধ করে বসে আছেন। কারণ, অসাধু ব্যবসায়ীরা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারের চেয়ে কম মূল্যে চামড়া চালান দিচ্ছেন। তাই ভারতীয় ব্যবসায়ীগণ নিম্নদরে চোরা পথেই আমদানী করছেন। মজার ব্যাপার, চোরাচালান বন্ধ করার দায়িত্বপূর্ণ পদে সমাসীন এমন সব ভদ্রমহোদয়ের হাত এতে রয়েছে যার দরুণ রপ্তানীর লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যবসায়ীদের এ ব্যাপারে যাবতীয় অভিযোগ অরণ্য রোদনে পর্যবসিত হয়েছে। তাছাড়া সাতক্ষীরা মহকুমার জনৈক এমসিএ চামড়া চোরাচালানে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকায় অসাধু ব্যবসায়ীদের হাতই মজবুত হয়েছে।

খুলনার নির্মম ইতিহাসের পাশাপাশি দালালের ঔদ্ধত্য কেমন মনে হয়

[কাজী আমানুল্লা প্রদত্ত]

খুলনা শহরে এসে অনেকে বলেন, বাংলাদেশের অন্যান্য জেলা, মহকুমা শহরের তুলনায় এখানে বর্বর পাকবাহিনীর তাণ্ডবলীলার নিদর্শন অনেক কম। কথাটা অবশ্য বাহ্যিক দৃষ্টিতে খুব একটা মিথ্যা নয়। সমস্ত শহর এলাকা ঘুরলে বুঝা যায় খুব বেশী একটা ঘর অগ্নিদগ্ধ হয়নি। বাহ্যত: বুঝবার উপায় নেই শহরের কোনদিকে কত ক্ষতি হয়েছে। অবশ্যি একটু তলিয়ে দেখলে যে কেউ শিউরে উঠবে। শিল্প এলাকা খালিশপুরে গেলে বুঝা যাবে বর্বর পাক সেনাবাহিনী মিলকারখানায় কী পরিমাণ ধ্বংস করেছে। শ্রমিকদের বস্তিগুলোর কোন চিহ্ন নেই। জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছে। বড় বড় পাটকলগুলোর যন্ত্রপাতি খুলে নষ্ট করে গেছে। আর সেই সাথে মটার আর লাইট মেশিনগানের গুলীতে কারখানাগুলোকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে। এর যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ ছিল না।

কম করে হলেও দশ হাজারের অধিক নিরীহ বাঙ্গালী শ্রমিককে নির্মমভাবে হত্যা করেছে পাকবাহিনী। আর সে সমস্ত লাশ ভৈরব নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছে। মেশিনগানের ব্রাশ ফায়ারে দৈনিক শতাধিক শ্রমিককে নদীর পাড়ে লাইন দিয়ে দাঁড় করিয়ে হত্যা করা হয়েছে। এরমধ্যে নারী-শিশু সকলেই ছিল। যুবতী মেয়েদের ধরে আটক করা হত এবং পরে তাদের উপর চলত পাশবিক অত্যাচার।

প্লাটিনাম ও ক্রিসেন্ট পাটকলের অভ্যন্তর প্রাঙ্গণে ফাঁসির মঞ্চ ও কসাইখানা নির্মাণ করা হয়েছিল। এখানে শ্রমিকদেরকে ধরে এনে হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখা হত, প্রথমে তাদের চোখ তুলে নেওয়া হত, তারপর হাত-পা কেটে ফেলত। পরে পুরুষাঙ্গ কেটে ঠোঁটের সাথে চামড়া ছিদ্র করে আটকিয়ে দিত। এভাবে অমানুষিক পাশবিক নির্যাতন চালাত তাদের উপর। ২৫শে মার্চ থেকে এপ্রিল এবং মে মাস পর্যন্ত খালিশপুরের মাটি লালে লাল হয়ে থাকত। আগুনের লেলিহান শিখা ২/৩ মাইল দূর থেকে দেখা যেত। পাক সেনাবাহিনী খালিশপুরের অবাঙ্গালীদের সহযোগিতায় বাঙ্গালীদের ঘরবাড়ী লুট করার পর আগুন ধরিয়ে দিত। সমস্ত খালিশপুর শহরে ধ্বংসের ও মৃত্যুর তাণ্ডবলীলা চলত। জীবনের ভয়ে যারা পালাতে চাইত তাদেরকে ধরে এনে পিঠমোড়া দিয়ে বেঁধে জবাই করা হত।

ইউ, এফ, ডি ক্লাব, নবকুমার লজ আর সার্কিট হাউজই ছিল দখলদারবাহিনীর কুখ্যাত ক্যান্টনমেন্ট। ওগুলো ছিল মৃত্যুদূতের আস্তানা। থমকে দাঁড়াতে হয় এ সব জায়গায় এসে। ক্লাব ঘরটাতে একসময় শহরের ধনীরা সারা রাত ধরে তাস, জুয়ো খেলতেন। মদ আর নারী এ দুটোও পাওয়া যেত। কিন্তু দখলদারবাহিনী এসে ক্লাবটাকে করল মৃত্যুদূতের আস্তানা। লোকদের ধরে এনে এখানে অকথ্য নির্যাতন করা হত। বারান্দার চৌকাঠে ঝুলত সার সার দড়ি। ফাঁসির বালা। চাপ চাপ রক্তের দাগ লেগে আছে বারান্দায় ও দেয়ালের গায়ে। মৃত্যুর বিভীষিকা যেন আজও ইথারে বিচরণ করছে।

হেলিপোর্টে তৈরী করা হয়েছিল ফাঁসির বালা। দড়িতে ঝুলিয়ে ধরে আনা লোকদের হান্টার দিয়ে নির্মমভাবে প্রহার করতো। গা চিরে লবণ লাগাতো, আঙ্গুলের ডগায় সূচ ঢুকাতো। মলদ্বারে হান্টার ঢুকাতো। করুণ আর্তনাদে ভরে উঠত আকাশ বাতাস। কালেক্টরির লোকগুলো তাই দেখতো। তাদের প্রাণ শিউরে উঠতো। ভয়ে হিম হয়ে যেত তাদের দেহ। মানসিকভাবে তারাও তৈরী হয়ে থাকতো মৃত্যুর জন্য।

ফরেস্টঘাটে লোক ধরে নিয়ে বেদম মারা হতো। মারের চোটে যখন দেহ অবশ হয়ে আসতো তখন লোকগুলোকে শুইয়ে দিতো। তারপর পেটে বেয়নেট ফেসিয়ে পৈশাচিক উল্লাসে নির্মমভাবে হত্যা করতো। সারি করে দাঁড় করিয়ে মেশিনগান চালাতো। তারপর লাশগুলো নদীতে ভাসিয়ে দিতো। ফরেস্টঘাটের পাশে জজ সাহেবের বাড়ী। তদানীন্তন জজ সাহেব এই নির্মম হত্যাকাণ্ড দেখতে দেখতে মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়েন এবং হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

লোয়ার যশোহর রোডের 'নব কুমার লজ' নারী ধর্ষণের জন্য ব্যবহৃত হতো। যুবতী নারীদের ধরে এনে একটি হোটেলে আবদ্ধ করা হতো এবং রাতের বেলা সামরিক অফিসাররা পছন্দমত নারী নিয়ে আসতো এই নব কুমার লজে। সারারাত ধরে ধর্ষণ করতো তারপর সেই সমস্ত মেয়েরা যখন নিস্তেজ হয়ে পড়তো তখন তাদেরকে হত্যা করা হতো। এই বাড়ীটায় বহু সায়া, ব্লাউজ, ব্রেসিয়ার পাওয়া গেছে।

বিশ হাজার নর- নারীর বধ্যভূমি গল্লামারীর বিল। সভ্যতার ইতিহাসে এত বড় জঘন্যতম হত্যাকাণ্ডের পর বর্বর সেনারা নারী নির্যাতনের জঘন্যতম নজীর রেখে গেছে এই বিলের আশেপাশে অবস্থিত ছোট ছোট কুঁড়ে ঘরে। বিলের চারদিকে শুধু লাশ আর লাশ। নর কঙ্কাল। বিক্ষিপ্ত হাড়গোড়। হাজার হাজার মাথার খুলি। মেয়েলোকের স্তন কাটা, মাথার চুল, শাড়ী, সায়া, ব্লাউজ ইত্যাদি।

ঘাসের উপর রক্তের চাপ দাগ। পুরুষের লিঙ্গ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছড়ানো। সে এক ভয়াবহ

দৃশ্য। না দেখলে বিশ্বাস হয় না। প্রতিদিন ও রাতে ট্রাক ভর্তি লোক এনে এই গল্লামারী বিলে হত্যা করা হতো। লাশের আধিক্যে জলাশয় ও স্রোতস্বিনি খালগুলোর মুখ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। অসহায় মানুষের আর্তনাদে রাতের আঁধার বিদীর্ণ হতো।

সৈয়দ মোল্যা, হাবিবুল হক, মানিক, শামছু মহি, ইছহাক, ইউসুফ মওলানা, মোহাম্মদ আলী, ব্যারিষ্টার আহাদ, সবুর খান এদের কথা খুলনাবাসী ভুলবে না। মুসলিম লীগ ও জামাতে ইসলামের এই পাণ্ডারা পাকবাহিনী নিয়ে এসে শহরের দোকানপাট তছনছ করে ঘর শূন্য করে দিয়েছেন। লাখ লাখ টাকা আত্মসাৎ করেছে। গ্রামে গ্রামে হানা দিয়ে নিরীহ লোকদের ধরে নিয়ে এসেছে। বর্বর

পাক বাহিনী তথাকথিত শান্তি কমিটির নামে সভা-সমিতি করে হিন্দু ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলের কর্মীদের ধরবার ষড়যন্ত্র করেছে।

শয়তান ইউছুফ মওলানা এখন ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে। মন্ত্রীত্বের স্বাদ তাকে জেলের প্রাচীরে আবদ্ধ করেছে। নরঘাতক হাবিবুল হক আত্মহত্যা করেছে। অন্যান্যরা এখনও ধরা পড়েনি। মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা ওদের খুঁজে বেড়াচ্ছে।

কিন্তু ওদের খুঁজে বের করতে পারবে কি? অনেকের মনেই আজ এই সংশয়ের ভাব। অনেক মুক্তিবাহিনীর সদস্যের মুখেও এই একই কথার প্রতিধ্বনি তাদের অনেকেরই অভিযোগ পাকবাহিনীর এই দুবৃত্ত দালালদেরকে বাঁচাবার জন্যে কতিপয় প্রভাবশালী ব্যক্তি বেশ কর্মতৎপর হয়ে উঠেছেন। দালাল ও রাজাকারের অনেক চাইতেই এখন প্রকাশ্য জলপথে নিবিঘ্নে ঘোরাফেরা করতে দেখা যাচ্ছে। এই সব ঘটনাকে কেন্দ্র করে জনমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়া বিচিত্র কিছু নয়।

তরল খনির সন্ধান ?

টাঙ্গাইল, ১৫ই এপ্রিল: শহরের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত পাড় দিঘুলীয়া গ্রামে একজাতীয় তৈলাক্ত তরল পদার্থের সন্ধান পাওয়া গেছে। এর গন্ধ অনেকটা পেট্রোলের মতো।

পাড় দিঘুলীয়ার রাস্তা বাঁধানোর জন্যে শ্রমিকরা একটি পুকুর থেকে মাটি কাটার সময় এই তৈলাক্ত পদার্থের সন্ধান পায়। এখনো এর রাসায়নিক সঠিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়নি। পদার্থটি ড্রামে পুঁতে রাখা পেট্রোল, কেরোসিন বা কীটনাশক ঔষধ হতে পারে বলে অনেকের ধারণা। বিশেষজ্ঞ দিয়ে এর পরীক্ষা করা প্রয়োজন। স্থানটি পুলিশ প্রহরাধীন রয়েছে।

মুজিবাদী দালাল

স্বাধীন বাংলাদেশে পাক আমলের দাললদের দালালী করবার কেউ থাকবেন, একথা স্বপ্নেও কোনদিন ভাবা যায়নি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় আওয়ামী লীগের বড় বড় নেতা, প্রভাবশালী এমসিএ এবং সরকারী অফিসারগণ অসংখ্য দালালকে গ্রেফতার ও শাস্তি থেকে রেহাই দিতে রীতিমত মনোযোগের সাথে কাজ করে যাচ্ছেন। হক-কথা সমীপে বিভিন্ন এলাকার জনগণের তরফ থেকে অভিযোগ পত্র আসছে। কোথাও কোথাও এমসিএ-দের নির্দেশে দালালদের জেল-হাজত থেকে ছেড়ে দেয়া হচ্ছে। খবর নিয়ে জানা যায়, দালালটি মাত্র কয়েক হাজার টাকা 'চাঁদা' দানের বিনিময়ে সাধু সাজার সার্টিফিকেট পেয়ে গেছেন। কোথাও দালালেরা একেবারে ধরাই পড়েনি। আওয়ামী লীগের নেতাদের সাথে যৎসামান্য লেনদেন করেই আপোষ রফায় পৌঁছেছেন। জনগণের চাপে যদিও বা কোথাও পুলিশ তাদের কাউকে গ্রেফতার করে বসে তৎক্ষণাৎ এমসিএ-দের পক্ষ থেকে সুপরিশমূলক হুকুম পাঠানো হয়। অথচ এসব

দালালের সহযোগিতায়ই হানাদারবাহিনী হত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন সব সেরেছে। এমনকি হত্যাকাণ্ডে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত এমন দালালও বেঁচে যাচ্ছে। একদিকে ঘটনা যখন এইরূপ অপরদিকে দালাল বাছাই অভিযানের নামে মুজিববাহিনীও আওয়ামী লীগের স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর তথাকথিত দেশপ্রেমিক চেলারা নতুন করে হয়রানি, রাহাজানি, লুণ্ঠন চালিয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে তাই আজ চরম অশান্তি ও অনিরাপত্তা দেখা দিয়েছে। এই সুযোগে আওয়ামী লীগের সমর্থক সেজে বহু লোক পারিবারিক রেষারেষি হিংসা-বিদ্বেষকে রাজনৈতিক রূপ দিয়ে অশুভ উদ্দেশ্য হাসিল করে নিচ্ছে। দালালদের চৌদ্দ গোষ্ঠি উদ্ধার করার কর্মতৎপরতার ফলে জেল-হাজতে বহু নির্দোষ মানুষও ধুকে মরছে এমন তথ্যও আমাদের হাতে রয়েছে। তাদের মধ্যে রয়েছে নিরীহ অর্থবান ব্যবসায়ী, বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মী এবং ক্ষেত্র বিশেষে আওয়ামী নেতাদের কুকাণ্ডের নির্ভীক সাক্ষী।

সরকারী- বেসরকারী বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানে বহু দালাল বহাল তরিয়তে দিন গুজরাণ করছেন তার অসংখ্য নজির রয়েছে। একে একে হক-কথার 'ইহা কি সত্য' কলামে তা প্রকাশও পাচ্ছে। তাতে দেখা যায় খোদ প্রধানমন্ত্রীর সাঙ্গপাঙ্গদের মধ্যেই কতিপয় নামজাদা দালাল সুকৌশলে স্থান করে নিয়েছেন। মন্ত্রীরা নেতার আদর্শ অনুসরণ করে দালাল পালনের মহতী কাজে শরীক হয়ে অশেষ সওয়াব হাসিল করছেন। এমনও নজির ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে নির্ভেজাল দালাল অফিসার স্বাধীনতার পর প্রমোশন পেয়ে গেছেন। প্রত্যেকটি ঘটনার অন্তরালে বিশেষ কারণ ও উদ্দেশ্য রয়েছে এতে কোন সন্দেহ নেই।

কিন্তু জনগণের সরকার বলে দাবী করে কীভাবে বাংলাদেশের এক নম্বরের দুশমনদের প্রশ্রয় দেয়া হচ্ছে আমরা তাই ভেবে পাই না। অপ্রত্যাশিত এতসব প্রক্রিয়ার প্রতিক্রিয়ায় জনগণ সোচ্চার হয়ে উঠেছেন। বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রধানমন্ত্রী সমীপে দালালী খতিয়ান বয়ান করে অভিযোগ পত্র পেশ করা হচ্ছে। এসবের অনুলিপি হক-কথা কার্যালয়েও পাঠানোর ফলে আমরা অনুধাবন করতে পারছি- কত বেইনসাফী এই স্বাধীন বাংলাদেশে অবাধ গতিতে চলছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরপরই এসব দালালের গণআদালতে বিচার হওয়াই সমিচীন ছিল। কিন্তু সরকার ক্ষমতা দখলের অনুকূল অবস্থা বজায় রাখতে তা হতে দেননি। বেতারে প্রচার চালিয়ে, ভারত সৈন্যের সাহায্য গ্রহণ করে জনগণের রায়কে উপেক্ষা করা হয়েছে। তা না হলে আজ হয়ত আর যাই হোক দালালের দৌরাত্ম এবং ঔদ্ধত্য থেকে বাঙ্গালী জাতি চিরদিনের জন্য রেহাই পেত।

(পরবর্তী কিস্তিতে ক্ষমাপ্রাপ্ত দালালদের পরিচয় ও ইতিহাস ভুলে তুলে ধরা হবে।)

কৃষককে শোষণ করতে এম সি এ দের অশুভ পদক্ষেপ

অগভীর নলকূপ সরবরাহকে ভিত্তি করে কমপক্ষে ৩০ জন এম সি এ বাংলাদেশের শত শত কৃষক পরিবার থেকে কয়েক লক্ষ টাকা বেআইনীভাবে উঠিয়ে নিচ্ছেন বলে কৃষি উন্নয়ন সংস্থার একটি হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে।

সাবেক পশ্চিম পাকিস্তানের ইদ্রিস এ্যাণ্ড ব্রাদার্স কোম্পানী যুক্তরাষ্ট্র থেকে সেচ কার্যে $^1/_2$ কিউসেক পরিমাপে ব্যবহারোপযোগী বহু শ্যালো টিউবয়েল বা অগভীর নলকূপ আমদানী করেন। কিন্তু সেগুলোর অধিকাংশই স্বল্প মেয়াদী প্রমাণিত হলে তদানীন্তন কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা ও কৃষি দফতরে অর্থবলে প্রভাব খাটিয়ে সংশ্লিষ্ট কোম্পানী বাংলাদেশের কৃষি

উন্নয়ন সংস্থার মাধ্যমে অচল মাল চালিয়ে দেবার অশুভ ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি নলকূপ মাত্র ৩৬ ডলারে বিক্রয় হলেও উক্ত ইদ্রিস এ্যান্ড ব্রাদার্স কোম্পানী সেগুলোর মূল্য সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা নির্ধারণ করে কৃষকদের নিকট সরবরাহ করেন। কৃষকদের তজ্জন্য অর্ধেক অর্থাৎ ২৭৫০ টাকা নগদ শোধ করতে হত আর সরকার বাকি অর্ধেক ঋণ স্বরূপ জমা দিতেন। শুভঙ্করী ফাঁকির এহেন কারসাজিতে দেখা গেছে উক্ত কোম্পানী প্রতি নলকূপে কমপক্ষে ২০০০/- টাকা লাভ করেছে। আশা করা গিয়েছিল পাকিস্তানী আমলের এহেন চাষী শোষণ নীতি এবার বন্ধ হবে। কিন্তু আওয়ামী লীগের এসসিএ-দের বদৌলতে তা বরং বেড়েছে।

ঢাকায় গুদামজাত ইদ্রিস এ্যান্ড কোম্পানীর বেওয়ারিশ কয়েক হাজার টিউবওয়েল এম সিএ সাহেবদের মাধ্যমে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় বিক্রয় করে কৃষকদের নিকট থেকে প্রতিটির মূল্য সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা আদায় করা হচ্ছে। অথচ সরকার খোলা বাজারে টিউবওয়েলগুলো অর্ধেক মূল্যে বিক্রয় করতে পারতেন। তাতে সরকারের কোন ক্ষতি তো হতই না বরং প্রচুর পরিমাণে লাভ থেকে যেত। কিন্তু এমসিএ সাহেবরা কুবুদ্ধি দিয়ে ক্রেতা কৃষককে পাকিস্তানী কায়দা ও মাত্রায় শোষণ করবার পথ করে নিয়েছেন। সংশ্লিষ্ট এম সি এ সাহেবরা প্রতিটি নলকূপ সরবরাহ করে কমপক্ষে ২০০০/- টাকা লাভ করছেন। এতে দেখা যায় বাংলাদেশের বিধ্বস্ত কৃষি-অর্থনীতি থেকেও আড়াই ডজন এম সি এ লক্ষ লক্ষে টাকা সুকৌশলে লুট করে নেবার ফন্দী এঁটেছেন।

নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রকাশ, টাঙ্গাইলসহ কয়েকটি জেলায় এমন লুণ্ঠনলীলা অবাধ গতিতে চলছে যা একমাত্র জাগ্রত কৃষকসমাজই রোধ করতে সক্ষম।

ন্যাপের কেন্দ্রীয় পরিষদের সভা

গত ১৪ই এপ্রিল সন্তোষে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সভাপতিত্বে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির কেন্দ্রীয় সংগঠক পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। আগামী ১০ই জুনের মধ্যে ন্যাপের সকল নগর ও জেলা সম্মেলন সম্পন্ন করবার নির্দেশ দান করে ২৩, ২৪ ও ২৫ শে জুনে কেন্দ্রীয় পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠানের এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। সভায় জনাব বজলুস সাত্তারকে আহ্বায়ক করে একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন সাব কমিটি গঠিত হয়। কমিটিকে সাহায্য করতে মওলানা সাহেব তিনজন শাসনতন্ত্র বিশেষজ্ঞ মনোনীত করবেন। গণপরিষদে বিবেচনার জন্যে উক্ত কমিটি এর একটি খসড়া রচনা করবেন। সভায় কয়েকজন সদস্যকে কেন্দ্রীয় কমিটিতে কোঅপ্ট করা হয়। (আগামী সপ্তাহে সভার পুরাপুরি প্রস্তাব পেশ করা হবে। কৃষক সমিতির রিপোর্ট ৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন।)

শিবপুর সম্মেলনে সাহায্য দানের আবেদন

বাংলাদেশ কৃষক সমিতির আহ্বায়ক মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী আগামী ২৯শে ও ৩০ শে এপ্রিল ঢাকা জেলার শিবপুরে অনুষ্ঠিতব্য সমিতির পূর্বাঞ্চলীয় সম্মেলন সংগঠনে সাধ্যানুযায়ী দান করার আবেদন জানিয়েছেন। উৎসাহী শুভাকাঙ্ক্ষীকে 'বাংলাদেশ কৃষক সমিতি পূর্বাঞ্চল সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটি, একাউন্ট নম্বর ৩৯৪০, জনতা ব্যাঙ্ক লিঃ, মতিঝিল শাখায়' তা জমা দিতে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

ভিয়েতনাম পরিস্থিতিতে ভাসানী উদ্বিগ্ন

সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে আফ্রো-এশিয়া ল্যাটিন আমেরিকার মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী উত্তর ভিয়েতনামে উদ্ভূত সর্বশেষ পরিস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। দক্ষিণ- পূর্ব এশিয়ায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করতে মওলানা সাহেব বিশ্বের শান্তিকামী জাতিগুলির প্রতি দুর্বার গণআন্দোলন গড়ে তুলবার উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের বেপোরোয়া বোমা বর্ষণের তীব্র নিন্দা করেছেন। বিবৃতিতে দক্ষিণ ভিয়েতনামের অস্থায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী সরকারকে স্বীকৃতি জানাতে মওলানা সাহেব বাংলাদেশ সরকারের প্রতি অনুরোধ জানান।

প্রিয় নুরুল ইসলাম সিদ্দিকী

তুমি গত ৫ই এপ্রিল হইতে বাড়ী ছাড়িয়াছ। কোথায় গিয়াছ জানাও নাই। যাহোক, তুমি সত্বর বাসায় চলিয়া আস। তোমার কোন ভয় নাই।

তোমার আম্মা

হক-কথা

৩রা বৈশাখ রবিবার

পাঁচ লক্ষ বাঙ্গালীর মুক্তি

বাংলাদেশ ও পাকিস্তান নীতিগতভাবে নাগরিক বিনিময়ে সম্মত হইয়াছে। যেসব নাগরিক স্বেচ্ছায় স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে চান দুই সরকার তাহাদের বিনিময় করিবেন।

নীতিগত সম্মতি আমাদের নৈরাশ্য কিছুটা ঘুচাইবার দাবী রাখে বটে, কিন্তু যেহেতু ব্যাপারটি প্রেসিডেন্ট ভুট্টোসহ পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠীর সহিত জড়িত, তাই কার্যত: কামিয়াব না হওয়া পর্যন্ত তাহাতে পুরাপুরি আশাবাদী হইবার কিছুই নাই।

পাকিস্তানে অবস্থানরত পাঁচলক্ষ বাঙ্গালীকে অনিশ্চিত অবস্থায় রাখিয়া আমরা স্বাধীনতার স্বাদ ভোগ করিতেছি – এই কথা ভাবা মাত্রই ধিক্কার, অস্বস্তি এবং উৎকণ্ঠা বোধ হয়। কিন্তু তাহাদিগকে ফেরত পাওয়ার প্রশ্নে সাড়ে সাত কোটি মানুষের একক ইচ্ছাশক্তি কোন কাজে আসিতেছে না, আসিবার কথাও নহে। কারণ যাহারা আমাদের জানি দুশমন তাহাদের হাতেই বাঙ্গালী পরিবারগুলি আটক রহিয়াছে। নরম মেজাজে পাকিস্তানী শাসক ও সামরিক গোষ্ঠী আমাদের স্বাধীনতা গ্রহণ করে নাই। এত হত্যা, এত ধ্বংস তাহাদের পশুসুলভ মনোবৃত্তিকে তৃপ্ত করিতে পারে নাই। তদুপরি স্বাধীন জাতি হিসাবে বিশ্বব্যাপী বাঙ্গালীর ইজ্জত বৃদ্ধিকে তাহারা কোন ক্রমেই বরদাশত করিবার কথা নহে। এই-ই যখন মানসিকতা, কি করিয়া আমরা তাহাদের নিকট হইতে মানবিক এবং যুক্তিসঙ্গত আচরণ আশা করিতে পারি।

বোধকরি এই সত্যটুকু উপলব্ধি করিয়াই বিগত ৯ই এপ্রিলে অনুষ্ঠিত পল্টনের জনসভায় মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী বাঙ্গালী পরিবারগুলিকে বাংলাদেশে ফেরত দিবার দাবীতে গণআন্দোলন গড়িয়া তুলিতে বিশ্বাসবাসীর প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, বাঙ্গালীরা পাকিস্তানে এমন কোন অপরাধ করে নাই যাহা পাক-বাহিনীর সমপর্যায়ের শামিল বলিয়া গণ্য হইতে পারে। এমনকি তাহারা রাষ্ট্রদ্রোহীমূলক কোন কাজেও লিপ্ত হয় নাই। আত্মসমর্পণকৃত সৈন্যদের ভাগ্যের প্রেক্ষিতে বাঙ্গালী পরিবারগুলির ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করিবার কোন যৌক্তিকতা নাই। মওলানা সাহেব আবেদন জানাইয়াছেন, ভারত, রাশিয়া ও অন্যান্য বন্ধুরাষ্ট্র প্রচারের মাধ্যমে বিশ্বজনমত গড়িয়া তুলিয়া পাকিস্তানের উপর কার্যকরী চাপ সৃষ্টি করিতে পারেন।

খবরে প্রকাশ, রাষ্ট্রপতি জনাব আবু সাঈদ চৌধুরীও বাঙ্গালী বিনিময়ের ব্যাপারে পাকিস্তান সরকারের অনমনীয় মনোভাব সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী আন্দোলন সৃষ্টির আহ্বান জানাইয়াছেন। তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে, পাকিস্তানের বন্দী শিবিরে অবস্থানরত বাঙ্গালীদের মুক্ত করিবার জন্য যদি পাকিস্তানকে বাধ্য করা না হয় তাহা হইলে আর একটি মানবিক দুর্যোগ অবশ্যম্ভাবী।

মানবিক দুর্যোগটির কথা ভাবিতেই আমাদের চেতনা শিহরিয়া উঠে। যাহারা মানুষের যন্ত্রণা, বেদনা ও হতাশাকে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গীতে ভাবিতে চায় না, যাহারা হুমকি, হত্যা আর হয়রানিকে নিস্পৃহ স্বাভাবিকতায় রূপান্তরিত করে – তাহাদের আওতায় আমাদের ভাই-বোন, মা-বাবা রহিয়াছেন, একবার অনুভব করিতেও ভয় লাগে। আমরা কি সত্যিই উপলব্ধি করিতে পারিতেছি, কী দুঃসহ পরিবেশ সহ্য করিয়া পাঁচ লক্ষ বাঙ্গালী পাকিস্তানে বসবাস করিতেছে? আমরা কি তাহাদের নিরুপায় অবস্থাকে একান্ত আপন করিয়া ভাবিতে পরিতেছি? তাই যদি হয়, তবে নিশ্চয়ই অতি প্রথম আমাদের দেশে বাঙ্গালী মুক্তির দাবীতে গণআন্দোলন শুরু করিতে হইবে। আমাদের গলা ফাটানো দাবী নয় বরং আকাশ কাঁপানো গণআন্দোলনই বিশ্ব বিবেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। একমাত্র তখনই আমরা আশা করিতে পারি– পাকিস্তান বিশ্বজনমতের চাপে আমাদের পরিবারগুলিকে সসম্মানে স্বদেশে ফিরিবার অনুমতি ও সুযোগ দান করিবে।

বাংলাদেশে শ্রেণী সংগঠনের ইতিহাস

আবদুল হামিদ খান ভাসানী

আজ বাংলাদেশ কৃষক সমিতি ও বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি লইয়া জনমনে নানারূপ বিভ্রান্তি সৃষ্টি হইয়াছে। দেশবাসী জানেন যে এই দুইটি সংগঠনকে বহু বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়া আমি প্রতিষ্ঠা করি। জনগনের বিভিন্ন সংগ্রামের পুরোভাগে থাকার ফলে জনমনে তাহা প্রতিষ্ঠিত হয়। আজ দুঃজনক হইলেও সত্য যে কিছু সংখ্যক রাজনীতিবিদ – যাহারা আশ্রয় লইয়া ঘোর দুর্দিনে এই সকল সংগঠনে ছিল – আজ রাজনৈতিক সুবিধা লাভের জন্য দেশপ্রেমের সার্টিফিকেট বুকে আঁটিয়া আমার সংগঠনের নাম ব্যবহার করিতেছে। জনগণকে বিভ্রান্ত করিবার জন্য আমার এবং আমার সংগঠনের বিরুদ্ধে নানা প্রকার প্রচারে নিজেদের নিয়োজিত করিয়াছে। অর্থব্যয়ে বিরাট প্রচার মাধ্যম ব্যবহার করিয়া তাহারা ইহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতেছে যে তাহারাই মূল সংগঠনের লোক। প্রয়োজনবোধে দলে লোক ভিড়াইবার জন্য তাহারা আমার নাম ব্যবহার করিতেও দ্বিধা করে না। জীবনের শেষ অধ্যায়ে দাঁড়াইয়া ইতিহাসকে পরিষ্কার রাখিবার জন্য দেশবাসীর কাছে এই সম্পর্কে আমি তাই কিছু বক্তব্য রাখিতে চাই।

পাকিস্তান হওয়ার পর বাংলাদেশের কৃষকদের সংগঠিত করিবার জন্য আমি ১৯৫৬ সালে সন্তোষে প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করি। সাতচল্লিশের পর বাংলাদেশের কৃষক সংগঠনের কোন অস্তিত্ব ছিল না। শোষণ ও অন্যায়ের কবলে জর্জরিত কৃষকদেরকে সংগ্রামে সংঘবদ্ধ করিবার জন্য কৃষক সমিতি গঠনের প্রস্তাব করি। সেই সময় আমি আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট ছিলাম। আমার আওয়ামী লীগের তৎকালীন বন্ধুরা – শেখ

মুজিব, অলি আহাদ প্রমুখ তখন এই প্রস্তাবে আপত্তি উত্থাপন করে। তাহাদের বক্তব্য ছিল আওয়ামী লীগ গঠনের সেই সময়ে শ্রেণী সংগ্রাম ভিত্তিক সংগঠন গড়িয়া তুলিলে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় দলে থাকিবে না। তাহারা দুই বছরের জন্য এই সংগঠন গড়া স্থগিত রাখিতে অনুরোধ জানায়। তাহাদের বক্তব্য অনুযায়ী আমি সেই সময় চুপ করিয়া যাই।

পরবর্তী পর্যায়ে স্বায়ত্বশাসন ও পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি ইত্যাদি প্রশ্নে যখন আমি আওয়ামী লীগ ত্যাগ করিয়া ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি গঠন করি, তখন পুনরায় আমি এই ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করি। ১৯৫৮ সালের ১ লা, ২রা ও ৩রা জানুয়ারিতে ফুলছড়িতে প্রথম কৃষক সম্মেলন আহুত হয়। দুইদিন যাবত কৃষক সমিতি গঠন করা বা না করা সম্পর্কে তুমুল বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। আওয়ামী লীগ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া কমিউনিস্ট কর্মীরা সেই সময় ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিতে সংঘবদ্ধ হইয়াছিল। প্রাক্তন আওয়ামী লীগ সহকর্মীদের মত ইহার ও একই যুক্তি উত্থাপন করে যে যেহেতু মধ্যবিত্তরা রাজনৈতিক দল পরিচালনা করে সেইহেতু শ্রেণী সংগ্রাম ভিত্তিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করিলে এবং শ্রেণী সংগ্রাম শুরু হইলে তাহারা দলে থাকিবে না। আমি আমার সিদ্ধান্তে অটল থাকি যে মধ্যবিত্তরা চলিয়া গেলেও কেবল কৃষকদের লইয়া কৃষক সমিতি করিব। আমার এই দৃঢ় সিদ্ধান্তে তাহারা ঐ প্রস্তাব মানিয়া নেয়। কিন্তু কৌশল পরিবর্তন করিয়া জেলা, মহকুমা তথা প্রতি পর্যায়ে কৃষক সমিতির মূল আসনসমূহ দখল করিয়া লয় এবং তাহাদের চিন্তা অনুসারে কৃষক সমিতিকে অগ্রসর না করিয়া তাহাকে স্থবির করিয়া রাখিয়া দেয়।

১৯৬৩ সালে জেল হইতে বাহির হইয়া আসিয়া আমি পুনরায় কৃষক সমিতি পুনর্গঠনে অগ্রসর হই। কিন্তু বিস্ময়কর হইলেও সত্য, সেই সময় আত্মগোপনকারী ও কমিউনিস্ট কর্মীরা বর্তমানে প্রকাশ্যে যাহাদের অধিকাংশ মস্কোপন্থী কমিউনিস্ট নামে পরিচিত – কৃষক সমিতি পুনর্গঠন করার ব্যাপারে পুনরায় আপত্তি উত্থাপন করে। কিন্তু তথাপিও কৃষক সমিতিকে পুনরুজ্জিবীত করা হয়।

একই সনে উত্তরবঙ্গে কৃষক সমিতির যে সভা হয় একই বন্ধুরা পুনরায় একই ভাবে বাধা প্রদান করেন।

কিন্তু কৃষক সমিতি অপ্রতিরোধ্য গতিতে চলিতে থাকে এবং বাংলাদেশের অনেকেই কৃষক সমিতির পতাকাতলে সমবেত হয়। ইতিমধ্যে এই বন্ধুদের সাথে সম্পর্কছিন্নকারী আরও কিছু 'অতিবাম' বন্ধু কৃষক সমিতি করার কাজে বাধা সৃষ্টি করা শুরু করেন। এই দুই বন্ধুরা তাহাদের আদর্শগত লড়াইয়ে পরস্পর চরম বিরোধী হইলেও কৃষক সমিতি না করার ব্যাপারে ভিন্নভাবে একমত ছিলেন। ১৯৬১ সালে পাকশী কৃষক সম্মেলনের মধ্য দিয়া কৃষক সমিতির যে নতুন কার্যক্রম শুরু করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয় এই সকল বন্ধুরা তাহাতে যোগদানে বিরত থাকেন তাহারা এই সম্মেলনকে মেলা, জলসা ইত্যাদি নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন। ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিয়া প্রবন্ধ লিখিয়াছে। কিন্তু তাহাদের সকল বাধাকে উপেক্ষা করিয়া ১৯শে জানুয়ারি ৭০ সালে সন্তোষ ও ১২ই এপ্রিল মহীপুরে ব্যাপক কৃষক জমায়েত ইহাই প্রমাণ করিয়াছে যে এদেশের ব্যাপক কৃষক জনতাকে কেউ উপেক্ষা করিলেও তাহারা তাহাদের নিজস্ব স্বার্থে, শ্রেণীস্বার্থে সংগঠিত হইতে চায় এবং সংগ্রাম করিতে চায়। ভারতীয় সংবাদপত্র ও রেডিও মহীপুরে তিন লক্ষ কৃষক জমায়েতের কথা প্রচার করে।

ইহা আজ দিনের আলোর মত স্পষ্ট যে বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামে এই সকল কৃষক সম্মেলনের সুদূর প্রসারী প্রতিক্রিয়া হয়। এই সকল সম্মেলনের ফলে ব্যাপক কৃষক সমাজ গ্রামে গ্রামে শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভে

জাগিয়া উঠে। পাকশাসকগোষ্ঠীকে উৎখাত করিবার সংগ্রামে তাহারা উদ্বুদ্ধ হয়। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের শতকরা পঁচিশ ভাগ লোকও স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠীর পক্ষে থাকিত তবে যুদ্ধের অবস্থা অন্যরূপ দাঁড়াইত। বাংলাদেশের কৃষক-শ্রমিক পাকসরকারের পক্ষে ছিল না এবং তাহারাই সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। বিহারী বাঙ্গালী দালাল বা এক শ্রেণীর তথাকথিত মৌলভী-মাওলানা যাহারা বদরবাহিনীতে যোগদান করিয়া অন্যায় ভাবে পাকিস্তানী বর্বর সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে হাত মিলাইয়া বাংলাদেশের কোটি কোটি ঘর জ্বালাইয়াছে, নি:স্ব নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা করিয়াছে। তাহার মূলে কাজ করিয়াছে ঐ সমস্ত কৃষক শ্রমিকদের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা যাহারা লালটুপী, লালপতাকা লইয়া কৃষক- মজুর রাজ কায়েম কর, শ্রমিক-কৃষক অস্ত্র ধর পূর্ব বাংলা স্বাধীন কর, কৃষক-শ্রমিকদের সংখ্যানুপাতে আইনসভা ও অন্যান্য সংস্থাসমূহে আসনচাই, কৃষকের ভোটে অকৃষক নির্বচিত হইতে পারিবে না ইত্যাদি শ্লোগান দিয়া বাংলাদেশে নতুন আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়াছিল।

বাংলাদেশ স্বাধীন হইবার পর আমি কৃষক সমিতি পুনর্গঠিত করিবার জন্য পুনরায় পদক্ষেপ গ্রহণ করি এবং কিছু দিন পূর্বে সন্তোষে কৃষকসমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক আহ্বান করি। তখন সেই পূর্বতন বন্ধুরা (যাহারা মস্কোপন্থী নামে পরিচিত) যাহারা কৃষক সমিতি গঠন ও শ্রেণী সংগ্রামের ঘোর বিরোধী ছিল, জোর ভাষায় উহার বিরুদ্ধে আপত্তি জানায়। কারণ ইতিমধ্যেই তাহারা অদৃশ্য হাতের ইঙ্গিতে আমার সংগঠনের নাম ব্যবহার করিয়া উহাকে শ্রেণীসংগ্রামের পথ হইতে বিচ্যুত করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অদৃষ্টের পরিহাস যে আজ সেই সমস্ত বর্ণচোরারা কৃষক দরদী সাজিয়া মায়ের চেয়ে মাসীর দরদ বেশী দেখাইবার জন্য সারা বাংলাদেশ চষিয়া বেড়াইতেছে এবং আমার প্রতিষ্ঠিত কৃষক সমিতি ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন কুসা প্রচার করিয়া বেড়াইতেছে।

তাহাদের অনুসৃত পথে কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করিয়া ঐ সমস্ত লোক তাহার কর্মসূচী অনুযায়ী কাজ করিলে আমার কোন আপত্তি নাই। আমি গণতন্ত্রকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করি। অতএব যেকোন দেশে কমিউনিস্ট পার্টি মুক্তভাবে কাজ করিবার অধিকারী বলিয়া আমি মনে করি। কিন্তু যে কৃষক সমিতি ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি গঠন করিতে আমি বহু নির্যাতন ভোগ করিয়াছি এবং সারাজীবন কৃষক ও ভূমিহীন কৃষকের মধ্যেকাজ করিয়াছি আজ সেই কৃষক সমিতি ও ন্যাপের নাম ভাঙ্গাইয়া ঐ সকল তথাকথিত কমিউনিস্টরা নিজেদের হীন স্বার্থ উদ্ধার কল্পে নানা ভাবে প্রচার চালাইতেছে।

দেশবাসীর কাছে আজ আমি স্পষ্টভাবে বলিতে চাই যে কেবল আজ নয়, অবিভক্ত বাংলায় কৃষকদের ঋণের বোঝা লাঘব করিতে বাংলা ১৩২৫ সাল হইতে বাংলার ২৮টি জিলায় গ্রামে গ্রামে জমিদার মহাজনদের বিরুদ্ধে আমি কৃষক আন্দোলন করিয়াছি – যাহার জন্য তৎকালীন বৃটিশ সরকার কৃষক মজুরদের প্রভাবে আমাকে কতবার কারাগারে পাঠইয়াছে, বাংলাদেশ হইতে বহিষ্কার করিয়াছে। যাহারা প্রবীণ তাহারা সকলেই অবগত আছেন ১৩৩৭ সালে আমি প্রাজাস্বত্ব আইনের জন্য টাঙ্গাইলের চারাবাড়ীতে কৃষক সভা অনুষ্ঠিত করি। সেই সময় কৃষকের জমিতে কোন স্বত্ব ছিল না, গাছ বপণ করিতে পারিত কিন্তু জমিদারের বিনা হুকুমে কাটিতে পারিতনা, মসজিদ-মন্দির তৈরি করিতে, জলাশয়-পুকুর খনন করিতে পারিত না। ১৩৩৮ সালে সিরাজগঞ্জ শহরের নিকট কাওয়াখোলা ময়দানে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ

কৃষক জমায়েত হয় এবং আমি সারা বাংলা হইতে একুশ মণ ঋণের তালিকা সংগ্রহ করি। ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেন চিটাগাং বিভাগীয় রিটায়ার্ড কমিশনার খানবাহাদুর আবদুল মোমেন সাহেব। ঐ সভার চারদিন পূর্বে বাংলার ২৮টি জেলার জমিদারদের অনুরোধে সভায় ১৪৪ ধারা জারী করিয়া বঙ্গ-আসাম প্রজা সম্মেলন বন্ধ করিয়া দিবার চেষ্টা করা হয়। সকলে ঐক্যবদ্ধ ভাবে দাবী জানায় যে ভাসানী সভা করিতে পারিলে বাংলার কোন অঞ্চলে খাজনা আদায় হইবে না, ঋণ পরিশোধ হইবে না। এই সভার মাস খানেক পূর্বেই বাংলার জমিদারদের দাবী অনুযায়ী ১২ ঘন্টার মধ্যে ময়মনসিংহ ছাড়ার জন্য বাংলা সরকার আমাকে নির্দেশ প্রদান করে। ময়মনসিংহের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ গ্রাহাম টাঙ্গাইলে আমার হাতে উক্ত নোটিশ প্রধান করিয়া পুলিশ দ্বারা আমাকে ময়মনসিংহ হইতে বাহির করিয়া দিলে আমি সিরাজগঞ্জে উক্ত সম্মেলনের ব্যবস্থা করি। শেষ পর্যন্ত বহু চেষ্টা করিয়া সরকারী নির্দেশ প্রত্যাহার করান হয়। উক্ত সম্মেলনে ঋণ ও সুদ আদায়ের ব্যাপারে মনিটোরিয়ামের প্রস্তাব পাশ করা হয়। ১৩৩৯ সালে রংপুর জেলায় সাঘাটা থানায়ও কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত করি। আসামে দীর্ঘদিন থাকিয়া কৃষকদের লাইনসিষ্টেম প্রথা উচ্ছেদের ব্যাপারে আমার ভূমিকার কথা সকলে অবগত আছেন। বাঙ্গাল খেদা আন্দোলনে কৃষকদের মাতৃভাষা বাংলাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমি কাজ করিয়াছি।

অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ, সামন্তবাদের বিরুদ্ধে বাল্যকাল হইতে খেলাফত আন্দোলন, কংগ্রেস আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন, মুসলিমলীগ আন্দোলন প্রভৃতিতে ধনিক, বনিক, জমিদার, মহাজন, জায়গীরদার, মীরাশদারদের বিরুদ্ধে অবিরামভাবে সংগ্রাম করিয়া আমি দীর্ঘকাল কারাবরণ করিয়াছি। এ সত্যও দেশবাসী অবগত আছে এবং যাহা প্রকাশ করা প্রয়োজন পড়ে না।

কিন্তু আজ এই সকল মক্কোপন্থী তথাকথিত কমিউনিস্টরা আমাকে সাম্রাজ্যবাদী, দালাল, পুঁজিবাদের অনুচর, কৃষক মজুরদের শত্রু বলিয়া নানা কৌশলে পুস্তক-পুস্তিকা ছাড়াইয়া এবং সভা-সমিতিতে প্রচার করিয়া বেড়াইতেছে। আমি তাহাদের বিরুদ্ধে কিছুই বলিতে চাইনা। কেবল এই সত্যটি আজ সকলকে জানাইয়া দিতে চাই যে সত্যের কখনো মৃত্যু হয় না, ন্যায় কখনও অন্যায় হয় না। গোয়েবেলসীয় নীতি অনুযায়ী একশবার মিথ্যা বলিলে সত্য হয়, ইহা মোটেই সত্য নহে। পৃথিবীতে একই নামে দুইটি দল কখনও কাজ করে না। কিন্তু তথাকথিত এই সকল কমিউনিস্টরা বাংলাদেশ কৃষক সমিতি ও ন্যাপের নামে সংগঠন করিতে সর্বত্র চেষ্টা করিতেছে। আমি স্পষ্ট বলিতেছি যে আমি এবং আমার সহকর্মীরা বহু নির্যাতনের মুখে যে কৃষক- সমিতি ও ন্যাপ গঠন করিয়াছি তাহার নাম ব্যবহার করিবার অধিকার কাহারও নাই।

কৃষক ক্ষেত-মজুর ভ্রাতাগণ ধোকাবাজের কথায় কর্ণপাত করিবেন না। যে ত্যাগ, তিতিক্ষার ফলে এই সংগ্রামী সংগঠন সমূহ গড়িয়া উঠিয়াছে, জনতার স্বার্থে দেশের স্বার্থে এবং ভবিষ্যত সংগ্রামের স্বার্থে তাহাকে অটুট রাখুন। সকল ব্যাপারে আমার সহিত শহীদ আসাদনগর (সন্তোষ), টাঙ্গাইল, এই ঠিকানায় সরাসরি যোগাযোগ করুন। জনতার সংগ্রামী প্রতিষ্ঠান সমূহকে সংগ্রামের সঠিক পথ হইতে বিচ্যুত হইতে দিব না এই প্রতিশ্রুতি আমি দিতে চাই। আপনাদের কাছেও আমার একই আহ্বান।

ভাসানীর বাণী

প্রভুত্বমূলক বন্ধুত্ব নয় – ভ্রাতৃত্বধর্মী বন্ধুত্বই আমাদের কাম্য। প্রভুত্ব বন্ধুত্বকে কুপমন্ডক ও কৃত্রিম করে ফেলে। আর ভ্রাতৃত্ব বন্ধুত্বকে ত্যাগ ও ভালবাসায় ভরপুর করে তোলে।

আমরা আত্মনির্ভলশীল জাতি হিসেবে গড়ে উঠতে চাই। ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে বিশ্বের দ্বারে দ্বারে আমরা ঘুরব না। ভারতের নয়, রাশিয়ার নয়, চীনের নয় – যুক্তরাষ্ট্রের তো নয়ই। যুক্তরাষ্ট্র এক পয়সা খয়রাত দিয়ে সত্তর পয়সার সওয়াব হাসিল করে নেয়।

আপনার চিঠি

টাকা উঠাইতে পল্লীবাসীর দুর্ভোগ

জনাব

সম্পাদক সাহেব,

আজ প্রায় একমাস পূর্বে সরকার পঞ্চাশ টাকার বাতিলকৃত নোট পল্লীর লোকদের সুবিধার্থে স্থানীয় সাব-পোষ্ট অফিস সমূহে জমা দেয়ার জন্য নির্দেশ দেন। সরকারের নির্দেশ মোতাবেক পল্লীর জনসাধারণ পঞ্চাশ টাকার নোট সাব পোষ্ট অফিস সমূহে জমা দেয়। ইহার ৫/৭ দিন পর রেডিও বাংলাদেশ হইতে ঘোষণা করা হয় যে ৫০.০০ টাকা হইতে ৫০০.০০টাকা পর্যন্ত যাহারা জমা দিয়াছে তাহাদের টাকা ব্যাঙ্ক হইতে দেওয়া হইবে। রেডিও মারফত এই সংবাদ শুনিয়া পল্লীর সরল মানুষ টাকা আনিবার জন্য কেহ ২০ মাইল, কেহবা ২৫ মাইল রাস্তা হাঁটিয়া টাঙ্গাইল পৌঁছাইলে জানিতে পারিল যে পোষ্ট অফিস সমূহে যে টাকা জমা দেওয়া হইয়াছে তাহা ব্যাঙ্কেই জমা হয় নাই। কাজেই টাকা ফেরত দেওয়ার প্রশ্নই উঠেনা। ওদিকে যিনি আসিলেন তাহার ৫০.০০ টাকার জন্য ১০.০০ টাকা খরচ হইয়া গিয়াছে।

জনগণের সরকার জনগণের সুবিধার্থে পোষ্ট অফিস সমূহে টাকা জমা নিলেও কেন ফেরত দেওয়া হইল না? অথচ, সরকার বন্দুকধারী পুলিশের তত্বাবধানে পোষ্ট অফিস সমূহ হইতে খুব সহজে সকল টাকা দুই দিনের মধ্যেই ফেরত দিতে পারেন।

টাঙ্গাইল হইতে টাকা আনিতে যাইয়া রাস্তায় অনেক লোকের অর্থ দুস্কৃতিকারীরা ছিনাইয়া লইবে এবং ভাগ্য খারাপ হইলে হয়তো দুস্কৃতিকারীরা কাহারও জীবন হানিও ঘটাইবে।

এমতবস্থায় জনগণের সরকারের নিকট বিনীত আরজ এই যে বন্দুকধারী পুলিশের তত্বাবধানে পোষ্ট অফিস সমূহে টাকা পাঠাইয়া বিতরণ করার ব্যবস্থা করিয়া সরকারের জনপ্রিয়তা বজায় রাখিবেন এবং মানুষের দুর্ভোগ এমন কি জীবনহানি যাহাতে না হয় তাহার ব্যবস্থা করিবেন।

মোহাম্মদ নুরুল হক
গ্রাম ও ডাকঘর ঃ– ধুবড়িয়া
থানা – নাগরপুর, টাঙ্গাইল

পাঠকের অভিমত

এতিমখানা প্রসঙ্গে

হক-কথার গত সংখ্যায় প্রকাশিত 'এতিমখানার অভ্যন্তরে' রিপোর্টটি পড়ে আমার নিম্নলিখিত বক্তব্যটুকু পেশ করা নৈতিক দায়িত্ব বলে মনে করছি।

এতিমখানা প্রতিষ্ঠার মাঝে মহত্ব আছে। কিন্তু, সেকথা ঢাক- ঢোল পিটিয়ে প্রচার করে আসল কাজে এমন নির্মম অবহেলা প্রদর্শনের অধিকার কারো নেই। অবিলম্বে টাঙ্গাইল এতিমখানার অব্যবস্থাবলীর অবসান ঘটানো না হলে হয় তো অপ্রত্যাশিত পরিণতি ঘটতে পারে। এজন্য সরকারকে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে:

(১) পাকা ভবন নির্মান সম্ভব না হলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের দাবী অনুসারে একটি বড়ো টিনের দোচালা ঘর তৈরি করে ছেলেদের থাকার বন্দোবস্ত করা, আরো অন্তত: ২০০ ছেলের থাকার ব্যবস্থা করা এবং এব্যাপারে ধর্মনিরপেক্ষতার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা।

(২) খাওয়ার জন্যে ২৫ টাকার স্থলে মাথা

পিছু অন্তত ৪০ টাকা ধার্য করা এবং দুধ -ডিম -মাংসের পরিমাণ বাড়ানো।

(৩) পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রদের জন্যে আলাদা ক্লাশ ঘরের ব্যবস্থা করা, শিক্ষকের সংখ্যা বাড়ানো, ৪ বছরের বেশী কোন শিক্ষককে একই স্থানে না রাখা, বাইরের বিদ্যালয়ে পাঠরত ছেলেদের প্রয়োজনীয় বেতন দেয়া, বই খাতা এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির জন্য আরো পর্যাপ্ত অর্থ অনুমোদন, ১৯ বছর বয়েস পর্যন্ত পড়ানোর ব্যবস্থা করা।

(৪) ব্যবহারিক শিক্ষায় প্রচলিত ব্যবস্থার সাথে টাইপ, শর্টহ্যান্ড ইত্যাদি শিক্ষার প্রচলন করা।

(৫) এতিমখানার জন্যে নিজস্ব ডাক্তার এবং নার্সের ব্যবস্থা, ঔষধপত্র এবং সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা, চিকিৎসাবাদে আলাদা টাকা দেয়া।

(৬) প্রচুর অর্থে নির্মিত পানির ট্যাংকটিকে কার্যোপযোগী করা।

(৭) পাঠাগার, পত্র-পত্রিকা এবং খেলাধুলার ব্যবস্থা করা।

(৮) বৎসরে ২টি শার্ট, ২টি লুঙ্গী। ১টি পাজামা, ১টি পাঞ্জাবী, ১টি গামছা, ১টি চাদর, বালিশ, মশারী ইত্যাদি বন্টন করা।

রেজাউল করিম, টাঙ্গাইল।

মুরিদের দরবার

তাসাওফের সাধনা

॥ মোহাম্মদ হোসেন ॥

অনেকেই মনে করেন আধ্যাত্মিক শিক্ষার জন্য কোন পীর বা মুর্শীদের সাহায্য নিস্প্রয়োজন। বিশেষ করিয়া শিক্ষিত মহলেই এই ধারনা পোষণ করেন। তাহারা মনে করেন নিজের চেষ্টায় এই শিক্ষাকে বাস্তবে উশ্মেষ ঘটানো সম্ভব। তাই ইহার জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী হইতে তাহারা বিমুখ কিন্তু তাহাদের এই ধারনা সম্পূর্ণ ভুল ও ভিত্তিহীন। আদম-সন্তান জন্মিবার পর হইতেই যেমনি অন্যের সাহায্য ব্যতীত অসহায় তেমনি আবার মানব জীবনের প্রতি স্তরেই শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। সোনা যমন নিজে নিজে অলংকারে পরিণত হইতে পারেনা তেমনি মানুষও শুধু মাত্র নিজ চেষ্টায় আধ্যাত্মিকতার চরমে পৌছিতে পারিবেনা। শিক্ষার জন্যই শিক্ষকের দরকার। সে শিক্ষা পার্থিবই হোক আর অপার্থিবই হউক মানুষ আপনা আপনি উহা গ্রহণে অক্ষম।

অনেকেই সাধনার মাধ্যমে সরাসরি রসূলুল্লাহ্‌র (সঃ) সাথে আত্মিক যোগাযোগ স্থাপন করিয়া এই শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহী। কিন্তু রসূলুল্লাহ্‌র (সঃ) সহিত আত্মিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য তাঁহার উম্মতের যে ইচ্ছাশক্তির দরকার তাহা আজ পর্যন্ত কয়জনের ভিতরই বা আসিয়াছে? অবশ্য ওয়ায়েস করণী (রাঃ) নবীর (সঃ) সহিত সেই রূপ অবিচ্ছেদ্য আত্মিক সম্পর্ক স্থাপনে সক্ষম হইয়াছিলেন। কোন দুরবর্তী স্থানে ফোনে আলাপ করিতে হইলে নিকটবর্তী এক্সচেঞ্জ অফিসের সাহায্য লইতে হয়! ট্রেনের যাত্রীবাহী বগী গাড়ীগুলি ইঞ্জিনের সাহায্য ব্যতীত গন্তব্যস্থানে পৌছিতে সক্ষম নয়। তেমনি কামেল পীরের সহযোগিতা ছাড়া মানুষ আধ্যাত্মিক পথে চলিতে অক্ষম।

পীরের নিকট মুরিদ হইয়া সাধনায় অগ্রসর হইলে পিছনে একটা বিরাট শক্তির উপলব্ধি আসে। নতুবা ঘুর্ণিপাকে হালবিহীন নৌকার মতই ঘুর-পাক খাইতে হয়। পীরকে যাচাই করিয়া লইবার মত সৎ সাহস ভক্তের থাকা চাই। পীরের

জ্ঞানের পরীক্ষার জন্য নয়-তিনি আসল না কৃত্রিম শুধুমাত্র এইটুকু উপলব্ধি করিবার মত জাগ্রত অন্তঃকরণ শিষ্যের থাকিলেই চলিবে। কারণ, লবণের পুতুল সমুদ্রের পানি মাপিতে নামিলে তাহর বিলুপ্তি অবধারিত। আর যে ছাত্র-শিক্ষকের জ্ঞানের পরীক্ষা করিতে চায় তাহার অবনতিই পরিণতি। যে রোগীর চিকিৎসকের উপর আস্থা নাই ঔষধ তাহার কোন কাজে আসে না। সমাজের সর্বত্রই আজ ভোজবাজীর খেলা। ভণ্ডামি অভণ্ডের ভিতর আর অভণ্ডামি ভণ্ডের ভিতর যেন লুকাইয়া থাকিবার প্রয়াস পাইতেছে। তাই ভেজাল হইতে নির্ভেজালটিকে বাহির করিবার মত ক্ষমতা মুরিদের থাকিতে হইবে। পরশ পাথরের সন্ধান পাইলে মানবজীবন সুন্দর ও সত্যময় হয়। তাই পরশ পাথরকে জীবনের পাথেয় স্বরূপ পাইলে মানুষের ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ হয়।

যাহারা শুধু নিজের শক্তিতেই বিশ্বাসী তাহারা নিজেকেই চরম ও পরম বলিয়া ধারণা করেন। বস্তুবাদী ধ্যান ধারণাই তাহাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে। তাই ভাববাদকে তাহারা উপেক্ষা করিয়া চলে। নিজের শক্তির পরাজয় ঘটিলে তাহারা নিরাশ হয়। অবশ্য সাধনার পথে জীবনের কোন এক মুহূর্তে এমন একটি উপলব্ধি আসিবেই যখন নিজেকেই সকল কিছুর উর্ধে বলিয়া মনে হয়। ধারণা জন্মে, 'আমি' আছি বলিয়াই জগতের সব কিছুর উপলব্ধি আছে অর্থাৎ বস্তু 'আমাকে' উপলব্ধি করে না। যতক্ষণ জীবিত আছি ততক্ষণ 'আমিই' বস্তুকে উপলব্ধি করি। 'আমার' শেষ-উপলব্ধিরও শেষ। তখন কর্মচঞ্চল জগতের সকল কিছুই আমার অজ্ঞাত হইয়া পড়ে। অতএব আমি আছি বলেই আমার নিকট জগত আছে। আমিও নাই- আমার নিকট জগতও নাই। সুতরাং 'আমিই' সত্য আর সব কিছুই মিথ্যা। এই অনুভূতির পরিবর্তন করিতে পীর-মুর্শীদেরা ভক্তের অংহবোধের বিলুপ্তি ঘটান। নতুবা বেশী আত্মপ্রত্যয়ী মানুষ আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করিয়া বাস্তব জ্ঞান বর্জিত হইয়া পড়ে।

মানুষ জেহাদ করিয়া দেশের ভৌগোলিক সীমাকে বর্দ্ধিত করে। যুদ্ধে জয়ী হইয়া বিশ্বজোড়া খ্যাতির অধিকারী হয়। কিন্তু বাস্তব জগতের জেহাদের চাইতে অন্তঃজগতের জেহাদ খুবই কঠিন। যে জগতকে জয় করিল কিন্তু নিজেকে জয় করিল না সে তো মানুষই নয়। নিজের নফসের সাথে জেহাদই প্রকৃত জেহাদ। মানুষের প্রবৃত্তিগুলিকে সৃষ্টিকর্তাই জগতমুখী করিয়া দিয়াছেন। আবার উহা হইতে বিরত থাকিবার নির্দেশও দিয়াছেন। এ যেন একটি লোকের দুইটি ক্ষমতা একটি ধ্বংসমূলক অপরটি গঠনমূলক। কোন এক দার্শনিক মানুষের ইন্দ্রিয়ের জগতমুখী স্বাভাবিক গতি লক্ষ্য করিয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন- সৃষ্টি কর্তাই মানুষের পরম দুশমন। যাক, নফসের সাথে জেহাদ সম্পর্কে মহাগ্রন্থ কোরআনে উল্লেখ আছে, তোমরা প্রবৃত্তির অনুগামী হইও না- উহার সহিত জেহাদ কর।

নাই নাই করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে সেই নিরাকার হইতেই নকল কিছুর উৎপত্তি। এ সম্পর্কেও কোরআনে রহিয়াছে ঃ মানুষ তাঁহার নিকট হইতে আসিয়াছে আবার সেই অন্তর্যামীর নিকটই ফিরিয়া যাইবে, বস্তুতঃ সকল কিছুর উৎপত্তিস্থল সেই পরম করুণাময়। সেই নিরাকার ভজনার জন্য যেমনি আকার প্রাপ্ত উপসনালয়ের দরকার তেমনি সর্বশক্তিমানের সঠিক উপলব্ধির জন্য একজন বুজুর্গ বা কামেল পীরের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে।

সকল ধর্মের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য আছে। উহা মানুষকে সত্য পথে দৃঢ় থাকিতে আজীবন অনুপ্রেরণা দিয়া থাকে। অনুপ্রেরণা মানুষের ভিতর অনুরাগের সৃষ্টি করে। আর অনুরাগটি বিশুদ্ধ হইলে অনুরাগীকে স্রষ্টামুখী করিয়া তোলে। ধর্মের আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে যেটুকু আকর্ষণ মানুষের মধ্যে আসে তাহার চাইতে ইহার অভ্যন্তরীণ দিকটির প্রতি অনুরাগ বেশী না হইলে মানুষের হৃদয় ধর্মের মৌলিক অর্থাৎ আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ স্পর্শ করিতে পারে না। আর সেই সত্যের পূর্ণ আস্বাদ পাইতে হইলে নির্জন সাধনার একান্ত দরকার। বিশ্বের বুকে যত ধর্ম প্রচারক আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাহাদের অধিকাংশ নির্জন উপাসনার পক্ষপাতি ছিলেন।

পরিচালক ব্যতীত কোন কাজই সুষ্ঠুভাবে চলিতে পারে না। কর্মচঞ্চল দুনিয়ার সবকিছুই পরিচালকের উপর নির্ভরশীল। চালক ব্যতীত কলকারখানা স্তব্ধ। সেইরূপ নির্জন সাধনায় আধ্যাত্মিক সফলতার জন্য একজন বিজ্ঞ পরিচালকের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। সেই পথপ্রদর্শক হইতেছেন কামিল পীর। গভীর অনুরাগী ভক্তের হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত আবেদন পীরকে সাধনাপথে স্বতঃস্ফূর্ত নির্দেশ দানে বাধ্য করে–আর শিষ্যের সাফল্যও আসে অভাবনীয় মাত্রায়। তাই মানবজীবনের পূর্ণতা অর্জনে পীরের অবদান অপরিসীম।

আমার জবাব

নজরুল ইসলাম

টাঙ্গাইল

মানুষের চেয়ে আদর্শ এবং প্রতিষ্ঠানের চেয়ে নীতিই যদি বড় হয় তাহলে বাংলাদেশে যে ভাবে ব্যক্তি পূজা শুরু হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে এ দেশের ভবিষ্যৎ কি হতে পারে?

উত্তর

মানুষ, আদর্শ, প্রতিষ্ঠান ও নীতি– এসবের ব্যাপারে চূড়ান্ত কোন সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে আমি মনে করি না। অন্তত: রাজনীতিতে এগুলো আপেক্ষিক, সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। ১৯৭০ সালের নভেম্বর মাসের মহাসাইক্লোনে লক্ষ লক্ষ লোক ভেসে যাওয়ার পর সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীর চালে যে অমানবিক রাজনীতি চলছিল তাতে আমি আদর্শের চেয়ে মানুষকে বড় করে দেখেছি। তাই ২৩ বৎসর পূর্বে যে আদর্শে বিজয়ী হয়েছি, মানুষের বৃহত্তর কল্যাণের খাতিরে তা পরিত্যাগও করেছি। আবার লক্ষ লক্ষ হিন্দু -মুসলমানে দাঙ্গা আমাদেরকে দ্বিজাতি তত্ত্বের আদর্শ থেকে এক সময় বিচ্যুত করতে পারেনি। তখন যেমন মুসলিম লীগকে পার্টি হিসেবে মুক্তি দাতা মনে করেছি, আবার তেমনি দেশ বিভাগের পর একই পার্টির সরকারের অন্যায়, অবিচারকে বরদাশত করতে না পেরে বিদ্রোহ করেছি।

ব্যক্তি পূজা, বক্তব্যের প্রতি নিষ্ঠা ইত্যাদি একটি জাতিতে পরিবেশের আলোকে জেকে বসে। পরিবেশ বদলে গেলেই তা ফসকে যায়। স্থান, কাল, পাত্রের উর্ধ্বে সকল পরিবেশে কল্যাণকামী মত ও পথ প্রতিষ্ঠা করলে তা কোন রাজনৈতিক চালই একেবারে ধ্বংস করে দিতে পারে না। ঠিক তেমনি এর প্রতিষ্ঠাতার ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের আবেদন বিলুপ্ত হয় না। আজ কাল বাংলাদেশে ব্যক্তি পূজা চলতে থাকলে ধরে নিতে হবে পরিবেশ মাফিক সংশ্লিষ্ট নেতা নিজেকে জনসমক্ষে উপস্থাপিত করেছেন। অন্তত: কথায় হলেও তিনি পরিবেশের দাবী মিটিয়েছে আবার সেই পরিবেশেই জাতির জন্যে অধিকতর কল্যাণকর বক্তব্য পেশ করেও অপর একজন ততটুকু পুজ্য নাও হতে পারেন। কারণ হয়ত

বা সেই বক্তব্য পরিবেশের আলোকে অগ্রগামী অথবা পশ্চাদগামী। যে সুরেণ বানার্জীকে বাঙ্গালী জাতি এক সময় ফুলের মালায় ভরে দিয়েছিল তাকেই আবার নর্দমার ময়লায় ছুড়ে ফেলেছে। কারণ পরবর্তী কালে তিনি পরিবেশের আলোকে পশ্চাদগামী হয়ে পড়ে ছিলেন। আবার এম, এন, রায় বাঙ্গালীর জন্যে মহত্তর কল্যাণের আদর্শ তুলে ধরলেও ততটুকু পুজ্য হয়ে উঠেন নি, যেহেতু তিনি বাংলার পরিবেশের চেয়ে অগ্রগামী ছিলেন। আমাদের বাংলাদেশে আজকের ব্যক্তি পুজায়ও ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটবে। এতে দেশের ভবিষ্যত আমি মোটেই খারাপ দেখিনা। কারণ বর্তমান পরিবেশটির প্রতি মানুষের আকর্ষণ ও মোহ না কাটিয়ে উঠলে সত্যি কারের কল্যাণ হাজির হবে না। সাময়িক একটু প্রশস্তি, অস্বস্তি থাকবে এই যা। অবশ্যি এর ভয়াবহ ক্ষতিকর দিকও রয়েছে। তা হল স্বেচ্ছাচারিতা, সন্ত্রাস ইত্যাদি। জাতিকে এসবের কুফল মোটেই পেতে হয় না যদি একই সঙ্গে প্রগতিশীল আদর্শবাদী রাজনীতিবিদগণ জনগণকে পরিস্থিতির বাস্তবতা সম্পর্কে সচেতন রাখেন। যারা ব্যক্তি পূজা পছন্দ করেন না তাদের কর্তব্য সেখানেই, দায়িত্ব তাই।



শহীদ আসাদ নগরে কৃষক সমিতির কেন্দ্রীয় সংগঠকদের গুরুত্বপূর্ণ সভায় জরুরী কর্মসূচী ও প্রস্তাব গৃহীত

গত ১৩ই এপ্রিল শহীদ আসাদ নগরে (সন্তোষ) বাংলাদেশ কৃষক সমিতির কেন্দ্রীয় সংগঠকদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সবায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ কৃষক সমিতি কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক পরিষদের আহ্বায়ক মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। সভায় সাংগঠনিক বিষয়াদি, ঘোষণাপত্র, গঠনতন্ত্র, আন্দোলনের কর্মসূচী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় সংগঠক হাজী মোহাম্মদ দানেশ, জনাব আলী সফদর খান, জনাব রাশেদ খান মেনন, জনাব ইন্তু মিঞা, জনাব আবদুল মান্নান ভূঞা ও জনাব মাহবুবুল্লাহ সাংগঠনিক ও বিভিন্ন কৃষক সমস্যা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেন।

সভায় বাংলাদেশ কৃষক সমিতির ঘোষণা পত্র, কর্মসূচী ও গঠনতন্ত্র আগামী ১৫ দিনের মধ্যে প্রণয়ন করিবার জন্য হাজী মোহাম্মদ দানেশ ও জনাব রাশেদ খান মেননকে দায়িত্ব দান করা হয়।

সভায় অপর এক সিদ্ধান্ত ক্রমে বাংলাদেশের ভবিষ্যত শাসনতন্ত্রের প্রশ্নে মওলানা ভাসানীকে আহ্বায়ক করিয়া 'শাসনতন্ত্র পর্যালোচনা কমিটি' গঠন করা হয়। হাজী মোহাম্মদ দানেশ, জনাব আলী সফদর খান, জনাব রাশেদ খান মেনন, শ্রী শান্তি সেন ও জনাব মাহবুবুল্লাহ উক্ত কমিটির সদস্য থাকবেন। ইহা ছাড়া তিনজন শাসনতন্ত্র বিশেষজ্ঞকে উক্ত কমিটিতে গ্রহণ করা হবে।

উক্ত কমিটি সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের শাসনতন্ত্র পরীক্ষা করবেন এবং বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রের প্রশ্নে কৃষক-শ্রমিক মেহনতি মানুষের অধিকার সংরক্ষণ সম্পর্কে প্রস্তাবনা হাজির করবেন।

ইহা ছাড়া সভা অবিলম্বে রিলিফ সহ সর্বস্তরে দুর্নীতি নিরোধ, চোরাচালান –মজুতদারী বন্ধ আইন শৃংখলা রক্ষা, আসন্ন চাষের মৌসুমের জন্য অবিলম্বে কৃষকদের মধ্যে বীজ, সার, গরু, লাঙ্গল ও ঋণ প্রদান ও উহার সুষ্ঠু বিতরণ, রিলিফ কমিটি ও গ্রাম পঞ্চায়েতে নির্বাচনের ব্যবস্থা, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য হ্রাস, বর্ষার পূর্বে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা, হাটবাজার ঘাট, জলা ইজারাদারী কন্ট্রাকটারী প্রথা বাতিলের দাবীতে আশু

আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহণ করে। উক্ত দাবীর ভিত্তিতে কৃষক জনতাকে ঐক্যবদ্ধ করা ও গণআন্দোলন গড়ে তোলার জন্য কৃষক সমিতির সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানান হয়।

সভায় টাঙ্গাইল জেলার জনাব আবদুর রহমান, রংপুরের শাহ তবিবর রহমান, খুলনার রফিকুল ইসলাম খোকন ও ময়মনসিংহের জনাব কুতুবুদ্দিন মিনারকে কেন্দ্রীয় সংগঠক হিসাবে গ্রহণ করা হয়।

সভায় অপর এক সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত অনুসারে কেন্দ্রীয় সংগঠকদের তাহাদের জেলাওয়ারী দায়িত্ব অনুযায়ী অবিলম্বে জেলা সমূহে সাংগঠনিক কমিটি এবং সদস্য সংগ্রহ অভিযান তরান্বিত করার নির্দেশ প্রদান করা হয়। নিম্নোক্তভাবে কেন্দ্রীয় সংগঠকদের জেলার দায়িত্ব বন্টন করা হয়। (১) হাজী মোহাম্মদ দানেশ– দিনাজপুর-রংপুর (২) আলী সফদর খান – সিলেট ও পার্বত্য চট্টগ্রাম (৩) সমসের উদ্দিন মোক্তার– রাজশাহী (৪) ইদু চৌধুরী – দিনাজপুর (৫) নুর জালাল– যশোর (৬) রফিকুল ইসলাম খোকন – খুলনা (৭) কাজী আফতাবুল ইসলাম – কুমিল্লা (৮) আবদুল মান্নান ভুঞা– ঢাকা (৯) রাশেদ খান মেনন – বরিশাল (১০) লুৎফর রহমান – কুষ্টিয়া (১১) শান্তি সেন– ফরিদপুর (১২) ইন্তু মিঞা– নোয়াখালী (১৩) আজাদ সুলতান – ঢাকা (১৪) মাহবুবুল্লাহ – পাবনা (১৫) আবদুর রহমান – টাঙ্গাইল (১৬) কুতুবুদ্দিন মিনার – ময়মনসিংহ (১৭) শাহ তবিবর রহমান – রংপুর (১৮) বদিউল আলম– চট্টগ্রাম।

কেন্দ্রীয় সংগঠকগণ জেলা সফর করে জেলা কর্মীসম্মেলনের মারফত উক্ত সাংগঠনিক কমিটি সমূহ গঠন করবেন এবং কেন্দ্রের রিপোর্ট পাঠাবেন।

সভায় আগামী ১৬ ও ১৭ই বৈশাখ (২৯ ও ৩০ শে এপ্রিল) ঢাকা জেলায় শিবপুরে অনুষ্ঠিতব্য বাংলাদেশ কৃষক সমিতি পূর্বাঞ্চল সম্মেলনের বিস্তারিত কর্মসূচী গৃহিত হয়। উক্ত কর্মসূচী অনুযায়ী ঢাকা, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, ফরিদপুর, বরিশাল, পটুয়াখালী, খুলনা, কুমিল্লা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রামের, কৃষক কর্মীগণ উক্ত সম্মেলনে যোগ দিবেন। ২৯ শে এপ্রিল প্রতিনিধি সম্মেলনে প্রতিনিধিগণ নিজ নিজ জেলার কৃষক সমস্যা, রাজনৈতিক, সাংগঠনিক বিষয়াবলী ও সামগ্রিক প্রশ্নে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করবেন ইহা ছাড়া ২৯ শে এপ্রিল ঘোষণাপত্র কর্মসূচী ও গঠনতন্ত্র এবং সাংগঠনিক বিষয়াবলী আলোচনার জন্য কেন্দ্রীয় সংগঠকদের সভা এবং ৩০ শে এপ্রিল কৃষক জনসভা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সম্মেলন উপলক্ষ করে উল্লেখিত জেলা সমূহে দ্রুত কৃষক সমিতির কাজ বিস্তৃত করা এবং সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার জন্য সভা সকল কৃষক সমিতির সদস্যদের বিশেষ নির্দেশ প্রদান করে। (অসমাপ্ত)

শিবপুর সম্মেলনে ভাসানী কি চান ?

আগামী ১৬ই ও ১৭ই বৈশাখ ইং (২৯শে, ৩০শে) এপ্রিল ঢাকা জেলার শিবপুরে স্বাধীনতা উত্তর প্রথম কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এতে প্রধান অতিথি থাকবেন বাংলা-আসামে কৃষক আন্দোলনের সূচনাকারী মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। শিবপুরে আহত কৃষক সম্মেলন নতুন কিছু নয় এবং মওলানা ভাসানীর সমগ্র জীবনের আন্দোলন সমূহ হতে বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনাও নয়। বস্তুত: মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রধান উৎস, দিগদর্শন এবং কৃষক আন্দোলনের গতি প্রকৃতি নির্ধারণি শক্তি ও তার জীবনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ কৃষক সম্মেলন।

বাংলাদেশ ও তৎসংলগ্ন কয়েকটি প্রদেশের বর্তমানে রাজ্য) মানুষের জীবিকার প্রধান অবলম্বন হচ্ছে কৃষিকার্য। বাংলাদেশের শতকরা ৮০ জনেরও বেশী লোক দারিদ্র পীড়িত কৃষক। তাই পাশ্চাত্যের বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনের পেছনে যেমন শ্রমিক, ভবঘুরে এবং নগর জীবনে অভ্যস্ত মানুসের অবদান রয়েছে। স্বাভাবিক কারণেই প্রাচ্য-মণ্ডলে অবস্থিত বাংলার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আন্দোলন গুলোও তেমনই কৃষি-জীবিদের অবদানে সমৃদ্ধ। মূলতঃ এই দেশের সাধারণ মানুষের বিভিন্ন দাবী দাওয়া এবং সংগ্রামগুলোর ইতিবৃত্ত একটু সচেতন ভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে তার অধিকাংশই হচ্ছে কৃষি সমস্যার সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত। আর নির্যাতিত শোষিত এবং অবহেলিত কৃষক সমাজের শ্রেনী হিসাবে প্রথম আত্মসচেতনতার স্ফুরণ, নিজেদের সংগঠিত করার প্রবণতা এবং একটি সংগঠনের কাঠামোতে বিভিন্ন দাবী দাওয়ার আন্দোলনে জড়িত থাকার প্রয়াসে যে মহানায়কের নাম জড়িত তিনি হচ্ছেন বাংলার কৃষক-শ্রমিকের নয়ন মণি মওলানা ভাসানী।

বাংলার রাজনৈতিক জগতে মওলানা ভাসানী আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত সংগ্রামী নেতা। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে তিনি বিভিন্ন সময়ে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু তার সবচেয়ে বড় পরিচয় হচ্ছে তিনি কৃষকের প্রশ্নাতীত নির্ভরশীল বন্ধু এবং নেতা। যাদের কথা কেউ বলে না অথচ যাদের রক্ত জল করা পরিশ্রমলব্ধ সম্পদে আজীবন পুষ্ট নগরবিলাসীরা বেঁচে থাকে সেই ভাগ্যহারা কৃষকদের ফরিয়াদ বার বার ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়েছে এই দূরন্ত মহানায়কের কণ্ঠে। পার্লামেন্টারী রাজনীতির সঙ্গে পুরোপুরি জড়িত থেকেও একমাত্র মওলানাই বোধ হয় সর্বহারা কৃষককুলের সঙ্গে এতোটা একাত্ম হতে পেরেছেন। শহরের বিলাস নিকেতনে আয়েসের জীবন কাটিয়ে তিনি পল্লীর সাধারণ মানুষের রাজনীতি করার ভড়ং করেননি – সমগ্র জীবনের অভিজ্ঞতা এবং বাংলার সুবিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী কৃষক সমাজের একজন হয়েও তাদেরই একান্ত পরিবেশে সুখদুঃখের সমভাগী হিসেবে মানসিকতার লালন করে তিনি গড়ে তুলেছেন তার রাজনৈতিক মানস, প্রজ্ঞা এবং আন্দোলনের ভিত্তিভূমি।

(চলবে)

ইহা কি সত্য?

॥ ৩১ ॥

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে উপেক্ষা করে বিগত জুন মাসের প্রথম দিকে কয়েক জন এমএনএ ঢাকাস্থ হোটেল ইন্টার-কন্টিনেন্টালে এক বিশ্বাসঘাতকতামূলক বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন। ৫ই জুনে প্রকাশিত কয়েকটি দৈনিক পত্রিকায় এখবর পরিবেশনও করা হয়েছে। এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে যোগদানকারী পুরুষ এমএনএ দের শাস্তি দেবার আয়োজন চলছে, এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু যোগদানকারীদের অন্যতমা জনৈক মহিলা এম এন এ রহস্যজনক কারণে আওয়ামী আয়োজনের আওতামুক্ত হয়ে রয়েছেন। বরং তিনি আজ একজন প্রভাবশালী এম সি এ যেমনটি পাক-আমলে আলবদররা ছিলেন। ভদ্র মহিলার হাজবেন্ডের ও নুরানী ঐতিহ্য রয়েছে – তিনি ইয়াহিয়ার থ্রি নট থ্রি কোম্পানীর লায়েক মেম্বার হওয়ার সত্ত্বেও আজ বাংলাদেশ সরকারের জবরদস্ত অফিসার।

এমন কি কোমল কারণ রয়েছে যে ইস্টারকন বৈঠকের সবাই হলেন দাগী শুধু ফসকে গেলেন এই ঘাতকিনী?

॥ ৩২ ॥

কয়েক হাজার টাকার শীতল পাটি কোথায় গেল?

প্রধানমন্ত্রী-ইন্দিরা আগমনী মঞ্চ সাজাতে সিলেট জেলা থেকে বহু শীতল পাটি কিনে

আনা হয়। কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং বুদ্ধিতে কোন ক্রমেই কাজে লাগাতে না পেরে ঢাকার একটি সংস্থার ৪ নং ইমারতের দু'তলায় পার্টিগুলো স্তূপীকৃত করা হয় আর পর সেগুলো আত্মসাতের জন্যে কয়েকজন এম সি এ ও অফিসারের মধ্যে পাল্লা চলে। কে তাতে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় হলেন সরকারী ভাবে প্রকাশ পেলে জনগণ নিশ্চয়ই বেশী নির্ভরযোগ্য মনে করত।

॥ ৩৩ ॥

চার কুতুবের অন্যতমের ম্যাট্রিকুলেট ভাই ব্রাহ্মণবাড়িয়ার একটি সংস্থার ইঞ্জিনিয়ার সেজে বসেছেন। বসেছেন মানে বসানো হয়েছে। বোমা মেরেও তার মগজ থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার ডিগ্রী পাওয়া যাবে না রাতদিন মাথা কুটেও তিনি পদানুযায়ী দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না। – স্রেফ কুতুবী কুদরতে কি করে তিনি জনগণের খেদমত করবেন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া বাসীর আজ তাই জিজ্ঞাস্য।

॥ ৩৪ ॥

কুমিল্লা জেলার জনৈক এম সি এ একটি গাড়ী হাইজ্যাক করিয়ে রং ও নেম প্লে পাল্টিয়ে ফেলেছেন। তাতে লিখেছেন, 'কসবা থানার বেসামরিক প্রশাসক।' একজন মহিলা এম সি এ-র ইন্ধনে তিনি কসবা সীমান্তে কার্যরত চোরাকারবারীদের সাথে সহযোগিতা করে যাচ্ছেন বলে মেহারী ইউনিয়নে এক জনসভায় মারমুখী জনতা অভিযোগ উত্থাপন করেন। এরপর থেকে তিনি বরাবর ষ্টেনগানধারী দেহ রক্ষী পোষছেন।

॥ ৩৫ ॥

তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় লেঃ কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনকে বেহুদা হয়রানি, জিজ্ঞাসাবাদ এবং মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় যে অফিসারটি বিশ্বস্ততার সাথে সেরে ছিলেন বাংলাদেশ সরকার (পুরস্কার স্বরূপ?) তাকে পদোন্নতি দান করেছেন।

॥ ৩৬ ॥

মুন্সীগঞ্জের যে দালালটি লুটপাট করে ১৪টি লঞ্চের মালিক হয়েছেন। বাংলাদেশ সরকারের জনৈক মন্ত্রী তাকে নিরাপদ আশ্রয়ে লালন করছেন। কিছুকাল দালালটিকে ঢাকার মগবাজারস্থ উক্ত মন্ত্রীর শ্বশুরালয়ে থাকতে দেখা যায়। বর্তমানে খোদ মন্ত্রীর তত্ত্বাবধানেই দিনাতিপাত করবার সৌভাগ্য তার হয়েছে বলে জানা গেছে।

টাঙ্গাইলে পুলিশের গুলিতে দুইজন হতাহত

টাঙ্গাইল, ১২ই এপ্রিল – আজ সকালে শহরের একটি বাড়ী দখল নিয়ে হাঙ্গামার সূত্রপাত হলে স্থানীয় পুলিশের গুলীবর্ষণে ঘটনাস্থলে একজন পথচারী নিহত এবং অন্য একজন আহত হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে বলা হয়, পাকবাহিনীর দালালির অভিযোগে জনৈক মোক্তারের গ্রেফতারের সুযোগে মারাত্মক আগ্নেয়াস্ত্র এবং দেশী অস্ত্রে সজ্জিত একদল লোক তার বসত বাটি দখল করে নেয় বাড়ীটি প্রকৃত মালিককে ফিরিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে তারা এসেছিল বলে দখলকারীরা দাবী করেছে। মোক্তার সাহেবের স্ত্রীর অনুরোধে পুলিশ ঘটনার তদন্তে গেলে দখলকারীরা তাদের প্রতি গুলীবর্ষণ করে। পরে একদল সশস্ত্র পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে চারদিকে থেকে অবিরাম গলীবর্ষণ করতে থাকে। ফলে একজন পথচারী নিহত এবং অন্য একজন আহত হয়। প্রায় একঘন্টা পর পুলিশ দখলকারীদের গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়।

সম্পাদক ঃ সৈয়দ ইরফানুল বারী, সন্তোষ, টাঙ্গাইল, মুদ্রণে ঃ শান্তি প্রেস, টাঙ্গাইল।

প্রতি কপি বিশ পয়সা সাপ্তাহিক রেজিস্টার্ড নং-ডিএ ১৭৬

হক-কথা

(WEEKLY THE HAQ-KATHA)

প্রকাশক ও পৃষ্ঠপোষক ঃ মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

প্রথম বর্ষ নবম সংখ্যা রবিবার ১০ বৈশাখ ১৩৭৯; ২৩ শে এপ্রিল, ১৯৭২; ৭ই রবিউল আওয়াল ১৩৯২; সন্তোষ, টাঙ্গাইল

ঢাকায় কিসিঞ্জারের গোপন সফর?

মার্চের শেষ এবং এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ বাংলাদেশের ভাগ্যাকাশে একটি নতুন শনি চেপে বসার পক্ষ, আজ আর এতে কোন সন্দেহ নেই।

সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ এবং ভারতীয় কংগ্রেস গোষ্ঠীর সম্প্রসারণবাদের আওতায় চলে যাবার পর বাংলাদেশের জন্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও ভয়াবহ বিপর্যয় হল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের শিকারে পরিণত হবার আশঙ্কা। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, পর্যায়টি এখন আর আশঙ্কায় নেই, ইতিমধ্যে এর সফল উত্তরণ ঘটেছে। সফল এই জন্যে যে মার্কিন চক্র কোন প্রলোভন হাতে নিয়েই বাংলাদেশের ধারে কাছে ঘেষতে পারছিল না। এদিকে নজরুল-তাজউদ্দীন সরকার পি এল ৪৮০ তহবিলের একাউন্ট ফ্রীজ করাতে মার্কিনীদের জন্যে অবস্থাটা আরও বেগতিক হয়ে যায়। তৎক্ষণাৎ ওয়াশিংটন মহল উপলব্ধি করেন যে ভুট্টোর জিন্দানখানা থেকে জনাব শেখ মুজিবর রহমানকে মুক্ত না করলে আর উপায় নেই। যদিও স্বদেশে শেখ সাহেবের প্রশ্নাতীত জনপ্রিয়তা ও বিশ্বজনমতের চাপ তাঁর মুক্তির জন্যে কার্যকরী শক্তি হয়ে কাজ করেছে তবু হোয়াইট হাউস

মার্কিন স্বীকৃতির অন্তরালে

বাংলাদেশ সরকারের একটি প্রভাবশালী অংশ এতে ভাল যোগান দিয়েছে।

ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা, মার্কিন স্বীকৃতি ও সাহায্যকে কেন্দ্র করে জনাব তাজউদ্দীন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমানের মধ্যে গোড়া থেকেই মতবিরোধ দেখা দেয়। স্মরণ করা যেতে পারে যে স্বাধীনতা লাভের পর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে জনাব তাজউদ্দীন মার্কিন সাহায্যের নামে পদাঘাত করে সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন, বাংলাদেশ এর প্রত্যাশী নয়। তাঁর এহেন খোলাখুলি নীতিনির্ধারণী মন্তব্যে এর কৃতিত্ব কুড়াবার প্রয়াস পেয়েছে। তারপর থেকেই শুরু হয় মার্কিনী মায়াজাল বিস্তার করার কূটকৌশল। যুক্তরাষ্ট্র স্বীকৃতি দানের পূর্বেই পি এল ৪৮০ তহবিল চালু করে দেয়া হল। ইউসিস ও কনস্যুলেট অফিস বন্ধ থাকলেও যুক্তরাষ্ট্রীয় একটি মিশনকে ঢাকায় কাজ করে যাবার অনুমতি দান করা হল। আশ্চর্যের বিষয় মিশনটি একজন বাঙ্গালী ফটোগ্রাফার নিয়োগ করতে যে তৎপরতা চালিয়েছে তাতেও সরকার পক্ষ থেকে কোন বাধা পেল না।

অবশেষে মার্কিন চক্রান্তে বশ্যতা স্বীকারটুকু স্পষ্টতর হয়ে উঠল যখন ম্যাকনামারা বাংলাদেশের মাটিতে পা দিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের হাতের খেল বিশ্বব্যাঙ্কের ম্যাকনামারাকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে জনাব শেখ মুজিবর রহমান ঢাকা বিমান বন্দরে সশরীরে অভ্যর্থনা জানান। নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রকাশ ম্যাকনামারার বিদায়ের পরপরই নিক্সন সরকারের কূটনীতি বিশারদ হেনরী কিসিঞ্জার অত্যন্ত গোপনীয়তা রক্ষা করে ঢাকা সফর করে গেছেন। যে দেশ আদৌ স্বীকৃতি দেয়নি কিংবা দিলেও যাকে সন্দেহাতীতভাবে মিত্র ধরে নেয়ার অবকাশ নেই তারই সেরা চাঁইদের সাথে বেসামাল ঢলাঢলি দেশপ্রেমিক মহলকে আঁতকিয়ে দিবে না তো কি!

চলতি মাসের প্রথম দু'তিনটি দিন হেনরী কিসিঞ্জার যুক্তরাষ্ট্রে ছিলেন না, এ তথ্যটি একরকম স্বীকৃত সত্য। কারণ, সোভিয়েত বার্তা সংস্থা তাস কিসিঞ্জারের নিখোঁজের একটি খবর পরিবেশন করলেও যুক্তরাষ্ট্র তাতে কোন প্রকার প্রতিবাদ জানায় নাই।

ঢাকা ছেড়ে কিসিঞ্জার সাহেব বিশেষ বিমানযোগে ব্যাংককে পৌঁছবার পরই হোয়াইট হাউস থেকে যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের কথা ঘোষণা করা হয়। ভিয়েতনাম পরিস্থিতি প্রত্যক্ষভাবে যাচাই করে হেনরী কিসিঞ্জার ওয়াশিংটন পৌঁছাবার পরদিন অর্থাৎ ৮ই এপ্রিল প্রেসিডেন্ট নিক্সন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমানের নিকট একটি পত্র লিখেন। এমতাবস্থায় ভাষ্যকার মহল মনে করেন যে ৩রা এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক দশ দিনের মধ্যে মার্কিন স্বীকৃতিদানের চাপটি উভয়ের মধ্যে আপোষরফার পূর্ব পরিকল্পনা বৈ কিছু নয়!

ইতিমধ্যে ঢাকারই বিভিন্ন দৈনিকে প্রকাশ, মার্কিন স্বীকৃতির পরপরই বাংলাদেশে তাদের সন্দেহজনক গতিবিধি পরিলক্ষিত হচ্ছে। রিলিফ কাজ করার নামে তারা কয়েকদিনের মধ্যেই অন্তত: ৫০০ জনকে আমদানী করেছে এবং ঢাকাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য বাড়ী ভাড়া করার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে। তাদের তৎপরতাকে কটাক্ষ করে মুজিব সরকার সমর্থক পত্রিকাগুলোতেও আলোচনা চলছে। কিন্তু বাংলাদেশের দুর্ভাগ্যের শেষ কোথায়, অভাগা বাঙ্গালী কাফেলার নিরাপত্তা-নিশ্চয়তা কোথায় – আজ জাগ্রত জনতার মনে এই প্রশ্ন।

ডব্লিউ জিটি ১০৫৭

ট্যাক্সিটি ভারতীয়। নম্বর ডব্লিউ জিটি ১০৫৭। প্রায়শ: টাঙ্গাইল আসে। স্বর্ণশিল্পী পট্টিতে পার্ক করা থাকে। হালুয়াঘাট, মোমেনশাহী, জামালপুর এবং মধুপুরেও ট্যাক্সিটি বিরাম নেয়। তারপর কীসব সংগ্রহ করে আবার মেঘালয়ের পথে পাড়ি জমায়। দেশপ্রেমিক কয়েকজন স্বর্ণশিল্পীর অভিযোগ, ট্যাক্সিটির সাহায্যে ধনাঢ্য এক গোষ্ঠী স্বর্ণের চোরাচালান করছে। বাংলাদেশকে ফউত করে দিচ্ছে। শুধু মোমেনশাহী, টাঙ্গাইল নয়, পাবনা জেলার কতক এলাকা থেকেও স্বর্ণ সংগ্রহের চ্যানেল এদের রয়েছে বলে প্রকাশ। সরকারের নাকের ডগায় এসব আর কদিন চলবে?

কৈফিয়ত

বিনা প্রাকৃতিক দুর্যোগে টাঙ্গাইল শহরে একটানা প্রায় সত্তর ঘন্টা বিদ্যুৎ সরবারহ বন্ধ থাকায় এবারের 'হক-কথা' বিলম্বে বের হল। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্যে সত্যিই আমরা দুঃখিত। – *সম্পাদক*

মাড়ওয়ারীর মারপ্যাঁচে

সিলেটের কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দ অভিযোগ উত্থাপন করেছেন যে ভারতীয় মাড়ওয়ারী ব্যবসায়ীরা সুকৌশলে বাংলাদেশের কোটি কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা আত্মসাত করছে।

বিবরণে প্রকাশ, বৃটেন থেকে প্রতিমাসে হাজার হাজার বাঙ্গালী তাদের পরিবারের জন্যে লক্ষ লক্ষ টাকা পাঠাচ্ছে। কিন্তু তা সরাসরি বাংলাদেশে না পৌঁছাতে বৈদেশিক মুদ্রার লাভটুকু আমাদের সরকার পাচ্ছে না। আন্তর্জাতিক এক চক্র সৃষ্টি করে ভারতের মাড়ওয়ারীরাই তা ভোগ করছে। এমনিভাবে বাৎসরিক হিসেবে দেখা যাবে বাংলাদেশের ন্যায্য প্রাপ্য কোটি কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা তারাই আত্মসাত করেছে।

এমতাবস্থায় অভিযোগকারীরা অবিলম্বে সরাসরি বাংলাদেশবাসীর হাতে টাকা পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতে সরকারের প্রতি জোর দাবী জানান।

বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশের সর্বত্র 'হক-কথা'র সংবাদদাতা ও এজেন্ট আবশ্যক। অবিলম্বে সম্পাদকের সাথে যোগাযোগ করুন।

মওলানা ভাসানীর যন্ত্রণায় বরাবরই একটি মহল ব্যতিব্যস্ত

আহমদ শাহ রেজা

মওলানা ভাসানী আবার যথানিয়মে অনেকের বিরক্তি এবং যন্ত্রণার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছেন। আর সাথে সাথে প্রভুভক্তের দলও ময়দানে নামতে শুরু করেছেন। এই প্রভুভক্তের একটা নিজস্ব চরিত্র আছে – এরা বুদ্ধিজীবী বলে পরিচিত এবং সব সময়ই প্রকৃত প্রভুভক্তের ভূমিকাই পালন করে থাকেন। তাই দেখা গেছে গত বছর ২৫শে মার্চের দিন পর্যন্তও এরা জনাব তাজউদ্দিনের 'নয়া নির্দেশ' প্রচার করতে করতেই হঠাৎ টিক্কা-ইয়াহিয়ার গুণগান শুরু করেছিলেন - কে কতো দুস্কৃতিকারী আর ভারতের দালাল গ্রেফতারের খবর দিতে পারেন এই প্রতিযোগিতায় নেমেছিলেন। এরাই শেখ সাহেবকে 'দেশদ্রোহী' আখ্যা দিয়েছেন – এরাই আবার দেশ হানাদার মুক্ত হবার পর তাঁর এবং প্রয়োজনীয় অন্যসব প্রভুদের জয়গানে মেতে উঠেছেন।

তারপর এলো প্রভুভক্তি প্রদর্শনের পালা– অতএব, পাকিস্তানী নিয়মেই মওলানা ভাসানী আক্রান্ত। কিন্তু, প্রভুভক্তদের এবার ভুল হলো: তাদের জানা উচিত, সে বল আর নেই যে খালি ময়দানে গোল দেয়া যাবে।

এরা আসলেই বুদ্ধিজীবী। তাই দেখা যায়, প্রয়োজন মত সবকিছু পাল্টে দেয়ার বুদ্ধিও এরা রাখেন। চেষ্টায় এদের কোন ত্রুটি হয়নি। কিন্তু দুঃখের বিষয়: অযৌক্তিক বুদ্ধি প্রয়োগ করে জয়লাভের দিন চলে গেছে। তাছাড়া মওলানা ভাসানী এদের দেখে ভয় পাননা কেননা তাদের চরিত্র সম্পর্কে তাঁর ভাল ধারণা রয়েছে। প্রভুভক্তদের প্রতি তাই অনুরোধ: আসুন, আমরা যৌক্তিক পর্যালোচনায় মওলানা ভাসানীর বিচার করি।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের আগে বাংলা এবং আসামের বৃটিশ বিরোধী গণজাগরণের পেছনে মওলানা ভাসানীর অবদানের কথা অবিস্মরণীয়। তারপর পাকিস্তান এলো। পাকিস্তানী জাতির পিতা জিন্নাহ্ সাহেবের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সেদিন কথা বলা ছিল যেন ফেরেশতাদের বিরুদ্ধে কথা বলার মতো। কিন্তু ভাসানী আজীবন ভাসানীই। তাই জন্ম হলো প্রথম বিরোধীদল আওয়ামী মুসলিম লীগের (পরবর্তী কালে আওয়ামী লীগ)। মওলানা ভাসানীর সৎ সাহসের ফলেই সেদিনের পাকিস্তানেও বিরোধী দল এবং বিরোধী রাজনীতির জন্ম হতে পেরেছিল। ইতিহাস তাই তাঁকেই এ দুটোর মূল প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

মওলানা ভাসানীর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে পাকিস্তানের একমাত্র

দাবীদার মুসলীম লীগের ভরাডুবি ঘটেছিল। সেদিনের যুক্তফ্রন্টের প্রধান নেতাও ছিলেন তিনিই।

তারপর যখন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং শেখ মুজিব ক্রমশ: সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও দুর্নীতিপরায়ণ পুঁজিপতি ও সামন্তবাদীদের পক্ষে যেতে থাকলেন, তখনই মওলানা ভাসানী ডাক দিলেন কাগমারী সম্মেলনের। আজকের 'জাতির নেতা' সেদিন বাংলাদেশের বৃহত্তম শত্রু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাথে সামরিক জোটে আবদ্ধ হতে চেয়েছিলেন – তাই সেন্টো, সিয়াটো এবং পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি হতে পেরেছিল। মওলানা ভাসানী প্রতিবাদ জানালে সোহরাওয়ার্দী সাহেব বলেছিলেন: "আপনি ফরেন পলিসির কী বুঝবেন? আমেরিকার সাথে দোস্তি না করলে আমাদের মরতে হবে।" কী নিদারুণ পরিণতি: এমন একদিন এসেছিল যখন সোহরাওয়ার্দী সাহেবের প্রিয় আওয়ামী লীগও যুক্তরাষ্ট্রের সাথে স্বাক্ষরিত সকল চুক্তি বাতিলের দাবীতে সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু সেদিনও মওলানা ভাসানী পেয়েছিলেন তাঁর জন্য নির্ধারিত আক্রমণ। আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠার পেছনে মওলানার অপরিসীম অবদান থাকা সত্ত্বেও সেদিন তিনি দলত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কেননা, তাঁর দাবী সমাজতন্ত্রের জবাবে সেদিন আজকের জাতির নেতারা ফতোয়া দিয়েছিলেন: মওলানা নাকি কমিউনিস্ট হয়ে গেছেন। তিনি চীনের দালাল। হায়! আজ শেখ সাহেব এবং তাঁর আওয়ামী লীগও সেই সমাজতন্ত্রের কথাই বলেন। তবু আজো মওলানা ভাসানী চীনের দালালই থেকে গেলেন।

মওলানা ভাসানী চিরদিনই আপোষের বিরুদ্ধে। তাঁর আজীবন নীতি ও বিশ্বাস সমাজতন্ত্র এবং সকল শোষণ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের উদ্দেশ্যে ১৯৫৭ সালে পাঠান নেতা গাফফার খান ও প্রগতিবাদী মিয়া ইফতেখার উদ্দিনকে নিয়ে তিনি গঠন করেছিলেন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি। সেদিনের পরিচিত ক্ষমতাশীন মহলের ঝটিকা-বাহিনীর আক্রমণ যদিও সম্মেলন এবং জনসভা পণ্ড করতে পেরেছিল, কিন্তু পারেনি তাঁকে টলাতে। আজ তাই সমাজতন্ত্রের কথা সকলকেই বলতে হয়।

অন্যান্য আন্দোলনের কথা বাদ দিলেও '৬৮/৬৯ সালের প্রচণ্ড গণবিস্ফোরণের কথা বলতে হয়। মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে শুরু হয়ে এই আন্দোলনই অবশেষে আইউব-মোনেমশাহীকে সমূলে উৎখাত করেছিল। আমরা আওয়ামী লীগের নেতাদের বীরত্ব ও সাহসের কাহিনী জানি। আগরতলা মামলা শুরু হবার পর কোন নেতাকেই আর তাদের অফিসের আশেপাশে দেখা যায়নি। মওলানা ভাসানীই সর্বপ্রথম আগরতলা মামলা প্রত্যাহারের দাবী জানিয়েছিলেন; দাবী করেছিলেন শেখ মুজিবের মুক্তির জন্যে। না হলে আজ হয়তো শেখ সাহেবের মোসাহেবরা তাঁকে জাতির পিতৃত্ব বর্তিয়ে দিতে পারতেন না। মুক্তি পেয়েই শেখ সাহেব ক্ষমতার জন্যে পাগল হয়ে উঠলেন- মওলানা ভাসানীর সাবধান বাণী সত্ত্বেও তিনি সেই তার সাথেই আপোষের গোলটেবিলে বসলেন যে আইউব তাঁকে মিথ্যা অভিযোগে দীর্ঘদিন জেল খাঁটিয়েছেন। মওলানা ভাসানীর সত্য প্রচার বন্ধ করার উদ্দেশ্যে সেদিনের জনপ্রিয় 'বঙ্গবন্ধু' তাঁকে রাজনীতি থেকে অবসর নেয়ার হাস্যকর আবদার জানিয়েছিলেন। অথচ এবারো মওলানা ভাসানীর কথাই ফললোঃ শেখ সাহেব আপোষের জবাবে ইয়াহিয়ার সামরিক শাসন কাঁধে নিয়ে ফিরলেন। দোষ পড়লো মওলানা ভাসানীর ঘাড়ে।

মওলানা ভাসানীর সোচ্চার বিদ্রোহী কণ্ঠকে স্তব্ধ করার জন্যে তাঁকে সেই পুরাতন কায়দায় স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী আখ্যা দেয়া হয়েছে। কী আস্পর্ধা!

কিন্তু ইতিহাস চিরদিন সত্য কথাই বলে। ১৯৫৬ সালের কাগমারী সম্মেলনেই তো মওলানা ভাসানী প্রথম বারের মত বলেছিলেন : পূর্ব বাংলার প্রতি বঞ্চনার অবসান ঘটানো না হলে দেশবাসী পশ্চিমকে 'আচ্ছালা-মোআলায়কুম' জানাবেন। তারপর থেকে বহুবার বহুভাবে তিনি স্বাধীনতার কথা বলেছেন।

১৯৭০ সালের নির্বাচন এলো। এলো প্রচণ্ড জলোচ্ছ্বাস। ১০ লাখ লোক মারা গেলেন; ক্ষতিগ্রস্তরা পেলেন নির্মম অবহেলা। অন্য কেউ নন, মওলানা ভাসানীই সেদিন পল্টনে দাঁড়িয়ে শেখ মুজিব এবং সব দল ও জনতাকে আহ্বান জানিয়ে পশ্চিমের প্রতি হাত উঠিয়ে বলেছিলেন : "আমাদের বিপদে ওরা কেউ আসেনি। অতএব, এসো, আমরা সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করি। নির্বাচনে কোন লাভ হবে না।" সেদিন সবার মুখে হাসির কি বাহার! আহ্বানে সাড়া দেয়ার বদলে আজকের নেতারা সেদিন ক্ষমতার মোহে ডুব দিয়েছিলেন।

কিন্তু, বাস্তবে দেখা গেল এবারো মওলানা ভাসানীই ঠিক। 'দেই দেই' করেও যখন গদিটা দিল না, বরং এলো কিছু ব্যঙ্গ উপহাস, শেখ সাহেব তখন অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিলেন। মওলানা ভাসানী বললেন: অহিংসায় কাজ হবে না, হাতিয়ার তুলে নাও। শেখ সাহেব পরিবর্তে দস্যু ইয়াহিয়ার সাথে পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার উদ্দেশ্যে আপোষ আলোচনায় বসলেন। মওলানা ভাসানীর সাবধান বাণীর কোন দাম তিনি দিলেন না, সুযোগ দিলেন হানাদারদের প্রস্তুতি নেয়ার – আলোচনার অবসরে আসতে থাকলো হাজার হাজার পাকবাহিনী। 'জাতির পিতা' সেদিন শুধু আপোষ আলোচনায় অগ্রগতির হয়তো কথাই জানাচ্ছিলেন। আরো অগ্রগতি হতো, কিন্তু ইয়াহিয়াই গোল পাকিয়ে ফেলল। যুদ্ধ শুরু করে দিল। প্রথম দফাতেই কয়েক লাখ নিরস্ত্র জনতা প্রাণ হারালেন। তবুও মওলানা ভাসানীরই দোষ।

আশা ছিল: দেশ স্বাধীন হলে হয়তো মওলানা ভাসানীর অপরাধের পরিমাণ কমে যাবে। কিন্তু হলো না। কেননা, তিনি তো আজীবন অন্যায় আর শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার। আর এবারের সবচেয়ে মুশকিল হলো: আগে আমরা জনতার দুর্ভাগ্যের সকল দোষ পশ্চিমাদের ঘাড়েই চাপিয়ে নেতা হতাম, কিন্তু এখন কার ঘাড়ে চাপাবো?

অতএব, মওলানা ভাসানীকে স্তব্ধ করার ব্যবস্থা কর। আর তাই প্রভুভক্ত বুদ্ধিজীবীরা ময়দানে নামতে শুরু করেছেন। কিন্তু, পৃথিবীর নিয়ম বড় নির্মম – সত্যের ঢোল আপনিই বাজে।

শিবপুর সম্মেলনে ভাসানী কি চান? ২

মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে পরিচালিত কৃষক আন্দোলন এবং বিভিন্ন সম্মেলনের বিশ্লেষণে যে সত্যটি পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠে তা হচ্ছে এই আন্দোলনের ধারা দুটি পৃথক চিহ্নে চিহ্নিত। যদিও আন্দোলনের উদ্দেশ্য মাত্র একটি এবং তা হচ্ছে সকল প্রকার শোষণ-নিপীড়নের হাত থেকে কৃষকদের মুক্ত করা এবং তাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। তবুও কৃষক আন্দোলনের উষালগ্নে বৃহত্তর সংগ্রামের রূপরেখা সঠিকভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব ছিল না। হয়তবা শ্রেণী সংগঠনের প্রকৃত চেহারা এবং ধাপে ধাপে কর্মসূচীর সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে এর বর্তমান অবস্থার স্বচ্ছ ধারণা গড়ে তোলা সে সময় সম্ভব ছিল না, তবুও কৃষকদের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন সমস্যাবলী, তার কারণসমূহ, শোষণ এবং নির্যাতনের বিরুদ্ধে তাদের সচেতন করে

তোলার প্রাথমিক উপকরণ দিয়েই মওলানা তৎকালীন কৃষক আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন। সেটা ছিল কৃষক আন্দোলনের উষালগ্ন বা প্রথম পর্ব। অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখার সঙ্গে সঙ্গে কৃষকদের শতকরা ৮০ ভাগ মুসলমানের ধর্মীয় অনুশাসন পালনে হিন্দু জমিদারদের বিধি নিষেধের বিরুদ্ধেও তখন সোচ্চার হয়েছিলেন তিনি। দরিদ্র হিন্দুদের সঙ্গে দরিদ্র মুসলমানদের ধর্মীয় কোন্দল ছিল না বটে তবে হিন্দু জমিদার যখন অর্থনৈতিক শোষণের পাশাপাশি মুসলমান প্রজাদের ধর্মীয় স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করতে দ্বিধাবোধ করতো না তখন কৃষক দরদী মজলুম নেতা চুপ করে থাকেননি। ফলে অর্থনৈতিক মুক্তি এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা এই দুই আন্দোলনের সমন্বয়ে সৃষ্টি হয়েছিল এক বাঁধ ভাঙ্গা উত্তাল তরঙ্গের। কৃষক আন্দোলনের এই প্রথম পর্বের যুগ চললো জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের সময় পর্যন্ত। অবশ্য ধর্মীয় চেতনা যেটা এই আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিল তা কোনদিক থেকেই সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী হতে জন্ম নেয়নি বরং প্রতিটি মানুষের সর্বপ্রকার স্বাধীনতা ভোগস্পৃহার অদম্য আকাংখাই ছিল এর মূল কারণ। আর অর্থনৈতিক শোষণ ও ধর্মীয় স্বাধীনতার পথে অজস্র বাঁধা ছিল বলেই পূর্ববর্তী কৃষক বিদ্রোহগুলো যেগুলি বিভিন্ন সময়ে খন্ডাকারে এবং বিচ্ছিন্নভাবে বাংলার কোন কোন স্থানে সংগঠিত হয়েছে (যেমন তীতুমীরের বিদ্রোহ) তার প্রায়গুলোর সঙ্গেই ধর্মীয় আবেগ জড়িত ছিল।

জমিদারী প্রথার অবসানে শোষণের মূল চরিত্র বদলে না গেলেও শুরু হয় মওলানা ভাসানীর কৃষক আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়। এতদিন কৃষক জমায়েত, কৃষক সভা এবং কোন কোন স্থানে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র কৃষকদের সমাবেশ ইত্যাদি যে প্রাথমিক উপাদানগুলো ব্যবহৃত হতো তার সুসংগঠিত রূপ দিতে সচেষ্ট হলেন তিনি। তখনই প্রয়োজন হয়ে পড়ে কৃষক সমিতির মতো একটি শ্রেণী সংগঠনের। ১৩২৯ সালে ভাসানী চরের সম্মেলন, ১৩৩৮ সালের সিরাজগঞ্জের সম্মেলন, ১৩৪২-এর ঘাগমারীর সম্মেলন, ১৩৬৩ সালের কাগমারীর সম্মেলনে কৃষকদের উপর শোষণের প্রকৃতি, তার অবসানের আহবান এবং আন্দোলনের প্রাথমিক কায়দাগুলো সম্পর্কে নিরক্ষর ও অজ্ঞ চাষীদের একটা ধারণা দেয়া এবং এই শোষণের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। এই সম্মেলনগুলোর চরিত্র ছিল প্রতিবাদ প্রধান যদিও তখন থেকেই এর জঙ্গী চেহারাও সুস্পষ্ট হয়ে উঠছিল। ১৩৩৮ সালে সিরাজগঞ্জের কাওরাখোলায় তিন লক্ষেরও বেশী কৃষক সমবেত হয় এবং এই সভায় একুশ জন ঋণের তালিকা সংগ্রহ করা হয়। জমিদারদের বিরুদ্ধেই প্রধানতঃ তখন বিক্ষোভ পুঞ্জিভূত ছিল এবং এই কৃষক সম্মেলনগুলোতেও তাই রাজনৈতিক অধিকারের দাবীর চেয়ে সামন্তবাদী শোষণের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলা এবং এর প্রতিকারের দাবীই ছিল প্রধান। কোন কোন ক্ষেত্রে মামলা-মোকদ্দমা পর্যায়েও যেতে হয়েছে মওলানাকে। উপরোক্ত সম্মেলনগুলোতে একমাত্র কৃষকদের সমস্যা নিয়েই আলোচনা হয়েছে এবং এই আলোচনা ও প্রতিকারের দাবী বাংলার সর্বহারা কৃষকদের মনে হঠাৎ আলোর ঝলকানির মত হাজার বছরের অন্ধ প্রাচীর ভেদ করে নিয়ে এসেছে নতুন জীবনের আহ্বান। তারা নিজেদের সমস্যাগুলো ভাবতে শিখলো, ঐক্যবদ্ধ হবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলো এবং এই সম্মেলনগুলোর মাধ্যমেই মওলানা ভাসানী বপন করলেন আগামী দিনের শ্রেণী সংগঠনের বীজ। শুধুমাত্র কৃষকদের সুখ-দুঃখ নিয়ে বাংলাদেশের আর কোন নেতা এর আগে এমন করে ভাবেননি। (চলবে)

দিনাজপুরের সিনেমা হলে ৭০ জন নিহত

সম্প্রতি দিনাজপুরের একটি সিনেমা হলে সংঘটিত হত্যাকাণ্ড সম্পর্কিত খবরাখবর সরকার ধামাচাপা দিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু দিনাজপুরবাসীর আজ দাবী—এই হত্যাকাণ্ডের নিরপেক্ষ তদন্তের পর দোষী ব্যক্তিদের কঠোর শাস্তি দেয়া হউক।

রাত সাড়ে বারটার পর একদল সশস্ত্র জোয়ানের ব্রাশ ফায়ারে সিনেমা হলেই কমপক্ষে ৭০ জন নিহত হয়েছে। সবকয়টি লাশ গুম করার চেষ্টা করলেও বড় ময়দানস্থ তাদের ক্যাম্পে দশটি মৃতদেহ পাওয়া গেছে।

তাছাড়া জোয়ানরা কয়েকজন মহিলা দর্শককে পার্শ্ববর্তী নাট্য সমিতি হলে পাশবিক অত্যাচারের পর গুলি করে হত্যা করে। সেই রাতেই সংশ্লিষ্ট জোয়ানরা বড় ময়দান থেকে ক্যাম্পে উঠিয়ে সৈয়দপুর চলে যায়।

শো-র প্রথম দিন কয়েকজন মাতাল জোয়ানের উৎপাত বন্ধকল্পে দর্শকরা তাদেরকে মারধোর করে। এরই প্রতিশোধ স্বরূপ এই হত্যাকাণ্ড ঘটেছে বলে জানা গেছে।

ভাসানী সমীপে একটি চিঠি

শ্রদ্ধেয় মওলানা সাহেব,

আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানবেন। বিশ্বের শান্তিকামী মানুষের প্রথম সারিতে আপনাকে জানি। মা যেমন, সন্তানকে ভালবাসে প্রত্যক শান্তিকামী মানুষ তেমনি দেশকে ভালবাসে। কখনো কখনো অজ্ঞ মা তার সন্তানকে অন্ধ স্নেহ দিয় কু-পথে ঠেলে দেয়। সে তার কল্যাণের পথ সন্দর ও সুগম করতে জানে না। আজকে আমরা অজ্ঞতার অন্ধকারে ডুবে আছি। চলার পথ-প্রদর্শকের অভাব। আমাদের একমাত্র আশা, আপনি এই পিচ্ছিল পথ অতিক্রম করে অগণিত নরনারীকে পথ দেখাবেন। নিশ্চয়ই সে পথ হবে সুন্দরের, কল্যাণের।

আমরা ৭০ সাল থেকে কাঁদতে শুরু করেছি। ৭০ সালে ঝড়ে কেঁদেছি, ৭১-এ পৃথিবীর ইতিহাসের জঘন্যতম বর্বতায় কেঁদেছি। চোখের সামনে কন্যাকে ধর্ষিতা হতে দেখে বোবা হয়েছি। ৭২-এ পাকিস্তানে ৫ লক্ষ ভাই স্বামী- সন্তান বধূদের রেখে কাঁদছি। আরো কাঁদছি অসাধু ব্যবসায়ীদের চক্রান্তে। সাগরে যেমন তল নাই এ কান্নারও তেমনি শেষ নাই। আর কত কাঁদব। আপনি সেই সুন্দরের পথ দেখিয়ে দিন- যাতে অগণিত মানুষ শান্তিতে দুমুঠো খেয়ে-পড়ে বাঁচতে পারে।

শ্রদ্ধান্তে -

আয়শা বাশার

৬৮/১, পুরানা পল্টন, ঢাকা-২

গোপালপুরে সাংগঠনিক তৎপরতা

টাঙ্গাইল, ২০শে এপ্রিল। সম্প্রতি গোপালপুরে বিপুল সংখ্যক কর্মীর উপস্থিতিতে থানা ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন শেষে বাবু গনেশ বিষ্ণুকে সভাপতি এবং জনাব তোজাম্মেল হোসেনকে সাধারণ সম্পাদক করে মোট ১৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি শক্তিশালী কার্যকরী সংসদ গঠন করা হয়।

গোপালপুর থানার হেমনগরে বিপুল সংখ্যক কৃষক কর্মীর সমাবেশে ইউনিয়ন সমিতির কার্যকরী সংসদ গঠন করা হয়। জনাব সেকান্দর আলী তালুকদার এবং মোনসের আলী সরকার যথাক্রমে সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন।

গোপালপুর থানার অন্য কয়েকটি স্থানেও বাংলাদেশ কৃষক সমিতির সাংগঠনিক পরিষদ

গঠন করা হয়েছে। নন্দনপুর শাখার ৯ সদস্য বিশিষ্ট পরিষদে খন্দকার আবদুস সামাদ এবং জনাব কাশেম মুন্সি যুগ্ম অহ্বায়ক নির্বাচিত হয়েছেন।

সুন্দর কৃষক সমিতির সম্মেলনে মো: দেলোয়ার হোসেন এবং জনাব রিয়াজ উদ্দিন তালুকদারকে যুগ্ম আহ্বায়ক হিসাবে নির্বাচিত করা হয়েছে। এই পরিষদে মোট ১১ জন সদস্য রয়েছেন।

সমেশপুর শাখা কৃষক সমিতির বিশাল কর্মীসভায় মোঃ আবদুল করিম এবং মো: আবুল হোসেনকে যুগ্ম আহ্বায়ক করে মোট ১৮ সদস্য বিশিষ্ট শক্তিশালী সাংগঠনিক পরিষদ গঠন করা হয়।

শ্রমিক লীগের সশস্ত্র আক্রমণে ৭ জন নিহত

(সংবাদদাতা প্রেরিত)

গত ৯ই এপ্রিল নওয়াপাড়া যশোর জুট ইণ্ডাস্ট্রিজের অঙ্গনে বাংলা মজদুর ফেডারেশনের উদ্যোগে আয়োজিত এক শ্রমিক জনসভা চলাকালীন অতর্কিতে কয়েকশত সশস্ত্র লোকের আক্রমণে ৭ জন নিহত এবং শতাধিক আহত হয়েছে। আহতদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক।

যশোর জুট ইণ্ডাস্ট্রিজের শ্রমিকরা যখনই কোন ন্যায্য দাবী আদায়ের সংগ্রাম করে তখনই তাদের কণ্ঠরোধ করার জন্যে শ্রমিক লীগের গুণ্ডাবাহিনীর সশস্ত্র হামলা হয়। ন্যায্য পাওনার দাবীতে ঐক্যমতে পৌঁছানোর জন্যে উক্ত মিলের শ্রমিকরা খুলনার শ্রমিকনেতা জনাব আশরাফ হোসেনকে ডেকে এনে এক শ্রমিক সভার আয়োজন করে। ঠিক ঐদিন একই সময়ে শ্রমিক লীগও এক পাল্টা জনসভার আয়োজন করে। জনাব আশরাফ হোসেন বক্তৃতা করতে দাঁড়ালেই গুলীর আওয়াজ হয় এবং 'লালবাহিনী' বলে পরিচিত একদল সশস্ত্র লোক সভায় হামলা চালায়। উভয় পক্ষে সংঘর্ষ শুরু হলে পরিস্থিতির অবণতি ঘটে। গুলীর আওয়াজে পার্শ্ববর্তী গ্রামবাসীরা ভীত হয়ে পালাতে শুরু করে। বাস-ট্রাক এবং অন্যান্য যানবাহনের চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পথচারীরা সন্ত্রস্তভাবে পালাতে থাকে।

প্রায় তিন ঘন্টা স্থায়ী সংঘর্ষে শ্রমিক লীগ গুণ্ডাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন জনৈক গণপরিষদ সদস্য এবং অন্যান্য শ্রমিক লীগ নেতৃবৃন্দ। সংঘর্ষ থেমে যাবার পর প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী কমপক্ষে ৭ জনের মৃত্যু ঘটেছে এবং শতাধিক আহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

সংঘর্ষের ফলে শিল্প শহর খালিশপুর ও আটরা অঞ্চলের শ্রমিকদের মধ্যে বিক্ষোভ দানা বেঁধে উঠতে থাকে। কিন্তু তারা কোন ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত না হয়ে শ্রমিক লীগের গুণ্ডামির প্রতিবাদে মিলকারখানায় ১০ই এপ্রিল সারাদিন হরতাল পালন করে।

স্বাধীনতা টাঙ্গাইল স্টাইল

হানাদার বাহিনীকে খতম করতে মাত্র চার মাস আগেও যেসব গ্রেনেড ব্যবহৃত হয়েছে সম্ভবত: সেগুলোরই একটিতে টাঙ্গাইলে ৪২ জন স্বাধীন নাগরিক আহত হবার পর সকল মহলে উত্তেজনা দেখা দেয়। সাবেক মুক্তিসেনা ও ছাত্র নেতাদের ত্বরিত বৈঠক এবং রাজনৈতিক কর্মীদের টাঙ্গাইল-ঢাকা যোগাযোগের মাঝে মাঝরাতের ব্রাশ ফায়ার ও হাত বোমার আওয়াজ সংশ্লিষ্ট মহলগুলোতে উত্তেজনা আরো বাড়িয়ে দিলেও পরদিন জনসাধারণে স্বাধীনতা সংগ্রামের আগেকার ভীতিসঞ্জাত প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়নি। রাতে জারী করা ১৪৪ ধারা দুপুরে উঠিয়ে নিলে ঘোষণা অনুসারে আজ (রোববার) ২টা থেকেই চার ছাত্রনেতার সভা শুরু হবে, সভাস্থল পর্যবেক্ষণ করে মনে হয়েছে, এমনটি বেশ কিছু সংখ্যক ব্যক্তি আশা করে ছিল। এরপরও ঘন্টার পর ঘন্টা অনেকে তাই তেলেসমাতি বটিকা কিংবা হালুয়ার প্রচার, পল্লীকবিদের সুর জুড়ানো কবিতা এবং ১৪ জন লাঠিয়ালের লাঠি খেলা উপভোগ করে কাটিয়েছেন। অবশেষে বিকেল ৫টা-১০ মিনিটে টাঙ্গাইল মুক্তিবাহিনী প্রধান জনাব আলমগীর খান মেনু মঞ্চে এসে বললেন, যে চার ছাত্রনেতার জন্যে ৪২ জনকে রক্ত দিতে হয়েছে তারাই যেহেতু আসলেন না তাই আমাদের আর তাদের উপর আস্থা নাই। সভাস্থলটি আগাগোড়া স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রে সজ্জিত অন্তত: তিনশত পুলিশ ও বাংলাদেশ রাইফেলসের প্রহরায় বেষ্টিত ছিল।

ইতিমধ্যে পাকবাহিনী কর্তৃক একসময়ে চৌদ্দ বছরের কারাদণ্ডপ্রাপ্ত স্বাধীনতা সংগ্রামী জনাব আবুল কালাম আজাদ এবং মুক্তিযোদ্ধা শ্রমিক নেতা জনাব আবদুস সবুরকে গ্রেফতার করা হয়। সন্ধ্যায় জনাব কাদের সিদ্দিকী সমর্থক কয়েকজন ছাত্র শহরে কয়েকটি পথসভা করেন। তাতে তারা প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে নিরীহ ছাত্রদেরকে গ্রেনেডের শিকারে পরিণত করার পাল্টা অভিযোগ উত্থাপন করেন। তারা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগে অভিযুক্ত করে হুঁশিয়ার প্রদান করেন।

ঠিক এক বৎসর পূর্বে পাক ফৌজ ট্রাকে ট্রাকে বোঝাই হয়ে টহল দিত বটে কিন্তু আজকালকার স্বাধীন টাঙ্গাইলে সদা প্রস্তুত কায়দার বাঙ্গালী যোয়ানদের শহরের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে গমনাগমন তাকেও ছাড়িয়ে গেছে।

রোববার সন্ধ্যায় শহরে আবার ১৪৪ ধারা জারী হলেও রাত এগারটায় শতাধিক শ্রমিকের একটি মিছিল বের হয়। তাতে বন্দীদের মুক্তি দাবী করে শ্লোগান দেয়া হয়।

ভারত সরকার জবাব দাও

টাঙ্গাইল, ২০ শে এপ্রিল। স্থানীয় একটি কুল প্রাঙ্গণে বাংলা ছাত্র ইউনিয়ন আয়োজিত জনাব তোরাব আলী ফকিরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সম্বর্ধনা সভায় প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রীয় সভাপতি জনাব মাহবুবউল্লাহ ভাষণদানকালে বাংলাদেশ সরকার ও জনগণের স্বার্থহানিকর স্বাধীনতা উত্তর ভারতীয় পদক্ষেপের পর্যালোচনা করে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করেন।

জনাকীর্ণ সভায় সংক্ষিপ্ত ভাষণে তিনি বাংলাদেশের জনগণের অংশীদারিত্ব উপেক্ষা করে আড়াই হাজার কোটি টাকা মূল্যের অস্ত্রশস্ত্র ভারতে পাচারের সমালোচনা করেন। জনাব মাহবুবউল্লাহ বিশেষ করে পাট ও খাদ্যশস্য চোরাচালানের খতিয়ান তুলে ধরে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও সঙ্কটের চরম পরিণতি সম্পর্কে সরকারকে হুঁশিয়ার করে দেন।

জেলা ন্যাপ সাংগঠনিক কমিটির আহ্বায়ক সৈয়দ আবদুল মতিন সুদীর্ঘ ভাষণে স্বাধীনতা অর্জনে বামপন্থী কর্মীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বিশ্লেষণ করে বলেন, "অন্যান্য রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান যখন দফাভিত্তিক আপোষ আলোচনায় ব্যস্ত আমরাই তখন প্রত্যক্ষ মুক্তি সংগ্রামের আহবান জানাই।"

বাংলা ছাত্র ইউনিয়নের জেলা শাখার সহ-সভাপতি খন্দকার মুসা চৌধুরী তার ভাষণে অভিযোগ উত্থাপন করেন যে মুক্তিযুদ্ধে বামপন্থী ছাত্র-যুবাদের কোনঠাসা করে রাখার জন্যে ভারত সরকার তাদেরকে আটক, দমন, হয়রানি এমনকি প্রয়োজনে হত্যা করতেও পিছপা হয়নি।

সভাপতির ভাষণে জনাব তোরাব আলী ফকির বলেন, আমরা রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেলেও অর্থনৈতিক মুক্তি পাইনি।

হক-কথা

১০ই বৈশাখ, রবিবার

বাংলাদেশ ও কমনওয়েলথ

বাংলাদেশ কমনওয়েলথের সদস্যপদ পাইয়াছে– সরকারী মহল এই খবরটি অত্যন্ত উৎসাহের সহিত ঢাক - ঢোল পিটাইয়া প্রচার করিয়াছেন। কোন কোন মহল আবার অভিনন্দন জ্ঞাপনের প্রতিযোগিতায়ও অবতীর্ণ হইয়াছেন। ভাবখানা এই, কমনওয়েলথের সদস্য হইয়া বাংলাদেশ যেন এক 'মহা' অনুগ্রহ লাভ করিয়াছে।

ইহা যে এক প্রকার অনুগ্রহ তাহাতে সন্দেহ করার বিশেষ সুযোগ নাই। কেননা, সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশ বিশ্বের বিভিন্ন সংস্থার নিকট হইতে স্বীকৃতি লাভ করুক-ইহা সকলেরই কাম্য। তবে প্রত্যেকটি স্বীকৃতির পটভূমি ও উহার মৌল উদ্দেশ্য অনুধাবন করার আবশ্যকতাও সেই সঙ্গে উপেক্ষিত হইলে চলে না।

কমনওয়েলথের ব্যাপারে বিশেষ বিশেষ মহলের অনাবশ্যক উৎসাহ দেখিয়া মনে হয়, সেই পটভূমিটি যথাযথরূপে অনুধাবন করা হয় নাই কিংবা সেই প্রশ্নটি সচেতনভাবে উপেক্ষিত হইয়াছে। সুতরাং এক্ষণে সেই পটভূমিটি ও তাহার পশ্চাদবর্তী উদ্দেশ্যগুলি একটু বিশ্লেষণ করার দরকার।

কমনওয়েলথ শুধুমাত্র কমনওয়েলথ নয়– বৃটিশ কমনওয়েলথ। বৃটিশ ঔপনিবেশিক চক্র যখন মুক্তিকামী মানুষের সংগ্রামের মুখে একের পর এক সাম্রাজ্য হারাইয়াছে তখন পরিত্যক্ত সাম্রাজ্যের সহিত যতদূর সম্ভব সম্পর্ক রাখার জন্যই এই সংস্থার প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। তাহা কি তাহাদের পরিত্যক্ত সাম্রাজ্যের স্বার্থে না বৃটিশের স্বার্থে। কমনওয়েলথের পূর্বাপর কার্যকলাপ যাহারা বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখিয়াছেন তাহারা এক-কথায় সাক্ষ্য দিবেন যে, কমনওয়েলথ প্রতিষ্ঠার মূল স্বার্থ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের। বাংলাদেশ-ভারত-পাকিস্তান এই উপমহাদেশ হইতে শুরু করিয়া রোডেশিয়া পর্যন্ত কমনওয়েলথ নির্যাতিত জনগণের স্বার্থে কাজ করিয়াছে এমন দৃষ্টান্ত নাই। ঠিক এই জন্যই দেশের মুক্তিকামী মানুষ বরাবর এবং আওয়ামী লীগও ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের ক্ষমতা লাভের পূর্ব পর্যন্তও বৃটিশ কমনওয়েলথ ত্যাগের দাবী করিয়া আসিয়াছে। অবশ্য ক্ষমতা লাভের পর এ ব্যাপারে তাহাদের আর উচ্চবাচ্য শোনা যায় নাই।

বিগত স্বাধীনতা আন্দোলনে আওয়ামী লীগ স্পষ্টত: জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতির প্রতিশ্রুতি জনগণের সামনে ঘোষণা করিয়াছিল। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সরকার সে নীতি কথায়, কাজে ও মনোভাবে সমানভাবে মানিয়া চলিবেন বলিয়া প্রত্যাশা করাই স্বাভাবিক।

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী ফাঁদ কমনওয়েলথে প্রবেশের সুযোগ পাইয়া তাহারা যেভাবে আনন্দে গদগদ ভাব দেখাইতে শুরু করিয়াছেন তাহাতে সে প্রত্যাশা কতখানি বাস্তব ভিত্তি পাইবে বলা যায় না। কে জানে, হয়ত একদিন সিয়াটো-সেন্টোর অনুরূপ অনুগ্রহেও তাহাদের আনন্দের কমতি দেখা যাইবে না। চাই কি তখন ০+০+০=০ এই জাতীয় চরম ক্ষতিকর যুক্তিরও পুনরাবৃত্তি ঘটিবে।

এই প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নাই। তবে সরকারের ভুলিয়া যাওয়া উচিত নয়, এই দেশের মানুষ মাত্র কয়েক মাস আগেও তৎকালীন পাকিস্তানকে কমনওয়েলথ হইতে বাহির করিয়া আনার জন্য আন্দোলন করিয়াছে। সে আন্দোলনের মূলীভূত কারণ কিন্তু দূর হইয়া যায় নাই। কমনওয়েলথ বাংলাদেশের মুখ চাহিয়া তাহার সাম্রাজ্যবাদী লেবাস পাল্টাইয়া ফেলে নাই। সুতরাং বৃটিশ কমনওয়েলথে প্রবেশকালে বেশী ফূর্তি করিয়া লাভ নাই।

আলস্টারের একটি রক্তাক্ত দিবস

তরুণ চট্টোপাধ্যায়

বাংলাদেশের ক্ষমতার নিজ ভাগ্য নির্ধারণের অধিকার লাভের আন্দোলন সার্থক হবার পরেই বৃটিশ সরকারের এক হোমরাচোমরা রাজপুরুষ অবিলম্বে সেখানে পদধূলি দিয়ে শেখ মুজিবকে অভিনন্দন জানাতে আসেন এত হাজার ক্রোশ দূরে, ঠিক তখন বৃটেনের প্রতিবেশী শ্বেতাঙ্গ অধ্যুষিত আয়ার‍্যাণ্ডের উত্তর ভাগের ছটি জেলার সমষ্টি ও বৃটিশ শাসিত প্রদেশ আলস্টারে (আলেস্টার শব্দটি

নিজের চরকায় কেউ তেল দেয় না

আলস্টারের অপভ্রংশ) চলছিল সেখানকার জনতার আন্দোলন। বৃটিশ রাজের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের যে লক্ষ্য, ঠিক সেই লক্ষ্যে উত্তীর্ণ হবার দুর্জয় সঙ্কল্প নিয়ে সেই আন্দোলনের উপর হিংস্র আক্রমণ চালাচ্ছিল বৃটিশ ফৌজ। একই লক্ষ্যের জন্য কালা আদমিদের বাংলাদেশকে অভিনন্দনের সঙ্গে যুগপৎ ধলা আদমিদের আলস্টারকে দমন-দলন আশ্চর্য নয় কি? না, আশ্চর্য নয়। কারণ, সাম্রাজ্যবাদের অভিধানে 'শোষণ' ও 'ফ্যাসিবাদ' ছাড়া আর কোন শব্দ আজ আর নেই। শোষণ ক্ষেত্রের বিস্তার যত সঙ্কুচিত হচ্ছে, অবশিষ্ট অংশে সেই অনুপাতে শোষণ আরো প্রচন্ড ও হিংস্র হয়ে উঠছে। বর্ণবিদ্বেষ ঐ সাম্রাজ্যবাদী শ্রেণী শোষণেরই এক হাতিয়ার ছাড়া আর কিছু নয় বলে একই বন্দুকের টোটায় বৃটিশ ফৌজ দক্ষিণ রোডেশিয়ার কাফ্রীদের ও উত্তর আয়ার‍্যাণ্ডের সাদা মানুষদের হত্যা করে। বাংলাদেশের সঙ্গে এই নতুন করে আমড় গাছি করা সেই দেশের জয়লাভের জন্য নয়, সেখানকার পাটের বাজারে ও অর্থনীতিতে প্রতিদ্বন্দ্বী যুক্তরাষ্ট্রের আগেই মহাজনী মূলধন রপ্তানীর সুযোগ লাভের আশায় এবং বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানও সেই জন্যই। কিন্তু আলস্টারের ক্ষেত্রে তার প্রয়োজন নাই। সেখানে পাট-পশম ও রেশম শিল্পে বৃটিশ মহাজনী মূলধন খাটছে অর্ধ শতাব্দী আগে থেকে যখন বৃটিশ জবরদস্তি করে এই ছয় জেলার প্রদেশটি আয়ার‍্যাণ্ড থেকে ছিনিয়ে নেয়। ঐ মহাজনী মূলধনের মাধ্যমে যে শোষণ চলে আসছে তা জনতা আর বরদাস্ত করতে রাজী নয় বলেই বৃটেনের এই মরিয়া ও হিংস্রভাবে আলস্টারে নামেমাত্র শাসনটুকুও কেড়ে নেওয়া। শ্বেতাঙ্গদের দেশ হয়েও তার রক্ষা নেই। আলস্টারে যা চলছে তার চেয়েও অনেক বেশী নির্যাতন ও হত্যালীলা চলে আসছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পিছনের আঙ্গিনা ল্যাটিন আমেরিকায় গেরিলাদের রাজত্বে ইন্দোচীনে, দক্ষিণ কোরিয়ার উত্তর কালিমান্তানের ও হণ্ডুরাসের বৃটিশ শাসিত অংশ (বৃটিশ বোর্ণিও), ব্রুনেইতে, সুহার্তোর ইন্দোনেশিয়ায় এবং পশ্চিম বাংলায় (আরো অনেক হিংস্র), উগাণ্ডায়, কিনশাশ, কঙ্গোয়, আয়ান স্মিথোন ও ভেরউডের রোডেশিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকায় এবং মালিতে। এটা অনিবার্য কারণ। নাভিশ্বাসের যুগে পুঁজিবাদ তথা সাম্রাজ্যবাদ মরিয়া হয়ে টিকে থাকবার জন্য শেষ খড়কুটো হিসাবে আঁকড়ে ধরে ফ্যাসিবাদী দমননীতি। ঐতিহাসিক ও দ্বন্দ্ব প্রগতি ভাষায় বলা যায় :

'জীবনে নিরন্তর কিছু না কিছু মরণোন্মুখ। কিন্তু সেই মরণোন্মুখ শান্তিতে মরতে কখনো রাজী হয় না। সে বাঁচবার জন্য মরিয়া হয়ে লড়াই করে, বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করে তার

পচা ধ্বসা আদর্শ।' (সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ১৫শ কংগ্রেসে স্তালিনের রিপোর্ট)।

একই চিত্র সর্বত্র সারা পুঁজিবাদী দুনিয়ায় ঠিক এই কারণে নতুন করে ফ্যাসিবাদের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়া হচ্ছে 'একনেতা, এক পার্টি, এক জাতি' শ্লোগান তুলে। শ্রীমতি ইন্দিরা বলেছেন যে এক পার্টি শাসন ফ্যাসিবাদের রূপ নেবে না। কথাটা অর্ধসত্য। যাদের প্রশ্নের জবাবে তিনি একথা বলেন তাদের কখনো সংসদীয় তর্কবিতর্ক সমিতির মোহ কাটেনি। পুঁজিবাদী দেশমাত্রই বুর্জোয়া একনায়কত্বের শাসন অর্থাৎ এক পার্টির শাসন। ভারতে তো স্বাধীনতার পর থেকে কংগ্রেসেরই একাধিপত্য চলে আসছে। এখন সেটা আরো নগ্ন হল অর্থাৎ এইটুকু শ্রেণী বিভক্ত সমাজে এক পার্টির শাসন আজকের দিনে ফ্যাসিবাদী রূপ গ্রহণ করতে বাধ্য। বলবেন, সমাজতান্ত্রিক দেশেও তো এক পার্টির শাসন। হ্যাঁ কিন্তু ঐসব দেশে শ্রেণীবিভেদ বিলুপ্ত এবং শ্রমিকশ্রেণীর একাধিপত্য তাদের মাধ্যম। সমাজটা শ্রেণীবিভক্ত না শ্রেণীবিহীন এটাই হচ্ছে মানদণ্ড। গণতন্ত্র ও অঙ্গরাজ্যিক অশ্বশাসনের মুখোশ পুঁজিবাদী শাসকশ্রেণী অবস্থা সামাল দিতে না পারলেই ছিঁড়ে ফেলে। লন্ডনের সরাসরি আলস্টারের শাসনভার গ্রহণ হচ্ছে সেই ব্যাপারে অনেকটা ভারতের রাষ্ট্রপতি শাসনের মতো)।

সাম্রাজ্যবাদ যে বিভেদ সৃষ্টির দ্বারা শাসন করে তার আর একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে আলস্টারে প্রোটেস্ট্যান্ট ও রোমান ক্যাথলিকদের মধ্যে আদায় কাঁচাকলা সম্পর্ক ও দাঙ্গাহাঙ্গামা। প্রাচীন নগরী লন্ডন ডেরীতে গত ৩০শে জানুয়ারী রবিবার ব্যক্তি স্বাধীনতা সংসদের আহ্বানে রাজপথে যে বিরাট নিরস্ত্র মিছিল বের হয়, বৃটিশ ছত্রীফৌজ বন্দুক দেগে তাদের ১৩ জনকে হত্যা ও ১৮ জনকে মারাত্মকভাবে আহত করে। মিছিলের দাবী ছিল: (১) বিনা বিচারে গারদে ও বন্দীশালায় আটক রাজবন্দীদের মুক্তি ও 'অপরাধ' সম্পর্কে বৈধ তদন্ত; (২) চাকরি ও বাসস্থান। এই দুটি দাবীর জবাব হল বুলেট। এটাই হল মি: হীথ ও মি: মডলিং-এর 'উত্তর আয়ারল্যান্ডে আইন ও শৃঙ্খলা' রক্ষার অত্যন্ত মানবিক কর্তব্য পালনে বৃটিশ ফৌজের বাহাদুরী। ১৯৬৯ সালে আলস্টারে প্রথম বৃটিশ ফৌজ নামাবার পর থেকে আজ পর্যন্ত সেখানে 'আইন ও শৃঙ্খলা' বজায় রাখা সত্যই সপ্তমে উঠেছে। এটা লক্ষণীয় যে সমস্ত পুঁজিবাদী দেশেই শাসক শ্রেণীর সরকারী হিংস্র দমননীতির সাফাই দেওয়া হয় এই 'আইন ও শৃঙ্খলার' যুক্তি দিয়ে। কলকাতার পথে পথে, ট্রামে-বাসে বড় বড় অক্ষরে লেখা সাধুবাদ 'হিংস্রতা (ব্যাকরণ শুদ্ধ?) বর্জন করুন' 'নিজে বাঁচুন, অন্যকে বাঁচতে দিন'– এইসব উপদেশের পাল্টা আমরা কি জিজ্ঞেস করতে পারি 'হিংসা প্রথমে শুরু করে কে?' আমরা কি ঐ লেখার নিচে লিখতে পারি: 'নিশ্চয় বাঁচব ও বাঁচতে দেব কিন্তু রুজি-রোজগারের সুযোগ দেন, কাজ দিন?'

হীথ সরকার পার্লামেন্টে সন্দেহজনক ব্যক্তিদের বিনা বিচারে আটক রাখার ক্ষমতা গ্রহণ করেন জরুরী অডিনান্স আলস্টারে জারি করে (ভারতের নির্বতনমূলক আটক আইনগুলির মতো) এই বলে জনমতকে ধাপ্পা দেন যে, ঐ আইনের প্রয়োগের ফলে জনতার ক্ষতি কমে যাবে কিন্তু ১৯৭১-এর ৯ই আগষ্ট থেকে ৩১ শে ডিসেম্বর পর্যন্ত দমননীতির হাড়িকাঠে জবাই হয় ১৪২টি প্রাণ যা ১৯৭০ সালের ঐ ক'মাসের ক্ষতিয়ানের ৭ গুণ।

লন্ডন ডেরী নয় – ডেরী

২৫ হাজার লোকের এক মিছিল বের হয় দক্ষিণ আয়ারল্যাণ্ডের রাজধানী ডাবলিন শহরে। মিছিলটি সোজা বৃটিশ দূতাবাসে গিয়ে একটি মলোটফ ককটেল ছুঁড়ে মারায় দূতাবাসে আগুন ধরে যায়।

লন্ডন ডেরীর ক্যাথলিক মহল বগসাইড-এর সামনে একটি সাদা দেওয়ালে লেখা আছে: 'এইখান থেকে আপনারা স্বাধীন ডেরীতে প্রবেশ করছেন। মনে রাখবেন এটা লন্ডন ডেরী নয়, ডেরী।' এর মানে সেখানকার জনগণ জোর করে চাপিয়ে দেওয়া বিভক্তিস্বরূপ 'লন্ডন' শব্দটি মেনে নিতে রাজী নন। আগে ব্যারিকেড বেষ্টিত ডেরীতে বৃটিশ ফৌজের উৎপাত করার সাহস ছিল না। স্থানীয় ক্যাথলিক ও কিছু প্রোটেস্ট্যান্ট নিয়ে গঠিত ডেরী নাগরিক প্রতিরক্ষা পরিষদ (নির্বাচিত) এলাকার সর্বব্যাপার সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতেন।

কালো সোমবার

কিন্তু আজ অবস্থা অন্য রকম। আলস্টারে ফৌজের বহর বাড়িয়ে বৃটিশ সরকারের খাড়া প্রথমেই পড়ল বগসাইডের অশ্বশাসনের গর্দানে, গ্রেফতার ও অন্তরীণ করা হল অডিনান্স প্রয়োগ করে, সবার আগে সান কেনান প্রমুখ পরিষদের পুরোধা নেতাদের। মি: কেনান বন্দী আছেন। কুখ্যাত লংকেশ বন্দী শিবির সম্পর্কে একটি কাগজে প্রকাশিত রিপোর্ট পরে দেব।

১৯৭১ সালের ৯ই আগস্ট সোমবার হীথ সরকারের তাবেদার বেলফাস্ট কর্তৃপক্ষও ঐ জরুরী অডিনান্স জারি করেন বলে লোকে ঐ দিনের নাম দিয়েছে 'কালো সোমবার'।

রক্তাক্ত রবিবারের মিছিলটির কথা ছিল ডেরীর রাস্তা দিয়ে গিয়ে একটি জনসভায় শেষ হওয়া। সভায় বক্তাদের তালিকার মধ্যে নাম ছিল লর্ড ফেনার ব্রকওয়ের এবং বৃটিশ পার্লামেন্টের আইরিশ সদস্য বার্নাডেট ডেলভিয়ের। একটি নারীকে বক্তৃতা মঞ্চ হিসাবে খাড়া করে বক্তৃতা দেবার জন্য তারা দুজনেই মিছিলে আসার জন্য প্রত্যাশা করছিলেন। কিন্তু প্রতীক্ষাই সার হল। বৃটিশ পুলিশ ও ছত্রীফৌজ মিছিলের পথ রুখে প্রথমে ঘা মারতে লাগল রবারের গদা দিয়ে ফাটালো বিষবাষ্পের বোমা। শেষে বুলেট।

শহীদদের শব নিয়ে ৩০ হাজার নাগরিক শোক যাত্রা করেন পরদিন। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদরা প্রায়-অবলুপ্ত সাম্রাজ্যবাদীরা দেখেও দেখছে না। এই সেদিন তারা সাইপ্রাসে, আদেনে, মালয়ে ও মিশরে যে মৃতবৎসা চক্রান্ত চালিয়েছিল এবং বর্তমানে চালাচ্ছে বৃটিশ বোর্ণিওতে ঠিক সেই দুষ্কার্যেই তারা আবার লিপ্ত হয়েছে আলস্টারের ৬টি জেলা– ডেরী, টাইরোন, ফার্মানাগ, আর্মাঘ, অ্যানট্রিম ও ডাউনের বিরুদ্ধে।

গত জানুয়ারী মাসে ড্যানিরেল ও নীল নামে এক ২০ বছরের দেশভক্ত যুবক বৃটিশ ফৌজের গুলীতে শহীদ হয়। সেইদিন আইরিশ নিউজ পত্রিকায় ছাপা হয় শহীদের উদ্দেশ্যে ৩৩টি শোকবার্তা। সংখ্যায় ৩৩টি হলেও সবগুলিরই বার্তা ছিল একই যারা অধিক অস্ত্রবলের দৌলতে প্রচন্ড আঘাত করে, আখেরে তারা কিন্তু জয়যুক্ত হয় না অস্ত্র যতই বা যেমনই থাকুক, জয়যুক্ত হন তারাই যারা সেই আঘাত সহ্য করেও দীর্ঘকাল খাড়া থাকতে পারে। তাছাড়া জীবনে সদাসর্বদা কিছু না কিছু নতুনের জন্ম হচ্ছে কিন্তু সেই নতুন কখনো আলোড়ন বাদ দিয়ে পৃথিবীতে আসে না। চ্যাঁ ভ্যাঁ করতে করতে সে আসে তার অস্তিত্বের অধিকার ঘোষণা করে' (স্তালিন–ঐ)।

রুবাইয়াৎ–ই বাংলাদেশ

॥ ডাঃ মোঃ নুরুল হক ॥

১। সংগ্রাম, সংগ্রাম চলবেই চলবেই
আগুন, আগুন জ্বলবেই, জ্বলবেই
মিছিলেতে ভরে গেলো দেশ।

পোষ্টারে, শ্লোগানে, বাস, ট্রেন, গো-যানে
হৈ-চৈ, আলোচনা, বক্তৃতা, বাথানে
ছেলে বুড়ো-জনতার নেই যেন শেষ।

২। প্রেসিডেন্ট ভবনে এহিয়া সযতনে
ফাঁদ পাতে মুজিবের ছয় দফা হননে
মিথ্যা ও কূটচালে চরাচর ধোঁয়াটে।
কাইউম, ভুট্টো, মমতাজ দৌলতনা
সবে বলে ছয় দফা মানাটানা যাবেনা
রাজনীতি হালচাল হয়ে গেলো ঘোলাটে।

৩। মার্চের পঁচিশে এহিয়ার পশুকুল
খাঁচা ছেড়ে বের হলো চারিদিকে বিলকুল
খুন-লাশ আগুনের লেগে গেলো সেকি ধূম।
দানবিক, আনবিক, মানবিক, পাশবিক
বিশেষণ যতকিছু কোনটাই নয় ঠিক
বাংলার হাহাকারে বিশ্বও নিঝঝুম।

৪। অবাঙ্গালী, বিহারী, ইসলাম-পন্থী
একই তারে বাঁধা যেন সবগুলি গ্রন্থী
ইসলামী দূর্গকে রাখবেই।
মানুষেতে কাজ নেই, নীতি মাঝে ভাঁজ নেই
পাট আর পাক-ভূমি বড় প্রয়োজন সেই
মুসলিম পৃথিবীতে থাকবেই।

৫। পুনঃশুরু মিছিলের সীমা-পার-পানেতে
'গাদ্দার' খোঁজা বাদ নেই কোন খানেতে
অশ্রু ও শোণিতের বয়ে গেলো বণ্যে।
ভারতের জনতা বিস্ময়ে ব্যথাতে
কোলে নিলো সবাকারে গ্লানি সব মোছাতে
ভাগ তারা দিয়েছিল নিজেদের অন্নে।

৬। করাচীর প্রচারে, কাগজে ও বেতারে
কথা-গানে, উপদেশ, বাঁশী ও সেতারে
বলেছিল পরিবেশ বিলকুল নরম্যাল।
দেশে দেশে দূত যায়, ধরে সবে হাতে-পায়
আমাদের ব্যাপারেতে কথা বলা অন্যায়
ভারতের মতি-গতি নয় ঠিক ফরম্যাল।

৭। ইউ-এন ও, ওয়াশিংটন, তেহরান, ক্যান্টন
চৌ আর নিক্সন, কোসিগিন, জনষ্টোন,
গড়মিলে, গোঁজামিলে ভরে গেলো বিশ্ব।
"ব্রেনগান, স্টেনগান, নাপাম আর SABRE-এ
ভরে দাও বাংলা। তা না হলে এবারে
নাই পথ।" কেঁদে কয় নিক্সন-শিষ্য।

৮। অবশেষে একদিন লঘু-গুরু স্থূল ক্ষীণ
ফেরা-রথ শুরু হলো। উত্তর দক্ষিণ,
পূর্ব ও পশ্চিম, ঢাকা পানে শুরু হলো যাত্রা।
সেরা সব ফাইটার, দেখে পথ নাই আর
ফেলে দিয়ে হাতিয়ার খুঁজে ফেরে শেল্টার
সারা ইতিহাসময় নাই যার মাত্রা।

৯। বাংলার সৃষ্টি। বিশ্বের দৃষ্টি
টেনে আনে নিজ পানে। কালচার কৃষ্টি
স্বগরবে গরবিনী বাংলা।
সংগ্রাম হলো শেষ। ছোট বড় সব দেশ
খুশী হলো এই ভেবে—সহৃদয় পরিবেশ
শুরু হবে। শেষ হবে তারবেলা মংলা।

আপনার চিঠি

চট্টগ্রামের ডি ডি পি আই অফিসে পাকিস্তানী ভূত

জনাব সম্পাদক সাহেব,

আমি ১৯৬৯ সালে কুমিল্লা বোর্ডের অন্তর্গত সিদলাই আশরাফ উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ৮ম শ্রেণীর বৃত্তি পাওয়ার পর বিশেষ অসুবিধার দরুণ ঢাকা বোর্ডের অন্তর্গত ঘোড়াশাল উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হই। বৃত্তি বোর্ড পরিবর্তন করার জন্যে ঘোড়াশাল বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের মাধ্যমে ঢাকার ডিডিপিআই সাহেবের কাছে দরখাস্ত করলে তিনি চট্টগ্রামের ডি ডি পি আই সাহেবের সাথে চিঠি লিখে যোগাযোগ করতে ব্যর্থ হল বলে জানান। পরে চট্টগ্রামের ডি ডি পি আই সাহেবের কাছে সরাসরি যোগাযোগ করলে

একটি প্রাপ্তিস্বীকার পত্র ছাড়া আজ পর্যন্ত আর কিছু পাওয়া যায়নি।

তারপর দীর্ঘ দিন কেটে গেছে। স্বাধীনতা সংগ্রামে আমিও অংশ নিয়েছি। পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম বড় ভাইটি এই যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। এখন তাই আমরা নিদারুণ অভাবে দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছি। এদিকে রিলিফ অফিসারকে ঘুষ না দেয়ার অপরাধে আমরা কোন রিলিফও পেতে পারিনি। এই মুহূর্তে আমার বৃত্তির টাকাগুলো অনেক উপকারে আসতো। পাকিস্তানের মৃত্যু হলেও, এখনো যে কিভাবে পাকিস্তানী রীতিনীতিই চালু থাকতে পারে, তা আমি ভেবে পাই না। চট্টগ্রামের ডি ডি পি আই সাহেব কি তার ফাইলের পাহাড় ঠেলে আমার দরখাস্তটি মঞ্জুর করে পাওনা বৃত্তির টাকাগুলো দিয়ে আমাদের বাঁচতে দেবেন?

– জনৈক ছাত্র

আমাদের জমি ফিরিয়ে দিন

জনাব সম্পাদক সাহেব

পাকিস্তান সরকার ইস্টার্ণ রেফাইনারী এবং নৌবাহিনীর জন্য পতেঙ্গার সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত আমাদের বিপুল পরিমাণ জমি জবর দখল করে নিয়েছিল। প্রতি কানি জমির মূল্য ৭/৮ হাজার টাকা হলেও আমরা তখন ক্ষতিপূরণ বাবদ পেয়েছিলাম মাত্র ৯২০ টাকা করে। এই জমিগুলোই ছিল আমাদের জীবিকা নির্বাহের একমাত্র অবলম্বন। পাকিস্তান সরকার এগুলো এক শ্রেণীর মুনাফাখোর ইজারাদারদের নিকট ইজারা দিয়েছিল। জমি থাকতেও আমরা তাই এখন জমিহীন সর্বহারা। অথচ এই জমিগুলো একমাত্র চাষের জন্যেই উপযোগী।

আমরা তাই সরকারের কাছে দাবী করছি, অবিলম্বে জমিগুলো ফেরত দিয়ে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে আমাদের রক্ষা করা হোক।

– হালিশহর-পতেঙ্গার গরীব চাষীবৃন্দ।

মেজর জলিল সমাচার

'হক-কথা'র গত সংখ্যায় 'মেজর জলিল সমাচার শ্বেতপত্র চাই' রিপোর্টটি পড়ে আমরা খুবই আশান্বিত হয়েছি। কয়েক মাসের মুখচাপা কথা রিপোর্টটিতে দুঃসাহসের সাথে তুলে ধরা হয়েছে। তবে প্রকাশিত বক্তব্য ছাড়াও আরো অনেক বিষয় বাংলাদেশবাসীর জানবার রয়েছে। আমরা তার কিছু পেশ করলাম।

পাঠকের অভিমত

মেজর জলিলকে গ্রেফতারের পেছনে দুটি প্রধান কারণ রয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের কতিপয় কর্মকর্তা ও জেনারেল ওসমানীসহ সেনাবাহিনীর কতিপয় অফিসারের সাথে মেজর জলিলের মনোমালিন্য। দ্বিতীয়তঃ দেশমুক্ত হবার পর ভারতীয় সেনাদের যথেচ্ছা জিনিষপত্র নেয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

মেজর জলিল একসময় বলেছিলেন, ট্যাংক রেজিমেন্টের অফিসার হওয়ায় জেঃ ওসমানী তাঁকে খুব ভালো চোখে দেখতে পারতেন না। অন্যদিকে পাক-সেনাদের বিরুদ্ধে সফল প্রতিরোধের ফলে সেনাবাহিনীর এবং সরকারের কতিপয় উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা তাঁকে রীতিমত ঈর্ষার চোখে দেখতেন। আর তাই, ১০ নং সেক্টরের স্বীকৃত অধিনায়ক হওয়া সত্ত্বেও, তাঁকে উৎখাত করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে মুজিবনগর থেকে অন্য একজন মেজরকে তাঁর এলাকায় পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু পরিণামে কর্মকর্তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ হয়।

স্বাধীনতার পর ভারতীয় সেনাবাহিনী সারাদেশ থেকে বিভিন্ন জিনিষপত্র ভারতে নিতে শুরু করে। এরা রেডিও, ঘড়ি জাতীয় জিনিষের সাথে সাথে কল-কারখানার মূল্যবান দুষ্প্রাপ্য পার্টসও নিয়ে যেতে থাকে। খুলনার খালিশপুর থেকে তারা যখন বিশেষ করে পাটকলগুলোর পার্টস ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি নিতে থাকে তখনই দেশপ্রেমিক মেজর জলিলের সাথে সংঘর্ষ বেঁধে যায়।

সরকারী প্রেসনোটের বক্তব্য যদি সত্য হতো, তাহলে সেনাবাহিনীর আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গের অপরাধে অপরাধীকে যুদ্ধের সময়ই গ্রেফতার করা হল না কেন? তাই মনে হয়, উপরের কারণ দুটোই প্রধান। তাছাড়াও, আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ রয়েছে বাংলাদেশ সরকার ও সেনাবাহিনীর কতিপয় কর্মকর্তা নাকি মেজরের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন, তিনি নকশাল হয়ে গেছেন। সরকারের বিরুদ্ধে পরবর্তীকালে বিদ্রোহের জন্যে তিনি প্রচুর পরিমাণ অস্ত্র সুন্দরবনে লুকিয়ে রেখেছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে মেজর জলিলের অবদানের কথা সর্বজন স্বীকৃত। অবিলম্বে তাঁকে মুক্তি দেয়া দরকার। না হলে হয়তো অন্য পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে। কতিপয় স্বার্থান্ধ অফিসারের কবলে পড়ে সরকারের ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে মুক্তিযুদ্ধের সময় বীর মেজর নিজের হাতে হাজার হাজার যোদ্ধা গড়েছেন।

– সৈয়দ মোঃ ফারুক
টাঙ্গাইল

তৌহিদী বিপ্লব

॥ আবদুল হামিদ খান ভাসানী ॥

মানবজাতির জন্যে ইসলামের শ্রেষ্ঠতম উপহার হইল বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গী। সেই দৃষ্টিভঙ্গী কিংবা কাঠামো বৈপ্লবিক হইলে তাহা স্বভাব বিরুদ্ধ নয়, একান্তই প্রকৃতিগত। এই বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গী উপলব্ধি করিতে না পারিলে হযরত মোহাম্মদের (দঃ) আর্বিভাবের গুরুত্ব এবং ইসলামের মাহাত্ম্য বুঝা যাইবে না। বিশেষ করিয়া বিংশ শতাব্দীতে ইসলামের সেই মৌলিক অবদানের কথা অক্ষরে অক্ষরে উপলব্ধি করা প্রয়োজন। তাহা না হইলে ইসলামকে মানবজাতির কল্যাণে আগাইয়া লইয়া যাওয়া বড়ই কঠিন কাজ হইয়া পড়িবে।

ইসলামের মূল বিশ্বাস এবং পরিস্থিতি মোকাবিলার পদ্ধতি সব কিছুকে কোরআন ও সুন্নীর শিক্ষা ভিত্তিক করিয়া যে বিপ্লব বিশ্ববাসীর নিকট তুলিয়া ধরা যায় তাহাই তৌহিদী বিপ্লব। তৌহিদী বিপ্লব রসূলুল্লাহর (দঃ) নবুয়তের পর হইতেই শুরু হইয়াছে কিন্তু তিনি সেই বিপ্লব আরাধনা উপাসনা কেন্দ্রিক না করিয়া করিয়াছেন বাস্তব ভিত্তিক। তৌহিদ মানুষকে শিক্ষা দেয় একমাত্র আল্লাহকেই ভয় করিয়া স্বীয় কর্তব্য পন্থা নির্ধারণ করিতে। তাই তৌহিদী জনতা এমনই নির্ভর ও সত্যনিষ্ঠ হইয়া উঠে যে তাহাদের দ্বারা সংগঠিত বিপ্লব দুনিয়ার আর সব কিছু হইতে বেশী প্রাণবন্ত হইয়া উঠিতে পারে। সেই বিপ্লবী জাতি ন্যায় ও সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য আপোষহীন এবং একমুখী হইয়া উঠে। ইহার ফলে লক্ষ্যে পৌঁছিতে তাদের যতই ত্যাগ ও সাধনা করিতে হউক না কেন তাহা তাহারা সম্ভব করিয়া তোলে। তৌহিদী জনতা মনে করে তাহাদের বিপ্লব মানুষের কল্যাণের জন্য এবং তা আল্লাহর সন্তুষ্টি মাফিকই হইতেছে। তাই তাহারা যেকোন ব্যবস্থার আশ্রয় গ্রহণ করুন না কেন তাহা মানব সভ্যতার সামগ্রিক কল্যাণে আসিবে বলিয়াই বিশ্বাস করেন।

অন্ধকার যুগে আসিয়া হযরত মোহাম্মদ (দঃ) আরববাসীকে সেই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই দেখা যায় অন্য সব জাতি ৮০০ বছরে যাহা করিতে পারে নাই মুসলমানগণ মাত্র ৮০ বছরেই তাহা সম্ভব করিয়াছিল।

আজ আমাদের বাঙ্গালীদের মধ্যে সেই তৌহিদী জোশ নাই, সেই বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গীও নাই। তাই আমি বলি আল্লাহ ও রসূলের নির্দেশিত পথে আধুনিকতম বৈপ্লবিক পরিবর্তন সম্ভব করিয়া তুলিতে হইলে আমাদিগকে প্রথমে ন্যায়নিষ্ঠা সাম্যবাদী এবং শোষণ ও দুর্নীতি বিরোধী হইতে হইবে। সমষ্টিগতভাবে আন্দোলন করিয়া আমরা শোষণ ও দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ করিতে পারি এবং তৌহিদী বিপ্লবের পথে পা বাড়াইতে পারি, যোগ্যতা অর্জন করিতে পারি।

আসন্ন ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী এই উপলব্ধিটুকু নূতন করিয়া আমাদের মধ্যে দিক ইহাই কামনা করি।

ভাসানীর বাণী

আজ দেখতে পাচ্ছি স্বাধীনতার স্বাদ ভোগ করছে লুটপাট সমিতি। একমাত্র কৃষক-শ্রমিক শ্রেণীই তা সমূলে ধ্বংস করতে পারেন। তাই আমি বলছি, আপনাদের জাতীয় শত্রু বিতাড়িত হলেও শ্রেণী শত্রু খতম হয়েছে বলে মনে করবেন না।

চাঁদার হার

বাৎসরিক নয় টাকা

ষান্মাষিক পাঁচ টাকা

ধর্মের বৈচিত্র

॥ ইবরাহীম খাঁ ॥

সভ্যতার প্রথম প্রভাত বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতিতে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন বেশে এসেছে। ব্যাবিলনের সভ্যতা আগের, না মিশরের সভ্যতা আগের, না সিন্ধু সভ্যতা আগের, তা নিয়ে মতভেদ থাকতে পারে; তবে একটা যে আর একটার আগে, তা একরকম নিশ্চিত বলা চলে, এমন হতে পারে যে এরা মোটামুটি সমসাময়িক। কিন্তু গ্রীক সভ্যতা যে মিশরীয় সভ্যতার পরের আর রোমক সভ্যতা যে গ্রীক সভ্যতার পরের এ সম্বন্ধে তত্ত্ববিদদের মধ্যে মতভেদ নাই।

জগতের সভ্যতাগুলির মধ্যে যে কেবল বয়সের বেশকম, তা নয়। তাদের মেজাজেরো বেশকম আছে। মহর্ষি মনু বলেন, মানুষে মানুষে ভেদ আছে, সবাই সমান নয়। হযরত মুহাম্মদ বল্লেন, মানুষে মানুষে ভেদ নাই, সবাই সমান।

কিন্তু সভ্যতাগুলির বয়স ও প্রকৃতিতে পার্থক্য যাই থাক, একটি বিষয়ে তাদের মধ্যে একটা অদ্ভুত মিল আছে। সে হল এই যে, আমরা যতদূর জানি, সমস্ত সভ্যতারই প্রেরণা জুগিয়েছে ধর্ম। গ্রীক দেবদেবীর কাহিনী নিয়ে যে গ্রীসে কেবল কাব্য-সাহিত্যের বিকাশ ঘটেছিল এমন নয়, গ্রীক নাট্য-সাহিত্যের মূলেও ছিল ধর্মের প্রেরণা। সে প্রাচীন যুগে অনেক সময় মন্দির ছিল নাট্যশালা, পুরোহিতরা ছিলেন প্রধান দর্শক, কখনো বা প্রধান অভিনেতা। অনেকে বলেন, হিন্দু গণিতের জন্মও ধর্ম হতে। বেদীর মাপ জোক নিয়ে যে সব সূক্ষ্ম হিসাবের দরকার হত, তারই তাগিদ মিটাতে গণিতের বিশেষতঃ জ্যামিতির জন্ম হয়। হিন্দু সভ্যতা আজো

মুরিদের দরবার

মূলত ধর্মভিত্তিক সে তো সকলের জানা কথা। আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতায় মার্টিন লুথারের কি বিরাট অবদান, তা কারো অজানা নাই।

সভ্যতার এই ধর্মীয় ভিত্তির কারণ বুঝা কঠিন নয়। এগিয়ে চলাই মানুষের অন্তর্নিহিত প্রকৃতি। সেই এগিয়ে চলার পথ সরলও নয় সহজও নয়, সে পথে আছে দুঃখের কাঁটা,

আছে দুশমনের শাপ, আছে বিঘ্নের বাঘ, আছে মুগ্ধ প্রলোভনের সহস্র সাইরেন। সেই বাধার পর্বতকে ডিঙিয়ে মঞ্জিলের পথকে যা সুগম করে, তাই ধর্ম। সহজ কথায় বলা চলে, মানুষের পক্ষে যা কিছু কল্যাণকর তাই ধর্ম।

কিন্তু ধর্ম কেবল উপদেশ নয়, ধর্ম সেই উপদেশকে কাজে পরিণত করার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ জানিয়ে দেয়। অবশ্য সে উপকরণ ব্যবহারের ভার ধর্মাচরণ যে করে তার উপর। এই উপকরণের মাল-মসলা দিয়ে তৈরী হয় সমাজের ভিত্তি, রাষ্ট্রের ভিত্তি, শিক্ষার ভিত্তি, এক কথায় সভ্যতার ভিত্তি।

সুতরাং ধর্ম মানুষের কল্যাণ সাধনের বৃহত্তম প্রচেষ্টা আর সভ্যতা সেই প্রচেষ্টার শক্তিশালী যন্ত্রবিশেষ।

অতএব যত দেশের, যত যুগের, যত ধর্মনেতা, তাঁরা সকলেই মানুষের কল্যাণ প্রচেষ্টাতেই প্রবৃদ্ধ হয়েছিলেন। তাঁরা মানব জাতির পরম শ্রদ্ধার পাত্র।

তা ধর্মের নামে মানুষ তর্ক করেছে, কলহ বাধিয়েছে, রক্তের স্রোত বহিয়েছে। তার কারণ বুঝাও কঠিন নয়।

সকল ধর্মের উদ্দেশ্য এক কিন্তু উপকরণ এক নয়। শক্তের ধন রক্তপাতকে মনে করে না, বৈষ্ণবের ধর্ম রক্তপাতকে পাপ মনে করে। রোমান ক্যাথলিকরা বিয়ে না করাকে ধর্মের সহায়ক বিবেচনা করে, ইসলাম বিয়ে করাকেই ধর্মের সহায়ক বিবেচনা করে। রোগ আছে সকলেই স্বীকার করে, ঔষধ দেওয়া দরকার এতেও সকলে একমত; কিন্তু ঔষধ দেওয়াকালে ঘটে গেল–হোমিওপ্যাথ বলে আমার চিকিৎসা প্রণালী ছাড়া আর সব ভুয়া, এ্যালোপ্যাথ বলে হোমিওপ্যাথ নামে আবার কোন পদার্থ আছে নাকি? আয়ুর্বেদী বলে– আরে রাম রাম ঋষিদের দেওয়া ঔষধ ছাড়া আর কোন ঔষধের কল্পনা করাও যে পাপ। তিব্বীওয়ালা বলে—তওবা–তওবা পাগলেরা বলে কি? ইউনানী আয়ুর্বেদ, ইরানী সর্বশাস্ত্র ঘেটে যে আবেহায়াত আবিষ্কার করা হয়েছে সেই হেকিমী ছাড়া কি রোগীর গতন্তর আছে? চিকিৎসকদের রক্ত গরম থাকলে কথা কাটাকাটি আরম্ভ হয়ে যায়, ভক্তরা তাড়াতাড়ি এসে মাথা ফাটাফাটি শুরু করে দেয়।

হিতৈষী বন্ধুরা এগিয়ে এসে বলেন আরে থাম, থাম; এমনকি তুচ্ছ জিনিষ নিয়ে যে তোমরা ঝগড়া শুরু করেছ!

কিন্তু ঝগড়া থামে না, সাময়িকভাবে বন্ধ হয় মাত্র। কারণ, ঝগড়া থামানের উদ্দেশ্যে মাতবরেরা তর্কটাকে তুচ্ছ বলে তাড়াতাড়ি যে ফতোয়া দেন, সে ফতোয়া সত্যি নয়। ধর্মের উদ্দেশ্য বিরাট, সুতরাং ধর্ম বিষয়ক তর্ক তুচ্ছ নয়। ইহ-পর উভয়কালের সুখ, সম্পদ, শান্তি নিয়ে যে ভাবনা-চিন্তা, যে তর্ক-আলোচনা, তা যদি তুচ্ছ হয়, তবে জগতে অতুচ্ছ জিনিস কি থাকতে পারে? আমরা বলি, সকল নেতাকে আমরা শ্রদ্ধা করি। এরা সকলেই আমাদের এ ভবসিন্ধু পাড়ি দেওয়ার জন্য মুক্তির কিশ্‌তী তৈরী করেছেন। কারো কিশতী বড়, কারো ছোট, কারো কিশ্‌তী জোরে চলে, কারো কিশ্‌তী ধারে চলে; কারো কিশ্‌তী তুফান কাটানোর শক্তি বেশী রাখে,কারো কিশতী সে শক্তি কম রাখে। আমরা দরিয়ার পাড়ে দাঁড়িয়ে আছি। কিশতী চাই; পাড়ি দিতে হবে। আমাদের দেশে লোক করেছে কাঠের নৌকা, ভিন জেলার লোকে করেছে লোহার লঞ্চ, বিদেশের লোকে করেছে ইস্পাতের জাহাজ। আমরা নিরাপদ ও দ্রুত পাড়ির জন্য যদি ইস্পাতের যে জাহাজ অনুকূল হবে– হয়, আমি তাই নির্বাচন করবো।

ধর্ম নিয়ে যখন কোন্দল হতে চায় তখন আমরা বলব বিরাট বিষয়ের আলোচনায় নেমেছে, ধীরে, গভীরভাবে শ্রদ্ধার সঙ্গে বিবেচনা কর। গবেষণা কর। দেখ মানব সমাজের কল্যাণের পথ কেন ধর্ম প্রশস্ততম করে দিয়েছে; সেই ধর্ম অবলম্বন কর কম। একটা কম ভাল জামাকে বাদ দিয়ে বেশী ভাল একটি জামা

গায়ে তুলে দেওয়ার মত ধর্মান্তর গ্রহণ সহজ নয়। নিজের চক্ষুলজ্জা, পরিচিতজনের গঞ্জনা, আত্মীয়দের ম্লান মুখচ্ছবি, প্রিয়জনের অশ্রুভরা আবেদন, কত বিপুল বাধা-বিঘ্ন পথে এসে দাঁড়ায়। কিন্তু বিষয় যত বড় সংশ্লিষ্ট বাধাও তো তেমনি বড় হবেই।

আমরা আরো বলব, যাদের ধর্মকে মানব কল্যাণের শ্রেষ্ঠতম সহায়ক মনে করো না তাদের ধর্মের উপরও উপেক্ষার কটাক্ষ করো না, মানব কল্যাণ পথের যারা অভিযাত্রী তারা আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র।

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি শাসনতন্ত্র প্রণয়নে সক্রিয় গুরুত্ব দান করেছে

বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি দেশের ভবিষ্যত সংবিধানের রূপরেখা সম্পর্কে গত ১৪ই এপ্রিল সন্তোষে অনুষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রীয় সংগঠকদের সভায় তাঁদের বক্তব্য তুলে ধরেছেন।

দলীয় প্রধান মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় গৃহীত প্রস্তাবে সংবিধানে জনগণের সর্বপ্রকার মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান এবং বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশা বিশেষত: শ্রমিক-কৃষকের সংখ্যা-ভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব সুনিশ্চিত করা ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সার্থক প্রতিফলন করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

সভায় গৃহীত অপর প্রস্তাবে বলা হয়, "সংবিধান হবে ধর্ম নিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক। সকল ধর্মমতের অনুসারী বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের মানুষ যাতে আইনের দৃষ্টিতে সমান অধিকার পায়, সেজন্যে শাসনতন্ত্রে নিশ্চয়তা থাকতে হবে।"

সভায় জাতীয় উৎপাদনে অংশগ্রহণ করার জন্যে শ্রমিক-কৃষকসহ সকল মেহনতি মানুষ যাতে পূর্ণাঙ্গ কর্ম-সংস্থান পায় এবং উৎপাদনলব্ধ সম্পদ যাতে শ্রম অনুসারে সুষমভাবে বন্টন করা হয় তার ব্যবস্থা করার জন্যেও আবেদন জানানো হয়।

সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে বলা হয়, "দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতার স্বার্থে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি বর্তমান সংবিধান প্রণয়নের জন্যে সকল রাজনৈতিক দল– ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, যুবক বুদ্ধিজীবী, মহিলা, সকল পেশা ও সংগঠনের মতামত নিয়ে সংবিধান প্রণয়নের আহবান জানানো হয়।" সংবিধানে জনগণের 'আশা-আকাঙ্খা প্রতিফলন করতে ব্যর্থ হলে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি সংবিধান গ্রহণ করবে না' বলেও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়।

সভায় গণপরিষদে বিবেচনার জন্যে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির পক্ষ থেকে জাতীয় সংবিধান প্রণয়নের জন্যে একটি সংবিধান সাব কমিটি গঠন করা হয়। দলীয় কর্মসূচী ও গঠনতন্ত্র প্রণয়নের জন্যেও সভায় অপর একটি সাব-কমিটি গঠন করা হয়।

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি বাজেয়াপ্ত না করা পর্যন্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ, আত্মনির্ভরশীল জাতীয় অর্থনীতি গড়ে উঠতে পারে না বলে অভিমত প্রকাশ করে। সভায় খাঁটি সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ জাতীয়করণের সুষ্ঠু নীতি অনুসরণের জন্যে সরকারে প্রতি আবেদন জানানো হয়। দেশে বিরাজিত খাদ্য সঙ্কট এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অগ্নিমূল্যে সভায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে ব্যবসায়ীদের মুনাফার হার কমিয়ে ন্যায্যমূল্যে জিনিষপত্র সরবরাহের ব্যবস্থা করার জন্য আহবান জানানো হয়। সভায় ভিয়েতনামের বীর

জনতার প্রতি সংগ্রামী অভিনন্দন জানিয়ে তাঁদের প্রতি একাত্মতা প্রকাশ করে মার্কিন বোমাবর্ষণের তীব্র নিন্দা করা হয়।

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি এবং কৃষক সমিতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং বর্তমানেও তাঁরই নেতৃত্বে দুটো প্রতিষ্ঠানই পরিচালিত হচ্ছে বলে মতামত প্রকাশ করে অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ ও শ্রী মনিসিংকে ন্যাপ ও কৃষক সমিতির নাম ব্যবহার না করার আহবান জানানো হয়।

দেশে রিলিফ বন্টনের দুর্নীতিতে গভীর দুঃখ প্রকাশ করে এই হীন কার্যকলাপে লিপ্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি বিধানের দাবী জানানো হয়। সভায় বাংলাদেশ- ভারত বাণিজ্য চুক্তির সমালোচনা করে সীমান্তের ১৬ কিলোমিটারের মধ্যে অবাধ বাণিজ্য অঞ্চল সম্পর্কিত ধারাটি প্রত্যাহার করার আহ্বান জানানো হয়।

সভায় রাজনৈতিক-ছাত্র-কর্মী ও তাঁতীদের উপর দুর্বৃত্তদের বিভিন্ন ধরনের নির্যাতনের তীব্র নিন্দা করা হয় এবং এ ব্যাপারে দায়ী ব্যক্তিদের কঠোর শাস্তি বিধানের দাবী জানানো হয়।

ইহা কি সত্য?

॥ ৩৭ ॥

বিগত ৯-৪-৭২ তারিখে ঢাকার মুহম্মদপুর থানায় কিছু জিনিষপত্র নিলামে বিক্রী হওয়ার কথা ছিল। সেমতে নিলাম ডাকার জন্য বহু লোকের সমাগম হয়। কিন্তু হঠাৎ করে ডাক বন্ধ করে দেয়া হয়। কারণ চার কুতুবের তরফ থেকে হুকুম নাজেল হয়েছে। অবশেষে দেখা গেল কুতুবদের চিঠি নিয়ে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব মুহম্মদপুর থানায় আসছেন। আর

নামমাত্র দাম দিয়ে জিনিসপত্র নিয়ে যাচ্ছেন। এক কুতুবের বড় ভাই ছোট ভাইয়ের চিঠি দেখিয়ে তিন হাজার টাকা মূল্যের হুন্ডা তিরিশ টাকায় পেয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া অভিমুখে রওনা হয়ে গেলেন। সত্যিই, এবারে সংগ্রাম - লুটপাট সমিতির সংগ্রাম।

॥ ৩৮ ॥

তিনি ইপিসিএস কিন্তু আজ তার ডাঁট বহু প্রবীণ সিএসপি'কেও ছাড়িয়ে গেছে। কারণ, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা রয়েছে। স্বাধীনতার আগে তিনি ছিলেন খাদ্য বিভাগে মামুলী একজন সেকশন অফিসার। স্বাধীনতারপর এষ্টাবলিশমেন্ট বিভাগের ডেপুটি সেক্রেটারী এবং কয়েকদিন বাদেই জয়েন্ট সেক্রেটারী হয়ে বসেছেন। শতাধিক অফিসারকে ডিঙ্গিয়েও স্বজনপ্রীতি প্রকাশ পায়নি। তাই বিভাগটির সেক্রেটারী হবার জন্য তিনি পাঁয়তারা করছেন।

॥ ৩৯ ॥

গত কয়েকদিন যাবত মিরপুর ১০ ও ১১ নং সেকশনে জনসাধারণের যাতায়াত নিষেধ। কয়েকদিন পূর্বে ওখানে নতুন করে একটি বধ্যভূমির সন্ধান পাওয়া গেছে। তাতে অসংখ্য নরকঙ্কাল রয়েছে। এই খবর মিরপুরে অবস্থানরত আওয়ামী লীগ বাহিনীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে উন্মত্ত জনতা নিয়ে তারা অবাঙ্গালীদের আক্রমণ করতে থাকে। গত ১৭ই ও ১৮ই এপ্রিল এমনি ভাবে কমপক্ষে ৩০০ অবাঙ্গালী হত্যা করা হয়েছে।

॥ ৪০ ॥

ছাত্রলীগের একজন গুণ্ডা নেতা পুরানা পল্টন ও মতিঝিল এলাকায় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। গুণ্ডাটি ফরিদপুরের অধিবাসী। তাই সর্বত্র সে প্রধানমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বলে পরিচয় দিয়ে বেড়াচ্ছে এবং বেদখল, রাহাজানি, অপহরণ সবকিছু বিনা বাধায় করে যাচ্ছে। সে পুরানা পল্টন ৫৮/১ নং বাসাটি জবরদখল করে অন্তত: ৫০ জনের গুণ্ডাবাহিনী নিয়ে বসবাস করছে। শুধু তাই নয় সে তার জনৈক চাচাকে নিয়ে অবাঙ্গালী পরিবারগুলো থেকে 'জিজিয়া করের' নামে বহু টাকা আদায় করছে।

॥ ৪১ ॥

গত ১১ই এপ্রিল কোরআন তেলওয়াতের মাধ্যমে গণ পরিষদে অধিবেশন শুরু করতে জনৈক এমসিএ অধ্যক্ষ সাহেবকে বার বার অনুরোধ করা সত্ত্বেও তা আগ্রহ্য হয়। অধিবেশন শেষে করেয়জন এমসিএ প্রস্তাবকারীকে তার এহেন ভূমিকাকে দালালির নামান্তর বলে অভিহিত করেন। এই নিয়ে দু'দল এমসিএ-র মধ্যে তুমুল বাক-বিতান্ড হয়।

॥ ৪২ ॥

রংপুর শহর থেকে প্রকাশিত একটি পত্রিকায় স্থানীয় একটি কলেজের অধ্যক্ষের দালালির খতিয়ান প্রকাশ করলে ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগ মহল যার পর নাই ক্ষুব্ধ হন। এক গুণ্ডাবাহিনী লেলিয়ে দিয়ে তারা পত্রিকার সম্পাদককে মারপিট করান। তাতে জেলার সকল মহল থেকে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে।

ন্যাপের সাংগঠনিক পরিষদের চূড়ান্ত তালিকা

বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির আহ্বায়ক মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী দলে কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক পরিষদের চূড়ান্ত তালিকা ঘোষণা করেছেন। নিম্নে সদস্যদের নাম দেয়া হল ঃ

১। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী (আহ্বায়ক) ২। জনাব বজলুস সাত্তার ৩। ক্যাপ্টেন শামসুল ইসলাম ৪। জনাব আরিফুর রহমান সুধারামী ৫। জনাব মুজিবর রহমান চৌধুরী ৬। জনাব আলমগীর সিদ্দিকী ৭। জনাব গাজী শহীদুল্লাহ ৮। জনাব রাশেদ খান মেনন ৯। জনাব কাজী জাফর আহমদ ১০। জনাব মাহবুব উল্লাহ ১১। জনাব আবদুর রহামন ১২। জনাব মোহাম্মদ আলী ১৩। জনাব আবদুর রহমান সিদ্দীকী ১৪। জনাব ফরিদুল হুদা ১৫। জনাব আবদুল করিম ১৬। জনাব আফসার সিদ্দিকী ১৭। জনাব আহাম্মদ আলী ১৮। বাবু শান্তি রঞ্জন দেব।

সম্পাদক ঃ সৈয়দ ইরফানুল বারী, সন্তোষ, টাঙ্গাইল। মুদ্রণে- শান্তি প্রেস, টাঙ্গাইল

প্রতি কপি বিশ পয়সা সাপ্তাহিক রেজিস্টার্ড নং ডিএ ১৭৬

হক-কথা

(WEEKLY THE HAQ-KATHA)

প্রকাশক ও পৃষ্ঠপোষক ঃ মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

প্রথম বর্ষ দশম সংখ্যা রবিবার ১৭ই বৈশাখ ১৩৭৯: ৩০শে এপ্রিল, ১৯৭২; ১৫ই রবিউল আওয়াল ১৩৯২; সন্তোষ টাঙ্গাইল

পতাকা উড়াতে হবে?

স্বাধীনতা উত্তর দশটি জনসভায় ভাষণ দানের পর মওলানা ভাসানী কৃষক সম্মেলনে যোগদানের পথে পাঁচরুখি, পাঁচদোনা ও নরসিংদীর সম্বর্ধনা সভায় এবং শিবপুরে অনুষ্ঠিত কৃষক প্রতিনিধিদের সমাবেশ ও গণজমায়েতে ভাষণ দিতে গিয়ে যে তিনটি বক্তব্য কমন রেখেছেন বোধকরি সুষ্ঠু নির্বাচন অথবা রক্তাক্ত বিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে তা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকবে।

সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের শাসনতন্ত্র প্রণয়নেই মওলানা সাহেবের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে। তাই বারবার তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, আওয়ামী লীগ সরকারের শাসনতন্ত্রে কৃষক-শ্রমিক তথা মেহনতি মানুষের দাবী অগ্রাহ্য হলে তা একেবারেই মানা হবে না। তাই তিনি শাসনতন্ত্রের রূপরেখা সম্পর্কে শিবপুরের জনসভায় বললেন, তাতে ১৮ বছরের উর্ধে সকল নারী-পুরুষকে ভোটাধিকার দিতে হবে। তবে শোষক, চোরাকারবারী, টাউট, লুঠপাটকারী, অত্যাচারী ও স্বাধীনতা যুদ্ধে শত্রু বাহিনীকে সহায়তাকারীদের ভোটের অধিকার থাকবে না। সকল বিদেশী পুঁজি বাজেয়াপ্ত এবং সামন্তবাদকে চিরতরে নির্মুল করার ব্যবস্থা শাসনতন্ত্রে থাকতে হবে। শাসনতন্ত্রের সমাজতান্ত্রিক অনেক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে মাত্র একটি– উৎপাদন বন্টন প্রশ্নে মওলানা সাহেব বলেছেন, উৎপাদনের সর্বনিম্ন ইউনিট হবে গ্রাম পঞ্চায়েত। পঞ্চায়েতের মোট আয়ের শতকরা ৫ ভাগ পাবে সরকার আর ৬৫ ভাগ ব্যয় হবে সেখানকার জনগণের জন্যে। বাকী ৩০ ভাগ থেকে ৫০ বছরের উর্ধ্ব বয়স্ক মহিলা, ৬০ বছরের বেশী বয়স্ক পুরুষ এবং ১৮ বছরের কম বয়স্ক বালক-বালিকা ও এতিমদের জন্যে খরচ হবে।

২৮ শে মে টঙ্গীতে অনুষ্ঠিতব্য কৃষক-শ্রমিক মৈত্রী সম্মেলনে আওয়ামী লীগের শাসনতন্ত্র যদি প্রত্যাখ্যাত হয় অর্থাৎ যদি কৃষক-মজুর রাজ কায়েমের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য তাতে স্বীকৃত ও গৃহীত না হয় তবে, মওলানা সাহেব বলেছেন, সেই সভাতেই ঠিক করা হবে সরকারের সাথে আমাদের সম্পর্ক কেমন থাকবে। এর পর পরই মওলানা সাহেবের বক্তব্য ছিল, যদি আওয়ামী লীগের শাসনতন্ত্র দিয়ে কৃষক-মজুর রাজ কায়েম সম্ভব না হয় তবে স্বাভাবিকভাবেই তাকে কৃষক-মজুর রাজ কায়েমের সংগ্রামী প্রতীক-পতাকা উড়াতে হবে। অবশ্য তিনি সম্পূর্ণ নৈরাশ্যও প্রকাশ করেননি। তাই তিনি বলেছেন, আওয়ামী লীগ সরকার যদি নির্ভেজাল সমাজতন্ত্র কায়েম

করতে চায় তবে এক যুগ ব্যাপী ক্ষমতায় থাকতে চাইলেও মুজিবকে আমি বাধা দেব না। অবশ্য এই বলেই মওলানা অজানা এক উদ্বিগ্নতায় আঁতকে উঠেন। কারণ তাঁর ভাষায়, মস্কোপন্থী কমিউনিস্টরা সরকারী দালাল সেজছে মাত্র। খাঁটি সমাজতন্ত্র থেকে সরকারকে দূরে সরিয়ে রাখাই তাদের আসল সাধনা। তাই সুস্পষ্ট ভাষায় তিনি শেখ মুজিবকে জানিয়ে দিয়েছেন, "সমাজতন্ত্রের নামে আমি কোন ভাওতাবাজী বরদাশত করব না।"

সমাজতন্ত্রের মৌলিকতা রক্ষার তাগিদেই মওলানা সাহেব মস্কোপন্থী কমিউনিস্টদের স্বরূপ উদঘাটন দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য হিসেবে সকল সভা-সম্বর্ধনা- সাক্ষাতকারে পেশ করে আসছেন। শিবপুরের গণজমায়েতেও তাই তিনি বললেন, "মস্কোপন্থীরা সাবধান হয়ে যাও। তোমরা আরাম আয়াশে সমাজতন্ত্র কায়েম করতে চাও। দুর্নীতির প্রশ্রয় দিয়ে মানুষের বিপ্লবী চেতনাকে ভোঁতা করতে চাও। মনে রেখো মার্কিন ডলার, রুশ রুবল কিংবা হিন্দুস্থানী রুপিয়া কোনটাতেই সচেতন বাঙ্গালী জাতিকে কেনা যাবে না।"

এই ক্ষেত্রেই মওলানা ভাসানীর তৃতীয় বক্তব্য তা হল লুটপাট সমিতির ক্রিয়াকাণ্ড ৬৫ বৎসরের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতায় মওলানা জানেন আওয়ামী লীগের যে অল্প কয়জনই দেশ ও জাতির ভাল কিছু করতে পারতেন কেবল লুটপাট সমিতির প্রভাবে তা পারবেন না। বারবার তাই এই সুহৃদ নেতা শেখ মুজিবকে অনুরোধ জানিয়েছেন, তোমার আশপাশ থেকে আবর্জনা দূর কর।

এবারের কৃষক সম্মেলনে মওলানা সাহেব কৃষক সমিতির সংগঠনে অতিশয় গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেছেন, আমাদের অর্থ নাই ঠিকই। কিন্তু মুষ্ঠির চাল তুলে হালের ৬২ হাজার গ্রামে কৃষক সমিতি করতে হবে। তিনি বলেন, কৃষক সমিতি দুনিয়ার সকল নির্যাতিত কৃষকের কল্যাণের জন্যে কাজ করবে। দুধ-পানি যেমন মিশে যায় ঠিক তেমনি আমরা একাত্ম হয়ে সংগ্রাম করব। ভারতের সংগ্রামী কৃষক-মজুরদের অভিনন্দন জানিয়ে তিনি বলেন, তাদের মুক্তি, আমাদেরও মুক্তি।

কমরেড মোজাফফর আসবার অনুমতি না পাওয়ায় মওলানা সাহেব বড়ই দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি তাকে অন্যান্য কমরেডসহ টঙ্গীর সম্মেলনে যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানান।

দুটো প্রসঙ্গে দেশের কোন নেতা কথা না বললেও মওলানা সাহেব বলেছেন। প্রথমতঃ জেলে বন্দী আবালবৃদ্ধবণিতাকে বিনা বিচারে আটকে না রেখে বরং ছেড়ে দিতে সোপারিশ করেন। দ্বিতীয়ত: মাদ্রাসা শিক্ষা প্রসঙ্গে বলেছেন, 'চার মাসের মধ্যে মাদ্রাসা শিক্ষার কিছুই করা হয় নাই। যদি তাই হয়, ঘোষণা কর– বৃটিশ যা করতে পেরেছে আমরা ধর্ম নিরপেক্ষতার নামে তা পারবো না। পরিষ্কার ভাবে জানিয়ে দাও ধর্মশিক্ষার ভার আমাদের নেই।' মওলানা সাহেব আরো বলেছেন, কোনক্রমেই এদেশে আর সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দেয়া যাবে না। তাই হিন্দুদের হিন্দুয়ানী রক্ষা কর, খৃষ্টানদের নিজ ধর্ম রক্ষা করতে দাও এবং ধর্ম নিরপেক্ষতা ধর্মহীনতা নয়– এই সত্যটি প্রতিষ্ঠা করে অধিকাংশ মুসলমানদের মনের সন্দেহ দূর কর।

শিবপুর থেকে বিদায়ের বেলায় মওলানা শহীদ আসাদের কবর জিয়ারত করেন।

সম্মেলন কেন পূর্ণাঙ্গ রূপ পেল না

শিবপুর সম্মেলনকে পূর্ণাঙ্গ রূপ থেকে বঞ্চিত করতে বেশ কতকগুলি প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল। বিরোধী মহল একেবারে অকৃতকার্য

হয়েছেন, একথা বলা যায় না। কারণ, অন্ততঃ দক্ষিণ পূর্ব-এশীয় দেশগুলোর দৃষ্টি শিবপুরে নিবদ্ধ হয়ে যেত যদি কমরেড মুজাফ্ফর আহমদ, কমরেড আবদুল্লা রসুল, কমরেড হরেকৃষ্ণ কোঙার এবং কমরেড নৃপেন চক্রবর্তী এতে যোগ দিতেন। কিন্তু গণতন্ত্রের দাবীদার ভারত সরকার তাদেরকে বাংলাদেশে আসতে অনুমতি দেননি, যদিও একই সপ্তাহে মস্কোপন্থী ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির প্রতিনিধিগণ ঢাকায় বিচরণ করেছেন। অবশ্য মস্কোওয়ালাদের আগমণের হেতু তাদের আহুত প্রেস কনফারেন্সে ধরা পড়েছে। শিবপুর সম্মেলনের ঠিক পূর্বেই মওলানা ভাসানী ও তাঁর দলবলের বিরুদ্ধে তারা কুৎসা প্রচার করলেন। এ যেন তাদের একটি নিরুপায় প্রয়াস– সম্মেলনের গুরুত্বটা কমানো যায় কি না।

শিবপুর, নরসিংদী এলাকায় যথাক্রমে কৃষক ও শ্রমিকের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধানো হয়। আওয়ামী লীগ ও শ্রমিক লীগ বহু সাধ্য সাধনায় তা করেছেন। অবশ্য নরসিংদীর ন্যাভাল সিরাজকে হত্যা করবার চক্রান্ত করে তারা জনপ্রিয়তাই হারিয়েছেন। শ্রমিক লীগের চাপে ডেমরা-তারাবো ফেরী অযৌক্তিক অজুহাতে বন্ধ রাখা হয়। পারাপারে বিঘ্ন ঘটায় বাসসহ বহু কৃষক শিবপুর পৌঁছতেই পারেননি। তাছাড়া আওয়ামী লীগের কর্মীরা সুকৌশলে সেদিনগুলোতে ঢাকায় ও আশেপাশে প্রচার করে বেড়ায় যে শিবপুরের দল-উপদলে সংঘর্ষ বেঁধে ব্রাশ ফায়ার হয়েছে।

জানি দুশমনদের এসব চক্রান্ত ও বিরোধিতা ছাড়াও খোদ অভ্যর্থনা কমিটির ত্রুটিতে সম্মেলনের পূর্ণাঙ্গ রূপে ভাটা পড়েছে। দক্ষিণ ভিয়েৎনাম কৃষক মুক্তি সমিতি এবং ভিয়েৎনাম আফ্রো এশীয় সলিডারিটি কমিটি তার যোগে জানিয়েছেন যে বিলম্বে দাওয়াত পেলেন বলে প্রতিনিধি পাঠাতে পারলেন না।

দুটি সাক্ষাতকার

শিবপুরে স্বপ্নকালীন অবস্থানে কয়েকজন বিদেশী সাংবাদিক মওলানা ভাসানীর বিশেষ সাক্ষাতকার গ্রহণ করেন। এ এফ পি-র প্রতিনিধি তাকে যে কয়টি প্রশ্ন করেন তন্মধ্যে ছিল ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির জেনারেল সেক্রেটারী মিঃ রাজেশ্বর রাও কর্তৃক মওলানার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্পর্কে বিজ্ঞেস করলে মওলানা বলেন, তারা আমাদের মেহমান। তাদের তরফ থেকে এহেন অহেতুক মন্তব্য আশা করা যায় না। তারা যদি তা করেই থাকেন তবে বলতে হবে অনধিকার চর্চা করেছেন। আমাদের দেশের রাজনৈতিক পার্টি ও নেতা সম্পর্কে কথা বলার তারা কে? আর যা বলেছেন তা তো আমার পার্টির ক্ষেত্রে নয় বরং মোজাফ্ফর–মনিদের দলেই ঘটছে। আমি চ্যালেঞ্জ করলাম, গেয়ে না বেড়িয়ে একজন অতিবাস কিংবা প্রতিক্রিয়াশীল আগন্তুক আমার পার্টিতে রয়েছে বলে প্রমাণ করে দিক। প্রতিনিধিটির আর একটি প্রশ্ন ছিল অধ্যাপক মোজাফ্ফর কোন্ পার্টি করছে বলে আপনি মনে করেন? মওলানা বললেন, আমি তো দেখছি তিনি কোন দলেই নেই। কারণ, ভারতে তিনি নিজেই কমিউনিষ্ট পার্টির সেক্রেটারী বলে জাহির করেছেন। আর আজ আমার পার্টির নাম ভাঙ্গিয়ে রাজনীতি জুড়েছেন।

সুইডিশ ব্রডকাষ্টিং কর্পোরেশনের প্রতিনিধি অনেক প্রশ্নের মাঝে জানতে চাইলেন, ভারত থাকাকালীন আপনি কেমন ছিলেন? মওলানা সাহেব জবাবে বললেন, এ বিষয়ে আমি আপাততঃ কিছু বলতে চাই না।

ন্যাপের পাটুয়াটুলী শাখা কমিটি

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির কর্মী ও সমর্থকদের উপস্থিতিতে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত সদস্যদের লইয়া পাটুয়াটুলী শাখা কমিটি গঠন করা হয়।

সভাপতি ঃ জনাব আজাদ সুলতান, সহ সভাপতি ঃ জনাব হারুন উর-রশীদ (মানিক মিয়া), জনাব মহিবুর রহমান, (দুদু মিয়া), জনাব মোবারক হোসেন, সাধারণ সম্পাদক ঃ মোঃ সিরাজুল ইসলাম, যুগ্ম সম্পাদক ঃ আবদুল মালেক, সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ হুমায়ুন কবীর (নবু মিয়া), প্রচার সম্পাদক ঃ কবীর আহম্মদ, কোষাধ্যক্ষ ঃ সিরাজ উদ্দিন মাঝি। সদস্যঃ জনাব মোঃ চান মিয়া (মনাক্কা), মোঃ ইদ্রিস দেওয়ান, আবদুল আউয়াল মৃধা, শেখ আবদুল মালেক, মোঃ এবাদত হোসেন শরীফ, আবদুল জব্বার ফকীর, আবদুল আজিজ খাঁ, আবদুল হামিদ, মোঃ সোহরাব হোসেন, শেখ ধলু, আবদুল জব্বার খাঁ, দুলাল মিয়া, সোনা মিয়া, সলিম লস্কর, রেয়াজ উদ্দিন, নুরুল ইসলাম মিয়া, সামসুল হক, মোঃ মোহসিন মিয়া, নুরু মিয়া এবং ওসমান আলী মিয়া।

চাঁদার হার

বাৎসরিক নয় টাকা

ষান্মাষিক পাঁচ টাকা

শিবপুর থেকে টঙ্গী ১

ত্রিশ লক্ষ মানুষের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত বাংলাদেশে প্রথম কৃষক সম্মেলন হল শিবপুরে। শিবপুরের এই কৃষক সম্মেলন বিভিন্ন কারণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলেই সারা বাংলা তথা আন্দোলনধর্মী বিশ্বের দৃষ্টি নিবদ্ধ হল।

স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলাদেশের কৃষকশ্রেণী অংশগ্রহণ করেছে ব্যাপকভাবে। ফলে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তাদের রাজনৈতিক জ্ঞান এবং সচেতনতাও বৃদ্ধি পেয়েছে বহুগুণ। বার বার প্রতারিত কৃষকদের কাছে বিভিন্নভাবে একটা ধারণা দেয়া হয়েছে যে বাংলাদেশ স্বাধীন হলে তাদের আর কোন দুঃখ থাকবে না। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষসহ খাদ্যশস্যের মূল্য যেমন কমবে অর্থকরী ফসলের দাম তেমনি বাড়বে। কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তীকালে যখন বাস্তবে উল্টোটি ঘটল এবং দেশ গড়ার নামে যুদ্ধকালীন ক্ষয়–ক্ষতির বোঝা শ্রমজীবী মানুষের উপরই বর্তাল তখন কৃষক সমাজ বুঝতে পারলো কি নির্মমভাবে আবার তারা প্রতারিত হতে যাচ্ছে। পূর্ববর্তী কৃষক সম্মেলনগুলোতে মওলানা ভাসানীর কণ্ঠে সমাজতন্ত্রের দাবী উত্থাপিত হলেও আওয়ামী লীগসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি এই দাবীকে সমালোচনা ও কটাক্ষের মাধ্যমে এর মধ্যে কমিউনিজমের গন্ধ খুঁজে বেড়াতো। কিন্তু যুগের প্রয়োজন এবং ব্যাপক জনপ্রিয়তার পরিপ্রেক্ষিতে সমাজতন্ত্রের অন্যতম সমালোচক আওয়ামী লীগই স্বাধীন বাংলাদেশ-এর প্রবক্তা হয়ে বসলো। জনগণকে ধোঁকা দেয়ার এই কৌশল থেকে সমাজতন্ত্রকে উদ্ধার করার জন্যই শিবপুর সম্মেলনে দাবী উঠেছে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের।

আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের সরকার সেজে ক্ষমতার যথেচ্ছ ব্যবহার ও লুটপাট সমিতির পৃষ্ঠপোষকতা শুরু করেছে – নির্যাতিত মানুষের পক্ষে কেউ প্রতিবাদ করলে ফ্যাসীবাদী দমন নীতির হুমকী দিচ্ছে– এরই পরিপ্রেক্ষিতে শিবপুর কৃষক সম্মেলনের উপর নির্ভর করছিল বাংলাদেশের প্রগতিশীল রাজনীতির ভবিষ্যত। যদি কৃষক- শ্রমিকদের সংগঠিত এবং ভবিষ্যত রাজনীতির নীতি নির্দ্ধারণ সম্ভব না হয় – ক্ষমতাসীন দলের যথেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উত্থাপন করা না যায় ও ফ্যাসীবাদের নগ্ন হামলার ভয়ে মজলুম জনতার বর্তমান দুঃখ- দুর্দ্দশার বাস্তব চিত্র তুলে ধরা না যায় তবে বাংলাদেশের যে কোন বিরোধী দলের ভবিষ্যত যে অন্ধকার

হয়ে উঠবে এই বাস্তবতার আলোকেই শিবপুর কৃষক সম্মেলন ডেকেছিলেন মওলানা। অন্যান্য সম্মেলনের সঙ্গে এই শিবপুর সম্মেলনের কটি বিশেষ তফাৎ ঃ শিবপুর সম্মেলনে যোগে দিয়েছেন দু'জন ভারতীয় কিষাণ নেতা, স্বীকৃতি জানিয়েছেন উপমহাদেশে' সাম্যবাদী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা কমরেড মোজাফ্ফর আহম্মদ এবং বাণী পাঠিয়েছেন দক্ষিণ ভিয়েতনামী কৃষক মুক্তি কমিটির সদস্যবৃন্দ ও আফ্রো-এশীয় সোলিডারিটি সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দ। বাঙলার কৃষকদের আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেছেন তারা।

শিবপুর সম্মেলনে মওলানা ভাসানী চেয়েছিলেন শত্রুমুক্ত বাংলাদেশের কৃষকদের সংগ্রামী অভিজ্ঞতাকে সাংগঠনিক কাঠামোর মাধ্যমে একটি মজবুত রূপ দিতে। তার দীর্ঘ সংগ্রামী জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে এদেশের হতভাগ্য কৃষকদের ভবিষ্যতকে সঠিক পথের সন্ধান দেখিয়ে যেতে। সঙ্গে সঙ্গে এই মুহূর্তে একদা গণতান্ত্রিক উপায়ে এবং গণসমর্থনে গদীসিন আওয়ামী লীগ সরকারের বর্তমান গণবিরোধী, দালাল তোষণ এবং শোষণ নীতির বিরুদ্ধে দেশের সাধারণ মানুষ কতটা সজাগ রয়েছে সে সম্পর্কে নিজেও একটা ধারণা নিতে। মওলানা ভাসানী চেয়েছেন বর্তমান মুহূর্তে দেশের সবচেয়ে জরুরী প্রশ্ন শাসনতন্ত্র সম্পর্কে তার সুস্পষ্ট অভিমত সরকারকে জানিয়ে দিতে এবং প্রয়োজনবোধে শিবপুর সম্মেলনের মাধ্যমে দলীয় কর্মী এবং নির্যাতিত মানুষের মনে সাংগঠনিক তৎপরতা বৃদ্ধি, আস্থার সৃষ্টি এবং পরবর্তী আন্দোলনের রূপরেখা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। শিবপুর সম্মেলন কৃষক সমিতির আন্দোলনের গতিপথ নির্ণয়ে চূড়ান্ত নয়। আসামের দুর্গম অঞ্চলে, বাংলার সুদূর গ্রামাঞ্চলে যে অজস্র কৃষক সভা ও সম্মেলনের মধ্য দিয়ে মওলানা ভাসানীর কৃষক আন্দোলনের শুরু শিবপুরে যুদ্ধোত্তর বাংলার প্রথম কৃষক সম্মেলনের সাফল্য সেই আন্দোলনের ভিত্তি হল সুদৃঢ় টঙ্গীর আগামী ২৮শে মেতে অনুষ্ঠিতব্য কৃষক-শ্রমিক মৈত্রী সম্মেলনে আওয়ামী লীগ কর্তৃক গৃহীত শাসনতন্ত্রের পৃষ্ঠে ভবিষ্যৎ আন্দোলনের ধারা হবে নির্ধারিত। কিন্তু ইতিহাসের রায় হল, মওলানার ধারা ভয়ঙ্কর গতিশীল; ভাসানীর আন্দোলন সেই দিন হবে ক্ষান্ত যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না।

মুজিববাদী দালাল ২

পূর্ববর্তী 'হক-কথা'র এক সংখ্যায় মুজিবাদী দালালদের স্বরূপ তুলে ধরার পর আমাদের সংবাদদাতা ও পাঠক মহল অসংখ্য নজির পাঠিয়েছেন। স্থানীয়ভাবে যোগাযোগ সেরে আমাদের বিস্ময়ের অবধি রইল না, কি করে মানুষের ঘোর দুশমনদের আওয়ামী লীগের কর্মকর্তা ও এম-সি-এ-রা লালন- পালন করছেন। তারা ঘুষ খেয়ে বড়লোক হতে চান। কিন্তু চাকুরী দানে, পারমিট-লাইসেন্স ইস্যুতে তো বটেই, হানাদার বাহিনীর জঘন্যতম দালালদের নিকট থেকে ঘুষ খেয়ে দালালী করে যাচ্ছেন একথা ভাবতেও কষ্ট হয়। ভাগ্যের কি পরিহাস! আজকের মুজিব সরকারই দাবী করছেন, পাক- ফৌজ একমাত্র আওয়ামী লীগেরই ১৭ হাজার কর্মী হত্যা করেছে। হ্যাঁ, জনৈক সাংবাদিকের ভাষায় বলতে হয়, কাপুরুষের মত ইচ্ছাকৃতভাবেই রণে ভঙ্গ দিয়ে আত্মসমর্পণ করে যিনি "জাতির পিতা" বনতে পারেন, একমাত্র তার আমলেই দালালীর এমন নজির প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

পাকিস্তানী আমলে অতিরিক্ত চীফ সেক্রেটারীর পদপ্রাপ্ত জনাব এ, এফ, এম, ফয়জুর রহমান সাহেবকে দিয়েই মুজিববাদী দালাল-পরিচিতি শুরু করা যাক। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ৬২ বৎসর বয়স্ক আত্মীয়কে রেজিষ্ট্রেশন বিভাগের ইন্সপেক্টর জেনারেল পদে চাকুরী দিয়ে এবং অর্থনীতির গ্রাজুয়েট জামাতাকে উন্নতমানের প্রকৌশলী সংস্থার কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ করে তিনি স্বজনপ্রীতির রেকর্ড স্থাপন করেছেন। ইনিই জনাব ফয়জুর রহমান যিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের সমর্থক বা অংশগ্রহণকারী কর্মচারীদের কাজে যোগ দেয়ার জন্যে বারবার নির্দেশ দিয়েছেন, জেল ও হত্যার ভয় দেখিয়েছেন এবং অবশেষে নির্দেশ অমান্যকারী অনুপস্থিত কর্মচারীদের তালিকা হানাদারদের হাতে তুলে দিয়েছেন। তার আন্তরিক পরিশ্রমের ফলেই মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী সরকারী ও বেসরকারী কর্মচারীদের ছেলে-মেয়েদের নাম-ঠিকানা পেতে পেরেছিলেন এবং তার ফলেই একমাত্র ঢাকা শহরেই প্রায় দশ হাজার ছাত্র- ছাত্রীকে বন্দী করা হয়েছিল। তাদের অনেকেই আজো ফেরেনি। গত বছর ৩০ শে আগষ্ট জনাব রহমানই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দূত মি: চার্লস এইচ পার্সীকে ঢাকা বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানিয়ে বাংলাদেশে গণহত্যা তীব্রতর করার ষড়যন্ত্রে বিশেষ অংশ নিয়েছিলেন। তবু তিনি আজ দেশপ্রেমিক। কেননা, তার গায়ে আছে দামী কালো কাপড়ের মুজিব কোট। এবং সবার উপরে রয়েছে এম-সি-এ এবং আওয়ামী নেতৃবৃন্দের আশির্বাদ। আর তাই তিনি পেনশন পাচ্ছেন এবং অচিরেই বাংলাদেশ সরকারের দূত হয়ে বিদেশের উদ্দেশে পাড়ি জমাবেন।

পাড়ি জমানোর পরে মৌলবীবাজারের তিন প্রখ্যাত দালাল কিন্তু জনাব ফয়জুর রহমানকে ছাড়িয়ে গেছেন সিলেট জেলার মৌলবীবাজারের মুসলীম লীগ নেতা জনাব মিয়াধন মিয়া, জামাতের পাণ্ডা জনাব মাসুক মিয়া এবং তথাকথিত শান্তি কমিটির সদস্য জনাব সানু মিয়া পাকবাহিনীর দালালীর ইতিহাসে উজ্জ্বল নক্ষত্র। নারীধর্ষণ, হত্যা ও রাহাজানির অভিযোগে থানায় কাগজে-কলমে মামলা দায়ের থাকলেও, গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী করা হলেও, এই তিন পাকিস্তানী ফেরেশতা গত ১১ই এপ্রিল নিরাপদে বিমান যোগে লণ্ডন চলে গেছেন। পলায়নের ব্যাপারে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের উল্লেখযোগ্য ভূমিকার পেছনে পাকবাহিনীর আমলে লুটপাটে কামানো তিন দালালের প্রচুর রক্ত মাখানো অর্থই কাজ করেছে কিনা, তা অবশ্য পরিষ্কারভাবে জানবার প্রয়োজন হয়নি।

জনাব ছোমেদ কাজী সকলকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। বরিশাল জেলার ধামুরা ইউনিয়নের দালাল চেয়ারম্যান কাজী সাহেব সম্প্রতি কয়েক মাস পলাতক থাকার পর তার নিজ গ্রামে ফিরে এসেছেন। পাকবাহিনীর আমলে এই ছোমেদ কাজী শুধু ধামুরা ইউনিয়নেই নয়, উজিরপুর থানার সকল এলাকাতেই হত্যা, লুট, ধর্ষণ, ঘর-বাড়ী পোড়ানোর ব্যাপারেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। উজিরপুর থানা শান্তি কমিটির সহ-সভাপতি হিসেবে তার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কীর্তিটি হল গত বছরের ১৭ই অক্টোবর পাকবাহিনীর সহায়তায় ধামুরা বন্দর সহ শত শত ঘর-বাড়ী পুড়িয়ে দেয়া এবং ১১৭ জন নারী-পুরুষ ও শিশুকে হত্যা করা। স্থানীয় এম-সি-এ সাহেবের সাথে মুজিব কোট পরিহিত জনাব ছোমেদ কাজীকে দেখে সেদিন জনগণ সত্যিই হতবাক হয়ে গিয়েছিল। বিস্ময় কেটে গিয়ে পরে ক্রোধ দেখা দিলো যখন এম-সি-এ ও আওয়ামী নেতৃবৃন্দের সাথে এই দালালটি বিকেলে জনসভায় বক্তৃতা করলেন, স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর অক্লান্ত অবদানের ফিরিস্তি দিয়ে বিজ্ঞাপন ছড়ালেন।

সাম্প্রতিক মুজিববাদী দালাল এই ছোমেদ কাজীর দালালীর পনেরোটি দলিল সম্বলিত একটি পুস্তিকা থেকে জানা গেছে, অচিরেই তিনি তার ইউনিয়ন পঞ্চায়েতের চেয়ারম্যান হতে যাচ্ছেন।

বরিশাল জেলার ঝালকাঠির তথাকথিত শান্তি কমিটির প্রভাবশালী সদস্য খন্দকার সিরাজ উদ্দিন অনেকদিন পর আবার প্রকাশ্য পথে নেমে পড়েছেন। এখন তাঁর সার্বক্ষণিক সাথীরা হল আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ আর গন্তব্য স্থানটি হল আওয়া লীগ অফিস পাক-বাহিনীর কুখ্যাত ক্যাপ্টেন আজমত এলাহীর তৎকালীন সঙ্গী এই সিরাজ উদ্দিন আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের আর্শীবাদে এখন ঝালকাঠির চিনি বিতরণের একমাত্র ডিলার হতে পেরেছেন।

বিনিময়ী চোরাচালান

পাবনা জেলার এনায়েতপুর, বেতিল, সোহাগপুর, রাঙ্কুনিবাড়ী প্রভৃতি এলাকার কতিপয় ব্যবসায়ী চোরাপথে ভারত থেকে প্রচুর সুতা আমদানী করছে। এরা কোলকাতা থেকে ট্রাক বোঝাই করে সুতা আনার পথে শিয়ালদহ ও ফরিদপুর ষ্টেশনে এবং ভেড়ামারা, পাকশী, ঈশ্বরদী, শাহজাদপুর প্রভৃতি থানায় প্রচুর অর্থ ঘুষ দিয়ে থাকে। ভারতীয় সীমান্তবাহিনী হিলিতে এই ব্যবসায়ীদের সতেরটি সূতা বোঝাই ট্রাক আটকে রেখে দশ হাজার টাকা ঘুষের বিনিময়ে সম্প্রতি দুটি ট্রাক ছেড়ে দিয়েছে বলে জানা গেছে।

এই দেশদ্রোহী চোরাকারবারীরা বাংলাদেশ থেকে কাঁসার জিনিসপত্র এবং গুড়ো দুধ ট্রাক বোঝাই করে ভারতে পাচার করে বিনিময়ে সুতা এনে থাকে। পাবনার জেলা প্রশাসক নাকি তাদের পারমিট দিয়েছে বলে তারা দাবী করেছে।

বীণা চাটার্জী চন্দন-টিপ ও অন্যান্য

অপপ্রচার প্রমাণিত হলেই আমাদের জন্যে আনন্দের ব্যাপার হত। ক্রিষ্টান কিলারকে কেন্দ্র করে প্রফুমার কেলেঙ্কারীর জন্যে যুক্তরাজ্যের মত উদার দেশে ম্যাকমিলান মন্ত্রীসভার পতন ঘটেছিল। আর বাংলাদেশে বিশেষ করে 'জাতির পিতা' পর্যায়ে এমনি অঘটন রটে গেলে কি পরিণতি পোহাতে হবে তার কথা কেউ তো ভেবেই দেখেনি।

লণ্ডন প্রবাসিনী ভারতীয় নর্তকী বীণা চাটার্জী দাবী করে বেড়িয়েছেন যে বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমানের কপালে চন্দনের টিপ পরিয়ে ভাগ্যবতী হয়েছেন।

অবশ্যে বীণা চাটার্জীর স্বরূপ সকল মহলে ধরা পড়ে গেলে তার এই দাবীতে সবাই আঁতকে উঠতে লাগলেন। কারণ, বীণা চাটার্জী লণ্ডনে কলগার্ল ছাড়া আর কিছুই নন এই দুঃখজনক সত্যটি বের হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ও তদীয় সাঙ্গপাঙ্গদের সাথে জড়িত নর্তকীর উদ্ভট ও অপ্রত্যাশিত দাবীগুলো মিথ্যা হয়ে থাকলে সরকারের উচিত জনমনের বিভ্রান্তি দূর করতে ঘটনাগুলোর আসল বিবরণ পেশ করা। তা না করলে বাংলাদেশবাসীর মনে বিনা কারণেই হয়ত অনুরণিত হতে থাকবে: বীণা চাটার্জী, একজন প্রধানমন্ত্রী, তার সাঙ্গ-পাঙ্গ নববর্ষের চন্দন-টিপ ইত্যাদি।

খুব সম্ভব বীণা চাটার্জীর অনেক মিথ্যা পরিচয়ের মধ্যে নামজাদা ও প্রভাবশালী কয়েকটি পত্রিকার সাংবাদিক এবং এরিষ্টোটল ওনাসিসের ব্যক্তিগত বন্ধু হিসেবে নিজেকে জাহির করাতে বাংলাদেশ সরকার বেসামাল হয়ে আদর আপ্যায়নে তাকে চুপসে দেন। কিন্তু শেষ রক্ষা করতে না পেরে বাংলাদেশ থেকে বের হয়ে যেতে তাকে চব্বিশ ঘন্টার নোটিশ দান করেন। এই দেয়াটা তো বোধ করি একটা চাল বৈ কিছু নয়। সম্ভবত: খোদ রাজা বাদশার ব্যাপার বলেই আমাদের ক্রিমিন্যাল ইনটেলিজেন্স ডিপার্টমেন্ট প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ করে এর চূড়ান্ত ফয়সালা করতে পারছেন না।

কালিহাতি থানা ন্যাপ কার্যালয়ের উদ্বোধন

গত ২৮ শে এপ্রিল বিপুল সংখ্যক কর্মীর উপস্থিতিতে বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির কালিহাতি থানা ন্যাপ কার্যালয় উদ্বাধন করা হয়। উদ্বোধন করেন ন্যাপ প্রধান মজলুম জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী।

উদ্বোধন শেষে সকাল সাড়ে দশটায় কালিহাতি উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে থানা ন্যাপ আয়োজিত এক বিরাট জনসমাবেশে মওলানা ভাসানী ঘোষণা করেন. 'আমরা পিণ্ডির থেকে গোলামী মুক্ত হয়েছি, নতুন করে আবার দিল্লীর গোলাম হব না।'

বক্তৃতায় মওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগ সরকারের ঘুষ, দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেন। সভায় অন্যান্যদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় ন্যাপ সাংগঠনিক পরিষদের সদস্য জনাব আবদুর রহমান, জনাব মোহাম্মদ আলী এবং টাঙ্গাইল জেলা কমিটির আহবায়ক সৈয়দ আবদুল মতিন।

হক-কথা

১৭ই বৈশাখ, রবিবার

ফারাক্কা বাঁধের হের-ফের

ভারতের বিদ্যুৎ শক্তি ও সেচ মন্ত্রী ডা: কে, এল, রাও নিশ্চয়তা দান করিয়াছেন যে ফারাক্কা বাঁধ সম্পর্কিত বিষয়ে বাংলাদেশের স্বার্থ রক্ষা করা হইবে। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতার পরই ফারাক্কা বাঁধ চালু হইতে পারে বলিয়া তিনি উল্লেখ করিয়াছেন।

ফারাক্কা বাঁধ বাংলাদেশে বেশ কথিত একটি বিষয়। কিন্তু ইহার হের-ফের সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ মহল অবহিত থাকিলেও জনগণ কোন প্রকার সুস্পষ্ট ধারণা রাখে না। কারণ, এই বাঁধটি সম্পর্কে এতদিন ভারতীয় সরকার যাহা বলিয়া আসিয়াছেন, কেহ বিশ্বাস করে নাই। আবার পাকিস্তান আমলে ওয়াপদার বরাত দিয়া বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকায় যাহা প্রচার হইয়াছে তাহাতেও নিরঙ্কুশ কোন জনমত গড়িয়া উঠে নাই। ফারাক্কা বাঁধ সম্পর্কে কত বৈঠক হইয়াছে কত ফিচার রচিত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। রাজনৈতিক বিরোধের মধ্যে পাকিস্তানী আমলে বাঙ্গালী বিশেষজ্ঞ মহলের বক্তব্যকেও অনেকে বানোয়াট মনে করিয়াছেন। তখন তাহারা পরিসংখ্যান, ভৌগোলিক অবস্থান, নদী-নালার অবস্থা ইত্যাদির সাহায্যে একটি সত্যই প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছেন–ফারাক্কা বাংলাদেশবাসীর জন্য মরণ বাঁধ বৈ কিছু নয়। ইহার দরুণ লক্ষ লক্ষ একর জমি আবাদের অযোগ্য হইয়া পড়িবে। আবার বর্ষাকালে হাজার হাজার গ্রাম প্লাবিত হইয়া যাইবে। বিশেষ করিয়া রাজশাহী ও কুষ্টিয়া জেলার জন্য ফারাক্কা বাঁধ ভয়াবহ হুমকি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভালভাবে পড়াশুনা করিয়া এমন কি সরেজমিনে তদন্ত করিয়াও ওয়াপদার প্রচারণাকে মোটেই সন্দেহ নাই। বরং পাঠক-লেখক মহল বিশেষজ্ঞদের সহিত একমত হইয়াছেন যে, ফারাক্কা বাংলাদেশের সুখ-সমৃদ্ধির প্রশ্নে একটি মারাত্মক চ্যালেঞ্জ।

কিন্তু এইবার কি হইবে? ওয়াপদার যে চেয়ারম্যান সাহেব ফারাক্কার কবল হইতে বাংলাদেশকে রক্ষা করিতে হার্ডিঞ্জ ব্রীজের নিকট আর একটি 'গঙ্গা বাঁধের পরিকল্পনা' পেশ করিয়াছিলেন, তিনি আজ আবার ফারাক্কার মহিমা আবিষ্কার করিতে মাঠে নামিয়াছেন। এইবার তাই আমাদের মনে কয়েকটি প্রশ্ন জাগে। প্রথমত: মিঃ রাও–এর বক্তব্য সম্পর্কে: ফারাক্কা বাঁধ সম্পর্কিত বিষয়ে

বাংলাদেশের স্বার্থ রক্ষা করা হইবে।' অর্থাৎ অন্য কথায় তিনি বলিতে চান, এই বাঁধের দরুণ বাংলাদেশের স্বার্থ বিরোধী কিছু ঘটিবার রহিয়াছে। তাহাই যদি সত্য হয় তবে কেন তাহারা মানবতা বিরোধী এই বাঁধ নির্মাণ করিলেন। কেন তাহারা মিথ্যা প্রচার করিতেন, ফারাক্কা কোন ক্ষতিকর বাঁধ নহে। আর যদি তাহা মিথ্যাই হইয়া থাকে তবে প্রশ্ন হইল, বাঙ্গালী বিশেষজ্ঞরা যাহারা পিণ্ডির চাটুকারিতা করিতে মিথ্যাকে সত্য বলিয়া প্রচার করিয়াছেন তাহাদিগকেই কেন আবার সেই জলসায় অংশ নিতে অনুমতি দেওয়া হইল? প্রমাণিত হইয়াছে যে তাহারা চরিত্রহীন অফিসার। নেহায়েত চাকুরী রক্ষা করিতে সত্যকে মিথ্যা বলিয়া প্রচার করেন। ইহারাই আবার চাকুরী রক্ষার্থে মিঃ রাও পরিচালিত প্রতিনিধিদলকে খুশী করিতে বাংলাদেশের স্বার্থকে জলাঞ্জলী দিবেন না, এই কথা কেহ জোর গলায় দাবী করিতে পারে না।

ভিয়েতনামা যুদ্ধের গোপন দলিল

আওরঙ্গজেব চৌধুরী

এই নিবন্ধ যখন লিখতে বসেছি (১৯-৪-৭২) তখন ভিয়েৎনামের মুক্তিবাহিনী সায়গন ঘিরে চূড়ান্ত বিজয়ের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, আর ক্ষুধার্ত শকুনির মতো ঝাঁকে ঝাঁকে মার্কিন বি-৫২ বোমারু বিমানগুলি উত্তর ভিয়েৎনামের আকাশে শতাব্দীর জঘন্যতম আক্রমণের কাজে নিয়োজিত, বোমা ফেলছে হ্যানয়ে, ফেলছে হাইফং-এ আর উপকূল ঘিরে চলছে সপ্তম নৌবহরের শান্তির পৃথিবীর উদ্দেশ্যে ক্রমাগত বিষাক্ত নিঃশ্বাস উদগীরণ। দৈনিক দেড়শো টন বোমা নিক্ষেপ করেও তারা কিন্তু তবু পারেনি উত্তর ভিয়েৎনামের মনোবল ভাঙতে, পারেনি ভিয়েতকং ও উত্তর ভিয়েৎনামের সম্মিলিত বাহিনীর দুর্জয় অগ্রসরের মুখে প্রতিরোধের ব্যূহ গড়তে। দুই দিন আগে মুক্ত হয়েছে প্রাদেশিক রাজধানী আনলক শহরটি। অবশ্য ভয়েস অব আমেরিকা ও দক্ষিণ ভিয়েৎনামের পুতুল সরকারের বেতারযন্ত্র এখনো সমস্বরে চেঁচাচ্ছে যে আনলকের পথে-ঘাটে এখনো লড়াই চলছে, হেলিকপ্টারযোগে ছত্রী সেনা নামানো হচ্ছে, এবং রাজধানী সায়গনের জন্যে চিন্তার কোন কারণই নেই। এই প্রচারণা সম্পর্কে প্রত্যেক পাঠকই একমত যে সর্বের মিথ্যা ছাড়া ঐ সংবাদগুলি আর কিছু নয়; আনলক মুক্ত না হলে মার্কিন বিমান ঐ শহরে বোমা ফেলতো না।

বিশ্বজুড়ে চলছে আজ প্রতিবাদ। দৃপ্ত কণ্ঠে ভিয়েৎনামী জনগণের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেছেন মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী, বিশ্বের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেছেন – স্বীকৃতি দাও দক্ষিণ ভিয়েৎনামের বিপ্লবী সরকারকে। একই শ্লোগান নিয়ে পথে নেমেছেন বাংলাদেশের মন্ত্রী তাজুদ্দীন আহমেদ, মনি সিং, আতাউর রহমান প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। খোদ মার্কিন মুলুকে, হোয়াইট হাউসের সামনে নিক্সন প্রশাসনের বিরুদ্ধে কথা তুলেছে আমেরিকার জনগণ। আমরা ভুক্তভোগী। বাংলাদেশবাসী নিক্সন সরকারের স্বরূপ মর্মে মর্মে জানি, তাকে আর বিশ্লেষণের প্রয়োজন নেই। তবে উত্তর ভিয়েৎনামে বোমারু হামলার ইতিহাস সাত–আট বছরের, গত বছর সংবাদপত্রে প্রকাশিত পেন্টাগনের দলিল থেকে ভিয়েৎনামে মার্কিন নীতির একটা রূপরেখা আন্দাজ করা যাক।

শান্তির শত্রু বি-৫২ বোমারুগুলির উত্তর ভিয়েৎনামে ব্যাপক আক্রমণে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহল বেশ বিস্মিতও হয়েছেন বলে জানা গেছে। যে মার্কিন সরকার লালচীনের বিশেষ চাপ না দেওয়া সত্ত্বেও তাইওয়ান থেকে সৈন্য সরিয়ে নিতে চেয়েছে, চীনের সাথে ভাগাভাগি করে নিয়েছে প্রশান্ত

মহাসাগর, ভিয়েৎনামের যুদ্ধ ভিয়েৎনামীদের দ্বারাই হবে বলে নিয়মিত ঘোষণা করে এসেছে সে হঠাৎ এমন মরীয়া হয়ে উঠলো কেন?

পেন্টাগনের যে দলিলগুলি 'দি নিউইয়র্ক টাইমস' ও 'ওয়াশিংটন পোস্টে' প্রকাশিত হয়েছে এবং সাতহাজার পৃষ্ঠা বিশিষ্ট ঐ দলিলের অন্যতম লেখক জন কেনেথ গলব্রেথ বলে জানা গেছে। তাতে ভিয়েৎনাম যুদ্ধের পূর্ণ ইতিহাস উদ্ধারিত হয়নি। হয়তো

OPERATION PLAN 34A

কোনদিন হবে। তবে তাতে জানা যায় উত্তর ভিয়েৎনামে বোমা ফেলবার ও আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধকে আক্রমণাত্মক বানাবার চন্ড রণনীতি সর্বপ্রথম গ্রহণ করেন প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট লিন্ডন বি, জনসন। তাঁর পরামর্শদাতাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল তৎকালীন প্রতিরক্ষা-সচিব রবার্ট ম্যাকনামারা, প্রেসিডেন্টের বিশেষ সহকারী ম্যাকজর্জ বুণ্ডী, পররাষ্ট্র সচিব ডীন রাস্ক ও ম্যাকনামারার উত্তরাধিকারী ক্লার্ক ক্লিফোর্ড। প্রথমোক্ত ও শেষোক্তজনের ভূমিকাই ছিল অত্যন্ত অধিক। অবশ্য এরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। বিশেষ করে উত্তর ভিয়েৎনাম সম্পর্কে প্রেসিডেন্টকে অনেকবার সি-আই-এ পেন্টাগন, ম্যাকনামারা ও রাস্ক যুদ্ধ সম্প্রসারিত না করতে, এমনকি ভিয়েৎনাম থেকে সরে আসতেও পরামর্শ দিয়েছে। এর কারণ আছে অবশ্য। উক্ত প্রতিষ্ঠান দুটি ও ব্যক্তিদ্বয় জন এফ, কেনেডি প্রভাবান্বিত। বলা চলে প্রাক্তন প্রেসিডেন্টের আদর্শ অনুসারী কিংবা তাঁর মানুষ ভয়েই হোক বা অন্য কারণে হোক জনসন সিআইএ ও পেন্টাগনের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কোন রদবদল করতে পারেননি। কিন্তু যুদ্ধবিরোধী মনোভাবের ম্যাকনামারাকে তিনি গ্রেফতারের এবং যুদ্ধের পরামর্শের জন্য বাধ্য করার হুমকি দিয়েছিলেন। তার মূলে যুদ্ধবাজ মার্কিন সেনাবাহিনীর ক্রমাগত উত্তর ভিয়েৎনাম আক্রমণ ও ধুলিসাৎ করার জন্য আদেশ প্রার্থনা। জনসনের মনেও তাই ছিল, তবে আদেশ জারী করতে তিনি বেশ সময় নিচ্ছিলেন। এই পরিকল্পনা তিনি গ্রহণ করেন ব্যারী গোল্ডওয়াটারের বিরুদ্ধে নির্বাচনী প্রতিযোগিতায় নেমে। অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে এই আদেশ জারী করা হয়। পেন্টাগনের দলিলে দেখা যায় ১৯৬৪ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী নেওয়া হল 'an elaborate program of convert military operations against the state of North Vietnam' যার সংকেতিক নাম দেওয়া হল 'OPERATION PLAN 34A।' এরপর সায়গনের তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রদূত হেনরী ক্যাবট লজ পরামর্শ দেন '...bomb North vietnam with unmarked planes...''। মার্কিন রাষ্ট্র - বিভাগের নীতিনির্ধারণী পরিষদের রণংদেহী সভাপতি ওয়াল্টরস্টো ১৯৬৪-র ১৩ই ফেব্রুয়ারীতে ডীনরাস্কের কাছে পাঠানো এক বার্তায় বলেন "....We are the greatest power in the world —if we behave like it."। ঐ বছরের জুন মাসে জনসন সিআইএ-র কাছে ভিয়েৎনাম পরিস্থিতির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও করণীয় কাজের জন্য পরামর্শ চেয়ে পাঠান। উত্তর আসে- 'লাওস, দক্ষিণ ভিয়েৎনামের পতন ঘটলে কম্বোডিয়া বাদে ঐ এলাকার অন্য কোন দেশে দ্রুত কম্যুনিজম আসার কোন সম্ভাবনা নেই। তদুপরি, কম্যুনিজমের প্রভাব ছড়ালেও তা দীর্ঘ সময়সাধ্য এবং ঐ ফাঁকে এমন কিছু ঘটে যেতে পারে যা কম্যুনিজম প্রসারে বিপত্তির কারণ হয়ে উঠতে পারে।'

এরপর জনসনের সম্মুখে সমস্যা দেখা দেয়

সায়গনের জেনারেল নগুয়েন থানের তাবেদার সরকারকে কিভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করা যায়। ১৯৬৪-র ১৮ই আগস্ট তারিখে সায়গনস্থ তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রদূত ম্যাক্সওয়েল টেলর ওয়াশিংটনকে ক্যাবল করে জানান যে 'Something must be added' সন্দেহ নেই এটা ছিল উত্তর ভিয়েৎনামে "a carefully orchestrated bombing attack" এর জন্যে ইংগিত। টেলর অবশ্য সতর্ক করে দিয়ে জানিয়েছিলেন যে "এটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে থান সরকার ১৯৬৫-র ১লা জানুয়ারী পর্যন্ত টিকে থাকতে পারবে মাত্র।" এর সপ্তাহখানেক পরেই মার্কিন সৈন্যাধ্যক্ষগণ জানান যে ব্যাপক বোমাবর্ষণ এখন 'essential to prevent complete collapse of the US Position in southeast Asia'। সুতরাং কয়েক দিন পরেই সহকারী প্রতিরক্ষা সচিব জন টি ম্যাকনটন আগ্রাসী পদক্ষেপের নকশা প্রণয়ন করেন। একই বছর ডিসেম্বর মাসে লাওসে চালানো হয় 'অপারেশন ব্যারেল রোল' 'সুযোগ-সুবিধার লক্ষ্য' ভেদ করতে থাকে মার্কিন জঙ্গী জেট বিমানবহর।

১৯৬৫-র জানুয়ারীতে ভিয়েৎনামে আকাশ যুদ্ধ অনেক বেশী সম্প্রসারিত হয়। ফেব্রুয়ারীর প্রথম দিকে প্লিকুতে ভিয়েৎকংদের এক হামলায় ন'জন মার্কিন সৈন্য প্রাণ হারায়। চোদ্দ ঘন্টার মধ্যেই ৪৯তম মার্কিন নৌবাহিনীর জেটগুলি উত্তর ভিয়েৎনামের মাটিতে প্রতিশোধমূলক আক্রমণের ভয়াবহ স্বাক্ষর রাখে। সব শেষে, ১৩ই ফেব্রুয়ারী প্রেসিডেন্ট জনসন 'অপারেশন রোলিং থাণ্ডার' শুরু করেন। উত্তর ভিয়েৎনামের উদ্দেশ্যে শুরু হয় সর্বাত্মক বিমান হামলা।

স্থানাভাবে পেন্টাগনের দলিল বিশদ বিবরণ উপস্থাপিত করা গেল না। তবে উপরিউক্ত তথ্যপঞ্জী থেকে এটা স্পষ্ট জানা যায় সিয়াটো চুক্তি নয়, ভিয়েৎনামে মার্কিন স্বার্থ অন্যরকম।

কি রকম সে ইতিহাস হয়তো আগামীতে কোন একদিন পেন্টাগনের এমন একটি দলিল থেকে জানা যাবে। ভিয়েৎনামের ব্যাপারে জনসন ও নিক্সনে কোন তফাৎ নেই কেন? কারণ কি এই যে ইন্দোনেশিয়ায় আবার শক্তি সঞ্চয় করেছে কম্যুনিস্টরা – তারা যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে উঠেছে বার্মায়, থাইল্যাণ্ডে, মালয়েশিয়ায়– সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়? বিপ্লবী আন্দোলনের ঝটিকা কেন্দ্র উত্তর ভিয়েৎনামকে পঙ্গু করে দিলেই হয়তো গোড়াতেই এদের বিষদাঁত ভেঙ্গে দেওয়া যাবে – এই কি মার্কিন যুদ্ধ বিশারদদের ধারণা? অস্ত্রের ব্যবসায় – অস্ত্রের কারখানাগুলি চালু রাখার মধ্যে এশিয়া-আফ্রিকা-লাতিন আমেরিকা জুড়ে সে যে কুকীর্তি করে বেড়াচ্ছে তাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যেই কি এক সর্বজননিন্দিত যুদ্ধে জয়ের খায়েশ হয়েছে মার্কিন সরকার তথা তার পরিচালক ওয়াল স্ট্রিটের বণিক সম্প্রদায়ের?

যাই হোক, পৃথিবীর বৃহত্তম ও মহত্তম শক্তি জনগণ, তাদের জয় অবশ্যম্ভাবী। সায়গনের ৪০ কিলোমিটারের মধ্যে এখন প্রবেশ করেছে ভিয়েতকং বাহিনী। জানা গেছে মার্কিন বিমান হামলার দায় বহন করতে রাজি হয়েছে সোভিয়েত রাশিয়া।

মহামানব মোহাম্মদের বৈশিষ্ট্য

॥ মানবেন্দ্র নাথ রায় ॥

মোহাম্মদের ভগবৎ অনুসন্ধানে ভলটেয়ারের মতো উন্নাসিকতা ছিল না। তাঁর ঈশ্বর কামনার মূলে ছিল উন্নাসিকতা প্রণোদিত আবেগ-প্রাণ একজন নিরক্ষর মানুষের আন্তরিক প্রয়াস। এমনি আজকের এই বিংশ শতাব্দীতে সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের মন যে, প্রচলিত প্রক্রিয়ার সাহায্যে ঐশ্বরিক অনুপ্রেরণা লাভের আশা করে তিনিই মরুভূমির মধ্যে গিয়ে সেই ধ্যান, উপবাস ও উপাসনায় নিযুক্ত হলেন সমগ্র আরব জাতিকেই বাঁচিয়ে দেবেন এমন এক মহাশক্তিশালী ভগবানকে খুঁজে বের করবার আশায়। এসব ছাড়িয়ে প্রায়ই মস্তিষ্ক বিকৃতির ফলে মানুষের এ অভিজ্ঞতা লাভ হয়। মনকে যদি অন্যান্য অনুভূতি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করতে পারা যায় তাহলে কতগুলো দৃঢ়বদ্ধ ধারণা সেগুলো যতই কাল্পনিক বা অদ্ভুত হোক না কেন, মনের মধ্যে পরিষ্কার রূপ পরিগ্রহ না করে পারে না। যোগীদের মনস্তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণকালে দেখা যায় তথাকথিত স্বর্গীয় অনুপ্রেরণা অথবা অন্য যে কোন প্রকার উগ্র ধর্মানুভূতি আকস্মিক বা উদ্দেশ্যমূলকভাবে যৌগিক প্রক্রিয়াপ্রসূত মানসিক ব্যাধিরই ফল।

তাঁর আগের ও পরের তত্ত্বাভিসারীরা এমন ক্ষেত্রে যা করেছেন মোহাম্মদও ঠিক তাই করলেন। কিন্তু তাঁর বেলায় এমন কিছু ঘটলো যা তাঁর কৃতিত্বেরই পরিচয় দেয়। মানসিক যে লক্ষণগুলোকে সাধারণ আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রমাণ বলে মেনে নেওয়া হয় সেগুলোর দ্বারা ভ্রান্ত হবার মতো লোক তিনি ছিলেন না। তাঁর ভয় হলো তিনি হয়তো পাগল হয়ে যাবেন। তাঁর যখন এই অবস্থা তখন যদি তিনি তাঁর ধীশক্তি সম্পন্ন সহধর্মীনীর সহচর্য না পেতেন তাহলে তাঁর আদর্শই হয়তো তাঁকে পরিত্যাগ করতে হতো। বিত্তবর্তী ব্যবসায়িকা খাদিজাই তাঁর সুপটু সংসারাভিজ্ঞতার জন্য স্বামীর এই মানসিক বিকল্পের আধ্যাত্মিক অর্থ দ্রুত অনুধাবন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁর দৃষ্টিতে পাগলামীর কিছু নেই এবং তা ঐশ্বরিক বার্তা বয়ে আনছে। এ কথা তিনিই তাঁকে জোর করে বোঝালেন। তাঁর মানসিক বিকল্পের এই সংকেত প্রবণ অবস্থার সুযোগ নিয়ে তিনিই তাকে দেখালেন যে, একজন স্বর্গীয় দূত আল্লার বাণী তার হাতে তুলে দেবার জন্য ঘরে ঢুকেছেন। এটা নিঃসন্দেহ যে, অজ্ঞতা, ভ্রান্তি এবং সংস্কারাচ্ছন্নতার মোহমুগ্ধ পটভূমিকাতেই কেবল এই নাটকের অভিনয় সম্ভব কিন্তু তাহলে কি হয়? এমনি করেই তো প্রত্যেক ধর্ম জন্ম লাভ করেছে। সুতরাং ইসলাম যে এর ব্যতিক্রম, এমন চিন্তার, কোন হেতু নেই। ইসলামের স্বাতন্ত্র শুধু এখানে যে,স্বর্গীয় সমর্থনের দাবী ছাড়া এর মধ্যে বর্ণের গোড়ামী আর আধিভৌতিক গবেষণার মাত্রা রয়েছে কম; এর মধ্যে আছে শুধু রাজনৈতিক চেতনা। প্রগতিশীল সামরিক নীতি এবং ব্যক্তিগত জীবনে ব্যবহারের সুন্দর একটি বিধান।

তিনি নিজেকে ধর্মতত্ত্বের অনাবশ্যক জটিলতার মধ্যে নিয়োজিত করলেন না, কিন্তু ব্যক্তিগত পরিষ্কার, পরিচ্ছন্নতা, মিতাচারিতা ও নামায, রোজা সংক্রান্ত আইন-কানুনের প্রতিষ্ঠা করে তার লোকদের সামাজিক উন্নতির বিহিত ব্যবস্থা করে দিলেন। আর দীন-দুঃখীর প্রতি বদান্যতা দেখানো বা তাদের দান-ধ্যান করাটাকে দিলেন সবার উপরে স্থান। যে সহনশীলতা ও উদারতা সাধারণতঃ আজকাল দেখা যায় না তার পরিচয় দিয়ে তিনি বললেন, প্রকৃতই যারা সৎক্রিয়াশীল যে কোন ধর্মাবলম্বীই হোক না কেন তারা মুক্তি লাভ করবে।

কঠিন একেশ্বরবাদই মহামানব মোহাম্মদের ধর্ম। এই একেশ্বরবাদের জন্যই তা এত দূর ও অনমনীয় এবং এই আপাতঃ বৈশিষ্ট্যই তাকে শ্রেষ্ঠতম ধর্মের রূপ দান করেছে। দার্শনিক অর্থে ঈশ্বরের ধারণাতেই ধর্মের ভিত্তি। 'নেতি' থেকে 'ইতি' সৃষ্টির সম্ভাব্যতা মেনে না নিলে এ ধারণার ভ্রান্তি জনকতা কিছুতেই ঘুচতে পারে না। গ্রীস এবং ভারতবর্ষের ও প্রবীণ দার্শনিকদের যুক্তিবাদ এই অদ্ভুত তত্ত্ব মানতে চায় না। ফলে আদিম যুক্তিবাদের পশ্চাৎপটে যে ধর্মের উৎপত্তি হলো তা শেষ পর্যন্ত ভগবান সম্বন্ধীয় মৌলিক কোন পূর্ণ ধারণায়

পৌঁছতে পারলো না। তার ফল হলো এই যে, হিন্দু, ইহুদী ও খ্রীষ্ট ধর্মের মতো বড় ধর্মগুলোর শেষ পর্যন্ত 'বিশ্বই ব্রহ্ম' এই মতবাদের কোন না কোন ধারার মধ্যে বিলীন হয়ে গেছে। এ মতবাদ প্রকৃতপক্ষে ধর্মকে বাঁচায় না। বরং যুক্তিশাস্ত্রের অনুশাসনে তাকে দেউলিয়া করতেই সহায়তা করে। সমস্ত বিশ্ব প্রকৃতিকে ঈশ্বরের সঙ্গে এক করে দেখার জন্য ঈশ্বরের ধারণা সম্বন্ধেই একটা সন্দেহ জেগে উঠে। তার সৃষ্টি সম্বন্ধে সকল ধারণা নষ্ট করে দেয়। তার পরিণাম এই হয় যে, ঈশ্বর সম্বন্ধে সকল ধারণাও তখন অন্তর্হিত হতে বাধ্য। অনন্তকাল হতেই যদি পৃথিবীর অস্তিত্ব থেকে থাকে তাহলে তার যে একজন স্রষ্টা আছেন এই মতেরও কোন যৌক্তিকতা নেই আবার সৃষ্টির কৃতিত্ব থেকে বঞ্চিত হলে একথা অবধারিত সত্য যে, ঈশ্বরও নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠেন।

মহামানব মোহাম্মদের ধর্ম এই এক দুরূহ সমস্যার সমাধান করে দেয়। 'নেতি' থেকে 'ইতি' সৃষ্টির নিতান্ত অযৌক্তিক মতবাদকে জোরের সঙ্গে দাঁড় করিয়ে দিয়ে ইসলাম আদিম যুক্তিবাদের অসহায়তা থেকে ঈশ্বরের ধারণাকে মুক্তি দিয়েছে। এর পরেও ঈশ্বর তাঁর আপন গৌরবে দাঁড়িয়ে আছেন। শুধু এজন্য নয় অসংখ্য জগত সৃষ্টির সামর্থ্যই তার অশেষ ও অসীম ক্ষমতার পরিচয় দেয়। খোদা সম্বন্ধে এর কম ধারণা যদিও কিছুটা অন্ধ বিশ্বাসমূলক এবং আদিম প্রকৃতির তবুও এই মত জোরের সঙ্গে দাঁড় করিয়ে দিয়ে যাওয়াতেই মহামানব মোহাম্মদের কৃতিত্ব। ধর্ম হিসাবে ইসলাম যুক্তি নিরপেক্ষতার চরম অভিব্যক্তি। সেই জন্যই ইসলাম অন্যান্য সকল ধর্মের উপরে এত সহজেই জয়ী হতে পেরেছে। কেননা, অন্য সব ধর্ম তাদের এতসব তাত্ত্বিক উৎকর্ষ মতবাদের সুক্ষ্মতা আর দর্শনের নানা প্রকার দাবী-দাওয়া সত্ত্বেও দর্শন হিসাবে ত্রুটিপূর্ণ এবং প্রকৃতপক্ষে ধর্মের নামান্তর মাত্র।

পরন্তু একেশ্বরবাদের মধ্যে ভীষণ বিপর্যয় সাধনশীলতা লক্ষ্য করা যায়। ধর্মের শ্রেষ্ঠতম রূপ একেশ্বরবাদের মধ্যেই। অথচ ধর্ম ভাবাপন্ন চিন্তার মূলে তা কুঠারাঘাত করেছে। জগতের বাহিরে ঈশ্বরের পৃথক স্থান নির্ধারণ করে তাকে একেবারে বাদ দিয়েও যে সংসারে চলা যায় একশ্বরবাদ এমনও ইঙ্গিত দেয়। ইসলাম কঠোরতম একেশ্বরবাদী ভূমিকা গ্রহণ করে মানব ইতিহাসের গতানুগতিক ধর্মভাব শাসিত অধ্যায়টি বন্ধ করে দিল আর তার স্বভাবগুণে এমন সব সংস্কার মুক্ত ব্যাখ্যার-দ্বার উন্মুক্ত করে দিল যা পরিণামে ধর্মভাব শাসিত চিন্তাধারার ভঙ্গিকে পঙ্গু করে দিয়ে বর্তমান যুক্তিবাদের ভিত গড়ে তোলে। একেশ্বরবাদের ক্রিয়াকর্মকে আমরা একটা বিরাট হ্রদের সঙ্গে তুলনা করতে পারি– সেখানে যেন জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্রোত এসে ভীড় করেছে হঠাৎ কখন বাঁধ ভেঙ্গে বেরিয়ে পড়বে তারই শুধু প্রতীক্ষায়। একেশ্বরবাদী বড় বড় ধর্মগুলোর মধ্যে তৃতীয় ধর্ম ইসলাম জড়বাদের খুব বেশী অনুকূল। এদের মধ্যে ইসলাম বয়ঃকনিষ্ঠ অথচ আরব সভ্যতাকে একটি গৌরব সমুজ্জ্বল দীপ্তি দিয়ে গিয়ে ইসলাম সর্বপ্রথম এক সংস্কার মুক্ত দার্শনিক ভঙ্গি গড়ে তুললো যা মধ্যযুগের প্রত্যক্ষভাবে ইহুদীদের উপরে এবং পরোক্ষভাবে প্রতীচ্যে খ্রীষ্টানদের উপরে অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করে।

পাঠকের অভিমত

মার্কিন স্বীকৃতির অন্তরালে

প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমান কর্তৃক দশদিন সময়দানের পর চতুর্থ দিনেই হঠাৎ করে মার্কিন স্বীকৃতি আসলে আমাদের বিস্মিত করে দিয়েছিল। কিন্তু ১০ই বৈশাখের 'হক-কথা'য় "ঢাকায় কিসিঞ্জারের গোপন সফর?" শীর্ষক

যুক্তিপূর্ণ পর্যালোচনাটি পড়ার পর সে বিস্ময়ের ঘোর কেটে গেছে। কেননা, এতেই রয়েছে সকল রহস্যের সুনির্দিষ্ট সমাধান।

মার্কিনী বন্ধুত্বের স্বরূপ আজ আর গোপন নেই। এই সাম্রাজ্যবাদী শোষকটি ঋণ এবং সাহায্যের নামে দেশে দেশে শোষণ চালায়, উন্নয়নশীল দেশগুলিকে পদানত রাখার জন্যে পুতুল সরকার প্রতিষ্ঠা করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বলিষ্ঠ বিরোধিতা করলেও, স্বাধীনতার পর থেকেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এদেশে তার আসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালিয়ে আসছিল। কিন্তু তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিনের কঠিন মনোভাবের ফলে তখন না পারলেও সম্প্রতি সে তার উদ্দেশ্য হাসিল করতে পেরেছে। 'হক-কথা'র পর্যালোচনাটিতেই এ কথার সত্যতা প্রমাণিত হয়ে গেছে। একটি সাম্প্রতিক তথ্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য: জাতিসংঘের ত্রাণকার্যের জন্যে বিভিন্ন রাষ্ট্র বাংলাদেশকে যে ১৫ কোটি ৩০ লাখ ডলার সাহায্য দেবে তার মধ্যে মার্কিন একাই দেবে ১১ কোটি ৯০ লাখ ডলার। যে শত্রু আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধিতা করেছে, সে-ই কেন আজ এত বেশী সাহায্য দিতে এগিয়ে আসছে, এবং তাজউদ্দিন সরকারে পদাঘাতের পরও কেন শেখ সাহেব আজ মার্কিনী সাহায্য নিতে রাজী হয়েছেন – সেকথা বুঝা এখন আর কঠিন নয়।

ভিয়েৎনামসহ সারা বিশ্বের নির্যাতিত মানুষের হাতে চরম মার খাওয়া মার্কিনকে এদেশে আবার আসন দেয়ার চক্রান্ত করা হলে বীর জনগণ তা অবশ্যই ব্যর্থ করে দেবে। বাংলাদেশকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কাছে বিক্রি করে জনগণের ভাগ্যকে আবার অন্ধকারে ঠেলে দেয়ার অধিকার কারো নেই – একথা সকলেরই জানা উচিত।

ফেরদৌস মাহমুদ
ঢাকা

আপনার চিঠি

তেজগাঁও এতিমখানার দুরাবস্থা

জনাব সম্পাদক সাহেব,

গত বছর ৮ই ডিসেম্বর বর্বর পাক-বাহিনীর বোমাবর্ষণের ফলে তেজগাঁও এতিমখানার সর্বহারা এতিমদের প্রায় চল্লিশ জন শহীদ এবং ঘর দরজাসহ অন্যান্য আসবাবপত্রও অনেক ধ্বংস হয়েছিল। তারপর দেশ স্বাধীন হলে এতিমখানার সকল দালাল কর্মকর্তারা পালিয়ে যায়। ফলে বর্তমানে আমরা হতভাগা এতিমদের নিয়ে প্রায় না খাওয়া অবস্থায় দিনাতিপাত করছি। আমাদের থাকারও কোন ব্যবস্থা নেই। এদিকে পুরাতন কমিটি বাতিল করার ফলে এতিমদের দুরাবস্থা আরো বেড়ে গেছে।

সরকারের প্রতি আমাদের আবেদন, অবিলম্বে আইনানুযায়ী এতিমখানা পরিচালনার জন্যে এডহক কমিটি নির্বাচন করে নিরীহ এতিমদের থাকা-খাওয়া ও সুশিক্ষার ব্যবস্থা করা হোক।

নিবেদক
মোহাম্মদ হানিফ
সভাপতি
তেজগাঁও এতিমখানা কর্মচারী সমিতি, ঢাকা-৮

অফিসের সময়সূচী প্রসঙ্গে

জনাব

সম্পাদক সাহেব,

সরকারী, আধা-সরকারী এবং স্বায়ত্বশাসিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাজের সময় আগে যেখানে সকাল ৭-৩০ থেকে দুপুর ২ টা পর্যন্ত ছিল দেশ স্বাধীন হবার পর যুদ্ধ বিধ্বস্ত অর্থনীতি পুনরুদ্ধার ও জাতীয় পুনর্গঠনের অজুহাতে বাংলাদেশ সরকার সেখানে সকাল ৯-৩০ থেকে বিকেল ৫টা (আধ ঘন্টা বিরতিসহ) পর্যন্ত ধার্য করেছেন : এই সময়সূচী প্রবর্তনের ফলে অধিকাংশ কর্মচারীর পক্ষেই জোহর এবং আছরের নামাজ আদায়

করা সম্ভব হয় না। অন্যদিকে দুপুরের খাওয়া সকলকে হোটেলে সারতে হয়। ফলে স্বল্প বেতনভুক বিশেষ করে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা মারাত্মক অর্থনৈতিক অসুবিধের মধ্যে পড়েছেন। নিয়মিত ডাল-ভাতের যোগাড় করাই যাদের পক্ষে দুঃসাধ্য তারা কীভাবে হোটেলে খেতে পারবেন?

গরীব কর্মচারীদের স্বার্থে তাই অফিসের সময়সূচী পরিবর্তন করে সকাল ৮ টা থেকে দুপুর ২ টা পর্যন্ত স্থির করার জন্যে আমরা সরকারের প্রতি আবেদন জানাচ্ছি।

আঃ হালিম
বড় মগবাজার, ঢাকা

নন-ম্যাট্রিক শিক্ষকদের দাবী

জনাব

সম্পাদক সাহেব,

আমরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নন-ম্যাট্রিক জি.টি.(ট্রেণ্ড) শিক্ষক। ম্যাট্রিক জি.টি. শিক্ষকদের সমান ট্রেনিং ও যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও দীর্ঘদিন ধরে আমরা বঞ্চিত হয়ে আসছি। একই দায়িত্ব পালন করলেও আমাদের বেতনের স্কেল ম্যাট্রিক জি.টি শিক্ষকদের চেয়ে অনেক নিম্নমানের। আমরা এখানে স্কেলের উল্লেখ করলাম ১। ম্যাট্রিক জি,টি, (ট্রেণ্ড)– ১৩৫.০০ – ২২৫.০০ টাকা; ২। নন-ম্যাট্রিক জি, টি, (ট্রেণ্ড)– ১২০.০০–১৩০.০০ টাকা মাত্র।

অবিলম্বে এই অমানবিক অবহেলার অবসান করে দায়িত্ব ও যোগ্যতা হিসেবে আমাদের বেতনের স্কেল ও অন্যান্য সুবিধে দেয়া হোক।

অবহেলিত শিক্ষকদের পক্ষে –

মোঃ তসলিম উদ্দিন সরকার
সাধারণ সম্পাদক
প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি
বাগমারা, রাজশাহী।

সম্বর্ধনায় সম্বর্ধনায়

সম্বর্ধনা কেমন হল না হল মওলানা ভাসানী এতে কখনো আকৃষ্ট হননি। তাঁর স্বভাবেই তা নেই। কিন্তু শিবপুর ফিরে এসে কয়েকজন কর্মীকে তিনি বলেছিলেন, আশ্চর্য মানুষের সচেতনতা। রক্তের বিনিময়ে পাওয়া স্বাধীনতা নিয়ে আওয়ামী লীগ ছিনিমিনি খেলছে জনতা তা বুঝে ফেলেছে। তাই এই কদিন আগেরও একচেটিয়া জনপ্রিয় আওয়ামী লীগ সরকারের কুকীর্তিগুলো শিবপুরে আসবার পথে মওলানা সাহেব পথ-সভাগুলোতে যখন তুলে ধরছিলেন উপস্থিত জনতা তাকে মুক্তির একমাত্র দিশারী হিসেবে স্বত:স্ফূর্ত অভিনন্দন জানিয়েছে।

ঢাকা থেকে শিবপুর পর্যন্ত ৪০ মাইল পথে মওলানা ভাসানীকে দশটি জায়গায় বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। প্রথমে পাঁচরুখি, তারপর পুরিন্দা বাজার, পাঁচদোনা, নরসিংদী, সাটির পাড়া, পুটিয়া বাজার, সামপুর, আইষুবপুর, পালাপাড়া এবং সবশেষে শিবপুরে মওলানাকে সম্বর্ধনা দেয়া হয়। তাতে অর্থ ব্যয়ের আধিক্য ছিল না। কিন্তু প্রত্যেকটি জমায়েতে মওলানাকে স্বাধীনতা উত্তর পরিবেশে নতুন করে দেখবার আগ্রহ এবং তৎসঙ্গে আগামী দিনগুলোর অনিশ্চিত অচলাবস্থাকে কাটিয়ে কৃষক-শ্রমিক তথা মেহনতি মানুষের খেয়ে–পরে বেঁচে থাকবার নিরাপত্তা বিধানের দাবী ফুটে উঠেছে। এর জবাবে সর্বহারা মওলানা কি দিতে পারেন। আজীবন তিনি দিয়ে এসেছেন মুক্তির পথ বাতলিয়ে। সংগ্রামী চেতনা নিয়ে কৃষক সমিতি গড়ে তোলার তিনি আহ্বান জানিয়েছেন। নরসিংদীর ষ্টেশন রোডে সমবেত বিপুল জনতার উদ্দেশ্যে রিকশার উপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতাদানকালে মওলানা ভাসানী বলেছেন, আমরা পাঞ্জাবির গোলামীর

জিঞ্জির ছিন্ন করেছি–ভারতের গোলামী করার জন্যে নয়। সকলের প্রতি স্বাবলম্বী হবার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, আমরা আমাদের স্বাধীনতা আমেরিকা, রাশিয়া ও চীনের কাছে বিকিয়ে দেব না। বুকের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে প্রাণপ্রিয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা আমরা রক্ষা করব।

সম্বর্ধনায় সম্বর্ধনায় মওলানা ফুলের মালা আর অভিনন্দন পত্র পেয়েছেন ; লাঙ্গল- জোয়াল-মইয়ের প্রতীক পেয়েছেন, সর্বোপরি পেয়েছেন- আবালবৃদ্ধবণিতার সোচ্চার সমর্থন।

শ্লোগান মিছিল পোষ্টার

গত ২৯শে ৩০শে এপ্রিল ঢাকা জেলার শিবপুরে অনুষ্ঠিত পূর্বাঞ্চলীয় কৃষক সম্মেলনের বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিকগুলোর একটি হচ্ছে সম্মেলনে যোগদানকারী অজস্র মিছিল আর শ্লোগানের বৈচিত্র। দুপুর দু'টো থেকে জনসভা শুরু হলেও বেলা ১২ টার দিক থেকেই বিভিন্ন এলাকা হতে আসতে থাকে অগুণতি মানুষের স্রোত, আসতে থাকে মিছিলের পর মিছিল। ছোট-বড়-আঝারী মিছিলগুলো গগণ বিদারী শ্লোগানে শ্লোগানে কাঁপিয়ে তুলছিল সমগ্র শিবপুর এলাকা ... ... প্রতিটি মানুষের প্রতিজ্ঞার প্রতিরোধে সোচ্চার ... রৌদ্রময় প্রান্তরের বুক চীরে আঁকাবাঁকা গ্রামের পথে লালটুপী, কৃষক সমিতির লাঙল শোভিত পতাকা আর ব্যানার সজ্জিত প্রতিটি জঙ্গী মিছিলকে মনে হয়েছে শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে জাগ্রত জনতার উদ্যত ঝলকিত কড়া চাবুক। কণ্ঠে তাদের শ্লোগানের শব্দাবলী কাঁধে বয়ে আনা মাইকে ধ্বনিত- প্রতিধ্বনিত হয়েছে জনসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালায়। কণ্ঠ থেকে কণ্ঠে সোচ্চারিত পাঞ্চজন্যের শঙ্খনাদ, ভাসানী তোমায় লাল সালাম, ভাসানীর উক্তি সর্বহারার মুক্তি, কেউ খাবে তো কেউ খাবেনা তা' হবে না, তা' হবে না, হচ্ছে লাল হবে লাল দিকে দিকে লালে লাল, সমাজতন্ত্রের নামে ভাওতাবাজী চলবে না, দিল্লী-মস্কোর গোলামী মানবো না, লুটপাট সমিতির বিরুদ্ধে আমরাও প্রস্তুত, স্বাধীনতা আনলো কারা কৃষক–শ্রমিক সর্বহারা।

এ সম্মেলনের একটি জনপ্রিয় শ্লোগান ছিল 'অনেকের অনেক কথা ভাসানীর হক কথা'। অবিরাম শ্লোগানের শেষে মওলানা ভাসানী তার তেজোদৃপ্ত কণ্ঠে মে মাসের জন্য একটি নতুন শ্লোগান উপহার দিলেন তার অগণিত ভক্ত আর কর্মীদের; চল চল টঙ্গী চল। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে মে মাসের ২৮ তারিখে তিনি টঙ্গীতে কৃষক–শ্রমিক মৈত্রী সম্মেলন আহবান করেছেন।

শিবপুর সম্মেলনের অন্যতম একটি আকর্ষণ ছিল এর বিরাট সভামঞ্চ এবং বিভিন্ন স্থানে সজ্জিত অজস্র সুদৃশ্য পোষ্টার। পোষ্টারের ভাষা ছিল নকশাল নাম দিয়ে প্রকৃত দেশপ্রেমিকদের হত্যা করা চলবে না, চোরাকারবার বন্ধ কর; বামপন্থীদের ঐক্য চাই , ভাসানীর নামে অপপ্রচার বন্ধ কর, ভারত-বাংলাদেশের মেহনতি মানুষের ঐক্য দীর্ঘজীবী হোক ইত্যাদি।

মিছিলের জঙ্গীত্ব, শ্লোগানের দৃঢ়তা এবং পোষ্টারের বক্তব্যে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল শিবপুরের এই সম্মেলন। খেটেখাওয়া মানুষগুলোর চোখে–মুখে যেন প্রতিফলিত হয়ে উঠেছিল সংগ্রামী চেতনার ভাস্বর দীপ্তি, প্রার্থিত দিনের সংগ্রামে প্রস্তুত লাখো জনতার শপথ রণিত-অনুরণিত হয়েছে শিবপুরের বিস্তৃত পথ মাঠ–ঘাট–প্রান্তরে।

'বাংলার বাণী' সম্পাদক সমীপে একটি খোলা চিঠি

মাননীয় সম্পাদক,

মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীর বিরুদ্ধে উদ্দেশ্যপূর্ণ মিথ্যা অপপ্রচারের প্রতিযোগিতায় আপনি সকলকেই হারিয়ে দিয়েছেন। আপনি কোনকালে ভাল নাটক করতেন কিনা জানিনা; তবে, একথা জানি যে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তার বেতনভূক দালাল নিয়োগের ব্যাপারে ছাত্রনেতাদেরকেই অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে।

আপনি নিশ্চয়ই জানেন, ভাসানীর জীবনের সবচেয়ে বড়ো ট্রাজেডিই হল তাঁর ত্যাগ এবং সংগ্রামের স্বীকৃতি না পাওয়া বরং আপনার মতো আরও অনেকের কাছ থেকেই তিনি যা পেয়েছেন, তা হল মিথ্যা অপবাদ আর জঘন্য নিন্দা। আজ তাই দেখছি – মার্কিনসহ সকল সাম্রাজ্যবাদকে উৎখাত করাই যাঁর আজীবন রাজনীতির প্রধান কথা, যাঁর প্রতিজ্ঞ সংগ্রামের ফলেই সোহরাওয়ার্দী সাহেবদের হাজার বিরোধিতা সত্ত্বেও এদেশে মার্কিন বিরোধী জনমত গড়ে উঠতে পেরেছে, আপনার পত্রিকা সেই মহান জননায়ক মওলানা ভাসানীকেই মার্কিনপন্থী বলে চিহ্নিত করার অপচেষ্টা করছে। প্রিয় সম্পাদক, আপনি নিজের বুকে হাত দিয়ে বলুন: এদেশে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আসল দালাল কারা?

আপনার পত্রিকায় ভাসানী বিরোধী এই অপপ্রচারের উদ্দেশ্য আপনারই ভাল জানবার কথা। তবু বলি: এর মূল নিহিত রয়েছে মার্কিন স্বীকৃতির অন্তরালে। আপনি নিশ্চয়ই ১০ই বৈশাখ সংখ্যা 'হক-কথা' পড়েছেন – পড়েছেন কিসিঞ্জার সাহেবের গোপন ঢাকা সফরের রিপোর্টটি। স্বাধীনতার পর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজ উদ্দিন আহমেদ মার্কিন সাহায্যের মুখে পদাঘাত করলেও আজ কেন আবার তার সাহায্যই কৃতজ্ঞচিত্ত গ্রহণ করা হচ্ছে, সে কারণও আপনিই ভাল জানেন।

বিশ্বের নির্যাতিত জনতার প্রধান দুশমন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে বাংলাদেশ ঢুকতে দেয়ার যেকোন চক্রান্তের বিরুদ্ধে মওলানা ভাসানীর বলিষ্ঠ ভূমিকাই কি আপনার পত্রিকাকে এত বেশী তৎপর করেনি? প্রসঙ্গত বলতে হয়: বিভিন্ন দেশে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বেতনভুক দালালদের প্রধান কাজই তো প্রভু বিরোধী আন্দোলনকে স্তব্ধ করার চক্রান্ত করা। এদেশে আপনার সম্পাদিত পত্রিকাটির ভূমিকা আমাকে সেকথাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

শ্রদ্ধেয় সম্পাদক,দয়া করে জামাতে ইসলামীর ইতিহাস স্মরণ করুন: তারা মওলানা ভাসানীকে কাফের বলে প্রমাণ করতে চেয়েছিল। কিন্তু পারেনি। কেননা, মওলানা আসলেই মুসলমান। এদেশে মার্কিন বিরোধী আন্দোলনের জন্মদাতা মওলানা ভাসানীকে আপনি তাই হাজার চেষ্টা করেও মার্কিনপন্থী বানাতে পারবেন না। পরিবর্তে বরং নিজের গোপন কথাই ফাঁস করে দিয়ে সকলের হাসির খোরাক জোটাবেন।

প্রিয় সম্পাদক, নিজের চেহারা কখনো ঢেকে রাখা যায় না- বরং ঢাকতে গিয়েই তা হাস্যকরভাবে উন্মোচিত হয়ে পড়ে। একটি কথা তাই আপনার জানা উচিৎ যে, এদেশের বীর জনতা তাদের সকল সর্বনাশের প্রধান হোতা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নির্লজ্জ দালালী কোনদিন সহ্য করবে না। অতএব, এখনো সাবধান হবার সময় আছে।

আহমদ শাহ রেজা

অমুসলিমদের দৃষ্টিতে মহানবী

দার্শনিক, বক্তা, ধর্ম প্রচারক, আইন–রচয়িতা, ভাবের বিজয়কর্তা, ধর্মমতের ও প্রতিমাবিহীন ধর্ম পদ্ধতির সংস্থাপক, কুড়িটি পার্থিব রাজ্যের এবং একটি ধর্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা দেখ-মহাম্মদকে (সাঃ) মানুষের মহত্ত্বের যতগুলো মাপকাঠি আছে, তা দিয়ে মাপলে, কোন লোক তাঁর চেয়ে মহত্তর হতে পারে?

- লামার টাইন

আমি বিশ্বাস করি, যদি তাঁর (মহানবীর) মতো কোন ব্যক্তি আধুনিক বিশ্বের একনায়কত্ব গ্রহণ করতেন, তবে তিনি এযুগের প্রতিটি সমস্যার এরূপ সমাধান করতেন যা আকাংখিত সুখ শান্তি বিধানে সমর্থ হতো ।

– জর্জ বার্ণার্ডশ'

মুসলমান ধর্ম কিরূপে বেঁচে রইল, যদি তার শিক্ষায় ভাল কিছু না থাকে । তাতে অনেক ভাল রয়েছে। মুহম্মদ ছিলেন পয়গম্বর – সাম্যের, মানুষের ভ্রাতৃত্বের, সকল মুসলমানের ভ্রাতৃত্বের।

স্বামী বিবেকানন্দ।

আমি মুসলমান নই কিন্তু মহাপুরুষ (হযরত) মুহাম্মদ (সঃ)-এর অনুপম জীবনাদর্শকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি। মদিনায় হিজরতের সময় সওর গুহায় আত্মগোপন অবস্থায় তিনি আবুবকরকে (রাঃ) বলেছিলেন, "হে আবুবকর! তুমি মনে করো না যে এখানে আমরা দু'জনমাত্র। আমাদের মাঝে খোদাও রয়েছেন।" সত্যি কত মহান ছিলেন তিনি।

– সি এফ এ্যান্ড্রি জর্জ

সমর্থন

বাংলাদেশ কৃষক সমিতি আয়োজিত শিবপুর কৃষক সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে বাণী ও বক্তব্য পাঠিয়েছেন উপমহাদেশে সাম্যবাদী আন্দোলনের অগ্রদূত কমরেড মোজাফফর আহমদ, মার্কসবাদী ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির কমরেড আবদুল্লাহ রসুল, হরে কৃষ্ণ কোঙার এবং নৃপেন চক্রবর্তী। তাছাড়া সম্মেলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন পশ্চিমবঙ্গ কিষাণ সভার যুগ্ম সম্পাদক কমরেড শান্তিময় ঘোষ এবং কোষাধ্যক্ষ কমরেড বগলা প্রসন্ন গুহ। তারযোগে অভিনন্দন বাণী পাঠিয়ে সম্মেলনের আদর্শ ও উদ্দেশ্যের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছেন দক্ষিণ ভিয়েৎনাম কৃষক মুক্তি সমিতি এবং ভিয়েৎনামের আফ্রো-এশীয় সলিডারিটি কমিটি।

কৃষক সমিতির এই সম্মেলনে বাংলাদেশীয় অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছে। তন্মধ্যে বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশন, বাংলা শ্রমিক ফেডারেশন, বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন, বাংলা ছাত্র ইউনিয়ন এবং শ্রমিক–কৃষক সমাজবাদী দল অন্যতম।

২৬ জন প্রতিনিধির ভাষ্য

শিবপুর সম্মেলনে বারটি জেলা থেকে অংশগ্রহণকারী সাত হাজার কৃষক প্রতিনিধির মতবিনিময় একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। ২৯শে এপ্রিল বিকেলে মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রতিনিধিদের প্রথম সভায় হাজী মোহাম্মদ দানেশ, কাজী জাফর আহমদ, জনাব আবুল বাশার, জনাব রাশেদ খান মেনন, জনাব মাহবুবউল্লাহ এবং জনাব আতিকুর রহমান সালুর সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য আগামী দিনের কর্মসূচীকে আশাপূর্ণ করে তুলে। ভারত থেকে আগত কমরেড শান্তিময় ঘোষ এবং কমরেড বগলা প্রসন্ন গুহ বয়ে আনা মৈত্রীর বাণী সংক্ষেপে পেশ করেন। তাছাড়া সম্মেলনের অভ্যর্থনা কমিটির আহবায়ক জনাব আবদুল মান্নান ভূঁইয়ার দীর্ঘ রিপোর্টে অতীতের আলোকে আগামী দিনের সংগ্রামের তাত্ত্বিক এবং পদ্ধতিগত বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠে।

৩০ শে এপ্রিল সকালে হাজী মোহাম্মদ দানেশের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রতিনিধিদের অধিবেশনে উপরোক্ত নেতৃবর্গ খোলাখুলি

বক্তব্য পেশ করেন। তাছাড়া জনাব বদিউল আলম, রফিকউদ্দীন ভূঞা, কাজী আফতাবুল ইসলাম, আবদুর রহমান, ওবায়দুল করিম বাবুল, মিয়া সাদেকুর রহমান, আইয়ুব রেজা চৌধুরী, জিয়াউদ্দীন, শামসুদ্দীন, জানে আলম চৌধুরী,মওলানা সিদ্দিকুর রহমান, দিলীপ সুর, মোল্লা জয়নাল আবেদীন, গিয়াসুদ্দীন আহমদ, ঈদ্রিস খাঁ প্রমুখ নিজ নিজ এলাকার কৃষক-মজুর শ্রেণীর অবস্থার আলোকে শ্রেণী সংগঠনের ভবিষ্যৎ রূপরেখা তুলে ধরেন।

জনাব আবদুল মান্নান ভূইয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিকেলের জনসভায় হাজী মোহাম্মদ দানেশ বলেছেন, মোজাফফর আহমদ ও মনিসিং মওলানা ভাসানীর ন্যাপ এবং কৃষক সমিতির নাম ভাঙ্গিয়ে রাজনীতি করছেন। তারা আওয়ামী লীগের কোমর ধরে সমাজতন্ত্র কায়েমের কসরত করছেন। শ্রমিক নেতা কাজী জাফর বলেছেন, ২৫ বিঘা জমির খাজনা মওকুফ করলে কি হবে– প্রতি মিনিটে ভূমিহীন কৃষক ও সর্বহারা শ্রমিকের রক্ত চুষে নেয়া হচ্ছে। কমরেড শান্তিময় ঘোষ ও কমরেড বগলা প্রসন্ন গুহ তাদের ভাষণে ভারত-বাংলাদেশ মেহনতি জনতার মৈত্রী ও একাত্মতার কথা ঘোষণা করেছেন। শিবপুর সম্মেলনের সুদূরপ্রসারী গুরুত্বের কথা উল্লেখ করে জনসভায় বক্তৃতা করেছেন শ্রমিক নেতা আবুল বাশার, কৃষক নেতা রাশেদ খান মেনন, মোস্তফা জামাল হায়দার, মাহবুব উল্লাহ, আতিকুর রহমান সালু, হায়দার আকবর খান রনো এবং মিসেস আনোয়ারা আহমদ।

॥ ৪৩ ॥

আইয়ুব আমলেও মন্ত্রীদের জন্যে কার্পেট ক্রয়ে বড়জোর তিনহাজার টাকা ব্যয় হয়েছে। 'সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়ে গেল বলে' প্রচারকারী বাংলাদেশ সরকার মন্ত্রীদের কার্পেটের জন্যে ছয়হাজার টাকা মঞ্জুর করেছেন। শুধু তাই নয় এপ্রিল মাসের প্রথমার্ধে মন্ত্রীদের জন্যে সরকারী টাকায় ১৪টি ফ্রীজ কেনা হয়েছে। বেতন কমালে কি হবে। বুদ্ধি তো খুলে গেছে।

ইহা কি সত্য?

॥ ৪৪ ॥

ময়মনসিংহ জেলার কুলিয়ারচর থানা যখন হানাদার মুক্ত হয় তখন সরকারী গুদামে ২২ শত মণ চাউল, ১৫ শত মণ গম এবং ২৬ হাজার মণ সার গুদামজাত ছিল। হানাদার মুক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে আওয়ামী লীগের কর্মকর্তাগণ উপরোক্ত দ্রব্যাদিসহ সিভিল অপারেশনের অজস্র টাকা ও মালপত্র কুক্ষিগত করেন। ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেলে মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করে। আত্মসাতকারীদের একজন পাক আমলে শান্তি কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবেও কাজ করেছেন। আজ তিনি শুধু আওয়ামী লীগের মাতব্বরই নন হাজার হাজার টাকার মূল্যের মালপত্র আত্মসাত করেও পার্টির একজন প্রভাবশালী পাত্র।

॥ ৪৫ ॥

গোপালপুর থানার ৮নং হেমনগর ইউনিয়নের জনৈক দুর্নীতিপরায়ণ দালালের সাহায্যে টাঙ্গাইলের এক এম-সি-এ তিনটি সরকারী মেহগনি গাছ আত্মসাত করবার সব কারসাজি সম্পন্ন করেন। কিন্তু গাছগুলো কাটার পর হেমনগর উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ ব্যাপার বুঝে গাছগুলো আটকে ফেলেন। হেমনগরের সেই দালালের মাধ্যমে এম-সি-এ সাহেব অর্থের প্রলোভনেও গাছগুলি আত্মসাত করবার চেষ্টা করেন। কিন্তু গাছ আর টাঙ্গাইলে পৌছাতে পারলেন না।

॥ ৪৬ ॥

মতিয়া গ্রুপের বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন একটি লাইব্রেরী জবরদখল করে টাঙ্গাইলে তাদের অফিস চালু রাখছেন বলে অভিযোগে প্রকাশ। লাইব্রেরীটির মালিক হানাদার আমলে ভারতে চলে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে অগ্নিকন্যাদের সাইনবোর্ড ঝুলছে দেখতে পান। তিন মাস টালবাহানা করে কাটিয়ে আজও তারা দখল ছাড়ছেন না। তাত্ত্বিক যুক্তি তাদের একটি রয়েছে। রাশিয়া যদি হাঙ্গেরী, পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া রেড করতে পারে তবে তারা পারবেন না কেন?

॥ ৪৭ ॥

একজন অবসরপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত আওয়ামী লীগের স্বজনপ্রীতির বদৌলতে ৬টি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়েছেন। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের জন্য অভিজ্ঞ লোক থাকা সত্ত্বে মোটা অঙ্কের ঘুষ প্রদানের বদৌলতে একই ব্যক্তি এতগুলির অধিকর্তা হয়ে বসেছেন। আরও রহস্যজনক ব্যাপার এই যে, একটি বিদেশী কোম্পানীর জনৈক বাঙ্গালী পার্টনারকে গত জুন মাসে পাক–বাহিনী হত্যা করার পর তার বাড়ী–ঘর ও যাবতীয় জিনিষপত্র উক্ত চেয়ারম্যান স্বনামে - বেনামে দখল করেছেন।

॥ ৪৮ ॥

ময়মনসিংহের সব কয়টি গোদারাঘাট ইজারা পত্তন দেওয়ার নামে প্রহসন হয়েছে। মুজিববাহিনী ও আওয়ামী লীগের হুমকি ও দাপটে কেউ ন্যায়সঙ্গত মাত্রায় ডাকতে পারেনি। স্বেচ্ছাচারিতা করে নামমাত্র টাকায় তারা ইজারা নিয়ে গেছেন। ১৯৭০-৭২ এই দুই আর্থিক বৎসরের জন্যে শম্ভুগঞ্জ ও কাচারীর গোদারা ঘাট দুই লক্ষ আটচল্লিশ হাজার টাকায় পত্তন হয়েছিল। এবার কর্মকর্তাদের চালবাজির বদৌলতে ডাক হয়েছে মাত্র ঊনপঞ্চাশ হাজার টাকা। মুজিববাহিনীর এক কমাণ্ডার তা এক পঞ্চমাংশ টাকায় বাগিয়ে নিয়েছেন।

॥ ৪৯ ॥

চালনা বন্দরে জাহাজ থেকে মাল খালাস করার জন্যে ২২টি পুরাতন বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান কাজ করে আসছিল। খুলনা জেলার এম-সি-এ সাহেবরা সব কয়টি বাতিল করিয়ে নিজেদের ও আত্মীয় স্বজনের নামে বাগিয়ে নিয়েছেন।

সম্পাদক ঃ সৈয়দ ইরফানুল বারী, সন্তোষ, টাঙ্গাইল। মুদ্রণে– শান্তি প্রেস, টাঙ্গাইল

প্রতি কপি বিশ পয়সা সাপ্তাহিক রেজিস্টার্ড নং – ডি.এ ১৭৬

হক-কথা

(WEEKLY THE HAQ-KATHA)

প্রকাশক ও পৃষ্ঠপোষক ঃ মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

প্রথম বর্ষ একাদশ সংখ্যা শুক্রবার ২৯ শে বৈশাখ ১৩৭৯; ১২ই মে, ১৯৭২; ২৭ শে রবিউল আওয়াল ১৩৯২; সন্তোষ, টাঙ্গাইল

প্রশাসনিক কেলেঙ্কারী বেড়েই চলছে

মুজিব সরকারের অনেক কেলেঙ্কারীর মধ্যে প্রশাসক নিয়োগ এবং তাদের লুটপাটে এমসিএ কিংবা আওয়ামী লীগের কর্মকর্তাদের সুপরিকল্পিত সহযোগিতা অন্যতম।

স্বাধীনতার পরপরই অবাঙ্গালীদের তো বটেই বাঙ্গালী দালালদের বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানেও প্রশাসক নিয়োগ জরুরী হয়ে পড়ে। কিন্তু এই নিয়োগ নিয়ে স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি কোনটিই বাদ পড়ে নাই। মন্ত্রী-এমসিএ-দের দৃষ্টি এতে নিবদ্ধ ছিল। কারণ লুটপাটে এত সহজে অংশীদার হবার মওকা আর কোন ক্ষেত্রে ছিল না। কিন্তু লুটপাট তো পরের কথা প্রশাসক নিয়োগ করতেই তারা দুর্নীতির আশ্রয় নিয়েছেন। কোন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে হয়ত প্রশাসকই দরকার নেই। মন্ত্রী-এমসিএরা হুমকি দিয়েছেন, প্রশাসক নিয়োগ করে সরকারী নিয়ন্ত্রণে নেয়া হবে। সংশ্লিষ্ট মালিক লাখ লাখ টাকা ঘুষ দিতে তা ঠেকিয়েছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে জাতীয়করণ হয়ে গেলে দেখা গেল মালিকরা মারাত্মকভাবে ঠকেছেন। রাগেগোস্বায় এবার ঘুষ দেবার কাহিনী তারা ফাঁস করে দিচ্ছেন। এমনি ঘটনা ঘটেছে আমাদের জানা মতে তিনটি টেক্সটাইল মিল ও দুটি জুটমিলে। প্রশাসকদের অনেকেই মন্ত্রী- এমসিএ-দের ঘুষ দিয়ে নিয়োগপত্র নিয়েছেন। যারা আওয়ামী কর্মকর্তাদের আত্মীয়স্বজন তাদের তো পোয়াবারো।

– মন্ত্রী এমসিএ ঘুষ আদায় করছে

– প্রতি পাউন্ড ৩০ টাকার মাল ৯০ পয়সায় বিক্রয় হয়েছে।

– প্রতিষ্ঠানের আসবাবপত্র বাসায় উঠছে।

অযোগ্য হলেও তারা কয়দিনের বাদশাহী পেয়ে বসেছেন। এমনও আছে, দুর্নীতির দায়ে যাকে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে তাকেও ঘুষ খেয়ে মন্ত্রী - এমসিএ-রা প্রশাসক করে দিয়েছেন। শুধু দুর্নীতিবাজ নয় খাস দালালকে প্রশাসক নিয়োগ করার নজীরেরও অভাব নেই। প্রশাসক হয়ে বসেই অনেকে প্রতিষ্ঠানের আসবাবপত্র নিজ বাড়ীতে সরিয়ে নিয়েছেন। কেউ কমদামে গুদামজাত মাল বিক্রি করে স্থানীয় প্রভাবশালী আওয়ামী লীগের নেতাদের সাথে ভাগ-বাটোয়ারা করেছেন। ইতিমধ্যে খোদ সরকারই কয়েকজন দুর্নীতিপরায়ণ প্রশাসককে বরখাস্ত করেছেন। কিন্তু যারা স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক লীগকে একচেটিয়া শক্তিশালী করে তুলতে খড়কুটা পোড়াচ্ছেন তারা দুর্নীতি করেও টিকে যাচ্ছেন। কারণ গুন্ডার ভয়ে সাধারণ শ্রমিক এর প্রতিবাদ করতে পারছেন না। উর্ধতন কর্তৃপক্ষও হিসেবে শ্রমিক লীগের অংশ দেখে দমে যাচ্ছেন।

বাংলাদেশের সম্পদ নিয়ে আর কতদিন ছিনিমিনি খেলা হবে কে জানে। আমরা পাঠক সমীপে মাত্র কয়েকটি নজীর তুলে ধরছি। শতাধিক ঘটনার মধ্যে এগুলো সাধারণ নমুনা মাত্র। কিন্তু দেশটা কি হয়ে গেল, দুর্নীতির ইতিহাস তুলে ধরলেও সরকার তাতে কান দেন না। বরং খেয়াল রাখেন প্রশাসকের মন রক্ষার।

বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম আহমদ বাওয়ানী, শরমিন ও বাংলাদেশ (সাবেক পূর্ব পাকিস্তান) এই তিনটি টেক্সটাইল মিলের যিনি প্রশাসক নিযুক্ত হয়েছেন তিনি একজন গণ পরিষদ সদস্য। শ্রমিকদের স্বার্থ, প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও সব খুচরা যন্ত্রপাতি, ব্যাংকের লেন-দেন বা দেশ-বিদেশের সাথে যোগাযোগের কোন জ্ঞান বা অভিজ্ঞতাই আজীবন ফৌজদারী মামলায় পারদর্শী এই ভদ্রলোকটির নেই। তবু তিনি তিন তিনটে মিলের পরিচালক।

মিল পরিচালনায় অযোগ্য হলেও, মিলের সম্পদ বিক্রয় এবং অন্যান্য অপকীর্তির ধারাবাহিকতায় তিনিও এমসিএ, আওয়ামী নেতৃবৃন্দ এবং তাদের আশির্বাদপুষ্টদের চেয়ে পেছনে পড়ে নেই। প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে আজ পর্যন্ত তিনি যা করেছেন, তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কীর্তিটি হল আহমদ বাওয়ানী মিলের উৎপাদিত ৯০ লাখ টাকার গুদামজাত দ্রব্য আত্মীয়স্বজনদের মাধ্যমে ৮০ লাখ টাকায় বিক্রয়। শরমিন ও বাংলাদেশ মিল দুটি মাত্র একমাস চলার পরই কাঁচামাল ও অব্যবস্থার জন্যে বন্ধ হয়ে গেছে। এদিকে আহমদ বাওয়ানী মিলসের আয়ুও ফুরিয়ে আসছে। কিন্তু আওয়ামী গণপরিষদ সদস্য প্রশাসকটি এখনো নিজের এবং প্রিয়জনদের স্বার্থ গোছাতে ব্যস্ত।

চট্টগ্রাম হাফিজ লুট মিলস ও টেক্সটাইল মিলসের আওয়ামী ভক্ত প্রশাসক ব্যাপক আলোড়ন তুলেছেন। মিল দুটির সচেতন শ্রমিক সমাজ এবং শুভাকাংখীদের কয়েকটি প্রচারপত্র থেকে জানা গেছে, শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার দিক থেকে অযোগ্য এবং দুর্নীতির দায়ে চট্টগ্রামের এ, কে, খান জুট ও মোমেন শাহীর আলহাজ্ব জুট মিলস থেকে এককালে বহিস্কৃত এই প্রশাসকটি সম্পত্তি লুন্ঠন, স্বজনপ্রীতি এবং ঘুষ- দুর্নীতির চরমে পৌছে গেছেন। তিনি মিলের অসংখ্য টন লোহা, তামা, সিমেন্ট ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি কমদামে বিক্রয়লব্ধ অর্থে এ পর্যন্ত ২৫ হাজার ২ শত ৫৬ টাকার আসবাবপত্র নিজের বাড়ীতে উঠিয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ৩০ টাকা পাউন্ডের তামা তিনি মাত্র ৯০ পয়সা মূল্যে বিক্রয় করেছেন। এমনকি মিলের অফিসারস- মেসের নিজস্ব গাড়ীটিও তিনি নিজের দখলে নিয়েছেন।

এই মিলটির শ্রমিক বা কর্মচারীদের কেউই আগে বাংলাদেশ (প্রাক্তন পূর্ব পাকিস্তান) পাটকল সমিতির নিয়মানুযায়ী বেতন ও অন্যান্য সুবিধে পেতে পারেননি। গত ফেব্রুয়ারী মাসে সমিতির নিয়মানুযায়ী বেতন ও সুবিধেদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও দালাল প্রশাসকটির অহেতুক হস্তক্ষেপের ফলে তা মার্চ মাসেই বাতিল হয়ে যায়।

নারায়ণগঞ্জের তেল ও গ্যাস উন্নয়ন সংস্থায় এখনো কোন স্থায়ী প্রশাসক নিয়োগ করা হয়নি। অস্থায়ী প্রশাসক হিসেবে যে জুনিয়র অফিসারটি কাজ চালাচ্ছেন, আওয়ামী লীগ ও

শ্রমিক লীগের যৌথ প্রচেষ্টায় তার এই সুযোগটি জুটেছে। তিনি তাই নেতৃবৃন্দকে খুশী করার চেষ্টায় কোন ত্রুটি করছেন না। অতএব, সম্পত্তি বিক্রয় এবং টাকা মারার সাথে সাথে শুরু হয়েছে কর্মচারী উচ্ছেদ অভিযান।

আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল শ্রমিক ইউনিয়নের নাম পাল্টানো। মিলের রেজিষ্ট্রিকৃত শ্রমিক ইউনিয়নটি শ্রমিক ফেডারেশনের সাথে সংযুক্ত থাকলেও, অস্থায়ী প্রশাসকটির প্রচেষ্টার ফলে তা রাতারাতি শ্রমিক লীগ হয়ে গেছে। (চলবে)

বাঘার গোস্বা বনাম মন্ত্রীর মন্ত্র

গ্রেনেড বিস্ফোরণে ৪২ জন আহত এবং একজনের মৃত্যুর প্রতিক্রিয়ায় দুজনকে গ্রেফতার করার প্রতিবাদে সভা অনুষ্ঠানের পর জনাব কাদের সিদ্দিকীর নির্দেশে ছাত্র লীগের উদ্যোগে প্রকাশ্য সড়কে টাঙ্গাইল নিবাসী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আবদুল মান্নানের কুশপুত্তলিকা সোল্লাসে দাহ হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে কাদের-মান্না চার কুতুবের ক্রিয়াকাণ্ড কনডেম করে কতকগুলো গোপন সিদ্ধান্তে পৌঁছবার পর একটি এভিনিউস্থ রেস্তোরায় তারা সদলবলে দুপুরের ভোজন সম্পন্ন করেন। বিনয়ের সাথে ২১৩ টাকার খাবার বিলটি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শোধ করে দেবার পর নাটকের দ্বিতীয় অঙ্ক শুরু হয়।

দন্তহীন বাঘের মত হুঙ্কার ছেড়ে চার কুতুব 'বাঘা কাদেরকে' গ্রেফতার করবার আবদার জানালেও গত ৭ই মে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সম্বর্ধনা সভায় প্রদত্ত ভাষণে তিনি তার বাহিনীর প্রতি অবিচারের অভিযোগ উত্থাপন করে পুলিশ ও 'টিকটিকি'দের কঠোর সমালোচনা করেন। নিজের গৌরবময় কর্মজীবনের ফিরিস্তি দিয়ে এক পর্যায়ে দুর্নীতিবাজ সরকারী কর্মচারীদের বরখাস্তের দাবী প্রসঙ্গে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বলেন, কথায় কথায় তাদের ছাঁটাই করা সম্ভব নয়। ঘুষ ও দুর্নীতির অসংখ্য অভিযোগে অভিযুক্ত এমসিএ জনাব বদিউজ্জামান খান জনগণকে চরিত্র সংশোধনের আহ্বান জানান। দামী শার্টিনের কাপড়ে ঘেরা সভামঞ্চটিতে সকরুণ নয়নে বসা ছিলেন এমসিএ আবদুল লতিফ সিদ্দিকী। গত ২৮ শে এপ্রিল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আবদুল মান্নান তাকে আওয়ামী লীগ থেকে বহিষ্কারের দাবী জানিয়ে প্রস্তাব পাশ করেছিলেন।

আমি সেদিন ভারতে বন্দী
– মওলানা ভাসানী

যে কথাটি জানতে দেশী-বিদেশী সাংবাদিক, শুভানুধ্যায়ী মওলানা ভাসানীকে বিগত চার মাস যাবত নানা প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত করেছেন গত ৭ই মে ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত জনসভায় ভাষণদানকালে ব্যাখ্যা না করে বললেও তিনি কিছুটা ইঙ্গিত দিয়েছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে বামপন্থীদেরকে পিছু হটিয়ে রাখতে ভারতীয় শাসক গোষ্ঠীর ভূমিকা বাংলাদেশের সচেতন নাগরিকদের মধ্যে বহুল আলোচিত।

ভারতে মওলানা সাহেব কোথায় কেমন ছিলেন এই প্রশ্নের জবাব পেতে বহু লক্ষ লোক উদগ্রীব, তাতে কোন সন্দেহ নাই। মওলানা সাহেব চারটি মাসের মধ্যে ইঙ্গিতেও রহস্যটি উদ্ঘাটন করেন নি। কিন্তু ময়মনসিংহের জনসভায় তিনি উন্মোচনের প্রথম পরিচ্ছেদ শেষ করেছেন। মওলানা বলেছেন, 'আমি সেদিন ভারতে বন্দী।'

প্রসঙ্গটি এসেছিল মস্কোপন্থী নেতাদের 'বিশেষ বক্তব্যে।' স্বাধীনতা আন্দোলনে সব ত্যাগ নাকি তারাই করেছেন। মওলানা বললেন, 'স্বাধীনতা সংগ্রামে ত্যাগ করেছে বাংলাদেশের কৃষক-মজুর শ্রেণী। মুক্তিবাহিনীকে তারা নিজের খাবার দিয়েছে। সর্বস্ব হারানোর ঝুঁকি নিয়েও আশ্রয় দিয়েছে। আজ মুক্তিবাহিনী

যেমনি লাঞ্ছিত-বঞ্চিত, কৃষক-মজুরের বাঁচার দাবীও তেমনি উপেক্ষিত।'

মওলানা সাহেব বললেন, 'তাই বলি না, আমি এদেশের স্বাধীনতা এনেছি। আমি সেদিন ভারতে বন্দী। মুজিব সেদিন পিণ্ডিতে বন্দী। কিন্তু মোজাফফর, মণিসিং মুক্ত অবস্থায় ভারতে বিচরণ করে বেড়ালেও একদিনের জন্যেও মাতৃভূমিতে আসে নাই। আমি কেন আসতে পারলাম না আমার চেয়ে ইন্দিরা সরকারই ভাল জানেন। তাই সবাইকে সবুর করতে বলি– সময় আসলে ভাসানীর দরকার হবে না। এদেশের মানুষ রায় দেবে স্বাধীনতা সংগ্রামে কার দান কত।'

সভাশেষে জনৈক সাংবাদিক মওলানাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এতদিন বলেন নি কেন ভারতে বন্দী ছিলেন।' জবাবে মওলানা বললেন 'আমি জানি একটি বৃহৎ জনতা এতে ক্ষুব্ধ হবে এবং বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রীতে গোড়াতেই ফাটল ধরে যাবে। তা ঠেকাতেই চুপ ছিলাম। বুঝি না, কেন মস্কোওয়ালারা কেঁচো খুড়তে সাপ বের করছে।'

বরাবরের মত ময়মনসিংহের ভাষণেও মওলানা ভাসানী প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমানকে তার দলীয় আবর্জনা , লুটপাট সমিতি এবং মস্কোপন্থী বিভ্রান্ত সৃষ্টিকারীদের সম্পর্কে সাবধান হতে বলেন। তিনি বলেন, 'মুজিব তুমি জেনে রেখো, মস্কোপন্থীরা নয়-বরং বুড়া ভাসানীই তোমার বন্ধু। কারণ, মস্কোওয়ালারা লুটপাট সমিতির যোগান দিয়ে তোমাকে অজনপ্রিয় করছে। আর আমি পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছি। আমার লড়াই শোষকশ্রেণী, ঘুষখোর, চোরাকারবারীর বিরুদ্ধে। আমি দুর্নীতি-স্বজনপ্রীতির উৎখাত চাই। ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী অটুট রাখতেই আমি অসাধু এবং শোষক মাড়ওয়ারীর বিরুদ্ধে কথা বলছি। তুমি মুজিব, এক যুগ ক্ষমতায় থাক আপত্তি নাই। কিন্তু মনে রেখো, স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখলেই শুধু চলবে না। সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীকে সমভাবে খাওয়াতে পড়াতে হবে।'

মওলানা সাহেব ক্ষেদের সুরে বলেছেন, 'ইসলামের শত্রু ঘোষণা করে পাকিস্তান সরকার আমাকে সেলে রেখেছে। আমার অসাম্প্রদায়িক ভূমিকার দরুন ওরা আমাকে ভারতের দালাল বলেছে। জীবনে কত গালি শুনেছি। আর আজ আমার বিরুদ্ধে কুৎসা রটানো হচ্ছে, আমি সাম্প্রদায়িক। অথচ আমি যখন আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট ছিলাম পাঁচজন হিন্দু- মনোরঞ্জন ধর, ধীরেন দত্ত, কামিনী কুমার দত্ত, বসন্ত কুমার দাস এবং জনৈক সূত্রধরকে মন্ত্রী করেছিলাম।

মওলানা সাহেব অনেক আশায় বললেন, 'আমার জীবনের সাধ শুধু বাংলাদেশে কৃষক-মজুর রাজ হউক। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমাজতন্ত্রবাদ কায়েম হউক। আমি দেখতে চাই বাংলাদেশে মজুর-মন্ত্রীতে খাওয়া থাকায় কোন প্রভেদ নাই।'

সভায় অনেকগুলো পোষ্টার ছিল। তন্মধ্যে একটিতে লেখা ছিল: ৭৯টি আমদানী দ্রব্যের মধ্যে টেন্ডু পাতা নাই কেন। সভামঞ্চে মওলানা সাহেবের মাটিতে গড়া একটি মূর্তি ছিল। সভাস্থলে প্রদত্ত অনেক শ্লোগানের মধ্যে ছিল: ভোটের আগে ভাতের নেতা- মওলানা ভাসানী।

মওলানা ভাসানীর শুভাগমনে বিশেষ ক্রোড়পত্র, এই পরিচয়ে 'দেশবাসী' নামে একটি পত্রিকা মোশাররাফ হোসেন মনজু, নবেন্দ্র কুমার দত্ত, দেলোয়ার হোসেন প্রমুখের উদ্যোগে প্রকাশিত হয়।

মওলানা সাহেব ছাড়া জনসভায় বক্তৃতা করেছিলেন জনাব আজাদ মিলকী, আবদুল জব্বার, শফিউল আজম ফারুক এবং মোশাররাফ হোসেন মনজু।

৬ই মে মওলানা ভাসানী ময়মনসিংহ শহর

থেকে ২০ মাইল দূরে ফুলপুরে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় ভাষণ দিয়েছিলেন। সেখানকার কৃষক-মজুর মওলানাকে চোরাচালানের মাত্রা সম্পর্কে বিস্তারিত খবরাখবর বলেন। ফুলপুর যাবার পথে কৃষক সমিতির উদ্যোগে মওলানা সাহেবকে শম্ভুগঞ্জে সম্বর্ধনা দেয়া হয়। যাত্রাপথে তারাকান্দায় তিনি ন্যাপের অফিস উদ্বোধন করেন। ৭ই মে তিনি মোমেনশাহী জেলা কৃষক সমিতির এবং সানকী পাড়াস্থ ন্যাপের ইউনিয়ন অফিস উদ্বোধন করেন।

জাতীয় পতাকা যা একবার উত্তোলিত হয়েছে তার বিকল্প অন্য পতাকা উত্তোলনের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। দল-মত নির্বিশেষে আমরা সকল শ্রেণীর এই জাতীয় পতাকাকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেছি। পক্ষান্তরে আমার বক্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা করে জনসাধারণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হচ্ছে।

– মওলানা ভাসানী

বিশেষ করে মস্কোওয়ালারা ফুলপুর ও ময়মনসিংহের জনসভায় গোলযোগ হবে কিংবা হচ্ছে বলে মিথ্যা প্রচার করে বেড়ায়। ময়মনসিংহের জনসভার পূর্ব রাত্রে শহরের ক্যালকাটা মুসলিম জুয়েলার্সে সশস্ত্র ডাকাতি হয়। পার্শ্ববর্তী গ্রামে গ্রামে একে সম্বল করে তারা প্রচার করে বেড়ায় যে ভাসানীর আগমনে শহর গরম। গেলেই গুলি খেয়ে মরতে হবে।

ভারত বাংলাদেশ বাণিজ্য চুক্তি

ফকির করার ফিকির

আহমদ শাহ রেজা

যুদ্ধোত্তর প্রথম দিনটি থেকে ৫০ লাখ টন চাল, আড়াই হাজার কোটি টাকার অস্ত্র, ৩০ লাখ বেল পাট, দেড় লাখ বেল সূতা, ৫০ হাজার পাউন্ড রং, ১ কোটি ১২ লাখ বর্গফুট কাঠ, ১২ হাজার টন ইলিশসহ লক্ষ লক্ষ টাকার তাজা মাছ, প্রায়– ৫০০টি যানবাহন প্রভৃতি চোরাপথে ভারতে পাচার হয়ে যাবার পর ভারত এবং বাংলাদেশের মাঝে এক বছর মেয়াদী একটি বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

যে কোন দেশের সাথে আর এক দেশের কোন চুক্তি হলে তাতে মূলত: উভয় দেশেরই স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকে। ক্ষুদ্রতর দেশের উপর বৃহৎ দেশটি চুক্তির মাধ্যমে তার আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ পেলে সম্পাদিত চুক্তিটি একপক্ষীয় হয়ে পড়ে, ক্ষুদ্রতর দেশটি শোষিত হতে থাকে। ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত বাণিজ্য চুক্তিটি বিশ্লেষণ করলে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে এরফলে ভারতই শুধু লাভবান হতে পেরেছে, বাংলাদেশ নয়।

তিন স্তর বিশিষ্ট এ চুক্তিটিতে বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশ এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা ও মিজোরাম রাজ্যগুলির সীমান্তে উভয় দেশের দশ মাইল এলাকায় অবাধ বাণিজ্য চলতে পারবে। উল্লেখযোগ্য যে, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত প্রায় ১২০০ মাইল বিস্তৃত। ফলে ১২০০ মাইল এলাকায় এই অবাধ-বাণিজ্য চলবে। স্বাধীনতা উত্তর বিগত চার মাসের হিসেবেই দেখা গেছে যে আইনগত কড়াকড়ি (?) থাকা সত্ত্বেও চোরাপথে বিভিন্ন জিনিস ভারতীয় পুঁজিপতিরা লুট করে নিয়ে গেছে। তারপরও যদি সীমান্তের নাম করে অবাধ বাণিজ্য চলতে দেয়া হয়, তাহলে আর পদধ্বনি নয় শুধু, উলঙ্গ দেহেই এদেশে মহাদুর্ভিক্ষ দেখা দেবে। অগণিত মানুষ না খেয়ে মারা যাবে।

অবশ্য চুক্তিতে উল্লেখ রয়েছে যে বিশেষ পারমিট ছাড়া কেউ সীমান্তে বাণিজ্য করতে পারবেনা এবং তা লক্ষ রাখার জন্য উভয় দেশেরই পর্যবেক্ষক অফিসার মোতায়েন রাখা হবে। ভারতীয়দের কথা জানা না থাকলেও বাংলাদেশের অফিসারদের চরিত্র সম্পর্কে জনগণের ভাল ধারণা রয়েছে। অতীতের অভিজ্ঞতার আলোকে একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, এই সব অফিসাররা নিম্নতম ঘুষের বিনিময়েই চোরামাল পাচারে সাহায্য করে ভারতের প্রতি বন্ধুত্বের নিদর্শন দেখাবেন। ফলে বাংলাদেশের অবস্থা আরো শোচনীয় হয়ে পড়বে।

চুক্তিটি বিশ্লেষণ করে এক বাক্যে বলা যেতে পারে যে, এটি অসম বাণিজ্য চুক্তি ছাড়া আর কিছু নয়। ব্যাপক আলোচনায় না গিয়েও যদি

মাছ ও পাটের বদলে তামাক
বার হাজার মাইলে অবাধ বাণিজ্য

শুধু পাট আর মাছ রপ্তানীর বিনিময়ে তামাক আমদানীর কথাই বলা যায়, তাহলেই কথাটির সত্যতা বেরিয়ে পড়বে।

চুক্তিটি অনুসারে বাংলাদেশ ভারতকে নয় কোটি টাকার তাজা মাছ এবং সাড়ে সাত কোটি টাকার কাঁচা পাট দেবে। বাংলাদেশ থেকে তাজা মাছ রপ্তানীর হিসেবে দেখা যায় অতীতে এদেশ থেকে চার কোটি টাকার বেশী মাছ কখনো বিদেশে রপ্তানী করা হয়নি। তদুপরি বিগত চার মাসে লক্ষ লক্ষ টাকার মাছ ভারতে পাচার হয়ে গেছে। ফলে মাছের দাম বেড়ে গেছে, বেড়ে গেছে অপুষ্টিতে ভোগা মানুষের সংখ্যাও। এর পরও যদি বছরে ৯ কোটি টাকার মাছ রপ্তানী করা হয়, তাহলে দেশবাসী অবশ্যম্ভাবীভাবেই মাছ পাওয়া থেকে বঞ্চিত হবেন, মাছের দামও কয়েকগুণ বেড়ে যাবে।

অন্য আর এক চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশ ভারতকে সাড়ে সাত কোটি টাকার কাঁচা পাট দেবে। একথা সত্য যে, বাংলাদেশের তুলনায় বেশী শিল্পায়িত ভারতে পাটকল ও পাটজাত জিনিসের উৎপাদনী শক্তি অনেক বেশী। পাট উৎপাদনের দিক থেকে বিশ্বের প্রধান হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তানী আমলে বাংলাদেশে তেমন কল-কারখানা তৈরী করা হয়নি। ফলে উৎপাদক হয়েও এদেশ চিরদিনই পাটের বাজার হয়েই থেকেছে। সাড়ে সাত কোটি টাকার কাঁচা পাট রপ্তানী চুক্তির ফলে এবার বাংলাদেশ ভারতের বাজারে পরিণত হয়ে পড়বে। এদেশে ভারতীয় মাড়োয়াড়ী পুঁজিপতিদের দালালরা সর্বদাই সজাগ তৎপর রয়েছে। তাই সাড়ে সাত কোটির চেয়েও অনেক বেশী পরিমাণ পাট চোরাপথে পাচার হয়ে যাবে। ফলে ভারত বিশ্বের একচেটিয়া পাট ব্যবসায়ী রাষ্ট্রে পরিণত হবে, অন্যদিকে বাংলাদেশ শুধু পাটের বাজার হিসেবেই থেকে যাবে।

এতো গেল রপ্তানীর দিক। তাজা মাছ আর পাটের বিনিময়ে বাংলাদেশ পাবে দশ কোটি টাকার তামাক। সাময়িক কর্মপ্রেরণা জোগালেও তামাক মূলত: মানুষের স্বাস্থ্যহানী ঘটায়, ডেকে আনে যক্ষ্মা আর ক্যান্সার। অথচ, ২৫ কোটি টাকার মধ্যে সেই তামাকই আমদানী করা হবে ১০ কোটি টাকার। এর চেয়ে নির্মম পরিহাস আর কী হতে পারে? অথচ, ক্ষতিকর তামাকের চেয়েও আরো ভাল জিনিস আমদানীর ব্যবস্থা স্বচ্ছন্দে করা যেতো।

বাণিজ্য চুক্তির প্রতিটি বিষয় পর্যালোচনা করেও নির্ভরযোগ্য এমন কোন তথ্যই পাওয়া যায় না যাতে করে বলা যায় যে বাংলাদেশ এতে লাভবান হয়েছে। বিশেষ করে সীমান্ত

এলাকার অবাধ বাণিজ্যের সুবিধেটি পরোক্ষভাবে সীমান্ত উচ্ছেদেরই নামান্তর মাত্র। আর এর ফলে চোরাকারবারিরাই ব্যাপক সুবিধে পাবে। তিরিশ লাখ লোকের শাহাদতের বিনিময়ে অর্জিত বাংলাদেশকে এইভাবে ভারতের কাছে বিকিয়ে দেয়ার দুঃসাহস সরকার কোথা থেকে পেলেন - জনতার মনে আজ এই প্রশ্ন।

৩

মুজিববাদী দালাল

বরিশাল হাতেম আলী কলেজের অধ্যক্ষ কাজী মোতাহার হোসেন পাকবাহিনীর আমলে যতোগুলো কীর্তি করেছেন, তার মাঝে ছয়জন অধ্যাপককে বহিষ্কার করা ছাড়াও রয়েছে বাংলাদেশ বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সহসভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও ছাত্রনেতা এস, এম, আলমগীরকে হত্যা করা। কলেজের ছাত্রদের প্রবল চাপ সত্ত্বেও আজো তিনি স্বপদে বহাল থাকতে পারছেন কেননা, করেও রংপুর ক্যান্টনমেন্টের এমইএস-এর এ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার আমিনুল হক ভূঁইয়া এখনো স্বপদে বহাল তবিয়তে আছেন। এজন্য অবশ্য তাকে পাকবাহিনীকে আমলে কামানো অর্থের একটা অংশ খরচ করতে হয়েছে। বলা বাহুল্য এই গরমের দিনেও তার গায়ে এমন মুজিব কোট শোভা পেয়ে থাকে।

কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টের এমইএস এর এ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিনিয়ার সুজায়েত উল্লাহ ও পাক সেনাদের দালালী করেছেন। পরবর্তীকালে ঢাকায় বদলী হয়ে এসেই তিনি দালালীর ব্যবসা শুরু করেছিলেন। ইনি টি এণ্ড পি ইয়র্ড থেকে মেশিনারী, রেফ্রিজারেটর, এয়ার কণ্ডিশনার প্রভৃতি বাজারে বিক্রি করে প্রচুর অর্থ কামিয়েছেন।

দেশ স্বাধীন হলে এই সুজায়েত উল্লাহ তার রূপ পাল্টে ফেলেন- খরচ করেন প্রচুর অর্থ। পাকবাহিনীর দালালীর সম্ভাব্য সাক্ষী কর্মচারীদের বরখাস্ত কিংবা বদলীর ব্যবস্থা করে তিনি এখন ঘনিষ্ট এম-সি- এ-দের

মগবাজারের পাগলা পীর
আইডব্লিও টিএ ক্যাপটেন শফী

এম-সি-এ ও আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ তাঁর দালালীতে মুগ্ধ। সবার উপরে, তাঁর গায়ে থাকে চকচকে কালো মুজিব কোট।

রাজশাহী জেলা শহর এবং নাটোর ও নবাবগঞ্জের শতশত রাজাকার ও আল বদর আওয়ামী নেতৃবৃন্দের সহজবোধ্য হস্তক্ষেপের ফলে বিনা বিচারে মুক্তি পেতে পেরেছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আলবদর পাণ্ডা জালাল উদ্দিন প্রচুর অর্থ এবং মুজিব কোটের বদৌলতে এখনো পুরাতন বদরী ডাট দেখিয়ে সকলকে সন্ত্রস্ত করে রাখছে।

স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় অসংখ্য দেশপ্রেমিককে হত্যা করে লক্ষ লক্ষ টাকা লুট বদৌলতে নিজস্ব পদটি ছাড়াও পি-ই-সি, এম-ই-এস, এম-ই, ও এ-কিউ-এস প্রভৃতি চারটি গুরুত্বপূর্ণ পদেও বহাল আছেন।

ঢাকার মগবাজারস্থ পাগলা পীর সাহেব আসলেও পূজনীয় পীরই বটেন। এই পীর সাহেব আইউব-মোনেম আমলেও সরকারী দালালী করে কর্মকর্তাদের ভক্ত বানিয়েছেন। যুদ্ধের সময় বিশেষ করে বাঙ্গালী হত্যার অন্যতম হোতা মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীকে প্রায় মুরীদ বানিয়ে দেশপ্রেমিকদের হত্যা করিয়েছেন, গ্রেপ্তার করিয়েছেন বাংলার বীর সন্তানদের, আবার স্বাধীনতার পরও তিনি তার ঐশ্বরিক ক্ষমতার বলে যথারীতি সরকারী কর্মকর্তাদের ভক্ত বানাতে পেরেছেন।

পাকবাহিনীর দালালীর অভিযোগে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করতে গিয়েও তাই বড়ো সাহেবের টেলিফোনিক ধমকের ঠেলায় আবার ফিরে গেছে।

এই পাগলা পীরটির পরিচিতি ঝোলে রাস্তার মোড়ের সাইন বোর্ডে, মাইকের ভয়ানক শব্দে শব্দে। যে মাইকটিতে মাত্র পাঁচ মাস আগেও শোনা গেছে পাকিস্তানের সংহতির মোনাজাত, আজ সেই মাইকেই শেখ মুজিব এবং তার সরকারের দীর্ঘায়ুর প্রার্থনা বাতাসে ধ্বনিত হয়। অতএব তিনি আজ ক্ষমা পেতে পেরেছেন।

মুক্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে পানি পথে পাক-নৌবাহিনীর সকল অপারেশনের প্রধান উপদেষ্টা অভ্যন্তরীন নৌপরিবহন সংস্থার হাইড্রোগ্রাফী বিভাগের প্রধান কার্যকরী অফিসার ক্যাপ্টেন শফি স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন। তিনি যুদ্ধের সময় অফিসে পাকিস্তানের সংহতির জন্যে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দান করতেন। নির্দেশ অমান্যকারী স্বাধীনতাকামী কর্মচারীদের নাম তুলে দিতেন হানাদারদের হাতে।

ক্যাপ্টেন শফির উদ্যোগেই যুদ্ধের সময় নারায়ণগঞ্জে সংস্থার জাহাজগুলি ভারী অস্ত্রে সজ্জিত থাকতো। তার নির্দেশেই অনেক কর্মচারীকে পাকবাহিনীর সাথে যুদ্ধে যেতে হতো। কুমিল্লা জেলার মতলবে তিনিই পাকবাহিনীর সহযোগিতায় নিরীহ জনগণের ঘরবাড়ি পুড়িয়েছেন। অসংখ্য নারী-পুরুষ ও শিশুকে হত্যা করিয়েছেন।

দেশ স্বাধীন হবার পর তিনি খাঁটি দেশপ্রেমিক সাজার চেষ্টা করেন। কিন্তু কতিপয় বেরসিক ব্যক্তি দালালীর যাবতীয় দলীল সহকারে তার বিরুদ্ধে ঢাকার রমনা থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। পুলিশ তাকে দুই দুবার গ্রেফতার করতে গিয়েও আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ এবং এম-সি-এ সাহেবদের হস্তক্ষেপের ফলে ব্যর্থ হয়েছে। অফিসের দেয়ালে দেয়ালে তার বিরুদ্ধে প্রচার পত্র থাকার পরও তিনি ক্ষমা পেয়ে গেছেন। কেননা তিনি এখন শেখ সাহেবের মারাত্মক ভক্ত এবং মুজিববাদে দারুণ বিশ্বাসী।

হক-কথা

২৯শে বৈশাখ শুক্রবার

অশান্ত নেতা

একজন রাজনৈতিক নেতাকে অনেক অপবাদ দেওয়া যায়। কোনটার সাহায্যে ভালরকম ঘায়েলও করা যায়। কিন্তু অপবাদের এ্যাটম বোমাও মওলানা ভাসানীকে ব্যতিব্যস্ত কিংবা পথভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। তিনি বঞ্চিত মানুষের প্রতিনিধি, বেপরোয়া বিদ্রোহী কণ্ঠ। মানুষের কল্যাণে তিনি আপোসহীন সংগ্রামী।

অত্যাচারী জমিদার আর সুদখোর মহাজনের বিরুদ্ধে যখন তার সংগ্রাম, নির্যাতনের সাথে সাথে তাহাকে সহ্য করিতে হইয়াছে ভিত্তিহীন অপপ্রচার। সবই তিনি উপেক্ষা করিয়াছেন। বরং তাহারাই পর্যুদস্ত হইয়াছে। আল্লাহ্-রসুলের পরই যখন মুসলিম লীগের স্থান-এককালের অমিত তেজা প্রাদেশিক পার্টির প্রেসিডেন্ট মওলানা ভাসানী বিদ্রোহ করিয়া বসেন। আঁতে ঘা লাগিয়াছিল সেদিনের শাসক শোষক গোষ্ঠীর। মওলানাকে তখন বলা হইল হিন্দুস্থানের দালাল। কত কষ্টে গড়া আওয়ামী লীগ যখন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হাতে দেশকে তুলিয়া দিল শুধু প্রতিবাদই নয় ভবিষ্যতের জন্য বিরাট ঝুঁকি লইয়া মওলানা পাল্টা শক্তি সংগঠিত করিয়া ফেলেন। তখন তিনি দেশ ও দশের এক নম্বরের দুশমন হিসাবে চিত্রিত হইয়াছেন। রাজনীতিকে গ্রামের মানুষের অঙ্গনে লইয়া যাইতে তিনি ৬২ হাজার গ্রাম চষিয়া বেড়াইয়াছেন। কৃষক -মজুরের অন্তরে অর্থনৈতিক বক্তব্য ফুটাইয়া

তুলিতে তিনিই সাধ্য সাধনা করিয়াছেন। সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের সহিত দেশবাসীর একটি যোগসূত্র স্থাপন করিতে তিনিই দুনিয়াটা তোলপাড় করিয়াছেন। হায়, ভাসানী তখন কাফের মওলানা। পুঁজিবাদ খতম করিতে তিনি নিরক্ষর কৃষক-মজুরদেরকে সহজ ভাষায় অর্থনৈতিক শোষণ বুঝাইয়াছেন। সামন্তবাদের অভিশাপ তাহাদিগকে ঘরোয়া কথায় বলিয়াছেন। সর্বোপরি সাম্রাজ্যবাদী ছোবলের স্বরূপ এবং প্রতিক্রিয়া তিনিই গ্রামে গ্রামে গাহিয়া বেড়াইয়াছেন। হাল-হাতুড়ির মানুষও উপলব্ধি করিয়াছে – আমি শোষিত, আমি বঞ্চিত।

সাম্প্রতিক স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়া মওলানা ভাসানীর বিশ বৎসরের কথিত বক্তব্য যখন কৃষক- মজুরদের মধ্যেও খোলাসা হইয়া গেল তখন বর্ণচোরারা আবিষ্কার করিল, মওলানা ভাসানী সাম্রাজ্যবাদির এজেন্ট। একজন বিদেশী সাংবাদিকের একটি প্রশ্নের জবাবে মওলানা একদিন বলিয়াছিলেন, আমার জন্য জঘন্য অপরাধ হইতে পারে – আমি সাম্প্রদায়িক, আমি সাম্রাজ্যবাদের এজেন্ট। আওয়ামী লীগ লুটপাট করিয়া যাইবে– ভাসানী চুপচাপ থাকিবেন – নিশ্চয়ই শেখ মুজিবও জানেন মওলানার স্বভাবে তাহা নাই। যতই লুটপাট বাড়িতেছে, মওলানাও ততই সোচ্চার সঙ্গে সঙ্গে অপবাদের সাহায্যে মওলানাকে আক্রমণও ততই বাড়িতেছে।

মওলানা ভাসানীর জীবনে অপপ্রচার প্রচার পর্যন্তই থাকিয়া যাইবে। কারণ একটি চরকে কেন্দ্র করিয়া এক কালের আবদুল হামিদ খান হইয়াছেন মওলানা ভাসানী। তাহার জনপ্রিয়তা, তাহার শক্তি ষড়যন্ত্রপ্রিয় একশ্রেণীর শিক্ষিত সমাজে নহে, ইহা তিনি ভাল করিয়াই জানেন। তিনি বিশ্বাস করেন, বিদ্রোহী জনতার মিছিল তার পিছনে, সত্যপ্রিয় সাধক সেনা তাহার পাশে।

কলকী সমাচার

।। গাঁজাবাবা ।।

ভারতীয় প্রতিরক্ষা বিভাগের দমন

জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়াছে বলিয়া আমি থোড়াই কেয়ার করিয়াছিলাম, কিন্তু গঞ্জিকাও কিছু দুস্প্রাপ্য হইয়া গিয়াছে। মাত্র কয়েকদিন আগে এমনি এক দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্ত নামিয়া আসিল। আমার গাঁজা ফুরাইয়া গেল। বুঝিলাম ঘটিয়াছে 'বিষম বিপদপাত'। কি করি, হায় হায় কি যে করি। এমনি সময়ে গাঁজা চাচার কথা মনে পড়িল, ভাবিলাম উহাকে পাইলে যৎসামান্য মাল যোগাড় করা চলিত, কলকীটি জ্বলিত অত:পর হাড়ে লাগিত বাতাস। কিন্তু না পাইয়া উত্তরোত্তর আমার গোস্বা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। গোস্বা যখন চরমে উঠিয়াছে তখন পুরনো থলিয়া হইতে কিয়ৎপরিমাণ অমৃতব্য ধুম্রোদগারী দ্রব্য বাহির করিতে সক্ষম হইলাম। যখন দম খেঁচিলাম তখন মনে হইল বেটার রক্ত শোষিতেছি। কিন্তু অবহিত পরেই অমৃতধুম্র আমার অভ্যন্তরে প্রবেশ করায় আমার গোস্বা চিরতরে তিরোহিত হইয়া গেল।

এইবার মস্তিষ্কের অভ্যন্তরের কপাট খুলিতে লাগিল। ভেলকীর গ্যারাকলে শুনিতে পাইলাম 'উর্দ্ধে গাঁজা নিম্নে গাঁজা গাঁজা চারিধার, মধ্যে সারগর্ভ বেতার, ওদিকে চলে খানসেনা বধের নব ইশতেহার।'

গত বছর বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর অস্ত্রধারীরা কয়টি খানসেনা কতল করিতে পারিয়াছিল ইহা সঠিক আজরাইল আলায়হিস সালামের রেকর্ড ছাড়া আর কোথায়ও বৈজ্ঞানিক ভাষায় যাহাকে এ্যাকিউরেট সংখ্যা বলা হইয়া থাকে তাহা পাওয়া সম্ভবপর নহে। তথাপি আন্দাজের উপর বর করিয়া চলিতে থাকিলেও শতকরা সাড়ে বিরানব্বই মার্কা তফাৎ সংখ্যা বাহির হইবে বলিয়া এমনকি আমি এহেন গঞ্জিকাচরণসেবীও কল্পনা করি নাই। আমার নৌকা হিলম্যান গাড়ীর মতই পাহাড় বাইয়া আসে। কিন্তু ব্যাপার হইল এই গত বছর ইহার বাইয়া খানবধ পর্বের স্ট্যাটিসটিসটিকসের যে খতিয়ান আসিয়াছিল এই বছর ভারতীয় সরকারের লড়াই দফতর হইতে প্রকাশিত এক রিপোর্টে গাঁজার দাম বাড়িয়া যাওয়ায় উহার দুস্প্রাপ্যতার এবং হেতু বাহির হইয়াছে। রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে পাঁচ হাজার চারিশত মাত্র খানসেনাকে মুক্তিবাহিনীওয়ালারা কতল করিতে পারিয়াছিল। ভাবিলাম পাঁচ হাজার তিনশত নিরানব্বই নহে অথবা চারিশত একও নহে– বৈজ্ঞানিক এ্যাকিউরেট সংখ্যা নট ওভার অর বিলো ফাইভ ফোর ডবল জিরো। তাহা বাহির করা কিবং প্রকারে সম্ভব হইল? যুগপৎ মনে হইল ইথারে প্রেরিত সংখ্যা যাহা লইয়া রেডিও পাকিস্তান গত নয় মাস ধরিয়াই মসকরা খেল্ খেলিয়াছে। অতএব ইহার প্রেরিত সংখ্যা ও ডিফেনস ওজারতী কর্তৃক হিসাবকৃত সংখ্যার দুরত্ব মোটামুটি উপলব্ধির বস্তু। দুইটির ব্যবধান চিন্তা করিতে গিয়া মনে করিলাম সোনাভান বিবির কেচ্ছার জংগের কেজুয়েলিটির বিবরণও পুঁথিতে একই প্রকারে লেখা হইয়াছিল।

'লাখে লাখে লোক মরে কাতারে কাতার গুনিয়া বাছিয়া দেখে মাত্র এক হাজার'। তবে পুঁথি লেখা হয় নাই তাহা বুঝিতে পারিলাম মিনিষ্ট্রি অব ডিফেন্সের খবর বিধায়। তবে হইয়াছে কি? এই ভাবিতে ভাবিতে আমার গঞ্জিকা পিপাসা তীব্রতর হইলে যখন খুঁজিয়াও গাঁজা মিলিতেছিল না তখন হৃদয়ঙ্গম করিলাম তাহা কোথায় গিয়াছে গাঁজা লইয়া যাওয়ার। তাহাদিগের বিরুদ্ধেও অশ্রাব্য গালিগালাজ করিবার উপক্রম করিয়াছিলাম অমনি গত ডিসেম্বরে নিহত দু'একজন শিখ ভদ্রলোকের কথা মনে পড়িয়া গেল। অতএব যাহ্ বেটাকে ছাড়িয়া দিলাম। আমি সাজা পাইয়া সন্তুষ্ট হইলাম বলিয়াই আর বেশী কিছু বাড়াবাড়ি করিলাম না। জেনারেল আতাউল গনি ওসমানী সাহেব অবশ্য খুশী বা না খুশী কিছুই হই না। তবে হিসাব মাফিক হক -কথাটি বলিতেও ছাড়েন নাই। নাকের উপর মুখের উপর নাহক অন্ততঃপক্ষে ভারত সরকারের দেশরক্ষা দফতরের কথার উপর কথাটি নিয়াই ফেলিলেন যে, নিদেশপক্ষে পঁচিশ হাজার সিন্ধু নীলাব দেশী ইয়াহিয়া মার্কা মুসলমান বীর পুরুষগণের ওফাতকর্ম মুক্তিবাহিনীর জোয়ানেরা সমাধা করিয়া দিয়াছে।

এই পর্যন্ত যাহা কিছু বলিলাম খুব ইম্পর্টেন্ট ভাবিবার কিছুই নাই। তবে খেঁচা দমের পর ঝিম ধরিয়া বসিলে কয়েকটি অপ্রিয় হক- খাত বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করে। এই পর্যন্তই প্রতিবার বাংলাদেশের জনগণ ভারত সরকারের বন্ধুত্ব ও মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় নানাপ্রকার সাহায্য, রুশ প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর লিখিত অনুরোধধর্মী খেত ও তাহাদের ভেটোত্রয়, বিলাতী খবরী কাগজ পত্রগুলির সহানুভূতিপূর্ণ মতামতের কথা কৃতজ্ঞতা সহকারেই স্মরণ করিয়া আসিতেছে। অতএব বাংলাদেশবাসী জনগণ কি ইহা আশা করিবে না যে অন্যান্য দেশগুলিও মুক্তিফৌজের কাজকারবারের ব্যাপারে খর্ব করিয়া দেখিবে না? আর যদি তাহা না হয় আমি নিশাখোর মনে করিলাম দোস্তীর ভাল মেয় থোড়া কুচ কালাও থাকিতে পারে। সুস্থ দেশবাসীরা কি ভাবিলেন এখনও বলিতে পারিতেছি না।

আপনার চিঠি

সাহায্য বঞ্চিত ডিগ্রী ছাত্রদের দাবী

জনাব সম্পাদক সাহেব,

দেশ স্বাধীন হবার পর বাংলাদেশের শিক্ষামন্ত্রী এক আদেশে বলেছেন , যারা গত বছর ২৪ শে মার্চ পর্যন্ত ডিগ্রী পরীক্ষার ফরম-পূরণ করেছে, তাদের প্রত্যেককে ৬০.০০ টাকা

করে সাহায্য দেয়া হবে। আর যারা অনিয়মিত পরীক্ষার্থী, তারা আরো ১৩.০০ টাকা সাহায্য পাবে। আমরা যারা ২৫শে মার্চ দিনের বেলায় ফরম পূরণ করেছিলাম, তারা কোন অপরাধে এই সাহায্য পাবে না? কেননা, হানাদার বাহিনী আক্রমণ শুরু করেছিল ২৫ শে মার্চ রাত্রিতে। দিবালোকে ফরম-পূরণকারীদের তাহলে অপরাধ কোথায়?

শিক্ষামন্ত্রীর প্রতি তাই আমাদের দাবী, ২৫শে মার্চ পর্যন্ত ফরম- পূরণকারীদেরকেও সাহায্য দেয়ার ব্যবস্থা করুন।

সাহায্য-বঞ্চিত ছাত্রদের পক্ষে

মোঃ আইনুল হক

হাজী আসমত মহাবিদ্যালয়, ভৈরব, ময়মনসিংহ।

রবীন্দ্রনাথকে নব মূল্যায়নে পড়তে হবে

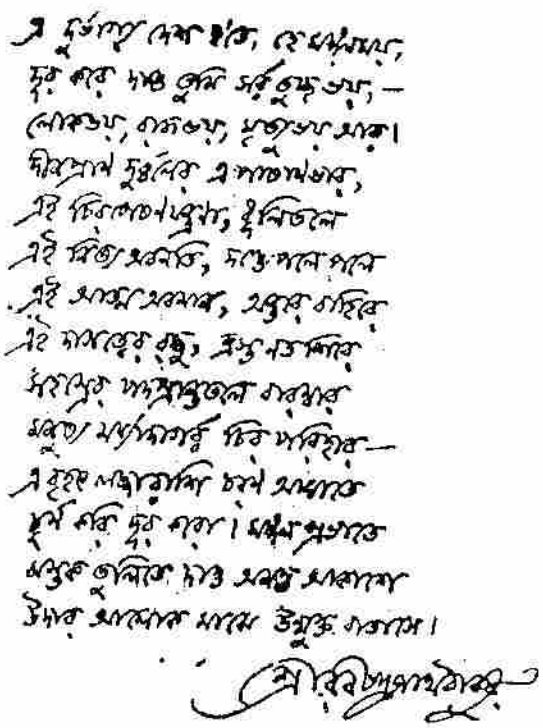
আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার
উঠে যতো ধ্বনি
আমার বাঁশীর সুরে, সাড়া তার
জাগিবে তখনি।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমগ্র রচনাবলীর মূল মর্মকথা উপরোক্ত লাইন দু'টিতেই বিধৃত। যেথা তার উঠে যতো ধ্বনি-এই যতো ধ্বনির মাঝেই একাধারে যেমন রয়েছে জীবন দেবতার লীলা, অতিন্দ্রীয় প্রেমের মোহাবেশ, লক্ষ যুগের প্রেমের স্রোতে ভেসে আসা যুগল হৃদয়ের মিলন-বিরহের আকুতি, অন্য দিকে তেমনি রয়েছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের দৃপ্ত চেতনা, যুগে যুগে লাঞ্ছিত মানবাত্মার উন্মোচিত হৃদয়ের কথকতা, বাংলাদেশের আবহমানকাল থেকে গড়ে উঠা সাংস্কৃতির উজ্জীবন। আর ঠিক সে কারণেই হয়তো প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের উদ্যত খড়্গ বার বার নেমে এসেছে রবীন্দ্র সাহিত্যের উপর।

ত্রিশ লক্ষ বাঙালীর উষ্ণ রক্তস্রোত ধারায় আমরা ধুয়ে ফেলেছি বাংলাদেশের পরাধীনতার মালিন্য। তাই রক্তের বিনিময়ে কেনা স্বাধীন বাঙলায় রবীন্দ্রনাথের নব মূল্যায়নের প্রয়োজন রয়েছে অবশ্যই। তার ভাববাদী রচনার ফাঁকে একটা উল্লেখযোগ্য রচনাই যে সাধারণ মানুষের উপর রচিত এ কথা এতো দিন যতো ভাবে ঢেকে রাখাই হোক না কেন আজ অবশ্যই তার আবিস্কারের প্রয়োজন রয়েছে।

রবীন্দ্র সাহিত্য অবশ্যই ভাববাদী। কিন্তু আজ থেকে বহু পূর্বেই একশ্রেণীর কট্টর সমালোচকদের উদ্দেশ্যে তিনি আশংকা প্রকাশ করেছিলেন যে বুর্জোয়া কবির সংসর্গদোষে হয়তো রবীন্দ্র সাহিত্য একদিন অপাংক্তেয় বিবেচিত হবে। কবির আশংকা সম্পূর্ণ সত্যে পরিণত না হলেও বর্তমান যুগের অসাহিত্যিক একচোখা সমালোচকদের হাতে পড়ে রবীন্দ্র সাহিত্যের বিকৃত সমালোচনা রবীন্দ্রনাথকে বিশেষ একশ্রেণীর বিলাসী পাঠকদের আয়েসী লেখক হিসেবে চিত্রিত করার অপপ্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।

কবি নিজে অনুভব করেছিলেন তার রচনা হয়তো বা বিলাসী পাঠকের ভোজের টেবিলে রসনা তৃপ্তির উপাদেয় ভোজ্য হয়েই থাকবে। তাই 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় তার আত্মপোলব্ধির পরিচয় হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো চকিত আভাসে দীপ্ত হল 'এবার ফিরাও মোরে লয়ে যাও সংসারের তীরে।' খেটে খাওয়া মানুষ যারা যুগযুগ ধরে সভ্য জগতের নিঃশব্দ অজান্তে সমাজের ভাঙ্গা-গড়ার পিছনে কাজ করে চলেছে অথচ ইতিহাসের পাতায় যারা কোনদিনই ঠাঁই পায়নি-তাদের আত্মদানের মহিমায় উঠে নাই কোন জয়স্তম্ভ। বিশ্ব কবির রচনায় বন্দিত হয়েছে সেই হতভাগ্যের দল-



"ওরা চিরকাল
টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল;
ওরা মাঠে মাঠে
বীজ বোনে পাকা ধান কাটে
ওরা কাজ করে
নগরে প্রান্তরে।
শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ' পরে
ওরা কাজ করে।"

সমাজে প্রতিনিয়ত অন্যায়ের উদ্যত চাবুকে ক্ষত বিক্ষত হচ্ছে ন্যায়ের মহিমা-বিচারের বাণী প্রতিকারহীন শক্তির অপরাধে নীরবে নিভৃত মাথা কুটে মরছে। তাই আবাল্য ঐশ্বরিক শক্তির কাছে সমর্থিত কবির বিক্ষুব্ধ হৃদয়ও বলতে পেরেছে-

"আমি যে দেখেছি প্রতিকারহীন
শক্তির অপরাধে
বিচারের বাণী নীরবে
নিভৃতে কাঁদে,
ভগবান সব প্রশ্নের
অতীত।"

কিন্তু ব্যথিত কবি তাকেই প্রশ্ন করেছেন-

"তাইতো তোমায় শুধাই অশ্রুজলে
যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু
নিভাইছে তব আলো
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছো
তুমি কি বেসেছ ভালো"

সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আজ সারা পৃথিবীর সংগ্রামী জনগণ সোচ্চার হচ্ছে- রবীন্দ্রনাথের আফ্রিকা কবিতায় সাম্রাজ্যবাদী নিষ্পেষনের বিরুদ্ধে যে ঘৃণা বর্ষিত হয়েছে তার তুলনা কই?

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন জমিদার লেখক। কিন্তু বাংলার আর দশজন জমিদারের মতো বাঈজী মহলের স্নিগ্ধ উত্তাপে কাটেনি তার দিন। তাই কখনো তাকে দেখা যেতো নিরক্ষর প্রজাদের মধ্যে লেখাপড়া চর্চ্চা প্রসারের কাজে নিয়োজিত, কখনো বা সমবায় পদ্ধতিতে চাষের কাজে প্রজাদের উৎসাহ দান করতে। আবার কখনো অসীম পদ্মার বুকে নিসর্গের শোভায় মুগ্ধ হয়ে সংগ্রহ করতেন সাহিত্যের উপাদান। তার গল্পগুচ্ছের গল্পমালায় বাংলার সাধারণ মানুষ, অতি তুচ্ছ ঘটনাও বিম্বিত হয়েছে। বাংলাদেশের অনেক সাহিত্যিক যারা অহরহ সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে আছে



যৌবনে

অথচ তাদের রচনায় পারিপার্শ্বিকতার ছাপ অনুপস্থিত। রবীন্দ্রনাথ সমাজের স্পন্দনকে অনুভব করতেন–স্বদেশবাসীর শুধু দিন যাপনের শুধু প্রাণ ধারণের গ্লানি তাঁকে পীড়িত করেছে– মূঢ়, ম্লান, ক্লান্ত মানুষের মিছিল তার কবি হৃদয়ে বেদনার সঞ্চার করেছিল বলেই তিনি আহ্বান করেছিলেন–এই সব মূঢ়, ম্লান, মূক মুখে দিতে হবে ভাষা। 'রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সুন্দরের ধেয়ানী কবি। যা কিছু কুৎসিত, অসুন্দর তার বিরুদ্ধেই তার লেখনী। বিরূপ সমালোচকগণ ভুলে যান অন্যায়, নির্যাতন, যা শোষণ, অসুন্দরের পর্যায়েই পরে।

বিশ্বকবি পৃথিবীর দিকে চোখ বুজে থাকেননি। বরং তিনি ছিলেন দারুণভাবে সমাজ সচেতন। এই সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায় জালিয়ানওয়ালা বাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে। পরিচয় পাওয়া যায় পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ রাশিয়া ভ্রমণের প্রামাণ্য পুস্তক 'রাশিয়ার চিঠির' ছত্রেছত্রে। তদানিন্তন অনেক সাহিত্যিকের মতো তিনি এই নতুন দেশের নতুন সমাজ ব্যবস্থার প্রতি ভ্রূ-কুচকে তাকাননি বরং বলেছেন রাশিয়ায় না এলে আমার এ জীবনে তীর্থভ্রমণের আশা অপূর্ণ থাকতো। ভাবতে আশ্চর্য্য লাগে সমাজের একটি বিশেষ উঁচু শ্রেণীতে জন্ম নিয়ে বিলাসের জীবনযাপন করেও রবীন্দ্রনাথ সমাজের নীচু তলার কৃষক শ্রমিকের রাষ্ট্রকে তীর্থের সঙ্গে তুলনা করতে পেরেছিলেন। নির্যাতিত মানুষের প্রতি কতটা গভীর মমত্ববোধ থাকলে এটা সম্ভব তা সহজেই অনুমেয়।

বাংলাদেশ আজ স্বাধীন। পাক আমলে প্রতিক্রিয়াশীল চক্র রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীকে নানা অপবাদে বার বার আক্রমণ করেছে। স্বাধীন দেশে এর অবসান অবশ্যই হওয়া উচিৎ। রবীন্দ্রনাথের মানবিক আবেদনে সমৃদ্ধ রচনা থেকে বাঙালীকে আর বঞ্চিত রাখা চলবে না। বিশ্বকবির কতিপয় শিশুপাঠ্য কবিতা তরুণ ছাত্রসমাজের পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করার প্রবৃত্তি এবার ত্যাগ করতে হবে। রবীন্দ্রনাথকে পড়তে হবে, জানতে হবে, স্বাধীন বাংলায় রবীন্দ্র সাহিত্যের নব মূল্যায়ন করতে হবে অবশ্যই। নির্যাতিত,শোষিত মানুষের দুয়ারে পৌঁছে দিতে হবে তার কবিতার ফসল।

চাঁদার হার

বাৎসরিক নয় টাকা

ষান্মাষিক পাঁচ টাকা

মুরিদের দরবার

হযরত মোহাম্মদ

নেপোলিয়ন বোনাপার্টি

মোহাম্মদের এমন এক প্রবল ব্যক্তিত্ব ছিল–যাতে লোকেরা সহজেই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হতো। ফলে তাঁর ডাকে দলে দলে লোক এসে জমতে লাগলো এবং অল্পদিনের মধ্যেই এমন এক সম্প্রদায় গড়ে উঠলো–যারা অল্প বছরের মধ্যে অর্ধ পৃথিবীতে ইসলামের বিজয় নিশান উত্তোলন করলো এবং পৃথিবী থেকে নাস্তিকতা তথা মিথ্যা খোদাদের মুছিয়ে দেবার ব্রত নিলো। মুসা এবং ঈশার অনুসৃতের দল পনের শত বছরে যতটুকু না তাদের ধর্মকে বিস্তার করতে পেরেছে, এরা শুধু পনের বছরে তা করে ফেলল। এবং এই সমুদয় উন্নতির একমাত্র কারণ মোহাম্মদের মহান ব্যক্তিত্ব।

পারসী, সাখীন, মংগোল, তাতারী এবং তুর্কী জাতিদের দেখে মনে হয় তারা আগে জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং শিল্পকলার ঘোর দুশমন ছিল। অথচ আরবরা সেই প্রথম থেকে শিক্ষা সংস্কৃতির অনুসন্ধানে নিমগ্ন। তখন ঘোর পৌত্তলিকতার পরিবেশও কাব্য সাহিত্যে দেদার প্রচলন ছিল। অথচ মোহাম্মদের শিক্ষা ও জ্ঞানসন্ধিৎসু প্রীতি সম্পর্কেও কোন লোকই বিরূপ মন্তব্য করতে পারল না। প্রথম উমাইয়া খলিফা মাবিয়াকে দেখো। জ্ঞানী-গুণি কবি সাহিত্যিকদের প্রতি তাঁর যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। একবার এক ধৃত ইহুদী পণ্ডিত তাঁর দরবারে আনীত হলেন। পণ্ডিত খলিফাকে আরবীতে খুব সুন্দর কয়েক চরণ কবিতা পাঠ করে শোনালেন। খলিফা তাতে মুগ্ধ হয়ে তাকে ক্ষমাযোগ্য বলে আখ্যায়িত করেন। খলিফার পুত্র এজিদও যথেষ্ট কাব্যানুরাগী ছিলেন। হারুনুর রশীদ এবং মামুনও প্রকৃত শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁরা সাহিত্যে এত অনুরাগী ছিলেন যে, দরবারে সাহিত্যের পরিবেশ সৃষ্টি করতেন এবং হামেশা শিক্ষা নবীশদের সাহচর্যে কাটাতেন। তাঁরা ল্যাটিন, গ্রীক জ্ঞান বিজ্ঞান সম্ভারকে আরবীতে ভাষান্তরিত করেছেন। এরা সে লোক যারা এলায়েড, উডেসী এবং একলিদাসের অনুবাদের ব্যাপক প্রচলন করেন। তাঁরা যে সব শিক্ষাগার স্থাপন করেন তাতে চিকিৎসা-বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা এবং নানা বিষয় শিক্ষা দেওয়া হতো। অংকবিশারদ আহমদ বটলিমুসের সূত্রকে সংস্কার করেন। আব্বাস অংকশাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন। মুসলিম বৈজ্ঞানিকরাই সর্বপ্রথম সানা থেকে কুফা অবধি দূরত্বকে মেপেছেন। তাঁরা রসায়নশাস্ত্রেরও গবেষণা করতেন। যার ফলে 'আলায়িক' আবিষ্কার সম্ভব হয়। তাছাড়াও রৌদ্র ঘড়ি, ঘন্টা, নির্ণয়, অংকশাস্ত্র এবং সংখ্যা বিজ্ঞানের তাঁরাই মূল উদ্যাক্তা। আজকের বিজ্ঞান জগৎ তাঁদের কাছে ঋণী।

কিন্তু এসব আবিষ্কার ছাড়াও যেটা তাঁদের সবচেয়ে উল্লেখ্য তা হচ্ছে তাদের জীবনব্যবস্থা সাহিত্য এবং বিজ্ঞান। তাদের কাব্যে আছে উদ্দামতা, উদারতা। মোহাম্মদ ছিলেন বিদ্যার্থীদের প্রেরণাস্থল। তিনি জ্ঞান-গরিমাকে জাগ্রত করেছেন এবং বুদ্ধিবৃত্তির সীমারেখাকে প্রশস্ত করেছেন। যার ফলে আজ কায়রোর

পুস্তকাগারে শুধু জ্যোতির্বিদ্যাই দু'হাজার গ্রন্থ এবং অন্যান্য শাস্ত্রে এক লক্ষ গ্রন্থ রয়েছে। কর্ডোভার লাইব্রেরীতেও বিভিন্ন তিন লক্ষ বিখ্যাত গ্রন্থাবলী মওজুদ আছে। মোট কথা, মুসলমানেরা পাঁচ'শ বছরে জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক বিরাট সম্ভার সংযোজিত করেছে এবং তাঁদের এই প্রচেষ্টা যখন চরম সাফল্যের গরিয়ান হয়ে উঠেছে এমন সময় চেঙ্গিস তাঁর ধ্বংসলীলা হাতে নিয়ে এলেন।

মোহাম্মদ মানুষের স্ত্রী গ্রহণ সংখ্যা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এর আগে বিয়ে শাদীতে কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না। যার যতো ইচ্ছা স্ত্রী রাখতে পারতো। কিন্তু মোহাম্মদ এসে এই নীতি উল্টে দিলেন। আসলে পুরুষের চেয়ে মেয়েদের জন্ম যেহেতু কম, সেহেতু স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে, মোহাম্মদ কেন এক্ষেত্রে পাশ্চাত্য নিয়মকে মেনে নিলেননা। কারণ, তারা একাধিক স্ত্রী রাখতে পারতো না। তখন গ্রীক, জার্মানী, রোম, স্পেন এবং ইংল্যান্ড সর্বত্রই একের বেশী স্ত্রী রাখা অবৈধ ছিল। অথচ প্রাচ্য জগতে ইহুদী, আছুরি, ইরানী, তাতারী বা আফ্রিকী কারোই স্ত্রী সংখ্যা নির্ধারিত ছিল না, এখন এই পূর্ব-পশ্চিমের পার্থক্য সম্পর্কে কেউ বলেন, ভৌগলিক পার্থক্যই এসবের কারণ। আসল কারণ তা নয়।

এশিয়ায় এবং আফ্রিকায় বিভিন্ন বর্ণের লোকের বাস। অথচ তারা বৈষম্যহীন সম্পর্ক নিয়ে বসবাস করে। এবং একাধিক স্ত্রী গ্রহণ নীতিও তাদের এই বৈষম্যের নিরসনকারী। কারণ, একাধিক স্ত্রী যুক্ত পরিবারের একই বাপের বিভিন্ন রংয়ের সন্তান হয় এবং সাদা কালো উভয়েরই ভাই বোন হয়, আর তারা একান্নভুক্ত পরিবারে থাকে এবং সামাজিক ক্ষেত্রে কালোর উপর সাদার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় না। এসব ভেবেই মোহাম্মদ চার স্ত্রীর অনুমতি রেখেছেন, যাতে বিশেষ করে বর্ণ-বিদ্বেষ মিটে যায়। এরপর প্রশ্ন জাগে–মেয়েরা সংখ্যায় যখন কম চারজনই বা কি করে নির্ধারণ করলেন। কিন্তু একটা বিষয় চিন্তা করো। একাধিক স্ত্রী ভোগ তো সাধারণতঃ ধনী লোকরাই করতে পারে। এবং তারাই সমাজের উপরের স্তরের লোক। এবং তারাই সমস্যার সমাধানকারী। তাই তাদের এ বিয়ে বর্ণবৈষম্য মিটানোর পক্ষে বিশেষ ফলপ্রসূ। আমরা (ফ্রান্সবাসী) যদি নতুন বিজিত (মিসর এবং উত্তর আফ্রিকা) লোকদের স্বাধীনতা দিয়ে তাদের বর্ণ বৈষম্য দূর করার মত পোষণ করি তাহলে আমাদের আইন প্রণেতাদের একাধিক বিয়েতে সম্মতি দিতে হবে।

এছাড়া প্রাচ্যের দাসত্ব নীতিও অনেকাংশে বৈষম্যহীন। বাইবেলের বর্ণনা মতে জানা যায় দাস প্রভুর সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার পেত। এমনকি প্রভুর মেয়েকে বিয়েও করতে পারতো। অধিকন্তু পাশা (মিসর নেতা) দাস সম্ভূত। বড় বড় মন্ত্রী, মিসরের বহু সুলতান, আলিবীন মুয়েদ, হুব প্রমুখ সবাই দাস। এদের অধিকাংশই প্রথমতঃ মালিকদের কাছে মামুলী দাস হিসেবে নিয়োজিত হয়ে অধ্যবসায় ও সততাগুণে বা করুণাপ্রাপ্ত হয়ে এসব পদে উন্নীত হয়েছেন। অথচ পাশ্চাত্য দাসত্ব নীতির স্বরূপ বড় নির্মম। দাসদের সাথে এরা যে জাতীয় ব্যবহার করে তা একান্তই নিকৃষ্ট পর্যায়ের, তাঁরা দাসদের স্বাধীন করেও দেয় কিন্তু তাদের স্বাধীনতা আসে না।

অতএব আমার বিশ্বাস, সেই দিন আর দূরে নেই যখন আমি জ্ঞানী-গুণীদের একত্র করে এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করবো যা এক রং–এক ধ্বনি এবং কোরআনের নীতি ভিত্তিক হবে। কারণ, আমি দেখেছি কোরআনের নীতিই সত্য এবং কোরআনই মানুষকে শান্তির পথে নিয়ে যেতে পারে।

শিবপুর থেকে টঙ্গী ২

বিভিন্ন সম্মেলন এবং সভা সমিতির মধ্য দিয়ে মওলানা ভাসানী পাক-ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের পাশাপাশি দেশীয় সামন্ত প্রভুদের বিরুদ্ধে কৃষকদের সংগঠিত করারও একটা প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছিলেন। মওলানা ভাসানীর স্বাধীনতা সংগ্রাম ছিল গরীব দুঃখী বিশেষতঃ গ্রামাঞ্চলের খেটে খাওয়া কৃষিজীবি মানুষের স্বাধীনতার সংগ্রাম। রাজনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার প্রত্যাশী ছিলেন বলেই পাকিস্তানের জন্ম হওয়ার এক বছরের মধ্যে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে তিনি গঠন করেছিলেন পাকিস্তানের প্রথম বিরোধী দল আওয়ামী মুসলিম লীগ।

পাকশী, সন্তোষ, মহীপুর, শিবপুর, টঙ্গী-একই সূত্রে গাঁথা

মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের গণবিরোধী চরিত্র এবং সাধারণ মানুষের উপর নির্মম শোষণের বিরুদ্ধে দেশের জনসাধারণকে নেতৃত্ব দেয়ার জন্যে তিনি প্রয়োজনবোধ করলেন একটি বিরোধী দলের। মওলানা সাহেব শুধুমাত্র ছাত্র এবং বুদ্ধিজীবিদের উপর তার সংগঠন এবং আন্দোলনকে নির্ভরশীল না রেখে তার চরিত্র্যের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ব্যাপক কৃষক আন্দোলনের প্রস্তুতিও নিলেন। দীর্ঘ বহু বছর যে জমিদারী প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়েছে সেই সামন্তবাদী শোষণের প্রধান উৎসটিকে উচ্ছেদের জন্য আওয়ামী লীগের নির্বাচনী মেনিফেষ্টোতে জমিদারী প্রথার অবসানের আশ্বাস মওলানা ভাসানীরই দীর্ঘদিনের কৃষক আন্দোলনের অভিজ্ঞতার ফসল।

আওয়ামী লীগ নির্বাচনে জয়ী হলেও আরও অনেক দাবীর মতোই বিনাখেসারতে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের ব্যাপারেও গোঁজামিলের আশ্রয় নিল। জমিদার শ্রেণী খেসারতের বিনিময়ে উচ্ছেদ হলেও স্বয়ং সরকারই জমিদার সেজে বসলেন এবং সরকারী কর্মচারীদের অত্যাচার, খাজনার হার এবং অন্যান্য দুর্নীতি এমনভাবে বেড়ে গেল যে দিশেহারা কৃষককুল কোন কোন ক্ষেত্রে ভাবতে বাধ্য হল যে জমিদারী প্রথাই বুঝি ঢের ভাল ছিল। ফলে মওলানাকে নতুন করে কৃষক আন্দোলনে নামতে হল। রাজনৈতিক দল হিসেবেও তখন আওয়ামী লীগ ত্যাগ করেছেন তিনি । ফলে কৃষক আন্দোলনের প্রতি সম্পূর্ণ মনোযোগ দেয়া সম্ভব হল না – নতুন গণসংগঠন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সাংগঠনিক কাজেই ব্যস্ত থাকতে হল তাকে। এরপর আয়ুবের কালোদশকে দু'একটি কৃষক সম্মেলন ও সভা ছাড়া কৃষকদের মাঝে কাজ তেমন এগোয়নি। অবশ্য মস্কোপন্থী নেতৃবৃন্দের হাত থেকে কৃষক সমিতিকে এসময়েই মুক্ত করা হয়। সংশোধনবাদী নেতৃবৃন্দ সুকৌশলে কৃষক সমিতির সংগ্রামী ভূমিকার গতিকে মোড় ঘুরিয়ে সামান্য দাবী-দাওয়া ভিত্তিক সংগঠনে পরিণত করার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে তখন থেকেই কৃষক সমিতির নামে পাল্টা সংগঠন গড়ার দুঃস্বপ্ন দেখতে শুরু করল।

মস্কো নেতৃবৃন্দের হাত থেকে উদ্ধার পেলেও মওলানার সঙ্গে কাজ করছে এমন বামপন্থী নেতৃবৃন্দ কৃষক সমিতির কাজে সুচতুর ভাবে বাধার সৃষ্টি করে যেতে থাকল। এই বামপন্থী নেতৃত্ব যেহেতু কয়েকটি উপদলে বিভক্ত ছিল সেইহেতু প্রতিটি উপদলের নেতৃবৃন্দই যার যার ঘাঁটি এলাকায় নিজস্ব কায়দায় কৃষক

সমিতিকে গঠন ও পরিচালনা করে 'ভাইবাদ জিন্দাবাদের -মহরার' ব্যস্ত হয়ে কৃষক সমিতির প্রধান লক্ষ্যের প্রতি বাধা হয়ে দাঁড়াল। মওলানা ভাসানী দলীয় শৃঙ্খলা এবং ঐক্য রক্ষার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা নিলেও উপদলীয় চক্রান্তে বারবার সংগঠনের উপর দুর্যোগ নেমে এসেছে। বিভিন্ন সম্মেলনেও লক্ষ্য করা যায় এই উপদলীয় কোন্দলের ভয়াবহতা।

পাকশী সম্মেলনের আয়োজন ও প্রচারে জঙ্গীত্ব থাকলেও সম্মেলনের সময় এর নানাবিধ ত্রুটি এবং দুর্বলতা ভবিষ্যতের জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে রইল। বিভিন্ন বামপন্থী গ্রুপের হানাহানির চরম প্রকাশও এই সম্মেলনের একটি অন্ধকার দিক। পরপর দুটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় যথাক্রমে সন্তোষ এবং মহীপুরে। পাকশী সম্মেলনের ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা গ্রহণের ফলে এই দুটি সম্মেলন মোটামুটি সফল হলেও সুস্পষ্ট বক্তব্য গ্রহণের দিক থেকে কাজ বেশীদূর এগুতে পারেনি। তবে মওলানা ভাসানীর কৃষক-শ্রমিক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী তৈরীর ঘোষণায় লক্ষাধিক লালটুপী বাহিনীর সদস্য সংগ্রহের ফলে এবং দুর্নীতি বিরোধী জুন আন্দোলনের মাধ্যমে সমগ্র বাংলাদেশের রাজনীতিতে একটা অভূতপূর্ব কৃষক জাগরণের ঢেউ লক্ষ্য করা যায়।

ভাসানীর নেতৃত্বে বিরোধী দল চাই

-কাজী জাফর

গত ৮ই মে বাংলাদেশ বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন, টাঙ্গাইল জেলা শাখার উদ্যোগে আয়োজিত এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বাংলা শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি কাজী জাফর আহমেদ মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে শক্তিশালী বিরোধী দল গঠনের আহ্বান জানিয়েছেন।

সমাজতন্ত্রের নামে ধোঁকাবাজি বন্ধ করে তিনি সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও শ্রমজীবি মানুষের মালিকানা প্রতিষ্ঠা করে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র কায়েমের আহ্বান জানান। মুজিব সরকারের মন্ত্রী, এমসিএ, ও কল-কারখানার আওয়ামী প্রশাসকদের ঘুষ ও দুর্নীতি এবং শ্রমিক লীগের গুণ্ডামীর উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আহ্বান জানিয়ে শ্রমিক নেতা কাজী জাফর বলেন, 'আপনারা লোকদের ঘুষ-দুর্নীতি ও গুন্ডামী বন্ধ করতে ব্যর্থ হলে আমরা গ্রামে গ্রামে সংগ্রামের দুর্গ গড়ে তুলবো।'

ভারত বাংলাদেশের বাণিজ্য ও তথাকথিত সৌহার্দ চুক্তির সমালোচনা করে কাজী জাফর বলেন, 'আমরা বন্ধুত্ব চাই – প্রভুত্ব নয়। এদেশে আমরা বন্ধুত্বের নামে মারোয়াড়ী পুঁজিপতিদের রাজত্ব কায়েম করতে দেব না।'

মওলানা ভাসানী এবং বামপন্থীদের বিরুদ্ধে কুৎসা ও অপপ্রচারের তীব্র নিন্দা করে তিনি স্বার্থন্বেষী মহলের বিরুদ্ধে কঠোর সাবধানবাণী উচ্চারণ করেন।

চার হাজার কোটি টাকার বিদেশী পুঁজি জাতীয়করণ না করার তীব্র সমালোচনা করে কাজী জাফর বলেন, 'এদেশে সাম্রাজ্যবাদের নির্লজ্জ দালালী বরদাশত করা হবে না।' তিনি প্রসঙ্গত পুঁজিপতিদের ক্ষতিপূরণ দিয়ে কলকারখানা জাতীয়করণেরও বিরোধিতা করেন।

মীর্জা গোলাম সরোয়ারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তৃতা করেন জেলা বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের যুগ্ম আহ্বায়ক খন্দকার নাজিম উদ্দিন ও ঘোড়াশাল আঞ্চলিক শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি জনাব মাইনুদ্দিন ভূঁইয়া।

বেয়াদবী

প্রধানমন্ত্রীত্বের চতুর্থ মাসে বিগত ৬ই মে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদের আজীবন সদস্যপদ পেতে গিয়েই সম্ভবত: শেখ সাহেবকে দ্বিতীয়বারের মতো অপদস্থ হতে হয়েছে। প্রথম ঘটনাটি ঘটেছিল মোমেনশাহীর জনসভায়: বিশাল জনসমুদ্রে রিলিফের কম্বল-প্রার্থীদের হাত উঠাতে বলা হলে কোন হাতই ওঠেনি; বরং কারা কম্বল পায়নি জানতে চাওয়া হলে উঠেছিল সকলের হাতই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনাটি আরো চমকপ্রদ: ছাত্র সমাবেশে বক্তৃতা প্রসঙ্গে ডাকসু সহসভাপতি জনাব আ স ম আবদুর রব 'মুজিববাদ' নয়, মার্কস- এঙ্গেলস ও লেনিনবাদের ভিত্তিতে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র কায়েমের 'নতুন সংগ্রাম' শুরু করার জন্যে ছাত্র-জনতার প্রতি আহ্বান জানালে একদল ছাত্র 'মুজিববাদ -জিন্দাবাদ' শ্লোগান দিতে শুরু করেন। উপস্থিত ছাত্রদের বৃহত্তম অংশ সাথে সাথে সোচ্চার হয়ে উঠেন পাল্টা শ্লোগানে : 'মুজিববাদের ব্যাখা চাই', 'মুজিববাদের অপর নাম - সুবিধাবাদ, সুবিধা বাদ', "মুজিববাদ না সমাজবাদ–সমাজবাদ-সমাজবাদ।"

পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করলে শেষে শেখ সাহেবকেই হস্তক্ষেপ করতে হয়। ঘটনার বিবরণী পত্রপত্রিকায় ছাপা না হলেও, প্রকাশিত হয়েছে, ছাত্রসমাজের উদ্দেশ্যে ঘটনাপরবর্তী প্রধানমন্ত্রীর রাগান্বিত বক্তব্যটি 'বেআদবী' করে জনগণকে নেতৃত্ব দেয়া যায় না। মেহেরবাণী করে আদব-কায়দার দিকে একটু নজর দিন।'

সাক্ষী

দৈনিক সংবাদপত্রে পাঠক মহল টাঙ্গাইলের অদূরে গত ৮ই মে সংঘঠিত যে মর্মান্তিক বাস দুর্ঘটনার খবর পড়েছেন ঘটনাক্রমে মওলানা ভাসানী এর প্রত্যক্ষদর্শী। ময়মনসিংহ থেকে তিনি ফিরছিলেন। ঘটনাস্থল থেকে তিনি যখন মাত্র শ পাঁচেক গজ দূরে তখনই দুর্ঘটনাটি ঘটে। প্রায় শতেক হতাহত দেখে মওলানা সাহেব এ্যাম্বুলেন্স ও ডাক্তারের ব্যবস্থা করতে দ্রুত টাঙ্গাইল আসেন। তিনি নিজে ডেপুটি কমিশনার ও সিভিল সার্জনের অফিসে এবং দুটি হাসপাতাল এমনকি থানার পর্যন্ত খবর দিতে ও উদ্ধারের ব্যবস্থা করতে ধর্ণা দেন। প্রশাসনিক কর্তাদের সব্বাই সফররত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পিছনে থাকায় অবশেষে সিভিল সার্জন সাহেবের উদ্যোগে এবং জনসাধারণের স্বত:স্ফূর্ত ব্যবস্থায় হত ও আহতদের হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়।

ইহা কি সত্য?

॥ ৫০ ॥

ব্যাপারটি জামাই-শ্বশুরে। শ্বশুর না হলেও জামাই বিখ্যাত অর্থাৎ চার কুতুবের একজন। পাকিস্তানী আমলে শ্বশুর ছিলেন প্লানিং বিভাগের একজন সেকশন অফিসার। জামাই কুতুবের কেরামতিতে প্রথমে ডেপুটি সেক্রেটারী, পরে জয়েন্ট সেক্রেটারী এবং পরপরই আণ্ডার সেক্রেটারী হয়েছেন। না তিনি দেশে লড়েছেন, না হিজরত করেছিলেন। কিন্তু দু'শ অফিসারকে ডিঙ্গিয়ে প্রমোশন তার চলছে।

॥ ৫১ ॥

প্রধানমন্ত্রীর একজন ভাগ্নে কয়েকখানা গাড়ী হাইজ্যাক করে ড্রাইভিং শিখেছেন। বর্তমানে তিনি যে গাড়ীটি চালাচ্ছেন তাও হাইজ্যাক করা। গাড়ীটির নম্বর ঢাকা খ- ২৬৫৯। তার প্রতাপে কলোনিটি তটস্থ। তাই সবার কানে

আঙ্গুল। প্রধানমন্ত্রীর ভাগ্নের কাণ্ড কোথাও কি বলা যায়!

॥ ৫২ ॥

সিলেটের এমসিএ জনাব দেওয়ান ফরিদ গাজীর বিরুদ্ধে জনৈক চিত্তরঞ্জন ধর একটি মামলা দায়ের করেছেন। ইতিপূর্বে চিত্ত রঞ্জনের ভগ্নিপতি ধীরেন্দ্রকুমার ধরের ঘর-বাড়ী লুট হয়ে যায়। লুটপাট সম্পর্কে চিত্তরঞ্জন যে সাক্ষ্য দেন তাতে এমসিএ সাহেবের পিলে কেঁপে উঠে। তিনি গুণ্ডা লেলিয়ে চিত্তবাবুকে বেদম মারধর করান এবং প্রদত্ত সাক্ষ্য তুলে নিতে চাপ দেন। কিন্তু সিদ্ধান্তে অটল থাকতে এমসিএ-র নির্দেশে চিত্তরঞ্জন ধরকে হাজতে নিয়ে আসা হয়।

॥ ৫৩ ॥

ময়মনসিংহে প্রদত্ত প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ বাংলাদেশ বেতারে প্রচার করা হয়েছিল। কিন্তু তা থেকে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় ইচ্ছা করে বাদ দেয়া হয়েছে। শেখ সাহেব জনতার নিকট জানতে চান তারা রিলিফ পেয়েছেন কিনা। নেতিবাচক জবাব এলে তিনি দুঃখ প্রকাশ করে সংশ্লিষ্ট দোষী ব্যক্তিদের গালিগালাজ করেন। সাবধানী চাকুরীজীবি এই অংশটুকুই বাদ দিয়েছেন।

॥ ৫৪ ॥

এসেসমেন্ট ফরমে ময়মনসিংহের শতকরা পঞ্চাশ জন অধিবাসী যে আলীজান বেপারীকে দালালী ও লুটপাটের অভিযোগে অভিযুক্ত করেছেন জনৈক এমসিএ ঘুষ খেয়ে তাকে জামিনে মুক্তি দিয়েছেন। জামিন দেয়ার রেওয়াজ আর কারো ক্ষেত্রে খাটেনি কিন্তু আলীজানের কপালে জুটেছে।

॥ ৫৫ ॥

গত এপ্রিল মাসের তৃতীয় সপ্তাহে ৫ জন যুবক স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র, গ্রেনেড এবং মদের বোতল নিয়ে ঢাকা থেকে সোজা কিশোরগঞ্জের গুরুদয়াল কলেজ প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে। তারা ধৃত এক দালালকে মুক্ত করতে এসেছে বলে জানায় এবং প্রধানমন্ত্রীর সিকিউরিটি গার্ড বলে পরিচয় দেয়। সন্দেহ করে ছাত্ররা তিনজনকে পাকড়াও করে হাজতে রাখলে সত্যি সত্যিই ঢাকাস্থ বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও বাংলাদেশ রাইফেলস অফিস থেকে তাদেরকে ছেড়ে দিতে টেলিফোনিক নির্দেশ যায়। বাধ্য হয়ে থানা কর্তৃপক্ষকে তা রক্ষাও করতে হয়।

॥ ৫৬ ॥

ময়মনসিংহের মুক্তিযোদ্ধা বলে পরিচিত বাচ্চু মিঞা আজ কারাগারে। অপরাধ, তিনি দালালদের নিকট থেকে টাকাপয়সা আদায় করেছেন। ব্যাপার তাই বটে। কিন্তু ঘটনার নায়ক আসলে ভারতীয় মেজর প্রীজ। তারই নির্দেশে দালাল জুটিয়ে আনত বাচ্চু। আর দুজনে আদায় করত অর্থ। সিংহভাগ মেজর প্রীজ বাগিয়ে ভেগেছেন, তা বলাই বাহুল্য।

॥ ৫৭ ॥

স্থান– ধনবাড়ী (টাঙ্গাইল) থানাধীন সাত্তার কান্দি গ্রাম। তারিখ ১লা মে।

হিন্দুর মাল লুট করে কালু ফকির পাক আমলে বড় হয়ে উঠেছিল। স্বাধীনতার পর গ্রাম্য বিচারে সব মালিককে বুঝিয়ে দিতে হয়েছে। কিন্তু সেদিন এখানকার প্রভাবশালী হিন্দু পরিবারভুক্ত কতিপয় যুবক তার বাড়ী আক্রমণ করে। তাকে না পেয়ে ঘরে রাখা কোরানশরীফকে জনসমক্ষেই অবমাননা করে। ঘটনাটা তড়িৎগতিতে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। যুবকদের অভিভাবকগণ মারমুখী জনতার নিকট সব স্বীকার করলেও উত্তেজনা অব্যাহত রয়েছে।

সম্পাদক ঃ সৈয়দ ইরফানুল বারী, সন্তোষ, টাঙ্গাইল। মুদ্রণে–শান্তি প্রেস, টাঙ্গাইল।

প্রতি কপি বিশ পয়সা সাপ্তাহিক রেজিস্টার্ড নং-ডি এ ১৭৬

হক-কথা

(WEEKLY THE HAQ-KATHA)

প্রকাশক ও পৃষ্ঠপোষক ঃ মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

প্রথম বর্ষ ১২শ সংখ্যা শুক্রবার ৫ই জৈষ্ঠ্য ১৩৭৯; ১৯ শে মে, ১৯৭২; ৬ই রবিউসসানি ১৩৯২; সন্তোষ, টাঙ্গাইল

অনাহারে মানুষ মরছে

পরপর কয়েক মাসের ব্যবধানে ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং পাকহানাদার বাহিনীর হাতে বাংলাদেশের প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ লোক প্রাণ হারিয়েছেন। ফলে সেই সময় মৃত্যু যেন এই দেশের একটা অতিসাধারণ ঘটনায় পরিণত হয়েছিল। স্বাভাবিক মৃত্যু বাদ দিয়ে এই অস্বাভাবিক মৃত্যুর সংখ্যা বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের গা' সহা হয়ে গিয়েছিল। তাই তখন মৃত্যুর সংবাদে কথায় কথায় কেউ আর আঁতকে উঠতো না। কিন্তু সেই মৃত্যু তো সাধারণ মৃত্যু ছিল না। প্রথমটি ইতিহাসের এক ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং অপরটি মাঝে মাঝেই অনেক সংবাদের পাশাপাশি ছাপা হচ্ছে অনাহারে মৃত্যুর সংবাদ।

অনেক রক্তের নদী পেরিয়ে গ্রথিত স্বাধীন দেশের মাটিতে গণসমর্থিত সরকারের শাসনামলে কৃষক-শ্রমিক রাজ কায়েমের উল্লাসধ্বনির যুগে অনাহারে মানুষের মৃত্যু হওয়ার সংবাদ একটি স্বাধীন সভ্য জাতি এবং তার সরকারের জন্য কতটুকু নাজুক এবং ধিক্কারের গ্লানি বয়ে আনতে পারে সামান্য আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন মানুষই তা অনুভব করতে পারবেন। আর সবচেয়ে দুঃখজনক অথচ নির্মম সত্য যে ঘটনাটি ঘটছে তা'হল

প্রতি ৪৮ ঘন্টায় ১ জনের আত্মহত্যা

সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীর স্বাধীনতাস্পৃহার ফলশ্রুতি মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ঘটনা। কিন্তু স্বাধীন দেশে স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে অস্বাভাবিক মৃত্যুগুলোর সঙ্গে উপরোক্ত মৃত্যুর কোন তুলনা চলে না। দেশ স্বাধীন হয়েছে। মানুষ আবার শান্ত পরিবেশে নতুন করে জীবন শুরু করার আগ্রহে অধীর। অথচ ঘটছে তো ঘটছে বেঁচে থাকার আগ্রহের বিরুদ্ধে মৃত্যুর হিমশীতল স্পর্শের জয়। সরকারী পরিচালনাধীন পত্রিকাগুলোর পাতায়ও তাই এই অনাহারে মৃত্যুর সংবাদকে গোটা জাতিই যেন বিনা প্রতিবাদে মুখ বুজে গ্রহণ করে নিচ্ছে। সামান্যতম কোন প্রতিবাদের গুঞ্জন, কোন আত্মসচেতন মানুষের ধিক্কার অথবা শোষক শ্রেণীর কোন গ্লানি অনুভবের কিছু

হক-কথার আগামী সংখ্যায় বিশেষ আকর্ষণ ঃ মওলানা ভাসানী কেন এবং কিভাবে ভারতে গেলেন।

মাত্র আভাস আমরা পাচ্ছি না। যেন বিংশ শতাব্দীর এই গৌরবময় যুগেও মানুষের না খেয়ে মরাটা খুবই স্বাভাবিক।

অথচ মাত্র বৎসরকাল আগেও না খাওয়া অনাহারী মানুষের একটা ভুখা মিছিল বের হওয়ার সংবাদে আলোড়িত হয়েছে সারা দেশ, অনাহারে একজন মানুষের মৃত্যুর সংবাদে বিক্ষোভ আর প্রতিবাদের ঝড়ে কম্পিত হয়েছে দেশের রাজনৈতিক আকাশ। কই দিনের পর দিন অনাহারে মৃত্যুর সংবাদে দৈনিক এবং সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলো ভরে উঠলেও দেশময় তার কোন প্রতিক্রিয়া হচ্ছে কি? পরাধীন দেশে মানুষের অধিকার দাবিয়ে রাখা, মনুষ্যত্বের লাঞ্ছনা এবং মানবতার অবমাননার একটা কারণ দেখানো যায় –। কিন্তু স্বাধীন দেশে এই দায়িত্বের বোঝা তো বহন করতে হবে সে দেশের প্রতিটি মানুষকে। যেসব ক্ষুদ্র-বৃহৎ ঘটনা পৃথিবীর সামনে নিজেদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করবে তার বিরুদ্ধে সচেতন থাকতে হবে বুদ্ধিজীবী থেকে প্রতিটি সাধারণ মানুষকে —। জনতার ভোটে নির্বাচিত শাসক শ্রেণীকেও জবাবদিহি করতে হবে জাতির কাছে। কিন্তু বাংলাদেশের বেলায় এর উল্টোটি কেন? নাকি জনতার দুঃখ-দুর্দ্দশা এবং সমস্যাবলীকে পুঁজি করে যারা রাজনীতি করেন তারা ক্ষমতায় যাওয়ার পর এমনই ঘটে। দেশপ্রেম আর জনগণের নেতৃত্বের একমাত্র দাবীদার মহলটি তো এখন দেশের শাসক, তাই যতই দুঃখ-দুর্দ্দশা বাড়ুক চালের মণ আশি টাকা হোক আর অনাহারে ধুঁকে ধুঁকে মানুষ মারা যাক– সে সব সাধারণ, অতি সাধারণ ঘটনা হয়ে যায়। এ ব্যাপারে কথা বলা পাপ।

কিন্তু আর কতদিন? কৃষক-শ্রমিক রাজ কায়েম হয়ে যাওয়া গরীব মানুষের কল্পস্বর্গ এই সমাজতান্ত্রিক(?) বাংলাদেশে যারা অহোরহ দেশ গড়ার আহ্বান জানাচ্ছেন – তাদের প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে এই বাংলার সাধারণ মানুষের দুঃখ দেখে না আপনারা কান্নায় ভেঙ্গে পড়তেন? আপনারা যখন রাজনীতির অঙ্গনে বিরোধী দলের ভূমিকায় অভিনয় করতেন তখন যদি অনাহারে কোন লোক মারা যেত অথবা অনাহারী ভুখা মানুষের কান্না-আর্তনাদে আকাশ-বাতাস ভরে উঠতো তখন আপনারা কি করতেন? সেদিন কি আজকের মত পেটে গামছা বেঁধে দেশ গড়ার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে বলতেন? নাকি কৃষক-শ্রমিকের রাজত্ব কায়েম হয়েছে এই বলে অনাহারে মৃত মানুষের বুকের উপর উল্লাসের জয়গাথা গাইতেন? এই সুন্দর পৃথিবীতে জীবনের সব সম্ভাবনা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেও যে হতভাগ্যের দল দু'মুঠো অন্নের অভাবে, আপনাদের বেহেশতী শাসনামলে জীবন হারালো তার মৃত্যুকালীন ফরিয়াদ শুনেছেন কি? না, আপনারা শোনেননি। নইলে শিউরে উঠতেন সেই হতভাগ্যের অন্তিম অভিশাপ শুনে, জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে যেতেন সেই মৃত্যু পথযাত্রীর চোখে শেষবার জ্বলে উঠা ঘৃণার আগুন দেখে।

হ্যাঁ-মানুষ মরছে–এই সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের গ্রাম-গঞ্জ থেকে প্রতিদিন আসছে অনাহারী মানুষের মৃত্যুর সংবাদ। সেই মুহূর্তে রাজধানীর বড় বড় শহরগুলোর বুকে বিহারী আর পশ্চিম পাকিস্তানীদের পরিত্যক্ত বাড়ীগাড়ী আর ব্যবসা নিয়ে চলছে একদার জনগণের নেতৃবৃন্দের অবিরাম প্রতিযোগিতা, যে মুহূর্তে শহরের নাগরিক সভ্যতার আড়ালে চলছে ভাগ্যবানদের লাইসেন্স, পারমিট, আশি টাকা মণ চাউলের কালোবাজারীর সুযোগ-সুবিধা নিয়ে কুকুরের কামড়াকামড়ির মহড়া সেই মুহূর্তে এই বাংলাদেশের নীরব নিভৃত গ্রামের দৃশ্যপটে অভিনীত হচ্ছে অনাহার আর দুর্ভিক্ষের করুণ, ভয়াবহ দৃশ্যাবলী।

আমরা তা দুর্মুখ ... সুযোগ পেলেই দুর্নাম রটনা করি, নিন্দা করা আমাদের স্বভাব, কিন্তু হায় ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। সরকারের

সহযোগী পত্রিকাগুলোতে যে অনাহারে মৃত্যুর সংবাদ দিনের পর দিন প্রকাশিত হচ্ছে– যদিও প্রকৃত ঘটনা এবং মৃত্যুর সংখ্যা তার চেয়ে কত গুণ বেশী তা' সহজেই অনুমেয়– তথাপি পত্রিকায় প্রকাশিত সেই সংখ্যাগুলোর দিকে তাকালে এবং এ ব্যাপারে সরকারের ঔদাসীন্য লক্ষ্য করলে স্তম্ভিত হতে হয়।

ঢাকার একটি প্রভাবশালী দৈনিকে প্রকাশ পেয়েছে পাক জল্লাদ বাহিনীর হাতে জনৈক শহীদের বিধবা মা'র অনাহারে মৃত্যুর সংবাদ। পাকবাহিনীর হাতে নিহত প্রতিটি শহীদের পরিবারবর্গের ভরণপোষণের কথা সরকারী মহল বক্তৃতায়, কথায় সোচ্চার কণ্ঠে ঘোষণা করলেও বাস্তবে এই হতভাগ্য শহীদ জননীর জীবনে সেটা নির্মম পরিহাসে পরিণত হয়ে তাকে জীবন দিয়ে প্রমাণ করতে হল সরকারের কথায় ও কাজের মধ্যে কতটুকু তফাৎ। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, স্থানীয় চেয়ারম্যানের কাছে বারবার রিলিফের আবেদন জানিয়ে সে ব্যর্থ হয়েছিল।

এই দৈনিক পত্রিকাটির একই সংখ্যায় ঠাকুরগাঁও মহকুমার পচাগড় থানায় মে মাসের প্রথম সপ্তাহে ২ জন মহিলাসহ ৬ ব্যক্তির অনাহারে মৃত্যুর সংবাদ ছাপা হয়েছে। ঢাকার অপর এক সাপ্তাহিক পত্রিকায় বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় অনাহারে মৃত্যুর যে সংবাদ প্রকাশ হয়েছে তাতে দেখা যায় মাগুরা জেলার বেরোল মলিতা গ্রামে আতিয়ার খান, ঠাণ্ডা খান এবং ফজলে মিয়া নামে ৩ ব্যক্তি ৩দিন অভুক্ত থেকে মর্মান্তিকভাবে মৃত্যুবরণ করেছেন। ঐ একই মহকুমার শালিখা থানার আড়পাড়া গ্রামে একজন মহিলা অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। চট্টগ্রামের এক সাপ্তাহিক পত্রিকায় এই জেলার সাতকানিয়া থানার বড় হাতিয়া গ্রামে এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে ১২ জন শিশু ও ২১ জন যুবক-যুবতী এই মোট ৩৩ জনের অনাহারে মৃত্যুর এক হৃদয়বিদারক ঘটনা প্রকাশ হয়েছে।

ঢাকার একটি সাময়িক মুখপত্র ঝিনাইদহ মহকুমা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্রিকার খবর উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে যে, সেখানে গড়ে প্রতি ২ দিন অর্থাৎ ৪৮ ঘন্টায় একজন করে মানুষ ক্ষুধার তাড়নায় আত্মহত্যা করছে। ১৯৭২ সালের ৫ই জানুয়ারী থেকে ১৯ শে এপ্রিল পর্যন্ত ৭৪ দিনে এই মহকুমার পল্লীগ্রাম থেকে ২৪ জন মহিলা ও ১৪ জন পুরুষ মোট ৩৮ জন ভাগ্য বিড়ম্বিত নর-নারী গলায় দড়ি এবং বিষপানে আত্মহত্যা করে ক্ষুধার জ্বালা থেকে রেহাই পেয়েছে। ঝিনাইদহ থেকে প্রকাশিত অপর এক সাপ্তাহিকে এই মহকুমার শৈলকূপা থানার ১ জন ও ফুলহরি গ্রামে ১ জন ব্যক্তি অনাহারে মৃত্যুবরণ করেছে। শেষোক্ত ব্যক্তি অনাহারে মৃত্যুবরণ করেও কর্তৃপক্ষের নির্মম রসিকতা থেকে রেহাই পায় নি। সংবাদে প্রকাশ, কয়েকদিন অনাহারে থাকার পর জনৈক নেছার উদ্দিন ওরফে নটবর মোল্লা মারা গেলে স্থানীয় একটি সাপ্তাহিকে এই সংবাদ ছাপা হওয়ার পর ২৫/৩/৭২ তারিখে শৈলকূপার সি, ও (ডেভ) তার অফিসের মেমো নং ৪৩৮ মোতাবেক ঘটনাস্থল পরিদর্শন ও কোন প্রকার তদন্ত না করেই নটবর মোল্লাকে নটবর সাহা বলে চালিয়ে দেয় এবং তার মৃত্যুর পরও ২২ দিন তাকে জ্যান্ত দেখানোর পর বেশী খেয়ে মারা যাওয়ার অজুহাত দেখিয়ে পত্রিকা সম্পাদকের বিরুদ্ধে মহকুমা প্রশাসকের নিকট এক দরখাস্ত পেশ করলে উক্ত পত্রিকায় তার দাঁতভাঙ্গা জবাব প্রকাশ করা হয়। অবশেষে ঘটনাস্থল পরিদর্শন ও সঠিক তদন্তের পর পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদটি সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর থানায় মুহাম্মদ আলী তার পরিবারের ১০ জন সদস্যসহ ২ দিন অনাহারে থাকার পর গত ৭ই এপ্রিল

শুক্রবারে বিষপান করে আত্মহত্যা করেছে। ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা থানার কুমারপাড়া ইউনিয়নের ৪ নং ওয়ার্ডের এক অভাগা এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে না খেয়ে মৃত্যুবরণ করেছে। জামালপুর মহকুমার দেওয়ানগঞ্জ থানার খেওয়ারচর গ্রামের জনাব আবদুল শেখ, তার স্ত্রী ও ছোট বোন গত মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে একটানা অভুক্ত থেকে মৃত্যুবরণ করেছে। অনাহারে মৃত্যুর খবর আসছে টাঙ্গাইল জেলার ধলেশ্বরীর পশ্চিম পাড়ের গ্রামগুলি থেকে।

বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় দেশব্যাপী অনাহারের মৃত্যুর যে ভয়াবহ সংবাদগুলো প্রতিনিয়ত প্রকাশিত হচ্ছে বাস্তব ঘটনার তুলনায় তা অতি সামান্য। সুচিন্তিত পদক্ষেপ গ্রহণ, রিলিফের সঠিক এবং সুষম বন্টন, দুর্নীতি এবং মানুষের দুঃখ-দুর্দ্দশার প্রতি সহকারের চরম উদাসীনতার ফলে বাংলার দারিদ্র পীড়িত মানুষ অর্দ্ধাহারে-অনাহারে দিন কাটিয়ে ধুঁকে ধুঁকে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। একদিকে চলছে ক্ষুধামুক্তির ব্যর্থ আশ্বাস এবং 'একটি মানুষকেও না খেয়ে মরতে দেওয়া হবে না' ইত্যাকার সান্ত্বনা প্রলাপ। অন্যদিকে খাদ্যশস্যসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের অবিশ্বাস্য মূল্য বৃদ্ধির অচলায়তনের পাষাণ প্রাকারে ক্ষুধিত, ক্লান্ত অসহায় মানুষের আর্তনাদ মাথা কুটে গুমরে মরছে। ত্রিশ লক্ষ মানুষের মৃত্যুতেও এ দুর্ভাগা দেশের যুগযুগান্ত সঞ্চিত বঞ্চনার অবসান হল না- তাই জীবনের সবচেয়ে সুন্দর দিনগুলো আসার ঢের আগেই অনাহারের করাল গ্রাসে ঝরে পড়ছে বাংলার অনেক মূল্যবান প্রাণ। জানিনা আর কতদিন এমনি করে ক্ষুধার জ্বালায় আত্মহত্যা আর অনাহারে প্রাণত্যাগের দু:সহ, মর্মান্তিক তালিকা আমাদের ছেপে যেতে হবে।

রাজশাহীর গ্রামে ভারতীয় সৈন্য

সাপ্তাহিক গণশক্তির সম্পাদক সমীপে চিঠি লিখে ভারতীয় দূতাবাস জানিয়েছে যে, বাংলাদেশ সরকার ভারতীয় বাহিনীর সাহায্য চেয়ে পাঠালে তাদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রেরণ করা হয়। ... 'এ ছাড়া বাংলাদেশের আর কোথাও কোন ভারতীয় সৈন্য নেই।'

ভারতীয় দূতাবাস কি অস্বীকার করতে পারবে – রাজশাহীর গ্রামে তাদের সৈন্যদল নেই?

এপ্রিলের প্রথম থেকেই বাংলাদেশ সরকার রাজশাহী জেলার অভ্যন্তরে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছেন; নকশাল ও দুষ্কৃতিকারী দমনের নামে পুলিশ ও বাংলাদেশ রাইফেলস বাহিনীকে লেলিয়ে দিয়েছেন। গত মাসের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে তাদের সাথে এসে যোগ দিয়েছে ভারতীয় সৈন্যদল। বামপন্থী কয়েকটি প্রতিষ্ঠান এবং এতে জড়িত ব্যক্তিদেরকে সমূলে উৎখাত ও ধ্বংস করে দেয়াই তাদের লক্ষ্য। কিন্তু এই অভিযানে তারা নিরীহ মানুষকেও রেহাই দিচ্ছে না। আক্রান্ত ও বিধ্বস্ত এলাকা থেকে পাবনা ও টাঙ্গাইল জেলায় আগত বেশ কতকগুলো পরিবার জানিয়েছে যে, বাংলাদেশ রাইফেলস্ বাহিনীর সাথে অবাংলা ভাষায় কথা বলে এমন সৈন্যও রয়েছে। তাদের পরনে সামরিক পোষাক নেই। তবে তারাই অপারেশনে নেতৃত্ব দিচ্ছে। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে প্রকাশ সাহায্যকারী এই সৈন্যদের শারীরিক গড়ন অবাঙ্গালীসুলভ এবং তারা উর্দুতে (হিন্দী ?) কথা বলে।

তাদের যুগপৎ আক্রমণ তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে আত্রাই, রাণীনগর, মন্দা, বাগমারা, মধুগুরনই, নবাবের তাম্বু, সামসপাড়া, বড় কালকাপুর প্রভৃতি এলাকায়। এসব জায়গার যুবক ছেলে বলতে কেউ বাড়ীতে থাকতে পারছে না। তাদের নকশাল বলে ধরে নেয়া হয়। নবাবের তাম্বুরের আবদুর রাজ্জাক ও আবদুল মান্নানকে ধরে নিয়ে গুম করে ফেলা হয়েছে। তাদের তালিকাভুক্ত ব্যক্তিকে না পেলে ঘরবাড়ীতে আগুন দিচ্ছে। বড় কলকাপুর গ্রামের ৪টি বাড়ী এমনিভাবে তারা জ্বালিয়ে দিয়েছে। গত ১৯ শে এপ্রিল বাংলাদেশ রাইফেলস বাহিনী আত্রাই কৃষক সমিতি অফিস দখল করে সদস্যদের হয়রানি ও নির্যাতন করেছে।

এসব ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে রাজশাহী জেলা ও নওগাঁ মহকুমা কর্তৃপক্ষ শান্তি কায়েমের প্রচেষ্টা তো দূরের কথা প্রতিটি ইউনিয়নে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রসজ্জিত পুলিশ মোতায়েন করে উস্কানির পথ প্রশস্ত করে দিচ্ছেন।

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন

গত ৪ঠা মে ভারতীয় ইংরেজী দৈনিক অমৃতবাজার পত্রিকায় 'দেশবিভাগ ও বাংলাদেশ', শিরোনামায় নিচের অনূদিত চিঠিটি প্রকাশিত হয়েছে।

"মহাশয়– এটা সাধারণ প্রবাদ যে এক মিথ্যা ঢাকতে অনেক মিথ্যা বলতে হয়। তবু তা গোপন থাকে না। পাকিস্তান সৃষ্টির ব্যাপারেও তাই-ই হয়েছে। সবাই জানতো ভারত অবিভাজ্য, কারণ সেখানে ছিল সাধারণ ভৌগলিক অবস্থা, জাতি, রীতি-নীতি, সর্বোপরি সাধারণ অর্থনীতি। কিন্তু স্বার্থবাদী ক্ষমতালোভীরা অবাস্তব দ্বিজাতি তত্ত্বের চমক সৃষ্টি করে ভারত ভাগ করে। ২৪ বছর পরে প্রমাণিত হয়েছে যে দ্বিজাতি তত্ত্ব প্রহসন ছাড়া কিছুই নয়।

জনগণ একে অপর থেকে বেশীদিন আলাদা হয়ে থাকতে পারে না, তার কারণ সহজবোধ্য।

অন্তত: পূর্বতন পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) তা বুঝতে পেরেছে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের কাণ্ডজ্ঞান ফিরে আসবার খুব দেরিও হয়ত নেই।

বাংলাদেশ ও ভারত উভয়ে উৎসাহজনকভাবে নতুন করে চিন্তা শুরু করছে এবং তারা বুঝতে পেরেছে যে, বাস্তব ব্যবস্থা ছাড়া উপমহাদেশে স্থায়ী শান্তি ও সমৃদ্ধি আসতে পারে না।

বাংলাদেশ ভারতের অংশ ছিল এবং বর্তমানে সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তিতে দু'দেশের একটা সাধারণ নীতিও আছে। শুধু তাই নয়, যে বাঙ্গালী কবি রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত রচনা করেছেন তিনি ভারতের জাতীয় সঙ্গীতের রচয়িতা। এটা স্পষ্ট যে বাংলার অর্ধেক ভাগ ও আসাম ভারতের সঙ্গে থাকার সুযোগ-সুবিধা ইতিমধ্যেই উপভোগ করছে। তাহলে বাংলাদেশের জনগণ কি দোষ করেছে যে মোটামুটি একই সংস্কৃতি থাকা সত্ত্বেও তারা পাশের প্রদেশের (পশ্চিম বাংলা) সঙ্গে যোগ দিতে পারবে না?

একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে যতদিন পর্যন্ত অবাস্তব বিভাগ বজায় থাকছে ততদিন ধর্মীয় অসমতা ও দুর্বল সংখ্যালঘু কখনই এই উপমহাদেশে আকাঙ্ক্ষিত শান্তি আসতে দেবে না।

রহমান জামান, ঢাকা।"

লালবাহিনীকে বেআইনী ঘোষণার দাবী

রাজধানী ঢাকার সম্মেলন অনুষ্ঠানের গতানুগতিক ধারাকে বর্জন করে গত ১৩ই ও ১৪ই মে টাঙ্গাইলে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের প্রথম জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রবীণ শ্রমিক নেতা জনাব নুরুল ইসলামের উদ্বোধনী ভাষণের পর বিশেষভাবে আমন্ত্রিত বক্তা মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী বললেন: "অর্থনৈতিক

টেণ্ডার নোটিশ

১৯৭২-৭৩ সালের জন্য টাঙ্গাইল জেলার বিভিন্ন রোডে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন সংস্থার অধীনে সার, বীজ ও অন্যান্য কৃষি সরঞ্জাম পরিবহনের জন্য উপযুক্ত ও আর্থিক সঙ্গতিপূর্ণ ঠিকাদারগণের নিকট হইতে সীল মোহরকৃত কভারে টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। আগামী ২৩ শে মে বেলা ১২ টা পর্যন্ত টাঙ্গাইল জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে টেণ্ডার গৃহীত হইবে এবং ঐ দিনই বেলা ১২-১৫ মিনিটে টেণ্ডার খোলা হইবে। বিস্তারিত ব্যাখ্যা, শর্ত ও নিয়মাবলীর জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর অফিসে যোগাযোগ করিতে বলা হইতেছে।

আব্দুল মান্নান
জেলা ব্যবস্থাপক
বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন সংস্থা, টাঙ্গাইল

স্বাধীনতা ছাড়া রাজনৈতিক স্বাধীনতার কোন মূল্য নেই।" প্রদৃপ্ত কণ্ঠে মওলানা ঘোষণা করলেন, তিনি প্রাণ দিয়ে হলেও স্বাধীনতা রক্ষা করবেন, কিন্তু শোষকদের স্বাধীনতা বরদাশত করবেন না।

মওলানা ভাসানীর পর জনাব মিসির আহমদ, জনাব হাতেম আলী খান, জনাব কাদের সিদ্দিকী প্রমুখ সম্মেলনে বক্তৃতা করেছেন। সম্মেলন অভ্যর্থনা পরিষদের সভাপতি জনাব হাবিবুর রহমান তার লিখিত ভাষণে শ্রমিকদের বিভিন্ন সমস্যা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার দুরাবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করেন।

সম্মেলন শেষে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের ২১ সদস্য বিশিষ্ট নতুন কার্যকরী সংসদের যারা কর্মকর্তা নির্বাচিত হয়েছেন তারা হল: জনাব ফজলুর রহমান খান (সভাপতি), জনাব হাবিবুর রহমান খান, খন্দকার গোলাম মোস্তফা, খন্দকার মুজিবর রহমান, জনাব নুরুল ইসলাম (সহ সভাপতি), দেওয়ান সিরাজুল হক (সাধারণ সম্পাদক), কাজী আবুল কাশেম, জনাব ইদ্রিস মিয়া, জনাব আজিজুল হক (সাংগঠনিক), জনাব মোজাম্মেল হোসেন (প্রচার), জনাব এম. এ. মালেক (কোষাধ্যক্ষ), জনাব ফরিদ উদ্দিন আহমেদ (সাংস্কৃতিক)।

১৪ই মে বিকেলে সংস্থার উদ্যোগে জনাব আবদুল গফুর সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। দেওয়ান সিরাজুল হক পরিবহন শিল্প জাতীয়করণ করে শ্রমিকদের শতকরা ৮০ ভাগ মালিকানার এবং দশ হাজার বেকার শ্রমিকের চাকুরীতে পুনর্বহালের দাবী জানান। বিভিন্ন স্থানে শ্রমিক লীগ ও লালবাহিনীর ফ্যাসীবাদী হামলার তীব্র প্রতিবাদ করে দেওয়ান সিরাজুল হক এর প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে সকল শ্রমিক সংগঠনের ঐক্যের আহ্বান জানান। তিনি মজলুম নেতা মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে শক্তিশালী বিরোধীদল গঠনেরও আহ্বান জানান।

সংস্থার কেন্দ্রীয় সহসভাপতি ও টাঙ্গাইল জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক জনাব হাবিবুর রহমান বিভিন্ন শ্রমিক এলাকায় শ্রমিক লীগ ও লালবাহিনীর হত্যাকাণ্ডের পরিণতি সম্পর্কে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেন। তিনি লালবাহিনীকে বেআইনী ঘোষণারও দাবী করেন।

১৪ই মে সন্ধ্যায় স্থানীয় বিন্দুবাসিনী স্কুল ময়দানে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের সমাপ্তি হয়। অনুষ্ঠানে ঢাকা থেকে আগত গণশিল্পী গোষ্ঠী গণসংগীত এবং মনোজ্ঞ গীতি নকশার আয়োজন করে ছিলেন।

মিষ্টি থেকে গ্রেনেড

সম্প্রতি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত মিলাদে মিষ্টি নিয়ে হাতাহাতি থেকে গ্রেনেড চার্জ পর্যন্ত হয়। দুইবার মিষ্টি নিতে গেলে দুই দল ছাত্রের মধ্যে হাতাহাতি হয়। এই সাধারণ ব্যাপার নিয়ে সন্ধে ৮ টা থেকে শেষ রাত ৩ টা পর্যন্ত মারামারি চলে। এতে গ্রেনেড, পিস্তল ও অন্যান্য মারাত্মক অস্ত্র ব্যবহৃত হয়। বেশ কয়েকজনকে মেডিকেল কলেজে ভর্তি হতে হয়। প্রাণভয়ে বিভিন্ন হলের নিরীহ ছাত্ররা স্থানীয় আবাসিক এলাকায় ও গ্রামে আশ্রয় নেয়। অনেকে হলের পুকুরে সারারাত কাটায়। পরিশেষে দেখা গেল একমাত্র সরকার সমর্থিত ছাড়া আর কোন ছাত্র নেই। তারা রুমে রুমে দরজা ভেঙে শত্রুর তল্লাসী চালায়, দুটি হলের জিনিসপত্র লুট হয় এবং বেশ ক্ষতি হয়। পর দিন কর্তৃপক্ষ গ্রীষ্মের ১৮ দিন ছুটি ঘোষণা করে মিলাদ মাহফিলের তামামসুদ সারেন।

কেন ভারত সরকার আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে এগিয়ে এলেন?

শুধু ভারতের নয়, সারা বিশ্বের নির্যাতিত জনগণ আমাদের বন্ধু। বিশেষ করে রক্তাক্ত স্বাধীনতা সংগ্রামের বিগত নয় মাসে ভারতের জনগণ আমাদের প্রতি তাদের বন্ধুত্বের অকৃত্রিতা প্রদর্শন করতে পেরেছেন। চরম বিপদের দিনে তারা আমাদের আশ্রয় দিয়েছেন, খাবার দিয়েছেন, দিয়েছেন যুদ্ধের প্রেরণা এবং ভবিষ্যতের অনাবিল ভরসা। তাদের সাহায্যে কোন দুরভিসন্ধি ছিল না, উদ্দেশ্যের পেছনেও ছিল না কোন স্বার্থন্ধতা। কিন্তু ভারত সরকার জনগণ নয়। তবু সরকার আমাদের সাহায্য করেছেন–এক কোটি শরণার্থী এবং পলাতক সরকারকে আশ্রয় দিয়েছেন, মুজিবনগর এবং স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার অনুমতি দিয়েছেন, অস্ত্রের সাহায্য করেছেন এবং সর্বশেষে সারা বিশ্বকে হতচকিতে করে দিয়ে নিজের সেনাবাহিনীকে তৈরী যুদ্ধ ক্ষেত্রে নামিয়ে হানাদার পাকবাহিনীকে আত্মসমর্পণ করানোর মধ্য দিয়ে এনে দিয়েছেন আমাদের স্বাধীনতা। আজ তাই আমরা 'স্বাধীন'।

কিন্তু, কেন এই সাহায্য–কৃতজ্ঞতার নামে বিগলিত, অন্ধ দালালীতে নয়, বরং যৌক্তিক পর্যালোচনায় বিশ্লেষণ করলে যে কথাটি বেরিয়ে পড়ে, তা'হল এডমাণ্ড বুর্কের কথা: 'স্বার্থ বনাম মানবতার মহাজন বাক্যটি মনে রেখেই একটি বৃহৎ রাষ্ট্রকে ক্ষুদ্রতর রাষ্ট্রের প্রতি তার নীতি নির্ধারণ করতে হয়।'

একথার সত্যতা প্রমাণ করবে মওলানা ভাসানীর বন্দী দশা, বামপন্থীদের প্রতি নিদারুণ অবিচার-অত্যাচার এবং নিজের সেনাবাহিনী দিয়ে বাংলাদেশকে স্বাধীন করে দেয়া।

চোরাচালানের হিড়িক, বাণিজ্য চুক্তির বৈশিষ্ট্য, মৈত্রী চুক্তির মারপ্যাঁচ, বামপন্থী দমনের কৌশল, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও ভারত মহাসাগরে সামরিক শক্তির নব অভ্যুদয়–সবই কি ইন্দিরা সরকারের বদান্যতার সাথে জড়িত নয়?

বাংলাদেশের সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু হয়েছিল সম্পূর্ণ অপ্রস্তুতাবস্থায়, জনতা যদিও প্রস্তুত থাকতে পারতেন, কিন্তু ইয়াহিয়া ও ভুট্টোর

সাথে শেখ মুজিব এবং আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের আপোষ আলোচনা এবং তার অগ্রগতির আশ্বাস বস্তুত: জনগণকে বিভ্রান্ত করে দিয়েছিল। মওলানা ভাসানী এবং প্রগতিশীল বামপন্থীদের বারবার সাবধানবাণী সত্ত্বেও তারা জনতাকে নিশ্চিত ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিতে দ্বিধা করেননি। তারপর পাকবাহিনীর সুপরিকল্পিত আক্রমণে অপ্রস্তুত জনতার রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হল, নেতৃবৃন্দ ভারত অভিমুখে পলায়ন করলেন, জেল খেটে অভ্যস্ত শেখ সাহেব এবারো ধরা দিলেন। প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু হল।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম কারো একার ছিল না–সর্বশ্রেণীর জনতাই এতে অংশ নিয়েছেন, নিতে চেয়েছেন। কিন্তু ভারত সরকারের সাহায্যে পরিচালিত এই যুদ্ধে বামপন্থীদেরকে সুকৌশলে কোণঠাসা করা হয়েছে। স্বাধীনতার প্রথম প্রবক্তা মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীকে বন্দী করে রাখা হয়েছে, মুক্তিবাহিনীতে এমন কাউকেই নিতে দেয়া হয়নি যারা পরবর্তীকালে ভারত সরকারের যাচ্ছেতাই কার্যকলাপের বিরোধিতা করবেন। এজন্যেই গলাটিপে হত্যা করা হয়েছে বামপন্থীদের স্বাধীনতার আকাঙ্খাকে। এদের মধ্যে যারা কঠোর পরিশ্রমে এবং বীরত্বের বিনিময়ে যুদ্ধ করেছেন, তাদের বেশীরভাগকেই বন্দী করা হয়েছে অথবা তারা নিহত হয়েছেন গুপ্তঘাতকের হাতে। যুদ্ধের সময় যাদের পারা যায়নি তাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার পর ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। বীরযোদ্ধা মেজর জলিলসহ আরো অনেক দেশপ্রেমিকই তাই আজো বন্দী।

এত করেও স্বার্থান্ধ ভারত সরকারের আতংক কাটেনি। যখন দেখা গেল বাংলাদেশে এলাকাভিত্তিক নেতৃত্ব গড়ে উঠছে এবং মুক্তিযোদ্ধারা বাস্তবতার ভিত্তিতে ক্রমাগতভাবে বামপন্থীদের দিকে ঝুঁকে পড়ছে তখনই দিশেহারা ভারত সরকার তার সেনাবাহিনীকে মুক্তিবাহিনীর তৈরী যুদ্ধক্ষেত্রে নামিয়ে দিয়ে স্বাধীনতা এনে দিলেন। কেননা, এই সশস্ত্র সংগ্রামকে আরো বেশী চলতে দিলে তা প্রকৃত গণযুদ্ধে পরিণত হয়ে অবশেষে সকল প্রতিক্রিয়াশীলকেই উৎখাত করতো, অবসান ঘটাতো সকল শোষণের, প্রতিষ্ঠা হতো প্রকৃত শোষণহীন সমাজ-ব্যবস্থার। তাছাড়া, প্রথম থেকেই প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা মুক্তিযুদ্ধের কৃতিত্বের সম্পূর্ণ অংশ ছিনিয়ে নেয়াও তাদের লক্ষ্য ছিল।

পাকিস্তানী বৃহৎ পুঁজিপতিদের সাথে বাঙ্গালী উঠতি পুঁজিপতিদের দ্বন্দ্ব সংঘর্ষে পরিণত হলে যখন জাতীয় স্বার্থের খাতিরে জনগণ সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হল, তখনই আজন্ম শত্রু পাকিস্তানকে ধ্বংস করার সুযোগ নিয়ে ভারত সরকার তার যাত্রা শুরু করলেন। বাংলাদেশকে স্বাধীন করার মধ্য দিয়ে ভারত সরকার তার খাদ্য সংকট থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিলেন, প্রতি বছরের অসংখ্য উদ্বাস্তু সমস্যারও সমাধান করতে চেয়েছিলেন। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বামপন্থীদের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা এবং বিদ্রোহী পশ্চিমবঙ্গের নকশালবাড়ী থেকে শুরু হয়ে যে কৃষিবিপ্লব পরবর্তীকালে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়তে যাচ্ছিল তার হাত থেকেও মুক্তির প্রয়োজন ছিল।

উপরের আলোচনার যৌক্তিক প্রমাণ মিলবে যুদ্ধোত্তর ঘটনাবলী থেকেই। যেকোন দেশপ্রেমিক স্বীকার করেন, ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত বাণিজ্য এবং ২৫ বৎসর মেয়াদী শান্তি, বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার চুক্তি বাংলাদেশের উপর মারণাঘাত হেনেছে। (বাণিজ্য চুক্তি সম্পর্কে গত সংখ্যার 'হক-কথা'য় আলোচনা হয়েছে)।

বিগত ১৭ই মার্চ ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী এসেছিলেন বাংলাদেশ সফরে। তিনি এসেছিলেন (পত্রপত্রিকার ভাষায়) 'বাংলার মানুষকে দাসত্বের নরক থেকে মুক্তি

স্বর্গের সিংহদ্বারে পৌঁছে দেবার জন্যে।' খোলাখুলি আশ্বাসবাণী এবং আশীর্বাদ স্বরূপ ১৯ শে মার্চ স্বাক্ষরিত হয়েছে ভারত-বাংলাদেশ 'শান্তি, বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা চুক্তি'।

চুক্তিটির নবম অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে '... কোন পক্ষ আক্রান্ত হলে অথবা আক্রান্ত হবার হুমকি আসলে উভয়পক্ষের কর্মকর্তারা অনতিবিলম্বে আশংকা দূর করে শান্তির নিশ্চয়তা বিধানের উদ্দেশ্যে পারস্পরিক আলোচনায় মিলিত হবেন'।

অথচ বাংলাদেশের মানচিত্র ঘাটলে দেখা যাবে একমাত্র পূর্বদিকের সামান্য স্থান জুড়ে বার্মার সীমান্ত ছাড়া আর সবদিকেই ঘিরে রয়েছে আমাদের প্রতিবেশী ভারত। তাছাড়া বার্মার তরফ থেকেও কোন আক্রমণ বা হুমকির সম্ভাবনা থাকতে পারে না। তবুও কেন চুক্তিটিতে এই শর্ত জুড়ে দেয়া হল?

এখানেই শেষ নয়, চুক্তিটির দশম অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে :'... চুক্তিকারী কোনপক্ষই অন্য কোন দেশের সাথে এমন কোন গোপন বা প্রকাশ্য চুক্তি করার চেষ্টা করবেন না, যা এই দুই পক্ষের কারো স্বার্থ বিরোধী।'

বাংলাদেশের জনগণের কি তাহলে সার্বভৌমত্ব নেই? এদেশের জনগণ নিজেদের ভবিষ্যত কর্মপন্থা নিজেরাই স্থির করার অধিকার রাখেন, কী হবে আর কী হবে না, কার সাথে চুক্তি করবেন বা করবেন না, সে সিদ্ধান্ত নেয়ার সর্বোচ্চ ক্ষমতাও জনতারই – অন্য কারো নয়। অথচ চুক্তিটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে বাংলাদেশকে দেশরক্ষা এবং পররাষ্ট্রনীতির প্রশ্নে সম্পূর্ণরূপে ভারতের উপর নির্ভরশীল হতে হবে–তার নির্দেশেই চলতে হবে সব সময়। প্রথমত: জাতীয় মিলিশিয়া গঠন করে আবার তা ভেঙ্গে দেয়ার কথাও বলতে হয়। স্বাধীনতা যুদ্ধে বামপন্থীদের সুযোগ না দেয়ার কারণ এবং উদ্দেশ্যই এখানেও কাজ করেছে। মুক্তিবাহিনীর যুবকদেরকে নিয়েই মিলিশিয়াবাহিনী গঠিত হয়েছিল। তাছাড়া, বীরযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃত বর্তমান বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনীর জোয়ানদের ট্রেনিং–এর জন্যে ভারতীয় অফিসারদের আনা হয়েছে এবং এদেশের অফিসারদের ট্রেনিং–এর উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়েছে ভারতে।

১৯৬৯ সালের জুন মাসে সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ 'এশিয়ায় যৌথ নিরাপত্তা' প্রস্তাবটির মাধ্যমে তার নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার যে সাধনায় নেমেছে, ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত ২৫ বছর মেয়াদী এই চুক্তিটি তারই সহায়তা করবে। ফলে সারা বিশ্বব্যাপী সোভিয়েত সম্প্রসারণবাদীদের আন্তর্জাতিক রণনীতির তাঁবেদার হয়েই বাংলাদেশকে থাকতে হবে। ভারত এবং সোভিয়েত সরকারদ্বয়ের বাণিজ্যের বাজার হিসেবে বিক্রি করতে হবে নিজেকে। এক কথায়: বাণিজ্য বা শান্তি চুক্তি–কোনটির মাধ্যমেই বাংলাদেশ সামান্য লাভবান হতে পারেনি–বরং এদেশের জনতার স্বার্থকে বিক্রি করে দেয়া হয়েছে।

স্বাধীনতা যুদ্ধের নয় মাসে বাংলাদেশের জনগণের চরম দুর্যোগের দিনগুলিতে ভারতের নির্যাতিত জনগণের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে। এই বন্ধুত্ব কোন স্বার্থকে কেন্দ্র করে হয়নি বরং আমাদের বিপদে ভারতীয় জনগণের অকৃত্রিম সাহায্য এবং সহযোগিতা দু'দেশের জনতার বন্ধুত্বকে সুদৃঢ় করে দিয়েছে। নির্যাতিত জনগণের এই বন্ধুত্বকে প্রতিক্রিয়াশীল শোষক গোষ্ঠী স্বভাবতই সহ্য করতে পারছে না। এর অপপ্রয়োগ করে একে লক্ষ্যভ্রষ্ট করার চেষ্টায় মেতে উঠেছে। কিন্তু পৃথিবীর কোন শক্তিই দু'দেশের নির্যাতিত মেহনতি জনতার বন্ধুত্বে ফাটল ধরাতে পারবে না। তাদের অপচেষ্টা বরং তাকে আরো সংহত করবে।

শিবপুর থেকে টঙ্গী–৩

গত সংখ্যায় আমরা পাকশী সম্মেলন থেকে শিবপুর সম্মেলনের মাধ্যমে কৃষক সমাজের রাজনৈতিক চেতনার বিশেষ স্তরে উত্তরণের পর্যায় আলোচনা করেছি। এ সম্মেলনগুলির আরেকটি গুরুত্বপূণ বৈশিষ্ট্য ছিল কৃষকদের মধ্যে সশস্ত্র প্রতিরোধের মানসিকতা গড়ে তোলার প্রচেষ্টা (যেকোন অন্যায়ের বিরুদ্ধে শোষিত শ্রেণীর সশস্ত্র প্রতিরোধের মানসিকতা গড়ে তোলার প্রচেষ্টা)। যেকোন অন্যায়ের বিরুদ্ধে শোষিত শ্রেণীর সশস্ত্র প্রতিরোধকে বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী এবং শোষক শ্রেণীর

সম্মেলন তো কোন অনিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির জন্ম দেয় না। তবে কেন টঙ্গী সম্মেলন সম্পর্কে সরকারের এত ভীতি? কেন মওলানা ভাসানীর বক্তব্যকে বিকৃত করে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করা হচ্ছে?

পদলেহী আইন রচয়িতাগণ যুগে যুগে বেআইনী এবং মহা অপরাধ হিসাবে চিত্রিত করেছেন। তার কারণ হচ্ছে যেকোন এলাকায় যেকোন কারণেরই হোক শোষিত শ্রেণী যদি সামান্যতম শক্তি প্রয়োগের মানসিকতা অর্জন করে ফেলে তবে সেটা পরবর্তী সময়ে বৃহত্তর শোষিত সমাজে সশস্ত্র সংগ্রামের দিকে মোড় নিতে পারে যা হচ্ছে শোষক শ্রেণীর জন্য ভয়াবহ ব্যাপার। সংশোধনবাদী মস্কোপন্থী নেতৃবৃন্দও সুচতুরভাবে জনগণের সংগ্রামী চেতনাকে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের আত্মঘাতী পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে সর্বদাই সচেষ্ট থাকে। ফলে জনগণের জঙ্গী চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে এবং তাদের যেকোন আন্দোলনই তার যৌক্তিক পরিণতিতে পৌঁছতে পারে না। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ লক্ষ্য করা যায় ১১ দফা আন্দোলনের স্বত:স্ফূর্ত প্রারম্ভ এবং সুবিধাবাদী নেতৃত্বের হাতে রাজপথ থেকে গোলটেবিল বৈঠকে স্থানান্তরের মাধ্যমে এই সম্ভাবনাময় আন্দোলনের অপমৃত্যুতে।

মওলানা ভাসানী বিভিন্ন সম্মেলনের মাধ্যমে কৃষক শ্রেণীর সংগ্রামী মনোভাবকে চাঙ্গা করে তোলার সঙ্গে সঙ্গে গঠন করলেন কৃষক-শ্রমিকদের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী। বাংলাদেশের যে কৃষক সমাজ আবেদন-নিবেদনের মধ্যেই তাদের দাবীদাওয়াকে সীমিত করে রেখেছিল তারা এবার সন্ধান পেল এক নতুন পথের। আবেদনপত্রের বদলে হাতে হাতে উঠে এলো বাঁশের লাঠি। বাঁশের লাঠি যতই তুচ্ছ হোক শক্তির প্রতীক হিসাবে শোষিত মানুষের মনে এনে দিল নতুন প্রেরণা। বাংলার হতভাগ্য নির্জীব খেটে খাওয়া মানুষের মনে মওলানা ভাসানীর আহ্বান ধ্বনিত হল মুক্তির মন্ত্র হিসাবে। ফলে দেশের আনাচেকানাচে ছড়িয়ে পড়লো শক্তি দিয়ে শক্তির প্রতিরোধের নতুন ইশারা। প্রতিটি কৃষকসভাতে দেখা যেতে লাগলো বাঁশের লাঠির মহড়া। অনতিবিলম্বে অন্যান্য রাজনৈতিক এবং ছাত্র প্রতিষ্ঠানগুলোতেও একই দৃশ্য দেখা গেল। তাই আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানের রমনা রেসকোর্স ময়দানের জনসভায়ও একদা শক্তি প্রদর্শনের বিরুদ্ধে সোচ্চার আওয়ামী লীগ কর্মীদের হাতেও শোভা পেল লাঠিসহ অন্যান্য অস্ত্র। বাঙ্গালী তথা কৃষক- শ্রমিকদের এই সশস্ত্র প্রদর্শনীর মহড়ার মধ্য দিয়ে প্রতিরোধের যে মানসিকতা গড়ে উঠেছিল তারই ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম এত দ্রুত সংগঠিত এবং বিজয়ের পথে এগুতে পেরেছে অহিংস অসহযোগে। আন্দোলনের পাশাপাশি এই সশস্ত্র প্রতিরোধের সংগ্রামী চেতনা মওলানা ভাসানীরই অবদান।

এবার এ, এচ, জি ১৭১৫

ডব্লিউ জি, টি ১৭৫৭ পালিয়ে যাবার পর **টাঙ্গাইল** সফরে এবার এসেছে এ.এচ.জি. ১৭১৫। গাড়ীটির নিবাস ভারতের আসামে। প্রায় একমাস যাবত একে রাত্রির অন্ধকারে টাঙ্গাইলের অলিগলি পথে যাতায়াত করতে দেখা যাচ্ছে। পেছনে পর্দা লাগানো এই গাড়ীটিতে প্রায়ই দুজন মাত্র যাত্রীকে বসে থাকতে দেখা যায়। ড্রাইভারটিকে পাকড়াও করলে থতমত খেয়ে সে জানিয়েছে, মুজিবপন্থী জনৈক ছাত্রনেতার বাড়ীতে গাড়ীওয়ালা দাওয়াত খেতে এসেছে। এবারো অভিযোগ একইরকম। ভারতে যে বিপুল পরিমাণ সোনা পাচার হয়ে যাচ্ছে তার পেছনে এই এ, এচ, জি ১৭১৫-এর অবদান অনেক।

প্রশাসক কেলেঙ্কারী বেড়েই চলছে–২

চট্টগ্রাম ন্যাশনাল কটন মিলসের আওয়ামী লীগ দরদী প্রশাসক মাত্র এক মাসের কর্মজীবনেই অনেক উল্লেখযোগ্য কীর্তি করে ফেলেছেন। পত্রপত্রিকায় প্রকাশ্য বিবৃতির মাধ্যমে এককালে আওয়ামী লীগ থেকে পদত্যাগী এই ভদ্রলোকটিই বাংলাদেশের

৩ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা মূল্যের দ্রব্য আত্মসাত

স্বাধীনতার পর বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতায় রূপান্তরিত হয়েছেন।

আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে শেখ মুজিবের সাথে বন্ধুত্বের দোহাই দিয়ে এই প্রশাসকটি চট্টগ্রামের অবাঙ্গালী ব্যবসায়ী ও দালালদের কাছ থেকে প্রচুর অর্থ কামিয়ে নিচ্ছেন।

চট্টগ্রামের ন্যাশনাল কটন মিলসের কর্মচারী ও শ্রমিকদের অভিযোগ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটির এই চেয়ারম্যান আনুমানিক তিন লক্ষ চৌদ্দ হাজার টাকা মূল্যের জিনিষপত্র আত্মসাত করেছেন। অভিযোগে প্রকাশ, এই এডভোকেট চেয়ারম্যান ১৪ বেল সুতা এবং ২৭ বেল কাপড় বাজারে গোপনে বিক্রি করে দেন। এগুলোর মূল্য অন্তত: ১ লাখ ৬৪ হাজার টাকা হবে। ব্যাপারটি আলোচিত হতে থাকলে তিনি বিক্রয়লব্ধ টাকা ব্যাঙ্কে জমা দিয়েছেন বলে জানান। খোঁজ নিয়ে দেখা গেল লালদীঘি শাখার ইউনাইটেড ব্যাঙ্কে তিনি ১৮ হাজার টাকা নিজের নামে জমা রেখেছেন। খবরে আরো প্রকাশ, চেয়ারম্যান সাহেব মিলের ১১ বাক্স নতুন খুচরা যন্ত্র গোপনে বিক্রি করেছেন। এগুলোর মূল্য অন্তত: এক লাখ টাকা হবে। তাছাড়া তিনি আনুমানিক ৫ হাজার পাউন্ড খোলা সুতা এবং ৮ হাজার পাউণ্ড খোলা কাপড় বিক্রয় করেছেন। এসবের মূল্য ৫০ হাজার টাকারও বেশী হবে। ধরা পড়বার ভয়ে তিনি নাকি স্টক বই, স্টক লেজার, ওয়ারহাউস স্টক ইত্যাদি গায়েব করে ফেলেছেন।

জনৈক এম-সি-এর ছোট ভাই নিযুক্ত হয়েছেন একটি টেক্সটাইল মিলসের এজেন্ট। তিনি পাকবাহিনীর আমলেও ঐ মিলটিরই কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করেছেন।

বিগত পাকিস্তানী নির্বাচনের সময় জামাত প্রার্থী ওসমান রমিজের অন্যতম ক্যানভাসার, পাকবাহিনীর বিশিষ্ট দালাল এবং অসংখ্য দেশপ্রেমিক হত্যার নায়ক এই লোকটি আজ আওয়ামী লীগ সরকারের মনোনীত মিল প্রশাসক। তাকে উৎখাত করার দাবীতে হাজার হাজার শ্রমিকের মিছিল চললেও শ্রমিক

লীগ তাকে মুক্তিবাহিনীর সাহায্যকারী আখ্যা দিয়েছে।

হক-কথা

৫ই জৈষ্ঠ্য শুক্রবার

দেশের হাল

সরকার কি সামগ্রিকভাবে একবার দেশের হাল ভাবিয়া দেখিয়াছেন?

অনাহারে মানুষ মরিতেছে। তাও একজন দুইজন নয়। ৬২ হাজার গ্রামের পরিসংখ্যান লইলে নিশ্চয় কয়েকশত হইবে। সরকার সমর্থিত ও নিয়ন্ত্রিত পত্রপত্রিকায়ই মাঝেমধ্যে না খাইতে পাইয়া আত্মহত্যা কিংবা মৃত্যুর খবর প্রকাশিত হইতেছে। একদিন এই আওয়ামী লীগই একটি লোক অনাহারে মরিলে কর্তব্য নিষ্ঠা দেখাইতে উঠিয়াপড়িয়া লাগিয়া যাইত। আজ তাহাদের সরকার বাস্তব সত্যটি যেন জানিয়াও জানিতেছেন না।

এক সময় যে দ্রব্যমূল্য লইয়া সারা দেশময় হৈচৈ পড়িয়া যাইত আজ তাহার চেয়ে শতকরা ১০০ হইতে ৫০০ ভাগ বৃদ্ধি পাইলেও সরকার হাল ছাড়িয়া বসিয়া আছেন। মধ্যবিত্ত চাকুরীজীবীদের বেতন একই রহিয়াছে, ব্যবসায়ে মন্দা গতি ধরিয়াছে, চোরাচালানে দেশ ফতুর হইয়াছে– পরিণতি স্বরূপ চাউল মণপ্রতি ৮০ হইতে ১২০ টাকা হইয়াছে, কেরোসিন সের প্রতি ৬ টাকা হইয়াছে; শ্মশান বাংলায় মানুষ কি আবার ছিয়াত্তরের মন্বন্তর আর উনপঞ্চাশ সনের দুর্ভিক্ষ দেখিতে যাইতেছে? আগামী ফসলেরইবা ভরসা কি! ডিজেল ও সারের অভাবে লক্ষ লক্ষ একর জমিতে ইরি ও বোরো ফলিতে পারে নাই। যাহাই হইয়াছিল, শিলাবৃষ্টিতে প্রচুর বিনষ্ট হইয়াছে। আউশের ক্ষেত বৃষ্টির অভাবে জ্বলিয়া যাইতেছে। ৩৫ লক্ষ টনের স্থলে এইবার ৭০ লক্ষ টন খাদ্য ঘাটতি দেখা দিয়াছে। কৃষক, মজুর, জেলে, মাঝি, তাঁতী, কামার, কুমার প্রভৃতি সর্বহারা শ্রেণী স্রেফ না খাইয়া মরিতে বসিয়াছে।

দেশে শিক্ষিত- অশিক্ষিত উভয় প্রকার বেকার রহিয়াছে। অনেক প্রতিষ্ঠিত শিল্প প্রতিষ্ঠানেও উৎপাদন শুরু হয় নাই। যে কয়টিতে শুরু হইয়াছে, মারাত্মক হারে উৎপাদন হ্রাস পাইয়াছে। তার মধ্যে রহিয়াছে প্রশাসকদের দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি। ইহাতে শ্রমিক অসন্তোষ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। চতুর প্রশাসনী যন্ত্র এই অসন্তোষকে শ্রমিক লীগের গুণ্ডামীর সাহায্যে দিকভ্রষ্ট করিতেছে। সশস্ত্র বেকারদের মধ্য হইতেই ডাকাত দল সৃষ্টি হইয়াছে। ট্রেনে, লঞ্চে আধুনিক পন্থায় ডাকাতি হইতেছে। দিনদুপুরে ব্যাঙ্ক লুট করিতেছে। শহর-বন্দরের ব্যবসায়ী ও গ্রামের নিরীহ মানুষ দুর্বৃত্তের উৎপাতে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। এই অবস্থার মধ্যে এমসিএ সাহেবরা, আওয়ামী লীগের কর্মকর্তারা, পঞ্চায়েতের চেয়ারম্যানরা দেশবাসীকে শোষণ করিতেছে, ন্যায্য রিলিফ হইতে বঞ্চিত করিতেছে। তাহাদের দুর্নীতি পূর্ববর্তী সকল রেকর্ড ভঙ্গ করিয়াছে।

আওয়ামী লীগ সরকার বাংলাদেশকে সাম্রাজ্যবাদী শোষকদের হাতে তুলিয়া দিতেছেন – এই সত্যটিও দেশপ্রেমিক মহলকে চিন্তিত করিয়াছে। ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফাণ্ডের সদস্য হইয়া বাংলাদেশ স্বাবলম্বী হওয়ার স্পৃহা হারাইয়াছে। বিশ্বব্যাঙ্কের সদস্য হইবার সকল উদ্যোগ সমাপ্ত করিয়া বাংলাদেশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দাবা খেলার গুটি হইতে যাইতেছে। বাণিজ্য ও মৈত্রী চুক্তির ফলাফলের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া আওয়ামী লীগ ভারত সরকারের আবদার এবং চাপে নতি স্বীকার করিতেছে। প্রতিরক্ষা পুরাপুরি নিয়ন্ত্রিত রাখিয়া বাংলাদেশকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারত-রাশিয়ার উন্মুক্ত সামরিক প্রান্তরে পরিণত করিবার দুরভিসন্ধিতে মাতিয়া উঠিয়াছে।

স্বাধীনতা লাভের পর দুনিয়ার সব দেশই কম-বেশী সমস্যার সম্মুখীন হইয়া থাকে। আমরা রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি। এত রক্ত বিশ্বের কোন জাতিকে অতি অল্প সময়ে দিতে হয় নাই। কিন্তু তবু আমাদের এই দশা হইল কেন? আমরা ঘরে বাইরে এত সমস্যার সম্মুখীন হইলাম কেন? শক্তির দম্ভে ও অক্ষমতার মোহে না থাকিয়া এইবার সময় আসিয়াছে সরকারকে ভাবিয়া দেখিবার। সরকার জাতিকে স্বাবলম্বী হইবার মশলা না যোগাইয়া আরাম-আয়াশ চাপিয়া দিবার কথা চিন্তা করিতেছেন। শোষক বন্ধু এইভাবেই বুঝাইয়া থাকে, সরকারকে উপলব্ধি করিতে হইবে। জনগণ ও বিরোধী দল হইতে সরকারকে আলাদা করিয়া আওয়ামী লীগ দেশের কল্যাণ কামনা করিতেছেন। প্রভুত্বমূলক বন্ধুত্ব ইহাই ভাবিতে শিখায়, সরকারকে তাহা বুঝিতে হইবে। অসাধু ব্যবসায়ী, মজুতদার, চোরাচালানী, দুর্নীতিপরায়ণ অফিসার, ঘুষখোর, এমসিএ ও প্রশাসক, পার্টিকর্মী, দুষ্কৃতিকারী– সকলকে জনগণের আদালতে বিচার করিতে হইবে। দেশের ভাল-মন্দ জনগণের অংশগ্রহণকে প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। জাতীয়তাবাদকে কেবল প্রচারে সীমাবদ্ধ না রাখিয়া জাতীয়বাধে প্রতিটি নাগরিককে স্বীয়কর্তব্য সম্পর্কে আত্মসচেতন করিতে হইবে। কথায় ও কাজে আন্তরিক, একনিষ্ঠ, সৎ থাকিয়া সকল মহলের সহযোগিতায় সকল সমস্যার সমাধান করা যাইতে পারে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার চারটি টেক্কা বাংলাদেশে প্রতিরক্ষার ভবিষ্যৎ কি?

আওরঙ্গজেব চৌধুরী

বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামকে ও প্রতিষ্ঠাকে অনেকখানি সুযোগ-সুবিধা ও সহায়তাদান করেছিল এর ভৌগলিক অবস্থান। পাকিস্তান থেকে হাজার মাইলের ব্যবধান এবং নাতিশীতোষ্ণ মন্ডলের আরণ্যক ও নদীমাতৃক প্রকৃতি হচ্ছে সেই সুবিধা। কিন্তু নবগঠিত রাষ্ট্র বাংলাদেশের জন্যে অসুবিধা ও বিপদের সম্ভাব্য ইঙ্গিতও দিচ্ছে একই ভৌগলিক অবস্থান। এবার অবশ্যই ডানে-বামে তাকাতে হবে। কোন সন্দেহ নেই, বাংলাদেশ একটি দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় রাষ্ট্র। দক্ষিণে বিস্তৃত ভারত মহাসাগর এবং বর্তমান বিশ্বে এই দু'টি অঞ্চলেই রক্তপিপাসু হায়েনাদের গতিবিধি সর্বাধিক। সুতরাং রাজনৈতিক, রাষ্ট্রিক ও সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ এলাকা হিসাবে – সামরিক দিকটিই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য – বাংলাদেশের অবস্থা ও পরিস্থিতি অবশ্যই বিচার্য। মার্কিন প্রেসিডেন্টের চীন সফরে চীন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সন্দেহ নেই, তবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে এর জন্য এক অন্ত:প্রবাহী তুমুল প্রতিক্রিয়াসজাত প্রভাব পড়েছে। কারণ, বাংলাদেশ-সংলগ্ন এই এলাকার দশটি দেশই কোন না কোনভাবে লাল চীনের ছায়াতলে বাস করে। এদের মধ্যে উত্তর ভিয়েতনাম, লাওস ও বার্মার সাথে চীনের সীমান্ত রয়েছে। সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়ায় চীনা জনসংখ্যা প্রচুর। প্রায় সবগুলি দেশেই, সর্বোপরি রয়েছে মাওবাদী গেরিলাদের তৎপরতা। এদের মধ্যে উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম, লাওস ও কম্বোডিয়া ইতিমধ্যেই ব্যাপক যুদ্ধের এলাকায় পরিণত

হয়েছে। এবং উত্তর ভিয়েতনাম বাদে ন'টি দেশই, অন্তত সরকার, মার্কিন ছাতার নীচে আছে। ডলার এসে এই দেশগুলিতে এক ধরণের স্বাচ্ছন্দ্য দিয়েছে, যার পুরোটাই ভোগ করে শাসক ও তাদের এজেন্ট শ্রেণীগুলি। মধ্যবিত্তরা নেমেছে আরো ওপরে উঠবার বক্রপথের প্রতিযোগিতায়। এজন্যেই সিঙ্গাপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ডীনকে বলতে শোনা যায় – "এখানে সবাই একটি নতুন গাড়ী ও একটি শীততাপনিয়ন্ত্রিত বাড়ী চায়। লাল চীনের পত্রিকা অনেকেই মনোযোগের সাথে পড়েন বটে, কিন্তু স্বদেশকে কেউ অনন্য একটি দেশে পরিণত করতে চান না।" এই কৃত্রিম উন্নতি জনসাধারণের কাছে মাওবাদী বিপ্লবের আবেদনকে ভাটা ধরিয়েছে। সীমান্তবর্তী এলাকা দিয়ে কম্যুনিস্ট গেরিলাদের ক্রিয়াকলাপ অনেকের কাছেই আজকাল তেমন উদ্বেগের কারণ বলে মনে হয় না। থাইল্যাণ্ডে দীর্ঘদিন যাবত বসবাসকারী একজন বলেন – "গেরিলারা এত দীর্ঘদিন যাবত আমাদের ঘিরে আছে যে তাদের অনেকেই মুখচেনা হয়ে গেছে।" তাই বলে শোষকশ্রেণী মুখচেনা হলেও শত্রুকে শত্রুই জ্ঞান করেন, উদ্বেগও যে বোধ করেন না এমন নয়, বিশেষ করে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া ও বার্মায় উল্লেখযোগ্য হারে কম্যুনিস্টদের তৎপরতা বেড়ে গেছে। মালয়েশিয়ার তথ্যমন্ত্রী তাজ শ্রী গাজ্জালী বিন শফি স্বীকার করেন যে – "আমরা নিজের গালে নিজেরাই থাপ্পর খাবো যদি ভেবে থাকি কম্যুনিস্টরা থাকবে। তবে প্রশ্ন হল কে কতো প্রাণশক্তি ধরে, – আমাদের বিশ্বাস তাতে আমরাই অধিক।" তদুপরি, ইন্দোনেশিয়ার একজন বুদ্ধিজীবী এই মত ব্যক্ত করেন যে – "দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে কম্যুনিস্ট অভ্যুত্থানের যুগ শেষ হয়ে গেছে। তুমি কম্যুনিস্ট কি না – এ দ্বারা এই নতুন যুগের ভাগ্য নির্ধারিত হবে না। গণঅসন্তোষ রূপে দেখা দেবে না"

মাওবাদী বিপ্লবী দলগুলিকে আগে পিকিং -এর হাতের পুতুল বলে মনে করা হতো। কিন্তু বর্তমানকালে মার্কিন দ্বারা পৃষ্ঠপোষিত এই সরকারগুলির ধারণা কিছু পাল্টেছে মনে হয়। এ সম্বন্ধে বার্মার একজন সরকারী কর্মকর্তার মন্তব্য উল্লেখযোগ্য– "স্থানীয় গেরিলাদের বেতার-মারফত পিকিং সবসময়েই আদর্শগত ও প্রচারগত সাহায্য দিয়ে যাবে বটে কিন্তু লাল চীনকে আমরা বোঝাতে সক্ষম হবো যে এসব কম্যুনিস্টদের দ্বারা নয়, আমাদের দ্বারাই তাদের স্বার্থ অধিক উদ্ধার হবে।"

চীনও কি তাই মনে করে? অবশ্য কম্বোডিয়া ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম বাদে চীন দক্ষিণ- পূর্ব এশিয়ায় সব ক'টি প্রতিষ্ঠিত সরকারের সাথেই সুসম্পর্ক স্থাপন করছে এবং এই যোগাযোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে ব্যাংককের একজন কূটনীতিবিদ বলেন- "তাঁরা শেষ পর্যন্ত বুঝতে পেরেছেন যে থাইল্যাণ্ডের ক্ষমতালাভের উপায় আর থাই–লাওস সীমান্তের অরণ্য–সমাকীর্ণ পর্বতমালায় নিহিত নেই। অর্থাৎ চীন বিশ্বাস করে এই এলাকার বিপ্লবী কার্যক্রমকে এখন মৃত বললেই হয়। কিন্তু বাস্তবে কি তাই? চীনের এই কূটনৈতিক তৎপরতার পশ্চাতে অন্য কোন কারণ নিহিত আছে বলে মনে হয়। বিশেষ করে রাশিয়া ও জাপানের কথা স্বত:ই মনে আসে। চীন সীমান্ত থেকে আমেরিকা যখন সৈন্য সরিয়ে নিচ্ছে বা নিতে চাচ্ছে জাপান তখন এই এলাকায় বিশাল আর্থনীতিক ক্ষেত্র প্রস্তুত করছে এবং রাশিয়া ততোখানিই প্রবেশ করছে যতখানি সুযোগ আহ্বায়ক দেশ তাকে দিচ্ছে। চীনের জন্যে শেষোক্তজনই বেশী উদ্বেগের কারণ। ইতিমধ্যে রুশ বাণিজ্যপোত সিঙ্গাপুরের ডকে ভিড়েছে এবং মস্কো থেকে যেকোন সময় থাইল্যাণ্ডের সাথে যৌথ প্রচেষ্টায় খনি সন্ধানের কথা ঘোষিত হতে পারে। ইন্দোনেশিয়া থেকে কিছুদিন

আগে ফিরে এলো ১৩ সদস্য বিশিষ্ট রুশ সাহায্য দল – ইস্পাত ও সার কারখানার সম্ভাবনা জরীপ করে। কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালিয়ে নির্বাচনে জয়ী ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্ট ফার্দিনান্দ মার্কোসও সম্প্রতি রাশিয়ার সাথে বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনা করেছেন। সর্বোপরি রুশ-ভারত মৈত্রী চুক্তি চীনের জন্যে আরো অস্বাচ্ছন্দ্যজনক হয়ে উঠেছে।

সিঙ্গাপুরের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস, রাজরত্নম বলেন – "পিকিং এখনো বিশ্বাস করে যে মাওবাদ ধীরে ধীরে সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়বে, কিন্তু সে হচ্ছে তাদের ভাবগত দিক। কলা-কৌশল ও স্ট্রাটিজি হচ্ছে অন্য জিনিস, তাতে চীন কিছু সুবিধা করতে পারছে না। পুরনো শত্রু আমেরিকা তাদের অর্ধেক দিয়েছে মাত্র। কিন্তু সোভিয়েত তাদের পুরোটাই ঘিরবে– সেখানে রয়েছে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত মহাসাগর। একে রোধ করতে চাইলে তাকে সরকারে সরকারে সম্পর্ক গড়ার নীতি গ্রহণ করতে হবে। চীন যদি তা না করে তবে দশদিক থেকেই তাকে ঘেরাও করা হবে" মনে হয় এই বিষয়ে চীন সজাগ আছে। আমেরিকার মক্কেল দেশগুলির সাথে তার বন্ধুত্ব স্থাপনে প্রচেষ্টা দেখে সেকথা মনে হওয়াই স্বাভাবিক।

চীনের নতুন কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক তৎপরতা অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে সম্প্রতিকালে। বার্মার সাথে তার দীর্ঘ দিনের শত্রুতা, জেনারেল নে উইনের পিকিং সফরের পর, শেষ হচ্ছে বলে সবাই ধারণা করছে। ঐ সফরের সমসময়েই চীনা বাণিজ্য প্রতিনিধি দল গেছে কুয়ালালামপুরে এবং ৪০ হাজার টন রাবার কিনে মালয়েশিয়ার হৃদয়কে যথেষ্ট পরিমাণে হিল্লোলিত করেছে বলে জানা যায়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় চীনকে আরো উত্তমরূপে স্বাগত জানানো হবে। তার কারণ জাপানও তার 'অর্থনীতিক সাম্রাজ্যবাদ' যা নিয়ে এই এলাকার জনসাধারণের মনে স্পষ্ট আতঙ্ক রয়েছে। বাস্তবিকই এই আতঙ্ক একেবারে অমূলক নয়। থাইল্যাণ্ড, ইন্দোনেশিয়া ও সিঙ্গাপুর জাপানেরই প্রধান অর্থনৈতিকে ক্ষেত্র এবং পুরো দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় বাজারে তার অংশীদারিত্বের সংখ্যা ক্রমশ: বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে। এই অর্থনীতিক দানব একদিন রাজনীতিক দানবে পরিণত হবে, এমন আশঙ্কা এখানকার সবার মনে। একজন ইন্দোনেশীয় কূটনীতিবিদকে ক্ষোভের সঙ্গে বলতে শোনা যায়– "এক সময় আমরা জাপানের একটি উপনিবেশ ছিলাম, আবার আমরা তার আধা-উপনিবেশ হতে চাইনা।" এইসব কারণেই জাপানের 'প্যারাসাইট' হিসাবে চীন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অধিকাংশ দেশেই অত্যন্ত আদরণীয় হয়ে উঠছে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে আমেরিকা চলে যাবে, থাকবে না কোন সাহায্য, কোন সপ্তম নৌবহর, কোন পরামর্শ, কোন ইনভেস্টমেন্ট– এই চিন্তা অধিকাংশ সরকারের জন্যই যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ। সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী লী কুয়ান ইউ মন্তব্য করেছেন– "আমেরিকা, বিশেষ করে নিক্সন প্রশাসন এখান থেকে সকল প্রভাব প্রত্যাহার করে নেবে এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়।" সত্যিই তাই। ভিয়েতনামে তার মরণ কামড় দেখে একথা আরো দৃঢ়ভাবে প্রমাণিত হল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হচ্ছে একটি 'Global power with global interests'— এবং তা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিপুল পরিমাণ পুঁজির প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের তত্ত্বটিসহ আজ পর্যন্ত এই এলাকায় দেড় বিলিয়ন ডলারের বেশী। এক সিঙ্গাপুরেই তিন শতাধিক মার্কিন ফার্ম কাজ করছে। আরো রয়েছে কুড়িটি তেল কোম্পানীর আমূল প্রতিষ্ঠা, যারা এখানে মার্কিন স্বার্থ রক্ষা করবে অনেকদিন ধরে অনেক বেশী; বলা হয় এই তেলকূপ ও কারখানাগুলি থাইল্যাণ্ডে একটি বিমান-ঘাঁটি অপেক্ষা বেশী কার্যকরী।

সুতরাং এই সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ থাকতে পারি যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া আজ যে তাস খেলতে বসেছে তাতে চীন, জাপান, রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই হচ্ছে চারটি টেক্কা। যদিও এই দেশগুলি মনে করছে যে তুরুপটি শেষ পর্যন্ত নিজেরাই তারা মারবে তবু সংলগ্ন দেশের অধিবাসী হিসাবে আমরা আশঙ্কা পোষণ না করে পারি না।

(আগামী সংখ্যায় ঃ ভারত মহাসাগরীয় পরিস্থিতির আলোকে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা)

শুনুন এবার লোক দেখানো ব্যস্তবাগীশ

সাইফ ফাতেউর রহমান–

শুনুন এবার লোক দেখানো ব্যস্তবাগীশ,
আপনি যে এক নিরেট ফাঁকা মস্ত ঢোলক,
আমরা এবার, এই জনতা, বুঝেছি তা।
আর কখনো বোকা ঠাউরে মিথ্যে আশা
ছাড়েন যদি,
আমরা কিন্তু তপ্ত শিশা,
ছাঁক লাগাবো।
ঝুড়ি ঝুড়ি বস্তা পঁচা সস্তাবুলি
ফেলুন এবার ভাগবিলে
ঘসে-মেজে মনটা এবার
ধোলাই করুন;
নইলে হুজুর, বোঝেনইতো,
সময় খারাপ–
ঘুম ভাঙ্গা এই জনতাকে সামলানো দায়।
বোঝেনইতো হাল জামানা
জনতারই
ঠকবাজীতে ইস্তফা দিন,
সাফ সুতরো মনটা নিয়ে
সামনে আসুন।
নইলে হুজুর, আমাদের তো
শরম কমই
আবর্জনা যেমন ফেলি নর্দমাতে
আপনাদেরও তেমনি করে ছুঁড়বো দূরে।

পাঠকের অভিমত

সত্যবাকের সত্য-মিথ্যা

গত ৭ই মে, দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত 'সত্য মিথ্যা' শিরোনামায় লেখা সত্যবাক সাহেবের লেখা পড়লাম। এ লেখার পৃষ্ঠে এই নগন্য পাঠিকার কিছু অভিমত রয়েছে।

হ্যাঁ, সব কথার শেষ কথা হক-কথা। তবে আমলা, তোষামোদকারী এবং ড্রইংরুমে বসে সমাজতন্ত্রের যারা কোরাস গেয়ে সরকারের সন্তুষ্টি লাভে ব্যস্ত তাদের জন্য নয় তো বটেই। 'হক-কথা' নির্যাতিত কৃষক, শ্রমিক ও মেহনতি মানুষের ভাগ্যের নির্মম হক-কথা। ২৫ শে মার্চের ঘোর অমানিশায় আপনাদের মতো সত্যকারেরাও বাদ যাননি মেঘের রাজ্যে ছুটে যেতে। তবে মওলানাকে একা ঘায়েল করেছেন কেন? ভারতে মওলানার অবস্থান আওয়ামী লীগ, কম্যুনিস্ট পার্টি, মোজাফফর ন্যাপের সমর্থকদের চেয়ে অনেকখানি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছিল না কি?

বাংলাদেশের চার নীতির এক নীতি হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষতা। এর অর্থ ধর্মহীনতা নয়। প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় এদেশের সকল ধর্মের সমান অধিকার আছে। যেদেশে শতকরা আশিজনেরও বেশী মুসলমান, সেদেশের একটা পত্রিকায় মুরিদের দরবারে যদি 'তওবা করার মাহাত্ম, তৌহিদী বিপ্লব, তাসাউফের সাধনা' ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয় তাতে অন্যায়ের কি থাকতে পারে বুঝলাম না। 'হক-কথা'য় ভারতে চোরাচালানের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়ে থাকে। অন্য পত্রিকায় সচরাচর তা দেখা যায় না। মাড়ওয়াড়ি পুঁজিপতিদের আনা-গোনার খবর প্রকাশনাকে ভারত বিরোধী প্রচারণা বলা কতটুকু সঙ্গত পাঠক মাত্রই অনুমান করবেন। প্রভুত্ব না খাটিয়ে বন্ধুত্বের দাবিতে যদি ভারত এগিয়ে আসে তবেই তাদের সাথে আমাদের সুন্দর সম্পর্ক থাকতে পারে। মওলানা ভাসানী এই কথাই বারবার বলছেন এবং এর অর্থ তাদের বিরোধিতা নয়। জেলা শহরের ঘটনা নিরেট সত্যি এবং এ সত্যি ঘটনা প্রকাশের অধিকার যদি কোন পত্রিকার না থাকে, উপরন্তু সাম্প্রদায়িকতার বীজ ছড়িয়ে যদি সত্যবাকেরা ব্যাপারটাকে ঘোলাটে করে তবে সরকারের ঘোষিত সংবাদপত্রের স্বাধীনতার তাৎপর্য কি থাকতে পারে? গত ৫ই মে বিবিসির ভাষ্যকার বিহারীদের অবস্থা বলতে গিয়ে সৈয়দপুরের একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। খালিশপুর এবং মিরপুরের ঘটনাবলী অনেকেই জেনেও যেন জানেন না। মওলানা বলেছেন দোষী ব্যক্তিদের ফাঁসী দাও। কিন্তু শিশু ও যুবতীদের উপর অত্যাচার কেন? দয়া করে খাল কেটে কুমির আনবেন না। গোমর ফাঁক হয়ে গেলে সত্যবাকেরা হতবাক হয়ে যাবেন।

যখনই কেউ হক-কথা বলেছে তখনই তাকে সত্যবাকেরা ধামাচাপা দিতে চেষ্টা করছে বা সত্যবাকদের দ্বারা নিন্দিত হতে হয়েছে। কিন্তু তাই বলে হক-কথা কখনও স্তব্ধ হয়ে যাবে না। সত্যবাক সাহেব, আমরা বুঝতে পারছি কাদের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত উৎসাহে আপনি 'সত্যবাক' সেজেছেন। কিন্তু আর নয়, কৃষক, মজুর, সর্বহারাদের চোখে ধুলো দেবার চেষ্টা করবেন না। রংচং মেখে সমালোচনা করে বাহবা পাবার দিন গেছে এখন সবাই বুঝতে, জানতে শিখেছে।

জুঁই চৌধুরী
টাঙ্গাইল

আপনার চিঠি

সমবায় দফতরের অভ্যন্তরে

জনাব সম্পাদক সাহেব,

বর্তমান সরকার দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি উচ্ছেদের কথা প্রায়ই ঘোষণা করছেন। তাদের এই ঘোষণা বাস্তবে কতটুকু কার্যকরী করা হচ্ছে তা সমবায় দফতরের কয়েকটি কার্যকলাপ থেকেই পরিষ্কার হয়ে যাবে।

সরকার ঘোষণা করেছেন যে ৫৫ বৎসরের বেশী বয়সের কর্মচারীকে অবসরগ্রহণ করতে হবে এবং তারপর আর কারো চাকুরী সম্প্রসারণ করা হবে না। কিন্তু বাস্তবে সমবায় দফতরের কতিপয় উচ্চপদস্থ সম্প্রসারণভোগী কর্মচারীকে অবসরগ্রহণের নোটিশ প্রদানের পরিবর্তে তাদের পুনর্নিয়োগের সুপারিশ করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়। এই দফতরের ডেপুটি রেজিষ্ট্রারের অবসরগ্রহণের তারিখ বিগত ৩১ শে মার্চ (১৯৭২) পার হয়ে গেলেও, রাতারাতি নতুন একটি পদ সৃষ্টি করে তাকে প্রমোশন দেয়া হয়েছে।

বর্তমান সরকারের সমবায় মন্ত্রণালয় সম্প্রতি আর একটি প্রহসন সৃষ্টি করেছেন। পাঁচ থেকে বারো বছরের অভিজ্ঞ প্রমোশনে নিযুক্ত ৬৫ জন কর্মচারী থাকা সত্ত্বেও এই মন্ত্রণালয় মাত্র চার বছরের অভিজ্ঞ ৭ জনকে সরাসরি ডেপুটি রেজিষ্ট্রার হিসেবে নিয়োগ করেছেন। অথচ স্বজনপ্রীতির বদৌলতে পদপ্রাপ্ত এই সাতজনের কেউই প্রয়োজনীয় ট্রেনিং-প্রাপ্ত তো ননই, এমনকি শিক্ষানবীসের পরীক্ষায়ও কৃতকার্য হতে পারেননি।

সমবায় দফতরের বর্তমান যে রেজিষ্ট্রার

সাহেব স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাক-বাহিনীকে খুশী করার জন্যে অনেক দেশপ্রেমিক কর্মচারীকে অযথা হয়রানী করেছেন, কেন্দ্রীয় ও প্রধান প্রধান দফতরগুলিতে মুসলিম লীগ ও জামাতপন্থী লোকদের ডিরেক্টর পদে নিয়োগ করেছেন, রাজাকার ও বদরবাহিনীর পান্ডাদের আত্মীয়-স্বজনকে গোপনে চাকুরী দিয়েছেন তিনিই এখনো তাঁর স্বপদে বহাল রয়েছেন। শুধু তাই নয়, বর্তমান সরকারের কাছেও তিনি যথেষ্ট প্রিয়পাত্র।

সমবায় দফতরের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল হেড এ্যাসিস্টেন্টের কীর্তি। কর্মচারীদের সমবায় স্টোরের সিগারেটের কার্ড রিনিউ করার নামে তিনি তা আত্মসাৎ করে বিগত এক বছর যাবৎ গোপনে কার্ডের সিগারেট তুলে চড়াদামে বিক্রি করে প্রচুর অর্থ কামিয়ে নিচ্ছেন। ব্যাপারটি ফাঁস হয়ে গেলে তিনি জনৈক রাজনৈতিক নেতার বদৌলতে পুলিশ ও সমবায় কর্তৃপক্ষের সাহায্যে তা সম্পূর্ণ চেপে যেতে সমর্থ হয়েছেন।

সমবায় দফতরের অভ্যন্তরে এই জাতীয় কার্যকলাপ এমনভাবে চলতে থাকলে তার পরিণতি মারাত্মক হতে পারে। এব্যাপারে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

খায়রুল হক ভূঞা

সন্দ্বীপবাসীদের আবেদন

জনাব সম্পাদক সাহেব,

চট্টগ্রাম জেলার বঙ্গোপসাগরের তীরে, মেঘনার মোহনায় প্রায় ১৩৫ বর্গমাইল পরিবেষ্টিত সন্দ্বীপে আড়াই লক্ষাধিক লোক বাস করে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং বন্যার ফলে এই দ্বীপের জনগণ সব সময়ই চরম দুরাবস্থার মধ্যে দিন কাটায়। বিশেষ করে বিগত ৭০ সালের জলোচ্ছ্বাসের ফলে সন্দ্বীপের ২০ সহস্রাধিক লোক প্রাণ হারিয়েছে, প্রতিটি ঘর-বাড়ীই ধ্বংস হয়ে গেছে। তার উপর আবার মেঘনার তীর ভাঙছে, শোনা যাচ্ছে বন্যার পদধ্বনি। ফলে এবার সন্দ্বীপের আড়াই লক্ষ লোক যে কি নিদারুণ দুর্দশার মধ্যে পড়বে, সেকথা কল্পনা করাও দুঃসাধ্য।

সরকারের প্রতি তাই সন্দ্বীপের হতভাগ্য অধিবাসীদের পক্ষ থেকে আবেদন, দেরি না করে সর্বহারা দ্বীপবাসীদের অন্যত্র পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা হোক।

নিবেদক–

১। মোঃ ওয়াছেক বিল্লাহ
বাটাপাড়া, সন্দ্বীপ

২। মোঃ নজরুল ইসলাম
হদ্রাখালী, সন্দ্বীপ

৩। আবুল কালাম আজাদ
মাইটভাঙ্গা, সন্দ্বীপ

৪। মোঃ মোজাম্মেল হোসেন
মগধরা, সন্দ্বীপ

ছড়া

আবু সালেহ

দিন দশেকের নোটিশ তবু
দাম কমেনা চালের
কোথায় গেল টাকা কথা
নতুন আদেশ হালের।
কোন মহাজন মানলো আইন
কে হোয়েছেন আটক–
রক্তে স্বাধীন বাংলাদেশে
চলছে ভালই নাটক।
কারবারে যে লাভ চলেছে
কে ধারে কারকথা
টাকায় এখোন বাড়ছে টাকা
মরুক স্বাধীনতা।
দেশের নেতা বাড়ান এবার
বজ্র কঠোর মুঠ
নইলে ওরা করবে আরো
তোমার আসন লুট।

মুরিদের দরবার

ভক্তের বেদনা

মোহাম্মদ হোসেন

মানুষ, জীব-জন্তু, বৃক্ষ-লতা, আকাশ, জমিন, পানি, মাটি সকল কিছুই আল্লাহর সৃষ্টি। আর এই সৃষ্টির ভিতর যে স্বভাবের প্রতিক্রিয়া হচ্ছে, এগুলোও আল্লাহ্‌র ইচ্ছাতেই হচ্ছে। ইবলীস যে মানুষকে সেজদা না করে ইবলীস হলো তাও আল্লাহর ইচ্ছাতেই হয়েছে। তার অহংবোধ আল্লাহই দিয়েছিলেন। তাই তার মধ্যে যে অহংকারের উন্মেষ হয়েছিল তার জন্মদাতা স্বয়ং আল্লাহ পাকই। আর এখন যে কাজে ইবলীস নিয়োজিত তাও আল্লাহর তরফ থেকেই পেয়েছে। অর্থাৎ ইবলীসের ক্ষমতায়ও আল্লাহ অস্তিত্ববান। আল্লাহর ক্ষমতাতেই ইবলীস পরিচালিত। মানুষের মধ্যে যে ভিন্ন ভিন্ন ভাব ও অনুভূতির উন্মেষ ঘটছে এও সেই করুণাময়েরই কারসাজি। মানুষের চেষ্টা আর ইচ্ছা, ভাল-মন্দের অনুভূতি বলতে যা কিছু বুঝায় তা' স্রষ্টা কর্তৃক সুনিয়ন্ত্রিত। আল্লাহ ইচ্ছা করলে সবকিছু করতে পারেন, মুমিন মুসলমান মাত্রই ইহা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেন। তাই আমা দ্বারা হতে পারে না এমন কোন কাজই নাই, সেই পরম করুণাময়ের ইচ্ছা থাকলে জগতের সব চাইতে বৃহৎ কাজও আমা দ্বারা সুসম্পন্ন সম্ভব, আর ইচ্ছা না থাকলে নিম্নস্তরের যেকোন কাজও অসম্ভব।

অনেকেই নিজের অযোগ্যতা আর অক্ষমতার দোষ দিয়ে নিজের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলে। তা নিছক নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ, নিজেকে বিশ্বাস করাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় বিষয়; খোদাকে বিশ্বাসের চেয়েও এর গুরত্ব কম নয়। নিজেকে নিজে যে বিশ্বাস করে না সে আল্লাহকেও বিশ্বাস করতে জানে না। এই জন্যই মহানবী (সঃ) বলেছেন : 'মান আরাফা নাফছাহু ফাকাদ আরাফা রাব্বাহু' অর্থাৎ যে নিজেকে জানে সে খোদাকেও চিনে। কিন্তু সেই নিজস্বকে জেনে খোদাকে উপলব্ধির জন্যে চাই একজন পীরের সাহচর্য। রসূলাহর (সঃ) পর আর কোন নবীর আবির্ভাব হবে না। কিন্তু মানুষকে ভুল পথ থেকে ফিরিয়ে আনতে তাঁর অনুসারী সংস্কারকের আগমন হবে। রসূলের আদর্শ অনুযায়ী মানুষকে বর্তমান যুগের ধারানুযায়ী দেশের পরিবেশ, পরিস্থিতি মোতাবেক সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে তাঁরা সদা-সর্বদা তৎপর থাকবেন। তাঁরা বাস্তব জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমনি দূরদৃষ্টি সম্পন্ন তেমনি আধ্যাত্মিক শিক্ষার বিভিন্ন স্তরেও থাকবেন পারদর্শী। মানুষের প্রতি সর্বদা দয়াশীলতা, দানশীলতা, ক্ষমাশীলতা, স্নেহ প্রবণতার পরিচয় দিবেন। প্রয়োজনবোধে অসত্যের বিরুদ্ধে চরম কঠোরতা অবলম্বন করবেন। তাতেই নবীশের অন্ত:চক্ষু উন্মোচিত হয়। তা না হলে সেই সর্বশক্তিমানের কোন কিছুই হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়।

বৃক্ষের চাড়া রোপণ করে তার চারদিক শক্ত কিছু দিয়ে ঘিরে দিতে হয়। নতুবা তৃণভোজী পশু অথবা অন্য কারো দ্বারা উহা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হতে পারে। গ্রীষ্মকালে উহারই গোড়ায় আবার পানি দিতে হয় নতুবা প্রচণ্ড খরতাপে তার জীবনীশক্তি শুকিয়ে যেতে পারে। তেমনি ভক্তকে মানুষ করতে পীরের সুনজর ও যত্নের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

অক্ষম, অযোগ্য আর অধম বলে আমাদের মধ্যে যে হতাশা রয়েছে তা আমাদের মনের দুর্বলতা বৈ কিছু নয়। মনকে এই সকল দুর্বলতার কবল থেকে মুক্ত রেখে সম্মুখ পানে চলতে হবে। সামনের বাধা-বিপত্তিকে নদীর গতির মতই ভেঙ্গে দিতে হবে। আমার মনে হয়, এই জন্যই রবীন্দ্রনাথ জীবনকে বৃক্ষের

সাথে তুলনা না করে নদীর গতির সঙ্গে তুলনা করেছেন। বৃক্ষ তার জীবনের বিকাশের পথের বাধা-বিপত্তিকে অপসারণ করতে নদীর মত তত সচল ও সক্ষম নয়। তার জন্যে চাই নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত একজন সহৃদয় লোকের যত্ন ও তত্ত্বাবধান। অবশ্য বনে-জঙ্গলে বিনা যত্নে অনেক গাছই জন্মে। কিন্তু সমাজের মানুষ নিয়ে আলোচনা করছি এই কথা মনে রাখতে হবে। যাক, বলছিলাম, নদীর গতি অপরিসীম। তার উদ্দাম, উচ্ছ্বাস, দুর্বার গতিতে সে তার পরমের দিকে ধাবিত। কিন্তু বৃক্ষের সেই স্বত:স্ফূর্ত আবেদন থাকলেও তা প্রাকৃতিক দুর্যোগ অথবা অন্য কোন না কোন কারণে অনেক সময় পরাভূত হয়। তবে বৃক্ষের নিকট আমরা সহিষ্ণুতার শিক্ষা পাই। আর নদীর কাছে অনুরাগী ভক্তের স্বতঃস্ফূর্ত আবেদন ও দুনিয়ার বাধা-বিপত্তিকে উপেক্ষা করে গন্তব্য পথে চলার প্রেরণা পাই। ত্যাগ ও তিতীক্ষার সহিত ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার মাধ্যমে বৃক্ষ আমাদিগকে অনন্তকে উপলব্ধি করবার শিক্ষা দেয়। আর নদী অনুরাগের ঝাণ্ডা হাতে সব রকম যুক্তি-তর্ক ও বাধা-বিপত্তিকে পদদলিত করে অনন্তের সাথে মিশে যাওয়ার শিক্ষাই দেয়। অতএব, পরমকে উপলব্ধির চেয়ে তার সাথে মিশে যাওয়া অনেক ভাল। নদী যখন সাগরের সাথে মিশে যায় তখন কি আর সে নদী থাকে? ভক্ত যখন সবকিছু উৎসর্গ করে স্বীয় সত্ত্বাকে ভুলে যায় তখন কি আর সে ভক্ত থাকে।

আমি ব্যক্তিটি অক্ষম ও অধম হতে পারি। কিন্তু তাই বলে আল্লাহ্ অক্ষম নন। তাঁর ক্ষমতা ও কুদরতও সীমিত নহে। তাঁর ইচ্ছায় এতিম বালক নবী হতে পারে। মেষের রাখালও মহামানব হয়ে যায়। মানুষের ক্ষমতা বলতে পৃথক কিছু নাই। নিজ কুদরতে অথবা নিজগুণে সর্বশক্তিমান সবকিছুই করতে সক্ষম। সুতরাং অযোগ্যতা ও অক্ষমতা বলে কোন কিছু আছে বলে বিশ্বাস করা যায় না। যদিও থেকে থাকে তা' আল্লাহ্র ইচ্ছাতেই আছে। ভক্তের অক্ষমতা আল্লাহর অসীম ক্ষমতারই ফল। ভক্তের যখন এই সত্যোপলব্ধি ঘটে তখনই সে সীমার মাঝে অসীমকে খুঁজে বেড়ায়। অন্য কথায় পীরের মধ্যেই সে ফানা হয়ে যায়। পীর যখন দেখতে পায়, ভক্তের নিজের বলতে কোন অনুভূতি নেই তখনই তাকে স্বীকৃতি দেন আর সন্ধান দেন আসল অসীম জগতের যেখানে ভক্ত উপলব্ধি করে বৃহত্তর 'ফানার সাধনা।' কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত ভক্তের মন-প্রাণ পীরের মধ্যে কেন্দ্রীভূত না হয় ততক্ষণ পর্যন্তই ভক্তকে হতে হয় কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন। এই সময় ভক্তও নিজের অযোগ্যতা ও অক্ষমতাকে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে সেই করুণাময়ের নিকট মোনাজাত করে- অযোগ্য যদি হই যোগ্য করে নাও! অক্ষম হই সক্ষম করে নাও!! আমাকে যদি অশুদ্ধ থেকে বিরত রাখতে না পারো তবে তোমার স্বয়ংসম্পূর্ণতা কোথায়! যদি হীনকে উন্নত করতে না পার আর পাপীকে উদ্ধার করতে না পার তবে তোমার মহিমাই বা কোথায়!! যদি আমার মনের উপর তোমার নিয়ন্ত্রণ না খাটে তবে তুমি সর্ব নিয়ন্ত্রণাই বা কোথায়!! যদি আমার ইচ্ছার উপর তোমার ইচ্ছার প্রভাব না খাটে তবে তোমার ইচ্ছা চরমই বা কোথায়!!!

আমার জবাব

প্রশ্ন

অবিনাশ ভৌমিক
লক্ষীবাজার, ঢাকা

হুজুর, আপনার 'হক-কথা'র কোন সংখ্যায়ই ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির কর্মী অথবা নেতার দালালী কিংবা দুর্নীতি সম্পর্কে রিপোর্ট দেখতে পেলাম না। আপনি কি মনে করেন এসব দোষে দুষ্ট আপনার পার্টিতে কেউ নেই?

উত্তর

আমাদের ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিতে দালাল ও দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তি নাই – এই কথা যেমন জোর গলায় বলতে পারি না, ঠিক তেমনি 'আছে' তাও সঠিক করিয়া উল্লেখ করিতে পারি না। কারণ, এই ধরনের রিপোর্ট যাহাদের বিরুদ্ধে ছিল স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে বিস্তর আলোচনা হইয়াছে। ইহার পরও যদি থাকে তবে আমাকে সপ্রমাণ জানাইলে নিশ্চয়ই এ্যাকশন নিব। আপনিই যদি প্রশ্নটির সহিত দুই-একটি নজির পাঠাইতেন তবে অবশ্যই সেমতে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতাম। 'হক-কথা'য় প্রকাশের জন্য যদি কোন নাগরিক আমার পার্টির সদস্য, কর্মী অথবা নেতা সম্পর্কে অভিযোগ প্রেরণ করে সত্য প্রমাণিত হইলে অবশ্যই উহা ছাপা হইবে।

প্রশ্ন

ফাতিমা ফিরোজ, কুমিল্লা

সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগে অভিযুক্ত হতে হয় এমন কথা থেকে আপনি বিরত থাকছেন না কেন?

উত্তর

৬৫ বৎসরের রাজনৈতিক জীবনে কখনো আমার ভূমিকা ও বক্তব্যকে জাতি-ধর্ম-শ্রেণী নির্বিশেষে মানিয়া লইতে দেখি নাই। একটি মহল বরাবর পাল্টা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আজও ইহার পুনরাবৃত্তি হইতেছে। ব্যাপারটি খুবই স্বাভাবিক। বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিতে পারে এমন কথা ছাপাইয়া জনমতকে খণ্ডিত করার উদ্দেশ্যে এইসব প্রচার চলিতেছে। কিন্তু ইতিহাস ও সত্যদ্রষ্টা জানে- আমি কাফের, আমি হিন্দুস্থানের দালাল, আমি হিন্দুঘেঁষা, আমি ইসলামের ঘোর শত্রু ইত্যাদি অপবাদ যেমনি কালের বিচারে মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছে, ঠিক তেমনি প্রমাণিত হইবে আমি সাম্প্রদায়িক নই, আমি চক্রান্তকারী নই। বরং আমি বাংলাদেশের শুধু নয়, ভারতেরই শুধু নয়- সারা বিশ্বের নির্যাতিত, বঞ্চিত শ্রেণী তথা কৃষক-শ্রমিকের কল্যাণ কামনা করিয়া কথা বলি, কাজ করি এবং সংগ্রামে অবতীর্ণ হই। এই সংগ্রামে আমি আপোষহীন, বিরামহীন। এই জন্যই সুবিধাবাদী মহল, পুঁজিবাদী, সামন্তবাদী, সাম্রাজ্যবাদী – তিনি অফিসার, ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ, সমাজকর্মী যা-ই হউন না কেন আমাকে বরদাশত করিতে পারেন না। পূর্বেই বলিয়াছি, আজও তাহাই ঘটিতেছে। তাহারাই চক্রান্ত করিয়া একটি বক্তব্য দাঁড় করাইতেছে: আমি সাম্প্রদায়িক ও আমি স্বাধীনতা নস্যাৎকারী। আসলে তাহারা বুঝিতেই পরিতেছে না – এই অপপ্রচারই হিন্দুকে হিন্দু, মুসলমানকে মুসলমান হিসাবে গোঁড়া করিয়া তুলিতেছে। অমুসলমানদের স্বার্থেহানি ঘটিয়াছে কিংবা মনে আঘাত লাগিয়াছে আমার এমন একটি কাজের নজিরও শত্রু শিবির তুলিয়া ধরিতে পারিবে না। এবং হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি বাড়ে এমন কাজ করিয়া এই জীবনে আমি কত গালিগালাজ যে শুনিয়াছি তাহার ইয়াত্তা নাই। আমি হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের জমিদার, জোতদার ও মহাজনদের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়াছি। অর্থনৈতিক শোষণে এবং রাজনৈতিক অধিকার আদায়ে হিন্দু - মুসলমানে কোন প্রভেদ নাই এই বিশ্বাস লইয়া আমি বাংলা ১৩২০ সাল হইতে কৃষক-মজুরের আন্দোলন শুরু করিয়াছি।

যাহোক, আপনার প্রশ্নটিতে দরদও ফুটিয়া উঠিয়াছে। আপনি হয়ত আমাকে ভালবাসেন। তাই চান না যে আমি এমন অভিযোগে অভিযুক্ত থাকি। কিন্তু প্রথমেই ভাবিয়া দেখুন, কি উদ্দেশ্যে এবং কিসের ভিত্তিতে বিশেষ মহল এইসব কথা প্রচার করিতেছে। তাহাদের উদ্দেশ্য জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সর্বহারা মানুষের ঐক্য বিনষ্ট করিয়া নিজেদের শাসন ও শোষণ বলবৎ রাখা। আর

তাহাদের বক্তব্যের ভিত্তি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। ভারতের শোষকশ্রেণীর ধ্বংসাত্মক কাজের বিরুদ্ধে কথা বলিলে আমি সাম্প্রদায়িক হইয়া গেলাম, কোন্ রাজনীতি সচেতন লোক ইহা বলিতে পারে? আমি যাহা বলিতেছি তাহা গোপনীয় কোন কাজ সম্পর্কে নয়, বরং প্রকাশ্য দিবালোকেই তাহা ঘটিতেছে। প্রতিটি অমুসলমানের অধিকার সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ন থাকুক, ইহাও আমি বলিতেছি। আমি চাই, সকল ধর্মাবলম্বী নিজ নিজ ধর্মের মৌল রীতিনীতি গোঁড়ামীমুক্ত মানসিকতায় শিক্ষা লাভ করুক সরকার যদি এই দায়িত্ব গ্রহণ করিতে না চান – স্পষ্ট ভাষায় অচিরেই তাহা জানাইয়া দিতে পারেন। জনগণ যদি ইহার আবশ্যকতা বোধ করে তবে তাহারা আগের মত নানাবিধ সাহায্যে ধর্মশিক্ষা গ্রামে-গঞ্জে বহাল রাখিবেন।

বড় বড় বই পড়িয়া অনেক তত্ত্বকথা জানা যায়, অনেক ফর্মূলা, থিওরী ইত্যাদির সহিত পরিচিত হওয়া যায়। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের নাড়ি বুঝিতে হইলে শুধু বই পড়িয়া রাজনীতি করিলেই চলিবে না তাহাদের সহিত একাত্ম হইয়া যাইতে হইবে। আমি একাত্ম হইয়া বুঝিয়াছি। বাংলাদেশের মানুষের সমস্যার সমাধান একমাত্র সমাজতন্ত্রই দিতে পারবে। আমি উপলব্ধি করিয়াছি – বাস্তব জীবনের গতিশীলতার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা আত্মিক উন্নতিও কামনা করে। মনের ভাসায় এই সত্যটি বাংলাদেশের কৃষক- মজুর শ্রেণী আমাকে জানাইয়াছে। মুষ্টিমেয় কয়েকজন শিক্ষিত লোক এই উপলব্ধিকেই কি বলিতেছে সাম্প্রদায়িকতা?



ইহা কি সত্য?

॥ ৫৮ ॥

সীমান্তবর্তী জেলার যেসব অসৎ ব্যবসায়ী চোরাচালানের জন্যে পশ্চিমবঙ্গে যাতায়াত করেন তাদেরকে বড় বাজারের মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীরা বিনামূল্যে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে দেন। মালপত্র বহনে এই মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী চক্র পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রী আশুতোষ ঘোসের ট্রাক ব্যবহার করেন। ইতিপূর্বে চোরাচালানে নিয়োজিত এই ট্রাক বেনাপোল সীমান্তে আটক করা হয়। কিন্তু মালপত্রগুলি খুলনার শুল্ক বিভাগের হেফাজতে রেখে বাংলাদেশ মন্ত্রীসভার প্রভাবশালী ব্যক্তিদের ইঙ্গিতে ট্রাক ছেড়ে দেওয়া হয়। পশ্চিমবঙ্গের এই প্রাক্তন মন্ত্রীর সঙ্গে এ দেশের উর্ধতন মহলের দহরম-মহরম হয়েছে বলেই হয়তো চোরাচালানীরা এই বিশেষ ব্যক্তির ট্রাকটি ভাড়া করা নিরাপদ মনে করে।

॥ ৫৯ ॥

ভারত সফরকারী হকি দলের অধিনায়ক কি দালাল নন? স্বাধীনতা সংগ্রাম চলাকালীন তিনি পাকিস্তানী দলের সাথে স্পেনে হকি খেলতে গিয়েছিলেন। ভারত হেরে গেলে তিনি বলেছিলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারতকে হারিয়ে দেয়া মানে সত্যের জয় হওয়া। প্রসঙ্গত: আর একটি অভিযোগ হল: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হকি টিম বলে পরিচয় দিলেও তাতে দু'জন খেলোয়ার আদৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নয়।

॥ ৬০ ॥

সম্প্রতি বি আই ডব্লিও টি এ অফিসের হিসাবরক্ষক বিভাগীয় পরিচালকের নির্লজ্জ স্বজনপ্রীতির ফলে এই দপ্তরের পাঁচজন এ্যাকাউন্টস এ্যাসিস্ট্যান্ট তাদের চেয়ে নিষ্ঠাবান এবং চার-পাঁচ বছরের সিনিয়র কর্মচারীকে ডিঙিয়ে পদোন্নতি ঘটেছে। এই বিভাগীয় পরিচালক ব্যক্তিটি বিগত মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকবাহিনীর ছায়াতলে থেকে অনেক রিপিয়ারীং বিলের অ্যাডভান্স পেমেন্ট করে দিব্বি দু'পয়সা কামাই করেছিলেন এবং নিজের নিরাপত্তার জন্যে ক্যান্টনমেন্টে তিনি হানাদারবাহিনীর আশ্রয় বাস করেছেন।

॥ ৬১ ॥

ময়মনসিংহ জেলা সদর কোতয়ালী থানার ৪ নং পরানগঞ্জ ইউনিয়নের রিলিফ কমিটির চেয়ারম্যান গগনচন্দ্র সাহা রিলিফ দ্রব্য ও টাকা–পয়সা আত্মসাৎ করে চলেছে। সামান্য অর্থ সাহায্য করে বেশী টাকার টিপসই করে নেয়া, কোন কোন ক্ষেত্রে অর্থ সাহায্য না করেই তাদের নামে সাহায্য দেখানো এবং গরীব কৃষকদের ১৬ টাকা, ১৮ টাকা দরে মাটি কাটিয়ে সরকারী কাগজপত্রে ২০ টাকা হারে মজুরী দেখানো প্রভৃতি জঘন্য কাজে সে লিপ্ত রয়েছে। এই ব্যক্তিটি আইয়ুবের শাসনকালে দুর্নীতির অভিযোগে ২০ হাজার টাকা জরিমানা ও ৫ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিল।

এই দুর্নীতিবাজ চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানিয়ে স্থানীয় জনসাধারণের পক্ষ থেকে ছাত্রনেতা আ.স.ম. আবদুর রবের নিকট একটি আবেদনপত্র পেশ করা হয়েছে।

॥ ৬২ ॥

গত ৫ই মে বাগেরহাট টাউন ক্লাবে মুজাফফর ন্যাপের কর্মী সম্মেলনের প্রধান অতিথি জনৈক এম সি এ বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সম্পর্কে অত্যন্ত অবমাননাকর বক্তৃতা দিয়েছেন। এই এম সি এ তার ভাষণে বলেছেন যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে মুক্তিবাহিনীর কোন অবদান নেই। মুক্তিবাহিনী নাকি শুধু জঙ্গলে পালিয়ে বেড়িয়েছে এবং ফুটফাট করেছে। আর পাকিস্তানী সৈন্য দেখলে প্রাণভয়ে পালিয়েছে। এই এম সি এ সাহেবের মতে ভারতীয় সৈন্যরাই বাংলাদেশের স্বাধীনতা এনে দিয়েছে। সুতরাং এখন যারা স্বাধীনতা সংগ্রামী বলে দাবী করে তারা সুযোগ সন্ধানী এবং দেশের শত্রু।

॥ ৬৩ ॥

মোমেনশাহী কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ভবনে কর্মরত ২৫ শে মার্চের পর যে তিনজন পিয়নের চাকুরী চলে গিয়েছিল তাদের দু'জনের পুনঃনিয়োগ হয়েছে। চাকুরীতে বহাল করার জন্যে আবেদন জানালেও একজনকে উপচার্য সাহেব না- পছন্দ করেন এবং তার পরিচিত এক ব্যক্তিকে সেস্থলে নিয়োগ করেন।

চট্টগ্রাম ও খুলনার জন্যে 'হক-কথা'র সংবাদদাতা এবং বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি আবশ্যক। ইচ্ছুক ব্যক্তি সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

সম্পাদক ঃ সৈয়দ ইরফানুল বারী, সন্তোষ, টাঙ্গাইল। মুদ্রণে ঃ শান্তি প্রেস, টাঙ্গাইল।

প্রতি কপি বিশ পয়সা সাপ্তাহিক রেজিষ্টার্ড নং - ডিএ ১৭৬

হক-কথা

(WEEKLY THE HAQ-KATHA)

প্রকাশক ও পৃষ্ঠপোষক ঃ মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

প্রথম বর্ষ ত্রয়োদশ সংখ্যা শুক্রবার ১২ই জৈষ্ঠ্য ১৩৭৯; ২৬ শে মে, ১৯৭২, ১৩ই রবিউসসানি ১৩৯২। সন্তোষ, টাঙ্গাইল

লক্ষাধিক বামপন্থী হত্যা করা হবে

বাংলাদেশে বামপন্থীদের ভাগ্যাকাশে মহাদুর্যোগ নেমে আসছে বলে আজ আর মোটেই বাড়িয়ে বলা হবে না। আর নেমে আসবারই বাকী রয়েছে কী, তাও আমরা ভেবে পাচ্ছি না।

এক সময় জামাতে ইসলামকে দিয়ে যে পরিকল্পনা কার্যকরী করার ছিল, স্বাধীন বাংলাদেশে তারই পুনরাবৃত্তি হবার সকল আলামত দেখা দিয়েছে। একটি বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থা বিশেষ প্রোগ্রামে এদেশে কাজ করে যাচ্ছে। তাদের হিসেব হল, বাংলাদেশে সোয়া লক্ষ বামপন্থী কর্মীকে হত্যা করতে হবে। তা না হলে শোষণের হাতিয়ার মজবুত রাখা যাবে না। এসব বামপন্থী বলতে বুঝানো হয়েছে বিশেষ করে তাদেরকেই যারা মার্কসবাদ- মাওবাদ বিশ্বাসী, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও এর দালাল বিরোধী, সোভিয়েত সংশোধনবাদ ও তার প্রভাব কিংবা হস্তক্ষেপ বিরোধী, ভারতীয় শাসক ও বণিক গোষ্ঠীর শোষণ বিরোধী এবং যারা খাঁটি জাতীয়তাবাদী হিসেবে যে কোন প্রকার শোষণ ব্যবস্থার বিরোধী ও শ্রমিক জগতের প্রগতিশীল কর্মী, কৃষক সমাজের ত্যাগী সুহৃদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সচেতন আন্দোলনকারী, কারিগরি ও প্রশাসনে দক্ষ বামপন্থী- সবাই কোন না কোন উপায়ে এই মহাষড়যন্ত্রের টারগেট।

অতি সম্প্রতি কালে বাংলাদেশের আনাচে কানাচে জাকিয়ে বসেছে ভারতীয় কুখ্যাত গোয়েন্দা সংস্থা রুথলেস র‍্যাড। প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর নিজস্ব গোয়েন্দা সংস্থা হিসেবে তা বরাবরই কাজ করে আসছে। এই সংস্থাটির ব্যবস্থাধীনে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম চলাকালীন বামপন্থীদেরকে কোনঠাসা ও হত্যা করা হয়েছে। ডাক্তার, সাংবাদিক, রিলিফ অফিসার ইত্যাদি সেজে তারা জাল পেতেছে গোয়েন্দাগিরি করবার। উৎসাহী বহু বামপন্থী যোদ্ধা ধরা পড়ে প্রাণ হারিয়েছে। আর যাদেরকে সে জালে ফেলা যায়নি ব্রেন ওয়াশ করে তাদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছে মুজিববাহিনীকে। বাংলার সচেতন নাগরিক মাত্রই জানেন, স্থানে স্থানে বামপন্থী গ্রুপের উপর অতর্কিত সশস্ত্র আক্রমণ হয়েছে। অকালে এবং বিনা প্রয়োজনে অনেকে এমনি ভাবে প্রাণ হারিয়েছে। স্বাধীনতার পরপরই আর যে যা-ই করুক এই রির্সাচ এ্যাণ্ড এ্যানালিটিক্যাল ডিভিশন (র‍্যাড) বাংলাদেশে গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা এবং স্থানে স্থানে তাদের নিজস্ব লোক বসানোর জন্যে উঠে পড়ে লেগে যায়। চট্টগ্রাম বন্দর, বাংলাদেশ শিপিং

কর্পোরেশন, নদী পরিবহন সংস্থা, বাংলাদেশ বিমান, বন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে ইতিমধ্যে তারা 'সুজন' এবং ' 'মেসেঞ্জার' নিয়োগ করতে সক্ষম হয়েছে। সুজন ও মেসেঞ্জার এ দুটি র‍্যাডের কোড শব্দ! সামরিক, বেসামরিক বিভিন্ন স্তরে তারা প্রভাব খাটানোর পুরাপুরি আয়োজন সমাপ্ত করেছে তা বলাই বাহুল্য। গত জানুয়ারী মাসেই তারা পরিবার পরিকল্পনা, সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার এবং ম্যালেরিয়া ইরাডিকেশন বিভাগত্রয় থেকে গোটা বাংলাদেশের নানাবিধ পরিসংখ্যান হাত করে নেয়। তাদের পূর্ববর্তী ইনফরমেশন ও উক্ত পরিসংখ্যান মিলিয়ে ৬২ হাজার গ্রামের মায়-মাতাব্বর, ৯৬ হাজার মসজিদের ইমাম, ৫৬ হাজার বাজারের ইজারাদার ইত্যাদি সম্পর্কে ধারাবাহিক খুঁটি-নাটি সংগ্রহ করে। তাদেরই সোর্সে এবং সর্বশেষ রিলিফ কমিটি ও পঞ্চায়েতী ব্যবস্থায় এদেশের বামপন্থী কর্মী ও প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে নাড়ি নক্ষত্র নখদর্পণে নিয়ে নেয়। এ রুথলেস র‍্যাডের উদ্যোগে সম্প্রতি ভারত এবং বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে প্রগতিশীল কর্মীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক একটা বোঝাপড়া হয়েছে। তাতে উভয় দেশের মধ্যে অস্ত্র পাচার এবং বামপন্থী দমন জনিত খবরা-খবর আদান-প্রদানের শর্ত রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে ভারতীয় সৈন্যের অপারেশন এর প্রাথমিক আলামত।

স্বাধীনতা সংগ্রামচলাকালীনই ছককাটা বামপন্থী নিধন পরিকল্পনার প্রয়োগ ধারা সবার অলক্ষ্যে এগিয়ে চলছে। ঠিক সবার অলক্ষ্যে নয়- কারণ, সবাই জেনেও না জানার ভান করেছে। দু' একটি সাপ্তাহিক লিখছে দু' একজন মুখ ফুটে বলছে। কিন্তু জনগণ মহাপরিকল্পনার ভয়াবহতা থেকে আজও অনেক দূরে।

স্বাধীনতা সংগ্রাম চলাকালে বরিশাল, খুলনা, যশোর, পাবনা ও টাঙ্গাইলে বহু বামপন্থী মুক্তি সেনাকে হত্যা করা হয়েছে। পাকবাহিনীর মত মুজিবওয়ালারা বামপন্থী ছাত্রীদেরকে অপহরণ, ধর্ষণ ও হত্যা করেছে। যেসব বামপন্থী মুক্তিযোদ্ধা পাক-ফৌজের কবল থেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকা মুক্ত করার গৌরব অর্জন করেছে তাদেরকেও পরিকল্পিত পন্থায় হত্যা করা হয়েছে। এমনিভাবে পাবনায় টিপু বিশ্বাস, ওসমান আলী, সামসুর রহমান, আজিজুল হক, আক্তারুজ্জামান বাদশা, বাহেজ আলী ফ্যাসিষ্ট মুজিববাদীদের হাতে প্রাণ হারিয়েছে। পাবনা ও সিরাজগঞ্জের স্কুল - কলেজ প্রাঙ্গণে দিবালোকে কয়েকজন বামপন্থী ছাত্রকে হত্যা এবং ছাত্রীকে অপহরণের রেকর্ডও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জয়পুরহাট কলেজের ছাত্রী রাফিয়া খানমকে গত জানুয়ারী মাসেই এই পশুরা গুম করেছে। রাজধানী ঢাকায়ও অসংখ্য অপহরণ ও হত্যা অবলীলাক্রমে চলছে।

এই ঘটনাপ্রবাহ কি যোগসূত্রবিহীন কিংবা বিচ্ছিন্ন? মোটেই নয়। বরং এর সাথে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে আওয়ামী লীগের লালবাহিনী গঠনের ইতিহাস।

বাংলাদেশে সরকারের মিলিশিয়া গঠনের পরিকল্পনাটি বাতিল করিয়ে এই কুখ্যাত রুথলেস র‍্যাডই একটি ত্রাস সৃষ্টিকারী বাহিনী গঠনের পরিকল্পনা চাপিয়ে দেয়। জুন মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে এর আলামত শুরু হবে বলে আগাম ঘোষণা দেয়া হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে তাদের কার্যক্রম এগিয়ে চলছে। তা হল বামপন্থী হত্যা আর প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠান ধ্বংস।

কিন্তু মুজিব সরকার কি ভেবেছেন রুথলে র‍্যাডের ভয় করে শ্রীমতি ইন্দিরা যেভাবে পশ্চিমবঙ্গে রক্ত গঙ্গা বহায়ে যাচ্ছেন- সেই পথ লক্ষ্য করে বাংলাদেশে বামপন্থী আন্দোলন সমূলে ধ্বংস করে দিতে পারবেন? মানুষ তো মরছেই। না খেয়ে মরছে,

ডাকাতের হাতে মরছে। কিন্তু রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড চাপিয়ে দেশে কি শান্তি ও সমৃদ্ধি আনা যাবে?

মওলানা ভাসানী সমীপে পাঠান ক্যাপ্টেনের চিঠি

পাকিস্তান আর্মি থেকে বহিষ্কৃত এক পাঠান ক্যাপ্টেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী সমীপে একজন দালাল ও যুদ্ধাপরাধী সম্পর্কে চিঠি লিখেছেন। চিঠিটির বঙ্গানুবাদ নিম্নে দেয়া হল।

লণ্ডন ১৫ই মে

মওলানা সাহেব,

আসসালামু আলাইকুম। একই চিঠি আমি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে লিখেছি। সেখানকার সংবাদপত্রেও। ভাবলাম, আপনাকে না জানালে কাজটা সঠিক করছি না।

আমি পাকিস্তান আর্মিতে ছিলাম। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের প্রথমদিকে আমার ডিভিশনকে কোয়েটা থেকে আপনার দেশে নিয়ে যাওয়া হয়। পুরো ডিভিশনটাই ঢাকায় আসে। আপনার দেশবাসীর জন্যে যা ঘটেছিল তখন থেকেই আমি তাতে শরীক ছিলাম। অবশেষে কর্তৃপক্ষের বশংবদ নই বলে কোর্ট মার্শালে আমার বিচার হয়। একে তারা বলল দেশের প্রতি অনানুগত্য। পাকিস্তান আর্মিতে আমি ছিলাম একজন ক্যাপ্টেন। ১৯৭১ সালের ২২ শে আগষ্ট অসম্মানের সাথে আমি বহিষ্কৃত হই।

এই চিঠি লেখার আমার মূল উদ্দেশ্য হল আপনাকে জানিয়ে দেয়া – যে ব্যক্তিটি বিশেষ করে চাঁদপুর গোয়ালন্দের গণহত্যা এবং ইঞ্জিনিয়ারদের হত্যার জন্যে প্রত্যক্ষভাবে দায়ী সে-ই একটি দায়িত্বপূর্ণ পদ দখল করে বসে আছে। তিনি হলেন তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তান শিপিং কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান ক্যাপ্টেন রহমান। তিনি ছিলেন দুষ্টের শিরোমণিদের একজন। এমনকি আচরণে তিনি বর্বর পাঞ্জাবিদেরকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। বিস্ময়ের সাথে আমি দেখতাম এই লোকটি মুসলিম লীগ, জামাতে ইসলামী, গভর্ণর এবং আর্মির সাথে সরাসরি যোগাযোগ রাখছে। আমার ধারণা, বদমাশ গভর্ণর মালিকের সাথে তার আত্মীয়তা রয়েছে। জেনারেল ফরমান আলীর বিশ্বস্ততম ছিলেন তিনি। সভা চলাকালীন অন্যান্য বাঙ্গালী অফিসারদের উপস্থিতিতে তিনি এমনকি আর্মীকে বিবরণী দিতেন। তার বাসভবনে জেনারেল আকবরকে দাওয়াত দেন। তাতে অন্যান্য জেনারেলরাও যোগ দেন। এতে একজন মাত্র বাঙ্গালী অফিসার ছিলেন। তিনি হলেন এইচ, আর, মল্লিক।

আমি ভেবেই পাচ্ছি না বর্তমান শাসনামলে কি করে তিনি এত গুরুত্বপূর্ণ একটি পদে থাকতে পারেন। যুদ্ধ অপরাধের জন্যে যদি পাঞ্জাবিদের বিচার করা হয়, ক্যাপ্টেন, রহমানও বিনা বিচারে থাকতে পারেন না।

আমি একজন পাঠান। আমার এলাকায় তা যদি ঘটত– আমি তাকে হত্যা করতাম। আমি আশা করি, আপনি এটিকে জনসমক্ষে তুলে ধরবেন।

আর তাকে শাস্তি দিবেন। আমি পাকিস্তান ছেড়ে দিয়েছি। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

বাংলাদেশের মে মাস

আজ থেকে প্রায় শতাব্দী কাল আগে, আমেরিকার শিকাগো শহরে ৮ ঘন্টা শ্রমনীতির দাবীতে বিক্ষোভরত শ্রমিকদের উপর পুলিশের গুলী বর্ষণে নিহত শ্রমিকদের পবিত্র স্মৃতি তর্পণের দিন হিসেবে ইংরেজী মে মাসের প্রথম দিনটির আবেদন আজ বিশ্বজনীন আবেদনে পরিণত হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে সে মাসটি যেন কলকারখানার শেডে শেডে সংখ্যাহীন শ্রমিকের মনে এনে দেয় বিসুভিয়াসের তপ্ত লাভাস্রোতের উষ্ণতা। বিশ্বব্যাপী শ্রমিক আন্দোলনের জন্মলগ্ন এই লাল পতাকার মাসটিতে। তাইতো আজো বজ্র নির্ঘোষে ঘোষিত হয় শ্রমজীবী মানুষের প্রদীপ্ত আহ্বান "দুনিয়ার মজুর এক হও"।

স্বাধীন বাংলায় এবার আগুনের ফুলকী ছড়িয়ে, লাখো শহীদের রক্তে রক্তলাল পলাশের পতাকায় আগমনী ঘোষণা করে শ্রেণী সংগ্রামের ডাক দিয়ে গেছে ঐতিহাসিক মে মাস। বিধ্বস্ত বাংলার শিল্পকারখানার চাকাগুলো চালু করার সঙ্গে যখন দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের সম্ভাবনা জড়িত ঠিক সেই দিনগুলোতেই সুযোগ সন্ধানী মজুতদার, মুনাফাখোর, আর লুটপাট সমিতির সদস্যদের কূট ষড়যন্ত্রের ফলে বাংলাদেশের অধিকাংশ কলকারখানাগুলোই আজ বন্ধ। শিল্প কারখানাগুলোই অবস্থা এমন এক পর্যায়ে এসে পড়েছে যে সেগুলোর আশু চালুকরণও সম্ভব নয়। সরকার কর্তৃক সুবিধাবাদী ও অনভিজ্ঞ প্রশাসক নিযুক্তিকরণ, শ্রমিক প্রতিষ্ঠানের নামে শ্রমিকদের ন্যায্য আন্দোলনের পথে বাধা সৃষ্টিকারী গুণ্ডাদের কলকারখানার যন্ত্রপাতি লুট করে নেয়া, শ্রমিক আন্দোলনে বিভেদ সৃষ্টি করা, নিরীহ শ্রমিকদের রক্তে শিল্পাঞ্চলের মাটি লাল করে তোলা, সর্বোপরি শ্রমিক দলের নামে সশস্ত্র ফ্যাসিষ্টবাহিনী গড়ে তোলা এসবই আজ শ্রমিক শ্রেণীর অগ্রগতি এবং সুষ্ঠুট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন গড়ে তোলার পথে বিরাট হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছে।

উপরোক্ত ঘটনাগুলো ঘটেছে এই মে' মাসেই - যে মাসে মে দিবস উপলক্ষে বিশেষ মহলের অজস্র শ্রমিক জমায়েত, লাল পতাকার মিছিল চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছে অনেক নির্যাতিত, সর্বত্যাগী শ্রমিক নেতাদেরও ঘটেছে সেই শ্রমিক আন্দোলনের প্রথম বিস্ফোরণের স্মৃতি বিজড়িত মে মাসেই - যে মাসে শ্রমিকদের কথা বলতে গিয়ে গদগদ হয়ে কেউ কেউ কখনো শ্রমিকদের ন্যায্য আন্দোলন করতেও বারণ করছেন, তিন বছর খেটে গামছা বেধে বায়ুভূক হবার পরামর্শ দিচ্ছেন আবার কখনও আত্মতৃপ্তির চরম পুলকে বলে ফেলছেন "কৃষক-শ্রমিক রাজ কায়েম হয়ে গেছে।"– সব শোষনের পথ বন্ধ।

কিন্তু বাংলাদেশের কলকারখানাগুলোর অভ্যন্তরে ব্যাপারটা কি ঘটছে? প্রকৃতপক্ষে সারা দেশ জুড়ে নেমে এসেছে এক

হৈ হুল্লোড় আর গুণ্ডামী করে শ্রমিক জগতের সমস্যা ধামাচাপা দেয়া হয়েছে।

বেকারত্বের চরম অভিশাপ। কারণ, দেশের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ৭০ ভাগ কলকারখানা এখনো চালু হয়নি। বিস্কুট, সিগারেট, প্লাষ্টিক, রাবার, সাইকেলের খুচরা অংশ এবং ক্ষুদ্র শিল্প কারখানার শতকরা ত্রিশ থেকে পঁত্রিশ ভাগ চালু রয়েছে। প্রয়োজনীয় সুতার অভাবে এবং টাকু নষ্ট হয়ে যাওয়ায় শতকরা নব্বই জন তাঁত ব্যবসায়ীর কাজ বন্ধ। লক্ষাধিক চা- শ্রমিকও আজ প্রায় বেকার। এমনিভাবে প্রায় প্রতিটি শিল্প কারখানার শ্রমিকরা আজ দ্রব্যমূল্যের চরম উর্দ্ধগতির যুগেও বেকারত্বের দুঃসহ যন্ত্রণায় ভুগছে।

সম্প্রতি কয়েকটি ব্যাঙ্ক এবং শিল্পসংস্থা জাতীয়করণের মাধ্যমে সরকার সমাজতন্ত্র কায়েমের কথা জোরেশোরে ঘোষণা করেছেন। কিন্তু এটা একটা মস্তবড়ো ধাপ্পা ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ, রাষ্ট্রের মালিকানায় শিল্পসংস্থা পরিচালিত হওয়া

মোটেই বড় কথা নয়- বরং রাষ্ট্রযন্ত্রে অধিষ্ঠিত লোকগুলোর শ্রেণীচরিত্র বিশ্লেষণে এর ফাঁকিটাই সম্পূর্ণ বড়ো হয়ে দেখা দেয়। জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করে সরকার যেমন কৃষকের কোন উপকার করতে পারেনি বরং নিজেই জমিদার সেজে গিয়েছিল। কারণ, রাষ্ট্রযন্ত্রে কৃষকের কোন প্রভাবই ছিল না, ঠিক তেমনি যে রাষ্ট্র মেহনতি মানুষের রাষ্ট্র নয় সেই রাষ্ট্রের মালিকানায় ব্যাঙ্ক বা শিল্প জাতীয়করণের মাধ্যমে শোষণের ব্যবস্থাকেই দৃঢ় করা হয়। সুতরাং বাংলাদেশে মে মাস যতো আড়ম্বরের সঙ্গেই পালন করা হোক এদেশের শ্রমিক আন্দোলনে পিছন থেকে ছুরিকাঘাতের প্রচেষ্টাও এ মাসেই বেশী হয়েছে। বর্তমান সরকার এবং শাসকগোষ্ঠী জানে শুধু কথায় চিড়ে ভিজবে না। কারণ, নয় মাসের সশস্ত্র সংগ্রামের অভিজ্ঞতায় অভিজ্ঞ বাংলার শ্রমিক শ্রেণীর চেতনার স্তর অনেক উন্নত হয়েছে। বৃদ্ধি পেয়েছে তাদের জঙ্গী মনোভাব। তাই একদিকে ভুয়া সমাজতন্ত্রের অফিস, কৃষক-শ্রমিকরাজ কায়েম হয়ে যাওয়ার মিথ্যা বাগাড়ম্বর অন্যদিকে প্রভুভক্ত দালাল শ্রমিক নেতাদের একত্রিত করে শ্রমিক দল গঠনের নামে সশস্ত্র ফ্যাসিষ্ট বাহিনী গঠন করে শ্রমিকদের মধ্যে গুপ্ত হত্যা ও প্রকৃত শ্রমিক নেতাদের খতম করে দেয়া প্রভৃতি ষড়যন্ত্রের নীল নকশা তৈরী হচ্ছে প্রতিদিন। নরসিংদী এবং টঙ্গীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে শ্রমিকদের উপর সশস্ত্র আক্রমণই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কিন্তু ইতিহাসের চাকাকে উল্টো ঘুরানো যায় না- বাংলাদেশেও যাবে না। মে' দিবসের স্মরণে শুধু সভা আর মিছিল নয় বরং এর প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবন দ্বারা মেহনতি মানুষের শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে দাঁড়াতে হবে সমস্ত বিভেদ আর দালালীর হোতাদের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে। শ্রমিক শ্রেণীর আদর্শকে মনে-প্রাণে গ্রহণ না করে শুধু শাসক আর শোষকদের স্বার্থরক্ষার জন্যে যারা তথা-কথিত সংগঠন গড়ে তোলে তাদের মুখ থেকে খুলে ফেলতে হবে শ্রমিক দরদী নেতার মেহনতি জনতার কাফেলায় তাদের ঠাঁই নেই।

এ দেশের ভালোবাসায় বিদ্রোহী নজরুলের দীর্ঘশ্বাস রয়েছে

বাংলার অশান্ত বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম–এবার তার জন্মদিন ১১ই জৈষ্ঠ্য বাংলাদেশে। এই বাংলাদেশের শ্যামল প্রকৃতি, রমনীয় পরিবেশ এবং কিছু ঘটনা প্রবাহ নজরুল সাহিত্যের গতিপথ বদলে দিয়েছিল এই বহুল আলোচিত সত্যটি আজ কবির উজ্জ্বল উপস্থিতিতি আমাদের মনে নতুন অনুভূতির আলোকে ভাস্বর হয়ে জন্ম দিচ্ছে নতুন প্রেরণার। বাংলাদেশের বিশেষ করে পল্লীবাংলা এবং পদ্মা নদীর নিসর্গ যেমন রবীন্দ্র সাহিত্যের একটা বিরাট অংশ জুড়ে ফেলেছিল তার বিম্বিত ছায়া, ঠিক তেমনই নজরুলের বিদ্রোহী সত্ত্বার উপর বুলিয়ে দিয়েছিল প্রেমের স্নিগ্ধ প্রলেপ। অগ্নিগিরি ভরে গিয়েছিল গিরিমল্লিকায়।

নজরুল ইসলাম ছিলেন অসাম্য আর অসুন্দরের বিরুদ্ধে বিশ্ববিবেকের তুর্যনাদ। তার ভাঙার গান এই বাংলার শ্যামলিমায় হয়ে উঠেছে প্রেমের সংগীত। ধ্বংসের বিষাদ বাজিয়ে ফেরা বৈশাখের রুদ্র ঋষিমুখর হয়েছে সৃজনদের মহানন্দে। অতৃপ্ত বিদ্রোহী চোখের প্রেমের অশ্রুজলে সিক্ত হয়েছে বাংলার মাটি।

চের আগে নজরুল এসেছিলেন তদানিন্তন পূর্ববাংলা, বর্তমানের বাংলাদেশে। কুমিল্লার কোন এক গ্রামে হঠাৎ করে থমকে গিয়েছিলেন চারণ কবি। রৌদ্রদগ্ধ হৃদয়ে বিদ্ধ হয়েছিল অতনুর পুষ্পশর। তারপর... তার-

পর প্রেমের কাঁটায় ক্ষত-বিক্ষত কবির হৃদয়াবেগের অনুভূতির প্রকাশ ঘটলো অজস্র কবিতা আর গানে। বিদ্রোহের কবি হলেন ফুলবনের উদাস গজল গাওয়া বুলবুল। বাংলা সাহিত্যের পাঠকমহল পেলেন প্রেমের কবি নজরুলকে। এই বাংলায় আঘাত পাওয়া নজরুল একের পর এক রচনা করে চললেন অজস্র প্রেমের কবিতা আর গান। সাহিত্য সমালোচকদের মতে সে রচনা নাকি নজরুলকে অমর করে রাখবে।

নজরুল আবার বাংলাদেশে আসছেন। কথাহারা মূক নজরুলের আত্মার গভীরে আবার উঠবে আত্মার কিনা নতুন কোন অতৃপ্ত ব্যথার ক্রন্দন, এই বাংলার আকাশ-বাতাস তার কবি সত্ত্বায় কোন ঝড়ের কাঁপন তুলবে কিনা জানি না। বহুদিন আগে বন্ধ হয়ে যাওয়া বাতায়নের ঝিলিমিলি খুলে গুবাক তরুর সারির দীর্ঘ পল্লব কম্পনে ধ্বনিত হবে কিনা হারিয়ে হাওয়া কবিতার চরণ।

"তোমাদের পানে চাহিয়া বন্ধু আর
আমি জাগিব না
সারা দিনমান কোলাহল করি
কারো ঘুম ভাঙিব না
নিশ্চল, নিশ্চুপ
আপনার মনে পুড়িব একাকি
গন্ধ বিধুর ধূপ।"

আজকের নিশ্চল নিশ্চুপ কবি একদিন এই বাঙলাদেশের ঘুম ভাঙ্গিয়েছিল। অসুন্দর আর লাঞ্ছনা, উৎপীড়ণ আর বঞ্চনার বোবা হয়ে যাওয়া মজলুম মানুষের সপক্ষে একদিন ঝলসে উঠেছিল নজরুলের কাব্য কৃপাণ। সহস্র যুগের অন্যায়, অবিচার আর কুসংস্কারের অচলায়তনের জীর্ণ-লোনাধরা দেয়ালটা ভেঙ্গে পড়েছিল তার ভাঙার গানের দৃপ্ত ছন্দে। সাহিত্যের যে অন্ধ প্রাসাদে শুধু চলতো বিলাসীদের আলো–আঁধারীর খেলা সেখানে হঠাৎ করে তিনি নিয়ে এলেন একরাশ নতুন ভোরের আলো। বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে এ এক নতুন অভিজ্ঞতার স্পন্দন...। সাহিত্য শুধু ফুল ফোটানোর অলস খেলা নয়, মুমূর্ষু মানুষের আত্মসচেতনতার বলিষ্ঠ হাতিয়ার হচ্ছে সাহিত্য, এ কথা তো নজরুলই আমাদের প্রথম শিখিয়েছেন।

(১)
জনগণে যারা জোঁক সম শোষে
তারা জমিদার হয়
সন্তান সম পালে যারা জমি
তারা জমিদার নয়।

(২)
দেখিনু সেদিন রেলে
কুলী বলে এক বাবু সাব তারে
ঠেলে দিল নীচে ফেলে

(৩)
মানুষেরে ঘৃণা করি
ও কারা কোরান বেদ বাইবেল
চুম্বিছে মরি মরি।

(৪)
ঐ দিকে দিকে বেজেছে ডঙ্কা
শঙ্কা নাহিক আর
মরিয়ার মুখে মারণের বাণী
উঠিতেছে মার মার।

বিদ্রোহী কবিকণ্ঠ সোচ্চার হয়েছিল মানুষের ওপর মানুষের শোষণের বিরুদ্ধে, অন্যায় আর অসাম্য, সত্য-সুন্দরের কণ্ঠরোধের সকল ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে। অকালে কবির কণ্ঠ নিশ্চুপ হয়ে গেছে। তাই সেই ষড়যন্ত্র আর অত্যাচারীর খড়গ কৃপাণের হাত থেকে রক্ষা পেলেন না স্বয়ং কবি নিজেও। যারা Arts for Arts sake ই শিল্পের জন্য শিল্প বলে বড়াই করে বেড়ান আর নজরুলের কবিতাকে উদ্দেশ্যমূলক রচনা বলে দোষারূপ করেন, তাদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেয়া যায় কবির জীবন থেকে উদাহরণ দিয়েই। কোন

সাহিত্যই শ্রেণীস্বার্থের বাইরে নয় বরং শাসক শ্রেণীর স্বার্থের বাইরে গেলে সেই সাহিত্যের উপর অত্যাচারের খড়্গ নেমে আসতে পারে। কবি নজরুল সম্পর্কে পশ্চিমবাংলার কংগ্রেসী নেতাদের বর্তমান মনোভাবেই তা ফুটে উঠেছে। কবি নজরুলের উত্তর পুরুষ জনতার সংগ্রামে লিপ্ত হবার অপরাধে কংগ্রেসী গুণ্ডাদের নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। এর প্রতিবাদ করে কবিপুত্র সব্যসাচী পত্রিকায় বিবৃতি দিয়েছেন। এর চেয়েও জঘন্য খবর হচ্ছে ভারতে সরকারীভাবে আর নজরুল জন্মোৎসব হচ্ছে না। আমাদের কথায় নয় বরং কোলকাতা থেকে প্রকাশিত ১০ই মার্চের 'বাংলাদেশ'-এর বিশেষ সংখ্যার একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে 'নজরুল সাহিত্যে চিরন্তন আবেদন না থাকায় এ বছর থেকে রবীন্দ্রসদনে সরকারীভাবে আর নজরুল জয়ন্তী পালন করা হবে না।' এই প্রস্তাবের উদ্যোক্তা ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তরের সেক্রেটারী শ্রী সেনগুপ্ত। শ্রী সেনগুপ্ত ঠিকই করেছেন। শোষক শ্রেণীর প্রতিনিধি কি করে অন্যায় আর শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কবিকে সহ্য করতে পারেন। অন্ধকারের জীব যারা তারা অরুণোদয়ের নতুন আলোর কবিকে ভয় করবেন এটাই তো স্বাভাবিক।

১ লা মে-র কবিতা

সুকান্ত ভট্টাচার্য্য

লাল আগুন ছড়িয়ে পড়েছে
দিগন্ত থেকে দিগন্তে,
কী হবে আর কুকুরের মতো
বেঁচে থাকায়?
কত দিন তুষ্ট থাকবে আর
অপরের ফেলে দেওয়া
উচ্ছিষ্ট হাড়ে?
মনের কথা ব্যক্ত করবে
ক্ষীণ অস্পষ্ট কেঁউ-কেঁউ শব্দে?
ক্ষুধিত পেটে ধুঁকে ধুঁকে
চলবে কত দিন?
ঝুলে পড়া তোমার জিভ,
শ্বাসে প্রশ্বাসে ক্লান্তি টেনে
কাঁপতে থাকবে কত কাল?
মাথায় মৃদু চাপড় আর
পিঠে হাতের স্পর্শে
কতক্ষণ ভুলে থাকবে পেটের ক্ষুধা
আর গলার শিকলকে?
কতক্ষণ নাড়তে থাকবে লেজ?
তার চেয়ে পোষমানাকে অস্বীকার করো,
অস্বীকার করো বশ্যতাকে
চলো, শুকনো হাড়ের বদলে
সন্ধান করি তাজা রক্তের,
তৈরী হোক লাল আগুনে ঝল্‌সানো
আমাদের খাদ্য।
শিকলের দাগ ঢেকে দিয়ে গজিয়ে উঠুক
সিংহের কেশর প্রত্যেকের ঘাড়ে॥

হক-কথা

১২ই জৈষ্ঠ্য, শুক্রবার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচন

আমাদের স্বাধীনতা লাভের পর যে কয়টি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে গেছে তন্মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হল ও কেন্দ্রীয় সংসদ নির্বাচন অন্যতম বললে অত্যুক্তি হবে না। একে একে গোটা বাংলাদেশের ছাত্র সংগঠন ও আন্দোলনে এর প্রতিফলন থাকবে, তাতে দ্বিমত থাকবার কোন অবকাশ নেই।

স্বাধীনতা আন্দোলনের পূর্ববর্তী পর্যায়ে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের মন্দা ভূমিকা থাকলেও ছাত্রলীগের মদদে সংগ্রাম চলাকালীন তারা কিছুটা শোধরে নিয়ে সক্রিয় হয়ে উঠে। স্বাধীনতার পর সংগঠনের জন্যে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে। বিশেষ করে রেসকোর্সে অনুষ্ঠিত তাদের সম্মেলনী বাহার সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাতে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমানের অংশগ্রহণকে সম্বল করে তারা যেমন ছাত্রলীগ মহলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে, তেমনি একটি গ্রুপে ক্ষোভের সঞ্চারও হয়। এই প্রবাহেই ছাত্রলীগ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। ছাত্রীলগের অনিবার্য জয়-জয়াকার ধ্বনি হাওয়ায় মিশে যায়। আজ বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন হল ও কেন্দ্রীয় সংসদ নির্বাচনে গরিষ্ঠ আসন পেয়ে গোটা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নেতৃত্বের আসন পাবার স্বপ্ন দেখছে।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের সোনালী স্বপ্ন পর্যবেক্ষকমহলের আলোচ্য বিষয় নহে। বরং লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে শেখ মুজিবের প্রধানমন্ত্রীত্ব ও জনপ্রিয়তার জোয়ারে 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র কায়েম করে–মুজিববাদকে লাথি মার'– এই শ্লোগানে ছাত্রলীগের রব গ্রুপ মুজিববাদীদের চেয়ে ৪ গুণ বেশী আসন দখল করতে সক্ষম হয়েছে। এই রব গ্রুপ শুধু ছাত্রলীগকেই নয় খোদ আওয়ামী লীগকেও স্বাধীনতা দাবীর পথে আসতে বাধ্য করেছিল। স্বাধীনতার পর লুটপাট সমিতির সদস্যপদ ত্যাগ করতে তারাই প্রথম উঠেপড়ে লেগেছিল। অবশ্যি এখনো গণআদালতে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেনি মুজিববাদকে বাদ দিয়ে ক্ষমতাবান থাকার যোগ্যতা থাকলেও তারা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ কায়েম করতে কতটুকু আগ্রহী। শ্রেণী সংগঠন ও সংগ্রামকে ক্ষেত্রবিশেষে সক্রিয় সমর্থন করে তারা যদি খাঁটি সমাজতন্ত্রের আদর্শে আনুগত্য এবং আন্তরিকতা প্রমাণ করতে পারেন তবে নিঃসন্দেহে আশা করা যায় বাংলাদেশে শুধু ছাত্র প্রতিষ্ঠানেই নয় জনগণের দরবারে তাদের আসন দৃঢ় ও সংখ্যায় আধিক্য হবে। স্বাভাবিকভাবেই আশঙ্কা করা যায় এখন থেকেই বিধ্বস্থ ভাগ্নেসর্বস্ব মুজিববাদী দলটি বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের লেজুড় ধরে জনতার প্রতি কিছুটা আগুয়ান গ্রুপটাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দিতে উঠেপড়ে লেগে যাবে।

সত্যিকারের বামপন্থী বলে পরিচিত ছাত্র প্রতিষ্ঠান দুটির নেতৃবর্গের অর্ন্তদৃষ্টি এই নির্বাচনী ফলাফলের পরও কি উন্মোচিত হবে না? মার্কসবাদী হলেও আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে চীনের নেতৃবর্গের ভূমিকার প্রতি তাদের কোন সমর্থন নেই – এই কথাটি কি পরিস্কারভাবে ছাত্রবন্ধুদের নিকট তারা তুলে ধরতে পারেননি? এদেশে মার্কসবাদকে বিকৃত করে শ্রেণী সংগঠন ও সংগ্রামকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে যখন মনিসিং ও খোকা রায়দের মত ঝানুরা মাঠে নেমেছিল তখন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে তাদের উত্তরসূরীরাই এগিয়ে এসেছিল। এই ঐতিহ্য ও অবদান থাকা সত্ত্বেও কোন কোন গলদে তারা এত পিছে পড়ে গেল, গভীরভাবে ভেবে দেখবার সময় হয়নি কি?

কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক হলেও বলতে হয় ছাত্রলীগের দ্বিধাবিভক্তি এবং তৎসঙ্গে হল সংসদীয় নির্বাচনের ফলাফল আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব ও সংগঠনে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে। রাশিয়া দাবার গুটির চালগুলো কিভাবে দিচ্ছে আওয়ামী লীগের আত্মসচেতন মহলকে এখন থেকেই নতুন করে ভেবে দেখতে হবে। সবার উর্ধে শেখ মুজিব কি ভেবে দেখছেন না মুজিববাদকে লাথি মেরে ছাত্ররা যদি এগিয়ে যেতে পারে সংগ্রামী জনতা আওয়ামী লীগের কোন গ্রুপকে নিয়ে নতুন দিনের স্বপ্ন দেখছে। সংক্ষেপে বলা চলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি নির্বাচন শুধু ছাত্রমহলের নয় গোটা দেশের রাজনৈতিক ধারার গতিপ্রকৃতি নির্দেশ করতে সক্ষম হয়েছে।

ভারত মহাসাগর ঃ এক ঘরে দুই পীর

আওরঙ্গজেব চৌধুরী

অষ্ট্রেলিয়ার সাম্প্রতিক নির্বাচনে ভারত মহাসাগর একটি বিরাট প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। প্রায় তিন হাজার মাইল দীর্ঘ ভারত মহাসাগরীয় উপকূলে অষ্ট্রেলিয়া বিশেষভাবে চিন্তিত রুশ নৌবহর নিয়ে। তাতে অবশ্য ভারতের কোনো উদ্বেগ নেই, তার জন্যে বরং অস্বস্তির কারণ মার্কিন নৌবহর, অষ্ট্রেলিয়া যাকে নিজের নিরাপত্তার জন্যে বিশ্ব স্নায়ুযুদ্ধের এই নতুনতম এলাকায় স্থায়ী করেত চায়।

চীন-পাকিস্তানের রেশম সড়ক নিয়ে যেমন ভারত ও রাশিয়ার যথেষ্ট উদ্বেগ রয়েছে তেমনি ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়াসহ এশিয়া আফ্রিকার প্রতিটি উপকূলবর্তী দেশ উদ্বিগ্ন রয়েছে মালাক্কা প্রণালী নিয়ে। চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই কিছুদিন আগে বলেছেন মালাক্কা প্রণালীকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগণ সামরিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ উদ্ধারের কাজে ব্যবহার করছে। বস্তুত রুশ ও মার্কিন রণপোত বহরগুলির ভারত মহাসাগরে প্রবেশের সবচেয়ে সুবিধাজনক পথ এইটাই। ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ার মধ্যবর্তী ২০ মাইল প্রস্থ বিশিস্ট এই প্রণালীটি ভারত মহাসাগরের সাথে চীন সাগরকে সংযুক্ত করেছে, এখানেই গত ডিসেম্বর মাসে মার্কিন সপ্তম নৌবহরকে বঙ্গোপসাগর অভিমুখে অগ্রসর হতে দেখা গিয়েছিল। এবং এই ঘটনাটিই ভারত মহাসাগর ও মাল্লাকা প্রণালীকে আন্তর্জাতিক দৃষ্টির সামনে ফেলে দিয়েছে, এবং নতুন এক সজ্ঞবদ্ধ সামরিক অঞ্চলের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে রাজনৈতিক আলোচনা পর্যালোচনা ব্যাপকভাবে শুরু হয়ে গিয়েছে এবং এ-কথা সত্য যে এশিয়ার অনেকগুলি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের ভবিষ্যত নির্ভর করেছে এই মহাসাগর কেন্দ্রিক সামরিক শক্তিগুলির কার্যক্রমের ওপর। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গীয় পত্রিকা পূর্ব তরঙ্গে, তরুণ রায়ের একটি প্রবন্ধ বেরিয়েছে 'ভারত মহাসাগর এবং দুই বৃহৎ শক্তি' নামে; সেখানে তিনি লিখেছেন– "সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন ও লুণ্ঠন এবং কোন দেশ বিদেশী সামরিক উপস্থিতির বিরুদ্ধে আজ পৃথিবীর জনমত ক্রমশই সোচ্চার হয়ে উঠেছে। তাই শক্তিগুলির দরকার হয়ে পড়ছে নতুন ধরনের ঘাঁটি এবং নিয়ন্ত্রণের নতুন নতুন কৌশল। জলপথে সামরিক উপস্থিতি সাম্রাজ্যবাদীর বাণিজ্যিক স্বার্থকেই কেবলমাত্র সুরক্ষিত করে না, বিভিন্ন দেশে অর্থনৈতিক শোষণকে বজায় রাখার জন্য এবং জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে দমন করার জন্যে বিরাট বিরাট নৌবহরগুলি সামরিক ঘাঁটি হিসেবেও কাজ করতে পারে এদিক দিয়ে বিচার করলে জলপথের একটি বিশেষ সুবিধা আছে। কারণ, আন্তর্জাতিক আইন হচ্ছে কোন দেশের সীমানা উপকূল থেকে মাত্র তিন মাইল পর্যন্ত। যুগের উন্নতর যান্ত্রিক কৌশলের সাহায্যে তিন মাইল দূরে থেকে কোন দেশে গুপ্তচরবৃত্তি বা অন্তর্ঘাত চালানো মোটেই কঠিন ব্যাপার নয়, আর জলপথ কোন দেশেরই জায়গা না বলে সেখানে প্রত্যক্ষ বিরোধিতারও সম্মুখীন হতে হয়না...." তাই আজ দেখা যাচ্ছে যে জলপথে প্রভাব বিস্তার করার জন্যে বিভিন্ন বৃহৎ শক্তিগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতা ও খেয়োখেয়ি বেড়ে উঠেছে। ... দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে শুরু করে মোজাম্বিক, ট্যাঙ্গানিকা সোমালিয়া, কেনিয়া, ইথিওপিয়া, সুদান, মিশর প্রভৃতি পূর্ব আফ্রিকার সমস্ত দেশ, সৌদি আরব, এডেন ইয়েমেন, পাকিস্তান, ভারত, বাংলাদেশ, বার্মা, সিংহল, থাইল্যাণ্ড, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি এশিয়ার বিভিন্ন অনুন্নত দেশ, এবং সমগ্র পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ায় অবস্থিত ভারত মহাসাগরের উপকূলে। বর্তমানে ভারত মহাসাগরের উপকূলবর্তী বা কাছাকাছি দেশগুলোতে ব্যাপকভাবে এগিয়ে চলছে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বিপ্লবী লড়াইগুলো। এই ভারত মহাসাগরের বুক দিয়েই বয়ে চলে ইউরোপের প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ তেল, জাপানের শতকরা ৯০ ভাগ, এবং আফ্রিকার শতকরা ৮০ ভাগ । এর উপকূলবর্তী দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশগুলিই দক্ষিণ দিক থেকে ঘিরে রেখেছে সমাজতান্ত্রিক চীনকে। কাজেই এই ভারত মহাসাগর এবং দক্ষিণ এশিয়া যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির খেয়োখেয়ির এক প্রধান রঙ্গমঞ্চ হয়ে পড়বে, তাতে অবাক হবার কোন কারণই নেই। প্রায় ২০০ বছর ধরে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ যে সমগ্র প্রাচ্যখণ্ডে তাদের অপ্রতিদ্বন্দ্বী আধিপত্য বজায় রাখতে পেরেছিল, তার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল সমগ্র ভারত মহাসাগরে বৃটিশ আধিপত্য সুয়েজের পূর্বাঞ্চল থেকে গলিত নখদন্ত বৃদ্ধ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী সিংহের অপরসারণের পর থেকেই এই অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তারের জন্যে সোভিয়েত ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ উঠেপড়ে লেগেছে।

ক্ষুদ্র রাষ্ট্র বাংলাদেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ পশ্চাদভূমি।

মোটকথা ভারত মহাসাগর এখন একই সঙ্গে 'একটি সোভিয়েত হ্রদ' ও 'একটি মার্কিন হ্রদ' এ পরিণত হয়েছে। অন্যান্য শক্তির তুলনায় এই এলাকায় বেশী রণপোত রয়েছে রাশিয়ার। ১৯৭০ সাল থেকে তার সম্প্রসারণ বেড়েই চলছে। এর মধ্যে আছে ৫টি গাইডেড মিসাইল ডেষ্ট্রয়ার, ৩টি সাবমেরিন, এবং গুপ্তচরবৃত্তি, সংবাদ আদান-প্রদান এবং সরবরাহের জন্যে অন্যান্য রণপোত। সাধারণভাবে সোভিয়েত নৌবহর তিন ভাগে বিভক্ত – (১) আন্টার্কটিকা পর্যন্ত বিস্তৃত একটি মাছধরার রণপোতবহর (২) মহাশূন্য গবেষণা ও আই,সি,বি,এম পরীক্ষার জন্যে একটি রণপোতবহর এবং (৩) একটি আক্রমণাত্মক রণপোতবহর। আফ্রিকার উত্তর-পূর্ব কোণে সাবমেরিন নৌবহর গড়ার ব্যবস্থা করে নিয়েছে রাশিয়া, ইয়েমেনি সাকোত্রা এবং এডেন বন্দরকে তারা আরো উন্নত করে তুলেছে, সিংহলের ত্রিঙ্কোমালী বন্দরেও তারা স্থান করে নিয়েছে আন্টার্কটিকা পর্যন্ত বিস্তৃত রাখার বন্দোবস্ত করেছে। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সোভিয়েত রণপোতবহর সিংহল থেকে তানজানিয়া পর্যন্ত বিভিন্ন দেশের ২০টি বন্দরে অন্তত ৫০ বার 'ভ্রমণ' করেছে। ভারতও অর্থনৈতিক সাহায্য ও বিমানের বিনিময়ে, এবং বাংলাদেশের ব্যাপারে সহযোগিতার জন্যে রাশিয়াকে মাদ্রাজ, বোম্বাই, বিশেষে করে ভিজাগাপত্তম ও বঙ্গোপসাগরে কয়েকটি নৌঘাঁটি ব্যবহারের অধিকার দিয়েছে।

ওদিকে মার্কিন মহল নিশ্চুপ নেই। পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী রণপোত বিমানবাহী 'এন্টারপ্রাইজ' অনির্দিষ্টকালের জন্যে ভারত মহাসাগরেই ভাসতে থাকবে বলে মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগ জানিয়েছে (৬-১-১৯৭২)। তাছাড়া মাত্র ৫০০ জনসংখ্যা বিশিষ্ট দিয়েগো গার্সিয়া দ্বীপে তারা নৌ, বিমান ও সংবাদ আদান-প্রদানের ঘাঁটি বসিয়েছে। এবং দিনের পর দিন এই এলাকায় শক্তিবৃদ্ধির জন্যে তাদের চেষ্টার কোন কসুর নেই।

নবজাত বাংলাদেশের এখন নানাদিকেই দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। নইলে একচোখা হরিণের দশা তারও হবে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও ভারত মহাসাগরের বড় টেক্কা দু'টির এদেশের প্রতি যথেষ্ট নেকনজর রয়েছে, কারণ বাংলাদেশ এই সমস্ত এলাকার মাঝে ভৌগলিক কারণে সবচেয়ে গুত্বপূর্ণ একটি পশ্চাদভূমি। উত্তর কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট যে কথাটি বলেছিলেন তা আপ্ত বাক্যের মতো স্মরণ রাখা উচিত যে বৃহৎ শক্তিগুলি ক্ষুদ্ররাষ্ট্রের বন্ধু হতে পারে না, শত্রু তারা শত্রু। মানবতার কথা বলে চোরাগলিপথে তারা স্বার্থ উদ্ধার করে নেয়।

একথা হবু বৃহৎ শক্তির ক্ষেত্রে আরো ভয়ংকর রকম সত্য। সুতরাং বুঝতে পারা যাচ্ছে বাংলাদেশকে শেষ পর্যন্ত সকল প্রকার মৈত্রী চুক্তি সত্ত্বেও, একটি মজবুত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। যাতে বিমান ও নৌবাহিনীর ভূমিকা থাকবে অবশ্যই বেশী। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে জনগণকে শুকিয়ে মেরে, পাকিস্তানের মতো সমরশক্তি বৃদ্ধি দরকার নেই, এবং তা যেন, পাকিস্তানের মতো, জনগণের উদ্দেশ্যে না ব্যবহৃত হয়। প্রতিরক্ষার দিকে গোড়ার দিকেই একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকা বাংলাদেশের প্রয়োজন, নইলে বৃহৎশক্তির দাবার গুটিতে পরিণত হওয়া তার পক্ষে অসম্ভব নয় বলে সচেতন ব্যক্তিমাত্রেই মনে করে।

মওলানা ভাসানীকে সীমান্তে যেতে হল– কিন্তু

তারপর!

'জল্লাদ টিক্কা খান আপনার লাশ চায়'– মওলানা সাহেবকে এ তথ্য জানানোর পরও তিনি লেলিয়ে দেয়া খুনি পাক-সেনাদের নাগালের বাইরে যাচ্ছিলেন না। প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়বার। বাংলাদেশেই মুক্ত এলাকা রেখে এ লড়াই চালিয়ে যাবেন–এই ছিল তাঁর পরিকল্পনা। কিন্তু ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসটিও তাঁর জীবনের বহু দুর্যোগপূর্ণ মাসের একটি– এ সত্য তাঁকে মেনে নিতেই হল। অবশেষে মওলানা সাহেব নৌকার মাঝিকে ডেকে হাঁক ছাড়লেন, "উজানে টান, বাদাম ছাড়।"

২৫শে মার্চের পর এপ্রিলের ৪টি তারিখ ৪, ৬, ১৪ ও ১৫।

৩০ শে মার্চ মওলানা সহেবের নির্দেশে আমাকে টাঙ্গাইল হয়ে ঢাকা রওনা হতে হল। স্থান-পাত্র ভেদে পত্র পৌছানো আর সরজমিনে বিধ্বস্ত ঢাকার রিপোর্ট সংগ্রহ- এই ছিল আমার দায়িত্ব। পথে পথে ঢাকা ফেরত পরিবারগুলোর মুখে বিভীষিকা ও ধ্বংসের বিবরণ শোনে আমার বিস্ময়ের মাত্রা শুধু বেড়েই যাচ্ছিল। ৩১ শে মার্চ বিকেলে মিরপুর যখন পৌছলাম তখনই ঢাকার ভেতরকার অবস্থাটা আঁচ করে নিলাম। সেখানকার বড় ব্রীজের নীচে অসংখ্য লাশ স্তূপীকৃত হয়ে পড়েছিল। রামগতির একটি পুকুরে বঙ্গোপসাগরীয় মহাসাইক্লোনের পর এমনি দৃশ্য দেখেছিলাম। আমার মনে পড়ল, দৃশ্যটি দেখে মওলানা ভাসানী কেঁদে ফেলেছিলেন।

২রা এপ্রিল মওলানা সাহেবের কাছে ফিরে গিয়ে রিপোর্ট দিচ্ছিলাম। খুব মনোযোগের সাথে শুনছিলেন। অবশ্যি ইতিমধ্যে দুজন আণ্ডারগ্রাউণ্ড শ্রমিকনেতা মওলানাকে খবরাখবর দিয়ে পরামর্শ করে গেছেন। নিহত বুদ্ধিজীবীদের নাম বলতে গিয়ে যখন ডক্টর জিসি দেবের নামও বললাম তখন লক্ষ্য করলাম মওলানার চাউনিতে আগুন বেরিয়ে আসছে।

৩রা এপ্রিল-সকালবেলা পাক-ফৌজ করটিয়া আক্রমণ করে। অসংহত মুক্তি বাহিনীর সাথে লড়াইয়ের পর সেদিন বিকেলে আক্রমণকারীরা টাঙ্গাইল দখল করতে সমর্থ হয়। মওলানা সাহেবের কর্মস্থলে এ খবর পৌছে গেল। নিযুক্ত সংবাদবাহকরা পাক-ফৌজের নৃশংসতার কথাও বলল। তৎক্ষণাৎ মওলানা সাহেব আমাদের তিনজনকে সন্তোষ পাঠালেন। ঘর থেকে জরুরী সব ফাইলপত্র সরিয়ে ফেলতে আদেশ দিলেন। এর মধ্যে দু'জন কাশ্মীরী মোহাজেরকে মওলানা সাহেব আশ্রয় দিয়েছিলেন। মুজাফফরাবাদ বাড়ী হলেও ইটের ভাটায় আগুন জ্বালাবার কাজে ওরা টাঙ্গাইল এসেছিল। ব্যক্তিগত প্রভাব খাটিয়ে মওলানা সাহেব সেদিনগুলোতে উন্মত্ত জনতার হাত থেকে বহু অবাঙ্গালীকে বাঁচিয়েছেন। সৌভাগ্যশালী এই দুই মোহাজেরকে আমাদের সাথে দিয়ে জোরেসোরে বলে দিলেন, "তোমাদের

গাফতলির জন্যে এদের কিছু হলে আমার দরবারে কিন্তু ক্ষমা নাই।" পথ চলতে চলতে মোহাজের দু'জন বলল, "এমন নেতা তো দেখিনি। এত পেরেশানেও আমাদের কথাই বেশী ভাবছেন।"

৪ঠা এপ্রিল সকাল সকাল পাক-ফৌজ সন্তোষসহ কয়েক মাইল এলাকা ঘেরাও করে ফেলল। অবশ্য এর মধ্যে মানুষ খুব কমই পড়েছিল। শুধু বুড়া-বুড়ি গোছের কিছু লোক ঘরে ছিল। বাকী সব মানুষ এর আগের দিনই অন্ততঃ দশ মাইল দূরে চরে চরে পলিয়ে গিয়েছিল। আমরা আচম্বিতে ঘেরাওএ পড়ে হতচকিত হয়ে পড়লাম। এরি মাঝে পাক-ফৌজ এলোপাথারি এলএমজি ছুঁড়তে লাগলে

গান পয়েন্টে পাকসেনা এগিয়ে আসছিল মওলানা সেদিকেই যাচ্ছিলেন

একে একে ওরা সকল বাড়ীতে আগুন জ্বালিয়ে চলল। আমরা দু'জন অতি সন্তর্পণে মওলানা সাহেবের বাড়ীর পশ্চিমে কাটা খালটিতে নেমে পড়লাম। কিন্তু আমাদের একজন ধরা পড়ে গেল। (তার নাম শাহাদাৎ, মওলানার শিষ্য। সেদিনই অবশ্য সে টাঙ্গাইল সার্কিট হাউস থেকে পালিয়ে এসে মওলানাকে নানাবিধ খবর জানায়।) একটি ম্যাপ মেলে ধরে পাক-সেনারা নিশ্চিত হল এটাই মওলানা ভাসানীর বাড়ী। আমাদের লোকটিকে ওরা বেদম মারধর করে মওলানা সাহেবের অবস্থানের কথা জানতে চাইল। সে শুধু বলে চলল, "আজ তিনি কোথায় আছেন জানি না।" কথিত মোহাজেররা এগিয়ে গিয়ে মওলানা সাহেবের বেওমার তারিফ করা শুরু করল। তাদেরকেও সেনারা শাস্তির ভয় দেখিয়ে মওলানা সাহেবের গতিবিধির খবরাখবর জানতে চাইল। ওরাও এক কথা বলল, "তাঁর শেষ খবর জানি না।" অবশেষে মওলানা সাহেবের সব কয়টি ঘরে পাক-ফৌজ আগুন ধরিয়ে দিল। বাড়ীর ঘরগুলো পোড়া শেষ করে প্রস্তাবিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আটটি ছন ও টিনের ঘর এবং দালানগুলোর সব দরজা-জানালা আগুনে পুড়িয়ে দিল। ইতিমধ্যে আমরা দু'জন পালিয়ে পালিয়ে আধ মাইল দূরে এসে কখনো একটি কদম গাছে চড়ে কখনো মাছ ধরার খাদে থেকে সব দেখছিলাম। তারপর পাক-ফৌজ গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল। যাকেই যেখানে পেল মেরে ফেলল। মাঝে মাঝে ধরে জিজ্ঞেস করল, "কাফের ভাসানী কোথায়?" এদের কেউ সঠিক না জানলেও এলাকাটা অনুমান করে বলে দিতে পারত। কিন্তু কেউ স্বীকার করেনি। পাক- ফৌজের কাণ্ডকারখানা দেখে আমাদের মনে হল, মওলানা সাহেবকে পেলে তারা মোটেই জীবিত রাখবে না। অথচ এই সময়টাই তিনি কয়েকজন আণ্ডারগ্রাউণ্ড বিপ্লবী কর্মী নিয়ে পরিকল্পনা-নির্ধারণী সভা করছিলেন। ৪ঠা এপ্রিল সারাটি দিন পাক-সেনারা টাঙ্গাইল শহরের চারপাশে গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে হিন্দু-মুসলমান বহু লোককে মেরে গেল। এর মধ্যে একমাত্র সন্তোষ গ্রামের ৬ জন বৃদ্ধা এবং ১৪টি গরু ঘরে পুড়েই মরেছিল।

দুপুর বেলা পাক-সেনাদের দৃষ্টি এড়িয়ে আমরা দু'জন একবার মওলানা সাহেবের

মওলানাকে দুঃখ দিল মদিনার মধু আর আওরঙ্গজেবের হাতে লেখা কোরআন শরীফ।

বাড়ীতে এলাম। দেখতে পেলাম, মওলানার পান- সুপারী কুটার হামানদিস্তাটি বাদে সব আগুনে জ্বলছে। বাড়ীর একটি ঘরে অন্ততঃ দশ হাজার লোকের সম্মেলনে জরুরী খাওয়া-থাকার যাবতীয় জিনিষপত্র মওজুদ ছিল। দেখলাম তৈজসগুলো তখনো জ্বলছে। সন্ধ্যায় মওলানা সাহেবকে ঘটনা ও দৃশ্যাবলীর পুরো

বিবরণ বললাম। কিছুক্ষণ চুপ থেকে একাকী উদাস স্বরে তিনি শুধু বললেন, "জনবল আছে – শুধু অস্ত্র চাই।" আরও কিছু সময় চুপ থেকে মওলানা বললেন, "সিন্দুকে আওরঙ্গজেবের হাতের লেখা একখানা কোরআন শরীফ ছিল। এও পুড়ল।"

সারাদিন মওলানা সাহেবের একরকম খাওয়াই হয়নি। কে একজন দুটো রুটি দিয়ে গেল। তিনি তাই পানিতে ভিজিয়ে চিবুতে লাগলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, "মদিনার মধুটুকু এক চামিচ খেয়েও দেখিনি। ঘরেই পুড়ল।" এক ধর্মপ্রাণ শিষ্য হজ্বে গিয়ে মওলানা সাহেবকে চিঠি লিখেছিলেন তার হুকুম জানাতে। মওলানা জবাবে মদিনার মধু নিয়ে আসতে বলেছিলেন। ফিরে এসে মাত্র কিছুদিন পূর্বে সেই শিষ্য মধুটুকু পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। মওলানা সাহেবের সরল প্রাণ কথা শুনে সেই দুর্দিনেও আমার হাসি পেল। এদিকে মওলানার স্ত্রী, মেয়ে ও নাতি -নাতনী চরে আশ্রয় নিয়েছিলেন। হাজার হাজার লোক চরে এসে উঠেছিল। তাই পরিচয় দিয়ে বিশেষ সুবিধা ভোগ না করে তারা উন্মুক্ত আকাশের নীচে বালুর উপরই কাপড় বিছিয়ে রাতটা কাটিয়েছিলেন।

৫ই এপ্রিলও বর্বর সেনাদল একতরফা হত্যাকাণ্ড এবং অগ্নিসংযোগ চালিয়ে গেল। মওলানা সাহেবকে গ্রেফতারকল্পে সাহায্য করতে তারা লোক জুটিয়ে নিল। তাঁরই প্রতিষ্ঠিত মওলানা মুহম্মদ আলী কলেজের অধ্যাপক টাঙ্গাইল জামাতে ইসলামীর সভাপতি আবদুল খালেক এর নেতৃত্ব দিলেন। ৬ই এপ্রিল বিকেল ৪ টায় নিরাপদ স্থান থেকে বিশেষ জরুরী কারণে বিন্নাফৈর গ্রামে মওলানা সাহেবকে আসতে হল। গ্রামটি টাঙ্গাইল শহর থেকে ৬/৭ মাইল পশ্চিমে। এখানে মওলানা সাহেবের প্রতিষ্ঠিত একটি স্কুল, একটি দাতব্যচিকিৎসালয় ও একটি মুসাফিরখানা রয়েছে। গ্রামবাসীর বোধহয় একটি লোক বাদে সবাই তাঁর অনুগত ভক্ত। মওলানা সাহেব খুব সাবধানে এলেও সেই লোকটি খবর পেয়ে গেল। আব্দুল খালেক সাহেববের চেলা হিসেবে এই আকালু মণ্ডল তার কর্তব্য সেরেছিল।

মওলানা সাহেব বিন্নাফৈরের সেই মুসাফিরখানায় উঠে রাতের থাকা-খাওয়ার কথা চিন্তা করছিলেন। নিরাপত্তার জন্যে স্ত্রী মেয়ে ও নাতনীদের অন্যত্র চলে যেতে হুকুম করলেন। কোথায় রাত কাটাবে তা না জেনেই তারা নিঃশব্দে পথে বেরিয়ে পড়ল। একটি সিন্দুক দেখিয়ে মওলানা সাহেব আমাকে বললেন "এটিতে কাগমারী সম্মেলনের কাগজগুলি আছে, গুছিয়ে নাও।" গুছাতে গিয়ে সম্মেলন সম্পর্কে মওলানা সাহেবকে লিখা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানিন্তন রেজিষ্ট্রারের একটি চিঠি পড়ছিলাম। আছরের নামাজ পড়ে মওলানা সাহেব দুজন স্থানীয় ছাত্রকর্মীর সাথে নির্দেশদানমূলক আলাপ করছিলেন। তাদের একজন তার জন্যে হামানদিস্তায় পান ও সুপারি কুটছিল। ঠিক এমনি সময় হঠাৎ করে চারদিকে থেকে হৈচৈ শোনা গেল। গ্রামবাসীর দৌড়াদৌড়ি শুরু হল। মুহূর্তে বোঝা গেল এক প্রাণান্তকর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। আমি বারান্দায় এসে চোখাচোখি হলে মওলানা সাহেব স্বাভাবিক কণ্ঠে বললেন, "আমার চাদরটা লও।" ধীরে ধীরে ঘর থেকে চাদর আনছি দেখে মওলানা বললেন, "চটপট কর, কাপুরুষের মত ধরা পড়লে চলবে না, কাজ করতে হবে।" ক্ষণিকেই তিনি তৈরী হয়ে নিলেন। লুঙ্গীটা শক্ত করে পড়লেন। লম্বা পাঞ্জাবীটা কোমরে খুটে খাট করলেন। টুপিটা খুলে আমার হাতে দিয়ে চাদরটাকে সুন্দর করে গুছিয়ে আজানুলম্বিত করে ফেললেন। এসব কিন্তু এই বৃদ্ধ মওলানা এত তাড়াতাড়ি করলেন যে না দেখলে বিশ্বাস হবে না। তারপর বাড়ীটার পেছনদিকে অর্থাৎ উত্তরে রওনা হলেন। আমিও তার পিছু নিলাম। প্রথমেই সামনে পড়ল একটি পুকুর। মওলানা দ্রুত পুকুরে নেমে পড়লেন। পুকুরটার তিন দিকে কলাবাগান। ভেতরের পাড় বেয়ে উত্তরে

খোলা দিকটায় আমরা গেলাম। দেখতে পাচ্ছিলাম শত শত পুরুষ-মহিলা প্রাণভয়ে চিৎকার করতে করতে যে যেদিকে পারছে দৌড়াচ্ছে। জানিনা মওলানা কি নিয়তে পুকুরে নেমেছিলেন। আধ মিনিটের মধ্যেই বুঝলাম এখানে আর থাকা যায় না। আমি পাড়ে উঁকি দিয়ে মওলানাকে দেখালাম গান পয়েন্টে অসংখ্য পাকসেনা এগিয়ে আসছে। তৎক্ষণাৎ তিনি বললেন, "আমার জুতাগুলো হাতে নাও।" আমি তার চটি জুতাগুলো তুলে নিলাম। তারপর ৯০ বৎসরের এই বৃদ্ধ পুকুরের পাড় থেকে লাফ দিয়ে অন্তত: ৪/৫ হাত নীচের জমিতে নেমে পড়লেন। আশ্চর্য্য, দূরে হলেও আমাদের সামনেই কিন্তু মেশিনগান উঁচানো পাক-ফৌজ। পুকুরটার উত্তর দিকে খোলা একটি মাঠের পর গ্রাম। মওলানা সেদিকেই এগিয়ে চললেন। পাক–সেনারা একে অন্যের মাঝে ১০/ ১২ হাত ফাঁক রেখে আমাদের ছেড়ে আসা বাড়ীটার দিকেই এগিয়ে যাচ্ছিল। অবশ্য তাদের সামনে দিয়ে বহু মানুষ ছুটে পালাচ্ছিল। সেদিকে তাদের লক্ষ্য ছিল না। তাদের দৃষ্টি শুধু বাড়ীটার দিকে যাতে মওলানা পালাতে না পারেন। এবার মওলানা বড় সুন্দর কায়দা নিলেন। তিনি স্বাভাবিকভাবে হাঁটতে লাগলেন যাতে তাঁর প্রতি সেনাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট না হয়। মনে হচ্ছিল শীতে আক্রান্ত চাদরে ঢাকা একজন অসহায় বৃদ্ধ– আর কেউ নন। সেনারা আমাদের পেছনে পড়তেই মওলানা অত্যন্ত দ্রুত হাঁটতে লাগলেন। তাঁর সাথে কুলোতে আমাকে একরকম দৌড়াতে হচ্ছিল। এমন সময় চিনতে পেরে মওলানার সেই ভক্ত কৃষক যুবক– শাহাদাৎ আমাদের সাথী হল। এবার শাহাদাৎ ও আমি মওলানাকে আড়াল করে যাচ্ছিলাম। খোলা মাঠটা পার হয়ে আমরা গ্রামে উঠে পড়লাম। হিন্দু- মুসলমান প্রতিটি বাড়ীর বৌ- বেটা সাধতে লাগল, হুজুর আমার বাড়ীতে আসুন। কিন্তু মওলানা কারও বাড়ীতে উঠছিলেন না। হয়ত ভাবছিলেন, ভক্তের বাড়ীটা পুড়িয়ে লাভ কি? তাই তিনি শুধু হেঁটেই চলছিলেন। আমরা গ্রামের পর গ্রাম হাঁটছিলাম। একটানা অন্ততঃ তিন মাইল হাঁটবার পর এক নাছোড়বান্দা তাঁকে পেয়ে বসল। সে ছেলে - মেয়ে ও বৌ সহকারে মওলানার পায়ের উপর পড়ল, বলতে লাগল – হুজুর, আমার ঘরে গা জুড়াইয়া যান। এদিকে সন্ধ্যাও হয়ে গিয়েছিল। আমি বললাম, এখানেই মগরিবের নামাজ পড়ে নিন। মওলানা বললেন– আন্, অজুর পানি আন্। তখনই স্বামী–স্ত্রী খুশীতে ঘরে দৌড়াল।

প্রত্যক্ষদর্শীর মুখে পরে শুনেছি– বিন্নাফৈরে সে সময়ে যা ঘটছিল, খুবই বিস্ময়কর। সেদিন ছিল হাট। মওলানার স্কুলটির মাঠেই হাট বসেছিল। পাকফৌজ কার্যত: গোটা গ্রামটা ঘেরাও করেছিল। এতে একজন মেজর ও দু'জন ক্যাপ্টেন নেতৃত্ব দিচ্ছিল। আর ছিল কথিত দালাল আকালু মণ্ডল। হাটের একজনও পালাতে পারেনি। ঘেরাও- এ পড়ে গিয়েছিল। খুব সন্তর্পণে মেজর-ক্যাপ্টেনরা কতিপয় সিপাই নিয়ে মওলানার বাড়ীতে ঢুকছিল। মজার ব্যাপার তারা সাথে করে একটি মিলিটারী এ্যামবুলেন্সও নিয়ে এসেছিল। তাদের ভাষায় কাফের ভাসানীর আহত দেহ কিংবা লাশ এই এ্যামবুলেন্সে টিক্কা সমীপে পাঠাতে হবে। অবশ্য এই কথাই মওলানার ভক্ত গ্রামবাসীদের ক্ষ্যাপা করেছিল। মওলানাকে বাড়ীতে ও আশেপাশে কোথাও না পেয়ে ওরা পাগলা কুকুরের মত হয়ে গেল। যুবক- বৃদ্ধ যাকেই পেল বেদম মারধর শুরু করল। যদিও এদের কেউ কেউ মওলানাকে মাঠ দিয়ে দৌড়াতে দেখেছে তবু তারা বলল না, তিনি কোথায়, কোন দিকে গেলেন। তারপর গ্রামবাসী সবাইকে হাটে জড়ো করে মেজর বোঝালে মওলানাকে ধরিয়ে না দিলে একটি প্রাণীকেও বাঁচিয়ে রাখবে না, একটি বাড়ীও আস্ত রাখবে না। তবু সবাই এককথা বলল হুজুরের খবর এক আল্লাহই জানে। তাদের মুখে আল্লাহর কথা শুনে মেজর আরও

চেঁচিয়ে উঠল। যাহোক, কিছুতেই যখন কিছু হল না, তখন মুসাফিরখানাটাতে আগুন ধরিয়ে দিতে হুকুম হল। হায়েনার দল সোল্লাসে একে একে সব কয়টি ঘর পুড়ল। উঠানে বাধা ছিল মওলানার দুটো খাসি। ভক্তদের দেয়া। নিয়ত করা ছিল পরবর্তী ঈদে মিলাদুন্নবীতে অনেকগুলোর মাঝে এও জবেহ হবে। খাসি দুটো এ্যাম্বুলেন্সে তুলে নিতে অফিসাররা হুকুম করল। এমন সময় আকালু মণ্ডল মেজরকে বোঝাতে চাইল, আগামীকাল আলবৎ মওলানাকে ধরিয়ে দেবে। রাগে-গোস্বায় সিপাইরা তখন আকালুকে বেদম পিটুনী দিল। না, আকালু মরেনি। সে আজও বেঁচে আছে।

ঘরটা ছিল একান্তই কুঁড়ে ঘর। সোজা হয়ে দাঁড়ানোও যায় না। গরু- ছাগল, ছেলে-মেয়ে নিয়ে স্বামী-স্ত্রীতে এই ঘরে তারা থাকে। অজু সেরে মওলানা বললেন, "উঠোনের চুলায়ই ভাত বসিয়ে দে। ছেলে-মেয়েদের খেলতে দে। আর তোরা দৌড়াদৌড়ি ফিসফাস করিস না।" আমি আর শাহাদাৎ ছোট ঘরটায় বসে খাচ্ছিলাম আর ভাবছিলাম এই অগ্নিপুরুষ জীবনটাকে কিভাবে কাটালেন। আসাম আর বাংলায় তাঁকে এই জীবনে কতবার যে শাসক-

আলবৎ মওলানার চোখে তখন ভাসছিল আসামের তূরা পাহাড়–একটি উপত্যকা–লক্ষ যুবকের সশস্ত্র ট্রেনিং

শোষক গোষ্ঠীর তাড়া খেয়ে পালাতে হয়েছে তার হিসেব কেউ রাখেনি। বিশেষ করে সন্তোষের মহারাজ, গৌরীপুরের (আসাম) মহারাজা এবং পাকিস্তানের ইস্কান্দার মীর্জা মওলানাকে হত্যা করতে বহুবার পরিকল্পনা নিয়েছে। সে যাক। নামাজ সেরে মওলানা রওনা হতে চাইলেন। আবার স্বামী-স্ত্রী পায়ে পড়ল। তাদের আবদার হুজুর ভাত খেয়ে যেতে হবে। মওলানা বললেন, না- সময় নেই, অনেক পথ হাঁটতে হবে। অবশেষে তারা ধরল, এক ফোটা দুধ খেয়ে যান। মওলানা রাজী হলেন। মাটির সানকীতে তারা দুধ দিল। শতাব্দীর অন্যতম নেতা চুমুক দিয়ে দুধটুকু খেলেন। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। এবার স্বামী-স্ত্রীর আবদার, হুজুর, ছেলে-মেয়েগুলোর জন্যে দোয়া করুন। মওলানা তাদের দোয়া করলেন। এবার রওনা হওয়া গেল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ভাই আপনার নাম কি। উত্তর পেলাম, আমজাদ।

সন্ধ্যা কেটে গিয়েছিল। আমরা আবার হাঁটতে শুরু করলাম। আকাশে চাঁদ ছিল। তাই খুব অসুবিধা হচ্ছিল না। কিন্তু কেউ যাতে চিনতে না পারে সেজন্যে সড়ক ছেড়ে মওলানা ক্ষেতের আল দিয়ে হাঁটতে লাগলেন। কোথায় যাব আমরা জানি না। মওলানার কাছেই শুনেছি, এমনিভাবে হাঁটতে হাঁটতে যৌবনে আবদুল হামিদ খান ওরফে চ্যাকা মোমেনশাহী থেকে আসাম পৌছে গিয়েছিলেন। কিছু উত্তরে কিছু পশ্চিমে আরও ৭/৮ মাইল হেঁটে আমরা ধলেশ্বরী-যমুনার মোহনায় পৌছলাম। ঘড়িতে দেখলাম, রাত তখন সাড়ে দশটা। পাড়ে দাঁড়িয়ে নদী পার হবার উপায় খুঁজছিলাম। এমন সময় একটি লোক ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে লাগল। কাছে এসে কোন কথা না বলেই মওলানার পদচুম্বন করল। কান্নার সুরে বলল শুধু: হুজুর। খেয়ার মাঝিকে ডেকে আনলো লোকটি। মাঝিটির নাম ইউনুস। সে নদী পার করে আমাদেরকে তার বাড়ীতে নিয়ে চলল। এত পথ হেঁটে মওলান সাহেবও অতিশয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন কিন্তু তার কথায় কোন প্রকার বিরক্তি বা ক্লান্তি প্রকাশ পাচ্ছিল না। ঠিক রাত বারটায় আমরা ইউনুস মাঝির বাড়ী পৌছলাম। মওলানা সাহেব অজু সেরে এশার নামাজ পড়লেন।

রাত দুটোয় আমরা তিনজন আলুভর্তা ও ডাল দিয়ে ভাত খাওয়া সারলাম। ভাত কম ছিল।

মওলানা বললেন, "কম চিবিয়ে খাও। আর সাথে সাথে কয়েক গ্লাস পানি খাও। মনে হবে, অনেক খেয়েছো।" পেট ভরা তাঁর সর্বহারা গোছের পরামর্শ শুনে আমার হাসি পেল। অথচ এই লোকটাকেই দেখেছি অবস্থাপন্ন ভক্তের বাড়ীতে উঠে আমাদের অন্তত: চার-পাঁচজনের খাবার একাই খেয়ে ফেলতে। সবটাতেই তাঁর খাপ খাইয়ে নেয়ার মন ও সাধনা রয়েছে। এই ব্যতিক্রম।

ক্লান্তদেহে একটু ঘুমাবার কথা যখন ভাবছি তখনই মওলানা ডাকলেন, ভোর হবার আগেই সেখানে পৌছতে হবে। ওঠ। রাত তিনটায় আবার আমাদের যাত্রা শুরু হল। এবার আমরা চারজন। ইউনুস মাঝিও সাথী। ফর্সা হয়ে আসছে দেখে মওলানা আরেক ভক্তের বাড়ীতে উঠে পড়লেন। নাম তার ময়েজ ফকির। এরা বরাবরই তাঁর দুর্দিনের দুঃসাহসিক সঙ্গী।

মওলানা সাহেবের স্ত্রী ও নাতিনদের সেদিনকার অবস্থা বড়ই করুণ। অর্ধাহার-অনাহারে কখনো বা কারো বাড়ীর গোয়াল ঘরে রাত কাটিয়ে তের দিন একটানা হেঁটে তারা পাঁচবিবি পৌছে ছিলেন। যাহোক ময়েজ ফকিরের বাড়ী থেকে মওলানা সাহেব নৌকাযোগে সিরাজগঞ্জ চলে যান এবং সেখানেই সুদূরপ্রসারী সংগ্রামের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ভোরে উঠেই তিনি হাঁক ছাড়লেন- উজানে টান। বাদাম ছাড়া কয়েক দিনের নৌসফর শেষে রৌমারী থানাধীন নমাজের চরে ভক্ত সেকান্দর ফকিরের বাড়ীতে তিনি উঠেন। সেদিন ছিল ১৪ই এপ্রিল বুধবার। নমাজের চর থেকে আসাম-সীমান্ত মাত্র চার মাইল। সে সময়টায় মওলানা সাহেব উথানটের একটি কথার খুব গুরুত্ব দিচ্ছিলেন। উথানট বলেছিলেম, বাংলাদেশের কোন নেতার তরফ থেকে তিনি পাকবাহিনীর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অভিযোগ পাননি। তাই মওলানা উথানট, নিক্সন ও মাও সেতুঙ সহ দুনিয়ার সকল রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে বিস্তারিত টেলিগ্রাম পাঠাবার জন্যে উদগ্রীব হয়ে উঠেছিলেন। যাহোক পরদিন ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার মওলানা সমীপে গড়ীসহ প্রতিনিধি পাঠান। ১৫ই এপ্রিল সন্ধ্যায়, মওলানার ভাষায় পূর্ববাংলার অন্তর্গত চারটি মাইল হেঁটে গায়ে ভারতীয় জীপে চড়েন। আলবৎ মওলানার চোখে তখন ভাসছিল আসামের তূরা পাহাড়-একটি উপত্যকা, লক্ষ যুবকের সশস্ত্র ট্রেনিং।

সৈয়দ ইরফানুল বারী

শিবপুর থেকে টঙ্গী ৪

শিবপুর সম্মেলনে মওলানা ভাসানী টঙ্গীতে আহ্বান করেছিলেন কৃষক-শ্রমিক মৈত্রী সম্মেলন। বিশ্বশ্রমিক আন্দোলনের রক্তস্মৃতি বিজড়িত মে মাসের পটভূমিকায় মাত্র একমাসের ব্যবধানে শিবপুর সম্মেলনের পর পরই টঙ্গীতে আহূত কৃষক-শ্রমিক মৈত্রী সম্মেলনের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। শিবপুর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে মে দিবস উপলক্ষে ঢাকায় লালবাহিনীর সমাবেশ, মওলানা ভাসানী এবং তার অনুগামীদের বিরুদ্ধে খোদ প্রধানমন্ত্রী থেকে ছোট-বড় আওয়ামী-নেতাদের শক্তি প্রয়োগের হুমকি, নরসিংদী ও টঙ্গীতে শ্রমিকদের উপর ফ্যাসীবাদীদের হামলা প্রভৃতি ঘটনাগুলো প্রমাণ করে দিয়েছে যে মওলানা ভাসানী কৃষক-শ্রমিকদের মুক্তির জন্য সঠিক পথই বেছে নিয়েছেন। পাকিস্তান থাকাকালীন যখন চরম ডানপন্থী দলগুলি (জামাতে ইসলাম ও মুসলিম লীগ) মওলানা ভাসানীর বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগে এবং পাকিস্তানকে দ্বিতীয় ইন্দোনেশিয়ায় পরিণত করার হুমকি দিচ্ছিল তখনও মওলানা সঠিক পথে মেহনতি মানুষের ঐক্য গড়ে তুলতে পেরেছিলেন বলেই তার বিরুদ্ধবাদীরা ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। তৎকালীন পাকিস্তানের চেয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে জনতা আজ আরো বেশী সচেতন। তাই মওলানা বিরুদ্ধবাদীদের সব কুৎসা এবং হুমকির পরোয়া না করে নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন দেশের দারিদ্রপীড়িত, ক্ষুধার্ত মানুষগুলোকে।

টঙ্গী সম্মেলন ফ্যাসীবাদী শক্তির বিরুদ্ধে একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াতো, এটা তারা ভালোভাবেই অনুধাবন করতে পেরেছিল। তাই এ সম্মেলনকে ব্যর্থ করার জন্যে আজ এই অশুভ শক্তি তৎপর হয়ে উঠেছিল। বিভিন্নভাবে তাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ময়দানে নেমেছে তথাকথিত বামপন্থীদের পরিচিত মস্কোপন্থীর দল। কিন্তু মওলানা তার দীর্ঘ ৬৫ বছরের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতায় একটি সত্য উপলব্ধি করেছেন, "লাঞ্ছিত মানুষের অভ্যুদয়কে রোধ করার সব চক্রান্তই ব্যর্থ হতে বাধ্য।'

বাংলার কৃষকসমাজ একদিন খাজনা পরিশোধের সময় বাড়লেই ধন্য হত, ভিটেমাটি ক্রোক করা থেকে রেহাই পেলেও মনে করতো এটা তাদের বিরাট বিজয়। কিন্তু আজ দিন পাল্টে গেছে। অশীতিপর বৃদ্ধনেতা মওলানার কাছে তারা শিখেছে শুধুমাত্র এক বেলা আয়ের সংস্থানই নয় বরং রাষ্ট্রযন্ত্রে মেহনতি মানুষের কর্তৃত্ব এবং শাসনতন্ত্রের মধ্যে তাদের সুখী-জীবনের গ্যারান্টি থাকতে হবে। এবারের টঙ্গী সম্মেলন তাই কৃষকদের রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের পথে বিরাট অগ্রগতি, নতুন পদক্ষেপের সূচনা করবে। যুগ বিবর্তনের ধারাও তো ঠিক তাই।

মওলানা ভাসানী দেশের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পরিবর্তনের স্পন্দন অনুভব করেন, জন্ম দেন নতুন ইতিহাসের। তিনি দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন – "শাসনতন্ত্রে যদি কৃষক-শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করার প্রচেষ্টা থাকে তবে টঙ্গী সম্মেলনে আমরা কৃষক-শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা এবং অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে সংগ্রামের পতাকা উড়াব।" সম্ভবতঃ বাংলাদেশের নতুন শাসনতন্ত্রে সুকৌশলে মেহনতি মানুষকে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। অগ্রিম সাবধানবাণীতে তাই সরকারের আৎকে উঠা স্বাভাবিক। যদি এই বহু কষ্টের শাসনতন্ত্রটি প্রত্যাখাত হয় তবে ....? অতএব ভাসানীর কথায় এবং কাজে নতুন কোন ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করা চাই...। প্রচার শুরু হয়ে গেল, টঙ্গীতে মওলানা ভাসানী বাংলাদেশের নতুন পতাকা উড়াবেন। উর্বর মস্তিষ্কের কোষ থেকে আরো আবিষ্কার হল মওলানা চীন এবং আমেরিকার সাহায্যে ষড়যন্ত্র করে নতুন বাংলাদেশের জনক হতে চান।

প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে মওলানা ভাসানী সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন-"বাংলাদেশের সব দল-মত-শ্রেণী নির্বিশেষে যে পতাকাকে জাতীয় পতাকা হিসাবে গ্রহণ করেছে তার বিকল্প কোন পতাকা উড়ানোর প্রশ্নই ওঠে না। সুবিধাবাদীচক্র আমার ভাষণের বিকৃত ব্যাখ্যা করে জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে।"

বাংলাদেশের মেহনতি মানুষ এই সর্বপ্রথম সচেতনভাবে শাসনতন্ত্র গ্রহণের মতো একটি জরুরী প্রশ্নে তাদের মতামত দিতে যাচ্ছে। সমস্ত বাধা-বিপত্তির পাহাড় ডিঙিয়ে শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ের মিছিল চলছে নতুন পৃথিবীর নব দিগন্তের পথে। তাদের এ মিছিল থামবে না। সংগ্রামী চেতনার স্বাক্ষর নিয়ে অনাগত ভবিষ্যতের সোনালি আলোয় ভাস্বর এ মহামিছিলের মহানায়ক জনগণের নন্দিত নেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী।

৩০ ও ৩১ শে মে কিশোরগঞ্জের ভাটি এলাকায় কৃষক সম্মেলন

বাংলাদেশ কৃষক সমিতির ময়মনসিংহ জেলা এডহক কমিটির সদস্য জনাব আবুল ফয়েজ জানিয়েছেন যে আগামী ৩০ ও ৩১ শে মে বাংলাদেশ কৃষক সমিতি কিশোরগঞ্জ ভাটি আঞ্চলিক সম্মেলন মিঠামন থানার চারিগ্রামে অনুষ্ঠিত হবে। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বাংলাদেশ কৃষক সমিতির আহ্বায়ক মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী।

দুইদিন ব্যাপী এই সম্মেলনের প্রথমদিন প্রতিনিধি সম্মেলন এবং দ্বিতীয়দিন কৃষক-জনসভা অনুষ্ঠিত হবে। জনসভার পর সন্ধ্যায় গণসঙ্গীতের আসর বসবে।

টাঙ্গাইল ন্যাপের নতুন আহ্বায়ক

গত ২১ শে মে জনাব আবদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির টাঙ্গাইল জেলা সাংগঠনিক কমিটির এক সভায় কার্যরত আহবায়ক জনাব সৈয়দ আবদুল মতিনের বিরুদ্ধে সর্বসম্মতিক্রমে অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত হয়। একই সভায় জনাব গোলাম নুরুন্নবীকে উক্ত কমিটির আহ্বায়ক নিযুক্ত করবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ইহা কি সত্য?

॥ ৬৪ ॥

বগুড়ার যে এমসিএ-টি অসংখ্য দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত, পয়লা নম্বরের কতকগুলো দালালকে সে ঘুষ খেয়ে রক্ষা করছে। যে বিধবাটি মেজর জাকিকে সঙ্গ দিয়ে বগুড়ার শত শত যুবতীর সর্বনাশ সাধন করেছে তাকেই এমসিএ সাহেব আগলে রাখছেন। জেলা পরিষদের অফিসের জনৈক কর্মচারী, হত্যা যজ্ঞের সাহায্যকারী এক চামড়া ব্যবসায়ী, হার্ডওয়ার ব্যবসায়ী, নর্থবেঙ্গল পেট্রোলিয়ামের জনৈক হর্তাকর্তা, পানি সরবরাহ বিভাগের এক কর্মকর্তা প্রভৃতি জঘন্য প্রকৃতির দালালদের উক্ত এম সি এ ঘুষ খেয়ে দেশপ্রেমিক নাগরিক বলে সার্টিফিকেট দিয়েছেন।

॥ ৬৫ ॥

শেরপুরের জনৈক এম সি এ শেরেবাংলা রোডের একটি পুরাতন মেহগনি গাছ কাটিয়েছেন। গাছটির মালিক গরুহাটি করাত-কলে পাঠিয়ে শেরপুর মিউনিসিপ্যালিটি তথা জনসাধারণ। তাই এম সি এ সাহেবের এহেন গর্হিত কাজে ক্ষুব্ধ হয়ে কয়েকজন রাজনৈতিক কর্মী প্রতিকারে নেমে পড়েন। এম সি এ সাহেবও আর কিছু করতে না পেরে যেসব কামলা গাছটি কেটেছিল তাদের হাজতে পুরেছেন।

॥ ৬৬ ॥

টাঙ্গাইলের সেই হাইওয়ান এমসিএ মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন গ্রেনেড চার্জে ডুবে যাওয়া দুটি নৌকা থেকে ১৪ নং কাকুয়া ইউনিয়নের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী কর্তৃক উদ্ধারকৃত বহু লোহার ফালি ৬ হাজার টাকায় বিক্রি করে উক্ত ইউনিয়নের একজন সহযোগীর সঙ্গে ভাগাভাগীতে আত্মসাৎ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু প্রচুর অর্থ ও শ্রমে উদ্ধারকৃত এই লোহাগুলি সরিয়ে নেয়ার ব্যাপারে স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ বাদ সাধলে তার সে মনস্কামনা পূর্ণ হতে পারেনি।

॥ ৬৭ ॥

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ভাগ্নিজামাই এম ডি সেলিমুজ্জামান গত ১৪ই মে পর্যন্ত মামুলী একজন সেকশন অফিসার (টেক্সেশন বিভাগ) ছিলেন। আজ তিনি একজন ডেপুটি সেক্রেটারী (ইনফরমেশন) এবং এ পদটি সরাসরি তাকে দেয়া হয়েছে তার উপরের অনেক অভিজ্ঞ অফিসারকে ডিঙ্গিয়ে। একটা পুরনো শ্লোগান মনে পড়লো- হক সাহেবকে ডুবালো কে- ভাগ্নে ছাড়া আবার কে?

॥ ৬৮ ॥

শেরপুরের জনৈক এমসিএ দু'জন অসাধু ব্যবসায়ীর প্রত্যেকের নিকট হতে এক হাজার টাকা ঘুষ গ্রহণ করে প্রথমজনকে সিমেন্ট এবং অপরজনকে ৩০০০ বস্তা সারের পারমিটের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তাছাড়া দীর্ঘদিন ধরে তেলের ব্যবসায়ে নিযুক্ত মোঃ মুকছেদুর রহমান নামক একজন ব্যবসায়ীর বৈধ লাইসেন্স থাকা সত্ত্বেও এই গণপ্রতিনিধি সাহেব ৭০০ টাকার বিনিময়ে নতুন করে অন্য একজনকে তেলের লাইসেন্স দেওয়ার ব্যবস্থা করে। এই সিমেন্ট, সার এবং তেল কোনটাই জনসাধারণ পায়নি।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবক দলের প্রধান আবদুর রাজ্জাকের (এম.সি.এ) বড় ভাই বুড়ীগঙ্গা নদী সংলগ্ন আজিজুর রহমান চৌধুরীর ডকইয়ার্ডে রক্ষিত বি.এন.ও. – এর ৫০ গ্রেল তেলের ২৪ ড্রাম কেরোসিন তেল কালোবাজারিতে বিক্রীর সময় ভাসানী ন্যাপের জনৈক কর্মীর নেতৃত্ব জনতার নিকট হাতেনাতে ধরা পড়েন। কতিপয় সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে জোরপূর্বক ঐ তেল কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করলে স্থানীয় যুবক দল এবং জনসাধারণ তার সেই চেষ্টাও ব্যর্থ করে দেয়।

টঙ্গী সম্মেলনের তারিখ পরিবর্তন

বাংলাদেশ কৃষক সমিতি প্রধান মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী মে মাসের ২৮/২৯ তারিখে টঙ্গীতে শাসনতন্ত্র পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে আহূত কৃষক-শ্রমিক সম্মেলনের তারিখ পিছিয়ে দিয়েছেন।

এই সম্মেলনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল শাসনতন্ত্রে কৃষক-শ্রমিকের স্বার্থ সংরক্ষিত হইয়াছে কিনা উহা পর্য্যালোচনা করিয়া আগামীদিনের কৃষক-শ্রমিক আন্দোলনের গতি প্রকৃতি নির্ধারণ।

কিন্তু যেহেতু সরকার মে মাসে শাসনতন্ত্র প্রকাশ করিতেছেন না, সুতরাং এই সম্মেলনের তারিখ পরিবর্তন করিয়া ১০ই ও ১১ই জুলাই ধার্য্য করা হইয়াছে।

মে দিবস ও শ্রমিক আন্দোলন

১৮৮৬ সালের ১লা মে। দৈত্যকুলে প্রহলাদের জন্মের মতো পৃথিবীর সাম্রাজ্যবাদী এবং ধনতান্ত্রিক শোষকদের মূল ঘাঁটি আমেরিকার শিকাগো শহরে শোষিত, নির্যাতিত শ্রমিকসমাজ বিক্ষোভের পতাকা উড়াল ... কণ্ঠে তাদের ৮ ঘন্টা খাটুনীর দাবী। মে মাসের এই প্রথম দিনটিতে বিশ্বশ্রমিক আন্দোলনের প্রথম বিস্ফোরণে কেঁপে উঠলো মালিকদের শোষণের ভিত্তিমূল। নির্যাতিত মানুষের চোখে প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা তাদের শিরায় শিরায় বইয়ে দিল অনাগত ভয়ের ঠাণ্ডা হিমস্রোত। চিরদিন যারা পায়ের নীচে মাথা নুইয়ে দিয়েছে, জীবনের শেষ শক্তিটুকু নিঃশেষ করে দিয়ে গড়ে তুলছে মালিকের মুনাফার পাহাড় তারা আজ কোন স্পর্দ্ধায় মাথা তুলতে চায়।

না অসম্ভব ... অঙ্কুরেই যদি এদের এই ঔদ্ধত্যের অহঙ্কার ধুলায় মিশিয়ে না দেয়া যায় তবে সারা বিশ্বজুড়ে শোষক শ্রেণীর সামনে এক ভয়াবহ দিন এগিয়ে আসছে। তলব করা হল তথাকথিত গণতান্ত্রিক দেশের বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থরক্ষক পুলিশ বাহিনীকে, গর্জে উঠল বন্দুক ...।

শিকাগো শহরের হে মার্কেটে বিক্ষোভরত শ্রমিক মিছিলে গুলি বর্ষণ করা হল ... শ্রমজীবী মানুষের ঘামে ভেজা পৃথিবীর মাটি এবার টকটকে তাজা রক্তে লাল হয়ে উঠল। রক্তরাঙ্গা মে' মাস হয়ে উঠলো বিশ্বশ্রমিক আন্দোলনের ঐক্যের প্রতীক।

যাদের জীবনের সব আশা আর স্বপ্নকে তিলতিল করে শোষণ করে তাদের রক্ত আর ঘামে গড়ে উঠেছে মিশরের পিরামিড, আলহামরার প্রাসাদ, চীনের প্রাচীর আর আগ্রার তাজমহল অথচ প্রতিদানে যারা প্রতিদিন ক্ষুধা আর ক্লান্তি, বেত্রাঘাত আর মৃত্যুর অলঙ্কারে ভূষিত হয়েছে মালিকদের কাছ থেকে, সেই ক্রীতদাস আর ভূমিদাসদের নবসংস্করণ আজকের সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণী। ক্রীতদাস আর ভূমিদাসরা শুধু মুখবুজে অত্যাচার সয়ে যেত ... কিন্তু আন্দোলনের অনেক অভিজ্ঞতার আলোকে আজকের শ্রমিক শ্রেণী চিনেছে নিজেদের, জ্ঞাত হয়েছে ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলনের শক্তি সম্পর্কে। হে মার্কেটের ঘটনা সেই অভিজ্ঞতা অর্জনের একটি প্রাথমিক পদক্ষেপ।

মে মাসের অভিজ্ঞতাকে গ্রহণ করে ১৮৮৯

সালে ফ্রান্সের প্যারী নগরীতে শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিক সংগঠন ১৮৯০ সালের ১লা মে হতে পৃথিবী জুড়ে এই দিবসটি শ্রমিক শ্রেণীর বিজয় উৎসব, মৈত্রীর বন্ধন এবং শপথ গ্রহণের প্রতীক দিবস হিসাবে গণ্য করার প্রস্তাব গ্রহণ করে।

মার্কিন ধনিক শ্রেণী যে দিনটিকে শ্রমিকদের জন্যে হত্যা আর বিভিষিকার কালো দিন হিসেবে তৈরী করতে চেয়েছিল সেই দিনটিই শ্রমিক শ্রেণীর জন্যে ঐক্য আর সংহতি, শক্তি আর বিজয়ের লাল পতাকার দিনে পরিণত হল। প্রথম মে দিবসের মাত্র একত্রিশ বছর পরেই পৃথিবীর বুকে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

বর্তমান জাতীয় মুক্তি আন্দোলন এবং সর্বপ্রকার শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের যুগে শ্রমিক আন্দোলনের গুরুত্ব অপরিসীম। কৃষি প্রধান অনুন্নত দেশগুলিতে জনসংখ্যাবৃদ্ধি, কৃষকদের উপর সীমাহীন সামন্তবাদী ও ধনতান্ত্রিক শোষণে তাদের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যাওয়ার ফলে ভূমিহীন কৃষকদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। শুধুমাত্র দেহের শ্রমশক্তি বিক্রী করা ছাড়া তাদের জীবনধারণের আর কোন উপায়ই থাকে না। দেশে যদি যথেষ্ট পরিমাণ শিল্পকারখানা গড়ে না উঠে তবে এই ভূমিহীন বেকার মানুষ সবচেয়ে কমদামে শ্রমশক্তি বিক্রীর প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে বাধ্য হয় এবং সুযোগ-সন্ধানী মালিকরা তাদের ইচ্ছা মতো বেতন নির্ধারণ করে এই সর্বহারা মানুষের শ্রমশক্তি কিনে নেয়।

সুষ্ঠু ট্রেডইউনিয়ন আন্দোলন গড়ে তোলাই হচ্ছে মালিকদের এই শোষণের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের প্রথম সক্রিয় পদক্ষেপ। তারপর ধর্মঘট, ঘেরাও প্রভৃতি বাস্তব আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তাদের রাজনৈতিক জ্ঞান বৃদ্ধি করে অবশেষে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মধ্যদিয়েই তারা রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করতে পারে।

শোষক শ্রেণীও অবশ্য বিভিন্ন শ্রমিক আন্দোলনের প্রতিরোধ করতে যেয়ে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে পরবর্তী সময়ে সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগায়। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার ফলে তারা বুঝতে পেরেছে যে শুধুমাত্র পুলিশী হামলা, গ্রেফতার আর হত্যা দ্বারা শ্রমিক আন্দোলন নস্যাৎ করা যায় না বরং এতে তাদের সংগ্রামী ঐক্য দৃঢ় হয়। পক্ষান্তরে যদি দালাল শ্রমিক নেতা সৃষ্টি করে শ্রমিকদের মধ্যে বিভেদ তৈরী করা যায় তবে সহজেই তাদের বিভ্রান্ত করে শ্রমিক শ্রেণীর জঙ্গী আন্দোলনগুলোর পিছন থেকে ছুরিকাঘাত করা সহজ হয়ে পড়ে। দেশে দেশে শোষক মালিক গোষ্ঠী তাদের সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাচ্ছে। প্রতিটি মিল-কারখানায় এবং শিল্পাঞ্চলসমূহে তাই সাচ্চা শ্রমিক প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি অজস্র তল্পীবাহক দালাল প্রতিষ্ঠান গজিয়ে উঠেছে।

দালাল শ্রমিক নেতাদের মাঝেও প্রধানতঃ দু'টি দল থাকে। কোন কোন দালাল নেতা নিছক দালালীর মাধ্যমে টাকা উপার্জনের জন্যে এ রাস্তায় আসে। বড়ো ধরণের কোন ধর্মঘটকে বানচাল করে দিয়ে এরা মালিক পক্ষের কাছ থেকে অজস্র টাকা উৎকোচ গ্রহণ করে। অবশ্য ২ /১টি ঘটনার পরই এদের প্রকৃত চেহারা শ্রমিকদের কাছে উদঘাটিত হয়ে পড়ে এবং এরা শ্রমিক আন্দোলন থেকে সরে পড়ে অথবা বিতাড়িত হয়। আবার কিছুসংখ্যক দালাল নেতা ও সংগঠন গড়ে ওঠে বুর্জোয়া মালিক শ্রেণী ও সরকারের সুপরিকল্পিত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে।

শ্রমিক আন্দোলনের জন্যে এরা মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। নিছক অর্থ উপার্জনই একমাত্র লক্ষ্য নয় বলে শ্রমিকদের বিভিন্ন আন্দোলনের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত জড়িত থেকে এরা তাদের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়। তারপর সুচতুরভাবে সেই আন্দোলনকে বিপথগামী করে এবং আন্দোলনের যৌক্তিক পরিণতির পথে বাঁধা সৃষ্টি করে। ধরা যাক কোন সুতার কলে ১০ হাজার শ্রমিক কাজ করে

এবং শ্রমিকদের গড়বেতন ষাট টাকা। এই মিলের শ্রমিকরা মাসিক ১০০ টাকা বেতনের দাবীতে ধর্মঘট করল। কোন নিঃস্বার্থ সাচ্চা শ্রমিকনেতা এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিলে শ্রমিকদের দাবী পুরোটাই আদায় করা সম্ভব হত। কিন্তু এই চতুর দালালনেতা আন্দোলনের মাঝপথে আশি টাকা বেতন হিসাবে মালিকদের সঙ্গে আপোস করে ফেলে। শ্রমিকদের বিশ টাকা বেতন বৃদ্ধি হওয়ায় তারাও খুশী হয় আবার মালিক পক্ষও প্রতি মাসে দুই লক্ষ টাকা বেতন বৃদ্ধির হাত থেকে রক্ষা পেল। এককালীন পঞ্চাশ হাজার টাকা ঐ শ্রমিকনেতা গোপনে মালিকের কাজ থেকে উৎকোচ গ্রহণ করল। বেতন বৃদ্ধি হওয়ায় শ্রমিকরাও সন্তুষ্ট থাকলো আবার মালিক পক্ষও একটা মোটা টাকা বেতন বৃদ্ধির হাত থেকে রক্ষা পেল। সেখানে শ্রমিক অসন্তোষ মারাত্মক পর্যায়ে পৌঁছে শ্রেণী সংগ্রামের চূড়ান্ত রূপে প্রকাশ পেল না। কিন্তু সবচেয়ে বিপজ্জনক শ্রমিক নেতা হচ্ছে তারাই যারা শ্রেণী সংগ্রামের মন্ত্রে দিক্ষিত হলেও সংশোধনবাদী চিন্তাধারার বশবর্তী হয়ে শ্রমিক আন্দোলনের শেষ পর্যায় শ্রেণী সংগ্রামের পথ থেকে শ্রমিক শ্রেণীকে দূরে ঠেলে রাখে।

বিশ্বরাজনীতিতে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের চরম সুবিধাবাদী মতবাদ অনুসারীরা শ্রমিকদের সশস্ত্র সংগ্রামের সঠিক পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্যে শান্তি, শৃঙ্খলা, অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় সাম্রাজ্যবাদী শোষক শ্রেণীকে উৎখাতকরণ প্রভৃতি গালভরা বুলি দিয়ে বিপ্লবের দীক্ষা থেকে শ্রমিকদের মানসিকতাকে আড়াল করে রেখে তাদের সংগ্রামী চেতনাকে ভোতা করে দেয়।

যাই হোক আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণী তাদের বিভিন্ন আন্দোলন এবং সংগ্রামের মধ্যদিয়ে ক্রমেই তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন এবং এই অধিকার আদায়ের বাস্তব পন্থা সম্পর্কে অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন কৌশলে সাময়িকভাবে হয়তো তাদের বিভ্রান্ত করা সম্ভব, কিন্তু দীর্ঘদিনের সংগ্রামী অভিজ্ঞতা তাই তাদের প্রকৃত বন্ধু চিনতে সহায়তা করে – তাদের পথ-নির্দেশ করে দেয়। শোষিত কৃষক সমাজ এবং সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণীর মৈত্রীর ভিত্তিতে দেশে দেশে মেহনতি মানুষের অভ্যুত্থান ঘটে, তাদের জয়যাত্রার অগ্রগতির পথে কোন ষড়যন্ত্রই শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারে না। একমাত্র শৃঙ্খল ছাড়া সর্বহারা শ্রেণীর হারাবার আর কিছু নেই। শ্রমজীবী মানুষ আজ আর বেতন বৃদ্ধি অথবা অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা লাভের সাময়িক প্রলোভনেও তৃপ্ত নয় – তারা এগিয়ে চলেছে এক নতুন পৃথিবী গড়ার লক্ষ্যে কৃষক—শ্রমিকরাজ কায়েমের দৃঢ় অঙ্গীকারে। একতাবদ্ধ মানুষের বিজয়ের দিন আসছে।

* *শৃঙ্খলা ছাড়া শ্রমিকদের হারাবার আর কিছু নেই।*
* *শ্রেণীর সঙ্গে শ্রেণীসমূহের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্কেই রাজনীতি।*

কবিতা বিপ্লব শুধু

মুশফিকুর রহমান

ঘুমিয়ে থাকার স্বপ্ন
গ্রন্থহীন জীবনে দুরতিকল্প,
মারমুখী জনতার
ভীড়ে-আক্রোশে তুলি হাতিয়ার
লাল গোলাপের ছায়া রক্তে ঘনতর।
বন্দরের পাট তুলে নৌকো
সাগরের উর্মিমুখে সংগ্রাম সাহসীঃ
বন্ধু, বিচ্ছেদ ভোলো, জীবনের কঠিন ক্রন্দনে
চিবুকে বঙ্কিম হাসি ধ্বংস রাশি ঠেলে
অবশ্য পৌঁছবো জেনো শঙ্কিল নিশি অবসানে
ভোরের প্রহরে দূরে শান্ত ছায়াতীর।
মৃত্যুর অধিক দুঃখ ক্ষুধা তীব্রতর
বেয়নেট অস্ত্রে বিধে। সভ্যতার 'সুকুমার' সুধা
আহত বিদায় নিল, কণ্ঠে সরে মিছিলের বাণী
কবিতা বিপ্লব শুধু হননের নিষ্ঠুর নিয়মে।

সম্পাদক ঃ সৈয়দ ইরফানুল বারী, মুদ্রণে ঃ শান্তি প্রেস, টাঙ্গাইল।

প্রতি কপি পঁচিশ পয়সা সাপ্তাহিক রেজিষ্টার্ড নং ডিএ ১৭৬

হক-কথা

(WEEKLY THE HAQ-KATHA)

প্রকাশক ও পৃষ্ঠপোষক ঃ মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

প্রথম বর্ষ চতুর্দশ সংখ্যা শুক্রবার ১৯ শে জৈষ্ঠ ১৩৭৯, ২রা জুন, ১৯৭২ ২০ শে রবিউসসানি ১৩৯২; সন্তোষ, টাঙ্গাইল

বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা পঙ্গু রাখতে

রুশ– ভারতীয় চক্রান্ত

ভারত সরকার বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু এর সার্বভৌমত্বে হস্তক্ষেপ করে চলছে, তাতে আজ আর কোন সন্দেহ নেই।

মুজিব সরকারের প্রতি ইন্দিরা-চক্রের নির্দেশ বলবৎ হয়েছে, বাংলাদেশের জন্যে পৃথক কোন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা রাখা যাবে না। পদাতিক বাহিনীতে আর একজনকেও যদি রিক্রুট করতে হয় তবে আর কারো না হউক ডিসেম্বরে খোদ বেঙ্গল রেজিমেন্ট কর্তৃক দখল করা পাক-বাহিনীর ভারী অস্ত্রগুলো পর্যন্ত ভারতীয়রা নিয়ে গেছে। তাদের সাফ জবাব, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জন্যে এসবের কোন প্রয়োজন নেই। সম্প্রতি একটি ফরাসী ম্যাগাজিনে প্রকাশ করা হয়েছে যে, পাকিস্তানে আটক বেঙ্গল রেজিমেন্টের হাজার হাজার জোয়ান তাদের মাতৃভূমি বাংলাদেশে ফিরে

– ভারত চায় না বাংলাদেশে বেঙ্গল রেজিমেন্ট ফিরে আসুক
– গত মাসে বিমানবাহিনী বিদ্রোহ করেছিল
– বন্দর পরিষ্কারের নামে বঙ্গোপসাগরে রুশ নৌ-তদারকী চেপে বসছে

বাংলাদেশের 'অ-সরকারী প্রধানমন্ত্রী' বলে পরিচিত মিঃ ডিপি ধরের অনুমতি লাগবে। জেনারেল ওসমানী চোরাচালান রোধকল্পে সীমান্তে পদাতিক বাহিনী নিয়োগ করতে চাইলে সরকার এর সংখ্যাল্পতার প্রশ্ন তুলেন। এমতাবস্থায় নওজোয়ান সংগ্রহ করবার অনুমতি চাইলে সরকার তাতেও রাজী হননি। ভারত সরকার জানিয়েছেন, তাদের সৈন্য-সামন্ত সীমান্তে থাকলে আর কারো দরকার পড়বে না। শুধু সংখ্যা নিয়ন্ত্রণই নয়, গত আসুক, ভারতীয় প্রতিরক্ষা দফতর তা কামনা করেন না। এই দফতরের ধারণা বেঙ্গল রেজিমেন্টের ভারত ভক্তি থাকলেও যেন-তেন প্রকারে কিছু করানো যাবে না। অসম্ভব কিছু না, আসন্ন ইন্দিরা-ভুট্টো আলোচনায় সেই হতভাগ্য জোয়ানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হবে। তারা তো আমাদের নাগালের বাইরে। মেজর জলিলের মত দেশপ্রেমিক যোদ্ধা আমাদের মাঝে থাকা সত্ত্বেও ভারতীয় কূট ইঙ্গিতে বাংলাদেশ

সরকার তাকে কোর্ট মার্শালে বিচার করতে যাচ্ছেন। সবই কিন্তু একই পরিকল্পনার অবিচ্ছিন্ন এ্যাকশন।

বাংলাদেশের বিমানবাহিনী শূন্যতা থেকে কয়েক মাসে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল। মুজিব সরকারের কোথাও সম্মতিতে কোথাও অসম্মতিতে ভারতীয় গোয়েন্দাচক্র সকল গতি ও প্রগতিকে নস্যাৎ করতে উঠেপড়ে লেগে আছে। আমাদের বিমানবাহিনীটিকে অঙ্কুরেই তারা পঙ্গু করে দিতে সমর্থ হয়েছে। রহস্যজনকভাবে কয়েকজন ক্যাপ্টেন বিমান দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন। কিন্তু তদন্তের বিষয়টি আজও রহস্যাবৃত রয়েছে। বাংলাদেশের বিমানবাহিনীকে উপেক্ষা করে ভারতীয় বিমান পার্বত্য চট্টগ্রামে বোমা বর্ষণ করে। তৎসঙ্গে আবার ভারতীয় গোয়েন্দারই উস্কানীতে সাড়ে তিনশতেরও বেশী এয়ারম্যান গত মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। পদাতিক বাহিনী দিয়ে তৎক্ষণাৎ বিমান দফতর এলাকাটিকে ঘেরাও করে ফেলা হয়। ৪৮ ঘন্টা এই অবরোধ চলার পর ৩০ জনকে গ্রেফতার ও ৫ জনকে কোর্ট মার্শালে বিচার করা হয়। এই ঘটনাটি বাংলাদেশে পদাতিক ও বিমানবাহিনীর মধ্যে দারুণ তিক্ততার সৃষ্টি করে। প্রকৃতপক্ষে ভারতের তাই কাম্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

বাংলাদেশের নৌশক্তি বলে একটা কিছু হতে পারত। কিন্তু একটি উপনিবেশে তা কি করে হয়? বোমা মেরে যে তিনটি জাহাজ সমুদ্রমুখে ডুবিয়ে দেয়া হয়েছিল সেগুলোকে উদ্ধার করতে রুশ কর্তৃপক্ষের সাথে বাংলাদেশ সরকার চুক্তি করতে বাধ্য হয়। অথচ এইটুকু কাজ সারার এক্সপার্ট বাংলাদেশেও রয়েছে। কিন্তু আমাদের অক্ষমতা প্রমাণ করতেই এই চুক্তি সম্পন্ন হয়। ১৯৬২ সালের ঘূর্ণিঝড়ে যেসব জাহাজ চড়ায় উঠে পড়েছিল বাংলাদেশের নাবিকরাই তা উদ্ধার করে কাজে লাগিয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে বঙ্গোপসাগরে রুশ নৌশক্তি চেপে বসবার সুদূরপ্রসারী অশুভ পরিকল্পনা নিয়ে তারা বন্ধু সেজে এসেছে। এর ফলে এক শতাব্দীতেও বাংলাদেশের নৌবাহিনী স্বীয় বৈশিষ্ট্যে গড়ে উঠবে না। এদিকে বোমায় বিধ্বস্ত হবার পর বাংলাদেশের যে কয়টি জাহাজ ছিল তাও ভারত নিজের দখলে নিয়ে গেছে। প্রথমে তারা এগুলো কিছুদিনের জন্যে ব্যবহার করতে অনুমতি প্রার্থনা করে। হাতে পাবার পর তারা আর ফেরত দিচ্ছে না। এগুলোর একটির নাম ছিল বাকের। ভারত এই জাহাজটির রং পাল্টিয়ে নাম রেখেছে হুগলি। হুগলিতে করেই তারা সাড়ে চার হাজার কোটি টাকার পাক অস্ত্র বাংলাদেশ থেকে নিয়ে যায়। অথচ এই অস্ত্র দখলে পাবার পেছনে বেঙ্গল রেজিমেন্ট এবং মুক্তিবাহিনীর অবদান কম নয়। পরিশেষে বাংলাদেশের জন্যে যা দাঁড়াল তা হল। প্রবাদের ভাষায়, 'আমও গেল, ছালাও গেল।'

এই ঘটনাপ্রবাহ সবচেয়ে বেশী দাগা দিয়েছে জেনারেল ওসমানীকে। তার আশা ছিল প্রতিরক্ষামন্ত্রী হয়ে এসবের নিরসন ঘটাবেন। শেখ মুজিব তাকে আশাও দিয়েছিলেন। বেচারা সি-ইন- সি-গিরি ছাড়লেন। কিন্তু প্রতিরক্ষার বদলে পেলেন পরিবহন। কারণ আর কিছুই নয়, মেজর জলিলের চেয়ে জেনারেল ওসমানী কয়েক ডিগ্রী বেশী ভারতীয় কাণ্ড সমালোচক ও প্রতিরোধকারী। জেনারেল ওসমানীর সাথে ভারতীয় সামরিক চক্রের বিরোধ চরমে উঠেছে বিগত স্বাধীনতা সংগ্রামের কয়েকটি বিষয় সম্পর্কিত পরিসংখ্যান ও তথ্য নিয়ে। ভারত বরাবরই প্রমাণ করতে চেষ্টা করছে – বেঙ্গল রেজিমেন্ট কিংবা মুক্তিবাহিনী কিছু না। প্রায় সবটাই সেরে দিয়েছে ভারতীয় বাহিনী। ইতিহাসের পাতায় এই মিথ্যা জুড়ে দিতে কত বাহানাই না তারা করছে। তাই তারা চায় না বেঙ্গল রেজিমেন্ট স্বীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত থাকুক। এই জন্যেই তারা দেয়নি মুক্তিবাহিনী দিয়ে

মিলিশিয়া গড়ে উঠতে। ভারত ভাল করেই জানে, বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কায়েম হলে বাবাজীগিরী দেখানো যাবে না। কিন্তু ভারতের জাগ্রত জনতা, ন্যায় বিচারকামী মেহনতি মানুষ কি বুঝবে না, বাংলাদেশকে এমনিভাবে একের পর এক উপায়ে পঙ্গু করে রাখার চেষ্টা চললে অনিয়ন্ত্রিত মরণকামড় নিশ্চিত।

কিশোরগঞ্জ ভাটি আঞ্চলিক সম্মেলনে মওলানা ভাসানীর ঘোষণা

লালবাহিনী দিয়ে কৃষক সমিতি দমন করলে মুজিবের দশা চিয়াং কাইশেকের মত হবে

মাইজদী, রাঙ্গুনিয়া, ফেনী, কুমিল্লা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জনসভার পর মওলানা ভাসানী বাংলাদেশ কৃষক সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত কিশোরগঞ্জ ভাটি আঞ্চলিক সম্মেলনে যোগ দেন। ভৈরব থেকে দশ ঘন্টা লঞ্চ সফরের পর গত ৩০ শে মে দুপুরে সম্মেলন স্থল মিঠামন থানাধীন চারিগ্রামে তিনি পৌঁছেন। যাত্রাপথে খয়েরপুর, আদমপুর ও কাঞ্চনপুরের লঞ্চঘাটে তাকে সম্বর্ধনা দেয়া হয়। অসুস্থ মওলানা সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে সর্বত্র ভাষণ দেন। এদের মধ্যে এমন লোকও ছিল যারা জীবনে মহকুমা শহর কিশোরগঞ্জও দেখে নাই। কোন নেতার সাক্ষাত পায় নাই। ভাটি এলাকার সত্যিকার অবস্থা না দেখলে বিশ্বাস হবে না। যোগাযোগের অভাবে সেটাই আরেক দুনিয়া হয়ে আছে। একটা মিনি মহাসাগরে যেন অসংখ্য হাওয়াই। অনেকে মওলানা সাহেবকে জীবনে প্রথম দেখেছে। বহুদিন পূর্বে ভাসানী চরের মওলানা অষ্টগ্রাম গিয়েছিলেন। অনেকে বাবার মুখে শুনেছে। জেনে আসছে লোকটি বড়ই বিদ্রোহী। হাজার হাজার বিঘা জমির মালিক ঘোড়া হাকিয়ে মওলানাকে দেখতে এসেছে। একেবারে ভূমিহীনও এসেছে নৌকায় ও পায়ে হেঁটে। মওলানা বললেন, এবার আর আপোষ নয়– সংগ্রামের মাধ্যমে জোতদারী শোষণের অবসান ঘটাতে হবে। ঘোড়া সওয়ারীরা বিবর্ণ হল। পদাতিকরা প্রথমে সন্দেহ প্রকাশ করল, হুজুর তো চলে যাচ্ছেন। তারপর কে কি করবে। মওলানা জানলেন, আমার সংগঠন কৃষক সমিতি রেখে যাচ্ছি। আগামীতে বেঁচে থাকলে আবার আসব। মওলানাকে কোথাও ফুলের মালা কোথাও বোরো ধানের ছড়া ও বাদামে গাঁথা মালা দেয়া হল। চারিগ্রামে পানি সেচের সনাতন যন্ত্র দিয়ে মূল তোরণটি করা হয়েছিল। তাছাড়া শহীদদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীত ছিল দুটি গেট। একটি লাঙ্গল, জোয়াল ও মই দিয়ে অপরটি পানি সেচের আধুনিক পাইপ দিয়ে।

৩০শে মে বিকেলে মওলানা সাহেবের সভাপতিত্বে সম্মেলন শুরু হয়। তাতে মিঠামন, নিকলী, ইটনা, অষ্টগ্রাম ও আজমিরীগঞ্জ এই পাঁচটি থানার কৃষক প্রতিনিধি যোগদান করে। সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক জনাব মহিবুর রহমান রঙ্গু তার রিপোর্টে ১৯৭০ সালের জানুয়ারী মাসে আওয়ামী লীগের গুণ্ডাদের হাতে শহীদ ওমর ফারুক এবং বিগত স্বাধীনতা সংগ্রামে শাহাদৎ প্রাপ্ত ভাটি এলাকার বীর গেরিলাযোদ্ধা সিরাজ, শাহাবুদ্দীন, সুখেন্দু, ইকবাল ও জগৎজ্যোতি প্রকাশের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন। রিপোর্টে বলা হয়, 'ইন্দিরা সরকার পূর্ববাংলার প্রশ্নে এত ভালবাসা দেখাইবার কারণ আজ আর কাহারও অজানা নাই। ইয়াহিয়া সরকারের কাশ্মীরের জনগণের জন্যে কান্না, শিখদের জন্যে কান্না যেমন উদ্দেশ্যমূলক; তেমনি পূর্ববাংলার জন্যে ইন্দিরা সরকারের দরদ উদ্দেশ্যমূলক।... মনে রাখিতে হইবে, ভারতের প্রতিক্রিয়াশীল সরকার আর ভারতের মহান জনগণ এক কথা

নয়। পূর্ববাংলার জনগণের মুক্তিসংগ্রাম ভারতের মেহনতি জনগণের সাহায্য ও সমর্থন সর্বদাই পাইবে তেমনি ভারতীয় মেহনতি জনগণের মুক্তি সংগ্রামেও পূর্ববাংলার জনগণ সব সময়ই সমর্থন দিয়া যাইবে। ভারত বাংলাদেশের মেহনতি জনগণের মৈত্রী অমর হউক।"

রিপোর্টের উপর আলোচনা করেন জনাব সালাহউদ্দীন, জনাব মতিউর রহমান ও জনাব আইয়ুব রেজা চৌধুরী। তারা ভাটি এলাকার অর্থনীতি, রাজনীতি, যোগাযোগ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করেন। জোতদাররা বিভিন্ন নামে জমি বন্টন করে ১০০ বিঘার নিম্নে নিয়ে এসেছে। কিন্তু ভোগ ও শোষণ তাদের ঠিকই রয়েছে। শতকরা ৪০ ভাগ কৃষকের হাতে কোন জমিই নাই। তারা শ্রম বিক্রি করে খায়। এই কপালেই যুগ যুগ কাটাতে হবে এই-ই তাদের ধারণা। শতকরা ৩০ ভাগ কৃষকের কিছু কিছু জমি থাকলেও তাদের গরু, লাঙ্গল, বীজ ইত্যাদি কিছুই নাই। বাকী সব বড় বড় জোতদার। তারা ধানের উপর, জমির উপর চড়া সুদে টাকা লাগায়। ফলে কৃষককে মহাজনের হাতে বেশীর ভাগ ফসল তুলে দিতে হয়। একসময় গোটা জমিই মহাজনের হাতে হারাতে হয়। এবার ধানের মণ ৩০ টাকা হলেও মহাজনেরা কৃষকের নিকট থেকে মাত্র ৮ টাকা দরে কিনে নিয়ে যাচ্ছে। কারণ, গত বছর অভাব অনটনে এই শর্তেই কৃষকরা টাকা এনেছে। জলার ইজারাদারগণ শোষণ করেই চলছে।

মিঠামন, নিকলী, ইটনা, অষ্টগ্রাম ও আজমিরীগঞ্জ – এই পাঁচটি থানায় প্রায় ৪ লক্ষ লোকের বাস। এর মধ্যে একটি কলেজ নাই। স্কুলের সংখ্যা অত্যন্ত কম, হাসপাতাল নাই বললেই চলে। মহকুমা শহর সব দিক দিয়ে বিচ্ছিন্ন। বর্ষাকালে গোরস্থান ও শ্মশানের অভাবে পানিতে প্রিয়জনের লাশ পর্যন্ত ভাসিয়ে দিতে হয়। অথচ এই থানা কয়টির হাওড় এলাকা থেকে প্রায় এক লক্ষ টন বোরো ধান উৎপাদিত হয়। সময়মাফিক সার্বিক সেচ ব্যবস্থার অভাবে উৎপাদন বাড়ছে না। এবার তো ডিজেল, সার, পাওয়ার পাম্প সব কিছুরই অভাব গেছে। ভাটি এলাকার সবচেয়ে দুঃখজনক বৈশিষ্ট্য হল, বছরের পুরা ছয়টি মাস প্রতিটি লোক বসে থাকে। হাতে কোন কাজ থাকে না। অথচ মাত্র দুটি বাঁধ দিলে বোরো ছাড়া আর একটি ফসল- বাওয়া ধান করতে পারে। এতে আমাদের লক্ষাধিক টন ধানের উৎপাদন বেড়ে যাবে। সরকার কুটিরশিল্পের ব্যবস্থাও করে দিতে পারেন। ভাটি এলাকার মাছ দিয়ে কত জেলার চাহিদা মিটায়। কিন্তু তড়িৎ যোগাযোগের অভাবে লক্ষ লক্ষ টাকার মাছ নষ্ট হয়। বর্তমানে অবশ্য ত্রিপুরার চোরাচালানীরা চড়া দামে ভাটি থেকে নৌকা- লঞ্চযোগে মাছ নিয়ে যাচ্ছে। এত সব সমস্যার মুখে আজ তাই সেখানে শ্লোগান উঠেছে লাঙ্গল–লাঙ্গল-লাঙ্গল যার জমি-জমি-জমি তার; জাল-জাল-জাল যার – জলা-জলা-জলা তার। শ্লোগান উঠেছে সর্বহারার মতবাদ – মার্কসবাদ-লেনিনবাদ। শ্লোগান উঠেছে কৃষক সমিতি-জিন্দাবাদ, মওলানা ভাসানী-জিন্দাবাদ। প্রতিনিধি সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে মওলানা ভাসানী বলেছেন, সেদিন আর বেশী দূরে নয় সর্বহারার মতবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে ভাটির কৃষক-মজুর শ্রেণী সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়বে, সকল অন্যায় অবিচারের হাত থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষকে মুক্তি দিবে।

নদীর তীরে নৌকার গলুইয়ে একঠাঁই বসে সারাটি রাত কাটান মওলানা ভাসানী। ভাটিয়ালী, মুর্শিদী ও মারিফতী গানে ভাটির গায়করা মওলানাকে মুগ্ধ করে দেয়।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্তি)

আবার ডলার

গত ৩০ শে মে ধনকুবেরের দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বাংলাদেশের মধ্যে ৯ কোটি ডলারের (৬৬ কোটি টাকার মতো) সাহায্য চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে মার্কিন ডলারের অনুপ্রবেশ ঘটলো। যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠনে বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজন অবশ্যই রয়েছে। গত নয় মাসের যুদ্ধ পাক-হানাদার বাহিনী বাংলাদেশের অর্থনীতিকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়ে গেছে। তাই এই হতভাগ্য দেশের সাহায্যকল্পে যদি কোন বন্ধুপ্রতিম রাষ্ট্র সাহায্যের হস্ত প্রসারিত করে দেয় তবে বাংলাদেশবাসীর আনন্দিত হওয়ারই কথা। সাহায্য চুক্তি স্বাক্ষর করার পর প্ল্যানিং কমিশনের সেক্রেটারী ড: এ, কে, এম গোলাম রব্বানী এই সাহায্যের জন্যে কৃতজ্ঞতা এবং আনন্দ প্রকাশ করেছেন।

বাংলাদেশের সাত কোটি অধিবাসী রব্বানী সাহেবের এই উচ্ছ্বাসে শরীক হতে পারতো যদি না মার্কিন ডলারের স্বরূপ এবং প্রকৃত চেহারা সম্পর্কে তাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকতো। যে ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পাবার কথা সে যদি ঘরের কোণে সত্যিকারের আগুন ধরতে দেখে তবে নিশ্চয়ই আনন্দ নয় বরং ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে এটাই স্বাভাবিক। আর হয়েছেও তাই।

পাকিস্তানী আমলে ২৪ বছর বাংলাদেশকে নির্মমভাবে শোষণ করার পর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা বিগত মুক্তিযুদ্ধের সময় বর্বর পাক-সেনাবাহিনীকে যুদ্ধাস্ত্র দিয়ে এবং বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করে তাদের নির্মম হত্যালীলাকে উৎসাহ জুগিয়েছে। আমেরিকার অস্ত্র কারখানায় তৈরী বুলেটে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে বহু দেশপ্রেমিক মুক্তিবাহিনীর দুরন্ত কিশোরের বুকের পাজর। তারপর দেশ মুক্ত হবার শেষ অঙ্কে সপ্তম নৌবহরের হুমকি দিয়ে আসন্ন বিজয়কে স্তব্ধ করার স্পর্দ্ধা দেখিয়ে মুক্তিকামী বিশ্ববাসীর ঘৃণা কুড়িয়েছে এই মার্কিন সরকার। দেশ যখন মুক্ত হয়ে গেল তখন বেশ কিছু দিন চুপ থেকে নতুন ফন্দী করে সাহায্যের ডালি হাতে নিয়ে অনুকম্পা দেখাতে এসেছে মৃতপ্রায় বাঙালী জাতিকে।

মার্কিন ডলার বড়ো সহজ চীজ নয়। একবার কোন দেশে ঢুকতে পারলে সে দেশের অস্থি-পাজর-মজ্জা চুষে খেয়ে সে দেশকে নিঃশেষ করে দেয়। আর এই ডলার যে কোন দেশে অবাধ ছাড়পত্র যোগাড় করে সাহায্যের ছদ্মবেশে।

বাঙালীমাত্রেই মার্কিন সাহায্যের মহিমা জানেন। কারণ, এই ডলারের সঙ্গে তাদের পরিচয় বিগত দুই যুগের। মার্কিন ডলারে এ দেশে বহু সরকারী সংস্থা পরিচালিত হয়েছে– বাঙালী মার্কিন গম আর ভিটামিনশূন্য মার্কিন চাউল খেয়ে বহুবার ধন্য হয়েছে – আবার আসছে সেই মার্কিন ডলার।

মার্কিন সরকার প্রথমে অনুন্নত দেশগুলিকে সাহায্য দিয়ে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করে নেয়। তারপর বিভিন্ন দিক দিয়ে সেই সাহায্যের লক্ষ গুণ উসুল করে নেয় – সে দেশের অর্থনীতিকে হাতের মুঠোতে নিয়ে চিরদিনের জন্যে মার্কিন সাহায্যের উপর নির্ভরশীল কাঁচামাল উৎপাদনকারী এবং মার্কিন ব্যবসায়ীদের প্রতিযোগিতাহীন বাজারে পরিণত করে রাখে। পৃথিবীর যে সমস্ত দেশ একবার মার্কিন ডলারের স্বাদ পেয়েছে তারা ধীরে ধীরে মার্কিনী অক্টোপাশের অষ্টবাহুর আলিঙ্গনে পড়ে নিঃস্ব, ভিখারীর দেশে পরিণত হয়েছে। মুক্তির আকাংখায় আজো তাই ভিয়েৎ নাম, কোরিয়া আর কম্বোডিয়ার মানুষ প্রতিদিন বুকের রক্ত দিয়ে ডলারের ঋণ পরিশোধ করে চলেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমানের রাশিয়া সফরের পর মার্কিন মহলের টনক নড়ে উঠে। একে তো মুক্তিযুদ্ধের সময় সাহায্য করার ফলে বাংলাদেশ সরকারের স্বাভাবিক কারণেই রাশিয়াপ্রীতি রয়েছে, আবার ভারত- বাংলা-রাশিয়ার মধ্যে একটা গাটছড়াও বাধা হয়ে গেছে তার উপর যদি প্রধানমন্ত্রীর রাশিয়া সফরের ফলে নতুন বন্ধুরা তার মনে খুব বেশী দাগ কেটে ফেলে।

কিন্তু না! বজ্র আটুনী ফস্কাগেরো। কিছু কৃতজ্ঞতাসূচক কথাবার্তা আর পারস্পরিক স্বার্থের আদান প্রদান- এর চেয়ে বেশী কিছু নয় রাশিয়ার সঙ্গে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো মার্কিন মহল। হাজার হোক এতোদিনের পরিচয় – না হয়, একটু ভুল বুঝাবুঝি হয়েছিল তবুতো পুরনো জানাশোনা।

শেখ সাহেব দু-একবার মুক্তিযুদ্ধের সময় মার্কিন ভূমিকার সমালোচনা করলেন বটে কিন্তু তার মুক্তির প্রশ্নে মার্কিন উপদেশ এবং ভূমিকার জন্যে স্বাভাবিক কারণেই তিনি কিছুটা দুর্বল ছিলেন। সুতরাং বাংলাদেশের প্রতি মার্কিন সরকারের স্বীকৃতির ঢের আগেই মুজিব সরকারের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে একটা গোপন সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমান কর্তৃক পিএল ৪৮০ তহবিল চালু করে দেওয়ার ব্যাপারেই তা প্রমাণ হয়ে যায়। অথচ এর মাত্র কিছুদিন আগে বাংলাদেশের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ এই বহুল বিতর্কিত পিএল ৪৮০ তহবিলটি ফ্রীজ করেছিলেন।

তিনি বলেছিলেন, মার্কিনদের কোন সাহায্য বাংলাদেশের দরকার নেই– আমরা কিছুতেই সে সাহায্য গ্রহণ করবো না। শেখ মুজিবর রহমানের সিদ্ধান্ত সেক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্যে আশির্বাদ হয়ে দেখা দিয়েছিল। ম্যাকনামারাকে বিমানবন্দরে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অভ্যর্থনা জ্ঞাপন, কিসিঞ্জারের গোপন সফর, প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বাঙলাদেশকে স্বীকৃত দেয়ার জন্যে আমেরিকাকে ১০ দিন সময় দান, দশ দিন গত হওয়ার আগেই তাড়াহুড়া করে মার্কিন সরকারের বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান এবং বর্তমানে বাংলাদেশ-মার্কিন সাহায্য চুক্তি স্বাক্ষর সবগুলো ঘটনাই একসূত্রে গাঁথা।

বাংলাদেশে আবার ডলার আসছে। কিন্তু সেই সঙ্গে খাল কেটে কুমীর আনার প্রবাদটি অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে। কারণ, পৃথিবীতে এমন একটি অনুন্নত দেশ নেই যেখানে ডলার গেছে অথচ মার্কিন ষড়যন্ত্রের হিংস্র নখরের আঁচড় লাগেনি। ইতিমধ্যে রাজধানী ঢাকা শহরে নামে- বেনামে বহু বাড়ী ভাড়া নেয়া হয়েছে এবং হচ্ছে। প্রথম শ্রেণীর হোটেলগুলিতেও মাঝে মাঝেই মার্কিনী মুখের আবির্ভাব ঘটছে। সুতরাং সবকিছু মিলিয়ে ঘটনার আলামৎ যা দেখা যাচ্ছে তাতে চিন্তাশীল দেশপ্রেমিক মাত্রেই আঁতকে উঠবেন সন্দেহ নেই। রুবল আর ভারতীয় মুদ্রার নতুন লীলাভূমি বাংলাদেশে ডলারের আগমন এই দেশে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র আর হানাহানির জন্ম দেবে, তৈরী করবে শোষণের নতুন ক্ষেত্র। এই আশংকাকে সামনে রেখে প্রস্তুত থাকতে হবে ওয়ালস্ট্রিট আর পেন্টাগনের চাঁইদের প্রতিটি ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দেবার মানসিকতা নিয়ে।

বিদ্রোহী কবি সকাশে বাংলার বিদ্রোহী কণ্ঠ

গত ২৩শে মে বাংলার বিদ্রোহী কণ্ঠ মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ঢাকায় বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের সাথে দেখা করেছেন। তিনি বিদ্রোহী কবিকে নদীমাতৃক বাংলাদেশে রাখবার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ জানিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, এখানে অবস্থান করা কবির ভগ্ন স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব উপকারী হবে।

কবির সাথে সাক্ষাৎকালে মওলানা কবির ভগ্ন স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্যে বিশেষ প্রার্থনা করেন। বিদ্রোহী কবিকে বাংলাদেশে আনার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করার জন্যে তিনি প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। কবিগৃহে অবস্থানকালে মওলানা ভাসানী কল্যাণী কাজীর ডায়েরীতে কবি পরিবারের সদস্যবর্গের জন্যে একটি আশির্বাণী লিখে দেন।

আওয়ামী লীগের সাংস্কৃতিক সম্পাদক জনাব মোস্তফা সরওয়ার এই উপলক্ষ্যে কবিগৃহে

উপস্থিত ছিলেন। মওলানার সাথে অন্যান্যদের মধ্যে জনাব রাশেদ খান মেনন, কাজী জাফর আহমেদ, জনাব হায়দার আকবর খান রনো, ক্যাপ্টেন ইসলাম এবং সাপ্তাহিক 'হক-কথা' সম্পাদক জনাব ইরফানুল বারীও কবিগৃহে যান।

ধর্মঘট : একটি গণতান্ত্রিক অধিকার

সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে রাষ্ট্রপ্রধান বিচারপতি জনাব আবু সাঈদ চৌধুরী সকল রাষ্ট্রীয় শিল্পে ৬ মাসের জন্যে সকল প্রকার শ্রমিক ধর্মঘট ও ঘেরাও বে-আইনী ঘোষণা করে এক আদেশ জারী করেছেন। এই আদেশে আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে কেউ এই বিধান অমান্য করলে তাকে জরিমানাসহ ৫ বছর কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে।

অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় ক্রমবর্দ্ধমান শ্রমিক অসন্তোষ রোধ এবং শিল্পে শান্তি প্রতিষ্ঠার অঙ্গ হিসেবে রাষ্ট্রপতি এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। এ কথা অনস্বীকার্য যে ৩০ লক্ষ শহীদের আত্মত্যাগ, অগণিত মা-বোনের ইজ্জত এবং সাত কোটি দেশবাসীর সহস্র দুঃখ কষ্ট লাঞ্ছনার বিনিময়ে অর্জিত বাংলাদেশের নবলব্ধ স্বাধীনতাকে রক্ষা, সুসংহত ও বিকশিত করার স্বার্থেই আজ গোটা বাঙালী জাতিকে ঐক্যবদ্ধভাবে দেশী-বিদেশী সকল ষড়যন্ত্রকে প্রতিহত করতে হবে। এর শর্ত হিসেবে শিল্পে শান্তি শুধু নয়, জন-জীবনের প্রতিটি স্তরে এই শান্তিকে সুনিশ্চিত করার প্রয়োজনেই শোষিত মানুষের আশা-আকাঙ্খার যথাযথ মূল্যায়নের প্রয়োজন রয়েছে এবং সরকার ঘোষিত ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণাকে বক্তৃতা মঞ্চ থেকে গণজীবনের বাস্তব পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করার আন্তরিক প্রচেষ্টা গ্রহণও একান্ত প্রয়োজন।

সর্বহারা মানুষের কল্যাণের প্রতি বাংলাদেশ সরকারের ঐকান্তিক আগ্রহের ঘোষণা এবং গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের আহ্বান বার বার উচ্চারিত হলেও রাষ্ট্রপতির শ্রমিক ধর্মঘট বেআইনী ঘোষণার অগণতান্ত্রিক আদেশজারীকে সমগ্র জাতি ব্যথাহত চিত্তেই লক্ষ্য করেছে। সরকার শ্রমিক ধর্মঘটকে বেআইনী ঘোষণা করে দেশে নির্ভেজাল গণতন্ত্র ও খাঁটি সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রকৃষ্ট উদাহরণই স্থাপন করলেন বটে। তথাকথিত পাকিস্তান আমলের শোষক ও শাসকদের মত সেই একই পুরানো কায়দায় অগণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করে ধর্মঘট করার নিম্নতম আন্তর্জাতিক অধিকার কেড়ে নিয়ে আর যাই হোক শ্রমিক অসন্তোষ বৃদ্ধি রোধ অথবা শিল্পে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। ক্ষুধিত মানুষের অসন্তোষের মূল কারণ দূর না করে, তাদের বক্তব্য বলার অধিকার হরণ করে শুধুমাত্র জেল-জুলুম আর আইনের রক্তচক্ষু দেখিয়ে তাদের চেতনাকে ভোতা করা যায়না, সোচ্চার কণ্ঠস্বরকে স্তব্ধ করা যায় না – ফরাসী বিপ্লব, রাশিয়া, চীনসহ প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশের ইতিহাসও তাই বলে। সরকার যদি সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণীর উপর ইচ্ছামাফিক আইনের শাসন চাপাতে থাকেন তাহলে ক্রমবর্দ্ধমান শ্রমিক অসন্তোষ বৃদ্ধি পেয়ে শিল্পে অশান্তিরই সৃষ্টি করবে যাতে শুধু জাতীয় উৎপাদন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থই হবে না বরং জাতীয় শিল্প বিকাশের পথও রুদ্ধ হতে বাধ্য। ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে সরকারের উচিৎ ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করে দেখা যে জেল-জুলুম আর অত্যাচারের আশ্রয় নিয়ে দমননীতি প্রয়োগ করে গণতান্ত্রিক অধিকারকে পদদলিত করে সাময়িকভাবে জনতাকে শায়েস্তা করা গেলেও মূল সমস্যার কোন সমাধান হয় না বরং সমস্যা-সংকটই তাতে বৃদ্ধি পায়। সরকার একদিকে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বলে পরক্ষণেই

অগণতান্ত্রিকভাবে শ্রমিক ধর্মঘটকে বেআইনী ঘোষণা করে দেশে গণতান্ত্রিক চেতনা বিকাশের সকল সম্ভাবনার পথ রুদ্ধ করে দেয়ার যে সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেছেন তাতে করে স্বাধীন বাংলার যেকোন সচেতন গণতন্ত্রমনা নাগরিকমাত্রই আতংকগ্রস্থহয়ে পড়েছেন।

ইতিমধ্যে শ্রমিকদের মধ্যে বিভেদ ও কোন্দল সৃষ্টির জন্যে শ্রমিকদের একাংশ নিয়ে বিভিন্ন বাহিনী সৃষ্টি, শিল্পাঞ্চলে এলএমজি-র ব্রাশফায়ার চালিয়ে নিরীহ শ্রমিকদের হত্যা করে ভয় সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম, নকশালপন্থী এবং দেশদ্রোহী বলে দেশপ্রেমিকদের উপরে হামলা চালিয়ে যারা সামাজিক শান্তি কেড়ে নিচ্ছে সরকার তাদের দমনের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ না করে ধর্মঘট বেআইনী ঘোষণার মাধ্যমে শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী পথ কেন বেছে নিলেন দেশবাসী তা ভেবে পাচ্ছে না।

ন্যাপ প্রধান মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ও ন্যাপের কেন্দ্রীয় সংগঠক শ্রমিকনেতা কাজী জাফর আহমদ ও সিরাজুল হোসেন খানসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক ও শ্রমিক নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশ সরকারের শ্রমিক ধর্মঘট বেআইনী ঘোষণার তীব্র নিন্দা করেছেন। ন্যায়সংগত কারণেই নেতৃবৃন্দের এই বক্তব্যের সঙ্গে দেশবাসী আজ একমত। নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে মওলানা ভাসানী উল্লেখ করেছেন যে স্বাধীনতা পূর্বকালে যে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ অন্যান্য দলের সঙ্গে গণমানুষের দাবী আদায়ের সংগ্রামে শরীক হয়েছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় আজ তারাই কিভাবে শ্রমিক স্বার্থহানীকর আইন জারী করতে পারলো! মাত্র এক বছরের ব্যবধানে ক্ষমতাসীন হয়ে তবে কি আওয়ামী নেতৃবৃন্দ একের পর এক তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে যাবে?

মাত্র কিছুদিন আগে শ্রমিক প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে ম্যানেজমেন্ট বোর্ড গঠন, শ্রমিক ধর্মঘটের অধিকার স্বীকার এবং সাচ্চা বার্গেইনিং এজেন্টদের নিয়ে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে অসন্তোষ রোধ, প্রশাসকদের দুর্নীতি বন্ধ এবং লুটপাট সমিতির জঘন্য কার্যকলাপ দমনের ঘোষণায় দেশবাসী যখন স্বাভাবিকভাবেই স্বস্তিবোধ করছিল ঠিক সেই মুহূর্তেই আকস্মিক বজ্রপাতের মতো রাষ্ট্রপতির ঘোষণায় সবাই মর্মাহত হবে এটাই স্বাভাবিক। সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও বৃহৎ আমলা পুঁজির শোষণকে চিরতরে নির্মুল করে জাতীয় শিল্পের বিকাশ সাধন, শ্রমিক অসন্তোষ বন্ধকল্পে শ্রমিকদের ন্যায্য দাবী-দাওয়া পূরণের মাধ্যমে তাদের অসন্তোষ দূরকরণ এবং সর্বোপরি যুদ্ধ বিধ্বস্ত এই বাংলাকে ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক এবং প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক বাংলায় পরিণত করার মাধ্যমে শোষিত বাঙালী জাতির অর্থনৈতিক মুক্তিকে সুনিশ্চিত করার স্বার্থেই রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পকারখানার শ্রমিকদের ধর্মঘট এবং ঘেরাও আন্দোলনের ন্যায্য আন্তর্জাতিক অধিকারের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া উচিৎ।

এমসিএ-দের কাণ্ড

।। ১ ।।

কুষ্টিয়া জেলার জনৈক এম-সি-এ সম্প্রতি অপূর্ব রবীন্দ্রানুরাগিতার পরিচয় দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী যখন ঘোষণা করেছেন যে বিশ্ব কবির স্মৃতি-বিজড়িত শিলাইদহকে দ্বিতীয় শান্তিনিকেতনে পরিণত করা হবে, এই এম-সি-এ সাহেব তখনই ভারতে হিজরত সমাপ্ত করে এসে শিলাইদহের কুঠিবাড়ী থেকে কবির স্মৃতি-বিজড়িত গাছ কেটে নিজের বাড়ী ঘরে দরজা-জানালা বানাতে লেগে গেছেন। পত্রিকান্তরে প্রকাশিত খবরে জানা গেছে যে তিনি তার নবনির্মিত বাড়ীটিতে রাবীন্দ্রিক আবহাওয়া সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই কীর্তিটি করেছেন।

।। ২ ।।

ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার প্রসিদ্ধ এমসিএ সাহেব অবশ্য কোনো গাছ কাটেননি, কিন্তু ইনিও তাঁর বাড়ী তৈরীর কাজে উঠেপড়ে লেগে গেছেন। সামনের দিকটি বাকী রেখে তিনি সম্প্রতি ভেতরে সুরম্য অট্টালিকার কাজ সমাপ্ত করেছেন। সি এ্যান্ড বি রোডের মাটিগুলো এখন ট্রাক বোঝাই হয়ে এসে তাঁর পুকুরটি ভরাট করছে। এই এম.সি.এ সাহেবই কিছুদিন আগে তাঁর হাতের ছড়িটি দিয়ে একজন নিরীহ রেলওয়ে কর্মচারীকে প্রহার করার অপরাধে ক্রুদ্ধ জনতার ঘেরাওয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু জনতার উত্তম-মধ্যম তার কপালে জোটেনি– কেননা, তিনি একজন এম.সি.এ।

।। ৩ ।।

মঠবাড়ীয়ার 'সরদার' কে হবে এই প্রশ্নে সম্প্রতি দুজন এম.সি.এ-র দলের মধ্যে ভয়াবহ মারপিট সংঘটিত হয়ে গেছে। এদের মধ্যে একজন এম.সি.এ সাহেব আবার অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছেন : তিনি গরুর হাট থেকে নিয়মিত বেআইনী খাজনা আদায় করে প্রচুর অর্থ কামিয়ে নিচ্ছেন। এর প্রতিবাদ জানাতে গেলে তিনি কয়েকজন ছাত্রনেতাকে গ্রেফতার করিয়ে হাজতে প্রেরণ করেছেন।

।। ৪ ।।

এবারের ঘটনার নায়কও দু'জন এম-সি-এ। ঢাকার ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকার শত্রু সম্পত্তি একটি সুন্দর অট্টালিকা অনেক কষ্টে নিজের নামে মঞ্জুর করিয়ে তা পুলিশ সহযোগে দখল করতে গিয়ে জনৈক এম.সি.এ দেখলেন, তার আগেই কে একজন বাড়ীটি দখলে নিয়ে ফেলেছেন। এম.সি.এ সাহেবের গোস্বা আর ধরেনা : একি মগের মুল্লুক! কিন্তু আফসোস : প্রশ্নের জবাবে আগের দখলকারীও জানালেন যে তিনি নিজেও আরেক এম-সি-এ। অতএব, ঘটনা বেগতিক।

।। ৫ ।।

ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার জনৈক এম-সি-এ-র নিজস্ব দুটি গাড়ী থাকা সত্ত্বেও রেডক্রসের এ্যাম্বুলেন্সটিকে দু'মাস দখলে রেখেছিলেন। যত্রতত্র চালানোর ফলে এ্যাম্বুলেন্সটির বারো বেজে যাওয়ার পর সম্প্রতি তিনি সেটা রেডক্রসের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছেন। সমিতির সভাপতির অভিযোগে প্রকাশ, এ্যাম্বুলেন্সটিতে চারটি ষ্ট্রেচার, দু'বাক্স প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জাম ছিল। সেগুলোর সাথে সাথে তার স্পেয়ার যন্ত্রপাতিও লাপাত্তা হয়ে গেছে। এ্যাম্বুলেন্স ব্যবহারের সময় এম- সি-এ সাহেব নিজেকে রেডক্রসের একজন পেট্রন হিসেবে জাহির করেছেন।

ফ্যাসীবাদের আলামত

গত ১৪ই মে ভোর রাত্রে তিন শতাধিক বাংলাদেশ রিজার্ভ পুলিশবাহিনী আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে কালিগঞ্জ থানার পূর্ব দিকে কামরাই দুধরাজপুর, গোপালপুর, কাতিলপুর প্রভৃতি এলাকা থেকে একজন মহিলাসহ চব্বিশ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে এবং থানায় নিয়ে যাওয়ার পর তাদের এতো বেশী প্রহার করা হয় যে কয়েকজন অজ্ঞান হয়ে যায়। পুলিশ সূত্রে তাদেরকে পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টির (মার্কসবাদী- লেনিনবাদী) লোক বলে অভিযুক্ত করা হয়। প্রকৃতপক্ষে এদের অনেকে ভাসানী ন্যাপের সমর্থক বলে আওয়ামী সমর্থক গোয়েন্দা কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী এদের গ্রেপ্তার করা হয় এবং দুষ্কৃতিকারী, নক্সাল বলে আখ্যায়িত করে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা সাধন করা হয়।

অথ ঃ তৈল সমাচার

কেরোসিন তেলের অভাবে যখন নারায়ণগঞ্জ মহকুমার ফতুল্লা থানার বাসিন্দারা অন্ধকারে

রাত কাটাতে বাধ্য হচ্ছে ঠিক তখনই বিএলও এবং ডিপিএন-এর তৈলাগার থেকে তাদের জন্যে নির্ধারিত কেরোসিন তেল রাতের অন্ধকারে সরিয়ে নেয়া হচ্ছে কালোবাজারে বিক্রী করার জন্যে। আর যারা এই কালোবাজারীর কালো খেলার খেলোয়াড় তারা সবাই দিনের আলোতে এক একজন উঁচু দরের দেশপ্রেমিক, দুর্নীতির বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী ভাষার বক্তা আর রাজনৈতিক দলের স্বনামধন্য নেতা।

সম্প্রতি কোন এক রাতে ফতুল্লা থানার অধিবাসীরা অবাক বিস্ময়ে দেখলো শীতলক্ষ্যার বুকে পচিশ ড্রাম কেরোসিন তেল সহ একটি কাঠের নৌকায় আগুন ধরে জ্বলছে। রাতের অন্ধকারের আড়ালে তেল সরাবার সময় এই দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। পরদিন পোড়া ড্রামগুলি পাওয়া গেল নদীর তীরে।

উন্মত্ত জনতা পরদিন বিএলও অফিস ঘেরাও করলে ভীত কর্মকর্তারা তৈল সরবরাহকারী হিসেবে যে পাঁচজনের নাম এবং তাদের তেলের পরিমাণের কথা জানিয়েছে, তারা হলেনঃ ফতুল্লা থানা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক লেহাজুর রহমান (২৫ ব্যারেল), থানা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি জালাল উদ্দিন (২৫ ব্যারেল), বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা ইমান আলী (৪০ ব্যারেল) থানা ছাত্রলীগ সভাপতি শরিফুল ইসলাম (২০ ব্যারেল) এবং আওয়ামী লীগ ও পঞ্চায়েত সদস্য আবু মিয়া (১০ ব্যারেল)। কিন্তু ফতুল্লাবাসীরা জানিয়েছে যে এদের কারো কাছ থেকেই তারা সামান্যও কেরোসিন তেল পায়নি। পুড়ে যাওয়া পচিশ ড্রাম তেলের মালিক এদের মধ্যে কে, তা অবশ্য এখনো জানা যায়নি।

এদিকে কিছু দিন আগে থানা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি জলিল উদ্দিন তার ছেলের পারমিটে ২৫ ড্রাম কেরোসিন তেল উঠিয়ে সাথে সাথে তা কালোবাজারে বিক্রী করে ধরা পড়ে যান। ঘটনার বিচারের ভার পড়েছিল আওয়ামী লীগ সম্পাদক লেহাজুর রহমানের উপর, যিনি তার আওয়ামী বন্ধুটির কাছ থেকে মাত্র ২০০ টাকা ঘুষ খেয়ে ব্যাপারটির সুরাহা করেছিলেন। ঘটনা ফাঁস হয়ে গেলে আওয়ামী লীগের এই নেতাটিও জনতার হাতে ধরা পড়ে যান। পরে দুই হাত জোড় করে তাকে জনতার আদলতে ক্ষমা ভিক্ষা করতে হয়েছে।

হক-কথা

১৯শে জৈষ্ঠ, শুক্রবার

বামপন্থী নিধন মহাপরিকল্পনা

বাংলাদেশ আজ আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। সম্প্রতি এই নব স্বাধীনতালব্ধ দেশের দেশপ্রেমিক বামপন্থীদের হত্যা করার একটি মহাপরিকল্পনা অনুযায়ী কতিপয় বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থা কাজ করে যাচ্ছে। বামপন্থীদের সমূলে উৎখাতের এই প্রচেষ্টা নতুন কিছু নয়। তথাকথিত পাকিস্তানী আমলেও এধরনের পরিকল্পনা বিভিন্ন সময়ে গ্রহণ করা হয়েছিল। তৎকালীন শাসক গোষ্ঠীর মতো বাংলাদেশের বর্তমান শাসক গোষ্ঠীরও বামপন্থীদের সম্পর্কে একটি বিশেষ শত্রুতামূলক ও সন্দেহপ্রবণ মনোভাব রয়েছে। আর এই মনোভাবের পিছনে ইন্ধন জুগিয়ে যাচ্ছে কতিপয় বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থা। সঠিকভাবে এর কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এর মূলে রয়েছে বাংলাদেশের ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক অবস্থান। স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হওয়ার কিছুদিন আগে মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী কুখ্যাত মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সি আই-এর একটি ষড়যন্ত্রের গোপন দলিল

সম্পর্কে ইঙ্গিত দেন। আর স্বাধীনতার পর সোভিয়েতের গোয়েন্দা প্রতিষ্ঠান কেজিবি এবং ভারতের কংগ্রেসী হায়েনাদের নরহত্যা উৎসবের প্রধান জল্লাদবাহিনী র‍্যথলেস র‍্যাডের নতুন পরিকল্পনা সি.আই.এর নির্দেশিত পথেই অগ্রসর হচ্ছে। এই ত্রয়ী-মৈত্রীর লক্ষ্যও হচ্ছে এ দেশের মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের শিকার হতে অনিচ্ছুক, ভারতীয় শাসক ও বণিক গোষ্ঠীর শোষণ বিরোধী, নিজ মাতৃভূমিতে লুটপাট সমিতি এবং ফ্যাসিস্ট বাহিনীর বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টির প্রচেষ্টারত প্রগতিশীল বামপন্থী কর্মী ও নেতৃবৃন্দ।

বিশ্বের রাজনীতিতে নয়া চিন্তাধারার বিকাশ ঘটেছে। সংগ্রাম চলছে দেশীয় শোষক, সাম্রাজ্যবাদ আর সংশোধনবাদী চক্রের হাত থেকে মুক্তি পাবার আশায়, সংগ্রাম চলছে অবাধ চোরাচালান আর দ্রব্যমূল্যের উর্ধগতির বিরুদ্ধে পারমিট লাইসেন্স শিকারিদের হাত থেকে শোষিত, লাঞ্ছিত মজলুম মানুষের মুক্তির সপক্ষে। জনতার এই সংগ্রামী কাফেলাকে বিভ্রান্ত করে, ভয় দেখিয়ে, গুপ্ত হত্যা চালিয়ে এই দেশে দেশী-বিদেশী শোষক চক্রের আসনকে পাকাপোক্ত করার পরিকল্পনারই একটা ধাপ হচ্ছে আজকের এই হত্যাযজ্ঞ পরিচালনার অভিযান। এই একটি জায়গায় উল্লেখিত শক্তিগুলোর মহাপরিকল্পনার আশ্চর্য মিল, অদ্ভুত সমন্বয় ঘটেছে।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর দেশের প্রতিটি মানুষ, প্রতিষ্ঠান এবং রাজনৈতিক দলগুলোই নির্ভয়ে তাদের বক্তব্য বলতে পারবে, গণতান্ত্রিক অধিকারের বলেই বিরোধীদলগুলো তাদের কার্যক্রম চালাতে পারবে এটা আশা করা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। স্বাধীনতা পূর্বকালে পাঞ্জাবি শাসকগোষ্ঠী যেমন সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলাকে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বলে আখ্যায়িত করতো, বিরোধী দলীয় কর্মী ও নেতাদের ভারতীয় চর, কমিউনিস্ট বলে চিহ্নিত করত এবং ষড়যন্ত্র থেকে বর্তমান শাসক গোষ্ঠীও রেহাই পায়নি, আজ ৩০ লক্ষ মানুষের রক্তে অর্জিত স্বাধীনতার পর বর্তমান সরকারের কাঁধেও যেন সেই পাকিস্তানী ভূত ভর করে আছে। তাই তো অবাধ চোরাচালান, সরকারী দলের পাণ্ডাদের লুটপাট, দ্রব্যমূল্যের উর্ধগতি আর সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশার কথা বললে দেশ-প্রেমের একক দাবীদার মহলটি এর মধ্যে রাষ্ট্র বিরোধী চক্রান্ত আর ষড়যন্ত্রের গন্ধ পান। তাই তো স্বাধীনতার প্রথম প্রবক্তা সর্বজন শ্রদ্ধেয় বৃদ্ধ জননেতা আজীবন স্বাধীনতা কামী মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীকে রাজাকার আর বদর-বাহিনীর দোসর হিসাবে প্রচার করার ঘৃণ্য চক্রান্তের খেলা চলে। স্বাধীনতা উত্তরকালে এই নির্ভিক স্পষ্টভাষী বর্ষিয়ান নেতার ক্রমবর্দ্ধমান জনপ্রিয়তা দেখে ক্ষিপ্ত প্রায় এককালের জনদরদী এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠ এবং বর্তমানে অজস্র টাকা, বাড়ী, গাড়ী আর লাইসেন্স পারমিটের মালিক নেতৃবর্গ আর তাদের জ্বী হুজুরের দল একের পর এক মিথ্যা, ভিত্তিহীন কুৎসার জাল রচনা করে চলেছে এবং অবশেষে ব্যাপক গণহত্যার কর্মসূচী গ্রহণ করে উস্কানীমূলক কাজের মাধ্যমে নরসিংদী, টঙ্গী, খুলনা, পাবনাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নিরীহ কৃষক- শ্রমিকের উপর আগ্নেয়াস্ত্রসহ আক্রমণ, সভা-সমিতি পন্ড এবং নেতৃবৃন্দের উপর প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রয়োগ, সর্বোপরি দিল্লী, মস্কো, ওয়াশিংটনের বন্ধুদের সহযোগিতায় প্রগতিশীল কর্মীদের সম্পর্কে ভুল ধারণার সৃষ্টি করে বাংলাদেশে নতুন ইন্দোনেশিয়ার সৃষ্টি করা- এই'ই হচ্ছে তাদের আশু লক্ষ্য।

সমাজতন্ত্রের নামাবলী গায়ে দিয়ে যখন দেশের বুভুক্ষু, ক্ষুধিত মানুষের প্রশ্ন এড়ানো সম্ভব হয় না নিজেদের কৃতকার্যের ফলভোগ করার আতঙ্কে বিকারগ্রস্থ হয়ে এই খুনী আর

লুটেরাদের চোখে তখন জ্বলে উঠছে চক্রান্তের আগুন, রক্তের তৃষা আর হত্যার নীল স্বপ্ন।

কালোবাজারী আর দেশের সম্পদ বাইরে পাচার বন্ধ করা আর দুঃখী মানুষের সপক্ষে কথা বললে যদি কোন বিশেষ বাদ বা বাহিনীর টারগেটভুক্ত হতে হয় তাহলে আমাদের বলার কিছু নেই। সোয়া লক্ষ বামপন্থী হত্যার পরিকল্পনা এক্ষেত্রে অপ্রতুল। কেননা, দেশের সাত কোটি মানুষের অন্তরের দাবীও আজ তাই – সুতরাং এদের সবার সম্পর্কেই তাহলে পরিকল্পনা তৈরী করতে হয়। আমরা জানি ইতিহাস তার পথ নিজেই সৃষ্টি করে ... একটি রক্ত বিন্দু থেকে জন্ম নেয় সহস্র রক্তকণা। সুতরাং ইতিহাসের চাকা উল্টো ঘুরানোর চেষ্টা যে ব্যর্থ হতে বাধ্য পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠী বাংলাদেশের মরণপণ মুক্তিযুদ্ধের তিক্ত অভিজ্ঞতায় তা যেমন বুঝে নিতে বাধ্য হয়েছে। কেউ যদি সেই পথে অগ্রসর হয় তাদের অভিজ্ঞতাও যে অনুরূপ হতে বাধ্য তাদের সম্পর্কে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কোরিয়া, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, কিউবা আর লাতিন আমেরিকার ঘটনাপ্রবাহ থেকে প্রত্যেকেরই শিক্ষা গ্রহণ করা উচিৎ। মানুষের দুঃখ-দুর্দশার সমাধান না করে রাজনৈতিক হত্যার আশ্রয় নিয়ে কোনদিন নিজেদের বাঁচান যায় না। যুগের দাবী আর লাঞ্ছিত মানুষের অভ্যুদয় ভোরের সূর্যোদয়ের মতই অনিবার্য।

পরিশেষে রুথলেস র‍্যাড আর তার আন্তর্জাতিক দোসরদের টারগেটকৃত কর্মী এবং নেতৃবর্গের প্রতি আবেদন, দেশবাসী আজ আর তত্ত্বের লড়াই- এর নামে নেতৃত্বের বিভেদ চায় না, তারা চায় কর্মের ঐক্য। অন্ততঃ জনসাধারণের এই নিদারুণ দুঃসময়ে, প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী, রাজনৈতিক কর্মী আর দেশবাসীর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের নীল নকশা তৈরীর যুগে চিন্তা আর কর্মের ঐক্য, উপদলীয় বিভেদের অবসান আর দেশপ্রেমের জ্বলন্ত শপথ নিয়ে এগিয়ে আসুন - বিপন্ন মানবতার আর বিশ্ব বিবেকের কণ্ঠস্বর আপনাদের সপক্ষে– ভবিষ্যত আপনাদেরই।

রাশিয়ায় নিক্সন ঃ ভিয়েতনামে বোমা

॥ আওরঙ্গজেব চৌধুরী ॥

রোম যখন পুড়ছিল, নীরো তখন বাঁশি বাজাচ্ছিলেন। নীরো অবশ্য আন্তরিকভাবেই সংগীতপ্রেমিক ছিলেন। এবং বর্তমানকালের কলাকৈবল্যবাদী বা শিল্পসর্বস্ববাদের পরিপোষকদের কাণ্ডকারখানা দেখলে তাঁর সেই অপরাধ মোটামুটি সহনীয়ই ঠেকবে অনেকের কাছে। কিন্তু আশা করি কেউই ভালো চোখে দেখবেন না বরং বলা উচিত দেখেনি। সাম্প্রতিককালে অনুষ্ঠিত সমাজতন্ত্রের ধ্বজাধারী একটি টেক্কার সঙ্গে অপর একটি টেক্কার খোশ- আলাপের বহর দেখে, বিশেষ করে যে টেক্কাটির তৈরী বুলেট পৃথিবীর এমন কোন স্থান নেই যেখানে রক্ত খাওয়ার উদগ্র কামনায় ছুটে যায়নি। হ্যাঁ, রাশিয়ায় মার্কিন প্রেসিডেন্টের বৃন্দাবনলীলা সম্পর্কেই কথা বলছি; যখন ভিয়েতনাম পরিণত হয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় কশাইখানায়, উত্তর ভিয়েতনামের বন্দরগুলি অবরুদ্ধ, স্থলপথের যোগাযোগও বিচ্ছিন্ন, তখন মস্কো বিমানবন্দরে স্বাগত জানানো হল সেই রিচার্ড এম. নিক্সনকে, করমর্দন করা হল তার সাথে যথেষ্ট আন্তরিকতার সহিত, পোদগর্ণি- ব্রেজেনেভ-কসিগিন সেই হাতটিকেই ভরে দিলেন মৈত্রীর উষ্ণ আবেগে, যে হাত মাত্র কিছুক্ষণ আগে উত্তর ভিয়েতনামকে সবদিক থেকে খতম করার আদেশপত্রে স্বাক্ষর করেছে। আরো মজা আছে। কমিউনিস্টদের দেওয়া ভোজসভায় ভাষণদান শেষ করেই মহান আমেরিকার মহান প্রেসিডেন্ট (ভোজসভায় প্রদত্ত মানপত্রে নিশ্চয়ই এরকম সম্বোধন লেখা ছিল, অনুমান করি) ঢালাও আদেশজারী করলেন রক্তপিপাসু ওয়েস্ট মোরল্যাণ্ডের প্রতি– "এবার কমিউনিস্টদের শিল্পাঞ্চলগুলি খতম কর।" বস্তুত এরই নাম তবে 'দুনিয়ার মজদুর এক হও!' কি জানি মস্কোতে প্রস্তুত মার্কসীয় বিশ্লেষণে 'মহান আমেরিকার মহান প্রেসিডেন্ট' রিচার্ড এম, নিক্সন 'মজদুর' বলে পরিগণিত হয় কিনা!

মোটকথা, মস্কোতে এবার ভিয়েতনামের অগণিত নর-নারী শিশুর রক্ত উপেক্ষিত হলো। (হায়রে, খোদ মার্কিন মুল্লুকে যুদ্ধবিরোধী মিছিলগুলি যেসব শ্লোগানে সমস্যার সমাধান মস্কোতে নেই, আছে প্যারিতে।"

প্রেসিডেন্ট নিক্সন অবশ্য খুব হুঁশিয়ার ব্যক্তি। মস্কোর মনস্তত্ব সম্পর্কে ভালোভাবে খোঁজ খবর নিয়েই তিনি পা বাড়িয়েছেন – হিস্যার কারবারে হাত দিয়েছেন। মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগের জনৈক কর্মকর্তা মন্তব্য করেছেন– "ভিয়েতনাম সমস্যার সমাধানে আমরা রাশিয়ার সহযোগিতা আশা করছি।" একই ব্যক্তি আরো কিছুদিন আগে হাইফং– এ বোমা ফেলবার পর বলেছিলেন – "চীনের সাথে আমাদের সম্পর্ক অবনতির কারণ রূপে দেখা দিতে পারে এই যুদ্ধ।" এবং রাশিয়া

বাংলাদেশে রাশিয়ার তিনটি স্বার্থ

আকাশ-বাতাস মুখরিত করেছে তার এক শতাংশ পরিমাণ প্রতিবাদী ভাষাও যদি মস্কোবাসী কম্যুনিস্ট প্রধানগণ ব্যবহার করতেন!) অথচ যাত্রাপথে অস্ট্রিয়াতে লজ্জাজনক অভিজ্ঞতা ঘটেছে নিক্সনের, জাপানের কমিউনিস্ট পার্টি আগেই আবেদন জানিয়েছে রাশিয়ার কাছে – 'ভিয়েতনামের বর্তমান পরিস্থিতির কারণে নিক্সনের মস্কো সফর বাতিল করুন।' বলাবাহুল্য, রাশিয়া শেষ পর্যন্ত কারো কথায় কান দেয়নি, কারণ অর্থনৈতিক ও ব্যবসা-বাণিজ্য ঘটিত কিছু সুবিধা আদায় করার অথবা বাণিজ্যের নামে শোষণের ব্যাপারে বিশ্বব্যাপী বখরা আদায়ের এই-ই ছিল সুবর্ণ সুযোগ। বস্তুত ভিয়েতনামের সাম্প্রতিক মুক্তিযুদ্ধ মার্কিন-মহলে কম চাপ সৃষ্টি করেনি।

রাশিয়ার কাছে তাহলে অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের পথটাই অনেক বেশী আদরণীয় ও বরণীয় হয়ে উঠলো? আর ভিয়েতনামের স্বার্থ হল তুচ্ছ? এজন্যেই বোধহয় ক্ষোভের সঙ্গে মন্তব্য করেছেন প্যারি শান্তি আলোচনায় ভিয়েতকং প্রতিনিধি মাদাম চিন- "ভিয়েতনাম বাণিজ্যের হিস্যায় সমান হয়ে - খুশীতে বাগ্ বাগ্ হয়ে- বন্ধুরাষ্ট্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে মোটেই নিরাশ করেননি বলে এখন অনেকেই মনে করছেন, বলাই বাহুল্য তাতে ভিয়েতনাম পরিস্থিতি নিক্সনের অনুকূলেই যাবে। তাহলে ভিয়েতনাম থেকে যাকে অপাঙতেয় করে রাখা হয়েছিল সেই চীনই কি বর্তমান তেজঙ্কর মুক্তিযুদ্ধের মূলে কাজ করছে – তাদের তৈরী অস্ত্রশস্ত্রই কি আঘাত করছে দখলকৃত আনলক, হয়ে, কনট্রম-এর ভাড়াটে পিশাচদের ওপর?

রাশিয়া যে বাণিজ্যিক সাম্রাজ্যবাদের পথে পা বাড়িয়েছে এবং মূলতঃ তার সাথে যে মার্কিন সরকারের তেমন কোনো পার্থক্য নেই তা ভিয়েতনাম ছাড়াও প্রমাণিত হয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়, প্রমাণিত হয়েছে ভারত মহাসাগরে। এই সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা আমি গত দু'সংখ্যায় করেছি। এখানে আবার করলে তা পুনরুক্তি বলে দোষাবহ হবে। এইসব আলোচনায় আমি যা বোঝাতে চেষ্টা করেছি তা হলো বৃহৎ শক্তিগুলি শেষ পর্যন্ত স্ব-স্ব স্বার্থেই পরস্পরের বন্ধু হয়ে উঠেছে এবং

সম্মিলিত ও সুসংগঠিত উপায়ে পুরো বিশ্ব শাসন-শোষণ করতে বদ্ধপরিকর হয়েছে। ফলে এশিয়া-আফ্রিকা-লাতিন আমেরিকায় এতোগুলি পূর্ব-পরিকল্পিত যুদ্ধ চলছে। যুদ্ধ চলেছে এবং যুদ্ধ শেষে ক্ষতস্থানে দ্রুত প্রলেপ দেওয়া হচ্ছে। বাংলাদেশের ব্যাপারে মার্কিন ভূমিকা এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয়। স্মরণীয় মধ্যপ্রাচ্যের ব্যাপারে রাশিয়ার ভূমিকা। এবং কম্বোডিয়ার বিপ্লবী সরকারকে আজ পর্যন্ত রাশিয়া স্বীকৃতি দেয়নি। বরং মার্কিন শক্তির তাবেদার দলের (ক্ষমতাসীন) সাথে সখ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে চলছে। শুধু তাই নয় প্রিন্স নরোদম সিহানুককে 'চীনের দালাল' আখ্যা দিয়ে বেতারে, পত্রপত্রিকায় হরহামেশা বিষোদগার করে চলছে। কম্বোডিয়ার বাধাগ্রস্ত মুক্তিযুদ্ধের বাধা হিসেবে রাশিয়ার কম ভূমিকা নেই।

রাশিয়া বাংলাদেশের বন্ধুরাষ্ট্র হলেও পর্যালোচনা সাপেক্ষ। কেননা, সে বাংলাদেশের বর্তমান সরকারকে জনপ্রিয় সরকার মনে করে; এই সরকার বিগত মুক্তিযুদ্ধে চীনের নীরব ভূমিকাকে মানবতা বিরোধী বলে মনে করে (অবশ্য সরকারীভাবে এবং শেখ মুজিবুর রহমান ও চীনের বিরুদ্ধে এখন পর্যন্ত কিছু বলেননি; বরং চীনের স্বীকৃতির ব্যাপারে যা অত্যাসন্ন, তাদের বিশেষ ইচ্ছা রয়েছে বলে ইদানিং অনেকেই মনে করছেন– যেমন বিবিসি); রাশিয়া আরো মনে করে বাংলাদেশের বর্তমান সরকারের একটি মার্কিন-মুখী মনোভাব রয়েছে, এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দিকে তার কোনো ঝোঁক নেই, উপরন্তু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যাতে কোনো দেশ সমাজতন্ত্রী না হতে পারে সেজন্যে এই সদ্য স্বাধীনতালব্ধ দেশটি একটি ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে পশ্চিমাশক্তির। সুতরাং রাশিয়া বঙ্গোপসাগর পেয়ে নিশ্চয়ই তুষ্ট হচ্ছে না, সে ভেতরেও জাঁকিয়ে বসতে চাইছে। আমার তো মনে হয় না কে-জি-বি খুব নিষ্ক্রিয়। এদের ভেতরে ঢোকার একটাই পথ। যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশে সবচেয়ে জরুরী অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও সাহায্য। রাশিয়া ভেতরে ঢুকলে মোটামুটি তিনটি প্রধান ক্ষতি– ১. রাজনৈতিক ২. সামরিক ৩. শোষিত শ্রেণীর জাগরণের। অবশ্য জনগণই তা ভালো বুঝবেন। এই সঙ্গে কাকতালীয়ভাবে একটি বিশেষ সংবাদের প্রতি পাঠকসাধারণের দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে চাই– প্রেসিডেন্ট নিক্সন মস্কো থেকে যাচ্ছেন ইরানের রাজধানী তেহরানে। সেখানে বর্তমান মার্কিন রাষ্ট্রদূতের নাম জোসেফ ফারল্যান্ড এবং ইরান একটি ভারত মহাসাগরীয় উপকূলবর্তী দেশ।



মওলানা ভাসানীর রাজনীতি

সম্প্রতি সাপ্তাহিক 'দেশ বাংলা' পত্রিকায় মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক জীবনের উপর একটি পর্যালোচনামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। মওলানা সম্পর্কে পর্যালোচক মহোদয় কতগুলো বিভ্রান্তিকর তথ্য পরিবেশন করেছেন। বিস্তারিত সমালোচনায় না গিয়ে আমি শুধু ভাসানী– জীবনের কয়েকটি দিক তুলে ধরতে চাই।

দলমত নির্বিশেষে উপমহাদেশের সর্বস্তরের জনগণ জানেন যে, মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়েছিল। বৃটিশ ভারতের মেহনতি জনতা তথা সর্বহারা নির্যাতিত-নিপীড়িত জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির শপথ নিয়ে। তার জীবন ক্ষমতার মোহে আবৃত নয়, বরং ক্ষমতা বা হাততালি কুড়োনোর রাজনীতিকে তিনি আজীবন পদাঘাত করেছেন, নির্যাতিত মানুষকে অত্যাচারের বিরুদ্ধে দিয়েছেন চেতনা, শুনিয়েছেন বিদ্রোহের বাণী। তাঁর রাজনৈতিক জীবনে তাই দুটি ধারা স্পষ্ট লক্ষণীয় ঃ ন্যায়ের পক্ষ সমর্থন এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে নির্ভীক বিদ্রোহ।

উপরের বক্তব্যের বাস্তব প্রমাণ মিলবে তাঁর রাজনৈতিক সংগ্রামের ইতিহাস থেকে ঃ পাকিস্তানের ফেরেশতা জাতির পিতা জিন্নাহ সাহেবের বিরুদ্ধে মওলানাই প্রথম সোচ্চার হয়েছিলেন– প্রথম বিরোধী দল আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠা, যুক্তফ্রন্টের নেতৃত্ব দিয়ে পাকিস্তানের একমাত্র দাবীদার মুসলিম লীগের ভরাডুবি ঘটানো, আইউবের সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন এবং বিশেষ করে ৬৮-৬৯ সনের প্রচণ্ড গণবিস্ফোরণের নেতৃত্ব দিয়ে, নিজে মহা-মিছিলগুলোর সামনে থেকে আইউব-মোনেমের পতন ঘটানো, শেখ সাহেবের মুক্তি (যার ফলে তিনি আজ 'বঙ্গবন্ধু') প্রভৃতিই মওলানার একারই কৃতিত্ব– অন্য কারো নয়। আপোষের মধ্য দিয়ে নয়, শক্তি দিয়েই শক্তি প্রতিরোধের আহ্বান একমাত্র মওলানা ভাসানীই দিয়েছিলেন। তাই তিনি, ৬৮- ৬৯ এর গণবিস্ফোরণের ফলে মুক্ত শেখ সাহেবকে নিষেধ করেছিলেন আইউবের সাথে গোল-টেবিলে বসতে, নিষেধ করেছিলেন মার্চ মাসে ইয়াহিয়ার সাথে আপোষ-আলোচনায় বসতে। কিন্তু শেখ সাহেবের চোখে ছিল ক্ষমতার লালসা। উভয়ক্ষেত্রেই মওলানার সাবধানবাণীই কাজ করেছিল ঃ আপোষ আলোচনার বিনিময়ে এসেছিল ইয়াহিয়ার সামরিক আইন, এসেছিল বাংলার মানুষের উপর প্রচণ্ড ধ্বংসের লীলা। এইসব পরিণতির জন্যে নিশ্চয়ই মওলানা ভাসানী দায়ী নন।

পর্যালোচনার এক পর্যায়ে চীনের ভূমিকার সাথে মওলানা ভাসানীকে জড়িত করার প্রয়াস দেখা গেছে। এই প্রসঙ্গে শুধু একটি কথাই যথেষ্ট যে, চীনের বিরোধিতা সত্ত্বেও মওলানা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিয়েছেন। আর মওলানার আজীবন রাজনীতির মূল কথাই সমাজতন্ত্র– আজকের দিনে বহুল প্রচারিত রঙিন সমাজতন্ত্র নয়। এদেশের বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মওলানা ভাসানীর ভূমিকার কথাও স্মরণীয় ঃ চোরাচালান, ঘুষ, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি – প্রভৃতির বিরুদ্ধে অন্য কেউ নয়, মওলানা ভাসানীই প্রথম সোচ্চার হয়ে উঠেছেন। বিভিন্ন জনসমাবেশে তিনিই আবার সংগ্রামের ডাক দিয়ে চলেছেন। বিভিন্ন ষড়যন্ত্রকারীদের ষড়যন্ত্র অতীতে বারবার মওলানাকে অপবাদ দিতে পারলেও, আর কোনদিন তারা সফল হবে না। কেননা, জনতা তাদের প্রকৃত বন্ধুকে চিনে নিয়েছেন। আগামীদিন তাই এদেশের জনতার- যার কাফেলার সামনে থাকতে পারবেন মাত্র একজন নেতাই – মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী।

জহিরুল কাদের
রায়ের বাজার, ঢাকা।

কংগ্রেসী গণতন্ত্র

পশ্চিমবাংলার লালবাগে বিগত ১লা মে দিবস উপলক্ষে বামফ্রন্টের উদ্যোগে একটি মিছিল বের করা হলে থানার সম্মুখের রাস্তায় ছাত্র পরিষদ ও যুব কংগ্রেসের কর্মীরা মিছিলটির গতিরোধ করে এবং মিছিলের লোকজনকে হুমকি দিতে থাকে। গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রশ্ন উঠালে কংগ্রেসী পাণ্ডারা উত্তর দেয় যে, এখন তাদের রাজত্ব। সুতরাং পাঁচ বছরের ভিতরে বিরোধী দলকে কোন মিছিল করতে বা শ্লোগান দিতে দেয়া হবে না। পুলিশের নাকের ডগায় এই ঘটনা ঘটলেও তাদের নীরব ভূমিকা এবং কংগ্রেস কর্মীদের ফ্যাসিবাদী ভূমিকার বিরুদ্ধে সমগ্র লালবাগে জনতার মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়।

আপনার চিঠি

আটক বাঙালীদের ফিরিয়ে আনুন

জনাব সম্পাদক সাহেব,

দীর্ঘ ছয় মাস হয়ে গেল বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু আজো পাকিস্তানে আটক পাঁচ লক্ষ বাঙালী দেশে ফিরে আসতে পারেনি। এই হতভাগাদের মধ্যে আমার ছেলে লেঃ শাহ খালেদ রেজা এখনো পাক-আফগান সীমান্তের একটি দুর্গে বন্দী অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে।

একদিকে আটক বাঙালীদের দেশের মাটিতে ফিরিয়ে আনার দাবীতে সারাদেশে অসংখ্য সভা-শোভাযাত্রা হচ্ছে আর অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ শুধু বারবার তাদের ফিরিয়ে আনার আশ্বাসই দিয়ে যাচ্ছেন– কিন্তু, কোনো বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন না। ফলে আজো আমি এবং আমার মতো আরো অগণিত মা-বোনেরা স্বাধীনতার স্বাদ- ভোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে আছি। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় আটক বাঙালীদের বিশেষ করে সামরিক অফিসার ও জোয়ানদের উপর নির্যাতনের যেসব করুণ কাহিনী প্রতিদিন পড়ছি, তার ফলে আমাদের জীবন আরও বেশী দুর্বিসহ হয়ে পড়ছে।

আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং পাকিস্তানী কারাগারে বন্দীজীবন কাটিয়েছেন। তিনি বন্দীত্বের দুঃসহ যন্ত্রণার কথা আমার চেয়েও ভালো বোঝেন। প্রধানমন্ত্রীর বন্দীদশায় তাঁর মা-র মানসিক অবস্থার কথাও তিনি নিশ্চয়ই শুনেছেন। তাঁর প্রতি তাই আমার আকুল ফরিয়াদ ঃ অনুগ্রহ করে নিরীহ পাঁচ লক্ষ বাঙালীকে কোনো রাজনীতির শিকারে পরিণত না করে তাদের অবিলম্বে মাতৃভূমিতে ফিরিয়ে এনে আমাদের দীর্ঘঃশ্বাস বন্ধের ব্যবস্থা করুন।

নিবেদিকা
অসহায় মা- বোনদের পক্ষে
বেগম রোকেয়া আজহার , টাঙ্গাইল।

উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে

জনাব সম্পাদক সাহেব,

আমরা শ্রীপুর থানার গরীব কৃষকবৃন্দ কিছুদিন আগে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের স্থানীয় শাখার তদন্তকারী অফিসার জনাব মোহাম্মদ আলীর বিরুদ্ধে ঋণ দেয়ার সময় ঘুষ খাওয়ার অভিযোগে তাকে বদলী করার দাবী জানিয়ে ব্যাংক প্রশাসকের কাছে আবেদন করেছি। কিন্তু অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে জানতে পারলাম যে মোহাম্মদ আলী নামের অন্য একজন নিরীহ কর্মচারীকে বদলী করা হয়েছে। ব্যাংক প্রশাসকের এই প্রতারণার প্রতি আমরা মাননীয় অর্থমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে এর প্রতিকার দাবী করছি।

নিবেদক –

১. আবদুল জব্বার, বরিদারচল।
২. আক্কাস আলী, গাজীপুর।
৩. সফিউদ্দিন, গাজীপুর।
৪. এলাহী বেপারী, গলিদাপাড়া।
৫. ওয়াজ আলী, গলিদাপাড়া।
৬. সাহজ উদ্দিন, গলিদাপাড়া।

লালচানের ছড়া

॥ ১ ॥
পঁচিশ বছর
দুয়ার খোলা
পাচার করো
মূল্য বাড়ুক
বন্ধু আছে
ধৈর্য ধরো।
তিনটি বছর
উপোস করো
গড়ার কাজে
সাম্য আসুক
দ্রব্য দামে
দু'দেশ মাঝে
দেখবে তখন
বন্ধ হবে
পাচার করা
কমতি মানুষ
গড়ায় পথে
হাজার মরা!

॥ ২ ॥
স্বাধীনতা আইছে হুনি
খুঁইজ্যা কোথা পাই?
কোন বাড়ীতে আইলো সে
কোথায় নিলো ঠাঁই?
একটুখানি দুধের লাগি
মাইয়া আমার মরে
স্বাধীনতা বান্‌ধা দ্যাহ
ধনীর দালান ঘরে।

॥ ৩ ॥
বাড়লো বেতন কুড়ি
উড়ছে স্বাধীন ঘুড়ি
সমাজবাদের লাটাই বেধে
বাড়ান্ নিজের ভুড়ি।
তিন টাকা সের চাল
রঙিন নাওয়ে পাল
চক্ষু–বাধা নেতার হাতে
অগ্রগতির হাল
কাঁপন হুজুর গলা
ব্যবসায়ীদের শলা
আদর করে খাইয়ে দিলো
একখানা কাঁচকলা।

ভাসানীর বাণী

রাতের বেলায় ঘুস খেয়ে আর বিকেলে পল্টন ময়দানে বক্তৃতা দিয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায় না। বাংলার ক্ষুধার্ত মানুষ যদি আবার বিদ্রোহ করে, তাহলে সারাদেশে বিপ্লবের আগুন ছড়িয়ে পড়বে। কোনো রাজনৈতিক দল বা নেতার জ্বালাময়ী বক্তৃতাই তা থামাতে পারবে না।

আমি প্রাণ দিয়ে হলেও স্বাধীনতা রক্ষা করবো, কিন্তু শোষকদের স্বাধীনতা এবং সমাজতন্ত্রের নামে ধোঁকাবাজী বরদাশত করবো না।

মুরিদের দরবার

মনের আনন্দ

॥ মোহাম্মদ হোসেন ॥

মানব অন্তরের সুপ্ত সুকুমার বৃত্তিগুলি যখন পরিপূর্ণ রূপে জাগিয়া মানুষের ব্যাপ্তিকে চারিদিকে সূর্যের কিরণের মত বিকশিত করিয়া দেয় তখনই মানব জীবনের সত্যিকার বিকাশ ও আত্মিক সমৃদ্ধির উন্মেষ ঘটে। শুধু উপলব্ধি নহে, তৎসঙ্গে জীবনের সামগ্রিক সমৃদ্ধিও আমাদের কাম্য। আর তাহার জন্য চাই–অনুকুল পরিবেশ ও মনের অনাবিল আনন্দ।

জীবনের সার্বিক বিকাশের জন্য আনন্দের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য্য। আনন্দহীন জীবন বিতৃষ্ণ হইয়া উঠে। বিতৃষ্ণ মন লইয়া বাস্তবের বিভিন্নমুখী কর্মে নির্বিষ্টচিত্তে

নিয়োজিত হওয়া যায় না। ফলে কর্মের ভিতর তৃপ্তির লেশ-মাত্র থাকে না। থাকে, নিয়ম-শৃংঙ্খলার কঠোর নাগপাশ ও প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজনীয় তাগিদ। তাই কর্মীটির মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত কর্মস্পৃহা থাকে না। জগত সম্পর্কে নীরস উদাসীনতা আসিয়া ব্যক্তিটিকে কর্মবিমুখ করিয়া তোলে। তখন সংসার তাহার মোটেই ভাল লাগে না ; অথচ একটা অনিবার্য্য নিয়তি অথবা অনুশাসনের পশ্চাতেই তাহার ইচ্ছার বিপক্ষে সারাটি জীবন কাটিয়া যায়। তাই কাজের মত কাজ তাহার দ্বারা কিছুই হয় না। যন্ত্রবৎ উদ্দমহীন জীবনই তাহার থাকিয়া যায়। এই জন্যই প্রতিটি মানব জীবনের পশ্চাতেই একটি আনন্দদায়ক অনুপ্রেরণার বিশেষ দরকার। আনন্দটি ব্যক্তিটির ইচ্ছা মাফিক থাকিলে তবেই না সে কর্মে উচ্ছ্বাস উদ্দীপনা পাইবে। আর এই আনন্দের মধ্যেই ব্যক্তিটির পরিচয় মূর্ত হইয়া উঠবে। এই জন্যই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন "মানুষ কি জানে তাহাতে নয়, কিন্তু মানুষ কিসে আনন্দ পায় তাহাতেই মানুষের পরিচয় পাওয়া যায়। মানুষের সেই পরিচয়ই আমাদের কাছে ঔৎসুক্যজনক। যখন দেখি সত্যের জন্য কেহ নির্বাসন স্বীকার করিতেছে তখন সেই বীরপুরুষের আনন্দের পরিধি আমাদের হৃদয়ের সম্মুখে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। দেখিতে পাই, সে আনন্দ এত বড় জায়গা অধিকার করিয়া আছে যে, নির্বাসন দুঃখ অনায়াসে তাহার অঙ্গ হইয়াছে। এই দুঃখের দ্বারাই আনন্দের মহত্ত্ব প্রমাণ হইতেছে। টাকার মধ্যেই যাহার আনন্দ সে টাকার ক্ষতির ভয়ে অসত্যকে অপমানকে অনায়াসে স্বীকার করে সে চাকরী বজায় রাখিতে অন্যায় করিতে কুণ্ঠিত হয় না, এই লোকটি যত পরীক্ষাই পাশ করুক, ইহার যত বিদ্যাই থাক, আনন্দ শক্তির সীমাতেই ইহার যথার্থ পরিচয়টি পাওয়া যায়।" অতএব মানুষের আনন্দই তাহার অন্তরের লুপ্ত স্বরূপটি প্রকাশ করিতেছে।

অবশ্য মানব জীবনের বিস্তারের জন্য নিয়ম-শৃংঙ্খলার দরকারও অপরিসীম। তথাপি সেই নিয়মের ভিতর এমন কতকগুলি ব্যবস্থাপনার আবশ্যক যাহাতে শৃংঙ্খলাটি মানুষের কর্মে আনন্দ দিতে পারে। তাহা হইলে ব্যক্তিটির সহিত তাহার কর্ম সুন্দর হইয়া উঠিবে।

মানব মনের আনন্দ পরিবেশ ও পরিস্থিতির উপরও অনেক নির্ভরশীল। ব্যক্তি বিশেষের মনের গতি অনুযায়ী পরিবেশ মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। কারণ, প্রত্যেক মানুষের সৌন্দর্য্য বা আনন্দানুভূতি এক রূপ নয়। তাই কর্ম ও পরিবেশ উভয়ই যদি মনোপযোগী না হয় তবে মন আনন্দসিক্ত হইবে না।

সমাজের সর্বস্তরে যাহাতে আনন্দের এই বারিধারা প্রবাহিত হয় তাহার অনুকূল ব্যবস্থা সৃষ্টি করা দরকার। মুষ্টিমেয় লোকের সুখ বা আনন্দ আমাদের লক্ষ্য নহে, লক্ষ্য গোটা সমাজের উপর। বিশ্বপ্রকৃতি কোন বিশেষ অঞ্চলকে লইয়া নয়, গোটা বিশ্বকে লইয়াই তাহার পূর্ণতা। ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। তবে বিশেষ বিশেষ স্থানে ইহার প্রভাব বিশেষ বিশেষ রূপ হইতে পারে। সেই প্রভাবকেই মানব মনের সহিত খাপ খাওয়াইয়া লইতে হইবে গোটা সমাজের মানুষের মনোপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া। বিজ্ঞ মনস্তাত্ত্বিকদের দ্বারা বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক পদ্ধতিতে, বাস্তব ও আধ্যাত্মিক জগতের সংমিশ্রণে সেই রূপ পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মনের অন্দরমহলের সুপ্ত সুকুমার বৃত্তিকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে। কারণ, মুষ্টিমেয় লোকের জন্য যাহা আনন্দদায়ক তাহাই আবার গোটা সমাজের জন্য অপ্রীতিকর হইতে পারে। আর তেমন কোন ব্যবস্থাপনায়

মানুষের সত্যিকার কল্যাণ আসিতে পারে না। সবচাইতে মানবতাবিরোধী জাতি আমেরিকাবাসী সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের ভিতর যে আনন্দ বা সুখের সন্ধান পাইতেছে উহাই আবার গোটা বিশ্বের নির্যাতিত অধিকার বঞ্চিত মানুষের সুখ ও আনন্দকে তিক্ত করিয়া তুলিতেছে। যে সকল ক্রিয়াকলাপ মানুষের চরিত্রকে শুদ্ধ রাখিয়া তৃপ্তিদানে সক্ষম সেইগুলির অনুকরণ জাতীয় জীবনে অপরিহার্য্য। জাতি যাতে সেইগুলি প্রফুল্লচিত্তে গ্রহণ করিতে পারে তাহার অনুকূল ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

ইহা ছাড়া জীবনবোধ যাহাতে একগুয়েমিতে পরিণত না হয় তাহার জন্য চাই–জীবন সম্পর্কে পুংখানুপুঙ্খ ধ্যান-ধারণা। জীবনের ব্যাপকতার জন্য বৈরাগ্যকে চিরতরে মানিয়া নিতে চাই না। তবে বিশেষ কোন সাধনার মাধ্যমে দুনিয়ার সবরকম ঘটনাকে দৃঢ় স্থির চিত্তে মোকাবেলার জন্য যে মনোবৃত্তির দরকার ইহার জন্য জীবনের বিশেষ একটি অংশ অতি সতর্কতার সহিত ব্যয় করিতে হইবে কিন্তু সেই সাধনার জন্যও চাই মনের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ ও আবেদন। কারণ, মনের বিপক্ষে কোন কাজকেই স্বাভাবিকভাবে মানিয়া লওয়া যায় না।

এক শ্রেণীর মানুষ অন্তরাত্মাকে বৈরাগ্যের কঠিন নাগপাশে বাঁধিয়া রাখিবার প্রয়াসী। ইহাতে জীবনের রসই শুষ্ক হইয়া যায়। অন্তরাত্মাকে না বাঁধিয়া বিশ্বের দরবারে উন্মুক্ত করিয়া ধরিলে "সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া, দেশে দেশে মোর দেশ আছে, আমি সেই দেশ লব বুঝিয়া"–কবির এই বাণীটির মর্মে পৌছা যায়। হৃদয়দ্বার বিশ্বের নিকট খুলিয়া ধরা আর বিশ্বকে হৃদয় দিয়া বুঝিবার নামই বিকাশ হওয়া–

হৃদয় আজি মোর কেমনে
গেল খুলি
জগৎ আসিয়া যেন করিছে
কোলাকুলি।

হৃদয়ে সঙ্কীর্ণতার জরাজীর্ণ থাকিলে বিশ্ববোধে আনন্দ পাওয়া যায় না। সঙ্কীর্ণতা অপসারিত হইলেই ব্যাপকতা আসিয়া সেই স্থান অধিকার করে তখনই "বিশ্বের সকল পাত্র হইতে আনন্দ মদিরা ধারা নব নব স্রোতে পান করিবার স্পৃহা জাগে।" আর মানুষের জীবনও এই আনন্দ-স্পৃহার ভিতর দিয়াই স্বার্থকতায় ভরিয়া উঠে।

স্রষ্টা ও সৃষ্টি

মাহমুদ চৌধুরী

স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হইতেছে মানুষ। মানুষ সৃষ্টির মাধ্যমে আল্লাহতালা বিশ্বব্রাহ্মণ্ডে নব নব সৃষ্টির দ্বার খুলিয়া দিয়াছেন। আদর্শ মানুষের মধ্যে স্রষ্টার গুণাবলীর প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। সৃষ্টির মূল তত্ত্ব অনুধাবন করার জন্য তাহার প্রাণ সর্বদা অজ্ঞাত জ্ঞানসমূহ যাহা দ্বারা স্রষ্টাকে নিবিড়ভাবে অনুভব করা সম্ভব উহা আহরণ করার জন্য উন্মুখ থাকে। আগুনের শিখা যেমন সর্বদা উর্দ্ধমুখী, আদর্শ মানুষের চিন্তার পাবকশিখা ঠিক তেমনিই সদা-সর্বদা স্রষ্টার রহস্যময় জ্ঞান অর্জনের জন্য উপাসনা, স্মরণ এবং ধ্যানের মাধ্যমে তাহার চিন্তাকে স্রষ্টামুখী করিয়া তোলে। আত্মশুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধি এবং একাগ্রতার মধ্যেই তাহার সাফল্য নির্ভর করে।

আল্লাহতালা বিভিন্ন ধর্মে প্রেরিত পুরুষের মাধ্যমে বিভিন্ন ধর্মের পথ মানুষের সম্মুখে খুলিয়া দিলেও প্রতিটি ধর্মের মূল কথাই হইতেছে স্রষ্টার সৃষ্টির মহিমায় পুলকিত হইয়া তাহার বন্দনায় আত্মসমর্পণ এবং তাঁহার

সৃষ্টিকে ভালভাসা। যে ব্যক্তি স্রষ্টার সৃষ্টির প্রতি অন্যায় অবিচার করে এবং হিংসা-দ্বেষ পোষণ করে তাহার সমগ্র জীবনব্যাপী সাধনা এবং উপাসনা সমস্তই ব্যর্থ হইতে বাধ্য।

'জীবে সেবা করে যেই জন
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।'

এই পৃথিবীতে আজ যে হানাহানি, হিংসা, অন্যায়, অবিচার এবং অশান্তির প্রকোপ দেখা যাইতেছে তাহার মূলে রহিয়াছে মানুষে মানুষে বৈষম্য, অন্যের হক আত্মসাৎ করার প্রবণতা এবং অসহায় মানুষের প্রতি ক্ষমতাদর্পী মানুষের বল প্রয়োগ। স্রষ্টা যেমন আকাশ, বাতাস, পানি কোন কিছুই বিশেষ কোন ব্যক্তির জন্য নির্দিষ্ট করিয়া দেন নাই ঠিক তেমনই এই পৃথিবীর মাটি, শস্যসম্ভার এবং জীবনধারণের কোন উপকরণের উপরই ব্যক্তিগত মালিকানা কায়েম করিয়া দেন নাই। মানুষ অন্যায়ভাবে ব্যক্তিগত মালিকানার স্বত্ব কায়েমের জন্য শক্তি প্রয়োগ, আইন তৈরী, উহা জোর করিয়া মানাইবার জন্য একদল সশস্ত্র রক্ষী দল পালন প্রভৃতি জোরজবরদস্তি দ্বারা ব্যক্তিগত মালিকানায় অজস্র সম্পদ ভোগ করিতেছে–আবার কেহ বঞ্চিত হইয়া ক্ষুধা, তৃষ্ণায় ধুঁকিয়া ধুঁকিয়া মরিতেছে। স্রষ্টা অসীম ক্ষমতাবান। মানুষ অন্যায় করিলে আদর্শ মানুষ দ্বারা তিনি তাহার প্রতিবিধান করেন। বর্তমান জগতেও এই অসাম্য এবং শোষণের বিরুদ্ধে মানুষ নতুন পথ সন্ধান করিতেছে, সংগ্রাম করিতেছে, সকল মানুষের জন্য সামাজিক উৎপাদন ও সমবন্টনের জন্য নতুন আইন সৃষ্টি করিতেছে। মিথ্যার অন্ধকার দূর হইয়া সত্য সূর্যের প্রকাশ অবশ্যম্ভাবী। নূতন যুগের দাবী প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে স্রষ্টার অসীম ক্ষমতারই জয় ঘোষিত হইবে।

জনতার আদালতে

সম্প্রতি বোয়ালমারীর গুনবাহা ইউসি-র জনগণ গম চুরির অপরাধে ৫ জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে স্থানীয় এম সি সি এ-র অফিসে ধরে আনার পর এম সি এ সাহেব তাদের বিচার করতে অস্বীকার করলে জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং দোষী ব্যক্তিদের প্রহার করে। এম.সি.এ সাহেব বাধা দিতে আসলে জনতা তাকেও প্রহার করে। এরপর তিনি পুলিশের সহায়তায় ৩০ জন লোককে গ্রেপ্তার করান।

সম্প্রতি একই অঞ্চলে কালোবাজারীতে কন্ট্রোলের তেল বিক্রয়ের সময় জনসাধারণের নিকট ধৃত হয়ে তেলের ডিলার কেষ্ট সাহা পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা দিতে বাধ্য হন।

॥ ২ ॥

সম্প্রতি টাঙ্গাইল থানার বাঘিল ইউনিয়নের রিলিফ হিসাবে বিতরণের জন্যে চার হাজার টাকা মঞ্জুর করা হয়। তিন হাজার টাকা বিতরণের পর বাকী এক হাজার টাকার মধ্যে রিজার্ভ হিসাবে দুইশত টাকা রাখিয়া অবশিষ্ট আটশত টাকা ঐ ইউনিয়নের ২৭টি মৌজার রিলিফ চেয়ারম্যানগণ আত্মসাৎ করে। গোপালপুর মৌজার চেয়ারম্যান জনাব ওমর আলী ঐ টাকার বখরা গ্রহণ না করিয়া এ ব্যাপারে প্রতিবাদ করিলে ঘটনাটি জনসমক্ষে প্রকাশ হইয়া পড়ে। ফলে প্রাক্তন মুক্তি-বাহিনীর সদস্যগণ, স্থানীয় ছাত্রসমাজ এবং জনসাধারণ এই রিলিফের টাকা আত্মসাৎকারী চেয়ারম্যানদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফটিয়া পড়ে এবং তাহাদের বিচার সভা আহবান করা হয়। জনতার রুদ্ররোষে ভীত হইয়া এই দুর্নীতিবাজ ব্যক্তিরা জনসাধারণের কাছে তাহাদের দুষ্কর্ম এবং অন্যায় স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। জনতার বিচারে তাহাদের প্রত্যেকের আড়াই শত টাকা করিয়া জরিমানা ধার্য্য করা হয়।

ডাকোটা দুর্ঘটনার তদন্ত রিপোর্ট চাই

বাংলাদেশ বিমান কর্মচারী কল্যাণ সংঘের সাধারণ সম্পাদক জনাব শাহ আলম এক বিবৃতিতে অবিলম্বে ডাকোটা বিমান দুর্ঘটনার তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশের দাবী করেছেন। বাংলাদেশ বিমানের অস্তিত্বকে মুছে ফেলার চক্রান্তের ফলেই বিমান দুর্ঘটনাটি ঘটেছিল বলে তিনি অভিযোগ করেন। বিবৃতিতে তিনি পাকিস্তানে আটক পি আই এ কর্মচারীদের দেশে ফিরিয়ে আনারও জোর দাবী জানিয়েছেন।

জনাব শাহ আলম কর্মচারীদের নিয়মিত রেশন, বকেয়া বেতন, ন্যায্যমূল্যের দোকান, পদোন্নতি এবং রিলিফের দাবী সম্বলিত সংস্থার ১৯ দফা কর্মসূচী বাস্তবায়নের দাবী জানান। বিবৃতিতে সাধারণ সম্পাদক অভিযোগ করেন যে এই সংস্থার অভ্যন্তরে আজ পর্যন্ত দালাল ও গণস্বার্থবিরোধী ব্যক্তিরা সক্রিয় রয়েছে এবং লক্ষ লক্ষ টাকার দ্রব্যাদি অপহৃত হয়েছে।

কর্মচারীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন অধিকার কেউ কোনদিন কাউকে দেয় না। আন্দোলন ছাড়া কোনাদিন অধিকার আদায় হয় না।

টাঙ্গাইলে সর্ব্বদলীয় সভা ও বিক্ষোভ মিছিল

নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদির দাম কমানের দাবীতে সম্প্রতি ৩৩টি ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে গঠিত জেলা সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে টাঙ্গাইলে এক বিরাট বিক্ষোভ মিছিল এবং জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

সৈয়দ আবদুল মতিনের সভাপতিত্বে স্থানীয় বিন্দুবাসিনী স্কুল প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় বিভিন্ন বক্তারা মন্ত্রী এবং এমসিএ-দের ঘুষ ও দুর্নীতির কঠোর সমালোচনা করেন, সভায় শ্রমিক লীগ ও লাল বাহিনীর ফ্যাসিবাদী কার্যকলাপের তীব্র নিন্দা করে তা প্রতিহত করার জন্যে জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বক্তৃতা করেন জনাব হাবীবুর রহমান, শামীম আল-মামুন, আতোয়ার রহমান, আবদুল সালাম, আবদুল খালেক ও অন্যান্য শ্রমিক নেতৃবৃন্দ।

ইহা কি সত্য?

॥ ৭০ ॥

অষ্ট্রেলিয়া সরকার বাংলাদেশের জন্যে মঞ্জুরকৃত রিলিফের অর্ধাংশের দাম ধরিয়া দুইটি বোয়িং ৭২০ ও চারিটি ফোকার ফ্রেণ্ডশীপ বিমান দিতে চাহিয়া ছিল। এই বিমানগুলি গঠন প্রকৃতির দিক হইতে খুবই মজবুত এবং দামও তুলনামূলকভাবে অনেক কম। কিন্তু যোগাযোগমন্ত্রী জনাব মনসুর আলী এ প্রস্তাব নাকচ করিয়া দিয়াছেন। কারণ, তাহার ভাগ্নে-ভাগিনা একটি ট্রাভেল এজেন্সী খুলিয়াছেন এবং ইংল্যাণ্ডের একটি বিমান কোম্পানীর নিকট হইতে সেকেণ্ডহ্যাণ্ড বিমান ক্রয়ের বন্দোবস্ত করিতেছেন।

॥ ৭১ ॥

বাংলাদেশ টোবাকো কোম্পানীর ডিলারশীপের জন্যে সহস্রাধিক আবেদনপত্রকে ডিঙ্গাইয়া সম্প্রতি ব্যাংকের কোন আমানত ছাড়াই জনৈক ভদ্রলোক ডিলারশীপ পাইয়াছেন। কোম্পানীর কর্মকর্তারাও তাহাকে খুশী করিতে পারিয়া ধন্য হইয়াছেন। কারণ, তিনি মামুবাদী

ছাত্রলীগের সভাপতি জনাব নুরে আলম সিদ্দিকীর পিতা।

॥ ৭২ ॥

ঢাকা জেলার মনোহরদী থানার পাটুলী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের জনৈক কর্মকর্তা দলীয় কর্মীদের সহযোগিতায় সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত শত্রুতা সাধনের উদ্দেশ্যে জনৈক মুক্তিযোদ্ধাকে জীবন্ত কবর দিয়াছেন। এই অপরাধে পুলিশ তাহাকে গ্রেফতার করিয়া নারায়ণগঞ্জে চালান দিলে জনৈক এম- সি- এ হস্তক্ষেপ করিয়া এই নরঘাতকটিকে মুক্ত করাইয়াছেন।

॥ ৭৩ ॥

স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নেওয়ার অপরাধে সড়ক ও জনপথ বিভাগের ১২ জন এস-ডি-ও ছাটাই হইলে জনপ্রতি ৫ হাজার টাকা সেলামীর বিনিময়ে যে ১২ জন সাব-এ্যাসিষ্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ারকে ঐ পদগুলি দেওয়া হইয়াছিল তাহারা এখনো তাহাদের নিজ নিজ পদে বহাল তবিয়তে আছেন। এই ৬০ হাজার টাকা সেলামী পাইয়াছিলেন ট্রেনিং এ্যাণ্ড এস্টাব্লিসমেন্ট বিভাগ। জনপ্রতি ৬ হাজার টাকা সেলামী লইয়া আরো ১৪ জন সাব-এ্যাসিষ্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ারকেও এস-ডি-ও পদ দান করা হয়েছে। ইহাদেরও কেহ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের ইন্টারভিউ-এর সম্মুখীন হন নাই।

সকল প্রকার নিযুক্তির ক্ষেত্রে সরকারী নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রীর সহকারী প্রেস সেক্রেটারী জনাব আমিনুল হক বাদশার ছোট ভাই রাশেদুল হককে বাংলাদেশ ওয়াপদার পারসোনাল ট্রেনিং ডিরেক্টরের সহকারী প্রধান হিসাবে নিয়োগ করা হইয়াছে। বিনা ইন্টারভিউয়ে পদপ্রাপ্ত রাশেদুল হকের পদ মাফিক প্রয়োজনীয় কোন যোগ্যতা বা অভিজ্ঞতাই নাই।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে যুক্তরাজ্যবাসীর চাঁদা

সন্তোষে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী কর্তৃক নির্মীয়মান ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় তহবিলে যুক্তরাজ্যের লাইসেস্টার শহরের নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ চাঁদা প্রদান করেছেন। জনাব শওকত হোসেন-২ পাউণ্ড, নূর আহমদ-১৫ পা. আলী আশরাফ-৫ পা. আলহাজ্ব আবু লায়েস-৫ পা. আবদুল লতিফ -৫ পা. আলী হোসেন-২ পা. ফরকুয়ান হায়দার-৫ পা. আবদুর রহিম-১ পা. মোজাম্মেল হক চৌধুরী-৫ পা. শফিকুল্লাহ-৫পা. আবদুল মতিন- ১ পা. আবদুল খালেক-৫পা. শরিফ উদ্দিন-১ পা. মোঃ আবদুল্লাহ -২ পা. ও আলহাজ্ব মনজুরুল হক-১ পাউণ্ড। উক্ত শহরের জনাব এম, এ, বাকি (৪৬ স্ন্যাকস বি স্টীট উল্লিখিত মোট ৬০ পাউণ্ড সংগ্রহ করে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাঙ্ক একাউন্টে জমা দিয়েছেন।

টাঙ্গাইল ন্যাপ সাবেক আহবায়কের সদস্যপদে বহাল

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির টাঙ্গাইল জেলা সাংগঠনিক কমিটির সাবেক আহবায়ক জনাব সৈয়দ আবদুল মতিনের বিরুদ্ধে গৃহীত অনাস্থা প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে পার্টি প্রধান সমীপে তৎকর্তৃক পেশকৃত বক্তব্যের ভিত্তিতে উক্ত কমিটিতে তার সদস্যপদ বহাল রাখার কথা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ঘোষণা করেছেন।

সম্পাদক ঃ সৈয়দ ইরফানুল বারী মুদ্রণে ঃ শান্তি প্রেস, সন্তোষ, টাঙ্গাইল।

প্রতি সংখ্যা পঁচিশ পয়সা সাপ্তাহিক চাঁদার হার : ষান্মাসিক-৬.০০ বার্ষিক-১০.০০

হক-কথা

(WEEKLY THE HAQ-KATHA)

প্রকাশক ও পৃষ্ঠপোষক ঃ মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

প্রথম বর্ষ পঞ্চদশ সংখ্যা শুক্রবার ২৬ শে জৈষ্ঠ ১৩৭৯, ৯ই জুন, ১৯৭২ ২৭ শে রবিউসসানি ১৩৯২, সন্তোষ, টাঙ্গাইল

মানবিক রিলিফের পাশবিক রূপ

বিশ্বের বিশেষ করে আফ্রোএশিয়া-ল্যাটিন আমেরিকার অনুন্নত দেশগুলিতে রিলিফ গৃহবিবাদ, গৃহযুদ্ধ, রাজনৈতি হত্যাকাণ্ড ও পট পরিবর্তন ডেকে এনেছে। নাইজেরিয়া, কঙ্গো, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, তুরস্ক ও জর্দানের গত দশকের ইতিহাস এর জলন্ত নজীর বহন করে। রিলিফকে কেন্দ্র করে গোয়েন্দাবৃত্তি ও অর্থনৈতিক শোষণের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। তাই মানবতার নামে একটি বিপর্যস্ত জাতির উপর নেমে আসে মহাদুর্যোগে। সেই আলোকে আজ একটি প্রশ্ন ঃ রিলিফ নিয়ে বাংলাদেশের ভবিষৎ কি?

সার্বজনীন মানবিক আবেদনকে পুঁজি করে বৃহৎ শক্তিগুলো বহুবার বিভিন্ন দুর্যোগ কবলিত দেশে তাদের ভবিষ্যত শোষণের মহামহীরুহের প্রথম বীজটি বপন করেছে।

নাইজেরিয়ার গৃহযুদ্ধের মূলে যে বিদেশী রিলিফ মিশনের অবদান রয়েছে সে কথা আজ সর্বজনবিদিত। নিরন্ন মানুষের সাহায্যের নামে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কালোহাতের ছোঁয়ায় সেদেশে তীব্রতর হয়েছিল গৃহযুদ্ধের ভয়াবহতা। সাহায্য সামগ্রী দাম শোধ করতে হয়েছিল লক্ষ নাইজেরিয়াবাসীর উষ্ণ রক্তের

লাগামহীন গোয়েন্দাবৃত্তি বাংলাদেশকে গৃহবিবাদের মুখে ঠেলে দিচ্ছে।

বর্তমান যুগে রিলিফ শব্দটির সঙ্গে বন্যা, ভূমিকম্প, দুর্ঘটনা এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দুর্যোগ কবলিত অসহায় মানুষ এবং তাদের ত্রাণকার্যে জড়িত একাধিক দেশের তৎপরতা বুঝায়। কিন্তু একটু সচেতন মন নিয়ে পৃথিবীর অনুন্নত দেশগুলিতে এই ধরনের সাহায্য তৎপরতা এবং তার পথে সেই দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি এবং সামরিক বিভাগে বিদেশী শক্তির অনুপ্রবেশ ও প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে গৃহযুদ্ধ ও রাজনৈতিক হানাহানির সূচনা লক্ষ্য করা যায়। বস্তুতঃ রিলিফের বিনিময়ে। কঙ্গোর জনপ্রিয় নেতা লুমুম্বার হত্যাকাণ্ডে শুধু কঙ্গোর কালোআদমীরাই নয় বরং সমগ্র বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষ মাত্রই হয়েছিল ব্যথিত, ক্ষুব্ধ। অথচ লুমুম্বার এই দুঃখজনক হত্যাকাণ্ড এবং কঙ্গোর স্বাধীনতাকামী মানুষের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্রের বেড়াজাল সৃষ্টি হয়েছিল তার পটভূমিও রচিত হয়েছিল জাতিসংঘের রিলিফ বা সাহায্য মিশনের তৎপরতার উপর। ইন্দোনেশিয়ায় কমিউনিস্ট নিধনের নামে লক্ষ লক্ষ দেশপ্রেমিককে হত্যা করার পর মার্কিন

গুপ্তচররা প্রগতিশীল কর্মীদের প্রতিটি পদক্ষেপ সম্পর্কে খোঁজ রাখার জন্য যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলো তাও রিলিফ মিশনের মাধ্যমেই। ইরানকে বামপন্থীদের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য যে প্রচেষ্টা সর্বদা তৎপর তার মাধ্যমও এই বৈদেশিক রিলিফ মিশন। ইরানের ভয়াবহ ভূমিকম্পের পর মার্কিন মহল যে রিলিফ মিশন প্রেরণ করে তাই তাদের গোয়েন্দা চক্রের কাজকে যথেষ্ট এগিয়ে নিয়ে যায়। যুক্তরাষ্ট্রঘেঁষা বলে পরিচিত দেশ তুরস্কের রাজনীতিতেও ভূমিকম্পোত্তর রিলিফের আড়ালে মার্কিন গোয়েন্দাদের বামপন্থী বিরোধী কর্মতৎপরতা তথা প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি কর্মসূচীকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দেয়ার কাজ পুরাদমে চলেছে। ১৯৬৭ সালে ইসরাইলের বিরুদ্ধে পাশাপাশি যুদ্ধ করলেও আল ফাতাহ ও জর্দানের বাদশাহর মধ্যে পরবর্তীকালে বিরোধ ও সংঘর্ষের মূলে রয়েছে কতিপয় বিদেশী ত্রাণ মিশনের অদৃশ্য কারসাজি। খোদ পাশ্চাত্য সাংবাদিকদের মতে জুন যুদ্ধের পরপরই বিশেষ করে প্যালেষ্টাইনী মোহাজেরদের মধ্যে রিলিফ কাজ করে চক্রান্তকারীরা এই সুযোগ গ্রহণ করে।

বাংলাদেশকে যে সমস্ত বিদেশী রাষ্ট্র সাহায্য করছে তার প্রথম সারির প্রথম নামটি হচ্ছে ভারত।

মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকে এই প্রতিবেশী রাষ্ট্রটি বাংলাদেশের মানুষকে রিলিফ বা সাহায্য সামগ্রীর মাধ্যমে যথেষ্ট সাহায্য করে আসছে। বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাষায় ভারত সরকারের এই সাহায্যের জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। বিশ্বের দরবারে ভারত এই সাহায্যের জন্যে সুনামও অর্জন করেছে যথেষ্ট। মুক্তিযুদ্ধের সময় বিভিন্ন রাষ্ট্র ভারতের মাধ্যমে বাংলাদেশকে বা বাংলাদেশের অসহায় মানুষকে সাহায্য করে আসছে। বাঙ্গালী জাতির জন্য ভারত বিশ্ববাসীর কাছ থেকে নগদ জিনিষপত্রে যে সাহায্য লাভ করেছে তার পরিমাণও কম নয়। ঐ সময় দেশত্যাগী বাঙ্গালীদের জন্যে ভারত সরকার যে সাহায্য দিয়েছেন অন্যান্য বৈদেশিক রাষ্ট্র থেকে প্রাপ্ত সাহায্য তা' থেকে বেশী কি কম আমাদের জানা নেই। ভারতের কাছে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকার জন্যেই এর একটা হিসাব হওয়া দরকার। পাশ্চাত্যের কতকগুলি পত্র-পত্রিকা অভিযোগ করেছে যে বাঙ্গালীদের জন্যে দেয়া রিলিফের দ্রব্যাদি এখনও ভারতে খোলা বাজারে বিক্রি হচ্ছে এবং তারা আশংঙ্কা প্রকাশ করেছে যে ভারত বর্তমানে বাংলাদেশকে সাহায্য হিসাবে যে দ্রব্যাদি দিচ্ছে তা প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের অধিবাসীদের জন্যে অন্যান্য রাষ্ট্র কর্তৃক ভারতকে দেয়া রিলিফেরই একটা অংশ মাত্র। দুর্দিনের বন্ধু ভারত এহেন অপবাদগ্রস্থ থাকুক আমরা তা কামনা করতে পারি না। কিন্তু রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ভারত বাংলাদেশের রিলিফ তৎপরতা সম্পর্কে জনগণ সুস্পষ্ট ধারণা না পেলে পাশ্চাত্যের প্রচার বহু বাঙ্গালীর মনে বদ্ধমূল হয়ে থাকবে।

অবশ্য এতো অস্বীকার করবার জো নেই যে, রিলিফের নামে চোরাচালান অবাধে হয়ে গেছে। লক্ষ লক্ষ টন পাট, হাজার হাজার বেল সুতা, লক্ষ লক্ষ মণ ধান চাউলসহ বহুবিধ জিনিষপত্র বাংলাদেশ থেকে রিলিফের ট্রাকেই চলে গেছে। এই সত্যটির বহুল প্রচার ভারত বাংলাদেশের রাজনৈতিক সম্পর্ককে জটিল করে ফেলেছে। রিলিফ তৎপরতা প্রত্যক্ষ সহযোগিতার নামে ভারতীয় গোয়েন্দা কর্মচারীরা যথাস্থানে বসে গেছে বিশেষ করে চলাচল, পরিবহন ও যোগাযোগ সংস্থাগুলোতে তাদের বাজীমাৎ হয়েছে। এসব কি বিবাদ ও পট পরিবর্তনের আলামত নয়?

বাংলাদেশ সরকারই বা করবেন কি। তাদের স্থায়ী জনপ্রিয়তা দরকার। বিধ্বস্ত বাংলা রিলিফ ছাড়া গড়বেন কি করে। তাই আল্লাহর

ওয়াস্তে ছেড়ে দিয়েছেন দেশকে। শুধু কি তাই? এম.সি.এ আর মাতবরদের সন্তুষ্ট রাখতে হবে। তাই আইয়ুব খান যেমন ঢালাও এইড দিয়ে চেয়ারম্যান মেম্বারদের হাতে রাখতেন শেখ মুজিব তেমনি যুৎসই ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন। উদ্দেশ্য পুরাপুরি মানবিক না হওয়াতে ব্যবস্থাপনায় মারাত্মক গলদ দেখা দিল- আর রিলিফ কেলেঙ্কারী অতীতের সব রেকর্ড ভঙ্গ করে এগিয়ে চলল। প্রথম প্রথম কেউ ছাপত না, অবশেষে অনেকেই প্রকাশ করতে লাগলেন এম.সি.এ, রিলিফ চেয়ারম্যান, পঞ্চায়েত সদস্য রিলিফ তথা অনাহার ক্লিষ্ট মানুষের ভাগ্য নিয়ে কত ছিনিমিনি খেলছেন।

সবচেয়ে বেশী ভয় করে যার রিলিফ সেইই শেখ সাহেবের উদারতায় জেকে বসে গেছে। তাছাড়া প্রধানমন্ত্রীর উপায়ই বা কি! কারণ, শ্যামচাচা তার বহুদিনের পুরানো বন্ধু। ১৯৭১ সালের ১৭ই জানুয়ারী ফার্লল্যাণ্ডের সাথে তার গোপন বৈঠক ভুলে গেলে চলবে না। প্রথম প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিনের ঘোষণা ঃ আমরা যুক্তরাষ্ট্র থেকে কোন সাহায্য চাই না – 'ফাঁসি ফেরত' শেখ সাহেব গদী ধরেই রদ করলেন। চাতুর্যের ভাষায় জানালেনঃ চাই, তবে শর্তহীন। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির চালকে তিনি এড়াতে পারলেন না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রথমে কোথাও শর্তযুক্ত দরদ দেখাতে যায়নি। বসবার জায়গা করে পরে শর্তটি জুড়ে দিয়েছে। আমরা আশঙ্কা করছি, বাংলাদেশে এর ব্যতিক্রম হবে না। ১৯৫৫–৫৬ সালে বাংলাদেশে যে ভয়াবহ বন্যা হয় যুক্তরাষ্ট্র কি তার পুরা সুযোগ গ্রহণ করেনি? এরই জের টেনে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী সাহেব কি বলেননি, মার্কিন সাহায্য আর বন্ধুত্ব ছাড়া পাকিস্তান টিকবে না। ১৯৭০ সালের বঙ্গোপসাগরীয় মহাসাইক্লোনের সুযোগ বৃটিশ আর মার্কিন নিচ্ছিল পুরোপুরিই। তখনো এদেশে হয়েছে বিপর্যয় নিয়ে রাজনীতি। বাংলাদেশের জনতা আজ জাগ্রত, যথেষ্ট আত্মসচেতন। কিন্তু একটি সত্য আমরা অস্বীকার করছি না তারা শেখ সাহেবের নেতৃত্বের উপর আস্থা হারাতে আরও একটু সময় কাটাতে চায়। শেখ সাহেব কি তারই সুযোগ গ্রহণ করে রিলিফের রাজনীতি করে যাবেন? বৈদেশিক গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর হাতে দেশটি তুলে দিবেন?

খোদা না করুন, এমনি প্রভুত্বমূলক বন্ধুত্ব চললে বাংলাদেশের জন্যও অপেক্ষা করছে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি– গৃহবিবাদ, গৃহযুদ্ধ, রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ও পট পরিবর্তন এবং অর্থনৈতিক শোষণ।

বিজ্ঞপ্তি

ক) বিজ্ঞাপনদাতাদেরকে অনুরোধ জানানো হচ্ছে

৪০/১ নয়া পল্টন, ঢাকা (ফোন নং- ২৮৩৪১৪)

এই ঠিকানায় হক-কথা প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ করতে।

খ) সার্কুলেশান এজেন্ট ও সংবাদদাতাগণ সরাসরি সন্তোষের ঠিকানায় যোগাযোগ করবেন।

'হক-কথা' প্রসঙ্গে মওলানা ভাসানী

হক-কথা প্রকাশনার পর থেকেই অজ্ঞাত মহল থেকে হুমকি ও জ্ঞাত মহল থেকে উস্কানী দেয়া হচ্ছে 'হক-কথা' গোষ্ঠী নিরবে সব সহ্য করছে। কিন্তু সম্প্রতি এর মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। তাই এর প্রকাশক মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী নিম্নরূপ বক্তব্য পেশ করেছেন।

বেশ কিছুদিন যাবত হক-কথা'কে কেন্দ্র করে হুমকি ও উস্কানি চলছে। অনেক এজেন্ট ও হকার আমাকে জানিয়েছেন যে হক-কথা বিক্রয়ে তাদের প্রাণনাশের হুমকি দেয়া হচ্ছে।

আর পত্রিকাটির সাথে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট সবাইকে ভয়ভীতি দেখানো হচ্ছে। অপহরণ ও হত্যার কথা জানিয়ে দেয়া হয়েছে। আমার আজ তাই বক্তব্য– যে কেউ পত্রিকাটির ত্রুটি-বিচ্যুতির সমালোচনা করতে পারেন। কিন্তু এর স্বাভাবিক গতি রুখে রাখতে কারো অধিকার এবং সাধ্যও নাই। সরকারের প্রতি আমার অনুরোধ, অপ্রীতিকর পরিণতির পূর্বেই এহেন অপ্রত্যাশিত ভূমিকা বন্ধ রাখুন।

মামুর কাছে ভাগ্নের বিচার

শেখ মণি প্রেস দখল করছেন

প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমান সমীপে সেন্ট্রাল অফসেট প্রেসের (৩/১ কৈলাশ ঘোষ লেন ঢাকা–১) কর্মচারীবৃন্দ তদীয় ভাগ্নে শেখ ফজলুল হক মণির স্বেচ্ছাচারিতা তুলে ধরে একটি আরজী পেশ করেছেন। নীচে তার অনুলিপি প্রকাশ করা হল।

শ্রদ্ধেয়,

আমরা সেন্ট্রাল অফসেট প্রেসের গরীব শ্রমিকবৃন্দ। আমরা বহুদিন ধরিয়া এই প্রেসে কাজ করিয়া আসিতেছি। গত স্বাধীনতা আন্দোলনেও আমাদের অনেক মুক্তি সংগ্রামে শরীক হওয়ার জন্যে নানাভাবে লাঞ্ছিত ও নির্যাতিত হইয়াছেন ও একজন শ্রমিক মৃত্যু বরণ করিয়াছেন।

এই প্রেসের মালিক অবাঙ্গালী বিধায় স্বাধীনতার পর ইহা শত্রু বা পরিত্যক্ত সম্পত্তি বলিয়া গণ্য করার দরুন প্রেস পরিচালনার জন্যে ম্যানেজার, শ্রমিক–প্রতিনিধিও একজন সরকারী প্রতিনিধিকে নিয়া একটি পরিচালক বোর্ড গঠন করত: এই পরিচালক বোর্ডের হাতে প্রেসটির পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। তারপর পরিচালক বোর্ড কর্তৃক যথারীতি সুচারুরূপে এই প্রেস পরিচালিত হইতেছিল কিন্তু শ্রমিকদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে হঠাৎ একজন এডমিনিস্ট্রেটর (পরিচালক) আসিয়া একদিন এই প্রেসের কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। আমরা ইহাও জানিতে পারি যে, তিনি পরিত্যক্ত সম্পত্তি পাসবান প্রেসেরও পরিচালক। সেখানে তিনি যে 'বাংলার বাণী' পত্রিকা প্রকাশ করেন তাহা এখন সেন্ট্রাল অফসেট প্রেস হইতে ছাপা হইতেছে। বর্তমানে তিনি পাসবান প্রেসের নাম রাখিয়াছেন 'মধুমতী মুদ্রণালয়'।

এরই মধ্যে সেন্ট্রাল অফসেট প্রেসে 'বাংলার বাণী' ছাপা বাবদ ২৫/৩০ হাজার টাকা বাকী পড়িয়াছে। সেন্ট্রাল অফসেট প্রেসের মালিক তিনি নিজেই এই দাবী করিয়া ইতিপূর্বে একবার প্রায় পাঁচদিন প্রেস তালাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন।

১১/৫/৭২ইং তাং আমাদের সকলকে ডাকিয়া নিয়া জানাইয়াছেন যে কৈলাশঘোষ লেন তেজগাওস্থ সেন্ট্রাল অফসেট প্রেস তিনি এখান হইতে সরাইয়া মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকায় নিয়া যাইবেন। এবং তিনি এই প্রেসের নাম পরিবর্তন করিয়া ইহার নাম রাখিবেন বাংলার বাণী। ইতিপূর্বে তিনি প্রেসের গাড়ীখানা (টয়োটা কার) ঢাকা গ ৫৪০১ নং নিয়া গিয়াছেন।

বর্তমানে সরকার কলকারখানাতে শ্রমিকদের অংশীদারিত্ব দেওয়ার কথা ঘোষণা করিয়াছেন। এমতাবস্থায় কি করিয়া এই প্রেস তিনি অন্যত্র সরাইয়া নিতে পারেন তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। সরকার ঘোষিত নীতিরও ইহা বরখেলাপ বলিয়া আমরা মনে করি। ইহার চাইতেও বড়কথা সেন্ট্রাল অফসেট প্রেস অপসারণ করার অর্থ এই মহাদুর্দ্দিনে কর্মরত ৩০/৩৫ জন শ্রমিকের কর্মচ্যুত হওয়া।

আমরা এখন আরও জানিতে পারিয়াছি যে, এই পরিচালক শেখ ফজলুল হক মণি আপনার ভাগ্নে। আপনি জাতির পিতা দেশবরেণ্য প্রিয় নেতা ও আমাদের জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী।

সুতরাং আপনার সমীপে গরীব সেন্ট্রাল অফসেট প্রেস শ্রমিকদের নিবেদন, কোন

অবস্থাতেই সেন্ট্রাল অফসেট প্রেস যাহাতে তিনি অন্যত্র সরাইয়া না নিতে পারেন তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে এবং সরকার ঘোষিত নীতি অনুযায়ী সেন্ট্রাল অফসেট প্রেসে কর্মরত শ্রমিকগণ উক্ত প্রেসের মালিকানা পাইতে পারে ও ইউনিয়ন হইতে যাহাতে প্রেস পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করিতে পারে সেরূপ প্রয়োজনীয় আদেশ দান করিতে আজ্ঞা হউক। ইতি

নিবেদক –

সেন্ট্রাল অফসেট প্রেসের গরীব শ্রমিকবৃন্দ, ঢাকা।

তাং ২২-৫-৭২ইং

এম, আলাউদ্দিন, মোঃ নাছিম হোসেন, বোরহান জোয়ারদার, আলি হোসেন, আলীউর রহমান, মোঃ হাবিব, মোসলিন উদ্দিন মিয়া, হায়দার আলী, আশরাফ মিয়া, মোঃ মহিউদ্দিন মিয়া, রহমান, আবুল কাশেম, মোঃ হাতেম খান, মোঃ ওফাজ উদ্দিন, মুক্তার উদ্দিন, মোঃ চান মিয়া, আবদুল মোন্নাফ, ওয়াস উদ্দিন, মোঃ আবু তাহের, মোঃ আওলাদ হোসেন, মোহাম্মদ আলী, আঃ কাদের, নুরুল ইসলাম, মাটিন, আজিউদ্দিন, আবদুল হামিদ ও মোঃ সোহরাব আলী।

কিশোরগঞ্জ ভাটি আঞ্চলিক সম্মেলনে মওলানা ভাসানীর ঘোষণা

লালবাহিনী দিয়ে কৃষক সমিতি দমন করলে মুজিবের দশা চিয়াং কাইশেকের মত হবে

(পূর্বে প্রকাশিতের পর)

৩১ শে মে বিকেলে চারিগ্রামে জনসভা শুরু হয়। দুপুর থেকেই লাল ঝাণ্ডা নিয়ে মিছিলের পর মিছিল আসতে থাকে। মওলানা যে কি আন্দোলনের। যেখানে একটি খবরের কাগজ আসে না, সেখানে দাবী ও জঙ্গী মিছিল মওলানাকে আশার বাণী শুনিয়েছে। জনাব মহিবুর রহমান রঙ্গর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জনসভায় ভাষণ দিয়েছেন জনাব পীযুষ তুংগ, জনাব সালাহউদ্দিন, জনাব শামসুল হক, জনাব রাশেদ খান মেনন, বাবু রায়মোহন দাস ও জনাব আইয়ুব রেজা চৌধুরী। ভাটি এলাকার সার্বিক অবস্থা বিশ্লেষণ করে কৃষকদের কর্তব্য সম্পর্কে বক্তাগণ বক্তব্য পেশ করেন। মওলানা ভাসানী তার ভাষণে বলেন, "কৃষক সমিতি গদি দখল করবার জন্যে নয়, লুটপাটের জন্যে নয়, বাড়ী-গাড়ীর জন্যে নয়– শ্রেণী সংগ্রামের মাধ্যমে পুঁজিপতি মহাজন তথা শোষক শ্রেণীকে উৎখাত করে সমাজতন্ত্র কায়েমই এর লক্ষ্য। তাতেই গরীবের ভাত-কাপড়ের সংস্থান হবে, গরীবের সন্তান শিক্ষিত হতে পারবে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষির উন্নতি হবে। আমার অনুরোধ, বিড়ি শ্রমিক, রিকসাওয়ালা, উকিল-মোক্তারদের যেমন সমিতি আছে আপনারা কৃষকরাও তেমনি সমিতি গড়ে তুলুন। এর নেতৃত্বে সংগ্রাম করে আপনাদের দাবী আদায় করতে পারবেন। লড়াই না করে বৃটিশ ও পাকিস্তান আমলে কিছুই পান নাই– তাই সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ুন। আমরা ভোটের জন্যে আসি নাই। আসবও না। আমরা চাই কৃষকের উন্নতি। আগামী শাসনতন্ত্রে কৃষকের ন্যায্য দাবীদাওয়া গ্রহণ করা না হলে তা মানবই না। মুজিব-তুমি চোরাকারবারীদেরকে পদাঘাত কর। কৃষকের দলে আস। কৃষক যদি তোমাকে ভোট না দিত তবে এই জীবনে প্রধানমন্ত্রী হতে পারতে না। লালবাহিনী দিয়ে কৃষক সমিতি দমন করলে তোমার দশা চিয়াং কাইশেকের মত হবে। আমার ৯০ বছরের উপদেশ গ্রহণ কর। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ কৃষকের আন্দোলনের মুখে টিকতে পারে নাই। ইয়াহিয়ার লক্ষাধিক সৈন্যও কৃষককে দমাইয়া রাখতে পারে নাই। তোমার লালবাহিনী কি করে পারবে? ইন্দিরা

সরকারের উচিত ছিল পাক-সৈন্যের লুণ্ঠিত মাল বাংলাদেশের জনগণের হাতে সমর্পণ করা। কিন্তু পরের ধন বাটপারেই খেয়েছে। বিশ্ববাসী জেনে রাখ, আরও ৫০ লক্ষ লোককে যদি শহীদ হতে হয় তবু বাঙ্গালী জাতি ভারত, রাশিয়া, আমেরিকা কিংবা চীনের গোলাম হবে না।"

সভাশেষে যখন গণসঙ্গীতের আসর বসেছিল তখন মওলানা সাহেবকে কয়েকজন সরল প্রাণ কৃষক বলল, হুজুর আমাদের মহাজনরা তো বলছে সমাজতন্ত্র হলে আকীকা, খতনা, মিলাদ নানান জিরাফত উঠে যাবে। মওলানা সাহেব বললেন, মিথ্যা কথা। বরং এসব সম্পন্ন করতে যাবতীয় খরচ আপনারা সমাজতন্ত্রী সরকার থেকেই পাবেন।

মওলানা সাহেবের বহুদিনের ইচ্ছা, রাজহাঁসের মাংস খাবেন। হয়ে উঠছিল না। ভাটিতে শত শত রাজহাঁস দেখতে পেয়ে এর স্বাদ সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন। ফলে যা হবার তাই হল। রাজহাঁস জবেই হল। খাওয়া হল।

ফিরবার পথে রাত এগারটায় মওলানা সাহেব ১৯৭০ সালের জানুয়ারী মাসে নির্বাচনী রাজনীতির অসাড়তা ও বিপ্লবী রাজনীতির প্রয়োজনীয়তা প্রচার করতে গিয়ে আওয়ামী লীগের গুণ্ডাদের হাতে শাহাদাৎ প্রাপ্ত ঢাকীর ওমর ফারুকের কবর জিয়ারত করেন।

চীনা অস্ত্রসহ ভারতীয় সৈন্য গ্রেফতার

গত ৪ঠা মে রাত ৯ টায় বেনাপোলের সাদিপুর বর্ডারে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ২৯৬৫৬৭৬ নং সেপাই গদাধর মণ্ডলকে বাংলাদেশ রাইফেল গ্রেফতার করেছে। তার কাছে একটি বেআইনী চীনা রিভলভার ছিল। উপরন্তু বাংলাদেশে আসার তার সাথে কোন কাগজপত্র ছিল না। শার্শা থানায় ১৯ (এ) এবং (এফ) ধারায় একটি অভিযোগ লিপিবদ্ধ করে গদাধর মণ্ডলকে যশোর জেল হাজতে পাঠান হয়েছে। গদাধর মণ্ডলের বাড়ী বর্ধমান জিলার কাউরী গ্রামে এবং সারসা থানার কেস নং ১৪ তাং ৬/৫/৭২ বলে প্রকাশ।

রেডক্রস ললনার লীলা

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এক শ্রেণীর অতি আধুনিকার সন্দেহজনক গতি-বিধি এবং কার্যকলাপ প্রতিটি খুলনাবাসীকে তটস্থ করে তুলেছে। এরা দিনের বেলা উগ্র পোষাকে দল বেধে ঘোরে, সন্ধ্যায় এদের পাওয়া যায় অভিজাত বিলাসী হোটেলের সম্মুখে। বিদেশীদের ক্রমাগত আগমনের সাথে সাথে এরাও কোথায় হারিয়ে যায় আকস্মিকভাবে।

প্রথমদিকে এদেরকে দেখা যেত ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের ক্যাম্পে। এরা সেখানে সমাজসেবার নামে গিয়ে আড্ডা মারতো কার্যরত অফিসারদের সাথে। আজকাল এদের অনেককেই দেখা যায় আন্তর্জাতিক রেডক্রসের খুলনাস্থ অফিসে যাতায়াত করতে। তাছাড়া সংস্থার প্রাক্তন প্রধান ডা: প্রাগের বাড়ীতেও এদের দু' একজনকে এমনকি গভীর রাত পর্যন্তও আসর জমাতে দেখা গেছে। রেডক্রসের কতিপয় প্রতিনিধির কার্যকলাপের ফলে তাদের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরির অভিযোগ উত্থাপনের অবকাশ রয়েছে। অনেকের ধারণা, ললনারা তাদের হয়ে বিভিন্ন মহলে যাতায়াত করে ব্যাপক তথ্য উদঘাটনে তৎপর রয়েছে। তবে তারা কিসের প্রতিনিধি– সিআইএ, রুথলেস র‍্যাড না কেজিবি'র।

গত ১০ই জানুয়ারী খুলনার খালিশপুরে অবাঙালী নিধনের যে বর্বর পর্ব সমাপ্ত হয়েছে, তার পেছনেও আন্তর্জাতিক কিছু একটা রয়েছে। ঐদিন খালিশপুরে রেডক্রসের গাড়ী ও কর্মকর্তাদেরকে অসম্ভব তৎপর দেখা গেছে। অমানবিক হত্যাকাণ্ডটি সংঘটিত হয়ে

যাওয়ার পর মানবতার এই ভেকধারীর হাসপাতালে অসংখ্য মৃত ও আহত দেহের ছবি তুলেছে, রিপোর্ট নেয়ার অভিনয় করেছে। একই সময় দু'জন আমেরিকানসহ একটি হেলিকপ্টার বার বার হাসপাতালটির উপর দিয়ে চক্কর মেরেছে। আর সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপারটি হলো, খালিশপুরের হত্যাকাণ্ডের প্রথম খবরটি পাওয়া গিয়েছিল মার্কিন বেতার ভয়েস অব আমেরিকা থেকে। আর একটি ব্যাপার হলো, বিদেশ থেকে বিশেষ করে মার্কিন বিরোধী দেশগুলো থেকে আসা রিলিফ সামগ্রীর ব্যাপকাংশ ইদানীং খুলনা থেকে উধাও হতে শুরু করেছে। এখানে এই মানবসেবী সংস্থা রেডক্রসের হাত রয়েছে বলে সকলের ধারণা।

আমলাগিরি সাবান ও সার শিল্পকে ধ্বংস করে দিচ্ছে

বাংলাদেশ সরকার কলকারখানা চালু এবং উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে প্রথম থেকেই গলা ফাটিয়ে আসছেন। মন্ত্রী, এম-সি-এ এবং সরকারী প্রশাসকদের ঘুষ ও দুর্নীতির ফলে উৎপাদন বৃদ্ধির পরিবর্তে একের পর এক কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, অন্যদিকে মুজিব-সরকার শ্রমিকদের ধর্মঘটের গণতান্ত্রিক অধিকারকে গলাটিপে হত্যা করার অপচেষ্টায় মেতে উঠেছেন। বিভিন্ন কল-কারখানায় সরকারী প্রশাসক এবং কর্মকর্তাদের দুর্নীতি ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের কাহিনী ইতিপূর্বে 'হক-কথা'য় প্রকাশিত হওয়ার পর আমাদের কাছে আরো নজীর আসছে।

দেশের বৃহত্তম সাবানের কারখানা ক্রিসেন্ট ইণ্ডাস্ট্রিজ। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর শিল্প পরিচালনা কমিটি প্রাক্তন ছাত্রনেতা জনাব হারুনুর রশীদের নেতৃত্বে একজন জেনারেল ম্যানেজার ও পরিচালনা বোর্ড নিয়োগ করেছিলেন। এই কমিটি দক্ষতার সাথে কার্য পরিচালনা করতে থাকলেও স্থানীয় এম.সি.এ সাহেবদের অনুরোধে সরকার সম্প্রতি আবদুল হক নামক জনৈক অযোগ্য ব্যক্তিকে ক্রিসেন্ট ইণ্ডাষ্ট্রিজের প্রশাসক নিয়োগ করেছেন। মিল পরিচালনায় ও নিয়ন্ত্রণে বারবার ব্যর্থ হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে চট্টগ্রামস্থ শিল্প দফতর এই প্রশাসকটিকে পরপর দু'বার বরখাস্ত করলেও সরকার এখনো তাকে বহাল রেখেছেন। তিনি প্রয়োজনাতিরিক্ত পদে নিজস্ব লোকদের নিয়োগ করে চলছেন। তৎসঙ্গে ভাড়াটিয়া গুণ্ডাবাহিনীও পালন করছেন। ফলে শ্রমিক ও কর্মচারীদের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ ও বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে। এতে ক্রুদ্ধ হয়ে স্থানীয় এম.সি.এ জনাব আখতারুজ্জামান বাবুর সহায়তায় আওয়ামী প্রশাসকটি ভাড়াটে গুণ্ডা দিয়ে গত ১৭ই মে কারখানটি ঘেরাও করেন। গুণ্ডারা ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে কারখানা ভবনের ক্ষতিসাধন করে। মারাত্মক পরিণতির আশঙ্কা করে অতিরিক্ত সুপার কারখানাটি বন্ধ ঘোষণা করেছেন।

যোড়াশালের ইউরিয়া সার কারখানাটিও পড়েছে দুর্নীতিপরায়ণ কর্মকর্তাদের হাতে। ইতিপূর্বে অপারেশন ম্যানেজারের অজ্ঞতার দরুণ কারখানাটি সুদীর্ঘ আঠারো মাস বন্ধ ছিল। যেখানে বয়লারের জন্যে প্রয়োজন মাত্র ০.৪ পিপি এম সিলিকা, তিনি সেখানে প্রয়োগ করিয়েছেন ১৫ পিপিএম সিলিকা। ফলে বয়লারটি বিকল হয়ে যায়। কিন্তু বহুদিন কারণটি গোপন রেখে তিনি সার উৎপাদনের অপূরণীয় ক্ষতি করেছেন। ঘোড়াশালে অবস্থানরত জাপানী বিশেষজ্ঞরা গবেষণা করে সম্প্রতি প্রকৃত কারণটি উদঘাটন করেছেন। কারখানাটি চালু করার জন্যে তাই বাংলাদেশ সরকারকে এক কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করে জাপানী বিশেষজ্ঞ আনতে হচ্ছে।

ইউরিয়া সার কারখানার প্রকল্প প্রধান সম্প্রতি জনৈক অফিসারকে তার সামনে ধূমপানের

অপরাধে সাসপেণ্ড করেছেন। ন্যায়সংগত বিচার চাওয়ার জন্যে তিনি আর এক অফিসারকে বদলি করে দিয়েছেন। গত ১লা মে সরকারী সিদ্ধান্ত থাকা সত্ত্বেও কারখানার প্রকল্প প্রধান শ্রমিকদেরকে মে দিবসের ছুটি প্রদান করেননি। পরে অবশ্য শ্রমিকদের প্রতিবাদের ফলে তিনি ২রা মে ছুটি দিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

কৃষক লীগের অপর নাম 'পাকিস্তান দালাল লীগ'

আগাম হাওলাতি টাকা না দিয়ে জমি চাষ এবং মেহনতি কৃষক ও সর্বহারার দু'বেলা অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থার দাবীতে যখন সারাদেশে মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ কৃষক সমিতি সোচ্চার, তখনই জোতদার মহাজনদের সহায়তার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়েছে কৃষক লীগ। জোতদার- মহাজন অধ্যুষিত কক্সবাজারের চকরিয়া থানার রাজাখালীতে গঠিত হয়েছে এমনি একটি কৃষক লীগ – যেখানে একজনও কৃষক সদস্য নেই। স্থানীয় এম-সি-এ জনাব আতাউর রহমান খানের উদ্যোগে গঠিত এই কৃষক লীগের যিনি সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন তিনি হলেন যুদ্ধকালীন পাক প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে মুসলিম লীগের প্রার্থী জালাল আহমদের সক্রিয় ক্যাডার জনাব বদিউল আলম। আইউবী মৌলিক গণতন্ত্রের একনিষ্ঠ সেবক, দীর্ঘ দশ বছরের মোনাফেক সদস্য বিশিষ্ট জামাত-পাণ্ডা সদস্য জনাব কালা মিয়া সিকদারকে বহাল করা হয়েছে এর সহ-সভাপতি পদে। আর সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন বিগত নির্বাচনে পিডিপি প্রার্থীর অন্যতম এজেন্ট জনাব নুরুল হক। কমিটির অন্যান্য কর্মকর্তারাও বিভিন্নভাবে মুসলিম লীগ, জামাত, পিডিপি এবং তথাকথিত শান্তি কমিটির সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন।

কৃষকহীন এই কৃষক লীগের বর্তমান কর্মসূচীর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে জোতদারের জমিগুলি চাষীদের মধ্যে বিশেষ সুযোগে এবং পূর্বে অবলম্বিত পন্থায় আগাম, হাওলাতি, নজর এবং সেলামী টাকা নিয়ে লাগিয়ত করা।

জোতদার- মহাজন এবং দালালদের নিয়ে গঠিত এই কৃষক লীগকে তাই রাজাখালীর জনগণ 'পাকিস্তান দালাল লীগ' নামে আখ্যায়িত করেছেন।

অনাহারে মৃত্যুর নজীর বেড়ে চলছে

অনাহারে মৃত্যু এখন বাংলাদেশে নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। ক্ষুধার তাড়নায় মানুষ এখন কচু ঘেচু, কলাগাছের কাঞ্জল প্রভৃতি অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে অসুখে ভুগে অহরহ মারা যাচ্ছে।

এমনি একটি মৃত্যু ঘটেছে টাঙ্গাইল থানাধীন হুগড়া গ্রামে। হাবেল নামের এই লোকটি দীর্ঘদিন কলাগাছের কাঞ্জল খেয়ে জীবনধারণ করছিল। ফলে কিছুদিন আগে তার বুকে ভীষণ যন্ত্রণা শুরু হয় এবং পরিণতিতে তার মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুর সময় সে স্ত্রী এবং পাঁচটি অসহায় সন্তান রেখে গেছে। তারাও এখন অনাহারে দিন কাটাচ্ছে।

ময়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছা থানাধীন গওরাসিয়া গ্রামের অমল চন্দ্র দাস সম্প্রতি অভাবের তাড়নায় আত্মহত্যা করেছে। রেশন তুলতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে সে ফাঁসি দিয়ে আত্মহত্যা করে। সে দুটি নাবালক সন্তান এবং স্ত্রী রেখে গেছে।

সম্প্রতি সিলেটের কুলাউড়া থানাধীন গইনকা গ্রামের দুটি তরুণ রইস আলী (১৪) এবং সাজিদ উল্লাহ (১১) অনাহারে মৃত্যুবরণ করেছে। এরা তিনদিন অনাহারে থাকার পর ক্ষুধার যন্ত্রণায় চতুর্থ দিনে কাঁচা কাঁঠাল খেতে বাধ্য হয়। সাথে সাথে অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে তারা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। পটুয়াখালীর মুজাগঞ্জ থানাধীন উত্তর চৈতা গ্রামের দিনমজুর আবদুল গফুরও সম্প্রতি অনাহারে মারা গেছে। এই এলাকার অন্যান্য অধিবাসীদের মতো সেও সরকারের খয়রাতি সাহায্যের উপর নির্ভর করতো। কিন্তু স্থানীয় কর্মকর্তারা খয়রাতি সাহায্যদানের পরিবর্তে আত্মসাত করতেই বেশী ব্যস্ত থাকায় জনগণের সাহায্য পেতে প্রায় এক সপ্তাহ দেরী হয়ে যায়। কয়েকদিন যাবৎ অভুক্ত আবদুল গফুর তাই ক্ষুধার দারুণ যন্ত্রণায় প্রাণ হারিয়েছে।

হক-কথা

২৬শে জৈষ্ঠ্য, শুক্রবার

পাটের রাজনীতি

পাটের মওশুম এসে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে গেছে পাটের রাজনীতি। দেশীয় যেমন তেমন বৈদেশিক খুব জমে উঠছে; গত বছরের গোড়ার দিকে জাতিসংঘের জনৈক বিশেষজ্ঞ এদেশের পাট সম্পদের উপর জরিপ করে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন, পাট হচ্ছে বাংলাদেশের সোনার খনি। কিন্তু প্রকৃতি আমাদেরকে যেমন এই অঢেল খনি দিয়েছে তেমনি দিয়েছে খনির রাজনীতি। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি যেমন তেল সমৃদ্ধ হয়েও তেলের রাজনীতিতে অভিশপ্ত হয়েছে তেমনি পাটখনিও কি বাংলাদেশের জন্যে বরে শাপ হবে?

'আমরা জানি সাবেক পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ এই পাট সম্পদকেই কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। ১৯৪৭-৪৮ সালে বিশ্বের উৎপন্ন পাটের শতকরা ৮০.১৭ ভাগ একমাত্র বাংলাদেশে উৎপন্ন হতো। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত: ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠী সুপরিকল্পিত পন্থায় বাংলাদেশের স্বার্থের পরিপন্থী পাটনীতি গ্রহণের ফলে ১৯৭০-৭১ সালে বিশ্বের পাট উৎপাদনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস পেয়ে শতকরা ৩৬.৩৮ ভাগে গিয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া পাটের বিকল্প যেমন আবিষ্কৃত হয় তেমনি ভারত, থাইল্যাণ্ড, নেপাল, বার্মা, ব্রাজিল, চীনের মূল ভূখন্ড এবং সোভিয়েত রাশিয়ায় পাটের চাষ ক্রমশ: জোরদার হয়। সমস্ত প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও ১৯৫৮–৫৯ সালে সাবেক পাকিস্তানের রফতানী বাণিজ্যের মোট আয়ের শতকরা ৭০.৫০ ভাগ পাট থেকে আসে। এই সময়ে সাবেক পাকিস্তানের রফতানী বাণিজ্যের মোট ১৩২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার মধ্যে পাট থেকে আয় হয় ৯৩ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা। অবশিষ্ট এই আয়ের সুফল বাংলাদেশ কোনদিনই লাভ করতে পারেনি। পারেনি এই কারণে যে, অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়ের উপর বাংলার মানুষের কর্তৃত্ব ছিল না। এই কারণে পাট চাষীদের ভাগ্যে সোনালী ফসল উৎপাদন করেও সোনালী দিনের প্রত্যাশী হওয়া ছিল অসম্ভব।

পাকিস্তান আমলে পাটের রাজনীতি হয়েছে। নিয়ন্ত্রিত হয়েছে পিণ্ডি থেকে। ঔপনিবেশিক শোষণ থেকে রেহাই পেয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হলে কি হবে, পাটের রাজনীতি দূর হয়নি। ইলিশ মাছ পেয়ে যেমন কোলকাতার বাজার সরগম হয়ে উঠেছে ঠিক তেমনি পাট পেয়ে ভারতের জং ধরা চটকলগুলো চাঙ্গা হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কেবল আমদানী- রপ্তানী হলে তো ভালই ছিল, কিন্তু তার চেয়ে ঢের গুণ বেশী হচ্ছে চোরাচালান। বাংলাদেশের চটকলগুলো অব্যবস্থা আর দুর্নীতিতে ভরে উঠেছে। অজ্ঞাত কারণে কলগুলো নির্দিষ্ট উৎপাদন ক্ষমতায় পৌঁছেছে না। আমাদের পাটশিল্পকে মজবুত বুনিয়াদের উপর গড়ে তোলে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতামূলক

বাজারে টিকে থাকবার মত পাটনীতি প্রণয়ন ও প্রয়োগ করা হচ্ছে না। তজ্জন্য দরকার পাট মন্ত্রণালয় ও পাট ব্যাঙ্ক। তৎসঙ্গে প্রয়োজন উন্নততর কৃষি ব্যবস্থা, বীজ সরবরাহ ও সুষ্ঠু উপায়ে বাজারজাতকরণ। পাট থেকে কি কি জিনিস উৎপাদন করা সম্ভব, এই বিষয়েও গবেষণার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। পাট শিল্পের সঙ্গে যেমন বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নিবিড়ভাবে জড়িত ঠিক তেমনি পাটের সঙ্গে এদেশের সর্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণ জনশক্তি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট। তাই বৈদেশিক প্রভাবমুক্ত পাট মন্ত্রণালয় ও পাট ব্যাঙ্কের মাধ্যমে পাট চাষী, পাট শ্রমিক, জুট বোর্ড, জুট মার্কেটিং কর্পোরেশন, জুট রিসার্চ ইন্সটিটিউট, জুট ট্রেডিং কর্পোরেশন ইত্যাদির উন্নতি ও কল্যাণকল্পে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। কিন্তু আমলাতন্ত্র, স্বজনপ্রীতি, ঢালাও দুর্নীতি সর্বোপরি ভারত ও রাশিয়ার কাঁচি-কাটা পরামর্শ আমাদের পাট শিল্পকে পাটের রাজনীতিতে রূপান্তরিত করছে। তাই যদি ঘটে, সেদিন কি খুব বেশী দূরে যেদিন বাংলাদেশের জাগ্রত জনতা পাট বিপ্লবের পথ ধরবে?

জাপান : মার্কিনী 'ওয়াচ ডগ'

ওরা হেরে জিতেছে। জাপান আর জার্মানীর প্রসঙ্গে এ মন্তব্য করেছেন আর্ণল্ড টয়েনবী। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সামরিক পরাজয় ঘটেছিল ওদের। পঁচিশ বছরের ব্যবধানে বিশ্বের প্রথম কাতারের অর্থনৈতিক শক্তি হিসাবে তাদের আত্মপ্রকাশ বিজেতাদের বিজয়কে ম্লান করে দিয়েছে।

বস্তুত: তাই। প্রাচ্যে জাপান। প্রতীচ্যে জার্মান। এ জাতি দুটি সমরবাদের চরম পর্যায়ে উপনীত হয়ে বিশ্বকে দুলিয়ে দিয়েছিল একবার। আজ অর্থনৈতিক প্রতিপত্তির শীর্ষে আরোহন করে তেমনি শঙ্কা আর ভীতির সঞ্চার করেছে তারা সমগ্র বিশ্বে। ওরা হেরেই জিতেছে।

উদিত সূর্যের দেশ জাপানের সম্রাট হিরোহিতো ঐতিহ্যের প্রাকার ভেঙে পিঞ্জরমুক্ত পাখীর মত উড়ে গিয়েছিলেন ইউরোপের সাতটি দেশ আর আমেরিকায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে বিশ্বশক্তি হিসাবে আত্মঘোষণার জন্যে আমেরিকানরা অনেকটা নিষ্প্রয়োজনে পারমাণবিক বোমার আতস পুড়িয়ে ধ্বংস করেছিল জাপানের নাগাশাকি ও হিরোশিমা জনপদ। ৭০ এর দশকের প্রারম্ভ বৎসরে মার্কিন ডলারের চরম সঙ্কটের সময়ে আলাস্কার উপকূলে শান্তি সাক্ষাতে নিক্সনের সাথে মিলিত হয়ে জাপ-সম্রাট হিরোহিতো বুঝি তারই পাল্টা জবাব দিয়ে ঘোষণা করেছিলেন, বিশ্বের অদ্বিতীয় অর্থনৈতিক শক্তি হিসাবে জাপানের আত্মপ্রতিষ্ঠার কথা!

দ্বিতীয় মহাসমরে আমেরিকার বিজয় লিখিত হয়েছিল দলিলে, ৭০-এর দশকে জাপানের বিজয় দলিলে লেখা হবে না।

পারমাণবিক বোমার মরণছোবলে ধ্বংসস্তূপে পরিণত প্রান্তরে অর্থনৈতিক পুনর্জাগরণের আন্দোলন শুরু হয়েছিল বছর পঁচিশেক আগে। এরই মধ্যে জাপানের বাৎসরিক জাতীয় উৎপাদন ৫০০০০ কোটি ডলারের মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্রের পর তৃতীয় অর্থনৈতিক শক্তি জাপান।

বৈদেশিক মুদ্রা তহবিলের দিক দিয়ে জার্মানীর পর জাপানের স্থান। তিন দশক আগে যে হতাশা গ্রাস করেছিল প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলবর্তী এ জাতিকে, আজ তা নেই। ৬০ –এর দশকব্যাপী মনে করা হতো, জাপান অন্তত: আরও তিনটি দশক নিজের বিক্ষত দশার স্মৃতি রোমন্থন কল্যাণমুখী আত্মপ্রতিষ্ঠায় ব্রতী থাকবে।

কিন্তু ৭০-এর দশকে সে ভুল ভাঙছে। জাপান তার লালনকর্তা মার্কিনীদের অর্থনৈতিক স্বার্থের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে আত্মপ্রকাশের সাথে সাথে ক্ষীণ ব্যতিক্রমসহ প্রভুর রাজনৈতিক শ্লোগানের প্রতিধ্বনি তুলছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর জাপানে প্রতিরক্ষা ও সামরিক নিরাপত্তার দায়িত্ব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্বহস্তে গ্রহণ করে, বিজয়ীয় এ দায়িত্ব গ্রহণ জাপানের জাতীয় সম্ভ্রমে সামান্য আঘাত হানলেও তার প্রতিরক্ষার ব্যয় কল্পনাতীতভাবে হ্রাস পায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে তার জাতীয় উৎপাদনের শতকরা ১০ ভাগ প্রতিরক্ষার জন্যে ব্যয় করতে হচ্ছে, এদিকে জাপান শতকরা ১ ভাগেরও কম ব্যয় করে প্রতিরক্ষার দায় সারছে। যক্ষশিশুর ন্যায় জাপান যে বুকে আশ্রয় নিয়েছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর, আজ সে যক্ষ কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে। জাপানীদের রপ্তানীকৃত প্রতি তিনটি পণ্যের মধ্যে একটি রপ্তানী হয় আমেরিকায়। আর এরই ফলশ্রুতিতে ১৯৬৮ সালে জাপান– মার্কিন বাণিজ্যিক লেনদেনে জাপানের আমেরিকার কাছে পাওনা হয় ১১০ কোটি ডলার। মার্কিন সংবাদপত্রে জাপানী পণ্যের বিজ্ঞাপনের বহর মার্কিন পণ্যকে বাজারে কোনঠাসা করে ফেলেছে। উৎকৃষ্ট মার্কিন পণ্যগুলি লাইসেন্সের ভিত্তিতে জাপানে উৎপাদন করে বিদেশে মার্কিন ব্যবসায়ের বাজার দখল করছে জাপানীরা। সবদিক দিয়ে আমেরিকা আজ ক্ষয়িষ্ণু। জাপান নবশক্তির উত্থিত নবারুণ। এশিয়ায় মার্কিন স্বার্থে শান্তি প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব আজ জাপানকে দেবার কথা ভাবছে আমেরিকানরা। দূরপ্রাচ্য হতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হবার আশঙ্কা একদিকে অপর দিকে যুদ্ধক্ষেত্রে গণশক্তির হাতে চূড়ান্ত পরাজয় বরণ– এ দুয়ের মধ্যবর্তী পন্থা হিসাবে জাপানকে শ্যাম চাচার প্রতিনিধি সাব্যস্ত করা ছাড়া আমেরিকার পথ নেই। চীন প্রসঙ্গে বক্তৃতাকালে আইচি বলেছেন, "দূরপ্রাচ্যকে নিয়তিভর দুর্যোগের মধ্যে ফেলে তাইওয়ানকে বহিকার করে গণচীনকে জাতিসংঘে আসন দান করা হলো।" অবশ্য তাইওয়ানকে উৎখাত করে চীন তার আসন পেয়েছে। তবু আইচির বক্তৃতা দূরপ্রাচ্যের ব্যাপারে জাপানের নতুন মাথা ব্যাথার উদাহরণ হিসাবে প্রকৃষ্ট। আরও উল্লেখ্য যে, ১৯৬৮-র পর তাইওয়ানের অদূরবর্তী চীনের একটি তৈল সমৃদ্ধ দ্বীপমালা দখলের জন্য জাপান পাঁয়তারা করছে, দক্ষিণ কোরিয়ার

'বন্ধু-পিতার' বদৌলতে শ্যামচাচা বাংলাদেশে ঠাঁই পেয়েছে এবার তার ওয়াচ ডগ কোন্ পথে আসবে?

মার্কিনবাহিনীর দায়িত্ব স্বস্কন্ধে তুলে নিয়ে। এক কথায় তিন দশককাল নিশ্চুপ থাকতে জাপান রাজী নয়। এখনই সে বৃহৎশক্তির মর্যাদা লাভ করতে আগ্রহী – সমাজতান্ত্রিক শিবিরের জঙ্গী অংশ একে বলছে সুপ্ত সাম্রাজ্যবাদের সমরবাদ।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, জাপানী জনগণ হঠাৎ করে বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হবার জন্যে লালায়িত হয়ে উঠেছে, না মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানকে দূরপ্রাচ্যের 'ওয়াচ ডগ' হিসাবে অভিষিক্ত করার পর্ব ত্বরান্বিত করতে চাচ্ছে? জাপানের বয়স্ক ব্যক্তিদের রক্ষণশীল অংশটি ব্যতীত ব্যাপক নবীন সমাজ, সোস্যালিস্ট ও কমিউনিস্ট আন্দোলন এবং র‍্যাডিক্যাল আন্দোলনে নিয়োজিত, ওকিনাওয়া দ্বীপ থেকে মার্কিনীদের হটাবার জন্যে দেশব্যাপী বিক্ষোভের ঢল বয়ে গেছে, বিদেশে হিরোহিতোকে শাসিয়েছে জাপানী ছাত্ররা, খবরদার – সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে পা দেবে না। এসব বাস্তব অবস্থাকে সামনে রেখে

বিচার করলে জাপানী জনগণের কাঁধে দোষ চাপানো যায় না।

জাপানের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী কিচি আইচি সরকারী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকাকালে বলতেন, জাপানের সামরিক শক্তি বলতে কিছু নেই। জাপানের উপর মার্কিন সামরিক দখলকারের সময় প্রবর্তিত শাসনতন্ত্র জাপানকে সামরিক শক্তি অর্জনের অধিকার দেয়নি। যদি এ নিষেধাজ্ঞা তুলেও দেওয়া হয়, তথাপি জাপানের নবীন বংশধরদের প্রগতিশীল আন্দোলন ও জনমতের বাধা ডিঙ্গিয়ে জাপান কিছু করতে পারবে না। দূর প্রাচ্যের প্রহরী হিসাবে তার ভূমিকা গ্রহণের সম্ভাবনা তাই নেই বললেই চলে।

আইচির সহকর্মীরা বলেছেন, জাতীয় উৎপাদনের দিক দিয়ে জাপান বিশ্বের তৃতীয় হলেও মাথা পিছু আয়ের দিক দিয়ে তার স্থান বিশ্বে ২৯ তম। এক চতুর্থাংশ বাড়ীঘর এখনও সরবরাহকৃত পানির সুযোগ পায়নি, দশটির মধ্যে একটি ঘরে রয়েছে স্যানিটারী টয়লেট। জাপানে রাস্তাঘাট, ময়লা নিষ্কাশন পয়: প্রণালী ও অন্যান্য সুবিধা গড়ে তুলতে হবে।

জীবনধারণের মানোন্নয়নের জন্যে জাপানকে অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকতে হবে বহুকাল। আইচি বলেছিলেন, জাপানের জনসাধারণ যদি বৃহৎশক্তির মর্যাদা অর্জনের জন্যে একান্ত উদগ্রীব হয়ে পড়ে, তবু এশিয়ার অন্যান্য জাতি জাপানের বর্ধিত সামরিক ভূমিকা মেনে নেবে না। ১৯৪০-এর দশকে জাপানের অভিযানবাদী ভূমিকার ক্ষত তাদের এখনো শুকায়নি। এশিয়া তথা পূর্ব এশিয়ায় শক্তির ভারসাম্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কমিউনিস্ট চীনের মধ্যেই বিরাজ করবে।

কিচি আইচি একথা বলেছিলেন ১৯৬৮ সালে। এবার তিনি জাপানী প্রতিনিধি দলের নেতা হয়ে গিয়েছিলেন জাতিসংঘে। রিপাবলিকান দলীয় প্রেসিডেন্ট নিক্সন এশিয়ায় বিচ্ছিন্নতা এড়াবার চেষ্টায় চীনের সাথে তাইওয়ানের মূল্যে যে বন্ধুত্ব গড়ে তুলছেন, তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হবে ভিয়েৎনাম থেকে অন্তত: মার্কিন স্থলবাহিনীর বিদায়। এ ক্ষতি অংশত: পুষিয়ে নেবার জন্যে জাপানকে দায়িত্বদানের ব্যাপারে হোয়াইট হাউসের আয়োজন এ রকম অপরিহার্য বলেই মনে হয়।

তাই সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, জাপানকে 'আত্মরক্ষা বাহিনী' সংগঠনে ব্যাপৃত দেখা গেছে। মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব মিঃ উইলিয়াম রজার্সের সাম্প্রতিক একটি মতবাদের আলোকে জাপানের আত্মরক্ষা ফৌজ সংগঠন অতীব তাৎপর্যপূর্ণ। রজার্স বলেছেন. '৭০-এর দশকে আধুনিক পারমাণবিক মারণাস্ত্র প্রয়োগের যুদ্ধ সংঘটিত হবে না। এশিয়াব্যাপী প্রচলিত অস্ত্রশস্ত্রের যুদ্ধ চলবে। 'দ্বিতীয় মহাসমরে জাপানী রাজকীয় বাহিনী যে অস্ত্রে যুদ্ধ করতো তারই অত্যাধুনিক প্রচলিত সংস্করণে সজ্জিত হয়েছে ৩ লক্ষাধিক জাপ সেনা।'

জাপান নিজের বাহিনীর জন্যে রাইফেল থেকে ট্যাঙ্ক, কামান থেকে শুরু করে এফ ১৪০ জেও, এক্সটি-২ জঙ্গী ও বোমারু বিমান নির্মাণ করছে। সহজেই পারমাণবিক অস্ত্র বহনের জন্যে রূপান্তরযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র উৎপাদিত হচ্ছে জাপানে।

জাপান রণসজ্জায় সাজছে, এর মাত্রা কত ত্বরিৎ, তা নিয়ে জাপানের উর্ধতন মহলে বিতর্কের অবকাশ থাকলেও এশিয়াবাসী সে ব্যাপারে নিঃসন্দেহ। কট্টর জাতীয়তাবাদের চেতনা থেকে ত্রিশ উর্ধ্ব বয়সের লোকেরা রণসজ্জায় উৎসাহ দিচ্ছে। আইচি নিজেই বলেছেন "মাত্র দশ বছরের মধ্যে জাপানের প্রতিরক্ষা বাজেট মোটামুটিভাবে কমিউনিস্ট চীনের প্রতিরক্ষা বাজেটের অঙ্কের নাগাল পেয়েছে।"

মার্কিন কুটনীতিকরা অবশ্য এসব সত্য চেপে যেতে চান। এশিয়ায় 'আইন-শৃঙ্খলা' বজায় রাখার পুলিশী দায়িত্ব পালনের ভার জাপানের উপর ছেড়ে দেওয়া সম্ভব, এটাকে তারা বলেন এক অকল্পনীয় কেচ্ছা। উদাহরণ হিসেবে তারা বলেন; 'কোরিয়ার কথাই ধরুন। দক্ষিণ কোরিয়া কমিউনিস্ট উত্তর কোরিয়ার ভয়ে মরছে। তবু তারা কি ৫০০০০ মার্কিন সৈন্যকে সরিয়ে তথায় ৫০০০০ জাপানী সৈন্য মোতায়েন করতে চাইবে? অবশ্যই নয়।' মার্কিন কূটনীতিকদের একথা সত্য। তবে জাপানের রণসজ্জা সম্পর্কে তাদের বেজায় খুশী ভাবটা অন্য প্রসঙ্গে প্রকাশ হয়ে পড়ে, তারা বলেন, জাপানকে নিয়ে কমিউনিস্ট চীন, রাশিয়া ও কোরিয়া হৈ চৈ থেকে বুঝা যায়, জাপানকে দেখে কমিউনিস্টদের টনক নড়েছে।

সমরবাদ শুধু বিদেশের ভয়ের কারণ নয়, দেশেরও। উগ্র স্বাদেশিকতা ও সাম্রাজ্য-পূজায় জাপানীরা অন্ধ হতে চায় না, ৩০- এর দশকে ফিরে যেতে নারাজ জাপানের শতকরা ৬০ জন লোক। তাদের ৪০ জন মধ্যবিত্তের ন্যায় চলমান গণতন্ত্র আর ২০ জন সমাজতন্ত্রের পক্ষপাতি। হিরোসিমা, নাগাসাকি সৃষ্টি করেছে দুই ধরনের প্রতিক্রিয়া: একটা ভয় অপরটা প্রতিহিংসা। বুড়োরা ভয় পায়, আমেরিকার কথা না শুনলে আবার এটম ফাটবে। তরুণরা এটমের প্রতি ঘৃণাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমগ্র অবয়বে মাখিয়ে শ্লোগান হাঁকছে : নিপাত যাক মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ।

চীন আর উত্তর কোরিয়া অভিযোগ তুলেছে : জাপানী জনগণ ভাল। ওদের সাথে আমাদের বিরোধ নেই। বরং দেশে দেশে জনতার কাতারে ঐক্য গঠনের আমরা পক্ষপাতি। কিন্তু ক্ষমতাসীন (তাদের ভাষায় প্রতিক্রিয়াশীল চক্র, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সেবক, এশিয়ায় মার্কিন পোষা কুকুর) মহল বড় বড় পুঁজিপতিদের (মনোপলি, কার্টেল, সিণ্ডিকেট) সাথে হাত মিলিয়ে জাপানী জনতার পরিশ্রমে অর্জিত সম্পদকে সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্যে যুদ্ধে পুড়াতে চাইছে, জাপানের প্রগতিশীল যুবকদের যুদ্ধে পাঠিয়ে কামানের খোরাক বানাতে চাইছে।

এ অভিযোগের ভিত্তি যে নেই তা নয়। ডাম্পিং ব্যবসায়ে জাপানের সাথে জুড়ি নেই কারো। দেশে দেশে স্থানীয় শিল্প ধ্বংস করে বাজারের প্রসার ঘটায় তারা। ইদানিং সাহায্যদাতার বেশে দেশগুলিতে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের চেষ্টায় তারা মশগুল। কিন্তু জাপানের বড় বড় মনোপলি ও কার্টেলগুলির বাজার, কাঁচামাল, যোগানো দেশান্তরী শিল্প স্থাপনের প্রয়োজনে আধা দখলীকৃত অঞ্চল চাই, যে অঞ্চলে অন্য কারো প্রতিপত্তি থাকবে না। আত্মরক্ষী বাহিনীর নামে বিশাল এক রাজকীয় বাহিনী সংগঠনের ইচ্ছায় তারা অকাতরে অর্থ ব্যয় করে। শাসনতন্ত্র সংশোধন করে সমরবাদ পুনরুত্থানের জন্যে আন্দোলনের ডাক দিয়ে গোপন সংস্থার মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী আবেদনের প্রচারপত্র বিলি করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ফেরত সামরিক অফিসারদের অধিকাংশকে মোটামুটি বেতনে "স্পোর্টসম্যাস পুষবার কায়দায়" নিজেদের ফার্মে নিয়োজিত করে। এদের বৈকালিক কাজ হলো, ফুটবল খেলার ক্লাবের মত বিভিন্ন নামের ক্লাবে বসে আত্মরক্ষী বাহিনীর গুণকীর্তন, যুদ্ধের শৌর্য-বীর্যের প্রশংসা করা এবং ধীরে ধীরে স্বেচ্ছসেবী সশস্ত্র ইউনিট গড়ে তোলা। সম্রাট হিরোহিতোর প্রতি আনুগত্য গোষণা করে প্রকাশ্যেই এটা করা যায়।

দ্বিতীয় পথটি অর্থনৈতিক সাহায্যদানের। ১৯৬২ সাল থেকে জাপান মহাজনী ব্যবসা শুরু করেছে। বছরে লগ্নি বাড়ছে শতকরা ২৩ ভাগ করে। যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানীর পর জাপানই সবচাইতে বড় মহাজন। এদিকে আইসেন হাওয়ারের পদাঙ্ক অনুসরণ করে রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ড নিক্সন দ্বিতীয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৯০০০০ কোটি ডলার জাতীয় আয়ের শতকরা একশ' ভাগের অর্ধেক হারে বৈদেশিক সাহায্য সরবরাহ করে, জাপান

৫০০০০ কোটি ডলারের শতকরা ১ ভাগ অর্থাৎ ৫০০ কোটি ডলার ঋণ হিসাবে বিতরণ করবে প্রতি বছর। নবগঠিত এশীয় ব্যাঙ্কে জাপান ২০ কোটি ডলারের শেয়ার কিনেছে আরও ১০ কোটি ডলার প্রদান করেছে বিশেষ তহবিলে, বিশ্বব্যাঙ্কে তার চাঁদা ৭৭ কোটি ২৬ লক্ষ ডলার। দূরপ্রাচ্য ও এশীয় অর্থনৈতিক হাইকমিশন ইকফের মধ্যে জাপানের ভূমিকা মুখ্য। এ সংস্থার মাধ্যমে উন্নয়ন ও খনিজ সম্পদ আহরণে জাপান প্রধান মুরুব্বী। এছাড়া এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় পরিষদ (আসপাক) নামে একটি রাজনৈতিক আঞ্চলিক সংস্থা গড়ে ওঠেছে জাপানের নেতৃত্বে মার্কিন ভক্ত দেশেগুলিতে।

জাতিসংঘে গণচীনের আসন জঙ্গী কমিউনিস্টদের বিজয় হিসাবে চিহ্নিত হবে। আর এ পরিপ্রেক্ষিতে আমেরিকা এশিয়া নিয়ে বেশী মাতামাতি করবে না। সে অবস্থায় এশিয়া, বিশেষতঃ দূরপ্রাচ্যে কমিউনিস্টদের ঠেকাবার জন্যে জাপানই হবে একমাত্র নির্ভরযোগ্য শক্তি। চীনের প্রতিপক্ষে দাঁড়িয়ে এশিয়ায় হানাহানিতে জাপানকে পুনরায় লিপ্ত হতে দেখা যাবে কিনা তা নির্ভর করে জাপানের অভ্যন্তরে সমরবাদ বিরোধী আন্দোলন ও এশিয়াব্যাপী জাপ-সমরবাদ বিরোধী আন্দোলনের ব্যাপ্তি ও স্থায়িত্বের ওপর।

১৯৬৮ সালে জাপানের শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তারা বলেছিলেন, সব ব্যাপারে দুই একটা বছর আমরা নিশ্চুপ থাকবো। জাপান তাই থেকেছে। দুই বছর কেটে গেছে। প্রতিবেশীদের শান্তি ও নিরাপত্তার জন্যে জাপান তার অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তিকে কাজে লাগাবে কি? না, এশিয়ায় বিচারবুদ্ধিহীন আরেকটি হানাহানির জন্ম দেবে জাপান? কার্লটি ওরয়ান বলেছেন, শুধু এশিয়া নয়, সমগ্র বিশ্ব একটি প্রশ্নের উত্তর চেয়ে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে, জাপান তুমি কি নিদ্রোতি দানব?

পাঠকের অভিমত

সি. আই. এ-র চরদের নবরূপ

সি. আই. এ-র চরদের নবরূপে দেখতে পাচ্ছি এই বঙ্গভূমিতে। এটা হচ্ছে এমন এক রূপ যা দিয়ে 'চোর সাধু সেজে সাধুকে চোর সাজাবার' মত। তা না হলে মওলানা ভাসানীর মত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী নেতাকে কেউ যে, সি, আই, এ-র দালাল বলতে পারে এ ধারণা কারও মনে স্বপ্নেও ছিল কিনা সন্দেহ। আমরা আজ যে জিনিষটা দেখতে পাচ্ছি তা হলো সাম্রাজ্যবাদ পৃথিবীর মানুষের কাছে ঘৃণিত। সারা দুনিয়ার মানুষ সাম্রাজ্যবাদের মুখে তাদের ঘৃণার থুথু নিক্ষেপ করছে। বাংলাদেশের মানুষ সাম্রাজ্যবাদ বিশেষ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কার্যকলাপ খুব ভালভাবেই জানে। এই অবস্থায় সি, আই, এ তাদের কাজ তাদের দালালদের মাধ্যমে করাতে গিয়ে দালালদের মুখ থেকে সি, আই, এ-কে তথা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে গালাগালি করাচ্ছে। জনতার মাঝে সাধুর বেশে মুখে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জপ আর গায়ে সমাজতন্ত্রের নামাবলি নিয়ে জনতাকে ধোঁকা দিচ্ছে। কিন্তু খুব কি সাফল্য লাভ করতে পারছে? আমার তো মনে হয় না। কারণ, বাংলাদেশের জনসাধারণ খুব ভাল করেই জানেন যে, মওলানা ভাসানী আর যাই করুন না কেন সি. আই, এর দালাল হতে পারে না। কোন দল ৬৯-এর আন্দোলনের আগেও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সম্বন্ধে মুখে কিছু বলতে প্রাণে ব্যাথা পেত তা বাংলাদেশের মানুষ খুব ভালভাবেই জানেন। এইসব 'ছেলে মানুষি' 'রাজনৈতিক ধোঁকা' দিয়ে কি বাংলাদেশের সচেতন মানুষের মন অন্যদিকে নেওয়া যাবে?

আবার বাংলাদেশের সেই দৈনিক 'হক-কথা' বের হওয়ার পিছনে সি আই এ টাকা খাটিয়েছে বলেও কটাক্ষ করা হয়েছে। একটা সাপ্তাহিক বের করতে কি সি আই এর সাহায্য দরকার? তাহলে একটা দৈনিক পত্রিকা বের করতে কার সাহায্যের দরকার? ও সেখানে বুঝি 'মামা' আছেন। না 'মামার মামা'ও সাহায্য করেছে। আমরা তো খুব ভাল করে জানি এমন কোন বাবার তালুক বা নিজের তালুক বা শ্বশুরেরও তালুক নাই যা দিয়ে রাতারাতি একটা দেনিক কাগজ চালান যায়। তবে হ্যাঁ, 'মামুর জোর' আছে। এবং মামুরও আবার তার মামুর জোর আছে যা দিয়ে একটা দেনিক চালান যায় এবং তাতে নিজের ইচ্ছামত যা ইচ্ছা তাই লেখা যায় এবং এদেশের সাধারণ মানুষের কাছে দেশপ্রেমিকদেরকে সি. আই. এ-র দালাল সাজাবার 'ব্যর্থ চেষ্টা' করে নিজেদেরই মুখোশ খুলে ফেলা যায়।

অমল কান্তি ঘোষ, বাংলা বাজার, ঢাকা।

আপনার চিঠি

॥ ১ ॥

ডাক বিভাগীয় কর্মচারীদের আবেদন

জনাব সম্পাদক সাহেব,

আমরা ডাক বিভাগীয় সর্বনিম্ন শ্রেণীর কর্মচারীরা (ব্রাঞ্চ অফিসের পোষ্টমাষ্টার, ডাকপিয়ন ও ডাক হরকরা) বিগত বহু বছর যাবত মাসিক মাত্র ২৪ টাকা ৮৫ পয়সা বেতনে চাকরি করে আসছি। কর্তৃপক্ষের নিয়ম অনুমানুযায়ী কাজের সময় সকাল ৮টা থেকে ১২টা পর্যন্ত হলেও, প্রকৃতপক্ষে আমাদের কাজ করতে হয় আড়াইটা পর্যন্ত। তাছাড়া অফিসের কাজের জন্যে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন জিনিষের খরচও অনেক সময় আমাদেরকেই বইতে হয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে ও পরে কয়েকবার ডাক বিভাগের কর্মচারীদের বেতন বাড়লেও আমাদের অন্যদিকে জিনিষপত্রের অগ্নিমূল্যের ফলে আমাদের অনেকে অনাহারেও মারা যাচ্ছে।

সরকারের প্রতি তাই আমাদের আকুল আবেদন, অনুগ্রহ করে বেতন-বৃদ্ধি, রিলিফ ও রেশন এবং অন্যান্য সুবিধের ব্যবস্থা করে ডাক বিভাগের নিম্ন শ্রেণীর কর্মচারীদের নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করুন।

নিবেদক-

ডাক বিভাগের বঞ্চিত কর্মচারীবৃন্দ।

॥ ২ ॥

ফেরত শরণার্থীর ফরিয়াদ

জনাব সম্পাদক সাহেব,

আমরা ভারত হইতে প্রত্যাগত প্রায় একশত শরণার্থী পরিবার কুমিল্লা জেলার চৌদ্দ গ্রাম থানার অন্তর্গত রায়কোট যজ্ঞশাল গ্রামের অধিবাসী। এতদঞ্চলে বর্বর পাক-বাহিনী কর্তৃক নির্বিচার হত্যা ও গৃহাদিতে অগ্নিসংযোগ যখন চলিতেছিল তখন আমরা প্রাণভয়ে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করি। আমাদের অনুপস্থিতির সুযোগে স্থানীয় দুস্কৃতিকারীরা যে সমস্ত গৃহাদি ও জিনিষপত্র পাক-বাহিনীর আগুন ও লুণ্ঠন হইতে রক্ষা পাইয়াছিল সে সমস্ত লুটপাট করিয়া লইয়া যায় এবং সমগ্র সমৃদ্ধশালী পাড়াটি একেবারে ধূলিস্যাৎ করে। বাস্তুভিটার চিহ্নিতমাত্র ছিল না- আমাদিগকে খোলা জায়গায় আশ্রয় শিবির তৈয়ারী করিতে হয়। এই পর্যন্ত অনেকের পক্ষে সাধারণভাবে বাসের উপযোগী 'চালা' উঠানও সম্ভব হয়

নাই। বর্ষা সমাগত। তদুপরি গতবারে ফসল না পাওয়ায় অনেকেই অর্ধহারে-অনাহারে দিন কাটাইতেছে। রিলিফের সুব্যবস্থা নাই বলিলেই চলে। জানুয়ারী হইতে এপ্রিল পর্যন্ত রিলিফ বলিতে চার মাসে মাত্র দুইবার মাথাপিছু চাউল একসের ও গম দুইসের পাওয়া গিয়াছে। কাহারো ভাগ্যে একশত টাকা ও কাহারো ভাগ্যে ত্রিশ টাকা জুটিয়াছে। তাহাতেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাঁচ টাকা করিয়া চাঁদা কাটিয়া রাখা হইয়াছে। এই ছিন্নমূল সর্বহারাদের অতি শীঘ্র পুনর্বাসনের এবং ভবিষ্যত ফসল না আসা পর্যন্ত আহারের ব্যবস্থা করার জন্য আমরা সদাশয় বাংলাদেশ সরকারের নিকট প্রার্থনা জানাইতেছি।

বিনোদ বিহারী আচার্য্য
গ্রাম- রায়কেট
পোঃ- বঙ্গড্ড বাজার
জিলা– কুমিল্লা

॥ ৩ ॥

রেসকোর্সের নাম

জনাব সম্পাদক সাহেব,

ইদানিং রেসকোর্স ময়দানকে সোহরাওয়ার্দি উদ্যান নামে সরকারী প্রচারযন্ত্রে ঘোষণা করা হচ্ছে। আমি সরকারের কাছে আবেদন করছি যে, এই রেসকোর্স ময়দানকে স্বাধীনতা উদ্যান নামে ঘোষণা করা হোক। কারণ, এই ময়দানে ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ শেখ মুজিবর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন (এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম)। এই ময়দানে নিয়াজী আত্মসমর্পণ দলিলে পাকিস্তানের পারাজয় ঘোষণা করে স্বাক্ষর করেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এই ময়দান যে বিশেষ স্থান অধিকার করেছে তা বলা বাহুল্য। অপ্রিয় হলেও এ কথাটি সত্যি যে বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদের উন্মেষে সোহরাওয়ার্দি সাহেবের ভূমিকা বিতর্কমূলক। এ কথা কি সত্যি নয় যে, সোহরাওয়ার্দি সাহেব পাকিস্তানের একটি শক্তিশালী কেন্দ্র চেয়েছিলেন? বাংলাদেশ- তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানকে পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন দিতে তিনি অনিচ্ছুক ছিলেন। মওলানা ভাসানী যখন পূর্ব পাকিস্তানের জন্যে স্বায়ত্বশাসন দাবী করেছিলেন তখন প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দি সাহেব করাচীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছিলেন "East Pakistan has got 98% provincial autonomy and provincial autonomy is a political stump."পরিশেষে আমি এ কথা বলতে চাই যে রেসকোর্স ময়দান বাংলাদেশের একটি ঐতিহ্যবাহী ময়দান। কোন রাজনৈতিক নেতার নামের সঙ্গে একে যুক্ত করে এর ঐতিহ্যকে খর্ব করার অপচেষ্টা থেকে বিরত থাকতে আমি সরকারকে অনুরোধ করছি এবং এই ঐতিহ্য রক্ষার্থে ময়দানটির নাম 'স্বাধীনতা উদ্যান' রাখার জন্যে দাবী জানাচ্ছি।

বিনীত–
মোহাম্মদ সাজ্জাদ নুর
৫/১ ইস্কাটন গার্ডেন সড়ক
ঢাকা – ২, বাংলাদেশ।

মুরিদের দরবার

ব্যক্তিগত মালিকানা

মুসলিম অধ্যুষিত দেশে সমাজতন্ত্র কায়েমের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীল চক্র ও সাম্রাজ্যবাদের দালালরা কখনো গোপনে কখনো প্রকাশ্যে প্রচার করে বেড়ান–ইসলামে ব্যক্তিগত মালিকানার অবকাশ রয়েছে। তাই সমাজতন্ত্র মুসলমানের জন্যে বিষবটিকা বৈ কিছু নয়। আগেও ছিল আজও প্রচ্ছন্নভাবে বাঙলাদেশে এই প্রবণতা রয়েছে। তাই আলোচ্য নিবন্ধ।

ইসলামে ব্যক্তিগত মালিকানার স্বীকৃতি নেই, ব্যক্তিকে আল্লাহ যে অধিকার দিয়েছেন তা ব্যক্তিমালিকানার অধিকার নয়। সম্পদে মালিকের যে যে অধিকার আছে বলে ব্যবহার শাস্ত্রবিদেরা স্বীকার করেছেন, আল্লাহ মানুষকে সে সব অধিকার দেননি। মালিক সমাজের কারো ক্ষতি না করে আপন খুশিমত সম্পদ ব্যবহার করতে পারে, ব্যবহার না করতে পারে, অপব্যবহার করতে পারে ও ইচ্ছানুসারে হস্তান্তর করতে পারে। কিন্তু ইসলামে এসবের স্বীকৃতি নেই। সম্পদ আল্লাহর ইচ্ছানুসারে ব্যক্তি এবং সমাজের কল্যাণে ব্যবহৃত হবে। ইসলাম ব্যক্তিকে সম্পদে যে অধিকার দিয়েছে তা স্থায়ী অধিকার নয়; কারণ, ব্যক্তিগত মালিকানার উপদানগুলোর স্বীকৃতি ইসলামে নেই। ইসলাম ব্যক্তিকে সম্পদের যে অধিকার দিয়েছে তা হচ্ছে সম্পদের ব্যক্তিগত আমানতদারীর অধিকার। ব্যক্তির কাছে আল্লাহর সম্পদ আমানত হিসাবে থাকে। সেই সম্পদে ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে এবং সীমিত ভোগ দখলের অধিকার শুধু ইসলাম স্বীকার করে।

আল কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আল্লাহ্‌র মালিকানা ঘোষিত হয়েছে। আল্লাহ বলেনঃ

"অবশ্যই জমিন আল্লাহর; তিনি তার বান্দাদিগের মধ্য হতে যাকে ইচ্ছা তাকে উত্তরাধিকার দান করেন"।

অনুরূপভাবে অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

"তিনি সেই প্রভু যিনি দ্যুলোকে এবং ভুলোকে যা কিছু আছে সব কিছুরই মালিকঃ বস্তুর কঠোর দন্ডের আবদার কাফেরদিগের জন্য।"

"আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব কিছুর মালিক আল্লাহঃ তোমাদের মনে যা আছে তা তোমরা গোপন কর বা প্রকাশ কর, সব কিছু সম্বন্ধেই আল্লাহ্ হিসাব নেবেন।"

"যা কিছু পৃথিবীতে আছে তিনিই তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন"

"তিনি প্রাণীসমূহের জন্য জমিনকে বিন্যস্ত করেছেন।"

আল কুরআনের উপরোক্ত আয়াতসমূহ হতে আল্লাহর মালিকানা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষিত হয়। বিশ্ব জগতে যা কিছু আছে সব কিছুর মালিক একমাত্র আল্লাহতায়ালা। মানুষ এ পৃথিবীতে বিশ্বপালকের খলিফা বা প্রতিনিধি মাত্র। খলিফা বা প্রতিনিধি মূল মালিকের সম্পদ তত্ত্বাবধান করবে এবং তার নির্দেশমত সম্পদ ব্যবহার করবে।

আল্লাহ্‌র মালিকানার বিশেষত্ব

আল্লাহ বিশ্বের সমস্ত জীবের 'রব্' বা প্রতিপালক এবং জীবজগতের স্রষ্টা হিসেবে তাঁর সম্পদে প্রতিটি সৃষ্ট জীবের অধিকার আছে। বাঁচবার অধিকার জীবের সর্বপ্রধান এবং মৌলিক অধিকার। জীবনধারণের জন্যে, বেঁচে থাকার জন্য আল্লাহর সৃষ্ট সম্পদে সৃষ্টির সমস্ত জীবেরই অধিকার রয়েছে– সম্পদ তার তত্ত্বাবধানে থাকুক বা না থাকুক।

আল্লাহ্‌র মালিকানার অর্থ এ নয় যে আল্লাহ সৃষ্ট সম্পদ ভোগ করবেন। আল্লাহ্ সম্পদ সৃষ্টি করেছেন তার সকল সৃষ্টির জন্যে, আল কুরআনের আয়াতে তা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হচ্ছে। আল্লাহর মালিকানার অর্থ সৃষ্ট জীবের তত্ত্বাবধানে ও ভোগের আরো একটু সীমিত অর্থে সামাজিক তত্ত্বাবধানে ও ব্যবস্থাপনায় ভোগের অধিকার।

রাষ্ট্রীয় সমস্ত সম্পদে ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধানের কর্তৃত্ব স্বীকৃত হয়েছে। ব্যক্তিগত আমানতদারীতে যে সম্পদ থাকবে তার হেফাজত ভোগ এবং তত্ত্বাবধানের একচ্ছত্র

অধিকার কোন ব্যক্তির থাকে না। বৃহত্তর সামাজিক এবং জাতীয় স্বার্থে খলিফা বা ইমাম ব্যক্তিগত আমানতে রক্ষিত সম্পদ তার কর্তৃত্ব আনতে পারবেন, তবে–

"বিশেষ এবং সংগত কারণ ভিন্ন ইমাম কাউকে কোন ব্যক্তিগত অধিকার হতে বঞ্চিত করতে পারবেন না।"

শর্ত হচ্ছে সংগত এবং কল্যাণজনক কারণ। সংগত বা কল্যাণমূলক কাজে ইমাম ব্যক্তিগত আমানতদারীতে রক্ষিত সম্পদ হতে ব্যক্তিকে বঞ্চিত করতে পারবেন।

অভাব-অনটনে যারা আছে, অনাহারে-অর্দ্ধাহারে যাদের কালাতিপাত করতে হয়, তাদের জন্য ইমাম অপরকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ হতে বঞ্চিত করতে পারবেন।

একদিকে প্রাচুর্য, অপরদিকে দুঃসহ দারিদ্র, একদিকে ধনীর বিলাসিতা অপরদিকে দরিদ্রদের হাহাকার–এ অবস্থায় ইসলামী রাষ্ট্রের খলিফা বা আমির নীরব দর্শকের ভূমিকা অবলম্বন করতে পারবেন না। ব্যক্তিগত মালিকানায় নিরন্ন ক্ষুধার্তকে সাহায্য করা ধনীর মহানুভবতা, উদারতা এবং করুণার পরিচায়ক; কিন্তু ব্যক্তিগত আমানতদারীতে তা হচ্ছে কর্তব্য। বিত্তশালীর নিকট হতে বিত্তহীন যা পাবে তা দান বা করুণা হিসাবে নয়, অধিকার হিসাবে।

প্রচলিত ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ যদি রাষ্ট্র সামাজিক কাজে গ্রহণ করতে চায় তবে তার জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। মালিক আদালতে ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন বা সরকার তা দিতে বাধ্য থাকবেন। কিন্তু ইসলাম কি ব্যক্তির এরূপ স্বীকৃতি দিয়েছে? ইসলাম ব্যক্তিকে সম্পদে অধিকার দিয়েছে সীমিত এবং শর্তসাপেক্ষে ভোগের; ব্যক্তি স্বীয় প্রয়োজনে এবং সামাজিক প্রয়োজনে তা ব্যবহার করবে। যদি কোন সামাজিক উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত আমানতভুক্ত সম্পদের প্রয়োজন হয় তবে ব্যক্তি তা প্রত্যার্পণ করতে বাধ্য থাকবে। কারণ, সে মালিক নয়, আমানতদার মাত্র; মালিকের অধিকার আছে ক্ষতিপূরণ দাবী করার, কিন্তু আমানতদারের সে অধিকার থাকবে না।

খলিফা উমর (রাঃ) হজরত আবু হুরায়ার সম্পত্তি সমাজাধিকারে নিয়ে আসেন; তখন ক্ষতিপূরণের কোন প্রশ্ন ওঠেনি। তেমনি আবু সুফিয়ানের পৈত্রিক সম্পত্তি রাষ্ট্রীয়করণ করার কালেও ক্ষতিপূরণের প্রশ্ন ওঠেনি। কারণ, তখনকার দিনে সম্পদের উপর ব্যক্তির একচ্ছত্র অধিকার স্বীকৃত হয়নি। সম্পদ ব্যক্তির অধীনে থাকলেও যেহেতু ব্যক্তিকে সম্পদের মালিক বলে স্বীকার করা হয়নি তাই ক্ষতিপূরণের প্রশ্নটি তখন ছিল না। ব্যক্তিকে সম্পদের মালিক স্বীকার করে নিলেই ক্ষতিপূরণের প্রশ্ন উঠে।

নিতান্ত পরিতাপের বিষয় বাঙলাদেশে ব্যক্তিকে সম্পদের মালিক স্বীকার করে নিয়েই ক্ষতিপূরণ দিয়ে জাতীয়করণ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশকে দ্বিতীয় মুসলিম প্রধান দেশ বলে গর্ব প্রকাশ করেছেন। কিন্তু ১৪০০ বছর পূর্বেই স্বীকৃত মুসলিম বিধান তিনি মানেননি।

(চলবে)

বয়েসেরা মিছিল তোলে

–সিকান্দার কবীর

বয়েসেরা মিছিল তোলে
হৃদয়ের রুদ্ধ দুয়ারে।
হাতে মশাল, মুখে
জোর দাবীর ধ্বনি।
বাইশের ক্লান্ত কেরাণী আমি।
বয়েসেরা মিছিল তোলে
কখনো বা মাথা ঠুকে মরে

ক্লান্ত কেরাণীর হৃদয়ের রুদ্ধ দোরে।
ভাগ্যের দেয়ালে ঝরে
নিরব ক্রন্দন।
একশ' দশের ক্লান্ত কেরাণী
রাত দিন হিসাব আর
হিসাব কষে কষে মরি।
মায়ের কাপড়, বাবার ওষুধ।
ভাইয়ের আকাশচুঁ ফিস।
নোতুন বউয়ের লজ্জার অবগুণ্ঠনে
নিরব দাবীর মিছিল।
আমি ক্লান্ত কেরাণী একশ' দশের
হিসাব কষে কষে মরি।
চাল নব্বই। বাজার সস্তুর।
নিজের হাতা কসা জামা
না হয় বিগত মাসগুলোর মত
আবারো ধরে রাখা যাক।
হিসেবের ছাড়পত্রটুকু
ছিঁড়ে ফেলি। কুচি কুচি করে।
চোখ দুটো মুছি আলগোছে।
এ দুটো না থাকলে বেদনার ভারে
ঘুমাত বা মরে যেতাম কবে
বয়েসেরা মিছিল তোলে
হৃদয়ের রুদ্ধ দুয়ারে।
একশ দশের ক্লান্ত কেরাণী।
রাত দিন শুধু হিসাব আর
হিসাব কষে কষে মরি।

আমার বিকলাঙ্গত্ব আর–হাজারো প্রশ্ন

শামসুজ্জামান লাবলু

ক্র্যাচের ঠক্ ঠক্ আওয়াজ
দেহের বিকলাঙ্গত্ব
আর–
আমার ডান হাতের আঙ্গুলগুলো
লুক থ্রো-এ
দেশকে ভালোবেসে
দেহকে বিচ্ছিন্ন করে
মাটির অমরত্ব আনিনি মোরা
ঐ ভোগ বিলাসীর তরে;
মোদের রক্ত, মোদের স্বপ্ন
ভূখানাঙ্গা, অত্যাচারিত
চিরকালের মজলুমের পরে।
পূর্বাণীর গো গো রুম।
কন্টির সাকী বার
আর–
হাজারো বাতির নীচে
কেন আজ হাসির ফোয়ারা;
স্বাধীনতা ঃ ত্যাগঃ
আর–
দেশপ্রেমিকতার ফল লাভে?
'বঞ্চিতেরা চিরকাল বঞ্চিত
লাঞ্ছিতেরা চিরকাল বঞ্চিত'
এ বাণী
আজি হতে রবে দূরে
ঐ পুরাতন পাঠ্যে।
বঞ্চিতের তাজা রক্তে
লাঞ্ছিতের ধর্ষিত বোনের
আর–
অত্যাচারিতের বজ্র বাণে
স্বাধীন এ দেশ,
তবু কেন বাংলার 'এরা'
পায়না সম্মান
রক্তের দাম !
নতুন করে আজ মোর
বিকলাঙ্গত্ব, ডান হাতের আঙ্গুল
আর–
কণ্ঠের ঐ বজ্র ধ্বনিতে
এ কোন্ অসুরের শক্তি?
ক্র্যাচের ঠক্ ঠক্ আওয়াজ
দেহের বিকলাঙ্গ
আর–
আমার ডান হাতের আঙ্গুলগুলো
লুক্ থ্রো-এ
কেন আজ এ হাজারো প্রশ্ন??

প্রধানমন্ত্রী সমীপে
'গণশক্তি সুহৃদের' খোলা চিঠি

গত ৩০ শে মে দিনগত রাত ২টায় যুগপৎ গণশক্তির সম্পাদক মোহাম্মদ তোয়াহা সাহেব এবং ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হাবিবুর রহমান সাহেবের বাড়ী (যুগীনগর ও জিঞ্জিরা) বিনা নোটিশে অপ্রত্যাশিতভাবে সরকারী পুলিশ বাহিনী ঘেরাও করে তাল্লাসী চালায় ও তছনছ করে। সবচেয়ে অপ্রিয় ব্যাপার এই যে, প্রচলিত আইন-কানুনের সম্পূর্ণ বরখেলাপ করে তোয়াহা সাহেব ও হাবিবুর রহমান সাহেবের সকল প্রকার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি আটক করা হয়। শুধু তাই নয় 'বেনামী' সম্পত্তির ছুতায় তোয়াহা সাহেবের স্ত্রী ও বিধবা কন্যার সম্পত্তি আটক করা হয়। তাঁর এই কন্যার স্বামী প্রফেসর ফজলুল হককে পাক-বাহিনী নির্মমভাবে হত্যা করেছিল।

সেই রাত্রে ২টার সময় তোয়াহা সাহেবের বাড়ীতে তাঁর দুই কন্যা ছাড়া আর কেউ ছিলেন না। তাদের মা দেশের বাড়ীতে ছিলেন। তোয়াহা সাহেবের বড় মেয়ে শহীদ ফজলুল হকের ২৩/২৪ বছরের বয়স্কা বিধবা স্ত্রী, তার শিশু সন্তান ও ১৮ বছর বয়স্কা ভগ্নীকে বাড়ী ছেড়ে এক কাপড়ে চলে যাবার নোটিশ দেওয়া হয়। যাহোক, যাবার জায়গার অভাবে তারা সে রাত বাড়ীতেই থাকতে বাধ্য হয়।

৩১ তারিখ সকালে তাদের থানায় নিয়ে যাওয়া হয়, পরে বিকালে থানা থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু বলা হয় তারা বাড়ী থাকতে পারবে না। বাড়ীর জিনিষপত্রের তালিকা তৈরী ও এদের বাড়ী থেকে চলে যাবার হুকুমজারীর জন্যে ফার্ষ্টক্লাশ ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ অফিসার সেই বাড়ীতে যায়। মেয়েরা জানায় যে এ বাড়ী তাদের মা বহু আগে সরকারের কাছ থেকে ১০০ বছরের জন্যে 'লিজ' নিয়েছিলেন এবং তিনি সরকারকে নিয়মিত ভাড়া দিয়ে যাচ্ছেন। মেয়েরা বাড়ী সংক্রান্ত সমস্ত কাগজপত্র ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে দেয়। কাগজপত্র দেখে ম্যাজিষ্ট্রেট স্বীকার করেন যে মেয়েদের বক্তব্য সত্য।

২৩/২৪ বছর বয়স্কা একজন শহীদের স্ত্রী ও তার ভগ্নীকে এভাবে বেআইনী হয়রানী সরকারের জুলুমবাজীর এক নগ্ন নিদর্শন।

'গণশক্তি' অফিস যেভাবে তালাবন্ধ করে দেওয়া হয়েছে তাও বিস্ময়কর। কারণ, রাত ২টায় হামলা ও অফিস বন্ধের পরদিন বিকাল চারটায় এ, ডি, সি. (Additional D.C) এক নোটিশ জারী করেন যে গণশক্তি বের করার জন্যে কোনও অনুমতিপত্র না নিয়ে গণশক্তি কেন প্রকাশ করা হচ্ছে তার কারণ ১৫ দিনের ভিতর দর্শাও। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ১৯৭০ সাল থেকে সরকারী অনুমতি নিয়ে এ পত্রিকা প্রকাশ করা হচ্ছে এবং সর্বজন শ্রদ্ধেয় নেতা মওলানা ভাসানী 'গণশক্তি' পত্রিকার উদ্বোধন করেছিলেন। ২৫ শে মার্চের পর ইয়াহিয়া সরকারের অত্যাচারের মুখে 'গণশক্তি' প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। ১৬ই ডিসেম্বরের পর 'গণশক্তি' যখন আবার প্রকাশ করা হয় তার আগে সরকারের কাছে জানানো হয় যে প্রাক্তন সম্পাদক সাইদুল হাসানের বদলে মোহাম্মদ তোয়াহা পত্রিকাটির সম্পাদনা ও প্রকাশনা করবেন। এরপর যত সংখ্যা 'গণশক্তি' প্রকাশ করা হয়েছে তার প্রতিটি সংখ্যা সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে। কাজেই এই নোটিশের অর্থ কি? এবং নোটিশ অনুযায়ী কারণ দর্শাবার জন্যে ১৫ দিন যে সময় দেওয়া হয়েছে তার জন্যে অপেক্ষা করা তো দূরের কথা, নোটিশ দেওয়ার ১৪ ঘন্টা আগেই অফিসে তালাবন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং অফিসে যে একজন কর্মচারী ছিল তাকে বেদম মারধোর করা হয়েছে।

শহীদ ফজলুল হকের স্ত্রী পূর্ণ আইনসম্মত উপায়ে একটি ছোট ছাপাখানা চালু করার চেষ্টা করছিলেন। সেই ছাপাখানা তোয়াহা সাহেবের "বেনামী" সম্পত্তি হিসেবে আটক করা হয়েছে। তোয়াহা সাহেবের মেয়ে যখন ম্যাজিষ্ট্রেটকে জানান যে এই প্রেসের মালিক তিনি এবং তৎসংক্রান্ত বৈধ মালিকানার দলিল দেখান তখন ম্যাজিষ্ট্রেট বলেন, এ ব্যাপারে আমরা সরকারের হুকুম মত কাজ করছি এবং এটা আটক থাকবে।

৩১ শে মে সংবাদপত্রে তোয়াহা সাহেব ও হাবিবুর রহমান সাহেবের বিরুদ্ধে 'আত্ম গোপন করে আছেন' বলে সরকার অভিযোগ আনে ও ৯ই জুন বেলা ৩টার ভিতর কোর্টে হাজির হবার নির্দেশ দেয়। কিন্তু এই নির্দেশ জারী হবার দু'দিন আগেই এবং তাঁদের অপরাধ কি তা জানাবার আগে ও কোর্টে দোষী সাব্যস্ত হবার আগেই স্বনামে ও 'বেনামীতে' তাঁদের সমস্ত সম্পত্তি আটক করা হয়েছে। এই 'বেনামী' সম্পত্তির অজুহাতে তোয়াহা সাহেবের স্ত্রী, কন্যার সামান্য বেঁচে থাকার অবলম্বন আটক করা হয়েছে। কিন্তু কেন? আপনি জবাব দিন।

ইতি-

গণশক্তির জনৈক সুহৃদ

সময় বাড়িয়ে দিন।

বাতিল ১০.৫ টাকা জমা দেয়ার সময় কমপক্ষে আরও ৩ দিন বাড়িয়ে দিতে মওলানা ভাসানী সরকারকে অনুরোধ জানিয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে এসব নোট কম বেশী সবার কাছে আছে। তাছাড়া নিভৃত পল্লীর মানুষকে সময় না দিলে তারা সর্বস্বান্ত হয়ে পড়বে।

এম.সি.এ-দের কাণ্ড

এম.সি.এ-দের কীর্তিকলাপ সম্পর্কে 'হক-কথা'র প্রায় প্রতি সংখ্যায় বিচিত্র কাহিনী প্রকাশিত হয়েছে। এরপরও এত বেশী নজির আসছে যার মাত্রা দেখে আমাদের বিস্ময়ের অবধি থাকে না যে মুজিব-সরকার এখনো কেন এইসব এম.সি.এদের বিচার করে শাস্তি দিচ্ছেন না, বাতিল করছেন না তাদের সদস্যপদ? এমন নিকৃষ্ট চরিত্র এবং ঘৃণ্য মনোবৃত্তির লোকেরা যদি আরো কিছুদিন জনগণের প্রতিনিধিত্বের সুযোগ পায়, তাহলে এদেশের অবস্থা কোন পর্যায়ে উপনীত হবে, তা ভবিষ্যতই জানে। পাঠকসমাজের অবগতির জন্যে আরো কয়েকজন এমসিএ-দের কাণ্ড এববার প্রকাশ করা হলোঃ

বিদগ্ধ শোষণ

ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁওয়ের জনৈক এম.সি.এ-র হঠাৎ খায়েশ হয়েছে যে, তিনি একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করবেন। বাংলাদেশ সরকার ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের তাকাবী ঋণ হিসেবে ঐ এলাকায় ৫০ হাজার টাকা মঞ্জুর করলে এই এম.সি.এ-টি ঋণ গ্রহিতা প্রতি ৫, ১০ এমনকি ১৫ টাকা পর্যন্ত তাঁর পত্রিকার চাঁদা আদায় করে প্রচুর অর্থ কামিয়ে নিয়েছেন।

পুল সেরাত

টঙ্গীর এম.সি.এ সাহেবটি টাকা কামানোর ক্ষেত্রে অপূর্ব কৌশল জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। এম.সি.এ সুলভ ক্ষমতার বলে তিনি কয়েকটি মিল-কর্তৃপক্ষকে সুতা বিক্রয় করতে নিষেধ করে দিয়েছেন। কোনো ব্যবসায়ী সুতা কিনতে এলে তাই দরবারেই হাজির হতে হয়। তিনি তখন ঐ ব্যবসায়ীটির কাছেই মিল রেটের অনেক বেশী দামে বিক্রয়

করে প্রচুর অর্থ কামিয়ে নেন। ওদিকে আবার নিজের ভাগ্নে ও ভগ্নিপতির নামে ইস্যুকৃত লাইসেন্সের সুতা থেকেও অর্থ কামাচ্ছেন। এখন তাহা এম.সি.এ সাহেবটির বাসায় রাজনৈতিক কর্মীর চেয়ে বেশী সমাগম হয় সুতার ব্যবসায়ীদের।

চোরাই লড়াইয়ে এম.সি.এ গাজী

সিলেটের জনৈক এম.সি.এ ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারখানার একটি ল্যাণ্ডরোভার গাড়ী দখল করে বিগত পাঁচ মাস কল্পিত লাইসেন্স নম্বরে হাঁকিয়েছেন। সম্প্রতি ভারতের করিমগঞ্জ থানা কর্তৃপক্ষ তা আটক করেছে। এম.সি.এ সাহেবের কয়েকজন সাঙ্গ-পাঙ্গ গাড়ীটি নিয়ে ভারতে গিয়েছিল। উক্ত থানা কর্তৃপক্ষ তাদেরকে চোরাকারবারী বলে সন্দেহ করে। এম.সি.এ- সাহেবের প্রচেষ্টার ফলে তারা মুক্তি পেলেও তার সাধের গাড়ীটি আটক থেকে গেছে।

এদিকে কয়েকদিন আগে মাছ বোঝাই একটি বাংলাদেশী ট্রাক আটক করে সিলেট সীমান্তবাসীরা থানায় জমা দিয়েছেন। আটক ড্রাইভারকে পারমিট দেখাতে বলা হলে সে ব্যর্থ হয়। এবার ড্রাইভারটির পক্ষে ওকালতি করতে গিয়েছিল উল্লেখিত এম.সি.এ সাহেবটির সেই চ্যালারা, যাদেরকে সেবার চোরাকারবারী সন্দেহে আটক করা হয়েছিল। কিন্তু গ্রামবাসীর দাবীতে ট্রাকের প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা মূল্যের মাছ মাত্র তিন হাজার টাকা নিলামে বিক্রি করে দেয়া হয়। এই চোরাচালানের সাথে এম.সি.এ সাহেবের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে বলে স্থানীয় জনগণের অভিযোগে প্রকাশ। হাতেনাতে চোরাকারবারী ধরা পড়লেও রহস্যজনক কারণে থানা কর্তৃপক্ষ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণে বিরত থাকেন। সীমান্ত প্রহরী ও চোরাকারবারীর ঠাণ্ডা লড়াইয়ে বরাবর এই এম.সি.এ সাহেব গাজী বনে আসছেন।

ইহা কি সত্য?

॥ ৭৫ ॥

প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমানের কনিষ্ঠ সহোদর ভ্রাতার বলে উল্লিখিত কতিপয় মূল্যবান মেডিক্যাল যন্ত্রপাতি এবং প্রসাধন সামগ্রী দুটি ভারতীয় ট্রাকে (টি আর এল ১৭০৩ ও টি আর এল ১৭০৯) বাংলাদেশে নিয়ে আসবার পথে বেনাপোল সীমান্তে আমাদের শুল্ক বিভাগ আটক করেছেন। অতএব মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

॥ ৭৬ ॥

আদমজী গোষ্ঠীর চটকল, কাপড়ের কল, চিনি, চা, ইত্যাদি ১৩টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রশাসক হিসেবে যাকে নিয়োগ করা হয়েছে হানাদার আমলে তিনি ধানমণ্ডি শান্তি কমিটির সভাপতি ছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই মুক্তি ফৌজের জন্যে তিনি ছিলেন ত্রাস। আফসোস তিনিই আজ প্রায় ৫০ হাজার শ্রমিকের ভাগ্য নিয়ন্তা।

॥ ৭৭ ॥

খুলনার আমিন জুট মিলসের একজন উর্ধতন অফিসার গত ২৩/৫/৭২ তারিখে বাংলাদেশ ন্যাশনাল ওয়েলসের খালিশপুর শাখা থেকে মিলের জন্যে ১০০০ গ্যালন জে বি ওয়েল খরিদ করেন। এই তেল মিলের রেজিষ্টারে জমা না দেখিয়ে ড্রামে ভরে নৌকাযোগে কালোবাজারে বিক্রি করে ফেলেন। এই চোরাই কাজে সহযোগীকে যথোপযুক্ত অংশ না দেয়াতে গুমর ফাঁক হয়ে গেছে।

॥ ৭৮ ॥

১৯৭০ সালে গৃহীত স্পেশাল ই পি সি এস পরীক্ষায় পাশ করা হতভাগ্যদের বাদ দিয়ে ৩৩০ জন ছাত্রলীগ কর্মীকে বিভিন্ন পদে নিয়োগ করা হয়েছে। ক্রমিক নং ৬১ বিশিষ্ট বরিশাল নিবাসী ভদ্রলোকটি নন ম্যাট্রিক হলেও অফিসার র‍্যাঙ্ক পেয়েছেন। ই পি সি এস রা কর্তৃপক্ষ সমীপে গেলে কিছু ওয়াজ ফরমিয়ে জনপ্রতি নগদ ৫০ টাকা দিয়ে বিদায় করা হয়।

॥ ৭৯ ॥

ময়মনসিংহের জনৈক বিধবা মহিলা পাক-আমলে তার স্বামীকে হত্যার অভিযোগে কতিপয় ব্যক্তির নামে মামলা দায়ের করলে পুলিশ অভিযুক্তদের একজনকে গ্রেফতার করে। পাক-বাহিনীর দালাল এই ব্যক্তিটিকে ছেড়ে দেয়ার জন্যে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ অবিরত ও,সি,-কে টেলিফোনে অনুরোধ করতে থাকেন। এর কয়েক ঘন্টা পরই জনৈক এম.সি.এ- সশরীরে থানায় হাজির হয়ে দালালটিকে ছেড়ে দিতে বললে থানা কর্তৃপক্ষ তাদের চাকুরী রক্ষার্থে নির্দেশ পালনে বাধ্য হন।

ময়মনসিংহ কৃষি বিদ্যালয়ের এনাটমী ও হিস্টোলজী বিভাগের রিচার্স এ্যাসিষ্টেন্ট পদের জন্যে অসংখ্য যোগ্য প্রার্থীর দরখাস্তকে 'দরকার নেই' বলে নাকচ করে দিয়ে কর্তৃপক্ষ জনৈক রুই-কাৎলার ভাগ্নেকে রাতারাতি পদটি দান করেছেন।

॥ ৮০ ॥

ফরিদপুর সদর মহকুমার পাক-দালালদের বিচার পরিচালনার জন্যে যে সরকারী উকিলদের নাম প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যেও তিনজন বিশিষ্ট দালাল রয়েছে। শান্তি কমিটির পাণ্ডা এই তিন দালাল-উকিল স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় গ্রামে-গঞ্জে পাকিস্তানের পক্ষে বয়ান করে বেড়িয়েছে।

॥ ৮১ ॥

বিনামূল্যে প্রদত্ত Bureopane-ইঞ্জেকশন মাত্র আট টাকা দরে বিক্রয়ের সময় ময়মনসিংহ মেডিক্যার কলেজ হাসপাতালের জনৈক ডাক্তার ছাত্রদের কাছে হাতেনাতে ধরা পড়েন। বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা তার অপসারণ দাবী করলেও তিনি এখনো বহাল তবিয়তে আছেন। কেননা, ডাক্তার মহোদয় বিশিষ্ট এম.সি.এ-র ঘনিষ্ঠবন্ধু।

॥ ৮২ ॥

প্রধানমন্ত্রী ১৫ দিনের সময় দিয়েছেন। দখল করা বাড়ী-ঘর ছেড়ে দিতে হবে।

মাদারীপুরের কালিপদ রায়ের মালিকানাধীন একটি পেট্রোলপাম্প ও গুদাম ঘর জনৈক এম.সি.এ-র ভাইপো দখল করে বসে আছে। সমবায় ব্যাঙ্কের দু'তলাটি বরিশাল ছাত্রলীগ দখল করে বসে আছে। ঢাকার ৩৬ নং কায়েতটুলীস্থ দ্বিতল বাড়ীটি আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ দখল করে বসে আছে।

বাংলাদেশ সরকার শত্রু-সম্পত্তি এবং বাড়ী, গাড়ী অবিলম্বে সরকারের নিকট হস্তান্তর করার জন্যে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করলেও লালবাহিনী ও জাতীয় শ্রমিক লীগ নেতা জনাব আবদুল মান্নান এম,সি,এ সাহেব অদ্যাবধি ১৯/৪ ফরিদাবাদ লেনের একটি বাড়ী দখল করে আছেন। তাছাড়া তিনি ঢাকা জুট মিলের গ-- ৭৪৪৮ নং গাড়ীখানাও নিজ দখলে রেখে ইচ্ছামত ব্যবহার করছেন।

সম্পাদক ঃ সৈয়দ ইরফানুল বারী মুদ্রণে ঃ শান্তি প্রেস, সন্তোষ, টাঙ্গাইল।

প্রতি কপি পঁচিশ পয়সা সাপ্তাহিক চাঁদার হার : ষান্মাসিক-৬.০০ বার্ষিক-১০.০০

হক-কথা

(WEEKLY THE HAQ-KATHA)

প্রকাশক ও পৃষ্ঠপোষক ঃ মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

প্রথম বর্ষ ষোড়শ সংখ্যা শুক্রবার ২রা আষাঢ় ১৩৭৯; ১৬ই জুন ১৯৭২ ৪ঠা জামাদিউল আওয়াল ১৩৯২ সন্তোষ, টাঙ্গাইল

ভাসানীকে হত্যা করা হবে?

আসাম-বাংলার মহারাজারা কতবার ফাঁদ পেতেছে মওলানা ভাসানীকে হত্যা করতে। ইস্কান্দার মীর্জা তাঁকে সুদক্ষ সিপাহীর হাতে গুলি করানোর কথা ঘোষণাই করেছিলেন। তারপর টিক্কা খাঁ চেয়েছিলেন মওলানার লাশ। বিধির বিধানে সব ভণ্ডুল হয়েছে। কিন্তু আজ নতুন কথা, নতুন ফাঁদ, নতুন পরিকল্পনা। শেখ মুজিবের আমলকে নেহেরু নমুনায় আমরণ স্থায়ী রাখতে একমাত্র পথের কাঁটা মওলানা ভাসানীকে চিরদিনের জন্যে দুনিয়া থেকে সরিয়ে ফেলার জঘন্যতম চক্রান্ত পাকাপাকি হয়ে আছে। তাই মওলানা ভাসানীকে হত্যা করবার মত উশৃঙ্খল ও অনিয়ন্ত্রিত পরিবেশ সৃষ্টি করতে আপ্রাণ চেষ্টা চলছে।

কারো অজানা নেই এবং অস্বীকার করবার যো নেই, মওলানা ভাসানীই একমাত্র ব্যক্তি যিনি প্রকাশ্যে ভারত, রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের অশুভ পদক্ষেপ এবং বাংলাদেশকে লুটেপুটে খাওয়ার জঘন্য চক্রান্তের বিরোধিতা করে আসছেন। গত এপ্রিল মাসে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মওলানার ভূমিকা সম্পর্কে বাংলাদেশের কতিপয় চক্রান্তকারীর উপস্থিতিতে প্রথম আলোচনা হয়। আওয়ামী লীগকে হাতের পুতুল রেখে বাংলাদেশকে উপনিবেশ করবার সাধ মিটাতে ভারত নিকৃষ্টতম পরিকল্পনা গ্রহণ করতেও উস্কানি দেয়। তারই জের টেনে মওলানা ভাসানীর জন্যে একটি মুহূর্ত এসেছিল গত এপ্রিলের ৩০ তারিখে। শিবপুরের সম্মেলনে ভাষণ শেষে জীপযোগে ঢাকা ফিরবার পথে ফেরীঘাটে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছিল ভয়াল চক্রান্তের শীর্ষস্থানীয় ক'জন। পরদিন ১লা মে-র সমাবেশে যোগ দিতে ঢাকাগামী শত শত লালবাহিনী নদী পারাপার হচ্ছিল। সাধারণ সদস্যরা কি করে ভাবতে পারে তাদের উপস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে একজন আমরণ সংগ্রামী নেতাকে হত্যা করা হবে? সুকৌশলে ফেরীঘাটেই লালবাহিনীকে দিয়ে একটি ঝগড়া বাধানো হয়। এর মধ্যে মওলানাকে আধো আলো আধো অন্ধকারে নদী পার হতে হত। নদীবক্ষেই মওলানা ভাসানীকে গুলি করা হত। কিন্তু কি ঘটতে গিয়ে কি ঘটে গেল। মওলানা তড়িতে সিদ্ধান্ত নিলেন, এই ঘাটে নদী পার হবেন না। কয়েক মাইল উত্তরে এসে নৌকাযোগে নদী পার হলেন।

মে মাসের প্রথম সপ্তাহেই একটি আন্তর্জাতিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মওলানা ভাসানী লন্ডন যাবার কথা। সেখানেই তাকে গুলি করে হত্যা করা হবে। আর এমন একটি কৌশলে করা হত যার বদৌলতে হত্যাকাণ্ডটির রহস্য চাপিয়ে দেয়া যেত পাকিস্তানের উপর। ভারত থেকে মায়াকান্না জুড়ে জোড়াতালি দেয়া হত। অবশ্য এতদসঙ্গে চিরদিনের জন্যে বাংলাদেশে মওলানার প্রবেশ ঠেকানো যায় কি না সে বিষয়টিও আলোচনার অন্তর্গত ছিল। কিন্তু মওলানা সাহেব সাময়িকভাবে চক্রান্তটি ফাঁস না করে মৃত্যুকে এড়িয়ে গেলেন মাত্র।

সম্পাদকীয়

দেশ কোন্ পথে

বাংলাদেশ কোন্ পথে-প্রতিটি দেশপ্রেমিক নাগরিক এই মুহূর্তে যদি বুঝে না দেখেন, জাতির প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা করবেন।

জানে-মালে বিধ্বস্ত হয়ে আমরা স্বাধীন হয়েছি। কিন্তু জাতির মনোবল ভাঙেনি, নৈরাশ্যে নিমজ্জিত হয়ে যায়নি। প্রকৃতি আমাদেরকে যা দিচ্ছে তাতে আজও কমতি দেখা দেয়নি। কিন্তু আমাদের অর্থনীতির এই দুর্দশা কেন? শিশুরাষ্ট্র কিংবা লুণ্ঠিত জনপদে এর চেয়ে বেশী কি হবে বলে জাতিকে রীতিমত ব্লাফ দেয়া হচ্ছে। আমরা শোষকের হাতে পড়ে গেছি। ভারত একরকম উপনিবেশ করে ফেলবার উপক্রম করেছে। যুক্তরাষ্ট্র বেশ ধৈর্য্যের সাথে কনুই টেসে জায়গা করে নিয়েছে। তার বশংবদদের হাতে পড়ে বাংলাদেশ সাম্রাজ্যবাদী শোষণের শিকারে পরিণত হয়েছে।

রাজনীতি চলছে দুর্যোগের গণবিরোধী সব অপকর্মে ভারতীয় মগজ যোগান দিচ্ছে। রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড চলছে। দুষ্কৃতিকারী কিংবা রাষ্ট্রদ্রোহী নিধনের নামে চলছে বামপন্থী উৎখাত অভিযান। তাও আবার ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা ও সেনাবাহিনীর সক্রিয় সহযোগিতায়।

এদিকে চোরাচালান আমাদেরকে ফতুর করে দিয়েছে। লুটপাট সমিতির কাণ্ডকারখানা দেশবাসীকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। স্বজনপ্রীতি, সার্বিক দুর্নীতি পূর্ববর্তী সব রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। রিলিফ কেলেঙ্কারী আজকাল ডাল-ভাত হয়ে গেছে। শিল্প-কারখানায় অসন্তোষ, সংঘর্ষ চলছে। এই সুযোগে প্রশাসক লুটপাট করে যাচ্ছে।

বেকার সমস্যা কল্পনাতীত রূপ ধারণ করেছে। চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি মারাত্মক হারে বেড়েছে। শিক্ষায় ও প্রতিষ্ঠানে কোন পরিবেশ নেই। মানবিক ও সামাজিক মূল্যবোধ পরিবর্তিত হয়ে বেপরোয়া বেহায়াপনায় পর্যবসিত হয়েছে। জনশক্তি সকল দিক দিয়ে খর্ব হচ্ছে।

সর্বোপরি আমাদের সেনাবাহিনীতে কোন্দল জুড়ানো হয়েছে। মেজর জলিলকে কেন্দ্র করে যে জনমত গড়ে উঠেছে এর মর্যাদা মোটেই দেয়া হচ্ছে না। মুক্তিবাহিনীর কোন ভবিষ্যত নেই। লালবাহিনী অনিয়ম, উশৃঙ্খলতা, স্বেচ্ছাচারিতা আর দমননীতির আশ্রয় নিয়ে যাচ্ছে-তাই করে যাচ্ছে। তাদের খামুশ না করে আশকারা দেয়া হচ্ছে। বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থার তৎপরতা এমন মাত্রায় পৌঁছেছে, মনে হচ্ছে সরকারের সাথে তাদের বোঝাপড়া হয়ে গেছে।

তাই আজ দেশপ্রেমিকের মনে মাত্র একটি প্রশ্ন- বাংলাদেশ কোন পথে? ভোট পেয়ে গণপ্রতিনিধি হবার মানে তো এই নয় যে দেশকে রসাতলে নিয়ে যেতে হবে। ক্ষমতাসীন থেকে কি অধিকার আছে তাদের বাংলাদেশকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের হাতে তুলে দেয়ার? কোন্ সাহসে তারা এদেশকে ভারতের উপনিবেশে পরিণত করছে?

এবার প্রশ্ন– সর্বশেষ কি চলছে। হ্যাঁ, চক্রান্তকারীদের জানিয়ে দেয়া হচ্ছে– মওলানা জানেন, লালবাহিনী আর পুলিশ বিভাগের মধ্যে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ বাধিয়ে দেশময় অচিরেই একটা অনিশ্চিত, উশৃঙ্খল ও অনিয়ন্ত্রিত পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হবে। তৎসঙ্গে চলবে বামপন্থীদের দল–উপদলগুলোকে নিশ্চিহ্ন করবার দক্ষযজ্ঞ কাণ্ডকারখানা। আশ্চর্য, খুবই খোলখুলি এবং সৎ সাহসের সাথে পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ বাবু জানিয়ে গেছেন, চোরাকারবারীর সাথে সাথে অবাঞ্ছিত (তথা ভারতীয় শোষণে বাধা দানকারী) ব্যক্তিদের উভয় রাষ্ট্রের সংযুক্ত কর্মসূচী মোতাবেক মোকাবিলা ও নিশ্চিহ্ন করা হবে। মওলানা ভাসানীকে হত্যা করা আজকের চক্রান্তকারীদের জন্যে কঠিন কিছু নয়। কিন্তু জুলিয়াস সীজারকে হত্যা করতে ক্যাশিয়াসের কু–বুদ্ধির সাথে যোগ দিয়েছিল ব্রুটাসের জনপ্রিয়তা। (আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

বাংলার দূতে বিশ্বপ্রেম নেই

খবরের কাগজের পাঠকমাত্রই লক্ষ্য করেছেন, কয়েকদিন যাবত বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন বিশ্বপ্রেম তথা বাংলার দূতের প্রচার করে আসছেন। জাহাজটি ভারতীয় শিপিং কর্পোরেশন এক কোটি টাকায় আমাদের নিকট বিক্রি করেছেন। স্বাধীন বাংলাদেশ একটি জাহাজের মালিক হয়েছে, এতো খুবই খুশীর কথা। তাছাড়া ডানেবামে বুঝানো হচ্ছে, তা ভারতের কতো বদান্যতা। কিন্তু হায়, নিয়ন্ত্রিত সাংবাদিকতায় পাঠকমহল কি করে জানবেন, ভারতের এই 'বিশ্বপ্রেমে' কি জ্বালা রয়েছে।

দশ বৎসরের পুরানো এই জাহাজটি ভারত আমাদের নিকট ১ কোটি টাকায় বিক্রয় করেছে এবং গোটা টাকাটি নগদ নিয়ে গেছে। কিন্তু জার্মানীর অধিকতর বৃহদাকারের জাহাজ 'কর্ণফুলি' ৬৫ লক্ষ টাকায় ক্রয় করা হয়েছিল। তাও টাকাটা শোধ করা হয়েছে কিস্তিতে। জাহাজের কামাই অনুসারে টাকা দেওয়া হয়েছে। শে গেল অতীতের কথা! আমাদের স্বাধীনতার পর যুগোশ্লাভিয়া, পশ্চিম জার্মানী, পোল্যান্ড জাহাজ বিষয়াদিতে সাহায্য করতে চেয়েছিল। কিন্তু ভারতের নিষেধ, শিপিং-এ আর কারো দ্বারে যাওয়া যাবে না। তাই বিধ্বস্ত বাংলা সস্তা সুযোগ সুবিধা পেল না। যুগোশ্লাভিয়া এর আগে সম্পূর্ণ নতুন একটি জাহাজ (রাঙ্গামাটি) আমাদের নিকট ১ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকায় বিক্রয় করেছিল।

সবচেয়ে রহস্যজনক ব্যাপার হল, বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণসহ ৩৮ জন নাবিক কলকাতা গেলেও বাংলার দূতের চীফ ইঞ্জিনিয়ার পদে রাখা হয়েছে একজন ভারতীয়। অথচ আমাদের দেশের এক্সপার্টগণ চাকুরী না পেয়ে বিদেশে চলে যাচ্ছে। স্বাধীনতার পর ভারতীয় চাপে ও চালে আমাদের শিপিং আশানুরূপ এগুতে পারেনি।

"সান্ত্রী-সিপাহীর খরচসহ মাসে দুই হাজার নহে, বোধকরি ভারত সরকার আমার জন্য উহারও বেশী পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিয়াছেন"

– মওলানা ভাসানী

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীকে ইঙ্গিত করে আজকাল বন্দীদশা সম্বলওয়ালা 'বন্ধুপিতা' কথা বলতে শিখেছেন। নির্বাচন বানচাল কোথায় করা হল, 'ঘুচুর ঘুচুর' করে

কেন বেড়ানো হচ্ছে, এমসিএ এমসিএ কেন করা হচ্ছে, ভারত সরকারের মাসে দু' হাজার টাকারও বেশী খরচ করার রহস্য কি— ইত্যাদি বিষয়ে বক্তব্য রেখে মওলানা সাহেব নিম্নরূপ বিবৃতি দান করেছেন।

৬৫ বৎসরের রাজনৈতিক জীবন কাটাইয়া আমাকে অথবা আমার হইয়া অন্য কাউকে যখন আদর্শ ও উদ্দেশ্যের সাফাই গাহিতে হয় তখন দেশবাসীর জন্য করুণা বৈ কি হইতে পারে!

আমি নতুন দেশপ্রেমিক বাংলাদেশ দরদী হই নাই। ৬৫ বৎসর পূর্বে যাহা ছিলাম, আজও তাহাই আছি। আমার মত ও পথের পরিবর্তন করি নাই। যাহারা আমার ঘাড়ে সওয়ার হইয়া অনেক কিছু বনিয়াছে তাহাদের মত ও পথ অনবরত পরিবর্তিত হইয়াছে। মন্ত্রী-মেম্বার হইয়া যাহাদের কথা ও কাজ পাল্টাইয়া গণবিরোধী হয়, তাহাদের সত্যিকার দেশপ্রেম ও ত্যাগ কোথায়? ক্ষুদ্র শক্তিতে সারা জীবন আমি যে ত্যাগ বরণ করিয়াছি অন্যান্য নেতাদের মত তাহার প্রতিদান কখনো ভোগ করি নাই; ইনশাআল্লাহ্ ভবিষ্যতেও ভোগের আশা রাখি না।

ইয়াহিয়া খাঁর আইনগত কাঠামোর অধীনে নির্বাচন করিয়া পশ্চিমা শোষকদের স্বার্থ রূপান্তরিত পন্থায় মজবুত রাখিয়া আওয়ামী লীগ যখন গোটা পাকিস্তানে বাদশাহী করিবার স্বপ্ন দেখিতেছিল তখন আমি তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করি। আমার এই ঘোষণা স্বাধীনতা অর্জনে জাতিকে

পরবর্তী সংখ্যার আকর্ষণ

ক) কেন এবং কিভাবে মওলানা ভাসানী ভারতীয় ফাঁদে আটকা পড়লেন

খ) ভারত বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনকে পঙ্গু রাখতে চায়

কতটুকু আগাইয়া দিয়াছে একমাত্র ইতিহাসই ইহার নিরপেক্ষ সাক্ষ্য দিবে। সম্প্রতি রেসকোর্সে উল্লিখিত সেদিনের 'একজন মানুষ' নির্বাচন বানচাল করিতে উঠিয়া–পড়িয়া লাগে নাই; বরং স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমি সৃষ্টি করিতেই গ্রামে-গঞ্জে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন। বানচাল ও বর্জন এক কথা নহে। আমরা নির্বাচন বর্জন করিয়াছি। আর যাহারা আওয়ামী লীগের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছে এবং হাটে-মাঠে হারিয়াছে তাহাদের লইয়াই উহারা 'কোমর ধরা সমাজতন্ত্র' কায়েমের ধোয়া তুলিয়াছে।

শুধু তাহাই নহে, বন্ধুত্বের নামে বাংলাদেশে প্রভুত্ব ও শোষণ যখন স্থান করিয়া লইতেছে তখন আওয়ামী লীগ দেশের অভ্যন্তরে সৃষ্টি করিয়াছে 'লুটপাট সমিতি।' অধিকাংশ এমসিএ উহার সদস্য, যায় মন্ত্রী পর্যন্ত। আমলা-মোসাহেবদের তো কথাই নাই। তাই দেশে অবাধে চলিয়াছে চোরাকারবারী, কালোবাজারী, স্বজনপ্রীতি, বেদখল আর মজুতদারী। গণপ্রতিনিধিরাই যদি লুটপাট সমিতির সদস্য হয় তবে অন্যরা তো কোন্ ছাড়। তাই দেশময় আজ এমসিএ, এমসিএ, এমসিএ, রব। জনতাকে সাক্ষী রাখিয়া চোর-বাটপারদের এমনিভাবে সাফাই গাইতে জীবনে আর কখনো শুনি নাই।

জনাব প্রধানমন্ত্রী সাহেব, গম্ভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিবেন, আমার 'হক-কথা'য় ও সভা সমিতিতে ঘুচুর ঘুচুর না করা হইলে লুটপাট সমিতির অত্যাচারে এতদিনে আপনার সরকার ও দেশের জনসাধারণ ধ্বংসের মুখে ঝুলিত। আমরা যাহা করি ও বলি, দেশের কল্যাণের জন্যই। গদি দখলের জন্য নহে।

দেশবাসী আর একটি কথা বুঝিয়া রাখিবেন। আমরা ভারত সরকারের দুরভিসন্ধি ফাঁস

করিয়া দিতেছি বটে কিন্তু ভারতের জনগণের সহিত আমাদের বন্ধুত্ব আশা রাখি চিরকাল অটুট থাকিবে। স্বাধীন বাংলায় ভারতীয় চিচিংফাঁকে আমি কি করিয়া অবতীর্ণ হইতে পারি ইহা ইয়াহিয়ার হাতে আত্মসমর্পণকারীদের বিস্ময়ের উদ্রেক করে। কারণ, বলা হয়, ভারত সরকার প্রতি মাসে আমার জন্য দুই হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছে। দেশবাসীকে আমি শুধু একটি কথাই স্মরণ করিতে অনুরোধ করিতেছি। বৃটিশ সরকার মহাত্মা গান্ধীকে আগা খানের পুনাস্থ প্রাসাদে বন্দী করিয়া রাখিতেন ও হাজার হাজার টাকা ব্যয় করিতেন। উহা কি বৃটিশ সরকারের বদান্যতা কিংবা অনুগ্রহ ছিল? আমি তাই বলি সান্ত্রী-সিপাহীর খরচসহ মাসে দুই হাজার নহে, বোধকরি ভারত সরকার আমার জন্য উহারও বেশী পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। কিন্তু এই ব্যয় কিসের জন্য ছিল তাহা খোলাসা করিয়া বলিবার সময় আসিলে অবশ্যই বলিব।

আমাদের সংগ্রাম সাম্প্রদায়িকতার সংগ্রাম নয়, শোষকের বিরুদ্ধে শোষিত মানুষের সংগ্রাম। সে শোষক হিন্দু হউক, মুসলমান হউক, যে কোন সম্প্রদায় বা গোত্রের হউক, তাদের বিরুদ্ধে যে কোন বাধা, বিঘ্ন, নির্যাতন মাথা পাতিয়া বরণ করিতে প্রস্তুত আছি, এমনকি মুজিবের লালবাহিনী বা অন্যান্য বাহিনীর হস্তে শহীদ হইতে হইলেও ভ্রুক্ষেপ করিব না। সত্যের জন্য মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই করিয়া যাইব। শোষিত মানুষের মুখপত্র সাপ্তাহিক 'হক-কথা' বন্ধ করিয়া দিলেও আমাদের ন্যায্য সংগ্রাম বন্ধ হইবে না। বরং ইনশাআল্লাহ আরো জোরদার হইবে। সরকার মুখে যতই গণতন্ত্রের কথা বলুন না কেন 'হক-কথা' বন্ধ করিলে দেশের আপামর জনতা বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইবে যে এ দেশে গণতন্ত্রের নাম-গন্ধ নাই। মুসলিম লীগের সময় যে কয়টি বিরোধীদলীয় মনোভাবাপন্ন পত্রিকা প্রথম দিকে বাহির হইয়াছিল সরকারের বিধি-নিষেধের ফলে সব বন্ধ হইয়া যায়। একমাত্র সাপ্তাহিক 'ইত্তেফাক' আওয়ামী লীগের মুখপত্ররূপে আমি বহুকষ্টে চালাইয়াছিলাম। আমার প্রতিষ্ঠিত আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে সাফাই গাহিতে বাংলা, ইংরাজী, উর্দু দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক অসংখ্য পত্রিকা থাকা সত্ত্বেও আমাদের সংগ্রাম লিয়াকত আলী খান, নুরুল আমীন সরকার ব্যর্থ করিতে পারে নাই। সরকারের অত্যাচার ও দমননীতি যতই দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছিল একমাত্র বিরোধী দল হিসাবে আওয়ামী লীগ ততই জনপ্রিয় হইয়া উঠিতেছিল। পাকিস্তানের প্রথম যুগের মত বাংলাদেশের প্রথম যুগেও বিরোধী দলের বিরুদ্ধে একই পন্থা গ্রহণ করা মোটেই সমীচীন হইবে না।

কল কারখানায় বেড়েই চলছে দুর্নীতি

মন্নু কেলেঙ্কারী

মুজিব-সরকারের রাষ্ট্রায়ত্ত কলকারখানার প্রশাসকদের কেলেংকারীর অধ্যায়ে আরেকজন নিজেকে সংযোজিত করেছেন—ইনি টঙ্গীর মন্নু টেক্সটাইল মিলসে নিযুক্ত প্রশাসক মহোদয়। মিল পরিচালনার জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার মাপকাঠিতে সম্পূর্ণ অযোগ্য হয়েও তিনি চান্সটি পেতে পেরেছেন। কেননা, মুজিব ভাই-এর প্রতি তার দারুণ ভক্তি এবং তিনি শুদ্ধ হয়ে এসেছেন ভারত থেকে।

এই আওয়ামী প্রশাসকটি তার দায়িত্বের প্রতি চরম অবহেলা করে যাচ্ছেন। নিতান্ত দয়া হলে তিনি সপ্তাহে হঠাৎ কখনো দু' এক ঘণ্টার জন্য টঙ্গীর কারখানা পরিদর্শনে আগমন করেন। আর তাই সেদিন অনুষ্ঠিত হয় বিশিষ্ট ভোজন-পর্ব। পোলাও, কোরমা আর কালিয়ার সৌরভে ভরপুর হয়ে উঠে সমস্ত কারখানা-ভবনটি।

কারখানায় যাতায়াত কম হলেও প্রশাসক মহোদয় ঢাকার দ্বিতল অফিসে নিয়মিত ডিউটি করেন। কিন্তু তাই বলে আগ্রহী কোন ব্যবসায়ীই তার সাক্ষাৎ পেতে পারেন না। কেননা, তিনি সর্বদাই ভয়ানক ব্যস্ত থাকেন। তাই আগ্রহী পার্টিদেরকে পার্টিশনের এপাশে বসে বসে তাঁর সচিব সমীপে হাত কচলাতে হয়। সচিবের নির্দেশ মত যার যার আবেদনপত্র টেবিলে জমা দিয়ে তারপর থেকে তাদের সিরিয়ালের প্রত্যাশায় বসে থাকতে হয়। তাদের কপালে আর কখনো এক বেল সুতাও জোটে না। ওদিকে যারা পাবার তারা সদা-ব্যস্ত প্রশাসকেরও দেখা পায়। সিরিয়ালের আশায় যাদের জুতো ক্ষয় হয় তাদের সম্মুখ দিয়েই প্রশাসকের এই প্রিয় ব্যবসায়ীরা তার নিজস্ব কামরাটিতে ঢুকে পড়ে। তারপর মন্নু টেক্সটাইল মিলসের প্রস্তুত সুতার বেল ট্রাক বোঝাই করে এরা নিজ নিজ এলাকায় নিয়ে চলে যায়। হাজার চেষ্টা করেও ঐ হতভাগা ব্যবসায়ীরা প্রশাসক সাহেবের দেখা পান না। তিনি যখন বাইরে আসেন তখনো তার মেজাজ শরীফ থাকে তপ্ত সাহারা।

প্রশাসকের ভোজনপর্ব, দালাল অফিসারের গ্রুপিং, ধিকৃত প্রশাসক, তদন্তকারী অফিসার এবং শ্রমিক লীগ

প্রশাসক মহোদয় নিজের কতিপয় বংশবদের নামে সুতার পারমিট মঞ্জুর করিয়ে নিয়েছেন। ফলে নতুন কোন ব্যবসায়ীই মন্নুর সুতা পেতে পারেন না। অন্য মিলগুলো একটি বিশেষ তারিখে সুতার পারমটি দিলেও এই আওয়ামী প্রশাসকটি তা হরহামেশাই দিয়ে থাকেন।

এই গেল প্রশাসকের কীর্তি। কিন্তু মুজিব সরকার মন্নু নগরে যে খেল খেলেছেন তার আর কোন তুলনাই হয় না। মন্নু মিলের সাবেক মালিকরা সরকারের আয়কর ফাঁকি দেয়ার উদ্দেশ্যে মিলে উৎপন্ন ৬০ ও ৪০ কাউন্টের সুতাগুলোর হিসাব 'ফাইন কটন মিলস' এই নামে সংরক্ষণ করতো। অথচ মেশিনারী, স্টাফ, শ্রমিক বা এলাকার দিক থেকে সেখানে একমাত্র মন্নু ছাড়া অন্য কোন মিলের অস্তিত্বই নেই। ফাইন মিলসের নামে ব্যাংকে জমাকৃত অর্থ পরে তারা মন্নু মিলসের এ্যাকাউন্টে বদলী করিয়ে নিতো। কোন সার্ভে ছাড়াই মুজিব সরকার পুরাতন কাগজপত্রের ভিত্তিতেই অস্তিত্বহীন মিলটিকেও স্বীকার করে নিয়ে তার জন্য আর একজন প্রশাসকও নিয়োগ করেছেন। ফলে সেই পুরানো কায়দাতেই প্রচুর অর্থ ফাঁকি দেয়া হচ্ছে। সাথে সাথে পকেট ভারী হয়ে উঠছে প্রশাসকের, কতিপয় আমলার ও কর্মকর্তাদের। অন্য আরো কারো নয় তো?

আমিন জুট মিলস

চট্টগ্রাম আমিন জুট মিলসের যিনি প্রশাসক নিয়োগ হয়েছিলেন, তিনি পাক-বাহিনীর আমলে মিল ম্যানেজার হিসেবে প্রচুর দালালী করেছেন। স্বাধীনতার পর প্রশাসক পদে উন্নীত হয়েই তিনি মিলের শ্রমিকদের মধ্যে স্থানীয়-অস্থানীয় প্রশ্নে বিভেদের চেষ্টা শুরু করেন। শ্রমিকদের সমবেত দাবীর ফলে প্রধানমন্ত্রী তাকে পদ থেকে অপসারণ করলে তিনি সরকারী শ্রমিক লীগের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়ে পদ ফিরে পাবার চেষ্টা চালাতে থাকেন। সরকারের পক্ষ থেকে একজন তদন্তকারী

অফিসার এসে শ্রমিক লীগের প্রচেষ্টায় এবং ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের দাবীতে পাক-বাহিনীর নির্লজ্জ দালাল এই শ্রমিকধিকৃত প্রশাসকটিকে আবার তার পদে পুনর্বহালের সুপারিশ করেছেন। আমিন জুট মিলস ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদকের বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, এই দালাল লোকটি তার পদ ফিরে পেলে শ্রমিক অসন্তোষ তীব্র আকার ধারণ করে উৎপাদনের মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হবে।

খুলনার আফিল জুট মিলসের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর আফিল উদ্দিনকে দালাল আইনে গ্রেফতার করার পর থেকে মিলের এডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসারের নেতৃত্বে কতিপয় কর্মকর্তা উৎপাদন বৃদ্ধির পরিবর্তে ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে মেতে উঠেছেন। এরা নিজেদের দল ভারী করার জন্য অযোগ্য এবং অদক্ষ লোকদেরকে গুরুত্বপূর্ণ পদে প্রমোশন দেয়ার ফলে বিভিন্ন বিভাগের কাজ ক্রমান্বয়ে অচল হয়ে পড়ছে। মিলের আড়াইশ' তাঁতের মধ্যে এক তৃতীয়াংশ তাঁত এখনো বিকল হয়ে রয়েছে। এই কর্মকর্তারা নিজস্ব বাড়ীতে থেকেই বাড়ী ভাড়া বাবদ মোটা অংকের টাকা আদায় করছেন। মিলের মজদুর ইউনিয়ন কর্মকর্তাদের বিবৃতির অভিযোগ থেকে জানা গেছে যে, এই এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার তথাকথিত শান্তি কমিটির সদস্য হিসেবে খালিশপুরের শত শত বাঙালী নিধনে সক্রিয় ছিলেন।

চট্টগ্রামের আমিন টেক্সটাইল মিলসের আওয়ামী প্রশাসক সম্প্রতি বিপুল পরিমাণ মওজুদ সুতা প্রচলিত দামের অনেক কম দামে বিশেষ ব্যক্তিদের কাছে বিক্রি করে দিয়েছেন। ফেব্রুয়ারীর শুরুর দিকে তিনি সুতা ক্রয়ে আগ্রহী ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে দরখাস্ত আহ্বান করলে প্রচুর দরখাস্ত জমা হয়। দরখাস্তকারী বা যাদের নামে সুতা মঞ্জুর হয়েছিল— তাদের কাউকেই সুতা না দিয়ে এই প্রশাসকটি আওয়ামী লীগার এবং তার নিজস্ব ব্যক্তিদের কাছে কম দামে বিক্রি করেছে। উল্লেখযোগ্য যে, এদের কেউই ব্যবসায়ী নয়।

স্বাধীন এ্যাম্বুলেন্স

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের এ্যাম্বুলেন্সগুলো বিশেষ ব্যক্তিদের চিত্তবিনোদনের কাজেই বেশী ব্যবহৃত হয়ে আসছে। দ্রুত চিকিৎসার অভাবে অসংখ্য মানুষ প্রাণ হারালেও এ্যাম্বুলেন্সগুলোকে যাত্রী বোঝাই হয়ে খেলার মাঠে যেতে দেখা যায়, কখনো বা পাওয়া যায় অভিজাত রেস্তোরাঁর সম্মুখে। ধানমন্ডী আবাসিক এলাকার কোন এক আলীসান বাড়ীর সামনেও এ্যাম্বুলেন্সটি মাঝে মাঝে সারা রাত পড়ে থাকে। জনৈক ছাত্র-পাণ্ডা তো একটি এ্যাম্বুলেন্সকে প্রাইভেট কারই বানিয়ে ফেলেছে। তাই মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলেও দেখা যায় এ্যাম্বুলেন্সকে। ইনি শুধু নিজেই চালান না, বন্ধুদেরকেও চালানো শেখান। হাসপাতালের জনৈক কর্মকর্তা সম্প্রতি পাবনায় রোগী নিয়ে যাওয়ার দোহাই দিয়ে বান্ধবী সমভিব্যহারে রাজশাহী ভ্রমণে গিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, এ্যাম্বুলেন্সগুলোর যাবতীয় তেল খরচই সরকারী তহবিল থেকে আসে।

হালদা নদী থেকে মাছের পোনা পাচার হয়ে যাবে

চুক্তি ও চোরাচালানে বাংলাদেশের মাছ ভারতে চলে যাচ্ছে— এ আর নতুন কথা নয়

কিন্তু ভারতীয় ব্যবসায়ী মহল নতুন বুদ্ধি এঁটে নতুন খবর দিয়েছেন। এবার তাদের পরিকল্পনা বাংলাদেশ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে মাছের পোনা নিয়ে যাবেন। মৎস্য বিভাগে যোগাযোগ করে চোরাকারবারীরা মাছের পোনা উৎপাদনী এলাকা উদ্ধার করেছেন। তন্মধ্যে পোনা সমৃদ্ধ অথচ মৎস্য বিভাগ কর্তৃক অসংরক্ষিত এলাকাকে তারা বেছে নিয়েছে। চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী থানার মাদারসা গ্রাম ও রাউজান থানাধীন আবুরখিল গ্রামের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হালদা নদী পোনা উৎপাদনীতে সম্ভবত বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় কেন্দ্র। চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, কুমিল্লা ও সিলেট এই চারটি জেলার অধিকাংশ পুকুরে এখানকার পোনাই সরবরাহ হয়। কিন্তু বিশ্বস্ত সূত্রে প্রকাশ, আগরতলা ও সুনামগঞ্জের ভারতীয় মাছ ব্যবসায়ীরা উক্ত এলাকার পোনার প্রতি লোলুপ দৃষ্টি ফেলেছেন। চট্টগ্রামে তারা দালাল খুঁজছেন। এই ভর বর্ষায়ই মাছের পোনায় নদীটি জমে উঠছে। চোরাকারবারীরা সাফল্যের সাথে যদি পোনা পাচারের ব্যবসা জমাতে পারে, তবে বাংলাদেশের মানুষকে মাছ খাওয়ার খায়েস পরিত্যাগ করতে হবে।

মানবিক রিলিফের পাশবিক রূপ

অসংখ্য কেলেঙ্কারীর পরও রিলিফ বিতরণের নামে বাংলাদেশের জনগণের ভাগ্যকে নিয়ে যে অমানবিক ছিনিমিনি খেলার পালা এখনো চলছে তার মধ্য দিয়েই আজকের মুজিব সরকারের প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়ে গেছে। ইতিপূর্বে গত ৭ই এপ্রিল সাহায্য ও পুনর্বাসন মন্ত্রী জনাব কামরুজ্জামান আওয়ামী লীগ ও তার সর্ব-কর্ম সমর্থক ন্যাপ ও কমিউনিস্ট পার্টির সমন্বয়ে বিরোধী দল বর্জিত সরকারী সর্বদলীয় রিলিফ কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেও আজ পর্যন্ত রিলিফ বিতরণের ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের একচেটিয়া নেতৃত্বই বজায় রাখা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে রিলিফ কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও স্বেচ্ছাচারিতার ঘটনা আজ আর অভিযোগের পর্যায়ে নেই, প্রমাণিত সত্যে পরিণত হয়েছে। আইউব খানের বিডি চেয়ারম্যান কেনার পন্থাতেই আজকের মুজিব সরকারও রিলিফ কর্মকর্তা পদে নিজস্ব লোক নিয়োগ করে চরম স্বেচ্ছাচারিতার নিদর্শন দেখিয়েছে। বহু স্থানে পাক-বাহিনীর অত্যাচারী দালালদেরকেও কর্মকর্তা পদে অধিষ্ঠিত করা হয়েছে। ফলে সারাদেশে রিলিফের নামে চলছে ব্যাপক চুরি আর আত্মসাতের পালা।

মুজিব সরকারের রিলিফ কেলেঙ্কারী এমন এক ন্যাক্কারজনক পর্যায়ে উপনীত হয়েছে যে, শুধু নিরপেক্ষ পত্রিকাগুলোতেই নয়, সরকারী পত্র-পত্রিকাতেও সে সব বিচিত্র কাহিনী প্রকাশিত হচ্ছে। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে পাওয়া এমনি অসংখ্য নজিরের মাত্র কয়েকটি এবার প্রকাশ করা হলো ঃ

রাজশাহী জেলার ভদ্রগ্রামের রিলিফ কর্মকর্তারা রিলিফ গ্রহীতাদের আঙ্গুলের ছাপ নিয়ে সরকারী কাগজপত্রে দাখিল করলেও ২৪শ' টাকার মধ্যে মাত্র ৯শ' টাকা বিতরণ করে বাকি সমস্ত টাকাই আত্মসাত করেছে। এই এলাকার শতকরা ৫৫ জনই রিলিফ পাননি। তাছাড়া সাড়ে পঁচিশ টাকা দরে বিক্রয়ের জন্য সরকার প্রদত্ত ২৫ মণ ধানও এই রিলিফ কমিটি ৩০ টাকা মণ দরে বিক্রয় করে সমস্ত অর্থ আত্মসাত করেছে।

ময়মনসিংহের পরানগঞ্জ ও সিরতা ইউনিয়ন

রিলিফ কমিটির চেয়ারম্যান মিথ্যা আঙ্গুলের ছাপ দেখিয়ে প্রচুর অর্থ আত্মসাত করা ছাড়াও ২শ' টাকা সাহায্য দেয়ার অঙ্গীকার করে জনগণের স্বাক্ষর নিয়ে মাত্র ২০ টাকা করে দিয়ে বাকি অর্থ আত্মসাত করেছে। টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতি থানাধীন ৭নং হরিপুর ওয়ার্ডের জনগণের জন্য প্রদত্ত ১৪টি কম্বলের মধ্যে রিলিফ কমিটির কর্মকর্তারাই ১২টি মেরে দিয়েছেন। উল্লেখযোগ্য যে, এই কমিটির চেয়ারম্যান শান্তি কমিটির সদস্য হিসেবে পাক-বাহিনীর দালালি করেছে। গোপালপুরের অর্জুনা ইউনিয়নের একটি মাত্র বাড়ীই যুদ্ধের সময় পোড়া হলেও রিলিফ কমিটির চেয়ারম্যান সরকারের কাছ থেকে চার হাজার টাকা আদায় করে ইউনিয়ন পঞ্চায়েত চেয়ারম্যানের সাহায্যে সম্পূর্ণ অর্থ আত্মসাত করেছে। ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল থানাধীন পাঁচ পাড়ার একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাটি কাটার জন্য টেস্ট রিলিফের ৬শ' টাকা থেকে মাত্র ৫০ টাকায় মাটি কাটিয়ে পঞ্চায়েত চেয়ারম্যান বাকি সমস্ত অর্থ আত্মসাত করেছে। ঐ গ্রামেই আরেকজন কর্মকর্তা একটি খাল খননের জন্য প্রদত্ত ১২শ' টাকার মাত্র ১৮০ টাকা খরচ করে বাকি অর্থ পকেটে ভরেছে। এরা উভয়েই জনৈক এমসিএ-র সহোদর ভাই।

ঢাকা জেলার ফতুল্লা ইউনিয়নের দুর্গত জনগণের জন্য প্রদত্ত কয়েকশ' বান টিনের একটিও কাউকেই না দিয়ে রিলিফ কমিটির কর্মকর্তারা নিজেদের বাড়ীতে উঠিয়ে রেখেছে। জনতার প্রবল দাবীর ফলে অবশ্য তারা জানিয়েছে যে সেগুলো সরকারকে ফেরত দেয়া হবে। অথচ এই এলাকার অসংখ্য মানুষ এখনো ঘর উঠাতে পারেনি।

ঝিনাইদহ মহকুমার শৈলকুপা থানার ২নং ইউনিয়নের রিলিফ কর্মকর্তারা জনগণকে বঞ্চিত করে ৫ বস্তা গম আত্মসাতের সময় হাতেনাতে ধরা পড়ে। বিক্ষুব্ধ জনগণ পরে রিলিফ কমিটির চেয়ারম্যান, সেক্রেটারী এবং জনৈক সদস্যের গলায় জুতার মালা পরিয়ে মাথায় ঘোল ঢেলে সারা এলাকায় প্রদক্ষিণ করে।

কালিহাতি থানার ১০ নং কোকডোহরা ইউনিয়নের পাক-বাহিনী কর্তৃক পোড়া বাড়ীর সংখ্যা সাড়ে তিন শতাধিক না হলেও কর্মকর্তারা সাত শ'র হিসাব দেখিয়ে সরকারের কাছ থেকে ৫১ হাজার টাকা আদায় করেছে। বাড়ী প্রতি মাত্র ১শ' টাকা দিয়ে রিলিফ কর্মকর্তারা বাকি প্রায় ২০ হাজার টাকা গায়েব করেছে। তারা আবার জনপ্রতি ৭০ টাকা দিয়ে জনগণের কাছ থেকে ভয় দেখিয়ে ১০০ টাকার প্রাপ্তির টিপসই নিয়েছে।

যশোরের মাইজদী কোর্টের জনৈক এমসিএ-র ভাই স্কুল শিক্ষক–ছাত্রদের জন্যে প্রদত্ত পাউডার দুধ আত্মসাত করে বাজারে বিক্রয় করে দেয়ার সময় জনতার হাতে ধরা পড়লে তাকে বেদম প্রহার করা হয়। পরে পুলিশ তাকে রক্ষা করে।

ঢাকা জেলার টঙ্গীবাড়ীর জনৈক আওয়ামী লীগ কর্মকর্তা তার বিশেষ ক্ষমতাবলে মার্কিন দূতাবাস থেকে কয়েক দফায় ঐ এলাকার জনসাধারণের জন্য শাড়ী, ধুতি, গেঞ্জি, পাউডার প্রভৃতি এনে তার নিজস্ব দুটি লোকের মাধ্যমে খোলা বাজারে বিক্রয় করে দিয়েছে।

গৃহযুদ্ধ মুর্দাবাদ

॥ সত্য কিংকর গুপ্ত ॥

বিশ্বের প্রতিটি দেশ এবং জাতির জন্য সবচাইতে দুর্ভাগ্যজনক এবং ভয়াবহ শব্দটি হইতেছে 'গৃহযুদ্ধ'। গৃহযুদ্ধের কালো রক্তের বন্যায় যে সমস্ত জাতি একবার ভাসিতে বাধ্য হইয়াছে তাহারাই ইহার মর্মান্তিক পরিণতির সাক্ষ্য বহণ করিতেছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে এক গৃহযুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল বিচ্ছিন্নতাবাদী দক্ষিণ অঞ্চলবাসীদের দ্বারা। ইতিহাসের সচেতন পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন সেইখানে রক্ত কত সস্তা– মানুষের জীবন কত তুচ্ছ হইয়া উঠিয়াছিল। যুদ্ধের শেষ দিকে যে নারকীয় পৈশাচিকতা ও জিঘাংসা চরিতার্থ সাধনের উপায় হইয়াছিল তাহা স্মরণ করিয়া কিংবা শুনিয়া পরবর্তীকালের অনেকেই দীর্ঘদিন লোমাঞ্চিত হইতেন। অস্ত্রের ব্যবহার শুরু হইলে পরিণতি কি দাঁড়ায় শত শত শূন্যবক্ষ মাতার অশ্রুতে পরিপূর্ণ বাংলাদেশের অধিবাসী হইয়া আমাদের তাহা অনুধাবন করিতে অসুবিধা হয় না। অবশ্যই বাংলাদেশের সংগ্রামকে গৃহযুদ্ধ বলা যায় না, ইহা স্বাধীনতার সংগ্রাম। তবে গৃহযুদ্ধ সংঘটিত হইলে দেশ ও সমাজের চিত্র কিরূপ হয় তাহা বুঝিতে হইলে বিগত নয় মাসের বাংলাদেশকে দেখিলেই চলিবে।

ইন্দোনেশিয়ার গৃহযুদ্ধ আরও মর্মান্তিক আকার ধারণ করিয়াছিল। সি-আই-এ 'মাস্টার-প্লান' অবলম্বন করিয়া ঐ দেশ হইতে শুধু কম্যুনিস্টদের নয়, কম্যুনিস্ট ভাবাপন্ন ও কম্যুনিস্ট-সহানুভূতিশীল সকলকেই নিশ্চিহ্ন করিতে চাহিয়াছিল। ফলে দশ বছরের ভিয়েতনাম-যুদ্ধে যত লোককে মৃত্যুবরণ করিতে হইয়াছে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী লোক মরিয়াছে মাত্র দশ দিনে। মানুষকে জীবন্ত অবস্থায় পুঁতিয়া, অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া, পানিতে ডুবাইয়া, বাঁশগাড়ী করিয়া, শরীরের চামড়া উপড়াইয়া, কাঁটাতারে জড়াইয়া— এইরূপ নানা নৃশংস উপায়ে হত্যা করা হইয়াছে। ইরান ও তুরস্কে দ্রুত বর্ধমান গৃহযুদ্ধের রূপ অনেকটা এই রকমই। আয়ারল্যান্ডের কথা চিন্তা করিয়া দেখুন। ইহার সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন হয় না। কারণ, প্রাত্যহিক সংবাদপত্রে নিয়মিত সেই পৈশাচিকতার বিবরণ প্রকাশিত হইতেছে। এই হত্যাকাণ্ড হইতে শিশু, নারী, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা কাহারও রেহাই নাই।

তবে এই শতাব্দীতে বীভৎসতায় ইন্দোনেশিয়াকে ছাড়াইয়া গিয়াছে বায়াফ্রার কাহিনী। সেখানে যুদ্ধে, নাইজেরীয় জঙ্গী বিমানের বোমা বর্ষণে যত না লোক মারা গিয়াছে তাহার অনেক অধিক মারা পড়িয়াছে ক্ষুধায়। সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় সেখানে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় চরম আকারে এবং শতকরা ৫০ জন বায়াফ্রাবাসী অনাহারে ধুঁকিয়া ধুঁকিয়া অসহায় মৃত্যুবরণ করে। পথে-ঘাটে বহু কংকালসার মৃতদেহের ফটোগ্রাফ দেখিয়া বিশ্ববাসীর নয়ন বিস্ফোরিত হইয়াছিল। ঘাস খাইয়া, গাছের পাতা খাইয়া, বিষাক্ত পচা দ্রব্য খাইয়া মানুষ তবু বাঁচিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু ক্রুর রাজনীতি তাদের বাঁচিতে দেয় নাই।

সুতরাং যাহারা অস্ত্রের হুমকি দিতেছেন তাহাদের শুদ্ধ হইতে বলি। বারংবার বলি— রক্ত নয়, আর রক্ত নয়। কিন্তু বিবেক ও শুভ বুদ্ধির জাগরণ সহজে হয় না। কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভাঙানো সহজ কিন্তু ইহাদের বেলায় তাহা মোটেই সুসাধ্য বলিয়া মনে হয় না। বরং বাংলাদেশ সরকারের কোন কোন কার্যকলাপ সেই রক্তপিপাসু শক্তিকে উস্কাইয়া দিতেছে বলিয়া অনেকেই মনে করিতেছেন। বিশেষ করিয়া জঙ্গী লালবাহিনী সংগঠনকে অনেকে সন্দেহের চোখে দেখিতেছেন। খুলনায় পুলিশের সাথে এই বাহিনীর গোলাগুলি বিনিময়ের পর হইতে ইহাদের যে কি পরিমাণ

শক্তি ও মদদ জোগান দেওয়া হইয়াছে তাহা সকলেই অনুমান করিতে পারিয়াছেন। এই বাহিনী দ্বারা বামপন্থী দমন বা নির্মূল করা হইবে বলিয়া দেশের ও বিদেশের বিভিন্ন সংবাদপত্রে পর্যালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা হইলে মনে হয় অপর পক্ষও নীরব থাকিবে না। আক্রমণ না করিলেও আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা তাহাদের করিতে হইবে। তাহা ছাড়া লালবাহিনীর মত প্রকাশ্য সশস্ত্র সংগঠন না থাকিলেও অন্যান্য ছোট বড় সকল রাজনৈতিক দলগুলোর অপ্রকাশ্য জঙ্গী বাহিনী রহিয়াছে বলিয়া যদি কেহ মত প্রকাশ করেন তবে বিস্ময় বোধ করিব না। মোটের উপর বেআইনী অস্ত্রশস্ত্রের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে অধিক বলিয়াই সকলের ধারণা। দেশের সর্বত্র আজকাল সশস্ত্র দুস্যুদলের বেপরোয়া অভিযান চলিয়াছে। রাজধানীর জীবন ও পল্লীজীবনের অবস্থা একইরূপ, শান্তিতে কেহ নিদ্রা যাইতে পারেন না। বিগত মুক্তি সংগ্রামে পেশাদার ডাকাতদের অধিকাংশই নিহত হইয়াছে। তাহা হইলে এখন যাহারা ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করিয়াছে ইহারা কারা? নিশ্চয়ই নতুন ডাকাতের দল। এখন কোন রাজনৈতিক দল যদি ইহাদের ব্যবহার করিতে শুরু করে তবে ব্যাপারটা কি দাঁড়াইবে।

গৃহযুদ্ধ অত্যাসন্ন বলিতে চাহি না, তবে গৃহবিবাদ যে চলিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা গৃহযুদ্ধের বিরোধী, গৃহবিবাদেরও। গৃহযুদ্ধের মাধ্যমে শ্রেণী সংগ্রামের কি উত্তরণ ঘটিবে অথবা দেশবাসীর কোন মহান স্বার্থ রক্ষিত হইবে তাহা আমরা বলিতে পারি না। আমরা বাংলাদেশে আর রক্তপাত দেখিতে চাহি না, ইহাই মূল কথা। গৃহযুদ্ধের মাধ্যমে বামপন্থী বা দক্ষিণপন্থী কাহার স্বার্থ সিদ্ধি হইবে জানি না, তবে সচেতন বাঙালী মাত্রেই এই ষড়যন্ত্রের প্রতিরোধে যে অগ্রসর হইবেন তাহাতে সন্দেহ পোষণ করি না।

ফতুল্লায় কৃষক সম্মেলন

গত ২৮শে মে বাংলাদেশ কৃষক সমিতির ফতুল্লা থানা শাখার এক বিরাট কর্মী সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণ দিতে গিয়ে কেন্দ্রীয় সংগঠক জনাব রাশেদ খান মেনন অবিলম্বে ভূমিহীন এবং গরীব কৃষকদের মধ্যে জমি এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে সুদমুক্ত দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দেয়ার দাবী জানিয়েছেন।

কৃষক নেতা জনাব বরকত আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই কর্মী সমাবেশ শেষে জনাব মনসুর আলী এবং জনাব মোশাররফ হোসেনকে যুগ্ম আহ্বায়ক নির্বাচিত করে ফতুল্লা থানা কৃষক সমিতির সাংগঠনিক পরিষদ গঠন করা হয়।

বাউফল থানা ন্যাপ সম্মেলন

সম্প্রতি বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির বাউফল (পটুয়াখালী) থানার কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় সংগঠক জনাব আবদুল করিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলন শেষে জনাব আবদুর রসিদকে সভাপতি এবং জনাব রিয়াছ মাহমুদকে সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত করে একটি শক্তিশালী থানা কমিটি গঠন করা হয়।

ন্যাপের সকল শাখার প্রতি

মওলানা ভাসানীর নির্দেশ

বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির আহ্বায়ক মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল

হামিদ খান ভাসানী পার্টির সকল ইউনিটের প্রতি এক জরুরী বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন যে, আগামী ১৯ ও ২০শে আগস্ট টাঙ্গাইল শহরে বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির জাতীয় কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত হবে।

আগামী ৩০শে জুলাইয়ের মধ্যে "ন্যাপে" সকল জেলার মহকুমা ইউনিটের নির্বাচন শেষ করে যথাসময়ে কেন্দ্রীয় কাউন্সিলারদের নামের তালিকা আহ্বায়কের নিকট প্রেরণ করতে হবে।

এমসিএ-দের কাণ্ড

দেশ স্বাধীন হবার পর এমসিএ-দের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ উত্থাপিত এবং প্রমাণিত হয়েছে, গুরুত্বের দিক দিয়ে তা মুজিব সরকারের রিলিফ ও প্রশাসক কেলেঙ্কারীর চেয়ে কোন অংশে কম নয়। ইয়াহিয়ার গণস্বার্থ বিরোধী আইনগত কাঠামোর অধীনে নির্বাচিত এই এমসিএ-রা দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি এবং স্বেচ্ছাচারিতার ক্ষেত্রে আইউবের বিডি চেয়ারম্যানদেরকেরও ছাড়িয়ে গিয়েছেন।

গণপ্রতিনিধি বলে দাবীদার এমসিএরাও নিশ্চয়ই একথা স্বীকার করবেন যে, দু'একজন ছাড়া জনগণ তাদের কাউকেই ভোট দেননি– দিয়েছেন শেখ মুজিবকে। জনগণকে সেবার মহান অঙ্গীকার করে তারা 'মুজিব ভাই'–এর দোহাই দিয়ে পরিষদে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

বাংলাদেশের বীর সন্তানেরা যখন জীবনবাজী রেখে পাকিস্তানী হানাদারদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন, এমসিএ সাহেবরা তখন ভারতের বুকে দিব্যি আরামে নির্লজ্জের মতো বড়াই করে ঘুরে বেড়িয়েছেন, বড় বড় হোটেলে পার্টি খেয়েছেন। তাই বিপ্লবত্তোর দেশের গণপ্রতিনিধিদের যে গণমুখী চরিত্র থাকা দরকার– তা এদের নেই।

দেশ স্বাধীন হবার পর আবার তারাই সমস্ত বাহাদুরী নিতে ময়দানে নেমে গেছেন। তাদের চাটুকারিতার ফলে প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধারা আজও তাদের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিতই হয়ে আছেন।

দেশ গড়ার পরিবর্তে তারপর শুরু হলো এমসিএ-দের 'পুনরুদ্ধার অভিযান'। পাক-হানাদাররা প্রথম দফাতেই তাদের অনেকের ঘর-বাড়ী পুড়িয়ে দিয়েছিল, লুট করেছিল জিনিসপত্র। অতএব, মুখে দেশ গড়ার কথা বললেও সর্বাগ্রে তারা নিজেদের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যই উঠে-পড়ে লেগে গেলেন। শুরু হলো দালান তোলা, জিনিসপত্র জোটানো আর জীবনের সাধ গাড়ী কেনা। টাঙ্গাইলের হাইওয়ান এমসিএটি তো মদের লাইসেন্স ইস্যু করে কামানো ১৩ হাজার টাকা দিয়ে আস্ত একটি জীপই কিনে ফেললেন। জনগণের অশুভ চরিত্রে মর্মাহত অপর এমসিএ–র দালান তোলাই এখনো শেষ হলো না। তবে তার ফকফকে জীপটি দেখা যায় যত্রতত্র। কিন্তু যদি প্রশ্ন করা যায় ঃ এত টাকা এরা কোত্থেকে পেলেন, তাহলেই সকলে আটকে যাবেন। দেশব্যাপী খোঁজ নিলে দেখা যাবে, অনেক এমসিএ এমনকি জমি পর্যন্ত বিক্রি করেও নির্বাচন যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

রাজনীতিতে অনভিজ্ঞ এবং জনসেবার মূলমন্ত্রে অদীক্ষিত এই মুজিব-সর্বস্ব এমসিএ-দের কার্যকলাপে অবাক হবার কিছু নেই। কেননা এদের যে শ্রেণী চরিত্র, তা শুধু তাদের শিখিয়েছে অন্যকে ঠকিয়ে নিজের বস্তা বোঝাই করতেই। সত্যি কথা বলতে কি, শেখ সাহেবের জনপ্রিয়তা এবং আওয়ামী লীগের সংগঠন বর্ণচোরা সব এমসিএ-দের রক্ষা করে চলছে। তা না হলে জনতার রুদ্ররোষে কবেই তারা ভস্ম হতো।

এবার আরো কয়েকজন এমসিএ-র কাণ্ড প্রকাশ হলো ঃ

দেশী ও বিলেতী

কুমিল্লার জনৈক এমসিএ টেক্সটাইল মিলের পরিচালক নির্বাচিত হবার পর প্রাক্তন মিল ম্যানেজারের প্রায় ২০ হাজার টাকা মূল্যের আসবাবপত্র হেফাজতে রাখার নামে নিজে আত্মসাত করেছেন। এ ব্যাপারে বিলেতী কুকুরটিও তার হাত থেকে রেহাই পায়নি। তাছাড়া নতুন যে আঠারটি রেশনের দোকান খোলা হয়েছে, তিনি নিজেই তার মধ্যে ছয়টির মালিক হয়ে বসেছেন। আর সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, কোন লোকই নাকি এমসিএ-র দোকান ছয়টি থেকে কোন জিনিস কিনতে পারেননি।

নাবালক প্রশাসক

কুমিল্লার আরেক এমসিএ অলৌকিক কেরামতির বদৌলতে নিজের নাবালক শ্যালকটিকে শত্রুসম্পত্তি বলে ঘোষিত একটি বাণিজ্যিক সংস্থার প্রশাসক নিয়োগ করেছেন।

রিলিফী কলেজ

এবারের এমসিএ-র নিবাসও কুমিল্লা জেলায়। ইনি আবার একটু মহৎ কাণ্ড করেছেন। নিজের এবং স্ত্রীর স্মৃতিকে অমর করার জন্য তিনি তাদের নামে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু যখন ফাঁস হয়ে পড়লো যে তিনি রিলিফের টাকা গায়েব করে এই কলেজটি করছেন, তখন স্থানীয় জনগণ বিক্ষোভ সভার আয়োজন করলেন। আর সাথে সাথে এমসিএ সাহেব পাঠালেন তার ভাড়াটে গুণ্ডাদেরকে। জনতার উপর গুণ্ডারা আক্রমণ চালালে উঠতে থাকলো-এমসিএ বিরোধী মুহুর্মুহু শ্লোগান। পরে পুলিশ পরিস্থিতি আয়ত্তে আনার দোহাই দিয়ে জনতার উপর গুলি বর্ষণ করলে একজন বালক নিহত হয়।

আত্মীয় খাল

বরিশাল জেলার গৌরনদী থানার কতিপয় এলাকায় ইরি ব্লকের পানি সেচের জন্য বাঁধ কাটানোর উদ্দেশ্যে সরকার অর্থ মঞ্জুর করলে স্থানীয় এমসিএ সাহেব তার ক্ষমতার বলে তা বাতিল করে এ টাকায় নিজের আত্মীয়স্বজনদের সুবিধার্থে একটি প্রয়োজনীয় খাল বন্ধ করিয়ে নিয়েছেন। ফলে পানির তীব্র অভাবে বিনষ্ট হয়ে গেছে ৫০ হাজার মণ ধান।

টেলিফোনিক টাউট

বগুড়ার জনৈক এমসিএ সম্প্রতি এগারোজনের নামে তার বাড়ী লুটের মামলা দায়ের করেই শুধু ক্ষান্ত হননি, রেহাই দেয়ার মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে টেলিফোনিক ধমকে আসামীদের কাছ থেকে আদায় করেছেন প্রায় ৫০ হাজার টাকা ঘুষ। ওদিকে থানা কর্তৃপক্ষকেও জোর তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। লুট হওয়া আসবাবপত্রের যে হিসেব তিনি দাখিল করেছেন, তার সর্বমোট মুল্য মাত্র ২ লক্ষ ৬২ হাজার ২০ টাকা। বিস্মিত জনগণের আজ শুধু একটিই প্রশ্ন– এত টাকার জিনিস সত্যিই কি তার ছিল?

রিলিফী সফর

বগুড়া জেলার জনৈক এমসিএ সে বার এক রিলিফী সফরে বেরিয়েছিলেন। এই সফর এবং আনুসঙ্গিক খরচ বাবদ তিনি শেরপুর রিলিফ কমিটির কাছে যে ভাউচার পেশ করেছেন, তা থেকে তাঁর খরচের বহর পাওয়া গেছে ঃ উদ্বাস্তু শিবির পরিদর্শনের জন্যে শেরপুর যাতায়াত ৩৫ টাকা, রিলিফ কমিটি

গঠনের জন্য শেরপুর যাতায়াত ৩০ টাকা, শেরপুর রিলিফ কমিটির কাজ তদন্তের জন্যে যাতায়াত ৩৫ টাকা, সীমাবাড়ীর মিটিংয়ে যাতায়াত (মাত্র ২৪ মাইল) ৬০ টাকা, বগুড়া-ভবানীপুর যাতায়াত ৬৫ টাকা, শেরপুর রিলিফ কমিটির মিটিংয়ে যোগদানে ৬০ টাকা, শেরপুরে মন্ত্রীর মিটিংয়ে যোগদান বাবদ গাড়ী ভাড়া ৬৫ টাকা, বগুড়া কম্যুনিটি সেন্টার থেকে মাত্র ১ মাইল দূরে এমসিএ-র বাসভবনে এক ট্রাক কম্বল পরিবহনের জন্যে ৪০ টাকা, ঐ কম্বল ঘরে তোলার জন্যে আরো ৪০ টাকা, শেরপুর মিটিংয়ে যোগদান ৬০ টাকা, অপর মিটিংয়ে যোগদান ৩০ টাকা, আরেকটি মিটিংয়ে যোগদান ৩৫ টাকা। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের এই এমসিএটির সর্বমোট খরচ মাত্র পঁচিশ শ' চার টাকা।

অনাহারে এখনো মানুষ মরছে

মুজিব-সরকারের সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার এত বড় বড় বুলির রাজত্বেও বাংলাদেশে প্রত্যহ অগণিত মানুষ ক্ষুধার নিদারুণ যন্ত্রণায় গলায় ফাঁসি নিয়ে আত্মহত্যা করছে। পটুয়াখালী জেলার বাউফল থানার হাকিম আলী এবং মালেক ফরাজী সম্প্রতি সন্তানদেরকে ক্ষুধায় আহার জোগাতে ব্যর্থ হয়ে ফাঁসি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। এরা প্রত্যেকেই মৃত্যুর সময় স্ত্রী ও কয়েকটি অসহায় সন্তান রেখে গেছে।

ময়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছা থানাধীন ভাবকি গ্রামের জনৈকা মহিলাও পরপর চারদিন অনাহারে থাকার পর আত্মহত্যা করেছেন। পর্যাপ্ত রিলিফ-দ্রব্য থাকা সত্ত্বেও কর্মকর্তাদের আত্মসাত ও অবহেলার দরুণ এই এলাকার জনগণ অনাহারে দিন কাটাচ্ছে।

আবার ইজারা

বাংলাদেশ সরকার দেশের সমস্ত জলমহালের ইজারা শুধু মৎস্যজীবীদের কাছে পত্তন দেয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেও বিভিন্ন স্থানে সরকারী নির্দেশ উপেক্ষা করে প্রাক্তন ইজারাদারদেরকে পত্তন দেয়ার খবর পাওয়া গেছে। জামালপুর মহকুমার কয়েকটি এলাকাতেও সমবায় ও রাজস্ব বিভাগের কর্মকর্তারা প্রচুর ঘুষের বিনিময়ে প্রাক্তন ইজারাদারদিগকে জলমহালের পত্তন দিচ্ছে। তারা কৃষক এবং অন্যান্য শ্রেণীর শ্রমজীবী মানুষদেরকে মৎস্যজীবীরূপে চিত্রিত করে এসব জলমহাল পত্তন নিয়েছে।

হাট-বাজারের ইজারা প্রথা নিষিদ্ধ হলেও বিভিন্ন এলাকায় এখনো রীতিমত জনগণের কাছ থেকে ইজারা তোলা হচ্ছে। নারায়ণগঞ্জ মহকুমার নবীগঞ্জ হাটের বাতিলকৃত ইজারাদার মোঃ টনিক মিয়াকে একশত টাকা ঘুষের বিনিময়ে আবার ইজারাদারী দেয়া হয়েছে। সে এখন জনসাধারণের কাছ থেকে উনিশ পয়সার স্থলে দেড় টাকা করে বেআইনী ইজারা আদায় করছে।

ঢাকা জেলার মনোহরদী থানাধীন চালাকচর বাজারেও স্থানীয় তহশিল কর্মচারীরা বেআইনীভাবে ইজারা আদায় করে জনমনে ক্ষোভের সঞ্চার করেছে।

মুরিদের দরবার

ব্যক্তিগত মালিকানা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আল-কুরআনে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন ঃ

"তিনি তোমাদিগকে খলিফা বা প্রতিনিধি মনোনীত করেছেন– আর কাউকে অপরের উপর মর্যাদাসম্পন্ন করেছেন–যাতে তোমাদের

প্রতি তার দান সম্বন্ধে তিনি তোমাদিগকে পরীক্ষা করতে পারেন ; নিশ্চয়ই তিনি দ্রুত দন্ডদাতা, তেমনি ক্ষমতাশীল ও করুণাময়।"

মানুষ এ পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি মাত্র। আল্লাহ্‌র মালিকানাভুক্ত সম্পদের তত্ত্বাবধানের ভার ন্যস্ত হয়েছে মানুষের উপর। ব্যক্তি বিশ্বে আল্লাহ্‌র সম্পদের তত্ত্বাবধান করবে নিজের কল্যাণের জন্যে, আল্লাহ্‌র কল্যাণের জন্যে। খলিফা বা প্রতিনিধি সম্পদের মালিকানা দাবী করতে পারেন না। যাকে তত্ত্বাবধান বা রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সে যদি তার নিকট আমানতস্বরূপ রক্ষিত সম্পদের নিজেই মালিক হয়ে বসে তাহলে প্রকৃত মালিকের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়।

মালিক যদি আমানতদারকে তাঁর সম্পদের কিছু অংশের মালিক বলে স্বীকার করে নেয় তাহলে হয়তো তত্ত্বাবধানকারী খলিফা কিছুটা সম্পদের মালিক হতে পারে। কিন্তু আমরা দেখি আল-কুরআনে আল্লাহ বার বার ঘোষণা করেছেন যে বিশ্বে যা কিছু আছে তার মালিক একমাত্র তিনিই, সে অবস্থায় খলিফা যদি খিলাফত ত্যাগ করে মালিকই হয়ে বসে তবে তা হবে খোদ মালিকের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা এবং সীমা লঙ্ঘন করা।

আল-কুরআনের বিভিন্ন আয়াত বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে মালিকানা একটি মাত্র সত্তায় সীমিত ঃ সে মহান এবং পরম সত্তা আল্লাহ্‌। মালিকানার অধিকার আল্লাহ্‌র নিজস্ব অধিকার। আল্লাহ্‌ কতকগুলো অধিকার মানুষকে দিয়েছেন, আর কতগুলো অধিকার আছে শুধুমাত্র আল্লাহ্‌রই, এর মধ্যে হাত দেওয়ার অধিকার কোন মানুষের নেই। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ইবাদত বা আনুগত্যের অধিকার। এ জাতীয় অধিকারগুলো আল্লাহ্‌র একচেটিয়া অধিকার, এ অধিকারগুলোর বিন্দুমাত্রও আল্লাহ্‌ কাউকে দেননি। যিনি এ অধিকার দাবী করবেন, তিনি আল্লাহ্‌র ব্যক্তিগত অধিকারে হস্তক্ষেপ করবেন। এরূপ হস্তক্ষেপকারী মুশ্‌রিক। মালিকানার অধিকারটিও আল্লাহ্‌র বিশেষ অধিকার। আল্লাহ্‌ সাথে মালিকানার অংশীদার হওয়ার অধিকার তিনি কাউকে দেননি।

আলিমদের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ্‌র মালিকানা স্বীকার করে মানুষের জন্য 'অধীনস্থ মালিকানা' দাবী করেন। তারা আল্লাহর মালিকানায় বিশ্বাস করেন এবং আল্লাহ্‌র সঙ্গে নিজেরাও মালিক হওয়ার দাবী করেন।

সংসারে এমন লোকও আছে যারা আল্লাহ্‌কে মুখে মুখে ইলাহ বা প্রভু বলে স্বীকার করলেও বাস্তব জীবনে নিজেরাই প্রভু হয়ে বসে। তারা সহায়হীন হতভাগ্য মানুষের উপর খোদায়ী কায়েম করে এবং আল্লাহ্‌ দ্বীনকে পরিত্যাগ করে নিজেদের খেয়াল-খুশী মতো জীবনব্যবস্থা কায়েম করে। তিনি যদি এ কথাটুকুও স্বীকার করতেন যে, আল্লাহ্‌কে মুখে মুখে সমস্ত সম্পদের মালিক বলে স্বীকার করে নিয়েও ব্যক্তিগত মালিকানা দাবী করে নিজের স্বার্থ এবং প্রবৃত্তির নির্দেশ অনুসরণ ইসলামী জীবন-দর্শনের সাথে সম্পূর্ণ সংগতিহীন-তবে তাঁর বক্তব্য আরো জোরদার হতো।

যখনই কোন নবী আল্লাহ্‌র আইনের সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করেছেন, মানুষকে তাদের কর্তৃত্বাধীন সম্পদ নিজেদের ইচ্ছার পরিবর্তে আল্লাহ্‌র ইচ্ছানুসারে ব্যয় করার আহ্বান জানিয়েছেন, তখনই দুনিয়ার ক্ষুদে খোদাগণ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে-খোদার আইনের বিরোধিতা করার জন্য এগিয়ে এসেছে। কারণ, তারা চায় নি যে, বিশ্ব সংসারে জীবনসামগ্রী নিজেদের খুশী মতো ব্যবহার না করে উহার নিরঙ্কুশ মালিক আল্লাহ্‌র বিধানমতে ব্যবহার করবে। এই দুনিয়ার ক্ষুদে খোদাগণই দাঁড়িয়েছে আল্লাহ্‌র প্রেরিত নবীদের বিরুদ্ধে এবং তারাই নিপীড়িত মানবকে দাসত্ব শৃঙ্খল হতে মুক্ত করার সংগ্রাম প্রতিহত করেছে। (চলবে)

এসো শপথ নেই

রওশন আরা রিনু

এসো শপথ নেই।
নিপীড়িত মানুষ যারা আছ
সর্বহারার সারিতে যারা আছ
তোমরা এসো। শপথ নেই–
বল, শুকনো পাতার শান্তনা বাণী চাই না
মিষ্টি কথার বুলি আর শুনবো না।
অন্নের অন্বেষণে আত্মার হাহাকারে
বাংলার আকাশ ছেঁয়ে গ্যাছে চেয়ে দ্যাখ।
অসহ্য ক্ষুধার যন্ত্রণা তোমরা বুঝছ কি ?
নিরস্ত্র শরীরের লজ্জা নিবারণের যন্ত্রণায় ভুগেছ কি?
অবহেলার তীক্ষ্ণ চোখের দৃষ্টিতে
মনের দেহটি ক্ষতবিক্ষত হয়েছে চেয়ে দেখেছ কি?
আর নয়–শেষ হয়েছে শান্তনার আয়ু।
সর্বহারার দল তোমরা এসো।
নরম কথায় মাথা নিচু করে সম্মতি আর নয়।
প্রয়োজন হলে রক্তের বিন্দু দিয়ে আল্‌পনা আঁকবো।

বন্ধু, অনুরোধ

কামরুল ইসলাম

বন্ধু, তোমাকে একটা খবর বলি
মৃত্যুর পরওয়ানা নিয়ে এসেছি আমি
যারা আমার সদ্য মুক্ত মায়ের
বিধ্বস্ত পাণ্ডুর দেহের
সজিবতা নিয়ে বেসাতি করে
তাদের পরওয়ানা নিয়ে এসেছি আমি।
আমার হাত আবার নিশপিশ করছে
সেদিনের মত যেদিন আমার মাকে
ওরা লুটতে চেয়েছিল বিনা দামে।
সেদিনের মত
আমি আবার ট্রিগার চেপে বসে আছি
মজুতদার, লুটেরা আর সদ্যস্ফীত
মোড়লের বুক তাক করে, যারা
আমার রুগ্ন মায়ের দেহে কলঙ্ক লেপনে
ব্যস্ত নিজেদের ইপসিত সাধনে।
বন্ধু, অনুরোধ, তাদেরকে সাবধান
করে দাও শেষবারের মতো।

ভাসানীর বাণী

কৃষক সমিতি গদি দখল করার জন্যে নয়, লুটপাটের জন্যে নয়, বাড়ী-গাড়ীর জন্যেও নয়— শ্রেণী সংগ্রামের মাধ্যমে পুঁজিপতি মহাজন তথা শোষক শ্রেণীকে উৎখাত করে সমাজতন্ত্র কায়েমই এর লক্ষ্য।

বিশ্ববাসী জেনে রাখো, আরো ৫০ লক্ষ লোককেও যদি শহীদ হতে হয় তবু বাঙালী জাতি ভারত, রাশিয়া, আমেরিকা বা চীনের গোলাম হবে না।

তোমার আইন

আবু সালেহ

আইন আইন কোরছো কেনো
আইন রাখো, বসতায়
তোমার আইন গুদোম পচা
তাই দিয়েছো সস্‌তায়।
তোমার মতো ব্যবসা ফেঁদে
অনেক নেতাই উঠলো কেঁদে
চিন্তা কোরে তারাও এখোন
ভীষণ রকম পসতায়
আইন রাখো বসতায়।

মহিউদ্দীন সিআইএ-র দালাল তাই—

মস্কোপন্থীদের এককালের 'বরেণ্য নেতা' মহিউদ্দীন আহমদ অবশেষে বাংলাদেশের কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্যপদ হারিয়েছেন। ন্যাপে বিভেদ সৃষ্টি করে একসময় তিনি তথাস্তুবাদীদের অত্যন্ত প্রিয় পাত্রে পরিণত

হয়েছিলেন। কিন্তু হালে আওয়ামী লীগের তৎপরতা সম্পর্কে তাঁর মনোভাব কোন কোন মস্কোবাদীদের মনঃপুত না হওয়ায় তাকে কোণঠাসা করার চেষ্টা শুরু হয়। এই বাবদ মস্কোবাদীরা অজুহাতও খুঁজে পায় একটা— কি? —না মহিউদ্দীন সিআইএ-র চর। সে এডওয়ার্ড কেনেডীকে মালা দিয়ে অভ্যর্থনা জানিয়েছে।

ব্যস আর যায় কোথা। মোজাফফর ন্যাপের সম্মেলনে মহিউদ্দীনকে একেবারে সিআইএ-র দালাল বানিয়ে কোষাধ্যক্ষ থেকে নীচে ফেলে দেয়া হলো। রাজনৈতিক কাজকর্মের যাতে সে কোন সুযোগ না পায় তারও ব্যবস্থা করা হলো। অগত্যা ন্যাপ-বিসর্জিত হয়ে এতিমের মত ক'দিন বরিশাল-পটুয়াখালী ঘুরলেন মহিউদ্দীন।

এদিকে তার মূল সঙ্গী মস্কোবাদী কম্যুনিস্ট পার্টিও বসে থাকল না। তারা এক গোপন সার্কুলারে ঘোষণা করে দিল যে মহিউদ্দীন আর কম্যুনিস্ট পার্টির সভ্য নন।

অবশ্য তার বিরুদ্ধে সিআইএ-র যোগসাজশের অভিযোগে আনলেও মোজাফফর ন্যাপ থেকে কিন্তু তাকে বহিষ্কার করা হয়নি—সেখানে তিনি কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য রয়েছেন।

কথিত 'সিআইএ-র' সাথে মিতালী কি করে অক্ষুণ্ন থাকে তা কিন্তু প্রকাশ্যে বা গোপন প্রচারে কোথাও বলা হয়নি।

কৃষি বিপ্লবের নমুনা

টাঙ্গাইল জেলার কৃষি অফিসার সাহেব সরকার ঘোষিত কৃষি-বিপ্লবের অপূর্ব নমুনা দেখিয়েছেন। ইরি পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য যে তিনজন অতিরিক্ত থানা কৃষি কর্মচারীকে টাঙ্গাইলের জন্য নিয়োগ করা হয়েছিল, দীর্ঘ এক বছর কেটে গেলেও তাদের কাউকেই গ্রামে না পাঠিয়ে তিনি এখনো অফিসের ফাইলপত্রেরই সেবা করাচ্ছেন। শস্য-সংরক্ষণ বিভাগের মেকানিক্সকে পোকা-মাকড় ধ্বংস, ঔষধ সিঞ্চন বা যন্ত্র মেরামতের জন্যে গ্রাম এলাকায় না পাঠিয়ে কৃষি অফিসার সাহেব বরাবরই নিজের গাড়ীটির পেছনে লাগিয়ে রেখেছেন। ওদিকে শতাধিক ঔষধ সিঞ্চন যন্ত্র মেরামত অভাবে এখনো অকেজো হয়ে পড়ে রয়েছে।

সরকারের পাট উৎপাদন বিভাগের টাঙ্গাইল জেলা অফিসার এবং প্রতি থানার জন্য একজন করে কৃষি গ্র্যাজুয়েটকে নিয়োগ করা হলেও তাদের কেউই আজ পর্যন্ত গ্রামে না গিয়ে জেলা-সদরে বসে বসে পাট উৎপাদন বৃদ্ধি করছেন বলে জানা গেছে।

নাগরপুর থানার গরীব কৃষকদের জন্য সরকার প্রদত্ত কৃষি ঋণের ১ লাখ ২৬ হাজার টাকা এখনো বিতরণ করা হয়নি। ঋণ চাইতে কৃষি অফিসারের কাছে গেলে তিনি নাকি কোন কথাই বলেন না। অথচ কৃষকদের ঋণ দরকার এই মৌসুমে। কেননা, বর্ষায় তাদের হাতে নতুন পাটের টাকাই নগদ থাকবে। কৃষি বিপ্লবের রব উঠেছে— সেবার প্রধানমন্ত্রী তো নিজেই দু' কোদাল মাটি কেটেছেন। কিন্তু এই যদি সারাদেশে কৃষি বিপ্লবের চেহারা হয়, তাহলে কৃষক আর ফসলের কী অবস্থা হবে তাই-ই ভাবনার বিষয়।

অসহায় পিতা দালাল দারোগা ও তার টিকটিকি

পাক-বাহিনীর আমলে নাগরপুর থানার ওসি পদে প্রমোশনপ্রাপ্ত সেই সর্বজনপরিচিত দারোগা সাহেবটি জনৈক মুক্তিযোদ্ধার পিতা ও ভাইকে গ্রেফতার এবং নির্যাতন চালানোর পর তাদের কাছে এক হাজার টাকা ঘুষ দাবী করেছিলেন। হানাদারদের হাতে মৃত্যুর আশংকায় তারা ঘুষ দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। পরে তাদের ছেড়ে দেয়া হয়।

দেশ স্বাধীন হবার পর মুক্তিযোদ্ধাটি দারোগা সাহেবকে পাকড়াও করলে তিনি নগদ দু'শ টাকা দিয়ে ঘুষের বাকি টাকা ফেরৎ দেয়ার অঙ্গীকার করেন। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে সুযোগ পেয়ে তিনি আবার তাদের পেছনে লেগেছেন। এবার তিনি হুমকি দিয়েছেন, তার কাছ থেকে ফেরৎ নেয়া দু'শ টাকা না দিয়ে দিলে তাদেরকে দালালীর কেসে ফেলে অকথ্য অত্যাচার করা হবে। মুক্তিযোদ্ধাটির অসহায় পিতা এ ব্যাপারে মন্ত্রী মহোদয়দের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও এখনো তিনি পলাতক রয়েছেন। আর এদিকে ঘুষখোর দারোগা সাহেব তাদের গ্রেফতারের জন্যে সর্বক্ষণ টিকটিকি লাগিয়ে রেখেছেন।

চাঁদার হার ঃ
বাৎসরিক– ১০ টাকা
ষাণ্মাসিক – ৬ টাকা

ডিপি ধরের আলখেল্লা পরে সিদ্ধার্থ বাবু এসেছিলেন

বাংলাদেশে দুর্যোগের রাজনীতির অশুভ সূচনা

বাংলাদেশে দুর্যোগের রাজনীতির অশুভ সূচনা আনুষ্ঠানিকভাবে হয়ে গেছে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থ শংকর রায় সম্প্রতি এদেশ সফরকালে এ ব্যাপারে পাকাপাকি বন্দোবস্ত করে গেছেন।

সিদ্ধার্থ বাবু রাজধানী ঢাকায় অবস্থানকালে এদেশের অধিকাংশ মন্ত্রীর সাথে 'অত্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ' পরিবেশে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে প্রধানতঃ দুইটি বিষয়ে মতৈক্যে পৌঁছেছেন ঃ (১) চোরাচালানী বন্ধ ও রাষ্ট্রবিরোধীদের মোকাবিলার জন্যে বাংলাদেশ ও ভারত সরকার সীমান্ত এলাকায় যৌথ 'কঠোর' ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং দুই দেশের মধ্যে পাসপোর্ট-ভিসা প্রবর্তন করে সফর নিয়ন্ত্রণে কড়াকড়ি আরোপ করবেন।

চোরাচালানী বন্ধের প্রশ্নে ভারত সরকারের আগ্রহ 'মাছ দিয়ে শাক ঢাকার চেষ্টা' বৈ কিছু যে নয়— তার প্রমাণ রয়েছে সিদ্ধার্থ বাবুর কথায়। তিনি বলেছেন— "বাংলাদেশ হতে ভারতে মাছ পাচার হচ্ছে না।" বাংলাদেশের বাণিজ্য মন্ত্রীও জানিয়েছেন যে, সীমান্ত বাণিজ্য— যা চোরাচালানীর আইনগত স্বীকৃতি স্বরূপ— স্থগিত রাখা হয়েছে।

অবশ্য বাংলাদেশের বাজার সম্পর্কে যারা ওয়াকেফহাল তারা জানেন চোরাচালানী সত্যি সত্যি হচ্ছে কি হচ্ছে না।

চোরাচালানীর প্রসঙ্গ, সুতরাং, কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তা বলা যায় না। তবে এর দ্বিতীয় অধ্যায় অর্থাৎ রাষ্ট্রবিরোধীদের দমনে দুই দেশের যৌথ ব্যবস্থার কথাটি যে বাংলাদেশের জন্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তাতে সন্দেহ নেই। কেননা, মিত্র রাষ্ট্রের সাথে এ মতৈক্য বাংলাদেশের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে এক নতুন অধ্যায়ের সংযোজন। আর সে অধ্যায় যে এক ভয়াল ভবিষ্যতের ইঙ্গিতবাহী তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই।

রাষ্ট্রদ্রোহিতার বিশেষ কোন সংজ্ঞা নেই। অতীতে পাকিস্তান আমলে দেখা গেছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কথা বললে, বাংলা ভাষার জন্যে কথা বললে কিংবা জনগণের কোন ন্যায় সংগ্রামে অংশগ্রহণ করলে স্বার্থবাদী ক্ষমতাসীন মহল ঢালাও রাষ্ট্রদ্রোহী আখ্যা দিয়ে জেলে পুরে রেখেছে। সরকারী প্রচারযন্ত্রগুলো তথাকথিত জাতীয় সংহতির জন্যে গলা ফাটিয়েছে।

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশেও ঐ মানসিকতা নতুন চেহারা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। এখন বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব বা স্বার্থের প্রশ্নে কোন কথা বললেই একটি মহল চেঁচিয়ে উঠেছে— গেল গেল মৈত্রী গেল। শুধু মৈত্রীই গেল নয়— এদের কথার মর্মার্থ হল মৈত্রীর

বিরুদ্ধে কথা বলাই রাষ্ট্রদ্রোহিতা। সুতরাং কঠোর দণ্ডযোগ্য।

ভারতে বিশেষত পশ্চিমবাংলা, মেঘালয়, ত্রিপুরা, আসাম প্রভৃতি রাজ্যের জনগণ বাংলাদেশের জনগণের জন্যে যে ত্যাগ স্বীকার করেছেন ইতিহাসে তার নজীর নেই। দুই দেশের জনগণের মধ্যে যে গভীর মৈত্রী এভাবে গড়ে উঠেছে তাও ভাঙা সহজ নয়। কিন্তু এই মৈত্রীর নামাবলী গায়ে জড়িয়ে শোষণের জাল ফেলবার অবাধ সুযোগ করে দেয়া তো মৈত্রী রক্ষা হতে পারে না। এরূপ মৈত্রী বাংলাদেশ বা ভারতের কোন দেশেরই নির্যাতিত মানুষের কল্যাণে আসতে পারে না।

অথচ দেখা যাচ্ছে— ক্ষমতাহীন উভয় সরকারই মৈত্রীর জিকির তুলে শোষণের ঐ কায়েমী ব্যবস্থা বহাল রাখতেই যেন তৎপর। সুতরাং তাদের দৃষ্টিতে কারা যে রাষ্ট্রদ্রোহী খেতাব পাবেন তা অনুমান করা কষ্টকর নয়।

বলা বাহুল্য এরূপ আলামত ইতিমধ্যেই ফুটে বেরিয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের বীর সেনানী মেজর জলিলের গ্রেফতার থেকে শুরু করে সাধারণ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি আওয়ামী সরকারের আচরণ বনাম পরিচিত পাক-দালালদের পুনর্বাসনের জন্যে নেপথ্য তৎপরতা দেখলেই উপলব্ধি করা যায়— দেশ কোন দিকে যাচ্ছে কিংবা কোন দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

কোন দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বাংলাদেশকে? —যারা শরণার্থী হয়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলেন বা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন তাদের পক্ষে তা অনুভব করা মোটেই কষ্টসাধ্য নয়। কেননা, রাষ্ট্রদ্রোহী দমনে পশ্চিমবঙ্গে সিআরপি— সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ কি ভয়াল-ভয়ঙ্কর ত্রাস কায়েম করেছে তা তারা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন। 'রাষ্ট্রদ্রোহী দমনে' সিদ্ধার্থ বাবু সেই সি আর পি মার্কা ত্রাস এখানেও যে কায়েম করতে চান তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ইতিমধ্যেই কয়েক জায়গায় লক্ষ্য করা গেছে।

অবশ্য শ্রী ডিপি ধর আগেই এমন একটি পরিকল্পনা করেছিলেন। সে অনুযায়ী কাজও শুরু হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু দুর্গা প্রসাদ বাবুর ঘন ঘন আগমন আর পরামর্শের তাৎপর্য সচেতন মানুষের কাছে ধরা পড়ে গেছে। আগের বার যখন তিনি এসেছেন তখন ক্ষুদ্র হলেও একটা বিক্ষোভ হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচনে ডিপি ধর দস্তুরমত নির্বাচনী প্রচারের অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছিলেন। সুতরাং ডিপি ধরের আলখেল্লাটি সিদ্ধার্থ বাবুর গায়ে চাপিয়ে দিয়ে পাঠান হলো এবার। তিনি সে কাজটি করেও গেছেন সুষ্ঠুভাবে।

শহীদ জব্বার স্মরণিকা

বিগত স্বাধীনতাযুদ্ধে শহীদ ন্যাপ নেতা এ্যাডভোকেট আবদুল জব্বারের জীবনের উপর খুলনা থেকে একটি 'স্মরণিকা' প্রকাশিত হচ্ছে। শহীদের গুণগ্রাহীদেরকে 'স্বাধিকার কার্যালয় ১, ধর্মসভা ক্রশ রোড, খুলনা।' এই ঠিকানায় লেখা পাঠাতে অনুরোধ করা হয়েছে।

ক্ষুধার জ্বালায়

পশ্চিমবঙ্গের শ্রীমতি মানু কুণ্ডু নাম্নী ২৫ বছর বয়স্কা জনৈকা মহিলা তার ক্ষুধার্ত একটি ছেলে ও একটি মেয়েকে খাবার দিতে ব্যর্থ হয়ে গঙ্গা নদীর হাওড়ার চাঁদমারী ঘাটে নিক্ষেপ করেন। স্থানীয় জনসাধারণের প্রচেষ্টায় ছেলেটিকে রক্ষা করা সম্ভব হলেও মেয়েটিকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। জনতার হস্তক্ষেপের ফলে মহিলাটিও নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করতে পারেননি। পরে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেছে। অবিশ্বাস্য হলেও ঘটনাটি কলকাতার দৈনিক 'সত্যযুগে' প্রকাশিত হয়েছে।

ইহা কি সত্য?

॥৮৩॥

কুখ্যাত ৩০৩ জনের একজন— মতিউল ইসলামকে বাংলাদেশের ফাইনান্স সেক্রেটারী করা হয়।

অথচ তিনি পশ্চিমা শোষক আমিন গ্রুপের কি দালালীই না করেছেন। ঢাকাস্থ অফিসে চট্টগ্রাম থেকে আমিন গ্রুপের সব খাতা-কাগজ সরিয়ে আনবার হোতাই তিনি। মূল্যবান দ্রব্যাদিসহ এই গ্রুপের সব কিছু করাচী পাঠানোর গুরুদায়িত্ব তিনিই পালন করেছেন। আল্লাহর মরজী ঢাকা-করাচীর শেষ ফ্লাইট বাতিল হওয়ায় একান্টসের জরুরী কয়েকটি বাণ্ডিল যেতে পারেনি। তা থেকেই বুঝা যায় মতিউল ইসলাম সাহেব বাঙালীর কত বড় সর্বনাশ সাধন করেছেন। টিক্কা-নিয়াজীর আমলেই পশ্চিমাদের যিনি এত জঘন্য দালালী করেছেন তিনিই আজ স্বাধীন বাংলাদেশের ভাগ্য নিয়ন্তাদের একজন।

॥৮৪॥

কিশোরগঞ্জের সরকারী কৃষিফার্মের লিচু গাছগুলোর মধ্যে তিনটির লিচু এবার বিক্রি করা হয়নি। উক্ত ফার্মের কর্তারা জানিয়েছিলেন গাছ তিনটির লাল টকটকে লিচুগুলো শেখ সাহেবের জন্য 'উপঢৌকন' হয়ে ঢাকায় যাবে। তিন তিনটি গাছের লিচু পাওয়া নিতান্তই বদহজমের ব্যাপার। সে যাক, তবু জনতা জানতে চায়, লিচুগুলো ৩২ নং ধানমন্ডীতে কি আদৌ পৌঁছেছিল?

॥৮৫॥

ঢাকার একটি প্রাচীন মাসিক পত্রিকার বয়োবৃদ্ধ মুসলমান সম্পাদক শাখারী বাজারস্থ শ্রীশ্রী কালাচান জিউ ঠাকুরের নামে দেবোত্তর সম্পত্তির ম্যানেজার হয়েছেন। প্রয়োজনীয় দালালী এবং তদবিরের জোরে বহুদিনের কাঙ্ক্ষিত এই পদটি তিনি টিক্কা খানের আমলে পেয়েছেন। এদিকে মন্দিরটির প্রতিষ্ঠাতা জানভীবল্লভ দত্তের দুই ছেলের সুদীর্ঘ বিশ বছর পর আগমন ঘটায় প্রথমে হতাশ হলেও তিনি তাদের সাথে শেয়ারের বাটোয়ারা স্থির করে নিয়েছেন। বড় অঙ্কের নগদ সেলামী দিয়ে প্রতিষ্ঠাতার তনয়দ্বয়কে কৌশলে ভাগানোর চেষ্টা করে ম্যানেজার সাহেব দেবোত্তর সম্পত্তিটি লুটপাটের পথ খোলাসা করছেন।

॥৮৬॥

টাঙ্গাইলের এককালীন 'বাঘা ভাই' এমসিএটি এবার হাজার জনতার ভিড়ে না গিয়েও পাকিস্তানী নোটের ১ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা বদলিয়েছেন। স্বাধীনতার পর ইনিই টাঙ্গাইল ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিলের ডাকবাংলায় মাস পাঁচেক থাকার পর প্রায় ছয় হাজার টাকা ভাড়া না দিয়েই দখলকৃত নতুন বাসাটিতে গিয়ে উঠে পড়েছেন। সরকার তার পাওনা টাকা বুঝে না পেলেও এমসিএটি ১ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা বদলানোর ক্ষেম প্রদর্শন করেছেন।

॥৮৭॥

টঙ্গীর ইউনাইটেড টোবাকো কোম্পানীর প্রশাসককে দুর্নীতির অভিযোগে বরখাস্ত করা হলেও তাকে সরকার পুনরায় উক্ত পদে নিয়োগ করেছেন। প্রশাসকটির বিরুদ্ধে গাড়ী দখল ও বেশুমার সিগারেট বিক্রির টাকা আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে। কিন্তু ঘুষের কেরামতিতে সেক্রেটারিয়েট থেকে কেসটি এস্টিকরাপশনে যায়নি।

॥৮৮॥

ডিপিআই অফিস থেকে স্কুলগুলোতে একটি সার্কুলার গিয়েছে এর মুল বক্তব্য হলো ঃ গরীব হলেই হবে না, শিক্ষকদের মধ্যে যারা ভারতে গিয়েছিলেন শুধু তারাই সরকারী সাহায্য পাবেন।

সম্পাদক ঃ সৈয়দ ইরফানুল বারী, মুদ্রণে— শান্তি প্রেস, সন্তোষ, টাঙ্গাইল।

প্রতি কপি পঁচিশ পয়সা সাপ্তাহিক চাঁদার হার : ষান্মাসিক-৬.০০ বার্ষিক-১০.০০

হক-কথা

(WEEKLY THE HAQ-KATHA)

প্রকাশক ও পৃষ্ঠপোষক ঃ মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

প্রথম বর্ষ সপ্তদশ সংখ্যা শুক্রবার ৯ই আষাঢ় ১৩৭৯ ; ১১ই জুন ১৯৭২ ; ২৩ শে জামাদিউল আওয়াল ১৩৯২। সন্তোষ, টাঙ্গাইল

মুজিবাদী গণতন্ত্রের নগ্ন হামলা

'হক-কথা' সম্পাদক গ্রেফতার

সংবাদপত্রের কণ্ঠ-রোধের আশংকাকে সত্য প্রমাণিত করে স্বাধীন দেশে বাক-স্বাধীনতার কণ্ঠ-রোধের নির্লজ্জ প্রয়াসের চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে বাংলাদেশ সরকার তার পুলিশবাহিনী দিয়ে সাপ্তাহিক 'হক-কথা' সম্পাদক জনাব সৈয়দ ইরফানুল বারীকে গত ২০শে জুন মঙ্গলবার দুপুর সাড়ে বারোটার সময় বিনা গ্রেফতারী পরোয়ানায় প্রচণ্ড ধাপ্পাবাজির মধ্য দিয়ে গ্রেফতার করেছে।

জনাব ইরফানুল বারী যখন সম্পাদনার কাজে ছাপাখানার কার্যালয়ে ব্যস্ত ছিলেন তখন জনৈক উর্দ্ধতন অফিসার পুলিশবাহিনীসহ উপস্থিত হয়ে জানায় যে, জেলা প্রশাসক তাঁর সাথে আলাপ করতে চান। অফিসারটির সাথে জনাব বারী জীপে চড়ে চলে যাওয়ার পর খোঁজ নিয়ে জানা যায়, জেলা প্রশাসক ঐদিন সরকারী কাজে টাঙ্গাইলের বাইরে গেছেন। মুখে গণতন্ত্রের বড় বড় বুলি কপচালেও বর্তমান সরকার অন্যতম গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর নির্লজ্জ হামলা চালিয়ে সম্পূর্ণ পাকিস্তানী কায়দায় জনাব ইরফানুল বারীকে গ্রেফতার করেছে।

প্রতিবাদ সভা ও বিক্ষোভ মিছিল

মওলানা ভাসানী প্রতিষ্ঠিত মেহনতি জনতার বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক 'হক-কথা'র সম্পাদককে গ্রেফতারের খবর ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে সারা টাঙ্গাইল শহরে বিক্ষোভ দানা বেঁধে উঠতে থাকে। বিকেলে তেত্রিশটি সংগঠনের সহন্বয়ে গঠিত সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ আহূত শহীদ মিনারের বিরাট প্রতিবাদ সভায় সমবেত জনতা বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি সৈদয় আবদুল মতিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় মুজিব সরকারের দমননীতি এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ওপর ফ্যাসিবাদী হামলার তীব্র নিন্দা করে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তৃতা করেন জেলা বাংলা ছাত্র ইউনিয়নের

সভা ও মিছিলে বিক্ষোভ প্রতিবাদ উচ্ছেদ করো ফ্যাসিবাদী বুনিয়াদ পদাঘাতে ভাঙো শোষকের কারাগার 'হক-কথা' আজ প্রত্যেক জনতার

সভাপতি জনাব আতোয়ার রহমান, বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের যুগ্ম-আহ্বায়ক খন্দকার নাজিমউদ্দিন এবং বাঙলা ছাত্র লীগের সাধারণ সম্পাদক বাবু সুরঞ্জন দাস দাশু। বক্তৃতায় তারা অবিলম্বে জনাব ইরফানুল বারীকে বিনাশর্তে মুক্তিদানের দাবী জানান। সভা শেষে শত শত ছাত্র-জনতার এক বিরাট বিক্ষোভ মিছিল শহর প্রদক্ষিণ করে 'হক-কথা' সম্পাদকের মুক্তি দাবী করে।

তার পরদিনও আবার বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করা হয়। ২২শে জুন সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত আরেকটি প্রতিবাদ সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তৃতা করেন বাঙলা ছাত্র লীগের সভাপতি জনাব আবদুস সালাম।

৮টি সংগঠনের প্রতিবাদ

দেশের বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দও জনাব ইরফানুল বারীর গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা করে বিবৃতি প্রদান করেছেন। তারা এই গ্রেফতারকে অগণতান্ত্রিক, জনস্বার্থ ও জাতির কল্যাণ-বিরোধী বলে উল্লেখ করে অবিলম্বে তাঁর মুক্তির দাবী করেছেন। পৃথক পৃথক বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারী সংগঠন ও নেতৃবৃন্দরা হলেন ঃ বাংলাদেশ কৃষক সমিতির কেন্দ্রীয় সংগঠক জনাব রাশেদ খান মেনন ও জনাব আবদুল মান্নান ভুইয়া, বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক জনাব আবুল বাশার ও জনাব সিরাজুল হোসেন খান, বাংলা শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক কাজী জাফর আহমেদ ও জনাব হায়দার আকবর খান রনো, কেন্দ্রীয় ন্যাপের সংগঠক আবদুর রহমান ও জনাব মোহাম্মদ আলী, ঢাকা নগর ন্যাপ আহবায়ক জনাব মুজিবুর রহমান, চিশতি, বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি (লেনিনবাদী)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড অমল সেন, বাংলার কমিউনিষ্ট পার্টির সভাপতি কমরেড দেবেন শিকদার, বাংলাদেশ বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক জনাব হায়দার আনোয়ার খান জুনো ও জনাব আতিকুর রহমান সালু এবং বাংলা ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক জনাব মাহবুব উল্লাহ ও জনাব আবদুল্লাহ-আল হারুণ।

ভুয়াপুরে আঞ্চলিক বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন এবং কৃষক সমিতির যৌথ উদ্যোগেও একটি প্রতিবাদ সভা এবং বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

সম্পাদকীয়

সংবাদপত্রের উপর হামলা

'হক-কথা' সম্পাদককে আকস্মিকভাবে গ্রেফতার করে গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী সরকার সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপর নগ্ন হামলার ধারা বিস্তার করেছেন। সার্বিক মুক্তি এবং স্বাধীনতার আকাংখাতেই এদেশের তিরিশ লাখ বীর সন্তান অকাতরে প্রাণ দিয়েছেন। অথচ তাদেরই লাশ মাড়িয়ে ক্ষমতায় অভিষিক্ত হবার ছয় মাসের মধ্যেই সংবাদপত্র ও শ্রমিক শ্রেণীর অধিকার হরণ করে বর্তমান সরকার নির্লজ্জের মতো তার সকল অংগীকার জলাঞ্জলি দিয়েছেন।

'হক-কথা' ক্ষমতা দখল বা কারো দালালীর লালসা থেকে উৎসারিত হয়নি। ঘুষখোর, চোরাকারবারী, লুটপাট সমিতি, দালাল রাজনীতিবিদ, স্বৈরাচারি আমলা, মন্ত্রী ও সরকার এবং সকল চেহারার শোষকদের কবল থেকে জনতাকে রক্ষার উদ্দেশেই 'হক-কথা'র বলিষ্ঠ ভূমিকা। 'হক-কথা' বিরোধিতা না করলে লুটপাট আর চোরাকারবার দেশ ও সরকারের মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতো। রুশ-ভারতসহ বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী-সম্প্রসারণবাদীরা বাংলাদেশের জনতাকে গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ করার যে চক্রান্তে মেতে উঠেছে, 'হক-কথা' তার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলে স্বাধীনতাকে সাচ্চা অর্থে অর্থবহ করে তোলার প্রচেষ্টায় নিজেকে উৎসর্গ করেছে। সকল অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে গড়েছে প্রতিরোধের দৃঢ় প্রাচীর। তাই 'হক-কথা' এদেশের নির্যাতিত প্রতিটি জনতার বলিষ্ঠ সমর্থন পেয়েছে।

শিল্প-কারখানা নিয়ন্ত্রণের চোরাগলিতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্যতম স্তম্ভ সংবাদপত্রকে আজ্ঞাবহ দাসে পরিণত করার এবং সাংবাদিকদের ফরমায়েশের জোয়ালে বন্দী করার যে প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে, 'হক-কথা' তার বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ। পাকিস্তানী সরকারগুলোর মতো বর্তমান সরকারও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নস্যাতের নেশায় মেতে উঠেছে। কিছুদিন আগে সাপ্তাহিক 'গণশক্তি' অফিসে তালা ঝুলিয়ে সম্পাদক ও ভারপ্রাপ্ত সম্পাদকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। এবার গ্রেফতার করা হলো 'হক-কথা'র সম্পাদককে। এই গ্রেফতারের মধ্য দিয়ে সরকার জনগণের পরিপূর্ণ সার্বভৌমত্ব লাভের আকাংখাকে গলা টিপে হত্যা করলেন।

'হক-কথা'র সম্পাদককে অবিলম্বে বিনাশর্তে মুক্তিদান এবং সংবাদপত্র ও শ্রমিক শ্রেণীর অধিকার ফিরিয়ে দেয়ার দাবী জানিয়ে সরকারকে আমরা শুধু বর্তমান নয় ভবিষ্যতেরও অন্তরীক্ষে দৃষ্টি রেখে কর্মপন্থা স্থির করতে অনুরোধ করছি। জনতার প্রতি আমাদের আবেদন, দমননীতি এবং গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের চক্রান্তের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠুন।

দিল্লীর শাসকগোষ্ঠীর নির্দেশে প্রণীত শাসনতন্ত্র মানবো না

গত ১৮ই জুন টাঙ্গাইল জেলা কৃষক সমিতির আহবায়ক জনাব লুৎফর রহমানের সভাপতিত্বে বিন্দুবাসিনী ময়দানে অনুষ্ঠিত এক তিল-ঠাঁই-নাই জনসমাবেশে বাংলার বিদ্রোহী-কণ্ঠ মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী মুহুর্মুহু শ্লোগান আর বিপুল করতালির মধ্য দিয়ে ঘোষণা করেছেন, দিল্লীর শাসকগোষ্ঠীর নির্দেশে প্রণীত কোনো শাসনতন্ত্রই বাংলার বীর জনতা মানবে না।

আগামী শাসনতন্ত্রে যাতে কৃষক-শ্রমিক, কামার-কুমার, জেলে-মাঝি, ছাত্র-বুদ্ধিজীবী এবং সর্বহারা-মেহনতি জনতার ইচ্ছে ও আশা-আকাংখা প্রতিফলিত হয়, তার জন্যে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টির আহবান জানিয়ে মওলানা ভাসানী বলেন, "বাংলাদেশের আইনমন্ত্রী দিল্লীতে গিয়ে ভারতীয় শাসকগোষ্ঠীর পরামর্শানুযায়ী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে যাচ্ছেন। এর ফলে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। খোদ ভারত সরকারও তার শাসনতন্ত্র প্রণয়নের সময় চীন-রাশিয়া আমেরিকা বা পাকিস্তানের কারো সাথেই পরামর্শ করেনি। পরিষদের সদস্যরা বিরোধী দলের সাথে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতেই শাসনতন্ত্র রচনা করেছিলেন। অথচ বাংলাদেশে অসংখ্য রাজনীতিবিদ এবং প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী থাকা সত্ত্বেও আইনমন্ত্রী শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্যে ভারতের দরবারে হাজির হয়েছেন।"

৩০ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত বাংলাদেশের স্বাধীনতা যাতে রুশ-ভারত বা চীন-মার্কিন কারো কাছেই বিক্রি হতে না পারে সেজন্য সর্বশ্রেণীর জনগণের প্রতি তিনি ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে নিয়ে বিদেশের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ানো বন্ধের জন্যেও তিনি সরকারের প্রতি দাবী জানান। এই দাবীর সপক্ষে হাত ওঠাতে বললে হাজার হাজার জনতা হাত তুলে তাদের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন জ্ঞাপন করেন। সমবেত জনতা বিদ্রোহী কণ্ঠের সাথে সোচ্চার হয়ে শ্লোগান তোলেন ঃ আজাদ বাংলাদেশ–জিন্দাবাদ।

ইয়াহিয়ার গণবিরোধী আইনগত কাঠামোর অধীনে নির্বাচিত বর্তমান সরকার কি ১। জনসাধারণের নির্বাচিত সরকার ২। বিপ্লবী সরকার ৩। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী আশ্রিত সরকার–প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবের কাছে উত্তর চেয়ে মওলানা ভাসানী উপরোক্ত প্রশ্ন তিনটি করে সেগুলো গভীরভাবে বিশ্লেষণের জন্যে জনগণের প্রতিও আহ্বান জানিয়েছেন।

গ্রাম-বাংলার দুর্দশাগ্রস্থ কৃষক-মজুরের অবস্থার কথা বলতে গিয়ে মওলানা বলেন, "যারা হাড়-ভাঙ্গা পরিশ্রম করে সরকার এবং শহরের মানুষদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছে, পাকিস্তানী সরকারগুলোর মতো বর্তমান সরকারও তাদের প্রতিই চরম অবহেলা প্রদর্শন করে চলেছেন। আগে কৃষকরা এক মণ পাট বিক্রি করে দেড় মণ চালের দাম পেতো কিন্তু এখন চালের দাম ৮০ টাকা। খাদ্য ও তীব্র অর্থনৈতিক সংকটে জর্জরিত গ্রামের ভূমিহীন সর্বহারা মেহনতি কৃষকরা আজ না খেয়ে মৃত্যুর পথে। কাফনের কাপড় জোটাতে না পেরে তারা কলার পাতায় জড়িয়ে মুর্দা দাফন করছে। মেয়েরা কাপড়ের অভাবে কাঁথা ও চট গায়ে জড়িয়ে লজ্জা নিবারণ করছে।"

পাটের সর্বনিম্নমূল্য ১২০ টাকা, শহরের মতো নিয়ন্ত্রিত মূল্যে গ্রামে গ্রামে চাল, আটাসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্র সরবরাহ এবং পূর্ণ রেশনিং-এর দাবী জানিয়ে মওলানা ভাসানী বলেন, "না হলে ১৯৪৩ সনের মতো ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের ফলে লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে মারা যাবে। সাথে সাথে যে উচ্ছৃঙ্খল বিপ্লব শুরু হবে তা রোধ করে শান্তি ফিরিয়ে আনা কঠিন হয়ে পড়বে।"

কৃষকদের ঠকিয়ে যারা দালান গড়ছে, তাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন "৭৪ সন পর্যন্ত যত পারো দালান গাঁথো, কৃষি-বিপ্লব নয় আমরা কৃষক-বিপ্লব করবো। বাংলার কৃষক তোমাদেরকে কানে ধরে বের করে কাঁথা বিছিয়ে সেদিন শ্লোগান তুলবে ঃ কাঁথা যার দালান তার।"

মুজিব সরকারের দমননীতির তীব্র সমালোচনা করে মজলুম জননেতা বলেন, "জনতার সমস্যার সমাধান না করে লালবাহিনী, স্বেচ্ছাসেবক, রক্ষী বা পুলিশবাহিনী দিয়ে ন্যাপ ও কৃষক সমিতির কর্মীদেরকে দমন করলে এবং গুণ্ডাঘাতক দিয়ে গুপ্তহত্যা করলে দেশকে সুখী ও সমৃদ্ধশালী করে তোলা যাবে না। আমরা সরকারী কাজের সমালোচনার সাথে সাথে ভালোর প্রশংসাও করে যাবো। খাঁটি গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই আমাদের আন্দোলনের একমাত্র লক্ষ্য।"

সরকারের প্রতি হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বাংলার বিদ্রোহী নেতা বলেন, "দেশের সার্বিক সমস্যা দিন দিন জটিল হচ্ছে। এখনো সাবধান হওয়ার সময় আছে। না হলে এর বিষময় পরিণতি সরকারকেই ভোগ করতে হবে। দমননীতি দীর্ঘকাল চালিয়ে গেলে বাংলাদেশ দ্বিতীয় ভিয়েতনামে পরিণত হবে।"

ভারতের নিকৃষ্টমানের জিনিষপত্র আমাদানী বন্ধ করে সেগুলো জাপান-জার্মানী প্রভৃতি দেশ থেকে আনার আহ্বান জানিয়ে মওলানা নিত্যপ্রয়োজনীয় অধিকাংশ জিনিষ প্রস্তুতের জন্যে জাতীয় শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার দাবী জানান। ভূমিহীন মজুর এবং অন্যান্য বেকারদের চাকরীর সংস্থান করার উদ্দেশ্যে টাঙ্গাইলে দু-তিনটি পাটকল স্থাপনের জন্যেও তিনি দাবী জানান। অর্থের অভাবে যেসব ছাত্র-ছাত্রীরা এবার পরীক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে তাদেরকে পরীক্ষার সুযোগ করে দেয়ার এবং সুতা ও কাপড়ের অগ্নিমূল্য-রোধেরও তিনি জোর দাবী জানিয়েছেন।

মওলানা ভাসানী দুঃখ করে বলেন, "চোরাকারবারী, ঘুষখোর, স্বজনপ্রীতি, লুটপাট সমিতি এবং সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ ও সামন্তবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে যখন আমরা ন্যাপ ও কৃষক সমিতির মাধ্যমে সমাজতন্ত্র কায়েমের সংগ্রাম শুরু করেছি,

তখন মুজিব-সরকারের অন্তরঙ্গ বন্ধু, বিখ্যাত বুরোক্র্যাট অফিসার, ভারতীয় মন্ত্রীসভার প্রধান উপদেষ্টা শ্রী ডিপি ধর এবং সরকারের লেজুড় মস্কোপন্থী কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃবৃন্দের পরামর্শে আমাদেরকে সাম্প্রদায়িক এবং দেশ ও স্বাধীনতার শত্রু বলে জোর অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। আমরা স্বাধীনতা সংগ্রাম করেছি, আমরা সাম্প্রদায়িকতাকে ঘৃণা করি-কেননা, এর পূর্ণাঙ্গ উচ্ছেদ ছাড়া আমাদের একমাত্র লক্ষ্য সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।"

স্বার্থবাদী মহলের উস্কানীতে উত্তেজিত না হয়ে সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিরোধী দল গঠন করতে দেয়ার জন্যে তিনি প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আহ্বান জানান।

বাংলাদেশের শতকরা ৮৬ জন মুসলমানের ধর্মীয় শিক্ষার স্বাধীনতা ও ব্যবস্থা করার জন্যেও তিনি দাবী জানান। না হলে দেশে যে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হবে তার জন্যে সরকারই দায়ী থাকবেন বলে মওলানা সাবধান বাণী উচ্চারণ করেন।

স্বার্থবাদী মহলের আতে ঘা লাগায় তারা 'হক-কথা' বন্ধ করার জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছে বলে মন্তব্য করে তিনি বলেন, "ঘুষখোর, চোরাকারবারী, লুটপাট সমিতি, স্বৈরাচারী অফিসার এবং সরকারের বিরুদ্ধে গঠনমূলক সমালোচনার অধিকারসহ সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দেয়া না হলে বাংলাদেশের মাটি থেকে চিরদিনের জন্যে গণতন্ত্র নির্বাসিত হবে।"

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করার চক্রান্তের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার জন্য শ্রমিক-কৃষক, ছাত্র-বুদ্ধিজীবী ও মেহনতি জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বাংলার সংগ্রামী নেতা বলেন, "আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকার নস্যাত করা হলে যে কোন ত্যাগের বিনিময়ে আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাবো। গণতান্ত্রিক অধিকার নিয়ে সুপ্রিম বা হাইকোর্টে রীট আবেদনের কোনো উপায় সরকার না রাখায় একমাত্র সংগ্রামের মাধ্যমেই অধিকার আদায় করতে হবে।"

মাত্র তিনদিনের প্রচার ও প্রস্তুতিতে অনুষ্ঠিত এই জনসভায় হাজার হাজার জনতা যোগ দেন। জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে ন্যাপ, কৃষক সমিতি, বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন, বাংলা ছাত্র ইউনিয়ন, হোটেল ও প্রেস শ্রমিক ইউনিয়নের শত শত কর্মীরা মিছিল সহকারে সভায় উপস্থিত হন। গুঁড়ি গুঁড়ি আষাঢ়ে বৃষ্টি সত্ত্বেও সমবেত জনতা সাগ্রহে বিদ্রোহী নেতার আড়াই ঘন্টা স্থায়ী ভাষণটি শোনেন। বক্তৃতার বিভিন্ন পর্যায়ে মুহুর্মুহু শ্লোগান এবং করতালিতে সভাস্থল বারবার উদ্বেল হয়ে উঠেছে।

মওলানা ভাসানীর প্রতিবাদ

মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে প্রেরিত পৃথক পৃথক তারবার্তায় 'হক-কথা' সম্পাদক সৈয়দ ইরফানুল বারীর অবিলম্বে বিনাশর্তে মুক্তি দাবী করেছেন।

কোনো অভিযোগ বা গ্রেফতারী পরোয়ানা না দেখিয়ে সম্পাদকের এই পুলিশী গ্রেফতারকে অগণতান্ত্রিক ও বেআইনী আখ্যা দিয়ে মওলানা ভাসানী বলেন, "শ্রমিকদের ধর্মঘটের অধিকার হরণের পর সরকার জনমতের বাহন সংবাদপত্রের উপর জঘন্য হামলা শুরু করেছেন।" এর মারাত্মক পরিণতি সম্পর্কে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে তিনি সরকারী দমননীতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্যে সংগ্রামী জনতার প্রতি আহ্বান জানান।

জনগণের আশা-আকাংখা অনুযায়ী দেশে শান্তি ও শৃংখলা ফিরিয়ে আনার আহ্বান জানিয়ে মওলানা বলেন, "দমননীতি চালিয়ে দেশে শান্তি আনা যাবে না। বরং বাংলাদেশ দ্বিতীয় ভিয়েতনামে পরিণত হবে।"

জনাব ইরফানুল বারীকে কোনো মিথ্যে মামলায় জড়িয়ে অত্যাচার না চালিয়ে অবিলম্বে বিনাশর্তে মুক্তি দেয়ার জন্যে মওলানা ভাসানী সরকারের প্রতি জোর দাবী জানিয়েছেন।

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক পদে মওলানা ভাসানী

সাপ্তাহিক 'হক-কথা'র সম্পাদক সৈয়দ ইরফানুল বারীকে সরকার গ্রেফতার করায় মওলানা ভাসানী বর্তমান সংখ্যা থেকে 'হক-কথা'র ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হিসেবে কাজ চালাবেন। গত ২১শে জুন তিনি এই সিদ্ধান্ত টাঙ্গাইলের জেলা প্রশাসককে জানিয়েছেন।

ভাসানীকে হত্যা করা হবে?

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

দিল্লীর সরকারের নিকট ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্ট হল ঃ বাংলাদেশে বামপন্থীদের দল-উপদলকে এক এক করে ক্রাশ করা যাবে। কিন্তু মওলানা ভাসানীকে কি করা যায়? তার তো মুখই আটকানো দায়। এই একটি মাত্র কণ্ঠ ভারত-বাংলাদেশ কনফেডারেশন না করণে সোচ্চার হয়ে উঠবে।

ইন্দিরা গান্ধী মওলানা ভাসানী সম্পর্কে অনেক কথা ভাবেন, কিন্তু বলেন না কিছুই। বললেন, তবে মিঃ রাজেশ্বর রাও এর মুখে। মওলানা বিরোধী জনমত সৃষ্টি করা যায় কিনা এই ছিল তাদের ব্যর্থ প্রয়াস।

গত এপ্রিল থেকেই মওলানাকে শায়েস্তা কিংবা প্রয়োজনে হত্যা করা হবে বলে চিঠিপত্র আসছে। আড়াই মাসে এমনি ২৩টি চিঠি এবং ১টি টেলিগ্রাম এসেছে। মিঃ রাজেশ্বর রাও ঢাকায় সন্তোষে দুটি চিঠি ও ১টি টেলিগ্রাম পৌঁছালো। চিঠি দুটির একটি ইংরেজী ও অপরটি বাংলায়। মূল বক্তব্য হল, বাড়াবাড়ি অনেক করেছেন-মনে রাখবেন, ভারত তার ঋণ শোধ করে নিবেই। টেলিগ্রামটি ছিল ঃ GET PREPARED; ব্যস, আর কিছু না। মোটামুটি সব কয়টি চিঠিতে মওলানাকে মৃত্যুর জন্য তৈরী থাকতে বলা হয়েছে। বক্তৃতায় ও বিবৃতিতে মওলানা সাহেব জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি প্রস্তুত।

বোধকরি বাংলাদেশের গোয়েন্দা বিভাগ একেবারেই বোকা, নয়তো দারুণ তীক্ষ্ণ। একটি ভারতীয় পরামর্শ তারা নাকচ করেছে। প্রস্তাবটি ছিল নকশাল বলে পরিচয় দানকারী একটি সশস্ত্র গ্রুপ সংগঠন করে তাকে দিয়েই মওলানা ভাসানীকে হত্যা করা। ভারতে এই চালটি খুব কাজের হয়েছিল। নকল নকশাল আসলের সব সুনাম শেষ করেছে। মে মাসের শেষ সপ্তাহে যখন গুজবের হিড়িক পড়ে গেল, বাংলাদেশে কি না হবে, তখনো মওলানা ভাসানীকে রহস্যজনক কারণে সরকারী সুহৃদ মহল থেকে জানানো হল, যদি কিছু ঘটেই যায় নকশালরাই তজ্জন্য দায়ী থাকবে। তবে সত্যিই কি ভারতীয় উদ্যোগে বাংলাদেশে শীঘ্রই কৃত্রিম নকশালী তৎপরতা শুরু হবে যার সুযোগ গ্রহণ করবে মওলানা ভাসানীর দুশমনরা?

ইরফানুল বারীর মুক্তির দাবীতে ঢাকায় গণসমাবেশ

সাপ্তাহিক 'হক-কথা' সম্পাদক সৈয়দ ইরফানুল বারীর বিনাশর্তে মুক্তির দাবীতে আগামী ২৭শে জুন ঢাকার বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে এক বিরাট গণসমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, কৃষক সমিতি, বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশন, বাংলা শ্রমিক ফেডারেশন, বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন, বাংলা ছাত্র ইউয়িন এবং গণতান্ত্রিক যুবলীগের সম্মিলিত উদ্যোগে আয়োজিত এই জনসভায় দলে দলে যোগদান করে জনাব ইরফানুল বারীর মুক্তির দাবীতে সোচ্চার হয়ে উঠুন।

আল-মুজাহিদীর বিবৃতি

বিলম্বে প্রাপ্ত এক বিবৃতিতে বাঙলা ছাত্রলীগের প্রাক্তন সভাপতি জনাব আল-মুজাহিদী 'হক-কথা' সম্পাদককে গ্রেফতারের নিন্দা করে বলেছেন, "নতুন সরকার ক্ষমতা প্রাপ্তির সাথে সাথে এদেশের মেহনতি জনতার দুঃসাহসিক কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক 'হক-কথা'র সম্পাদক সৈয়দ ইরফানুল বারীকে গ্রেফতার করেছে। গণতন্ত্রের সকল শালীনতার পর্দা ছিঁড়েফুড়ে সরকার সংবাদপত্রের উপর হামলা চালিয়েছে। আমরা জনাব ইরফানুল বারীর মুক্তি এবং সংবাদপত্রের সর্বপ্রকার অধিকার ও বাক স্বাধীনতা চাই। না হলে আমাদের বিক্ষোভের চাপা আগুন মারাত্মক পরিণতির সূচনা করবে।"

জরুরী বিজ্ঞপ্তি

*** যে সকল এজেন্টদের বিল বাকী পড়েছে, তাদের বাকী পাওনা অবিলম্বে শোধ করতে হবে। নাহলে পত্রিকা প্রেরণ বন্ধ করা হবে।**

*** ঢাকা ছাড়া দেশের সর্বত্র বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি আবশ্যক। প্রতিনিধিদেরকে উচ্চহারে কমিশন দেয়া হবে।**

চোরচালানের আকাশপথ খুলে গেছে

নিকৃষ্টমানের ভারতীয় মাল স্থলপথে আসতে বিরূপ জনতার রোষের ভয় হেতু আকাশপথ খোলা হয়েছে। গত মাসের শেষ ভাগে যশোরে বাংলাদেশ বিমানের মালপত্র বিভাগ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ৩০ হাজার টাকার ভারতীয় সাইকেল টায়ার ও খুচরা অংশ। এগুলো বিমানযোগে এসেছে। বিমানযোগেই ঢাকা প্রেরণের কথা ছিল।

ভারতে পাচার করার সময় খুলনায় ঐ সময় ৬ হাজার টাকা মূল্যের ৬ বস্তা তামার তারও উদ্ধার করা হয়েছে।

বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে যে, ভারত থেকে চোরাইমাল এনে ঢাকা প্রেরণের জন্য এখন সরাসরি যশোর থেকে বুক করা হয় না। এসব চোরাইমাল পথিমধ্যে হঠাৎ করে বিআরটিসির কোচ থামিয়ে ধমাধম তুলে নেয়া হয় এবং ঢাকা শহরের কাছাকাছি এনে তেমনি নামিয়ে রাখা হয়। কোচ সার্ভিচ চেকিং হয় না, এটুকু বুঝবার গম্যি চোরাকারবারীদের আছে।

'হক-কথা'র ৫ই জৈষ্ঠ্য সংখ্যায় চট্টগ্রাম ন্যাশনাল কটন মিলসের প্রশাসকের বিরুদ্ধে কতিপয় ভুল তথ্য প্রকাশিত হওয়ায় আমরা দুঃখিত।

আলালের ঘরে দালাল

শোষক শ্রেণী শোষণের কলকাঠি ঠিক রাখার অভিপ্রায়ে পরিবারের একাংশকে ওপারে পাঠিয়েছে 'গাজী' হয়ে ফিরতে, অপরাংশ দেশ থেকে করেছে পাকফৌজের ঘৃণ্য দালালী। একুল ওকুল-দুকুলই হাতে রেখে এরা জবর বাঁচাটা বেঁচে গেছে। ফলে মন্ত্রী, দলীয় কর্মী ও মুজিবী কমান্ডারদের আশীর্বাদ নিয়ে কুখ্যাত দালালরা বেঁচে যাচ্ছে শাস্তির হাত থেকে। অথচ এরাই রাজাকার গড়েছে, এরাই ধ্বংসযজ্ঞে দিয়েছে নেতৃত্ব।

হাজত থেকে লন্ডনে

অভ্যন্তরীণ নৌচলাচল কর্তৃপক্ষের জনৈক উর্দ্ধতম কর্মকর্তার পুত্র কুখ্যাত দালাল আলম রশীদ এতদিন হাজতে ছিলেন। এখন তিনি বহাল তবিয়তে সুদূর লন্ডনে দিন কাটাচ্ছেন। কার হস্তক্ষেপে পাকফৌজের এই ঘনিষ্ঠ সহযোগীকে নিতান্ত সামান্য জামানতে হাজত থেকে বের করে বি-ও-এ-সি'র বিমান যোগে লন্ডন পাঠানো হয়েছে, সরকার তার রহস্য ভেদ করবেন কি?

শ্বশুরের গুণে

বরিশাল জেলার ঝালকাঠি থানাকে পাকবাহিনীর নিরাপদ আস্তানায় পরিণত করার কৃতিত্বে কৃতিত্বান পুলিশ সিআই শাহ আলম হাজার হাজার মানুষ হত্যার সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিল। এই 'স্বনাম ধন্য' দালাল স্বাধীনতার পর শ্বশুরের আশীর্বাদে বেঁচে গেছে। ১৬ই ডিসেম্বরের পর তাকে গ্রেফতার করে জেলে ১৫ মিনিটের বেশী রাখা যায়নি। কেননা, জেলা আওয়ামী লীগের প্রধান কর্মকর্তার স্নেহের জামাতা শাহ আলম শ্বশুরের মদদ পেয়েছে।

মর্যাদাকর নেকনজর

বরিশাল জেলার উজীরপুর থানার ৬ নং শোলক ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান আবদুস সামাদ কাজী এক 'পাজী' দালাল। জল্লাদবাহিনীর পদসেবা, গণহত্যা ও নারী নির্যাতনের কীর্তি ছাড়াও সে রাজাকার বাহিনীর স্থানীয় সংগঠক ও কমাণ্ডার। এখন তাকে রিলিফ কমিটির চেয়ারম্যান নিয়োগ করা হয়েছে। বন্ধুপিতার বোনাই ক্যাবিনেট মন্ত্রীর নেকনজর রাজাকার কমাণ্ডারকে নতুন মর্যাদায় উন্নীত করেছে বলে শোনা যায়।

চিরন্তনীতে দুই দালাল

পটুয়াখালী, পাথরঘাটা থানা ও কালামেস্বা ইউনিয়নের শান্তি কমিটির মোড়ল তাহের উদ্দিন তালুকদার গ্রেফতার হয়েও মুক্তিবাহিনীর আত্মীয় ক্যাপ্টেনের জোরে বেঁচে গেছেন। এখন তিনি বরখাস্তকৃত ইঞ্জিনিয়ার বেয়াই-এর সাথে দিন কাটাচ্ছেন ১৬নং সড়কে ৫৭৩ নং চিরন্তনীতে। বাংলাদেশের অনুগত অফিসারসহ মালেক মাস্টার, শাহজাহান, আদম আলী, ইন্দুখানের মত বহু নিরাপরাধ মানুষ হত্যার জন্য দায়ী লোকটি জবর বেঁচে গেছে।

মাড়োয়ারীদের বাড়াবাড়ি চরমে উঠেছে

জয়পুরহাটের জনৈক পত্রলেখক মাড়োয়ারীদের চক্রান্ত ও হীনতৎপরতা সম্পর্কে এক পত্র লিখেছেন। তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এই কুসীদজীবী সম্প্রদায়টির আসল চেহারা উদঘাটন করছে। পত্রটি সংক্ষেপে পত্রস্থ করা হলো ঃ

বাংলাদেশে মাড়োয়ারীদের ভূমিকা দেবসন্তানতুল্য-এসব কথা বলে গত ১৪ই মে ঢাকার অবজারভার কাগজে চাটগাঁর আই পি আগরওয়ালা এক চিঠি লিখেছেন। আমি জয়পুরহাটের অধিবাসী। পাকিস্তান আমল, মুক্তিযুদ্ধকালে ও স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে এদের গতিপ্রকৃতি, আচরণ ও ভূমিকা প্রত্যক্ষ

অবাঙালী যুবতী বৃদ্ধদের ওরা জবাই করেছে

বিবস্ত্র যুবতীদের লাশ পড়েছিল পথে

করার মন্দভাগ্য আমার হয়েছে। সে অভিজ্ঞতা থেকে আমি এই সম্প্রদায়টিকে সম্প্রদায় বলে নয়, বরং শোষক ও হিংস্র চরিত্রের জন্য নির্মম শাইলক বলতে চাই।

মানুষের অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে এই অর্থশালী সম্প্রদায় অভাবগ্রস্ত মানুষের সোনাদানা ও জমিজমা বন্ধক নেয়। ঋণের চড়া সুদের দরুণ গ্রহীতারা কোনদিনই আর ঋণ মুক্ত হতে পারে না। কুসীদজীবী ও আত্মসাতের এই নিয়মকেও যদি নির্দোষ ব্যবসায় ধরা হয় তবু মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের অপকীর্তির ভাণ্ডারে দোষের কমতি নেই।

জয়পুরহাটে এরা যা করছে, তা থেকেই দেশবাসী এদের অভীষ্ট বিচার করে নিতে পারবেন ঃ

মাড়োয়ারী ও তাদের দালালরা ধান, চাউল, কেরাসিন তৈল, সরিষা, কলাই, কাঁসা,

পিতলের বাসন এবং আরও বহু ধরনের অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী প্রায় 'বাজার সুদ্ধ' কিনে ট্রাকভর্তি করে হররোজ সীমান্তের ওপারে পাচার করছে।

আইয়ুবের আমলে চরসের চোরাকারবার ও দুর্নীতির অপরাধে এখানকার ঝাঝালো ধরনের এক মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীর পাট রফতানীর লাইসেন্স বাতিল হয়ে গিয়েছিল। এর পর তিনি কেবল তার ছোট প্রেস বেলিং- এর কলের জন্য সামান্য পরিমাণ পাট কিনতেন। স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হবার সময় তার গুদামে যে পাট ছিল তা সকল অস্থাবর সম্পত্তির সাথে ট্রাকে তুলে তিনি ভারতে চলে যান। জয়পুরহাটের সকল বাসিন্দা তা দেখেছেন।

দেশ স্বাধীন হবার পর এখানে ফিরে এসে সেই ঝাঝালো মাড়োয়ারী স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রে সজ্জিত একটি রেইড স্কোয়াড (হামলা বাহিনী) গঠন করেছে। স্থানীয় লুটপাট সমিতির সাথে এক হয়ে এরা এতদঞ্চলের প্রত্যেক চাষীর বাড়ীতে হানা দিয়ে নিজ জমিতে উৎপাদিত পাট জোরপূর্বক বের করে এনে ঐ মাড়োয়ারীর পাট গুদামে তুলে দিচ্ছে। শ্রী ঝাঝলার যুক্তি হলো, এই বৎসর চাষীরা পাট চাষ করতে পারেনি। তাই তাদের ঘরে পাট থাকতে পারে না। তার গুদামের পাটগুলোই চাষীরা লুট করে নিয়েছিল। এখন তিনি তা ফিরিয়ে আনছেন মাত্র। এই বর্বর অত্যাচারের বিরুদ্ধে যারা কথা বলতে গেছে, হঠাৎ করে তাদের 'দালাল' সনাক্ত করা হয়েছে এবং ভাগ্যে জুটেছে বুলেট।

দুস্কৃতিকারী অবাঙ্গালীরা স্বাধীনতার পর পরই উধাও হয়েছে। জয়পুরহাটে এরপর ৭০/৭৫ জন নিরপরাধ অবাঙ্গালী মুসলমান পড়ে ছিল। পাকফৌজের অত্যাচার থেকে এরা অনেক ভাবে স্থানীয় লোকদের বাঁচিয়েছে বলে জনসাধারণও এদের প্রতি সহানুভূতিশীল। ঐ মাড়োয়ারী রেইড স্কোয়াড গত ১৪ই মার্চ (১৯৭২) এই অবাঙ্গালী শিশু, বৃদ্ধ, যুবক, যুবতীকে একস্থানে জড়ো করে ভয়াবহ অত্যাচার চালায়। সকলের সম্মুখে যুবতীদের বিবস্ত্র করে ঘাতকেরা পাশবিক উল্লাসে মেতে উঠে। কয়েকজন সুন্দরী যুবতীকে ও দুজন বৃদ্ধকে জবাই করা হয়। এদের লাশগুলো কয়েক দিন পড়েছিল। জানাজা দেবার জন্য কোন মুসলমান এগুতে সাহস করেনি।

এরপর সামান্য পেটিকোট পরা যুবতীদের ঘাতকেরা টেনে নিয়ে চলে। বেঁচে থাকা বৃদ্ধ দুজন পাগলের মত চীৎকার করছিল, ওদের মেরে ফেলো, ইজ্জতের উপর হাত দিও না। তোমাদের নবলব্ধ আজাদীর জন্য আমরা দোয়া করবো। সে হৃদয়-বিদারক দৃশ্যে পাষাণও হয়ত টলেছে, টলেনি মাড়োয়ারী দ্বারা সংগঠিত রেইড স্কোয়াড। কয়েক দিন পরে জয়পুরহাটের বিভিন্ন স্থানে ঐ লাঞ্ছিতা যুবতীদের বিবস্ত্র লাশ পড়ে থাকতে দেখা গেছে। অথচ বাঙ্গালী- অবাঙ্গালী তিক্ত সম্পর্কের সুযোগ নিয়ে এই হত্যাকাণ্ডের পশ্চাতে মাড়োয়ারীর একমাত্র উদ্দেশ্যে ছিল ঃ

(ক) ব্যবসায়ী প্রতিদ্বন্দ্বী খতম করা

(খ) নিহতদের পরিত্যক্ত বাসস্থান ও বাড়ীঘর নিজ দখলে আনা (ইতিমধ্যে তা সুসম্পন্ন হয়েছে)

(গ) তীব্র সাম্প্রদায়িক জিঘাংসা চরিতার্থ করা।

এ ঘটনা সম্পর্কে কারো কোন সংশয় থাকলে জয়পুরহাটে এসে তা নিরসন করে যাবেন।

এই মাড়োয়ারীরা পাকিস্তানকে মানতে পারেনি বলেই তখন ভারতে টাকা ও সম্পদ পাচার করতো, এটা যদি আমরা ধরেও নেই, তবু জিজ্ঞাসা থেকে যায়, আজও বাংলাদেশ থেকে এরা কোটি কোটি টাকা ও বিপুল সোনাদানা ভারতে পাচার করছে কেন? সীমান্তের ওপারে বালুরঘাট, রায়গঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ, মালদহ ইত্যাদি স্থানে মুদ্রা বিনিময় ব্যবসা গোপন ছুপ্তিতে গদি মারফৎ টাকা পাচার যা হচ্ছে তার অঙ্ক বহু কোটি টাকা ।

শুধু তাই নয়, পাকফৌজের হামলার পরা এরা নিজেদের কাঠের পিড়িটিসহ সব অস্থাবর সম্পত্তি নিয়ে চলে যায় ভারতে, সেখানে গিয়ে ওখানকার গদীতে বসে মহা আনন্দে ব্যবসা বাণিজ্য করে সবকিছু সেখানে রেখে ফিরে আসে। এখন এরা বলছে, যাবার সময় কিছুই তারা নিয়ে যেতে পারেনি। (অসমাপ্ত)

রিলিফ কেলেঙ্কারী অবাধে চলছে

রিলিফে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি এবং আত্মসাতের অভিযোগ এখন অহরহ প্রমাণিত হচ্ছে। আত্মসাত করতে গিয়ে ধরা পড়ে আওয়ামী লীগ মনোনীত রিলিফ কমিটির বহু মেম্বার-চেয়ারম্যান জনতার হাতে প্রহৃত হচ্ছে, তাদের ফটো এমনকি সরকারী পত্রপত্রিকাতেও প্রকাশিত হচ্ছে। সারাদেশে আওয়ামী লীগের ছায়াতলে থেকে যারা রিলিফ কমিটির মাতব্বরী করছে তাদের মধ্যে শতকরা নব্বই জনেরও বেশী দুর্নীতি এবং চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও এখনো তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থাই নেয়া হয়নি। কেননা, তাহলে তো আওয়ামী লীগের জনসেবার খোলস খোলাসা হয়ে পড়বে। অথচ এই সব মেম্বার চেয়ারম্যানরা যে দুর্নীতি এবং চুরির ইতিহাসে আইউবী বিডি মেম্বার চেয়ারম্যানদেরকেও হারিয়ে দিয়েছে, লজ্জা লাগলেও সেকথা নিশ্চয়ই আজ শেখ সাহেবও স্বীকার করবেন।

'হক-কথা'র রিলিফ-সংক্রান্ত কয়েকটি মাত্র কেলেঙ্কারী প্রকাশিত হবার পর থেকে আরো অসংখ্য অভিযোগ এবং নজীর আসছে। তার মধ্য থেকে এবার কয়েকটি প্রকাশ করা হলোঃ

বরিশাল জেলার হিজলা থানার জনগণ খাদ্যাভাবে চরম দুর্দশায় দিন কাটালেও রিলিফ কমিটির কর্মকর্তা একের পর এক দুর্নীতি এবং আত্মসাতের পালা চালিয়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি একটি হিন্দুর মৃত্যু হলে তার শ্রাদ্ধের জন্যে দু'শো টাকা টেস্ট রিলিফের অর্থ থেকে দান করে স্থানীয় চেয়ারম্যান ধর্মনিরপেক্ষতার মহান দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এদিকে এই কমিটির আরেক মেম্বার রিলিফের মাল চুরির সময় জনতার হাতে ধরা পড়ে বেদম মার খেয়েছেন।

কিশোরগঞ্জের অষ্টগ্রাম থানার খায়েরপুর রিলিফ কমিটির চেয়ারম্যান আইউবী বিডি মেম্বার তো ছিলেনই, পাকবাহিনীর আমলেও যথেষ্ট দালালী করছে। এর বিরুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা অভিযোগ জানালেও স্থানীয় এমসিএ সাহেবের আশির্বাদে তিনি বেশ কিছুদিন চেয়ারম্যান হিসেবে মাল আত্মসাত করতে পেরেছেন। পরে খোদ রিলিফ কমিটিরই অধিকাংশ সদস্য তার পদাপসারণ দাবী করলে তাকে পদচ্যুত করা হলেও মাতব্বরী তার যথারীতি রয়েছে। সম্প্রতি তাকে ঐ এমসিএটির নির্দেশে ৪৫ মণ গম এবং কয়েক শত টেস্ট রিলিফের টাকা দেয়া হয়েছিল। এর কিছুটা নিজের প্রিয়জনদের মধ্যে বিলি করে বাকী সবই তিনি আত্মসাত করেছেন। গ্রামে রাস্তা তৈরীর জন্যে তাকে যে অর্থ দেয়া হয়েছিল, তাও তিনি মেরে দিয়েছেন। স্থানীয় জনসাধারণের তাই প্রশ্ন ঃ পাকবাহিনীর এই দালালটিকে বিচার না করে কোন আইনে রিলিফ কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়েছিল এবং পদচ্যুত হলেও কীভাবে সেই তিনিই আবার রিলিফের জিনিষ বিতরণের সুযোগ পেয়েছেন?

বরিশাল জেলার ঝালকাটির বাসণ্ডার ওয়ার্ড মেম্বারের জামাতা সম্প্রতি একবান রিলিফের ঢেউটিন বাজারে বিক্রির সময় ছাত্রদের হাতে ধরা পড়েন। ঐ টিন নাকি তার বিধ্বস্ত মন্দিরের জন্যে দেয়া হয়েছিলে। অথচ, এরা শ্বশুর-জামাতা উভয়েই স্থানীয় মুসলিম লীগের পাণ্ডা ইসহাক খলিফার সাথে একযোগে পাকবাহিনীর দালালী করে কিছু হারানোর বদলে প্রচুর কামিয়েছেন। মেম্বার মহাশয় জাল টিপসই নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রচুর অর্থ পকেটে

ভরেছেন। তাছাড়া অসংখ্য দিনমজুরকে দিয়ে কাজ করিয়ে তিনি এখনো তাদের পারিশ্রমিক দিচ্ছেন না। কেউ না পেলেও সম্প্রতি তিনি ঘোষণা করেছেনঃ প্রতিটি শ্রমিককেই তাদের মজুরী দেয়া হয়েছে। নিজের এলাকায় তিনি ভাড়াটে গুণ্ডার সাহায্যে এমন ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছেন যে তার অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলার মতো অবস্থা আর কারো নেই।

শেরপুরের জনৈক রিলিফ কর্মকর্তা ২০ মণ রিলিফের চাউল আত্মসাত করে তা ভালোভাবে ছাঁটার জন্যে স্থানীয় একটি চাউলের কলে নিয়ে গেলে জনতার হাতে ধরা পড়ে যান। জনতার দাবীতে ওসি সাহেব চাউল আটক করলেও আত্মসাতকারী কর্মকর্তাটিকে চেয়েও দেখেননি। কেননা, গণদুশমন এই রিলিফ কমিটির কর্মকর্তাটি স্থানীয় একজন এমসিএ-র ঘনিষ্ঠ আত্মীয়।

ভাসানীর বাণী

শুধু শহরের মানুষের সুখ-সুবিধা দেখলেই সমাজতন্ত্র কায়েম হয়ে যাবে না। বাংলাদেশের ৬২ হাজার গ্রামের মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের সাথে আমাদের রাজনীতি-অর্থনীতি জড়িত।

কৃষক মজুরের উপার্জিত সম্পদে শহরের মানুষ বেঁচে থাকে। কিন্তু কোন সরকারই তাদের প্রতি ন্যায় বিচার করে নাই।

হক-কথা

৯ই আষাঢ় শুক্রবার

মূল্যবোধের অবলুপ্তি

মহামৃত্যুর অলিন্দ পেরিয়ে গভীর জীবনবোধে এদেশের মানুষ উদ্বুদ্ধ হতে পারেনি। সমাজ ও ব্যক্তির জীবনের সুকুমারবৃত্তি ও মূল্যবোধগুলো হারিয়ে গেছে নৈরাজ্য ও হতাশার চোরাবালিতে। একটি নবীন জাতির পক্ষে এ শূন্যতা ভয়ঙ্কর।

পরিবারের একজন লোকের মৃত্যু পরিবারের বাকী সবাইকে জীবনের প্রতি সংযমী ও গভীর উপলব্ধিতে সচেতন করে তোলে। সাময়িকভাবে হলেও একথা সত্য। অথচ এদেশে উনিশ সত্তুরের মহাসাইক্লোনে ১৫ লাখ মানুষ মারা গেছে। মহামৃত্যুর সে প্রান্তর না পেরোতেই রাজনৈতিক সংঘাতে আরও ৩০ লাখ মানুষের জীবনাবসান ঘটেছে ১৯৭১এ। এই মহামৃত্যুও এদেশের মানুষের জীবনে বাঞ্ছিত সংযম ও গভীরতা এনে দিতে পারেনি।

নিজের ও অপরের জীবন এখন মানুষের কাছে যেন মোটেই মূল্যবান নয়। সমাজ জীবনের প্রতি সহজাত আসক্তি কেটে গেছে। প্রচণ্ড বিতৃষ্ণায় মানুষ সব কিছুর প্রতিই যেন বিমুখ। পরস্পরের প্রতি দরদ ও সমমর্মিতা গেছে হারিয়ে। কেউ হয়ে উঠেছে নিষ্ঠুর, কেউবা চরম উদাসীন। এর শেষ কোথায়?– আমাদের এ শোচনীয় পরিণতির জন্য দায়ী কে?

আশাভঙ্গের পরিণামেই সৃষ্টি হয় এ ধরনের শূন্যতা। কাম্য বস্তু পাবার জন্য পুরোপুরি দাম শোধের পরও মানুষ যদি প্রতারিত হয়, তখনই সব কিছুর প্রতি চরম অনীহা ও বিতৃষ্ণায় সে নিজের লক্ষ্য ও গতির উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। বহু জীবনের বিনিময়ে স্বাধীনতার উপকূলে পৌঁছে এদেশের মানুষ এমনি নিদারুণ আশাভঙ্গের কবলে পড়েছে।

চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, খুন-খারাবির মত চিরায়ত ঘটনাগুলোর সাথে স্বাধীনতার পর নতুন করে জুটেছে সীমাহীন বেকারত্ব, অনাহারে মানুষের মৃত্যু। মানুষের শোচনীয় দুর্দশাকে উপেক্ষা করে আরেকটি শ্রেণী মেতে উঠেছে বেহায়াপানা, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, চোরাকারবারী, মজুদদারী ও লুটপাটের কারবারে। এসবে নেতৃত্ব দিচ্ছে অসৎ 'রাজনৈতিক' জান্তব শক্তি। এদের ঘাড়ে

সওয়ার হয়ে মৈত্রীর ধ্বজাধারী বিদেশী লুটেরা এদেশের পূর্ণ বুককে শূন্য করে দিচ্ছে। সব কিছু মিলে সৃষ্টি হয়েছে এমন এক পরিস্থিতি যেখানে বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা ও সার্থকতা মানুষ খুঁজে পায় না। চোরাবালিতে জীবনের গভীরতা ও মূল্যবোধ হারিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু জনগণকে আজ ভেঙ্গে পড়লে চলবে না। জনগণের উদাসীনতার সুযোগ নিয়েই গণদুশমন দেশীয় শোষক ও বিদেশী লুটেরারা দেশকে সর্বস্বান্ত করে দেয়। আজ আশা ভঙ্গের বর্তমান পরিস্থিতিতে জনগণকে দৃঢ় প্রতিরোধ গড়তে হবে। ঠগের দলকে বুঝিয়ে দিতে হবে, এদেশ বিদেশী লুটেরার এজেন্টদের নয়, এদেশ জনগণের– কৃষক, শ্রমিক, সর্বহারা মানুষের।

জাতীয় চেতনা ও মূল্যবোধের ক্ষেত্রে চিরশূন্যতা বিরাজ করতে দেওয়া জাতীয় আত্মহননের নামান্তর। সংগ্রামী বাঙ্গালী জাতি তা হতে দেবে না। হীন স্বার্থ বুদ্ধির যে যুপকাষ্ঠে মহত্তর মূল্যবোধগুলিকে বলি দেয়া হচ্ছে, সেই যুপকাষ্ঠ ভাঙ্গতে হবে। মানুষের মর্যাদা ও জীবনবোধ ফিরিয়ে আনার জন্য নতুন আশার সঞ্চার ঘটাতে হবে। সার্বিক মুক্তির জন্য বাঁধতে হবে জোট। প্রতিনিয়ত সংগ্রামের মাধ্যমে নতুন মূল্যবোধ ও জাতীয় আকাঙ্খার ভিত গড়তে হবে। এই ভিতের উপরই শোষণমুক্ত দুর্নীতিমুক্ত কৃষক-শ্রমিকের বাংলাদেশে গড়ে উঠবে।

সমাজতন্ত্র ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি

মাহমুদ আলম খান

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি কি সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করতে পারে?

প্রশ্নটি মৌলিক, তাই কেবল মাত্র 'মার্কসবাদীদের' নিকটই নয়– বিপ্লবী পেটি বুর্জোয়া শ্রেণী দেশপ্রেমিক জনগণ ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির প্রতিটি সদস্যদের নিকটও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়।

এই প্রশ্নের সমাধান হওয়া উচিৎ এবং তা চিরকালের জন্যই হতে হবে। এই প্রশ্ন উত্থাপন করেই তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে অনেক জটিলতার সৃষ্টি হয়েছিল। নতুন করে একই প্রশ্নের পুনরুত্থানের ফলে বাংলাদেশের রাজনীতিতেও পুনরায় জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে। সুতরাং আলোচনার মাধ্যমই আমাদের সিদ্ধান্তে উপণীত হতে হবে।

এই আলোচনাকে আমরা কয়েকটি বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেই মৌলিক প্রশ্নটির জবাব অনুসন্ধান করে সিদ্ধান্তে আসার জন্য চেষ্টা করব।

প্রথমতঃ এই সমস্ত প্রশ্ন রাজনীতির স্বার্থে অথবা বিশেষ কোন উদ্দেশ্য নিয়ে তোলা হয়েছে কিনা, তা বিবেচনা করা এবং দ্বিতীয়তঃ বিজ্ঞান ভিত্তিক যুক্তির নামে যে সমস্ত বক্তব্য তুলে ধরা হয়ে থাকে-তা আদৌ বিজ্ঞান ভিত্তিক কিনা?

আলোচনার প্রথম বিবেচ্য বিষয়, আওয়ামী লীগ, ন্যাপের বিচ্ছিন্ন অংশ এবং মওলানা ভাসানী পরিচালিত ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির কর্মসূচী ও রাজনৈতিক বক্তব্য কি এক? যুক্তিবাদীদের দৃষ্টিতে যেহেতু তিনটি দলেরই শ্রেণী চরিত্র এক এবং এই কারণেই তারা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক দায়িত্ব সমাধা করতে পারে না।

এই সমস্ত যুক্তিবাদীদের নিকট আমাদের জিজ্ঞাস্য-সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক দায়িত্ব ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি সমাধা করতে পারবে-এমন দাবী এই রাজনৈতিক দল কোনদিন করেছে কি?

পাকিস্তান আমলে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির বক্তব্য ছিল 'সমাজতন্ত্র দলের মূল লক্ষ্য' গত ৬ই ফেব্রুয়ারী শহীদ আসাদ নগরে অনুষ্ঠিত

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির কার্যকরী পরিষদের বর্দ্ধিত সভায় গৃহীত রাজনৈতিক প্রস্তাবে বলা হয়েছে 'ইতিহাসের ধারা একথাই প্রমাণ করে যে, বিপ্লব ছাড়া সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয় না।' পরবর্তী কালেও মওলানা ভাসানী বারবার উল্লেখ করেছেন 'বাংলাদেশেও সমাজতন্ত্র বিপ্লব ছাড়া প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।' আসাদ নগরের ঐ সভাতেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সমাধার প্রশ্নে মওলানা ভাসানী দলের ভূমিকা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এই উদ্দেশ্যে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি শ্রেণী সংগ্রামকে তীব্রতর করে গড়ে তুলে দেশ থেকে সামাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও পুঁজিবাদী শোষণকে উৎখাত করার সঙ্কল্প নিয়ে জনগণের মাঝে বিপ্লবী কর্মসূচী তুলে ধরবে।

অভিন্ন মত পোষণ করে। কিন্তু যুক্তিবাদীরা ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির বিরুদ্ধেও এই অভিযোগ এনেছেন। এটা কি সত্য?

বাস্তব অবস্থা হচ্ছে আজ সমাজতন্ত্রের সপক্ষে বাংলাদেশে শক্তিশালী জনমত গড়ে উঠেছে। এই জনমত কি করে সংগঠিত হয়েছে এবং কে বা কারা এই জনমত গড়ে তুলেছেন যার প্রতিকূলে কোন রাজনৈতিক দলেরই প্রচার চালান সম্ভব নয়?

অতীতের রাজনৈতিক ঘটনাবলীর দ্বারাই নিঃসন্দেহে বলা চলে এই জনমত গঠনের জন্য মওলানা ভাসানী ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির ভূমিকাই প্রধান ছিল। সমাজতন্ত্রকে ছাড়পত্র হিসাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যেই কি মওলানা এই প্রচার করেছিলেন?

বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সমাজতন্ত্র কায়েমে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালনের দায়িত্ব বিজ্ঞান সম্মত কারণেই বর্তমান। এই মহান দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে ইতিহাস ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিকে কোনদিন ক্ষমা করবে না।

অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তির সমন্বয়ে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি বিপ্লবের পথেই এগিয়ে চলবে। বিপ্লবের চূড়ান্ত পর্যায়ে অন্য একটি দলের নেতৃত্বে বিপ্লব সমাধা হবে।

মওলানা ভাসানীর উপরোক্ত বক্তব্য দলের মূলনীতি হিসাবেই স্বীকৃত। তাহলে আওয়ামী লীগ ও ন্যাপের বিচ্ছিন্ন অংশের নীতি ও লক্ষ্য কি এক বলা চলে?

আজ বাংলাদেশে কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষেই সমাজতন্ত্রের বক্তব্য ছাড়া রাজনীতি প্রচার একটি অবাস্তব কল্পনা। শ্রেণী চরিত্র হিসাবে যে রাজনৈতিক দলের কর্তব্য সমাজতন্ত্রের বিরোধিতা করা, তারাও আজ বাধ্য হয়েই সমাজতন্ত্র শব্দটিকে ছাড়পত্র হিসাবে ব্যবহার করছে।

এই বক্তব্যের সঙ্গে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিও তাহলে কি কেবলমাত্র পেটি বুর্জোয়া দল হিসাবে শ্রেণী বিশ্লেষণের দ্বারাই এই অভিযোগ যুক্তি সম্মত? ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে এই দলকে পেটি বুর্জোয়াদের একটি রাজনৈতিক দল হিসাবে প্রচার করে। তবু ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ও মওলানা ভাসানীর ভূমিকা সম্পর্কে এই জাতীয় প্রশ্ন উত্থাপন করে রাজনীতিতে ব্যাপক জটিলতা সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে কেন? এর মূল কারণটি এখানেই নিহিত রয়েছে এবং আমাদের তা অনুসন্ধান করা উচিৎ।

প্রত্যেক দেশেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সপক্ষে পেটি বুর্জোয়া শ্রেণী এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকেন। বাংলাদেশেও এই শ্রেণীর ভূমিকা পালনের দায়িত্ব রয়েছে। অন্যান্য দেশে শ্রমিক শ্রেণীর সহযোগী হিসাবে এই শ্রেণী কাজ করেন কিন্তু বাংলাদেশে এই

শ্রেণীর ভূমিকা একটি উল্লেখ্য ঘটনা। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কর্মসূচী নিয়ে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে পরিচালিত ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিই বাংলাদেশের রাজনীতিতে একটি শ্রমিক শ্রেণীর দলের পরিবর্তে প্রধান রাজনৈতিক দলের স্থান অধিকার করে রয়েছে।

এই ব্যতিক্রমের কারণ অনুসন্ধানের নাম করে প্রগতিশীল কর্মী সমাজকে মোহগ্রস্থ অথবা মোহমুক্ত পর্যায়ে বিভক্ত করে তত্ত্ব কথা দিয়ে ভুল সংশোধনের প্রচেষ্টা চালানো হলে অতীতের ন্যায় আজও সুফল পাওয়া যাবে না।

বাংলাদেশে পেটি বুর্জোয়া শ্রেণীকে শ্রমিক শ্রেণীর দায়িত্ব পালন করতে হয় কেন? বাংলাদেশে সমাজতন্ত্রের স্বপক্ষে গঠিত জনমত কি শ্রমিক শ্রেণীর দলের প্রতি আস্থাশীল? শ্রমিক শ্রেণীর বিভিন্ন দল ও উপদলের নেতৃত্ব এবং প্রচারিত কৌশল কি জনগণ গ্রহণ করেছেন? যদি শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে ব্যাপক জনতা এবং বিপ্লবের সহযোগী শক্তিও আস্থাশীল না হয় তাহলে কি তাদের রাজনীতি সঠিক? রাজনীতির বিজ্ঞানে এই প্রশ্নগুলির জবাবের মাধ্যমেই এর সমাধান পাওয়া যাবে।

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির বাস্তব জন্ম এবং উৎপত্তি বিষয়ক বিজ্ঞান দিয়ে যে বক্তব্য প্রমাণ করার প্রচেষ্টা চালানো হয়, মোহমুক্ত বলে দাবীদার মার্কসবাদীদের একই বিজ্ঞান দিয়ে বিচার করলে কি উৎপত্তির উৎস একই স্থানে বলে প্রমাণিত হবে না?

মুসলিম লীগ থেকে আওয়ামী মুসলিম লীগের এবং আওয়ামী লীগ থেকে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির নামের মিল অনুসন্ধান করে উৎপত্তি বিষয়ক বিজ্ঞান দ্বারা যে বিচার করা হয়েছে, তদ্বারা কি পাক-ভারত-বাংলাদেশের বাস্তব অবস্থাকেই অস্বীকার করা হয়নি? একজনের পিতৃদত্ত নামের শেষে যদি খান পদবী থাকে তাহলে কি সে ইয়াহিয়া খানের অনুসারী হবে? অথবা একজনের নামের মধ্যে মার্কস শব্দটি থাকে তাহলে কি তিনি শ্রেষ্ঠ মনীষীর উত্তরাধীকারী হিসাবে স্বীকৃতি পাবেন?

সুতরাং উৎপত্তি বিষয়ক বিজ্ঞান দিয়ে যে যুক্তি দেখানো হয়েছে তা একদিকে যেমন শিশুসুলভ তেমনি অপর দিকে বিভ্রান্তিমূলক।

যে রাজনৈতিক দল নিজেদের শ্রেণী চরিত্র সম্পর্কে সচেতন থেকে রাজনীতি এবং বক্তব্য প্রচার করে-তার শ্রেণী চরিত্র বিশ্লেষণ করতে অনেকেই বিজ্ঞের পরিচয় দিতে পারেন। কিন্তু ভুলেও কি এই সমস্ত বিজ্ঞ ব্যক্তিরা নিজেদের শ্রেণী চরিত্র কোনদিনও বিশ্লেষণ করে দেখেতেন? শ্রেণীচ্যুত্য মনে করলেই তা হওয়া যে সহজসাধ্য ব্যাপার ন এসত্যও কি তারা উপলব্ধি করেছেন? নিজেদের সামাজিকতা এবং মানসিকতা দিয়ে একবার উপলব্ধি করার চেষ্টা করলেই নিজেদের আসল চেহারা খুঁজে পেতে পারেন।

শ্রমিক শ্রেণীর সংগঠন বলে পরিচিত অধিকাংশ দল উপদলগুলিও মূলতঃ বিপ্লবী বুর্জোয়াদেরই একটি অংশের দ্বারা পরিচালিত। এদের দলীয় শক্তিও পেটি বুর্জোয়াদেরই বিপ্লবী অংশের উপর নির্ভরশীল। অবশ্য অন্য একটি যুক্তিসাঙ্গত কারণও এর পশ্চাতে কাজ করছে।

কিন্তু সবচাইতে উল্লেখ্য বিষয় হচ্ছে, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে একটি সঠিক শ্রমিক শ্রেণী দলের অনুপস্থিতি। যার ফলে ঐ সমস্ত বামপন্থী দল ও উপদলের নীতি ও কৌশল জনগণের বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। ঐতিহাসিক কয়েকটি ঘটনা দিয়েই এই বক্তব্যকে প্রমাণ করা যাবে।

'৬৮-৬৯ সালে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে এবং ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, শ্রমিক ফেডারেশন ও কৃষক সমিতির যৌথ উদ্যোগে যে ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থান তৎকালীন

গণবিপ্লব পূর্ব পাকিস্তানে গড়ে উঠেছিল সেই অভ্যুত্থান গণবিপ্লব অথবা সামাজিক বিপ্লবে রূপান্তরিত না হয়ে প্রতিক্রিয়ার নেতৃত্বে পরিচালিত এবং অবশেষে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় কেন?

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্ম দিয়েছিলেন মওলানা ভাসানী সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কর্মসূচী নিয়ে। ১৯৭১ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারী তিনি সিলেট বার লাইব্রেরী হলে বামপন্থী শক্তিকে নানা দল উপদলে বিভক্ত না হয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণের আবেদন জানান। জনগণ স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করলেন কিন্তু নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হল কারা? কিন্তু কেন?

কেবলমাত্র ব্যর্থতা এবং ভুল স্বীকারোক্তির মধ্যে এর জবাব অনুসন্ধানে ব্যস্ত থাকলেই চলবে না। একটি সঠিক শ্রমিক শ্রেণীর দলের অনুপস্থিতিই এই ব্যর্থতার মূল কারণ, জনগণ যখন সংগ্রামের পথে এগিয়ে যায় প্রগতিশীল শক্তি তখন তত্ত্ব বিশ্লেষণে ব্যস্ত থাকেন। গাড়ী প্ল্যাটফরম ছেড়ে গেলে যাত্রা হল না বলে আক্ষেপ করেন।

বৃটিশ ও পাকিস্তান আমলে জনগণ বহুমুখী গণতান্ত্রিক সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছেন। কিন্তু প্রতিবারই সংগ্রামের শেষে শোষক শ্রেণীর দ্বারাই পুনরায় শাসিত হয়েছেন। এর জন্য দায়ী কারা? জনগণ না অন্য কেউ? এই সমস্ত প্রশ্নের সঠিক জবাব অনুসন্ধান করে নিজেদেরকে সংগঠিত করাই হবে বাস্তব ও বিজ্ঞানভিত্তিক সিদ্ধান্ত। পেটি বুর্জোয়ারা সমাজতন্ত্র পতিষ্ঠার ঐতিহাসিক দায়িত্ব সমাধা করতে পারে না এই বক্তব্য হাজির করে নিজেদের উপস্থিতি অথবা সঠিকতাকে প্রমাণ করা যায়না।

আমরা জানি একজন মার্সকবাদী বলে পরিচিত কোন ব্যক্তি যদি ন্যাপের বক্তব্যকে বিজ্ঞানসম্মত বলে অভিমত পোষণ করেন অথবা ন্যাপের প্রতি বন্ধুত্বমূলক আচরণ করেন, তখনই ন্যাপের ভূমিকা বিশ্লেষণে এরা ব্যস্ত হয়ে ওঠেন।

আমি বিশ্বাস করি বাংলাদেশে এখনও শ্রমিক শ্রেণীর বিকাশ ঘটেনি। এই শ্রেণীর সমান্য অস্তিত্ব থাকলেও মূলতঃ তাদের জীবনযাত্রা এবং চিন্তাধারার মধ্যে পেটি বুর্জোয়া শ্রেণীর চিন্তাধারা ও মানসিকতা বর্তমান। এই শ্রেণী তাঁর নিকটতম শ্রেণীর উপর নির্ভরশীলও বটে। সুতরাং যতদিন শ্রমিক শ্রেণীর পূর্ণ বিকাশ না ঘটছে, ততদিন একটি শ্রমিক শ্রেণীর দলেরও পূর্ণ বিকাশ সম্ভব কি?

এই কারণেই বাংলাদেশে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির ঐতিহাসিক ভূমিকা পালনের দায়িত্ব বিজ্ঞানসম্মত কারণেই বর্তমান। এই মহান দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলেই ইতিহাস ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিকে কোনদিনও ক্ষমা করবে না।

আরও একটি বাস্তব অবস্থার উল্লেখ এখানে করা যেতে পারে। যদি মওলানা ভাসানী রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করেন এবং ন্যাপের বিলুপ্তি ঘোষণা করা হয় তাহলে যে রাজনৈতিক শূন্যতার সৃষ্টি হবে, তা পূরণ করার ক্ষমতা প্রগতিশীল শক্তির আছে কি? নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে-না। তা'হলে এই শূন্য স্থানে কোন শ্রেণীর ব্যক্তিদের আগমন ঘটেছে? অবশ্যই সংশোধনবাদী অথবা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির। তাহলে স্বীকার করতেই হবে যে, প্রতিক্রিয়াশীল এবং সংশোধনবাদীদের বিরুদ্ধে যে শক্তি মহীরুহের ন্যায় বাংলাদেশে বর্তমান সে শক্তি মওলানা ভাসানী এবং ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি। সুতরাং এই শক্তিকে সুসংগঠিত করার মাঝেই কি জনগণের বিজয় নিহিত নেই? অবশ্যই চূড়ান্ত বিজয়ের দায়িত্ব শ্রমিক শ্রেণীকেই পালন করতে হবে। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি এই নীতিকেই সম্মুখে রেখে লক্ষ্য পথে এগিয়ে চলবে।

পাঠকের অভিমত

সমবায় দফতরের অভ্যন্তরে

বাংলাদেশ সরকারের অধীন সমবায় দফতর এক আজব প্রতিষ্ঠান। সারা বাংলাদেশে যখন গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের আলোকে অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা পুনর্বিন্যাসের ব্যাপক উদ্যোগ চলিতেছে, তখন সমবায় দফতরের অভ্যন্তরে দুর্নীতি, আমলাতান্ত্রিক চক্র ও গণস্বার্থবিরোধী শক্তির চক্রান্ত জোরদার হইয়া উঠিতেছে।

সমবায় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সূচী বাস্তবায়নের জন্য দেশের দরিদ্র সমবায়ী সাধারণের মৃতপ্রায় সমিতি সমূহের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চাঁদা নিয়া স্থাপন করা হইয়াছিল বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন। বিগত দুই বছরে এই ইউনিয়ন কোন প্রকার শিক্ষাসূচী হাতে নেয় নাই, কিন্তু ইহার কষ্টার্জিত তহবিল থেকে যেভাবে অপরাধ করা হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে, ইহাতে যে কোন সামান্যতম বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি হতবুদ্ধি না হইয়া পারে না। কয়েকমাস আগে এই ইউনিয়ন জনৈক জয়েন্ট রেজিস্ট্রারের বদলী উপলক্ষে ঢাকার একটি অভিজাত হোটেলে এক ভোজসভায় আড়াই হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছে, প্রায় চল্লিশ হাজার টাকায় একটি গাড়ী ক্রয় করিয়েছে, এবং প্রত্যেকের বার শত টাকা মাসিক বেতনে দুইজন 'বিশেষ' কর্মচারী নিয়োগ করিয়াছে। কর্মচারী দুইজনের মধ্যে একজন ইংরেজী বা বাংলায় শুদ্ধ করিয়া লিখিতে বা বলিতে পারেন না। দ্বিতীয় কর্মচারী হইলেন ৩০৩ ভুক্ত জনাব পিএ সাজিয়। তাহার রেকর্ড সবারই জানা আছে। পূর্ব থেকেই সমবায় ইউনিয়নের কর্মচারীর সংখ্যা ও তাহাদের বেতনের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় সম্ভবতঃ চারিগুণ ছিল। এখন ইহার প্রয়োজন ও ব্যয়ের অনুপাত পরিমাপ করা খুবই কষ্টসাধ্য,-কেননা এখানে বর্তমানে অর্থব্যয় করা হয় শুধু স্বজনপ্রীতিতে, বাড়ী-গাড়ীর চাকচিক্যে এবং আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতির তাগিদে।

চট্টগ্রামস্থ বাংলাদেশ মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিতেও গত জানুয়ারী মাসে বিনা প্রয়োজনে এক হাজার টাকা বেতনে একজন ডেভেলপমেন্ট অফিসার নিয়োগ করা হইয়াছে। তিনি কুমিল্লার পল্লী উন্নয়ন একাডেমীতে চাকুরী করার সময় হানাদার পাকসেনাদের সাথে সহযোগিতা করার অপরাধে মুক্তিসেনাদের দ্বারা আক্রান্ত হন। কিন্তু কোনমতে তিনি চট্টগ্রামে গিয়া প্রথমে আত্মগোপন করেন এবং পরে বর্তমান চাকুরীতে অধিষ্ঠিত হন।

সমবায় দফতরের অধীনে প্রায় ২৫ খানা সরকারী গাড়ী রহিয়াছে। তন্মধ্যে ঢাকা শহরে ব্যবহৃত হয় ছয় খানা। প্রকৃতপক্ষে এই গাড়ীগুলি ব্যবহৃত হয় প্রধানতঃ উর্ধতন কর্মচারীদের বাসা থেকে অফিসে যাওয়া-আসা এবং তাহাদের পারিবারিক পরিবহন-চাহিদা মিটানোর জন্য। প্রত্যেক গাড়ীর জন্য ভূয়া লগ-বুক রাখা হয়, কিন্তু এই ভূয়া লগ-বুক অনুযায়ী গন্তব্য স্থল পরীক্ষা করিলে দুর্নীতির সবটুকু ধরা যাইবে। সমবায় সম্প্রসারণের যে মূল্যবান সিনেমা ভ্যানটি রহিয়াছে, তাহা দ্বারা গত বছরে কখনো সিনেমা দেখানোর ব্যবস্থা হয় নাই; বরং গাড়ীখানা সম্পূর্ণ পারিবারিক উদ্দেশ্যে দিন-রাত ব্যবহার করা হইতেছে এর কারণ ব্যবহারকারী শেখ সাহেবের নিকট আত্মীয়।

সমবায় দফতরের অব্যবস্থার মূলে রহিয়াছে উর্ধতন পদে অনভিজ্ঞ ও অদক্ষ অফিসার নিয়োগ। এই সব অফিসার দুই এক বছরের জন্য পদে বহাল থাকিয়া শুধু সমবায়

কার্যক্রমের কষ্টলব্ধ ধারাবাহিক ও সংহতিকেই বিনষ্ট করেন না, প্রশাসনিকযন্ত্রকে নানাবিধ দুর্নীতিতে ভারাক্রান্ত করিয়া থাকেন,– যাহার ফলে এদেশের সমবায় আন্দোলন কেবলই ব্যর্থতার বোঝা টানিয়া চলিয়াছে। অথচ কৃষি, মৎস্য, বন, মাছের ও অন্যান্য দফতরের ন্যায় সমবায় দফতরকেও সিএসপি মুক্ত করিয়া সমবায়ের সমৃদ্ধিকে নিশ্চিত করার জন্য বিগত ২৪ বছর ধরিয়া জোর গণ-দাবী জানানো সত্ত্বেও বর্তমান সরকার এখনও নিশ্চুপ রহিয়াছেন। সমবায়কে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রধান হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করার সরকারী নীতি যদি সত্যই অর্থপূর্ণ হয়, তাহা হইলে সরকার এই গণদাবীকে অবজ্ঞা করিতেছেন কোন্ যুক্তিতে ?

–খায়রুল হক ভূঞা
ঢাকা

জনতার প্রতি

আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকেই ভয় করবেন না। দমননীতির ভয়ে পবিত্র ইসলামের আদর্শ পরিত্যাগ করবেন না। ইসলাম জিন্দা হোতো হ্যায় কারবালাকে বাদ। তাই ইনশাহ্ আল্লাহ্, এবার বিশ্বের মুসলমান সর্ব প্রকারের পাপ থেকে তওবা করে পুনরায় অতীত ইতিহাস উদ্ধার করতে সক্ষম হবে। শুধু প্রয়োজন জাতীয় চরিত্র গঠন ও আল্লাহ্র প্রতি অটল বিশ্বাস-স্থাপন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যাতে চিরস্থায়ী হয় এবং সাড়ে সাত কোটি বাঙালী যাতে পুনরায় অন্য কোনো দেশের গোলাম না হয়, তার জন্য ঈমানদার মুসলমান ভাইয়েরা দেশের ৯৬ হাজার মসজিদে আল্লাহ্ পাকের দরবারে মোনাজাত করবেন। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলে বাংলাদেশকে সুখী ও সমৃদ্ধশালী করে গড়ে তুলতে আপ্রাণ চেষ্টা করবেন।

জরুরী ঘোষণা

বাংলাদেশে ৯৬ হাজার মসজিদে দ্বীন ও দুনিয়ার উন্নতি করে মুসল্লীদেরকে উপদেশ প্রদান করার জন্যে বাংলায় খোৎবা ছাপিয়ে ইনশাহ্ আল্লাহ্ শিগগিরই বিতরণের ব্যবস্থা করবো। আল্লাহ্, রসূল (সঃ) ও ছাহাবাদের প্রশংসা আরবীতে লেখা থাকায় সেগুলি বাংলায় লেখা হবে। এই মহৎ কাজে যারা বিনা বেতনে সাহায্য করতে চান, তারা আমার সাথে সন্তোষে দেখা করবেন। তাদের কোরান, হাদিস প্রভৃতি ধর্মীয় শাস্ত্র এবং বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় বিশেষ জ্ঞান থাকতে হবে।



এমসিএদের কাণ্ড

লীজের পর

টাঙ্গাইলের বাঘা-ভাই এমসিএটি অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের প্রতিযোগিতার পাল্লায় পরাজিত করে বর্তমান নিবাসটি লীজ নিয়েছিলেন। লীজ নেয়া জায়গায় কোন নতুন সংস্কার বা নির্মাণ কার্য্য সম্পূর্ণ বেআইনী হলেও বাড়ী সংলগ্ন চত্বরে তিনি একটি নতুন ভবনের নির্মাণ কার্য্য শুরু করেছেন। জানা গেছে, তিনি নাকি ওখানে মিল-ফ্যাক্টরী প্রতিষ্ঠা করার ইচ্ছে রাখেন। দেশে একটি প্রতিষ্ঠিত সরকার, তার আইন এবং আইন কার্য্যকরী করার সংস্থা থাকা সত্ত্বেও তাদের নাকের ডগায় এধরনের বে-আইনী কাজ কি করে সম্ভব জনগণের আজ তাই জিজ্ঞাসা।

আটক মালে রাজা

স্বাধীনতার পরপরই শেরপুরের জনৈক এমসিএ 'মেসার্স শেরপুর জুট ট্রেডার্সে'র সাড়ে সাতশ মণ পাট আটক করেছিলেন।

অভিযোগ ঃ সংস্থার জনৈক কর্মকর্তা পাকবাহিনীর দালালী করে জেলখানায় বিচারাধীন রয়েছেন। আর এ জন্যেই এমসিএটি শত শত গরীব ফঁড়িয়া এবং ক্ষুদে ব্যবসায়ীদের পাট আটক করেছেন। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসলে তিনি ঘোষণা করলেন, সাড়ে সাতশ মণ নয়, পাট ছিল মাত্র সোয়া দু'শ মণ। সোয়া পঁচিশ মণ পাটের টাকা বেমালুম গায়েব করে দেয়ার পর ঘোষিত পাটের বিক্রয়লব্ধ দশ হাজার টাকাও তিনি নিজের নামে ব্যাংকে জমা দিয়েছেন। প্রকৃত পাট মালিকদের অর্থ ফেরত দেয়ার দাবী সোচ্চার হওয়ায় তিনি সম্প্রতি নিজের বশংবদদের মধ্য থেকে ভূয়া দাবীদার দাঁড় করানোর ব্যবস্থাও করে ফেলেছেন।

একচোটে

কুমিল্লা জেলার কসবা থানার জনৈক এমসিএ একটা গাড়ী হাইজ্যাক করে কিছুদিন 'বেসামরিক প্রশাসক' হিসেবে রাজত্ব চালানোর পর তার রাজ্যে অসন্তোষ বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ঘাটি গেড়েছেন। শহরে আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে কিছুদিন আগে তিনি বেহুদা নিরীহ ষ্টেশনমাস্টারকে একচোট মেরেছেন। এখন তাই সেখানে তার দারুণ দাপট। অতএব দুনিয়ায় রাজাকার, আলবদর আর দালালদের সমাগমে এমসিএটির বাড়ীও জমজমাট।

ভাগ যুদ্ধ

কোলকাতার হোটেলে বসে বসে দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধ করে ক্লান্ত কসবার দুজন এমসিএ কদিন আগে বন্ধ ঘরে তুমুল ফাইট করেছেন। কষ্টে জোটানো জিনিষের ভাগবাটোয়ার নিয়ে এই ফাইটের ফলে এমসিএ দুজনের সম্পর্ক এখন পাক-ভারতের অবস্থায় দাঁড়িয়েছে।

কারফিউ এবং তারপর

মানিকগঞ্জ মহকুমার 'খিদমতগার' এমসিএটি কিছুদিন আগে তার ভাড়াটে লোকদের অস্ত্রে সজ্জিত করে শহরের বাইরের একটি গ্রামে ভোররাত্রে কারফিউ জারী করে পাইকারী ধরপাকড়ে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তারপর সবাইকে ছেড়ে দেয়ার আশ্বাস দিয়ে হাজার পঞ্চাশেক টাকা পকেটস্থ করে তিনি ব্যাটেলিয়নসহ প্রত্যাবর্তন করেন। এই এমসিএটির বিশিষ্ট ধামাধরা জনৈক পঞ্চায়েত চেয়ারম্যান রিলিফের মাল আত্মসাতের সময় জনতার হাতে ধরা পড়লে তিনি তার ক্ষমতার বলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে ফেলেন। এর প্রতিবাদ করায় মাননীয় এমসিএটি রিলিফ কমিটির দু'জন তরুণ সদস্যকে বহিস্কার করেছেন। এখন তিনি স্থানীয় ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে নিয়মিত চাঁদা আদায় করছেন।

থাকিব না পিছনে

কসবার মহিলা এমসিএটিও পিছিয়ে নেই। তিনি নিজের ভাইকে দিয়ে একটি দেশপ্রেমিক গুণ্ডা বাহিনী গঠন করিয়ে তাঁর মাধ্যমেই যাবতীয় কার্য সমাধা করছেন। ভাই-এর বাহিনীটি সাম্প্রতিককালের 'সাকসেসফুল অপারেশনে' যা কামিয়েছে এমসিএ সাহেবান তারই হিসেব নিয়ে এখন ব্যস্ত থাকায় অন্য কোনো কাজে অংশ নিতে পারছেন না।

'বাংলার বাণী'তে প্রকাশিত খবরের প্রতিবাদ
মওলানা ভাসানীর বিবৃতি

গত ২১ শে জুন বুধবার ঢাকা থেকে প্রকাশিত দৈনিক 'বাংলার বাণী' নামক পত্রিকায় "বাঙালী হত্যার নায়ক বেলায়েত হোসেন মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক সচিব" এই শিরোনামায় একটি উদ্ভট ও অবমাননাকর সংবাদ এবং একটি মিথ্যা ও জাল চিঠির ফটোস্টেট ছবি ছাপা হইয়াছে। এই সংবাদ ও চিঠি পাঠ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত ও বিস্মিত

হইলাম। এই সংবাদ সম্পূর্ণ কাল্পনিক জঘন্য মিথ্যা এ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

সন্তোষে আমার বাড়ীতে বিভিন্ন সময়ে বর্তমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসিয়াছেন এবং বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারী অফিসার ও বিভিন্ন জেলার আওয়ামী লীগ প্রতিনিধিগণ প্রতিমাসে ২/১ বার আমার সঙ্গে মিলিত হন। আমি অসুস্থ বলিয়া তাহাদের সকলকে বাড়ীর ভিতরে আমার নিজের ঘরে ডাকিয়া আনিয়া আলাপ করি। এমনকি আইবি অফিসার যাহারা সর্বদা আমার বাসস্থানের আশেপাশে ডিউটিতে থাকেন তাহারাও অবাধে বাড়ীর ভিতরে যাতায়াত করে। আমার বাড়ীর সব কয়টি ঘরই ছনের তৈরী বলিয়া কোন কামরা কুঠুরী নাই। বাড়ীর ভিতর ঢুকিলে যে কেহ ঘরের ভিতর ও বাহিরের সমস্ত কিছুই দেখিতে পারিবে। এ অবস্থায় আমার বাড়ীতে 'বাংলার বাণী'র সংবাদ অনুযায়ী বহু লোক তো দূরের কথা একজনও আত্মগোপন করিয়া থাকিতে পারিবে না। কলিকাতা হইতে যে সমস্ত পুরাতন বন্ধুবান্ধব এবং সাংবাদিকরা আসেন তাহারা আমার সঙ্গে আমার বাড়ীতে প্রকাশ্যেই আলাপ-আলোচনা করেন। কোন রকম গোপন পরামর্শ বা আলাপ আলোচনা করিতে কেহ আসে একথা কেহই বলিতে পারিবেন না। চারু মজুমদার বা কানু সান্যাল এদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ, আলাপ-আলোচনা বা সাক্ষাৎ জীবনে হইয়াছে একথা কেহই কসম করিয়া বলিতে পারিবে না। তাছাড়া ধ্বংসাত্মক কার্যে যাহারা লিপ্ত থাকে তাহাদের বিরুদ্ধে আমি বরাবরই জনসভায় ঐরূপ জঘন্য কাজ হইতে বিরত থাকার জন্য কঠোর ভাষায় মন্তব্য করিয়াছি। উগ্রপন্থী কিছু লোক বরাবর আমার বিরুদ্ধে বিজ্ঞাপন ও প্রচার পুস্তিকার মাধ্যমে সর্বত্র প্রচার করিয়াছে যে আমি সমাজতন্ত্রের কথা বলিলেও আমার দ্বারা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয় কারণ আমি একজন প্রতিক্রিয়াশীল লোক। রাজাকার এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরুদ্ধে যাহারা পাঞ্জাবী সেনাদের সঙ্গে হাত মিলাইয়া দেশপ্রেমিক নাগরিক এবং মুক্তিযোদ্ধাদের অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছে তাহাদিগকে আমি আন্তরিকভাবে ঘৃণ্য করি এবং এই মোনাফেকদের জন্য আমি প্রধানমন্ত্রীর নিকট কেন, কোন লোকের নিকটই আজ পর্যন্ত কোন সুপারিশ করি নাই। প্রধানমন্ত্রীর নিকট আমি ২টি পত্র লিখিয়াছি এবং উহার বিষয়বস্তু তিনি ভালোভাবেই অবগত আছেন। এই পত্রের উত্তরে প্রধানমন্ত্রী যে পত্র আমার নিকট দিয়াছেন উহাও আমার নিকট জমা আছে। সুতরাং 'বাংলার বাণী'তে প্রকাশিত আমার রাজনৈতিক সচিব হিসাবে কাল্পনিক বেলায়েত হোসেন সম্পর্কে যে সংবাদ ছাপা হইয়াছে আমি তীব্রভাবে উহার প্রতিবাদ করিতেছি। এ রকম জঘন্য মিথ্যা যদি আমার বিরুদ্ধে ক্রমান্বয়ে খবরের কাগজে ছাপা হইতে থাকে তবে উহা খুবই দুঃখজনক হইয়া দাঁড়াইবে। আশা করি ভবিষ্যতে এরূপ জঘন্য কাল্পনিক ও মিথ্যা বিবরণ 'বাংলার বাণী'তে প্রকাশিত হইবে না।

বাংলাদেশে শিপিং গড়ে ওঠার বিরুদ্ধে
ভারতীয় চক্রান্ত

আজ বাংলাদেশ এমনিতেই তিনটি জাহাজের মালিক থাকার কথা। কিন্তু ভারত চক্রান্ত করে তা থেকে আমাদের বঞ্চিত করেছে। স্বাধীনতার পর চট্টগ্রাম থেকে তারা তিনটি জাহাজ নিয়ে গেছে। 'বাকের'-এর নামক জাহাজটি দিয়ে দখল করা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যাবার নাম করে শ্রেফ জাহাজই দখল করে বসেছে। বাকেরের রং পাল্টিয়ে ভারত এর নাম রেখেছে 'হুগলি'। তাছাড়া আমাদের 'মধুমতি' ও 'পাসনী' ভারত নিয়ে গেছে। নিজ দেশে পরবাসী হবার মতই আমরা জাহাজের মালিক হয়েও উচ্চ মূল্যে পুরানো একটি কিনেছি। এর

চেয়ে শোষণ আর কি হতে পারে ?

স্বাধীনতার পর বেশ কয়েক মাস আমরা জাহাজ বিহিন শিপিং কর্পোরেশন চালিয়েছি। তবুও ভারতীয় পরামর্শে আমাদের সরকার বাংলাদেশকে কনফারেন্স লাইনের সদস্য করেছেন। এই কয় মাস ভারতই এর সুযোগ-সুবিধা লুটেছে। শুধু তাই নয়, ইতিমধ্যে আমাদের রফতানিকৃত লক্ষ লক্ষ বেল পাট ভারতই বহন করে লক্ষ লক্ষ টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেছে। এই লোভেই ভারত চায় না, আমাদের শিপিং কর্পোরেশন দ্রুত

✔ ভারত বাংলাদেশের তিনটি জাহাজ দখল করেছে
✔ভারতীয় জাহাজে বাংলাদেশের পতাকা
✔চট্টগ্রাম বন্দরের কর্তা পদের জন্যে ভারতীয় গোঁ

স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠুক। অথচ আমরা তা হতে পারি। কারণ, বিশ্বে এর চেয়ে লাভজনক ব্যবসা আর নেই। প্রায় পাঁচ মাসের মধ্যেই বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন চার্টার্ড জাহাজে ৬৭ হাজার ৪ শত ৬৯ টাকা এবং এজেন্সী কাজে ১৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেছে।

পাকিস্তানের আমলে বাংলাদেশেরই আয়ে ৫ বৎসরে ৩৫ টি জাহাজ ক্রয় করা হয়েছিল। অথচ এখন নির্বিঘ্ন ব্যবসা চালিয়ে তদপেক্ষা আরও কম সময়ে ততোধিক জাহাজ ক্রয় করা সম্ভব। কিন্তু বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন ১৯৮২ সাল অর্থাৎ আগামী ১০ বছরের মধ্যে মাত্র ৪০ খানা জাহাজ ক্রয়ের পরিকল্পনা করছে। অথচ পাকিস্তান আমলের অনুপাতে ক্রয় করা হলেও ১০ বছরে জাহাজের সংখ্যা ৭০ খানার কম হওয়া উচিত নয়।

'আয় করে দাম পরিশোধ' এই শর্তে যুগোশ্লাভিয়াসহ কয়েকটি দেশ বাংলাদেশের কাছে সম্পূর্ণ নতুন জাহাজ প্রতিটি ৮৫ লাখ টাকায় বিক্রির প্রস্তাব দিয়েছিল। কিন্তু সেই প্রস্তাব গ্রহণ করা হলো না। বরং বহু পুরাতন ভারতীয় বিশ্বপ্রেমকে বিশাখা পত্তমে জবর মেরামতের পর বাংলাদেশের কাছে পুরো ১ কোটি টাকায় নগদে বিক্রি করা হয়েছে।

শুধু কি তাই, বাংলাদেশের বিশ্ব বিখ্যাত সওদাগরী জাহাজের নাবিকগণ চাকুরী না পেয়ে হতাশ হয়ে যখন ডাণ্ডি প্রভৃতি বন্দরে চলে যাচ্ছেন, তখন সদ্যক্রীত বাংলাদেশের সবেধন নীলমণি 'বাংলার দূত'-এ একজন ভারতীয় নৌ ইঞ্জিনিয়ারকে সর্বাধিপত্তির পদ দিয়ে রাখা হয়েছে। শীঘ্রই এমন ধরনের আরেকখানা পুরোনো মাল বাংলাদেশের ঘাড়ে গুজে দেয়া হবে।

বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন ভারতীয় শিপিং সংস্থার অভিভাবকত্বে যুক্তরাজ্য-ভারত-পাকিস্তান-বাংলাদেশ কনফারেন্স লাইনের সদস্যপদ পেয়েছে। এতে সুযোগের চাইতে দুঃখ কুটেছে ঢের বেশী। কনফারেন্স লাইনের সদস্য হলে সুবিধা হলো, বাংলাদেশের জাহাজ যেমন পাট নিয়ে কুয়ালালামপুর গেল, সেখান থেকে ফিরবার সময় জাহাজটিকে ভাড়াটের জন্য অপেক্ষা করতে হবে না, এবং কনফারেন্স লাইনের যোগাড় করা জাহাজী মাল তুলে এদিকে চলে আসতে পারবে। ফলে জাহাজ চালনার খরচ উঠে গিয়ে বৈদেশিক মুদ্রায় লাভ থাকে প্রচুর। ভারত গত কয়েক মাসে বাংলাদেশের জাহাজী মালের কোটা বহন করার জন্য বিদেশী বন্দরে গিয়ে নিজেদের জাহাজে বাংলাদেশের পতাকা সেঁটেছে। এ পথে বাড়তি লক্ষ লক্ষ টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ভারত ট্যাকে গুজেছে।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

ইহা কি সত্য?

॥ ৮৯॥

সহোদর খোঁড়া শেখ মুসলিম লীগের এমপিএ আবুল হাসানের লুটের কামাই থেকে মাত্র ২ লাখ ৫ হাজার টাকা হিস্যা পেয়ে তাকে ঢাকা থেকে নিরাপদে খুলনাস্থ এমপিএর নিজ বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়েছেন।

॥ ৯০॥

'৭১-এর নভেম্বর পর্যন্ত পাকফৌজের নেকনজরে থাকার পর মুক্তিবাহিনীর হাতে রফা হবার ভয়ে সীমান্ত পার হয়ে ডিসেম্বরেই যিনি ফিরে আসেন, চট্টগ্রামের মিরেশ্বরাই-ফটিকছড়ির সেই এমসিএ সাহেব এখন দালাল রক্ষা সমিতির একজন বড় কর্মী। শান্তি কমিটির মামু ছাড়াও অনেক রাজাকার, আল-বদর তাঁর হেফাজতে। রুষ্ট জনতার কবল থেকে বাঁচার জন্য তিনি চট্টেশ্বরীর ওয়াপদা রেস্টহাইজে থাকছেন।

॥ ৯১॥

মন্ত্রীর অনুরোধ শিরোধার্য করতে গিয়ে কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগারের পরিচালক তিন তিনজন নিম্নতম কর্মচারীর হাতে বেধড়ক মার খেয়ে তারপর সুমতি ফিরে পেয়েছেন। তিতুমীর কলেজের জনৈক ছাত্রকে মহাখালীস্থ ষ্টাফ কোয়ার্টারে রুম দেবার অবৈধ আবদার নিয়ে পরিচালকের সাথে যোগাযোগ করেছিলেন। মন্ত্রী সাহেব পরিচালক রুম খালি করার জন্য পিয়নকে নোটিশ দিলে পিয়ন আকুতি জানাতে আসে। পরিচালক মেজাজ দেখিয়ে মারতে গেলে পাল্টা ঘা পড়ে।

॥ ৯২॥

কৃষি বিভাগের এক উপ মানে উপরিওয়ালার চাকুরীর ৫৫ বৎসর পার হয়েছে বেশ কয়েক মাস। তাকে অবসর গ্রহণ করানোর ফাইল মন্ত্রীদফতরে পাঠানো হলেও আজ দু'মাস মামুর জোরে তা চাপা পড়ে আছে।

॥ ৯৩॥

সোনার বাংলার একটি জুট মিলের কাহিনী। মিল গত ছ'মাস যাবৎ বন্ধ। কারণ, তাতে যোগ্যতার বহর ফাঁস হয়ে পড়তে পারে। মামুর জোরে নিযুক্তি প্রাপ্ত এই প্রশাসক বন্ধ ঘোষিত মিলের তহবিল থেকে বেতন ২০০০ টাকা, বাড়ী ভাড়া ১৪০০ টাকা, গাড়ী বাবদ ৫০০ টাকা, ৬ জন দেহরক্ষী দারোয়ান ১০০০ টাকা মাসিক ব্যয় ছাড়াও কোলকাতায় ৫ দিনের মউজ সফরে ৫৬০০ টাকা খরচ করে আসেন। মামুটি একজন মন্ত্রী।

॥ ৯৪॥

চোরের চাইতে বাটপাড় বড়। ময়মনসিংহের কনভেনশনী মুসলিম লীগের এমপিএ খোন্দকার আবদুল হামিদের বাসভবনটি চলতি লীগের শেরপুরের নেতাজী দখল করে আছেন, ছাড়বার নামগন্ধটিও নেই।

॥ ৯৫॥

খুলনা সমবায় শিল্প সমিতিতে ডেপুটেড কর্তা সমিতির টাকায় ব্যক্তিগত সাইড বিজনেস করতে গিয়ে গোপন কেচ্ছা রাষ্ট্র করে ফেলেছেন। ভারত থেকে চোরাই সুতা আমদানীর ব্যবসা তাঁর। চোরাই মাল চালাতে না পেরে সমিতির ঘাড়ে সঁপে দিয়েছেন। ধরা পড়েও বড় কর্তাদের কৃপায় সেরে যাচ্ছেন। ৩১/৩/৭২ তারিখে কেলেঙ্কারী ঘটেছিল।

সম্পাদক ঃ সৈয়দ ইরফানুল বারী ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ঃ মওলানা আবদুল খান ভাসানী মুদ্রণে ঃ শান্তি প্রেস, সন্তোষ, টাঙ্গাইল।

প্রতি কপি পঁচিশ পয়সা সাপ্তাহিক চাঁদার হার : ষান্মাসিক-৬.০০ বার্ষিক-১০.০০

হক-কথা

(WEEKLY THE HAQ-KATHA)

প্রকাশক ও পৃষ্ঠপোষক ঃ মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

প্রথম বর্ষ অষ্টাদশ সংখ্যা শুক্রবার ১৬ই আষাঢ় ১৩৭৯ : ৩০শে জুন ১৯৭২ ১৮ই জামাদিউল আওয়াল ১৩৯২ ঃ সন্তোষ, টাঙ্গাইল

বিডিআর ও রক্ষীবাহিনীর সাথে ভারতীয় সেনারাও মিলেছে

পার্বত্য চট্টগ্রামে গণ হত্যা চলেছে

হত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, লুটতরাজ আর পাইকারী গ্রেফতারের এক বীভৎস অভিযান চালিয়ে বর্তমান সরকার নিজের সামরিক বাহিনী ও ভারতীয় সেনাবাহিনীকে আমদানী করে পার্বত্য চট্টগ্রামের নিরীহ জনগণের জীবন বিপর্যস্ত করে দিয়েছে। স্বাধীনতা লাভের পর থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্বত্য জাতিসত্ত্বাগুলির ওপর অত্যাচারের নির্মম ষ্টীম রোলার চালাতে শুরু করে সরকার দেশের সংহতিকেই বিপন্ন করে তুলেছে।

দশটি সংখ্যালঘু জাতিসত্ত্বার আবাসভূমি পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমাদের রাজা ত্রিদীব রায় আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে নির্বাচনে জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর থেকেই তার প্রতি আওয়ামী নেতৃবৃন্দ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। ২৫শে মার্চের পর মুক্তিবাহিনীকে সর্বাত্মক সমর্থনের আশ্বাসদানের পরও বিশ্বাসঘাতকতা করে রাজার প্রেরিত প্রতিনিধিকে ত্রিপুরায় গ্রেফতার করা হলে চাকমারা বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে রাজা ত্রিদীব রায়কে চীন হয়ে পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে তিনি পাকিস্তান মন্ত্রীসভার সদস্য হওয়ায় অভিযোগ আনা হয়েছে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা, মগ ও মংরা পাক-বাহিনীর দালাল। এই অভিযোগে ১৬ই ডিসেম্বরের পর মুক্তিবাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামে ঢুকে পাইকারী গ্রেফতার ও মারপিটও শুরু করে। ফলে সারা এলাকায় প্রচণ্ড বিশৃংখলা এবং অরাজকতার সৃষ্টি হয়।

অবস্থা জটিল আকার ধারণ করলে রাঙামাটি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম সফরের পর বাংলাদেশ সরকারের উপজাতীয় পরামর্শদাতা এম, মেইন প্রধানমন্ত্রী, বাণিজ্যমন্ত্রী, শ্রমমন্ত্রী ও বাংলাদেশের চীফ সেক্রেটারীর কাছে তারবার্তা পাঠিয়ে জানান অসহায় উপজাতীয় লোকদের দালাল অভিযোগে পাইকারী গ্রেফতারের ফলে অবস্থা মারাত্মক হয়ে উঠেছে। তিনি সকলকে মুক্তিদানেরও পরামর্শ দেন।

বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে ইতিমধ্যে ভারতীয় বিমানবাহিনী দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের নিরীহ পাহাড়ী মানুষদের উপর নির্বিচারে বোমা বর্ষণ ও বিমান হামলা চালানো হয়েছে। ভারতীয় সেনারা সমগ্র এলাকা ঘেরাও দিয়ে পাহাড়ী চাকমা ও মগদের হত্যা করেছে,

পাইকারীভাবে গ্রেফতার করে জেলে পুরেছে এবং গুম করে দিয়েছে। হাজার হাজার পাহাড়ী মানুষ প্রাণের ভয়ে ভারতের দিকে পালাতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছে, অনেকে পালিয়ে গেছে বার্মায়। স্বাধীনতার তিন মাস না কাটতেই এ সকল ঘটনা ঘটে গেছে।

মার্চের মাঝামাঝি পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিবের তারবার্তার উদ্ধৃতিসহ একটি প্রচারপত্র বিলি করে ২০শে মার্চের মধ্যে অস্ত্র সমর্পণের জন্যে উপজাতীয়দের প্রতি নির্দেশ প্রদান করেন। কিন্তু যাদের কাছে আদৌ কোনো অস্ত্র নেই তারা কী করবে? অথচ সরকারের বদ্ধমূল ধারণা যে প্রতিটি চাকমা ও উপজাতীয়দের কাছেই অস্ত্র রয়েছে। কল্পিত অস্ত্র উদ্ধারের নামে তাই এখনো ভারতীয় সেনারা বিডিআর এবং রক্ষীবাহিনীর সাথে মিলিতভাবে নিরীহ পাহাড়ী মানুষদের উপর ত্রিমুখী আক্রমণ চালাচ্ছে। হত্যা, গ্রেফতার, লুটতরাজ এবং অগ্নিসংযোগের পরও ভারতীয় সেনারা পাক-বাহিনীর কায়দায় মা-বোনদের উপর পাশবিক অত্যাচার এবং অকথ্য নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে।

কর্ণফুলী প্রকল্পের উপর ভারত লোলুপ দৃষ্টি ফেলেছে
হত্যা, ধর্ষণ এবং নির্যাতন বন্ধের দাবীতে ছাত্রদের মিছিল

সম্পদ প্রাচুর্যে ভরপুর পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকেই কোটি কোটি টাকার বনজ সম্পদ আহরণ করা হয়। কর্ণফুলী পরিকল্পনায় জলবিদ্যুত দিয়েই আলোকিত হয়েছে ঢাকা ও চট্টগ্রাম। উপজাতীয় অধিবাসীরা সমগ্র দেশের উন্নতির জন্য কতদূর ত্যাগ স্বীকার করেছে তার উদাহরণ কর্ণফুলী বাঁধ। এ বাঁধ নির্মাণের ফলে কৃত্রিম হ্রদে পানি জমে আশেপাশের পাহাড়গুলি পানির নীচে ডুবে গেছে। পাহাড়ের মাথার উপর দিয়ে এখন লঞ্চ চলে। এ থেকে বুঝা যায় কি বিরাট এলাকা হয়েছে জলমগ্ন। আর এর ফলে এক লক্ষাধিক উপজাতীয় লোক আবাদী জমি ও ভিটি থেকে উৎখাত হয়েছে। সরল মানুষেরা আজও তাই ছিন্নমূল। এত কিছুর পরও যে এই এলাকার নিরীহ উপজাতীয়দের উপর অত্যাচারের নির্মম ষ্টীম রোলার চালানো হচ্ছে তা মূলতঃ আর একটি বিদেশী চক্রান্তের ফসল। কেননা, বাংলাদেশ থেকে বিদ্যুত নিয়ে যাবার জন্যে ভারত কর্ণফুলী প্রকল্পের উপর লোলুপ দৃষ্টি ফেলেছে। নিজ উদ্যোগে কর্ণফুলী বাঁধকে আরো ১৬ ফুট উঁচু করে তিনটি টার্বাইন চালাবার পরিকল্পনা নিয়েছে। এই বিদ্যুত নিয়ে আসামকে আলোকিত করে ইন্দিরা কংগ্রেসের ভবিষ্যত ফর্সা করার ষড়যন্ত্র চলছে। বাঁধটি আরো ১৬ ফুট উঁচু করা হলে এই বাড়তি বিদ্যুতের বেদীমূলে আরো লক্ষাধিক উপজাতীয় লোক চিরতরে জমি ও ভিটা হারাবে।

তাই নির্যাতিত হৃত সর্বস্ব উপজাতীয়দের পক্ষে পাহাড়ী জঙ্গী ছাত্ররা জুনের প্রথমদিকে বিক্ষোভ করেছেন, ভারতীয় সেনা ও বিডিআরকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে নারী ধর্ষণ বন্ধের দাবী জানিয়েছেন, দাবী জানিয়েছেন অত্যাচার বন্ধ করে বার্মায় আশ্রিত পাহাড়ীদের ফিরিয়ে আনার জন্যে।

এদিকে মং-রাজা মেইন, মানবেন্দ্র লার্মা এমসিএ, বোমং রাজা এম, এস, প্রু চৌধুরী, সাবেক এম এল এ কামিনী মোহন দেওয়ান এবং চারু বিকাশ চাকমার নেতৃত্বে ১৭ জন উপজাতীয় প্রতিনিধি প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করে তাঁদের দাবীসমূহ পেশ করেছেন।

১) পার্বত্য চট্টগ্রামকে নিজস্ব আইন পরিষদ বিশিষ্ট স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চল হিসেবে স্বীকৃতি দান।

২) উপজাতীয়দের অধিকার সংরক্ষণের জন্যে শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা।

৩) উপজাতীয় রাজাদের দফতর রক্ষা এবং

৪) পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের মতামত যাচাই ছাড়া কোন প্রকার শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন না করা– প্রভৃতি তাদের দাবীদাওয়াতে পেশ করা হয়েছে।

এইসব দাবীসমূহ বাস্তবায়নের জন্য শাসনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটির কাছেও দাবী জানানো হয়েছে।

জাতীয় নিপীড়নের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার আলোকে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়দের ন্যায়সংগত অধিকারের দাবীর প্রতি সমর্থন জানানো আমাদের প্রতিটি বাঙালীর কর্তব্য। বিগত চব্বিশ বছরের স্বেচ্ছাচার এবং তীব্র শোষণের ফলে উপজাতীয়রা আমাদের চাইতেও অনুন্নত রয়ে গেছে। তাদেরকে স্বকীয় বিকাশের পথে অগ্রসর হতে না দেয়া হলে উপজাতীয়দের পৃথক সত্বা ও সংস্কৃতি বিনষ্ট হবে। হিলট্রাক্টস ম্যানুয়েলে বর্ণিত স্বীকৃত আইন লংঘন করে বহিরাগতরা উপজাতীয় জীবন ও অর্থনীতিকে ধ্বংস করছে। তাদের দাবীসমূহ মেনে নিয়ে দেশের জনগণের মধ্যে অনৈক্য, প্রতিহত করা না গেলে বিদেশী ষড়যন্ত্রকারীরা বাংলাদেশের সর্বনাশ করবে। তারা এখন লোলুপ দৃষ্টি ফেলে ষড়যন্ত্রের জাল ফেলছে।

দুর্ভিক্ষ এলাকা ঘোষণা করো

প্রলয়ঙ্করী বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত সিলেটবাসীর প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করে অসুস্থ জননেতা মওলানা ভাসানী সম্প্রতি সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বন্যা কবলিত সিলেটের সমগ্র অঞ্চলকে অবিলম্বে দুর্ভিক্ষ এলাকা ঘোষণার জন্য সরকারের নিকট দাবী জানিয়েছেন।

ভয়াবহ বন্যায় ২ শত লোকের শোচনীয় মৃত্যু ও বিস্তীর্ণ জনপদে অপরিমেয় সম্পদ বিনষ্ট হওয়ার মর্মান্তিক সংবাদে মওলানা ভাসানী যার-পর-নাই ব্যথিত হয়েছেন। তিনি বলেন, অসুস্থতা হেতু বন্যা বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শনে আমার বিলম্ব হবে।

নিহত ব্যক্তিদের আত্মার মাগফেরাতের জন্য তিনি আল্লাহর দরবারে দোয়া করেন।

বন্যা কবলিত অঞ্চলের দুর্গত মরণাপন্ন জনগণের সাহায্যার্থে সরকারের নিকট সকল প্রকার সাহায্য দ্রব্য অবিলম্বে পৌঁছে দেবার জন্য তিনি দেশবাসী ও বিদেশী দানবীরদের অনুরোধ জানান।

বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দাও

অবিলম্বে বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদান করে পাকিস্তানে আটক ৫ লাখ অসহায় বাঙ্গালীর আশু স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করার দাবী জানিয়ে বাংলাদেশের অশীতিপর বৃদ্ধ জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী পাকিস্তান ও ভারতের আসন্ন শীর্ষবৈঠকের স্থান শিমলা ঠিকানায় ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রযত্নে পাকিস্তানী প্রেসিডেন্ট ভুট্টোর নিকট এক জরুরী তারবার্তা প্রেরণ করেছেন।

তারবার্তায় মওলানা ভাসানী বলেন, আপনার ও আপনার সরকারের প্রতি আমার বিশেষ উপদেশ যত শীঘ্র সম্ভব বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান ও পাকিস্তানে আটক ৫ লাখ নির্দোষ বাঙ্গালীকে অতি সত্বর বাংলাদেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন।

বাঙ্গালীদের প্রতি পাকিস্তান সরকারের অত্যাচারকে বিশ্বের ইতিহাসে নজীরবিহীন অমানুষিক বলে আখ্যায়িত করে মওলানা ভাসানী আশা প্রকাশ করেন যে, পাসপোর্ট ও ভিসা প্রথায় দু'দেশের জনসাধারণ উভয় দেশে-যাতায়াত ও ব্যবসা-বাণিজ্য করতে সমর্থ হলে উভয় দেশের মধ্যে বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্ব পুনরায় গড়ে উঠতে পারে।

ন্যাপ নির্বাচনে অংশ নেবে

মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন ঃ বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি আগামী নির্বাচনে অংশ নিয়ে প্রতিযোগিতা করবে।

বিবৃতিতে তিনি বলেন, "এক শ্রেণীর স্বার্থপর লোক ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সর্বত্র প্রচার করছে যে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি আগামী নির্বাচন বর্জন করবে। এই অপপ্রচার সম্পূর্ণ মিথ্যে। ইনশাহআল্লাহ ন্যাপ আগামী নির্বাচনে অবশ্যই অংশগ্রহণ করে প্রতিযোগিতা করবে।"

কাশ্মিরীদের গণভোটের অধিকার চাই

যোগসূত্রহীন এবং পরস্পর বিরোধী বক্তব্য বলতে বলতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী এবং পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টো গত ২৮শে জুন সিমলায় আলোচনা বৈঠকে মিলিত হয়েছেন। আগামীকাল এই বৈঠক শেষ হওয়ার কথা।

স্বভাবতই পাক-ভারতের এই বৈঠকের প্রতি সকলেই উদগ্রীব হয়ে তাকিয়ে আছেন। যদিও বৈঠকটি সম্পূর্ণরূপে পাক-ভারতের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার, তবু এই বৈঠক সম্পর্কে বাংলাদেশের মানুষ উদাসীন থাকতে পারে না। বৈঠকে বাংলাদেশ প্রশ্ন আলোচিত হতে পারে, কিন্তু জনগণের অনুমতি ছাড়া কোনো সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার ইন্দিরা- ভুট্টোর নেই। আমাদের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট যে কোন ব্যাপারে আলোচনার আগে জনাব ভুট্টোকে অবশ্যই বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হবে, ফেরত দিতে হবে পাঁচ লক্ষ নিরীহ আটক বাঙালীকে।

সিমলা বৈঠকের সাফল্যের মধ্য দিয়ে পাক-ভারত তাদের দীর্ঘদিনের আভ্যন্তরীণ বিরোধ সমূহের নিষ্পত্তি করুক, এই সকলের কাম্য। এই প্রসঙ্গে পাক-ভারত বিরোধের মূল কারণ কাশ্মির সমস্যা সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে ভারত ও পাকিস্তান প্রথম থেকেই কাশ্মিরী জনগণের ভাগ্যকে নিয়ে নিজেদের স্বার্থোদ্ধারের চেষ্টায় রয়েছে। নির্যাতিত লক্ষ লক্ষ মানুষের দাবী অনুযায়ী উভয় দেশকেই কাশ্মিরীদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের স্বীকৃতি দিতে হবে। তিরিশ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশের জনগণ সবসময়ই কাশ্মিরীদের আত্মনিয়ন্ত্রণের জন্য গণভোটের দাবীর প্রতি সমর্থন জানিয়ে যাবে।

ইরফানুল বারীর মুক্তির দাবীতে মিছিল-গণসমাবেশ

বাংলাদেশের নির্যাতিত শোষিত মেহনতি জনগণের নির্ভিক কণ্ঠস্বর মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী প্রতিষ্ঠিত সাপ্তাহিক 'হক-কথা' সম্পাদক সৈয়দ ইরফানুল বারীকে মিথ্যে অজুহাতে গ্রেফতারের প্রতিবাদে সারাদেশ সোচ্চার হয়ে উঠেছে। গত ২৭শে জুন ঢাকার বায়তুল মোকাররমে আটটি দলের যৌথ আহ্বানে অনুষ্ঠিত এক বিরাট গণসমাবেশে বিভিন্ন বক্তা লোক দেখানো দালালীর অভিযোগ প্রত্যাহার করে অবিলম্বে জনাব ইরফানুল বারীকে বিনাশর্তে মুক্তিদানের দাবী জানিয়েছেন।

বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, কৃষক সমিতি, বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশন, বাংলা শ্রমিক ফেডারেশন, বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন, বাংলা ছাত্র ইউনিয়ন, গণতান্ত্রিক যুব লীগ ও বাংলাদেশ বেকার সমিতির সম্মিলিত আহ্বানে অনুষ্ঠিত এই গণসমাবেশে ঢাকা শহর ন্যাপের আহ্বায়ক জনাব মুজিবর রহমান চিশতি সভাপতিত্ব করেছেন।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, "জনপ্রিয় সাপ্তাহিক 'হক-কথা'কে বন্ধ করে দেয়ার হীন উদ্দেশ্যেই

জনাব ইরফানুল বারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।"

যারা বিগত ২৪ বছর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবীতে বিভিন্ন আন্দোলনে অংশ নিয়েছে, ক্ষমতায় গিয়ে সেই আওয়ামী লীগই জনগণের ন্যায্য গণতান্ত্রিক অধিকার হত্যার নেশায় মেতে উঠেছেন বলে বক্তারা অভিযোগ পেশ করেন। তারা দেশে সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের মতো নিকৃষ্ট পথ পরিহার করার জন্যেও মুজিব সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

গণসমাবেশে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তৃতা করেছেন মেসার্স মুজিবুর রহমান, রফিক উদ্দিন আহমদ (ইন্তু মিয়া), গোলাম মহিউদ্দিন, হায়দার আনোয়ার খান জুনো, গাজীউল হাসান, নাজমুল আলম লাল, মনিরুজ্জামান খান, সিরাজুল হক ও মিসেস আনোয়ারা আহমদ।

সমাবেশ শেষে শত শত ছাত্র-শ্রমিক-জনতার এক বিরাট প্রতিবাদ মিছিল বায়তুল মোকাররম থেকে সদরঘাট পর্যন্ত যাওয়ার পথে জনাব ইরফানুল বারীর নিঃশর্ত মুক্তির দাবী জানান। তাছাড়া তারা ভাসানী তোমায় লাল সালাম, সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করা চলবে না, গণশক্তির তালা-খুলে দাও, প্রভৃতি শ্লোগানে ঢাকার রাজপথ মুখরিত করে তোলেন।

বাংলা জাতীয় লীগ

জনাব দেওয়ান সিরাজুল হকের সভাপতিত্বে ২৫শে জুন অনুষ্ঠিত বাংলা জাতীয় লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির দু'দিন ব্যাপী বৈঠকে 'হক-কথা' সম্পাদককে গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা করে অবিলম্বে তার বিনাশর্তে মুক্তি দাবী করা হয়েছে। তারা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব না করার জন্যে সরকারের প্রতি দাবী জানিয়েছেন।

ঝিনাইদহ সাংবাদিক ইউনিয়ন

গত ২৪শে জুন ঝিনাইদহ মহকুমা সাংবাদিক ইউনিয়নের এক জরুরী সভায় জনাব ইরফানুল বারীকে গ্রেফতারের তীব্র প্রতিবাদ করা হয়েছে। তারা অবিলম্বে 'হক-কথা' সম্পাদকের মুক্তি দাবী করেছেন।

বাংলা ছাত্র ইউনিয়ন

২২শে জুন মানিকগঞ্জ মহকুমা বাংলা ছাত্র ইউনিয়নের এক কর্মী সমাবেশে 'হক-কথা' সম্পাদকের অগণতান্ত্রিক গ্রেফতারকে নিন্দা করে অবিলম্বে তাঁর মুক্তি দাবী করা হয়। মহকুমা সভাপতি জনাব আবদুর রশিদ বিশ্বাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় জনাব ইরফানুল বারীর মুক্তি দাবী করে বক্তৃতা করেন সাধারণ সম্পাদক জুলফিকার রহমান দুলাল, হাবিবুর রহমান টুটুল, নুরুল ইসলাম ও মুজিবুর রহমান।

ঝিনাইদহ ন্যাপ

ঝিনাইদহ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সভাপতি জনাব জাহিদ হোসেন ও বাংলা ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি নারায়ণ চক্রবর্তী এক যুক্ত বিবৃতিতে জনাব ইরফানুল বারীকে নিঃশর্তে মুক্তির দাবী জানিয়েছেন।

'অমৃতবাজার পত্রিকা' বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের প্রতি কটাক্ষ হানছে

সাম্রাজ্যবাদীদের অর্থেপুষ্ট ভারতের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠীর মুখপত্র বলে পরিচিত কোলকাতার ইংরেজী দৈনিক 'অমৃতবাজার পত্রিকা' ক্রমাগতভাবে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের প্রতি অমার্জনীয় কটাক্ষ হানতে শুরু করেছে। পত্রিকাটির গত ৪ঠা মে সংখ্যায় ঢাকার জনৈক রহমান জামানের 'দেশ বিভাগ ও বাংলাদেশ' শীর্ষক একটি চিঠি এবং পরবর্তী ১৬ই মে সংখ্যায় 'ভারত ও বাঙালী জাতীয়তাবাদ' শীর্ষক আরেকটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এটির

লেখক হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বলে কথিত জনৈক আজিজ আহমদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

মাত্র কয়েকদিনের ব্যবধানে 'অমৃতবাজার পত্রিকায়' প্রকাশিত চিঠি ও নিবন্ধটিতে সুচতুরভাবে একই বক্তব্য ব্যক্ত করা হয়েছে। চিঠিটির মূল বক্তব্য হলো ঃ "বাংলাদেশ ভারতের অংশ ছিল এবং বর্তমানে সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তিতে দু'দেশের একটি সাধারণ নীতিও আছে... এটা স্পষ্ট যে বাংলার অর্ধেক ভাগ ও আসাম ভারতের সঙ্গে থাকার সুযোগ সুবিধে ইতিমধ্যেই ভাগ করছে। তাহলে বাংলাদেশের জনগণ কী দোষ করেছে যে মোটামুটি একই সংস্কৃতি থাকা সত্ত্বেও তারা পাশের প্রদেশের (পশ্চিম বাংলা) সাথে যোগ দিতে পারবে না? ... একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে যতদিন পর্যন্ত অবাস্তব বিভাগ বজায় থাকছে ততদিন ধর্মীয় অসমতা এবং দুর্বল সংখ্যালঘু কিছুতেই এই উপমহাদেশে কাংখিত শান্তি আনতে দেবে না।"

নিবন্ধটির বক্তব্য হলো ঃ ভারত ও বাংলাদেশ সরকার যদি তাদের দেয়া প্রতিশ্রুতির প্রতি আন্তরিক ও শ্রদ্ধাশীল হন তাহলে এখনো পর্যন্ত বাংলাদেশকে যে বিভক্ত থাকতে দেয়া হয়েছে, তা অসম্ভব নিস্ফল ও অনাবশ্যক হয়ে পড়বে। ... ৭১ এর ১৬ই ডিসেম্বর থেকে দু'দেশের সীমান্তের যথার্থতা ফুরিয়ে গেছে। ... উপমহাদেশের বৃহত্তর স্বার্থে ও স্থায়ী শান্তির জন্যে ভাবাবেগ বর্জন করে আমাদের ভারতীয়করণের জন্য সক্রিয় হওয়া উচিত। তাহলেই আমরা গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্ম নিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদের সুফল লাভ করতে পারবো।

ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের নির্লজ্জ দালাল এই পত্রলেখক ও অধ্যাপকটি কে? নিজের দেশকে যারা অন্য দেশের কাছে বিকিয়ে দেয়ার দালালী করতে পারে, সে দেশদ্রোহীদেরকে প্রকাশ্য গণআদালতে দাঁড় করিয়ে হত্যা করতে হবে। নাহলে জনগণ সরকারকে ক্ষমা করবেন না।

পত্রিকান্তরে প্রকাশিত খবরে জানা গেছে, 'অমৃতবাজার পত্রিকার' নিবন্ধটির লেখক ঐ অধ্যাপকটির অস্তিত্ব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই। বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের প্রতি উদ্ধত অবজ্ঞা প্রদর্শন করে তাহলে এই নিবন্ধটি কে লিখেছে? একে নিশ্চয়ই গণতন্ত্রের দেশ ভারতের জনগণের বাক-স্বাধীনতার বাড়াবাড়ি বলে উপেক্ষা করা চলে না। দু'দেশের জনগণের সংগ্রামী ঐক্য অবশ্যই আমাদের কাম্য। কিন্তু মৈত্রীর নাম ভাঙ্গিয়ে 'অমৃতবাজার পত্রিকা' ভারতের শোষক শ্রেণীর স্বার্থে বাংলাদেশকে একটি আশ্রিত তাবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করার জঘন্য উদ্দেশ্যে যে গলাবাজি শুরু করেছে তাকে কোনো অবস্থাতেই ক্ষমা করা যায় না। তিরিশ লক্ষ শহীদের তাজা খুনে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের প্রতি মারাত্মক কটাক্ষ হেনে আমাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার দুঃসাহস এই পত্রিকাটি কোত্থেকে পেয়েছে? এখনো এই পত্রিকাটির বিরুদ্ধে ভারত সরকার কোনো ব্যবস্থাই নেননি। তাহলে কি বুঝতে হবে যে এর পেছনে অন্য আরো কোনো বিশেষ মহলের গোপন ইঙ্গিতে রয়েছে?

ঝিনাইদহে
মস্কো ন্যাপের সভা পণ্ড

ঝিনাইদহ পাবলিক পার্কে ১৪ই জুন মোজাফফর দলের এক সভা পণ্ড হয়ে গেছে। উক্ত দলের নেত্রী মতিয়া চৌধুরী সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীর নাম ধরে দোষারোপ শুরু করলে উপস্থিত জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। আমার নেতা তোমার নেতা মওলানা ভাসানী – জনতার এই শ্লোগানের মুখে সভাটি পণ্ড হয়ে যায়।

জরুরী বিজ্ঞপ্তি

প্রতিটি এজেন্টকে প্রতি কপি এক টাকা হারে তাদের জামানতের অর্থ এবং বিলের বাকী টাকা আগামী ১৫ই জুলাই-এর মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। না হলে পত্রিকা প্রেরণ বন্ধ করা হবে।

'হক-কথা' নিয়মিত মেহনতি জনগণের নিজস্ব পত্রিকা। একে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্বও প্রত্যেকের। আপনারা সকলে 'হক-কথা'র গ্রাহক হোন এবং অন্যকেও হতে বলুন।

সত্য অথচ অন্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয় না এমন সংবাদ 'হক-কথা'য় পাঠিয়ে দিন।

– আবদুল হামিদ খান ভাসানী

কেন 'হক-কথা' সম্পাদককে গ্রেফতার করা হলো?

প্রচণ্ড ধাপ্পাবাজীর মধ্য দিয়ে 'হক-কথা' সম্পাদক সৈয়দ ইরফানুল বারীকে গ্রেফতারের পর সংবাদপত্র ও শ্রমিকের অধিকার হরণকারী জুলুমবাজ সরকার এক হাস্যকর নাটকের অবতারণা করেছেন। বিদেশী লুটেরাদের এজেন্ট ও ফ্যাসীবাদী উচ্চাশী ক্ষমতাসীনদের মনে ত্রাস সৃষ্টিকারী সাপ্তাহিক 'হক-কথা'র উপর আঘাত হানার একমাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে সম্পাদককে গ্রেফতার করার পর সরকার অলীক কেচ্ছা শুনিয়ে দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করবার জন্য বলেছেন, দালাল হিসাবে দালাল আদেশবলে জনাব ইরফানুল বারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

'হক-কথা' সম্পাদকের গ্রেফতারের প্রতিবাদ করে মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর কাছে ২০শে জুন প্রেরিত তারবার্তায় অবিলম্বে জনাব ইরফানুল বারীর নিঃশর্ত মুক্তি দাবী করলে সরকার তড়িঘড়ি করে যা পেরেছেন তাই খাড়া করে বলেছেন, জনাব ইরফানুল বারী নাকি দখলদার আমলে দালালী করেছেন এবং এনএসএফ ইত্যাদির সাথে জড়িত ছিলেন। থলির বিড়াল তাদের কিঞ্চিত বেরিয়ে পড়েছে। মওলানা ভাসানীর প্রতিবাদ তারবার্তার উত্তরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আবদুল মান্নানের প্রেরিত তারবার্তায়। মান্নান সাহেবের তারবার্তায় অলীক কেচ্ছার ফাঁকে বেফাঁসে হয়ত বলে ফেলা হয়েছে, 'হক-কথা'র মাধ্যমে জনতাকে উত্তেজিত করার অভিযোগও জনাব বারীর বিরুদ্ধে রয়েছে। সরকার যে কেচ্ছা শুনাচ্ছেন তা হলো ঃ

"সৈয়দ ইরফানুল বারী মোনয়েম আমলের কুখ্যাত ছাত্র প্রতিষ্ঠান এনএসএফ-এর জঘন্য পাণ্ডা, পয়গামের মত 'কুখ্যাত' কাগজে তিনি চাকুরী করেছেন, মোনয়েম পুত্রের সাথে তাঁর ছিল ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং যুদ্ধের নয় মাসে তিনি সেনাবাহিনীর দালালী করেছেন, শুধু তাই নয়, এখানো মওলানা ভাসানীর পক্ষপুটে আশ্রয় নিয়েছেন, মওলানা ভাসানী বোধহয় লোকটির আসল রূপ অবগত নন, এবং 'হক-কথার মাধ্যমে জনতাকে উত্তেজিত করা হয়েছে।

সরকার অলীক কেচ্ছা ফেঁদেছেন

তাঁর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগগুলি সরকার তদন্ত করে দেখছেন"– স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উত্তরের সারবস্তু হচ্ছে এই।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এ 'উত্তরের' জবাবে মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী আরেকটি তারবার্তা পাঠিয়েছেন। তাতে তড়িঘড়ি বানানো সরকারী কেচ্ছাখানা ভণ্ডুল হয়ে যাচ্ছে। মওলানা বলেছেন, ক্ষমতাসীন জুলুমবাজ সরকারের কোপানলে পড়লে শয়তান ফেরেস্তা বনে যায়, তাতে ফেরেস্তাকে

শয়তান বলে আখ্যা দানের এই চেষ্টা মোটেও বিস্ময়কর নয়।

তারবার্তায় মওলানা ভাসানী উল্লেখ করেছেন, স্বাধীনতার দু'মাস পরে 'হক-কথা' প্রকাশের জন্য ডিক্লারেশনের ব্যাপারে আবেদন করা হলে, সেই ডিক্লারেশনেই সৈয়দ ইরফানুল বারীকে সম্পাদক করার প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল।

টাঙ্গাইলের ডিসিকে ডিক্লারেশনটি তাড়াতাড়ি করে দেয়ার অনুরোধ জানান হলে তিনি স্বরাষ্ট্র বিভাগের প্রচলিত বিধানের কথা তুলে বলেছিলেন, প্রস্তাবিত সম্পাদকের স্কুল জীবন থেকে ১৯৭২ সাল অবধি প্রতিটি বিষয় তদন্ত না করে ডিক্লারেশন দেয়ার উপায় নেই। স্বরাষ্ট্র দফতরের অধীন স্পেশাল ব্রাঞ্চ, গোয়েন্দা বিভাগ, পুলিশ কর্তৃপক্ষ তাঁর বাড়ী, তাঁর কর্মক্ষেত্র সর্বত্র পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শেষে রিপোর্ট দিলে তারই ভিত্তিতে পত্রিকায় তাকে সম্পাদক করা ও পত্রিকা প্রকাশের অনুমতি দেয়া হয়। সে রিপোর্টে ইরফানুল বারীকে 'আদর্শ চরিত্রের' বলে মন্তব্য করা হয়েছিল।

কিন্তু 'হক-কথা' ১৬ সংখ্যা প্রকাশের পরই আদর্শ চরিত্রের ব্যক্তিটি সর্বাত্মক দালালে পরিণত হলেন এটা কেমন কথা? তিনি দালাল হলে বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্র দফতর ডিক্লারেশন কেন দিয়েছিল?

গোমর এইখানেই। দালালীর কথাটা শ্রেফ কেচ্ছা। কেননা, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যেও বলা হয়েছে, জনাব বারীর ব্যাপারে তদন্ত চলছে। অর্থাৎ দালালী তিনি করেছেন কিনা, এবিষয়ে নিজেরাও তারা নিশ্চিত নন। আটকানো দরকার, তাই ক্ষমতার বহর দেখিয়ে জেলে পাঠানো হয়েছে। না হলে তিনি মওলানা ভাসানীর নির্দেশে ঘুষ-দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, চোরাকারবারী, দুর্নীতিপরায়ণ মন্ত্রী, এমসিএ, সরকারী কর্মচারী এবং বাংলাদেশের বিরুদ্ধে রুশ–ভারতসহ অন্যান্য বিদেশী চক্রান্তের প্রতিবাদে যে দেশপ্রেমিকতার নজীর স্থাপন করছিলেন, তার ফলে স্বার্থবাদীদের সব খায়েশই নস্যাত হয়ে যেতো।

মওলানা ভাসানী তারবার্তায় বর্তমান ক্ষমতাসীনদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, পাকিস্তানের প্রথম আমলেও এমনি খেলাই চলতো। যে শেরে বাংলা ফজলুল হককে 'রাষ্ট্রদ্রোহী' বলে অভিযুক্ত করা হয়েছিল সেই সরকারই পরে তাকে মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগ করেছে। ক্ষমতাসীন জালেম সরকারের কোপানলে পড়লে ফেরেস্তা শয়তান না হয়ে আর যায় কোথায়?

১৯৬৯ সাল থেকেই মওলানা ভাসানীর ব্যক্তিগত সচিব হিসেবে জনাব ইরফানুল বারী কাজ করে এসেছেন। যুদ্ধের নয় মাসে তিনি মওলানার নির্দেশে তার প্রতিনিধি হিসেবে ঢাকা-টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ এবং আসামসহ বিভিন্ন অঞ্চলে বিরাট ঝুঁকি নিয়ে অনেক দুঃসাহসিক দায়িত্ব সম্পন্ন করেছেন।

তাই এসব আজগুবী কেচ্ছা–কাহিনী স্থগিত রেখে অবিলম্বে 'হক-কথা' সম্পাদককে মুক্তি দেয়ার জন্য মওলানা ভাসানী দাবী করেছেন।

এবার কাঁচা পয়সা

ভারতীয় বেনিয়া ব্যবসায়ীরা অবশেষে আমাদের কাঁচা পয়সাও পাচার করে ভারতে নিতে শুরু করেছে। কুমিল্লা, যশোর, দিনাজপুরসহ বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে এমনকি ট্রাকযোগেও পয়সা নিয়ে যাবার কথা প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। এই ব্যবসায়ীরা ভারতের কাঁচা পয়সার ঘাটতি পূরণের উদ্দেশ্যেই পয়সা পাচার করছে বলে জানা গেছে। তাছাড়া বাংলাদেশে প্রচলিত পাকিস্তানী ধাতব মুদ্রাগুলিতে নিকেলসহ উত্তম ধাতুর সংমিশ্রণ থাকায় ভারতীয় বেনিয়ারা সেগুলি গলিয়ে অর্থকরী ব্যবসা শুরু করে প্রচুর মুনাফা লুটের সুবিধেও আদায় করবে। এখনো এদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থাই নেয়া হচ্ছে না।

হাওয়াই সফরে চারটি গাড়ী

ঢাকা গ- ৬৭০৬ (সানবীম এ্যারো), ঢাকা গ- ৪৬৭৯ (ডাটসন), ঢাকা গ- ৪৬৩৮ (মাজদা) এবং ঢাকা খ- ৯৩৯৫ (কার্টিনা) – এই গাড়ী চারটি এখন ময়মনসিংহে হাওয়া খাচ্ছে। খাওয়াচ্ছেন মেডিক্যাল কলেজের জনৈক ছাত্র। তার যোগ্যতা ঃ তিনি একজন মামুবাদী মুক্তিযোদ্ধা এবং পিতা তার পদলেহী আমলা।

সে মাস আসিবে কবে?

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র ছাত্রীবাস রোকেয়া হল সংলগ্ন চত্বরে আরেকটি ছাত্রীবাসের ভিত্তি ১৯৭০ সনে স্থাপন করা হলেও তার নির্মাণ কাজ এখনো শেষ হয়নি। ঐ ছাত্রীবাসে সীট দেয়ার অঙ্গীকার করে অসংখ্য ছাত্রীকে রোকেয়া হলে অস্থায়ী সীট দেয়ার ফলে এই ভীষণ গরমেও ছাত্রীদেরকে এক বিছানায় দু'জন করে থাকতে হচ্ছে। কর্তৃপক্ষ এবং নতুন সামসুন্নাহার হলের সহ-সভানেত্রী দীর্ঘদিন ধরে হলটি চালুর ব্যাপারে 'আগামী মাসের' আশ্বাস দিয়ে আসলেও এখনো ছাত্রীদের দুরবস্থার অবসান হয়নি। কর্তৃপক্ষ এবং ছাত্রী-সংসদ নেত্রীদের সমীপে তাই অসংখ্য ছাত্রীর আজ জিজ্ঞাসা ঃ তাদের আগামী মাসটা কবে আসবে?

দালাল অধ্যাপক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক বিভাগীয় অধ্যক্ষ মাটি ছেড়ে আকাশে উঠবার জন্য দালালীর পথ ধরেছেন। পাক-আমলের দালাল এখন মামুবাদী ছাত্রলীগ ও দালালীওয়ালাদের মধ্যে 'রেসকো' ত্রাণ সংস্থার বৃত্তি বিলাচ্ছেন। তিনি 'অতি ধর্মনিরক্ষেতা' প্রমাণের জন্য শহীদুল্লা হলের মসজিদে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন ক'দিন আগে, পরে তা খোলা হয়েছে। ছাত্ররা এই দালাল অধ্যাপকের অপসারণ চাইছে।

এসো দেশ গড়ি

আওয়ামী লীগের লেজ ধরে তার লেজুড় মঞ্চো ন্যাপও সরকারী ক্ষমতা অপপ্রয়োগ শুরু করেছে। ১১ই জুন 'সবচেয়ে শিক্ষিত' নেতা অধ্যাপক মোজাফফর আহমদের নীলফামারীতে যে জনসভাটি অনুষ্ঠিত হয়েছে, তার প্রচারকার্যের জন্য তারা রিলিফের গাড়ী ব্যবহার করেছে। জনসভায় ডোমার ও শিলাহাটী থেকে কিছু ভাড়াটে শ্রোতা গুমার করা হয়েছিল। রাতে ফিরে যাওয়ার কোনো গাড়ী না পেয়ে ভাড়াটে শ্রোতারা লেজুড় দলের নেতাদের গালাগালি করতে থাকলে তারা এবং তস্য লেজুর মতিয়া ছাত্র ইউনিয়নের কর্তারা রেলষ্ট্রেশনে গিয়ে একটি যাত্রীবাহী ট্রেন পাকড়াও করে। ট্রেনটা ডেমার শিলাহাটী পেরিয়ে নীলফামারী হয়ে পার্বতীপুর যাচ্ছিলো।

সরকারী ধামা ধরে অর্জিত ক্ষমতার দাপটে তারা ট্রেনটিকে আবার ঘুরিয়ে ডোমার শিলাহাটী পাঠানোর দাবী তুলে ষ্ট্রেশন মাষ্টারকে ধমকাতে থাকে। যাত্রীদের জিজ্ঞাসার উত্তরে তারা একে দেশ গড়ার অঙ্গ বলে একচোট লেকচার ঝাড়ে। নিরুপায় ষ্টেশন মাষ্টার এসডিও-র শরণাপন্ন হলে তিনি এসে আওয়ামী লীগের লেজুড়দেরকে বোঝানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু বী-টিমী কর্তারা দ্বিগুণ ভলিউমে চেঁচামেচি শুরু করে দেয়। ফলে বাধ্য হয়ে এসডিও তাদের অন্যায় দাবীটি মেনে নেন। দেশ গড়ার মহান ব্রত নিয়ে পরে আওয়ামী দালালেরা দুটো বগি থেকে নিরীহ যাত্রীদেরকে বের করে দিয়ে ইঞ্জিনসহ ডোমার- শিলাহাটীর ভাড়াটে শ্রোতাদেরকে ফেরত পাঠিয়ে দেয়।

তালা থানায় যুবকদের হত্যা করা হচ্ছে

খুলনা জেলার তালা থানায় সরকার যুবশক্তি নিধনের পরিকল্পনা নিয়ে প্রতিরক্ষা ও শৃঙ্খলা

বিধায়ক বাহিনীর সাথে ভারতীয় সেনাবাহিনীকেও লেলিয়ে দিয়েছেন। যারাই এমসিএ-দের দুর্নীতির সমালোচনা করছেন, তাদেরকেই গোপনে ভারতীয় সেনাদের ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হচ্ছে, পাইকারীভাবে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী করা চলছে। ফলে ভীত-সন্ত্রস্ত মুক্তিযোদ্ধাদের অধিকাংশই পালিয়ে জীবন বাঁচাচ্ছেন বলে এক পত্রে জানিয়েছেন।

মামুবাদী যুবফ্রন্টের মুক্তিযোদ্ধারা এখনো প্রচুর অস্ত্র জমা না দিয়ে নিজেদের কাছেই রেখে দিয়েছে। অথচ তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে সরকার একপেশে নীতি গ্রহণ করে নিরীহ যুবকদেরকে হত্যা ও অত্যাচার চালিয়ে শৃঙ্খলার নামে মারাত্মক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করছেন। ফলে যুবকরা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন।

ঢাকাই বিদ্যুতে

ঢাকা বিদ্যুত সরবরাহ কেন্দ্রের পাওয়ার ইউনিয়নের কতিপয় কর্মকর্তা সংস্থার অভ্যন্তরে দুর্নীতি এবং ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। বিশেষ ব্যক্তিদের ইঙ্গিতে এরা কিছুদিন আগে ওয়াপদার পাওয়ার বিভাগের চীফ ইঞ্জিনিয়ারকে প্রকাশ্যে প্রহার করেছে। দুর্নীতির প্রতিবাদ করায় দু'জন এ্যাকাউন্টস অফিসারও এই গ্রুপটির হাতে নির্দয়ভাবে প্রহৃত হয়েছেন। এদের দুর্ব্যবহারের ফলে সংস্থার ২১ জন ইঞ্জিনিয়ার সম্প্রতি একযোগে পদত্যাগ করতে বাধ হন।

বিদ্যুত সরবরাহ কেন্দ্রের এই গ্রুপটির কার্যকলাপের ফলে সংস্থার প্রতিটি কর্মচারী ভীতিগ্রস্থ হয়ে পড়েছেন। এরা প্রায়ই তাদেরকে টেলিফোনে হুমকি দিয়ে সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করে থাকে। ফলে বেশীর ভাগ কর্মচারীই এখন অফিসে অনুপস্থিত থাকেন। সংস্থার অভ্যন্তরে এখন দেখা দিয়েছে বিশৃংখলা এবং স্বেচ্ছাচারিতা।

ঢাকা বিদ্যুত সরবরাহ কেন্দ্রের আভ্যন্তরীণ গোলাযোগের ফলে জনসাধারণকে নিদারুণ অসুবিধে পোহাতে হচ্ছে। প্রায়ই বিদ্যুত বন্ধ থাকে, লাইন কেটে গেলে তা সারতে অনেক দেরী হয়। এদিকে সংস্থার মাসিক আয়ও ৪৫ লক্ষ টাকার স্থলে ১৫ লক্ষেরও নীচে এসে দাঁড়িয়েছে। সংস্থার সন্ত্রাসী এই গ্রুপটির দৌরাত্বের ফলে বিগত পাঁচ মাসে সরকারকে প্রায় ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা ক্ষতি বরদাশ করতে হয়েছে।

ভাসানীর বাণী

অন্যায়, অত্যাচার যতই বেশী হোক না কেন সাড়ে সাত কোটি বাঙালী মিলিতভাবে সংগ্রাম করলে জালেমের জুলুম অবশ্যই আমরা প্রতিরোধ করতে সমর্থ হবো।

সরকারের শাসনতন্ত্রে কৃষক মজুর শতকরা ৯৫ জন মানুষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক-ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগের নিশ্চয়তা না থাকলে এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আশু ব্যবস্থা না হলে ঐ শাসনতন্ত্র আমরা কিছুতেই মানবো না।

হক-কথা

১৬ই আষাঢ়, শুক্রবার

গণতন্ত্র ও বিরোধীদল

সাচ্চা গণতন্ত্রে ভারসাম্য রক্ষায় ক্ষমতাসম্পন্ন শক্তিশালী বিরোধী দলের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। অথচ বর্তমান সরকার শুরুতেই বিরোধী দলের অস্তিত্ব বরদাশত করতে পারছে না। মুখে গণতন্ত্রের কপচানি থাকলেও তাদের কার্যক্রম বিচার করলে দেখা যাবে, একদলীয় যথেচ্ছাচারকেই তাঁরা গণতন্ত্র বলে আখ্যায়িত করতে চান।

১৯৭০-এর নির্বাচনে তাঁরা সাংঘাতিক রকম একচেটিয়া ভোট পেয়েছেন, এটা নজীরবিহীন কোন ব্যাপার নয়। পাকিস্তান ইস্যুতে ১৯৪৬ সালে পাকিস্তানভুক্ত অঞ্চলে মুসলিম লীগ এর চাইতেও বৃহত্তর বিজয় অর্জন করেছিল। গণতন্ত্র ও বিরোধী দলকে হত্যা করতে গিয়ে সেই মুসলিম লীগ নিজেই নিহত হয়েছে, তাদের সাধের পাকিস্তানও ভেঙে গেছে।

১৯৪৯ সালে গণআন্দোলনের পুরোধা মওলানা ভাসানী প্রমুখের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ গড়ে উঠলে সেদিনের ক্ষমতাসীনরা বিরোধী দলকে ভারত, চীন ও রাশিয়ার দালাল আখ্যা দিতে শুরু করে। বিরোধী দলের গঠনমূলক সমালোচনা ও সুপারিশ গ্রহণের পরিবর্তে বিরোধী দলকে সমূলে ধ্বংস করার জন্য মুসলিম লীগ সরকার হাজারো কৌশল বের করে। পরিণতিতে ১৯৫৪ সালে ক্ষমতাসীন চক্র চিরতরে পরাজিত ও বিপর্যস্ত হয়।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর থেকে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ দলীয় ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী বলে ভাবতে শুরু করেছে। ঠিক পাকিস্তানী কায়দায় তারাও বিরোধী দলকে চীন ও আমেরিকার দালাল বলে আখ্যায়িত করছে। সবচাইতে জঘন্য ব্যাপার হলো, বিরোধী দলকে সাম্প্রদায়িক বলে আখ্যা দিতে এই সরকারের বিন্দুমাত্র লজ্জার উদ্রেকও হচ্ছে না। বিরোধী দল জনগণেরই অংশ। একথা ভুলে গিয়ে ক্ষমতাসীনরা যত ভাবে পারছে, বিরোধী দলের টুঁটি চেপে ধরছে। এর পরিণতি ১৯৫৪ সালের পুনরাবৃত্তি ছাড়া কিছুই হতে পারে না। স্বার্থ লুটের জন্য সারা দেশটিকে কোচরে পুরবার প্রবণতা থেকে মুসলিম লীগ 'দেশটা একা আমাদের' বলে চীৎকার করতো। আজ সেই আলামত আবার দেখা দিয়েছে। বিরোধী দলকে বিদেশের চর আখ্যা দিয়ে এরা নিজেদের ভাগ্য গড়ার ও কৃত অপকীর্তি গোপন রাখার চেষ্টায় আকুল। অথচ জনগণ জানে বিদেশী লুটেরাদের এজেন্ট কারা। কারা দেশটিকে বিদেশী শক্তির যোগসাজশে সর্বনাশের দিকে ঠেলে দিচ্ছে, জনগণ হাড়ে হাড়ে তা টের পাচ্ছে।

দেশে সাম্প্রদায়িকতা কেন দেখা দিচ্ছে, বিরোধী দলের উপর দোষ না চাপিয়ে, তদন্ত কমিশন বসিয়ে সরকারের উচিত তার কারণ জেনে নেওয়া। সারাদেশ ঘুরে সে কমিশন যে রিপোর্ট দেবে তাতে ভবিষ্যত সম্পর্কে শঙ্কাগ্রস্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের উদ্বেগাকুল ভাবনার ছবি পাওয়া যাবে। শুধু শুধু বিরোধী দলকে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দিয়ে বাংলাদেশের হিন্দুদের বিরোধী দলীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ থেকে নিবৃত্ত করলে গরীব হিন্দু-তাঁতী, কামার-কুমারের ভাগ্যে শোষণের তীব্র জ্বালা বাড়বে বৈ কমবে না।

চোরাবাকারবারীদের ধর্ম নেই, রাষ্ট্র নেই। হিন্দু চোরাকারবারী ও ভারতীয় লুটেরা ব্যবসায়ী, চোরাকারবারীদের বিরুদ্ধে কথা বললে তাতে সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ আসবে কেন?

আমরা ভারতের কাছে চাই সমমর্যাদার বন্ধুত্ব। তার প্রভুত্ব করার খায়েশ আমরা রুখবোই, একথা বললে ভারত সরকারের সাথে বন্ধুত্ব নষ্ট হবে বলে যারা চিন্তা করে তাদের জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেম ঠুনকো ছাড়া আর কি? ভারতসহ সকল দেশের সাথে সমমর্যাদার বন্ধুত্বের দাবী ক্ষমতাসীনদের চাইতে বিরোধী দলই আগে তুলেছে। তবে, বহু রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতাকে বিসর্জন দিয়ে জনগণ আবার গোলামীর শৃঙ্খলে বাঁধা পড়তে রাজি নয় এ মহাসত্যটা অবশ্যই সব কিছুর সাথে মনে রাখতে হবে।

এদেশে বিরোধী দল মাথা তুললে বিদেশী লুটেরাদের এদেশীয় এজেন্টরা গদীতে থাকতে পারবে না, সেক্ষেত্রে লুটেরা কারবার হবে বন্ধ। তাই বিরোধী দলকে শুরুতেই ধ্বংস করে দেবার জন্য ক্ষমতার আসন থেকে যে

আঘাত আসছে তা অনিবার্যভাবে বিদেশী শক্তির ইঙ্গিতেই করা হচ্ছে।

সংবিধানের ভারত সফর

বাংলাদেশের ভবিষ্যত রাষ্ট্র পরিচালনার মূল দলিল আওয়ামী সরকার প্রণীত খসড়া সংবিধান বা শাসনতন্ত্র সম্প্রতি দিল্লী সফরে গেছে। 'শুভেচ্ছা' সফরে নয়— সংবিধানের এ সফরের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মুরব্বীদের কাছে আত্মপ্রকাশের 'অনুমতি' প্রার্থনা।

আইন ও পার্লামেন্টারী দফতরের মন্ত্রী ডঃ কামাল হোসেন খসড়া শাসনতন্ত্র বহন করে নিয়ে গেছেন। দিল্লীতে ইন্দিরা কংগ্রেসের বিশেষজ্ঞরা এখন এটি পরীক্ষা করে দেখছেন। ইতিপূর্বে বাংলাদেশের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনাও 'ভারত সফর' করে স্বদেশে ফিরে এসেছে।

সংবিধান বা শাসনতন্ত্র একটি দেশের জনগণের, সেই দেশের সরকারের অধিকার ও ক্ষমতার একটি পবিত্র দলিল। রাষ্ট্রের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন থাকে এ দলিলে। সুতরাং শাসনতন্ত্রে কি হচ্ছে জনগণেরই তা জানার হক সর্বাগ্রে এবং ষোল আনা। কিন্তু স্বাধীন ও স্বার্বভৌম বাংলাদেশে দেখা যাচ্ছে জনগণ এ হক থেকে যেন বঞ্চিত হচ্ছে।

সরকার খসড়া সংবিধান জনগণের নিকট প্রকাশ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কয়েকদিন আগেই। কিন্তু দিল্লীর মুরব্বীরা যদি রুষ্ঠ হন, যদি তাদের অঘোষিত স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্থ হয়- তাই জনগণের নিকট প্রকাশ করার আগেই তা দিল্লীতে নিয়ে গেছেন আইনমন্ত্রী স্বয়ং। সেখানে তিনি সংবিধানের বিভিন্ন ধারা নিয়ে কংগ্রেসী নেতাদের সাথে আলাপ-আলোচনাও করেছেন বলে খবর বেরিয়ে গেছে।

সংবিধান প্রণীত হচ্ছে তা বাংলাদেশের জন্য, বাংলাদেশের জনগণের জন্য। দিল্লীতে আলোচনার আগে বাংলাদেশের ক'জন রাজনৈতিক নেতার সাথে বা সংবিধান বিশেষজ্ঞের সাথে সরকার আলাপ করেছেন? বর্তমান প্রেক্ষিতে জনগণের এ একটি অতি সঙ্গত জিজ্ঞাসা।

অবশ্য দিল্লীতে খসড়া শাসনতন্ত্র নিয়ে আলাপ-আলোচনার খবর প্রকাশ হওয়ায় আইনমন্ত্রী কিছুটা বিব্রত হয়ে পড়েছেন। সম্ভবতঃ সেই জন্যই শাক দিয়ে মাছ ঢাকার উদ্দেশ্যে খসড়াখানি দিল্লীতে ফেলে তিনি লন্ডনে পাড়ি জমিয়েছেন। কৈ? আগে তো তার লন্ডন সফরের কথা ঘোষিত হয়নি। দিল্লী থেকে হঠাৎ করে লন্ডন যাওয়ার কারণটা আর কিছু কি? স্মরণ করা যেতে পারে বাংলাদেশের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনাও ইতিপূর্বে দিল্লীতেই আলোচিত এবং মূলতঃ বিবেচিত হয়েছে। ৫৫০ কোটি টাকার উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণের খবর বাংলাদেশের রাজধানী থেকে প্রচার করা হয়নি– হয়েছে ভারতের রাজধানী দিল্লী থেকে। বলাবাহুল্য সে ক্ষেত্রেও একই বিব্রত অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। আর তাই অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী জোর দিয়ে ঐ খবরের প্রতিবাদ করে বলেছিলেন যে, বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা বাংলাদেশেই প্রণীত হবে। এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু জনগণের প্রশ্ন তা দিল্লী গিয়েছিল কেমন করে এবং কেন?

ইন্দিরা কংগ্রেসের অনুমতি প্রার্থনার মধ্যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব নিহিত নেই তো?

আপনার চিঠি

সীমান্ত বাণিজ্য প্রসঙ্গে

জনাব সম্পাদক সাহেব,

স্বাধীনতা লাভের ছয় মাস পরও সরকার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে পুরোপুরিভাবে সীমান্ত রক্ষীবাহিনী মোতায়েন করেননি। উদাহরণস্বরূপ সিলেট জেলার জৈন্তাপুর, কানাইঘাট ও জকিগঞ্জ উত্তর সীমান্তের কথা উল্লেখ করা যায়। অরক্ষিত সীমান্ত দিয়ে প্রত্যহ বাংলাদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকার জিনিসপত্র পাচার হচ্ছে। সরকার আমাদের চাহিদা মেটানোর জন্য যে সমস্ত খাদ্যশস্য ও অন্যান্য জিনিসপত্র ভারত ও অন্য দেশসমূহ থেকে আমদানি করেন, তাও রাতের আঁধারে অথবা প্রকাশ্য দিবালোকে অবাধ-বাণিজ্যের নামে ভারতে চলে যায়। ফলে জিনিসের দাম হ্রাস পাওয়ার বদলে দিন দিন বেড়েই চলছে। জিনিসপত্র পাচার হওয়ার ফলেই দেশবাসীর মন ক্রমশঃ ভারত-বিরোধী হয়ে উঠছে। এ জন্য অবিলম্বে সরকারের উচিত নিম্নলিখিত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করা ঃ

১) সীমান্তে শক্তিশালী সীমান্ত রক্ষীবাহিনী মোতায়েন করা।
২) বেসরকারী অবাধ বাণিজ্য নিষিদ্ধ করা।
৩) সরকারীভাবে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে আমদানি-রফতানি নীতি গ্রহণ করা।
৪) ভারত-বাংলাদেশে অবাধ যাতায়াত বন্ধ করা।
৫) চোরাকারবারীদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া।
৬) দেশের চাহিদা মেটানোর পর বন্ধুদের প্রতি হাত প্রসারিত করা– নিজে অভুক্ত থেকে নয়।

– মোহাম্মদ আলাউদ্দিন, বিয়ানীবাজার, সিলেট।

'গণশক্তি' পড়তে চাই

জনাব সম্পাদক সাহেব,

স্বাধীন এ জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠা লগ্নে 'গণশক্তি' জনগণ ও সরকারকে চারিদিকের মৃত্যু-ফাঁদ ও কুজ্ঝটিকা সম্পর্কে অবহিত করতে শুরু করেছিল। পাকিস্তান আমলেও গণশক্তি অন্যায়ের বিরুদ্ধে এমনি সোচ্চার ছিল। অথচ পত্রিকাটির গলাটিপে ধরলেন গণতন্ত্রের ধ্বজাধারীরা। কিন্তু সরকার কি ভাবছেন? একটি গণশক্তির টুঁটি টিপলেই সব নিশ্চুপ হবে? লক্ষ গণকণ্ঠে কি গণশক্তির কণ্ঠ ধ্বনিত হবে না? দেশবাসী সত্য জানতে চায়। 'গণশক্তি' ফিরিয়ে দেবার দাবী জানাচ্ছি।

– নূরুল আলম চৌধুরী, পটিয়া।

সেভিংস সার্টিফিকেট

জনাব সম্পাদক সাহেব,

অনেক নিম্নবিত্ত মানুষও পাকিস্তানী সেভিংস সার্টিফিকেট কিনেছিল। এখন তা ভাঙ্গানো যাচ্ছে না। সারা জীবনের সঞ্চয় আটকে পড়ায় তারা স্ত্রী-পরিবারসহ ভীষণ অসুবিধায় পড়েছেন। এই বিড়ম্বনার অবসান করে সেভিংস সার্টিফিকেট ভাঙ্গিয়ে দেয়ার জন্য সরকারের প্রতি দাবী জানাচ্ছি।

– ফিরোজ খান, ময়মনসিংহ।

মাড়োয়ারীদের বাড়াবাড়ি চরমে উঠেছে

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে মাড়োয়ারী পরিবার ছিল তিনশত। এখন এদের সংখ্যা চারগুণেরও বেশী।

এরা ব্যবসায় ক্ষেত্রে নিজেদের প্রভু হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট। ভারত থেকে চোরাই পথে আনা নিকৃষ্ট মালগুলি চড়া দামে বিক্রি করে এবং যথেচ্ছভাবে এখানকার সম্পদ

ওপারে পাচার করে এরা পুঁজি বাড়াচ্ছে।

মাড়োয়ারীদের যারা দেবপুত্ত হিসাবে সনাক্ত করতে চান তাদের অবগতির জন্য এসব উল্লেখ করলাম। সরকার নিশ্চয়ই এদের ব্যাপারে উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে উদাসীন।

বাংলাদেশে শিপিং গড়ে উঠার বিরুদ্ধে ভারতীয় চক্রান্ত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

জাহাজ চলাচল ও বন্দর নিয়ন্ত্রণের জন্য দেশের প্রধান বন্দরে ডিরেক্টর অব পোর্ট এণ্ড শিপিং নামক একজন সমন্বয় বিধায়ক কর্মকর্তার অফিস থাকে। বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বন্দরে তা থাকার কথা। কিন্তু অদৃশ্য হাতের কারসাজিতে এ অফিস সংগঠিত হয়নি। উপরন্ত চট্টগ্রাম বন্দরের প্রধান কর্মকর্তার পদটি এখন অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি দিয়ে অস্থায়ীভাবে পূরণ করা হয়েছে। প্রকাশ, ঐ পদে একজন ধামাধরা লোককে বসাবার জন্য আমাদের 'মিত্র' গোঁ ধরেছে, যাকে বসানো হলে শ্রমিক অসন্তোষে বন্দরে বিরাট বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী। এখানকার কর্তারা 'মিত্র'কে সে কথা বুঝানো সত্ত্বেও 'মিত্র' নরম হয়নি। আশঙ্কা করা হচ্ছে, পছন্দসই লোকটিকে দেশের প্রধান বন্দরে বসিয়ে আরেকটা সর্বনাশের বীজ উপ্ত করা হবে।

বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের অবস্থাও তথৈবচ। এর প্রধান ব্যক্তিটি হলেন পাক-ফৌজের বিশ্বস্ত সেবক, জঘন্য কোলাবোরেটর। হাজার হাজার লোককে হত্যা করার ব্যাপারে তার সহায়তার প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও তাকে বিশেষ কারণে ওখানে রাখা হয়েছে। কারণটি আর কিছু নয়, অপরাধী ব্যক্তিকে কেউ কৃপা করে রক্ষা করলে, পরে কৃপাকারী ঐ ব্যক্তিকে ইচ্ছামত কাজে লাগাতে পারে।

ভারতীয় 'বিশ্বপ্রেমের' যে মাহাত্ম্য আমাদের আস্তেপৃষ্ঠে বাধতে শুরু করেছে, তা থেকে বেরুতে ভয়ানক বেগ পেতে হবে বৈকি!

জো হুজুরী এবং শোষক শ্রেণীর দালালীর অপর নাম

মস্কোপন্থীদের রাজনীতি

॥ কালা লাল হে ॥

অন্যায়, অত্যাচার এবং সর্বপ্রকার শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-ই হলো মওলানা ভাসানীর আজীবন রাজনীতির মূল কথা। নিজে পাকিস্তান আন্দোলন করলেও এই একটি মাত্র কারণেই তৎকালীন পাকিস্তানী জাতির পিতা জিন্নাহ সাহেবের নেতৃত্বে গঠিত স্বাধীনতার একমাত্র দাবীদার মুসলিম লীগ সরকারের বিরুদ্ধে ৪৮ সনেই মওলানা বিদ্রোহ করেছিলেন, 'কতল করেঙ্গা' হুমকিকে পদাঘাত করে গড়েছিলেন প্রথম বিরোধীদল মুসলিম আওয়ামী লীগ। জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে নিজের গড়া আওয়ামী লীগও ক্ষমতায় গিয়ে যখন জনতার ওপর শোষণ অব্যাহত রাখলো এবং মার্কিনসহ অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে সম্পাদিত জোটসমূহও রক্ষা করে এদেশের জনগণকে সাম্রাজ্যবাদের গোলামে পরিণত করতে থাকলো, তখনো মওলানা তাঁর নিজস্ব নিয়মে আওয়ামী লীগকেও পদাঘাত করলেন, সভাপতির পদ ত্যাগ করে বেরিয়ে এসে আবার গড়ে তুললেন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি। তৎকালীন পাক-ভারত উপমহাদেশে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন জোরদার হলো। এমনিভাবে মওলানা ভাসানীর ৬৫ বছরের রাজনৈতিক সংগ্রামের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে (পরবর্তীতে করা হবে) দেখা যাবে তিনি আজীবন শোষণের বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ করেছেন, গড়ে তুলেছেন আন্দোলন– জন্ম হয়েছে নতুন নতুন ইতিহাসের।

স্বাধীনতার প্রথম প্রবক্তা হলেও স্বাধীন বাংলাদেশে মওলানা ভাসানীই প্রথম সরকার বিরোধী বক্তব্যে সোচ্চার হয়ে উঠেছেন। ঘুষ-দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, লুটপাট, চোরাকারবারী, স্বৈরাচারী সরকারী কর্মকর্তা, এমসিএ এবং মন্ত্রী বাহাদুরদের বিরুদ্ধে ন্যায়সঙ্গত বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার সাথে সাথে এবারও মওলানা পাকিস্তানী কায়দায় আক্রান্ত হয়ে পড়েছেন। মুসলিম লীগ, পিডিপি আর জামায়াতে ইসলামীদের ভূমিকায় এবার সবচেয়ে বেশী সক্রিয় হয়ে উঠেছেন মস্কোপন্থী পরিচয়ে গর্বিত এক শ্রেণীর নির্লজ্জ দালাল রাজনীতিবিদ। সমালোচনা করতে গিয়ে এরা গণতান্ত্রিক রীতিনীতি বা সাধারণ শালীনতাও

দালালীর প্রয়োজনে ভাসানী-বিরোধী প্রচারণার এরা মওদুদী নস

বিসর্জন দিয়েছেন– স্বাধীনতার প্রথম প্রবক্তা মওলানা ভাসানীকে এরা স্বাধীনতার শত্রু বলার স্পর্ধা পর্যন্ত দেখিয়েছেন। শুধু বাংলাদেশেরই নয়, ভারতীয় মস্কোপন্থীরাও এ ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছেন। কেননা, সব শিয়ালের এক রা।

মওলানা ভাসানীর রাজনীতির যেমন একটা সংগ্রামী বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তেমনি এই মস্কোপন্থীদের রাজনীতিরও বৈশিষ্ট্য আছে– আর তা হলো শোষক শ্রেণীর লেজুরবৃত্তি এবং নির্লজ্জ দালালী।

বাংলাদেশের মস্কোপন্থীরাও একসময় মওলানা ভাসানীর দলভুক্ত ছিলেন। সামন্তবাদ, পুঁজিবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদ বিশেষ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মওলানার বলিষ্ঠ ভূমিকার ফলে এরা ঘাবড়ে গেলেন। সারা দেশব্যাপী মওলানা যখন মার্কিনসহ সকল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম গড়ে তুলতে ব্যস্ত, সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের দালাল এই রাজনীতিবিদরা তখন পিছুটান দিলেন। কেননা, শ্রমিক-কৃষক-মেহনতি জনতার স্বার্থ রক্ষার চেয়ে এদের দালালী রক্ষাই তখন বড়। আর এ জন্য তারা ভাসানী বিরোধী ভূমিকায় তখন কোন কোন ক্ষেত্রে মওদুদী নসরুল্লাদেরকেও হারিয়ে দিয়েছেন।

দালালীর প্রয়োজনে মওলানা ভাসানীর সাথে সম্পর্কোচ্ছেদ করলেও এরা তাঁর ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির নাম ভাঙ্গিয়ে আজো বেঁচে থাকার চেষ্টা করছেন। দলত্যাগ করেই এরা শেখ মুজিব এবং আওয়ামী লীগের লেজুরবৃত্তি শুরু করেছিলেন। ১১ দফা আন্দোলনের পরিণতিতে আগরতলা মামলা থেকে মুক্তি পেয়েই শেখ মুজিব বাঙালী ধনিক শ্রেণীর স্বার্থে প্রণীত ৬-দফা নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকদের সাথে যখন দরকষাকষি শুরু করলেন, এই মস্কোপন্থীরাই সেদিনও যোগ্যতার সাথে দালালী করেছেন– ছাত্র জনতার সম্মিলিত দাবী ১১-দফার সাথে করেছেন অমার্জনীয় বিশ্বাসঘাতকতা। আইউব-মোনেম বিরোধী আন্দোলনের সফল জন্মদাতা মওলানা ভাসানী বারবার গোলটেবিল বৈঠকের ব্যর্থতার ভবিষ্যৎবাণী করলেও এরা সেদিন বৈঠকে অংশ নিয়ে শোষকগোষ্ঠীর সাথে আপোষের বাণী প্রচার করেছেন। বর্থ্যবৈঠক শেষে ঢাকায় ফিরে নিজেদের দোষ ঢেকে জনতার বিক্ষোভের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার উদ্দেশ্যে সমস্ত দোষ মওলানা ভাসানীর ঘাড়ে চাপিয়ে দিতেও এদের লজ্জা বাধেনি।

তারপর এলো নরঘাতক ইয়াহিয়ার গণবিরোধী আইনগত কাঠামোর অধীনে নির্বাচনের পালা। এবার মস্কোপন্থীরা শেখ মুজিব এবং আওয়ামী লীগের দালালীতে রেকর্ড সৃষ্টি করলেন। জলোচ্ছ্বাসে লক্ষ লক্ষ লোক মারা গেল, পশ্চিম পাকিস্তানী শাসক এবং রাজনীতিকরা বাংলাদেশের অসহায় জনগণের প্রতি চরম অবহেলা প্রদর্শন করলো– মওলানা ভাসানী নির্বাচন বর্জন করে

সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামের দাবীতে সোচ্চার হয়ে উঠলেন– দল-মত নির্বিশেষে সকলের প্রতি আহ্বান জানালেন। মওলানার ডাকে সাড়া দেয়া দূরের কথা, জামায়াত-মুসলিম লীগরা তখন মওলানাকে দেশ ও জাতির শত্রু বলে যে ফতোয়ার ধোঁয়া তুলেছিল, এই বিশ্বাসঘাতক মস্কোপন্থীরাও সে সুরেই তাল ধরেছেন। পাকিস্তানকে টিকিয়ে রাখার নির্বাচনী পাল্লায় পার হওয়ায় উদ্দেশ্যে এরা শেখ মুজিবের প্রতি বারবার অসহায় ঐক্যের আহ্বান জানিয়েছেন। শেখ মুজিব সে আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করে সাইনবোর্ড পাল্টে উল্টো আওয়ামী লীগেই যোগদানের ডাক দিয়েছেন, তবু এই নির্লজ্জ মস্কোপন্থীদের লজ্জা হয়নি–তবু তারা ঐক্যের সানাই বাজিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত ঐক্যের আহ্বান ব্যর্থতার করুণ সুর তুললেও এরা শেখ মুজিবের পেছনে পেছনেই ঘুরেছেন। বলাবাহুল্য, পিডিপির মত প্রতিক্রিয়াশীল দলও আসন পেয়েছিল, কিন্তু আওয়ামী লীগের লেজুর এই মস্কোপন্থীদেরকে জনগণ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন– ভোট দেননি। তবুও এদের লজ্জা হয়নি।

বাংলাদেশের জনগণের স্বার্থের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখিয়ে ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের বৈঠক বন্ধ করে দেয়ায় সারাদেশে বিক্ষোভের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলে মস্কোপন্থী নেতৃবৃন্দ বেকায়দায় পড়ে গেলেন। কেননা, মওলানা ভাসানী স্বাধীনতার আহ্বান দিয়েছিলেন ৭০ সনের ৪ঠা নভেম্বর। তারপর থেকে এই অশীতিপর বৃদ্ধ সংগ্রামী জননেতা সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামের আহ্বান জানিয়ে তোলপাড় করছিলেন সারাদেশের আনাচে-কানাচে। তাই বীর জনতা তখন মওলানার আহ্বানের যথার্থতা বুঝতে পেরেছেন– বুঝতে পেরেছেন মস্কোপন্থী রাজনীতির ধাপ্পাবাজী। আর সবচেয়ে বড় কথা ঃ ইতিমধ্যে জনগণই এদেরকে আওয়ামী লীগের 'বি-টিম' বলে আখ্যা দিয়েছেন। অতএব, কুল রক্ষা করতে হবে। মওলানা ভাসানীর হাজারো সাবধান বাণী, বামপন্থীসহ দেশপ্রেমিকদের বারবার সশস্ত্র সংগ্রামের আহ্বান সত্ত্বেও যখন শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ অহিংস-অসহযোগ আন্দোলন শুরু করলেন, মস্কোপন্থীরা যথারীতি তার সমর্থনে এগিয়ে এলেন। আপোষের বাণী আগুনে জ্বালিয়ে দেয়ার জাতির দাবী উপেক্ষা করেও নরঘাতক ইয়াহিয়া, ভুট্টোর সাথে যখন শেখ সাহেব পাকিস্তানী সংহতি রক্ষার প্রশ্নে আপোষ আলোচনায় বসলেন তখনো এই গোষ্ঠীটাই তার সমর্থনে সর্বাগ্রে এগিয়ে এসে পাক-হানাদারদেরকে প্রস্তুত হওয়ার সুযোগ করে দিলেন। তখনো তাদের চোখে লাহোর, পিণ্ডি আর করাচীর দৃশ্যই ভেসেছে। তাই তারা পাকিস্তান রক্ষার চেষ্টায় ব্যস্ত ছিলেন। জনতার মার খাওয়ার ভয়ে তারা তাদের পশ্চিম পাকিস্তানী গুরু ওয়ালী খানকে আপোষ আলোচনায় প্রতিনিধি হিসেবে তৎপর করেছিলেন। কিন্তু কুল আর রক্ষা হলো না– আপোষ আলোচনার অবসরে সেনাবাহিনী আনিয়ে ইয়াহিয়া-টিক্কা জল্লাদরা জাতির উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিল। প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু হলো।

(চলবে)

ছড়া

আহসান হামিদ

শূন্য গোলা শূন্য
নেই কো পেটে অন্ন
বাড়ছে দেশে সৈন্য
আমরা তাই ধন্য (?)

॥২॥

কলস হাতুড় কাস্তে
চলবে না আর আস্তে
এসো সবাই এক কাতারে
চাও যদি ভাই বাঁচতে।

॥৩॥

সূর্য সূর্য সূর্য
উঠবে নতুন সূর্য
দেখবে সেদিন উঠবে বেজে
সব হারাদের তূর্য।

॥৪॥

ক্ষমা ক্ষমা ক্ষমা
পাচ্ছে দালাল ক্ষমা
আমরা উপোস থাকি
যত্তো পারিস জমা।

॥৫॥

চোর চুরি আর জালিয়াত
করছে ভীষণ বাজি মাৎ
কেউবা করছে আর্তনাদ
কেউবা সোফায় হচ্ছে কাত।

॥৬॥

হানাদার ফিরে গেলো হানাদার
রেখে গেছে গোপনীয় চেলা তার
আমরাও রয়েছি যে সোচ্চার
আয়োজন হবে শেষ জানাজার।

আমার প্রিয়নবী অন্যায়ের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতেও দ্বিধা করেননি

॥আবদুল হামিদ খান ভাসানী॥

ইসলাম ধর্ম শুধু নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত, কোরবানী, ঈদ, বকরী ঈদ প্রভৃতি আনুষ্ঠানিকতায় সীমাবদ্ধ নয়। শুধুমাত্র এ সকল আনুষ্ঠানিকতা প্রবর্তনের জন্য আল্লাহ রসূলের (দঃ) মাধ্যমে বিশ্বজগতে ইসলাম নাজেল করেননি। বিশ্বের নিপীড়িত, নির্যাতিত মজলুম মানুষের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক মুক্তির জন্য আল্লাহতালা বিশ্বনবী হযরত মুহম্মদ মুস্তফা (দঃ)-কে পাঠিয়েছিলেন রহমাতুল্লিল আলামীন রূপে। পবিত্র

মুরিদের দরবার

ইসলামের মূল আদর্শ এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহকে কেন্দ্র করে সারা বিশ্বের মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তোলা। পিতার সন্তান শিক্ষিত, মূর্খ, অন্ধ, বধির, ফর্সা, কালো যাই হোক, বাংলা আসাম বার্মা– যে কোন দেশের বাসিন্দা হোক পৈত্রিক সম্পত্তির উপর যেমন সকলের সমানাধিকার থাকে ঠিক তেমনি আল্লাহর এই পৃথিবীর উপর আল্লাহর বান্দা হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন, পার্সী, গারো, সাঁওতাল, বাঙ্গালী, অহমিয়া (আসামবাসী), ইউরোপীয়, আমেরিকান– সকলের সমান অধিকার। এই অধিকার শোষণের নহে, অন্যের হক জোর করে দখল করার নহে। সমানভাবে ভাগ করে সমানভাবে ভোগ করার অধিকার দান করার নীতিই ইসলামের মূল আদর্শ।

আল্লাহর কালাম ও রসূলের হাদিসের ভুল ব্যাখ্যা না করে, বিশ্ব মুসলিমকে সত্যিকার ব্যাখ্যায় অনুপ্রাণিত হতে হবে। তা না হলে দুনিয়ার মুসলমান বাঁচতে পারবে না।

বিশ্ব স্রষ্টাকে আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করুন। সকলকেই তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে হবে। তাঁর প্রদত্ত সম্পদ সমানভাবে ভোগ করতে হবে। একেই বলে সমাজতন্ত্র। সমাজতন্ত্র ব্যতীত পৃথিবীর সর্বহারা মানুষের মুক্তির কোন পথ নেই। যারা ভিন্ন পথে মুক্তির আশ্বাস দেয় তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য নিজেদের ভোগ বিলাস ও প্রভুত্ব কায়েম রাখার জন্য ধোঁকাবাজী ছাড়া অন্য কিছু নহে।

তাই, আজ পবিত্র দ্বীন ইসলামের প্রতি যারা বিশ্বাস রাখেন, কাল বিলম্ব না করে সকলেই একতাবদ্ধ হোন, বিশ্বশান্তি ও বিশ্বের নির্যাতিত মানুষের মুক্তির জন্য শহরে-গ্রামে সর্বত্র সংগঠন গড়ে তুলুন। দুর্নীতি ও

শোষণের বিরুদ্ধে, হিংসা ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে, দমন ও জুলুমবাজীর বিরুদ্ধে অনবরত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গণঐক্য জোরদার করুন। এক আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় পাবার কোন কারণ নাই। বিশ্বাসী জনতা সর্বহারা মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে কামিয়াব হবেই।

আমাদের প্রিয় বিশ্বনবীর সময় শুধু নামাজ পাঠের জন্য মসজিদ নির্মিত হয়নি। মসজিদকে একাধারে এবাদতখানা, অন্যদিকে পাঠাগার, বিদ্যালয়, বিচারালয়, আইন প্রণেতা সংসদ, যুদ্ধ পরিচালনার পরামর্শ কেন্দ্র, জনকল্যাণমূলক কাজের পরিকল্পনা শিবির– এ সকল মহত্তর সামাজিক কাজে ব্যবহার করা হয়েছে রসূলুল্লাহর আমলে।

পবিত্র ইসলামের মূল আদর্শ এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহকে কেন্দ্র করে সারা বিশ্বের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তোলা। অন্যায়, অত্যাচার ও দমননীতির প্রতিরোধ করে শান্তি-শৃংখলা প্রতিষ্ঠাই আমাদের কাম্য

বাংলাদেশের ৯৬ হাজার মসজিদ নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ে আছে। সামাজিক দুর্বিপাকে দিশেহারা মানুষ ঐকান্তিক মন দিয়ে আল্লাহকেও ডাকতে পারে না। আমাদের নেয়ামত ৯৬ হাজার মসজিদকে এখন থেকে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও আধ্যাত্মিক আত্মোৎকর্ষতা সাধনের কেন্দ্রে রূপান্তরিত করুন। মসজিদকেন্দ্রিক সংগঠন গড়ে তুলুন।

সাড়ে সাত কোটি মানুষ অন্যায়-অনাচার ও দমননীতির শিকারে পরিণত হয়েছে, তা প্রত্যেকে ভালভাবে উপলব্ধি করা সত্ত্বেও লালবাহিনী, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী, রক্ষীবাহিনী ইত্যাদির ভয়ে– কোন মুহূর্তে কাকে জবাই করবে, তার নিশ্চয়তা না থাকায়, সেই ভয়ে দিন কাটাচ্ছেন। এমতাবস্থায়, ছাত্র-যুবক, কৃষক-মজুর, মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী, সরকারী অফিসার সকলেরই এক কথা, এক ইচ্ছা– তা হলো, গণতন্ত্রকে বাঁচাতে হবে এবং সর্বহারা নির্যাতিত মানুষের মুক্তির জন্য অবশ্যই সংগ্রাম করে যেতে হবে।

কিন্তু সংগ্রামের কর্মসূচী কি হবে এবং কার নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিচালিত হবে এটাই সকলের কাছে জরুরী প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে।

ব্যক্তির নেতৃত্বের প্রয়োজন অস্বীকার করার উপায় নাই, কিন্তু আদর্শই সংগ্রামের মূল লক্ষ্য ও অভীষ্ট। মজলুম মানুষের মুক্তির জন্য সংগ্রাম করা জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের অপরিহার্য কর্তব্য। তাই আশা করি, জেলা, মহকুমা, থানা সর্বত্র সভা-সমিতি করে সরকার ও দুনিয়াকে জানিয়ে দিন, যে কোন ত্যাগের বিনিময়ে আমরা গণতন্ত্র এবং সর্বহারা মানুষের মুক্তির পথ সমাজতন্ত্রবাদ ইনশাল্লাহ প্রতিষ্ঠা করবোই করবো।

এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী লোক বিভিন্ন এলাকায় প্রচার করে বেড়াচ্ছেন যে, ভাসানী মওলানার সঙ্গে হাত মিলিয়ে সংগ্রাম করলে সংগ্রাম সাফল্যমণ্ডিত হবে তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু মওলানা আগামী নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করলে আমরা যারা পার্লামেন্টারী রাজনীতিতে বিশ্বাস করি, তাদের পক্ষে শুধু সংগ্রামের জন্য সংগ্রামে যোগদান করা সম্ভব নয়। তাই আমি পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিচ্ছি যে, আমার প্রাণাধিক প্রিয়নবী নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে পার্লামেন্টারী শাসন প্রবর্তনের পক্ষপাতি ছিলেন ; অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রয়োজনে অস্ত্র ধারণ করতেও দ্বিধা করেননি। পবিত্র ইসলাম আমাকে এ শিক্ষা দেয়নি যে, আমরা জালেমের জুলুম দিনের পর দিন মাথা পেতে বরণ করতে থাকবো। নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে আন্দোলন করে এবং আবেদন নিবেদনে

জালেমের জুলুম বন্ধ না হলে, শরীরের প্রতিবিন্দু রক্ত উৎসর্গ করে হলেও মজলুম মানুষকে জালেমের কবল থেকে রক্ষার জন্য অস্ত্র ধারণ করতে দ্বিধা করবো না। আমাদের সংগ্রামের মূলমন্ত্র হবে সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ, সামন্তবাদ, সকল ধরনের শোষণ ও অশুভ প্রভাবের বিরোধিতা। আমরা সংগ্রাম চালাবো সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ, সামন্তবাদের বিরুদ্ধে, দেশী ও বিদেশী শোষককূলের বিরুদ্ধে, আমাদের সংগ্রাম পরিচালিত হবে চোরাকারবারী, লুটপাট সমিতি, ঘুষখোর স্বৈরাচারী অফিসার যাদের কারসাজি ও অর্থলুণ্ঠনের পরিণামে খাদ্য ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর অগ্নিমূল্য হওয়ায় শত শত নিরপরাধ মানুষ না খেয়ে মরছে, হাজার হাজার মানুষ উপবাসে কাটাচ্ছে, কয়েক কোটি মানুষের জীবন থেকে শান্তি-স্বস্তি বিদায় নিয়েছে– তাদের বিরুদ্ধে। অন্যায়কে নির্মূল করে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাই আমাদের কাম্য। অত্যাচার উৎপীড়ন দমননীতি প্রতিরোধ করে দেশে শান্তি–শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করাই আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা।

শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রসঙ্গে

মোহাম্মদ হোসেন

চিরন্তন আদর্শের অবলুপ্তি নেই

॥ ১ ॥

মানব জাতির সার্বিক উন্নতি শিক্ষার উপর নির্ভরশীল। শিক্ষার অগ্রগতিই মানব সমাজকে আদিমতার কবল থেকে সভ্যতার যুগে পৌঁছে দিয়েছে।

প্রকৃতি তার সুপরিকল্পিত ও সুনিয়ন্ত্রিত বিশেষ বিশেষ কৌশলে মানব জাতির শিক্ষার অভাব পূরণ করে আসছে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, যে আদম-সন্তান অরণ্যের বাসিন্দা ছিল তারাই শিক্ষার গুণে আদিমতার হাত থেকে ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে আজকের জগতে পদার্পণ করেছে। শিক্ষার উপর ভিত্তি করেই মানুষ অতিশয় দুর্গম পথকেও সুগম করে নিয়েছে। আজকের জগতে যা কিছু চাঞ্চল্যকর আবিষ্কার হয়েছে ও ভবিষ্যতে হবে তাও এই শিক্ষার বদৌলতেই হবে। তাই শিক্ষার অবদান জাতীয় জীবনে অতুলনীয়। ইহা ব্যতীত জাতি মূঢ় ও মূক। যে জাতির শিক্ষা পদ্ধতি যত উন্নত তার গৌরবও তত উজ্জ্বল। এক এক দেশের শিক্ষা পদ্ধতি এক এক রূপ। একটি দেশের মানুষের সামাজিক, নৈতিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় চিন্তাধারার গতি অনুযায়ী শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠে। যে জাতি বস্তুকেই উন্নতির মূল কারণ বলে মেনে নিয়েছে আর যে জাতি ভাববাদকেই বিশেষ স্থান দিয়েছে,আবার যারা বস্তুবাদ আর ভাববাদের ভিতর সমন্বয় ঘটিয়েছে তাদের সবার জীবন বোধ এক নয়– বরং স্ব স্ব মতানুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন রূপ নিচ্ছে।

যার সাহায্যে মানব সমাজ উন্নতির চরমে পৌঁছতে সক্ষম তার রূপটি কেমন হওয়া প্রয়োজন? অন্য দেশের কথা বাদ দিয়ে আমাদের কথাই বলছি। কারণ, পৃথিবীর অন্য অন্য দেশগুলো যা ভাবছে তা আমরা ভাবছি কিনা আর ভাবলেও সেই ভাবকে নিজেদের সামাজিক পরিবেশের সাথে আন্তরিকভাবে খাপ খাইয়ে নিতে যাচ্ছি কিনা তাই আগে নিশ্চিতভাবে জানতে হবে। আমাদের দেশের শতকরা ৯৬ জন মুসলমান। তাই এখানকার শিক্ষা পদ্ধতি মুসলিম মুল্যবোধে গড়ে উঠতে বাধ্য। আমরা দেশকে ধর্মনিরপেক্ষই বলি আর যাই বলি, দেশের এই সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম সম্প্রদায়ের রায় যেদিকে পড়বে সেই রায়ই বলবৎ থাকবে। জোর করে মানুষের সাহসের সীমানা সাময়িকভাবে কিছুটা খর্ব করা যায়। কিন্তু প্রাণের দাবী আর মনের ঐকান্তিক ইচ্ছাকে চিরতরে লুপ্ত করা যায় না। তার জ্বলন্ত প্রমাণ ভিয়েতনামের ইতিহাসই বহন করছে। আজ যে সত্যটিকে উপেক্ষা করে যাচ্ছি কালই যে তা জাতির প্রাণে প্রভাত কিরণের মত

লাগবে না ইহা জোর গলায় কে বলতে পারে! যারা সত্যের নামে অসত্যকে সংযোগ করেছে তারা চরিত্রহীন। তাদের শাস্তির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। তাই বলে মহাসত্যটিকে রাগ করে বাতিল করার অপচেষ্টা বাতুলতা বৈ আর কিছু নয়। আমাদের দেশে এই রূপই ঘটতে যাচ্ছে। মহাসত্যের নামে শাসন-শোষণ, অত্যাচার, উৎপীড়ন ইত্যাদি মানবতা বিরোধী কাজ হয়েছে বলে সত্যটিও ব্যক্তিটির সাথে দায়ী হয়ে পড়েছে। আসলে অকৃত্রিম সত্যটি জাতীয় জীবনের কর্মসূচীতে প্রয়োগই হয়নি। চরিত্রহীন লোক দ্বারা এমন কল্যাণময় আদর্শকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। এর যথার্থতা উপলব্ধি না করেই ক্ষমতাসীনেরা মানুষের চিরন্তন মঙ্গল সাধনের সার্বজনীন আদর্শটিকে উপেক্ষা করে বস্তুবাদীদের পদতলে আশ্রয় নিয়েছেন। আর ভিন দেশের নির্দেশে ধর্মনিরপেক্ষতার বুলি আওড়াচ্ছেন। ইসলামী আদর্শবাদ সকল ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতা ও সমানাধিকারের যে নীতি ঘোষণা করেছে, ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারী, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বিক্ষত ভারত কার্যতঃ তার শতভাগের এক ভাগও দেখাতে পারেনি। তাই আমাদের শিক্ষা পদ্ধতি আমাদের প্রকৃত 'কালচারের' বহির্ভূত হয়ে পড়েছে। ইহা অপর জাতির ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। ব্যক্তি বিশেষকে বুলেটের আঘাতে বিলুপ্ত করা যায়। কিন্তু ইসলাম তো কোন ব্যক্তি বিশেষ নয়। তাই ইহাকে বেয়নেটের আঘাতে অথবা অন্য কোন উপায়ে দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব নয়। দু'দিন আগেই হোক আর পরেই হোক, জাতি আবার এই চিরন্তন আদর্শটিকে আঁকড়ে ধরবে তখন শিক্ষার ধারাটিও তৎসঙ্গে পালটে যেতে বাধ্য।

(২য় পর্ব আগামী বারে)

৪ সের গম আর ২ সের চাল

মুজিব-সরকারের নিয়ন্ত্রিত মূল্যে খাদ্য সরবরাহের এক অপূর্ব নমুনা সম্প্রতি টাঙ্গাইলের বাথুয়াজানী গ্রামে পাওয়া গেছে। গ্রামের ওসমান শেখের ১১ সদস্যের পরিবারটিকে এক মাসের জন্য দেয়া হয়েছে মাত্র ৪ সের গম আর ২ সের চাল। এমন অপর্যাপ্ত খাদ্য সরবরাহের চেয়ে না করাই কি ভালো ছিল না?

অনাহারে মৃত্যু

টাঙ্গাইল থানার ধারাপঠিয়া গ্রামের মোঃ আমজাদ আলী গত ১৬ই জুন অনাহারে মারা গেছে।

রাজস্ব দফতর শত্রু সম্পত্তি হাতে নিচ্ছে ?

যে রাজস্ব বিভাগ শত্রু সম্পত্তি বিভাগ পরিচালনা করতে গিয়ে শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছিল, সেই রাজস্ব বিভাগের হাতেই শত্রু সম্পত্তি বিভাগ আবার তুলে দেয়া হচ্ছে। নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, রাজস্ব বিভাগের মৌ-লভী কর্তারা এ আয়োজন শেষ করে ফেলেছেন। আর এর ফলে শত্রু সম্পত্তি বিভাগের অভিজ্ঞ বহুসংখ্যক কর্মচারীকে পথে বসতে হবে। বেকার সমস্যা সমাধানে এটা কি সহায়তা করবে?

আপনারা সবই পারেন

ফেরেশতাকে শয়তান বানানোও সহজ কাজ

'হক-কথা' সম্পাদক সৈয়দ ইরফানুল বারীকে গ্রেফতারের মিথ্যে কারণ ব্যাখ্যা করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী প্রেরিত তারবার্তার জবাবে মওলানা ভাসানী ২৫শে জুন নিচের তারবার্তাটি পাঠিয়েছেন।

"আপনার তারবার্তার জন্য ধন্যবাদ। দেশ স্বাধীন হবার বেশ কিছুদিন পর সৈয়দ ইরফানুল বারীকে সম্পাদক মনোনীত করে জেলা প্রশাসকের কাছে 'হক-কথা'র ডিক্লারেশন চেয়ে দরখাস্ত করলে তিনি

বলেছিলেন ঃ সম্পাদকের বাল্যজীবন থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত তার সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় অনুসন্ধান না করে ডিক্লারেশন দেয়া সম্ভব নয়। সৈয়দ ইরফানুল বারীর বিরুদ্ধে কোন প্রকার অভিযোগ না পাওয়ায় জেলা প্রশাসক পরবর্তীকালে ডিক্লারেশন দিয়েছিলেন। দুঃখের বিষয় যে আইবি অফিসাররা তাকে আদর্শ চরিত্রের ব্যক্তি বলে সরকারের কাছে রিপোর্ট পেশ করেছিলেন, সেই অফিসারদের উপর নির্ভর করেই মিথ্যে অভিযোগে সম্পাদককে গ্রেফতার করা হয়েছে। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, সরকারী রিপোর্টের উপর নির্ভর করে পাঞ্জাবি শাসকগোষ্ঠী এককালে শেরে বাংলা ফজলুল হককে বিশ্বাসঘাতক, গাদ্দার বলে অভিহিত করেছিল, তারাই পরবর্তীকালে তাঁকে মুখ্যমন্ত্রীর পদ দিয়েছিল। সরকারের শুভ দৃষ্টিতে পড়লে শয়তানও ফেরেশতা হয়, অন্যদিকে কোপানলে পড়লে ফেরেশতাও শয়তানে পরিণত হয়। আপনার প্রতি আমার অনুরোধ, 'হক-কথা'র ডিক্লারেশনের পূর্বে আইবি প্রদত্ত রিপোর্ট তদন্ত করে সঙ্গত সিদ্ধান্ত নিন।"

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ধনিকদের জন্য আসেনি

ভারতের কমিউনিস্ট নেতা কমরেড মোজাফফর আহমদ সম্প্রতি বাংলাদেশে শুভেচ্ছা সফরে এসেছে। দেশ স্বাধীন হবার পর থেকেই কমরেড মোজাফফর তাঁর জন্মভূমি দেখার আকাঙ্ক্ষায় উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিলেন (প্রসঙ্গতঃ তাঁর বাড়ী সন্দ্বীপ)। বিশেষ করে ৩০শে এপ্রিলের শিবপুর সম্মেলনে যোগদানের আমন্ত্রণ জানিয়ে মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী তাঁকে পত্র লিখলে তিনি বাংলাদেশ সফরের অনুমতি চেয়ে ভারত সরকারের নিকট আবেদন করেন। কিন্তু ভারতীয় প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠী তাঁকে অনুমতি দেননি। পরবর্তীকালে মাত্র পনেরো দিনের সংক্ষিপ্ত সফরে আসার পর কমরেড মোজাফফরকে বিভিন্ন সংস্থা আন্তরিক সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করতে থাকেন।

সন্দ্বীপবাসীদের পক্ষ থেকে সম্বর্ধনার জ্ঞাপনের পর বাংলা শ্রমিক ফেডারেশন, বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন, সৃজনী শিল্পী ও লেখক গোষ্ঠী এবং ভ্রান্তি শিল্পী গোষ্ঠী সম্প্রতি বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে কমরেডকে আন্তরিক সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেছেন।

কাজী জাফর আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় সম্বর্ধনার জবাব দিতে গিয়ে কমরেড মোজাফফর আহমদ বলেছেন, "বহু রক্তের বিনিময়ে অর্জিত বাংলাদেশের স্বাধীনতা মুষ্টিমেয় ধনিকদের জন্য আসেনি।"

শোষিত-বঞ্চিত মেহনতি প্রতিটি জনতার দ্বারে স্বাধীনতা এবং মুক্তির স্বাদ পৌঁছে দেয়ার প্রচেষ্টা চালানোর জন্য কমরেড মোজাফফর আহমদ আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "নাহলে তিরিশ লক্ষ শহীদের রক্তের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে।"

ইহা কি সত্য?

॥৯৬॥

ডোমার-ডিমলা অঞ্চলের এমসিএ সাহেবের বড় ভাই অন্যের বউ আটক রেখেছেন। এলাকার সরকারী অফিসার এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কাছে দেন-দরবার করেও দীর্ঘদিন যাবৎ মুতুড়া মিয়া তার ছেলের বউকে ফিরিয়ে নিতে পারছেন না।

॥৯৭॥

বরিশালের মুলাদী থানার একটি রিলিফ কমিটির চেয়ারম্যানকে ১৬ মণ গুঁড়ো দুধ চুরির সময় জনতা হাতেনাতে পাড়কাও করলে দ্বিতীয় লীগের কর্তাব্যক্তিরা জবর নাটকের অবতারণা করেন। বিচারের নামে প্রহসনের মাঝামাঝিতে চোর চেয়ারম্যানটি ইচ্ছাকৃতভাবে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়।

প্লানটির সফলতার সুযোগে নেতারা পরে বিচারের ধাপ্পা দিয়ে চোরটিকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেন। বলা বাহুল্য, দ্বিতীয় লীগের পাণ্ডা-চোরটিকে আর জনতার আদালতে দাঁড়াতে হয়নি।

॥৯৮॥

মাথায় ধবধবে শাদা টুপি লাগিয়ে হানাদার আমলে অশান্তি আর বদরদের সভা-সমিতিতে অসংখ্য লেকচার ঝাড়া নেতাটি টাঙ্গাইলের মামুবাদী যুবদলের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর লাঠিহাতি কমান্ডার হয়েছেন। উনার নেতৃত্বে সম্প্রতি সেবকদের একটি গ্রুপ এক জুয়ার আড্ডা রেইড করে সমাজদ্রোহীদের শায়েস্তা করতে গিয়েছিল। তিন তাসের আসরে ছিলেন আর এক মামুবাদী নেতা। অতএব, যা হবার তাই হয়েছে।

॥৯৯॥

সেদিনের সাইকেল অফিসারটি হাইজাম্প মেরে বাংলাদেশ সরকারের এস্টাব্লিশমেন্ট বিভাগের জয়েন্ট সেক্রেটারীতে পরিণত হয়েছেন। হাইজাম্পের হাইট অবশ্য বেশী ছিল না। কারণ, উনি প্রধানমন্ত্রীর ব্রাদার-ইন-ল!

॥১০০॥

বরিশালের যে মুন্সী উকিলটি পাক-বাহিনীর সাথে হরদম দহরম-মহরম চালাতেন, ভারত ও মুক্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে অপপ্রচার চালানো ছিল যার সারা দিবসের কর্ম, তিনিই এখন গায়ে দিয়েছেন আওয়ামী লীগের বর্ম। পাক-সেনাদের এই নিজস্ব দালালটি বর্তমানে রিলিফ কমিটির সর্বময় কর্তা এবং রেডক্রসেরও অন্যতম খাদেম।

(অন্যায় এবং দুর্নীতির শিরোমণিদেরকে সরাসরি আক্রমণ করে এই বিভাগটি এবার তার সেঞ্চুরী পূরণ করলো। আঁতে ঘা লাগায় স্বার্থান্বেষী মহলের চাপে মিথ্যে অভিযোগে সম্পাদককে গ্রেফতার করা হলেও বিভাগটি তার কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে।)

॥১০১॥

যে ৫৫ বছর বয়সে শত শত সরকারী অফিসাররা অবসর গ্রহণ করেন, আইউব-ইয়াহিয়ার বিশ্বস্ত সেবক ভদ্রলোকটি তখন সবেমাত্র ধীরে-সুস্থে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যানের পদ অলঙ্কৃত করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর শ্বশুরের আপন মামাতো ভাই বলেই নাকি এমনটি ঘটেছে।

মওলানা ভাসানী সকাশে কমরেড আবদুল্লাহ রসূল

সারা ভারত কিষাণ সভার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড আবদুল্লাহ রসূল বাংলাদেশের কৃষক আন্দোলনের সংগ্রামী অগ্রনায়ক মওলানা ভাসানীর সাথে সাক্ষাতের জন্যে গত ১৯শে জুন সন্তোষ এসেছিলেন।

বিগত স্বাধীনতা সংগ্রামের দিনগুলিতে পশ্চিমবঙ্গের কৃষকরা যে সক্রিয় সাহায্য এবং সহযোগিতা করেছেন, তার জন্যে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে মওলানা ভাসানী আশা প্রকাশ করেছেন যে, বিগত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দু'দেশের মেহনতি জনগণের মধ্যে যে সংগ্রামী ঐক্য গড়ে উঠেছে, শাসকগোষ্ঠীর কোনো প্ররোচনাতেই তা ব্যাহত হবে না।

কমরেড আবদুল্লাহ রসূল বাংলাদেশের সংগ্রামী কৃষকদের প্রতি পশ্চিমবঙ্গের কৃষক সমাজের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। মওলানা ভাসানী এবং কমরেড আবদুল্লাহ রসূল দৃঢ় আশা প্রকাশ করেছেন যে, উভয় দেশের জোতদার, মহাজন এবং ধনিক-বণিকদের বিরুদ্ধে শ্রমিক- কৃষক- মেহনতি জনতার ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামকে সাম্প্রদায়িকতার ঘৃণ্য চক্রান্তে ডুবিয়ে দেয়ার যে অপচেষ্টা চলছে উভয় দেশের কৃষক আন্দোলন পরস্পর সংগ্রামী ঐক্য স্থাপন করে তাকে প্রহিত করবে।

সম্পাদক ঃ সৈয়দ ইরফানুল বারী, ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ঃ মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী
মুদ্রণে ঃ শান্তি প্রেস, সন্তোষ, টাঙ্গাইল।

প্রতি কপি পঁচিশ পয়সা **সাপ্তাহিক** চাঁদার হার : ষান্মাসিক-৬.০০ বার্ষিক-১০.০০

হক-কথা

(WEEKLY THE HAQ-KATHA)

প্রকাশক ও পৃষ্ঠপোষক ঃ মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

প্রথম বর্ষ ১৯শ সংখ্যা : শুক্রবার ; ২৩শে আষাঢ় ১৩৭৯ ; ৭ই জুলাই ১৯৭২ ; ২৫শে জমাদিউল আওয়াল ১৩৯২ ; সন্তোষ, টাঙ্গাইল

পাগলা ঘোড়া বশ মানেনি

দেশব্যাপী তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করে রংবেরং-এর বাহিনীগুলি দুষ্কৃতিকারী বিরোধী অভিযান চালিয়েছে দ্রব্যমূল্য সাবেক পর্যায়ে কমিয়ে আনার ওয়াদা দিয়ে। ঘোষিত 'মহৎ উদ্দেশ্য' সাধনে জনগণও সহযোগিতা করেছেন অকপটে। কিন্তু জনগণের আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ থেকে গেছে আজ অবধি। তবে দেশটাকে আরেক দফা দখলদার আমলের আতঙ্ক ও শিহরণ দিয়ে বেসরকারী পকেট বাহিনীগুলি নিজেদের স্ট্যাটাস বাড়িয়ে নিয়েছে, এর অনিবার্য পরিণাম আসবে ভবিষ্যতে। সরকারী বাহিনীগুলিকে বাদ দিয়েই লাল সবুজেরা জনপদে নামবে। যখন যেমন ইচ্ছে তেমনি করবে। তখন কেউ টু শব্দ করতে সাহস পাবে না। কেননা, জুন মাসেই সেনা, পুলিশ ও রক্ষীবাহিনীর সমমর্যাদার ক্ষমতা এরা ব্যবহার করে নজীর সৃষ্টি করে রেখেছে যে, এরা কোন বিশেষ দলের বাহিনী হলেও, ক্ষমতার বদৌলতে এরা জনগণের দণ্ড মুণ্ডের কর্তা। পরিপূর্ণ ফ্যাসিবাদ কায়েমের পূর্বশর্ত হিসাবে পকেট বাহিনীগুলিকে অথরিটি হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা এবং তার স্টেজ রিহার্সাল সম্পন্ন। এখন সহস্র রজনীর অভিনয়ের পালা শুরু হলো।

কে না জানে, ক্ষমতাসীন দলের মহাপ্রভুদের পক্ষপুটে আশ্রয়প্রাপ্ত ও তাদের নিজেদের অনেক ব্যক্তিই চোরাকারবার, মজুদদারী, অস্ত্র সুমার করার কাজে লিপ্ত রয়েছেন। বিড়াল দিয়ে শুটকি চোর ধরানোর মহড়া কৌতুককর হলেও অর্থবহ নয়।

তাই এ অভিযানের পরে রংবেরং বাহিনী এবং মহাপ্রভুদের অঙ্গীকার তিলার্ধও পূরণ হয়নি। চালের দাম কমেনি। কোথাও হাট বাজার শূন্য, দোকানে শুধু ন্যায্য দরের তালিকা ঝুলছে। অনেক জিনিসের দাম আগের চাইতে বেড়েছে। ফলে প্রকারন্তরে সরকারই জনগণকে বুঝিয়ে দিলেন, চেষ্টার ত্রুটি আমরা করিনি তা স্বচক্ষেই দেখলে, এখন সব কিছু তোমাদের কপাল।

জনগণও এই গোলকধাঁধার জগদ্দল দেয়ালে মাথা কুটে কুটে মরতে থাকবেন এবং বাড়তি বিড়ম্বনা হিসাবে পকেট বাহিনীগুলির আইনানুগ দাপটের নিচে কাটাতে হবে দিবা ও নিশি।

এখন সরকারকে প্রশ্ন করা যায়, সরকারী প্রচারযন্ত্রের মিথ্যা প্রচারটুকু ছাড়া দ্রব্যমূল্য সত্যিকারভাবে কমেছে কি? যদি না কমে থাকে এর প্রতিকার কি হবে? মুক্তিযুদ্ধের পর ছয় মাসের ধাক্কায় এদেশকে কলিকাতার সমান উঁচু মাচানে তুলে দেয়া হলো এটাই কি চিরস্থায়ী হবে?

সরকার প্রচারযন্ত্র মারফৎ আরও চেষ্টা করতে থাকবে, এটা সবাই জানে। কিন্তু দেশে উৎপাদিত পণ্যগুলি সীমান্তের গা ছুঁয়ে হাওয়া হয়ে যাবে না? নিশ্চয়ই যাবে। মুদ্রাস্ফীতির চাপে জনগণের এ দুর্দশা সৃষ্টি হয়েছে, তা স্বীকার করতে সরকারের দ্বিধা কেন? দ্বিধা একমাত্র নিজেদের কীর্তি ফাঁস হয়ে পড়া ও গদী নড়বড়ে হয়ে যাবার ভয়ে। এখানকার দ্রব্যমূল্য পশ্চিমবঙ্গের দ্রব্যমূল্যের সাথে পাল্লা দিয়ে অতিক্রম করে গেছে, এটা কি বন্ধুত্বের দোহাই দিয়ে উভয় ভূখণ্ডকে একই বাজারে পরিণত করার গোপন ষড়যন্ত্রের ফল নয়?

রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ক্ষমতাসীন সরকারের কার্যক্রমই যদি ক্ষতিকর বলে প্রমাণিত হয় তার বিচার করবে কে? এর বিচারক জনগণ। কিন্তু বিচারক স্বীয় শক্তিকে সংগঠিত করে রুখে দাঁড়াবার আগেই তার মাথার উপর লাঠি হাজির হয়েছে। এ লাঠি সরকারী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিতদের পকেট বাহিনীর হাতের মুঠোয়। জনগণের দুর্দশা যতই হোক এখন আর টুঁ শব্দ করা চলবে না। ঘরের পাশে কাউকে পিটিয়ে মেরে ফেললেও প্রতিবাদ করা যাবে না। যখন খুশি যাকে ইচ্ছে বন্দী করার বিরুদ্ধে উচ্চবাচ্য করা নিষেধ।

রাশিয়ার বাহবা পেয়ে উল্টো দিক থেকে সমাজতন্ত্র কায়েমের কসরত করে প্রতিবেশী দেশ বার্মায় নে'উইনের সরকার চরম ব্যর্থতা বরণ করে এখন শক্ত পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে। রাশিয়ার উল্টো সমাজতন্ত্রের বাহবা আর ইন্দিরা গান্ধীর আজব সমাজতন্ত্রের প্রেরণা থেকে মুজিব সরকার ফ্যাসিবাদী পুঁজিবাদ ছাড়া আর কি কায়েম করবেন?

যুগান্তরে প্রকাশিত খবরের প্রতিবাদে

মওলানা ভাসানীর বিবৃতি

ইদানিং ভারতের 'যুগান্তর' ও অন্যান্য পত্র-পত্রিকা আমার বিরুদ্ধে নানারূপ মিথ্যা ও কুৎসা প্রচার করিতেছে দেখিয়া যারপরনাই দুঃখিত হইয়াছি। আমি সারা জীবন সংবাদপত্রের প্রতি সব সময়ই আন্তরিক শ্রদ্ধা পোষণ করি এবং ভবিষ্যতেও করিয়া যাইব। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয়, 'যুগান্তর' পত্রিকা ভারতের হাই কমিশনারের বরাত দিয়া আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা খবর প্রকাশ করিয়াছে। আমি তীব্র ভাষায় উহার প্রতিবাদ করিতেছি।

স্বাধীনতার পর টাঙ্গাইল পৌঁছিয়াই আমি ভারতের মাড়োয়ারী চোরাকারবারীদের দৌরাত্ম সম্পর্কে অবহিত করার জন্য ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশনারকে পত্র লিখিয়াছিলাম। চোরাকারবারীদের কার্যকলাপের ফলে যাহাতে দুই দেশের মৈত্রী বিনষ্ট না হয় তাহার আশু ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করার উদ্দেশ্যেই আমি তাহাকে পত্র লিখিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি দিল্লী যাত্রার প্রাক্কালে টেলিগ্রামযোগে জানাইয়াছিলেন যে পরবর্তীতে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। তাহার পর উক্ত হাই কমিশনারের সহিত আমার আজ পর্যন্ত কোন আলাপ-আলোচনাই হয় নাই।

ভারতে থাকাকালীন ডি,আই,জি, আমাকে যে নোটটি দিয়াছিলেন, সময় উত্তীর্ণ হওয়ায় তাহা বাংলাদেশের কোন ব্যাঙ্কে ভাঙ্গানো সম্ভব হয় নাই। তাই ভারতের ফার্স্ট সেক্রেটারীকে ঢাকায় সাক্ষাতের সময় অবগত করিয়া ঐ বিষয়ে সাহায্য চাহিয়াছিলাম। ঐরূপ ভুল নোট দেওয়ার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া পরে তিনি তাহা ডাকযোগে প্রেরণ করার অনুরোধ জানাইয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। তাহার পর ডি,আই,জি অথবা ফার্স্ট সেক্রেটারী কাহারো সহিতই আমার সাক্ষাত হয় নাই।

টাঙ্গাইল আসিয়া ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর নিকট যে পত্রটি লিখি তাহাতে আমি দুই দেশের বন্ধুত্বের স্বার্থেই চোরাকারবারীদের তৎপরতা বন্ধের ব্যবস্থা করার অনুরোধ করি। তাছাড়া, সন্তোষের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এবং মহিপুরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন একাডেমীর নির্মাণ কার্যের জন্যে লোহা, সিমেন্ট ও শালকাঠ আমদানীর পারমিটের জন্য অনুরোধ করিয়াছিলাম। ঐ সময় ভারত বাংলাদেশের মধ্যে কোন প্রকার বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় নাই। তাহার জবাবে ভারত সরকারের ফরেন সেক্রেটারী যে উত্তর দিয়াছেন তাহাও আমার নিকট জমা আছে।

'যুগান্তর' পত্রিকা আমার বিরুদ্ধে এইভাবে জঘন্য মিথ্যা কুৎসা প্রচার করিলে উভয় দেশের মধ্যে তিক্ততা বৃদ্ধি পাইবে, বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্ব ভাবও অনেক হ্রাস হইতে থাকিবে। আশা করি, ভবিষ্যতে ভারতীয় পত্র-পত্রিকায় আমার বিরুদ্ধে এই জাতীয় অসত্য সংবাদ প্রকাশিত হইবে না।

অভিশাপের পুরোনো বোঝা আবার বইতে হবে

সমাজতান্ত্রিক বাজেটের নামে ধোঁকা

তিন পয়সার পোস্টকার্ড খানা আজও দশ পয়সায় কিনতে হবে— পাকিস্তান আমলে দরিদ্র জনগণের উপর যে সব অর্থনৈতিক শোষণের সূচনা হয়েছিল, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তার শতকরা ১০টি অভিশাপ নিজেদের ১৯৭২-৭৩ সালের বাজেটে সুন্দরভাবে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অথচ এখন সাড়ম্বরে প্রচার শুরু হয়েছে যে, সম্প্রতি ঘোষিত জাতীয় বাজেট সমাজতন্ত্রের ভিত গড়ে দিয়েছে। বস্তুত বাজেটের কথাই ধরুন আর পরিকল্পনার কথাই ধরুন— এসবের ঘাড়ে সওয়ার হয়ে যে বস্তু আসছে, সমাজতন্ত্রের নামে তাকে চালানোর উপায় নেই। কারণ, অন্ধবধির ব্যক্তিটিও ঠিক বুঝছেন, সরকারের হাতের চাকা কোন দিকে মোড় নিচ্ছে।

অবশ্য অর্থমন্ত্রী তাঁর বাজেট বক্তৃতায় ভবিষ্যতে বাঁচবার একটা পথ খোলা রেখেছেন, জনগণের দুঃখবরণ ও কষ্ট স্বীকারের অধ্যায় এত সহসা ঘটবে না। দেশের জন্য আরও কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করতে হবে।

দরিদ্র অসহায় ভুখানাঙ্গা মানুষকে দেশের প্রতি কর্তব্যানুরাগে উদ্বুদ্ধ করার দরকার নেই। কারণ, যাদের মুখ থেকে এ আহ্বান আসছে তাদের চাইতে বেশী ত্যাগ স্বীকার করেছেন জনগণ। হানাদার বাহিনীর অত্যাচার নিজেরা বুক পেতে নিয়েছেন। যুদ্ধ শেষ হবার পর-পরই সংগ্রামী বীরকুল ভাগ্য হাতড়িয়ে নিয়েছেন। এখন স্বচ্ছন্দে ক্ষমতায় বসে দিন কাটানো এবং জনগণকে অনির্দিষ্টকাল দুঃখবরণের আহ্বান জানানো ছাড়া কাজই বা তাদের আর কি আছে।

সমাজতন্ত্রের বুনিয়াদ বলে প্রচারিত এ বাজেটে উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত মেহনতি মানুষদের জন্য কি বিশেষ ব্যবস্থাটি রয়েছে? বস্তুতঃ কিছুই নেই। সরকার এক্ষণে আবার ১৫ লাখ টাকার সম্পত্তি বিশিষ্ট নব্য পুঁজিপতি গোষ্ঠী গড়তে সচেষ্ট। কনসেশন যা দেবার সব সেমুখী। পনের লাখ শুধু খাতাপত্রে, গণমুখী পরিকল্পনা সে তো বেতারের ভাষ্যকারের কণ্ঠে, অর্থনৈতিক উল্টোরথ ইতিমধ্যে যে পুঁজিপতি শ্রেণীকে উৎখাত করার পরিবর্তে, তাদের মহা সমারোহে আসীন করে ছুটে চলছে তার দিকে জনগণকে লক্ষ্য করতে হবে।

ঢাকা থেকে মুন্সীগঞ্জ, ঢাকা-টাঙ্গাইল-জামালপুর, রাঙ্গামাটি থেকে চট্টগ্রাম, হবিগঞ্জ থেকে সিলেটের মধ্যে রেলপথ নেই। কক্সবাজার-চট্টগ্রামে নেই পূর্ণ রেল সংযোগ। দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতির লক্ষ্য যদি প্রধান হয় কোন পরিকল্পনাবিদ বা বাজেট প্রণেতা এই শূন্যতাকে মেনে নিতে পারবেন না। যোগাযোগ খাত ছাড়াও রয়েছে কৃষি খাত— যার উপর নির্ভর করেছে শতকরা ৮৫ জন

মানুষের ভবিষ্যত। গ্রামীণ উন্নয়নের নামে পঞ্চায়েত লালনের সুবন্দোবস্ত অবশ্য হবে, সে সাথে রয়েছে ৩০ কোটি টাকার ঋণ— যার দশা আগের ১০ কোটি টাকার তাকাভী ঋণের মত হবে। বিগত ছয় মাসে ১০ কোটি টাকার তাকাভী ঋণ কারা পেয়েছে— এ হিসাব নিলেই ভবিষ্যত ৩০ এর গতি বুঝতে জনগণের অনুবিধা হবে না।

কোন জেলায় শতকরা ৩৮, কোন জেলায় শতকরা ৬৮ জন করে গড়পড়তা শতকরা ৫৩ জন করে ভূমিহীন কৃষক রয়েছে। সরকারের তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক বাজেটে তাদের জন্য কোন আশ্বাস নেই। তবে পাটের উপর কর রয়েছে মণপ্রতি দু'টাকা হারে— ন্যায্য দর না দিয়ে তদুপরি দু'টাকা হারে কেড়ে নেবার সুব্যবস্থা হিসাবে।

এদেশে তুলা হয় না। সুতীবস্ত্র তৈরীর জন্য বিদেশ থেকে যে সুতা আসবে তার উপর শতকরা ৬০ টাকা শুল্ক ধার্য করা হয়েছে অর্থাৎ ১০০ টাকার সুতার দাম দাঁড়াবে ১৬০ টাকা। বস্ত্র বয়নের পর কাপড় কলের খরচ, মুনাফা ও শুল্ক সমেত সব কিছু এসে পড়বে জনসাধারণের ঘাড়ে। পক্ষান্তরে প্রসাধনী জিনিস এখানে উৎপাদিত হওয়া সত্ত্বেও নামকরা বিদেশী প্রসাধন সামগ্রী আনতে ট্যাক্স দিতে হবে মাত্র ৩৫ ভাগ। অভাবী গরীবদের কাপড়ের উপর ৬০ ভাগ অথচ ধনিকদের প্রসাধনীর উপর ৩৫ ভাগ শুল্ক—এতদপেক্ষা সমাজতন্ত্রের প্রকৃষ্ট নমুনা কোথায় পাওয়া যাবে।

সরকার মুখে বলছেন, দেশের যারপরনাই সঙ্কট চলছে। অথচ কার্যত, তারা ঘোষণা করেছেন উদ্বৃত্ত বাজেট। আয় হবে ২৮৫ কোটি ৩৮ লাখ টাকা, ব্যয় হবে ২১৮ কোটি ৪৩ লাখ তৎসহ উন্নয়ন বহির্ভূত মূলধন খাতে ৮ কোটি ১৫ লাখ—একুণে ব্যয় দাঁড়ায় ২২৬ কোটি ৫৮ লাখ— প্রকৃত উদ্বৃত্ত থাকবে ৫৮ কোটি ৮০ লাখ টাকা। পাকিস্তানের সরকারগুলি টাকা বাঁচিয়ে রেখে (খরচের জায়গা নেই) বাহবা নিতে চাইতো দেশ ও বিদেশ থেকে, তাই উদ্বৃত্ত বাজেট ছিল তাদের অবলম্বন। বিধ্বস্ত বাংলাদেশেও উদ্বৃত্ত বাজেট পেশ করে সরকার সস্তা বাহবা পাবার আশা নিশ্চয়ই করছেন, নতুবা সুষম বাজেট করতে তাদের অসুবিধাটা ছিল কোথায়? প্রতিটি মানুষকে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষার নিশ্চয়তা দান করাই সমাজতান্ত্রিক বাজেটের মূল লক্ষ্য হয়ে থাকে। দেশের শিল্পগুলির বৃহদাংশ সরকারের হাতে, তা থেকে লাভ আহরণ হত ঠিকই কিন্তু শ্রমিকরা ঐ পাঁচটি মৌলিক প্রয়োজনের গ্যারান্টি পাবে না। শিক্ষার জন্য সর্বোচ্চ অঙ্কের টাকা বরাদ্দ করা হলেও ম্যাট্রিক অবধি বিনাখরচায় পড়াবার পরিকল্পনা নেই, তাই শিক্ষার সুযোগ ভাগ্যবানদের জন্যই থাকবে সীমিত। ৬২ হাজার গ্রামের অবহেলিত মানুষের জীবনের প্রান্তে এ বাজেটের কোন সুফল পৌছবে না। কেননা, পল্লীকে অগ্রাধিকার দানের সাথে ভূমির সমবায় মালিকানার কোন সংযোগ নেই। এককথায়, পাকিস্তানী বাজেটকেই উনিশ-বিশ করে আবার ছাড়া হয়েছে। অর্থনীতির রাজত্বে জনগণকে আরেকটি বৎসর অভিশপ্ত অর্থনীতির বোঝা বইতে হবে।

বাদুড়

মোঃ রিয়াজ উদ্দিন

ওগো কাল বাদুড়ের দল,
ছাড়তে হবে এবার তোদের রক্ত চোষার ছল।
দিনের বেলায় লুকিয়ে থাক বিজন অন্ধকারে
রাত্রি এলেই বেরিয়ে পড় লুট করিবার তরে।
সাধুর বেশে থাক তুমি চোরের বড় ভাই
এ-কথাটা বুঝতে এবার কারো বাকী নাই।
মুখোশ পরে ঘরে ঘরে করছো অনেক চুরি
এবার তোমায় প্রাণটা যাবে পড়বে গলায় ছুরি।
দেখছোনা ঐ হাটে মাঠে পড়ছে কত সাড়া
সবাই যে গো বলছে তেড়ে চোরাদেরে তাড়া।
এবার তুমি জানতে পাবে চুরি করার ফল
জ্যান্ত তোমার কবর দেবে দেশের তরুণ দল।

এমসিএ-র দাম

পাবনা জেলার উল্লাপাড়া থানা ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ সরকারের খাদ্যমন্ত্রী বাবু ফণিভূষণ মজুমদার সমীপে এক লিখিত বিবৃতিতে অভিযোগ করা হয়েছে যে স্থানীয় সরকারী গুদাম থেকে সম্প্রতি ২১ টাকা মণ দরে ৭৮৬ মণ গম জনৈক এমসিএ-র কাছে গোপনে বিক্রি করে দেয়া হয়েছে। পরে এমসিএ সাহেব ঐ গম খোলা বাজারে ৪৫ টাকা দরে বিক্রি করে ১৮ হাজার টাকা মুনাফা অর্জন করেছেন। রেশনে যখন জনগণ গম পাচ্ছেন না, তখন কোন অধিকারে এমন কালোবাজারী করা হলো মন্ত্রী সমীপে সংস্থা দুটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছে।

কৃষক সমিতির সকল শাখার প্রতি ভাসানীর অনুরোধ

আগামী অল্পদিনের মধ্যেই বাংলাদেশ কৃষক সমিতির স্বেচ্ছাসেবক সম্মেলন ডাকা হবে। ইতিপূর্বে পাকশী, মহীপুর, সন্তোষ এবং শিবপুরে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এবারের সম্মেলন যে কোন স্থানে হতে পারে। তাই প্রত্যেক জেলা ও মহকুমা কৃষক সমিতির কাছে আমার অনুরোধ এই সম্মেলনের স্থান ও তারিখ সম্পর্কে অবিলম্বে নিজ নিজ এলাকার মতামত পাঠাবেন। অধিকাংশ মতের ভিত্তিতেই স্থান ও তারিখ নির্ধারিত হবে।

বাঁধের টাকায় আমের ব্যবসা

টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর থানার দেওয়ানবাড়ী বড়ইর বিলটিতে বাঁধ না দেয়ার ফলে প্রতি বছরই লক্ষাধিক টাকার ফসল বিনষ্ট হয়ে যায়। বাংলাদেশ সরকার এবার বিলটির মুখে বাঁধ দেয়ার জন্যে স্থানীয় আওয়ামী লীগ কর্মকর্তাদের কাছে অনুমোদিত অর্থের সাত হাজার টাকা দিয়েছিলেন। তারা বাঁধ না দিয়ে সরকার প্রদত্ত টাকা দিয়ে আমের ব্যবসা জমিয়েছিলেন। ফলে সম্প্রতি অন্যান্যবারের মত প্রায় দুই লক্ষ টাকার পাকা ধান বিনষ্ট হয়ে গেছে।

ক্ষতিগ্রস্থ বিক্ষুব্ধ কৃষকরা সমবেতভাবে আওয়ামী লীগ কর্তাদের বাড়ী ঘেরাও করলে তারা পলায়ন করে। পরে জনতা আওয়ামী লীগের সম্পাদকের ঘরের টিন এবং আরেক নেতার খড়ের পালা তুলে এনে বিলটিতে বাঁধ নির্মাণ করেছেন।

সেতাবগঞ্জ ন্যাপ
সম্মেলন ও জনসভা

সম্প্রতি সেতাবগঞ্জে বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির বোচাগঞ্জ থানা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জনাব হোসেন আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষক সমিতির কেন্দ্রীয় সংগঠক ও বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (লেনিনবাদী)-র দিনাজপুর জেলা সম্পাদক কমরেড হাজী মোহাম্মদ দানেশ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (লেনিনবাদী)-র কেন্দ্রীয় সম্পাদক কমরেড অমল সেন, বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ও কৃষক সমিতির কেন্দ্রীয় সংগঠক জনাব রাশেদ খান মেনন এবং কেন্দ্রীয় ন্যাপ সংগঠক জনাব মহম্মদ আলী।

সম্মেলনে বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির ইতিহাস ও বিভিন্ন রাজনৈতিক, সাংগঠনিক প্রশ্নে ব্যাপক আলোচনা হয়। সভায় এক প্রস্তাবে 'হক-কথা' সম্পাদকের অবিলম্বে মুক্তি, সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ ও হামলা, গুপ্ত সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সম্মেলনে জনাব খলিলুর রহমানকে সভাপতি

ও আনোয়ারুল হক চৌধুরী (নওয়াব)-কে সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত করে একটি শক্তিশালী কার্যকরী কমিটি সংগঠিত হয়।

সম্মেলন শেষে সেতাবগঞ্জ হাই স্কুল প্রাঙ্গণে নবনিযুক্ত সভাপতি জনাব খলিলুর রহমানের সভাপতিত্বে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তৃতা করেন নবনির্বাচিত ন্যাপ সম্পাদক জনাব আনোয়ারুল হক চৌধুরী, দিনাজপুর জেলা বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন সভাপতি কামরুল হুদা, কাহারুল থানা ন্যাপ সভাপতি বাবু দুর্গাচরণ রায়, জনাব মহাম্মদ আলী, কমরেড অমল সেন, রাশেদ খান মেনন ও প্রধান অতিথি হাজী মোহাম্মদ দানেশ।

দি পাকিস্তানী জিনিয়াস

দখলদার আমলে ক্লাশ বর্জনকারী ছাত্রদের কাছে হুমকিপত্র পাঠিয়ে, ব্যক্তিগত উদ্যোগে চিঠি লিখে, সার্কুলার প্রচার করে যে শিক্ষাবিদ পাকিস্তান রক্ষায় দ্বিতীয় মওদুদী সেজেছিলেন, তিনি এখনও বহাল তবিয়তে বিশেষ ইনস্টিটিউট ও ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়কে 'আলোকিত' রাখছেন। গণি যুগের স্বজনপ্রীতির সূত্র ধরে বেয়ে উঠতে উঠতে দালাল ভাইস চ্যান্সেলার সাজ্জাদ হোসেনের আমলে এসে তিনি কূল পেয়ে গিয়েছিলেন। অনেক যোগ্য ব্যক্তিকে ডিঙ্গিয়ে তার মাথায় গোটা ইনস্টিটিউটের সম্রাটের মুকুট দেওয়ায় তিনি সামরিক কর্তৃপক্ষ ও সাজ্জাদ হোসেনের প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে ওঠেন। দখলদার আমলে কুয়ালালামপুরে সেমিনার করে, করাচীতে সমতুল্য ইনস্টিটিউটের সভায় যোগ দিয়ে তিনি সংহতি সংহতি চীৎকার ছেড়েছেন। সামরিক কর্তৃপক্ষের আশীর্বাদ নিয়ে ডলার চেক খেয়ে খেয়ে বিদেশ সফর করে বেড়িয়েছেন তিনি। বারবার একই কথা তিনি বলতেন, মিলিটারীদের স্বার্থেই আমার বিদেশ যাত্রার সুব্যবস্থা হওয়া উচিত। মহাপুরুষটি এখনও আছেন তার ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষের পদ অলঙ্কৃত করে।

অবলা সম্রাজ্ঞী

তিনি বিধবা হিন্দু নারী এবং ভারতীয় নাগরিক। অথচ এই অবলার সবল প্রতাপে যশোরের কালিয়া থানার পুরুলিয়া তটস্থ।

পুরুলিয়া গ্রামের মৃত নিরোদ বিহারী শিকদারের বিধবা পত্নী কুসুম কুমারী শিকদার ৮ বছর আগে তার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ছাফ কবলা দলিল মূল্যে হস্তান্তরিত করে ২৪ পরগণার বনগাঁ থানার গরীরপুর গ্রামে বাড়ী করেন এবং ভারতীয় নাগরিকত্ব গ্রহণ করে ৮ বছর সেখানে কাটান।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর দু'মাস আগে তিনি ঝোপ বুঝে কোপ দিতে এসেছেন এপার। সীমান্ত অতিক্রমের বৈধ পারমিটও তার নেই। তিনি এপারে এসে একটা দুর্বৃত্ত দল সংগঠিত করে বিক্রি করে যাওয়া সম্পত্তির জবরদখল করেছেন এবং সম্রাজ্ঞীর মত প্রতাপ দেখাচ্ছেন।

ক্ষুধার জ্বালায় কুল বধূরা পালাচ্ছে

ক্ষিধের জ্বালায় হাভাতে স্বামীর ঘর ছেড়ে কুল বধূরা পালাচ্ছে। খুলনার কোতওয়ালী থানায় বেকারত্বের অভিশাপে বেচাইন বুড়ো কলিমদ্দি কুলসুম বিবিকে খুঁজছেন। দারোগা সাহেবকে ধরেছেন, বউ খুঁজে বের করে দিতে। কলিমদ্দি বলছেন, নয়তো সন্তান কটি বাঁচবে না। কিন্তু কলিমদ্দি আজো আয়ের সংস্থান করতে পারেননি।

খুলনায় ছাঁটাইয়ের দলে পড়া বেকার শিল্প শ্রমিকের ঘরের বউও দিশেহারা হয়ে বাপের বাড়ী পালিয়েছে। অভিযোগ– "সাত দিন তো

ভাতের মুক দেহি না সাব। কি খাইয়া থাকুম। হেঁ তো ছাটাইয়্যার দলে।" এমনিভাবে সমাজের পাতানো সংসার ভাঙ্গছে।

উনি দোতালা থেকে জনতার উপর পানি ঢেলে দিয়েছেন

ময়মনসিংহের জনৈক এমসিএ পত্নীর কাণ্ডকারখানায় স্থানীয় জনগণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন। রিলিফ কমিটির চেয়ারম্যান ঐ এমসিএটির কাছ থেকে রিলিফ না পেয়ে সেদিন একটি গণমিছিল তার বাড়ী চড়াও করেছিল, হঠাৎ এমসিএ-র পত্নী দোতলার উপর থেকে সমবেত জনতার উপর পানি ঢেলে দিলে তারা মারমুখী হয়ে উঠে। পরে কতিপয় বৃদ্ধের হস্তক্ষেপে জনতা নিবৃত্ত হয়।

এদিকে মুমিনুন্নেছা কলেজের ক'জন ছাত্রী তাদের রিলিফের প্রাপ্য টাকা চাইতে গেলে এমসিএ পত্নীটি কর্কশ স্বরে চেঁচিয়ে উঠেন 'তুমরা রিলিফের লাইগা আও ক্যা, বিয়া বইতে পার না?' ছাত্রীরা তাদের স্যান্ডেল কাজে লাগিয়েছে বলে জানা গেছে।

কুষ্টিয়ায় মুজিববাদ কায়েম হয়েছে

কুষ্টিয়া শহরে মুজিববাদ কায়েম হয়েছে। ঢাকা কেন্দ্র থেকে কাগজপত্রে মুজিববাহিনী নিষিদ্ধ হলেও কুষ্টিয়ায় বিপ্লবী মুজিব বাহিনী সর্বময় কর্তৃত্ব হাতে নিয়েছে। ভারতে কয়েক ট্রাক পাট পাচারের কেলেঙ্কারীর প্রধান নায়ক এমসিএটি আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য হয়েছেন। তাঁর সব পাপ মাফ হয়েছে। তার কেলেঙ্কারী যে ছাত্রনেতা ঘরে ফেলেছিল বিপ্লবী মুজিববাহিনী তাকে একদিন বেদম মারপিট করেছে। তাকে প্রহারের খবর ছাত্রনেতার নিজ এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে ঘটনার দু'একদিন পর শহর থেকে ১৪ মাইল দূরের আমলাসদরপুর থেকে হাজার হাজার লোকের একটি বিক্ষুব্ধ মিছিল এমসিএ-কে শায়েস্তা করার উদ্দেশ্যে শহরের দিকে আসতে থাকলে কলঙ্কিত এমসিএটি টেলিফোনে ঢাকায় মহাপ্রভুর সাথে যোগাযোগ করেন। তৎক্ষণাৎ একটি হেলিকপ্টার এসে তাকে তুলে ঢাকায় নিয়ে যায়। মিছিল এগিয়ে এলে মুজিববাহিনীর গুণ্ডারা শহর ছেড়ে নদীর অপর পাড়ে পালিয়ে যায়। ডিসি, এসপিসহ এমসিএ রউফ চৌধুরী এগিয়ে গিয়ে অন্যায়ের যথোচিত প্রতিকারের আশ্বাস দিয়ে জনতাকে নিবৃত্ত করেন।

ছাত্রজীবনে সহপাঠীকে ছুরি মেরে হত্যা করার দায়ে ২০ বছরের দণ্ডভোগের পর মুক্ত হয়ে যে ব্যক্তি আওয়ামী লীগের নেতাজী এবং লুটপাট সমিতির ম্যানেজিং ডিরেক্টর বনেছেন, তার কীর্তি দেখে মানুষ 'থু-থু' ফেলছে।

মুজিববাদী গুণ্ডাদের কীর্তিকলাপ স্থানীয় 'শান্তির ডাক' সাপ্তাহিকীতে প্রকাশিত হওয়ার পর ২৭শে মে পত্রিকা অফিসে হামলা চলে এবং সম্পাদকের বুকে রিভলবার ধরা হয়। থানায় জানানো হলে পুলিশ তাদের গ্রেফতার করে। অবশ্য মুজিববাদীদের চাপে সাথে সাথে গুণ্ডাদেরকে ছেড়েও দিতে হয়েছে।

গত ২৩শে মে মুজিববাহিনীর লোকেরা ১২টার সময় ল্যান্ডরোভার ধরনের একটি গাড়ী জোরপূর্বক নিয়ে যায়। সন্ধ্যায় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল, রহস্যজনকভাবে বিদ্যুতও ছিল না শহরে। ডাকাতি করার জন্য হাসপাতালের গাড়ী নিয়ে ঐ দুর্বৃত্তরা বেরিয়ে গেলে থানার সম্মুখে টহলদার পুলিশ ট্রাকের সামনাসামনি পড়ে যায়। মুজিববাহিনীর ডাকাতরা হঠাৎ করে পজিশন নিয়ে পুলিশের উপর এলোপাথাড়ি গুলীবর্ষণ শুরু করলে পুলিশ ট্রাকসহ পেছনে সরে থানায় যায় এবং শক্তি বৃদ্ধি করে ফিরে আসে। পরে হাসপাতালের গাড়ীখানি একটা গাছের সাথে ধাক্কা লাগা অবস্থায় পাওয়া গেছে। সব কিছু জানা সত্ত্বেও

কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি।

স্বাধীনতার পর কুষ্টিয়া শহরে নতুন রেশন ডিলার নিয়োগ করা হয়েছে ৫০ জন, সবাই মুজিব বাহিনীর লোক। এরা দখলীকৃত বাড়ীতে বসে আরামে ব্যবসা চালাচ্ছে। এগ্রোনমি অফিস থেকে জীপ অপহরণ করে ভিন্ন জেলার প্লেট লাগিয়ে মুজিববাহিনীর নেতা ডাটে সেখানা চালাচ্ছে। এজাহার দিয়েও লাভ নেই। মুজিববাদে বিশ্বাসীদের উপর হাত তোলা সম্ভব নয়। অনেক গাড়ীর সম্মুখে "বঙ্গবন্ধুর অনুমতিক্রমে" প্লেট লাগিয়ে চালানো হচ্ছে।

মুজিববাদ কায়েম হবার পর কুষ্টিয়াবাসীরা হাবিয়া দোজখতুল্য শান্তিতে বাস করছেন।

বৃত্তি বণ্টন সমাচারেৎ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য সদ্য বরাদ্দ দেশী-বিদেশী ৬৫৫টি বৃত্তি বণ্টন নিয়ে জবর খেলা চলেছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছাত্রনেতাদের মন রাখার জন্য বণ্টনের ভার দিয়েছেন সদা সরব ছাত্র নেতাটির উপর। অভাবী ছাত্রদের পরিবর্তে তিনি ট্রেট্রন মার্কা সর্বহারাদের তালিকা তৈরী করলে দারুণ বিক্ষোভের সঞ্চার হয়। অবশেষে বন্ধে ছাত্ররা বাড়ী চলে গেলে নেতাটির নেতৃত্বে নিরাপদে মামুবাদীদের মধ্যে সেই বৃত্তি বণ্টন করা হয়ে গেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

লাইসেন্স থেকে রম্ভা

ঠাকুরগাঁও দেবীগঞ্জ থানায় 'থানা প্রতি ১০ জন' কোটায় আমদানী লাইসেন্স বিলি করা হয়েছে। ১০ খানা লাইসেন্সের মধ্যে ৯ খানা পেয়েছেন আওয়ামী লীগের টাউটরা, ১ খানা দেয়া হয়েছে তাদেরই সুনজরে পতিত মুসলিম লীগের ও থানা শান্তি কমিটির প্রভাবশালী সদস্য ও রাজাকার স্রষ্টাকে। কোন ধনশালী ব্যক্তিকে লাইসেন্স দেয়া হবে না বলে এমসিএ তম্বি করলেও এই দশ ব্যক্তি সবাই এলাকার মাথা তোলা ধনী। ক্ষতিগ্রস্ত, প্রকৃত দরখাস্তকারী এবং মুক্তিযোদ্ধারা রক্ত দেখছেন।

চট্টগ্রামে দ্রৌপদী ললনাকুল

চট্টগ্রামে ভিনদেশী দ্রৌপদী ললনাকুলের আবির্ভাব ঘটেছে। এই দ্রৌপদীরা যেমন দিবাচর, তেমনি নিশাচর। বড় বড় হোটেল, বার, ক্লাব, সোসাইটি তো আছেই, বাণিজ্যিক এলাকা ও সরকারী অফিসগুলিতে এদের আনাগোনা বেশ অর্থবহ। সরকারী ও সামরিক অফিসাররাই এই দ্রৌপদীদের সঙ্গ ও আহ্লাদ পাচ্ছে। এরা চতুর্থ বাহিনী হয়ে এদেশের অভ্যন্তরে পঞ্চম বাহিনী সংগঠন করছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। অনুসরণ করে দেখা গেছে এই সন্দেহজনক তরুণীরা প্রত্যেকে জনদশেক লোকের সাথে যোগাযোগ রাখছে এবং বিশেষ বিশেষ অফিসারদের সাথে রাত কাটাচ্ছে।

সবই তেলেসমাতি

ফকির হাটের এমসিএ সাহেবের পত্নী ভারত থেকে কিছুদিন আগে ট্রাক বোঝাই মালপত্র নিয়ে ফিরেছেন। দুর্দৈব বলতে হয়। পথে এ্যাকসিডেন্টে ট্রাক কুপোকাৎ হলে দেখা গেল টাকে সব রিলিফের মাল। রিলিফের আটা নাক মুখ দিয়ে ঢুকে ট্রাকের উপর উপবিষ্ট এক 'দাসী'ও মারা গেছে। এমসিএ সাহেবের পত্নীর বাসাটিতে রিলিফ সামগ্রী গেল কি করে?

ভাসানীর বাণী

আমরা সংগ্রাম চালাবো সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ, সামন্তবাদের বিরুদ্ধে, দেশী ও বিদেশী শোষককুলের বিরুদ্ধে, আমাদের সংগ্রাম পরিচালিত হবে চোরকারবারী, লুটপাট সমিতি, ঘুষখোর স্বৈরাচারী অফিসার— যাদের কারসাজি ও অর্থ লুণ্ঠনের পরিণামে খাদ্য ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর অগ্নিমূল্য হওয়ায় শত শত নিরপরাধ মানুষ না খেয়ে মরছে, হাজার হাজার মানুষ উপবাসে দিন কাটাচ্ছে, কয়েক কোটি মানুষের জীবন থেকে শান্তি-স্বস্তি বিদায় নিয়েছে— তাদের বিরুদ্ধে। অন্যায়কে নির্মূল করে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাই আমাদের কাম্য। অত্যাচার, উৎপীড়ন ও দমননীতি প্রতিরোধ করে দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করাই আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা।

হক-কথা

২৩শে আষাঢ়, শুক্রবার

পাটের দর ১২০ টাকা চাই

পাট বপনের প্রাক্কালে দীর্ঘস্থায়ী খরা এবং চারার যত্ন নেবার সময়ে— জ্যৈষ্ঠ্য আষাঢ়ে অতিবৃষ্টির ফলে দেশে বিপুল পরিমাণ পাট ইতিমধ্যেই নষ্ট হয়ে গেছে। বন্যায় সাংবাৎসরিক ক্ষয়ক্ষতির ধাক্কা এখনও অনাগত। এই বিপুল ক্ষয়ক্ষতির সামলে উঠে চাষীরা যে পাট উৎপাদন করবেন, তার ন্যায্য দর ধার্য করার উপরই কৃষককুলের বাঁচা-মরা ও ভবিষ্যতে নির্ভর করছে।

পশ্চিমাদের শোষণের লীলাক্ষেত্র বাংলাদেশে অতীতে কৃষকরা পাটের ন্যায্য দামের এক তৃতীয়াংশও পায়নি। বৃটিশ বেনিয়ারা এদেশে যেভাবে নীলচাষ করিয়েছে, পাট চাষের ক্ষেত্রেও বিগত ২৪ বছরে একই ব্যাথাকরুণ ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। এই দুরাবস্থার চিরাবসানের লক্ষ্যে পরিচালিত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয়েছে বাংলাদেশ। এবার পাটচাষী তার পাটের ন্যায্য মূল্য পাবে, এ আকাঙ্ক্ষাই, ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও চাষীদেরকে পাটচাষে উদ্দীপ্ত রেখেছে।

অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও আপৎ-এর বোঝা সর্বদা সরল ও নিরীহ চাষীকুলের উপর চাপিয়ে দেবার রীতি বাংলাদেশে আর চলবে না, কৃষক তাই কামনা করে। কিন্তু ইতিমধ্যে সরকার ও দুর্নীতিবাজ নেতৃবৃন্দের সৃষ্টি অর্থনেতিক চাপের বোঝা এবং লুটপাটের ক্ষতিকর পরিণতি ও বিদেশী শোষণের আপৎ মেহনতি মানুষদের উপর চাপিয়ে দেবার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এ থেকে আশঙ্কা করা স্বাভাবিক যে, পাট ফসলের ন্যায্য মূল্য থেকে পাটচাষীদেরকে বঞ্চিত করে ক্ষমতাসীন সরকার প্রচুর মুনাফা লুটে তা দিয়ে ভারতীয় প্রভুদের খেদমত করবে। আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতের সাথে প্রতিযোগিতায় না গিয়ে তার সাথে ভাগাভাগির চেষ্টায় পাটের দর হ্রাসের কথাও শোনা যাচ্ছে।

তাই কৃষককুলকে বাঁচাবার জন্য পাটের ন্যায্য দর নির্ধারণের দাবী উত্থাপন করা সমীচিন।

আগে ফঁড়িয়া, ব্যবসায়ী, পাটকল, গাঁট বাঁধার কল মালিকরা ও রপ্তানীকারক যে মুনাফা লুটতো, আজ জাতীয়করণের ফলে তা সম্পূর্ণরূপে সরকারের নিয়ন্ত্রণে এসে গেছে। এই মুনাফা দেশের আমলা শ্রেণীর জন্য না রেখে পাটচাষী ও পাট শ্রমিকদের মধ্যে বণ্টন করতে হবে। কিন্তু সরকারী কর্তা ব্যক্তিদের মুখে অন্তঃসারশূন্য লম্বা বুলি শোনা যাচ্ছে, বাস্তব কথা তাদের মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে না।

১৯৭১-এর ধ্বংসলীলায় ও বিগত ২৪ বছরের শোষণে কৃষক সমাজের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গেছে। আজও যদি এরা শক্তি নিয়ে দাঁড়াতে না পারে, দেশের শতকরা ৮০ জন কৃষিনির্ভর লোক পাটের ন্যায্য মূল্য যদি না পায় তবে দেশ বাঁচবে না। স্বাধীনতা হয়ে পড়বে অর্থহীন।

পাটের নিম্নদর ধার্য করা হলে হতাশাগ্রস্ত

কৃষকদের হাত থেকে ভারতীয় চোরাকারবারীরা সব পাট নিয়ে যাবে দেশের অর্থনীতির উপর আসবে সর্ববৃহৎ আঘাত। ভারত পরোক্ষভাবে প্ররোচনা দিয়ে সেই পরিণতির দিকেই বাংলাদেশকে ঠেলে দিচ্ছে। আজ তাই কৃষক সমাজের দাবী তুলতে হবে দেড় মণ চালের দরে সমান পাটের মণপ্রতি দর চাই। ৮০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে চাল, সামনে শ্রাবণ-ভাদ্রে আসছে দুর্ভিক্ষ, পাটচাষী পাটের জন্য মণপ্রতি কমপক্ষে ১২০ টাকা দর না পেলে কৃষকুলের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়বে। সরকার দেড় মণ চালের দামে পাট ক্রয়ের সুস্পষ্ট নীতি ঘোষণা না করলে জনগণ বুঝবে এই সরকারও আবার শোষণবাদী শাসকগোষ্ঠীর কাতারে সামিল হয়েছে।

মন্থনে উঠেছে বিষ পিও আশুতোষ

নীল কণ্ঠ

এইবার নীলকণ্ঠ ঠেলা আসিয়াছে। ইন্দিরা গান্ধীকেই এই ঠেলা সামলাইতে হইবে। অপরের নিকট হইতে ষোল আনা বুঝিয়া লওয়ার দাবী সমর্থন করিয়াই এতদিন ইন্দিরা গান্ধী মনে করিয়াছিলেন, তিনি দুনিয়াজোড়া সুনাম কুড়াইয়াছেন। এইবার তাঁহাকে বুঝিতে হইবে, কত ধানে কত চাউল হইতে পারে।

তামিল নাড় র কথাই বলিতেছিলাম। সাবাস করুণানিধি! ডি,এম,কে-র প্রধান হিসাবেই তিনি এইবার স্বায়ত্বশাসনের দাবী তুলিয়াছেন। সঙ্গতভাবেই তুলিয়াছেন। নয়া দিল্লীর কংগ্রেসী হর্তাকর্তারা চিরটা কাল দাক্ষিণাত্যের রক্ত চুষিয়া খাইবে, ভাবিয়াছিল। কিন্তু তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছেন করুণানিধি। তিনি জোর দিয়া বলিতেছেন, "ইন্দিরা গান্ধী নাকি স্বায়ত্বশাসন বুঝেন না। এইবার তাহাকে সেই স্বায়ত্বশাসনের মানে আমি বুঝাইয়া দিতে চাই।" (আনন্দবাজার পত্রিকা–২৩শে মে/৭২)

কিন্তু সত্যই যে ইন্দিরা গান্ধী স্বায়ত্বশাসনের অর্থ বুঝিতে চাহেন না। তিনি বলেন, "সর্বনাশ! স্বায়ত্বশাসন! এই শব্দটি ভীষণ বিপদজনক হইয়া উঠিতে পারে।" ইন্দিরা গান্ধী সবাইকে হুঁশিয়ার করিয়া দিতেও ভুলেন না। বলেন, "জানেন, আমি প্রধানমন্ত্রী! প্রধানমন্ত্রীর নিরঙ্কুশ ক্ষমতা থাকা দরকার!" শুধু কি তাই? তিনি আরও বলেন, "পৃথিবীতে এমন কোন দেশ আছে কি, যেখানে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা কম? আসলে এই পৃথিবীতে উহা সম্ভব নয়; অন্য কোন গ্রহে সম্ভব।" (দেখুন, আনন্দবাজার পত্রিকা মে ২৩/৭২)।

ইন্দিরা গান্ধী তামিল নাড় র স্বায়ত্বশাসন দাবীতে আর নতুন কিছু বলার নাই বলিয়াছেন। (দেখুন আনন্দবাজার – ঐ)।

ইন্দিরা গান্ধীর বলার কিছু না থাকিতে পারে কিন্তু করুণানিধির যে অনেক কিছুই বলার আছে। তাই তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন, "কেহ বুঝুন আর নাই বুঝুন, স্বায়ত্বশাসন আমাদের হৃদয়ে গাথিয়া রহিয়াছে।" অনেক কিছু বলার আছে লক্ষ লক্ষ শোষিত-বঞ্চিত তামিল ভাষাভাষী জনগণেরও। আর হ্যাঁ, বলার আছে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষেরও। কেননা, ইন্দিরা গান্ধী না বুঝিলেও বাংলাদেশের জনগণ ইহা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেন, কেন স্বায়ত্বশাসনের দাবী উঠে। কোন অবস্থায় মানুষ স্বায়ত্বশাসনের দাবী তুলিতে বাধ্য হয়। এবং কোন্ লক্ষ্যে পৌছানোর উদ্দেশ্যে, প্রাথমিক পর্যায় হিসাবে স্বায়ত্বশাসনের দাবী তুলিতে হয়। বিগত ২২শে মে, মাদুরাইয়ের জনসভায়, স্বায়ত্বশাসন সংক্রান্ত সাংবাদিকদের প্রতিটি প্রশ্নই ইন্দিরা গান্ধী এড়াইয়া গিয়াছেন। (অমৃতবাজার–ঐ)

কিন্তু প্রশ্ন এড়াইয়া গেলেই কি প্রশ্ন ফুরাইয়া

যায়? নাকি নতুন নতুন রূপে বর্ণে বর্ণে ও গন্ধে সেই প্রশ্ন আরও শত প্রশ্নের জন্ম দেয়। ইন্দিরা গান্ধী সখেদে বলিয়াছেন, কতকগুলি প্রশ্ন কেন্দ্রের এখ্‌তিয়ারভুক্ত থাকেই। তাহার কারণ, আমরা মনে করি রাজ্য ওইগুলির টাল সামলাইতে পারিবে না। দেশে সংহতি রক্ষার জন্য কতকগুলি বিষয় কেন্দ্রের হাতেই থাকিতে হয়। এ সমস্ত বিষয় অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সেগুলি আলাদা করা যায় না। (আনন্দবাজার পত্রিকা–ঐ)

কথাগুলি, আমরা বাংলাদেশের মানুষেরা, কোথায় যেন শুনিয়াছি বলিয়া মনে হইতেছে। হ্যাঁ, এই কথাগুলিই মুসলিম লীগ নেতারা

তামিল নাড়ু স্বায়ত্বশাসনের দাবী তুলিয়াছে। ইন্দিরা গান্ধী এবারে কি করিবেন?

বলিয়াছিলেন। কহিয়াছিলেন আয়ুব খাঁ, ইয়াহিয়া-ভুট্টোর কণ্ঠেও ইহাই ধ্বনিত হইয়াছে। এখন সেই ধ্বনিরই প্রতিধ্বনি কিনা বাজিল ভারত রত্ন, নেহেরু দুহিতা, প্রিয়দর্শিনী ইন্দিরা দেবীর কণ্ঠেও। কিমাশ্চর্যম অতঃ পরম?

সত্যিই, একি কথা শুনি আজ মথুরার মুখে? বাংলাদেশের বেলায় ইন্দিরা দেবী উচ্চারণ করিতেন, পাখতুনদের বেলায় ভারত গোটা বিশ্বে খ্যাতি অর্জন করিয়াছে। আমরাও তাহাদের সেই সমর্থনে, সাহায্য আর সক্রিয় সহযোগিতায়, ধন্য হইয়াছি ঃ কৃতার্থ হইয়াছি ; কৃতজ্ঞতায় কখনও কখনও বা গলিয়াও গিয়াছি। কিন্তু আজ বঞ্চিত শোষিত জনের সেই পরম বন্ধু, দুস্থ মানবতার সেই শ্রেষ্ঠ হিতৈষী আর মানবাধিকারের সেই অকৃত্রিম সুহৃদয় কণ্ঠে একি সুর! হায়, আমাদের যে শরমে মুখ দেখানোই ভার হইতেছে! পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দের নিকট আমাদের মাথা যে কাটা যাইবার উপক্রম!!

সে যাই হোক, করুণানিধিকে কিন্তু আমাদের একান্ত আপনজন বলিয়াই মনে হইতেছে। স্বায়ত্বশাসনের স্বপক্ষে জনমত গঠনের কথা তিনি ঘোষণা করিয়াছেন। বলিয়াছেন, "তামিল নাড় আর বাংলাদেশ এক বরাবর। তামিল নাড় র লোকেরা নাকি ইতিমধ্যেই করুণানিধিকে "তামিল নাড় র শেখ মুজিব" বলিয়া ডাকিতে শুরু করিয়াছে। শুনিয়াছি, মুজিব কোট পরিহিত করুণানিধির ছবি শেখ মুজিবের ছবির পাশাপাশি ছাপান হইয়া তামিল নাড় র দেওয়ারে দেওয়ালে শোভাবর্ধন করিতেছে। আনন্দবাজার পত্রিকা পড়িয়া ইহাও জানিতে পারিয়াছি যে, সেই যুগল ছবি দেখিয়া ইন্দিরা দেবী নাকি রাগিয়া কাঁই হইয়াছেন। তাঁহার এই রাগ করুণানিধির উপরে, না শেখ মুজিবের উপরে, কে বলিবে?

করুণানিধি স্পষ্ট বলিয়াছেন, "স্বায়ত্বশাসন শব্দটি জওহলালের দেওয়া। পিতার আবিষ্কৃত শব্দের অর্থ কন্যা ইন্দিরা বুঝিতে পারিতেছেন না ইহা আশ্চার্য! আর ইন্দিরা গান্ধী বুঝিতে না পারার জন্যই তো ডি,এম,কে এই স্বায়ত্বশাসন শব্দের আলোচনার ব্যাপারে সমস্ত রাজ্যের একটি সম্মেলন আহ্বানের জন্য কেন্দ্রের প্রতি দাবী জানাইতেছে।" (আনন্দবাজার – ঐ)

ইন্দিরা দেবী এবারে কি করিবেন? তিনি না বুঝিবার ভান করিতেছেন। তাঁহার নিয়ন্ত্রিত ভারতীয় পত্র-পত্রিকাগুলি করুণানিধির পিছনে লাগিয়াছে। (আনন্দ বাজার সম্পাদকীয় দেখুন– ঐ)।

এদিকে বাংলাদেশ তাহার ঘোষিত নীতি অনুযায়ী ('যেখানে স্বাধীনতার দাবী, স্বায়ত্বশাসন ও মানবাধিকারের সংগ্রাম— সেখানেই আমরা সমর্থন দেব, সাহায্য দেব, সরকার হইলে যুদ্ধ করিব। – শেখ মুজিব।') করুণানিধিকে সমর্থন দিতে বাধ্য শেখ মুজিব

কি করিবেন, ইন্দিরা গান্ধীই বা কি করিবেন? আমরা কাহাকেও কোন পথ বাতলাইয়া দিতে চাই না। গোটা বিশ্ব লক্ষ্য করিতেছে। আমরা শুধু বলিতে চাই ঃ মন্থনে উঠেছে বিষ– পিও আশুতোষ!!

আপনার চিঠি

গরীবের বেলায় দেশ

জনাব সম্পাদক সাহেব,

কৃষি বিভাগের জনৈক নিম্ন বেতনভুক্ত কর্মচারীর দুই বছরের বকেয়া ইনিক্রিমেন্টের দাবী অর্থ দফতর দেশের বর্তমান পরিস্থিতি' দেখিয়ে দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। এতে গরীব কর্মচারীটি বরং সন্তুষ্ট। কিন্তু প্রশ্ন হলো, গরীবের বেলায় দেশ ও হোমরাচোমরাদের বেলায় অশেষ কেন? সরকারী তহবিলের অনারিয়ামের টাকা অফিসাররা বেহুদা ৩/৪ শত টাকা করে পকেটে পুরছে, টিএ,–র সেংশন জেলা অফিসে না দিয়ে বছরের শেষে ডাইরেক্টরিয়েটের কর্তারা সবই আত্মসাৎ করছে। আমরা এর উত্তর চাই।

মোঃ শওকত আলী, ঢাকা

হাউজী চলছে

জনাব সম্পাদক সাহেব,

সব জুয়ার বড় জুয়া হাউজী এখনও চলছে। এখন শহরের এখানে সেখানে আসর বসিয়ে হাউজী খেলা হচ্ছে। দারিদ্র্যের কষাঘাতে অভাবনীয় পরিবর্তনের স্বপ্নে বেঘোর হয়ে অনেকে যাচ্ছে আসরে, হারিয়ে আসছে সর্বস্ব। এটা বন্ধ করতে সরকার অপারগ কেন? ইতি–

আবদুল হামিদ, ফেরদৌস আলম, ফিরোজুল আলাম, মোঃ ইব্রাহীম, জালাল আহমদ, সিরাজুল হক, আবদুল হক, আলী মিয়া, ফজল আহমদ, র আহমদ, এফ আহমদ, জাফর আহমদ, আজিজুল হক, খাইরুল বশর, চট্টগ্রাম।

জো হুজুরী এবং শোষক শ্রেণীর দালালীর অপর নাম

মস্কোপন্থীদের রাজনীতি

কালা লাল হে

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

স্বাধীনতা উত্তর প্রথম দিনটি থেকেই সারা দেশে আওয়ামী লীগের লুটপাট সমিতি অরাজকতার সৃষ্টি করেছিলেন, স্বাধীন দেশেও ঘুষ-দুর্নীতির যে ব্যাপক প্রসার ঘটছিল এবং ভারত বাংলাদেশের দেশদ্রোহী চোরাকারবারীরা আমাদের সম্পদ ভারতে পাচার করে যে মহা সর্বনাশের সূচনা করছিল তার বিরুদ্ধে প্রথম সোচ্চার হয়েছিলেন মওলানা ভাসানীই, আর কেউ নয়। এইটেই নাকি মওলানার অপরাধ।

দীর্ঘ নয় মাসের রক্তপাত এবং পরিবর্তনও যে মস্কোপন্থীদের দালালীর অভ্যাস বদলাতে পারেনি তারা তা প্রমাণ করলেন। শুরু হলো আওয়ামী লীগ সরকারের লেজুরবৃত্তি। শুরু হলো ভাসানী বিরোধী জঘন্য অপপ্রচার। দালাল মস্কোপন্থীরা কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে বলে বসলেন ঃ মওলানা ভাসানী পাকিস্তানের বড় খেদমতগার ছিলেন, তিনি স্বাধীনতার দুশমন।

এখানেই মস্কোপন্থীদের রাজনীতির আসল চেহারা। তিরিশ লাখ লোক শহীদ হয়েছেন কিন্তু সাড়ে সাত কোটি এখনো বেঁচে আছেন। স্বাধীনতার আহ্বান প্রথম কে দিয়েছিলেন? মওলানা ভাসানী, শেখ মুজিব না মোজাফফর সাহেব অথবা আন্ডারগ্রাউন্ড কমিউনিস্ট দাদা মনিসিং? এরা যখন পাকিস্তানী জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে বাজিমাত করার কম্পিটিশনে নেমেছিলেন তখন মওলানা ভাসানী– একমাত্র মওলানা ভাসানীই স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানানোর জন্যে এই বৃদ্ধ বয়সেও বাংলার গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে বেড়িয়েছেন। মস্কোপন্থী বড় বড় স্বাধীনতা সংগ্রামীরা ডিগবাজী খেয়ে অথবা উল্লম্ফন দিয়ে নির্লজ্জের মত সব কিছু উল্টিয়ে দেয়ার অপচেষ্টা করতে পারেন– ভাবতে পারেন জনতাও ভুলে গেছে, কিন্তু ইতিহাস সব কিছু লিখে রাখে। কত বেশী বিকৃত মস্তিষ্ক হলে অথবা কুল রক্ষায় হাবুডুবু খেতে থাকলে যে মানুষ এত বড় জঘন্য মিথ্যে প্রচার করতে পারে, মস্কোপন্থী দালাল রাজনীতিবিদরাই তার জীবন্ত প্রমাণ।

মওলানা ভাসানী রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কৃতি ছাত্রও নন, যুগ যুগ আন্ডারগ্রাউন্ড থেকে রাজনীতির গৌরবময় অতীতও তাঁর নেই, কিন্তু সফল সংগ্রামের ইতিহাস তাঁর আছে। মওলানা নাকি স্বাধীনতা যুদ্ধের দিনগুলোতে আরামে কাটিয়েছেন। এ প্রশ্নের সঠিক জবাব নিশ্চয়ই মস্কোপন্থীদেরও জানা ছিল। মওলানা বলতে চাননি এরাই বলিয়েছেন ঃ একজন বন্দী কিভাবে অংশ নেবেন? তবু তো মওলানা ভাসানী এই বীর সেনানীদের মত জনগণকে যুদ্ধের ভয়াবহতার মধ্যে ফেলে রেখে মস্তোতে হাওয়া খেতে যাননি।

পাকিস্তানী বন্ধুদেরকে এরা ভুলতে পারেননি। তাই মওলানা ভাসানীর বিদ্রোহী কণ্ঠকে স্তব্ধ করার খায়েশে তারা সম্পূর্ণ পাকিস্তানী কায়দায় আক্রমণ শুরু করেছেন। তারা বলেছেন ঃ মওলানা নাকি স্বাধীনতা নস্যাত করতে চান– তিনি নাকি রুশ-ভারতের সাথে মৈত্রীর বন্ধন নষ্ট করতে চান। আমাদের সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্যে মওলানা ভাসানী ভারত এবং রাশিয়ার সরকার ও জনগণের প্রতি বারবার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন– এখনো করছেন। মওলানা বলেছেন ঃ তিনি দেশ-বিদেশের নির্যাতিত জনগণের সংগ্রামী ঐক্য চান– চান সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মহান ঐক্য। কিন্তু তাই বলে তিনি অন্যায়ের পক্ষ সমর্থন অতীতের মত ভবিষ্যতেও করবেন না। আর এখানেই মস্কোপন্থীদের গোস্বার কারণটি। ঘুষ-দুর্নীতি, লুটপাট, স্বজনপ্রীতি আর চোরাকারবারের বিরুদ্ধে মওলানার কণ্ঠ সোচ্চার হওয়ার সাথে সাথে এরা তাঁর দেশপ্রেমের অভাব আবিষ্কার করলেন, আবিষ্কার করলেন মিত্র দেশ দুটির বিরুদ্ধে চক্রান্ত। কিন্তু চোরাকারবার কি করে মৈত্রী স্থায়ী করতে পারে? এর ফলে দু'দুশের জনগণের মধ্যে প্রথমে ভুল বোঝাবুঝির শুরু হয়, পরস্পরের প্রতি সন্দিহানই করে তোলে এবং পরিণামে স্থায়ী শত্রুতার সৃষ্টি হয়। তাই মওলানা চোরাকারবারের বিরোধিতা করেছিলেন, চোরাকারবারীদের শাস্তি দাবী করেছিলেন। কিন্তু মস্কোপন্থীরা যথারীতি বিরোধিতা করলেন, ভারত এবং প্রভুদেশ রাশিয়ার সাথে মৈত্রীর দোহাই পেড়ে বরং তারা চোরাকারবারীদেরকেই সাহায্য করলেন। উৎসাহী চোরাকারবারীরা আরো বেশী উদ্যমে মাল পাচার করে বাংলাদেশের জনগণকে সর্বনাশের পথে ঠেলে দিতে থাকলো।

মওলানা ভাসানীর সোচ্চার কণ্ঠের ফলে চোরাকারবার বিরোধী প্রবল জনমতের দাপটে এখন তাই মস্কোপন্থীদেরকেও মুখ খুলতে হয়েছে। প্রথম দিকে মওলানা ভাসানীকে দোষ দিতে গিয়ে চোরাকারবারের সত্যতাই অস্বীকার করেও এখন যখন তারাই আবার চোরাকারবারের বিরুদ্ধে কথা বলেন, তখন যথেষ্ট হাসির খোরাক জোটে বৈকি!

ঘুষ-দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি এবং লুটপাট সমিতির বিরুদ্ধেও যখন মওলানা ভাসানী প্রতিবাদ করেছেন, তখনো এরা যথানিয়মে আওয়ামী লীগের ধামা ধরেছেন। তারা বলেছেন ঃ স্বাধীনতা নস্যাতের উদ্দেশ্যেই নাকি মওলানা

এসব কথা বলেছেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বড় বড় পণ্ডিত হলেও দালালীর প্রয়োজনে এই মস্কোপন্থীরা গণতন্ত্রের অন্যতম স্তম্ভ বিরোধী দলের কথাও বেমালুম ভুলে গেছেন। যে কোন সচেতন ব্যক্তিই স্বীকার করবেন ঃ মওলানা ভাসানী যদি মস্কোপন্থীদের সাথে সুর মিলিয়ে নির্লজ্জের মত দেশপ্রেমের নামে অন্যায়ের সমর্থন করতেন, আর সরকারের দালালীতে মেতে উঠতেন, তাহলে ঘুষখোর এবং দুর্নীতিবাজ অফিসার, মন্ত্রী, এমসিএদের দৌরাত্ম্যে আর লুটপাটের বাড়াবাড়ির ফলে দেশ আজ কোন অবস্থায় পৌঁছে যেতো। মজার ব্যাপারটি হলো ঃ সেই মস্কোপন্থীরাও এখন পজিশন রক্ষার্থে ঘুষ-দুর্নীতির বিরুদ্ধে

নিজেরা না পেরে শেষে এরা ভাসানী বিরোধী অপপ্রচারের জন্যে ভারত থেকে রাজেশ্বর বাবুদের আমন্ত্রণ করেছিলেন

কথা বলতে শুরু করেছেন। কি আশ্চর্য ভঙ্গুর এদের রাজনৈতিক বক্তব্য, কত সংকীর্ণ এদের রাজনীতির পরিসীমা।

দালালী করতে গিয়ে বারবার ব্যর্থ হয়ে শেষে মস্কোপন্থীরা নতুন পথ উদ্ভাবন করলেন ঃ আমন্ত্রণ করলেন তাদের ক'জন ভারতীয় পরামর্শদাতাদের। স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহায্যদানকারী ভারতের দালাল নেতাদেরকেও বাংলাদেশের জনগণ অন্ধ ভক্তি করবে এই–ই ছিল এদের দুরাশা। বাংলাদেশে ডুবন্ত স্বগোত্রিয়দের উদ্ধারের উদ্দেশ্যে এলেন ভারতের মস্কোপন্থী কমিউনিস্ট পার্টির যে তিন নেতা তাদের প্রধান ছিলেন সর্বশ্রী রাজেশ্বর রাও।

দেশে ফেরার আগে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বাবু রাজেশ্বর রাও আন্তর্জাতিক রীতি-নীতি এবং শালীনতার তাল হারিয়ে বলে বসলেন ঃ মওলানা ভাসানী স্বাধীনতার বিরুদ্ধে চক্রান্ত

করছেন।

মস্কোপন্থী বন্ধুদের আমন্ত্রণে আসলেও রাজেশ্বর বাবুর মনে রাখা দরকার ছিল যে তিনি দিল্লীতে বসে ইন্দিরা গান্ধীর দালালী করছেন না– তিনি কথা বলছেন স্বাধীন সার্বভৌম একটি দেশের রাজধানীতে বসে এবং সেই দেশেরই একজন জনপ্রিয় নেতার প্রতি মারাত্মক কটাক্ষ হেনে। মস্কোপন্থীদের আন্তর্জাতিক কর্তব্য অনুযায়ী নিজের দেশে কংগ্রেস সরকারের সর্বকর্মে দালালীতে অভ্যস্ত এই তথাকথিত কমিউনিস্টটি মওলানা ভাসানীর সমালোচনা করতে গিয়ে বাংলাদেশের সংগ্রামী জনগণের প্রতিই অবহেলা দেখিয়েছেন। কে মিত্র আর কে শত্রু, কখন কার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়, হাতিয়ার তুলে খতম করতে হয়, তা এদেশের বিপ্লবী জনতা শুধু জানেনই না, রাজেশ্বর বাবুদের মত নির্লজ্জ দালালদেরকে শিখিয়ে দেয়ার মত প্রজ্ঞাও রাখেন। বাংলাদেশের জনগণ তো বিগত তেইশ বছরে কত সংগ্রামের ইতিহাস তৈরী করলেন, রাজেশ্বর বাবুরা সে সময়ে ভারতে দালালী করা ছাড়া আর কি করেছেন? মস্কোপন্থীদের যে লজ্জার ল-টা পর্যন্ত নেই, এই ভারতীয় দালাল-রাজনীতিবিদটি সে কথাই আর একবার প্রমাণ করেছেন। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশে বেড়াতে এসে এদেশেরই সংগ্রামী জননেতার বিরুদ্ধে কুৎসা রটিয়ে বক্তৃত রাজেশ্বররাও অমার্জনীয় ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেছেন। তার বক্তব্যে মনে হয়েছে যেন বাঙালীরা তাদের নির্দেশ মেনে চলার জন্যই জন্ম নিয়েছে, দেশবাসী যেন স্বাধীন নয়–পরাধীন। তিরিশ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত বাংলাদেশের স্বাধীনতা নস্যাত করার হীন চক্রান্তে কেউ মেতে উঠলে বীর জনতাই তা প্রতিহত করবেন– কোন দালালকে সে জন্য উপদেশ দান করতে হবে না। রুশ-ভারতের প্রতি কৃতজ্ঞতার নামে তাদের মত অন্ধ দালালী না করলেই কি মওলানা ভাসানী স্বাধীনতার শত্রু হয়ে পড়বেন? আর তাও যদি হয়, তবু সে কথা একজন বিদেশী হয়ে রাজেশ্বর বাবু কোন অধিকারে বলার স্পর্ধা দেখিয়েছেন? স্পর্ধার সীমা থাকা দরকার নাহলে, তরুণ কৃষক নেতার মত আমরাও বলবো ভারতের মহান জনগণ আমাদের বন্ধু কিন্তু সেই দোহাই দিয়ে বাঙলাদেশের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে নাক গলাতে আসলে বাংলার মাটিতে পা রাখতে দেবে না দিল্লীতে ফিরে যেতে হবে।

নির্লজ্জের মত যারা বিদেশীদের ডেকে এনে দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ দিয়ে জাতির সার্বভৌমত্বের ওপর আঘাত হানে, সেই মস্কোপন্থীরাই আবার যখন দেশপ্রেমের বড়াই করেন, তখন শুধু হাসি নয়, ক্রোধেরও উৎপত্তি হয়। তবে, আশার কথা সময় ঘনিয়ে আসছে। অন্যান্য সকল কিছুর মত দালালীরও সীমা আছে, পরিণতি আছে।

(চলবে)

সাংবাদিক সমাজ ও দিগগজ সাংবাদিকটিকে

জনাব ইরফানুল বারীকে গ্রেফতারের পর সাংবাদিক সমাজের কুম্ভকর্ণের সুসুপ্তি আমাকে ব্যথিত করেছে, বোধহয় সংবাদপত্রের প্রবীণ পাঠক এবং সাংবাদিক মহলের সাথে জানাশোনার কারণেই আমি এ ব্যাপারে ব্যথিত।

এদিকে আরেক দিগগজ সাংবাদিক আবদুল গাফফার চৌধুরী তাঁর শেষ আশ্রয় হিজরত করা শ্লোগান মার্কা পত্রিকা 'জয়বাংলা' থেকে গলা বাড়িয়ে সরকারের কোপানলে পতিত 'হক-কথা' ও এর সম্পাদকের ব্যাপারে শালীনতা বর্জিত গালাগালিতে নেমেছেন, তাঁর বর্তমান প্রভুর (যিনি নাকি বিজ্ঞাপন ম্যানেজারও– মতান্তরে) দফতরের অপকীর্তিকে ঢাকা দেবার মানসে। সর্বত্র তাড়া খাওয়া ও অবমাননাকর পন্থায় বিতাড়িত এই দিগগজ কলামিস্ট তার শেষ আশ্রয়টিকে আঁকড়ে ধরার জন্য দালালীতে নেমে বিলিয়ে দিতে দিতে, খুলতে খুলতে সব খুলে হর্ষবর্ধন হবেন তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কিন্তু শালীনতার প্রবক্তা দিগগজটি একজন পত্রিকা সম্পাদককে 'গবর্ধন' ইত্যকার শব্দ প্রয়োগ করবেন এটা বিস্ময়কর। তাঁর কথা দিয়েই তাঁকে প্রশ্ন করছি, এগুলি "সাংবাদিকতা না ইতরামী"?

পয়গামের মত কুখ্যাত কাগজের সার্কুলেশনের কেরানী 'হক-কথা'র সম্পাদক হয়েছেন এ অলীক অভিযোগ তাঁর ঐ কুখ্যাত কাগজে ইত্তেফাক, পূর্বদেশ, দৈনিক বাংলার বিশিষ্ট সাংবাদিকরা কাজ করে গেছেন, শুনেছি এই দিগগজটিও পয়গামে যাবার জন্য ছিলেন এক পায়ে খাড়া। কুখ্যাত খসরু মিয়া পয়সাটা বাড়িয়ে দিয়ে আরেকবার সাধলেই সুড়সুড় করে তিনিও ঢুকে পড়তেন। অবশ্য কর্মরত সাংবাদিকদের মতামত নিতে গিয়ে গিগগজের জনপ্রিয়তা দেখে খসরুকে পিছু হটতে হয়েছিল। আজ তিনি যে সাপ্তাহিকে কাজ করছেন কাল জনগণ এটাকে পয়গামের মতই যে ঘৃণ্য ভাববে, ইতিমধ্যে দ্বিতীয় পয়গাম বলে এর আখ্যাও হয়ে গেছে তখন দিগগজ কি বলবেন? প্রফেশনের খাতিরে? তবু আজ তাঁর সৃষ্ট বুমেরাং সেদিন তাকেই ঘায়েলের ধার রাখবে। মগজ আছে বিক্রি করুন, নীলামে চড়ান কিন্তু 'ইতরামীতে' যাবেন কেন?

খোঁজ নিয়ে জানলাম, মফস্বল সম্পাদক থেকে সহকারী সম্পাদক অবধি বিভিন্ন স্তরে কাজ করেছিলেন ইরফানুল বারী। তিনি সার্কুলেশনে ম্যানেজার হলে তাতেই বা কি? মানিক মিয়া,

ঢাকার সুন্দরতম দৈনিকের বার্তা সম্পাদক ও পরে সম্পাদক– তাঁরা কি ছিলেন? তাঁরা কি সাংবাদিকতায় শীর্ষস্থানীয় হননি? বস্তুত দালালীতে শরীর পচালে কি হবে, 'বিদ্যার গম্যিটার' কথা দিগগজ ভুঁলতে চান না।

জনাব বারী মোনেম খানের আত্মীয় দিগগজের হীন আবিষ্কার। শেরে বাংলার পুত্রও দালালী করেছে। অত্যাচারী সামন্ত প্রভুর'নেক' নজরে পড়া দাসী 'নজর' বানুর গর্ভে জন্মগ্রহণকারী ব্যক্তিও ভাল মানুষ। নিকট আত্মীয়তা সত্ত্বেও এরূপ ব্যতিক্রম যদি সম্ভব হয়, তবে কোন কুখ্যাত ব্যক্তির দূর সম্পর্কের আত্মীয়রা সবাই জাহান্নামগামী হবে দিগগজের এ তত্ত্বও কি 'শিশুপাঠ্য' নয়?

পাঠকের অভিমত

ঘরোয়া দফতরের সাথে অহর্নিশ যোগাযোগ, প্রভুর পদপ্রান্তে বসে কল্কে প্রস্তুতকারী এই ব্যক্তিটি এডিটরিয়েল লিখতে লিখতে 'এই মাত্র খবর পেলাম' ট্যান্ট দিয়ে ইরফানুল বারীর গ্রেফতার এবং তাঁকে যে মিথ্যা অভিযোগে গ্রেফতার করা হবে তার নীল নকশা প্রভুর মুখে শুনে "জানি না নয় মাসের ঘটনার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে কিনা" বলে ষড়যন্ত্রের আগাম আভাস দিতে পারবেন তা আমরা জানি।

যারা দুই রিম কাগজে হণ্ডা কাবার করে, এ ধরনের পত্রিকার দিগগজরা 'হক-কথা'র জনিপ্রয়তা ও গণসমর্থন দেখে ঈর্ষান্বিত হবেন এবং একে তৃতীয় শ্রেণীর ব্যবসা বলে প্রচার করবেন তা বিচিত্র কি?

প্রভু সরকারের কুকুরটির সামনেও নতজানু হয়ে 'আপনি হুজুর, আমার মনে হয় হুজুর, ভুলচুক হতে পারে হুজুর, ভুলচুক হলে গোস্তামবী মাফ করবেন হুজুর, আপনার ভালোর জন্য হুজুর, আপনার অমঙ্গল কি চাইতে পারি হুজুর, পরিস্থিতির কারণে হুজুর, অতি বিনীতভাবে নিবেদন করছি হুজুর, আপনার পাগুলি খুব সুন্দর এবং উপকারী হলেও হুজুর এই আর কি, মাঝে মধ্যে, অবশ্য খুব কদাচিৎ হুজুর, যাদের খামচায় হুজুর তারাও বদ হুজুর, নিশ্চয়ই হুজুর, তবু হুজুর গণতন্ত্রের খাতিরে' এই হচ্ছে খ্যাতিনামা (কীর্তিমান) কলামিস্টদের এমসিএ কুলের কঠোর সমালোচনার ধরন। গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভকে ভয় নামক উই-এ যখন খেয়ে সেরেছে, তখন জনগণের সোচ্চার কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি হয়ে বেরিয়েছে 'হক কথা'। তথ্য মন্ত্রী সাংবাদিকদের সমবেত করে মিথ্যা লিখুন, অল্প লিখুন বলে প্রত্যক্ষ চপেটাঘাত করে গেলেও এরা হাসেন প্রভু তবু স্মরণ করেছেন এ ধরনের আহ্লাদে। এরাই বাঁচাবেন চতুর্থ স্তম্ভকে?

জনতার অংশ হিসাবে আমাদের রায়, 'হক-কথা' নিরভরণ, নিরলঙ্কার, সরল, অকপট হতে পেরেছে বলেই জনতার কাছে তার সমাদর সচেতন, জনতা সুচারু নিক্কন লালিত শব্দ চায় না, বা গা চাটার কৌশল আর দেখতে চায় না, প্রত্যক্ষ ভাষার আজ তারা সত্য জানতে চায়।

দু-একখানা অবহেলিত কাগজ সংশয়ের মধ্য দিয়ে হলেও 'হক-কথা' সম্পাদককে গ্রেফতারে প্রতিবাদ করেছেন, তাদের প্রতি জনতার শ্রদ্ধা থাকবে।

– আরশাদ হোসেন, ঢাকা

নির্দোষ ব্যক্তিদের সাজা যেন না হয়

॥ আবদুল হামিদ খান ভাসানী ॥

যুগে যুগে ধর্মের নামে বিভিন্ন দেশে সাধারণ মানুষকে নানা প্রকার ধোঁকা দিয়া ধর্মীয় পুরোহিত, মোল্লা, ভণ্ডপীর সাজিয়া অসংখ্য অসাধু ব্যক্তি গণমানুষকে শোষণ করিয়াছে। অন্যদিকে, সত্যিকার ধার্মিক ধর্মপ্রচারকগণও অত্যাচারী শাসক ও শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে জেহাদ করিয়া নানাভাবে নির্যাতন ভোগ করিয়াছে। বহু আদর্শবাদী ধর্মপ্রচারক ও সমাজ সংস্কারক জালেমের অমানুষিক অত্যাচারে প্রাণ হারাইয়াছে, বৎসরের পর বৎসর নির্জন কারাগারে বাস করিয়াছে ইহা সবাই অবগত আছেন। একমাত্র অখণ্ড ভারতেই মওলানা আবুল কালাম আজ্জাদ, মওলানা হোসেন আহমদ মাদানীত, মওলানা কেফায়েতুল্লা মুফতী, মওলানা আবদুল্লাহেল কাফী ও মওলানা আবদুল্লাহেল বাকী, মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, মওলানা আকরম খাঁ, মওলানা আজ্জাদ সোবহানী, মওলানা শরিফতুল্লাহ্, পীর বাদশা মিয়া, মওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধী, মওলানা সৈয়দ আহমদ বেরলভী, মওলানা আবদুল হক দেহলভী, মওলানা জামাল উদ্দিন আফগানী, মওলানা হসরৎ সোহানী, মওলানা মোহাম্মদ আলী ও শওকত আলী প্রমুখ হাজার হাজার নায়েবে রসুল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল সংগ্রাম করিয়া নির্জন কারাগারে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন এবং অনেকেই বাড়ীঘর সর্বস্ব হারাইয়া সর্বস্বান্ত হইয়াছেন। তাই মওলানা, মৌলবী অথবা পীর শ্রেণীর সকলেই ধর্মের নামে জনসাধারণকে ধোঁকা দিয়া নিজেদের ভোগ বিলাসপূর্ণ করে ইহা মোটেই সত্য নহে। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল দলের সকল মতের মানুষের ভিতর সৎ ও অসৎ লোক বিদ্যমান ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।

যে সমস্ত মৌলবী, মওলানা স্বৈরাচারী বর্বর পাঞ্জাবী সৈন্যদের সহিত হাত মিলাইয়া স্বাধীনতার বিরুদ্ধে নানারূপ মিথ্যা প্রচার, মুক্তিবাহিনীকে হত্যা, মানুষের বাড়ীঘর জ্বালাইয়া দেওয়া, নারী ধর্ষণ প্রভৃতি জঘন্য কাজে সহযোগিতা করিয়াছে তাহাদের অপরাধ কিছুতেই মার্জনীয় নহে। কিন্তু পাইকারীভাবে সমস্ত মৌলবী, মওলানাকে দালাল শ্রেণীতে ভুক্ত করিয়া বিনা বিচারে বিনা অপরাধে শাস্তিদান মোটেই কোন সভ্য সরকারের উচিত হইবে না। আশা করি, বাংলাদেশ সরকার নির্দোষ ব্যক্তিদিগকে যত শীঘ্র সম্ভব মুক্তি প্রদান করিবেন।

মুরিদের দরবার

শিক্ষা ব্যবস্থা প্রসঙ্গে

মোহাম্মদ হোসেন

॥ ২ ॥

মুসলিম শিক্ষার বদৌলতেই আজকের জগত

শিক্ষা পদ্ধতি যারা নিরূপন করবেন তাদের পূর্ণ স্বাধীনতার দরকার অপরিসীম। এদের উপর দেশের শাসক-প্রণালী যাতে অযথা প্রভাব বিস্তার করতে না পারে তার নিশ্চয়তার প্রয়োজন। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের শিক্ষাদাতা হচ্ছেন দেশের শাসকবর্গ। ইচ্ছার স্বাধীনতা ব্যতীত কোন প্রতিষ্ঠানই তার দায়িত্ব সুসম্পন্ন করতে পারে না। তারই অভাব হেতু সুশিক্ষার পরিপন্থী অনেক কিছুই শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রয়োগ হতে চলছে।

আমরা মুসলমান। আমাদের অতীত ইতিহাসের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ইত্যাদির কোনটিই পৃথিবীর অগ্রগামী দেশগুলোর তুলনায় কোন অংশে কম ছিল না– বরং অনেকাংশে ছিল বেশীই। খোলাফায়ে রাশেদীনের সময় মুসলমানদের জীবনবোধের পূর্ণ বিকাশ হয়েছিল। তারপর থেকেই তাদের অগ্রগতি অন্যদিকে ধাবিত হয়। তথাপি ইতিহাস প্রমাণ করে আজকের

সভ্যতার জন্মদাতা মুসলমানেরা। মধ্য যুগে এই মুসলিমরাই এক নতুন সংস্কৃতি ও সভ্যতা গড়ে তোলে। শুধু তাই নয়, প্রাচীন গ্রীক সভ্যতা যখন বিলুপ্তির পথে তখন মুসলিম মণীষীগণ ইহা সংরক্ষিত রাখেন। জগতের শ্রেষ্ঠ সভ্য জাতি হিসেবে এই সময় তাদের সুনাম পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বিদ্যার্থীরা কায়রো, বাগদাদ, কর্ডোভা প্রভৃতি মুসলিম শিক্ষা কেন্দ্রে অধ্যয়নের জন্য আসত এবং ইউরোপের সর্বত্র তাদের জ্ঞানভাণ্ডার নিয়ে যেত। খ্রীস্টান জগত মুসলিম সভ্যতার দ্বারাই উজ্জ্বল হয়। আল-রাজী, ইবনেসিনা, ইবনে রুশদ, ইবনে খলদুন, আল-বেরুনী প্রমুখ মুসলিম মণীষী ইউরোপের নব-জাগরণে আধুনিক সমাজকে উদ্বুদ্ধ করে তোলেন। এই জন্যই ঐতিহাসিক এম এন রায় বলেছেন, 'Europe and the modern world is the child of Renaissance whose father the muslims decidedely were'—A Survey of world history.

অর্থাৎ ইউরোপ ও আধুনিক জগত সেই রেনেসাঁর সন্তান, যার জন্মদাতা নিঃসন্দেহে মুসলমান। কিন্তু আজ আমাদের সেই অতীত ঐতিহ্য বিলুপ্তির পথে। তার প্রধান কারণটি হলো আমাদের স্ব-ঐতিহ্য বহির্ভূত শিক্ষা ব্যবস্থায় মানুষ তৈরীর পন্থা নেই। ফলে তারা মনুষ্যত্ব অর্জনে অক্ষম।

শিক্ষার দু'টি দিক থাকার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। এক– বাস্তব জগত সম্পর্কে, দুই–অন্তর্জগত সম্বন্ধে। অর্থাৎ শুধু বস্তুবাদ অথবা ভাববাদকে চরম না ভেবে এই দুইয়ের ভিতর সমন্বয় সাধন করা। তাছাড়া নিজ নিজ ধর্মানুযায়ী যাতে শিক্ষার্থীরা গবেষণামূলক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে পারে তার ব্যবস্থা থাকার একান্ত দরকার রয়েছে। মূলতঃ তাদেরকে ধর্মের আধ্যাত্মিক দিকটির প্রতি আকৃষ্ট করতে পারলে শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ রূপ নেবে। বার্টণ্ড রাসেল বলেছেন ঃ "শিক্ষা সংস্কৃতির উদ্দেশ্য হওয়া উচিত আত্মার মহত্বে মানুষকে বিশ্বাসী করে তোলা। যে শিক্ষা তা করে না সে শিক্ষা ব্যর্থ–তা দিয়ে আত্মরক্ষার ফন্দি ফান্দি শেখান গেলেও আত্মবিকাশের প্রয়োজনীয় জীবনতত্ত্ব শেখান যায় না। যাতে চরিত্র গঠন হয়,মনের ও আত্মার শক্তি বাড়ে, শুভ বুদ্ধি ও সাহসের উন্মেষ ঘটে, শিক্ষার্থী নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে পারে তেমন শিক্ষাই আমাদের কাম্য। শিক্ষা হচ্ছে মানুষের ভিতর যে পূর্ণতা প্রথম থেকেই বিদ্যমান, তারই প্রকাশ।" কিন্তু আমাদের জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থায় সেইরূপ অনুকূলতা নেই যাতে বিদ্যার্থীরা সত্যি সত্যিই মিথ্যার প্রতি বিতৃষ্ণ আর সত্যের প্রতি সক্রেটিসের মতই অনুরাগী হবে।

তার কারণ চরিত্রহীন লোক দ্বারা মানব কল্যাণের সুষ্ঠু ও সুন্দর বিকাশ সম্ভব নয়। চরিত্র হচ্ছে তপস্যার জিনিষ। মুখে মুখে চরিত্রবান কথাটি উচ্চারণ করা যত সহজ এর অধিকারী হওয়া তত সহজ নহে। এর অধিকারী হওয়াটা বড়ই কষ্টের ও সংযমের ব্যাপার। যে জাতির চরিত্র যত শুদ্ধ তার মনুষ্যত্বের বিকাশও ততই উন্নত। আর সেই জাতিই জাগ্রত জাতি। তাই আমাদের দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের ডিগ্রীর প্রতি লালায়িত না করে চরিত্র তৈরীর প্রতি উদ্দীপিত করলে তাদের কল্যাণ হত সব চাইতে বেশী।

যে সব শিক্ষকদের উপর ছাত্র-ছাত্রীদের মানুষ করার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে তারা যেন শুধু প্রয়োজনের তাগিদে এই কাজে নিয়োজিত্ না হন। আর তারা যেন সত্যি সত্যিই এই ব্যাপারে পারদর্শী ও চরিত্রবান হন এবং বিদ্যার্থীদের নিকট অকপটে একটা জিনিষের বাহ্যিক ও অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেন তার প্রতি শিক্ষা কর্তৃপক্ষের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে বাহুল্য বই পড়ে অন্তরকে

কলুষিত না করে এবং চরিত্র গঠনের সহায়ক কতকগুলো সুনির্দিষ্ট বইয়ের যথার্থতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় তার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। অবশ্য শিক্ষা কর্তৃপক্ষকেও আবার শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ পারদর্শী ও চরিত্রবান হতে হবে।

আমার মনে হয়, পারিবারিক দায়িত্ব মুক্ত উদারচেতা ইসলামের আদর্শ ও মানবতাবোধে উদ্দীপিত চরিত্রবান শিক্ষকদের দ্বারাই এমন একটি অতুলনীয় মহৎ কাজ সুসম্পন্ন সম্ভব।

পবিত্র ওরস শরিফ

স্থান ঃ সন্তোষ, তারিখ, ৩১শা শ্রাবন, বুধবার

হযরত খাজা মঈন উদ্দিন চিস্তীর (রাঃ) প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন।

মুসলমান জাতির অতীত ইতিহাস নির্মুল হইতে বসিয়াছে। একতা ও চরিত্র হারাইয়া ধ্বংসের পথে পতিত। তাই দলে দলে উক্ত পবিত্র ওরস শরীফে যোগদান করিয়া শপথ গ্রহণ করুণ, আমরা আল্লাহ, রসুলের বিধি নিষেধ বর্ণে বর্ণে পালন করিব। কোরআন হাদিস ফেকা ইত্যাদি ধর্মীয় শাস্ত্র প্রত্যেক মুসলমান যাহাতে পাঠ করিয়া খাটি মুসলমান হইতে পারে তজ্জন্য প্রত্যেক মসজিদে মক্তব খুলিয়া সন্তান-সন্ততিদিগকে শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করিব। বাংলাদেশের শতকরা ৮৬ জন মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও আজ তাহারা পথের ফকির। কাপড়ের অভাবে কচু-ঘেচু, কচুরী পানার ডাটা সিদ্ধ করিয়া খাইতেছে। কাপড়ের অভাবে ছিড়া খেতা চট পরিধান করিয়া, মেয়েরা লজ্জা নিবারন করিতেছে। আর বিলম্ব করিলে চলিবে না। সবাইকে একতাবদ্ধ হইয়া গ্রামের মসজিদকে পুনরায় দ্বীন ও দুনিয়ার প্রধান কেন্দ্র বানাইতে হইবে। শুধু জুম্মার নামাজ পড়িয়া মসজিদ হইতে বাহির হইয়া আসিলে চলিবে না বাংলাদেশকে সুখী ও সমৃদ্ধশালী করিয়া গড়িয়া তুলিতে কৃষি, কুটির শিল্প, মৎসের চাষ ইত্যাদি বিষয়ে নামাজ প্রত্যেক শুক্রবার যাহাতে গ্রামের সমস্ত মুসলমান জুম্মার শরীক হইয়া নামাজান্তে মসজিদ প্রাঙ্গণে সভা করিয়া বাস্তব কর্মসূচী গ্রহণ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। জুম্মার খুৎবাতে আল্লাহ রসুল ও বুজর্গানেদিগের আদেশ নিষেধসহ রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ ব্যবস্থার আমূল সংস্কার বিষয় বস্তু যাহাতে খুৎবার জরিয়াতে প্রত্যেক মুসলমান অবগত হইয়া নিজ নিজ কর্তব্য পালন করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সরকারী বেসরকারী দমননীতি ও অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে সকলে একতাবদ্ধ হইয়া নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে জেহাদের প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে। আল্লাহর ভয় ব্যতীত সমস্ত ভয় পরিত্যাগ করিয়া কাজে নামিতে হইবে। উক্ত ওরষ শরীফের তারিখে বাংলাদেশের ৬২ হাজার গ্রামে কিভাবে বাংলা খুৎবা প্রচার করিয়া মুসলমান সমাজকে একতা বদ্ধ করা যায় তজ্জন্য বিশেষভাবে কর্মসূচী গ্রহণ করিতে হইবে। একতাবদ্ধ হইতে না পারিলে চতুর্দিকে হইতে মুসলমানদিগকে নির্মূল করিবার জন্য যে ভীষণ ষড়যন্ত্র আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে মুসলমানদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে। আমার এই ইশতেহার আপনারা প্রত্যেক পাঠ করিয়া নিজ নিজ এলাকায় ঢোল সহরৎদিয়া পবিত্র ওরস শরীফের প্রচার করিলে ব্যধিত হইব। ওরস শরীফে দুরদেশ হইতে যাহারা উপস্থিত হইবে তাহাদের খাবার ব্যবস্থা করিতে চাল, ডাল, গরু, বকরী, খড়ি, পাতা যে যাহা পারেন সংগ্রহ করিয়া লইয়া আসিবেন।

মোঃ আবদুল হামিদ খান ভাসানী
২৮/০৬/৭২

চা বাগানে আদার চাষ

চট্টগ্রাম। পটিয়া চা বাগানের বর্তমান ম্যানেজার বাগানের মূল্যবান গাছ কেটে আওয়ামী লীগ কর্তাদের নজরানা দিচ্ছেন।

শ্রমিকরা যখন ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করছে, তখন ইনি চা বাগান কেটে আদার চাষ শুরু করেছেন। দখলদার আমলে গোপন পথে এসে এই লোক স্বীয় ভ্রাতা বসেছিলেন রাজাকার কমান্ডারকে দিয়ে ম্যানেজারের গদীতে। চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক এ চা বাগানের দায়িত্বে থাকলেও তাঁর ব্যস্ততার সুযোগে দালার ম্যানেজারটি সব কিছু লোপাট করে দিচ্ছে।

সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করছে কারা ?

গত ১৬ জুন জনৈক এমসিএ ও চা শ্রমিক লীগ নেতা শ্রীমঙ্গলের রাজঘাট চা বাগানে ইউনিয়ন গঠন করতে যান। সেখানকার প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়নের কর্মী শ্রী রাজেন্দ্র পেনাজ তাদের বাধা দেন। বাকবিতণ্ডার পর এমসিএ সাহেব সাম্প্রদায়িক উস্কানী দিয়ে সেখান থেকে কেটে পড়েন। পরে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা এত চরম মাত্রায় পৌঁছে যে শ্রীমঙ্গল থানার পুলিশ অফিসার বহু চেষ্টার পরও পরিস্থিতি আয়ত্তে আনতে পারেননি।

ন্যাপকর্মী নিহত

যশোরের মহেশপুরে দুর্বৃত্তদের গ্রেনেড নিক্ষেপের ফলে পুবনদরপুরের ন্যাপকর্মী খান ইমামুল ইসলাম শান্তি নিহত হয়েছেন। স্থানীয় রিলিফ চেয়ারম্যানের দুর্নীতির বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার প্রতিবাদ জানানোর দিনেই দিবাগত রাত্রিতে তাঁর উপর আক্রমণ চালানো হয়।

বাংলা ছাত্র ইউনিয়নের জনসভায় 'হক-কথা' সম্পাদকের মুক্তি দাবী

সম্প্রতি নাগরপুর যদুনাথ স্কুল প্রাঙ্গণে থানা বাঙলা ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে এবং আমিনুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় দেশের বর্তমান পরিস্থিতির উপর বক্তৃতা করেন জনাব মাহবুব উল্লাহ, নূর মোহাম্মদ খান, আতোয়ার রহমান, জনাব গোলাম কিবরিয়া, খন্দকার মোছা চৌধুরী এবং অন্যান্য ন্যাপ ও যুবলীগ নেতৃবৃন্দ।

জনাব মাহবুব উল্লাহ তার বক্তৃতায় খাদ্যশস্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ঊর্ধ্বমূল্যের সমালোচনা করেন এবং 'হক-কথা' সম্পাদকের গ্রেফতার প্রসঙ্গে বলেন 'প্রধানমন্ত্রী দুর্নীতিপরায়ণ এমসিএদের জ্যান্ত কবর দেয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন কিন্তু যখন 'হক-কথা' সম্পাদক জনাব ইরফানুল বারী সেই সকল দুর্নীতিপরায়ণ এমসিএদের কার্যকলাপের সমালোচনায় সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন ঠিক সেই সময় সরকার তাকে গ্রেফতার করে গণতন্ত্র বিরোধী ভূমিকার পরিচয় দিয়েছেন।

ইন্দিরা গান্ধী মাছই খান না অন্যরাও অল্প অল্প খায়–

মওলানা ভাসানী প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির নাম ভাঙ্গিয়ে চলা মস্কোপন্থীদের যে আগুনের টুকরোটি এই সেদিন ভাসানী বিরোধী অপপ্রচার চালাতে গিয়ে ঝিনাইদহে জনতার ধাওয়া খেয়ে ফিরেছেন, তিনিই সম্প্রতি টাঙ্গাইল এসেছিলেন লেকচার দিতে। স্বাধীনতার পর থেকেই চোরাপথে ভারতে মাল পাচারের বিরুদ্ধে মওলানা ভাসানী কণ্ঠ সোচ্চার করায় আগুনের টুকরোটি তাঁর গোস্বা প্রকাশ করেছেন। তিনি বিশেষ করে মাছ চোরাচালানের সত্যতা সম্পূর্ণ অস্বীকার করে বক্তব্যের স্বপক্ষে অপূর্ব যুক্তিও দাঁড় করিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ "ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী মাছই খান না, অন্যরাও অল্প অল্প খায়। (পেয়েও অল্প খায়, না পায় না বলেই অল্প খেতে হয় তা অবশ্য বলেননি) তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী

সিদ্ধার্থ শংকর রায় ঢাকা ত্যাগের আগে বলে গেছেন ঃ তারা মাছ চান না, চান বন্ধুত্ব। সুতরাং মাছ পাচারের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।"

এ ব্যাপারে কোনো মন্তব্যও নিষ্প্রয়োজন।

'হক-কথা' সম্পাদকের মুক্তির দাবীতে জনসভা

গত ২৬শে মার্চ দিনাজপুর ইনস্টিটিউট ময়দানে আয়োজিত এক বিরাট জনসভায় 'হক-কথা' সম্পাদকের অবিলম্বে বিনাশর্তে মুক্তি দাবী করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশন, বাংলাদেশ মজদুর ফেডারেশন এবং বাংলাদেশ বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই জনসভায় দিনাজপুর জেলা ন্যাপ সম্পাদক জনাব এস, এ বারী এ,টি সভাপতিত্ব করেন। বক্তারা বিনা গ্রেফতারী পরোয়ানায় অগণতান্ত্রিকভাবে জনাব ইরফানুল বারীকে গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করেন।

সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তৃতা করেছেন মেসার্স আবুল কাসেম, রিয়াজুল হক চৌধুরী, সাঈদ ইস্কান্দার, মাহমুদুল হাসান মানিক, আবদুল বারী এবং এ্যাডভোকেট সামছুল হক।

তিনি মুখ খুলিলেন

সম্প্রতি, প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমান তার অতি সংক্ষিপ্ত সিলেট সফরে বিভিন্ন মতবাদের শ্লোগানে বিরক্ত হয়ে হেলিকপ্টারে মৌলবীবাজারে পৌঁছানোর পর একই দৃশ্যের অভিনয় শুরু হয়। ছাত্রলীগ রবগ্রুপের সমর্থকরা মজিববাদের বিরুদ্ধে পাল্টা শ্লোগানে মুখর হয়ে উঠে এবং বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের দাবী তোলে। ফলে প্রধানমন্ত্রী তরুনদের এই বেয়াদবীতে উষ্ম প্রকাশ করে বলেন 'আমি এতদিন মুখ খুলিনি– আমার ছাত্রদের ভিতরে বিভেদ সৃষ্টি করার চেষ্টা চলছে– কিন্তু বিভিন্ন শ্লোগানের শব্দে প্রধানমন্ত্রীর উত্তেজিত কণ্ঠ স্তিমিত হয়ে আসে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে মুজিববাদ বিরোধীদের বিরুদ্ধে এবং মুজিববাদের সমর্থনে প্রথম শেখ সাহেবের মনোভাব প্রকাশ পেলো।

ডাকোটা দুর্ঘনার তদন্ত রিপোর্ট কেন প্রকাশ করা হচ্ছে না?

বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর যে ডাকোটা বিমানটি বিধ্বস্ত হওয়ার ফলে কয়েকজন প্রতিষ্ঠিত এবং উজ্জল ভবিষ্যত বৈমানিক প্রাণ হারিয়েছেন সেই দুর্ঘটনার সঠিক তদন্ত এবং তার রিপোর্ট প্রকাশ করার জন্য মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী সহ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বিবৃতি দিয়েছেন। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীকে দুর্বল করার প্রচেষ্টা হিসাবে এই ডাকোটা দুর্ঘনার পিছনে বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থার হাত রয়েছে বলেও কেউ কেউ আশংকা করেছেন। বাংলাদেশের সার্বিক স্বার্থেই এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি সম্পর্কে দেশবাসীকে অবহিত করানো সরকারের পবিত্র দায়িত্ব। দুর্ঘটনা সম্পর্কে তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ করার জন্য সরকার প্রথমে দু সপ্তাহ সময় নিয়ে পরে তা বাড়িয়ে তিন সপ্তাহ করেন। আজ কয়েক মাস হয়ে গেল দেশবাসী এই দুর্ঘটনার কারণ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অন্ধকারেই রয়ে গেছে।

জানা গেছে গত ৪ঠা এপ্রিল রিপোর্টটি পেশ করা হলেও কোন বিশেষ কারণে আজ পর্যন্ত ঐ রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়নি। স্বার্থবাদী মহলের আঁতে ঘা লাগার ফলেই কি রিপোর্টটি প্রকাশ করা হচ্ছে না।

ইহা কি সত্য?

॥১০২॥

আওয়ামী লীগের সমাজসেবা সম্পাদক ভারতে হিজরত করতে বড় বেশলেট করে ফেলেছিলেন। আত্মীয়স্বজনদের পাকিস্তানে পাঠানোর ব্যবস্থা করতেই তার চার মাস দেরী হয়ে গিয়েছিল।

॥১০৩॥

সরকারী শ্রমিক লীগের আদমজী মিল শাখার দু'জন নেতা (একই নামের) ঢাকার গ্রীন রোডে একটি বাড়ী দখল করে ডাটে দিন কাটাচ্ছেন।

॥১০৪॥

গত ২৬শে জুন বরিশালে একটি ট্রাকযোগে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র সরিয়ে ফেলার সময় পুলিশ তা আটক করে থানায় নিয়ে গিয়ে বড় বেকায়দায় পড়ে যায়। কারণ ঢাকা-ট ৮৬৭৫ ট্রাকটির মালিক হলেন ভূমি ও রাজস্ব মন্ত্রীর তনয় এবং প্রধানমন্ত্রীর ভাগিনেয়– যিনি বরিশালের মুজিববাহিনীর প্রধান ছিলেন। অতএব, পর দিনই ট্রাক ও তার ড্রাইভারটি খালাশ পেয়েছে। সত্য ঘটনা গোপন রেখে পরে জানানো হয়েছে যে, ঐ অস্ত্রগুলো পুলিশ সুপারের বাসভবন সংলগ্ন ময়দান থেকে উদ্ধার করা হয়েছে।

॥১০৫॥

বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা দফতরের উপ সচিব সম্প্রতি কার্পেট, সোফাসেট ও অন্যান্য আসবাবপত্রসহ আরো কিছু জিনিস মেরে তার বাসভবনে তুলেছেন। অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তদন্ত করতে গিয়ে চারজন অফিসারের সমন্বয়ে গঠিত তদন্ত কমিটি তার বিরুদ্ধে রিপোর্ট পেশ করলেও এখনো কোন ব্যবস্থাই নেয়া হয়নি।

॥১০৬॥

দিনাজপুরের দেবীগঞ্জ থানার সুন্দরদীঘি ইউনিয়ন রিলিফ কমিটির আওয়ামী কর্তারা সাধারণ মানুষের হক মেরে। সম্প্রতি হাজার খানেক টাকা খরচ করে করতোয়া নদীর তীরে মহাসমারোহে পিকনিক করেছেন।

সম্পাদক ঃ সৈয়দ ইরফানুল বারী ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ঃ মওলানা আবদুল খান ভাসানী মুদ্রণে ঃ শান্তি প্রেস, সন্তোষ, টাঙ্গাইল।

প্রতি কপি পঁচিশ পয়সা সাপ্তাহিক চাঁদার হার : ষান্মাসিক-৬.০০ বার্ষিক-১০.০০

হক-কথা

(WEEKLY THE HAQ-KATHA)

প্রকাশক ও পৃষ্ঠপোষক ঃ মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

প্রথম বর্ষ ২০শ সংখ্যা, শুক্রবার, ৩০শে আষাঢ়, ১৩৭৯ ; ১৪ই জুলাই ১৯৭২; ২রা জমাদিউসানী ১৩৯২; সন্তোষ, টাঙ্গাইল

মুদ্রাস্ফীতি বাংলাদেশকে সর্বনাশের মুখে ঠেলে দিয়েছে

ভারতীয় সেনা সরকারই দায়ী

প্রথমদিকে অস্বীকার করে পরবর্তীকালে আমতা আমতা করলেও সম্প্রতি অর্থমন্ত্রী বাংলাদেশে মুদ্রাস্ফীতির অস্তিত্বের কথা স্বীকার করে ফেলেছেন। কিন্তু এর জন্যে দায়ী কারা- সে কথা অবশ্যই তিনি বলেননি। কেননা, তাহলে 'মিত্র রাষ্ট্রের' মান সম্ভ্রমের প্রশ্ন এসে যাবে, উন্মোচিত হয়ে পড়বে তাদের বাংলাদেশ-প্রেমের আসল চেহারা। বেকায়দায় পড়ে স্বাধীনতার দীর্ঘ সাত মাস পর সরকার মুদ্রাস্ফীতির কথা স্বীকার করলেও বস্তুতঃ এর জন্ম হয়েছে ৭১-এর ১৭ই ডিসেম্বরের দিনটি থেকেই। আর যাদের অবদানে এই মুদ্রাস্ফীতির জন্ম হয়েছে, তারা অন্য কেউ নয়- বাঙালীর 'মিত্রবাহিনী' বলে পরিচিত ভারতের লুটেরা সেনাবাহিনী।

স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হলে পাকিস্তানী সামরিক জান্তারা ভেবেছিলঃ এই যুদ্ধও দীর্ঘস্থায়ী হবে। আর তাই তারা করাচীতে রাত-দিন ছেপে বিপুল পরিমাণ কাগজের টাকা বস্তা বন্দী করে তাদের সাধের 'পূর্ব পাকিস্তানে' পাঠিয়ে রেখেছিল। এই টাকার পেছনে কোনো স্বর্ণ সমর্থন ছিল না– অর্থাৎ প্রতি একশত টাকার জন্য স্টেট ব্যাংকে ৪৮ টাকার স্বর্ণ মজুত রাখার রীতি তারা পালন করেনি। এই 'মা-বাপহীন' পাকিস্তানী টাকাগুলো তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন ব্যাংকসমূহে ছাড়াও পাক-বাহিনীর সেনানিবাসে এমনকি তাদের ব্যাংকারে ব্যাংকারেও পড়েছিল। হানাদার বাহিনী আত্মসমর্পণ করার ফলে পাকিস্তানী কাগজী টাকার অনিস্যুকৃত এই নোটগুলোর সম্পূর্ণই ভারতীয় সেনাবাহিনীর হাতে গিয়ে পড়ে। তারা ঢাকা চট্টগ্রাম খুলনার মতো বড় বড় শহরসহ বাংলাদেশের সর্বত্র হরদম জিনিসপত্র কেনাকাটা শুরু করে দেয়। রেডিও, ঘড়ি, কাপড় থেকে শুরু করে রবারের সেণ্ডেল অবধি সব কিছু কিনে তারা দোকানপাট সাফ করে ফেলে। যে টাকা তাদের জমা দেয়া উচিৎ ছিল বাংলাদেশ সরকারের কাছে, কিন্তু আমাদের এই 'মিত্রবাহিনীর' লুটেরারা তা না করে বাংলাদেশকে মুদ্রাস্ফীতিজনিত ভয়াবহ সর্বনাশের মুখে ঠেলে দিয়েছে।

টাকার পরিমাণ বেড়ে গেলে তার সাথে সম্পদও বৃদ্ধি না পেলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। বাংলাদেশেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। তাই

আজ জনগণের এই দুর্দশা। কিন্তু তবু ভারতের প্রভুত্বে আস্থাশীল বর্তমান সরকার এখনো দেশের মুদ্রাস্ফীতির জন্যে দায়ী ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে টু শব্দটি পর্যন্ত উচ্চারণ না করে বরং একে যুদ্ধ পরবর্তী পরিস্থিতির অবধারিত ফল বলে চালিয়ে দেয়ার অপচেষ্টা করে যাচ্ছেন। এর পেছনে যে কারণটি রয়েছে তাও কম চমকপ্রদ নয়। ৭১-এর ২৫ শে মার্চের পর সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন ব্যাংক থেকে যে বিপুল পরিমাণ পাকিস্তানী কাগজের নোট আওয়ামী লীগের কর্তারা ভারতে নিয়ে গিয়েছিলেন, তার অধিকাংশই গিয়ে পড়েছে ভারতের মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীদের হাতে। স্বাধীনতা-উত্তর প্রথম দিনটি থেকেই মাড়োয়ারীরা উন্মুক্ত সীমান্ত পথে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করে কোটি কোটি টাকার সম্পদ ভারতে নিয়ে যায়। তাছাড়া পাকিস্তানে ৫ ও ১০ টাকার নোট বাতিল ঘোষণার পরও মাসাধিকাল ঐ নোটগুলো এ দেশে চালু থাকার ফলে ভারতের ব্যবসায়ীরা আফগানিস্তানের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ অচল টাকা বাংলাদেশে চালু করে দিয়ে দেশে মুদ্রাস্ফীতির পথকে প্রশস্ত করে দিয়েছে।

বাংলাদেশ ও এদেশের মানুষকে নিঃস্ব করে ফেলার পেছনে ভারতীয় সরকারের অবদানও কম নয়। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় যে লক্ষ লক্ষ শরণার্থী গিয়ে ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল, তাদের কাছ থেকে ভারতীয় স্টেট ব্যাংক পাকিস্তানী ৫০ ও ১০০ টাকার নোট এবং বিপুল পরিমাণ সোনা নামমাত্র মূল্যে কিনে নিয়ে নিজেদের ট্যাঁকে গুজেছে। (অসমাপ্ত)

রূপপুর আণবিক কেন্দ্রে গরু-ছাগল গবেষণা করছে

একটি দৈনিকে প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশ আনবিক শক্তি কেন্দ্রের জনৈক কর্মকর্তা রূপপুর আণবিক কেন্দ্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশঙ্কা প্রকাশ করে কেন্দ্রের জন্যে অধিক ব্যয় বরাদ্দের অনুরোধ জানিয়েছেন। কেননা, পাকিস্তানী আমলে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ যে কয়টি ইস্যু নিয়ে হৈ চৈ করেছেন, মাঠে -ময়দানে লম্বা লম্বা বক্তৃতা ঝেড়েছেন, তার অন্যতম এই কেন্দ্রটি এখন দুর্বৃত্ত আর গরু-ছাগলের আড্ডাখানায় পরিণত হয়েছে।

কাংখিত ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে আওয়ামী লীগ সরকার রূপপুর আনবিক কেন্দ্রটির সর্বাঙ্গীন কল্যাণের দাবীতে তাদের বিভিন্ন অনলবর্ষী ভাষণের কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে এর জন্যে বাজেটে মাত্র ৩ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করেছেন। অথচ পাকিস্তানী আমলে ৪৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কেন্দ্রের যে ভবনগুলো গড়ে উঠছিল, তার সমাপ্তির জন্য প্রয়োজন মাত্র ১৫ লক্ষ টাকা। অমার্জনীয় ঔদাসীন্য প্রদর্শন করে মুজিব সরকার প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ না করার ফলে যা একদিন বাংলাদেশের গৌরব হতে পারতো সেই রূপপুর আনবিক কেন্দ্র এখনো অসম্পূর্ণ থেকে যাচ্ছে। মাঠে-ময়দানে এককালে বক্তৃতা দিলে কী হবে, লক্ষ লক্ষ প্রাণের দামে অর্জিত দেশের ক্ষমতায় গেলেই বা কী– সব দোষই যদি পশ্চিমাদের উপর চাপিয়ে দিয়ে রেহাই মিলে যায় তবে সে চেষ্টায়ই বা ক্ষতি কী! অতএব, জয়তু মুজিব-সরকার!

নরসিংদীতে ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর পুলিশ হামলা চালিয়েছে

নরসিংদী থানার তিনজন পুলিশ একটি মহিলার ওপর পাশবিক নির্যাতন চালাতে গিয়ে ছাত্রদের কাছে ধরা পড়ার পর তারা পুলিশদের বিচার চাইলে সম্পূর্ণ মিথ্যে একটি ডাকাতির মামলায় জনৈক ছাত্রনেতাকে গ্রেফতার করলে সারা শহরে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। পরদিন সোমবার নরসিংদীর সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিক্ষুব্ধ ছাত্র-ছাত্রীরা থানা ঘেরাও করে তার মুক্তির দাবী করেন। আইউব আমলকে হারিয়ে দিয়ে পুলিশবাহিনী স্বাধীন দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর ব্যাপক লাঠিচার্জ করে। ছাত্র-ছাত্রীরা আত্মরক্ষার জন্যে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লে মুজিব-সরকারের পুলিশবাহিনীও ঝাঁপিয়ে পড়ে, বিশেষ করে ছাত্রীদের ওপর পশুর মতো আক্রমণ চালায়। ফলে এগারোজন ছাত্রীসহ শতাধিক ছাত্র আহত হয়েছেন। পুলিশের হামলার পর থেকে এখনো একজন ছাত্রী নিখোঁজ রয়েছেন।

মাত্র ১৬০ দিনে

আলতাফ গওহরের হাতে ট্রেনিংপ্রাপ্ত তথ্য বিভাগের কর্মকর্তারা এককালে আইউবকে অলৌকিক শক্তিধর ফেরেশতায় পরিণত করার উদ্দেশ্যে যে স্টাইলে কালো দশকের গুণ কীর্তনে নেমেছিল, স্বাধীন বাংলাদেশেও সেই খেলেরই লক্ষণ দেখা দিয়েছে।

মুজিব-সরকারের বিভিন্ন ফাঁকি সুকৌশলে ঢেকে রেখে এবার ১৬০ দিনের বিরাট বিরাট পর্বতপ্রমাণ কর্মাদির ফিরিশতি দেখিয়ে পোস্টার ছাপানো হয়েছে। ফিরিশতি দেখে যেন সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামী 'হাবা-গোবা' মানুষেরা ভাববে ঃ ১৬০ দিনের মহান অবদানসমূহের দানে তাদের চৌদ্দ পুরুষ পেট ভরে খেয়ে দেয়ে নাকে তেল দিয়ে ঘুমোতে পারবে।

এখনো সাবধান হবার সময় আছে নাহলে মার খেয়ে গাছে ঝুলতে হবে

'থ্যাংকলেস জব' এর জন্যে দুঃখ প্রকাশকারী মন্ত্রী বাহাদুরের শ্লোগান মার্কা পত্রিকাটি তাদের চার রিম কাগজের সার্কুলেশন বাড়ানোর দুরাশায় বাংলার বিদ্রোহী কণ্ঠ মওলানা ভাসানী বিরোধী অমার্জনীয় কুৎসা প্রচারে মালকাছা দিয়ে ময়দানে নেমে পড়েছে। এককালে শেখ মুজিবের বিরোধিতা করতে গিয়ে যে দালাল সাংবাদিকটি জল্লাদ ইয়াহিয়ার লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডারকেও পর্যন্ত আশ্রয় হিসেবে আঁকড়ে ধরেছেন, পর্যাপ্ত অর্থ আর স্বাভাবিক দালাল সুলভ মনোবৃত্তির কারণে তিনিই বর্তমানে পত্রিকাটির সম্পাদক হয়ে সরকারের ধামা ধরছেন, ভেড়ার স্বরে

দেশের সংগ্রামী ভাই-বোনদের প্রতি আমার অনুরোধ

সাপ্তাহিক 'হক-কথা'র সম্পাদক গ্রেফতার হওয়ায় আমি যারপরনাই অসুবিধায় পড়িয়াছি। বহু এজেন্ট এখনো বাকী টাকা পরিশোধ করে নাই। নিজের প্রেস না থাকায় এবং সরকারের দমননীতির ভয়ে অন্য কেহও 'হক-কথা' ছাপাইতে রাজী না হওয়ার দরুণ অসুবিধা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। এমভাবস্থায় আপনারা প্রতি জেলা হইতে যদি অন্ততঃ দুই হাজার করিয়া অর্থ সাহায্য করিতেন তাহা হইলে আমি একটি ডবল ডিমাই সাইজের মেশিন এবং প্রয়োজনীয় টাইপপত্র ক্রয় করিয়া স্বাধীনভাবে 'হক-কথা' ছাপাইয়া শহরের মত গ্রামে গ্রামেও পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে পারি। এজেন্টরা বিল পরিশোধ করিলে এবং আর্থিক টানাটানি হইতে রেহাই মিলিলে আপনাদের সমুদয় অর্থ ইনশাহআল্লাহ ফেরত দিয়া দিব। আশা করি 'হক-কথা'কে নিজের পত্রিকা ভাবিয়া সাধ্যমত সকলেই অর্থ সাহায্য করিবেন। বিজ্ঞাপন ব্যতীত সংবাদপত্র চালানো সম্ভব নহে। আপনারা 'হক-কথা'র জন্য বিজ্ঞাপন পাঠাইলেও উপকৃত হইব।

—আবদুল হামিদ খান ভাসানী

তাল তুলেছেন সাম্রাজ্যবাদী আর সম্প্রসারণবাদী প্রভুদের সপক্ষে।

পত্রিকাটির সাম্প্রতিক দুটি সংখ্যার একটিতে মওলানা ভাসানীর সাথে তাঁর দলের মতানৈক্যের কাল্পনিক আবিষ্কার প্রকাশ করা হয়েছে, প্রভুদের উচ্ছিষ্ট গাঁজার কলকীতে দম দিয়ে বেহায়ার মতো বলা হয়েছে যে, সৈয়দ ইরফানুল বারীর গ্রেফতারের পর শ্রমিক নেতা জনাব সিরাজুল হোসেন খানের 'হক-কথা' সম্পাদনার দায়িত্ব নেয়ার কথা ছিল। তাই তিনি 'এনা'র সম্পাদক পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন। এই ভাওতা প্রচারের জবাবে স্বয়ং সিরাজুল হোসেন খানই বিবৃতি দিয়েছেনঃ "আমার 'হক-কথা' সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণের প্রস্তাবই কখনো ওঠেনি। মওলানা ভাসানীর সঙ্গে আমার মতানৈক্যের সংবাদটিও কাল্পনিক। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নীতিগত প্রশ্নে ও আমার রাজনৈতিক দায়িত্বের দরুণই আমি 'এনা' থেকে পদত্যাগ করেছি। সংবাদটি মিথ্যে এবং মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক শক্তির বিরুদ্ধে অপপ্রচার।"

সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের প্রভুত্ব কায়েমের হীন উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানকে নিয়ে একটি নতুন কমনওয়েলথ গঠনের সুপারিশকারী দালাল সাংবাদিকটি এর পরের সংখ্যাটিতে জানালেনঃ পাকিস্তানী প্রেসিডেন্ট ভুট্টো নাকি স্বাধীনতার প্রথম প্রবক্তা মওলানা ভাসানীর কাছে গোপন চিঠি পাঠিয়েছেন, আর তারই জবাবে নাকি মওলানা সিমলা বৈঠকের প্রাক্কালে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি এবং আটক বাঙালীদের ফেরতদানের অনুরোধ জানিয়ে ভুট্টোর কাছে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছেন। ভুট্টোর গোপন চিঠি কীভাবে মওলানা ভাসানীর কাছে পৌঁছেছে সে প্রসঙ্গে দালাল পত্রিকাটি লিখেছেঃ "চিঠিটা উর্দুতে লেখা এবং যে ভাবে যে পথেই হোক, বাহক মারফৎ মওলানা সাহেবের কাছে এসেছে।" মিথ্যে কথারও সীমা থাকা দরকার। কথাটি যে কোন পাঠকই পড়ে একবাক্যে বলে দিতে পারেনঃ এমন ভাওতা যুক্তি এবং ডাহা মিথ্যে আর হয় না।

শোষকদের পক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান পর্যন্ত হারিয়ে বেহায়া সম্পাদকটি সংবাদ প্রেরকরূপে জনৈক জয়নুল আবেদীনের নাম ব্যবহার করেছেন, আর নামের নীচে ব্রাকেটে লিখেছেন 'সন্তোষ থেকে।' জনতাকে ধাপ্পা দেয়ার নির্লজ্জ খায়েশে উনি ভুলে গিয়েছিলেন যে সন্তোষ কোনো বিরাট শহর নয়–বাংলার নিভৃত একটি গ্রামের নাম-এখানে সবাই সবাইকে চেনে। প্রভুদের কাছ থেকে টাকা নেয়ার সময় তো দালাল জনাবেরা নিজেদের নাম ব্যবহার করতে পারেন, তবে কেন ভাসানী বিরোধী খবরের মাথায় নাম ব্যবহারে এত আপত্তি? নাকি স্বাভাবিক পরিণতির ভীতি?

সাংবাদিকতার নামে বিভিন্ন সময়ে শোষকদের অর্থ খেয়ে খোলশ পাল্টানো এই দিগগজ সাংবাদিকটির সম্পর্কে গত সংখ্যায় 'হক-কথা'র জনৈক সুহৃদ পাঠক তার নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ইনি এবং তার সহকর্মীরা দালালীর স্বার্থে এত বেশী অধঃপতনে গেছেন যে এদের বিরুদ্ধে কিছু লিখতেও আমাদের ঘৃণা হয়। বেহায়া সম্পাদকটিকে শুধু বলবোঃ সরকার এবং বিদেশী প্রভুদের ধামা ধরার পাল্লা দিচ্ছেন, দিন। কিন্তু সাংবাদিকতার নামে বেহায়াপনা আর জালিয়াতির পথ ভালোয় ভালোয় ত্যাগ করুন। আপনাদের প্রহরা কনসেনট্রেটেড আয়রণ মেড হতে পারেন, কিন্তু ভাওতাবাজী সীমা ছাড়িয়ে গেলে, শোষণ তীব্রতর হতে থাকলে আর তার সাথে তাল মিলিয়ে ধামা ধরতে গেলে মওলানা ভাসানীকে কিছু বলতে হবে না–জনতাই আপনাদের পিটিয়ে মারবে-গলায় রশি বাধা আপনারা ঝুলবেন পথিপার্শ্বের গাছগুলোতে। মোনেমের পয়গাম আর জামাতের সংগ্রামের পরিণতি স্মরণ করুন। এখনও সাবধান হবার সময় আছে।

ফ্যাসিবাদী হামলা প্রতিহত করো

বাংলা ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সভাপতি জনাব মাহবুব উল্লাহ সপ্তাহিক 'হক-কথা' সম্পাদককে গ্রেফতারের তীব্র প্রতিবাদ করে গণতন্ত্রের পরিপন্থী কার্যক্রম থেকে বিরত থাকার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। ময়মনসিংহ শহর শাখার সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে জনাব মাহবুব উল্লাহ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা এবং ফ্যাসিবাদী হামলা প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে একত্রিত হবার জন্যে ছাত্র সমাজের প্রতি আহ্বান জানান। এই সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে কেন্দ্রীয় বাংলা ছাত্র ইউনিয়নের সহসভাপতি জনাব নূর মোহাম্মদ খান এবং সদস্য জনাব নাজিমুল আলমও বক্তৃতা করেন।

'হক-কথা' সম্পাদক সৈয়দ ইরফানুল বারীর আশু মুক্তি, শ্রমিকনেতা জনাব আবুল বাশার এবং ছাত্রনেতা জনাব মতিউর রহমানের উপর থেকে গ্রেফতারী পরোয়ানা বাতিলের দাবী জানিয়ে সম্মেলনে কতিপয় প্রস্তাব গৃহীত হয়।

ইরফানুল বারীর মুক্তি চাই

মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী প্রতিষ্ঠিত সাপ্তাহিক 'হক-কথা'র সম্পাদক সৈয়দ ইরফানুল বারীকে মিথ্যে অভিযোগে গ্রেফতারের প্রতিবাদ করে রংপুর জেলা ন্যাপ, কৃষক সমিতি, বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন এবং বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এক যুক্ত বিবৃতিতে সরকারকে অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। তারা বলেন– " যে আওয়ামী লীগ বাক-স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা তথা বিভিন্ন গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবী তুলতো, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পর তারাই জনগণের বিভিন্ন ন্যায়সঙ্গত অধিকার নস্যাত করার কাজে লিপ্ত হয়েছে।

জনাব ইরফানুল বারীর বিনাশর্তে মুক্তি দাবী করে যারা বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছেন তারা হলেনঃ মেসার্স শাহ তবিবুর রহমান, আশরাফ হোসেন, আবদুল হালিম খান, কেশব বর্মন, মন্নুম চৌধুরী রাখু, আবুল হোসেন, আবদুস সোহবান, মোজাম্মেল হক, সৈয়দ নজরুল ইসলাম মনজু, রুস্তম আলী, আমিনুল ইসলাম গোলাপ এবং ইব্রাহিম।

ফেনী বাংলা ছাত্র ইউনিয়ন

বাংলার নির্যাতিত জনতার সাপ্তাহিক মুখপত্র 'হক-কথা'র সম্পাদক সৈয়দ ইরফানুল বারীর গ্রেফতার এবং তার বিরুদ্ধে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ঘোষিত মিথ্যে অভিযোগের প্রতিবাদে সম্প্রতি ফেনীতে বাংলা ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে এক গণসমাবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জনাব আবদুল হক মানিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তারা সরকারের এই কার্যক্রমকে অগণতান্ত্রিক এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নস্যাতের অশুভ চক্রান্ত বলে আখ্যা দিয়ে জনাব ইরফানুল বারীর অবিলম্বে বিনা শর্তে মুক্তির দাবী জানিয়েছেন।

গ্রেফতার অপরহণ বন্ধ করো

বাংলাদেশ বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী একটি বিবৃতিতে সংস্থার কর্মীদের বিরুদ্ধে মিথ্যে মামলা এবং হুমকি বন্ধের দাবী জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে তারা অভিযোগ করেন যে, সারাদেশে বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের কর্মীদেরকে রাজাকার, আলবদর এবং নকশাল

হিসেবে চিহ্নিত করে কুচক্রী প্রতিক্রিয়াশীল এবং মস্কোপন্থীদের গুণ্ডাবাহিনী জঘন্য অত্যাচার চালানোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। ইতিপূর্বে সংস্থার বরিশালের নলছিটি থানার সভাপতিকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং লোহাগড়া থানা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদককে আওয়ামী লীগের গুণ্ডাবাহিনী অপহরণ করেছে।

অবিলম্বে এইসব অন্যায় অত্যাচার বন্ধ করা না হলে যে কোন মূল্যের বিনিময়ে বাংলাদেশ বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন সংগ্রাম চালিয়ে যাবে বলে সম্পাদকমণ্ডলী জুনো-সালু ঘোষণা করেছেন। বিবৃতিতে তারা কুচক্রী মহলকে শেষবার হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন।

গণতন্ত্র আসিয়া গিয়াছে এখনো চলিতেছে

সারাদেশে হত্যা-লুট এবং অপহরণের পালা এখনো চলছে। সরকারের অন্যায় কার্যক্রমকে সমর্থন না করে সোচ্চার বিরোধিতা করায় দেশপ্রেমিকদের ওপর ফ্যাসিবাদী নগ্ন হামলা আজও অব্যাহত রয়েছে।

দেশব্যাপী এমনি অসংখ্য হামলার মধ্যে একটির শিকার হয়েছেন জয়দেবপুরের বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরী শ্রমিক ইউনিয়নের সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব গিয়াসউদ্দিন চৌধুরী। বিভিন্ন শিল্পকারখানার মতো এখানেও সরকারী শ্রমিক লীগের গুণ্ডারা শ্রমিকদের ওপর বলপ্রয়োগ করে নিজেদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। গত ৮ই জুন কারখানার সদর দরজার সামনে জনৈক আওয়ামী লীগ নেতা প্রয়োজনবোধে শ্রমিক প্রতিনিধিদেরকে হত্যার জন্যে লালবাহিনীর প্রতি নির্দেশ জারী করার পর থেকেই এলাকার পরিস্থিতি মারাত্মক হয়ে উঠতে থাকে।

গত ২৯শে জুন রাতে শ্রমিক লীগের গুন্ডারা জনাব গিয়াসউদ্দিনকে চোখ বেঁধে সম্পূর্ণ মুজিববাদী কায়দায় অপহরণ করে নিয়ে যায়। আমানুষিক নির্যাতনের পর হাতে একটি গ্রেনেড দিয়ে তারপর তাকে মিথ্যে মামলায় থানায় জমা দেয়া হয়। শ্রমিক লীগের গুণ্ডারা এমন ত্রাসের রাজ্য কায়েম করেছিল যে, থানার সাথে যোগাযোগ পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। জনাব গিয়াসউদ্দিন এখনো আটক রয়েছেন।

এদিকে বাংলাদেশ বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন যে, তাদের সংস্থার যশোরের লোহাগড়া থানা কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব আজিজুর রহমানকে স্বেচ্ছাসেবক বলে পরিচয় দানকারী একদল আওয়ামী লীগ গুণ্ডা প্রকাশ্য দিবালোকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে। প্রশাসন কর্তৃপক্ষও যথানিয়মে নীরব থেকেছেন–এখনো থাকছেন। অপহরণের পর থেকে জনাব আজিজুর রহমানের কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি বলে জানানো হয়েছে।

এমনিভাবে সারাদেশে মুজিব সরকার তার গণতন্ত্র দান করছেন। আইউব খানের মৌলিক গণতন্ত্র নয়–বাংলাদেশে শেখ সাহেব খাঁটি এবং পরিপূর্ণ গণতন্ত্রের খেল দেখাচ্ছেন।

তুমিই ধন্য ধন্য হে

এমসিএ সাহেবের আত্মীয়টি দালাল হয়েও এখন রিলিফ ও পঞ্চায়েত কমিটির চেয়ারম্যান হয়েছেন। গোপালগঞ্জ থানার ভদ্রেশ্বর ইউনিয়নের রিলিফের কর্তা সমানুদ্দিনের বিরুদ্ধে স্থানীয় জনসাধারণ দল বেঁধে প্রমাণাধিসহ কৃষিমন্ত্রী ও সার্কেল অফিসারের কাছে অভিযোগ পেশ করেছিলেন। কিন্তু প্রতিকার কিছু হয়নি। দুর্নীতির বিরুদ্ধে যারা অভিযোগ জানাতে গিয়েছিল সমানুদ্দিন তাদের রিলিফ বন্ধ করে দিয়েছেন। প্রতিবাদকারী ব্যক্তিদের দুর্দশা আরো বাড়ছে।

তাদের জেল-হাজতের হুমকি দেয়া হচ্ছে।

শান্তি কমিটির এই সাবেক চেয়ারম্যানের শান্তি ভঙ্গ করার সাহস কারো নেই।

কোম্পানী কা মাল দরিয়ামে ঢাল

দেশের একমাত্র তৈল শোধনাগারটি লোকসানি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবার পেছনে সর্বোচ্চ কর্মকর্তার দুর্বলতা ও অযোগ্যতাই কাজ করছে। পাকফৌজের দালালীসহ তার অন্যান্য অপকীর্তি ফাঁস করে দেবার হুমকি দিলেই তিনি কাৎ। এর সুযোগ নিয়ে জনা-চারেক অফিসার জোট বেঁধে 'মউজ' বানাবার জন্য ঢাকায় ইন্টারকনে কয়েক সপ্তাহব্যাপী থাকবার সুবিধা আদায় করেছে। আবাসিক, কারিগরী ও অর্থবিষয়ক তিনজন প্রধান আমলাও স্ত্রী-ধনদের নিয়ে হর মাসে এমনি মউজ সফর করছেন। অধস্তন অফিসাররা প্রধান কর্তার হাত মুচড়ে ট্রেনিং-এর নামে এ সুবিধা আদায় করেছে। এদের এক একটি সফরের পেছনে ২৫ থেকে ৩৫ হাজার টাকা খরচ হচ্ছে। এছাড়া রিফাইনারীতে আত্মীয় লালনের জন্য বহু আজেবাজে পদ সৃষ্টি করা হয়েছে, সে বাবদ খরচ হচ্ছে বহু হাজার টাকা।

পাঠশালা কহিনু ঘর

গ্রাম্য টাউটদের ছেলেপুলেরা অসৎ উপায়ে টাকা কামাবার সাইড বিজনেস শুরু করেছে। পাবনার মালিগাছা ইউসি-র রিলিফ কর্তার পুত্রধন হঠাৎ করে বিদ্যোৎসাহী হয়ে উঠেছেন। একটা পাঠশালা খুলেছেন। উদ্দেশ্যও তার হাসিল হয়েছে। 'পাঠশালা' সংস্কারের জন্য ৩০০০ টাকা মঞ্জুরী এসেছে। তা দিয়ে তিনি নিজের ঘরদোর সংস্কার করে নিচ্ছেন।

এ কিসের আলামত?

যশোরের একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় খবরে প্রকাশ দৌলতপুর, ডুমুরিয়া, বাগেরহাট ও সুন্দরবন অঞ্চলে সর্বত্র নয়া অত্যাচারে আবার মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়েছে। ১২ বছরের কিশোরদের পিটিয়ে সারাজীবনের মত পঙ্গু করে দেয়া হচ্ছে। প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক কর্মীদের গাছের ডালে পা উপরের দিকে বেঁধে বেপরোয়া পিটানো হচ্ছে। নৃশংসতম অত্যাচারে রক্তাক্ত হচ্ছে অসংখ্য প্রগতিশীল ও বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মী। পাক-বাহিনীর হাতে ধর্ষিতা তরুণী বাঙ্গালী বাহিনীর দ্বারা পুনরায় ধর্ষিতা হচ্ছে। রাজাকার ধরার জন্য বলে প্রচারিত মপিং আপ অপারেশনে অত্যাচারের মাত্রা যখন সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন উক্ত অঞ্চলসমূহে ঘরে ঘরে মা-বোনদের কান্নার রোল পড়ে যায়। বাগেরহাটে শেষ পর্যন্ত ২শত মা-বোন পথে বেরিয়ে বিক্ষোভ মিছিল বের করেছেন।

গণতন্ত্রের দেশে

ভারতের কারাগারে রাজবন্দীর সংখ্যা সাধারণ কয়েদীদের সাথে পাল্লা দিচ্ছে গণতন্ত্রের নমুনা হিসাবে। ভারতের মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির তথ্যানুসারে পশ্চিমবঙ্গের কারাগারগুলিতে একমাত্র তাঁদের পার্টিরই ২১২৬ জন রাজবন্দী রয়েছেন। রাজনৈতিক কারণে আটক হওয়া সত্ত্বেও এদের শতকরা ২১ জনই তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদীর মত জেলে পচ্ছেন।

আর চিন্তা নেই

বুলেট এসে গেছে

যশোর জেলার কালিগঞ্জ রেলস্টেশনে ভারত থেকে আগত একটি রেলওয়াগনকে বেশ কিছুদিন একভাবে পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয় জনমনে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছিল। পরে তারা সমবেত হয়ে ওয়াগনটি খুললে ভেতরে যে

জিনিষের সমারোহ দেখা গেল, তা খাদ্যশস্য নয়, বুলেট। যশোর, খুলনাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গণনির্যাতন তীব্রতর হচ্ছে আর মিত্র বলে পরিচিত দেশটি ক্ষুধার্ত বাঙালীদের জন্যে বুলেট পাঠাচ্ছে।

বি-টিমের নয়া ব্যবসা

শমসের নগরের রাজনীতির অঙ্গনে বি-টিমী ছোকরারা দালাল রক্ষা সমিতি বানিয়েছে। এ টিমের লুটপাট সমিতি সবকিছু হালাল করার পর বি-টিমী ছোকরারা উৎকোচ হিসাবে ৭ মণ/১০ মণ ধান নিয়েও দালাল বাঁচাচ্ছে। কালোবাজারীরা বি-টিমের হাতে পড়লে পোয়াবারো। অল্প খরচেই বমাল রেহাই মিলছে। শান্তি কমিটির সদস্য চাচা-ভাতিজারা বি-টিমের আশ্রয়ই শুধু পায়নি বরং বি-টিম তাদের হিস্যা হিসাবে ভাতিজাকেও আসন দিয়েছে।

দালাল সমাজপতি

পশ্চিমা খানদের সাথে বৃটিশ প্রদত্ত বড়খান উপাধিধারী যে 'বাঙ্গালী চাঁই'-এর পুত্রধন নাড়ির টান অনুভব করেছেন এবং পশ্চিমা ক্যাপ্টেনের সাথে স্বীয় তনয়ার বিয়ে দেবার জন্য উঠেপড়ে লেগেছিলেন, বরিশাল সদরে বসবাসকারী প্রভাবশালী সেই ব্যক্তিটি এখনও আবার মামুবাদী ছাত্রলীগের কৃপায় সমাজের পুরোভাগে রয়েছেন। এই খান খানান দখলকার আমলে নির্লজ্জ দালালী করে বরিশালবাসীর অনেক সর্বনাশ করেছে, অথচ এখন সে বলছে, মুক্তিবাহিনীর গুপ্তচর হিসাবে সে কাজ করেছে, নিজ ঘরে প্রেমলীলার বৃন্দাবন বসিয়েছে।

তমঘা-ই-পাকিস্তানের লম্ফ

চট্টগ্রামস্থ বাংলাদেশ পিডব্লিওডি-এর যে নিম্নপদস্থ ইঞ্জিনিয়ারটি যোগ্যতার সাথে পাক-বাহিনীর দালালীর বিনিময়ে তমঘা-ই-পাকিস্তান খেতাবে ভূষিত হয়েছিলেন, তিনিই স্বাধীনতার পর অনেক উর্দ্ধতন ও যোগ্য ইঞ্জিনিয়ারদেরকে ছাড়িয়ে এক লাফে চীফ ইঞ্জিয়ারের পদে গিয়ে উঠেছেন।

খান সাহেব প্রথমে অবাঙালীদের পরিত্যক্ত পদগুলোর একটির জন্যে আবেদন করেছিলেন। উপযুক্ত যোগ্যতা না থাকলেও বিশেষ কারণে তাকে সুপারিন্টেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ারের পদ দেয়া হয়। ফলে উর্দ্ধতন ইঞ্জিনিয়ারদের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ দেখা দেয়। এর প্রতিকার হিসেবে কিছুদিনের মধ্যেই খান সাহেবকে আবার চীফ ইঞ্জিনিয়ারের পদটি দেয়া হয়। প্রথমে একে অস্থায়ী ব্যবস্থা বলে জানানো হলেও বিশেষ কারণে পদটি স্থায়ী হয়ে গেছে। আর এই বিশেষ কারণটি নাকি প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিবের সাথে তমঘা-ই-পাকিস্তানের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা।

হক-কথা

৩০শে আষাঢ়, শুক্রবার

ভূমিহীন ক্ষেতমজুর

এদেশের জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশ ভারবাহী পশুর মত এই সমাজ আর সভ্যতার রথ টেনে টেনে আজ সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হবার পথে এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের পরিশ্রম, তাদের মেহনতে উৎপাদিত ফল ভোগ করে বেশ কিছুসংখ্যক ভাগ্যবান নাগাল পেয়েছে বিলাস-বৈভবের। কিন্তু ঐ ভারবাহী মেহনতি শ্রেণীটির ভাগ্য বিমর্ষ থেকে বিমর্ষতর হয়ে উঠেছে।

এদেশের কৃষিনির্ভর অর্থনীতির বুনিয়াদ ভূমিহীন ক্ষেতমজুরদের হাড়ের উপর গড়ে উঠেছে। সামন্তযুগের ভয়াবহ শোষণের শিকার দাস শ্রেণীর মতই এরা শুধু নিজেদের পরিশ্রম বিলিয়ে যাচ্ছে বংশানুক্রমে। এদের জীবনীশক্তি নিঃশেষ করে, তারই মূল্যে এদেশের শতকরা ৭০ ভাগ সম্পদ উৎপাদিত হলেও জাতীয় সম্পদের শতকরা ১০ ভাগও এই বিপুলসংখ্যক মানুষের হাতে আসে না। আজ সরকারের মুখে সমাজতন্ত্রের বাগাড়ম্বর শোনা যাচ্ছে। অথচ সাবেক জমিদারী আমলে যা ছিল, পাকিস্তান আমলে যে অবস্থা ছিল, তদপেক্ষা ভয়াবহ অবস্থায় এসে পৌঁছেছে এই ক্ষেতমজুর শ্রেণীটি।

কোন জেলায় মোট জনসংখ্যার শতকরা ৩৮ ভাগ, কোন জেলায় জনসংখ্যার শতকরা ৬৮ এমনকি ৭২ ভাগ মানুষ ভূমিহীন। পল্লীবাসী এই হতভাগ্যদের সামনে ক্ষেতমজুর হিসাবে গতরখাটা ছাড়া আর কোন পথ খোলা নেই। সংঘবদ্ধভাবে মজুরী ও অধিকার আদায়ের কোন শক্তিও নেই এদের। এর ফলে, এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত সমগ্র দেশের শতকরা ৫৩ জন মানুষ পরের শ্রম লুণ্ঠনকারী শোষক শ্রেণীগুলির হাতে নিষ্পিষ্ট হচ্ছে যুগের পর যুগ ধরে।

দেশের রাজনৈতিক -অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে অনেক 'যুগসন্ধিক্ষণ' অতিবাহিত হয়েছে। সংঘটিত হয়েছে অনেক 'পরিবর্তন' ও 'বিপ্লব'। এদেশের এই হতভাগারা দু-দুটি স্বাধীনতা দেখেছে। কিন্তু নতুনতর নিপীড়ন ছাড়া, আরও বৃহত্তর সংখ্যক কসাইতুল্য শোষকের হাতেপড়া ব্যতীত এই পরিবর্তন ও স্বাধীনতার কোন অর্থ আছে কিনা, তা তারা জানে না।

এ দেশের কৃষিখাত থেকে দেশের যে ৭২ ভাগ সম্পদ আসে তার সবটুকুই এই ভূমিহীন ক্ষেতমজুরদের রক্ত পানি করা পরিশ্রমের ফল। বিরাট জোতজমার মালিক নব্য সামন্তপ্রভু জোতদার শ্রেণী, বেপরোয়া শোষণে অভ্যস্ত ধনিক কৃষক এমনকি মাঝারী কৃষককেরা 'নিজেদের' জমিতে যে বিপুল ফসল উৎপাদন করে, তার সবটুকুই ভাগ্যহত ক্ষেতমজুরদের পরিশ্রম। ঐসব ভাগ্যবানরা মাটি আর জমির সাথে দলিলপত্রের সম্পর্ক আর ফসল তোলা ছাড়া কোন সম্পর্কই রাখে না। এদের জমিতে সারা বৎসর ধরে প্রাণান্তক পরিশ্রমে ফসল ফলায় ঐ ভূমিহীন ক্ষেতমজুরেরা। বিনিময়ে তারা যা পায়, তাতে বেঁচে থাকার সংস্থানও হয় না। জীবনভরে এরা ঘাটতি দিয়ে চলে, এ ঘাটতির টান গিয়ে পড়ে শরীর আর সন্তান-সন্ততির উপর। হাড়ভাঙ্গা খাটুনি শেষে এরা পায় না পেটভরে খাবার দু'মুঠো ভাত। পরিধানের বস্ত্র লুঙ্গি থেকে গামছাতে নেমেছে, তাও বজায় রাখার সামর্থ এদের নেই।

সারা দেশ আর জাতির উন্নতির জন্য এদের বরণ করতে হয়েছে মানবেতর জীবন। আর 'সভ্য' সমাজের কাছে এরা আনকালচার্ড অসভ্য হিসাবে গণ্য হচ্ছে। এই দুর্বিষহ, দাসতুল্য জীবন থেকে হতভাগ্য শতকরা ৫৩ জন মানুষকে মুক্ত করার চিন্তা নেই ক্ষমতাসীন সরকারের। বছর পাঁচেক পরে একদিনের কামলা বন্ধ রেখে ভোট দিতে যাবার 'অধিকার' গুঁজে দিয়ে চলছে গণতন্ত্রের বড়াই। জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ হিসাবে এদের গুরুত্ব শুধু ভোটের দিনেই, তাও আবার এরা যাদের মজুর খাটে তাদের নির্দেশেই দিতে হয় ভোট। এই প্রহসনের পুনরাবৃত্তি চলছে ও চলবে। কিন্তু আজ প্রশ্ন, অনাহারে, অকালমৃত্যু, রোগব্যাধি, জরা, অশিক্ষা, কুশিক্ষার অন্ধকারে ফেলে রেখে এই সর্বহারা ক্ষেতমজুর শ্রেণীর উপর অত্যাচার ও শোষণের স্টীম রোলার যারা চালাচ্ছে সচেতন জনতা তাদের ক্ষমা করবে কিনা?

তুমি যারে ফেলেছ পশ্চাতে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে– আপোষবাদী কণ্ঠের এরূপ করুণা ভিক্ষার দিন অতীত হয়ে গেছে। শোষকদের উপর প্রচণ্ড আঘাত হানা ছাড়া নরম সুরের কাকুতি মিনতিতে কোন ফল হয়া

না-এটা ইতিহাসের চূড়ান্ত শিক্ষা। দেশের শতকরা ৭০ ভাগ সম্পদ উৎপাদনকারী মেহনতি মানুষকে ধ্বংসের পথে যারা ঠেলে দিচ্ছে তারা শুধু শোষিত মানুষের শত্রু নয়, তারা দেশ, জাতি, স্বাধীনতা এবং আল্লাহর দুশমন। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে অভিশপ্ত জীবন ও অনাহারের পথে ঠেলে দিয়ে আর যাই হোক গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র কায়েম হয় না। নির্যাতিত জনতাই শক্তি-তাদের কণ্ঠই আল্লাহর কণ্ঠ। আজ তাদের জাগাতে হবে। মুখ বুজে অত্যাচার যারা সহ্য করে আল্লাহ তাদের পছন্দ করেন না। শোষিত মানুষ তাই জাগছে। ইতিহাসের চাকা ঘুরাবার অধিকার তাদেরকে হাতে ছিনিয়ে নিতে হবে।

কলকী সমাচার

॥ গাঁজাবাবা ॥

জনাব সৈয়দ ইরফানুল বারীর গ্রেফতার সম্পর্কে প্রথম যে ধারণা করা হইয়াছিল মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বাহাদুরের টেলিগ্রামের পর সেই ধারণা পাল্টায় সত্যি, কিন্তু গ্রেফতার খানাও যেমন বিনা মেঘে বজ্রপাত স্বরূপ ছিল তেমনি মন্ত্রী বাহাদুরের টেলিগ্রাম খানাও বিনা ইস্রাফিলে কিয়ামত।

মাধ্যমে প্রেরণ করিয়াছেন। গ্রেফতারের কারণ ইহাই ধারণা করা হইয়াছিল এবং আশা করা গিয়াছিল যে বোল্ট খানা ব্লু না দিয়া কারণ দর্শাইয়া আইন সঙ্গত উপায়ে হাতকড়া গহনা লাগান হইবে।

কিন্তু মওলানা ভাসানীর নিকট প্রেরিত তার বাণীতে বলা হইয়াছে জনাব বারী স্বাধীনতা সংগ্রাম চলাকালীন অবস্থায় পাক-সরকারের দালালী করিয়াছেন-যে কার্যের নিমিত্ত গারদে পুরিতে কোনই পরওয়ানার সুবন্দোবস্ত দরকার পড়ে না। এই কথা শুনিয়া আমরা চীনের প্রাচীর, মস্কোর ঘণ্টা, মিশরের পিরামিডকে ছার ভাবিতে শুরু করিলাম। তদুপরি আমার এতকালের বিশ্বস্ত পাহাড় বাইয়া আসা নৌকার মালামাল লজ্জায় মাথা হেঁট করিল।

যদি জনাব বারী দালাল– কথাটি সত্য হইয়া থাকে তবে এই কথাটি সরকারী পুলিশ রিপোর্ট যাহা পত্রিকার সনদের আগে সম্পাদিত হইয়াছিল তাহাতে উল্লেখ নাই কেন? সদাশয় সরকার ইহা প্রমাণ করিতে পরিবেন কি– কোথায়, কিভাবে, কেমন অবস্থায় তিনি পাকিস্তানের সহযোগিতা স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে করিয়াছেন? প্রমাণিত হউক বা না হউক জনাব বারী দালাল নিউজখানা এতই

'হক-কথা' সম্পাদককে গ্রেফতার প্রসঙ্গে সরকার জবর দম দিয়াছেন

স্বার্থবাদীরা গণ্ডদেশের ধমনী ফুলাইয়া বলিয়া বেড়াইতেছিল 'হক-কথা' নিউজ ডিসটরট করিতেছে। কিন্তু জনাব আপনারা যে বাংলাদেশে, দেশের গণকল্যাণ, মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের হক পাওনা, টেস্ট রিলিফের দ্রব্যাদি অহোরাত্র ডিসটরট করিয়াই চলিয়াছেন সেই সকল ডিসটরশানের নিউজ প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক কারণেই ডিস্টরটেড নিউজ বৈ কি! এই অপবাদের কথা মন্ত্রী মহোদয় মওলানা ভাসানীর নিকট তারবাণীর

ডিসটরটেড যাহার ডিসটরশানের সীমাহীনতা যে কোন কিছুর চাইতেও বেশি তাজ্জবকেও হার মানাইতে পারিতেছে।

সরকার কখনও ভাবিয়াছেন কি কলেজে পড়াকালীন সময়ে গুরুদয়াল কলেজের একজন কৃতী ছাত্র সৈয়দ ইরফানুল বারী কিশোরগঞ্জের তদানীন্তন বিপ্লবী নেতা মরহুম জনাব আবু তাহের খান পাঠান যিনি শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে চালিত আওয়ামী লীগের একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন তাহারই সাহচর্যে

লালিত। মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম বীর সৈনিক কিশোরগঞ্জ আজিমুদ্দিন হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক জনাব মতিউর রহমান যখন তাঁহার বাড়ীঘর-ভস্মীভূত অবস্থায় ফেলিয়া নিজ পুত্রকে স্বাধীনতা সংগ্রামে কোরবাণী দানের পর নিজে অজ্ঞাত বাসে থাকিয়া সংগ্রাম চালাইতেছিলেন সৈয়দ ইরফানুল বারী কি তখন যোগাযোগ ও খবরাখবর দ্বারা কিশোরগঞ্জ ও ঢাকা জেলার রায়পুরা অঞ্চলের মুক্তিসেনাদেরকে জনাব মতিউর রহমান মারফত সাহায্য করেন নাই? জীবিকার জন্য পয়গাম পত্রিকায় চাকুরী করা কি করিয়া দালালী হইতে পারে? তাছাড়া তিনি এনএসএফ অথবা কনভেনশন মুসলিম লীগের সাহায্য কিংবা কোন প্রকার সহযোগিতা করিয়াছেন এমন প্রমাণ কোথাও পাওয়া যাইবে কি? অন্যদিকে তিনি নিজের পয়সায় ভাড়া করিয়া নারিন্দার যে ঘরটিতে বসবাস করিতেন তাহাতে এনএসএফ কিংবা কোন দালালের স্পর্শ পাওয়া যাইত কিনা তাহা প্রত্যক্ষদর্শী মাত্রেই বিবেচনা করিতে পারিবেন। তাহা ছাড়া তিনি মোনেম আমলে কয়খানা লাইসেন্স ও কয়খানা সুবিধাজনক চাকুরী বাগাইয়াছিলেন ইহার ফিরিশতিও অন্ততঃ জানাশোনা সবার কাছেই পাওয়া যাইতে পারে। তবে পয়গামে চাকুরী ও মোনেম খানের আত্মীয়তায় যদি সৈয়দ ইরফানুল বারী দালাল হইয়া থাকেন তবে একা এক বারীকে গ্রেফতারই যথাযোগ্য নয়। সমগ্র বাংলাদেশ ব্যাপী অসংখ্য তদানীন্তন কনভেনশানী হোমরাচোমরাদের আত্মীয় স্বজনসহ পয়গামের তদানীন্তন সকল কর্মচারীদের কেই কিছু না কিছু দোষী সাব্যস্ত না করিলে সরকারকে আমরা দালাল ছাড়িয়া দেওয়া দোষে দোষী সাব্যস্ত করিতে পারিব। এই প্রসঙ্গে আমি ইহাও উল্লেখ করিতে চাই যে প্রধানমন্ত্রীর বর্তমান প্রেস সেক্রেটারি জনাব মাহবুবুল আলমও কি এককালে পয়গামে সৈয়দ ইরফানুল বারীর চাইতেও অধিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন না এবং গভর্নর মোনেম খানের প্রশংসায় অজ্ঞান ও কুখ্যাত খসরুর একজন নিকটতম উপদেষ্টা ছিলেন না? তাহা ছাড়া, মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর শ্যালক-যিনি তাহার শ্লোগানমার্কা সাপ্তাহিকটির প্রকাশক বনিয়াছেন-তিনি কি করিয়াছেন? স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষদিকে জনাব বারী পয়গামেই ছিলেন ও খসরুর সহিত সংস্পর্শও তাহার ছিল এবং এই জন্য তিনি ইতিপূর্বে মওলানা ভাসানীর ব্যক্তিগত সেক্রেটারি থাকার দরুণ তাহার প্রাণহানির সম্ভাবনাও তিরোহিত হইয়াছিল। কিন্তু এর মধ্যে থাকিয়াও তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে সমর্থন ও সাহায্য করিয়াছিলেন ইহাও সত্য।

বেশ কিছুদিন পূর্বেও একই কলকীতে দম দিয়া আমি বাংলাদেশের পত্রিকাগুলির ভূমিকার কথা কিঞ্চিত বয়ান করিয়াছিলাম। এইবারও আমি সরকারকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে পত্রিকায় চাকুরী করিতে গিয়া অনেক বিশ্বস্ত মুক্তিকামী বাঙ্গালী বিগত নয়মাস প্রধানমন্ত্রী ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে সঙ্গতি রাখিয়া লিখিয়াই গিয়াছেন। এই জন্য আমাদের ধারণা তাহাদিগকে কিছুতেই দালাল কিংবা পাকিস্তানী জঙ্গী জান্তার সহযোগী বলিতে পারি না। কাগজে কলমে যদিওবা তাহারা দালালী রীতিমত লিখিতভাবেই করিয়াছেন। জনাব বারীর পয়গামের সাংবাদিকতাও যে একই প্রকার সাংবাদিকতা ছিল ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। তবে, সরকার তাহাকে হাতকড়া লাগাইতে চাহিলে অনেক উপায়েই পারেন। স্রোতের উজানে থাকিয়া জল ঘোলা করিয়াছে অথবা সে না করিয়া থাকিলে অন্য কেউ কোন না কোন উপায়ে তাহার আত্মীয় ছিল এবং সেই জল ঘোলা করিয়াছিল বলিয়া শাস্তি বিধানের

একপ্রকার প্রথা মোটামুটি কোন কোন অধিষ্ঠিত মহলে প্রচলিত আছে।

গণপরিষদের আইনগত ভিত্তি কোথায়?

বাংলাদেশের শাসনতন্ত্র নিয়ে যে কেলেঙ্কারী হয়ে গেল, এর পরিপ্রেক্ষিতে শাসনতন্ত্রের সামগ্রিক পটভূমি বিশ্লেষণ করার জন্য প্রশ্ন করতে হয়, বাংলাদেশের ক্ষমতায় আসীন এই সরকার কি বাংলাদেশের জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকার, না তারা বিপ্লবী সরকার অথবা তাঁরা ভারতের আশ্রিত সরকার?

জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহে টাঙ্গাইলের জনসভায় জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এ প্রশ্নটিই উত্থাপন করেছিলেন।

তাঁর সে প্রশ্নের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে নতুন প্রশ্ন হিসাবে, পরিপূরক জিজ্ঞাসা হলো, বর্তমান সরকার যে পরিষদের বরাত দিয়ে শাসনতন্ত্র বানাচ্ছেন, শাসনতন্ত্র রচনার আইনানুগ অধিকার কি সেই গণপরিষদের আছে? বর্তমান সরকার নিজেকে বিপ্লবী সরকার হিসাবে পরিচয় দান করতে আহলাদ অনুভব করে। যদিও বিদেশী শক্তির কাছে মাথা নত করে ও তার পদতলে আশ্রয় নিয়ে এ সরকার আশ্রিত সরকারে পরিণত হয়েছে তথাপি তর্কের খাতিরে তাদের বক্তব্যই সঠিক বলে ধরা যাক।

ক্ষমতাসীন সরকার বহুবার নিজেকে বিপ্লবী সরকার হিসাবে ঘোষণা করেছে। প্রতিটি রাষ্ট্রবিপ্লবের অর্থ হচ্ছে, সাবেক রাষ্ট্রযন্ত্রকে ভেঙে সম্পূর্ণ নতুন ভিত্তি ও মূল্যবোধ দিয়ে নতুন রাষ্ট্রের পত্তন করা। অতীতের আইন-কানুন, অর্ডিন্যান্স, অর্ডার সবকিছু বর্জন করে সম্পূর্ণ বিপ্লবী রীতিতে নতুন ভিত্তি রচনাই হলো বিপ্লবী সরকারের করণীয়।

যদি এ সরকার বিপ্লবী সরকার হয়ে থাকে তবে পাকিস্তান আমলের আইন-কানুন, অর্ডিন্যান্স এবং সরকারী রীতি এরাই ধ্বংস করে এগিয়ে এসেছে নতুন রাষ্ট্র ও ব্যবস্থার পত্তন করতে, অথচ বাস্তবে বিশেষ করে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের প্রহসনে তাঁর প্রমাণ আছে কি? নেই।

পাকিস্তান আমলে অখণ্ড পাকিস্তানের কাঠামোধীনে ইয়াহিয়া খানের লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডার বা আইনগত কাঠামো আদেশের অধীনে যে নির্বাচন হয়েছিল আওয়ামী লীগ তাতে অংশ নিয়েছে। ইয়াহিয়া খানের পাঁচ দফার শর্ত মেনে এরা নির্বাচনে গিয়েছিল। এরা অখণ্ড পাকিস্তানের অস্তিত্বের প্রতি আইনানুগ স্বীকৃতি না দিয়ে নির্বাচনে যেতে পারেনি। সেই নির্বাচনে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য জাতীয় পরিষদ তথা গণপরিষদ নির্বাচিত হয়েছিল তৎসহ নির্বাচিত হয়েছিল প্রাদেশিক পরিষদ। তদানীন্তন পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের জন্য যারা পাকিস্তানের এই অংশ থেকে নির্বাচিত হয়েছিল তাদের আইনানুগ মর্যাদা নুরুল আমীন প্রমুখের পর্যায়ে। এছাড়া প্রাদেশিক পরিষদ তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান পরিষদের সদস্য হিসাবে যারা নির্বাচিত হয়েছিল তারা শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করার অঙ্গীকার বা ক্ষমতা জনগণের কাছ থেকে পায়নি। পাকিস্তান টিকে থাকলে এরা প্রাদেশিক পরিষদে প্রাদেশিক বাজেট, ওয়ার্কস প্রোগ্রামের অর্থবরাদ্দ নিয়ে সামান্য চেঁচামেচি ছাড়া আর কিছুই করতো না। মজার ব্যাপার হলো, পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অর্ধেকাংশ পূর্ব পাকিস্তান পরিষদের পুরো অংশকে যুক্ত করে এই তথাকথিত 'বিপ্লবী' সরকার স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের গণপরিষদ গঠন করলেন। অথচ এর আইনগত ভিত্তি কোথায়? এই পরিষদ সদস্যরা পাকিস্তানী, পাকিস্তানের সাবেক ব্যবস্থা ভেঙেচুরে নতুন রাষ্ট্রের পত্তন করা হয়েছে, তাহলে এরা

কিভাবে পরিষদের সদস্য হচ্ছে এবং গণপরিষদই বা হলো কিভাবে? এটা কি প্রধানমন্ত্রী আর রাষ্ট্রপ্রধান ইচ্ছা করলেই হয়ে যাবে? তারা বিপ্লবী সরকারের নেতা হিসাবে বিপ্লবী পদক্ষেপ নিতে পারেন, কিন্তু তাই বলে মরাঘোড়াকে জিন্দা করতে পারেন না।

আজ দেশের আদালতে এসব প্রশ্ন তুলে মামলা করার অধিকারও এ সরকার কেড়ে নিয়েছে। কিন্তু যদি আজ হাইকোর্টকে এই জটিলতা সম্পর্কে রায় ঘোষণার অধিকার দেওয়া হয় তাহলে জনগণের পক্ষ থেকে মামলা উঠানো হলে এর অবশ্যম্ভাবী রায় হবেঃ পাকিস্তান আমলের এমএনএ ও এমপিএদের কোন অধিকার নেই, বাংলাদেশের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন তারা করতে পারে না।

অথচ বাংলাদেশ সরকার এই বেআইনী ব্যবস্থা বহাল রাখার পরে এ গণপরিষদের নামে শাসনতন্ত্রও পাশ করিয়ে নিতে যাচ্ছে।

রাজনৈতিক ব্যাখ্যার আলোকে এ পরিষদটির অস্তিত্বের বৈধতা যাচাই করলে দেখা যাবে একই মুখে জয়বাংলা জয় পাকিস্তান শ্লোগান দিয়ে, সুখী সমৃদ্ধ পাকিস্তান গঠনের শ্লোগান আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের ৬ দফা নিয়ে এরা নির্বাচনের বৈতরণী পার হয়েছিল। পাকিস্তান কায়েম থাকাকালে এবং বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হবার পর এই দুই সময়ের মধ্যকার ব্যবধান মাত্র ৯ মাস হলেও রাজনৈতিক সচেতনতা, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও মূল্যদানের দিক দিয়ে জনগণ অনেক এগিয়ে গেছে। একটি করে ভোট দিয়ে ১৯৭০-এ বাঙ্গালীরা যাদের নির্বাচন করেছিল, সেই নির্বাচন ও ভোটদানের পটভূমি ছিল ২৩ বৎসরে ৫০০০ কোটি টাকা লুট ও অত্যাচার। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাসে ৩০ লাখ সন্তানকে বলি দিতে হয়েছে, এ মূল্যদান বিশ্বের ইতিহাসকে কাঁপিয়ে তুলেছে, অথচ হত্যাকারী পাকিস্তানী জেনারেল ইয়াহিয়ার লিগ্যাল ফ্রেম ওয়ার্ক অর্ডারও পাঁচ দফাকে টলাতে পারলো না, এটা কেমন কথা?

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

নতুন ঝড়ের ইশারা এসেছে

বুলবুল খান মাহবুব

পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম
দিন থেকে রাত্রি আর রাত্রি থেকে প্রভাতের সবুজ প্রান্তরে।

কি আশ্চর্য স্বদেশের রৌদ্রময় ছায়া
যুগ যুগ মুক্তির সাগর সৈকতে
শব্দহীন কান্নার হাতে হাত রেখে
বসে আছে, বসে আছে আমার স্বদেশ
কাঙ্ক্ষিত জীবনের কাছে
কি গভীর প্রত্যাশা নিয়ে।

পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম
হাওয়ার সোহাগ নিয়ে শস্যের সবুজ শিশুরা
খেলা করে, বিহ্বল দৃষ্টি মেলে জনক কিষাণ
বলে শুধু শান্তি দাও, চিরদিন থাকে যেন বসন্তের ঋতু
যেন আর ক্ষুধার হায়েনা
আমাদের রক্ত মেখে হিংস্র নখরে
বাংলার জোছনায় খেলা না করে
যেন আর বঞ্চনার দিন
বিলাসীর পান পাত্রে না হয় রঙিন
আমাদের অশ্রু যেন রক্ত হয়ে আর
এই বাংলার
পথে পথে না ঝরাতে হয়
মুক্ত স্বদেশে হোক শোষকের শেষ পরাজয়।

পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম
স্বাধীনতা, রক্তের দামে কেনা সেই স্বাধীনতা
ধর্ষিতা জননীর লজ্জা দিয়ে কেনা
মুক্তির প্রার্থিত গান
হয়না ধ্বনিত কেন বাংলার বুকে
রক্ত কেন উঠে আসে ক্ষুধাতুর মানুষের মুখে
এখনও স্বদেশে দেখি পল্লবীতে লোভের অঙ্কুর
হায়েনার মৃতদেহে জন্ম হয় নতুন পশুর।

ব্যর্থ তবে আত্মদান, এতো রক্ত মানুষের শত লাঞ্ছনা
বারুদের গন্ধভরা আমাদের কালবেলা
মূল্যহীন! বিধ্বস্ত বাংলার বুকে
আজ শুধু উন্মুক্ত লালসার খেলা।
পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম
দূর আরো বহুদূর মুক্তিহীন আকাঙ্ক্ষার কাছে
ক্লান্ত যোদ্ধা আমি, তবু আছে ঢের যুদ্ধ বাকী
শত্রুর মুখোমুখি কি করে এখন
অস্ত্র ফেলে রাখি
পিশাচ বধের খেলা শেষ হলে বাংলার বুকে
এবার রুখতে হবে ঘরের শত্রুকে
কিসের সঙ্গীত শুনি রাত্রিদিন মৃত্তিকার বিক্ষত বুকে
কিসের উপমা খুঁজি দীর্ঘশ্বাস গুণে
অন্তহীন স্বপ্নগুলো ভেঙে গেলে কে যেন হাওয়ার
গভীর গভীরে শুধু বলে গেল শত্রুবধ খেলারত শিশুদের কানে
বাতাসে বারুদ আজো গন্ধ ছড়ায়
নতুন ঝড়ের ইশারা এসেছে বিক্ষত বাংলার
শোষিত মানুষ যুদ্ধ শেষের ডাকে
হাতে হাতে হাত রাখে।

পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম
শ্রেণী যুদ্ধের মহড়ায় ব্যস্ত বাংলার লাখো গ্রাম।

সত্যকে দেখা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমাদের ধ্যানের দ্বারা সৃষ্টিকর্তাকে সৃষ্টির মাঝখানে ধ্যান করি। ভূর্ভুবস্বঃত হতেই সৃষ্টি হচ্ছে, সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, তারা। প্রতি মুহূর্তেই তার থেকে প্রকাশ হচ্ছে–আমাদের চৈতন্য প্রতি মুহূর্তেই তাঁর থেকে প্রেরিত হচ্ছে–তিনিই অবিরত সমস্ত প্রকাশ করছেন, এই হচ্ছে আমাদের ধ্যান।

এই দেখাকেই বলে সত্যকে দেখা। আমরা সমস্ত ঘটনাকে কেবল বাহ্য ঘটনা বলেই দেখি। তাতে আমাদের কোন আনন্দ নেই। সে আমাদের কাছে পুরাতন হয়ে যায়–সে আমাদের কাছে দম দেওয়া কলের মত আকার ধারণ করে ; এই জন্যে পাথরের নুড়ির উপর দিয়ে যেমন স্রোত চলে যায় সেই রকম করে জগৎস্রোত আমাদের মনের উপর দিয়ে অবিশ্রাম বয়ে যাচ্ছে– চিত্ত সাড়া দিচ্ছে না–চারিদিকের দৃশ্যগুলো তুচ্ছ এবং দিনগুলো অকিঞ্চিৎকর হয়ে দেখা দিচ্ছে–সেই জন্যে কৃত্রিম উত্তেজনা এবং নানা বৃথা কর্ম্ম সৃষ্টি দ্বারা আমরা চেতনাকে জাগিয়ে রেখে তবে আমোদ পাই।

যখন কেবল ঘটনার দিকে তাকিয়ে থাকি তখন এই রকমই হয়–সে আমাদের রস দেয় না, খাদ্য দেয় না। সে কেবল আমাদের ইন্দ্রিয়কে, মনকে, হৃদয়কে কিছু দূর পর্যন্ত অধিকার করে–শেষ পর্যন্ত পৌঁছায় না–এই জন্যে তার যেটুকু রস আছে তা উপরের থেকেই শুকিয়ে আসে–সে আমাদের গভীরতর চেতনাকে উদ্বোধিত করে না। সূর্য্য উঠেছে তো উঠেছে–নদী বইছে তো বইছে–গাছপালা বাড়ছে তো বাড়ছে–প্রতিদিনের কাজ নিয়মিত চলছে তো চলছে। সেই জন্যে এমন কোন দৃশ্য দেখতে ইচ্ছা করি বা প্রতিদিন দেখিনে–এমন কোন ঘটনা জানতে কৌতূহল হয় যা আমাদের অভ্যস্ত ঘটনার সঙ্গে মিলে না।

কিন্তু সত্যকে যখন জানি তখন আমাদের আত্মা পরিতৃপ্ত হয়। সত্য চির নবীন, তার রস অক্ষয়। সমস্ত ঘটনাবলীর মাঝখানে সেই অন্তরতম সত্যকে দেখলে দৃষ্টি সার্থক হয়। তখন সমস্তই মহত্বের বিস্ময়ে আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠে। এই জন্যেই আমাদের ধ্যানের মন্ত্রে আমরা প্রতিদিন অন্ততঃ একবার সমস্ত

মুরিদের দরবার

বিশ্বব্যাপারের মাঝখানে বিশ্বের যিনি পরম সত্য তাঁকে ধ্যান করবার চেষ্টা করে থাকি। ঘটনাপুঞ্জের মাঝখানে যিনি একমূল শক্তি তাকে দর্শন করবার জন্যে দৃষ্টিকে অন্তরে ফেরাই। তখন দৃষ্টি থেকে জড়ত্বের আবরণ ঘুচে যায়–জগৎ একটা যন্ত্রের মত আমার অভ্যাসের কক্ষ জুড়ে পড়ে থাকে না–প্রতি মুহূর্তেই অনন্ত আকাশব্যাপী প্রকাণ্ড প্রকাশ একটি জ্ঞানময় সত্য হতে নিঃসৃত হচ্ছে ইহাই অনুভব করে আমাদের চেতনা পরিপূর্ণ হয়ে উঠে তখন অগ্নি জল ঔষধি বনস্পতির মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলতে পারি, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত ব্রহ্ম, সর্বত্রই আনন্দরূপে অমৃতরূপে তাঁর প্রকাশ। (সংক্ষিপ্ত)

কৃষক শ্রমিক সর্বহারা ও মেহনতি মানুষদের প্রতি
আমার আবেদন

সরকার দিনের পর দিন বিভিন্ন অর্ডিন্যান্স জারী করে বাংলাদেশের শাসনকার্য পরিচালনা করছে। চোরাকারবারী, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, সমাজবিরোধী প্রভৃতি শ্রেণীদেরকে নির্মূল করার কথা প্রচার করে লালবাহিনী এবং রক্ষীবাহিনী গঠন করে নিজেদের অস্তিত্বকে বজায় রাখার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছে। কিন্তু খাদ্য এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম কমার বদলে ক্রমাগতভাবে বাড়ছে। চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি এবং গুণ্ডহত্যা বেড়েই চলছে। এদিকে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া ঘনিয়ে আসছে। কৃষক-শ্রমিকসহ সর্বশ্রেণীর মেহনতি মানুষের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠছে। এগুলোর প্রতিকারের জন্য জনগণের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন অনিবার্য হয়ে উঠেছে। তাই কাল বিলম্ব না করে প্রত্যেক ইউনিয়ন, থানা এবং মহকুমার ন্যাপ ও কৃষক সমিতির সংগঠনকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলার জন্য কৃষক-শ্রমিক, ছাত্র-যুবক এবং প্রতিটি মেহনতি জনগণ আন্তরিকভাবে চেষ্টা করুন। গণসংগঠনের দ্বারাই ইনশাহআল্লাহ দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হবে। চোরাকারবারী, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি প্রভৃতি গণবিরোধী

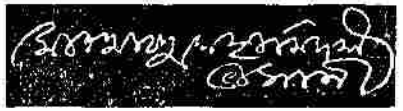
ভাসানীর বাণী

ধনী কখনো গরীবের বন্ধু নয়, জালেম এবং শোষকও শোষিত মানুষের বন্ধু নয়। দুনিয়া থেকে শোষক শ্রেণীকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করতে না পারলে শোষণমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করা সম্ভব হবে না। তাই নির্যাতিত, অধিকার বঞ্চিত কৃষক-শ্রমিক, ছাত্র-যুবক নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর নিপীড়িত মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে নিজ নিজ এলাকায় কৃষক সমিতি ও ন্যাপের সংগঠন গড়ে তুলুন। আল্লাহ আমাদের সহায় হবেন। শ্রেণী সংগ্রামের মাধ্যমেই বিশ্বের শোষিত মানুষের মুক্তির একমাত্র উপায় সমাজতন্ত্র কায়েম সম্ভব হবে। দুনিয়ার সমস্ত সম্পদের মালিক একমাত্র আল্লাহ এবং আল্লাহর বান্দা জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে এই সম্পদের সম-বন্টন করতে পারলেই বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

কার্যকলাপ, সমাজ থেকে চিরকালের জন্যে উচ্ছেদ সম্ভব হবে। বাংলাদেশের আয়তন এবং জনসংখ্যা পার্শ্ববর্তী ভারতের চেয়ে অনেক কম হলেও বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি সংগ্রামী মানুষকে বিদেশীদের প্রভুত্ব স্পর্শও করতে পারবে না। সাড়ে সাত কোটি বাঙালী একত্রিত হয়ে আন্তরিক নিষ্ঠার সাথে গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করলেই দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের পরিপূর্ণতা আনয়ন সম্ভব হবে। আগামী সাধারণ নির্বাচন না হওয়া কাল পর্যন্ত সরকার দেশের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করুক না কেন, তারা গণপ্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের দাবী করতে পারবে না।

পাকিস্তান সরকারের অধীনে ও তত্ত্বাবধানে যে নির্বাচন হয়েছিল, তা পাকিস্তানের পতনের সাথে সাথেই বিলুপ্ত হয়েছে। আগামী নির্বাচনে যারা জনগণের প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে সরকার গঠন করবে সেই সরকারই হবে বাংলাদেশের প্রকৃত সরকার। শতকরা ৯৫ জন কৃষক-শ্রমিক সর্বহারা এবং মেহনতি মানুষ পাকিস্তানের ২৪ বৎসরের স্বৈরাচারী শাসনের ফলে ধ্বংসের মুখে পতিত হয়েছে। তাদেরকে রক্ষা করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে বাংলাদেশের গণনির্বাচিত সরকারকেই। বিশ্বকে দেখাতে হবে যে, বিগত ২৪ বছরে পাকিস্তান সরকারগুলো বাংলাদেশের জনগণকে শুধু শোষণই করেছে–তাদের উন্নতির জন্যে কিছুই করেনি; শোষিত কৃষক-শ্রমিক সর্বহারা তথা মেহনতি মানুষদেরকে শোষণের হাত থেকে অত্যাল্পকালের মধ্যেই রক্ষা করে বাংলাদেশের স্বাধীন সরকার তাদের সর্বাঙ্গীন উন্নতির বিধান করতে সক্ষম হয়েছে।

শুধু প্রচার-প্রপাগান্ডা দ্বারা সাড়ে সাত কোটি মানুষের আস্থা অর্জন করা সম্ভব হবে না। কাজের ভিতর দিয়ে প্রমাণ করতে হবে যে স্বাধীন বাংলার সাড়ে সাত কোটি বাঙালী ও বাংলাদেশ সরকার কঠোর পরিশ্রম করে মাতৃভূমিকে সুখী ও সমৃদ্ধিশালী করে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। বিদেশী প্রভাব ও প্রভুত্বের কবল থেকেও চিরকালের জন্য মুক্তি লাভ করেছে।



এমসিএদের কাণ্ড

ফন্দী থেকে ফিকির

সরকার ১০ ও ৫ টাকার নোট বাতিল ঘোষণা করলে যশোর জেলার কেশবপুরের এমসিএ সাহেব জবর ফ্যাসাদে পড়ে যান। টু পাইস তিনি কম কামাননি। শেষে তিনি এক অপূর্ব পন্থার উদ্ভাবন করেছিলেনঃ এমসিএ সাহেবদের দৌরাত্মের ফলে বাংলাদেশে অভাবী মানুষের তো আল্লায় দিলে অভাব নেই-জনপ্রতি এক সের চাল দেয়ার অঙ্গীকার করে তিনি জনা ৮০ মজুরকে টাকা বদলানোর জন্যে ব্যাংকের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন।

মজুররা টাকা বদলিয়ে দিয়ে চালের জন্য আবার লাইন দিয়ে দেখতে পেল ঃ এমসিএটির এক চাঁই তাদের প্রাপ্য রিলিফের মাস্টার রোলে টিপ সই নিয়ে চাল দিচ্ছে। অতঃপর নেচারাল এ্যাকশনঃ বিক্ষুব্ধ শ্রমিকদের গুণগুণানী শেষে বিক্ষোভে পরিণত হলো। এমসিএ সাহেবও পিছিয়ে থাকার লোক নন–লেলিয়ে দিলেন শ্রমিক লীগের গুণ্ডাদের– তারা নিরীহ মজুরদেরকে পেটালো। অতঃপর থানা এবং তারও পর যা হবার তা-ই।

পলায়ন শেষে ক্লিক

দিনাজপুরের জনৈক এমসিএ এখন ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকার ৪ নম্বর সড়কে দিনগুজরান করছেন। স্বাধীনতার পর সরকার তার হাতে রিলিফের কয়েক লক্ষ টাকা এবং অষুধ বিতরণের যে ভার দিয়েছিলেন, দেশের অধিকাংশ এমসিএ-র মতো ইনিও সে টাকার বেশীর ভাগই মেরে দিয়েছেন, সমুদয় অষুধ পাচার করে দিয়েছেন মিত্র রাষ্ট্রে। ঘটনা গোপন থাকেনি-প্রচার হওয়ার সাথে সাথে জনতা এমসিএ এবং তার সাঙ্গপাঙ্গদের পাকড়াও করেছে, কয়েকজনের হাত ভেঙ্গেছে, বাকি সকলেই হাসপিটালাইজড। এমসিএ সাহেব সপরিবারে পলায়ন করেছেন। তারপর ধানমণ্ডি এসে উঠেছেন এক প্রাক্তন মন্ত্রীর বাংলে। এখন তিনি ক্লিক করছেন মন্ত্রীর ছেলে-মেয়েদের সংসারে ভাঙন সৃষ্টির সদোদ্দেশ্যে।

দালাল-জামাই-বেয়াই-দরদী

জোদার দক্ষিণাঞ্চলের এমসিএ সাহেব দালাল-দরদী সেজেছেন। ঐ এলাকার শান্তি কমিটির কুখ্যাত চেয়ারম্যান ঢাকায় পালাতে গিয়ে ধরা পড়ে রমনা থানায় আটক হলে এমসিএ সাহেব পাগলের মতো ঢাকা ছুটে গিয়ে তাকে মুক্তির ব্যবস্থা করে দেন। পাক-বাহিনীর বড় বড় দালালদের তিনি মোটা অংকের সম্মানিকের বিনিময়ে সার্টিফিকেট দিয়েছেন। সম্প্রতি আমদানী-রফতানী লাইসেন্স বিলির ভার হাতে পেয়ে তিনি আওয়ামী লীগারদের ছাড়াও নিজের বেয়াই আর জামাইদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছেন। এখন তিনি দেশপ্রেমিকদেরকে নকশাল বলে ধরিয়ে দেয়ার অভিযানে নেমেছেন।

ডাঃ পিটনি খান

এককালে পাঁচ টাকা ভিজিটেও যার কাছে রুগী আসার ভরসা পেতো না, সিলেটের সেই ডাক্তার এমসিএটি স্বাধীনতার পরপরই হাসান মার্কেটস্থ জনৈক উর্দুওয়ালীর লিবার্ট স্টোর্সের চার লক্ষ টাকা মূল্যের সমুদয় অষুধ এনে আম্বরখানাস্থ নিজের ফ্যাকাশে বদনী ফার্মেসীর শোভাবর্ধন করেছেন। তাছাড়া উনি ঐ মালিকের বাসাও দখল করে নিয়েছেন। নিজের সুবিধে আদায় করতে না পেরে ইনি কিছুদিন আগে চক্রান্ত করে সিলেট মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপালকে বদলী করালে ছাত্র-ছাত্রীরা তাকে ঘেরাও দিয়ে পর্যাপ্ত উত্তম-মধ্যম দান করেছেন। জানা গেছে এ ব্যাপারে ছাত্রীরাও অংশ নিয়েছিলেন। তথ্য অনুসন্ধান কমিটির মেম্বার হিসেবে এই এমসিএ সাহেব ঘুষের বিনিময়ে অনেক দালালকেই 'ভালো' সার্টিফিকেট দিচ্ছেন। তাছাড়া গত ২৭শে জুন সিলেট সফরকালে জনসভায় শেখ সাহেব ভাষণ দিতে গিয়েও যে মাইকের গোলযোগের দরুণ পারেননি তার কারণ নাকি এই এমসিএটির সাথে আরেক এমসিএ গাজী সাহেবের কোন্দলজনিত পরিণতি।

হুমকি মাস্টার

টঙ্গীর শাহানশাহ এমসিএটি জয়দেবপুরের পুবাইল ইউনিয়নের জন্যে বরাদ্দ দশ টন টেউটিনের মধ্য থেকে মাত্র তিন টন গায়েব করে দিয়েছেন। এ ব্যাপারে কিছু বলতে গেলে তার হুমকির দাপটে সবাইকে পানি খেতে হচ্ছে।

রিলিফী টিউবওয়েল ঘেরাও এবং পুলিশ

কুমিল্লা জেলার মতলবের জনৈক এমসিএ রিলিফের বরাদ্দ থেকে নিজের বাড়ীতে একটি এবং নিজস্ব আর এক চাঁই চেয়ারম্যানের বাড়ীতে একটি টিউবওয়েল স্থাপন করেছেন।

স্থানীয় যুবকেরা খবর পেয়ে তাদের বাড়ী ঘেরাও করে টিউবওয়েলের কিছু অংশ ছিনিয়ে নিয়ে যায়। বলাবাহুল্য, উনারা তখন বাড়ীতে ছিলেন না। পরে পুলিশ দিয়ে সে সব আবার ফেরৎ নিয়ে এমসিএটি বেহায়াপনার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন।

দালালের ঘরে

বাগেরহাটের জনৈক এমসিএ এক দালাল ডাক্তারের বাসা জবর দখল করে দিনাতিপাত করছেন। ডাক্তারটির স্ত্রী তার অসহায় সন্তানদের নিয়ে যেখানে সেখানে রাত কাটালেও এমসিএ সাহেবের দয়া হচ্ছে না। উনার বাসায় কেউ দেখা করতে গেলে দেখবেন দু'জন রিভলবার-হাতী দেহরক্ষী তাকে গার্ড দিচ্ছে, আর একজন সেবা করছে। ডাক্তার দালালী করেছে, তাই বলে তার স্ত্রী সন্তানরা কী দোষ করলো যে তাদের তাড়িয়ে দিয়ে এমসিএ বাহাদুর নিজে বাসা দখল করে থাকবে?

হারিয়েছে

আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স হারিয়ে গেছে। কেউ পেয়ে থাকলে দয়া করে ঢাকার আজিমুরে ফুট মোটর গেরেজে পৌঁছে দিলে বাধিত হবো।

জাফর আহমদ

টঙ্গীর নির্বাচনে সরকারী শ্রমিক লীগ
কাহিল কুপোকাৎ

সারাদেশে শ্রমিক শ্রেণীর ওপর একচ্ছত্র আধিপত্য কায়েম করার উদ্দেশ্যে শোষক শ্রেণীর লেজুড় সরকারী শ্রমিক লীগ যে তৎপরতা চালিয়ে আসছিল সম্প্রতি টঙ্গীর বিভিন্ন কলকারখানায় অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বীর শ্রমিকরা তার জবাবে বলিষ্ঠ আঘাত হেনেছেন। এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত নয়টি কলকারখানার নির্বাচনে আটটিতে মওলানা ভাসানী সমর্থক বাংলা শ্রমিক ফেডারেশন বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করেছে। একটিতে মাত্র ছয় ভোটের ব্যবধানে শ্রমিক লীগ জিততে পেরেছে। শেখ মুজিবের দোহাই, তথাকথিত সমাজতন্ত্রের আশ্বাস, প্রচুর অর্থের ছড়াছড়ি এবং গলাকাটার প্রকাশ্য হুমকি সত্ত্বেও বাংলা শ্রমিক ফেডারেশন অলিম্পিয়া টেক্সটাইলে শতকরা ৮০ ভাগ, জিনাত টেক্সটাইলে শতকরা ৮৫ ভাগ, মনু টেক্সটাইলে শতকরা ৭৫ ভাগ ও আগাজ রাবারে শতকরা ৮০ ভাগ ভোট পেয়েছে। নিশাত জুট মিলেও নৌকার প্রতীক নিয়ে অবতীর্ণ শ্রমিক লীগ শোচনীয় পরাজয় বরণ করেছে। এছাড়া অন্য তিনটি কারখানার বারবার নির্বাচনের তারিখ বদলানো হলেও তারা প্রার্থী দাঁড় করাতে সাহস পায়নি। টঙ্গীর নির্বাচনে সবচেয়ে খেল দেখিয়েছে মস্কোর দালাল সংগঠন ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র। তারা শুধু জিনাত টেক্সটাইলেই অংশ নিয়েছে। ১৮০০ শ্রমিকের মধ্যে মাত্র ২৩টি ভোট তাদের কপালে জুটেছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার খায়েশে ইতিপূর্বে শ্রমিক লীগের গুণ্ডারা টঙ্গীর

টাঙ্গাইল থানা ন্যাপের
কাউন্সিল সভা

আগামী ১৬ই জুলাই রোববার বেলা দুটোয় টাঙ্গাইল শিবনাথ উচ্চ বিদ্যালয় মিলনায়তনে থানা ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত হবে। সভায় দেশের বর্তমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পর্যালোচনা করা হবে। দলীয় সদস্যদের উক্ত সভায় উপস্থিত থাকার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে।

নিরীহ শ্রমিকদের ওপর এলএমজির ব্রাশ ফায়ার পর্যন্ত করেছিল।

সোনার বাংলা জুটমিলে
'লালবাহিনী' কৃপা

মামুর মদদে নিযুক্ত অযোগ্য প্রশাসকের কৃপায় মুন্সীগঞ্জের সোনার বাংলা জুট মিল ছ'মাস কাল বন্ধ থাকার পর খোলার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু আজব লীগের শাখা শ্রমিক লীগ ও তথাকথিত লালবাহিনীর কৃপায় আবার বন্ধ হয়েছে। ফলে হাজার হাজার শ্রমিক এখন অর্ধাহারে অনাহারে দিন কাটাচ্ছে।

দাঙ্গা বাঁধাও লোপাট কর
সমাজতন্ত্র কায়েম কর!

মুখে শ্রমিক কল্যাণের বড় বড় বুলি কপচিয়ে সমাজতন্ত্র কায়েমের শপথে নানা পদের লম্ফ ঝম্প দানকারী শ্রমিক লীগ আদমজী নগরে দাঙ্গা বাঁধিয়ে দিয়ে শত শত শ্রমিকের রক্তে

ফরাসী বিপ্লবের স্মৃতি
আমাদের প্রাণ দিক

আজ ১৪ই জুলাই। ১৭৮৯ সালের এই দিনটিতেই শতাব্দীর রাজতন্ত্রের অত্যাচার, অবিচার, শোষণ, জুলুম আর স্বেচ্ছাচারের হাত থেকে মুক্তির দুর্বার আকাঙ্ক্ষায় ফ্রান্সের নিষ্পেষিত মানুষেরা মরিয়া হয়ে উঠেছিল-তারা ভেঙে ফেলেছিল বাস্তিল কারাগার-যেখানে বুদ্ধিজীবী আর রাজদ্রোহীদেরকে অন্যায়ভাবে আটকে রাখা হতো। তারা এনেছিল সর্বহারা মানুষের প্রথম বিজয়। মহান ফরাসী বিপ্লবের সেই সংগ্রামী স্মৃতি আমাদের উজ্জীবিত করুক। প্রাণ দিক।

বস্তি এলাকাগুলো লাল করে দিয়েছে।

শ্রমিকদের চাঁদার লক্ষ লক্ষ টাকা মেরে লোপাট করার জঘন্য উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে গিয়ে সমাজতন্ত্রী এমসিএ এবং সরকারী শ্রমিক লীগের যাদুকর নেতার মধ্যে কাড়াকাড়ির পরিণতিতে তারা সর্বজন ঘৃণিত দাঙ্গার সৃষ্টি করেছে। এমসিএপন্থীর 'ঢাকাই জাতীয়তাবাদ- এর শ্লোগান তুলে 'বিদেইশ্যা ভূতগোরে খ্যাদাইবার প্রচেষ্টায় নেমেছে, অন্যদিকে যাদুকরটি 'নোয়াখাইল্যার ইজ্জত' এর ধোঁয়া তুলে প্রত্যাঘাতের পাল্লায় নেমে পড়েছে। এদিকে নেতাদের কামড়াকামড়ির শিকার হয়ে ইতিমধ্যেই শত শত নিরীহ শ্রমিক প্রাণ হারিয়েছে-রক্তে লাল হয়েছে।

শ্রমিক লীগ ইতিপূর্বে দেশের বিভিন্ন শিল্প এলাকায় নিজেদের একক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার খায়েশে স্বয়ংক্রিয় মারণাস্ত্রসহ বিভিন্নভাবে শ্রমিকদেরকে হত্যা করেছে। এরাই আবার নির্লজ্জের মতো 'শ্রমিক রাজ' সমাজতন্ত্র কায়েমের কথা প্রচার করে-এমসিএ সাহেবদের আওয়ামী লীগ সমাজতন্ত্রের সানাই বাজায়।

হায় হায় সব গেলো!

'হক-কথা'র সত্য সংবাদগুলির প্রতিবাদ করা এখন ভারতীয় হাই কমিশনের রোগে পরিণত হয়েছে। ৩০ শে জুন সংখ্যার কতিপয় সংবাদের প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে ভারতের হাইকমিশন আর একবার প্রমাণ করলেন যে 'শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায় না' প্রবাদটিই সত্য। 'পার্বত্য চট্টগ্রামে গণহত্যা চলেছে' সংবাদটির প্রতিবাদ করে তারা বলেছেন যে, বাংলাদেশে আজ একটিও ভারতীয় সেনা নেই। অথচ সংবাদটিতে বলা হয়েছে যে বিগত মার্চ এপ্রিল ব্যাপী পরিচালিত গণহত্যা

ও ধ্বংসলীলায় ভারতীয় সেনারা অংশ নিয়েছে। আজ নেই-কিন্তু তখন ছিল-প্রকারান্তরে তারা একথাই বেফাঁসে স্বীকার করে ফেলেছেন। তাছাড়া, মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সীমান্ত পথ অভিক্রম করে ভালো মানুষ সাজলেও ভারতীয় সেনারা যে কি জিনিষ সেকথা সাতক্ষীরা, বাগেরহাট আর খুলনার অধিবাসীরা ভালোভাবেই জানেন। বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধে এপ্রিলে ভারতীয় সেনারা এসে কয়েক সপ্তাহ অবস্থান করে 'বিদ্রোহীদের দমন করেছে'—সংবাদটির সত্যতাও তারা স্বীকার করে বলেছেন যে পার্বত্য চট্টগ্রামের মগ ও উপজাতীয় লোকদের এখন হত্যা করা হচ্ছে না।

খুলনায় দুর্নীতিবাজ এমসিএদের সমালোচক তরুণদের অপহরণ ও হত্যার সংবাদটিও অস্বীকার করতে চেয়েছেন। তাহলে স্থানীয় জনগণ যে সেনাদের মুখে অবাংলা ভাষা শুনেছে তারা কি পাক-বাহিনীর জল্লাদ ছিল? নির্যাতিত জনগণ ঠিকই চিনেছে, কারা তাদের রক্তের দামে কেনা স্বাধীন দেশকেও বুটের তলে নিষ্পিষ্ট করেছে তারা পাক-বাহিনী নয়-ভারতীয় সেনাবাহিনী।

কর্ণফুলী বাঁধের বিদ্যুত লোপাট করে ভারতে চালান দেবার ষড়যন্ত্র সম্পর্কে হাইকমিশনের প্রতিবাদলিপিতে বলা হয়েছে, উভয়ের স্বার্থে বিদ্যুত বিনিময়ের ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে কয়েক দফা। বাঁধের উচ্চতা ১৩ ফুট বাড়িয়ে দিয়ে বিদ্যুত উৎপাদন তিনগুণ বৃদ্ধি পাবে, এটা বাংলাদেশের স্বার্থেই কাজে লাগবে, তাই ভারত নীতিগতভাবে এটা করে দেবার প্রস্তাব দিয়েছে। বাঁধের উচ্চতা বাড়লে ভারতের মিজোরামেরও বিরাট এলাকা পানিতে ডুবে যাবে, তবু বাংলাদেশের সাথে বিদ্যমান প্রেম মজবুত করার অভিপ্রায়েই ভারত ক্ষতি স্বীকার করতে রাজী। 'হক-কথা' বলেছিল, কর্ণফুলী বাঁধের উচ্চতা বাড়ানো হলে লক্ষ লক্ষ পার্বত্য চট্টগ্রামবাসী জমি ও বাড়ীঘর হারাবে। অর্থাৎ এর বিনিময়ে যে বিদ্যুত উৎপাদিত হবে তা চলে যাবে ভারতে। মিজোবাসীর রক্তে হাত রাঙিয়ে ইন্দিরা গান্ধী আসামে নিজের রাজনৈতিক ভাগ্যকে অন্ধকার করে ফেলেছে, বাংলাদেশের বিদ্যুত দিয়ে নাগাল্যান্ড ও আসামকে আলোকিত করে কংগ্রেস সরকার নিজেদের ভবিষ্যত ফর্সা করতে চাইছে। হাইকমিশনের প্রতিবাদলিপি ৮ই জুলাই প্রচার করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, বিদ্যুত বিনিময়ের আলোচনা চলছে। কিন্তু ৭ই জুলাইর খবর হলো মিজোরামে কাপ্তাই বাঁধের বিদ্যুত পৌঁছে যাচ্ছে কয়েক দিনের মধ্যে : 'জনসাধারণ' তাই খুশীতে বাগ বাগ। অথচ প্রতিবাদলিপি লিখতে বসে ঐদিনের কাগজের খবরটিও হাইকমিশনের সূক্ষ্ম বুদ্ধিমত্তার অধিকারী ব্যক্তিদের নজরে পড়েনি।

সাবেক পূর্ব পাকিস্তান সরকার কাপ্তাই বাঁধের উচ্চতা বাড়াতে চাইলে এই ভারত সেদিন বাঁধা দিয়েছিল। প্রতিবাদে সেই কথাটিও আছে। সেই একই বাঙালীদের জন্য আজ ভারতের কী দরদ! অবশ্য দরদের মাহাত্ম্য নতুন প্রেম নয়। এই প্রেম হাতড়ে নেওয়া ও লুণ্ঠনের প্রেম। শিকারের প্রতি শিকারীর স্বাভাবিক আসক্তি। মাত্র ছ'মাসের মধ্যে ২৪০০ কোটি টাকার সম্পদ লুণ্ঠন করার ঐতিহাসিক সুযোগ পেয়ে, এটাকে চিরস্থায়ী করার বাসনায় ২০ বছর মেয়াদী প্রেমচুক্তি সম্পাদন করে ভারত এখন প্রেমসঙ্গীত গাইবে তাতে আশ্চর্য কি? কিন্তু 'হক-কথা'র সত্য সংবাদগুলির অযথা প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে ভারতীয়রা থলিয় বিড়াল আরও বের করে ফেলেছে। একেই বলে বেরসিক নিয়তি!

ইহা কি সত্য?

॥ ১০৭ ॥

কোন শত্রু সম্পত্তি না হলেও ঢাকার পুরনো পল্টনস্থ ৫৮/১ নম্বরের বাড়ীটির নীচতলা জবর দখল করে বাংলাদেশ কৃষক লীগ তাদের অফিস বানিয়েছে। বাড়ীর মালিক ভাড়ায় রফা করতে চাইলেও মাননীয় কৃষক নেতারা এক পয়সাও ভাড়া দিতে রাজী হননি।

॥ ১০৮ ॥

তরুণ রাজনৈতিক সচিবের শ্বশুরবাড়ী এখন দালাল রক্ষা বাহিনীর দুর্গে পরিণত হয়েছে। ভোলার মোল্লা এবং মাস্টার গোছের দু'জন কুখ্যাত দালালকে কোলাবরটের লিস্ট থেকে রেহাই দিতে। শ্বশুর সাহেব নিজের বাড়ীতেই হেফাজত করছেন।

॥ ১০৯ ॥

দুর্নীতিবাজ ব্যবসায়ীদের শায়েস্তা করার জন্যে সরকার যখন কার্ফিউ-এর খেল দেখাচ্ছেন, তখন প্রভাবশালী কতিপয় সরকারী কর্মকর্তা প্রচুর উৎকোচ গ্রহণ করে চাল-গমসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্র বোঝাই বহুসংখ্যক পল্টুন, আধা বোট, বড়লঞ্চ এবং কার্গো ভাসেলকে চাঁদপুর, বরিশাল, খুলনা প্রভৃতি নদী পথের অখ্যাত স্থানে ফেলে রাখার ব্যবস্থা করেছেন। এসবের মালিক ব্যবসায়ীরা এখন কর্তাদের উৎকোচ দিয়ে কত লাভ থাকবে তারই হিসেব কষতে ঘর্মাক্তকলেবর।

॥ ১১০ ॥

হেঁহেবাদী ছাত্রলীগের শীর্ষনেতার ভগ্নিপতি ঝিনাইদহে একটি পেট্রোল পাম্প জবর দখল করেছেন। ডিসি, এসডিও নেচারাল রিজনেই ঠাণ্ডা।

॥ ১১১ ॥

আইনমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সচিব ঢাকার মহাখালীস্থ ওয়ারলেস গেটে মাত্র একটি বাড়ী দখল করে আরামে বসবাস করছেন।

॥ ১১২ ॥

পাক-আমলের আমলাতান্ত্রিকতাকে পদাঘাতের কথা বারবার বলা হলেও একই পন্থায় অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাবেক শাখা প্রধানকে রাতারাতি দফতরের মুখ্যসচিব পদে উন্নীত করা হয়েছে।

॥ ১১৩ ॥

হানাদার আমলে কোন ক্ষতি না হলেও বাশাইল থানা আওয়ামী লীগ সম্পাদক ক্ষতিপূরণ বাবদ ১৭ হাজার টাকা পকেটে ভরেছেন। তাছাড়া তিনি এমসিএ সাহেবের সাথে জুট বোর্ডও গঠন করতে যাচ্ছেন। অতএব তার দিন আমীরের হালেই কাটুক।

মেজর জলিল মুক্ত

ভারতীয় লুটেরা সেনাবাহিনীর যাচ্ছেতাই লুণ্ঠনের সফল বিরোধিতার জন্যে জঘন্য মিথ্যে অভিযোগে গত বছর ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম বীর যোদ্ধা মেজর জলিলকে গ্রেফতার করে দীর্ঘদিন বেআইনীভাবে আটক রাখার পর গত ৪ঠা জুলাই সরকার তাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে 'হক-কথা' তার অষ্টম সংখ্যায় 'মেজর জলিল সমাচার শ্বেতপত্র চাই'-এর মাধ্যমে এই দেশপ্রেমিক যোদ্ধাটির মুক্তি দাবী করেছিল।

সম্পাদক ঃ সৈয়দ ইরফানুল বারী, ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ঃ মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, মুদ্রণে ঃ শান্তি প্রেস, সন্তোষ, টাঙ্গাইল।

প্রতি কপি পঁচিশ পয়সা সাপ্তাহিক চাঁদার হার : ষান্মাসিক-৬.০০ বার্ষিক-১০.০০

হক-কথা

(WEEKLY THE HAQ-KATHA)

প্রকাশক ও পৃষ্ঠপোষক ঃ মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

প্রথম বর্ষ ২১ সংখ্যা শুক্রবার ৫ই শ্রাবণ ১৩৭৯ ২১শে জুলাই, ১৯৭২ ৯ই জামাদিউসসানী, ১৩৯২ ; সন্তোষ টাঙ্গাইল।

ডি পি ধর আউট ঃ এবার হাকসার

বাংলাদেশ এখন ইন্দিরার মঞ্চ

ইন্দিরা গান্ধীর প্রিন্সিপাল সেক্রেটারী পি এন হাকসার 'অসুস্থ' ডি পি ধরের দায়িত্ব নিয়ে ১৬ই জুলাই বাংলাদেশে তশরীফ এনেছেন। পশ্চিমবঙ্গের সিদ্ধার্থ বাবু শেখ মুজিবকে ব্রিফ করে যাবার পর এক মাসের মধ্যেই নাজেল হলেন পি এন হাকসার। সিদ্ধার্থ বাবু প্রকাশ্যে মাছের কেচ্ছা শোনাতে এসে আসল যে কাজগুলো করে গেছেন, পি এন হাকসার এলেন সিমলা কনফারেন্সের অছিলায় সেই কাজগুলোর অগ্রগতি সরজমিনে তদন্ত করে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা বাৎলে দিতে।

ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নীতি পরিকল্পনা কমিটির চেয়ারম্যান ডি পি ধরের হাত দিয়ে বাংলাদেশের ব্যাপারগুলো 'ডিল' করার চেষ্টায় ইন্দিরা গান্ধী যদ্দুর সফলকাম হয়েছেন, তাতে তুষ্টি ও সন্তুষ্টি আসেনি। অধিকন্তু বাংলাদেশের অসরকারী প্রধানমন্ত্রীরূপে ডি পি ধরের হীনতৎপরতা সম্পর্কে বাংলাদেশের জনগণ সচেতন হয়ে উঠেছিল। এ দু' কারণে ডিপি ধরকে দৃশ্যপট থেকে আউট করে দিয়ে সেখানে এলেন সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়। ঝানু পলিটিসিয়ান সিদ্ধার্থ রায় মাথার পেছন দিক দিয়ে হাত ঘুরিয়ে নাক ধরে ওটাকে 'নাসিকা' বলে চালাতে গিয়ে বেকায়দায় পড়েন। বাংলাদেশের সাথে ভারতের সম্পর্ক বিদেশী রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কের মর্যাদাতুল্য নয়, বাংলাদেশকে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সমান্তরালে ঠেলে এনে নয়াদিল্লীর মাষ্টার দেওয়া একই পড়া দু'জনকে পড়াবার ব্যাপার যখন স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তখন মাছ কূটনীতির ধারক সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়কেও বাদ দেওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে। বাংলাদেশকে এখন একান্ত ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে পরিচালনার জন্য ইন্দিরা গান্ধী উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। নিজের প্রধান রাজনৈতিক-সামরিক-অর্থনৈতিক সচিব পিএন হাকসারকে বাংলাদেশে প্রেরণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

দিল্লীর মসনদের কাছে বাংলাদেশের মর্যাদা ক্রমেই কমে আসছে। ডি পি ধরের সফর আমলে বাংলাদেশকে ধরা যেত ভারতের একান্ত অনুগত কোন বিদেশী রাষ্ট্র। সিদ্ধার্থ বাবুর সফর আমলে বাংলাদেশকে ধরা হয়েছে ভারতেরই কোন রাজ্যের তুল্য। পি এন হাকসারের সফর কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন অঞ্চল তত্ত্বাবধানের কার্যক্রমের চাইতে বেশী কিছু নয়।

পি এন হাকসার ভারতের পুরাতন রাজনৈতিক ঝানু আমলাদের মধ্যে অন্যতম, যারা দিল্লীর মসনদে আসীন প্রভুদের আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবায়নের জন্য ভারতের রাজ্যগুলি ছাড়াও আশেপাশে অনেক ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিনষ্ট করেছেন।

সিমলা চুক্তির ব্রিফ নিয়ে হাকসারের বাংলাদেশে আগমনের ফলে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠেছে যে, দিল্লী-মস্কো আঁতাতের একনিষ্ঠ সেবক ডি পি ধর আর ইন্দিরা গান্ধীর আস্থাভাজন নয়। মস্কোর চয়েসের লোক ডি পি ধর রাশিয়ার কিঞ্চিৎ স্বার্থ রক্ষার কোশেশ সব সময় করতেন ভারতের ষোলআনা স্বার্থ উদ্ধারের পরেও। ডি পি ধরকে দিয়ে ভারত-মস্কো আঁতাত গঠনের চুক্তি ইত্যাদির ভিত্তি প্রস্তুত করা হয়েছিল। বাংলাদেশকে স্বাধীন করা এবং পাকিস্তানকে করজোড়ে জানুনত করানোর পর ভারত এখন নিজে নিজেই বাকি কাজটুকু গুছিয়ে ফেলতে চাইছে। এমতাবস্থায় মস্কোকে এড়িয়ে চলতে ইন্দিরা আগ্রহী। মস্কোকে এড়িয়ে চলবার জন্য উল্টো বিষ হাজির করতে হলে মার্কিন ঘেঁষা ব্যক্তিরাই শ্রেয়। তাই সিমলা বৈঠকের পূর্বাহ্নে মারী আলোচনা ডি পি ধরকে দিয়ে সম্পন্ন করানো হয়, এমনকি সিমলা বৈঠকের প্রথম অধিবেশনে ডি পি ধর হাজির থাকেন। এর পরই তিনি আউট হয়ে যান। প্রচার করা হয় যে, ডি পি ধরকে অসুখে ধরেছে।

দৃশপটে মার্কিন ঘেঁষা পি এন হাকসার ভেসে ওঠেন। এ ব্যক্তিটি ইতিপূর্বে আশীর্বাদ হারিয়ে দিল্লী দরবার থেকে দূরে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। ইন্দিরা গান্ধী তাকে আবার হাতে তুলে নিয়ে দাবার ঘরে বসিয়ে উজির-নাজির কুপোকাৎ করার খেলায় মেতেছেন।

ভারতীয় উপমহাদেশ ও পারিপার্শ্বিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলিকে মস্কোকেন্দ্রিক তাবেদার অঞ্চলে পরিণত করা হবে– এই ঠাণ্ডা লড়াই এখন সাংঘাতিকভাবে চলছে। বাংলাদেশ ভারতের একদম হাতের মুঠোয়। পাকিস্তানও এলো বলে। বাংলাদেশকে 'সিমলা চুক্তির তথ্যাদি অবহিত করানোর জন্য' ইন্দিরা গান্ধী এখন স্বয়ং কেয়ার নিচ্ছেন, একদম নিজের লোক দিয়ে।

ডি পি ধর সীন থেকে আউট হয়ে যাওয়ায় ভারতের মস্কোপন্থীরা প্রমাদ গুণছে। তারা স্পষ্ট বুঝতে পারছে, অনেক আশা নিয়ে রচিত তাদের সুখের ঘর 'সকলি গরল ভেলের' মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশের মস্কোওয়ালারা অবশ্য একটু ভিন্ন গোছের। মস্কোর চাইতে তারা বেশী করে ভারতের আজ্ঞাবহ এবং অনিবার্যভাবে ভারতমুখী নেতৃবৃন্দের 'বিশ্বাসগুণের' ফলশ্রুতি। তবু পি এন হাকসারের বাংলাদেশ সফরের পরপরই এখানকার মস্কোওয়ালাদের উপর 'জবর কষণ' শুরু হয়ে যাবে, ভারতেরও হবে ঠিক তাই।

সে প্রসঙ্গ রেখে, পি এন হাকসারের তিনদিন ব্যাপী সফরের উদ্দেশ্যের দিকে তাকালে দেখা যাবে, হাকসারের সফর উপলক্ষে যে মন্ত্রণালয়টি সবচাইতে বেশী তৎপর হয়ে উঠেছে তা পররাষ্ট্র দফতর নয়, বরং স্বরাষ্ট্র দফতর। সিদ্ধার্থ বাবু মুজিব সরকারকে ভারত বিরোধী এলিমেন্ট উৎখাত করার যে হোমটাস্ক দিয়ে গিয়েছিলেন তা কদ্দুর এগুলো, পি এন হাকসারকে এটা বিস্তারিত জানাতে হবে।

বাংলাদেশে তৎপর ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা রুথলেস র‍্যাডের রিপোর্টের সাথে বাংলাদেশ সরকারের হোম মিনিস্ট্রির রিপোর্ট দিল্লীতে মিলানো হবে না। পি এন হাকসার ঢাকাতেই সেটিকে মিলিয়ে দেখছেন। বাংলাদেশ সরকারের হোম ডিপার্টমেন্টের সাথে গত কিছুদিন যাবৎ আরেকটি অফিস ভয়ানবক তৎপর ছিল– সেটি হচ্ছে ভারতীয় দূতাবাস– হাইকমিশন। চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, যশোর, রাঙ্গামাটিসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে 'পাসপোর্ট ভিসার ঝামেলা চুকাবার' নামে 'বিশিষ্ট ব্যক্তিরা' দূতাবাসে ধর্ণা

দিয়ে পড়েছেন। সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে র‍্যাডের রিপোর্ট তৈরীর জন্যই এদের তলব করা হয়েছিল।

ভারতকে খুশী করার মত ইতিমধ্যে যথেষ্ট 'হোমটাস্ক' বাংলাদেশ সরকার সেরে ফেলেছেন। তন্মধ্যে খুলনা জেলার গ্রামাঞ্চলকে 'ঠাণ্ডা' করে দেওয়া, পার্বত্য চট্টগ্রামে পার্বত্যবাসীদের ভারতীয় বিদ্রোহী মিজোদের 'সহযোগী' হিসাবে ও বিদেশের উস্কানীতে তারা নাচছে বলে অভিযোগ উত্থাপনের অজুহাত রচনা, রাজশাহীর আত্রাই অঞ্চলে কম্বিং অপারেশন, ঢাকা-চট্টগ্রাম-খুলনায় শিল্পাঞ্চল থেকে লালবাহিনী দিয়ে বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নিজম উৎখাত, যথেষ্ট চেষ্টা সত্ত্বেও দ্রব্যমূল্য কমবে না- এ অভিনয়ের পালা চুকানো, 'ভারত-বিরোধী' রাজনৈতিক পত্রিকা ও কর্মীদের উপর সাকসেসফুল হামলা অন্যতম।

(অসমাপ্ত)

কোনালীর রেড কার্পেট রিসেপ্সন

মনি সিং মস্কো যাচ্ছেন

মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সনের বিশেষ দূত কোনালী বাংলাদেশের সমাজতন্ত্রী বিপ্লবী সরকারের পক্ষ থেকে রেড কার্পেট (লালগালিচা) সম্বর্ধনা পেয়ে ঢাকা ঘুরে গেছেন। আলেপ্পোর পথে সমুদ্রে বিরাজমান রহস্যজনক অধিভৌতিক হস্ত দুটির মত বাংলাদেশ সরকার একহাতে সাম্রাজ্যবাদকে ডাকছে- এসো, কাছে এসো। আরেক হাতে বারণ করছে- এসো না। তার বাড়ানো হস্ত অবশ্য শুধু জনগণকে ধোঁকা দেবার জন্য।

আমেরিকার নব্য-অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যের বর্তমান কারিগর সাবেক অর্থ সচিব কোনালীর এ সফর ছিল সংক্ষিপ্ত। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে সব তাবৎরা বারংবার কুর্নিশ করে মার্কিন সরকারকে এ আশ্বাস দিয়ে দিয়েছে যে, আর যাই হোক, এদেশ আমেরিকার লাগাম ছিঁড়ে পালাবে না।

কোনালীর সফরের পর সরকারের অভ্যন্তরে বিদ্যমান সংখ্যাগরিষ্ঠ মার্কিন লবী সক্রিয় হয়ে উঠেছে। সচিবালয়ের অভ্যন্তরে রুই-কাতলারা হাতে তুড়ি দিয়ে 'লঙলিভ কোনালী' শ্লোগান হাঁকছে। সর্বোচ্চ ক্ষমতায় আসীন ব্যক্তিও ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ার মত অবর্ণনীয় স্বস্তি অনুভব করছেন।

কোনালী প্রকাশ্যে ভদ্রতা ও সৌজন্যবোধক দু'চারটি কথা ছাড়া আর কিছুই বলেননি। অথচ সচিবালয়ের গোপন খবর হলো, ঢাকায় অবস্থানকালে মিঃ কোনালী প্রতিরক্ষা দফতর থেকে অর্থ দফতর পর্যন্ত সব কয়টি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ফাইলগুলির সংক্ষিপ্তসার বগলদাবা করেছেন। তাকে যে সব প্রামাণ্য নথিপত্র দেওয়া হয়েছে, তাতে একথা বারংবার দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশের আনুগত্যের ব্যাপারে আমেরিকা যেন বিন্দুমাত্র দ্বিধা-দ্বন্দ্ব না রাখে।

মার্কিন লবী সোচ্চারে বলছে, পাকিস্তান আমলেও কোন মার্কিন কর্তা এতটা খুশী হয়ে সফর শেষ করেননি। কোনালী পুরোপুরি সন্তুষ্ট হয়েছেন।

কোনালীর সন্তুষ্টি লাভের পরপরই ঢাকাসহ বাংলাদেশের সর্বত্র মার্কিন এজেন্সী ও প্রতিষ্ঠানগুলি এবং এতদিন ম্রিয়মান হয়ে চুপচাপ থাকা ব্যক্তিরা দারুণ সক্রিয় হয়ে পড়েছেন। মার্কিন তথ্যকেন্দ্র চুনকাম সেরে নিচ্ছে, দ্বিগুণ উৎসাহে সমাজতন্ত্র বিরোধী বইপত্রের ক্যাটালগ ছেড়েছে। রহস্যজনক মার্কিনী নাগরিকদের ছুটাছুটির কোন শেষ নেই। বাংলাদেশ সরকারের অভ্যন্তরে মার্কিন ঘেঁষা আমলারা বহুবধি অপরাধের ক্ষমা পেয়ে গেছেন। এদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় আমলারা শীঘ্রই প্রমোশন পেতে শুরু করবেন।

বাংলাদেশে শীঘ্রই অফুরান ডলার আসতে শুরু করবে। বাংলাদেশ 'সিধা পথে' থাকলে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে ৩৩ শত কোটি টাকারও বেশী মার্কিন ডলার সরবরাহ করা হবে।

সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী রাশিয়ার তাঁবেদারগণ এখনো কোনালীর সফরের পরবর্তী পরিস্থিতির ক্ষেত্রে কি করা উচিত সে সম্পর্কে মস্কোর নির্দেশ পায়নি। মস্কোওয়ালারাও রয়েছে বিভ্রান্তির মধ্যে। মস্কোর কাছ থেকে এই নিদারুণ পরিস্থিতির দাওয়াই সেরে আসার জন্য তথাকথিত কমিউনিস্ট পার্টির শ্রী মনিসিং-এর নেতৃত্বে ক'জন কমিউনিস্ট মস্কো যাচ্ছে। মার্কিন লবী আবার এদের পাসপোর্ট আটকে দিয়েছিল। অবশ্য সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত পোপভ মন্ত্রীদের সাথে দেখা করে পাসপোর্ট বের করে দিয়েছেন।

মস্কোওয়ালাদের অভ্যন্তরে হতাশা সৃষ্টি হওয়ার পর মনিসিং গং ফাস্ট এইড হিসাবে একটা টোটকা থিউরী দিয়ে বলেছেন, সহ-অবস্থান ও সংগ্রামের পথ তাঁরা অনুসরণ করছেন। ভাগ্য ভালো, তবু আমেরিকা, চীন তো নয়! আমেরিকার সাথে ঘর করে, তার সাথে অহর্নিশ সংগ্রামের ঐতিহ্য তারা বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে গড়ে তুলেছেন।

ফাস্ট এইড পেয়ে মস্কোওয়ালাদের একাংশ চাঙ্গা হয়ে সোচ্চারে বলছেন যে মনিদা ফিরে এলেই হয়। তারপর দেখো।

আশা করা যাচ্ছে, এর পর একটা জবর খেল্ দেখা যাবে।

শেষ পর্যন্ত ভাগাভাগির মধ্যে খেল সমাপ্ত হবে বলেই ধারণা করা হচ্ছে। কারণ, সরকারের বৃহদাংশ পুরোপুরি আমেরিকার মুঠোয়। জনগণের সর্বনাশ করে তারা মস্কোর সাথে বিরোধ লাগাবে না, যদিও মস্কোওয়ালাদেরকে ঘরের বউ পেয়ে যখন তখন পিটাবে। ফলে মার্কিন লবী হবে জোরদার। সরাসরি মস্কো বাংলাদেশকে লুটপাট ও দীর্ঘস্থায়ী শোষণের অংশ পাবে।

সর্বশেষ খবরে প্রকাশ, কোনালীর সফরের সাথে ভারসাম্য বজায় রাখার উদ্দেশ্যে এক টি সোভিয়েত টিম অর্থনৈতিক সাহায্যের চাহিদা জরীপের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে এসেছে।

ইরফানুল বারীর

মুক্তি চাই

গত ৪ঠা জুলাই পিরোজপুর শহরে বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, বাংলাদেশ কৃষক সমিতি ও বাংলাদেশ বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের যৌথ উদ্যোগে 'হক-কথা' সম্পাদকের গ্রেফতারের প্রতিবাদে এক বিরাট বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। 'হক-কথা' সম্পাদকের মুক্তি ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দাবী সম্বলিত অসংখ্য পোস্টার আর ব্যানারে ঐদিন সারা শহর ভরে গিয়েছিল। বিভিন্ন রাস্তার মোড়ে মোড়ে খণ্ড খণ্ড পথসভা আর মিছিলের শ্লোগানে শ্লোগানে শহর মুখরিত হয়ে উঠেছিল।

ঐদিন বিকেলে স্থানীয় শহীদ ফজলুল হক ময়দানে অনুষ্ঠিত জনসভায় সারা শহরের মানুষ ভেঙ্গে পড়ে। বিপ্লবী ছাত্রনেতা সমীর কুমার বাচ্চুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই জনসভায় বক্তৃতা করেন ন্যাপ নেতা জনাব সিরাজুল হক, গাজী নুরুজ্জামান বাবুল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত ছাত্রনেতা এন, এম খালেদ (রবি) ও অন্যান্য আরও অনেকে। সভায় 'হক-কথা' সম্পাদকের গ্রেফতারের ব্যাপারে সরকার সমীপে মওলানা ভাসানীর প্রতিবাদলিপির জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যে হাস্যকর ও অযৌক্তিক অজুহাত দেখিয়েছেন তার কঠোর সমালোচনা করা হয়। বক্তরা এভাবে 'দালাল' আইনের অপব্যবহার করে বিরোধী দলকে ঘায়েল করার সরকারী অপচেষ্টার তীব্র নিন্দা করেন এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করার জন্য জাগ্রত দেশবাসীকে সংগ্রামের পথ বেছে নিতে আহ্বান জানান।

পূর্ব টাঙ্গাইল বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন

গত ১৪ই জুলাই আইসরার পূর্ব টাঙ্গাইল বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে আবদুল হামিদ খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে সংস্থার কেন্দ্রীয় সভাপতি জনাব আতিকুর রহমান সানু 'হক-কথা' সম্পাদককে গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা করে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের সরকারী চক্রান্ত প্রতিরোধের জন্যে জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। এই সভায় অন্যান্যদের মধ্যে কেন্দ্রীয় ন্যাপ সংগঠক জনাব মোহাম্মদ আলী, বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সহ-সম্পাদিকা হাজেরা সুলতানা, জেলা যুগ্ম আহ্বায়ক খন্দকার নাজিম উদ্দিন এবং কৃষক নেতা জনাব আনোয়ার হোসেন বক্তৃতা করেন।

তারাই বেবাক

ভাতিজা এমসিএ। চাচা রিলিফ চেয়ারম্যান। জেঠা মিয়া শান্তি কমিটির সাবেক সদস্য ও বর্তমানে টেস্ট রিলিফের ঠিকাদার। চাচাতো ভাই মাটি মাপবার ওভারশীয়ার। সুতরাং 'আমরা আর আমাদের মামুরা' গল্পের মত তাঁরাই 'ব্যাবাক।' রিলিফ আসে আর হাওয়া হয়ে যায়। টেস্ট রিলিফের মঞ্জুরী আসে, অর্ধেক টাকাও খরচ হয় না। যিনি ধরবেন, যার কাছে অভিযোগ করা যায় এই সিও এবং এমসিএ সবাই হাতের লোক। চট্টগ্রামের মীরশ্বরাই থানার ৩নং ইউনিয়নের জোয়ারগঞ্জের জনসাধারণ দায়ে পড়েছে। ওই আত্মীয় চক্র 'কোর' নামক বিদেশী ত্রাণ ও পুনর্বাসন মিশনের তিন লাখ টাকা মেরে দিতে গিয়েও ধরা পড়ে গিয়ে ফ্যাসাদে পড়েছে।

রক্ষা মাদুলী

যত জটিল স্বপ্ন দোষ ও স্বপ্নে প্রস্রাবের দোষ। ধারণে নির্ঘাত চিরতরে বন্ধ হবেই। গ্যারান্টি ঃ দাম সডাক ছয় টাকা। অর্ডার দিন। শ্রীকালুচন্দ, গ্রাম-চান্দসী, পোঃ ঘাটাইল, জিলা-টাঙ্গাইল।

খুলনা সমাচার

তাতে কি আছে?

খুলনাস্থ 'রোড এন্ড হাইওয়েজ' ডিভিশন অফিসের কেরানী সাহেব একজন লা-পরওয়া মানুষ। অসতর্ক মুহূর্তে তিনি বলেই ফেললেন, "তাতে কি হয়েছে?" ঘটনা হলো উক্ত অফিসের কাগজপত্রে নাকি এখনও পর্যন্ত 'গভর্ণমেন্ট অব ইস্ট পাকিস্তান' লেখা ফরম (কন্ট্রাকটিং ফরম) ব্যবহার করা হয়। ফরমটির প্রয়োজন হয় কন্ট্রাকটরদের। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করতে না পারলে কন্ট্রাক্টর সাহেবরা 'এক্সটেনশন অব টাইম' নামক এই ফরমটি পূরণ করে আরও সময় চেয়ে নেন। আর এই ফরম-এর উপরে লেখা রয়েছে 'গভর্ণমেন্ট অব ইস্ট পাকিস্তান' কথাটি!

দোকান ছাড়াই লাইসেন্স

প্রথম কিস্তিতে ২৫ হাজার করে সেভেন ও ক্লক ব্লেড বিক্রি করার লাইসেন্স পেয়েছিলেন বেশ কয়েকজন, যাদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব দোকান ছিল এবং আসল ব্যবসায়ী লোক।

কিন্তু কয়েকদিন আগে যাদেরকে দ্বিতীয় কিস্তিতে লাইসেন্স দেয়া হয়েছে তাদের কারও কোন দোকান নেই এবং কেউই জ্ঞাত ব্যবসায়ী নন। তাহলে এরা কি করে লাইসেন্স পেলেন? দোকানহীন এই ব্লেড ব্যবসায়ীরা কি চোরাচালানী? সরকারী কর্তৃপক্ষ কোন রকম অনুসন্ধান না চালিয়ে এদেরকে ব্লেড বিক্রি করার লাইসেন্স দিয়েছেন। ব্লেড চোরাচালান হচ্ছে এদের দ্বারা!

সবুরের স্যাঙাত বহাল তবিয়তে

মুসলিম লীগের দালাল পাইকগাছা থানার ঘোষাল গ্রামের আফিলুদ্দিন বহাল তবিয়তে খুলনার রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সবুর খানের প্রিয় কর্মী বলে কথিত এই দালাল ব্যক্তিটি পাক-আমলে বেশ দাপটের সঙ্গে রাজত্ব করেছে এবং লুটপাট সমিতির সাথে যোগসাজস করে বহু পয়সা কামাই করেছে।

এমসিএ পুত্র চরিতম্

খুলনার জনৈক এমসিএ সাহেবের ছেলে রিলিফের মাল চুরি করে বিক্রি করার সময় হাতেনাতে ধরা পড়েছেন। কিন্তু তার কোন সাজা হয়নি। কারণ, তিনি এমসিএর পুত্র, তার সাত খুন মাফ।

জনতার রোষ

পাক-আমলের কুখ্যাত দালাল আবুল হাসানকে সরকারী প্রশাসনযন্ত্র নিরাপত্তা দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু জনতার আক্রোশ ক্রমাগত বাড়তে থাকলে তাকে টেলিফোন করে আত্মসমর্পণ করার জন্য অনুরোধ করা হয়। প্রকাশ্য দিবালোকে এই কুখ্যাত দালালটি আদালতে আত্মসমর্পণ করে।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই কুখ্যাত দালালকে কখনও গ্রেফতার করা হয়নি। সে বহাল তবিয়তে নিজস্ব বাসভবনে বাস করছিল এতদিন। পাক-সেনাদের আমলে তার বাস-ভবনটি ছিল বর্বর পাক-সেনাবাহিনীর হারেমখানা ও কসাইখানা। আবদুল হাসান নাকি পাক-সেনাবাহিনীকে তার বাসভবন এবং হোটেল শাহীন উপহার দিয়েছিলেন। দেশ স্বাধীন হবার পর এই দালাল আত্মগোপন করলেও বেশ কয়েক লক্ষ টাকার বিনিময়ে নিরাপত্তা খুঁজে পেয়েছিল। কিন্তু টাকা আর কতক্ষণ!

নারী দালাল রক্ষা সমিতি

এখানকার কোন এক ব্যাংকের ম্যানেজার খুলনা স্বাধীন হওয়ার পর পাক-আমলের জনৈক নারী দালালকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। এখনও পর্যন্ত ম্যানেজার সাহেব বহাল তবিয়তে চাকুরী করে যাচ্ছেন।

শাহানশাহ-র প্রতাপে

ময়মনসিংহ শহরাঞ্চলে কেষ্টপুর ইউনিয়নের অধিবাসীরা এক জুয়াড়ী টাউট চেয়ারম্যানের অত্যাচারে অতিষ্ঠ। পোস্টাফিস কর্মচারী থাকাকালে মানিঅর্ডারের টাকা আত্মসাতের দায়ে তার চাকুরী গিয়েছিল। ময়মনসিংহের রাজাকার কমান্ডার এক এডভোকেটের মুহুরী হয়ে তার দ্বিতীয় যাত্রা শুরু। এখনও সে পলাতক রাজাকার অধিনায়কের সম্পত্তি দেখা-শোনা করে। তার বদৌলতে আলবদর কমান্ডার এখন আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর ইউনিয়ন প্রধান হয়েছে। ঘৃণ্য দালাল ও মোনাফেকদের জড়ো করে সে আওয়ামী লীগের শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছে। কেষ্টপুর রিফুজি কলোনীর মালিক এখন তিনি। ঘরগুলি ভাড়া দিয়ে তা থেকে নিয়মিত ভাড়া আদায় করে পকেটে পুরছেন।

স্থানীয় মসজিদের পুকুরের মাছ ধরে তিনি বেচে দিয়েছেন। বাধা দিতে গিয়ে ইমাম ঐ চেয়ারম্যানের গুণ্ডাদের হাতে প্রহৃত হন। তারপরও জিদ না মেটায় আলবদর বলে ইমাম সাহেবকে ধরিয়ে দেন, শেষে স্থানীয় জনসাধারণ ইমামকে মুক্ত করিয়ে নেয়। রাজনৈতিক কর্মীদের উপর মারাপিট চালানো ছাড়াও, স্বামীহারা নারী কল্যাণ সমিতির সভার উপর সে আক্রমণ চালিয়েছে। তার অনুমতি না নিয়ে কেউ সভা করলে 'গ্রেনেড মেরে উড়িয়ে দেবার' হুমকি দিয়েছে সে। ক্যাথলিক মিশন রিলিফ বণ্টন করতে উদ্যোগী হলে তার পুত্র হ্যান্ড গ্রেনেড, স্টেনগান দিয়ে ওদের আক্রমণ করতে আসে। এই দুর্বৃত্তের

গুণ্ডা দলের এক ব্যক্তি গরীব এক রিকশাওয়ালার গৃহে ঢুকে নারীর উপর নির্যাতন চালাবার চেষ্টা করে। স্থানীয় প্রাইমারী স্কুল থেকে অভিজ্ঞ শিক্ষকদের বিতাড়িত করে এই দুর্বৃত্ত দলটি দু'জন প্রমোদদায়িনীকে বসিয়েছে শিক্ষকের আসনে। এখন কৃষ্ণলীলা চলছে কিন্তু স্কুল যাচ্ছে উচ্ছন্নে। রিলিফের টাকায় সুন্দরী অভিনেত্রীদের দ্বারা নাট্যাভিনয়ও করিয়েছে এই টাউট। কিন্তু জনসাধারণ সাহায্য সামগ্রী কিছুই পায়নি। তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে কেউ সাহস পায় না। কেননা সে কেষ্টপুরের শাহানশাহ্।

ফরিদপুরে ভাগ্য গড়ার কল

ফরিদপুর সদর কোতওয়ালী থানায় ক'জন সাবেক মুক্তিযোদ্ধা ভাগ্য গড়ার খেল শুরু করেছে। ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে জোর করে অর্থ আদায় তো প্রাত্যহিক ঘটনা। কিছুদিন আগে পৌরসভার পাহারাদারকে মারপিট করে এসব দুর্বৃত্ত বহু দামী কাপড় ডাকাতি করে নিয়ে যায়। পাহারাদারদের প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেয়। প্রশাসন কর্তারা পাহারাদার দু'জনকে থানায় পাঠিয়ে পিটিয়েছেন। আজ দারোগান্বয় রিক্ত। অনাহারে তাদের দিন কাটছে।

তারপর ডাকাতির মাল ধরা পড়লে সে কাপড় নিলামে চড়িয়ে দুর্বৃত্তরাই সকলকে তাড়িয়ে ১৫০০০ টাকার কাপড় ৬০০০ টাকায় ডেকে নেয়। একটা ডিজেল ট্রাকও কেনা হয়েছে একই কায়দায় ৭০০০ টাকায়।

ছাত্রনেতা সিপাহসালার দালান গড়েছে। আলালের ঘরের দুলাল আজ কন্ট্রাক্টারীর ডিলারী করছে। সংসার না চললেও এক ছাত্রনেতার বাড়ীতে উঠেছে অট্টালিকা– বাংলাদেশের স্বাধীনতা লুটেপুটে ভোগ করার দৌড়ে এরা কেউ পিছিয়ে নেই।

বি টিমী কর্তারা এখন পুলিশের দালালী করছে

সিলেটের বিয়ানীবাজার থানার আওয়ামী লীগের বি-টিমী দলের সেক্রেটারী কামরুজ্জামান কসবা গ্রামের জনৈক আয়াজ আলীর ব্যক্তিগত শত্রুর কাছ থেকে টাকা খেয়ে আয়াজ আলীকে ফুসলিয়ে থানায় নিয়ে পুলিশকে দিয়ে তাকে গ্রেফতার করায়। খবর ছড়িয়ে পড়লে জনসাধারণ থানায় ছুটে এসে পুলিশের দালাল বি-টিমী কর্তাকে ঘেরাও করে ধরে নিয়ে আসে। জনতার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে কামরুজ্জামান রেহাই পেয়েছে।

কুড়ার বাজার ইউনিয়ন ন্যাপের কর্মী ফুলুই মিয়াকে মস্কোপন্থীরা ষড়যন্ত্র করে হাজতে পাঠায়। জনতার দাবীতে দু' ঘন্টা পরেই ফুলুই মিয়া মুক্তি পায়। তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই।

তাকে ধর্মের পবিত্র দায়িত্ব দেয়া হবে

বেতার-টিভিতে দরাজকণ্ঠে ধর্মের বুলি আওড়ায় লোকটি। আওয়ামী লীগের নড়বড়ে নৌকায় কোনদিন ধর্মের হাওয়া দেবার দরকার পড়লে তাকে পাল তুলতে দেয়া হবে। একটা পকেট ওলেমা পার্টির পেপার ওয়ার্ক নিয়ে সে ঘুরছে। পৃথক ধর্ম দফতরের দাবী নিয়ে জনগণের বিশ্বাসকে ফাইলপত্রের নীচে চাপা দেবার ভবিষ্যত পরিকল্পনার সে উঠতি নায়ক। খুলনা বিভাগে একটা জেলার নাম নিজের নামের শেষে সেঁটে দিয়ে এই ভণ্ডটি ধর্মের নতুন ফিকিরের ব্যবসা শুরু করতে চাইছে।

১৯৭০ সালে আওয়ামী লীগ প্রার্থীর বিরুদ্ধে নির্বাচনে দাঁড়িয়ে পিটুনির ভয়ে শেষে রণে ভঙ্গ দেয় লোকটি। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ভারতে গিয়ে ভারতীয়দের ও ইন্দিরা গান্ধীর কাছে নির্লজ্জভাবে অর্থ ভিক্ষা করে সে পকেটে পুরেছে। শরণার্থী শিবির থেকে একটি মেয়েকে হোটেল 'পূর্ণ'-তে নিয়ে যায় এবং নিজের হেফাজতে রেখে দেয়। কেলেঙ্কারী ফাঁস হয়ে পড়লে সে প্রচার করে যে, 'মুতা' বিবাহ করে সে মেয়েটির সঙ্গে কাটিয়েছে। গত ২৯শে জুন রাতে গুলিস্তানে ঘুরঘুর প্রমোদবালাদের সাথে তাকে দেখা গেছে।

সে সরকারী দলের ধর্মশাখার নাম ভাঙ্গিয়ে অফিস আদালত থেকে অবৈধ সুযোগ আদায় করে বেড়াচ্ছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদে অধ্যাপকের সমমর্যাদার ইমামতি দাবী করে সে আরেক তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে বসে। মিথ্যা অজুহাতে পোষ্য ছাত্র ও পুলিশ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদে হামলা চালায়। অভিযোগ মিথ্যা প্রতিপন্ন হলে ছাত্ররা তাকে নাজেহাল করে ছেড়ে দেয়। ইসলামী একাডেমীতে আলীশান একটি পদের মোহে একাডেমী দখলের চেষ্টায় সে একটি বিবৃতিও ছেড়েছিল।

মিথ্যা কথা বলে ঈদের ইমামতি ও রেডিও প্রোগ্রাম বাগানো তার অভ্যাস। বায়তুল মোকাররমে একটি দোকান করার খায়েশে তিনি একটি গুদাম ঘর খুলে দেবার জন্য প্রশাসনকে চাপ দেন। পল্টন ময়দানে মিলাদুন্নবী পালনের নামে বহু টাকা চাঁদা উঠিয়ে তিনি আত্মসাৎ করেছেন। ইসলামী শিক্ষা সংস্থার সভায় হামলা চালিয়ে কাগজপত্র জবরদখল, পাল্টা ভারত-বাংলা মৈত্রী সমিতি গঠনের চেষ্টা, মোহাম্মদপুরে কাজীর অফিস দখলের মত বহু কীর্তিতে তিনি কীর্তিমান।

ক্ষমসাতীন দল তাকে দিয়ে ধর্মানুরাগী জনগণকে ধোঁকা দেবার নতুন চেষ্টায় মেতে উঠেছে।

তারা হাজির হননি

নাগরপুরের সার্কেল অফিসার ইউনিয়ন পঞ্চায়েতের চেয়ারম্যানদের কাছ থেকে ঘুষ আদায় এবং টেস্ট রিলিফের টাকা আত্মসাতের সময় ধরা পড়ে গিয়েছিলেন। এলাকার এমসিএ-র নেতৃত্বে পঞ্চায়েত চেয়ারম্যানদের বৈঠকে জনৈক ছাত্রনেতা ঐ অফিসারটির বিচার দাবী করলে এমসিএ সাহেব বিচারের আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু বিচারের নির্দিষ্ট দিনে এমসিএ সাহেব বা সার্কেল অফিসারের কেউই উপস্থিত হননি। কারণটা নাকি সহজবোধ্য।

হক-কথা

৫ই শ্রাবণ, শুক্রবার

অক্টোপাসের রাহুগ্রাস

এক পয়সার সাহায্য দিয়ে সত্তর পয়সার ছওয়াব হাসিল করার পক্ষপাতি অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি সাহায্য ও ঋণের টোপ বাংলাদেশ আবার গলাধঃকরণ করেছে বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকারের কৃপায়। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আবার ঋণের জাল ছড়িয়ে দিয়েছে বাংলাদেশের উপর। সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী সোভিয়েত ইউনিয়ন উদ্দেশ্যমূলক ঋণের বেড়াজাল নির্মাণ শুরু করেছে। ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের কাছ থেকে ১০০ কোটি টাকার ঋণ ছাড়াও পশ্চিম জার্মানী, জাপান প্রভৃতির ন্যায় সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদার দেশগুলির কাছে বাংলাদেশ মুচালেকা লিখে দিয়ে ঋণ সংগ্রহ করেছে। প্রায় ৩৫০ কোটি টাকার বিদেশী ঋণের উপর বাৎসরিক পরিকল্পনা ও বার্ষিক বাজেট বিন্যস্ত করে সরকার সোচ্চারে প্রচার করছেন যে, মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই এসব দেশ ঋণ দিয়েছে। অর্থমন্ত্রী বলছেন বাংলাদেশকে

সমর্থন না করার কৃত অপরাধ ও পাপের প্রায়শ্চিত্ত মাশুল তথা কাফফারা হিসাবেই সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার কাছ থেকে সাহায্য নামক ঋণ আদায় করে নেয়া হচ্ছে।

সাম্রাজ্যবাদী, সম্প্রসারণবাদী দেশসমূহ কী মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গরীব দেশগুলিকে ঋণ সাহায্য দান করে, বিগত ২৪ বছরে নিজেদের জীবনের অভিজ্ঞতা এবং গরীব জনগণের জীবনে বিরাজমান দোজখী যন্ত্রণা লক্ষ্য করে বাংলাদেশের জনগণ খুব ভালভাবেই তা উপলব্ধি করতে পারে। সুদজীবী গ্রাম্য মহাজনেরা ২৫ টাকা কর্জ দিয়ে সুদ-আসল হিসেব করে তিন বছরের মধ্যে হাজার টাকার ভিটেমাটি থেকে গরীব কৃষককে যেভাবে উৎখাত করে সাম্রাজ্যবাদীরা হচ্ছে সেই ধরনের আন্তর্জাতিক মহাজন ও সুদের কারবারী। পাকিস্তান আমলে তিনশত কোটি টাকার জাতীয় বাজেট হতো প্রতি বছর, মার্কিন ও সোভিয়েত সাম্রাজ্যবাদীদের ঋণের সুদ হিসাবে বরাদ্দ করা হতো একশত কোটি টাকার মত। জাতীয় আয়ের শতকরা ২৫ ভাগ প্রতি বছর এই মহাজনদের হাতে তুলে দেবার পরও তাদের মোট পাওনা বছরে বছরে বেড়ে তিন হাজার কোটি টাকার মত দাঁড়িয়ে ছিল ২৪ বছরে। জোচ্চুরি হিসাব এবং হীন শর্তের কারণে মহাজন ও কাবুলীওয়ালাদের পাওনা যেমন শোধ করা অসম্ভব, সাম্রাজ্যবাদী শোষকদের পাওনাও ঠিক তেমনি পরিশোধ করার উপায় নেই।

দেনার ভার, পাওনাদারের হুমকি, ঘর সংসার-পারিবারিক জীবনে অন্যায় ও অবৈধ হস্তক্ষেপ দ্বারা মহাজনরা যেরূপ কৃষকের জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে, মানুষের আশা-ভরসা, সুখ ও স্বপ্নকে ধূলিসাৎ করে দেয়, সাম্রাজ্যবাদীরাও ঠিক তেমনি ঋণের কিস্তিতে সওয়ার হয়ে গরীব দেশের অভ্যন্তরে নাক গলায়, সরকারকে নিজেদের খেয়াল খুশীমত চালাতে চেষ্টা করে। এভাবে গরীব দেশগুলি সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রের লীলাক্ষেত্রে পরিণত হয়।

৩০ লাখ জীবনের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতাকে সাম্রাজ্যবাদী শোষকদের কাছে বিক্রি করে দেওয়া হবে না, এই প্রত্যাশা নিয়ে এদেশের জনগণ ১৬ই ডিসেম্বরের পরে অনেক কষ্টের মধ্য দিয়েও অগ্রসর হতে শুরু করে। কিন্তু জনগণের চাইতে সাম্রাজ্যবাদের উপর অধিকভাবে নির্ভরশীল আওয়ামী লীগ সরকার তার চেহারা অচিরেই প্রকাশ করে। সাম্রাজ্যবাদী মহলের কাছে বারংবার দেশকে বন্ধক দিয়ে, তাদেরকে ডেকে আনে দেশের অভ্যন্তরে।

পাকিস্তান প্রতি বছর গড় পড়তা ১৫০ কোটি টাকার দেশ-বিদেশী ঋণ নেয়নি, অথচ বাংলাদেশ শুরু থেকেই সাড়ে ৩শ' কোটি করে ঋণ সাহায্য নিতে শুরু করেছে। বছরের পর বছর এ ঋণের পরিমাণ না বাড়িয়ে উপায় থাকবে না। শোনা যাচ্ছে, বছর পাঁচেকের মধ্যে আমেরিকা ৩৩ শত কোটি টাকা বাংলাদেশে ছড়িয়ে দেবে।

বিপুল পরিমাণ ঋণের আমদানী কি শোচনীয় অবস্থা সৃষ্টি করে তার নজীর দক্ষিণ ভিয়েতনাম ও গুয়েতেমালা। কৃষি প্রধান দক্ষিণ ভিয়েতনামে এক মণ চালের দাম দুশ' টাকা। গুয়েতেমালায় অনাহার ও নির্যাতনে মানুষের মৃত্যুর সংখ্যা পৃথিবীর সর্বোচ্চ। স্বাধীন বাংলাদেশকে গুয়েতেমালার পথে ঠেলে দেবার অধিকার এই সরকারকে কে দিয়েছে, আজ এটাই বড় জিজ্ঞাসা।

৬ মাসে ভারতকে ২৪ হাজার কোটি টাকার সম্পদ লোপাট করতে দিয়ে যে সরকার দেশকে ফতুর করে দিয়েছে, তারা সাম্রাজ্যবাদী শোষকদের তুষ্ট রাখার জন্য এবার নেমেছে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নিয়ে। ভারতের প্রেমডোরে বাঁধা পড়ার অবর্ণনীয় যন্ত্রণায় জনগণ আজ দোজখের স্বাদ পাচ্ছে সোনার বাংলাদেশে। ভবিষ্যতে

বিশ্বসাম্রাজ্যবাদীদের অক্টোপাসের শতবাহু আমাদের ছিঁড়েফুটে গ্রাস করবার উদ্যোগ নিচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও সাম্রাজ্যবাদের তাবেদারদের বিরুদ্ধে নিরলস সংগ্রাম ব্যতীত এ দুর্যোগ থেকে জনগণের মুক্তি নেই। অক্টোপাসের বাহুগুলি কেটে ফেলার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়তে বিলম্ব হলে এদেশ চিরদিনের জন্য বিদেশের গোলামে পরিণত হবে।

স্বর্গ প্রাপ্তি আসন্ন

ক্ষমতাসীনদের অভ্যন্তরেও কেউ কেউ নাকি লজ্জা পেয়েছে। শাসনতন্ত্রের ভারত সফর তাদের মনঃপুত হয়েছে বটে। কিন্তু প্রভু আর সেবকের সম্পর্কটা গোপন রাখা কেন গেল না, এখন তারা তাই ভেবে আকুল। অবশ্য এর পর থেকে আরও গোপনীয়তা অবলম্বনের ব্যাপারে তারা প্রস্তুত।

দেবার রাজনীতিতে, যার জুড়ি পৃথিবীতে নেই। শেষ এখানেই নয়, এরপর তৃতীয় দফা দেশবন্ধক নেওয়া প্রভুদের মধ্যে রয়েছে আমেরিকা আর বৃটেন। আমেরিকানরা প্রভুত্ব ফলাবার জন্য হাত মোচড়ায় না, মাথায় যা দেয় ইংরেজরা ভাল মানুষের মত উল্টো পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে যায়, তারপর বিজন বনের মধ্যে একলা পেলে চুপিসারে ঘাড় মটকায়।

এই চারমুখী টানাপোড়েন চলছে। পিরীতি বিষম জ্বালা বলে গান আছে এদেশের সাধারণ মানুষের মুখে। শ্যাম রাখি না কুল রাখি দশায় পড়ে সরকারের ব্রেনহীন পান্ডবদের অবস্থা হয়েছে তাই।

অবশ্য, টানা হেঁচড়াটা গরল প্রেমাভিনয়ে মত্ত সরকারী কর্তাদের উপর দিয়ে গেলে আপত্তি ছিল না কারো। যার কর্ম সেই পেতো ফল।

আমেরিকার বিশেষ দূত কোনালী এসে ডলারের বস্তা ফেলে যাবার পর বাংলাদেশ তৃতীয় দফা বিক্রি হয়ে গেছে!

াধীন জাতির পবিত্র শাসনতন্ত্র নিয়ে এরা ারা বিশ্বের সম্মুখে এক হাস্যকর াণ্ডকারখানা বাঁধিয়ে দিয়েছে। বিদেশীরা চকি হেসে বলছেন, এটা হবে, তারা আগেই নতেন। অবশ্য পশ্চিমা বিদেশীরা এখন কেই কথা বলছে নম্র কণ্ঠে। ক'দিন পর ার বলবে না। কেননা, আমেরিকার বিশেষ ত কোনালী এসে ডলারের বস্তা ফেলে যাবার র দেশটা তৃতীয় দফা বিক্রি হয়ে গেছে, এটা শ্চিমারাও বোঝে।

তরাং, এখন থেকে একাধিক প্রভুকে মেনে তে হবে ভারতের কথা না শুনলে কি যে ব বা হবে না, ভারতের রক্তচক্ষুর দিকে কিয়ে সবাই এটা বুঝতে পারেন। তারপর ছে প্রভুর তালিকায় গুরুগম্ভীর সোভিয়েত শিয়া– গোপনে হাত মুচড়ে বিকলাঙ্গ করে

কিন্তু বিপত্তি হলো, কীর্তিমান কর্তারা তো কেউ ভারতের পায়ে, কেউ রাশিয়ার পায়ে, কেউ আমেরিকার পায়ে, কেউবা বৃটেনের পায়ে নিজেদের সঁপে দিয়ে খালাস। অথচ খাল কেটে আনা এই কুমীরেরা ইয়াবড় হাঁ করে যখন দেশটিকে গোগ্রাসে গিলতে চাইছে, জনগণের পক্ষ থেকে তখন চেঁচামেচি উঠেছে। সবাই বলছে, হলো কি, হলো কি?

সরকার বুঝাচ্ছেন, কিছু হচ্ছে না, দু'চারটা কামড় সয়ে যেতে পারলেই ব্যস, দেশে পরিপূর্ণ সমাজতন্ত্র হয়ে যাবে। এরকম 'ব্রহ্মচারী' ইনজেকশন নিতে নিতে বার্মার হাতে-পায়ে, কোমরে– উরুতে গোদ হয়ে গেছে। বাংলাদেশেরও যে গোদ হতে শুরু করেছে তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। মজা হলো, বাংলাদেশের পেটে সমাজতন্ত্র জন্মাবার জন্য

পুঁজিবাদী দেশের ব্রহ্মচারী নিলে কোন কাজ হবে না, এটা বললেই সরকার বেচাইন ক্ষেপে উঠে, তারা পিটাতে চান, বলেন– দেশপ্রেমিকের মত না চললে দেবো শেষ করে। দেশপ্রেম যে কী বস্তু, দেশকে তিনচার দফা বন্ধক দেওয়া 'দেশপ্রেমিকদের' কাণ্ড দেখে জনগণ তা ভুলতে বসেছে। যাই হোক 'শ্যাষ' করে দেবার হুমকি যে গোদা পায়ের লাথি সরকার এটা বুঝছেন না। ইয়া মোটা ফুলে যাওয়া পা উঠিয়ে ধমকাতেই সুখ, কিন্তু লাথ দিতে গেলে ফল হয় না, চোরাকারবারী মজুতদারদের সিধা পথে আনার অভিযানে নেমে এটা প্রমাণ হয়ে গেছে।

খালি তো খালি সব খালি। জিনিসপত্র কিছু নেই বাজারে। ব্যবসায়ীদের আয়েশে তা দেওয়া গোঁফ থেকে সরষে তেলের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে, জিজ্ঞাসা করুন, তেল আছে? উত্তর– নেই। সাবান চান? – নেই। সিগ্রেট?– কিছু না। বিড়ি?– তা আছে, নেন। কুম্ভি পাতাও নয়, বিলাতী গাব পাতার। খেয়ে মজা বুঝুন, ঝিকে মেরে বউকে বুঝানোর মত ব্যবসায়ীরা প্রতিদিন সকালে তাদের দরজায় হাজির জনসাধারণকে নাকের পানি, চোখের পানি এক সাথ করে দিয়ে ছেড়ে দিচ্ছে। সরকারকে বুঝিয়ে দিচ্ছে, বুঝলে? বস্তা। আমাদের ঠেকানোর আশা ছেড়ে সরকারকে বরং সিধা পথে আনো।

আলামত দেখে বুঝা যাচ্ছে, ব্যবসায়ীকুলকে সিধা পথে আনতে না পেরে সরকার বাহাদুরই সুড় সুড় করে সিধা পথে গিয়ে উঠেছে। সেই সিধা পথই বোধ হয় সেরাতুল মোস্তাকিম। এ পথেই অতীতের জ্ঞানীরা গেছেন। পুঁজিপতি ব্যবসায়ীদের আশীর্বাদ নিয়ে, পরস্পর পরস্পরের পিঠ চুলকিয়ে পরস্পরকে সুখ দেবে। বাইরের চার প্রভু হাজির। ভিতরের প্রভুদের বিগড়ানো বন্ধ। সুতরাং স্বাধীনতার পর সমাজতন্ত্রের যে বীজ বপন করা হয়েছিল কাছের প্রভু বাবাজী ২৪০০ কোটি টাকা ট্যাকে গুজে ফেলায়, নতুন গজানো চারার মাথা গেছে, নড়বড়ে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের নতুন শাখা গজিয়েছে, লুটপাট সমিতি রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের কচি ডগা খেয়ে ফেলায় নতুন করে গজিয়েছে টাউট পুঁজিবাদের কঞ্চি। এখন মুনাফাখোরী পুঁজিবাদ, ১৫ লাখ টাকার কারখানা ব্যবসা আর বিদেশী চার প্রভুর কামড়ে চারার আগামাথা সব গেছে। আর এর ফলেই সরকারের মুখ এখন সেরাতুল মোস্তাকিমের দিকে। যাই হোক এখন আবার হাতে ডুবড়ি দিয়ে স্বর্গে যাবার গান গাওয়া যাবে–

আমেরিকার সাথে
পিরীত করে–
স্বগগে যাবো গো!
রাশিয়ার সাথে
পিরীত করে
৮০ টাকা মণ চাল খেয়ে
স্বগগে যাবো গো!
স্বগগে যাবো গো ...

বন্যা নিয়ন্ত্রণের বাস্তব পদক্ষেপ চাই

এবারও প্রলয়ঙ্করী বন্যায় সিলেট, জামালপুর, নারায়ণগঞ্জসহ দেশের বহু অঞ্চল বিধ্বস্ত হয়েছে। বিগত ২৩ বছরে বন্যায় বাংলাদেশের ৫ হাজার কোটি টাকার সম্পদ ছাড়াও বহু অমূল্য জীবন ধ্বংস হয়েছে। বন্যা আজ প্রাকৃতিক দুর্যোগ অপেক্ষা সাংবাৎসরিক ধ্বংসলীলার রূপ পরিগ্রহ করেছে বেশী। দেশের এই প্রবীণতম সমস্যাটির সমাধানকল্পে অতীতের সরকারগুলি পরিকল্পনা নামক বাঁকা পথের আশ্রয় নিয়েছিল। আজও পরিকল্পনার অবয়বের মধ্যে সমস্যাটিকে গোর দেয়া হচ্ছে কিনা, সরকারই তা ভাল জানেন।

পাকিস্তানী আমলে মার্কিনী পরিকল্পনা বিশারদদের এনে তৈরী করা হয়েছিল গোড়া বাঁধ। এক একটি অঞ্চল ঘেরাও দিয়ে রচিত এ বাঁধ প্রকারান্তরে মরণ ফাঁদে পরিণত হয়েছিল। বেড়ী বাঁধের আওতাভুক্ত এলাকায় জলাবদ্ধতা সৃষ্টি এবং তা থেকে ক্রমান্বয়ে মাটির গভীরে বিদ্যমান লবণ গলে গলে উপরে উঠে এসে সৃষ্টি করে লবণাক্ততা। শোষক সরকার তখন অজুহাত পেয়েছিল যে, নদীর উৎসমুখ নাগালের বাইরে, অর্থাৎ ভারতে অবস্থিত। এ অজুহাতে অর্ধেক দায় তারা সেরেছে এবং বাকি অর্ধেক দায় তারা সেরেছে পরিকল্পনার হিমাগারে সমস্যাটিকে তুলে দিয়ে। প্রকৃতপক্ষে আজ বাংলাদেশের প্রধান প্রধান ৫১টি নদীর গভীরতা হ্রাস পেয়েছে। নদীগর্ভে বালি জমে উঠেছে। ১৯৪১ সালে বৃটিশ সরকার পরিচালিত জরীপ অনুসারে ব্রহ্মপুত্র নদের গভীরতা ছিল ৪২ ফুট। আজ ব্রহ্মপুত্রের বুক ভরে গেছে! চৈত্র মাসে গরুর ব্যবসায়ীরা হেঁটে বা গরুর গাড়ী দিয়ে ব্রহ্মপুত্র নদী পার হয়ে যায়।

নদীগুলির বুক ভরাট হয়ে যাবার ফলে নদীর বুক দিয়ে স্বাভাবিক পানির প্রবাহ গেছে বন্ধ হয়ে। বর্ষা মওসুমে পানি সামান্য বাড়লেই তা নদীর দুই কূল ছাপিয়ে দেয়। এমতাবস্থায় নদীগুলির গর্ভ খনন করা না হলে বেড়ী বাঁধ দিয়ে বন্যা রোধ করা এক কথায় অসম্ভব।

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের অর্থাৎ রাজশাহী ও আশেপাশে দিয়ে যে সব নদী বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে, গত কয়েক বৎসরে সেগুলির গর্ভ মারাত্মকভাবে ভরাট হয়ে গেছে। পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র ইত্যাদির বুকে পড়েছে বালুচর। বিদেশীয়ান অর্থ সাহায্যে ও কারিগর দিয়ে নির্মিত ভারতের ফারাক্কা বাঁধের ফলেই সৃষ্টি হয়েছে এ দুরবস্থা। 'বন্ধু রাষ্ট্র ভারত' আমাদের গলায় ফাঁসটি একহাতে রেখে অন্য হাতে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরেছে গলা।

বন্যা সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য ভারতের অসহযোগিতায় পরিকল্পনা গ্রহণকে সবাই অভিনন্দন জানাবে। কিন্তু যুক্ত পরিকল্পনার নামে তহবিল যুক্ত করে, 'তোমার টাকা আমার টাকা, আমার টাকা আমার টাকা প্রবাদের পুনরাবৃত্তি না ঘটে সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।

অতীতে অনেক কমিশন বন্যা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে রিপোর্ট দিয়েছে, এখন আবার যুক্ত কমিশন বসছে। বাংলাদেশের প্রয়োজনীয় পরিমাণ পানি সরবরাহ করতে ভারত নির্দ্বিধায় রাজি হলে সমস্যার বহুলাংশে সীমান্তের এপারেও সমাধান করা সম্ভব।

সে যা-ই হোক, বন্যা নিয়ন্ত্রণের নামে অতীতে শত শত কোটি টাকার বরাদ্দ দেখানো সত্ত্বেও কাজ কিছু হয়নি। সরকার এবার কথা শুনিয়ে কাজ দেখাতে শুরু করলে ভাল হয়। কেননা বছর না গড়াতেই ভয় ধ্বংসলীলা নিয়ে আবার বন্যা হাজির হবে।

ভারতীয় সেনা সরকারই দায়ী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

তাছাড়া যুদ্ধের পূর্ব মুহূর্তেই আওয়ামী লীগের মাতব্বররা মানুষের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া জাতীয় সোনাও ভারতে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দিয়েছে। প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের কাছে আওয়ামী সংগ্রাম পরিষদের মাধ্যমে যে সোনা গিয়েছিল, তাও বিনা শর্তে ভারত সরকারের হাতে তুলে দিতে হয়েছে। এদিকে পাক সেনারা দেশব্যাপী লুণ্ঠন চালিয়ে নিজেদের ব্যাংকারে যে স্বর্ণালংকার মজুদ করেছিল, তাও ভারতীয় সেনাদের হাত ঘুরে পৌঁছে গেছে ভারত সরকারের কাছে। একমাত্র যশোর ক্যান্টনমেন্ট থেকেই ভারতীয় সেনারা ৯মণ স্বর্ণালঙ্কার নিয়ে গেছে।

রিক্ত বাংলাদেশ তাই তার টাকার পেছনে স্বর্ণ

সমর্থন রাখার জন্য জনগণের কাছেও হাত পাততে পারছে না। তাঁবেদার সরকার এখন ঠেকলে পরে 'বাবার নাম' স্মরণ করে বলছে, সমাজতান্ত্রিক দেশে টাকার পেছনে স্বর্ণ সমর্থন রাখতে নেই। তাজুদ্দিন আবার বলছেন, আমরা কিছু স্বর্ণ মজুদ রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছি। অর্থাৎ, ইচ্ছা থাকলেও এ সরকার উপায়হীন হয়ে পড়েছে। কিন্তু দুঃখ জনগণের সামনে প্রকৃত শত্রুকে সনাক্ত করে জনগণের সাহায্য চাইতেও এ সরকার অপারগ।

এখন দেশে যে বিস্তার সামগ্রী রয়েছে তা যদিও স্বর্ণ নয়, তবু সম্পদের হিসাব-নিকাশে তার স্থান যথেষ্ট। কিন্তু এসব কাসা, পিতল, রূপাও আজ পাচার হচ্ছে ভারতে। কাঁচা পয়সার মধ্যে যে মূল্যবান ধাতু আছে, ভারত তাও বাংলাদেশে থাকতে দেবে না। ট্রাকভর্তি করে বাংলাদেশের কাঁচা পয়সা ভারতে পাচারের ফলে একদিকে আমাদের মূল্যবান সম্পদ হ্রাস পাচ্ছে অন্যদিকে দেখা দিচ্ছে কাঁচা পয়সার সঙ্কট। এর পরিণতিতে বাংলাদেশের টাকার দাম আরো কমে যাবে।

এই সর্বনাশের পরও আমাদের উপর নেমে এসেছে ভারতীয় টাকার অভিশাপ। যে ভারতীয় টাকার মান ছিল পাকিস্তানী টাকার অর্ধেকের কিছু বেশী (অর্থাৎ, ভারতের ১০০ টাকায় পাকিস্তানী ৬০ টাকা পাওয়া যেতো) সেই টাকাই স্বাধীনতার পর সমান মূল্যে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে চালু হয়ে পড়ে। বাংলাদেশ যখন অর্থনৈতিক মৃত্যুর দ্বারে, ঠিক সেই সুযোগে ভারতীয়রা তাদের টাকাকে হাতে তোলার চান্স গ্রহণ করেছে। সীমান্তের এপার-ওপার তখন অখণ্ড বাজারে পর্যবসিত, তাঁবেদার তাজুদ্দিন সরকার ভারতের প্ররোচনায় বাংলাদেশের মুদ্রামান হ্রাস করে সরকারীভাবে ভারতীয় টাকাকে বাংলাদেশের টাকার সমানে তুলে আনে। কিন্তু এর পরেই ভারতীয় মুদ্রাকে আরও জাতে তোলার জন্য ভারতীয় মাড়োয়ারী ও সরকার সীমান্তের ওপারে বেসরকারী লেনদেনের হার পরিবর্তন করে বাংলাদেশের ১০০ টাকার বিনিময়ে ভারতীয় ৮০ টাকা দিতে শুরু করে। আজ বাংলাদেশের ১০০ টাকা দিয়ে ভারতের ৫০ টাকা পাওয়া যায়। এদিক থেকে হিসাব করলে ফল দাঁড়ায় ঃ দেড় বছর আগের তুলনায় বাংলাদেশের টাকায় দাম কমেছে অবিশ্বাস্য রকম। এখনকার ১০০ টাকা তখনকার ৩০ টাকার সমানে এসে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ একইভাবে জিনিসপত্রের দাম গড়পড়তা বৃদ্ধি পেয়ে দেড় বছর আগের তুলনায় তিনগুণ বেশী দাঁড়াতে বাধ্য। বাংলাদেশ সরকার সব কিছু ভালভাবে অবগত রয়েছে। তথাপি সত্য কথাটি বলতে তারা নারাজ। কেননা তাতে তাদের প্রভু ভারতের চেহারা আর নিজ দলের লোকদের অপকীর্তি ফাঁস হয়ে পড়বে।



প্রধানমন্ত্রীর এমসিএ পদ

জনাব সম্পাদক সাহেব,

লজিক অর্থাৎ যুক্তি হিসাবেই 'হক-কথা'র পাঠকসমাজের কাছে একটি বক্তব্য রাখতে চাই। পাকিস্তান আমলে বিশেষতঃ দখলকার আমলে দেশের অভ্যন্তরে যে এমসিএ বাস করেছেন, তাদের শাস্তি দেয়া হয়েছে। ভারতে যারা আশ্রয় নিয়েছে তারা মন্ত্রীত্বসহ সর্বাধিক পুরস্কার পেয়েছে স্বাধীনতার পরে। দখলকার আমলে যারা দেশের অভ্যন্তরে রয়ে গিয়েছিল তারা হানাদারদের সাথে সহযোগিতা যাকে বলে তা করেনি। তখনকার প্রেক্ষিতে নিরপেক্ষ থেকে আত্মরক্ষা করেছেন। তবু শাস্তির হাত থেকে তাদের রেহাই মিলেনি। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী সব জেনেশুনেও পাক-বাহিনীর হাতে ধরা দিয়েছেন, নয় মাস কাটিয়েছেন তাদের হাতে। ভুট্টো সম্প্রতি বলেছেন, মুজিব অনেক কথার মর্যাদা রক্ষা করেনি। তাহলে প্রধানমন্ত্রীও অনেক আশ্বাস তাদের শুনিয়েছিল বলে মনে করা যায়। পাকিস্তানীদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য যদিও এটা তিনি করেছেন বলে আমরা ধরতে পারি, তথাপি প্রশ্ন থেকে যায় অন্য যে সব এমসিএ তাঁর চাইতে বেশী কোন কথা হানাদারদের বলেনি, তাদের শাস্তি হবে কেন? যদি তাদের শাস্তি পেতে হয় তবে শেখ মুজিবের এমসিএ পদই বা অটুট থাকবে কেন? এটা কি একযাত্রার দুফল নয়?

নজমুল হুদা, ঢাকা

রাজত্বটা ত্রাসের

জুলকারনাইন

(জনাব ইরফানুল বারীকে নিবেদিত)

দালাল দালাল করিস কারণ
রাজত্বটা ত্রাসের
কেউবা দালাল ভারতীয়
কেউবা দালাল রুশের
দালাল বলিস কারে, আমি
মানুষ বাঙাল দেশের
ও ভাই দালাল হলাম কিসে!
মাটি ফুটে বেরিয়েছি ভাই
নামটি বাঙালী,
মাটির মাঝেই লুটাই ফুটাই
চির কাঙালী,
জগৎশেঠের ছাবালদেরই
মুখে চুনকালি।
ওরা বড় জঞ্জালী!
যেমন ছিলাম তেমনই আছি
আছি বেঁচে আছি।
ও ভাই তুমিও নাই আমিও নাই
এসো সবাই বাঁচি
অপর জনের কথায় কেন
ধেই ধেই ধেই নাচি
আর পরাণটাও যাঁচি
পরস্পরের কান মলি আয়
নিজের বোল বুলি
পরের কথায় নেশা ধরলে
চোখে পড়বে ঠুলি
মাটির মালিক আল্লাকেও
সবাই যদি ভুলি
ওরা চোখে দেবে ধুলি
তাই বলি ভাই দালাল দালাল
করিস নে আর সবে,
দালাল যমের বাড়ী গেলে
যমও দালাল হবে,
যমের সঙ্গে দালালীতে
কেউ পারে না ভবে
সবাই দালাল হবে!
আমিও দালাল তুমিও দালাল
অমুক দালাল কিসের
অমুক দালাল ভারতীয়
অমুক দালাল রুশের
অমুক দালাল মাও সেতুঙ আর
অমুক দালাল নাসের
রাজত্বটা ত্রাসের।

মুরিদের দরবার

দার্শনিকের দৃষ্টিতে ইসলামী সমাজতন্ত্র

॥ মোহাম্মদ হোসেন ॥

ইসলাম কোন ধর্ম নয়

॥ ১ ॥

আমরা যদি ব্যক্তিগত স্বার্থকে ছোট করিয়া দেখি সমগ্র মানব সমাজের স্বার্থকে বড় করিয়া বুঝি ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দকে জলাঞ্জলি দিয়া সকলেই সকলের সুখ স্বাচ্ছন্দের জন্য তৎপর হই সমাজের বৃহৎ স্বার্থ বা কল্যাণের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কাজ করিয়া যাই, তবে জীবনকে সার্থক ও সুন্দর করিয়া তুলিতে পারি। ব্যক্তিগত স্বার্থে বা ভোগ বিলাসে এখন আমরা যতটুকু শান্তি পাইতেছি তাহার চেয়ে শত সহস্র গুণ বেশী তৃপ্তি পাইতে পারি, জীবনকে স্রষ্টার সৌন্দর্য সম্ভোগে ডুবাইয়া রাখিতে পারি যদি আমরা ক্ষমাশীল দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি নিঃস্বার্থ ও স্বতঃস্ফূর্ত ত্যাগে উদ্দীপিত হইয়া সংবেদনশীল হই–যদি আমরা আমাদের প্রেম বা ভালবাসাকে সঙ্কীর্ণ গন্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ না রাখিয়া সমগ্র মানব সমাজের মধ্যে বিস্তার করিয়া দেই–যদি আমরা একে অন্যকে প্রেমের দ্বারা আপন করিয়া লই– যদি আমাদের হৃদয়ে সেই বিশ্বপ্রেম ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব ভাব জাগ্রত হয়। প্রেমানুভূতিতে ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের দৃষ্টিভঙ্গিতে জগতকে দেখিতে হইলে প্রথমেই ইসলামের সুমহান আদর্শকে মানিয়া লইতে হইবে। শুধু মানিয়া লইলেই চলিবে না ইহার সেই আদর্শ ও নীতিকে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে, আবার শুধু হৃদয়ঙ্গম করিলেই চলিবে না বাস্তব জীবনের দৈনন্দিন কর্মের ভিতর দিয়া ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। ইসলাম বলিতে শুধু মুসলিম ধর্মকে বুঝায় না। ইসলাম কোন ধর্ম নয়, ইসলাম হইতেছে একটি সুমহান আদর্শ। ইহাকে বিশেষ কোন ধর্মের দ্বারা চিহ্নিত করা যায় না বা এই আদর্শ বিশেষ কোন জাতি বা ধর্মের একচেটিয়া নয়। ইহা হইতেছে সার্বজনীন ও সর্বকালীন।

ইসলামকে একটি বৃক্ষের সহিত তুলনা করিলে ইহার আদর্শটি আমাদের নিকট সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে। বৃক্ষ নিশ্চল কিন্তু তাই বলিয়া প্রাণহীন ও দানহীন নয়। সর্বশক্তিমানের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ কিন্তু কেন যেন মনে হয় বৃক্ষই তাহার অমর সৃষ্টি। বৃক্ষ মানুষকে যে স্বতঃস্ফূর্ত নিঃস্বার্থ ত্যাগ ও দানের শিক্ষা দেখাইতেছে তাহা কি সকল মানুষই পারে! মানুষ মনুষ্যত্ব হারাইয়া অমানুষ হইতে পারে কিন্তু বৃক্ষ কি তাহাই পারে? বৃক্ষ-বৃক্ষই থাকে। মানুষ স্বার্থের বশে স্বীয় উদ্দেশ্যকে এড়াইয়া যাইতে পারে কিন্তু বৃক্ষ তাহার উদ্দেশ্যে অবিচল থাকে। আমরা ইহাকে প্রতিনিয়তই একই স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখি। বিশেষ কোন কারণে মূল হইতে বিচ্যুত না হইলে সে যুগ যুগের স্বাক্ষর হিসাবে দাঁড়াইয়া থাকে। কিন্তু সে বৃক্ষ প্রাণ খুলিয়া তাহার অন্তরের ভাষা কাহারো নিকট ব্যক্ত করিতে পারে না। একান্ত ইচ্ছা জাগিলেও অন্য কোথাও সচল প্রাণীর মত চলাফেরা করিতে পারে না, মূক বধিরের মত একই স্থানে দৃঢ়ভাবে অবস্থান করে। আমরা মানুষ সেই অচল বৃক্ষটির আদর্শটিকে যদি গ্রহণ করিতাম তবে মানবসমাজের কতই না মঙ্গল হইত তাহা কি একবারও ভাবিয়া দেখি? সে উত্তপ্ত রোদের সময় আপনজনের

মত কত ক্লান্ত জীবনকেই না তাহার স্নিগ্ধ শীতল ছায়া দিয়া তৃপ্তি দান করে। তাহার সেই স্নিগ্ধ শীতল ছায়ার নীচে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে আল্লাহর সকল সৃষ্টিই শ্রান্তি দূর করিতে দাঁড়াইতে পারে। কাহাকেও সে ঘৃণা বা অবজ্ঞার চোখে দেখে না। ছোট বড়, উঁচু-নিচু সকলকেই সে সানন্দে অভিনন্দন জানায়। এই বৃক্ষ যে ফল দেয় তাহা শুধু মানুষই নয় জীবন্ত পশু-পক্ষী কুলকেও সে তাহা দান করিয়া-তাহাদের জঠর জ্বালা নিবৃত করে। যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার ভাণ্ডারে আছে ততক্ষণ পর্যন্ত সে উন্মুক্ত হস্তে তাহার সেই প্রাণে ধন বুভুক্ষদের মধ্যে বিলাইয়া দেয়, নিজের জন্য সে কিছুই সঞ্চয় করে না। অকৃতজ্ঞ মানুষ তাহাকে মূল হইতে বিচ্যুত করিয়া খণ্ড বিখণ্ড করিয়া কত ভাবে কত নিয়মে নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দের জন্য কত কিছুই না গড়িয়া লইতেছে তাহাতেও কোন আপত্তি করিতেছে না। পরিশেষে অম্লান বদনে হৃষ্ট চিত্তে মানুষের কল্যাণের জন্য সে তাহার অমূল্য ও প্রাণপ্রিয় জীবনকেও উৎসর্গ করিতেছে। নিজত্বকে ভুলিয়া অনন্তে বিলীন হইয়া যাইতেছে।

এই যে বৃক্ষ যাহাকে আমরা সাধারণ-অতি সাধারণ ও নগন্য মনে করিতেছি-তাহার মধ্যে যে সার্বজনীন প্রেমের দান রহিয়াছে উহার কিঞ্চিতও যদি মানুষের মধ্যে থাকিত তবে জগৎ অমৃতময় হইয়া উঠিত। বৃক্ষের মধ্যে এই যে ত্যাগ ও দানের সাম্য ও প্রেমের চিরন্তন সার্বজনীন আদর্শ ইসলামও ঐ রূপ একটি আদর্শ। (চলবে)

কেয়ামত প্রসঙ্গে

আবদুল হক

সম্প্রতি কেয়ামত বা মহাপ্রলয় সম্পর্কে এক খবর প্রকাশিত হইয়াছে। এ খবর নিয়া বিভিন্ন মহলে কিছুটা আলোড়ন জল্পনা-কল্পনা শুরু হইয়াছে।

ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ইহার গুরুত্ব কতটুকু ইহা কষ্টি-পাথরে যাচাই করা আমাদের প্রয়োজন। এই পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা, আকাশ-বাতাস সবই আল্লাহ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাঁহারই আদেশে নিজ নিজ কক্ষে বিচরণ করিতেছে। এই নিয়মের ব্যতিক্রম কোথাও দেখা যায় না। আল্লাহর ইচ্ছা এবং আদেশেই এই দুনিয়া সৃষ্টি হইয়াছিল আবার তাঁহার আদেশেই এই দুনিয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। তবে ইহা কবে সংঘটিত হইবে দিন-তারিখ নির্দিষ্ট নাই। পবিত্র কোরান সর্বশেষ আসমানি কেতাব বা গ্রন্থ এবং মহানবী হজরত মুহাম্মদ (দঃ) সর্বশেষ নবী। কোরান মজীদ নাজিল হইবার পূর্বে বহু আসমানি গ্রন্থ দুনিয়ায় নাজিল হইয়াছিল। কিন্তু পরিতাপের বিষয় সেগুলি ছহি বা সঠিক অবস্থায় বর্তমানে বিদ্যমান নাই। একমাত্র পবিত্র কোরান পাক নির্ভুল ও শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করিতে পারে। ইহা স্বয়ং কোরান নিজেই বিশ্ববাসীকে চালেঞ্জ প্রদান করিয়াছে বিগত ১৪০০ বৎসর পূর্বে।

কোরান মজীদে সুরা লোকমানে আল্লাহ ঘোষণা করিয়াছেন কেয়ামত কবে সংঘটিত হইবে তাহা শুধু একমাত্র আমি (আল্লাহ)-ই অবগত আছি।

মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সঃ) ছহি বুখারী শরীফ হাদিসে ঘোষণা করিয়াছেন-'যে পর্য্যন্ত আল্লাহ শব্দ উচ্চারণ করার মত একজন মুসলমান বিদ্যমান থাকিবে কেয়ামত বা মহাপ্রলয় হইবে না' পবিত্র কোরআন ও হাদিসের আলোকে দেখা যাইতেছে যে কেয়ামত অক্টোবর মাসে সংঘটিত হইতে পারে না। এবং একথা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। ইতিপূর্বে বহুবার এরূপ আজগুবী খবর পত্রিকান্তরে ও হ্যান্ডবিল আকারে প্রকাশিত হইয়াছে কিন্তু কোন কিছু সংঘটিত

হয় নাই। তবে এ সমস্ত খবর প্রকাশিত না হইলেও আমাদের সকলেরই উচিত পাপ কাজ পরিহারপূর্বক সরল, সঠিক পুণ্য পথে জীবনযাপন করতঃ দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করা।

গণপরিষদের আইনগত ভিত্তি কোথায়?

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বাঙ্গালী জনগণ সেদিন যতটুকু পাবার আশায় এদের নির্বাচন করেছিল, আজ তার চাইতে বহু শতগুণ বেশী পাবার দাবীদার। এই সব সদস্যরা যখন ছিল দ্বিধান্বিত তখনই জনগণ 'আজকে থেকে কি হলো– বাংলাদেশ স্বাধীন হলো' বলে স্বাধীনতার দাবী নিয়ে এগিয়ে গেছে সম্মুখে। তাই, এই সদস্যরা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেও তা করেছে আর বাংলাদেশের চরিত্রকে আরও স্পষ্ট করিয়ে দিয়েছে। এরপর দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, রিলিফ চুরির মধ্য দিয়ে এই শ'পাঁচেক ব্যক্তির দলটিই সর্বাংশে জনগণের অনাস্থায় পতিত হয়েছে অথচ শর্টকাট পগার পার হবার জন্য এবং সকল ধরনের শোষণ ও মৈত্রীর নামে প্রভুত্ব বিস্তারকারী বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে সোচ্চার গণমুখী ও যুবশক্তিকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য ক্ষমতাসীনরা বিপ্লবের সর্বনাশ করেছে। ৩০ লক্ষ লোকের জীবনদানকে পদদলিত করে, তাদের হাড়ের উপর ইয়াহিয়ার লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডারের তাঁবেদারদের আসীন করিয়েছে।

বিশ্ব বিপ্লবের ইতিহাসে বিশ্বাসঘাতকতার এমন নজীর নেই। বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার সংবিধানও এভাবে প্রণীত হয়নি। গণতান্ত্রিক দেশ বৃটেনের শাসনতন্ত্রের ধারাগুলি গ্রহণেরও একটি আইনগত দৃঢ় ভিত্তি আছে। সাম্রাজ্যবাদীরা উপমহাদেশকে ১৯৪৭ সালে ভাগ করে লন্ডনের কমন্স সভায় আইন পাশ করিয়ে এ উপমহাদেশে সৃষ্ট দুটি রাষ্ট্রের সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলি থেকে পূর্ববর্তী নির্বাচনে নির্বাচিত ব্যক্তিদের গণপরিষদের সদস্য বলে ঘোষণা করেছিল। সেই সাম্রাজ্যবাদী নির্দেশের ফলশ্রুতি বয়ে পাকিস্তান ও ভারতের জনগণের জীবন বিষিয়ে উঠেছে। পাকিস্তানের সেই গণ তথা জাতীয় পরিষদ সাত বছর ক্ষমতার ঝুটি ধরে রেখেছিল। কোন শাসনতন্ত্র দেয়নি। অবশ্য সেই স্বাধীনতা বিপ্লব ছিল না। ১৯৫৬ সালে মার্কিন গমের বস্তায় সওয়ার হয়ে ওয়াশিংটন থেকে আগত মোহাম্মদ আলী (বগুড়া) যে শাসনতন্ত্র দিয়েছিল জনগণ তাও মানেনি। সাম্রাজ্যবাদের অঙ্গুলী হেলনে চলবার অভিশাপ থেকে মুক্তির জন্য অস্ত্রহাতে লড়াইতে নেমেছিল বাঙ্গালীরা। কিন্তু এখন আবার একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হলো, এবার বৃটিশ কমন্স সভায় আইন পাশ হয়নি, হয়েছে বন্ধুরূপী প্রভুদের ইঙ্গিতে।

বর্তমানের তথাকথিত গণপরিষদ জনগণের বিপ্লবী আকাঙ্ক্ষার পরিপন্থী, পশ্চাতমুখী ও প্রগতির দুশমন। এ গণপরিষদ ও ঐ পরিষদের হেফাজতদার সরকার বিপ্লবের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা দশজনের মত, বিশেষ কোন আইনগত অধিকার নিয়ে নয়। এছাড়া এদেরকে যদি মুক্তিযোদ্ধা তরুণরা লাঠি হাতে পাহারা দিয়ে না রাখতো, এদের অধিকাংশ লোক এসে পাকিস্তানীদের সাথে হাত মিলাতো, তা জনগণের জানা আছে। যুদ্ধকালে ফার্স্টক্লাশে আয়েশে দিন কাটিয়ে এরা নায়ক সেজেছে, কিন্তু নয় মাসের যুদ্ধ ও সংগ্রামে পোড় খেয়ে জনগণের আস্থা এসব উকিলমার্কা রাজনীতিকের উপর বিনষ্ট হয়ে নতুনভাবে নব্য যুবশক্তির উপর আবর্তিত হয়েছে।

ন্যাপের আসন্ন জাতীয় সম্মেলনেঃ

মওলানা ভাসানীর নির্দেশ

আমি অত্যন্ত উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করিতেছি যে সরকারী নীতির চরম অব্যবস্থা এবং এমসিএ ও আমলাদের দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির ফলে বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ তাঁতী আজ চরম সংকটের সম্মুখীন। সুতার অপর্যাপ্ততা ও বণ্টন ব্যবস্থার দুর্নীতির ফলে একদিকে লক্ষ লক্ষ তাঁতী শ্রমিক বেকার হইতে চলিয়াছে এবং অন্যদিকে কাপড়ের মূল্য বাড়িয়া যাবার ফলে গরীব জনসাধারণের কষ্টের আর সীমা থাকিতেছে না। সরকারের সর্বশেষ নীতি অনুযায়ী প্রকৃত তাঁতীদের মধ্যে সুতা বণ্টনের জন্য এমসিএদের সার্টিফিকেটের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু অভিযোগ আসছে যে এমসিএদের বদৌলতে রাতারাতি হাজার হাজার তাঁতীর সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে যারা কোনদিন তাঁত চোখেও দেখে নাই। অন্যদিকে প্রকৃত অনেককেই সুতা কিনিতে হইতেছে খোলা বাজার হইতে দ্বিগুণ মূল্য দিয়ে। অদ্যই আমি আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে জানিতে পারিয়াছি যে পাবনা জিলার চৌহালী থানার একজন প্রকৃত তাঁতী এক ডবল ৬০ কাউন্টের সুতা টাঙ্গাইল হইতে জনৈক কার্ড হোল্ডারের কাছ হইতে ২৬০ টাকায় ক্রয় করে যাহার প্রকৃত মূল্যে ১৬০। সে বাড়ী ফিরার পথে আমার নিকট এই অভিযোগ জানাইয়া যায়।

এমতাবস্থায় আমি এই অব্যবস্থা দূর করিয়া অবিলম্বে প্রকৃত তাঁতী নির্ধারণ পূর্বক তাদের মধ্যে সরাসরি ন্যায্য মূল্যে সুতা সরবরাহ করিয়া দেশের তাঁত শিল্পকে বাঁচাইয়া রাখার অনুরোধ জানাইতেছি।

বাংলাদেশের সাত লাখ বিড়ি শ্রমিক পাতার অভাবে আজ কাজ হারাইবার মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। স্বাধীন বাংলাদেশে চাউল-ডাউল ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের অগ্নিমূল্যে প্রতিটি মানুষের দু'বেলা আহার সংগ্রহ করা দুষ্কর হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সেই মুহূর্তে এই লক্ষ লক্ষ লোক বেকার হইয়া পড়িলে কি জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হইবে তাহা বর্ণনা করা যায় না। পাকিস্তানী আমলে বিড়ি শ্রমিকদের ভাগ্য লইয়া ছিনিমিনি খেলা শুরু হয় তাহা আজও যদি চলিতে থাকে তাহার চেয়ে দুঃখের আর কিছুই নাই।

বাংলাদেশ সরকার বিড়ি পাতা সরবরাহের ব্যাপারে এখনও কোন সুনির্দিষ্ট কথা বলে নাই। ভারত হইতে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে টেন্ডু পাতা আমদানী না করার দরুণ চোরাপথে পাতা আসিতেছে। ফলে একদিকে সরকারের যেমন ক্ষতি হইতেছে, অন্যদিকে বিড়ি শ্রমিকরাও পাতার সরবরাহ পাইতেছে না।

ইহারা কাহারা?

সম্প্রতি নাগরপুর থানার পুলিশের একটি দল ধলেশ্বরী নদী পথে নয়টি নৌকাযোগে ভারতে চোরাচালানরত প্রায় আট লক্ষ টাকা মূল্যের বিভিন্ন মালামাল আটক করেছে। ঢাকা, চট্টগ্রাম, চাঁদপুর, নারায়ণগঞ্জের বিভিন্ন মোকাম থেকে কেনা এই মালগুলির প্রকৃত মালিকদের কোন ঠিকানা পাওয়া যায়নি। নৌকার মাঝিরাও এ ব্যাপারে তাদের অজ্ঞতার কথা জানিয়েছে। নৌকাগুলোতে চাল, আটা, বাদাম, করগেটেড টিন, চিনি, কেরোসিন ও নারকেল তৈল, আলকাতরা, সাবান প্রভৃতি ছিল। বাংলাদেশ থেকে জিনিসপত্র পাচারকারী এই দেশদ্রোহীরা কারা?

নিয়মিত বিদ্যুত চাই ঃ ভাসানীর তারবার্তা

'হক-কথা' প্রকাশের দু'তিন দিন পূর্ব থেকেই বিগত কিছুদিন যাবৎ নিয়মিত

বিদ্যুত বন্ধ হওয়ায় সৃষ্ট অসুবিধের দরুণ সময় মত 'হক-কথা' প্রকাশিত হতে পারছে না। এই পরিপ্রেক্ষিতে গত ১৬ই জুলাই মওলানা ভাসানী প্রধানমন্ত্রী এবং বিদ্যুত মন্ত্রীর প্রতি যে তারবার্তাটি প্রেরণ করেছেন তা হুবহু নীচে ছাপা হলো ঃ

"গত সপ্তাহ হইতে 'হক-কথা' ছাপার ঠিক সময়মত বিদ্যুত বন্ধ হয় যাহার ফলে 'হক-কথা' নিয়মিত বাহির করা সম্ভব হইতেছে না। আমি মনে করি ইহাও দমননীতির একটি অংশ। নিয়মিত বিদ্যুত সরবরাহের ব্যবস্থা করিলে বাধিত হইব।"

ইহা কি সত্য?

॥১১৪॥

এককালে চুলোয় হাড়ি না উঠলেও কক্সবাজারের এক বিশেষ বাহিনীর লিডার এবার গজল গাইতে গাইতে দু'লাখ টাকা বদলিয়ে ফেলেছেন। এত টাকা তিনি কীভাবে কোথায় পেলেন– জিজ্ঞেস করা তো দূরের কথা, জনাবের ডাণ্ডার ভয়ে এখনো জনগণ তাকে প্রচুর চাঁদা দিচ্ছেন।

॥১১৫॥

উত্তরাধিকার সূত্রে সম্প্রতি ঢাকার তেজগাঁ এতিমখানার পরিচালক নিযুক্তি সুসম্পন্ন হয়েছে। দালালীর অভিযোগে প্রাক্তন পরিচালক পলায়ন করার পর নতুন লীগের কর্তারা তার পুত্রধনটিকেই পিতার পদে বহাল করেছেন।

॥১১৬॥

শ্যামপুরের দ্বিতীয় লীগের সম্পাদক এবং আরেক মুজিববাদী মুক্তিযোদ্ধা রিভলবার দেখিয়ে রিলিফের ১৭ হাজার টাকা ছিনিয়ে নিয়েছেন।

॥১১৭॥

'তথ্য অনুসন্ধান কমিটির' অধিকাংশ সদস্যই সেই সব সদাশয় অফিসার যারা হানাদার আমলেও কর্তা হয়ে দালালী করেছেন। চান্স পেয়ে তারা এখনো টুপাইস বিজনেস শুরু করেছেন।

॥১১৮॥

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্ণর পরবর্তী পদটিতে যাকে বসানো হয়েছে, তিনি ভারত থেকে অতি সম্প্রতি আগমন করেছেন।

॥১১৯॥

কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন পটুয়াখালীর গলাচিপা থানার জন্য যে ২ হাজার মণ রাসায়নিক সার পাঠিয়েছিল, তা পথিমধ্যেই জনৈক এমসিএ-র বাহিনী আটক করে নৌকাগুলো ঢাকার দিকে নিয়ে যায়। কারণ, সার আগেই ঢাকার এক ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করা হয়ে গেছে। কর্তৃপক্ষ ধরলে প্রথমে এমসিএ এব্যাপার চেপে যাবার অনুরোধ করেন। কাজ না হওয়ায় শেষে থ্রেটনিং। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন ঃ প্রাণ ও চাকরির মায়া জগতে কার না আছে!

সম্পাদক ঃ সৈয়দ ইরফানুল বারী, ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ঃ মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী
মুদ্রণে ঃ শান্তি প্রেস, সন্তোষ, টাঙ্গাইল।

প্রতি কপি পঁচিশ পয়সা সাপ্তাহিক চাঁদার হার : ষান্মাসিক-৬.০০ বার্ষিক-১০.০০

হক-কথা

(WEEKLY THE HAQ-KATHA)

প্রকাশক ও পৃষ্ঠপোষক ঃ মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

প্রথম বর্ষ ২২ সংখ্যা শুক্রবার ১১ই শ্রাবণ ১৩৭৯ ২৮শে জুলাই ১৯৭২ ১৬ই জামাদিউসসানী, ১৩৯২ সন্তোষ টাঙ্গাইল।

বেকায়দায় পড়ে শেখ সাহেব কেটে পড়েছেন

হেঁ-হেঁবাদী বনাম লাথিবাদী

প্রধানমন্ত্রী জবর বেকায়দায় পড়ে গেছেন। মুজিববাদকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগের হেঁ হেঁ বাদী আর লাথিবাদী গ্রুপদ্বয়ের পাল্টা-পাল্টি এবং দল ভারীর কম্পিটিশনে স্বয়ং নিজে নেমেও হাস্যকর পরিণতির মুখোমুখি হয়ে এখন শেখ সাহেব হায় হায় দশায় পড়েছেন।

গত ২১শে থেকে ২৩শে জুলাই পর্যন্ত ঢাকায় অনুষ্ঠিত ছাত্রলীগের দুটি পাল্টা গ্রুপের সম্মেলনের শেষ দিনে মুজিববাদী গুণ্ডারা মুজিববাদে পদাঘাতকারী ছাত্রলীগটির ওপর জঘন্য হামলা করে ফ্যাসীবাদের আরেক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। মত প্রকাশের গণতান্ত্রিক অধিকারকে গায়ের জোরে দমন করার এই দৃষ্টান্ত অবশ্য বাংলাদেশে এবারই প্রথম নয়। ইতিপূর্বে দেশের বিভিন্ন স্থানে দেশপ্রেমিক বামপন্থীদের ওপর হামলা, গুপ্ত হত্যা এবং গ্রেফতার ইত্যাদিই তার সাক্ষ্য বহন করে। আর সবচেয়ে বড় সাক্ষ্য স্বয়ং শেখ মুজিব আর তার বিভিন্ন বক্তৃতা 'নকশাল' দেখামাত্র গুলী করার সদম্ভ হুমকির পর 'সর্বজন শ্রদ্ধেয়' ভ্রাতা-বন্ধু-পিতাটি সম্প্রতি প্রেসক্লাবে এবং তারও দু'তিন দিন পর আদমজীর শ্রমিক সমাবেশে নিজের অতীতের কলঙ্কজনক অধ্যায়ের স্মৃতিকে সগর্বে স্মরণ করে বলেছেন ঃ "জাতির পিতা হইয়া খাইছি, নাইলে (আস্তিন গুটাতে গুটাতে) এসব হাঙ্কিপাঙ্কি কীভাবে তরবিয়ত করতে হয়, আমার তা ভালোই জানা আছে।"

খাঁটি সত্য কথা– শেখ সাহেবের সে ঐতিহ্য আছে। ময়মনসিংহে সাবেক আওয়ামী লীগ সম্পাদকের উন্মাদ হয়ে যাওয়া, সাবেক পূর্ব পাকিস্তান এসেম্বলী, রূপমহল আর পল্টন তার ফ্যাসীবাদী কার্যকলাপের নীরব সাক্ষ্য দান করছে। 'জাতির পিতা'র এই মহান ঐতিহ্যে অনুপ্রাণিত হবার কড়া নির্দেশ পেয়ে হেঁ-হেঁবাদীদের মধ্যে সাজ-সাজ রব পড়ে গিয়েছিল। ২১শে জুলাই হেঁ-হেঁ বাদী ছাত্রলীগের সম্মেলন উদ্বোধন করতে গিয়ে তিনি এক পায়ে খাড়া। রক্তচক্ষু লাঠিয়ালদের আশুকরণীয় সম্পর্কে নির্দেশ দান করেন "আমি যখন রাজনীতিতে নেমেছি তখন এদের জন্মও হয়নি, নাক টিপলে দুধ বেরোবে। আজ এরা লম্বা লম্বা কথা বলছে। আমি জাতির পিতা হইয়া খাইছি। নইলে দেখায়ে দিতাম, হাঙ্কিপাঙ্কি কীভাবে ঠাণ্ডা করে দিতে হয়।" পৃথিবীর কোন জাতির পিতার মুখ দিয়ে

(অবশ্য হিটলার বাদে) এমন অমৃত কখন বেরিয়েছে, কেউ প্রকাশ্য সভায় দাঁড়িয়ে নিজেকে জাতির পিতা বলে এ্যাসার্ট করেছে– এমন নজীর পৃথিবীতে আছে বলে আমাদের জানা নেই।

তা শেখ সাহেবের ইশারা কাজে লেগেছে। ছাত্রলীগ সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে লালবাহিনীর মুখ দিয়ে মুজিববাদী শ্লোগান বের করার জন্য নানান ডালে লম্ফদানকারী মাংকী নেতার আয়োজনে বায়তুল মোকাররমে যে 'লাল বদর' সমাবেশ হয়েছে তাতে শেষ মুহূর্তে প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সেক্রেটারী হাজির হয়ে বলেছেন, "মুজিব ভাই যে কথা বলতে পারেননি, আমাকেই সে কথা বলতে হচ্ছে। উগ্রপন্থীদের কবরের ওপরই মুজিববাদ প্রতিষ্ঠা করা হবে।"

প্রধানমন্ত্রীর এই দুরমুজের পয়গামই সম্মেলনের শেষ দিনে কাজ করলো। এই দিন রেসকোর্সে হেঁ-হেঁবাদীদের প্যান্ডেলে বুড়ো বুড়ো অতি চেনা মুখগুলোর সমাবেশ হলো– তারা মিছিলযোগে পল্টনের লাথিবাদীর সম্মেলনের কাছে গিয়ে ইটপাটকেল ছুঁড়ে ভ্রাতা-বন্ধু-পিতার নির্দেশ ম্যানাভিয়ানের শুরু করলো। ছাত্রদের হলেও মিছিলে প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব আর স্বেচ্ছাচার বাহিনীর নেতা রাজ্জাক সাহেবকে পাওয়া গেল। ঝগড়া বাঁধালেও লাথিবাদীদের দাপটে টিকতে না পেরে রাজনৈতিক সচিব জান নিয়ে পালালেন, রাজ্জাক সাহেবের নাকের গোড়ায় খান কয় ঘুষি পড়লো– আ স ম রব তাকে উদ্ধার করে স্টেডিয়ামের একটি ঘরে আশ্রয় করে দিলেন।

বিকেলে আবার আওয়ামী স্বেচ্ছাচার বাহিনী বায়তুল মোকাররমে সভা ডাকলো। পলাতক তোফায়েল সভায় জানবাজী রেখে লাথিবাদীদের প্রতি চ্যালেঞ্জ দিলেন। মুজিববাদ বিরোধী ছাত্রলীগের আগে থেকেই শহীদ মিনারে শপথ গ্রহণের কর্মসূচী থাকলেও স্বেচ্ছাচারীরা গিয়ে দখল করেছিল শহীদ মিনার। মুজিববাদ বিরোধীদের হাজার হাজার ছাত্রের মিছিল গোলমাল এড়ানোর উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট সময়েরও দেড়ঘন্টা পর ভিন্ন পথে শহীদ মিনারের উদ্দেশ্যে যেতে থাকলে হঠাৎ করে সশস্ত্র মুজিববাদী গুণ্ডারা নিরীহ ছাত্রদের ওপর ত্রিমুখী হামলা চালিয়ে এমনকি ছাত্রীদেরকেও আহত করেছে। ছাত্র নেতা আ স ম আব্দুর রব এবং মমতাজ বেগম সহ শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন, আহত ছাত্রনেতা মালেক পরে শহীদ হয়েছেন। পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থল থেকে নিরাপদ দূরত্বে সাক্ষী গোপালের মত অবস্থান করেছে।

মারপিট লাগিয়ে দিয়ে মজা দেখে শেষে ভ্রাতা-বন্ধু-পিতা সহানুভূতি আকর্ষণের দুরাশায় চিকিৎসার উদ্দেশ্যে লন্ডন যাত্রা করেছেন। এদিকে ২৪শে জুলাই মিছিল শেষে লাথিবাদীদের ছাত্র সমাবেশে বলা হয়েছে, "আপনি সত্যিকার অসুস্থ হয়ে থাকলে দোয়া করি, নিরাময় হউন। কিন্তু লন্ডন যাবার এই ফাঁকে যদি কোন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন, তাহলে এদেশের প্রতিটি ধূলিকণা গ্রেনেড নামক বোমায় পরিণত হবে।"

কথা না মানলেই গুণ্ডা লেলিয়ে দেয়ার যে ঐতিহ্য শেখ মুজিব এবার সৃষ্টি করে গেলেন, নিজের এই সৃষ্টির আঘাতেই কোনদিন তাকে আহত হতে হবে কিনা, তা ভবিষ্যতই বলে দিতে পারবে।

এবার ধরপাকড় শুরু হবে

প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমানের চিকিৎসার্থে লন্ডনে ১২ দিন অবস্থানকালে দেশের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক দমননীতি শুরু হবার আশঙ্কা রয়েছে।

বিশ্বস্ত সূত্রে প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ ঃ দেশব্যাপী বিরোধী দলের উপর সরকারী হামলা পরিচালনার জন্য শেখ মুজিবের অনুপস্থিতির

সময়টিকেই বাছাই করা হয়েছে। কারণ, পানি যে দিকেই গড়াক, পরিণতি যে দিকে যাক, শেখ মুজিব ফিরে এসে 'আমি কিছু জানতাম না' বলে হাল ধরে নেবেন। বিপন্ন নৌকায় তিনি মাঝি দূরে থাক যাত্রীও হতে নারাজ। তাই ঢাকায় রাজনৈতিক দাঙ্গার প্রতিক্রিয়া সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ার মুহূর্তে তিনি সরে পড়েছেন। দেশের অবস্থা বেগতিক বলে তাঁর ১২ দিনের সফরের মেয়াদ আরও বাড়িয়ে নেয়া হবে।

রাজনৈতিক ধরপাকড়, গুপ্ত হত্যা, প্রকাশ্য হামলা, কিডন্যাপিং-এর সুবিস্তারিত পরিকল্পনা নিয়ে ফ্যাসীবাদী শক্তি এই সুযোগে ঝাঁপিয়ে পড়বে বিরোধী দলের উপর।

মস্কোওয়ালাদের প্রিয় তাজুদ্দিনকে অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী না করায় দুটো জিনিস ধারণা করা হচ্ছে ঃ (১) তাজুদ্দিন বিপ্লবী বোলচালের গভীরে চরম সুবিধাবাদী হয়ে উঠায় স্বয়ং প্রভুও তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। (২) মস্কো 'মিয়াদের' উপর একদফা চোটপাট না গেলেও তাদেরকে অন্ততঃ ডেকচির প্রহরায় বসানো যায় না– "ব্রেন ওয়াশের" পরও 'আশা ভরসার প্রতীক' ব্যক্তিটি এটাই মনে করছেন।

এবারের হামলা দেশের সত্যিকার বামপন্থী অংশ এবং সদ্য ঘরত্যাগী লাথিবাদীদের উপর পরিচালিত হবে বলে জানা গেছে।

শেখ মুজিবের অনুপস্থিতিতে বাংলাদেশে ভারতের বহু সংখ্যক সৈন্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে অবস্থান করবে। এদেরকে রক্ষীবাহিনী, বিডিআর বলে চালিয়ে দেয়া হবে।

সাংবাদিককুল এখন মুজীবী দাবার ঘুটি

"দাবা খেলে গেলাম ঘুটি যেন ঠিক ঠিক চলে" সাংবাদিকদের প্রেসক্লাবের তাস জুয়ার ঘরে ঢুকে প্রধানমন্ত্রী খেলোয়াড় সাংবাদিকদের প্রতি যে ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন বিলক্ষণ সেটার অনুসরণ ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। আইয়ুবের ঘুটিগুলি নতুন প্রভুর চালে এখন নবোদ্যমে 'জি হুজুর' বলে কলম চেপে ধরেছে। পত্রিকার কলামগুলি ভরে উঠছে তোষামোদের ভাষায়।

১৬ই জুলাই ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সম্মেলন উপলক্ষে বঙ্গ-পিতা তসরিফ ফরমাইয়াছেন ভেরী ইম্পর্টেন্ট পি (ভি আই পি) সাংবাদিকদের একান্ত অঙ্গন প্রেসক্লাবের মঞ্চপে। পরিচিত সাংবাদিকদের জন্য তিনি এনেছিলেন কিছু পেপার কাটিং ও একখানা যাদুমন্ত্রের ফাইল।

সম্মেলন উদ্বোধন করে বক্তৃতা দিয়েছেন তিনি, দরাজ কণ্ঠে, 'স্বরাজ পাবার' চেতনা নিয়ে সাংবাদিকতার নীতিমালা মেনে চলবার সদুপদেশ তিনি দিয়েছেন– ব্যবস্থা করবেন বলে জানিয়েছেন। আইয়ুব যেমনি সম্পাদকমণ্ডলীর পোঁ-ধরা সদস্যদের দিয়ে ভদ্রলোকের চুক্তি জেন্টলম্যানস এগ্রিমেন্ট করে পাকিস্তানের সাংবাদিকতাকে বেহায়ার পর্যায়ে তুলে নিয়েছিলেন, বঙ্গ পিতার দরাজী নির্দেশ তার চাইতে কম ঘৃণ্য নয়।

সংবাদপত্র দলন ও সাংবাদিক গ্রেফতারের ঘটনাগুলি সম্পর্কে চীফ ফুয়েরার-এর কাছ থেকে কিছু শুনবার জন্য শ্রোতাসাধারণ উৎকর্ণ ছিল, তাদের আশা পূরণ করে তিনি বলেছেন, সাংবাদিকতার নামে যা খুশী তা করা তিনি বরদাশত করবেন না। যা খুশী তার প্রমাণ স্বরূপ তিনি 'হক-কথার' বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত সংবাদগুলির ধারে কাছে না ঘেঁষে শুধু হেডিং-এর কাটিং পড়ে শুনিয়েছেন ঃ এক লক্ষ বামপন্থী হত্যা করা হবে, রুশ-ভারত চক্রান্ত ইত্যাদি। তাঁর মতে এবং বুদ্ধিতে এগুলি হলো যা খুশী তা লেখার নমুনা। বামপন্থী হত্যার প্রকাশ্য নির্দেশ দিয়ে যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে গুলী করে নকশাল মারার

ফ্যাসিস্ট নির্দেশ দিয়েছেন, যার কৃপায় দেশ আজ ভারত-রুশ অক্ষের পদতলে সমর্পিত- তিনি আসল কথাগুলি শুনেই জ্বলেপুড়ে উঠবেন এটা অনিবার্য। মজার কথা হলো, বক্তৃতা দিতে দিতে তিনি তাঁকে মাঝে মধ্যে ভৃত্যের মত পাখা করার কাজে ব্যস্ত সবচাইতে বিগ সাংবাদিকটির দিকে তাকিয়ে কয়েকবার জিজ্ঞেস করেছেন, কি হে ঠিক তো! হেঁ হেঁ মার্কা এ্যাম্বেসেডর হতে ইচ্ছুক সাবেক ও হবু সর্বাধিপতি হয়ে তা যা বলেছেন বলে দিয়েছেন সায়।

'হক-কথা' সম্পাদক ইরফানুল বারীর ব্যাপারে শাসনতান্ত্রিক বলে কথিত সরকারের প্রধান যে সব মন্তব্য করেছেন, গণতন্ত্রের 'গ' ও বিচার বিভাগের অস্তিত্ব যে দেশে আছে, সে দেশের দায়িত্বশীল কোন ব্যক্তি এরূপ উক্তি করতে পারে না। ইরফানুল বারীর বিরুদ্ধে মামলা খাড়া হবার আগেই সরকার প্রধান রায় ঘোষণা করেছেন– একনায়কত্ববাদী আইয়ুব ফ্রাঙ্কোকেও বঙ্গ-পিতা এক্ষেত্রে হারিয়ে দিয়েছেন। এমন একজন প্রচণ্ড শক্তিমান বেপরোয়া ফ্যাসিস্টমনার হাতে পড়ে গণতন্ত্র ও বিচার ব্যবস্থার কি গতি হবে ভবিতব্যই তা জানে।

হাতের যাদুমন্ত্রের ফাঁকা ফাইল নাচিয়ে তিনি সাংবাদিকদের হৃদপিণ্ড দুলিয়ে দিয়ে বলেছেন, সব আছে আমার কাছে। চিচিং ফাঁক করে দেবো। কাঁচা মাংস ও মুরগী সাপ্লাই দিয়ে পাক-সেনাদের যারা খেদমত করেছে তাদের তোমরাই বের করে দাও, নইলে শক্ত হাতে ধরবো। জন পঁচিশেক শিরোমনির শ্বেতবস্ত্র খাকী হবার উপক্রম হয়েছিল এ হুমকিতে। কিন্তু গোমর ফাঁক হয়ে গেল পরে 'ও ফাইলে ছুঁচোর কেত্তন'– অর্থাৎ একদম ফাঁকা। পি সি সরকার স্টাইলে আসর মাৎ করে তিনি মঞ্চ ত্যাগ করলেন। জুয়াখেলার ঘরে গিয়ে দাবার ঘুটি চাললেন। ঘুটি চেলে গেলাম যেন ঠিক ঠিক চলে। পরদিন কাগজগুলিতে ধন্যি ধন্যি পড়ে গেল। 'নমস্যি তোমায় দেবতা গোছের' এডিটরিয়াল লিখলেন কোন কোন ঘুটি মুনিষ্যি। আইয়ুবের সাজানো ঘুটিগুলি বেহাত হয়ে গেল। সাংবাদিকতার ইথিকস নামীয় ইথারীয় বস্তুর বেদীমূলে এদেশে সাংবাদিকতার নামগন্ধ দৈনিক কাগজগুলো থেকে মুছে গেল রাতারাতি। মুজিব দর্শনের ইথিকস রাতারাতি কাগজগুলোকে দুর্গন্ধময় করে তুললো। চললো ঘুটি ঠিক্ ঠিক্।

'হক-কথা' সম্পাদককে গ্রেফতারের মূল কারণ ফুয়েরারের হস্তস্থিত পেপার কাটিং-এর মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয়েছে। এদেশে সরকারের তাঁবেদারী এবং সরকারের প্রভু রুশ-ভারতের তাঁবেদারী না করলে কোন কলম চলতে পারে না। আর সাংবাদিকতার নীতিমালার মূল কথা হলো, ক্ষমতাসীন সরকার দেশকে বিদেশী শক্তির নয়া-উপনিবেশ ও আশ্রিত রাজ্যে পরিণত করলেও সে সম্পর্কে কোন উচ্চবাচ্য করা যাবে না। কিন্তু শেষ প্রশ্নটি দাঁড়ায় ঃ বিদেশের অনুগত তাঁবেদার সরকার আর সরকারের প্রধানগণ নিজেদেরকে মহাবিপ্লবী বলে ব্যক্ত করেন কোন সাহসে? সেটা কি সরকারী প্রচার ও অত্যাচারের যন্ত্র হাতে পাবার ভরসায়? কিন্তু জনতার রুদ্ররোষে এমনি বহু তখতে তাউস ধূলায় মিশে গেছে। শাদ্দাদরা পেয়েছে অনিবার্য পরিণতি।

রাশিয়ার সাথে চট্টগ্রাম বন্দর নিয়ে দ্বিতীয়বার কাবিননামা হলো

মার্কিন প্রেসিডেন্টের বিশেষ দূত কোনালী বাংলাদেশে ডলারের বস্তা ফেলে যাবার পর পরই তার ফল যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে ঝট করে এসে পড়েছিল একটি রুশ প্রতিনিধি দল। পাতে তোলা কই মাছটি প্রাণ পেয়ে লাফিয়ে নেমে গেছে কিনা– তা দেখাই ছিল এই প্রতিনিধিদলটির উদ্দেশ্য। কেননা, বিগত

এপ্রিলেই তড়িঘড়ি করে চট্টগ্রাম বন্দরকে রুশ নৌবাহিনীর আস্তানায় পরিণত করার কাজ গুছিয়ে নেয়া হয়েছে। আমেরিকা জাহাজ উদ্ধার আর মাইন অপসারণের কাজটি পাবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহী থাকা সত্ত্বেও 'আনরড' সংস্থার নাকের ওপর দিয়ে এসে ছোঁ মেরে কাজটি বাগিয়ে নিয়েছে রাশিয়া। বন্দর পরিষ্কারের কাজ সম্পন্ন করার চুক্তি স্বাক্ষরের আগে রাশিয়া বন্দরটি পরিদর্শনের প্রয়োজন পর্যন্ত বোধ করেনি, তাড়া ছিল এতই বেশী। আমেরিকার চোখের সামনে বাংলাদেশ সরকার মায় প্রধানমন্ত্রীর হাত দুটো মুচড়িয়ে সেদিন মস্কো 'কবুল' আদায় করে নিয়েছে।

তাই কোনালীর সাকসেসফুল মিশনের ফলে রাশিয়া ঘাবড়ে গেছে। বন্দর পরিষ্কারের মিথ্যে অজুহাতে এত কষ্টে বাগানো চট্টগ্রাম বন্দরটি বাংলাদেশ সরকার আবার আমেরিকার হাতে তুলে দেয়নি তো? কিন্তু না, অতটুকু করার জন্যও যে শিরদাঁড়া থাকা দরকার মুজিব সরকারের তাও নেই।

তাই রাশিয়ানরা কাবিননামা ফ্রেশ করে লিখিয়েছে। হালটা কি দেখে চট্টগ্রাম থেকে ফিরে ১১ই জুলাই বাংলাদেশ সচিবালয়ে চট্টগ্রাম বন্দর নিয়ে নতুন কাবিন হয়েছে। এটাকে বলা হয়েছে প্রোটকল চুক্তি। গত চুক্তিতে টাইমটা দিতে ভুল হয়েছিল। এবার সে ফাঁক পূরণ করে শক্ত আটুনি দেয়া হয়েছে ঃ সোভিয়েত টিম যথাশীঘ্র চট্টগ্রাম বন্দর পরিষ্কার করে দেবে; আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে অবশ্যই। জনমতকে ধোঁকা দেবার জন্য কাজের অগ্রগতি ও অভিজ্ঞ কার্যক্রমের পর্যালোচনায় বলা হয়েছে যে, এখনও প্রচুর কাজ বাকি। অর্থাৎ ডিসেম্বরে গিয়ে আবার দরকার হলে 'ঝাটাই কামের' জন্য সময় নেয়া যাবে। অবশ্য এর পরেও দরকার হলে বন্দর উন্নয়ন, বন্দর চুনকাম, পানি শোধন কত নামেই তো বছরের পর বছর চুক্তির মেয়াদ বাড়ানো যাবে। একই মোহনায় দ্বিতীয় কাবিন স্বাক্ষর করেও মস্কো টিম আশ্বস্ত হয়নি। তাদের মনে আবার সংশয়, চাটগাঁ তাহলে হাত ছাড়া হয়নি। তবে কি চালনা বন্দর দিয়ে দেয়া হয়েছে আমেরিকাকে? তারা চালনা বন্দর ঘুরলেন। তেমন প্রকাশ্য আলামত কিছু নেই। তবু যেন কেমন একটা রহস্যঘেরা ভাব। আসলে ভারত নিজের নৌবাহিনীর নবলব্ধ সাবাবত্ব টেস্ট করার জন্য একটা বিদেশী বন্দরে মাতব্বরী করার খায়েশ পোষণ করছে– সে জন্য বাই দা বাই বলেও দেখেছে বাংলাদেশ সরকারকে। এদিকে ভারত মহাসাগর পেরিয়ে মাঝে মধ্যে বঙ্গোপসাগরে নাক গলানোর জন্য অজুহাত হিসাবে আমেরিকা চালনা বন্দর হাতে নিতে চাইছে। ভারতীয় নৌবাহিনীর উপস্থিতি অবশ্য এখন আর তেমন দ্বন্দ্বের কারণ নয়, কেননা মস্কোর সাথে বন্ধন শিথিল করার জন্য ইন্দিরার ইন্ডিয়া-আমেরিকার দিকে একহাত বাড়িয়ে আছে। এমতাবস্থায় রাশিয়ানরা চালনা বন্দরটিকে হাত করার অভিলাষ না জানিয়ে পারেনি। বাংলাদেশ সরকার চালনা বন্দরে অন্যকে আস্তানা দেবার আনঅফিসিয়াল ওয়াদা দিয়ে ফেলেছে। তাই বাংলাদেশ সরকার ঝট করে উত্তর দিয়েছে ওখানে কোন ঝামেলা নেই, নির্বিঘ্নে কাজ চলছে। ওদিকে তাকাতে হবে না। রাশিয়ানরাও কম ঝানু নয়। তারা বন্দর পরিদর্শনে গিয়ে এবার পানিতে ভেসে খুঁজেছে। দেখা গেল তিনটি জাহাজ ডুবে আছে এখনও। নব সাবালক ভারত ওটা তুলতে পারেনি, অধিকন্তু 'জাতিসংঘ' লেবেল এটে আমেরিকার রণপোত ওখানে আনার অছিলা হিসাবে জাহাজ তিনখানা রাখা দরকার।

ঝানু রাশিয়ানরা বলেছে, এই তো জাহাজ তিনখান ডুবে আছে। দাও যদি তুলে ফেলতে পারি। অবশ্য সেটা তোমার ইচ্ছে।

বাংলাদেশ সরকারের 'ঝঞ্ঝাটমুক্ত' চালনার রাশিয়নরা 'ঝঞ্ঝাট' আবিষ্কার করে বধূয়াকে

লজ্জায় ফেলে দিয়েছে। কিন্তু এ লজ্জা সত্ত্বেও বধূয়ার করার কিছু নেই। ওটার জন্য সময় হলে আনপুরুষ – আনরড ঠিকই আসবে।

চট্টগ্রামে রুশ নৌঘাটি, চালনায় মার্কিন নৌ-আস্তানা, মধ্যিখানে চলমান শাটেল ভারতীয় নৌবহর– এ তিনে মিলে বাংলাদেশের উপকূলীয় সমুদ্রভাগ পরিবেষ্টিত হবে। আমার ডানে বামে ভারত, পদপ্রান্তে তিন শক্তির বিষাক্ত নিঃশ্বাসে বাংলাদেশের অস্তিত্ব ও পদ-মর্যাদা বাড়ছে না কমছে, আমাদের নিরাপত্তা জোরদার হচ্ছে না বিপন্ন হচ্ছে সরকার তা বলে না। এসব শক্তি বাংলাদেশকে শকুনীর মত টানা-হেঁচড়া করলে ছিন্নভিন্ন হতে হবে। অথচ একথা বললে রগচটা ক্ষমতাসীনদের মাথায় রক্ত চেপে যায়। ধাপ্পা দিয়ে নির্লজ্জের মত বলা হয় ঃ রুশ-ভারতীয় চক্রান্ত নাকি নেই।

টাঙ্গাইলের গ্রামাঞ্চলে পুলিশী নির্যাতন

টাঙ্গাইলের গ্রামাঞ্চলে স্থাপিত ক্যাম্পের পুলিশদের অত্যাচারে সেখানকার জনসাধারণ অতিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সম্প্রতি রাত্রিকালে পুলিশ রক্ষিত বেলতা গ্রামের মোঃ গোমর সেখের বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া গৃহস্বামী এবং তাহার পুত্রকে ধরিয়া অন্য এক বাড়ীতে রাখে এবং গৃহস্বামীর পুত্রবধুকে ধরার চেষ্টা করিলে সে দৌড়াইয়া ঘরের বাহিরে আসে। সঙ্গে সঙ্গে বাইরের সেপাইগণ তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া অত্যাচার করে।

৪ঠা শ্রাবণ খরজানা গ্রামের বাসিন্দা জনৈক মুইচার ছেলে তাহার নিজস্ব একটি খাসী বিক্রয়ের জন্য করটিয়ার হাটে যাওয়ার পথে পোড়াবাড়ী বাজার হইতে পুলিশ তাহাকে গ্রেফতার করে। ধৃত ব্যক্তি খাসীর মালিক এই সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়ার পরও তাহাকে বেদম প্রহার করা হয়। কয়েকজন গরুর বেপারীকে তাহাদের সঙ্গে গরু ক্রয়ের রশিদ থাকা সত্ত্বেও একইভাবে মারপিট করা হইয়াছে। পরে তাহাদের নিকট হইতে কিছু টাকা রাখিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

করটিয়া কলেজের একটি ছাত্র বড় বেলচা গ্রামে আত্মীয় বাড়ীতে যাওয়ার সময় কয়েকজন সেপাই ও তাহাদের হাবিলদার ঐ ছাত্রটির নিকট হইতে একটি হাতঘড়ি কাড়িয়া রাখে। বহু চেষ্টা তদবির এবং অনুরোধ করার দুই দিন পর ঘড়িটি ফেরত পাওয়া যায়।

পোড়াবাড়ী (ইন্দু বেলতা) গ্রামের কয়েকজন ঘোড়ার গাড়োয়ানের গাড়ীতে চড়িয়া টাঙ্গাইল আসার পর ভাড়া চাইলে সেপাইগণ বলে যে আমরা সরকারী লোক। আমরা ভাড়া দেব কেন? গাড়োয়ানরা এরপরও ভাড়া দাবী করিলে তাহাদেরকে অশ্লীল গালাগালি করা হয়। কয়েকদিন পূর্বে জনৈক প্রাক্তন মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারের শ্বশুরবাড়ীতে অনুসন্ধান চালাইতে গিয়াও পুলিশ একটি সাত বছরের বালকের মাথায় রাইফেলের বাড়ি মারিয়া তাহাকে আহত করিয়াছে। পুলিশদের এই ধরনের কার্যকলাপ এবং মনোভাবে স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে তীব্র বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছে।

৪ হাজার টাকা হিমাগারে

টাঙ্গাইলের নাগরপুর থানাধীন ৪নং লাউহাটি ইউনিয়নের রিলিফ চেয়ারম্যান ৩০শে মে থানার সার্কেল অফিসারের কাছ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের মধ্যে বণ্টনের জন্য ৪০০০ টাকা তুলে এনেছেন। দু'মাস অতিবাহিত হচ্ছে, এ টাকা বণ্টনের নামগন্ধ নেই। করিমখালি খালে একটি ছোট বাধ নির্মাণের জন্য তুলে আনা হয়েছে ৫০০ টাকা, কিন্তু তাতে ১৫০ টাকার বেশী একটি পয়সাও খরচ হয়নি।

টাঙ্গাইল থানা ন্যাপ সম্মেলন

গত ১৬ই জুলাই শিবনাথ স্কুলে বাবু কুলদা প্রসাদ চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে টাঙ্গাইল থানা ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। কাউন্সিলে বাবু কুলদা প্রসাদ চক্রবর্তীকে সভাপতি এবং জনাব শামছুল হককে সাধারণ সম্পাদক করে থানা ন্যাপের কার্যকরী পরিষদ গঠন করা হয়েছে।

সভায় ন্যাপের আহ্বায়কের নাম দিয়ে সৈয়দ আবদুল মতিন কর্তৃক প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপনের নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় এবং দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য সৈয়দ আবদুল মতিনকে ন্যাপের সাধারণ সদস্যপদ বাতিলের জন্য মওলানা ভাসানীর নিকট জোর দাবী জানানো হয়।

২৬শে জুলাই ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির কার্যালয়ে টাঙ্গাইল ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি জেলা সাংগঠনিক কমিটির একটি বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়। জনাব আবদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় থানা ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির কাউন্সিল অধিবেশনের ৭নং প্রস্তাবে দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য সৈয়দ আব্দুল মতিনের সাধারণ সদস্যপদ বাতিলের দাবীর প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে ন্যাপ প্রধান মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর প্রতি উক্ত প্রস্তাব কার্যকরী করার জন্য অনুরোধ জানানো হয় এবং 'হক-কথা' সম্পাদকের মুক্তির দাবীসহ কতিপয় প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

মনিদা'র নয়নমণি

জুলাই মাসের দু'তারিখে ঢাকার পল্টন ময়দানে মনিসিং-এর 'কমিউনিস্ট' দলের জনসভা হয়েছে। শ্রোতারা সেদিন মনিদা'র নয়নমণি হাতের লাঠি অন্ধের যষ্টিকে দেখেছে। অমৃত বচন তার শুনেছে।

আন্ডারগ্রাউন্ডে 'দীর্ঘকাল' কাটিয়ে পাতাল মন্থন করে যারা ভারতের ওদিকে থেকে স্বর্গ নিয়ে ভেসে উঠেছে, মনিসিং জনসভায় শ্রোতাদের সামনে তাদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলেন।

'কমিউনিস্ট' ফরহাদ বক্তৃতা দিতে দাঁড়াবার আগে মনিসিং দাঁড়িয়ে ভূমিকা দিলেন ঃ 'কমিউনিস্ট' পার্টির সদস্য হওয়া কত কষ্টের কাজ আপনারা তা জানেন না, যিনি এখন বক্তৃতা দেবেন, তিনি শুধু পার্টির সভ্য নয় কেন্দ্রীয় কমিটিরও সদস্য অর্থাৎ পলিটব্যুরোর তরুণতম সদস্য আশা ভরসা কমরেড ফরহাদ।

মনিদা'র গর্বের বস্তুটি বক্তৃতায় দাঁড়িয়ে বললেন, লোকে বিভিন্ন কথা বলে আমাদের বিরুদ্ধে। আমরা নাকি মুজিব ও আওয়ামী লীগের দালালী করি। (একটু থেমে) হ্যাঁ আমরা তো করি, মুজিব ও আওয়ামী লীগের দালালীই আমরা করি। কারণ, মুজিব ও আওয়ামী লীগ সমাজতন্ত্র চায়। আমরা সমাজতন্ত্রের দালালী করছি।

মনিসিং-এর 'কমিউনিস্ট' দলের এত গৌরবের ধন ও এত গুণগানের ব্যক্তিটি মনি'দা'র নয়নমণি যে কথা বলেছেন, তাতে বিস্ময়াবিষ্ট হয়েছে সবাই। প্রতিটি শব্দ যারা মেপে 'কয়' তারা বেফাঁসে তো একথা বলেনি।

মনিসিং-এর কমিউনিস্ট দল তাহলে আওয়ামী লীগকে খাঁটি সমাজতন্ত্রী দল বলে মনে করে-যার লেজুড়বৃত্তি করা একটা কমিউনিস্ট দলের পক্ষেও অসঙ্গত নয়।

এক কুমীরের ছাও সাতবার দেখিয়ে বৈজ্ঞানিক রাজনীতি করতে অভ্যস্ত রাজনৈতিক এতিমরা মেরুদণ্ডের অভাবে পুঁজিবাদের ধারক ও বাহকদেরকেও অবলীলাক্রমে সমাজতন্ত্রী বলে চালিয়ে দেয়। মনিসিং-এর ডুবু ডুবু রাজনীতির মাহাত্ম্য আছে বৈ কি!

তার ধুমপানে মাসে ১৬০০ টাকা লাগে

অগ্রণী ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও জনৈক ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার ১৯৭২ সালের এপ্রিল মাসে যথাক্রমে ১০০০ টাকা ও ১৬০০ টাকার ধুমপান করেছেন। ৮ই জুন তারিখে ম্যানেজিং ডিরেক্টর তাঁর স্ত্রীর অসুখ বাবদ মেডিক্যাল বিল নিয়েছেন ৫ হাজার ৩ শত ৭৫ টাকা। জাতীয়করণের আওতাভুক্ত এ ব্যাংকটি লুটেপুটে শেষ করে নিচ্ছে ক'জন আমলা। বিবিধ খাতে ব্যয় দেখিয়ে ইচ্ছামত পকেট ও ব্যক্তিগত খরচ আদায় করা হচ্ছে। ১৩-৪-৭২ তারিখে এমনি একটি বিবিধ খাতের ব্যয় দেখানো হয়েছে ১৫২ টাকা। এ টাকায় গ্লুকোজ ডি ও ভিটামিনের মত অ-জরুরী ব্যক্তিগত দ্রব্যাদি কেনা হয়েছে। একই দিন ৩ টাকার একখানা ক্যাশমেমো মূলে ২৩ টাকা ২৫ পয়সা আদায় হয়েছে। ২৯-৫-৭২, ১৩-৫-৭২, ৬-৪-৭২, ১১-৪-৭২, ১৭-৪-৭২, ৮-৪-৭২ প্রভৃতি তারিখে এমনি অজস্র অর্থ তোলা হয়েছে।

চট্টগ্রাম বন্দরে স্টিভাডোর নিযুক্তি কাহিনী

কোন টেন্ডার ছাড়াই ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বন্দরের মাল খালাসের স্টিভাডোর হিসাবে মেসার্স কন্টিনেন্টাল ট্রেডার্স নিযুক্তি পেয়েছে। এই কোম্পানীর কেসটির সুপারিশ করেছেন চট্টগ্রামস্থ ট্রেডিং কর্পোরেশনের সিনিয়র একজিকিউটিভ জনাব এ রহীম। কন্টিনেন্টাল ট্রেডার্স কুখ্যাত দালাল হামিদুল হক চৌধুরীর ভাইপোর ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। শোনা যায়, ট্রেডিং কর্পোরেশনের উক্ত একজিকিউটিভ সুপ্ত অংশীদার হিসাবে কন্টিনেন্টাল ট্রেডার্সের মুনাফার ভাগ পান।

কোন টেন্ডার ছাড়াই মেসার্স অগ্রণী শিপিং কর্পোরেশন মালিক এন এ খান ট্রেডিং কর্পোরেশনের শিপিং এজেন্ট হিসাবে কাজ করছেন। ইনিও হামিদুল হক চৌধুরীর আত্মীয়।

টিসিবি-র মাধ্যমে আমদানী করা খোলা মাল বন্দরে উঠানোর পরে উক্ত একজিকিউটিভ মর্জিমাফিক, এ শেড থেকে ও শেডে, এখান থেকে সেখানে সরকারী আদেশ দেন। এর ফলে মালের প্রাপকদের অযথা বিপুল টাকা খরচ হয়ে যায়। স্বাভাবিকভাবেই আমদানীকারক এ বাড়তি খরচ তুলবার জন্য মালের পড়তার খবরটি যোগ করে দেন। ফলে জনসাধারণকেই শেষ পর্যন্ত উক্ত অফিসারের খামখেয়ালীর বোঝা বইতে হয়। এসব মাল স্থানান্তর কার্য পরিচালনা করে স্টিভাডোর ও সি এন্ড এফ এজেন্ট। তাদের আয় বৃদ্ধির সাথে অফিসারটির স্বার্থ যুক্ত রয়েছে বলে শোনা যায়।

কয়েক লক্ষ টাকার মার্কারী সিলিন্ডার অপহৃত হয়েছে চট্টগ্রাম বন্দর অরক্ষিত কেন ?

সম্প্রতি চট্টগ্রাম বন্দরে নিউমুরিং-এর ১৪ নং শেড থেকে কয়েক লক্ষ টাকা মূল্যের আমদানীকৃত বেশ কিছুসংখ্যক মার্কারী সিলিন্ডার বলপূর্বক অপহৃত হয়েছে। সামরিক পোশাক পরিহিত অফিসার গোছের কয়েক ব্যক্তি একটি মিলিটারী জীপযোগে এসে নিউমুরিং জেটিতে প্রবেশ করে এবং প্রহরারত প্রহরীকে বেঁধে ফেলে। এর পরে দুর্বৃত্তরা আর কোনদিকে না এগিয়ে সরাসরি মার্কারী সিলিন্ডারগুলির দিকে এগিয়ে যায়। ঝটপট সেগুলো তুলে নিয়ে কেটে পড়ে।

এখন প্রশ্ন হলো যথাযথ অনুমতি ব্যতিরেকে প্রবেশ নিষিদ্ধ এমন একটি এলাকায় বন্দর সিকিউরিটি ও গেটে সশস্ত্র পুলিশ প্রহরা থাকতে এরা কি করে ভিতরে প্রবেশ করলো? তারা ঐসব মার্কারী সিলিন্ডার চট করে খুঁজে পেল কিভাবে এবং বহু প্রহরীকে ধরাশায়ী করলোই বা কেমনে?

শেডটিতে অনেক প্রহরী ছিল। সেখানে সচল টেলিফোনও ছিল। গেট থেকেও স্থানটি দূরে নয়। এতগুলি প্রহরীকে নিঃশব্দে কাবু করা সম্ভব হলো কি করে?

চট্টগ্রাম বন্দরের জেটি ও মুরিংগুলি কাস্টম কর্মচারীহীনভাবে সাধারণ প্রহরীদের প্রহরায় থাকে। বেশ কয়েকটি গেট প্রহরী ছাড়াই এমনিতে বন্ধ করা। বন্দর সিকিউরিটির সাথে সামঞ্জস্য রেখে কাস্টমস কর্মচারীর ডিউটি নির্ধারিত না হওয়ায় চোরাচালানকারীরা অবাধে বন্দরের মধ্য দিয়ে চোরাকারবার চালিয়ে যেতে সক্ষম হচ্ছে।

এ বৎসরের বাজেটে প্রধান আয়ের উৎস হচ্ছে শুল্ক। কাস্টম বিভাগ দেশের প্রধান বন্দরকে অরক্ষিত রেখে এই উৎসকে বিনষ্ট করে ফেলছে।

কয়েক লক্ষ টাকার মার্কারী সিলিন্ডার অপহরণের মত আরও ঘটনা যে ঘটছে এ বন্দরে তার হিসাব কে রাখে?

গ্রামের লোকেরা রাবিশ জংলী

জনস্বাস্থ্যের দায়িত্ব গ্রহণ নিয়ে মন্ত্রী-সচিবরা যখন গালভরা বুলি আওড়াচ্ছেন, তখন ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের রেডিওলজীর এসোসিয়েট প্রফেসর নজরুল ইসলাম 'গ্রামের জংলী রাবিশ' লোকদের আশ্বাসশত করতে পারছেন না। গ্রামের গরীব লোকজন এক্সরে করানোর জন্য হাসপাতালে এলে তিনি যাচ্ছেতাই গালি-গালাজ করে বেশ কয়েকবার এক্সরে সেকশন থেকে বের করে দিয়েছেন। পয়সা দিয়ে যারা এক্সরে করাতে আসে তাদের প্রতি তিনি সদয়। গরীবরা বিনা পয়সায় এক্সরে করানোর অনুমতিপত্র সংগ্রহ করে হাজির হলেও তিনি তাদের সাথে পশুর মত ব্যবহার করেন। এই মহামানিবের বিরুদ্ধে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে কয়েকবার অভিযোগ জানিয়েও কোন ফল হয়নি।

ছাত্রলীগ নেতার মামু উদ্ধার নাটক

সিলেটের জনৈক ছাত্রলীগ নেতা চৌধুরী মিয়াবাজারে জমিদারী পেয়ে গেছেন। মুজিববাহিনীর সদস্য হিসাবে যুদ্ধকালে ধরা পড়ার পর স্থানীয় দালাল তারা মিয়া তাকে কৌশলে বাঁচিয়ে দেয়। তারা মিয়ার ভাগিনা হিসাবে পরিচয়ে এতদিন সে মামাকে রক্ষা করছিল। সম্প্রতি মামাগোষ্ঠীর ত্রাতা রূপে সে বড়মামা কাঁচা মিয়ার সাথে হৃদ্যতা স্থাপন করে। দালাল মামাকে উদ্ধারের কথা বলে সাদা কাগজে বড় মামার স্বাক্ষর নিয়ে আসে। এ কাগজ অতীব সতর্কতা ও নিপুণতার সাথে 'মামার' সমস্ত সম্পত্তি '১০ হাজার টাকায়' সাফ কবলা হয়েছে মর্মে দলিল না করে বাড়ী ও দোকান দাবী করে বসে। এই সুচতুর ভাগিনার কর্মকাণ্ডে এলাকাবাসী হতভম্ব।

দালাল আমলাদের আখড়া

রাওয়ালপিণ্ডির কেন্দ্রীয় তথ্য দফতরের শাখা অফিস রিজিওন্যাল ইনফরমেশনের কর্মচারীদের সচিবালয়ে প্রবিষ্ট করানো হচ্ছে। তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয় শীঘ্র দু'ভাগে ভাগ হচ্ছে। সচিবালয় অংশে বেতন ও সুযোগ সুবিধে হবে বেশী যেখানে পিণ্ডির প্রত্যক্ষ কর্মচারীদের স্থান দেয়া হবে। সাবেক পূর্ব পাকিস্তান তথ্য দফতরের কর্মচারীরা ডাইরেক্টরেট সাইডে যাবেন কম বেতনে হাবুডুবু খেতে। এসব কিছু হচ্ছে আমলাদের ষড়যন্ত্রের ফল।

স্বাধীন বাংলা বেতারের চরমপত্রে যে দালালটির বিরুদ্ধে দু' দুবার হুঁশিয়ারী উচ্চারিত হয়েছিল, তিনি তথ্য সচিব ও তথ্য মন্ত্রীর রিকমেন্ডেশন পেয়ে প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনে ডেপুটি সেক্রেটারী হয়ে বসেছেন। আরেক দালাল সেকশন অফিসার পুত্র মুক্তিযোদ্ধার বদৌলতে উন্নীত হয়েছেন ডেপুটি সেক্রেটারীর স্তরে।

পাকিস্তান আমলে এক চানক্য সেকশন অফিসার আমলাদের অবাধ বিচরণের সুবন্দোবস্ত করার জন্য দফতরটিকে চারটি উপশাখায় ভাগ করে চার চারজন ডেপুটি ডিরেক্টরের পদ সৃষ্টি করেন। কাজের সুবিধা বা অগ্রগতি এতে কিছুই হয়নি বরং লালফিতা ও আমলতন্ত্রের দৌরাত্ম্য এতে বেড়েছে। স্বাধীনতার পরে পুনরায় তথ্য দফতর আমলা ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ায় উপযোগিতাবিহীন চারটি শাখাই কিন্তু অটুট রয়ে গেছে।

দফতরের গরীব ও নিম্ন কর্মচারী এবং টাইপিস্টরা সুযোগ সুবিধা কিছুই পাচ্ছে না। সবই যাচ্ছে আমলাদের তেলচর্চিত মুখুতে। টাইপিস্টগণ প্রমোশনের দাবী তুললে দালাল অফিসার নানা প্রকারে তা চাপা দেন। হুমকি দেন যে পশ্চিম পাকিস্তান প্রত্যাগত লোক দিয়েই সিনিয়র পোস্ট পূরণ করা হবে। অবশেষে ভূতপূর্ব সচিবের বারংবার চাপে মাত্র ৪ জন টাইপিস্ট প্রমোশন পেয়েছেন।

কিন্তু প্রশ্ন, তথ্য ও বেতার দফতরে এই ইন্টেলেকচুয়াল জঘন্য আমলাদের আখড়া ভাঙবে কবে?

হক-কথা

১২ ই শ্রাবণ শুক্রবার

স্বাধীনতা, তুমি কোথায় ?

বাংলাদেশের কষ্টার্জিত স্বাধীনতা আজ বিপন্ন। বন্ধুত্বের ছদ্মাবরণে সক্রিয় ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ, সোভিয়ত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এদেশকে তাদের হুকুমের গোলামে পরিণত করেছে। এদেশের জনগণ ৩০ লক্ষ জীবনের বিনিময়ে যে স্বাধীনতা অর্জন করেছে, সেই স্বাধীনতাকে পূর্ণাঙ্গ ও অখণ্ডভাবে ভোগ করার গণআকাঙ্ক্ষাকে অস্বীকার করে এদেশের ক্ষমতাসীনরা বিদেশের তাঁবেদারে পরিণত হয়েছে। স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের মর্যাদা রক্ষার জন্য জনগণের উৎকণ্ঠার অন্ত নেই। অথচ ক্ষমতাসীনরা তাদের বিদেশী প্রভুকে পূজা করার হট্টগোল সৃষ্টি করে জনগণের উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠাকে ধামাচাপা দিয়ে চলেছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমানকে অনুসরণ করে ক্ষমতার গদীতে আসীন অনেকে এবং মস্কোর দালালরা অহর্নিশ চিৎকার করছে যে ভারত ও রাশিয়ার মত বন্ধুর দ্বারা এদেশের তিলমাত্র ক্ষতি হবার সম্ভাবনা নেই। এদের এই যুক্তি বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পরে পরেই ভোতা হয়ে গেছে সেদিকে তারা লক্ষ্য করছে না।

রাশিয়া পাকিস্তানের কাছে পাওনা ঋণের বৃহদাংশ নবজাতক বাংলাদেশের গলায় পা দিয়ে উসুল করতে শুরু করছে, চট্টগ্রাম সামুদ্রিক এলাকাকে নিজেদের সামরিক নৌশক্তির আস্তানায় পরিণত করার উদ্দেশ্যে ঢাকার 'আনয়ডে'র সাথে পাল্লা দিয়ে 'বলশেভিক থিয়েটার' মঞ্চস্থ করছে, মস্কো থেকে প্রচারপত্র পড়ে এদেশের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে নাক গলিয়ে আন্তর্জাতিক ভদ্রতার কানুন ভঙ্গ করেছে, এদেশের রাজনীতিকে স্বতঃস্ফূর্ত ধারায় অগ্রসর হতে না দেবার সংকল্প নিয়ে কুখ্যাত গোয়েন্দা সংস্থা কেজিবিকে লেলিয়ে দিয়ে উঠতি তরুণদের মধ্য থেকে 'দ্য জ্যা' গোষ্ঠী সৃষ্টি করছে– এগুলি নিশ্চয়ই বাংলাদেশের ক্ষমতাসীনদের কাছে আহ্লাদ বলে বিবেচিত হয়ে থাকবে। ৬ মাসের মধ্যে ভারত এদেশ থেকে হাজার

কোটি টাকার সম্পদ লুট করেছে, অধীনতামূলক মিত্রতার চুক্তিতে স্বাক্ষর আদায় করে যখন খুশী বাংলাদেশের যে কোন স্থানে সৈন্য প্রেরণের সুবন্দোবস্ত করে নিয়েছে, অসম বাণিজ্য চুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশকে দীর্ঘকাল নিয়মতান্ত্রিকভাবে শোষণের পথ বের করেছে, বাংলাদেশের বিপুল সীমান্ত এলাকাকে নিজের নামে নিজের জিহ্বার ডগায় তুলে নিয়েছে, এদেশের ন্যাশনাল শিল্পকারখানাকে ধ্বংসের জন্য ঘৃণ্য বেনিয়ার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে, এদেশে বিরাজমান নিজেদের দালাল গোষ্ঠীর মাধ্যমে প্রগতিশীল রাজনৈতিক শক্তিকে সমূলে বিনাশ করার চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে, বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা শক্তিকে পঙ্গু করে দেবার জন্য সুগভীর ষড়যন্ত্র চালিয়েছে, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বাংলাদেশকে নিজের একটি আশ্রিত রাজ্যে পরিণত করছে– ভারতের এ সকল কীর্তিকে সামনে রেখেও ক্ষমতাসীন মহল জনগণকে ধোঁকা দেবার আশা পোষণ করেন, তা দুরাশা বৈ আর কি?

রাশিয়ার নজীর অনুসরণ করে আন্তর্জাতিক মহাজন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ বাংলাদেশের হাত মুচড়ে পাকিস্তানী ঋণ সুদে-আসলে এখন থেকে আদায় করে নেবার জন্য এগিয়ে এলে বর্তমান সরকার ক্ষীণ প্রতিবাদটুকু ছাড়াই পুরাতন প্রভুদের পায়ে পুরাতন ভৃত্যের মতই ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ইন্দিরা গান্ধীর স্বীয় ভারতীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার অভিলাষ সঞ্জাত মার্কিন দুই নাগরের খেল্ যখন ভারতের নির্যাতিত জনগণের জীবনকে দুঃস্বপ্নে পরিণত করেছে, বাংলাদেশ তখন ভারতীয় প্রভুর নির্দেশে সে খেমটা নাচকে অনুসরণ করতে বাধ্য হচ্ছে। এদেশের জনগণ কি চেয়েছিল, এদেশের জনগণ কি পেয়েছে হিসাব মিলিয়ে জনগণ স্পষ্ট বুঝতে পারছে, একটা তাঁবেদার সরকার আর এই পাণ্ডবদের কাণ্ডজ্ঞান বর্জিত ক্রিয়াকলাপের শুভ ফলাফল ছাড়া সাড়ে সাত কোটি মানুষের জন্য আর কিছুই আসেনি।

বিদেশী শক্তির পদপ্রান্তে আত্মসমর্পণ করে তাদের নির্দেশ অনুযায়ী দেশ পরিচালনা করতে গিয়ে এদেশের জনগণের কষ্টার্জিত সম্পদ বিদেশে পাচার, তাঁবেদারি বিপ্লবের দোহাই দিয়ে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ, নজীরবিহীন দুর্নীতির জন্মদান, বুভুক্ষা, অনাহার, মৃত্যু, চিড়িয়াখানায় পঠিতব্য আজববাদ, সাম্রাজ্যবাদের উপর নির্ভরশীলতার মত অভিশাপগুলি সম্ভাবনাময় বাংলাদেশের ভবিষ্যতকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে তুলেছে।

জনগণের জীবনের প্রান্তে অফুরন্ত দুঃখ-দুর্দশার স্থায়ী প্লাবন এসে ঠেকেছে। দেশের অভ্যন্তরে বিদেশী শক্তির কালোহাত সঞ্চালিত হচ্ছে। বিশ্বকে ভাগাভাগি করে নেবার শক্তি দ্বন্দ্বে লিপ্ত রাশিয়া ও আমেরিকার হীন কামড়াকামড়ি ও ভাগাভাগির খেল বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় জীবনকে বিষাক্ত করে তুলেছে। রাশিয়ার ব্রেজনেভ পরিকল্পনা, ইন্দিরার ভারত তাঁবেদার জোট, আমেরিকার যুদ্ধ ঘাঁটি পরিকল্পনার আওতায় বাংলাদেশকে টেনে নেবার জন্য যে টানা-হেঁচড়া চলছে সরকার সে সম্পর্কে নীরব। বিদেশী প্রভুর সেবা করে যদি স্বাধীনতা রক্ষা করা যেতো তাহলে গুয়েতেমালা, দক্ষিণ ভিয়েতনাম, চেকোশ্লোভাকিয়া, ভুটানের মত দেশগুলি স্বর্গসুখ ভোগ করতো। বন্ধুত্বের ছদ্মাবরণে দাসত্বের শৃঙ্খল গলায় পরিয়ে দেবার নজীর নিশ্চয়ই শেখ মুজিবর রহমানের অজানা নয়। কিন্তু যে জেগে ঘুমায়, তার কাল ঘুম, ভাঙাবে কে?

পাট আবার হাতছাড়া হবে

আসন্ন পাট মওসুমেই পাটের ভবিষ্যত খোলাসা হয়ে যাবে। বাংলাদেশের অভিভাবক ভারত ও রাশিয়া বাংলাদেশের সেবা করার জন্য নিজ উদ্যোগে এগিয়ে এসেছে। তারা বিশ্বের বাজার সম্পর্কে বাংলাদেশকে জ্ঞান দিয়েছে। এ জ্ঞানের মর্মার্থ হলো ঃ পাটের চাষ করা, আমরা যখন রয়েছি দর ভালো মন্দ যাইহোক বিশ্ববাজারে পাট চালিয়ে দেবো খন। কৃত্রিম আঁশের দাপটে যা অবস্থা, দর না কমালে কিন্তু কিছুই পারা যাবে না।

এ সৎপরামর্শ পেয়ে বাংলাদেশ সরকার আহ্লাদে বাগবাগ। চোখের উপর চাপিয়ে দেওয়া ঠুলিটা নেড়ে, আরচোখে বিদেশ দূরে থাক, পাশের পশ্চিমবঙ্গের দিকে তাকানোর প্রয়োজনও বাংলাদেশ সরকার অনুভব করেনি।

বিশ্বের বাজারে পাটের চাহিদা ও দর-দুটোই বেড়ে চলেছে পশ্চিমবঙ্গের পাটকল মালিক ও ব্যবসায়ীরা যখন বগলবাজাচ্ছে, বাংলাদেশ সরকার তখন সোচ্চারে প্রচার করলেন যে, বিদেশের বাজারে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হবার জন্য পাটের দর কমিয়ে দিতে হবে। শোনা যাচ্ছে, পাটের ৫ মণের গাঁট দুশো টাকা দরে বিদেশে ছাড়বার দর সরকার স্থির করে নিয়েছে। কিন্তু ভারত-রাশিয়ার গায়ে পড়ে জ্ঞানদানের মাহাত্ম্য আরও গভীরে।

রাশিয়া তার অনুগত অনুন্নত দেশগুলি থেকে সস্তা দরে কাঁচামাল কিনে নিয়ে নিজ দেশে কাজে লাগায় এবং বাড়তি কাঁচামাল তৃতীয় দেশে উচ্চ মুনাফায় বিক্রি করে দেয়। বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয় দেশই যদি তাঁবেদার হয় তবে বিক্রেতাকে বেশী করে ঠকানো ও ক্রেতার কাছ থেকে বাজার ছাড়া দর আদায়ের সুযোগ রাশিয়া গ্রহণ করে।

বাংলাদেশের অভিভাবক সেজে রাশিয়া পাটের ব্যবসায়ে নামতে চাইছে। ভারত পাটের মওসুমকে সামনে পেয়ে আনন্দ উল্লাসে মত্ত হয়ে পড়েছে। তাদের চাপা খুশির চাপা হোল্লড় এখন বেশ স্পষ্ট মৃত পশুকে সামনে রেখে শকুন-শকুনী আহ্লাদ ধ্বনির মতই এ হুল্লোড় অসহ্য।

ভারতে অবস্থিত পাটকলগুলি কাঁচা পাটের চাহিদাই শুধু নয়, বরং বিপুল পরিমাণে পাট রপ্তানীর জন্য আয়োজন সম্পন্ন করে ফেলেছে।

ভারত সরকার পাট মওসুমে তার করণীয় ভেবে এখন থেকে প্রস্তুতি নিচ্ছে। নিজস্ব জাহাজবিহীন বাংলাদেশকে জাহাজের জন্য সর্বোতভাবে ভারতের উপর নির্ভর করতে হবে। ভারতের কাছে বাড়তি জাহাজ চাইলে ভারত অত্যন্ত ব্যস্ততা দেখাতে শুরু করেছে। পাট মওসুমে ভারতের বিশ্ব প্রেমের মাহাত্ম্য নড়বড়ে 'বাংলার দূত' ছাড়া বাংলাদেশের হাতে কোন জাহাজ থাকবে না। ভারতও ভাড়ায় কোন জাহাজ দিতে চাইবে না। অই দুয়ের মাঝামাঝি আপোষকর প্রস্তাব নিয়ে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ভারতীয় প্রতিনিধিদল বাংলাদেশে এসে পাট-বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করে যাবে। এ চুক্তিতে বলা হবে যে, যেহেতু বাংলাদেশ পাট রপ্তানী করতে না পেরে ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে, যেহেতু ভারত তাকে সাহায্য করতে আগ্রহী, সুতরাং যৌথ উদ্যোগে দু'দেশ পাট রপ্তানী করবে। কাঁচা পাট কেনা ও বেল বাঁধাইয়ের খরচের উপর যা লাভ হবে, সেটা দু'দেশ ভাগ করে নেবে। বিদেশে পাট ক্রেতা ঠিক করা, কর নির্ধারণ, লেনদেন সব কিছুই ভারতের হাত দিয়ে হবে। যেন ভবিষ্যতে সব ক্রেতা ভারতমুখী হয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে বাংলাদেশ ইচ্ছা করলেও যেন বাজার খুঁজে না পায়।

এ গেল একদিক। অন্যদিকে বাংলাদেশকে পাটের দর হ্রাসের পরামর্শ দেবার ফলে সরকার বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বড় জোর পাকিস্তান আমলের সমান অথবা তদাপেক্ষা দু'চার টাকা বেশীতে পাটের সরকারী দর

নির্ধারণ করবে। সরকারী সংস্থার মাধ্যমে পাট কেনা হবে বলে বাজারের চাহিদা ও সরবরাহের সূত্র অনুসার পাটের দর বৃদ্ধি পাবে না। ছোট ছোট বেসরকারী ব্যবসায়ীও সরকারী দরের উপরে পাট কিনতে চাইবে না। কৃষক সাধারণ পাটের নিম্নমূল্য এবং জীবনযাত্রা ও কৃষি কার্যের উচ্চ ব্যয় লক্ষ্য করে যখন নিরাশ হয়ে পড়বে তখনই ভারতের চোরাকারবারীরা দেশের অভ্যন্তরে ঢুকে সরকারী দামের চাইতে বেশী উচ্চ মূল্যে কাঁচা পাট খরিদ শুরু করবে। ভারতীয় মনোপলিবাজ বড় ব্যবসায়ীরা সর্বভূতেষু মাড়োয়ারীদিগকে এজন্য ইতিমধ্যে কাজে লাগিয়ে দিয়েছে। জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে বেশ কিছু নতুন মাড়োয়ারী সাবেক মাড়োয়ারীদের আত্মীয় সেজে বাংলাদেশে এসে গদী খুলেছে। এদের সাথে যোগাযোগ করে সন্দেহজনক কিছু বাংলাদেশী লোক গ্রাম-গঞ্জে পাটের গুদাম ভাড়া করছে।

এদের মাধ্যমে বাংলাদেশের পাট সম্পদের প্রায় অর্ধেক সীমান্তের ওপারে পাচার হয়ে যাবে। ভারত সরকার ও ভারতীয় ব্যবসায়ীরা এ পাটকে ইন্ডিয়ান গ্রেড বলে বিশ্বে চালাতে শুরু করবে। বিশ্বের চোখে উৎকৃষ্ট মানের বাংলাদেশের পাট ও নিকৃষ্টমানের ভারতীয় পাটের সাবেক ধারণা ঘুচে যাবে। ওদিকে যৌথ রপ্তানীর ফলে পরিমাণগত সরবরাহের জন্যও ভারত নির্ভরশীল বিক্রেতা হিসাবে পরিচিতি লাভ করবে। যে সম্পদের জন্য আমরা মনোবল ও আর্থিক সামর্থ্য পেতে পারতাম, তা আবার দ্বিতীয় শোষকদের হাতের মুঠোয় চলে যাবে।

শ্রী-বিদ্বেষীর পাল্লায় পড়ে বাংলাদেশ একবার সর্বস্ব হারিয়েছিল, এবার শ্রীকুলের কবলে পড়ে সোনার বাংলা আবার শ্রীহীন হয়ে পড়বে।

আপনার চিঠি

মোদাব্বের সাহেবকে বলছি

মহোদয়,

মোদাব্বের নামীয় জনৈক লেখকের একটি লেখা জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষ দিকে ঢাকার গণকণ্ঠে ছাপা হয়েছে। পাকিস্তানে আটক ৫ লক্ষ বাঙ্গালীর মুক্তি দাবী করে সিমলা বৈঠক ঠিকানায় ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রীর প্রযত্নে জননেতা মওলানা ভাসানী কর্তৃক প্রেরিত তারবার্তাকে নিয়ে এ ভদ্রলোক ইয়ার্কি করেছেন।

পাকিস্তানে আটকে পড়া বাঙ্গালীদের উদ্ধারের জন্য আমরা উৎকণ্ঠিত এবং সচেষ্ট। জাতীয় জীবনে এ প্রশ্নটি এখন সব বিতর্কের উর্ধ্বে। কেননা, শত্রু গৃহে পাঁচ লক্ষ ভাই-বোনকে ফেলে রেখে জাতি স্বাধীনতার পূর্ণ আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করতে পারে না।

যাদের আত্মীয়স্বজন পাকিস্তানে আটকে পড়েছে, তারা বাংলাদেশের সকল নেতার কাছে বারংবার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জনমত সৃষ্টির চেষ্টায় ব্রতী হবার আবেদন জানিয়েছে। আমরা ঢাকা থেকে মওলানা ভাসানীর কাছে এ মর্মে চিঠি লিখেছি। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকেও মওলানা ভাসানীসহ অন্যান্য নেতার কাছে চিঠি লেখার জন্য আমরা ভাগ্য বিড়ম্বিত আটক ব্যক্তিদের পরিজনের কাছে চিঠি দিয়েছিলাম।

মওলানা ভাসানী নিজ উদ্যোগেই হোক অথবা আমাদের চিঠিপত্র পেয়েই হোক, সিমলা বৈঠক উপলক্ষে ভুট্টোর কাছে সরাসরি এদেশের জনগণের দাবী জানিয়ে দেবার প্রশংসনীয় উদ্যোগ নিয়েছেন। আমার বিশ্বাস, বৃদ্ধ

জননেতা ছাড়া অন্য কোন বেসরকারী নেতা পাকিস্তানী প্রেসিডেন্টকে সরাসরি আঘাত করার কৌশল খুঁজে বের করতে পারতেন না। সন্তোষের গ্রাম থেকে পাঠানো এ তারবার্তাটি যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। সিমলাতে তারবার্তা পৌঁছার পরেই সারা বিশ্বের সংবাদপত্রে এটা খবর হয়েছে। জননেতা মওলানা ভাসানীকে বিশ্ববাসী চেনে। তাঁর ইমেজ পড়ে বাঙ্গালী উদ্ধারের দাবী অত্যন্ত বলিষ্ঠ হয়ে উঠেছে আন্তর্জাতিক অন্তরীক্ষে।

পাকিস্তান সরকার সরকারীভাবে তারবার্তার প্রাপ্তি খবর স্বীকার করেছে। একই সাথে তারা বিশ্ব জনমতের নতুন চাপের সম্মুখীন হয়েছে।

মওলানা ভাসানী তারবার্তায় বলেছেন, পাকিস্তানে বন্দীদশায় ৫ লক্ষ বাঙ্গালীকে আটক রেখে তাদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালানো হচ্ছে।

ভুট্টো সরকার সত্য না হোক অন্ততঃ মুখে স্বীকার করেছে, বাঙ্গালীদের প্রতি সদাচারণ করা হচ্ছে। যদি প্রত্যক্ষ করতে হয় মওলানা ভাসানী এসে তা দেখে যেতে পারেন।

রাজনীতি ও কূটনীতির ভাষা যারা বুঝেন, তারা জানেন, এটা চ্যালেঞ্জের উত্তর। পাকিস্তানে আমন্ত্রণ জানানোর ভাষা এটা নয়। আর মওলানা ভাসানী একপায়ে খাড়া নন যে আমন্ত্রণ জানালেই সুড় সুড় করে যাবেন। ১৩ বৎসর আগে মওলানা ভাসানীই প্রথম ওয়ালাইকুম দিয়েছিলেন। ১৯৭১ সালে তিনিই প্রথম দেখিয়েছেন পথ কোনটি। নিজের সংগঠনের পশ্চিম পাক শাখার সাথে তিনিই সবার আগে সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছিলেন। এসব কথা যাক।

আটক বাঙ্গালীদের আত্মীয়স্বজন হিসাবে নিজেদের ভাগ্যাহত স্বজনদের জন্য উৎকণ্ঠা আমাদের বেশী। আমাদের অনুরোধে মওলানা ভাসানী তারবার্তা করে যদি অপরাধ করে থাকেন, তবে সে অপরাধ আমাদের। মওলানা ভাসানীর নয়।

তবে যে সব লেখক লেখার খাতিরে লেখা, গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনুধাবন না করে কলমের লগুড় এলোপাথাড়ি চালাতে অভ্যস্ত তাদের প্রতি সবিনয় নিবেদন, মওলানা ভাসানীর এ তারবার্তাটির ফলে ভুট্টো চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়ে জবাব দিতে বাধ্য হয়েছে। এটাকে নিয়ে তারা মস্করা করার লোভ সামলাতে পারবেন না কেন।

লেখক মহলকে আমি চিনি না। মোদাব্বের সাহেব কে তাও জানি না। তার লেখা আমি পড়ি। কিন্তু একটা খটকা লাগে, নতুন মৌলবী নাকি কলেমা বেশী পড়ে। তিনিও নয়া অতি-বাঙ্গালী নয় তো?

ফরহাদ হাসান, ঢাকা

জেগেছি আমরা – সর্বহারা

॥ শাহাবুদ্দীন নাগরী ॥

বাক-স্বাধীনতা কোথা তুমি দিলে বাঙলার সরকার?
গণতন্ত্রের মিছে বুলি দিয়ে সময় করিছ পার।
ভারতে করিছ পাচার সকলি, কহিলে আমার দোষ,
বড়লোক হলো মাড়োয়ারী সব, মুখোপাধ্যায়, ঘোষ।
আশি টাকা হলো চাউলের মণ, প্রতিবাদ যদি করি,
ধরে নিয়ে গিয়ে 'আঁধারের ঘর' কারাগারে রাখো পুরি।
বাইশ পরিবার গেল দেশ ছাড়ি, ষাট পরিবার এলো,
এমসিএ ওরা রিলিফের মাল লুটিয়া পুটিয়া নিলো।
ছেড়ে দাও তুমি বারীকে আজকে নইলে দেখবে কবে,
জ্বেলেছে আগুন সর্বহারা, স্বার্থবাদীর ভবে।
দেরী নয় আর, বিপ্লব এলো বাঙলা মায়ের পরে
ঝরুক রক্ত যে টুকুই ঝরে, সর্বহারার তরে।

['হক-কথা'র সম্পাদক ইনফানুল বারী গ্রেফতারের প্রতিবাদে।]

এবার হাকসার

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

প্রভু এত দেখেও 'তৃপ্ত হলাম না জান' করবেন। ডিপি ধর বা সিদ্ধার্থ বাবু যেটা করেননি, পিএন হাকসার সেটা করে যাবেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও আরও বড় গোছের কর্তাদের সাথে বাংলাদেশে অবস্থানরত কয়েকজন 'বন্ধুর' পরিচয় করিয়ে দেবেন। এ বন্ধুরা ১৬ই জুলাইর দু'একদিন আগে থেকেই বিভিন্ন উপলক্ষে ঢাকায় হাজির হয়েছেন। ভারতীয় হাইকমিশনের দরজায় তাদের বিরাট বপুও দেখা গেছে।

এসব বন্ধুরা হলেন কুখ্যাত ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা রুথলেস র‍্যাডের শীর্ষস্থানীয়-র চাঁই। বহুকাল ধরে বাংলাদেশে থেকেও যারা যথারীতি ভারতের খেদমত করে আসছেন। এদের একটি পশমে হাত দেবার শক্তিও বাংলাদেশ সরকারের নেই। এ গোয়েন্দা চক্র ১৯৬৯ থেকে কাজ করে চলেছে। রুশ-ভারত অক্ষের সুযোগ নিয়ে ভারতকে 'সাম্রাজ্য' প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্য অর্জনে সহায়তাই ইন্দিরার নিজস্ব সৃষ্টি রুথলেস র‍্যাডের সাধনা। ভারতের রাজ্যগুলির সর্বনাশ করতে এই সংস্থা ওস্তাদ। সিদ্ধার্থ বাবুকেও তাই বাংলাদেশস্থ চাঁইদের কথা জানানো হয়নি। ডিপি ধরকে তো নয়ই। কাঁটা তোলার দ্বিতীয় কাঁটা হাকসারকে দিয়ে এই কাজটি সমাধা করা হবে।

পিএন হাকসারের সফরের পর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গোয়েন্দা বিভাগ বা ভারতীয় উলুপ্রহরী গোয়েন্দা সংস্থার মতানুযায়ী নয়, একদম রুথলেস র‍্যাডের ইচ্ছানুসারে বাংলাদেশ সরকার দ্বিগুণ উৎসাহে হোমটাস্ক শুরু করবে।

পিএন হাকসারের সফরের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ ভারতের ন্যূনতম স্বায়ত্বশাসনহীন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের স্টাটাচ লাভ করলো।

ভাগ্যের পরিহাস হলেও সত্যি যে, বাংলাদেশ এখন ইন্দিরার নিজস্ব মঞ্চে পরিণত হলো। দশাননী এখন তার এ মওসুমের সক্রিয় অনন (হাত) দিয়ে প্রত্যক্ষ গাইডেন্সে নাবালক বাংলাদেশকে পরিচালনা করবে। মস্কোর তারস্বর চীৎকার ও ২০ বছর মেয়াদী কাবিননামার হুমকি দিয়ে কিঞ্চিৎ মার্কিনমুখী ইন্দিরাকে যতদিন না ফিরাতে পারছে ততদিন মহাভারত নাটকের এ অঙ্ক চলবে।

শিল্প-কারখানা বিক্রির খেল আবার শুরু

ইপিআইডিসি আমলের মাদারীর খেল, আবার শুরু হতে যাচ্ছে। সরকারের হাতে নেওয়া শিল্প প্রতিষ্ঠান ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রির আলামত দেখা যাচ্ছে। চট্টগ্রামের উত্তর পতেঙ্গায় অবস্থিত ইন্টারন্যাশনাল অয়েল মিলস লিঃ ও এর সাথে জড়িত সহযোগী প্রতিষ্ঠান ইন্টারন্যাশনাল টেঙ্ক টার্মিন্যাল-প্রতিষ্ঠান দুটির প্রথমটিকে জাতীয়করণ, দ্বিতীয়টিকে টেকওভার করা হয়েছে। এখন অয়েল মিলটি ব্যবসায়ী ব্যক্তিবিশেষের কাছে বিক্রি করার গোপন তৎপরতা চলছে। শ্রমিক ইউনিয়ন এ অশুভ তৎপরতার প্রতিবাদ জানিয়ে প্রতিষ্ঠানটি তাদের কাছে হস্তান্তরের দাবী জানিয়েছেন।

বিড়ালটাকে থলির মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলছে

রাজশাহী জেলার পোরশা থানার অন্তর্গত গ্রামে বেআইনী অস্ত্রসহ ধৃত ও থানায় প্রেরিত দু'জন সাবেক মুক্তিযোদ্ধা জিজ্ঞাসাবাদকালে অস্ত্র গোপনকারী বহু আওয়ামী লীগের চাঁই এবং দুষ্কর্মে লিপ্ত রাজনৈতিক দেবতাদের নাম প্রকাশ করে দিয়েছে। কিন্তু 'পুলিশ বাহিনীর শক্তি নেই' অজুহাতে আসামীদের ধরা হচ্ছে না। ইতিমধ্যে সব কিছু ধামাচাপা দিয়ে

মুক্তিযোদ্ধা দু'জনকে বের করে আনার জন্য আজব লীগের জেলা নেতৃত্ব সক্রিয় হয়ে উঠেছেন।

হিজ্যাক গাড়ির মুক্তিপণ সরকারী তহবিল থেকে

কুষ্টিয়া ক- ১০১৯ নং জীপখানা হিজ্যাক হয়েছিল। এখন কুষ্টিয়া জি কে এগ্রোনমি অফিস মুজিববাদী নেতার কাছ থেকে সেখানা ফেরৎ নিয়েছে। তবে জীপখানার মুক্তিপণ দিতে হয়েছে ৬ হাজার ২ শত ২৪ টাকা। ১৬ই জুন এ অঙ্কের একখানা চেক এগ্রোনমি অফিসার মুজিববাদী তরুণ নেতার হাতে তুলে দিয়েছেন। গাড়ীখানা মেরামত করতে আরও হাজার ছয় টাকা লাগবে।

বিগত নির্বাচনে স্বতন্ত্রপ্রার্থী কুখ্যাত প্রাক্তন ফুড কন্ট্রোলারের পক্ষে যে লোকটি নির্বাচনী প্রচার চালিয়েছিল, সে ব্যক্তিটিই এখন মুজিববাদী নেতা সেজে এ গাড়ী হিজ্যাক করে। জীপখানার গায়ে ঢাকা ক- ১৫৬৮ নম্বর প্লেট লাগিয়ে দেশ ভ্রমণ ও বড় ভাইয়ের কন্টাক্টারী চালিয়ে এ্যাদ্দিন পরে ফেরৎ দেওয়া হলো, তাও সরকারী তহবিল থেকে মুক্তিপণ আদায়ের পর।

'হক-কথা' সম্পাদকের মুক্তি চাই

জনাব সম্পাদক সাহেব,

সত্য উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে মিথ্যার কারাগারে অন্তরীণ 'হক-কথা' সম্পাদক ইরফানুল বারীকে অবিলম্বে নিঃশর্তে মুক্তি দিয়ে সরকার সত্যের পথ ধরবেন এইটাই আমাদের দাবী।

সাহানা আক্তার (নিলু)
রেহেনা আক্তার (ডলি), চট্টগ্রাম।

মুরিদের দরবার

দার্শনিকের দৃষ্টিতে ইসলামী সমাজতন্ত্র

॥ মোহাম্মদ হোসেন ॥

আত্মোপলব্ধি ও আত্মিক জ্ঞান ব্যতীত মওলানা ভাসানীর প্রস্তাবিত ইসলামী সমাজতন্ত্রের মর্মার্থ বুঝা সম্ভব নয়। আর যে জাতির আত্মিক জ্ঞান নাই শুধু বাহ্যিক জ্ঞানের উপরই নির্ভরশীল–সে জাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকার–

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

॥ ২ ॥

ইসলাম অর্থ শান্তি ও পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ পাকের নিকট সৃষ্টির স্বতঃস্ফূর্ত আত্মসমর্পণকে বুঝায়। পৃথিবীতে যত প্রকার ধর্ম আছে প্রত্যেক ধর্মেরই মূল আদর্শ হইতেছে সৃষ্টিকর্তার উপাসনা। উপাসনা অর্থ আবার শুধু ধর্মীয় কতকগুলি অনুষ্ঠান বা ক্রিয়াকলাপকে বুঝায় না। ধর্মের মূল জিনিষ হইতেছে অদ্বিতীয় রব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি তথা স্বীয় জীবনের কল্যাণ ও মুক্তির জন্য সেই সর্বশক্তিমানের নিকট পরিপূর্ণরূপে নিজেকে বিলাইয়া দেওয়া। অতএব ইসলামের আদর্শ শুধু মুসলিমদের একার নয় সমগ্র জাতির সমগ্র মানব সমাজের। সকল মানুষের সৃষ্টিকর্তাই তো এক আল্লাহ পাক। 'এক ছাড়া তো' আর দ্বিতীয় নাই। দ্বিতীয় নাই বলিয়াই তো সমগ্র মানব জাতির সত্ত্বা 'একের' মধ্যে বিরাজ করিতেছে। আমরা যেন আত্মোপলব্ধির দ্বারা সৃষ্টি ও একের মধ্যে অন্যকে আবিষ্কার করিতে পারি।

'আমার' আর 'তোমার' ও 'তোমার' আর 'আমার' বলিয়া কিছুই থাকে না, সকলই ঐ 'একের' মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু ঐ 'একের' মধ্যে 'তোমার' যে অধিকার 'আমার'ও সেই অধিকার। সকলেরই তিনি। ইহার ব্যতিক্রমেই অহং-এর উৎপত্তি।

সকল কিছুরই একমাত্র মালিক আল্লাহ্ পাক। সকলেরই উৎসস্থান তিনি। আবার সকলকেই সেই স্রষ্টার দিকেই ফিরিতে হইবে। তাই ইসলাম এমন একটি আদর্শ রূপে বিশ্বে আসিয়াছে যেখানে হিংসা-দ্বেষের স্থান নাই, যেখানে সকল মানুষই সমান, ছোট-বড় সকলেরই সামানাধিকার বর্তমান, যাহাতে ভিন্ন যা নিম্ন জাতি বলিয়া কাহাকেও অবজ্ঞা করা হয় না–সমগ্র মানব জাতিকেই এক পরিবারভুক্ত বলিয়া গণ্য করা হয়–যাহাতে আল্লাহ্ প্রদত্ত কোন সম্পদ বা সৃষ্টিকেই নিজের বলিয়া কুক্ষিগত করা হয় না–যাহাতে প্রেম বা ভালবাসাকে সঙ্কীর্ণ করা হয় নাই–পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসার মাধ্যমে আপন করিতে পারে–যাহাতে রাষ্ট্রের উচ্চপদস্থ কর্মচারী হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্ন শ্রেণীর কর্মচারীর ও পরিশেষে কৃষক, মজুর, কামার, কুমার, জেলে-মাঝি, তাঁতী, গারোয়ান, শিক্ষিত-অশিক্ষিত প্রভৃতি রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত সকল শ্রেণীর মানুষের সমানাধিকার পরিদৃষ্ট হয়–যাহাতে মেথর-মুচি বলিয়া কাহাকেও ঘৃণা বা অবজ্ঞার অবকাশ নাই–যাহাতে সকলেই স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করিবার ও শাসন পদ্ধতির দোষ-ত্রুটির সমালোচনা পূর্বক উহাতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করিবার অধিকার রহিয়াছে এমন একটি নির্ভেজাল ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত আদর্শই হইতেছে ইসলামী আদর্শ।

মহানবী (সঃ) চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে আরবের মক্কার প্রান্তরে ইসলামের এই আদর্শই প্রচার করিয়াছিলেন এবং ইহার স্পর্শে আরবের নির্দয় মানুষের অন্তরেও প্রেমের অমৃত ধারায় আপ্লুত হইয়া উঠে যাহার ফলে তাহাদের মধ্যে দলাদলি ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের অবসান হইয়া সাম্য-ভ্রাতৃত্বের সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। নবী (সঃ)-এর সেই আদর্শ সকল কালে সকল দেশের মানুষের জন্য প্রযোজ্য। ইহাতে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষেরই মঙ্গল নিহিত আছে।

মহান নেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ইসলামের এই সুমহান আদর্শই আজ জাতির ভবিষ্যত মুক্তির পথ হিসাবে তুলিয়া ধরিয়াছেন। তিনি ইসলামের অন্তর্নিহিত মূল আদর্শকে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াই নির্যাতিত ও অধিকার বঞ্চিত মানুষের জীবনে শান্তি ফিরাইয়া আনিতে 'মানুষে মানুষে কোন প্রভেদ নাই' নবী (সঃ)-এর এই অমর বাণীকে বাস্তবে রূপ দিতে জাতিকে ইসলামের সাম্য-শান্তি ও ভ্রাতৃত্বের দিকে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন। ধৈর্য্য ও তিতীক্ষার দ্বারা সংযম ও প্রেমের দ্বারা মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে ঐক্যের বন্ধন দৃঢ় করা ও সর্বোপরি পরিপূর্ণভাবে স্রষ্টার নামে সকল কিছুকেই উৎসর্গ করিয়া পরস্পর পরস্পরের সুখে দুঃখে সেবার মনোবৃত্তি লইয়া অগ্রসর হওয়াই মওলানা ভাসানীর প্রস্তাবিত ইসলামী সমাজতন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য। এই রূপ শোষণমুক্ত সার্বজনীন সমাজ ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত ধন-সম্পত্তির চির অবসান হইবে, অর্থনৈতিক বণ্টন ব্যবস্থার বৈষম্য দূর হইবে। একথাই আর একভাবে অভুক্ত রাখিয়া হৃষ্ট চিত্তে অনাহার করিবেন না–

পরস্পর পরস্পরের প্রতি সংবেদনশীল হইবে। এই সমাজ ব্যবস্থার আওতায় শোষক আর শোষিত মানুষ ধনী ও গরীব বলিতে দ্বিতীয় কোন শ্রেণী থাকিবে না। স্রষ্টার সৃষ্টি হিসাবে সকলেই এক সামাজিক ব্যবস্থার আওতায় বাস করিবেন সমাধিকার লইয়া।

আত্মপোলব্ধি ও আত্মিক জ্ঞান ব্যতীত মওলানা ভাসানীর এই ইসলামী সমাজতন্ত্রের মর্মার্থ বুঝা সম্ভব নহে। আর যে জাতির আত্মিক জ্ঞান

নাই শুধু বাহ্যিক জ্ঞানের উপরই নির্ভরশীল, সে জাতির ভবিষ্যতও অন্ধকার। (চলবে)

অনাহারে মানুষ মরছে

সম্প্রতি নোয়াখালী জেলার রামগতি থানার চরগাজী এলাকায় অনাহারে তিন ব্যক্তি মারা গেছেন। চালের দাম এ অঞ্চলে ৭০ থেকে ১০০ টাকা।

ফেনী থানার উত্তর ধলিয়া ইউনিটের মুক্তিযোদ্ধা নূর আহমদ ২৬শে মে অনাহারে ধুঁকে ধুঁকে মারা গেছেন।

খুলনা অঞ্চলে বাবুগঞ্জের রফিয়াদী গ্রামে রজ্জব আলী নামক ভূমিহীন কৃষক না খেতে পেয়ে মারা গেছেন। এতদঞ্চলে পাঁচটি গ্রামের মানুষ কোন সাহায্য পায়নি। হাজার হাজার মানুষ অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে দিন কাটাচ্ছেন।

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ও কৃষক সমিতির সাংগঠনিক তৎপরতা

ভুরুঙ্গামারী

সম্প্রতি জনাব আবুল হাশেম সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক কৃষক সভায় জনাব ইব্রাহিম হোসেনকে সভাপতি, কবি মহীউদ্দিন আহম্মদকে সম্পাদক করে ১৯ সদস্যবিশিষ্ট ভুরুঙ্গামারী থানা কৃষক সমিতির একটি শক্তিশালী কমিটি গঠিত হয়। উক্ত সভায় সরকারের গণতন্ত্র বিরোধী কার্যকলাপের তীব্র নিন্দা জানিয়ে 'হক-কথা' সম্পাদকের আশু মুক্তি দাবী করা হয়।

হবিগঞ্জ

গত ১৬ই জুলাই বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে হবিগঞ্জ মহকুমা ন্যাপের ও কৃষক সমিতির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আফসার উদ্দিন আহম্মদ এডভোকেটকে সভাপতি ও জনাব আলীকে সম্পাদক করে ন্যাপ কমিটি ও জনাব আব্দুল হক এডভোকেটকে সভাপতি এবং আব্দুর রকীব চৌধুরীকে সম্পাদক করে কৃষক সমিতির শক্তিশালী কমিটি গঠিত হয়। উভয় সম্মেলনেই ন্যাপ ও কৃষক সমিতির কেন্দ্রীয় সংগঠক জনাব রাজা আলী সফদার খান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকেন। সম্মেলন শেষে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় 'হক-কথা' সম্পাদকের মুক্তি, রিলিফের দুর্নীতি বন্ধ ও বাজেটের সমালোচনা করে বিভিন্ন বক্তা বক্তব্য রাখেন।

পার্বত্যবাসীর উপর জুলুম বন্ধের দাবী

গত ৮ই জুলাই কৃষক নেতা হাবিবুর রহমান শিকদারের সভাপতিত্বে রাউজান থানা ন্যাপ, কৃষক সমিতি ও বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের এক যৌথ সভায় 'হক-কথা' সম্পাদক জনাব ইরফানুল বারীকে অবিলম্বে বিনাশর্তে মুক্তিদানের দাবী জানানো হয়।

সভা পার্বত্য চট্টগ্রামে নিরীহ পার্বত্যবাসীর উপর সরকারের ঘৃণ্য দমননীতির তীব্র নিন্দা করে সকল প্রকার জুলুম অবিলম্বে বন্ধ করার দাবী জানায়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টির হীন তৎপরতায় সরকার ও সরকারী দলকে লিপ্ত থাকতে দেখা যাচ্ছে, এ অভিযোগ করে সভা এহেন তৎপরতা বন্ধের দাবী জানায়।

সভা শেষে একটি বিরাট মিছিল বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

বারীন বাবু বলেছেন

কোলকাতা থেকেই সব করে দেয়া যাবে

চারজন এমসিএ বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় ও প্রতিশ্রুতিশীল প্রকাশনা শিল্প ও এর সাথে জড়িত সাড়ে একুশ লাখ লোককে নিশ্চিত

ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন। ভারতে অবস্থানকালে সাত লাখ টাকা পণ দিয়ে হিন্দুকুমারীকে বিয়ে করার জঘন্য কেলেঙ্কারী যে এমসিএটি ঘটিয়েছে, যে কলমজীবী ফতুর এমসিএটি ৫৫ হাজার টাকা দামের কার্ডিলাক গাড়ী উপহার পেয়েছে, তাদের কাঁধে সওয়ার হয়ে ভারতের প্রকাশকচক্র এবং খোদ ভারতীয় সরকারী মহল বাংলাদেশকে শোষণের আরেকটি উর্বর ক্ষেত্র হিসাবে বাংলাদেশের প্রকাশনা শিল্প ও পাঠ্যপুস্তকের বাজার দখলের জঘন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। ভারত যাকে যেমনভাবে পেরেছে, কোন বৃদ্ধকে তরুণী ভার্য্যা দিয়ে, কোন উচ্চাভিলাসীকে কার্ডিলাক গাড়ী দিয়ে, কোন অপদার্থকে মন্ত্রী বানাবার আশ্বাস দিয়ে, কোন বহিরাগতকে বাংলাদেশের খোদ কর্তার প্রিয়পাত্রে পরিণত করার আশ্বাস দিয়ে প্রকাশনা সেক্টরে পঞ্চম বাহিনী সৃষ্টি করেছে। আজ এই কেনা গোলামরা ভারতের ইঙ্গিতে এক বিরাট পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রকাশনা শিল্পকে পঙ্গু করে ভারতের হাতে তার দায়িত্ব তুলে দেবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। স্বাধীনতার পর পরই ভারত থেকে এসে, শেখ মুজিবের প্রত্যাবর্তনের আগেই এরা দারুণ হৈচৈ করে এমন একটা ভাব সৃষ্টি করে যে, প্রকশনা ও পুস্তক ব্যবসায়ে তাদের চাইতে বিশেষজ্ঞ আর কেউ নেই। তারাই সব ম্যানেজ করতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে প্রভুর কাছে দিয়ে আসা অঙ্গীকার পূরণের পথে না জানি কোন ব্যাঘাত হয়, এই ভেবেই তারা প্রকাশনা শিল্পের দিকটির পথ আগলে দাঁড়ায়।

শিক্ষা দফতর, শিক্ষা সম্প্রসারণ বিভাগ থাকা সত্ত্বেও পুস্তক প্রকাশনা শিল্পকে মানুষ করার জন্য গবাদি মন্ত্রী নাজেল হবার গুঢ় রহস্য এখানেই।

ফলে টেক্সট বুক বোর্ড-- পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চাবিকাঠি এদের হাতে এসে যাবার পরেই এরা আশ্বস্ত হয়ে 'কাজ' শুরু করে। বোর্ডের কর্মকর্তা, ঐ চাররত্ন ও দু'জন প্রকাশক প্রতিনিধি গঠিত পাঠ্যপুস্তক প্যানেল স্বাধীনতার পর প্রথম বৈঠকে মিলিত হলে অত্যুৎসাহী একরত্নের মুখে থেকে আসল কথাটি ফাঁস হয়ে পড়ে। আমরা সব বই ছেপেছুপে নেবো বলে একরত্ন তদ্বি শুরু করলে অভিজ্ঞ প্রকাশকরা যখন বলেন যে, এটা কি সম্ভব? দেশব্যাপী কাঠামো নিয়ে দণ্ডায়মান সমগ্র শিল্পটিই যখন বোর্ডের বই প্রকাশনা যথাসময়ে সম্পন্ন করতে হিমশিম খেয়ে যায়, তখন আপনারা হঠাৎ করে পারবেন কিভাবে। ঠিক এ পর্যায়ে ব্রাহ্মণ ঠাকুর ও ঢাকা এমসিএদ্বয় 'উঠে আসুন', 'উঠে আসুন' হাকডাক দিতে দিতে বলে ফেলেন যে, 'কোলকাতায় বারীন বাবুর সাথে সব কিছু আলোচনা হয়েছে। তিনি সব বই ছেপে সরবরাহ করতে রাজী। তাঁকে এক পার্সেন্ট দিলেও চলবে, না দিলেও চলবে।'

দেশে সম্ভাবনাময় ও স্বনির্ভর প্রকাশনা শিল্প বিদ্যমান থাকতে কতিপয় এমসিএ ভারতে বারীন বাবুকে দিয়ে দেশের প্রধান পুস্তকগুলি মুদ্রণের ব্যবস্থা করবেন একথা শুনে প্রকাশক ও বোর্ডের প্রতিনিধিরা 'থ' হয়ে যান।

এ বারীন বাবু সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ভদ্রলোকটি ১৯৫৮ সালের পূর্বে ঢাকায় গ্রেটবেঙ্গল লাইব্রেরীর কর্মকর্তা ছিলেন। ১৯৫৮ সালের কিছুদিন পূর্বে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের পুস্তকের বাজার সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ তালাস করতে এসে ভারতের প্রকাশক চক্র বারীন বাবুকে ভারতে নিয়ে যান এবং নিজেদের উপদেষ্টা হিসাবে পৃথক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসহ তাকে প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশ ছিল ভারতের উর্বর পুস্তক বাজার। বারীন বাবু বিশিষ্ট রপ্তানীকারক হিসাবে তখনই এখান থেকে কোটি কোটি টাকা লোপাটের কারবারে ভারতীয় প্রকাশক ও সরকারকে সাহায্য করে আসছিলেন।

প্যানেলের দ্বিতীয় বৈঠকে একই প্রশ্ন নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। বোর্ড নিজ উদ্যোগে বই ছাপাতে চাইলে ছাত্ররা বই ঠিক সময়ে পাবে না, এতে শিক্ষার অসুবিধা ছাড়াও পুস্তক বিক্রয় ও সরবরাহের উপর নির্ভরশীল সাড়ে একুশ লাখ লোক কর্মহীন হয়ে পড়বে বলে যুক্তি দেখানো হয়। ডিগ্রী শ্রেণীর রাষ্ট্রবিজ্ঞান পুস্তকের লেখক ও প্রবীণ আওয়ামী লীগের হাফিজ হাবিবুর রহমান যুক্তি দিয়ে চার রত্নকে বাস্তব ব্যাপারটি বুঝাতে চাইলে ঢাকাই এমসিএ হঠাৎ ক্ষেপে উঠে বলেন যে, এ প্রস্তাবে হাফেজ সাহেব রাজী না হলে তিনি ওয়াকআউট করতে পারেন। প্রবীণ গ্রন্থকার ছোকবার এ ব্যবহার হজম করে নিয়ে বলেন যে, আজ এ সভা থেকে ওয়াকআউট করলে কালই বিভিন্ন কাগজে খবর বেরুবে। আওয়ামী লীগের অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকাশ পাবে– আওয়ামীলীগার হিসেবে তিনি তা পারেন না। তিনি বলেন, সভায় উপস্থিত আমি থাকবো কিন্তু গৃহীত সিদ্ধান্তে আমি আমার প্রতিবাদ মন্তব্য লিখে তারপর স্বাক্ষর করবো। সে সভার পর থেকে প্রকাশ করা প্যানেল কমিটির বৈঠক বর্জন করে চলেছেন। ফলে কমিটিতে 'আমরা আর মামুরা' ছাড়া কেউ নেই। এবং আজ ৭ মাস অতিবাহিত হতে চলেছে, স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা আজও বই পায়নি। গত বছর ক্লাস ফোর থেকে অটোপ্রমোশনপ্রাপ্ত ছাত্রটি এবার বইয়ের মুখ না দেখেই ফাইভ থেকে অটোপ্রমোশন নিয়ে সিক্সে যাবে, তখন তার হাতে সিক্সের বই তুলে দেবার অর্থ দাঁড়াবে ক্লাশ থ্রি পাশ করা ছেলের হাতে হাইস্কুলের বই দান! দেশের প্রায় এককোটি ছাত্র-ছাত্রীর অর্ধেকের বেশী শিক্ষার্থীকে এ শোচনীয় অবস্থায় ফেলবার জন্য এককভাবে ঐ চারজন এমসিএ দায়ী যারা এদেশের বোর্ড, প্রকাশনা শিল্পকে তুলে দেবার দাসখত লিখে দিয়ে এসেছে নারী– বাড়ীর বিনিময়ে।

ইতিমধ্যে ভারতের কর্তৃপক্ষীয় মহলের সুপারিশসহ ভারতীয় প্রকাশক চক্র নাকি বাংলাদেশের শিক্ষামন্ত্রীর কাছে এক চিঠিতে মাসীর দরদ ঝেড়ে লিখেছে যে বাংলাদেশের ছেলেমেয়েদের হাতে বই নেই দেখে দুঃখে তাদের বুক ফেটে যাচ্ছে। তাঁরা ডাকিবামাত্র হাজির হয়ে সব ল্যাটা চুকিয়ে দিতে পারেন। ল্যাঠা চুকানোর এই গায়ে পড়ে দেওয়া প্রস্তাব আপাত মধুর হলেও এর পশ্চাতে রয়েছে এদেশের লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের ঘাড় মটকে খাবার অভিলাষ। এই প্রস্তাবখানার ব্যাপারে ফেভারেবল (অনুকূল) সাড়া দানের জন্য মন্ত্রীসভার অনেক রাঘববোয়াল ও এমসিএ চক্র অধীর হয়ে উঠেন। শেষাবধি তা টেক্সট বুক বোর্ড ফেভারেবল (অনুকূল) মত দিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বললেন যে, তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে পশ্চিম পাকিস্তানী বই আসতো না, বরং পূর্ব পাকিস্তানী বই পশ্চিম পাকিস্তানে বাজার করে নিতে শুরু করেছিল। বাংলাদেশের প্রকাশক ও মুদ্রাকরগণ 'টাইপ নেই, ব্লক নেই' এ ধরনের অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে সমগ্র শিল্পটিকে আজ আধুনিকতম পর্যায়ে নিয়ে এসেছেন। আজ নিশ্চয় বাইরের কাউকে ডেকে এনে শিল্পটিকে ধ্বংস করা ঠিক হবে না। কর্তারা বেজায় গোস্বা হয়ে ভারতীয় প্রভুদের মনতুষ্টির জন্য পরবর্তী পন্থা খুঁজতে লেগে যান। পরবর্তী পন্থা হিসাবে এদেশের আধমরা প্রকাশকদের উপর অর্থনৈতিক স্টীমরোলার চালানো শুরু হয়েছে।

প্রকাশকদের হাতে যে সব বোর্ডবই ছিল, বোর্ডের কাঁধে বন্দুক রেখে এমসিএ কমিটি তা সব তুলে নেন। বিনিপয়সায় বিতরণের জন্য সীল মেরে এসব বই তাঁরাই বন্টনের জন্য পাঠান। প্রকাশকদের অর্থে ছাপানো বই দিয়ে সরকার দানছত্র খুলেছেন, এসব বইয়ের জন্য একটি পয়সা ক্ষতিপূরণও প্রকাশকদের দেওয়া হয়নি। অধিকন্তু বোর্ডের ১২/২/৭২ তারিখের ১বি-১৭২ নং সার্কুলার মারফৎ এমসিএ কমিটি প্রকাশকদের হাতে রক্ষিত তৃতীয়

থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত বিভিন্ন শ্রেণীর মোট ৬১ খানা বিভিন্ন ধরনের পুস্তককে বাতিল ঘোষণা করেন। এর ফলে প্রকাশকগণ ৪০ থেকে ৪৪ লাখ টাকা ক্ষতির সম্মুখীন হন।

সর্বস্বান্ত প্রকাশকগণ দাবী করেন যে, ১৯৭১ সালের সব বই সরকার নিয়ে গিয়েছেন অথবা বাতিল করে দিয়েছেন, এমতাবস্থায় প্রকাশকদের কাছে এসব পুস্তকের জন্য ব্যাঙ্ক গ্রান্ট বাবদ টেক্সট বুক বোর্ডের যে লাখ চল্লিশেক টাকার দাবী আছে তা মাফ করা হোক। কিন্তু ভারতের ইঙ্গিতে এদেশের প্রকাশনা ও মুদ্রণ শিল্পকে ধ্বংস করে দেবার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ সরকার তাও করছেন না। ফলে আজ প্রকাশকদিগকে বাড়ীঘর, দোকানপাট দাবী করে পথে বসে বোর্ডের অন্যান্য পাওনা শুধতে হবে। আর এটা হলেই এমসিএ রত্নদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। হতাশাগ্রস্ত প্রকাশকগণ ফতুর হয়ে পথে বসলে অথবা জীবনের তরে পুস্তক ব্যবসা ছেড়ে দিলেই হুড়মুড় করে ভারতীয় প্রকাশক চক্রের বিজয় রথ বাংলাদেশের লাখ লাখ অভিভাবকের কঙ্কালসার দেহগুলির উপর দিয়ে এগুতে শুরু করবে। সর্বস্বান্ত বাঙ্গালীদের রক্তের পর হাড়ের রসটুকুও মুক্তিদাত্রী ভারত দেবীর পদতলে নিবেদন করতে তাহলে অসুবিধে হবে না।

বাংলাদেশের বোর্ড স্বীকৃত ১৬০ জন প্রকাশকের মধ্যে তিন চারজন ছাড়া সবাই মাঝারী ব্যবসায়ী, বোর্ডের বই লাভের জন্য ছাপাম করে অবশেষে তারা প্রকাশক হয়েছেন। বই ছাপার অনুমতি পেলে তাঁরা তিনি প্রকাশক মিলে যৌথ তহবিল গঠন করে পুস্তক প্রকাশের খরচ যোগাড় করেন। এ ১৬০ জন প্রকাশক কমপক্ষে ২০০টি প্রেসে বোর্ডের বই ছাপতেন। সমাজতন্ত্রী এমসিএদের কৃপায় তাদের পছন্দসই ১০টি প্রেস অন্তবর্তীকালীন কাজগুলি পেয়েছেন।

তাদের ধন পোদ্দারীতে নেমেও বিনামূল্যে বই বিতরণে লিপ্ত ভারতসেবী এমসিএ-রা আজ পর্যন্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় স্তরের শতকরা একাংশ ছাত্রকেও এবং মাধ্যমিক স্তরে হ্রাসকৃত মূল্যে শতকরা ১০ ভাগ ছাত্রকেও বই পৌঁছিয়ে দিতে পারেনি। সুতরাং বাংলাদেশ যে বই প্রকাশনা ও বন্টনের কাজ চালাতে পারবে না, ভারতীয় বাবুরা ছাড়া যে রক্ষা করার কেউ নেই এটা সোচ্চারে বুঝাবার সময় নিকটবর্তী। আজ পুস্তক মুদ্রণ, কাল পুস্তক প্রকাশনা পরশুদিন পুস্তক রচনার দায়িত্ব ভারতের হাতে তুলে দিয়ে আমাদের শিক্ষাকে বন্দেমাতরামের অনুগামী করার রাজনৈতিক চাল আর এদেশের জনগণকে শোষণের উদার বন্দোবস্ত করে দেবার ঔদার্যে দরুণই তো এরা ভারতের কাছ থেকে দেশপ্রেমিকের সার্টিফিকেট পেয়েছে।

বিসমিল্লাহ

গত বৃহস্পতিবার বাশাইল থানা আওয়ামী লীগ সম্পাদক করটিয়ার হাটে গিয়েছিলেন কচু কিনতে। আট আনার কচু কিনে এক টাকার নোট দিয়েছিলেন তিনি। কচুওয়ালা তাকে দাম রেখে আট আনা ফেরত দিতে গেলে আমীর সম্পাদকটি চটে উঠে আবদার জানান যে, তিনি দাম দেয়ার সময় দশ টাকার নোট দিয়েছিলেন। অথচ বেচারা কুচওয়ালার কাছে একটিও দশ টাকার নোট ছিল না। তিনি মিথ্যে আবদারটি চরম পর্যায়ে উন্নীত করলে কচুওয়ালারা রেগে উঠে তার উপর আক্রমণ করে। তাদের সাথে জনতাও যোগ দেয়। মিনিট দশেক পর আওয়ামী লীগের এই নেতাকে জমিদার বাড়ীর কাচারীতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে অনুষ্ঠিত অন্যান্য কার্যাবলীর মধ্যে নাকি জুতা-স্যান্ডেলও ব্যবহৃত হয়েছে। পরে তার পরিচয় পেয়ে তাকে ছেড়ে দেয়া হয়।

ইরফানুল বারীর

মুক্তি চাই

গত ২১, ২২ ও ২৩শে জুলাই ঢাকার পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত মুজিববাদ বিরোধী বাংলাদেশ ছাত্রলীগের বিশাল কর্মী সম্মেলনে গৃহীত এক প্রস্তাবে সাপ্তাহিক 'হক-কথা' সম্পাদক সৈয়দ ইরফানুল বারীর গ্রেফতারের নিন্দা করে অবিলম্বে তার মুক্তি দাবী করা হয়েছে। সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে ছাত্রনেতা জনাব আ স ম আবদুর রব সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নস্যাতের সরকারী ষড়যন্ত্রের তীব্র সমালোচনা করে বলেন ঃ "স্বাধীনতার পর দীর্ঘ সাত মাস কিছু না বলে 'হক-কথা' সম্পাদকের গ্রেফতার করার মধ্যে দিয়ে সরকার সাংবাদিকদের কণ্ঠরোধ করার অপচেষ্টায় মেতেছেন।" জনাব রব সৈয়দ ইরফানুল বারীর মুক্তি এবং সাপ্তাহিক 'গণশক্তি'র তালা খুলে দেওয়ারও দাবী জানিয়েছেন।

বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের কুমিল্লা ও কুষ্টিয়া শাখা

সম্প্রতি কুষ্টিয়ার ছাত্রনেতা মিজানুর রহমান মিঞ্জুর সভাপতিত্বে বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের এক বিরাট সমাবেশে 'হক-কথা' সম্পাদক সৈয়দ ইরফানুল বারীকে অনতিবিলম্বে বিনাশর্তে সসম্মানে মুক্তি দিয়ে সংবাদপত্রের সত্যিকারের স্বাধীনতা সংরক্ষণের জোর দাবী জানানো হয়। এই সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন পাক্ষিক 'সমীক্ষা'র সম্পাদক জনাব শামসুল হুদা।

কুমিল্লায়ও বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে গত ২৩শে ও ২৪শে জুন 'হক-কথা' সম্পাদককে গ্রেফতারের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শৈলকুপা বাংলা ছাত্র ইউনিয়ন

'হক-কথা' সমপাদকের বিনাশর্তে মুক্তির দাবীতে শৈলকুপা থানা বাংলা ছাত্র ইউনিয়নের আহ্বানে সম্প্রতি ঝিনাদহে একটি বিরাট বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। মিছিল শেষে জনাব দেলোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় জনাব ইরফানুল বারীর গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা করে তার মুক্তি দাবী করা হয়।

ইহা কি সত্য?

॥১২০॥

চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় খান্নাস ও মান্নাব গোছের দু'জন নেতা আসকার দীঘি ও জামাল খান লেন এলাকায় দুটি পরিত্যক্ত প্রাসাদতুল্য বাড়ি এখনও দখল করে আছে। সরকারী কর্মচারীদের বলে দেওয়া হয়েছে যে, এ সম্পর্কে উচ্চবাচ্য করলে চাকুরী থাকবে না। চাটগাঁর এমসিএ ও নেতাজীরা গাড়ী-বাড়ীর দখল কিছুতেই ছাড়বেন না বলে চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন।

॥১২১॥

ইংরেজী অথবা বাংলায় শুদ্ধ করে একখানা দরখাস্ত লিখবার যোগ্যতা তার নেই। ওয়াপদার কনসালটেন্ট ফার্মের তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী এই খবিশ উদ্দিন দখলদার আমলে 'সাচ্চা পাকিস্তানী'র সার্টিফিকেট টিক্কা খানের দরবার থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর একমাত্র যোগ্যতা তিনি শেখ। বড় শেখের চাচাতো ভাই। মাদারীপুরের মোচওয়ালা এমসিএ-র ভগ্নিপতি। আর তারই বদৌলতে তিনি বাংলাদেশ সরকারের রিলিফ ও পুনর্বাসন বিভাগের ডিরেক্টর হয়েছেন। গাড়ী-বাড়ী, চাকর-নফর পেয়েছেন তিনি। তদুপরি পারমিট শিকার করে টু-পাইস কামাই করছেন।

॥১২২॥

অর্থমন্ত্রীর ভাই মফিজ উদ্দীন সাহেব বনানীর ৩৭/এফ নম্বার যে বিলাসবহুল প্রাসাদটিতে বাস করেন এর মালিক ছিল ডেল্টা কন্সট্রাকশন এর পশ্চিমা কামাল মুন্সি। ঐ বাড়ীর আসবাবপত্রগুলিও অর্থমন্ত্রীর ভাই-এর নিজস্ব নয়।

॥১২৩॥

নাগরপুরের এমসিএ সাহেব ঢাকা গ-৫০২৬ নং জীপ গাড়ীটি রিলিফ বিতরণের কাজে নিয়ে নিজেই ব্যবহার করেছেন। মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়ে দরিদ্র যুবকরা সর্বস্বান্ত হলেও ব্যবসা-বাণিজ্যের সব সুযোগ থেকে তারা বঞ্চিত হয়েছে। এ এলাকার 7o'clock ব্লেডের লাইসেন্স, এ আলমাস খানের নামে এমসিএ সাহেব ২৫,০০০ ব্লেড ঢাকা থেকে নিয়েছেন। তাছাড়া নিজের নামে একটি কোম্পানী খুলে আরো কিছু লাইসেন্সও বাগিয়েছেন।

॥১২৪॥

পরিত্যক্ত বাড়ী ছেড়ে দেবার পনের দিনের মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার পরেও সুনামগঞ্জের আওয়ামী লীগের নেতা জাকমল আলী ও পাজী উদ্দিন আজও দুটি দখল করে রেখেছেন।

॥১২৫॥

বাংলাদেশে ভারতীয় সৈন্য নেই কিনা তাই জনসাধারণ সেদিন অপ্রতিভ হয়ে ঢাকার ডিক্টোরিয়া পার্কের পশ্চিম-উত্তর কোণে তিনজন ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীসেনাকে খুটিয়ে খুটিয়ে দেখে নিলেন। বিএসএফ তিনটি জান্ত ছিল, সচল ছিল, কথা বলছিল। পোশাকের আস্তিনার বাজুতে বাঘের ছবি থাকলেও 'বিএসএফ' খোদাই করা পিতলের চিহ্ন ছিল কাঁধে। হাতে তাদের স্টেনগান ছিল। দুজন কৃশ, একজন বৃষ কোথাও যাবার জন্য কথা বলছিল তারা একজন উত্তর দিল, কুই ফায়দা হোগা নেই। খাসা হিন্দী। তারিখটি ছিল ২০শে জুলাই। সময় ১২টা ২ মিনিট।

ফ, কা চৌধুরীর পেটুয়া এখন মুক্তি কমান্ডার

ফ, কা চৌধুরীর নির্বাচনী প্রচারক ও অফিস সম্পাদক কন্ট্রাক্টর পুত্র ফজলুল হক মুসলিম লীগের তহবিল তসরুপের দায়ে বিতাড়িত হয়েছিল। এখন হাটহাজারী থানার দোর্দণ্ড প্রতাপ মুক্তি কমান্ডার তিনি। সীমান্ত পেরিয়েই তার হাতে আলাদীনের চেরাগ এসেছে। কুখ্যাত দালাল সামসুল হুদা চৌধুরী ৪৭ হাজার টাকার বিনিময়ে তার কাছ থেকে রেহাই পেয়েছে। হাটহাজারীতে ৬০ হাজার টাকা দামের একখানা প্রেসও তিনি বাগিয়েছেন, ব্যাংক ব্যালেন্স দাঁড়িয়েছিল ৬৭ হাজার টাকায়, বাড়ীতে তার নতুন বিল্ডিং উঠেছে, ১৩০ জন রাজাকার মাথাপিছু ৩০০ টাকা করে উৎকোচ দিয়েছে। ফলে থানা থেকে জামিনে দেয়া হয়েছে মুক্তি। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে কতিপয় মুক্তিযোদ্ধা একদিন তাকে ঘেরাও করলে তিনি ভাগ দেবার কথা বলে সে যাত্রা বেঁচে যান।

ফ, কা চৌধুরীর একখানা লাল টয়োটা জীপ এখন তার দখলে। হাটহাজারীর বিভিন্ন স্থানে ডাকাতির সময় একখানা লাল টয়োটা জীপকে তৎপর দেখা যায়।

মুক্তিবাহিনীর নামে এই স্বেচ্ছাচার কতদিন চলবে জনসাধারণ জানতে ইচ্ছুক।

পাঠকের অভিমত

সন্ধানীর জবাবে

২৬শে জুন সোমবার 'ইত্তেফাকের ঘরে বাইরে' বিশেষ নিবন্ধে জনাব 'সন্ধানী' যে বিতর্কমূলক আলোচনা করেছেন তা অশিষ্ট,

পক্ষপাতদুষ্ট এবং বিদ্বেষ প্রসূত বলে আমাদের মনে হয়েছে। 'হক-কথা'র সম্পাদক সৈয়দ ইরফানুল বারীর গ্রেফতারকে কেন্দ্র করে জনমনে যে আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে তাকে নিছক ভ্রান্তি বলে অভিহিত করে সেই ভ্রান্তি (!) দূরীকরণার্থে এই সবজান্তা লেখক যে বিদ্বেষ ছড়িয়েছেন তা অসঙ্গত, অসৌজন্যমূলক এবং সম্পূর্ণ অমানবিক। একজন সাংবাদিকের পক্ষে অপর একজন সাংবাদিককে এমন অভদ্র ও হিংস্রভাবে আক্রমণ করা কিরূপে সম্ভব হয় তা অনুধাবন করা সত্যই আমাদের পক্ষে কষ্টকর। 'সন্ধানী'র নিজের উক্তির কয়েকটি নমুনা দেখুন– সম্পাদক 'ইরফানুল বারী' সম্পর্কে মন্তব্য করতে যেয়ে ভদ্রলোক (!) লিখেছেন, "মোনেম খাঁর এই আত্মীয়টি সাংবাদিকতার নামে যেসব কাণ্ডকীর্তি করেছিলেন তাতে ঘোড়ার পক্ষেও হাসি সম্বরণ করা সহজ ছিল না।" সৈয়দ ইরফানুল বারীর সাংবাদিকতা সম্পর্কে আরো কটুক্তি করে তিনি লিখেছেন– "ছাগল দিয়ে যদি হাল চাষ করা যেতো তাহলে মানুষ হালের গরু কিনতো না।" এ ছাড়াও লেখক কোন কারণ না দেখিয়েই জনাব বারীকে 'গোবর গনেশ সম্পাদক' 'গো-বর্ধন সম্পাদক' ইত্যাদি অশালীন বিশেষণে ভূষিত করেছেন। কিসের সন্ধান করতে যেয়ে সন্ধানী একটা বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিকের সম্মানিত সম্পাদককে এরূপ নির্লজ্জভাবে আক্রমণ করেছেন আমাদের জানা নেই, কিন্তু এতে করে তার যে ব্যক্তিগত আক্রোশ ও কদর্য মানসিকতার পরিচয় মিলে তাকে ধিকৃত না করে পারা যায় না। আর এরূপ ব্যক্তিগত অশালীন উক্তি পত্রিকায় প্রকাশের সম্পূর্ণ অযোগ্য বলেই আমরা মনে করি। জনাব ইরফানুল বারী কেমন ব্যক্তি বা তিনি সত্যই দালাল শ্রেণীর কিনা তা প্রমাণ সাপেক্ষ। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিজেই বলেছেন, হক-কথা সম্পাদকের নয় মাসের ক্রিয়াকলাপের সঠিক সন্ধান নেওয়া হচ্ছে।" তাহলে লেখক তার দালালীর সুস্পষ্ট প্রমাণ পেলেন কোত্থেকে? তিনি গ্রেফতার হয়েছেন এটাই বোধহয় তার অপরাধের প্রমাণ? না, লেখকের হাতে আরো ধ্রুব একটা প্রমাণ রয়েছে যেটাকে তিনি বার পাঁচেক প্রয়োগ করে নিজের প্রমাণকে নির্ভেজাল করে ছেড়েছেন তা হলো, সৈয়দ ইরফানুল বারী নাকি মোনেম খাঁর একজন আত্মীয়। কিন্তু একজন অপরাধীর আত্মীয় হওয়াই যে একটা অপরাধ নয় এই ছোট কথাটি সন্ধানীকে কে বুঝাবে? এখানেই শেষ নয়, পাক-হানাদারদের ধ্বংসযজ্ঞ শুরু হওয়ার পর মওলানা ভাসানীর দেশ ত্যাগের যে বিবরণ সম্প্রতি 'হক-কথা'য় প্রকাশিত হয়েছে তাকে লেখক বাহরাম সিরিজের কল্পিত কাহিনী বলে টিটকিরি দিয়েছেন। আবার পাঠকদের প্রতিভূ হিসেবে নিজেই নিজের অসার যুক্তির পক্ষে রায়ও দিয়েছেন। সত্যি চমৎকার! আমি একজন সামান্য পাঠক হিসেবে এই সবজান্তা লেখক সাহেবকে প্রশ্ন করি, আপনি কি বিগত মুক্তিযুদ্ধের কোন খোঁজ রাখেন? যদি রাখতেন তাহলে বুঝতে পারতেন শিশুপাঠ্য বাহরাম সিরিজের চেয়ে তা' ছিল অনেক বেশী লোমহর্ষক। সম্পাদক ইরফানুল বারী বা লেখক 'সন্ধানী' কারো প্রতিই আমার ব্যক্তিগত বিদ্বেষ নেই, কারণ এরা কেউই আমার অন্নে ভাগ বসাতে আসছেন না, আমার জিজ্ঞাসা শুধু এটুকু সাংবাদিকতার নামে এরূপে কাদা ছুঁড়াছুড়ি আর কতদিন চলবে? তাছাড়া একটা অভিজাত সংবাদপত্রের সম্পাদকীয়তে এমন সব অর্ব্বাচীনদের উষ্ণ মস্তিষ্কের তৃতীয় শ্রেণীর উদ্ভট সৃষ্টি কিরূপে স্থান পায় তা আমাদের কল্পনাতে আসে না।

ত্রিশ লক্ষ লোকের রক্ত পথ পেরিয়ে আমরা সদ্য স্বাধীনতার তীরে এসে পৌঁছেছি। বিধ্বস্ত এই দেশ, বিপন্ন এই জাতিকে সঠিক পথে চালিত করার কাজে আমরা সংবাদপত্রের কাছ থেকে আজ অনেক কিছুই আশা করি। বীরত্বময় মূঢ়তার জঞ্জাল ফেলে দিয়ে সুস্থ্য মানসিকতা সৃষ্টি শাশ্বত সত্যের স্ফুরণের জন্য সাংবাদিকগণ নির্ভিকভাবে এগিয়ে আসবেন এটাই দেশবাসীর কাম্য। সেস্থানে সংবাদপত্র যদি ব্যক্তিগত বিদ্বেষ, গোষ্ঠী বিশেষের গুণকীর্তন আর মোসাহেবীর উৎস হয়ে উঠে তার চেয়ে পরিতাপের বিষয় আর কি হতে পারে? অথচ একথা সবাই স্বীকার করবেন যে বিগত দিনগুলিতে বাঙালী জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার পিছনে ইত্তেফাকের একটা সক্রিয় ভূমিকা ছিল। প্রাক-স্বাধীনতা যুগে যখন নির্ভেজাল সত্য স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি প্রচার প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছিল সে ক্ষণেও 'ইত্তেফাকের' ভীমরুলের মিটে কড়া 'মুসাফিরের রাজনৈতিক মঞ্চ' বাঙ্গালীর কাণে যুগিয়েছে নতুন উদ্দীপনা, শুনিয়েছে নতুন আশার বাণী। আজ দেশ যখন স্বাধীন, যখন সংবাদপত্র নিজস্ব মতবাদ প্রচারের অধিকার পেয়েছে, সেক্ষণে শ্রদ্ধেয় তোফাজ্জল হোসেনের সেই ইত্তেফাকের ভূমিকা দেখে খাঁটি কথাই মনে হয়– হায় মুসাফির! হায় চমৎকার!

মোঃ সা, চৌধুরী

এমসিএ-টি বিধবা নারীর টাকা মেরে দিয়েছেন

মাগুরার মাগুরা থানার এমসিএ সরকার প্রদত্ত সহায় বিধবা নারীর দু'হাজার টাকা মেরে দিয়েছেন। সুবল অধিকারী নামক জনৈক মুক্তিযোদ্ধা বিগত যুদ্ধের সময় পাক-বাহিনীর জল্লাদদের হাতে মারা যাবার পর তার স্ত্রী জয়ন্ত্রী রাণী অধিকারী প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে সাহায্য চেয়ে দরখাস্ত করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী তার জন্য দু'হাজার টাকা মঞ্জুর করে টাকার চেক মাগুরার মহকুমা প্রশাসকের কাছে প্রেরণ করেন। জয়ন্ত্রী রাণী প্রধানমন্ত্রীর চিঠি পেয়ে চেকটি মহকুমা প্রশাসকের কাছ থেকে নিয়ে ব্যাংকে ভাঙ্গাতে গেলে ব্যাংক-কর্তৃপক্ষ স্থানীয় এমসিএ-র স্বাক্ষর ছাড়া তাকে টাকা দিতে অস্বীকার করেন। পরে তিনি এমসিএ-র কাছে স্বাক্ষর আনতে যান। এমসিএ জয়ন্ত্রী রাণীর স্বাক্ষর রেখে চেকের অর্থ তাকে পরে দেয়া হবে বলে জানিয়ে দেন। কিন্তু প্রায় তিন মাস কেটে গেলেও এখনো জয়ন্ত্রী রাণী তার প্রাপ্য অর্থ পাননি।

প্রধানমন্ত্রীর মঞ্জুরীকৃত দু' হাজার টাকা এমসিএ মেরে লোপাট করে দেয়ার পরিণতিতে এখন অসহায় জয়ন্ত্রী রাণীকে অন্যের বাড়ীতে কাজ করে খেতে হচ্ছে।

আসলে কেসটি ভয়ঙ্কর

পাবনার জেলা প্রশাসকের কাছে প্রেরিত এক অভিযোগপত্রে পাবনার ঈশ্বরদী এলাকার জনসাধারণ চোরাচালানের মালসমেত চোরকারবারীকে ছেড়ে দেবার রহস্য জানতে চেয়েছেন। প্রকাশ, দেড় লক্ষ টাকার ভারতীয় সুতা ও অন্যান্য সামগ্রীসহ ভারতের জলঙ্গী বাজার নিবাসী শিউ কিষণ ও পাবনার তোরাপ আলী ধরা পড়ে চালান হয়েছিল। ২৭শে জুন তারা বমাল খালাস পেয়ে গেছে। এর মধ্যে সিক্সটিন ডিভিশন, চলতি লীগ এবং পবিত্র ইনস্টিটিউট জড়িত আছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। পবিত্র ইনস্টিটিউটে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি সম্পর্কেও জনমনে সন্দেহ দেখা দিয়েছে।

সম্পাদক ঃ সৈয়দ ইরফানুল বারী, ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ঃ মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, মুদ্রণ ঃ শান্তি প্রেস, সন্তোষ, টাঙ্গাইল।

প্রতি কপি পঁচিশ পয়সা সাপ্তাহিক চাঁদার হার : ষান্মাসিক-৬.০০ বার্ষিক-১০.০০

হক-কথা

(WEEKLY THE HAQ-KATHA)

প্রকাশক ও পৃষ্ঠপোষক ঃ মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

প্রথম বর্ষ ২৩ তম সংখ্যা শুক্রবার ১৯ শ্রাবণ ১৩৭৯ ঃ ৪ঠা আগষ্ট ১৯৭২ ২৩ শে জমাদিউসানী ১৩৯২; সন্তোষ, টাঙ্গাইল

বাংলাদেশ নিয়ে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র

লন্ডনে কি ঘটতে চলেছে?

শেষ মুহূর্তে রাশিয়ার পার্টি প্রধান, প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর মত তিনজন জাঁদরেল লোক বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবকে চিকিৎসা করার প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন, ঢাকা বা মস্কো যেখানে খুশি সর্বোত্তম চিকিৎসার নিশ্চয়তা দিয়ে।

রোগী নিয়ে টানাটানির নজীর, রাজনীতির ইতিহাসে কম নয়। বুদ্ধিমান ইংরেজ মোঘল বাদশাহর অগ্নিদগ্ধ কন্যাকে নিরাময় করে পেয়েছিল কুঠি স্থাপনের জন্য স্থান। সেই মুজিবের পেটে পাথর জমেছে বলে ডাক্তারগণ যেদিন ঘোষণা দিলেন, তার পরদিনই লন্ডন বিবিসি বল্‌লো, তিনি আসছেন, এখানে আয়োজন আর সব কিছু হয়ে গেছে। ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিং অবশ্য রাশিয়ার ভাগ্য বিপর্যয়ের স্থান কায়রো ঘুরে দিল্লী প্রত্যাবর্তনের আগে আগে লন্ডন গিয়েছিলেন। বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিউমের সাথে তার আলোচনা হয়েছে বাংলাদেশ সম্পর্কে। এরপর সম্প্রসারিত ইউরোপীয় কমনমার্কেট (কমন

প্রধানমন্ত্রীর অপারেশন সাকসেসফুল হলেও বাংলাদেশে রাশিয়ার রাজনৈতিক অপারেশন ব্যর্থ হতে চলেছে।

পিড়ির কোণে বসে মুলুক তারা দখল করে নিয়েছিল।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মার্কিন স্ট্যাট্রেজি পরিবর্তনের সাথে লন্ডনে শেখ মুজিবের উপস্থিতির যোগসূত্র রাশিয়ানরা খুঁজে পেয়েছে। এক্ষেত্রে শেখ মুজিবকে বয়ে নেবার জন্য ভারতীয় বিমান দানের ঘটনা থেকেও রাশিয়ানরা ভারতের ভূমিকা পরিবর্তনের ইঙ্গিত পাচ্ছে।

মার্কেট মার্কিন স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর থাকলেও বৃটেনের চেষ্টায় ওটাকে সম্প্রসারিত ও পরিবর্তিত করার পর আমেরিকার পথের কাঁটা ভোতা হয়ে গেছে)-এর প্রেক্ষিতে ৩১টি কমনওয়েলথ দেশের বৈঠক শুরু হয়েছে লন্ডনে। ভারত এই জোটের সাথে সহযোগিতা করে অথর্ব সিংহ বৃটিশকে টুপাইস ঘুষ দিতে রাজী। সেই সুবাদে বাংলাদেশকেও কিছু গচ্চা দিতে হবে। বৃটেন এশিয়ায় আমেরিকার আখের গুছিয়ে দেবার মধ্যস্থতায় নেমে নিজের আখেরটাও গুছিয়ে নিচ্ছে কিছু কিছু।

শেখ মুজিবর লণ্ডন রওয়ানা হবার পর পররাষ্ট্রমন্ত্রী সামাদ সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে বুঝাতে চেষ্টা করেন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া নিয়ে 'সয়া সিয়োটা' হচ্ছে না। হলে হবে নির্দোষ অর্থনৈতিক জোট। আর এ জোটের ফাবিননামা সম্পাদিত হবে বৃটেনের মাটিতে।

রাশিয়ার নাকের ডগায় এসব ঘটে গেল। আসল রোগ চিকিৎসার চেষ্টায় রোগী আটকাবার কোশেশ সে করেছে। কিন্তু ভারতীয় পক্ষীরাজ তখন দিয়েছে চম্পট।

নড়াইলে বামপন্থী হত্যা চলছে

নড়াইলে প্রগতিশীল কর্মীদের উপর ফ্যাসীবাদী সরকার হামলা অব্যাহত রেখেছে। সমগ্র মহকুমায় ন্যাপ ও বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের কর্মীদের ধরপাকড়, মিথ্যা মামলা, গুপ্ত খেলিয়ে দেওয়া ছাড়াও গুপ্তহত্যা, সন্ত্রাসলীলা শুরু হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধকালে নড়াইল অঞ্চলে জনগণের উপর নির্ভর করে যারা গড়ে তুলেছিল প্রতিরোধ সংগ্রাম আজ তারাই ক্ষমতাসীন সরকারের সরকারী ও প্রাইভেট বাহিনীর হাতে মারা পড়ছে। সুপরিকল্পিত হত্যাযজ্ঞ দেখে অনুমিত হচ্ছে এটা বামপন্থী নিধনের ভারতীয় পরিকল্পনারই অংশ। জনসাধারণ ফ্যাসিস্টদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছে।

রিলিফ মালের বিপণি কেন্দ্র

সিলেটের বালাগঞ্জ থানার দয়ামীর বাজারে বিত্তশালী ও প্রভাবশালী মহাজন রানা মিয়ার দোকানে রিলিফের মাল পাওয়া গেছে। লোকটির আসল বাড়ী ভারতের কালিগঞ্জে। তার ভাই জাতিসংঘের ট্রাকচালক। সে সুবাদে না হোক, সেই সূত্রে ২০০ কম্বল, ১৮৭ খান ত্রিপল, ১২ টিন সর্ষের তেল তার দোকানে হাজিরা দিয়েছে।

আশ্চর্য উত্তরাধিকার

মৌলবীবাজার (সিলেট)। ২৩শে জুলাই। সামরিক শাসনের অধীনে তৎকালীন পাকিস্তান আমলে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের উপর মামলা দায়ের করা হয়েছিল বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে।

কাউকে কাউকে পাকিস্তানী পুলিশ গ্রেফতার করেছিল; সামরিক আদালতে তাদেরকে দণ্ডও দেয়া হয়েছিল।

বহুসংখ্যাক সামরিক শাসন বিরোধী তথা পাকিস্তান বিরোধী নেতা ও অসংখ্য রাজনৈতিক কর্মী আত্মগোপন করেছিলেন, তাদের মধ্যেও কাউকে কাউকে অনুপস্থিতিতে কারাদণ্ড দেয়া হয়েছিল।

মৌলবী বাজারের সমসের নগরের তৎকালীন সমসেরনগর চা বাগানের পাঞ্জাবী ম্যানেজার ঠিক এমনি একটি মামলা দায়ের করেছিল প্রখ্যাত চা শ্রমিক নেতা, সিলেটের গৌরব জনাব মফিজ আলীসহ কয়েকজন চা শ্রমিকের উপর। ঘটনা ঘটেছিল শ্রমিকদের ওভারটাইমের মজুরী নিয়ে। ম্যানেজার শ্রমিকদের ওভারটাইমের মজুরী দিতে অস্বীকৃতি জানালে চা শ্রমিকরা ধর্মঘটে নামেন, ফলে কয়েকজন চা শ্রমিক চাকুরী হারান। তারপর শুরু হয় ঘেরাও আন্দোলন। ম্যানেজারের নির্দেশে পাকিস্তানী পুলিশ গুলি করে হত্যা করে তিনজন চা শ্রমিককে।

কিন্তু ঘটনা এখানেই শেষ হয় না। ম্যানেজার অমার্জনীয় অপরাধ করেও সামরিক আদালতে মোকদ্দমা দায়ের করলে জনাব মফিজ আলীসহ কয়েকজন চা শ্রমিকের উপর জারী

হয় গ্রেফতারী পরওয়ানা।

প্রখ্যাত চা শ্রমিক নেতা মফিজ আলী আত্মগোপন করেন এবং জনতার মধ্যে থেকে বিপ্লবের মাধ্যমে বাংলাদেশকে স্বাধীন করার জন্য কাজ চালিয়ে যান।

ত্রিশ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে, লাখো লাখো মা বোনদের ইজ্জতের বিনিময়ে বাংলা আজ স্বাধীন। পাকিস্তানী নরপশুরা বাংলা থেকে বিতাড়িত। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস এখানেই। পাক-সামরিক চক্রের হাত থেকে বাংলা মুক্ত হয়েছে ঠিকই কিন্তু সামরিক আদালতে যে গ্রেফতারী পরওয়ানা হয়েছিল জনাব মফিজ আলী তা থেকে মুক্তি পেল না। পিতৃ সম্পত্তির মত উত্তরাধিকার সূত্রে বাংলাদেশ পুলিশ সামরিক আদালত (তৎকালীন পাকিস্তানের) জারীকৃত গ্রেফতারী পরওয়ানার বলে সম্প্রতি গ্রেফতার করলেন জনাব মফিজ আলীর সাথী জনৈক চা শ্রমিককে। মফিজ আলীকে আবার আত্মগোপন করতে হলো। হায়রে বিচিত্র দেশ, হায়রে বিচিত্র আইন, হায়রে আশ্চর্য উত্তরাধিকার।

পাশবিক

গত ২২শে জুলাই রাত্রি ১২টার সময় পোড়াবাড়ী পুলিশ ক্যাম্পের দুইজন সিপাই বড় বেলতা গ্রামের জনৈক রিক্সাচালকের বাড়ীতে ঢুকে তার খোঁজ করে। রিক্সাচালকের স্ত্রী জানায় যে তার স্বামী এখনও বাড়ীতে ফেরে নাই। পুনরায় আনুমানিক রাত্রি দুইটার সময় তিনজন সিপাই উল্লেখিত বাড়ীতে এসে রিক্সাচালকের স্ত্রীকে দরজা খুলতে বললে সে অস্বীকার করে। তখন লম্পট সিপাইগণ দরজা ভেঙ্গে ঘরে প্রবেশ করে এবং রিক্সাচালকের বয়স্কা কন্যাকে জোরপূর্বক আঙ্গিনায় এনে অত্যাচার করে। রিক্সাচালকের স্ত্রী এবং ছোট ছেলেমেয়েরা চীৎকার করলে তাদের মারধর করা হয় এবং গুলি করে মেরে ফেলার ভয় দেখানো হয়। ত্রিশ লক্ষ লোকের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন নাগরিকদের উপর পুলিশের এহেন জঘন্য অত্যাচারের বিচার হবে কিনা জনমনে আজ সেই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

জিলা বোর্ডের সরকারী ডাকবাংলা এখন জুয়া মদের আড্ডাখানা

ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোনা মহকুমার অন্তর্গত পূর্বধলা থানার রেলওয়ে স্টেশনের নিকট সরকারী ডাকবাংলা অবস্থিত। এই ডাকবাংলা এখন মদ, জুয়া এবং প্রমোদবালার আড্ডাখানায় পরিণত হয়েছে। সন্ধ্যার পরেই মাতালদের মাতলামি শুরু হয়ে যায়। এই আড্ডাখানার প্রধান নেতা হলো স্থানীয় এমসিএ-র সহোদর দজ্জাল মিয়া। সঙ্গে তার অনুগামী হলো নামধারী ছাত্রলীগের সদস্য তথা প্রাক্তন মুক্তিবাহিনীর থানা কমান্ডার, এমসিএ সাহেবের ভাগ্নী জামাই, তালুকদার, স্থানীয় সি ও অফিসের সুপার ভাইজার, স্থানীয় ছাত্রলীগ নেতা, স্থানীয় আইয়ুবী আমলের কুখ্যাত বিডি মেম্বার এবং বর্তমান রিলিফ কমিটির সদস্য বাবু ও আরো অনেকে। এদের মদ, মুরগী, মাংস এবং মেয়ে মানুষ আমদানী করে সি ও অফিসের পার্শ্ববর্তী বাড়ীর এক চোরবাবু। চোরবাবু মহাজ্ঞানী মহাজনদের জন্য নিজের পরমজনকেও ঐ আড্ডাখানায় পাচার করে। এরা চুপি চুপি যদি মদ খেতো তা সহ্য করা যেতো, কিন্তু মদ খেয়ে ভীষণভাবে মাতলামি শুরু করে দেয়। স্থানীয় স্টেশন বাজারের দোকানদারদের মারধর করে, তাদের দোকান ঘরের উপর লাঠি দিয়ে পিটাপিটি শুরু করে দেয় এবং দোকানের মালামাল ছিনিয়ে নিয়ে যায়। এ মাতালগুলো নিরীহ পথযাত্রীদের হয়রানি করে, পথযাত্রীদের এরা অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে। বর্তমানে এ মাতলামি এত চরম আকার ধারণ করছে যে, আশেপাশে নিরীহ জনসাধারণের এখানে বাস করাই দায় হয়ে পড়েছে।

চট্টগ্রামে দালালরা অবাধে ঘুরছে

অসহযোগ আন্দোলনের সময় পশ্চিম পাকিস্তান থেকে চার লাখ টাকার অস্ত্র এনে জামাত, মুসলিম লীগের পাণ্ডাদের কাছে তিনি বিক্রি করেছেন। ক্যান্টনমেন্ট থেকে অস্ত্র এনে গোপনে বিক্রি ছাড়াও প্রতি রোববারে উপঢৌকন নিয়ে ক্যান্টনমেন্টে তিনি ধর্ণা দিতেন। চট্টগ্রামে প্রতিরোধ যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ের পর ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট ও ইপিআর-এর ফেলে যাওয়া অস্ত্র তাঁর দোকানের রশিদমূলে পাচার হয়েছে। চট্টগ্রামে জমা দেওয়া ঐ নয় মাসের অস্ত্র লাইসেন্স, সাবেক পিআইএ-র কারগো রিপোর্ট, দোকানে সীল দেবার পূর্বে কাগজপত্র পরীক্ষা করলে এসব অভিযোগের প্রমাণ মিলবে।

ভারত গমনরত ক্যাপ্টেন খায়রুল বশিরকে ক্যান্টেনমেন্টে প্রেরণের ষড়যন্ত্রের তিনি হোতা, শান্তি কমিটির প্রভাবশালী সদস্য, জামাতে ইসলামীর আহ্বায়ক তিনি। সুলকবহর শান্তি কমিটির পরিচয়পত্রে তার ফটো ও সই পাওয়া গেছে। সুলকবহরে পাক-নেভীকে ডেকে আনার কাজও তিনি করেছেন। বহু মৃত্যুর জন্য তিনি দায়ী। আবদুর রহিম আরমস কোং-এর এই মালিক আজও অক্ষত দালাল। আইনে তিনি কি পড়েন না?

এই আবদুর রহিমের সহযোগী মোহাম্মদ হানিফ চকবাজার শান্তি কমিটির সদস্য ও শান্তি রক্ষীবাহিনীর কমান্ডার ছিলেন। পাঞ্জাবীদের এই সহচরটি আজও বুক ফুলিয়ে হাঁটছে।

নতুন লীগের হেফাজতী

চট্টগ্রামের ডবল মুরিং থানার লালখান বাজার এলাকায় নতুন লীগের টাউটরা বিহারীদের হেফাজতের নামে জঘন্য অপকীর্তি শুরু করেছে। স্বামীহারা নারী ও যুবতীদের 'রিলিফের' স্লিপ দিয়ে রাত দশটার পরে তলব চলছে। বৃদ্ধা ও কুৎসিৎদের ভাগ্য বিরূপ। প্রকাশ, বিহারী হেফাজতের জন্য নব্য টাউট কয়েকশত টাকা অঙ্কের মাশুলও আদায় করছে।

ক্যারু থেকে মদ চুরি

বিদায়ের আগে বাংলাদেশের ক্যারু এন্ড কোম্পানী থেকে ২ হাজার ক্যান ও ৪০ লাখ টাকার মদ ভারতীয় সৈন্যরা চুরি করে নিয়েছে।

বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে

'জয়বাংলা' আন্দোলনকালে ভারতের শোষক ও দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে লড়াই করে তিনি বাংলাদেশী উদ্বাস্তুদের অন্নের সংস্থান করেছিলেন। ভারতের জলপাইগুড়ি জেলার বৈরাতী পাড়ার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুশীলচন্দ্র রায়ের একমাত্র কামনা ছিল বাংলাদেশ সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রসর হবে, ভারতের রাহুগ্রাস তাকে সর্বস্বান্ত করবে না। ন্যায়বাদী এ ব্যক্তিটি কংগ্রেসী টাউটদের চক্রান্তে মিথ্যা মামলায় পড়ে দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। শিলবাড়ী আশ্রম ও প্রশিক্ষণ শিবিরের পৃষ্ঠপোষক সুশীলচন্দ্র বাংলাদেশের ন্যায্য স্বার্থের সমর্থক হওয়ার দরুণ ভারত সরকারের রোষে পতিত হয়েছেন। 'বঙ্গবন্ধুর' কাছে আইনগত সাহায্য ও উপদেশ চেয়ে তিনি পত্র লিখলেও তার উত্তর পাননি।

সন্তোষ ন্যাপ-এর কর্মীসভা

সম্প্রতি টাঙ্গাইল পৌরসভার অধীন সন্তোষ ইউনিয়নে জোয়াহের আলীর সভাপতিত্বে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির এক কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সভায় বক্তৃতা করেন জেলা ন্যাপ সাংগঠনিক কমিটির আহবায়ক জনাব গোলাম নুরুন্নবী ও বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির কেন্দ্রীয় সংগঠক জনাব মোহাম্মদ আলী প্রমুখ। জনাব শামছুল হককে সম্পাদক করে ২১ সদস্য বিশিষ্ট সন্তোষ ইউনিয়ন ন্যাপ কমিটি গঠিত হইয়াছে। সভায় এক প্রস্তাবে জনপ্রিয় সাপ্তাহিক 'হক-কথা' সম্পাদকের আশু মুক্তি দানের জন্য সরকারের নিকট জোর দাবী জানানো হয়।

মুজিববাদী রিলিফ দখলের যুদ্ধ

সম্প্রতি তেজগাঁও থানার মাতুয়াইল গ্রামে রিলিফের ভাগবাটোয়ারা নিয়ে এলএমজি, এসএলআর ও স্টেনগানে সুসজ্জিত দুই দল মুজিববাদীর মধ্যে এক সংঘর্ষ বাধে।

উক্ত গ্রামের এমসিএ সাহেবের একনিষ্ঠ ভক্ত রিলিফ কমিটির চেয়ারম্যান ও এমসিএ সাহেবের ছোট তরফের মধ্যে ৮০ বান টিন, ৪ বস্তা চিনি ও বিগত ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থ জনগণের সাহায্যের টাকার ভাগ-বাটোয়ারকে কেন্দ্র করেই ঘটনার সূত্রপাত হয় এবং গ্রামের মুজিবাদীগণ দুই দলে বিভক্ত হয়ে হাতাহাতি, লাঠালাঠি এবং এক পর্যায়ে পিস্তলের গুলি ছুড়াছুড়ি শুরু করে।

পরের দিন রিলিফ কমিটির চেয়ারম্যান দলবলসহ মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বিপক্ষ দলের বাড়ী ঘেরাও করে প্রকাশ্য দিবালোকে এলোপাথারী গুলি ছুঁড়তে থাকেন। পরিণতিতে কাসেম নামক একজন নিরীহ গ্রামবাসী আহত হয়। গ্রামবাসী ক্রুদ্ধ হয়ে তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালে চেয়ারম্যান সাহেব সদলবলে রণে ভঙ্গ দেন।

পুলিশ বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করে চেয়ারম্যান সাহেব ও তার কতিপয় সাঙ্গপাঙ্গকে পুলিশী হেফাজতে রাখে। কিন্তু পরে এমসিএ সাহেবের বদৌলতে তারা পুলিশী হেফাজত থেকে শুধু ছাড়াই পাননি, বর্তমানে বহাল তবিয়তে অস্ত্র কাঁধে নিয়ে ঘুরেও বেড়াচ্ছেন।

পরে জনতার চাপে এমসিএ সাহেব এলাকায় জনসভা আহ্বান করে সবাইকে অস্ত্র জমা দেওয়ার আহ্বান জানালে মুজিববাদী আঃ মতিন তার কাছে একটি স্টেনগান জমা দেন।

একটি ম্যাচ ফ্যাক্টরীর অভ্যন্তরে

ঢাকা ম্যাচ ফ্যাক্টরীর শ্রমিকদের তরফ থেকে জানা গেছে যে, ঢাকা ম্যাচ ফ্যাক্টরীর ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের বর্তমান নেতৃবর্গ 'ঢাকা ম্যাচ ফ্যাক্টরীর' শ্রমিকদের 'ভাগ্যবিধাতা' হয়েও বিভিন্ন প্রকার দুষ্কর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের এই দুষ্কর্মে যাদের তরফ থেকে বাধা দানের এতটুকু সম্ভাবনাও আছে বলে তারা মনে করে তাদের কাউকেই ফ্যাক্টরীর অভ্যন্তরে ঢুকতে দেয় না। তারপরেও যারা তাদের এই অপকর্মে বাধা দান করবে তাদের ঠেঙ্গানোর উদ্দেশ্যে প্রায় চারিশত গুণ্ডা তৈরী করে রেখেছে। এরা কখনও কোন উৎপাদনে অংশগ্রহণ করেছে না, কিন্তু নিয়মিতভাবেই হাজিরা ও বেতন পাচ্ছে।

এই সমস্ত অপকর্মের প্রধান প্রধান হোতা হচ্ছে ১৪ জন, সবাই শ্রমিক লীগ সমর্থক। এদের মধ্যে লুটপাটের স্বার্থ নিয়ে হানাহানির পরিণতিতে এরা তিনটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে যাওয়াতেই তাদের অপকর্মের ব্যাপারগুলো পৃথিবীর আলোবাতাস দেখতে পেয়েছে। এ পর্যন্ত তাদের দ্বারা সংগঠিত যে সমস্ত অপকর্মের বৃত্তান্ত জানা গেছে তার প্রধান প্রধানগুলো নিম্নরূপ ঃ

১। জাহাঙ্গীর মেটাল ইন্ডাষ্ট্রিজের একটি মেশিন বিক্রি করেছে। জাহাঙ্গীর মেটাল ইন্ডাষ্ট্রিজের বর্তমান নাম হলো শহীদ মেটাল ইন্ডাষ্ট্রিজ।

২। নয় লাখ টাকা আত্মসাৎ করেছে।

৩। পুরাতন রড এবং মেশিনারী পার্টস বিক্রি করে দিয়েছে এবং এর সমুদয় অর্থ আত্মসাৎ করেছে।

৪। ফ্যাক্টরী থেকে যে সমস্ত মাল বিক্রি হয় তার প্রতি 'গ্রুসে' এক টাকা করে কম লিখে 'উবৃত্ত' সমস্তই আত্মসাৎ করে।

৫। চিটাগাং গোডাউন থেকে সাবেক পাকিস্তান আমলের কেনা মাল (যা হাসান ব্রাদার্স কর্তৃক কেনা ছিল) ফ্যাক্টরীতে এনে মিথ্যা ভাউচার প্রস্তুত করে বিপুল পরিমাণ অর্থ আত্মসাৎ করে।

এই টাকার জোরেই পাণ্ডাদের একজন 'বিশপ' ষোল হাজার টাকায় আটার মেশিন ক্রয় করেছে, খান্নাস তার গ্রামের বাড়ীর চেহারা বদলিয়ে অপূর্ব সাজে সাজিয়েছে, ভিটাই তার বাড়ীতে দুইটি টিনের ঘর তুলছে, পবিত্রবংশ তার বাড়ীর রং বদলিয়ে জমি কেনায় ব্যস্ত, অপর একজন বাড়ী ঠিক করে জমিজমা বাড়িয়েছে, আরেকজন দালান তুলছে, বাকি দু'জনও মহাজ্ঞানী, মহাজনদের পথ ধরেছে।

এমনিভাবে 'সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ' নির্মাণ কার্যে এই লুটেরা নেতারা 'সাহায্য' করছেন। পাশাপাশি শ্রমিক ফেডারেশন কর্মী মান্নানকে সাতদিন আটকে রাখা, মফিজকে গেট থেকে মারধর করে তাড়িয়ে দেওয়ার মত গণতান্ত্রিক কার্যকলাপেও তারা অতিশয় সিদ্ধহস্ত।

সাইকেল মেকার সমিতির সভা

সম্প্রতি টাঙ্গাইলের সকল সাইকেল ও রিক্সা মেকারদের এক সাধারণ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে জনাব মতিয়ার রহমানকে সভাপতি ও জনাব এস এম রেজাকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করে টাঙ্গাইল জেলা সাইকেল মেকার শ্রমিক সমিতি গঠন করা হয়। সমিতির পরবর্তী এক জরুরী সভায় অত্র জেলায় সাইকেলের টায়ার, টিউব ও অন্যান্য দ্রব্যাদির দুষ্প্রাপ্যতা ও মূল্যবৃদ্ধিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় এবং অবিলম্বে দেশে উক্ত দ্রব্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধি বা বিদেশ থেকে আমদানী করে প্রকৃত সাইকেল ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে সুষ্ঠু বন্টনের ব্যবস্থা করার জন্য সরকারের নিকট জোর দাবী জানানো হয়।

গুপীগাইন-বাঘাবাইন ও কিছু নিরাশ্রয় পরিবার

রোম যখন পুড়ছিল সম্রাট নীরো তখন মনের আনন্দে বাঁশি বাজাচ্ছিলেন। ইতিহাসের পাতা থেকে সম্রাট নীরোর প্রেতাত্মা এখন এসে ভর করেছে নওগাঁর কিছু হৃদয়হীন গুপীগাইন আর বাঘাবাইনের স্কন্ধে। সম্প্রতি নওগাঁর উকিল পাড়ার শত্রুসম্পত্তি বলে ঘোষিত একটি বাসগৃহে মুক্তিযুদ্ধের সময় ঘর-বাড়ী হারানো নিঃস্ব ৫/৭টি পরিবার এসে আশ্রয় নেয়। এদের করো ঘর-বাড়ী নেই, কারো ভাই পাক-দস্যুদের হাতে নিহত হয়েছে, কেউবা পিতা বা স্বামী হারিয়ে পাগলিনীর মতো হয়ে পথে পথে ঘুরে অবশেষে এই গৃহে ঠাঁই নিয়েছিল। এই গৃহটি এক সময় মুসলিম লীগ অফিস ও পরে অবাঙ্গালী অধিকৃত ছিল। সরকারী এক নোটিশে ৭ দিনের মধ্যে বাড়ী খালি করার নির্দেশ দেয়ার পর এই আশ্রয়হীন মানুষগুলোকে তাড়িয়ে দেয়ার জন্য

কিছুসংখ্যক ভুঁইফোড় গুপীগায়েন ও বাঘাবাইন তাদের সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে এই বাড়ীতে হানা দিয়ে অসহায় পরিবারগুলোর উপর তর্জন-গর্জন চালাতে থাকে। "প্রতিটি নিরাশ্রয় পরিবারের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে" বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর এই প্রতিশ্রুতির প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রদর্শন করে আজ ছিন্নমূল মানুষের পুনর্বাসন দূরের কথা তাদের সাময়িক আশ্রয় থেকেও বঞ্চিত করা হচ্ছে। 'তাদের মাথা গুঁজবার শেষ ঠাঁই আজ রূপান্তরিত হচ্ছে' সঙ্গীতের আখড়ায়। মানুষ যখন দু'মুঠো অন্ন আর সামান্য একটু আশ্রয়ের অভাবে দিশেহারা, তখন এই নব্য তালেবানদের নির্মম সঙ্গীত শরাঘাতে তারা ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছে। কে এর জবাব দেবে, জনসাধারণ না বাংলাদেশ সরকার?

নড়াইলের গ্রামাঞ্চলে স্বেচ্ছাচার বাহিনীর ত্রাস সৃষ্টি

কিছুদিন পূর্বে নড়াইল মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র বণিকে প্রকাশ্য দিনের বেলায় কলেজ থেকে অপহরণ করা হয়। দু'দিন পরে তার মৃতদেহ পাওয়া যায়। সংবাদ নিয়ে জানা গেছে যে, কলেজ থেকে কয়েকজন দুষ্কৃতিকারী তাকে একটা গাড়ীতে করে নিয়ে যায়। সমস্ত দিন পাশের এক গ্রামের বাড়ীতে আটক রাখা হয় এবং সন্ধ্যায় সেখান থেকে নিয়ে গিয়ে নির্মমভাবে তাকে হত্যা করা হয়। বণি বাংলাদেশ বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের একজন বিশিষ্ট কর্মী ছিলেন। এ ব্যাপারে আজো কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি। সরকারী প্রশাসনযন্ত্র আশ্চর্যজনকভাবে নিষ্ক্রিয়।

গত ২রা জুলাই বাংলাদেশ বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের লোহাগড়া থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক আজিজুর রহমানকে অপহরণ করা হয়েছে। প্রকাশ্য দিবালোকে ১১টায় ট্রাকে করে নিয়ে যাওয়া হয়। শেষ সংবাদ পাওয়া পর্যন্ত তাকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। বেশ কিছুদিন থেকে লোহাগড়া থানায় আওয়ামী স্বেচ্ছাচার বাহিনীর কিছু দুষ্কৃতিকারী নানাবিধ সমাজবিরোধী কার্যকলাপ করে বেড়াচ্ছে। এদের নেতৃত্ব করছে কুখ্যাত শামছুল আলম। এ ব্যক্তি ২৫শে মার্চের পর নানারকম সমাজবিরোধী কার্যকলাপ করার দরুণ মুক্তিবাহিনীর অধিনায়ক ক্যাপ্টেন সাহাবুদ্দীন তাকে গ্রেফতার করে ধোলাই দেয় এবং মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেয়। অবশ্য সে পালিয়ে জীবন রক্ষা করতে সক্ষম হয়।

এ ব্যক্তিটি সদ্য বিধবা একজন অসহায় নারীর উপর এবং কিছুদিন আগে এক বেদে মেয়ের উপর অত্যাচার চালিয়েছে। এ দলটি গভীর রাতে বিভিন্ন বাড়ীতে হানা দিয়ে নারী নির্যাতন করছে। ঘুষ, জুয়া, মদ, নারী এদের নিত্যকার সাথী। সমগ্র লোহাগড়া থানায় এদের সন্ত্রাস চলছে।

প্রগতিশীল ছাত্র ও রাজনৈতিক কর্মীদের উপর এই স্বেচ্ছাচার বাহিনীর হামলা, হুমকি ও হয়রানি ক্রমাগত চলছে।

হক-কথা

১৯শে শ্রাবণ, শুক্রবার

শাসনতন্ত্র চাই

গত ৩০ শে জুলাই সন্তোষে মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ও কৃষক সমিতির কাউন্সিল অধিবেশনে অবিলম্বে কৃষক-শ্রমিকসহ শতকরা ৯৫জন মানুষের অধিকার সংরক্ষিত শাসনতন্ত্র প্রদানের দাবী জানানো হয়েছে। শাসনতন্ত্রের দাবী নতুন কিছু নয় বরং স্বাধীন বাংলাদেশে বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকেই সাড়ে সাত কোটি মানুষের ইচ্ছা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিধ্বনি করে মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী শাসনতন্ত্র প্রদানের দাবী জানিয়ে আসছেন। ৯ই এপ্রিল পল্টনের বিশাল জনসভায়, ২৯ শে ও ৩০ শে এপ্রিল শিবপুর কৃষক সম্মেলনে এবং বিভিন্ন সময়ে বক্তৃতা বিবৃতির মাধ্যমে তিনি এই দাবী পেশ করেছেন।

বহু পূর্বেই শাসতন্ত্র প্রদানের ওয়াদা ও বারবার সেই ওয়াদা ভঙ্গ হওয়ায় আমাদের শংকিত হবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। কেননা, দীর্ঘ পঁচিশ বছরের পাকিস্তানী আমলেও আমরা শাসনতন্ত্র নিয়ে এই বহুবিধ ওয়াদা এবং ওয়াদা ভঙ্গের খেলা দেখেছি। মূলতঃ পাকিস্তানী আমল এবং বর্তমান বাংলাদেশেও প্রধান সঙ্কট হচ্ছে শাসনতান্ত্রিক সঙ্কট। এই দীর্ঘ পঁচিশ বছরে এদেশের জনগণ কখনও এমন একটি শাসনতন্ত্র পায়নি যাতে শুধুমাত্র মুষ্টিমেয় গোটাকয়েক পরিবার আর আমলাদের স্বার্থ রক্ষার বদলে কৃষক-শ্রমিক মেহনতী মানুষসহ গোটা জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন রয়েছে। পাকিস্তান গঠিত হবার দীর্ঘ নয় বছর পর ১৯৫৬ সনে জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে যে শাসনতন্ত্র দেয়া হয় সেটাও জনগণের নয় বরং শোষক গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যেই প্রণীত হয়েছিল এবং সেই অর্থেই ছিল অপূর্ণাঙ্গ। কালো দশকের নেতা আইউব খান সেই সংবেধন নীলমণি শাসনতন্ত্রটিও বাতিল করে ১৯৬২ সনে যে নতুন শাসনতন্ত্র প্রদান করেছিলেন সেটা ছিল শাসনতন্ত্রের নামে সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের একটি কালো দলিল এবং একটি প্রকাণ্ড ধাপ্পা মাত্র। পরিণামে জনগণের স্বার্থের পরিপন্থী এই শাসনতন্ত্র নিক্ষিপ্ত হয় ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে।

শাসনতন্ত্রহীন দেশে ব্যক্তি স্বাধীনতা বিপন্ন হতে বাধ্য। হানাহানি, অরাজকতা এবং সরকারী দল ও আমলাদের ফ্যাসীবাদী মনোভাব গড়ে উঠার পেছনে শাসনতন্ত্রের অনুপস্থিতি কাজ করে মৌন সম্মতি হিসাবে। শাসনতন্ত্রহীন দেশে তা সে যত অল্প সময়ের জন্যই হোক না কেন স্বেচ্ছাচার আর ফ্যাসীবাদী শক্তির অঙ্কুর সরকারী দলের অস্থিমজ্জায় দ্রুত পল্লবিত হতে সাহায্য করে এবং বিরোধী দলের কার্যক্রম কখনও নিরাপদ থাকে না। পাকিস্তানী আমলে তাই শোষক গোষ্ঠীর স্বার্থ বজায় রাখার উদ্দেশ্যে এবং শক্তিশালী বিরোধী দল গড়ে উঠার পথে বাঁধার সৃষ্টি করার জন্য জনগণকে শাসনতন্ত্র থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছিল। পরিণামে শোষিত বাঙ্গালী জাতির তিলে তিলে জমে উঠা বিক্ষোভের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে কায়েমী স্বার্থবাদীদের শোষণের ঘৃণ্য মসনদ! পূর্বাঞ্চলের পাকিস্তান ঠাঁই পেয়েছে ইতিহাসের অতীত স্মৃতি চারণের পাতায়।

স্বাধীন বাংলাদেশে লক্ষ লক্ষ শহীদের আত্মদানকে ব্যর্থ করে দেবার চক্রান্তের ভাগাড়ে যে স্বেচ্ছাচার আর ফ্যাসীবাদের অসুর জন্ম নিচ্ছে তারই হিংস্র ইচ্ছার ইঙ্গিতেই হয়তো বাংলাদেশের শাসনতন্ত্র এখনও আলোর মুখ দেখতে পায়নি...তারিখ বদলাচ্ছে— দিন যাচ্ছে শাসনতন্ত্র প্রকাশ করা হচ্ছে না। গণপ্রতিনিধি বলে দাবীদার আওয়ামী লীগ প্রতিনিধিদের যদিও শাসনতন্ত্র প্রণয়নের কোন অধিকারই নেই, কেননা জল্লাদ ইয়াহিয়ার আইনগত কাঠামোর আওতায় নির্বাচিত প্রতিনিধিরা পাকিস্তানের কাঠামোর ভিতরে থেকে দফা ভিত্তিক দাবী তুলতে পারেন, স্বাধীন বাংলাদেশের শাসনতন্ত্র প্রনয়নের ক্ষমতা দেশবাসী তাদের দেয়নি, তবুও ক্ষমতার দাপটে সে অধিকার আদায় করে নিলেও জনগণ তা মেনে নিয়েছে মাত্র একটি আশায়। এমসিএগণ শতকরা ৯৫ জন মজলুম মানুষের স্বার্থ সংরক্ষিত শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করবেন। স্বাধীনতার পর এই দীর্ঘ নয় মাস তাই জনগণ শাসনতন্ত্র পাবার অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছে, আজো দিন গুণে যাচ্ছে।

একদিকে জনগণের এই প্রত্যাশা, অন্যদিকে আওয়ামী লীগ সরকার নিজের দেয়া সময় সীমা নিজেরাই লংঘন করে চলেছেন। দেশের জ্ঞানীগুণী এবং বিশেষজ্ঞদের অবহেলা করে এবং নিজেদের জ্ঞানের অভাব এবং সীমাবদ্ধতার পর্দা উন্মোচন করে নিজেদের অক্ষমতার উলঙ্গ প্রকাশ ঘটিয়ে আইনমন্ত্রীসহ কয়েকজন 'শাসনতন্ত্রকে' দিল্লী সফর করিয়ে এনেছেন সেখানকার শাসকগোষ্ঠীর অনুমতির সীলমোহর পরিয়ে; প্রয়োজনীয় রদবদল করে। তবুও জনগণ ধৈর্য ধরেছে। মওলানা ভাসানীর শাসনতন্ত্র প্রদানের দাবী আজ সাড়ে সাতকোটি মানুষের দাবীতে পরিণত হয়েছে। মওলানা বলেছেন-উৎপাদনের সর্বনিম্ন ইউনিট হবে গ্রাম পঞ্চায়েত। পঞ্চায়েতের মোট আয়ের শতকরা ৫ ভাগ পাবে সরকার আর ৬৫ ভাগ ব্যয় হবে স্থানীয় জনগণের জন্যে। বাকি ৩০ ভাগ থেকে ৫০ বছরের বেশী বয়স্কা মহিলা, ৬০ বছরের বেশী বৃদ্ধ এবং ১৮ বছরের কমবয়েসী বালক-বালিকা ও এতিমদের জন্য খরচ হবে।

মওলানা বলেছেন-নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কৃষক-শ্রমিক মেহনতি মানুষ অর্থাৎ শতকরা পচানব্বই জনের স্বার্থ সংরক্ষিত শাসনতন্ত্র দেয়া না হলে দুর্বার গণআন্দোলন গড়ে তোলা হবে। আর সে আন্দোলনের পরিণাম কি হবে আইউব-এহিয়ার পরিণতি সে দিকেই অঙ্গুলী নির্দেশ করছে-।

মিশর

মিশর থেকে রাশিয়ার ২০ হাজার সৈন্য বিতাড়িত হয়েছে। মিশরে সমাজতন্ত্রের ডিম তা দেবার জন্য দু'একজন নয়, বিশেষজ্ঞ উপদেষ্টা নামের ২০ হাজার রাশিয়ান সৈন্য বাসা বেঁধে নিয়েছিল। এতদিন শোনা যেত এরা আছে। সংখ্যা কত, ব্যাপ্তি কত, এগুলি কিছুই জানা সম্ভব হয়নি। রাশিয়ার পীরিতে আকণ্ঠ মজে মজে মিশর সমাজতান্ত্রিক স্বর্গের নজদিগ্ পৌছানোর কথা।

কিন্তু এখন দেখা গেল, রিপাবলিক মিশর গত ১৫ বছরে যে সাবালকত্ব অর্জন করেছে সেটা আমেরিকার গলায় ঝুলে পড়ার সাবালকত্ব। সমাজতন্ত্রের ডিমে দীর্ঘ পরিকল্পনা নিয়ে তা দিয়ে মিশর পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের উপর নির্ভরশীলতার বাচ্চা ফুটিয়ে দিয়েছে।

মিশরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদত বাইরের অঙ্গুলি নির্দেশে আর পথ চললেন না, সম্প্রতি আরব 'স্যাশ্যালিস্ট ইউনিয়ন' নামক একমাত্র মিশরীয় রাজনৈতিক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির অধিবেশনে এ হুঙ্কার দেবার পর মিশর সরকার মিশরের আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকা ২০ হাজার রাশিয়ান সৈন্যকে সসম্মানে ঘাড় ধরে বের করে দিয়েছে। মিশর এতদিন রাশিয়ার সাথে ঘর করলেও রাশিয়ান শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতির বদৌলতে আমেরিকার সাথে গোপন সম্পর্ক বজায় রেখে আসছিল আর ঘরের লোকটির সাথে সম্পর্ক চুকানোর পর মিশর এখন পরকীয়া সম্পর্কে আমেরিকাকে আপন করে নিচ্ছে।

বিচ্যুত রাশিয়ান নেতৃত্ব ক্রুশ্চেভের আমল থেকেই স্বদেশে সমাজতন্ত্রের অপমৃত্যু ঘটিয়ে পুঁজিবাদের পুনঃবিকাশ ঘটিয়ে চলেছে। সমাজতন্ত্রের সমাধি রচনা করে তার উপরে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের সৌধ গড়েছে, মুখে চীৎকার করেছে, আমরা চূড়ান্ত সাম্যবাদ-অর্থাৎ কমিউনিজমে পৌছে গেছি। ফলে তার পররাষ্ট্র নীতির রূপ হয়ে দাঁড়ালো সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের তুল্য। সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার সাথে তার পার্থক্য রইলো, আমেরিকা গণতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্রের কথা বলে চালায় অভিযান আর রাশিয়া সমাজতন্ত্রের সানাই বাজিয়ে শোষণ ও শাসনের জন্য দুর্বল দেশগুলোকে কব্জা করে।

সমাজতন্ত্র বিকাশের মূল সূত্র বা নিয়মকে রাশিয়া ভঙ্গ করেছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তার চরিত্রে এসেছে আপোষবাদ। শান্তিপূর্ণ উপায়ে

সমাজতন্ত্রে উত্তরণ লাভের থিওরী দিয়ে রাশিয়া সাম্রাজ্যবাদের এজেন্টদেরকে 'বিপ্লবী' ও 'সমাজতন্ত্রী' বলে সার্টিফিকেট দিয়ে তাদেরকে তাঁবেদারে পরিণত করার সহজতম খেলা শুরু করেছে।

রাশিয়ান সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা লেনিন বলেছেন এযুগে আর ধনিক শ্রেণীর নেতৃত্বে সমাজতন্ত্র কায়েম করা সম্ভব নয়। কায়েমের জন্য চাই সর্বহারার প্রশ্নাতীত একনায়কত্ব ও নেতৃত্ব।

ক্রুশ্চেভ ও বর্তমান ব্রেজনেভ-কোসিগিন রাশিয়ার এ সকল নেতা সাম্রাজ্যবাদী লিপ্সায় অধীর হয়ে লেনিনের এই প্রত্যাদেশকে উল্টে ফেলে প্রচার করছে যে, জঙ্গী ধনিক শ্রেণীর নেতৃত্বেও সমাজতন্ত্র আসতে পারে। ধনিক শ্রেণীর যে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র রয়েছে তারই মাধ্যমে ধীরে ধীরে যে কোন দেশকে সমাজতন্ত্রে পৌছে দেওয়া যায়। এ জন্য তারা আরেক থিওরী আবিষ্কার করেছে। সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা ও ব্রিটিশ বিভিন্ন দেশে পুঁজি ঢুকিয়ে তারই জোরে চালায় শোষণ-শাসন। রাশিয়া একই প্রকার শোষণে ভাগীদার হবার জন্য গরীব দেশে পুঁজি ঢুকাবার পথ একটা খুঁজে নিয়েছে। তারা বলছে, প্রগতিশীল দেশগুলিকে সমাজতান্ত্রিক দেশ থেকে বেশী থেকে আরও বেশী আর্থিক ও বৈষয়িক সাহায্য দেওয়া হলে ঐ দেশের অভ্যন্তরে আসল সমাজতান্ত্রিক শক্তিগুলো উপরে উঠে এলে দেশের ক্ষমতায় বসে সমাজতন্ত্রের মঞ্জিল মকসুদে দেশকে পৌছে দিতে পারে। এক কথায় তাদের বক্তব্য হলো ধনিক বুর্জোয়া শ্রেণী দয়া করে সমাজতন্ত্র দিতে পারে, এই দয়াকে ত্বরান্বিত করার জন্য সমাজতান্ত্রিক দেশকে ঐ সব দেশে সাহায্য ঢেলে দিতে হয়।

মজার ব্যাপার হলো, ধনিক শ্রেণীর পিঠে হাত বুলিয়ে প্রকারান্তরে তাদের দাপট বৃদ্ধি করার রাশিয়ান রাজনীতির ধ্বজা ধরে দেশে দেশে কমিউনিস্ট নামধারী মস্কোমুখী পার্টির জন্ম হয়েছে। এরা জন্মগতভাবে ধনিক শ্রেণীর পদলেহী ও দালাল। বাংলাদেশেও সেই আলামত দেখা যাচ্ছে। ধনিক শ্রেণীর রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের লেজুড়বৃত্তি করে রাশিয়ার অনুগত কমিউনিস্টরা সমাজতন্ত্র কায়েমের কোশেশ করছেন।

রাশিয়া ধনিকদের গায়ে গায়ে হাত বুলিয়ে যেনতেন প্রকারে সমাজতন্ত্র 'প্রতিষ্ঠা' করতে না পারলে সাহায্যের বস্তায় করে মক্কো থেকে সমাজতন্ত্র ও বিপ্লব রপ্তানী করার পক্ষপাতি। এটা যে একটা মস্তবড় অব্যর্থ ঔষধ, ক্রুশ্চেভ-ব্রেজনেভের স্বপ্নে পাওয়া মকরধ্বজ এতদিন সারা বিশ্বে মস্কোওয়ালারা এ কথাটা ঢোল সহরতে প্রচার করেছে।

মিশরের সমাজতন্ত্রের ডিমে রাশিয়া তা দিচ্ছিল

কিন্তু সমাজতন্ত্র রপ্তানীযোগ্য কোন পণ্য বা ধনিকদের খয়রাতি সামগ্রী নয়-এ সত্যগুলি রাশিয়ার অন্ধভক্তরা বুঝতে চায়নি।

মিশরে ২০ হাজার সামরিক অফিসার ও সৈন্য ঢুকিয়ে দিয়ে গত ক'বছরে ৭০ লক্ষ ডলার (৭ হাজার কোটি টাকা) সাহায্য দিয়ে, নাসের-সাদতের পিঠে পনের বছর যাবত তেল মালিশ করেও রাশিয়া মিশরকে সমাজতন্ত্রের কাছাকাছি নিতে পারেনি। বরং 'জ্বীনে পাওয়া' সুদর্শন ব্যক্তির দেহ যেমন দিন দিন শুকিয়ে কাঠ হয় মিশর দিন দিন তেমনি নির্জীব হয়ে পড়েছে। মনোবল ও নৈতিক শক্তি হারিয়ে ইসরাইলের হাতে শোচনীয় পরাজয় বরণ করেছে। দেশের ভিতরে অযথা সন্দেহ, ভীতি, আশঙ্কা জমে উঠেছে। রাশিয়ার হাতে পড়ে মিশরের জনগণের অবস্থা দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে। যেন এক আবদ্ধ জলাশয়, যেখানে পচা পানি যুগ যুগ ধরে অনড় হয়ে

আছে–মিশরের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনকে এমনি এক স্থবিরতার অভিশাপে অভিশপ্ত করে তুলেছে রাশিয়া। পুলিশ বাহিনীর চাইতে বড় গোয়েন্দা বাহিনীকে কাজে লাগিয়ে দেশের প্রতিটি শিক্ষিত ও সচেতন মানুষকে সারাক্ষণ উদ্বেগ, উৎকণ্ঠার মধ্যে নিবিষ্ট করেছে। এই আন্যোয়ার সাদত কিছুদিন পূর্বে একটি পিরামিডের পাদদেশে গোয়েন্দাদের তৈরী টেলিফোনের কয়েক মণ টেপরেকর্ড পুড়িয়েছেন– যাতে রেকর্ড করা ছিল জনসাধারণের বিশেষতঃ সচেতন ব্যক্তিদের কথোপকথন। এত করেও সমাজতন্ত্রে পৌঁছানো যায়নি বরং মিশরের গর্ভে রাশিয়ার সংস্পর্শে পুঁজিবাদের ভ্রূণ বেশ বিকশিত হয়ে উঠেছে। এই ভ্রূণ তার উপযুক্ত পিতা পেতে উদগ্রীব হয়ে উঠলে মিশর রাশিয়ার গলা ছেড়ে ঝুলে পড়েছে আমেরিকায় গলায়।

যে কোন দেশের সমাজের অভ্যন্তরে শোষক ও শোষিতের যে দ্বন্দ্ব বর্তমান থাকে, তার মীমাংসা না করে, বাইরে থেকে সমাজতন্ত্র চাপিয়ে দেওয়া যদি সম্ভব হতো, অথবা পুঁজিবাদের শক্ত মজবুত ঘাঁটির কপালে 'সমাজতান্ত্রিক দেশ'-এর লেবেল আটলেই সমাজতন্ত্র কায়েম হয়ে যেত তাহলে সমাজতন্ত্রের জন্য মানুষ যুগ যুগ ধরে জীবন দিত না।

মিশরের শিক্ষা বাংলাদেশের জনগণের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য শিক্ষা। মধ্যপ্রাচ্যে সত্যিকার বিপ্লবের সম্ভাবনাকে নিস্তব্ধ করে দিয়ে রাশিয়া ঐ একই তুক্ তাকের ভণ্ডামী নিয়ে দক্ষিণ এশিয়ায় নেমেছে। বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানকে সমাজতান্ত্রিক দেশে পরিণত করার জন্য রাশিয়ার পাতের গোটা মুড়োটা রাশিয়া ধনিক শ্রেণীর মুখে তুলে দিয়ে তোষামোদ শুরু করেছে। ধনিক শ্রেণীর গাল গড়িয়ে পড়া উচ্ছিষ্ট তৃপ্ত রাশিয়ান পেটেন্ট কমিউনিজমের ক্যানভাসাররা এর পেছনে দু'হাত তুলে ধেই ধেই করে নাচছে, আর বলছে, এসে গেল, এসেই গেল, সমাজতন্ত্র এসেই গেছে। এরপরে এতদঞ্চলক মিশর এরপর আলেন্দের চিলি, শেখ মুজিবের বাংলাদেশ, ইন্দিরা গান্ধীর ভারতে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে থাকবে। তবু প্রচার করা হবে, ঢোল সহরৎযোগে, মকরধ্বজ। মস্কাই মকরধ্বজ। বিনা অস্ত্রে অশ্ব-ভগর্দ্দরের অত্যাশ্চর্য চিকিৎসা পদ্ধতি-অতি সস্তায় মিলছে।

তাই বলতে হয়, নাকে কান্না এনে বলতে হয় ও মস্কো আর ঘুঘুবি কত-চোখে ঠুলি আটা বলদের মত।



স্বাধীনতার সীমা আছে প্রসঙ্গে-

জনাব

১২ই জুনের দৈনিক পূর্বদেশ পত্রিকায় ডঃ এবনে গোলাম সামাদ 'স্বাধীনতারও সীমা আছে' শিরোনামায় একটা নিবন্ধ লিখেছিলেন। শিরোনামা দেখেই মনে হয় ওটা শিরোনামা তো নয়ই যেন একটা দম্ভোক্তি। নিবন্ধটা পড়ার আগেই মনে হলো যেন বর্ধন কাকেও শাসিয়ে বলছেন 'স্বাধীনতারও সীমা আছে।' শিরোনামায় ব্যবহৃত 'স্বাধীনতা' শব্দটি ঢালাও অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে, অথচ পুরো বক্তব্যটা পড়লেই বোঝা যায় তিনি 'স্বাধীনতা' শব্দটি নিতান্ত রাজনৈতিক অর্থেই ব্যবহার করেছেন। কিন্তু ডক্টর সাহেব,

কোন ব্যক্তি বিশেষের কি অধিকার আছে, কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে স্বাধীনতার সীমা বেঁধে দেওয়ার? বিশেষতঃ যেখানে গণপরিষদের অস্তিত্ব বিরাজমান? জনাব সামাদ কি দেশের স্বাধীনতা (রাজনৈতিক স্বাধীনতা) মুষ্টিমেয় ক'জন অথবা সরকার ও সরকারের 'জ্বি হুজুর' মার্কা আমলাদের জন্যই মনে করেন? তিনি কি গণতান্ত্রিক দেশের সরকারকে সমালোচনার টুঁটি চেপে ধরতে বলেন?

প্রবন্ধের প্রারম্ভেই জনাব সামাদ গালভরা মাস্টারীসুলভ কয়েকটা কথা বলেই তাঁর বক্তব্যের সপক্ষে যুক্তি খাড়া করতে চেষ্টা করেছেন। তিনি যা বলতে চান তার সারমর্ম হলো দেশের কয়েকটা 'অতিবিপ্লবী' (?) পত্রিকা স্বেচ্ছাচারিতার মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রতি কটাক্ষ করছে। বিদেশী অর্থে পুষ্ট (?) এই সমস্ত পত্রিকা দেশের জনমত বিভ্রান্ত করছে। জনাব সামাদ সাহেবের প্রবন্ধে একটা বিশেষ পত্রিকার বিশেষ সংখ্যার উল্লেখ আছে। অথচ পত্রিকাটির নাম তিনি প্রকাশ করেননি। বোধহয় 'স্বাধীনতার' সীমারেখা আজও নির্দিষ্ট করা হয়নি বলে। সামাদ সাহেব, পত্রিকাটি কি দোসরা জুনের 'হক-কথা' নয়? উক্ত সংখ্যার সাপ্তাহিক 'হক-কথা'য় বলা হয়েছে বাংলাদেশ ভারত-রাশিয়ার ক্রীড়নক হয়ে উঠেছে এবং মার্কিন ডলারের কাছে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। কথাগুলি যদি বলাও হয়ে থাকে তবে তাতে বাংলাদেশের স্বার্থ বিরোধী কি কথাটি বলা হয়েছে জনাব সামাদ বলতে পারবেন কি? তিনি যদি চান যে বাংলাদেশ ভারত-রাশিয়ার ক্রীড়নক হয়ে উঠুক বা ডলারের কাছে বিক্রি হোক তবে অন্য কথা। কিন্তু কোন দেশপ্রেমিক তা' চায় না। তাই তার বিরুদ্ধে বলাটাও স্বাধীনতার প্রতি কটাক্ষ করা বা বাংলাদেশের স্বাধীনতা মেনে না নেওয়া নয়। উল্লেখিত সংখ্যার 'হক-কথা' আমরাও পড়েছি, তা'তে কয়েকটা তথ্য দেয়া হয়েছে। জনাব সামাদকে অনুরোধ করছি তিনি যেন পত্রিকাটি আবার পড়েন এবং গণতান্ত্রিক উপায়ে 'হক-কথা'য় প্রকাশিত তথ্যগুলি মিথ্যা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। সামাদ সাহেব প্রশ্ন তুলেছেন, বাংলাদেশ এতগুলি রাষ্ট্রের কাছে বিক্রি হচ্ছে কিভাবে? সাম্রাজ্যবাদীরা কূটকৌশলে কোন সম্পদশালী বিশ্বভূমি নিয়ে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয় এ কথা কি ডঃ সামাদ জানেন না? সাহেব তিনি আরেক জায়গায় বলেছেন 'হক-কথা' চীনের সপক্ষে প্রচারণা চালাচ্ছে। কোন সংখ্যায় এ ধরনের প্রচারণা রয়েছে জনাব সামাদ জানাবেন কি? বর্তমানে বাংলাদেশের এমন কোন পত্রিকাই নাই যা চীনের বক্তব্যের সপক্ষে প্রচারণা চালাচ্ছে। ভারতবর্ষ শোষণ ও লুণ্ঠনকারী তথাকথিত গণতান্ত্রিক দেশ বৃটেনের পক্ষে তো ফাসিস্ট মোজলোকে জেলে পোড়া সামান্য ব্যাপার! ডঃ সামাদ তথাকথিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বৃটেনের 'জালিয়ান-ওয়ালাবাগ' হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী হত্যাকারীদের সপক্ষে এবার কি যুক্তি আনবেন?

দু'একটা সমালোচনামূলক বিরোধী বক্তব্য থাকলেই কোন পত্রিকা বা ব্যক্তিকে 'স্বেচ্ছাচারী' বা 'স্বাধীনতার সীমা লঙ্ঘনকারী' বলা যায় না, বরঞ্চ একটা গণতান্ত্রিক দেশে সরকারের সমালোচনা অপরিহার্য ও অনস্বীকার্য। এ ধরনের সমালোচনায় সরকার জনপ্রিয়তা হারায় না বা জনমত বিভ্রান্ত হয় না। সামাদ সাহেবদের মতো ব্যক্তিদের কূট উদ্দেশ্যপূর্ণ উপদেশই গণতান্ত্রিক সরকারকে একনায়কত্ববাদী হতে এবং জনমতকে বিভ্রান্তির চোরাবালিতে নিক্ষেপ করতে সাহায্য করে।

–ইরতিশাদ উদ্দীন আহমদ
চট্টগ্রাম

যে যায় লঙ্কায়

জনাব সম্পাদক সাহেব

জনদরদ, গণদরদে যে সব ছাত্র ও শ্রমিক নেতা উথাল-পাথাল করতেন, নিজেদের দলকে ক্ষমতায় বসানোর পর তারা সবাই এখন আখের গোছাতে ব্যস্ত। দেশে আজ যে কোন সময়ের চাইতে বেশী দুর্নীতি ও লুটপাট চলছে। সাবেক আমলে উনিশ থেকে বিশ হলে যাদের সইতো না তারা আজ তিন আর উনাশিকে মেনে নিচ্ছেন কেমন করে? যে যায় লঙ্কায় সে হয় রাবন-এটাই কি তাহলে চোস্ত?

–এসএম **ইউসুফ**, ঢাকা

ব্যবসায়ী পাচারের নয়া ব্যবসা

চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জের জান মোহাম্মদ এন্ড কোং, আবদুর রাজ্জাক এন্ড কোং, আসাদগঞ্জের পাঞ্জাবী এন্ড কোং ও ইয়াসীন এসোসিয়েটেডের ন্যায় বহু অবাঙ্গালী প্রতিষ্ঠানের মালিকরা রাজনৈতিক দেবতাদের হাতে মোটা অঙ্কের টাকা গুজে দিয়ে ননকলাবোরেটর (দালাল নয়) সার্টিফিকেট যোগাড় করে সম্পত্তি, এমনকি দোকানপাটের পজিশন উচ্চমূল্যে বিক্রি করে লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে ভারতে পাড়ি জমাচ্ছে; এক শ্রেণীর আওয়ামী টাউট এই আয়োজনে শরীক হয়ে দেশের সম্পদ পাচারের বিনিময়ে কিছু পয়সা কামাই করছে।

ছাত্রনেতা গ্রেফতার

খুলনা জেলার দৌলতপুর থানার অন্তর্গত দেয়ানা ইউনিয়ন বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি জনাব নুরুল ইসলামকে পুলিশ অজ্ঞাত কারণে গ্রেফতার করেছে। সকাল-বেলা পুলিশ তার বাড়ীতে আকস্মিক হামলা করে। এ ব্যাপারে বহু বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের কর্মী ও স্থানীয় ছাত্র-জনতা খুলনার জেলা প্রশাসকের নিকট হাজির হয়ে তার মুক্তি দাবী করে। জেলা প্রশাসক উপস্থিত ছাত্র-জনতাকে আশ্বাস দিলেও আজ পর্যন্ত তার জামিন অথবা মুক্তির কোন ব্যবস্থা হয় নাই।

ট্যাক্সি স্ট্যান্ডটা তারা উঠিয়ে দিল

ট্যাক্সি যানবাহন সমিতির পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়, ঢাকার জগন্নাথ কলেজের ছাত্র নামধারী কতিপয় উচ্ছৃঙ্খল তরুণের দাপটে কলেজটির পার্শ্বস্থ রাস্তায় এতকালের ভাড়া ট্যাক্সির স্ট্যান্ড উঠে গেছে। ৮ই জুলাই একদল বখাটে ছোকড়া বিনি পয়সায় ট্যাক্সিতে চড়ে ভ্রমণের চেষ্টা করলে শ্রমিক ড্রাইভাররা আপত্তি জানায়। এর জবাবে উচ্ছৃঙ্খল 'ছাত্ররা' ড্রাইভার ও হেলপারদের মারধোর ও গাড়ীর ক্ষতি সাধন করে। পরে এটাকে 'রাজনৈতিক ইস্যু'তে পরিণত করে কলেজের ছাত্ররা সরকারী রাস্তাটিকে কলেজের রাস্তা বলে জবর দখল করে। মোটর ট্যাক্সি চালকগণ এসব ঘটনার প্রতিবাদে ধর্মঘট পালন করেছেন। ছাত্র নামধারী দুর্বৃত্তরা এখনও হুমকি দিয়ে চলেছে।

যে ছাত্রদের আমরা প্রাণাধিক ভালবাসতাম, যাদের আমরা মনে করতাম আমাদের অগ্রণী সেবক, তাদের এ রূঢ়তা ও অশালীন অভদ্র আচরণে আমরা মর্মাহত। ছাত্রদের নাম নিয়ে যারা গুণ্ডামী করে তাদের সমর্থনে সাধারণ ছাত্ররাও এগিয়ে আসেন, এটা সত্যই বিস্ময়কর।

পুলিশের কাছে আমরা বিচার পাইনি। কারো কাছেই পাবার আশা করছি না। আমরা চাই বিবেক বলে কোন পদার্থ থাকলে সংশ্লিষ্ট ছাত্ররা নিজেদের কৃতকর্ম একবার নিজেরাই

বিচার করে দেখুন। তাঁরা অনুতপ্ত যদি না হন তবে আমরা বুঝবো, ভবিষ্যত আশা বলে আমরা যাদের দিকে তাকিয়ে আছি তারা মরিচীকা!

থলির বিড়াল কিছুটা বেরুলো

ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল থানার পাঁচপাড়ার রিলিফ ও পঞ্চায়েত চেয়ারম্যান জনৈক ডাঃ মোঃ মোক্তার হুসেন এক চিঠিতে 'হক-কথা'কে আইনগত ব্যবস্থার হুমকি দিয়ে বলেছেন, তিনিই এমসিএ'র ভাই। সুতরাং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাটি কাটার টেস্ট রিলিফের টাকা তিনি মারেননি। কাজটি নাকি বিদ্যালয় কমিটি সদস্যদের মনপূতঃ হয়নি। বিদ্যালয় কমিটি নাকি তাদের হাতে মঞ্জুরীর প্রাপ্ত আংশিক টাকা তুলে দিতে বলেছিল। চেয়ারম্যান সাহেব বলেছেন, বিদ্যালয় কমিটি [illegible] টাকা দিয়ে বিদ্যালয়ের বেড়া দিতেন অথবা আত্মসাত করতে না পেরেই বিদ্যালয় কমিটি ক্ষেপেছে। মাটি কাটার টাকা নিয়ে চোরাগুপ্তা [illegible]কারির সংবাদ যিনি সংগ্রহ করেছেন, এমসিএ ভ্রাতা ঐ চেয়ারম্যান সাহেব তাঁর নামধাম জানতে চেয়েছেন। মজার ব্যাপার [illegible] গ্রাম্য মোড়ল তাহলে নির্ভিক সাংবাদিকতাকে হয়ত একহাত দেখে নিতে চাইবেন বলে মনে করেছেন।

[illegible]র্মহারার ছড়া

[illegible] মাসনুন রিফাহ ॥

[illegible]মাও জমাও আরো জমাও
[illegible]লদা ফোড়ার পুঁজের মত
[illegible] জমাও।
[illegible] দিয়েছি ছুরি কাঁচি
[illegible]টাবো এবার
[illegible] ফোড়া।
বাড়াও বাড়াও ভুঁড়ি বাড়াও
রিলিফ আছে বস্তাভরা
চর্বি ভুঁড়ির গলবে তখন
পড়বে যখন নগদ ধরা।
(২)
হিসসা আছে ভাতের থালায়
সবার আছে হিসসা;
কেউ যদি চায় কেড়ে নিতে
মারব এবার পিষষা।
(৩)
আসছে রিলিফ আসছে রিলিফ
সাবধান সব এমসিএ
উলট পালট করলে বিলি
মারব জানো খামচি এ।

মামুবাদী বেয়াদব

গত ১১ই জুলাই সকাল ১০টা ৪০ মিনিটে ঢাকার তেজগাঁও টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটের একদল ছাত্র সর্বজনসম্মানিত অধ্যক্ষ ডঃ লুৎফর রহমানের অফিসকক্ষে ঢুকে তাকে জোরপূর্বক থানায় নিয়ে যায়। নিজের হাতে গড়া ছাত্রদের কাছে লাঞ্ছনায় মরীয়া হয়ে অধ্যক্ষ কাকুতি জানিয়ে বলেছিলেন, আমি চাকুরি থেকে ইস্তাফা দেবো, তোমরা এমনটি করো না। কিন্তু হাল আমলের মামুবাদী বেয়াদবগুলি তাঁকে তাঁর গাড়ীর পেছনে উঠিয়ে তেজগাঁ থানায় হাজির করে। তেজগাঁ থানার দারোগা তিন ঘন্টার মধ্যে অধ্যক্ষ সাহেবের বিরুদ্ধে দালালীর প্রামাণ্য অভিযোগ হাজির করতে বলেন। আত্যুৎসাহী মামুবাদী বেয়াদবগুলি কিছুই যোগাড় করতে পারেনি। নিরীহ শিক্ষকের লাঞ্ছনায় এলাকাবাসী ক্ষুব্ধ। অবশ্য বেয়াদবী করাটা আগে রাষ্টিকেট যোগ্য অপরাধ হলেও এখন হয়ত নয়, কেননা ওস্তাদ ঠ্যাঙাড়েদের রাজত্ব এখন।

মুরিদের দরবার

দার্শনিকের দৃষ্টিতে ইসলামী সমাজতন্ত্র

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

"জালেমের বিরুদ্ধে মজলুমের সংগ্রাম এবং শোষকের বিরুদ্ধে শোষিতের সংগ্রামই আমার সংগ্রাম, আজ হউক, কাল হউক এই দেশে শোষণমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা 'সমাজতন্ত্র' ও কৃষক-মজুর রাজ অবশ্যই কায়েম হইবে।"

॥৩॥

বাংলাদেশের রাজনীতিবিদগণ যাহারা আজ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন তাহাদের প্রায় প্রত্যেকেই মওলানা ভাসানীর সন্তোষ ও বীরনগরের বাড়ীতে ধর্ণা দিয়াছেন। জনতার নিকট তাহাদের নাম তখন সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। আর অজ্ঞাত ছিল তাহাদের দলীয় কর্মসূচীর চিন্তাধারা। মওলানার বদৌলতেই তাহারা জনসাধারণের নিকট পরিচিত হইয়া পড়িয়াছেন। বড়ই দুঃখের ও পরিতাপের বিষয় তাহাদেরই ছোট মুখে আজ বড় কথা শোনা যায়। আজ যাহারা মওলানা ভাসানীকে 'স্বার্থবাদী' 'কমিউনিষ্ট' ও 'সাম্প্রদায়িক' প্রভৃতি বলিয়া তিরস্কার করিতেছে তাহারা নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যই যে উহা করিতেছে তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। ইহাদের অন্তরের লুপ্ত অভিলাষ জনতার নিকট ফাঁস হইয়া গিয়াছে। ইহারা জনগণের স্বার্থ ও জীবনের সুখ সমৃদ্ধিকে ক্ষুণ্ণ করিয়া ব্যক্তিগত স্বার্থকে বড় করিয়া দেখিতেছে। তাই সমাজতন্ত্রের নামে বাড়ী, গাড়ী, নারী লইয়া ভোগের আতিশয্যে মগ্ন রহিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে মানবতা বলিতে যাহা আছে তাহা মৌলিক নয়, কৃত্রিম। এই কৃত্রিম মনুষ্যত্বের অন্তরালে পশুত্বের বর্বরতা বিরাজ করিতেছে। শুধু সময়োপযোগী সুযোগের অপেক্ষায় লোলুপ নেত্রে চাহিয়া রহিয়াছে। জনগণের সহিত দেশসেবা বা দেশপ্রেমের নামে তাহারা চিরাচরিত প্রথায় কৃত্রিম অভিনয় করিয়া যাইতেছে। সময় আসিলেই যে তাহাদের কৃত্রিম মনুষ্যত্বের অন্তরাল হইতে সেই পশুত্ব বাহির হইয়া আসিবে এবং দেশের ও সমাজের তথা জনগণের সর্বনাশ করিবে ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই। ইহার চাক্ষুস প্রমাণ ইতিমধ্যেই হইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ আমাদের স্বাধীনতার মধ্যেই ইহার প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইতেছি।

প্রায় দুইশত বৎসর ইংরেজ জাতির গোলামী করিয়া আমরা স্বাধীনতার জন্য যেরূপ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলাম এবং বহু ত্যাগ ও সংগ্রামের বিনিময়ে যে পাকিস্তান পাইয়াছিলাম তাহাতে সকল শ্রেণীর মানুষের মুক্তি ও শান্তি আসিবার কথা ছিল। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী ও স্বার্থবাদী পুঁজিপতি শোষকগোষ্ঠীর কূট-কৌশলের দরুণ সর্বহারা ও অধিকার বঞ্চিত মানুষের সেই মনের ঐকান্তিক ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই। শোষণ-শাসনের যাতাকলে নিষ্পেষিত হইয়া আমরা আবার স্বাধীনতার জন্য নতুনভাবে উদগ্রীব হইয়া উঠি। অতি প্রথম মওলানা ভাসানীই আমাদের সেই প্রাণের দাবীকে সমর্থন করেন। তিনিই সর্বপ্রথম বাংলাদেশে স্বাধীনতার শ্লোগান দেন। তখন বর্তমান ক্ষমতাসীনেরা বর্বর ইয়াহিয়া সরকারের সহিত সমঝোতায় আসিতে বিশেষ উৎসাহী ও ব্যতিব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু মওলানা ভাসানীর 'স্বাধীনতা' ব্যতীত জাতির মুক্তি নাই-শান্তি নাই-স্বার্থবাদী পুঁজিপতি ও সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠীর প্রভাব প্রতিপত্তির

অবসান নাই-এই শ্লোগান ও আন্দোলন ক্ষমতালিপ্সুদের সমঝোতার প্রতিবন্ধক হইয়াছিল। নতুনা তাহারা সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীর আশা-আকাংখাকে পদদলিত করিয়া ক্ষমতার রাশ আঁকড়াইয়া ধরিতে যেন-তেন রকমে সমঝোতায় আসিয়া ক্ষমতায় বসিতেন ইহা আজ যে কোন বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রেই অনুধাবন করিতে পারেন। বর্তমান ক্ষমতাসীনেরা যখন দেখিলেন সমঝোতার ফল বিশেষ আশাপ্রদ নয় তখন তাহারা অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বাধ্য হইয়া মওলানার সেই স্বাধীনতা ঘোষণাকেই সমর্থন করিলেন। অবশ্য ইহা ছাড়া তাহাদের সম্মুখে দ্বিতীয় কোন পথ খোলা ছিল না। থাকিলে এই সকল মহত্মনেরা কি মনোভাবের পরিচয় দিতেন আর কিইবা করিতেন তাহার জবাব জনগণ বিগত স্বাধীনতার ইতিহাসে ও আজকের দৈনন্দিন জীবনের মধ্যেই পাইতেছে।

আজ আমরা স্বাধীন হইয়াছি, কিন্তু স্বাধীনতা বলিতে যাহা কিছু বুঝায় তাহার পূর্ণ স্বাদ লাভ করি নাই। তাহার কারণ, আমাদের থাকার ঘর নাই, পেটের অন্ন নাই, পরনের কাপড় নাই, রোগের চিকিৎসা নাই, শিক্ষার ব্যবস্থা নাই, স্বাধীন মত ব্যক্ত করিবার অধিকার নাই। আমাদের স্বাধীনতা আজও ব্যাহত। আজও অগণিত লোক ভুঙ্গা-নাঙ্গা অবস্থায় ফুটপাতে শুইয়া থাকে, আজও অজস্র মা-বোন পেটের দায়ে ইজ্জত বিক্রি করে।

তাই আমরা চতুর্দিক দিয়াই লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত। আমাদের এই সমস্যার কি সমাধান নাই? আমরা কি চিরদিনই ধুঁকিয়া ধুঁকিয়া মৃত্যুর জন্য দিন গুণিতে থাকিব? না, তাহা কখনই নয়। আমরাই আমাদের পথ বাছিয়া বাহির করিব। আমাদের সম্মুখে একটি মাত্র পথই উন্মুক্ত রহিয়াছে যাহাতে সকল প্রকার সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হইতে পারে-তাহা হইতেছে মওলানা ভাসানীর মত ও পথ 'ইসলামী সমাজতন্ত্র।' স্বার্থবাদী ব্যক্তি ও ক্ষমতালিপ্সু শাসক ও শোষকগোষ্ঠীর দুরভিসন্ধিমূলক পরিকল্পনা এবং জনসাধারণকে ফাঁকি দিবার সবরকম কূট-কৌশল যখন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে-যখন শোষণের রূপ বদলাইবার দ্বিতীয় কোন পথ খুঁজিয়া পাইবে না-সকলই জাগ্রত জনতার চোখে ধরা পড়িবে-তখনই কেবল তাহারা মওলানা ভাসানীর সেই 'স্বাধীনতা' ঘোষণার মত তাঁহার এখনকার এই প্রস্তাবিত খাঁটি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা 'কৃষক-মজুর রাজ' মানিয়া লইবেন নচেৎ নহে।

এইরূপ সমাজতন্ত্র ছাড়া আমাদের মুক্তির আর দ্বিতীয় কোন পথ নাই। বাংলাদেশের অদ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ, জনদরদী নেতা মওলানা ভাসানী তাহার দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়া সকল দিক সূক্ষ্মভাবে বিচার বিশ্লেষণ করিয়াই এই পথটি দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্ত ও দেশী-বিদেশী শোষক শ্রেণীকে সমূলে উৎখাত করিবার জন্য তিনি বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন, "জালেমের বিরুদ্ধে মজলুমের সংগ্রাম এবং শোষকের বিরুদ্ধে শোষিতের সংগ্রামই আমার সংগ্রাম, আজ হউক কাল হউক এই দেশে শোষণমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা 'সমাজতন্ত্র' ও 'কৃষক-মজুর রাজ' অবশ্যই কায়েম হইবে। দারিদ্রতাকে শেষ করে দাও, শোষণকে নির্মূল করে দাও, সবার মুখে হাসি ফুটতে দাও তবেই আমার কাজ ফুরাবে। জালেমের সাথে মজলুমের, শোষকের সাথে শোষিতের, নির্যাতনকারীর সাথে নির্যাতিতের, ধনীর সাথে গরীবের কোন সময় আপোষ বা বন্ধুত্ব হইতে পারে না। যেমন পারে না ক্ষুধার্ত বাঘের সাথে ছাগলের কোন আপোষ বা বন্ধুত্ব। পশ্চিমের

শুকর সাদা হইতে পারে আর পূর্বের শুকর কাল হইতে পারে সব শুকরই হারাম। শোষণ ছাড়া শোষকের কোন ধর্ম নাই, জাত নাই।'

আমরা বহু দিন যাবত রোগে ভুগিয়া রোগ যাতনাকে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছি। রোগ প্রতিষেধক বহু ঔষধও প্রয়োগ করিয়াছি। কিন্তু ব্যথা যাতনার উপশম হয় নাই। এখন রোগের জ্বালায় অস্থির হইয়া উঠিয়াছি। তাই এবার যাতনার উপশম করিতে রোগের উৎস স্থলটিকেই অপারেশন করিয়া রোগ-জীবাণু বাহির করিয়া দিতে চাই। 'ইসলামী সমাকতন্ত্রই' সেই রোগের সর্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহারই সাহায্যে জাতির জীবনকে রোগ-মুক্ত করিতে চাই–হিংসা-দ্বেষ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, বর্ণ-বৈষম্যের হাত হইতে রেহাই পাইতে চাই–মানুষ হিসাবে মানুষের অধিকার লইয়া দাঁড়াইতে ও বাঁচিতে চাই। যুদ্ধে নয় স্রষ্টা প্রদত্ত প্রেমের দ্বারা সকলের হৃদয়কে জয় করিতে চাই।

ভাসানীর বাণী

লালবাহিনী, রক্ষীবাহিনী, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী, পুলিশ বাহিনী অথবা যে কোন শক্তিশালী বাহিনী বাংলাদেশের কৃষক, শ্রমিক, জেলে, মাঝি, বুদ্ধিজীবী প্রভৃতি জনসাধারণের ন্যায়সঙ্গত দাবীর বিরুদ্ধে যতই হুমকি অথবা দমননীতি চালাইয়া ভয় প্রদর্শন করুক না কেন, তাহা অগ্রাহ্য করিয়া একমাত্র রাব্বুল আলামীনের ভয় ও বিশ্বাসকে বুকে স্থান দিয়া অন্যায়ের বিরুদ্ধে সকল স্তরের, সকল দলের, সকল মতের, সকল ধর্মের বাঙালীদিগকে ঐক্যবদ্ধ হইয়া গণআন্দোলন চালাইয়া সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ, সামন্তবাদ ও দেশী-বিদেশী সমস্ত শোষক জালেমদের প্রভুত্ব ধ্বংস করিতে হইবে।

বাংলাদেশের মাটি, কল-কারখানা, ব্যাংক-ইন্সিওরেন্সে সকল সম্পদ আল্লাহর (ঈশ্বর) নামে জাতীয়করণ করিয়া সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে প্রয়োজনানুযায়ী বণ্টন করার ব্যবস্থার নামই সমাজতন্ত্রবাদ। মুজিববাদ বা অন্য যেকোন বাদই হোক না কেন, বাংলাদেশের মানুষ আল্লাহবাদ ও ঈশ্বরবাদ বর্জন করিয়া অন্য কোন বাদই গ্রহণ করিবে না। কিন্তু বিশ্বশান্তি ও বিশ্বের শোষিত মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির কর্মসূচী সম্বলিত যে কোন বাদই অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারজনিত বিশ্বাসে আকৃষ্ট হইয়া বর্জন করিবে না।

বর্তমান সরকার ৬-দফার অঙ্গীকার করার পর বর্তমান অবস্থায় পুনরায় সমাজতন্ত্রবাদ, গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষ শাসন-এই চারটি কর্মসূচী বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে সম্পূর্ণভাবে পালন করিতে ওয়াদাবদ্ধ হইয়াছে। এই ওয়াদা যথাযথ রূপে পালন করিলে সরকারের জনপ্রিয়তা বহাল থাকিবে। মুসলিম লীগের মতো ধোঁকাবাজী করিয়া গদি দখল করিয়া ওয়াদা পালনে ব্যর্থ হইলে বর্তমান সরকার ও আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠান জনসাধারণের নিকট বিশ্বাসঘাতকরূপে পরিচিত হইবে। তাই সরকার ও আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠানের জরুরী কর্তব্য মুজিববাদ ও অন্যান্য বিতর্কমূলক শ্লোগান দিয়া দেশের ভিতর মারামারি, খুন-খারাবী অত্যাধিক রূপে বৃদ্ধি না করিয়া একমাত্র সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ওয়াদা যথা সত্বর সম্ভব বাস্তবায়নের জন্যে আন্তরিকভাবে চেষ্টা চালানো। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হইলে দেশের শতকরা ৯৫ জন মানুষের মতামত প্রতিফলিত হইবে তাহাই হইবে সত্যিকার গণতন্ত্র। ধর্মনিরপেক্ষ শাসন ও জাতীয়তাবোধ সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠা ব্যতীত কিছুতেই আসিবে না। তাই সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠার প্রথম পদক্ষেপ কৃষক-মজুরের সংখ্যানুপাতে প্রতিনিধিত্বমূলক দাবী সরকারকে অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে। যতই কর্মসূচী গ্রহণ করা হোক না কেন এবং ভারত, আমেরিকা, রাশিয়া, চীন প্রভৃতি দেশ যত কোটি ডলারই বাংলাদেশ সরকারকে ভিক্ষা বা ঋণ প্রদান করুক না কেন, কিছুতেই বাংলাদেশকে সুখী ও সমৃদ্ধশালী করিয়া গড়িয়া তোলা সম্ভব হইবে না। একমাত্র বাংলাদেশের মেরুদণ্ড স্বরূপ কৃষক-মজুর যাহারা সংখ্যায় ৯৫ জন তাহাদের কঠোর পরিশ্রম ও সরকারের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন দ্বারাই সম্ভব হইবে।

প্রতি সপ্তাহে বাংলা খোতবা বের হবে

বাংলাদেশের সাত কোটি মুসলমানের প্রাণের চেয়ে প্রিয় ইসলামিক আদর্শ আজ দেশী-বিদেশী চক্রান্তকারীদের হাতে চরম দুর্দশার সম্মুখীন। জালেম ও নাস্তিকদের হাত হইতে খাঁটি মুসলমানকে রক্ষার জন্য আগামী মাসের শেষ সপ্তাহ হইতে পবিত্র জুম্মার খোৎবা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও যুগোপযোগী ব্যাখ্যাসহ নিয়মিত বাহির করা হইবে। সর্বহারা শোষিত মানুষের মুক্তির জন্য খোৎবায় রাব্বুল আলামীন আল্লাহপাকের কালাম, হাদিস, মুসলিম মণীষীদের বাণী প্রতি সপ্তাহে বাংলা ভাষায় বাহির হইবে। বাংলাদেশের ৯৬ হাজার মসজিদে পৌঁছানোর জন্য এজেন্ট এবং ব্যক্তিগত গ্রাহক হউন। বার্ষিক-আট টাকা, ষান্মাসিক–পাঁচ টাকা।

প্রতি সংখ্যা-উনিশ পয়সা। বিজ্ঞাপিন দিতে ইচ্ছুক ব্যবসায়ীগণ সরাসরি যোগাযোগ করিতে পারেন। আমাদের ঠিকানায় ব্লক পাঠাইবেন।

বিজ্ঞাপনের হার-প্রতি কলাম ইঞ্চি-পনের টাকা।

সন্তোষ, টাঙ্গাইল

চাঁদপুর কৃষক সমিতির সভা

বাংলাদেশ কৃষক সমিতির চাঁদপুর মহকুমা সাংগঠনিক কমিটি সম্প্রতি জনাব আসফ আলীর সভাপতিত্বে এক বৈঠকে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে। সভায় বামপন্থী নিধনের ষড়যন্ত্র, গণশক্তি অফিসে তালা ঝুলানো ও 'হক-কথা' সম্পাদককে অন্যায়ভাবে গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা করা হয়।

সিলেটে কৃষক সম্মেলনের প্রস্তুতি

আগামী ৭ ও ৮ই আগস্ট সিলেট সদর মহকুমা কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। গত ৫ই জুলাই প্রস্তুতি কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ২০ টাকা দরে চাল, ১০ টাকা দরে গম দাবী করে। সিলেট জেলাকে দুর্গত অঞ্চল ঘোষণার দাবী জানান হয়।

অথ থানা সমাচার

সম্প্রতি টাঙ্গাইলের জনৈক ছাত্রলীগ কর্মী থানায় আটক করা মোটরের টায়ার চুরি করার সময় হাতেনাতে ধরা পড়ে এবং থানার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের যোগসাজশে মুক্তি পায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায় গত ৩১শে জুলাই দিবাগত রাত প্রায় সাড়ে এগারোটার সময় উক্ত ছাত্রলীগ কর্মী থানার মাঠ থেকে টায়ার চুরি করার সময় পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে থানার হাজতে রাখে। গভীর রাতে জনৈক উর্ধতন কর্তা মাতাল অবস্থায় থানায় প্রবেশ করে নিজ দায়িত্বে আসামীকে ছেড়ে দেয়। কারণ, ঐ আসামীটি তার ছেলের বন্ধু। এই কর্মকর্তার গুণধর পুত্রের বিরুদ্ধেও এর আগে

থানায় একবার ডাইরী করা হয়েছিল। থানার সেপাইগণ আসামীকে হাজতের বাইরে দেখে সঙ্গে সঙ্গে তাকে গ্রেফতার করে থানার অফিসে নিয়ে গেলে ঐ অফিসারটি রেগে গিয়ে সেপাইদের বলে, একে আমি ছেড়ে দিয়েছি তোমরা যা পার করো। সেপাইরা তখন পুলিশ ইন্সপেক্টরের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি তাদের হেফাজতে আসামীকে রাখতে নির্দেশ দেন এবং পরদিন সকালে তদন্ত করে দেখবেন বলে আশ্বাস দেন। তিনি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকেও ঘটনা জানিয়ে রাখতে বলেন। সেপাইরা তখন ডিএসপি, এসপি এবং ডিসিকে ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করে। ডিএসপি সেপাইদের গালাগালি করলেও এসপি ঘটনা তদন্ত করে দেখার আশ্বাস দেন এবং ডিসি সাহেব তাদের নিরাপত্তার ভার নেন।

পরদিন সকালে পুলিশ ইন্সপেক্টর আসামী ছাত্রলীগ কর্মীটিকে জামিনে মুক্তি দেয়। সেপাইদের উপর বিক্ষুব্ধ হয়ে থানার কয়েকজন কর্মকর্তা ১লা আগস্ট দুপুরে এসপি-র কাছে তাদের পদমর্যাদার প্রতীক 'ফুল' জমা দেন। তাদের এই আইন বিরুদ্ধ কার্যকলাপে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলে তারা পরদিন দুপুরে আবার নিজ নিজ 'ফুল' ফেরত নিয়ে যায়। উপরোক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে জনমনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে যে ছাত্রলীগ কর্মী হলে অথবা থানা কর্তৃপক্ষের আত্মীয় বা নেকনজরে পরা ব্যক্তি হলেই কি থানা প্রাঙ্গণ থেকে সরকারী জিনিস চুরি করেও মাফ পাওয়া যায়? আর কর্তব্যের খাতিরে সাধারণ সেপাইরা চোরকে গ্রেফতার করার অপরাধে তাদের কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হতে হয়। স্বাধীন বাংলায় এই দৌরাত্ম্য আর কত দিন চলবে?

বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের জনসভা

গত পহেলা আগস্ট 'গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা দিন' উপলক্ষে টাঙ্গাইল শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে জেলা বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের যুগ্ম আহ্বায়ক জনাব মির্জা গোলাম সরোয়ার ছানা।

দেশের বর্তমান অস্বস্তিকর রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে জনগণের আশু করণীয় সম্পর্কে এবং সরকারের ফ্যাসিস্ট কার্যকলাপের সমালোচনা করে সভায় বক্তৃতা করেন বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের যুগ্ম আহ্বায়ক খন্দকার নাজিমুদ্দিন, বাবু উদয় শংকর ঘোষ, সৈয়দ মোঃ ফারুক, জনাব রুহুল আমিন শেলী ও ন্যাপ স্বেচ্ছাসেবক প্রধান জনাব সাকাওয়াত মতিন ভূইয়াঁ ।

সভায় সাপ্তাহিক 'হক-কথা' সম্পাদককে মুক্তি, গণশক্তি প্রকাশের ব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক গুপ্তহত্যা বন্ধ করার জন্য সরকারের নিকট জোর দাবী জানিয়ে কতিপয় প্রস্তাব পাশ করা হয়।

সন্তোষে
ন্যাপের কেন্দ্রীয় কমিটির বর্ধিতসভা

গত ৩০শে জুলাই সন্তোষে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি এবং কৃষক সমিতির বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়। দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে ন্যাপ ও কৃষক নেতৃবৃন্দ এই অধিবেশনে যোগদান করেন। মোটর দুর্ঘটনায় আহত হওয়ায় কেন্দ্রীয় কৃষক সংগঠক হাজী মোহাম্মদ দানেশ এবং রাশেদ খান মেনন এই সভায় যোগ দিতে পারেনি।

এই অধিবেশন জনগণের স্বাধীনতার পূর্ণ রূপায়নের জন্য স্বার্থবাদী ক্ষমতালিপ্সু শোষক গোষ্ঠীর দুর্নীতির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেছে। সভার

১০ই অক্টোবরের মধ্যে শাসনতন্ত্র না দিলে সরকারের বিরুদ্ধে দুর্বার সংগ্রাম গড়ে তোলার ঘোষণা।

সভাপতি ও প্রধান বক্তা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী কৃষক-মজুরদের সমস্যাবলীর দীর্ঘালোচনা করেন। তিনি ঘোষণা করেন, শাসনতন্ত্র নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সাথে শোষকেরা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলে অথবা কৃষকদের ন্যায্য অধিকার ও দাবী দাওয়ার পরিবর্তে অন্যভাবে এ নিয়ে ষড়যন্ত্র করা হলে ও অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে শাসনতন্ত্রের পূর্ণ প্রণয়ন না করলে ন্যাপ এর বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করবে। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, শাসনতন্ত্রে শতকরা ৯৫ জন কৃষক-শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার সংরক্ষিত না হলে তার দল উহা কখনই গ্রহণ করবে না এবং জনগণের সত্যিকারের কল্যাণকামী শাসনতন্ত্রের জন্য বিরামহীন সংগ্রাম চলবে। এই আন্দোলনকে জোরদার করে গড়ে তোলা ও পরিচালনার জন্য ন্যাপের সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণের বিশেষ প্রয়োজন বলে তিনি উল্লেখ করেন। সভায় নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়।

ক) এই সভা মনে করে যে, শাসনতন্ত্রে শ্রমিক-কৃষকের প্রতিনিধিত্বমূলক নির্বাচন ব্যবস্থা না থাকলে প্রকৃত সমাজতন্ত্র কায়েম হতে পারে না। জাতীয় পরিষদে শ্রমিক-কৃষকের শ্রেণীভিত্তিক সংখ্যানুপাতে প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা পূর্বক শাসনতন্ত্র রচনার জন্য এই সভা দাবী করছে। অন্যথায় শাসনতন্ত্রের বিরোধিতা করে গণআন্দোলন গড়ে তোলা হবে। অতীতের মতো স্বাধীন বাংলাদেশেও কৃষকসমাজ তাদের পাটের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে না। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পাট উৎপাদনকারী দেশ হলেও বিশ্বের পাটের বাজারে বাংলাদেশ যাতে তার আসন পেতে না পারে, সে জন্য রুশ-ভারতীয় শাসকরা সর্বক্ষণ ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। মুজিব সরকার রুশ-ভারত দ্বয়ের পরামর্শে বাংলাদেশের পাট শিল্পকে ক্রমাগত ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়ার পাঁয়তারা করছে। আটা চালসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় অন্যান্য জিনিষের সাথে আনুপাতিক হারে পাটের দর কমপক্ষে ১২০ টাকা ধার্য করার জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবী জানানো হচ্ছে।

(খ) ভূমিহীন কৃষকদের বর্তমান আর্থিক অবস্থা চরম আকার ধারণ করেছে। এদের বাঁচানোর জন্য সরকারের কাছে শহরের মত গ্রামেও চাল-আটা সস্তা মূল্যে রেশন প্রথায় বিতরণ করার দাবী এই সভা জানাচ্ছে।

(গ) সারের মূল্য বৃদ্ধিতে এই সভা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। অবিলম্বে সারের মূল্য হ্রাস করার জন্য এই সভা সরকারের নিকট আহ্বান জানাচ্ছে।

(ঘ) সর্বহারা কৃষকদের সন্তান-সন্ততিগণ পয়সার অভাবে স্কুল-কলেজে বেতন ও পরীক্ষার ফি দিতে পারছে না। এই সভা আহ্বান করছে যে, সরকার যেন তাদের বেতন ও পরীক্ষার ফি মওকুফ করে দিয়ে তাদের শিক্ষা জীবনকে বাঁচিয়ে রাখে।

(ঙ) এই সভা আগামী ১০ই অক্টোবরের পূর্বেই কৃষক-মজুরদের ন্যায্য দাবী-দাওয়া অধিকার সংরক্ষিত শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জোর দাবী জানাচ্ছে।

(চ) এই সভা আগামী ৮ই অক্টোবর ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে শ্রমিক-কৃষক-স্বেচ্ছাসেবক সম্মেলন এবং ৯ তারিখে টঙ্গীতে কৃষক-শ্রমিক মৈত্রী প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এই সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার জন্য কৃষক সমিতির প্রতিটি শাখা কমিটিকে স্বেচ্ছাসেবক স্কোয়াড গঠন ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছে।

আওয়ামী লীগ সরকারের প্রতি একটি অনুরোধ

বাংলাদেশ মুসলিম অধ্যুষিত দেশ। এদেশে কৃষকদের সংখ্যা শতকরা ৮৫ জন তন্মধ্যে আবার শতকরা ৯৬ জনই মুসলমান। এই সকল মুসলমানেরা অন্যান্য ধর্মানুরাগীদের চাইতে ধর্মের প্রতি কোন অংশে কম আকৃষ্ট নহে এবং ধর্মের প্রতি তাঁহাদের অটল বিশ্বাস অনেকাংশে বেশীই রহিয়াছে। তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত বাংলাদেশের ৬২ হাজার গ্রামের ৯৬ হাজার মসজিদই বহন করিতেছে। এই সকল মসজিদে মুসলমান সম্প্রদায় যথারীতিভাবে নামাজ পড়িয়া আসিতেছে। প্রতি শুক্রবারে জুম্মা নামাজ আদায় করা মুসলমানের পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য বলিয়া মনে করে। বাংলাদেশ সরকার নগন্য সংখ্যাক খৃষ্টান ও হিন্দুদের তুষ্টির জন্য শুক্রবারের পরিবর্তে রবিবারে ছুটি মঞ্জুর করায় মুসলমান কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে দারুণ বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছে। অতএব, নগন্য সংখ্যক খৃষ্টান ও হিন্দুদের মনোতুষ্টির জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানেরা পবিত্র দিন শুক্রবারের ছুটি বাতিল করা নিরপেক্ষ সরকারের পরিচায়ক নহে।

তাই যাহাতে রবিবারের পরিবর্তে শুক্রবার ছুটির দিন ঘোষণা করিয়া বাংলাদেশের শতকরা ৯৬ জন মুসলমানেরা উপাসনার পবিত্র দিনটির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয় তাহার জন্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

মোঃ আবদুল হামিদ খান ভাসানী

বোয়ালখালী থানা ন্যাপ

গত ২রা জুলাই অনুষ্ঠিত চট্টগ্রামের বোয়ালখালী থানা ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সম্মেলনে গৃহীত এক প্রস্তাবে 'হক-কথা' সম্পাদক সৈয়দ ইরফানুল বারীর গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা করে অবিলম্বে তার মুক্তির দাবী করা হয়।

বাংলাদেশ বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের মাগুরা এবং ঢাকার সিদ্ধেশ্বরী বিদ্যালয় শাখার দু'টি সাম্প্রতিক সভায় মওলানা ভাসানী প্রতিষ্ঠিত সাপ্তাহিক 'হক-কথা' সম্পাদক সৈয়দ ইরফানুল বারীকে অবিলম্বে বিনাশর্তে মুক্তির দাবী জানানো হয়। তাছাড়া জনাব বারীকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে দেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে তোলারও আহ্বান জানানো হয়েছে।

ইহা কি সত্য?

॥ ১২৬ ॥

একদিনের বেতন দান করে দালাল স্বর্গে আরোহণ করেছে। ডিকেডী আমলের তমঘাধারী থানা স্কীমের নামে বিপুল অর্থ আত্মসাৎকারী খান সবুরের কৃপায় ৬/৭ ধাপ পদোন্নতিলাভকারী হেকিম মার্কা নামের ব্যক্তিটি এখন ডাক ও তার বিভাগের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। কর্তাভজা ভাব থেকে আগামীদিনের কর্তা শেখ সাহেবের সংগ্রাম তহবিলে একদিনের বেতন দান করেই তিনি আজ কালো অতীতকে গোর দিয়েছেন।

॥ ১২৭ ॥

ঢাকা জেলার সদর দক্ষিণ থেকে নির্বাচিত তরুণ এমসিএটি যাকে অত্র এলাকার লোক জনাব সুবিধা আলী বলেই জানে তিনি গোটাদুই অবাঙ্গালীর খড়ির দোকানের মালিক হয়েছেন। যদিও অসুবিধা এড়ানোর জন্য তা করা হয়েছে তার ভাই-এর নামেই। তাছাড়া কোহিনুর কোম্পানীর এজেন্সীও বর্তমানে উনিই বগলদাবা করেছেন। রিলিফের কম্বলের ব্যাপারেও তার ক্রিয়াকলাপ জনসাধারণের মধ্যে ফাঁস হয়ে গেছে।

॥ ১২৮ ॥

তেজগাঁ পলিটেকনিক্যাল হাইস্কুলের বর্তমান ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দাপটে ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষকবৃন্দ ত্রাহী ডাক ছাড়ছে। এই প্রধান শিক্ষক গত জানুয়ারী মাসে বেশ কয়েকজন শিক্ষক-শিক্ষিকাকে ব্যক্তিগত আক্রোশে কাজে যোগ দিতে দেয়নি। সমাজ বিরোধী কিছু ব্যক্তির সহায়তায় তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের ধর্মঘট ও প্রতিবাদ করার পথও বন্ধ করেছেন।

॥ ১২৯॥

সুনামগঞ্জের নাবিস্কো বিস্কুটের এজেন্সী নারায়ণগঞ্জে চলে। মামুর জোরে এজেন্সী বাগিয়ে সুনামগঞ্জে শুধু বন্ধ ঘরে সাইনবোর্ড ঝুলনো হয়েছে। বিস্কুটের কারবার নারায়ণগঞ্জে ভাল চলে কিনা!

॥ ১৩০ ॥

দালাল খোকন আহত মুক্তিযোদ্ধা সেজে চিকিৎসার জন্য রাশিয়া পাড়ি দিয়েছে। কুমারখালী অশান্তি কমিটির সেক্রেটারি শফিকুল আলমের পোষ্য পুত্র খোকন দখলদার আমলে পালক পিতার বদৌলতে পাকসেনাদের পেয়ারের আদমী হয়েছিল। গ্রামবাসীর উপর অত্যাচার ও নারী নির্যাতনে তার জুড়ি ছিল না। কুমারখালী মুক্ত হবার পর মুক্তিফৌজ তাকে পাকড়াও করে মেরে ফেলার জন্য গুলি করে। আহত অবস্থায় সে গড়াই নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে বেঁচে যায়। পরে তাকে কুষ্টিয়া হাসপাতালে দেখা গিয়েছিল। সেখান থেকে মুক্তিফৌজ তাকে বের করে আনতে গেলে সে সরে পড়ে। এখন সে মুক্তিযোদ্ধার সার্টিফিকেট যোগাড় করে রাশিয়া গেছে। ২৮/৬/৭২ তারিখের দৈনিক পত্রিকায় অন্যান্যদের সাথে তার ছবিও ছাপা হয়েছে। শান্তি কমিটি নেতার পোষ্যটি এখন আবার আওয়ামী লীগ নেতার পোষ্য হয়েছে।

॥ ১৩১ ॥

কৃষিমন্ত্রীর ভাগ্নি ও ভাগ্নে পিপলস জুট মিলে কাজ পেয়েছে। ভাগ্নি ম্যাট্রিক পাশ কিনা সন্দেহ। বেতন পাওয়া যাচ্ছে ৪৭২ টাকা ২৫ পয়সা করে। নতুন চাকুরীতে যোগদানকারী অনেক বিএ, বিকম পাস পাচ্ছেন ১৭৫। ভাগ্নি জয়নাব বেগম এপ্রিল মাসে কাজে যোগদান করেও ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসের বেতন পেয়েছে। ভাগ্নেটি এবার ম্যাট্রিক পাস করেছে। চাকুরী মিলেছে ওয়েলফেয়ার এ্যাসিস্ট্যান্টের। বেতন ৩৫০ টাকা। এদের কারো লিখিত পরীক্ষা হয়নি। কেবল টেলিফোন হয়েছিল।

সম্পাদক ঃ সৈয়দ ইরফানুল বারী ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ঃ মওলানা আবদুল হামিদ ভাসানী
মুদ্রণে ঃ শান্তি প্রেস, সন্তোষ, টাঙ্গাইল।

প্রতি কপি পঁচিশ পয়সা সাপ্তাহিক চাঁদার হার : ষান্মাসিক-৬.০০ বার্ষিক-১০.০০

হক-কথা

(WEEKLY THE HAQ-KATHA)

প্রকাশক ও পৃষ্ঠপোষক ঃ মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

প্রথম বর্ষ ২৪ তম সংখ্যা ; শুক্রবার ; ২৬শে শ্রাবণ, ১৩৭৯ ; ১১ আগষ্ট, ১৯৭২ ; ৩০শে জামাদিউসসানী, ১৩৯২ ; সন্তোষ, টাঙ্গাইল।

কিন্তু ডিবা ফেলে মনিসিং-রা ভাগোয়াট হবেন

মস্কো জবর দাওয়াই পাঠাচ্ছেন

তথাকথিত কমিউনিষ্ট পার্টির নেতারা মস্কো থেকে একটা কিছু ভালো দাওয়াই-এর ব্যবস্থাপত্র নিয়ে ঢাকায় ফিরছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

মনিসিং গং মস্কো ছুটে গেছেন ঢাকার কোনালীর সফর এবং মার্কিন লবী জোরদার হবার আলামত দেখে।

সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পার্টির সাথে নীরব-নিভৃতে তাদের দীর্ঘ আলাপ চলছে। মিসর ও দক্ষিণ ইয়েমেনে অবমাননাকর লাথি খেয়ে সোভিয়েত রাশিয়া বিতাড়িত হবার পটভূমিতে মস্কো তাদের লেজুড় পার্টিগুলিকে নতুন কর্মকাণ্ডের দিশা দেবার জন্য আগ্রহী। মনিসিং গং মস্কো হাজির হয়েছেন ঠিক এমন এক সময়ে, যখন বাংলাদেশ রাশিয়ার খপ্পর থেকে ছুটে আমেরিকার মুঠোয় চলে যাচ্ছে। মিসরে যে ঘটনা ঘটতে লেগেছে ১৫ বছর, বাংলাদেশে তার জন্য এক বছরের বেশী সময় লাগবে না।

মনিসিং যে দাওয়াই নিয়ে বাংলাদেশে ফিরেছেন তার মধ্যে অন্যতম দিক হচ্ছে, সরকারী ক্ষমতায় হিস্যা দাবী। এর প্রত্যুত্তরে শেখ মুজিবের কাছ থেকে তারা অষ্টরম্ভা ছাড়া আর কিছু পাবেন বলে মনে হয় না। ক্ষমতার হিস্যা নেবার মত মর্যাদাকর অবস্থা মনিসিংদের নেই, অন্ততঃ শেখ মুজিবের চোখে। কারণ, 'সাইনবোর্ড পাল্টে এসে পড়ো, মন্ত্রীত্বের ভাগ দিতে পারি তাহলে'– বলে যাদেরকে 'তু-তু' করে ডাকা হয় তারা দাবী জানিয়ে, অধিকার হিসাবে হিস্যা আদায় করতে পারে না।

মস্কোর রাজনীতিকে যে কাল-ব্যধিতে ধরেছে, তার অনুগামী পার্টিগুলি তারই বিষক্রিয়ায় পরিণত হয়েছে শোকেসে। মুজিব সরকারের কাছ থেকে এবার পরোক্ষ 'দাবড়ানি' খেয়ে মস্কোর ব্যবস্থাপত্রে দ্বিতীয় দাওয়াই হিসাবে মনিসিং গং মহাসম্মেলন (কংগ্রেস) বর্জিত কমিউনিষ্ট পার্টির একটা কংগ্রেস ডাকবেন, সংগ্রামের রাজনীতি গ্রহণের জন্য।

কংগ্রেস নামক পদার্থে মুজাফ্ফর-এর দল, ছাত্র ইউনিয়ন, টিইউসি, মহিলা পরিষদ এবং কমিউনিষ্ট পার্টি-সকল কাগুজে দলের প্রাইমারী মেম্বারদের ডেলিগেট হিসাবে সুমার করে ষ্ট্রেংথ প্রদর্শন করার চেষ্টা করলে মুজিব সরকার বিগড়াবে।

সংগ্রামের রাজনীতির আদ্য-শ্রাদ্ধ করে তারপর

মনিসিং গং-এরা চিরাচরিত নিয়মে ধরা ছোঁয়ার উর্ধ্বে– অর্থাৎ আন্ডারগ্রাউন্ডে গিয়ে ঘাপটি মেরে চুপ করে থেকে চামড়া বাঁচাবেন।

ফাইন্যাল রাউন্ড শুরু হবে সোভিয়েত গোয়েন্দা সংস্থা কেজিবি-র দ্বারা। কেজিবিকে দিয়ে সরকার গদীচ্যুত করানোর প্রচণ্ড একটা চেষ্টা হবে আগামী দিনগুলিতে। সাফল্য অর্জন করলে কৃতিত্ব হবে মনিসিং গং-এর। পরাস্ত হলে বদনাম হবে সোভিয়েত হস্তক্ষেপের।

আগামী দিনগুলিতে কেজিবি ষড়যন্ত্রের এজেন্ট হিসাবে কাজ করার জন্য অসংখ্য মস্কোপন্থী মস্কো থেকে ইতিমধ্যে ট্রেনিং নিয়ে ফিরছে। জনগণের সাথে সংশ্রব না রেখে প্রাসাদ আর ক্যান্টনমেন্ট ষড়যন্ত্রের পথ অবলম্বন করবে তারা।

শেষ পরিণতি হবে হয়ত সুদান নয় তো বলিভিয়া। সুদানে এমনি ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে কমিউনিষ্ট চেলাদের গদীতে বসাতে গিয়ে রাশিয়া জবর চর খেয়েছে। বলিভিয়ার বীর বিপ্লবী চেগুয়েভারার শত্রুদের সাথে হাত মিলিয়ে মস্কো প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করিয়ে ছিল, কিন্তু তাও মাস তিন-চারের জন্য। আমেরিকানদের ষড়যন্ত্রের কাছে পরাজিত হয়ে তারপর তারা শেষ হয়ে গেছে।

ভীতু অধ্যাপক মোজাফ্ফর এসব আলামতে যেতে ভয় পাচ্ছেন, তাই কমিউনিষ্ট পার্টির বিরুদ্ধে তার চাপা উষ্মা। সুযোগ পেলেই ফস্ করে দু'চারটি অমৃতবাক্যে মনিসিংদের শ্রাদ্ধ করে ছাড়েন। বিবৃতি, সাক্ষাৎকারে কমিউনিষ্ট দলকে ভীতিকর গোলক ধাঁ-ধাঁ বলে ইঙ্গিত দিতে চেষ্টা করেন।

এটা ব্যর্থ চেষ্টা। তিনি কম্বল ছেড়ে দিলেও কম্বল তাকে ছাড়ছে না। অতি বড় শিক্ষিত ব্যক্তির মত শহরে আশ্রয় নিয়ে কসমোপলিটান পলিটিক্স করার মত আরাম তাঁর হারাম তো হবেই, বরং লেজেগোবরে অবস্থায় এদের পড়তে হবে।

কারণ, আওয়ামী লীগের ঠাণ্ডারে বাহিনীর স্থির বিশ্বাস হয়ে গেছে, মোজাফ্ফরের দল, মনিসিং কমিউনিষ্ট পার্টি, মতিয়া ছাত্রদল, ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র– এসব দলগুলোকে কিলিয়ে সুখ আছে। রাবিন্দ্রীক মার্কসবাদে সমৃদ্ধ হয়ে এনারা ঘরের বউ-তে পরিণত হয়েছেন।

বলিষ্ঠভাবে বিরোধী দলের ও আন্দোলনমুখী ভূমিকায় অবতীর্ণ শক্তিগুলিকে ঠ্যাঙাতে গিয়ে আওয়ামী লীগ পাল্টা লগুর খাচ্ছে। বাইরে মার খেয়ে এসে, ঘরের বউ কিলোনোর মত মনি-মোজাফ্ফরের ছাওয়ালদের উপর আওয়ামী লীগের বীর পুঙ্গবরা বিষ ঝাড়ে।

এরোফ্লটের বিমানে মস্কোর ডিপ্লোমেটিক ব্যাগে করে মনিসিংদের জন্য আগামী রাজনীতির যে খসড়া এসেছে (যা সবিস্তারে বুঝে আসার জন্য কর্তাদের মস্কো যাত্রা) তার বাস্তবায়ন শুরু হবার আগেই আওয়ামী লীগ তার সাম্প্রতিক কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক কমিটির তৃতীয় দিনের বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঘরের বউ কিলিয়ে ফ্যাসীবাদী হামলা পর্বের উদ্বোধন ঘটাবে।

ভাগ্যের নির্মম পরিহাস হলেও সত্যি যে, মনি গং-এর আসন্ন 'সংগ্রামে' ব্যবহারের জন্য মস্কো তাদের ঢাকাস্থ মিশনের গুদামে যে বিপুল পরিমাণ পোষ্টারিং ও ডকুমেন্ট মুদ্রণের কাগজ এনে রেখেছে, তা এখানকার মস্কোওয়ালাদের উপর মুজিব সরকারের 'জবর কষণের' দুঃখজনক কাহিনীতে বোঝাই হয়ে আবার মস্কো ফিরে যাবে।

মস্কোর দাওয়াইয়ের ডিবা পলাতক মনিসিংদের ভ্যালভেট এয়ারকন্ডিশনে পরিপাটি সুদৃশ্য অফিস ভবনে মাথা কুটবে তাতে আর সন্দেহ কি।

বন্যা নিয়ন্ত্রণের নামে

বাংলাদেশের গলার আরেকটি ফাঁস তৈরী হচ্ছে

'হক-কথা'র এক সংখ্যায় 'বন্যা নিয়ন্ত্রণের বাস্তব পদক্ষেপ চাই' শিরোনামায় প্রকাশিত রিপোর্টে যে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছিল, তা এখানে সত্য বলে দেখা গেছে। বাংলাদেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণে মুরুব্বীয়ানা করে ভারত নিজের আখের গুছাতে চাইছে। বাংলাদেশ-ভারত যৌথ নদী কমিশনের বরাত দিয়ে সরকারী বার্তা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আগস্টের ৩ তারিখে পরিবেশিত সংবাদে বলা হয়েছে যে, কিভাবে ভারত ও বাংলাদেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা হবে তা ঠিক হয়ে গেছে। নদীর বুক খনন না করে বানানো হবে কৃত্রিম হ্রদতুল্য পানি সংরক্ষণাগার। এতে পানি আটক করে রাখা হবে বর্ষাকালে। শীতকালে পানি ছেড়ে দেয়া হবে।

যুক্ত নদী কমিশন সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে আসামের কাছার অঞ্চলে এরূপ জলাশয় নির্মাণের জন্য স্থান নির্বাচন করবেন।

ভারতীয় প্রভুরা নিজেরাই স্থান বেছে নিয়েছে ঃ আসামের কাছার। এরপর সেপ্টেম্বরে স্থান নির্বাচনের যে কর্মসূচী করা হয়েছে তা নির্ভেজাল প্রহসন।

বাংলাদেশের টাকা নিয়ে ভারত নিজের এলাকায় যে জলাশয় তৈরী করবে সেটি একটি বিরাট প্রকল্প। কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিতব্য এ প্রকল্পের ফল কি দাঁড়াবে সে সম্পর্কে পানি বিশেষজ্ঞগণ এখনই নিশ্চিত।

বাংলাদেশের কয়েকজন পানি বিশেষজ্ঞের সাথে যোগাযোগ করে জানা গেছে, পৃথিবীর আরও কয়েকটি দেশ এধরনের জলাশয় নির্মাণ করেছে। এতে বন্যা নিরোধের সম্ভাবনা কম। কারণ, পানি জমিয়ে রাখলে বর্ষাকালে প্লাবনের মাত্রা কিছুটা কম হবে, এছাড়া আর কোন ফায়দা নাই। এখন যেখানে বন্যায় এককোমর পানি দাঁড়ায়, তখন পানি দুই ইঞ্চি কম দাঁড়াবে, এই–যা। কিন্তু আসাম অঞ্চলে জলাশয় নির্মাণ করে মূল ফায়দা লুটবে ভারত সরকার। বর্ষাকালে জলাশয়ে পানি প্রবেশ ও শীতকালে পানি বের করার প্রবাহ কাজে লাগিয়ে উৎপাদিত হবে বিদ্যুৎ। ভারতের অন্ধকার প্রদেশ আসামকে সে বিদ্যুতে উজ্জ্বল করে ইন্দিরা গান্ধী তার ফ্যাসীবাদী কংগ্রেসের রাজনৈতিক ভাগ্যকে উজ্জ্বল করবেন।

এছাড়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা না করার চাবিকাঠি এবং শীতকালে পানি সরবরাহের মূল চাবি থেকে যাবে ভারতের হাতে। এটাকে আরেক ফারাক্কার মত ব্যবহার করে ভারত প্রয়োজনে বাংলাদেশের গলা টিপে ধরতে পারবে।

পনের বছর সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের পয়সা দিয়ে ভারত এমনিতরো বহু ফারাক্কা গড়বে। বাংলাদেশ যদি কোনদিন মেরুদণ্ড নিয়ে দাঁড়ায় তবু এসব কারণে ভারতের পদানত থাকতে হবে তাকে।

বাংলাদেশের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত মহা-প্রেমিকরা দেশের গলায় ফাঁস লাগাবার বিদেশী ষড়যন্ত্রে এভাবেও সহযোগিতা করছেন। নিকাশের পালা যেদিন শুরু হবে, সেদিনের জন্য দেশপ্রেমিকতার নামে বিশ্বাসঘাতকতার জবাব দানের জন্য এরা যেন প্রস্তুত থাকেন।

বাংলাদেশ বিমানের

পাইলট ক'জনকে হত্যার ষড়যন্ত্র

বোয়িং বিমান কিনতে চাইলে ভারতের পারমিশন নিতে হবে। ক্ষমতাসীন দেশপ্রেমিকরা এই শর্ত মেনে নিয়েছেন। আর এর আগে বাংলাদেশ বিমান গঠনের অনুমোদন ভারতের কাছ থেকে পাওয়া যায়নি।

বাংলাদেশের যে ডাকোটাটি বিধ্বস্ত হয়েছিল সেটি ধ্বংস এবং একই সাথে বহু অমূল্য ও

দক্ষ পাইলট শেষ করার পশ্চাতে ভারতীয়দের কারসাজি ও ষড়যন্ত্র ছিল বর্তমান– এটা আজ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

যেসব শর্তসাপেক্ষে ভারতের তাঁবেদার-রা বাংলাদেশ বিমান (বিবি) গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে তা আঁচ করতে পেরে বি.বি-র কর্মচারীরা এখন বিক্ষুব্ধ।

বাংলাদেশ বিমান এখন দুটি লক্কড় মার্কা পুরনো বিমান দিয়ে চলছে। এগুলি ভারতের দান। পরিত্যক্ত বিমানকে মৃত্যুশালা থেকে বের করে রংচং দিয়ে বাংলাদেশের হাতে দেওয়া হয়েছে। কাঠামোর ভিতর এগুলির ইঞ্জিন বাদামের খোসার অভ্যন্তরের শাসের ন্যায় অসংলগ্ন যাত্রী। বিমানে চড়লে তারা বুঝতে পারেন, ইঞ্জিনটা যেন এলোপাথাড়ি লাফাচ্ছে।

ধর্মের ঢাক আপনিই বাজে

'হক-কথা' যখন একথাগুলি বলেছিল তখন কারো ভালো লাগেনি– সরকার, ভারতীয় হাইকমিশন সবার গা জ্বালা শুরু হয়েছিল। কিন্তু এখন?

বাংলাদেশের বিমান ও জাহাজ চলাচল মন্ত্রী, মুক্তিযুদ্ধকালে মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক, প্রতিরক্ষা বাহিনী থেকে সম্প্রতি অপসারিত দেশপ্রেমিক জেনারেল ওসমানী সম্প্রতি বাংলাদেশ বিমানে কর্মচারী সমাবেশে বলেছেন, বাংলাদেশে বিমান ও জাহাজ চলাচল ব্যবস্থা গড়ে উঠার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। কোন কোন বিদেশী শক্তি এদেশে তাদের জাহাজ ও বিমান সার্ভিস খুলতে চাইছে। তারাই সকল দিক দিয়ে বাংলাদেশ বিমান ও বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনকে পঙ্গু রাখার ষড়যন্ত্রে মেতেছে।

আজ মন্ত্রীর মুখ দিয়ে যে কথা বের হলো আজ থেকে দু'-তিন মাস আগে 'হক-কথা' নির্ভরযোগ্য সূত্রের বরাত দিয়ে তাই প্রকাশ করেছিল।

'হক-কথা' বলেছিল, ভারত বাংলাদেশের ক'খানা জাহাজ চুরি করে নিয়ে গেছে। সেগুলি ফেরত দেবার নামগন্ধও সে নিচ্ছে না। 'হক-কথা' বলেছিল, বাংলাদেশকে দেওয়া 'বিশ্বতে' ভারত দূতের বিশ্বপ্রেম নেই। ভারত ধ্বংসপ্রাপ্ত একটি জাহাজকে ঘষেমেজে বাংলাদেশের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে মোটা দামে। এরকম আরও জাহাজ সে গছাবে। আমরা বলেছিলাম, চট্টগ্রাম বন্দরকে বিকলাঙ্গ রাখার জন্য ভারত তার নিজের লোককে বন্দরে অধিষ্ঠিত করার গোঁ ধরেছে। বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের সর্বোচ্চ পদে ভারত ইচ্ছা করেই একজন পাক-দালালকে অধিষ্ঠিত রেখেছে যেন ইচ্ছামত তাকে চালানো যায়।

বাংলাদেশের জাহাজ চুরি করেই ভারত ক্ষান্ত হয়নি। বাংলাদেশের পতাকা নিজ দেশের জাহাজে লাগিয়ে ভারত আন্তর্জাতিক কনফারেন্স লাইনে বাংলাদেশের মালের কোটা পরিবহন করে লক্ষ লক্ষ টাকার বৈদেশিক মুদ্রা কামিয়েছে।

অবশেষে মন্ত্রীও তার দফতর নিয়ে আন্তর্জাতিক চক্রান্তের কথা স্বীকার করলেন। অবশ্য এ কথা ঠিক, এটা একজন মন্ত্রীর পক্ষেই সম্ভব। জেনারেল ওসমানী ছাড়া সত্য কথা বলতে কারো সাহস হয় না। তারা সত্যের চাইতে মিথ্যাকে প্রশ্রয় দিয়ে ক্ষমতা আঁকড়ে থাকতে চান।

কিছুদিন পূর্বে নারায়ণগঞ্জে নৌবাহিনীর এক জাহাজে ভাসানী আরও একটি অতি সত্য কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আমার মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা যখন কঠিন প্রাচীরে আঘাতের পর আঘাত হেনে নড়বড়ে করে ফেলেছিল, তখনই ভারতীয় বাহিনী এসে একধাক্কায় ওটাকে ফেলে দিয়ে কৃতিত্ব নেয়। কিন্তু নয় মাসে আমার ছেলেরা যতদূর করেছে এটা অনন্য। বাকি কাজটুকু করতে তাদের ছয়

মাস, বড় জোর নয় মাস সময় লাগতো।

এশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ রণনীতিবিদ জেনারেল ওসমানী। তাঁর এ হিসাব যে কোন কষ্টিপাথরে যাচাই উত্তীর্ণ। হয়তো নয় মাস বিলম্বে স্বাধীনতা অর্জন করলে আমরা ছ'মাসে ২৫ হাজার কোটি টাকার সম্পদ লুট করার আশঙ্কা এড়াতে পারতাম নিজেরাই। ভারতও আমাদের মাথা কিনে নিত না।

'হক' কথা বলার বিপদ আছে। 'হক' কথা বলায় জেনারেল ওসমানী সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়কের পদ থেকে অপসারিত হয়েছেন। তাঁকে প্রতিরক্ষামন্ত্রীও করা হয়নি। তাঁকে করা হয়েছে শিপিং-বিমানমন্ত্রী। এখানেও 'হক' কথা বলা-এর জন্যও আবার তাঁকে দণ্ড পেতে হবে না তো?

ভাসানীর বাণী

যতদিন পর্যন্ত জামার পকেট থাকিবে ততদিন পর্যন্ত পকেটমারও থাকিবে। তেমনি যতদিন পর্যন্ত ব্যক্তিগত স্বার্থ ও মালিকানার চির সমাধি না হইবে ততদিন পর্যন্ত মানুষের সত্যিকারের কল্যাণ আসিবে না। ইসলামই ইহার চির অবসান ঘটাইয়া মানুষকে নিশ্চিন্ত সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের পথে নিয়া জীবনকে সুখী ও সমৃদ্ধিশালী করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারে। এই আদর্শ মানব জাতির জন্য মহাকল্যাণকর। ইহার সত্যিকারের রূপায়ণ ঘটিলে সকল শ্রেণীর শোষিত ও নির্যাতিত মজলুম মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তি অবশ্যম্ভাবী। ইসলামের আওতায় ছোট-বড়, অর্ধস্তন-উর্ধ্বস্তন সকল শ্রেণীর মানুষ সমানাধিকার লইয়া বাঁচিতে পারে। একমাত্র রব্বুল আলামীনের মালিকানা ও প্রভুত্ব ব্যতীত অন্য কাহারো মালিকানা স্বীকার করা যায় না। আল্লাহর চোখে সকল মানুষই সমান। তাই সাম্য, শান্তি, ভ্রাতৃত্বের সমাজ প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেই সর্বশক্তিমানের মালিকানাধীন সকল সম্পদ সকল বান্দাই সমভাবে বণ্টন করিয়া লইতে পারে।

আর বেশী দেরী নাই। বাংলাদেশে ইন্‌শাল্লাহ অতি শীঘ্রই সেই রূপ সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইবে। তখন এদেশে শোষক আর শোষিত, নির্যাতক আর নির্যাতিত, ধনী আর গরীব, সাম্প্রদায়িক আর সাম্প্রদায়িকতা বলিতে কিছুই থাকিবে না। ধর্মের নামে শোষণও চলিবে না। নিজ নিজ বিশ্বাস অনুযায়ী মানুষ নির্বিবাদে ধর্মের আচার অনুষ্ঠান পালন করিতে পারিবে। ইহার ফলে সকল সম্প্রদায়ের লোকের ভিতর ঐক্য ও প্রীতির সম্পর্ক গড়িয়া উঠিবে।

আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ ও মিথ্যা প্রচারণা চালানো হয় যে, ভাসানী কেবল সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে কিন্তু নিজে সরকার গঠন করিয়া দেখাইতে পারে না। তাঁহার (ভাসানীর) সরকার দেশ ও জনগণের কতটুকু উন্নতি করিতে পারে। তাই এবার আমি শেষ সিদ্ধান্ত নিয়াছি যে, বাংলাদেশে ইসলামী সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলে ইন্‌শাল্লাহ্ আমি নিজেই নির্যাতিত ও অধিকার বঞ্চিত মজলুম মানুষের সহযোগিতায় সরকার গঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করিব।

দুর্ধর্ষ এমসিএ-র গাড়ী চুরি

৭ই জুন ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে বন্ধুপিতা 'ফেরেস্তা' বলে সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন সেই সার্টিফিকেটধারীদের অন্যতম চিটাগাং-এর এমসিএ জনাব আখতারুজ্জামান গত মঙ্গলবার চোরাইগাড়ীসহ ধরা পড়েন। উত্তরা ব্যাংকের এই গাড়ীটি (ঢাকা ক-৬৭১৭) কয়েক মাস আগে চুরি যায়। কেবলমাত্র নম্বরটি বদলিয়ে (চট্টগ্রাম ঘ-১০৫০) জাদরেল এমসিএ সাহেবটি যখন নিশ্চিতমনে সস্ত্রীক বঙ্গবন্ধু

এভিন্যুতে হাওয়া খেতে মশগুল, তখন পুরাতন ড্রাইভার গাড়ীটিকে চিনতে পেরে ধাওয়া করেন। এবং এমসিএ ও তার পরিবারের সকলকেসহ গাড়িটিকে রমনা থানায় হাজির করেন। আপাততঃ গাড়ীটি থানার হেফাজতে আছে। কিন্তু এমসিএ সাহেব নাকি জব্বর গোস্বা হয়েছেন এবং খবরে প্রকাশ এই গোস্বার আগুনে নাকি চুরি ধরায় উৎসাহী দু'একজনের চাকুরী যায় যায় অবস্থা।

লুটপাটের উত্তর সেক্টরে পজিশন তৈরী হচ্ছে

ঢাকাই সাংবাদিকদের নিষিদ্ধ শরাবানে তহুরা গিলিয়ে হার্ডিঞ্জ ব্রিজ মেরামতে ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারদের প্রাণান্ত চেষ্টার কয়েক 'পোজ ছবি' জাতীয় সংবাদপত্রে প্রকাশ করা হয়েছিল কিছুদিন আগে। সে থেকে ভয়ানক গতিতে বন্ধুরা হার্ডিঞ্জ ব্রিজ মেরামতে লেগেই আছেন। প্রধান বন্দর চট্টগ্রামের সাথে রাজধানীর সংযোগ বিচ্ছিন্ন রেখে ভৈরবের পুল এখনও মেঘনার পানি খাচ্ছে। ভারতীয়রা নিজের ঘরের দরজা থেকে ঢাকা অবধি সেতুবন্ধ বাঁধবার কোশেশে লেগে আছেন।

ভারত থেকে ট্রেনগুলি গম-ভুট্টার 'অতি বিরাট চালান' নিয়ে পার্বতীপুর, রাজশাহীতে ঢুকছে। যাবার সময় বিনা টিকেটে বোঝাই হয়ে যাচ্ছে সম্পদরাজী। হার্ডিঞ্জ ব্রিজখানা হয়ে গেলে ঢাকার মানুষকে অন্ধকারে রেখে ওদিক দিয়ে লুটপাটের কারবার আরও জমবে ভালো।

স্বাধীনতা কবে আসবে

বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু সেই স্বাধীনতার সাথে এদেশের কৃষক, মজুর, কামার, কুমার, তাঁতী তথা অধিকার বঞ্চিত ও নির্যাতিত শোষিত মজলুম মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি আসেনি। এখনো অর্থনৈতিক বণ্টন ব্যবস্থার বঞ্চনায় এরা বঞ্চিত। অতীতের সরকারগুলোর আওতায় যেমনিভাবে শোষক শ্রেণীর ভাগ্যাকাশ উজ্জ্বল হতে উজ্জ্বলতর হতো ঠিক তেমনিভাবে আজও এক শ্রেণীর শোষকের উদ্ভব হয়েছে এবং তাদের অবস্থা দিন দিন উন্নতির চরমে পৌছতে যাচ্ছে। অপরদিকে যাদের শ্রমের বিনিময়ে এ দেশের সকল শ্রেণীর মানুষের অন্নের সংস্থান হয়, স্বার্থবাদীদের স্বার্থের, পুঁজিপতির পুঁজির, ভোগান্বেসীর ভোগের উপকরণাদি যোগার হয় সেই কৃষক, মজুর, কামার, তাঁতীদের জীবন আজ অবনতির চরম ধাপে উপনীত। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের অগ্নিমূল্যের জন্য তারা যে কিরূপ দুর্ভোগের মধ্য দিয়ে দিন কাটাচ্ছে তা চর্মচোখে না দেখে অনুধাবন করা মোটেই সম্ভব নহে।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড কৃষক-শ্রমিক। এদের উপর নির্ভর করেই এদেশের কলকারখানা ও শহরতলীর আকাশচুম্বী অট্টালিকাগুলো গড়ে উঠেছে। অথচ ইহারাই আজ এক মুঠো অন্নের জন্য পথে বের হয়েছে। আমরা অতীতেও লক্ষ্য করেছি, এখনো করছি, ভূমিহীন কৃষক মজুরেরা কোন কর্মের সংস্থান করতে না পেরে স্ত্রী পরিবার নিয়ে শহরে এসে ভিড় জমাচ্ছে। বাংলাদেশের প্রত্যেক জেলাতেই এদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বেড়ে যাচ্ছে। আমাদের চোখের সম্মুখেই এদের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা ভাতের অভাবে জঠর জ্বালায় কাঁদছে। শুধু তাই নয়, ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে রাস্তায় রাস্তায়, দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঢাকা শহরের অলিতে-গলিতে সদরঘাটের ফুটপাতের ধার দিয়ে এই রূপ অসংখ্য পরিবার নৌকার ছৈয়ের মত করে অতি সংকীর্ণ স্থানে পশুর চেয়েও হীন ও অবহেলিত অবস্থায় জীবনযাপন করছে। শুধু ঢাকাই নহে, বাংলাদেশের উনিশটি জেলাতেই এই সমস্যা বিদ্যমান।

অত্যাচারের বিরুদ্ধে
ভাসানীর প্রতিবাদ

রাজশাহী জেলার পোরশা থানার অন্তর্গত খোর্দ্দ হরিপুর প্রকাশে চুলিয়াপাড়া ও তৎপার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের নিরীহ জনসাধারণ বিশেষ করিয়া বিরোধী দলীয় রাজনৈতিক কর্মীগণের উপর পুলিশী জুলুম ও অত্যাচারের মাত্রা পাক আমলকেও হার মানিয়েছে।

ঘটনায় জানা যায় যে, ২/৩ দিন অনাহারের জ্বালায় ছেলেমেয়েরা অতিষ্ট হইয়া উঠিলে উক্ত চুলিয়াপাড়া সাকিনের সাঁওতাল সম্প্রদায়ভুক্ত গদাই মাল নামক এক ব্যক্তি উক্ত গ্রামের হাজী চান্যতুল্লা মন্ডলের গাছ হইতে একটি কাঁঠাল লইয়া অনাহারে ক্লিষ্ট ছেলেমেয়েদিগকে খাওয়াইলে পর হাজী সাহেবের হুকুমমত তাহার 'মুক্তিফৌজ নামধারী' এক নাতি গদাই মালকে প্রকাশ্য দিবালোকে পিটাইতে পিটাইতে মারিয়া ফেলে। তৎসম্পর্কে থানায় খবর দেওয়া সত্ত্বেও থানা কর্তৃপক্ষ কোন ব্যবস্থা না নেওয়ায় উত্তেজিত জনতার হাতে হাজী সাহেবের মৃত্যু হয়।

আমি জানিতে পারিলাম যে, উল্লিখিত ঘটনার পর স্থানীয় এমসিএ পুলিশ বাহিনীসহ তথায় যান এবং ঐ ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া ঐ এলাকায় সন্ত্রাসের রাজত্ব বিস্তার করিতে ব্রতী হন। উক্ত এমসিএ-র সহযোগিতায় পুলিশ বাহিনী এ এলাকায় বহু নিরীহ লোককে বিশেষ করিয়া বিরোধী রাজনৈতিক দলীয় কর্মীদিগকে অকারণে মারপিট ও গ্রেফতার করিতেছে। ভয় প্রদর্শন করিয়া এবং অন্যায়ভাবে অর্থ আদায়ের খবরও পাওয়া যাইতেছে। অবস্থা এমন দাঁড়াইয়াছে যে, বহু লোক প্রাণহানি ও অত্যাচারের ভয়ে চাষাবাদের কার্য ফেলিয়া গৃহত্যাগ করিয়া অন্যত্র পালাইয়া গিয়াছে।

আমি সরকার ও সরকারী বাহিনীর এবংবিধ অত্যাচারের তীব্র প্রতিবাদ করিতেছি এবং অবিলম্বে অত্যাচার বন্ধ করার জন্য সরকারকে আহ্বান করিতেছি।

ইয়ং ফুয়েরারের ম্যামোরি খারাপ

দেশে ফ্যাসীবাদ আমদানীর মূল দায়িত্বে অবতীর্ণ পলিটিক্যাল সেক্রেটারী তোফায়েল আহমদ মওলানা ভাসানীর বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে তার ফ্যাসীবাদী ঝটিকা বাহিনীকে অগ্নিতপ্ত করার কাজ এগিয়ে নিতে নেমেছেন। মওলানা ভাসানীকে আন্তর্জাতিক ধারক হিসাবে চিত্রিত করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, চীন ও আমেরিকার ষড়যন্ত্র মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে এগিয়ে চলছে। উগ্রপন্থীরা সে কাতারে সামিল।

বাংলাদেশে ফ্যাসীবাদ আমদানীর কঠিন দায়িত্বে পড়ে তরুণ নেতার মেমোরি খারাপ হয়ে গেছে। আমেরিকার কাছে দেশখানা বন্ধক দিয়ে, কোনালীকে রেডকার্পেট অভ্যর্থনা দিয়ে, কিসিঞ্জারের গোপন সফরের আঞ্জাম করে তাঁর প্রভু শেখ মুজিব আমেরিকার বাংলা প্রাপ্তির কোন সাধই তো অপূর্ণ রাখেননি। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মার্কিনী নকশার অনুবর্তী করে তারাই বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির রূপরেখা নির্ণয় করছেন। প্রধানমন্ত্রীর পলিটিক্যাল সেক্রেটারী হিসাবে এগুলি তাঁর হাত ঘুরেই তো হচ্ছে। তিনি হঠাৎ করে কেন ভুলে যান যে, তাঁর প্রভু ছাড়া আমেরিকার এজেন্ট অন্য কেউ হতে পারে। তাঁর প্রভু যদি তাৎপর্য নিয়ে অধস্তনের কথা কয়টি ভাবেন, তাহলে তিনিও লজ্জিত হবেন।

চীনের চক্রান্ত যদি এদেশের অভ্যন্তরে চলতেই থাকে, তাহলে প্রচণ্ড শক্তিধর সরকার কোন ভরসায় চুপ করে বসে? তারা জাল ফেলে চক্রান্ত আবিষ্কার করুন। প্রকাশ্য আদালতে বিচার করুন। তাতে কেউ বাধা দিচ্ছে না। মওলানা ভাসানী বহু আগেই এ

চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন শেখ মুজিবকে।

কিন্তু শেখ মুজিবর ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা চ্যালেঞ্জ গ্রহণের জন্য অগ্রসর হচ্ছে না। বরং খবর পাওয়া যাচ্ছে, এই সরকারই গোপনে লাইন লাগাচ্ছে চীনের সাথে। বার্মায় গিয়ে সামাদ চীনা রাষ্ট্রদূতের সাথে গোপন বৈঠক করে এসেছেন। এগুলি কিসের লক্ষণ? চক্রান্ত ও দুর্বলতার নয় কি?

পলিটিক্যাল সচিব এসব কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে স্বেচ্ছাসেবক ক্ষ্যাপাবার জন্য আবোলতাবোল বকেছেন। অবশ্য তার অভীষ্ট সফল হয়েছে। ক্ষিপ্ত স্বেচ্ছাসেবক ক্ষ্যাপা সারমেয়র মত একদল ছাত্রকে কামড়িয়েছে সেদিন বিকালেই।

এমসিএ-রা এখন পার্সেন্টেজ খাচ্ছেন

পাক-আমলে বিডি মেম্বার এবং চেয়ারম্যানদের নিকট হতে সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন) এবং তার সহকারীরা উন্নয়নমূলক কাজের জন্য সরকারী বরাদ্দকৃত টাকা থেকে শতকরা ১০ টাকা বা ১৫ টাকা সেলামী হিসাবে রেখে দিত। এখন এমসিএ-রা ঠিক অনুরূপভাবে সরকারী উন্নয়নমূলক কাজের জন্য বরাদ্দকৃত টাকা হতে শতকরা ২০/২৫ সেলামী রেখে দিচ্ছে।

ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোনা মহকুমার পূর্বধলা, দুর্গাপুর এবং কমলাকান্দা থানার এমসিএ-রা এরূপভাবে সরকারী টাকার অপচয় করছে। এই এমসিএদের নিজস্ব একটা দল আছে। তারা প্রত্যেকেই আওয়ামী লীগের লোক, এটা তাদের দাবী। এদেরকে ওয়ার্কস প্রোগ্রামের কাজ দিতেই হবে। এদেরকে উন্নয়নমূলক কাজের জন্য চেক দিলে চেক ভাঙ্গিয়েই এরা মদ খায়, জুয়া খেলে। এরা এদের দলীয় প্রধান অর্থাৎ এমসিএ সাহেবের নিকট হতে চিঠি (অর্ডার) নিয়ে আসে যাতে চেক বা প্রজেক্টের কাজ দেওয়া হয়। না দিলে তারা এমসিএ-দের নিকট কেঁদেকেটে নালিশ করে। ফলে সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্তৃপক্ষকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নিতে হয় বা তাদেরকে দালালীর ভয় দেখিয়ে চেক বা প্রজেক্টের কাজ তাদের নামে ইস্যু করিয়ে নেয়। যে এমসিএ সাহেবের বদৌলতে ওরা চেক বা প্রজেক্টের কাজ পায় তাদেরকে এরা প্রজেক্টের টাকা থেকে শতকরা ২৫ টাকা হারে সেলামী দিয়ে থাকে। মাঝে মাঝে এমসিএ-দের বাসায় মাছ, মুরগীও যায়। এমসিএ গ্যাংটির মিথ্যা মাস্টার রোলের উপর সুপারভাইজারগণও প্রাণের ভয়ে দস্তখত দিতে বাধ্য হচ্ছে। শেষাবধি সার্কেল অফিসারকেও নিরুপায় হয়ে এভাবে মাস্টার রোল ও ভাওচার মেনে নিতে হচ্ছে।

রিলিফের গম-চালে ধর্মসেবা

ফরিদপুর জেলার সদর থানার ৬নং কৃষ্ণপুর ইউনিয়নের রিলিফ চেয়ারম্যান এমসিএ-র অনুমতি নিয়ে আনন্দ আশ্রমের কীর্তনে ২০ মণ, ওয়াজের জন্য ১৫ মণ, চেয়ারম্যান সাহেবের বাড়ীতে গানের জলসার জন্য ১২ মণ, কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য ৯০ মণ (প্রতি ইউনিয়ন থেকে) গম ও চাল বরাদ্দ করেছেন। স্থানীয় জনসাধারণ এতে আপত্তি করলে 'এ ব্যাটারা রাজাকার ছিল' বলে চেয়ারম্যান তেড়ে আসে। তাঁদের মুখের বুলি শুনুন ঃ গুড়া দুধের হিসাব নেয় কোন শা...চিনি খাবার মুখ কার আছে– রিলিফের টাকা পাবে আহ্বায়করা– তারাই তো কষ্ট করে দেশ স্বাধীন করেছে।

হক-কথা

২৬শে শ্রাবণ শুক্রবার

সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াই জোরদার করতে হবে

এদেশের ক্ষমতায় আসীন সাম্রাজ্যবাদের দালালরা দেশকে আবার তুলে দিয়েছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের হাতে। এদেশের জনগণের দীর্ঘদিনের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের ফলকে নস্যাৎ করে আমাদের কষ্টার্জিত স্বাধীনতাকে তাঁবেদারের স্বাধীনতায় পরিণত করে বাংলাদেশ সরকার দেশকে নতুন 'সিয়াটোর' মধ্যে টেনে নিয়েছে। নির্দোষ অর্থনৈতিক সহযোগিতার নামে এশিয়ার আরও কতিপয় গণবিরোধী শাসকগোষ্ঠীর সাথে গাঁটছাড়া বেঁধে বাংলাদেশ সরকার এদেশের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে করেছে পদদলিত।

সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ, পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের জনগণের মরণপণ সংগ্রামের নিয়ন্ত্র- হাতল ভারতের ইন্দিরা গান্ধীর হাতে তুলে দেবার মর্মান্তিক পরিণতি হিসাবেই ভারতের পছন্দসই বাংলাদেশীয় সাম্রাজ্যবাদের দালালরা ৩০ লাখ লাশের উপর দিয়ে সদর্পে হেঁটে গদীতে আরোহণ করেছে।

দ্বিচারিণী ভারতের ক্রুর ও কুটিল অভিষ্ট হচ্ছে এতদঞ্চলে তার প্রভুদেরকে নিয়ে ভাগবাটোয়ারায় টাউটবৃত্তি করা এবং ধীরে ধীরে তাদের কৃপায় নিজের তাঁবেদারী এলাকার সম্প্রসারণ ঘটানো। ভারত আজ তার অনুগত বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠীকে দিয়ে বিপজ্জনক খেলা খেলতে শুরু করেছে। বাংলাদেশকে বাঘপ্রলুব্ধ করার টোপ ছাগ বৎসের ন্যায় ব্যবহার করে ভারত বাংলাদেশকে তুলে দিয়েছে আমেরিকার হাতে।

সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল সংগ্রাম পরিচালনার ঐতিহ্যে মহীয়ান বাঙ্গালী জাতি, এদেশের সাচ্চা প্রগতিশীল শক্তি এবং দেশপ্রেমিকদের সামনে আজ যুগের বৃহত্তম চ্যালেঞ্জ উপস্থিত হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদের ক্রুর থাবার নিচে বাংলাদেশকে ছুঁড়ে ফেলার পর আজ তাদেরকে ঠিক করে নিতে হবে কর্তব্য। এ কর্তব্য হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ ও তার দালালদের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম চালিয়ে দেশের স্বাধীনতা ও স্বকীয়তাকে রক্ষা করা।

কারো কৃপায় স্বাধীনতা ভোগ করার পরিণতি যে কতটা মর্মান্তিক ও ভয়াবহ, আজ দিবালোকের মত তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আজ সবাই একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে, স্বাধীনতা শোষিত সর্বহারা মানুষের ও মুক্তির জন্য আমাদের কাছ থেকে পুরোপুরি মূল্য আদায় করা হয়েছে, কিন্তু বাঞ্ছিত স্বাধীনতা আমাদের আসেনি।

সকল প্রকার সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ, নব্য উপনিবেশবাদ ও সম্প্রসারণবাদের বিরুদ্ধে লড়াই না করলে এসব অশুভ শক্তির বাহন পুঁজিবাদ, সামন্তবাদ, শোষণবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা যায় না, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দ্ব্যর্থহীন দৃঢ়তায় লড়াই না চালিয়ে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামকে সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছানো অসম্ভব, আজ বাংলাদেশের প্রতিটি সচেতন মানুষ মর্মে মর্মে তা উপলব্ধি করছে।

ভাবাবেগপূর্ণ শ্লোগানের জোয়ারে দেশবাসীকে ভাসিয়ে নিয়ে সাম্রাজ্যবাবাদের দালালরা সাম্রাজ্যবাদের পদপ্রান্তে তাদের নৌকার নোঙ্গর ফেলেছে। ভাত-কাপড়ের অভাব, রোগ-ব্যাধি করার নিষ্পেষণ, বেকারত্ব, দুর্ভিক্ষের পদধ্বনির মত বিভিন্ন আভ্যন্তরীণ কারণে দেশের জনগণ যখন বিভ্রান্ত, ঠিক তখনই সাম্রাজ্যবাদের দালালরা নৌকা থেকে চুপিসারে নেমে সাম্রাজ্যবাদের পায়ে আত্মসমর্পণ করেছে। রাশিয়ার নাকের ডগার উপর দিয়ে শেখ মুজিবকে লন্ডন ছিনিয়ে

নেওয়া, পোদগর্ণীর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সফরের পর পরই মার্কিন প্রভুর ইঙ্গিতে সামাদের জাকার্তা-ব্যাংকক সফরের ফলে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, এদেশের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ভূমিকার রক্ষাকবচ হিসাবে যারা রাশিয়ার উপর নির্ভরশীলতার নোসখা দেয় তারা ভ্রান্ত।

এদেশের জনগণ তাদের জীবনোপলব্ধি থেকে অতীতের ন্যায় বর্তমানে পুনরায় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইতে অবতীর্ণ না হলে ঐ রাশিয়াও শেষাবধি ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাথে স্বার্থ ভাগাভাগির আসর জমিয়ে বসবে।

বিশ্বব্যাপী পরিচালিত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আপোষহীন লড়াইগুলোর সাথে একাত্ম হয়ে আজ বাংলাদেশের জনতাকে শেষ লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিতে হবে। জনগণের সংগ্রামকে ধোঁকা দিয়ে হাতের মুঠোয় পুরবার সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের বিরুদ্ধে সতর্ক থেকে আজ বাঁধতে হবে জোট। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াইয়ের রণাঙ্গনে জনতার জন্য বিজয়ের লালসূর্য ছিনিয়ে আনার পূর্ব পর্যন্ত আমাদের মুক্তি নেই।

এশিয়ায় রুশ-মার্কিন স্ট্র্যাটেজী বদলাচ্ছে

অর্বাচীন সরকার আগুন নিয়ে খেলছে

দক্ষিণ ও পূর্ব-এশিয়ায় রুশ-মার্কিন স্ট্যাটেজী বদলাচ্ছে। সম্পদশালী এশিয়াকে ভাগাভাগি করে নেবার নতুন খেল চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। মার্কিন তাঁবেদার 'আসপাক' জোট ভেঙে দেয়া হচ্ছে। সোস্যালিস্ট ইন্টারন্যাশনালের জেবো নয়া মার্কিন তাঁবেদারগোষ্ঠী দাঁড় করানোর কাজ চলছে গোপনে। রাশিয়াও চেষ্টা করছে দক্ষিণ এশিয়ার পর আরও কিছু অঞ্চল দখল করতে। কিন্তু সুচ্যাগ্র স্থান আর আমেরিকা ছাড়তে নারাজ। রাশিয়ার সাথে দর কষাকষির উদ্দেশ্যে ভারত বাংলাদেশকে নিজের প্রতিভূরূপে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নারকীয় চক্রান্তের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। তাই সামাদ গেছেন ইন্দোনেশিয়া ও থাইল্যান্ড। এশিয়াকে ভাগাভাগি করার আসন্ন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের জন্য পজিশন নিচ্ছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ। বাংলাদেশের অর্বাচীন সরকার আগুন নিয়ে খেলতে নেমেছে। সাড়ে সাত কোটি মানুষকে সাম্রাজ্যবাদীদের শক্তি পরীক্ষার দ্বন্দ্বে কামানের খোরাকে পরিণত করবে এরা। জনগণ নিজেকে না বাঁচালে এ চক্রান্তের অনিবার্য পরিণাম থেকে বাঁচোয়া নেই। সাম্রাজ্যবাদী, সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের বিরুদ্ধে শক্তিশালী জনমত গড়ে তুলে এ চক্রান্ত প্রতিরোধ করতে হবে।

বৃটিশ তাঁবেদার টেঙ্কু আবদুর রহমানের দেশ মালয়েশিয়া আশেপাশের দেশগুলি নিয়ে এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় মৈত্রী জোট গড়েছিল এতদঞ্চল থেকে ১৯৭২ সালে বৃটিশ বাহিনী অপসারণের পর 'সবে মিলে' একযোগে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পদসেবায় লিপ্ত হবার মানসে। সম্প্রতি ম্যানিলা থেকে কূটনৈতিক মহলের বরাত দিয়ে বার্তা প্রতিষ্ঠান খবর দিয়েছে, স্বয়ং মালয়েশিয়া সেই সাধের জোট 'আসপাক' ছেড়ে দিচ্ছে।

ইন্দোনেশিয়ার সুহার্তো, মালয়েশিয়ার তুণ আবদুর রাজ্জাক, সিঙ্গাপুরের লী কুয়ান, ফিলিপাইনের ফার্ডিনেন্ড মার্কোস, থাইল্যান্ডের সাবেক ভূমিবল বর্তমানের জেনারেল প্রাফাস এ জোট গড়েছিল নিরপেক্ষতা, স্বনির্ভরতা, পারস্পরিক সহযোগিতার বুলি কপচিয়ে। এটা ছিল এতদঞ্চলব্যাপী একক অধীশ্বর হিসাবে

সরাসরি আমেরিকা অবতীর্ণ হবার পূর্বে সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদারবর্গের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত উদ্যোগ। 'সময় কাটুক' বলে আমেরিকার 'বেসরকারী' ফ্রি ওয়ার্ল্ডবাদীরা এর প্রতি সোচ্চার সমর্থন দিয়ে যাচ্ছিল, পরোক্ষ মার্কিন আশীর্বাদ ছিল এ সংস্থার জীবনীশক্তি। আজ এ জোটটির বৃন্ত থেকে একটি একটি করে তাঁবেদার খসে পড়ছে। এটা কিসের ইঙ্গিত?

মালয়েশিয়ার 'ভাল্লাগেনা' মনোভাব প্রকাশ পাবার আগে, জুলাই মাসের প্রথম পক্ষে, সিঙ্গাপুরে আমেরিকান প্রফেসরদের উপস্থিতিতে একটা তাত্ত্বিক সম্মেলন হয়েছে। সম্মেলনটির উদ্যোক্তারা 'এশিয়াকে প্রভাবমুক্ত কর' শ্লোগান হেঁকেই ওয়াশিংটনের দিকে মুখ করে সেজদায় পড়েছে। দীর্ঘ এ সেজদাটিই হচ্ছে দীর্ঘ তিন দিনব্যাপী তাত্ত্বিক সম্মেলন।

মজার ব্যাপার হলো, ফিকে লালচে জোবা পরে যে সোস্যালিস্ট ইন্টারন্যাশনাল নামক সংস্থা বিশ্বস্থতার সাথে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দালালী করে আসছে, তাদের বক্তব্যের প্রতিধ্বনি তুলে সিঙ্গাপুরের লেজামার্কা সম্মেলন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সম্ভাবনাময় অর্থনৈতিক ভবিষ্যত, অঞ্চলকে সবুর ধরে নিরপেক্ষ রাখলে তার রাস্তা নেওয়ার গুণাবলী, এতদঞ্চলের দীর্ঘ রাজনৈতিক ঐতিহ্য জপ করেছে। ফাঁকে মাঝে ভিয়েতনামে মার্কিন হামলার 'কঠোর' সমালোচনাও তারা করেছেন, জিহ্বার স্বাদ বদলাবার উদ্দেশ্যে।

এসব মিলে যোগফল যা দাঁড়ালো তা হচ্ছে ঃ নিতান্ত পথ ভুলে সিঙ্গাপুরে এসে পড়া মার্কিন মানবতাবাদী ও সমাজতন্ত্রী অধ্যাপকরা চোখের সামনে একটা সম্মেলনে ঢুকে পড়ে উদ্যোক্তাদের মহান অভীষ্টের মহত্ত্ব লক্ষ্য করে খুবই মুগ্ধ হলেন। 'জঘন্য' মার্কিন সরকারের বিরুদ্ধে 'একটানা' সংগ্রাম চালানোর 'অভিজ্ঞতা' থেকে এসব মুসাফির অধ্যাপক দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে 'নিজে বাঁচো' আসল চিচিংফাঁক শিখিয়ে দিয়ে গেলেন। নেপাল-ভারত-বাংলাদেশ-পাকিস্তান-আফগানিস্তানের পর এদিকে কোন স্কোপ বা সুযোগ আসে কিনা তা অনুসন্ধানের জন্য জনৈক রাশিয়ান নেতার সিঙ্গাপুর আগমনটি এই বিপ্লবী সম্মেলনের মুখে পড়ে পানসে হয়ে গেল। বেচারা শেষে নিতান্ত পথিমধ্যে জিরানোর পালা শেষ করে শেষ আশ্রয় পূর্ব ইউরোপের দিকে পাড়ি জমালেন।

ক্রেমলিনের হিসাব অনুযায়ী দক্ষিণ-এশিয়া তার হাতের মুঠোয়, দক্ষিণ ভিয়েতনামী মুক্তিবাহিনীর কষ্টার্জিত বিজয়কে তুরুপ হিসাবে আমেরিকার সামনে ফেলে মস্কো কর্তৃক সুবিধা আদায় সত্ত্বেও উত্তর ভিয়েতনামের উপর ক্রেমলিনের অনিবার্য প্রভাব রয়েছে। এখন মধ্যবর্তী 'গ্যাপ'টুকু পূরণ হলেই চলনসই একটা এশীয় সাম্রাজ্যের অধিপতি হয়ে ক্রেমলিন প্রজাহিতৈষি শাসনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে। কিন্তু আশা ভুণ্ডুল। কোসিগিন যাবার দিনে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সাম্রাজ্যবাদের পদলেহী জাত টাউটরা 'সবে মিলে' সোশ্যালিজমের কলেমা পড়তে লেগে গেছে।

এ নাটক থেকে একটা জিনিস স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, এশিয়ার খেলার মাঠে দুই নাটেরগুরু সমান তৎপর। এশিয়াকে পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের কায়দায় ভাগাভাগি করে নেবার জন্য রাশিয়া ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ মাঠে নেমে পড়েছে। এতদিনের খেলা ভুণ্ডুল হয়ে গেছে। ফের পহেলে সে বলে একজন দক্ষিণ দিক থেকে একজন পূর্ব দিক থেকে আখের গুছিয়ে আনছে।

এশিয়া-আফ্রিকা-ল্যাটিন আমেরিকার নির্যাতিত জনগণ মুক্তির পথ হিসাবে সমাজতন্ত্রকে বেছে নিতে আগ্রহী। তাই এই দুই সাম্রাজ্যবাদও একজন সনাতন সমাজতন্ত্রী অপরজন বাঁকা গলির সমাজতন্ত্রী সেজেছে আজ।

সিঙ্গাপুরের সম্মেলন দৃষ্টে মনে হচ্ছে,

সোস্যালিস্ট ইন্টারন্যাশনালের জারজ সন্তানেরা এবং পশ্চিম জার্মানীর সাবেক নাৎসী অধ্যাপক চক্রের দ্বারা পালিত 'সাবভার্সান ইন সোশ্যালিজম থ্রো সোশ্যাল ডেমোক্রেসী' (সামাজিক গণতন্ত্র দিয়ে সমাজতন্ত্রের সম্ভাবনা বিনাশ করা) রণনীতির যুগপৎ সাঁড়াশী প্রয়োগ হবে এশিয়ায় মার্কিনের তরফ থেকে। সিঙ্গাপুর তাইওয়ানে 'সমাজতন্ত্রের' পরীক্ষা-নিরীক্ষায় লিপ্ত সোশ্যালিস্ট ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের কতিপয় ইংরেজী কাগজের মাধ্যমে বিষ ছড়াচ্ছে। উক্ত ইন্টারন্যাশনাল সংস্থা বাংলাদেশের আওয়ামী লীগের কর্তা ও সরকারী মহলের সাথে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সেরে গেছেন মে মাসে। জন স্টোন হাউস আওয়ামী লীগ অফিসে বঙ্গ পিতার উপস্থিতিতে বিপুল সম্বর্ধনা পেয়ে বলেছেন সম্ভাবনা আছে বাংলাদেশের। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রতিবেশীদের সহযোগিতায় বাংলাদেশ অর্থনৈতিক কাঠামোকে দাঁড় করাতে পারবে। নমুনা দেখুন ঃ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পশ্চিম জার্মানী বাংলাদেশের চাইতে শোচনীয় অবস্থায় পৌছেছিল। তবু আজ তারা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির উচ্চ শিখরে। যুক্তিযুক্ত অর্থনৈতিক কর্মপন্থাই এ পথের পাথেয়।

পশ্চিম জার্মানী যে আমেরিকা ও বৃটেনের কাছে কম করে হলেও সাতদফা বন্ধকে রয়েছে, বার্লিন শহরটিকেও চার ভাগ করে এক-এক অংশ এক-একটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পদতলে নিবেদিত রয়েছে জন স্টোন হাউস এসব কথা বলেননি।

'আসপাক' ভেঙ্গে গেলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রত্যক্ষ মার্কিন নিয়ন্ত্রণে আরেকটি 'নির্দোষ' গ্রুপ গড়ে উঠবে। এরা হবে রাশিয়ার প্রতিপক্ষ– মার্কিন তরফের। সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক চক্রান্তের সর্বশেষ হাতিয়ার প্রযুক্ত হবে এতদঞ্চলে।

এতে আর আশ্চর্যের কিছু নেই যে, রাশিয়ার সাথে ভারতের গোপন প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিণতিতে ভারত তার 'নবজাতক' বাংলাদেশকে নিয়ে রাশিয়ার ঘর থেকে বেরিয়ে যাবো, যাবো করছে।

শক্তিমান ইন্দিরা গান্ধী আমেরিকার ঘরে উঠবার জন্য ইঙ্গিত করলে যে কোন সময় বেরিয়ে আসতে পারে, তকে যুগপৎ দুজনের ঘর করার সুযোগটা যতক্ষণ পারা যায় সে নেবেই।

এই দ্বিচারিণী খেলায় অবতীর্ণ ভারত পায়ের ত্রস্ত করার জন্য, হেলেদুলে ইচ্ছামাফিক চলার সুবিধার জন্য বাংলাদেশকে কাঁধ থেকে নামিয়ে আগামী দিনের 'ঘর'টা দেখিয়ে দিয়েছে, যাও খোকা ও ঘরে গিয়ে বসোগে, আমি আসছি।

আর এ আজ্ঞা পেয়ে বাংলাদেশ হঠাৎ করে দক্ষিণ পূর্ব-এশিয়ার ব্যাপারে অতি মাত্রায় সচেতন হয়ে উঠলো। পররাষ্ট্রমন্ত্রী সামাদ সাংবাদিক নয় খোদ সম্পাদকদের ডেকে নিয়ে বললেন, জোট নয়, গ্রুপ নয়, সৎ প্রতিবেশী নিয়ে বাঁচবার জন্য ভৌগলিক অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে দক্ষিণ-এশিয়া আমাদের কাছে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। তাই ইন্দোনেশিয়া যাচ্ছি। কালই যাবো, ব্যাংকক হয়ে।

ইন্দোনেশিয়ায় গিয়ে সুহার্তো ও আদম মালিকের সাথে নীরব নিভৃতে আলাপ হয়েছে সামাদের। মার্কিন এজেন্ট সুহার্তোর সাথে সামাদ সাহেব ভবিষ্যত 'আসপাকের' কাঠামো, ভূত-ভবিষ্যত নিয়ে আলোচনা করেছেন গোপনে। ওসব কথার বিন্দু বিসর্গও এখন প্রকাশ তাঁরা করতে পারেন না। তবে গোপনে কি আলোচনা হলো সেটার জল্পনা-কল্পনা থেকে জনগণকে ফিরিয়ে রাখার জন্য মার্কিন বার্তা সংস্থার মাধ্যমে একটা 'গোপন' খবর ফাঁস করে দিলেন তাঁরা। সে খবরটি হলো মুজিব-ভুট্টো বৈঠকের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হয়েছে, সামাদ তা মানেননি। আসলে এটা একটা ভাওতাবাজী। বাংলা

ভারত-পাকিস্তানের কারবার ভারত নিজেই ম্যানেজ করবে। আমেরিকা এখন ভারতের উপর যথেষ্ট আস্থাশীল। আমেরিকা তার এজেন্ট সুহার্তোকে দিয়ে কর্মকাণ্ডের মধ্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করার সামান্যতম প্রয়োজনও বোধ করেন।

সিআইএ-র আড্ডা ব্যাংকক-সিঙ্গাপুর ঘুরে আসা সেই মুসাফির অধ্যাপকেরা অপেক্ষা করেছেন। আমাদের বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সামাদও মুসাফির হয়ে ব্যাংককের সরাইখানায় তাদের সাথে দেখা করে বলে আসবেন, 'ও-কে'। আমরা আছি।

সাম্রাজ্যবাদী গ্রীসের বিরুদ্ধে জনতাকে সাথে নিয়ে লড়াই না করে, সব প্রভুকে খুশী রাখার যে আগুন খেলায় বাংলাদেশের ক্ষমতাসীনরা নেমেছে, তার পরিণতি ভয়াবহ হতে বাধ্য। যে কোন একপক্ষ রুষ্ট হলেই সে পক্ষ ঝাঁপিয়ে পড়বে সর্বাত্মক নিষ্ঠুরতা নিয়ে। বাংলাদেশ পরিণত হবে সাম্রাজ্যবাদীদের শক্তি পরীক্ষার রণাঙ্গনে। এখানকার নিরীহ ও শোষিত মানুষ সাম্রাজ্যবাদীদের বিশ্ব ভাগাভাগি করার যুদ্ধে ব্যবহৃত হবে কামানের খোরাকে।

সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদার মেরুদণ্ডহীন ক্ষমতাসীনদের 'নিরপেক্ষ' পররাষ্ট্র নীতির খেল্ কদ্দুর গড়াবে, এটাই আজ প্রশ্ন, কিন্তু গড়াবার জন্য যথেষ্ট জায়গা আর বাকি নেই। সুতরাং সাধু সাবধান!



পাগলা ঘোড়ার খেমটা নাচ

প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের আকাঙ্ক্ষা আজ জনপ্রিয়। সরকার সমাজতন্ত্রের কথা বলছেন। সরকারী বক্তব্যে সমাজতন্ত্রের উল্লেখ ইতিপূর্বে আনুক্রমিকভাবে গণতন্ত্রের পরে ছিল। ১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২-এ শেখ মুজিব ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে বৈঠকের পর জনসভায় বক্তৃতাকালে সর্বপ্রথম অবিচ্ছেদ্য রাষ্ট্রীয় নীতি হিসাবে জাতীয়তা-বাদের সংযোজন করেন। জাতীয়তাবাদ সেদিন ছিল চার নম্বরে। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ছিল গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা। ২২শে জুন নোয়াখালীর জনসভায় মুজিবের বক্তৃতায় 'জাতীয়তাবাদ' বাকি তিনটিকে ডিঙ্গিয়ে সর্বপ্রথমে এসে বসেছে। প্রকৃতপক্ষে এ থেকে পরিষ্কার হয়ে উঠেছে যে, সরকার এখন জাতীয়তাবাদী স্বানু চেতনাকে প্রকৃত মূলধন করে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের ঘোড়া ছুটাতে বদ্ধপরিকর, ধর্মনিরপেক্ষতা এর চাবুক। পরস্পর বিরোধী এবং সম্পূরক নয় এমন কতকগুলি মৌলিক আদর্শের যুথবদ্ধ দশা ঘোড়াকে গতিদানের পরিবর্তে যদি পাগল করে তোলে তাতে বৈচিত্র্য কিছু হবে না।

গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র কায়েম করে বিশ্বকে চমকে দেবার কথা বলে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান ময়মনসিংহের মানুষদের চমৎকৃত করেছেন। কিন্তু খোদ ইংল্যান্ডে আজ থেকে দুশো বছর আগে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের মর্মান্তিক গোর হয়ে গেছে, ঐ পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথাটা বরণ করে যারা ভুল স্বীকার করেছেন, ইতিহাস বলে আমাদের আওয়ামী লীগের কর্তাদের চাইতে তাদের মাথার ঘিলু বরং সরস ছিল বেশী।

আসলে এখানে চলছে একটা গভীর ষড়যন্ত্র। হিটলারের ন্যাশনাল সোশ্যালিজম (জাতীয় সমাজতন্ত্র)– নাৎসীবাদ আবার পুরুত্থানের চেষ্টা চলছে। বিশ্বজনতার কাছে পরাজিত নাৎসীবাদ গোপন পথ ধরেছে। এ গোপন পথ হচ্ছে সোশ্যাল ডেমোক্রেসি বা সামাজিক গণতন্ত্রের মাধ্যমে সমাজতন্ত্রের সর্বনাশ করা।

পশ্চিম জার্মানীর এক সাবেক নাৎসী অধ্যাপক এ মর্মে বই লিখেছেন ঃ 'সাবভার্সান ইন সোশ্যালিজম থ্রো সোশ্যাল ডেমোক্রেসী।' সমাজতন্ত্রের বিপক্ষে দণ্ডায়মান সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মোড়ল। পশ্চিম জার্মানী, ইংল্যান্ড, আমেরিকার এ নীতি প্রযুক্ত হচ্ছে সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়াসহ এশিয়া-আফ্রিকার বেশ কয়েকটি দেশে। পশ্চিম জার্মানী গোয়েন্দা সংস্থার সাথে জড়িত ঐ অধ্যাপক কিছুদিন আগে (মে, ৭২) ঢাকা এসে গেছেন। বৃটিশ এমপি ও আওয়ামী লীগের দোস্ত মিঃ স্টোন হাউস এই কর্মকাণ্ডের অন্যতম এজেন্ট। ধনতান্ত্রিক শোষণকে টিকিয়ে রাখার সর্বশেষ ও সর্বাধুনিক অস্ত্র এখন বাংলাদেশে নেমেছে বেশ নগ্নভাবে। সোশ্যাল ডেমোক্রেসীর মাধ্যম সমাজতন্ত্রের সর্বনাশ সাধনের আন্তর্জাতিক চক্রান্তে আওয়ামী লীগ জড়িত নেই, এটা তাঁরা কি প্রমাণ করতে পারবেন?

মোস্তাফিজুর রহমান– ঢাকা।

পাঠকের টেবিল থেকে বলছি

সংগ্রামী জনতার নির্ভীক কণ্ঠস্বর সত্যাশ্রীর 'হক-কথা'কে কেন্দ্র করে ঢাকার বিশেষ কয়েকটি সুবিধাবাদী পত্র-পত্রিকা এক জঘন্য চক্রান্তে মেতে উঠেছিল। যেমন উঠেছিল স্বাধীনতা পূর্বকালে তৎকালীন পাকিস্তান আমলে একান্ত বাধ্যগত দাসানুদাসের ভূমিকায় বাংলাদেশের তথা সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে। তখন বাংলাদেশের গোষ্ঠী উদ্ধারকল্পে ধামাধরা এইসব পত্র-পত্রিকাগুলো সোচ্চার কণ্ঠে পাকিস্তান গেল, ইসলাম গেল বলে চেঁচিয়ে গোটা দেশ মাত করেছে। বাবা টিক্কা-নিয়াজীর পক্ষপুষ্ট হয়ে রাজাকার, আল-বদর, আল-শামস গঠন করার অপপ্রচার চালিয়ে প্রকারান্তরে বাঙ্গালী দিয়ে বাঙ্গালী নিধন যজ্ঞের ইন্ধন যুগিয়েছেন। গরম গুরু মহাদেব-প্রায় ইয়াহিয়ার গুণ-কীর্তন করে ইন্দিরা মুজিবের অবৈধ প্রণয়োপাখ্যান লিখে মুক্তিপাগল সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা চালিয়েছেন। আজ আবার সেই সব পত্র-পত্রিকাগুলোই নির্লজ্জের মত রাতারাতি ভোল পাল্টিয়ে নতুন নামাবলী গায় দিয়ে মুজিববাদের পরমভক্ত সেজে সত্যকে অসত্য, হককে নাহক বলে চালিয়ে নিজেদের পুতি গন্ধময় অতীতকে চাপা দেবার ব্যর্থ প্রচেষ্টায় বর্তমানের তথ্যবহুল সঠিক সংবাদ পরিবেশক 'হক-কথা'কে 'গণশক্তির' সমগোত্রীয় করার হীন চক্রান্তে তার মনগড়া বিরাগ সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছেন। জঘন্য চক্রান্তকারী এই সব হীনমন্য পত্র-পত্রিকাগুলো নির্ভীক 'হক-কথা'র যতই মনগড়া বিরূপ সমালোচনা করুন না কেন, গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে যতই বলুন না কেন যে, 'হক-কথা' নাহক কথায় পূর্ণ, আজকের সংগ্রামোত্তর কালের জনসাধারণের কাছে তা ভূতের মুখে রাম নামের মতই হাস্যকর বৈকি। কেননা, এদের অতীত পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, তৎকালীন পাকিস্তান আমলে এদেশের সঠিক সংবাদ থেকে বঞ্চিত করে ক্ষমতাসীন দলের দালালীপনায় ভুয়ো কতকগুলো উদ্ভট সংবাদ পরিবেশন করে এদেশের জনসাধারণকে অন্ধকারে রাখবার সেকি প্রাণপাত প্রচেষ্টা। সে স্মরণ করে ধ্বজাধারী এই সব পত্র-পত্রিকাগুলোর লজ্জা হওয়া উচিৎ।

বাংলার মানুষ আজ অন্ধ নয়। তাদের চোখ ফুটে গেছে 'হক-কথা'র মত মুষ্টিমেয় দু' একটির সাপ্তাহিকের নির্ভীকতায়। জাগ্রত জনতাকে মিষ্টি কথার ফুলঝুরি দিয়ে ধোঁকা দেবার দিন উত্তরে গেছে। তাই বলি ভায়রা সৎ-সাহস যদি না থাকে কেটে পড়লেই হয়; রদ্দিমার্কা, বস্তাপচা পুরনো মাল চালাবার সঙ্গে সঙ্গে অন্যের কুৎসা রটনার এই হীনমনোবৃত্তি

কেন? নাকি অতীতে যা অস্থি-মজ্জার সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গেছে তারই প্রতিফলন মাত্র।

–জনৈক পাঠক

বাঙলা ছাত্র ইউনিয়নের সভা ও কর্মী সম্মেলন

গত ৩০শে জুলাই সন্তোষ ভাসানী ভবনে বাঙলা ছাত্র ইউনিয়ন টাঙ্গাইল জেলা শাখার উদ্যোগে এক বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন বাঙলা ছাত্র ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় সংসদের সভাপতি মাহবুব উল্লাহ, জেলা ও শাখার অন্যান্য কর্মীগণ।

এছাড়া গত ২রা জুলাই বাঙলা ছাত্র ইউনিয়ন টাঙ্গাইল জেলা শাখা কার্যালয়ে কর্মীসভার সিদ্ধান্তক্রমে আগামী ১২ই আগস্ট মালঞ্চ সিনেমা হলে দুপুর ১২টায় এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

ময়মনসিংহ স্টেশন কোয়ার্টার আঞ্চলিক ন্যাপের সভা

গত ১লা জুলাই ময়মনসিংহ শহর ন্যাপ সভাপতি জনাব আজাদ মিলকীর সভাপতিত্বে স্টেশন কোয়ার্টার আঞ্চলিক ন্যাপের এক কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় বিভিন্ন বক্তা দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর বক্তৃতা করেন। এতে ন্যাপ প্রধান মওলানা ভাসানীর গতিশীল নেতৃত্বের প্রতি পূর্ণ আস্থা স্থাপন করা হয়।

সভা শেষে ১৯৭২–৭৩ সনের জন্য বাবু তপন কান্তি সাহাকে সভাপতি ও বাবু শমু সরকারকে সম্পাদক করে ৫২ সদস্য বিশিষ্ট স্টেশন কোয়ার্টার আঞ্চলিক ন্যাপের একটি শক্তিশালী কমিটি গঠন করা হয়।

লাইসেন্সের যুগ আবার এলো

প্রতি ইউনিয়নে ১টি করে আমদানী লাইসেন্স বণ্টন এবং মুক্তিসেনা, ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি ও প্রকৃত ব্যবসায়ীদের অগ্রাধিকার দানের সরকারী 'নির্দেশের' প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে চট্টগ্রামে রাঙ্গুনিয়া থানার এমসিএ লাইসেন্স বণ্টন পর্ব সমাধা করেছেন। ১০টি ইউনিয়নের মধ্যে ২টি ইউনিয়নে কেউ লাইসেন্স পায়নি। এমসিএ-র নিজ গ্রামে তিন ব্যক্তি লাইসেন্স পেয়েছে। তারা তাঁর ভাই, ভগ্নিপতি ও খালাতো ভাই। ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া সত্ত্বেও কোন হিন্দুকে লাইসেন্স দেয়া হয়নি।

ছড়া

আবু সালেহ

কৌশলে যা' চাপিয়ে দিলেন
ইন্দ্রিরাণী কান্ধে
জয় চেলারা মুজিবাদী
সেই ন্যক্কসী বান্ধে।
চাপিয়ে দিলেন ইন্দ্রিরাণী
আজব নীতির তন্ত্র
আহম্মকের স্বর্গে বসে
হুক্কা ছাড়ে মন্ত্র।
হুক্কা হুয়া হুক্কা হুয়া
আজববাদী শেয়ালে
আঙ্গুর খাবার মিথ্যে আশায়
পদ্ম ছড়ায় দেয়ালে।
দেয়াল বড়ো শক্ত দাদু
কুলোর মত কর্ণ
এক নিমিশে পাল্টে দেবে
আজববাদীর বর্ণ।
আমরা তো নই কাব্যের দাসি বান্দি
শোনরে ওলে ভারত মাতা গান্ধি।
শোনরে ওহে শ্যাম চাচাগো কর্ণে
পিতলা ঘুঘু যতই সাজানো স্বর্ণে
সব কিছু মোরা ছিড়বো লড়াই বাধলে
চলার পথে একটু বাধা সাধলে।

আল্লা ফানা দে

আমরা দালালদের শাসনে দিন কাটাচ্ছি

কেসটা তাহলে সত্যি। ২২শে জুলাই বায়তুল মোকাররমের লালবদর বাহিনীর সমাবেশে বক্তৃতা দিতে গিয়ে মান্নান এমসিএ বলেছেন, "বঙ্গভবনে গিয়ে দেখি সব দালালরা মুজিব ভাইকে ঘিরে রেখেছে, এসব দালালকে আমি মোনেম খানের বাড়ীতেও দেখেছি (তাহলে তিনি মোনেম খানের বাড়ীতেও যেতেন, এ্যাঁ)। আমরা ক'জন না থাকলে দালাল ছাড়া আর কেউ থাকবে না মুজিব ভাইয়ের পাশে। সুতরাং আমরা নড়ছি না।"

কেসটা তাহলে এরকম, শেখ সাহেবকে ঘিরে রেখে তাকে দিয়ে যারা দেশ চালায় তারা শতকরা ৯০ জন দালাল এবং শতকরা ১০ জন মান্নান এমসিএ-র মত মানুষ (যারা আবার মোনেম খানের বাড়ীতেও যেতেন)। তাহলে একুনে যোগফলটা দাঁড়ায় আমরা দালালের শাসনে দিন কাটাচ্ছি।

আল্লা ফানা দে!

হায়রে নির্লজ্জ!

পাট। পাট লোপাট করার জন্য ভারতীয় দস্যুরা কিভাবে কথাটা পাড়ছে দেখুন ঃ

নয়াদিল্লী থেকে ভারতের প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়া (পিটিআই) পরিবেশিত খবর ঃ

প্রতিবেশী বাংলাদেশকে নিয়ে একটা পাট জোট গঠনের জন্য ভারতের চাপদানকারী মহল (জনগণ অর্থে) ভারত সরকারের উপর যে অহর্নিশ চাপ দিয়ে যাচ্ছে, ভারত সরকার তার কাছে নত হবে না বলেই জানা গেছে।

কিন্তু সংবাদের পরের অনুচ্ছেদ ঃ

আসলে পাট পণ্য আন্তর্জাতিক বাজারে বিক্রি সংক্রান্ত ব্যাপারে পাট জোট একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে, যা হবে ভারত ও বাংলাদেশ উভয়ের পক্ষে কল্যাণকর।

একথা-ওকথা বলে ভারতের সরকারী সংবাদ সংস্থা যে কথা পেড়েছে, সংক্ষেপে তা হলো, জনমত এত প্রবল হয়ে উঠেছে যে, ভারত সরকার বাধ্য হবে বাংলাদেশকে সাহায্য করতে। পাট বিক্রি নিয়ে বাংলাদেশ অসুবিধায় পড়বে, ভারতীয় 'জনগণের' এটা সহ্য হয় কি করে! তাই পাট জোট গঠন অবশ্যাম্ভাবী। আগামী পাট মওসুমের আগেই এটার ফয়সালা হয়ে যাবে। বাংলাদেশ ও ভারত যুক্তভাবে পাটের বৈদেশিক 'ব্যবসায়ে' নামবে। বাংলাদেশের কাছ থেকে ছলেবলে কৌশলে পাট ছিনিয়ে নেবার জন্য ভারত উঠেপড়ে লেগেছে।

বাংলাদেশ সচিবালয় ও ভারতীয় হাইকমিশনের মধ্যে এ ব্যাপারে যে যোগাযোগ চলছে, এতদসংক্রান্ত অন্যান্য তৎপরতার উল্লেখ করে 'হক-কথা' কিছুদিন পূর্বে 'পাটও চলে যাবে' শিরোনামায় একটি ডেসপ্যাচ ছেপেছিল তাতে আমরা বলেছিলাম, এমনি ভনিতা করে ভারত এগিয়ে এসে পাটের ডালাটিও ছিনিয়ে নেবে।

কি নির্লজ্জের মত ভারত তার গোপন অভীষ্ট জনসাধারণের গা সওয়া করে নেবার জন্য কথাটা পাড়ছে, পিটিআই-এর সংবাদই তার উৎকৃষ্ট নজীর।

টাঙ্গাইল ন্যাপের বর্ধিত সভা

টাঙ্গাইল, ৬ই আগস্ট। স্থানীয় ডাকবাংলায় ন্যাপ নেতা জনাব মজিবর রহমান চৌধুরীর

সভাপতিত্বে জেলা ন্যাপ সাংগঠনিক কমিটির এক বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় দেশের বন্যা, খাদ্য ও দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বক্তৃতা করেন বাংলাদেশ কৃষক সমিতির কেন্দ্রীয় সংগঠক জনাব আবদুর রহমান, বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির কেন্দ্রীয় সংগঠক জনাব মোহাম্মদ আলী, জেলা ন্যাপ সাংগঠনিক কমিটির আহ্বায়ক জনাব গোলাম নূরনবী, জনাব ছলিম উদ্দিন, জনাব মোয়াজ্জেম হোসেন ও জনাব মোছা চৌধুরী।

সভায় দেশের বন্যা পরিস্থিতি বিশেষ করে টাঙ্গাইল, বাসাইল, গোপালপুর, কালিহাতী, নাগরপুর থানায় সর্বনাশা বন্যার ফলে যে চরম দুর্ভিক্ষ অবস্থা বিরাজ করিতেছে তাহার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের আশুদৃষ্টি আকর্ষণ ও জরুরী সাহায্য প্রেরণের জন্য সরকারের নিকট এই সভা দাবী জানায়।

এই সভা গভীর দুঃখের সাথে লক্ষ্য করিতেছে যে, সরকারী ব্যর্থতার দরুণ ধান, চাউল, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্য ক্রমশঃ জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতার বাহিরে চলিয়া যাইতেছে। অবিলম্বে এর আশু প্রতিকার করিতে না পারিলে আগামীতে অসংখ্য মানুষ অনাহারে মৃত্যুবরণ করিবে এবং এর জন্য সরকারকেই দায়ী হইতে হইবে।

এহেন উদ্বেগজনক পরিস্থিতির মোকাবিলার উদ্দেশ্যে সরকারকে অবগত করার জন্য ন্যাপ নেতৃবৃন্দ স্থানীয় ডেপুটি কমিশনারের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং বর্তমান অবস্থা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো ও তার আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ন্যাপ নেতৃবৃন্দ ডিসি সাহেবকে অনুরোধ জানান।

বিরাট জনসভা

আগামী ১৯শে আগস্ট, শনিবার, বিকেল ৩টা– রাজবাড়ী

২০শে আগস্ট, রোববার, বিকেল ৩-৩০ টা – ফরিদপুর

প্রধান বক্তা

মওলানা ভাসানী

মুখুজ্যে-চাটুজ্যের সাইনবোর্ডে ভরে গেছে

নানান ধান্ধায় সাড়ে তিন লাখ ভারতীয় এখানে হিজরত করবে

তিনি কখন ঢাকায় এলেন কেউ জানেনি। ভারতের পররাষ্ট্র দফতরের বলে কথিত অবতার সিংজী শেষ পর্যন্ত তাঁর টিকির হদিস পাওয়া গেল কোন ঘিঞ্জি গলিতে নয়, খোদ বাংলাদেশ সচিবালয়ে।

তোমার ঘর আমার ঘর করে কেলেঙ্কারী যখন সর্বশেষ মাত্রায়, প্রতিকার একটা হলে ভাল। ১লা সেপ্টেম্বর থেকে পাসপোর্ট-ভিসা নামক বস্তু চালু করার কথা ঘোষণা করা হলো। বাংলাদেশ সরকার ভাবলেন, এটাই সুযোগ। এ সুযোগে একটা বৈঠকের কথা বলে অবতারজীর অবতারণ করার সংবাদ প্রচার করলে মন্দ হয় না। তাই হলো।

সংবাদপত্রের পাঠকরা ভারতীয় বৈদেশিক দফতরের সচিব শ্রীঅবতার সিং গং-এর সাথে বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্র সচিব গং-এর আলোচনার সংবাদ পড়েছেন। ভারতীয় পররাষ্ট্র দফতরের প্রান্ত এসে বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্র ঘরোয়া ব্যাপারে ঠেকেছে। এতদুর হলেও ছিল রক্ষা।

বস্তুতঃপক্ষে শ্রীহাকসার আগমনের সময় তাঁকে অনুসরণ করে যে ভারতীয় পঙ্গপাল এসেছিল এবং ক্রমাগত আসছে তাদের মধ্যে অবতার আর দেবতারা রয়েছেন।

শ্রীঅবতারজী ভারতীয় প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট ঝানু পাণ্ডব। স্বরাষ্ট্র দফতর তাঁকে ছেরর ঘেঁচু কছু দেখাচ্ছেন না।

ইন্দিরাজীর প্রত্যক্ষ শাসনাধীন বাংলাদেশে আইন-শৃঙ্খলার ঘরোয়া ব্যাপারটিই তাঁদের দেখানো হচ্ছে আর আজ্ঞা নেয়া হচ্ছে।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে শুরু করে কুতুবদিয়ার বাতিঘর পর্যন্ত সর্বত্র খাঁটি ও সাচ্চা বাংলাদেশী পরিচয়ে যে ১৬ হাজার ভারতীয় লোক বসানো হবে, তার পুরো ব্যাপারটি যেন সম্পূর্ণ গোপনে সামাল দেবার উদ্দেশ্য নিয়েই অবতারদের আগমন ঘটেছে।

এই ১৬ হাজার লোক গাঁট মেরে বসে গেলে মহেশখালীর অখ্যাত নদীর ঢেউ থেকে বঙ্গুপিতার বুকের হার্টবিট পর্যন্ত সবকিছু নিখুঁতভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে।

পিড়ির কোণা পেলে তারপরই ব্যস। শুধুমাত্র ঢাকায় ৬০ হাজার কোলকাতাই মুখার্জী-ঘোষ এবং সারাদেশে লাখ তিনেক সেন-চাটুজ্যে এসে হাজির হবেন। 'নানা ধান্ধায়' তাদের আগমন হবে। কেউ ব্যবসা, কেউ পুরাতন ফেলে যাওয়া ওকালতি, কেউ নিতান্ত গোবেচারা মাস্টার মশাই হয়ে আগমন করবেন। 'পাসপোর্ট-ভিসা ছাড়া একটি লোকও যাচ্ছে না' একথা বলার ভিত্তি কেতাব কলমে এই জন্যই করে ফেলা হয়েছে। ফলে সাড়ে তিন লাখ সোমথ লোক জায়া-কন্যা-পুত্র নিয়ে হাজির হলে তারা হবে আদি ও অকৃত্রিম বাংলাদেশী।

কাশ্মীরটাকে যেভাবে চাটতে চাটতে গিলে ফেলা হয়েছে, বাংলাদেশকে নিয়ে সে প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে।

ঢাকায় টুলেট সাহেবদের বাড়ী আর নেই। সবখানে ডবল পোস্টকার্ড সাইজের সাইনবোর্ড লাগানো। চাটুজ্যে এন্ড কোম্পানী, এ্যাকাউন্টস স্পেশালিস্ট থেকে শুরু করে দুর্গাদাস এন্ড সন্স, হারমোনিয়াম নির্মাতা সবই রয়েছে। এখন শুধু গামছা ফেলার ধুম। গামছার মালিকরা আসছেন ; বাংলাদেশের জনগণ এখন আবাহনী গাইতে পারেন, এসো এসো প্রভুকূল অধিপতি এসো হে।

রিলিফ দিয়ে যা হচ্ছে

চাউল-কলেজ ব্যাংক ব্যালেন্স

বৈদ্যের বাজারের এমসিএ সাহেবের সহচর আলীঙ্কর ৪ঠা জুলাই দু'বস্তা রিলিফের চাল চুরি করার সময় হাতেনাতে ধরা পড়ে। চোর শায়েস্তা না করে এমসিএ সাহেব 'শাক দিয়ে মাছ ঢাকেন।' তিনি বলেন, "আমি এ চাল বহু পূর্বে বিক্রি করে দিয়েছি।" বহু পূর্বে তিনি চাল বিক্রি করলেন কেন? বহু পূর্বে বিক্রি করা চাল সেদিন তাঁর বেলায় হাতে এলো কেমন করে?

বৈদ্যের বাজারে বিদ্যালয়গুলি পুনঃনির্মাণের জন্য বরাদ্দ দেড় লাখ টাকা এখন নয়া কলেজ-পত্তনে লাগছে। এই সুযোগে সাহেবের বাড়ীখানাও পাকা হয়ে যাচ্ছে।

বৈদ্যের বাজার জনতা ব্যাংকে বাহাউদ্দিন আহমদের মোটা টাকা হয়েছে। তিনি রিলিফ কমিটির মোগরাপাড়া ইউসি প্রধান। এমসিএ সাহেবের পেয়ারের দোস্ত।

মোচা না নিলে কলা নেই

নাগরপুরে তিব্বত কোম্পানীর একজোড়া ব্যাটারী ও একখানা সাবান কিনতে হলে মোটা পয়সা গচ্চা দিয়ে একখানা জেট গুঁড়ো সাবানের বাক্সও কিনতে হয়; নইলে কিছুই পাওয়া যায় না। সরকার পরিচালিত তিব্বত কোম্পানীর নাগরপুরের এজেন্সীও সরকারের দলের লোকেরা বাগিয়েছে। মধ্যবিত্ত ও গরীব জনসাধারণের মাথা ভেঙ্গে এখন তারা আখের গুছিয়ে নিচ্ছে।

Money Should Not Be a Problem

VISIT FLOOD AREAS

পাক-হানাদাররা যে দিনটি থেকে বাংলাদেশের নিরীহ-নিরস্ত্র দেশবাসীর উপর তাদের হিংস্র থাবা বিস্তার করেছিল, ঠিক সেদিনই 'আমার বিপন্ন মানুষদের রেখে পালাতে পারিনি' অজুহাতে ধরা দিয়ে নিরাপদে 'জাতির পিতা' হয়ে ফেরার পর আবার তার জনগণকে বন্যার করাল গ্রাসে ফেলে পিত্তকোষের অপারেশনের উদ্দেশ্যে (!) লন্ডনের বিলাসী ক্লিনিকে বসে শেখ সাহেব তার সহকর্মীদের প্রতি নতুন ফরমান জারি করেছেন ঃ টাকা যতই লাগুক, পরোয়া নেই তোমরা বন্যা-উপদ্রুত এলাকা সফর করো। প্রয়োজনে সকল বিমান কাজে লাগাও। টাকার চিন্তা তোমাদের করতে হবে না।

যথা আজ্ঞা বলে অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী গায়ে মুজিবকোট চড়িয়ে উঠে পড়লেন হেলিকপ্টারে। সাথে তার কর্মী বাবু শাহ্ মোয়াজ্জেম, স্বেচ্ছাচার বাহিনীর মাংকী চীফ রাজ্জাক সাহেব এবং অন্যান্য ইত্যাকার নেতৃবৃন্দ।

সৈয়দ নজরুল সাহেব গত ৮ই আগস্ট জামালপুরের বন্যা দেখলেন আকাশের বুকে হাওয়া খেতে খেতে। নামলেন দেওয়ানগঞ্জ। তারপর সিরাজগঞ্জ। এই দুটি জায়গাতেই তাদের সোনার বাংলার অর্ধ-উলঙ্গ পাণ্ডুর মুখের বেরসিক নারী-পুরুষরা তাকে ঘেরাও করলো। তাদের সবার কণ্ঠে হাহাকার-খাদ্য চাই, বস্ত্র চাই, বন্যার হাত থেকে রেহাই চাই। নজরুল সাহেব অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী হবার ঠ্যালা বুঝলেন। জো হুজুরের দলেরা মুহূর্তে গাড়ী নিয়ে হাজির হবার পর তিনি লাফিয়ে উঠে পড়লেন। সাথীরাও উঠলেন। কিন্তু হাজার নির্দেশ, হুমকিতেও আর কাজ হলো না– ক্ষুধার্ত জনতা তাদের ঘেরাও প্রত্যাহার করতে রাজি নয়, তারা চায় সমস্যার আশু প্রতিকার।

'হাংকী-পাংকী চলবে না' হুমকির নায়কের চ্যালারাও ময়দানে নামলো– অসভ্য লোকগুলো পেয়েছেটা কী? নজরুল সাহেব কি মোনেম খান? অতএব– রাজ্জাক সাহেব নামলেন– নামলেন হায়দারী এমসিএটিও। তাদের চড়-চাপড় আর লাল বদরদের ঠ্যালার সামনে কুলাতে না পেরে অসহায় মানুষগুলো সরে গেলে অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে গাড়ীটি এগিয়ে গেল হেলিকপ্টারের উদ্দেশ্যে।

সৈয়দ নজরুল তার কর্তব্য যথাযথ পালন করেছেন। বন্যা সমস্যা সমাধানের দৃঢ় পদক্ষেপ নয়– বন্যা উপদ্রুত এলাকা সফরে যাও– রিলিফ দাও–করুণা দেখিয়ে পপুলার হও–টাকার চিন্তা করতে হবে না– শেখ সাহেবের আয়ুবী নির্দেশ তিনি মোনেমী কায়দায় সুচারুরূপে পালন করেছেন। মুজিব ভাই নিশ্চয়ই ফিরে নজরুল সাহেবের পিঠ চাপড়ে বলবেনঃ সাবাশ!!

ইহা কি সত্য?

॥১২৭॥

প্রধানমন্ত্রীর অন্যতম দেহরক্ষী জালাল উদ্দিন আহম্মদ এবার গৌরনদী কেন্দ্র থেকে বিএ পরীক্ষা দিয়েছেন। সান্ধ্য আইন জারী করে যখন অস্ত্র উদ্ধার চলছে, তখন দেহরক্ষী পরীক্ষার্থীটি কোমড়ে রিভলভার ঝুলিয়ে পরীক্ষা হলে এসেছেন। পরীক্ষার খরচ বাবদ তিনি সরকারের কাছ থেকে নজরানা স্বরূপ ১০০ রাউন্ড পিস্তলের গুলী পেয়েছেন বলে তাঁকে প্রচার করতে শুনা গেছে। তিনজন সহযোগী জুটিয়ে তিনি কিভাবে পরীক্ষা দিয়েছেন তা না বললেও চলে।

॥১২৮॥

ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোনার অন্তর্গত পূর্ব ধলা থানার সাবেক মুক্তিফৌজ অধিনায়ক ছাত্রলীগ কর্মীর বড় ভাই, আয়ুবী আমলের বিডি মেম্বার ও চলতি লীগের চাঁই জনাবটি গত ২৭শে জুন ৫ শত মণ পাট বোঝাই একখানা নৌকা কংস নদীপথে গুয়াতলা ইউনিয়নের মধ্য দিয়ে ভারতে পাচার করে দিয়েছেন।

॥১২৯॥

ঢাকার জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল পরিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী সাহেব কেবল এমসিএদের সুপারিশে পদোন্নতি ও বদলির সুযোগ দিচ্ছেন। এ ব্যক্তির পূর্ব সূত্র পাক-আমলে কি যেন ছিল, তাই তিনি এখন এমসিএদের নেকনজরে আসতে চান।

॥১৩০॥

চট্টগ্রাম জেলা রেজিস্টার মতিন ঠাকুর পাক-আমলে দালালী করে বিশিষ্ট হয়েছিল, এখনও বাংলাদেশ সরকারের কৃপায় তিনি যথাস্থানে অধিষ্ঠিত। তাঁর অফিসটি ঘুষ দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে। ২৭/৬/৭২ তারিখে ১ লাখ ৩৬ হাজার টাকার দলিলে ৫ হাজার টাকার ঘুষ আদায় হয়েছে। প্রতিদিন কর্তার পকেটে শ' পাঁচেক টাকা ঘুষ ঢুকছে। জনৈক আলী মার্কা কেরানী চাকুরী রক্ষার খাতিরে তাঁর জন্য ঘুষ সংগ্রহে বাধা হচ্ছে। দুর্নীতি দমন বিভাগ নিশ্চুপ।

প্রধানমন্ত্রী ও খাদ্যমন্ত্রীর নিকট ভাসানীর জরুরী তার

খাদ্যের অভাবে কোটি মানুষ মৃত্যুর কবলে পতিত

বস্ত্রাভাবে মেয়েরা উলঙ্গ

চোরাকারবারের আতিশয্যে জীবন দুর্বিষহ

আশু প্রতিকার চাই

ভাসানীর আবেদন

৩রা সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের সর্বত্র ভুখা মিছিল বের করার জন্য মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ন্যাপ, কৃষক সমিতি, ছাত্র প্রতিষ্ঠান, অন্যান্য রাজনৈতিক দল ও শ্রমিক সংস্থার নিকট আবেদন জানিয়েছে। কৃষক-শ্রমিক ও সকল শ্রেণীর দরিদ্র-মেহনতি ভুখা-নাঙ্গা মানুষের খাদ্যের দাবীতে জেলা প্রশাসক, মহকুমা, অফিস, থানা, মন্ত্রী ও এমসিএদের বাড়ীতে উপস্থিত হয়ে দাবী আদায় করতে তিনি জরুরী তাগিদ দিয়েছেন।

সম্পাদক ঃ সৈয়দ ইরফানুল বারী ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ঃ মওলানা আবদুল হামিদ ভাসানী মুদ্রণে ঃ শান্তি প্রেস, সন্তোষ, টাঙ্গাইল।

প্রতি কপি পঁচিশ পয়সা সাপ্তাহিক চাঁদার হার : ষান্মাসিক-৬.০০ বার্ষিক-১০.০০

হক-কথা

(WEEKLY THE HAQ-KATHA)

প্রকাশক ও পৃষ্ঠপোষক ঃ মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

প্রথম বর্ষ ২৫ তম সংখ্যা ; শুক্রবার ; ১লা ভাদ্র, ১৩৭৯ ; ১৮ই আগস্ট, ১৯৭২ ; ৮ই রজব, ১৩৯২ ; সন্তোষ, টাঙ্গাইল ।

লন্ডনে-জেনেভায় আরেকটি 'সাকসেস'

ইলেকশন অপারেশন ?

লন্ডনের হোটেলে বসে আইয়ুব খান ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্র ও মৌলিক গণতন্ত্রের খসড়া করে এনেছিল ইঙ্গ-মার্কিন গোয়েন্দা চক্রের আশীর্বাদ ও সহায়তায়।

আবার লন্ডন বাংলাদেশের রাজনীতির ভবিষ্যত ভাগ্য নির্ধারণের আরশে পরিণত হয়েছে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর অস্ত্রোপচার সফরকে কেন্দ্র করে।

লন্ডন থেকে প্রাচ্য-প্রতিচ্যের সাংবাদিক ও কূটনীতিকদের সংগৃহীত সংবাদ ও রিপোর্টে যে আভাষ পাওয়া যাচ্ছে, তাতে স্পষ্ট যে আবার এক গোলকধাঁধায় বাংলাদেশের রাজনীতিকে আবদ্ধ করার জন্য নীলনকশা নেয়া হয়েছে জনপ্রিয় ব্যক্তির হাতে।

বাংলাদেশের শাসনতন্ত্র দানে গড়িমসি করে যদ্দিন সম্ভব সময় কাটানো এবং আগামী মার্চে নির্বাচন অনুষ্ঠানের যে কথা ছিল, সে ওয়াদা জরুরী অবস্থার অছিলায় ভঙ্গ করার জন্য ইতিমধ্যে পাকাপোক্ত ব্যবস্থা হয়ে গেছে।

দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, লুটপাট, কালোবাজারী, অরাজকতার দেবতারা ক্ষমতাসীন হবার পর থেকে এদের জনপ্রিয়তা কমতে শুরু করেছে। জনপ্রিয়তা প্রতি মাসে হ্রাস পাচ্ছে শতকরা ৫ থেকে ৭ ভাগ। এই হার ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। ফলে আগামী মার্চে নির্বাচন হলে জনপ্রিয়তার মাত্রা শতকরা ২০ জন ভোটারে এসে ঠেকবে। তখন খালি ভোটের বাক্স দিয়ে ডুগডুগি বাজানো ছাড়া কোন পথ থাকবে না আওয়ামী লীগের।

আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক দেউলিয়াত্ব ইতিমধ্যে প্রমাণিত হওয়ার ফলে আগামী ২০ তারিখ থেকে সদস্য সংগ্রহের অভিযান শুরু করা হচ্ছে। সরকারী আওয়ামী লীগে লোকের অভাব হবার নয়। মোনেম খানের মুসলিম লীগের কেতাবেও এমনি লক্ষ লক্ষ সদস্য ছিল। কনভেনশন মুসলিম লীগ করে যারা হালুয়া-রুটির ভাগ বা গন্ধ শুকতে পেতো, তারা এখন বুভুক্ষু। 'আওয়ামী দাওয়াতে' ২০ তারিখে তারা সামিল হবে আওয়ামী লীগের পতাকা তলে, কেতাব-কলমে নাম লিখিয়ে। কিন্তু জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন না পেলে এই জড়ো করা ভূষির স্তূপের উপর সওয়ার হয়ে গাঙ পেরুতে যাওয়া বিপজ্জনক। মোনেম খান, আয়ুব খানেরাও তা পারেনি। এই শেখেরাও তা পারবে না।

সুতরাং আগামী ইলেকশনে রঙ্গ ছাড়া আর কিছু জুটবার সম্ভাবনা নেই দেখেই হতোদ্যম ভঙ্গুর আওয়ামী লীগ প্রমাদ গুণছে। ভাঙ্গাগড়ার খেলা শুরু হবার সাথে সাথে নির্ঝঞ্ঝাট প্রিয় লোকটি যথাসময়ে কেটে পড়লেন। দেশের চাইতে বিদেশে বসে ভাগ্যকে মজবুত করার আশায়। এদিকে একই পরিস্থিতিকে সামনে রেখে আওয়ামী সাংগঠনিক কমিটি বৈঠকে বসলো পাঁচ দিনব্যাপী। সরকারী যন্ত্র ও সরকারী দলের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যাদি পর্যালোচনা করে দেখা গেল, ইলেকশন এলে রাজনৈতিক অপমৃত্যু ঘটবে আওয়ামী লীগের। সুতরাং সংবিধান আর নির্বাচন সম্পর্কে কোন উচ্চবাচ্য না করে ভণ্ডামী ও ফন্দিফিকির তারা করেছেন। তথাকথিত 'মুজিববাদ' কায়েমের উপর গুরুত্ব আরোপ করে, 'মুজিববাদ' কায়েমের জন্য জান কোরবান করার শপথ ঘোষণা করে, সত্যিকার বিরোধী দলকে ঠেঙানোর প্রস্তাব নিয়ে সভা শেষ হলো।

বৈঠকের সিদ্ধান্ত আর সর্বাধিনায়কের মগজের চিন্তাকে একসাথে মিলিয়ে একটা পাকাপোক্ত উপসংহার টানার জন্য আওয়ামী লীগের সমাজকল্যাণ কর্তা ও মুজিববাদের গবেষণাগারের আলকেমিস্ট পুঁজিপতি মুস্তফা সরওয়ার লন্ডন পাড়ি দিলেন।

পগার পার হয়ে বিভুঁইতে রাজনীতির অনেক চাল চেলে কমিটির শেষ 'ও-কে' শোনার জন্য অধীর আগ্রহে সর্বাধিনায়ক হাসপাতালে অপেক্ষা করছিলেন। সরওয়ার সাহেবের কাছ থেকে 'ঠিক হ্যায়' সাড়া পেয়ে লন্ডনের বুকে আরেক বিষাক্ত নীলনকশা হাতে টেনে নেয়া হয়েছে অতি সম্প্রতি।

এ নীলনকশা, আইয়ুবের 'প্রজ্ঞা ও দিব্য জ্ঞান' অর্জনের সমতুল্য। ইলেকশন বন্ধ রাখার জন্য শাসনতন্ত্র প্রণয়নে গড়িমসি চালাতে হবে। প্রয়োজনে শাসনতন্ত্র ঠেকিয়ে রাখা হবে নানা বিষয়ে তিন বৎসর। না পারলে এমন এক প্রস্তাব শোনানো হবে যাতে দেশে হৈচৈ বাড়বে আর শাসনতন্ত্র কমিটি 'আচ্ছা বদলাচ্ছি', 'আচ্ছা বদলে দিচ্ছি' বলে সময় কাটাতে থাকবে। যদ্দিন পারা যায় ব্যক্তির ইচ্ছায় চালানো হবে। পরে জনচাপের মুখে শাসনতন্ত্র যদিবা দেওয়া হয়, তখনও থাকবে ইলেকশন 'হনুজ দূর অস্ত'।

লন্ডনে আর জেনেভায় এই নীলনকশার সবিস্তার কর্মসূচী প্রণয়ন করে তিনি ফিরবেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দেশের ভাগ্যকে সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে বিকিয়ে তাঁর নিজের গদীর জন্য সাম্রাজ্যবাদীদের আশীর্বাদ নিয়ে তিনি ফিরবেন। আর তখন আওয়ামী লীগ "অপারেশন সাকসেসফুল" শ্লোগান হেঁকে আসর জমিয়ে আরেকবার মোনাজাতে বসবে।

কিন্তু আগাম হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলে রাখা ভালো, নির্বাচন ও শাসনতন্ত্র নিয়ে যদি গড়িমসি করে ক্ষমতার গদী আঁকড়ে রাখার চেষ্টা করা হয় তবে ১৯৫৪ নয়, ১৯৬৯ ও ১৯৭১-এর পুনরাবৃত্তি আবার ঘটবে।

পচা তামাকের সিগারেট খেয়ে মানুষ অসুখে পড়ছে

ভারত থেকে আমদানী করা পচা তামাক বিভিন্ন ধরনের দূরারোগ্যের উৎস বলে জানা গেছে। ময়মনসিংহ, ঢাকা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি শহর থেকে প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে কালো বর্ণের এই অপরিশোধিত তামাক দিয়ে তৈরী সিগারেট পান করে বহু লোক বিষক্রিয়ায় ভুগছেন। এর সাথে নানা উপসর্গ নিয়ে কাশি, বুক ব্যথা, মাথা ঝিম ঝিম করা, দৌর্বল্য, বমি দেখা দিচ্ছে। এলার্জী ব্যাধির রোগীরা এ সিগারেট খেয়ে এলার্জীতে পুনরায় আক্রান্ত হয়েছেন। অনেকের গলায় দেখা দিচ্ছে ভয়ঙ্কর ধরনের শোথ। ডাক্তারদের অভিমত হলো, এই শোথ থেকে ক্যান্সার হতে পারে।

ভারতের তামাক এমনিতেই বিশ্বের নিকৃষ্টতম। তদুপরি তারা নিজেদের জন্য

তামাকের সারাংশ নিয়ে আবর্জনাতুল্য যে বাড়তি জঞ্জাল ছেটে ফেলে, সেগুলির জন্যও এখন বাংলাদেশকে বাজার হিসাবে কাজে লাগাচ্ছে।

বাংলাদেশে উৎপাদিত তামাক উৎকৃষ্ট মানের। স্বাধীনতার পরে পরেই এসব তামাকের গুদাম সামান্য বেশী দামে কিনে ফেলে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা দু' মাসের মধ্যে তা ভারতে নিয়ে যায়। আর সে সাথে বাংলাদেশের সিগারেট কারখানাগুলির অচলাবস্থার সুযোগ নিয়ে এখানে ভারতের প্রস্তুত সিগারেট চালাতে শুরু করে। জনসাধারণ তখনই প্রথমে ভারতীয় তামাকের স্বাদ গ্রহণ করে। কিন্তু ভারতীয় সিগারেটের পাশাপাশি তখন বাংলাদেশের বিভিন্ন সিগারেট বিক্রি হচ্ছিলো। জনসাধারণ ভারতের উচ্চমানের ব্রান্ড না খেয়ে দেশী নিম্নমানের ব্রান্ডের সিগারেট খেতে শুরু করেন। এখনকার অখ্যাত সিগারেটেও ওখানকার বহুল কথিত চার্মিনার, ইত্যাদির চাইতে হাজার গুণে ভালো।

বাংলাদেশে ভারতীয় সিগারেটের স্থায়ী বাজার প্রতিষ্ঠা করতে না পেরে ভারত ভিন্ন পন্থা গ্রহণ করে। ভারত জানতো বাংলাদেশের সিগারেটের মওজুদ অচিরেই ফুরিয়ে যাবে। কিছুদিনের জন্য খুলনা, ফরিদপুর, কুমিল্লার পল্লী অঞ্চলকে বাজার হিসাবে বেছে নিয়ে ভারত সুবর্ণ সুযোগের অপেক্ষা করতে থাকে। ইতিমধ্যে বাংলাদেশের তামাক ব্যবসায়ের কেন্দ্রগুলিতে ভূয়া ব্যবসায়ী গজিয়ে ওঠে সর্বশেষ তামাকের মওজুদটিও বাংলাদেশ থেকে সরিয়ে ফেলার আয়োজন সম্পন্ন করে।

একসময়ে বাংলাদেশে তামাক ও সিগারেট নিঃশেষ হয়ে এলে ভারত ঝোপ বুঝে কোপ মেরে প্রচুর তামাক রপ্তানী করতে শুরু করে। পঁচা ঘাসের মত বিশ্রী কালো রঙের বিষাক্ত তামাকে বাজার ভরে ওঠে।

সারা বাংলাদেশে প্রত্যহ কমপক্ষে আড়াই লাখ টাকার তামাক পুড়ছে। বিশ্বের কোথাও যা চলবে না নির্বিবাদে তা এখানে চালিয়ে ভারত সরকার অর্জন করছে কোটি কোটি টাকা।

ভারত সরকারের সৎ পরামর্শে বাংলাদেশ সরকার তামাক চাষের উপর থেকে আশীর্বাদ প্রত্যাহার করে দিয়েছে, যার অনিবার্য ফল হবে এখানকার তামাকের বাজারে ভারতের পঁচা তামাকের একাধিপত্য।

এই বিষাক্ত তামাক আমদানীর পূর্বে ল্যাবরেটরীতে এগুলি পরীক্ষা করা হয়নি, অথচ বিশ্বের সকল দেশ তামাক আমদানীর ক্ষেত্রে এ পন্থা অনুসরণ করে থাকে। জানা গেছে যে, বাণিজ্য দফতর ও ট্রেডিং কর্পোরেশনের কর্তারা এই তামাক বাংলাদেশের বাজারে প্রতিষ্ঠিত করার অঙ্গীকার দিয়ে যে ফাওটি পকেটে পুরেছে তা দিয়ে তাদের প্রত্যেকের পাঁচ-পুরুষ থ্রি ক্যাসেলস্ ট্যাডার্ডে জীবন কাটিয়ে দিতে পারবে।

মুজিব আমেরিকাও যাবেন

প্রধানমন্ত্রীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ উপদেষ্টা বিএম আব্বাস চুপিসারে ঢাকা ছাড়লেন। গোপনে প্লেনে চড়ে সোজা লন্ডন ক্লিনিক। তারপর লন্ডন থেকে খবর ছড়ালো, তিনি বন্যাজনিত ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির কেচ্ছা শোনাতে গেছেন।

তারপর শোনা গেল, তিনি যাচ্ছেন ওয়াশিংটন। তারপর মস্কো। মস্কোতে তাঁর সফর হবে সান্ত্বনামূলক। রাশিয়ার আঙ্গিনা দিয়ে আনবাড়ী যাওয়ায় রাশিয়া যেন না চটে, লোককে শোনবার মত রাশিয়ার যেন কিছু বলার থাকে তাই এই সান্ত্বনা সফর।

পাকিস্তানের অর্থনৈতিক মানব এম এস আহমদ যে লোকটিকে সাথে নিয়ে ওয়াশিংটন ঘুরে বেড়াতেন, সাম্রাজ্যবাদের মূল চালকদের সাথে এম এস আহমদ যাকে নিয়ে বৈঠকে বসতেন তিনি এই বি এম আব্বাস।

পাকিস্তান আমলে দেশের উপর মার্কিন অর্থনৈতিক শোষণের যন্ত্র যারা বসিয়েছে বি এম আব্বাস তাদের মধ্যে অন্যতম।

তিনি আবার তার পরিচিত প্রভুদের সাথে সম্পর্ক রিনিউ করতে যাচ্ছেন। বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য তিনি মার্কিন আশীর্বাদ আনতে গেছেন। এ ঋণ এনে তৈরী হবে ভারত-বাংলা যৌথ তহবিল– যা দিয়ে আসামের ডিব্রুগড়ে তৈরী হবে জলাশয়। তবে বন্যা নিয়ন্ত্রণের কথাবার্তা বলা অছিলা মাত্র। বি এম আব্বাস ওয়াশিংটনে গেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমানের আমেরিকা সফরের ব্যবস্থা করতে। গোপনে বি এম আব্বাসের লন্ডন পাড়ি দেবার উদ্দেশ্যে হলো লন্ডন থেকে তলব এসেছিল, তাড়াতাড়ি এসে পড়। তাড়াতাড়ি যাবার খবর পেয়ে তিনি গেছেন। ধারণা করা হচ্ছে, মুজিব এ বছর শেষ হবার আগেই আমেরিকা সফরে যাবেন।

কলকাতা

মিশন এখন ঠুটো জগন্নাথ আশ্রম

অকর্মন্য দক্ষতাবিহীন কর্মচারী নিয়োগের ফলে কলকাতার বাংলাদেশ মিশন ঠুটো জগন্নাথের আশ্রমে পরিণত হয়েছে। তারা কলকাতার হাওয়া আর বাংলাদেশের বেতন খাচ্ছেন, আর তাদের করণীয় কিছু নেই।

সম্প্রতি বাংলাদেশ মিশনে কোন জরুরী কাজ বা তথ্যের জন্য গেলে নাকি একই উত্তর পাওয়া যায়– আমরা সরকারের কোন নির্দেশ পাইনি। পশ্চিমবঙ্গের লোকজন পর্যন্ত বর্তমান কলিকাতাস্থ হাই কমিশনের কার্যকলাপে বিস্মিত হয়েছেন। ওখানে অনেকে প্রকাশ্যেই বলাবলি করছেন যে, মিশনের ভূতপূর্ব কর্তা হোসেন আলী সাহেবের নাম শুধু পশ্চিমবঙ্গে কেন ভারতের প্রত্যেক নর-নারী পর্যন্ত জানত। সে মিশনে এমন অনভিজ্ঞ কর্মচারীদের পাঠানো হয়েছে, বৈদেশিক মিশনে কাজ করা সম্বন্ধে যাদের কোন যোগ্যতা বা অভিজ্ঞতা নেই। ঐরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ অফিসে কর্মচারী মনোনয়নের প্রাক্কালে বাংলাদেশ সরকারের একটু যাচাই করে দেখা উচিত ছিল। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক্ষেত্রে স্বজনতোষণ ছাড়া আর কোন বিবেচনার অবকাশ রাখেনি বলে জানা গেছে।

ব্যাংক থেকে টাকা উধাও

অবশেষে ব্যাংক থেকে জমাকৃত টাকা উধাও হতে শুরু করেছে। অনেকগুলো টাকা পকেটে করে বহন করা বিরক্তিকর এবং বিপজ্জনক, ঘরে রাখলে চুরি-ডাকাতির ভয় এবং জীবন বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাই লোকে ব্যাংকের আশ্রয় নেয় এবং সেখানেই সমুদয় টাকা জমা রেখে নিশ্চিন্ত থাকে। কিন্তু এবার থেকে সেই ব্যাংককেও আর বিশ্বাস করা যাচ্ছে না।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে খুলনা জেলার মোড়লগঞ্জ থানার হরিতকীতলার মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান খুলনার অগ্রণী ব্যাংকের জোনাল ম্যানেজারের কাছে এক লিখিত অভিযোগপত্র পেশ করেছেন। অভিযোগে অভিযোগকারী বলেছেন যে, তিনি মোড়লগঞ্জ শাখার অগ্রণী ব্যাংকে একটি এ্যাকাউন্ট খোলেন। সে এ্যাকাউন্ট নং হচ্ছে ১৫১৩। এবং উক্ত এ্যাকাউন্টে ৫/৭/৭১ তারিখে তিনি ১০০০.০০ (এক হাজার) টাকা জমা দেন। পুনরায় তিনি ২২/৫/৭২ ইং তারিখে এক হাজার টাকা এবং ১০/৬/৭২ ইং তারিখে ২,৬৭০.০০ (দুই হাজার ছয়শত সত্তর) টাকা জমা দিলে ব্যাংকে তার মোট জমাকৃত অর্থের অংক দাঁড়ায় চার হাজার ছয়শত সত্তর টাকা। কিন্তু টাকার অত্যন্ত প্রয়োজন হওয়ায় জনাব সিদ্দিকুর রহমান ২০/৬/৭২ তারিখে ব্যাংক কর্তৃপক্ষের কাছে একখানা চেক বই চান। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ব্যাংক জাতীয়করণ হয়ে

যাওয়ার হাস্যকর অজুহাত দেখিয়ে সিদ্দিকুর রহমানকে মাত্র একখানা চেকের পাতা দেয় এবং উহার মাধ্যমে তিনি মোড়লগঞ্জ শাখা অগ্রণী ব্যাংক থেকে মাত্র পাঁচশত টাকা তোলেন। কিছুদিন পর আবার প্রয়োজন হওয়ায় টাকা তুলতে গেলে ব্যাংক কর্তৃপক্ষের কথা শুনে তিনি হতবাক হয়ে যান। কারণ, ব্যাংক কর্তৃপক্ষ তাকে জানিয়ে দেন যে, তার এ্যাকাউন্টে মাত্র দুইশত সত্তর টাকা আছে। সুতরাং পুনরায় কোন চেক বই তার নামে ইস্যু করা হবে না। সিদ্দিক সাহেব পরিষ্কারভাবে জানতে চাইলে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ বলেন যে, তিনি নাকি অগ্রণী ব্যাংকের বাগেরহাট শাখা থেকে ড্রাফটের মাধ্যমে তিন হাজার টাকা তুলে নিয়েছেন এবং দুই পৃথক দিনে পাঁচশত এবং চারশত টাকা তুলেছেন।

সিদ্দিকুর রহমান এতে অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করেন এবং টাকা তোলার অভিযোগ একটি মিথ্যা ও বানোয়াট ঘটনা বলে এর সত্যতা যাচাই করার কথা বললে তাকে অত্যন্ত অশালীন ভাষায় গালিগালাজ করা হয় এবং বলপূর্বক অফিস থেকে বের করে দেয়ার ভয় দেখানো হয়। পরে তিনি বাগেরহাট শাখার অগ্রণী ব্যাংকের ম্যানেজারের কাছে নালিশ করলে সে ম্যানেজার সাহেবও ক্রুদ্ধ হয়ে যান এবং নালিশের কোন সন্তোষজনক উত্তর না দিয়ে তিনি সিদ্দিক সাহেবকে মোড়লগঞ্জ ব্যাংকের কর্তৃপক্ষের সাথে 'বোঝাপড়া' করতে বলেন।

সিদ্দিক সাহেব উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান চালাবার দাবী জানিয়েছেন এবং তার জমাকৃত টাকাগুলো সব ফেরত দেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন। সেই সাথে যারা তার এই টাকাগুলো 'জালিয়াতি' করে উঠিয়ে নিয়েছেন তিনি তাদের বিচার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবী করেছেন।

এবার প্রশ্ন দাঁড়ায় ঃ ব্যাংকের অভ্যন্তরে জালিয়াতি ব্যবসার মূলে কারা রয়েছে এবং এ ধরনের ব্যবসা কতদিন ধরে শুরু হয়েছে। ব্যাংক কর্তৃপক্ষের ঘুষ খাওয়া অভিযোগ থেকে শুরু করে অনেক রকমের অভিযোগ প্রায়ই শুনা যায়। ফলে জনসাধারণের মনে ধারণা হওয়া অসম্ভব নয় যে, মাঝে মাঝে প্রকাশ্য দিবালোকে যে সমস্ত ব্যাংক লুটের চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটে থাকে তার পেছনে হয়তো সংশ্লিষ্ট মহলের হাত থাকতে পারে। তদুপরি ব্যাংকে টাকা জমা রাখলে সে টাকা বেমালুম গায়েব হয়ে যাওয়ার অভিনব কাহিনীতে জনসাধারণের মনে স্বভাবতঃই আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। সরকার এবং সরকারী প্রশাসন যন্ত্রের উচিত ব্যাংকের অভ্যন্তরে এ ধরনের রহস্যজনক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া এবং মানুষের কষ্টে উপার্জিত অর্থ 'উধাও' না হওয়ার নিশ্চয়তা বিধান করা।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে টাঙ্গাইল টাউনে মেসার্স পাল এণ্ড কোং নামীয় তহবিলের অংশীদার ভাগ্যবতী পালের মৃত্যু হওয়ার ও ইয়া রাণী পাল ও মিনতী বালা পাল উক্ত তহবিল হইতে অবসরগ্রহণ করায় বিগত ১৯৭২ সনের ১লা জুন হইতে নিম্নলিখিত তিনজন অংশীদার সমন্বয়ে উক্ত তহবিল পুনর্গঠিত হইয়াছে। ইতি–

(১) শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ পাল ৩-এর ১ অংশ
(২) শ্রী বীরেন্দ্রনাথ পাল ৩-এর ১ অংশ
(৩) শ্রী প্রকাশচন্দ্র পাল চৌধুরী ৩ এর ১ অংশ

ধামইর থানায় ভারতীয় দুর্বৃত্তদের দৌরাত্ম্য

সম্প্রতি নওগাঁ মহকুমার ধামইরহাট থানায় সশস্ত্র ভারতীয় দুর্বৃত্তদের নিয়মিত হামলায় জনসাধারণ ভয়াবহ আতঙ্কের মধ্যে দিন যাপন করছে। এই থানার সীমান্তে পশ্চিমবঙ্গের বালুরঘাট মহকুমা অবস্থিত। সীমান্তের ওপার থেকে আগত বেশ কিছু সংখ্যক দুষ্কৃতিকারী আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে এপার বাংলার গ্রামসমূহে ঢুকে নিরীহ জনসাধারণের উপর (বিশেষ করে মেয়েদের উপর) দিনে এবং রাতে লুটতরাজ, রাহাজানি, দৈহিক ও পাশবিক নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। লুটতরাজ করে ফেরার সময় গ্রামের বিবাহিত ও অবিবাহিত স্ত্রী-কন্যাকে নিয়ে ভারতে চলে যায়। কিছুদিন পূর্বে ধামইর হাট থানার সাপাহার গ্রামে ৭০/৮০ জন সশস্ত্র ভারতীয় দুর্বৃত্ত সম্পূর্ণ গ্রামটিকে ঘিরে ফেলে বাড়ী বাড়ী তল্লাশী চালিয়ে লুটতরাজ চালায়। লুটপাট শেষে দুর্বৃত্তরা একই বাড়ী থেকে দু'জন বিবাহিত স্ত্রী লোককে নিয়ে রওনা হলে ঐ মহিলাদ্বয়ের স্বামী মরণপণ করে তাদের বাধা প্রদান করে। ফলে দুর্বৃত্তদের গুলীতে উভয় ব্যক্তি নিহত হয়। আজ পর্যন্ত মহিলাদ্বয়ের কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। স্থানীয় থানা কর্তৃপক্ষ এবং এমসিএ-র সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে এদের নিষ্ক্রিয়তার জন্য দুর্বৃত্তরা এখন প্রকাশ্যে ও নির্ভয়ে জনগণের ধন-সম্পদ ও ইজ্জতের উপর হামরা চালিয়ে যাচ্ছে।

'হক-কথা'র বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি ভাসানীর অনুরোধ

'হক-কথা'র বিজ্ঞাপনদাতা ও এজেন্টদের নিকট আমার বিশেষ অনুরোধ আপনারা কপর্দ্দক পয়সাও অন্য কাহারো হাতে দিবেন না। কারণ, অনেকেই 'হক-কথা'র টাকা আদায় করিয়া আমার নিকট জমা না দিয়া আত্মসাৎ করিয়াছে। তাই 'হক-কথা', পোঃ সন্তোষ, জিলা ঃ টাঙ্গাইল, এই ঠিকানায় আমার নামে মনিঅর্ডার, চেক, ড্রাফট যোগে সরাসরি টাকা পাঠাইবেন অথবা আমার মনোনীত মোহাম্মদ হোসেনের নিকট হইতে ছাপা রশিদ গ্রহণ করিয়া টাকা প্রদান করিবেন। বাৎসরিক, ষাম্মাসিক গ্রাহক টাকা পাঠাইয়া যদি কাগজ আজ পর্যন্ত না পাইয়া থাকেন তবে টাকা পাঠানোর রশিদ নং, নাম, ঠিকানা, তারিখ পরিষ্কারভাবে লিখিয়া আমার নামে সন্তোষের ঠিকানায় পাঠাইবেন।

প্রত্যেক গ্রামে যাহাতে কমপক্ষে একখানা 'হক-কথা' ও 'বাংলা খুৎবা'র গ্রাহক হয় তজ্জন্য সংগ্রামী ভাই-বোনেরা চেষ্টা করিবেন। 'হক-কথা'র জন্য দেশদরদী ব্যবসায়ীগণ কিছু বিজ্ঞাপন দিলে এবং অন্যান্য ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান হইতে সংগ্রহ করিয়া পাঠাইলে বাধিত হইব।

আমার নাম ভাঙ্গাইয়া বহু স্বার্থপর টাউট প্রকৃতির লোক টাকা-পয়সা আত্মসাৎ করিতেছে– ভবিষ্যতে আমার মনোনীত লোক ('হক-কথা'র ছাপানো রশিদ) ব্যতীত কাহাকেও এক কপর্দ্দকও দিবেন না। কোন ব্যক্তি হক-কথার ফান্ডে টাকা দিলে তাহার নাম ও টাকার পরিমাণ 'হক-কথা'য় ছাপানো হইবে।

সন্তোষে অনুষ্ঠিত খাজা বাবার জলশায় গৃহীত প্রস্তাবাবলী

হযরত খাজা মঈনদ্দীন চিশতির (রাঃ) পবিত্র ওরশের পর সন্তোষে যে বিরাট মুসলমানী জলশা হইয়াছে তাহাতে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহিত হয়। উক্ত জলশায় সভাপতিত্ব করেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী।

(১) বাংলাদেশের শতকরা ৮৬ জন মুসলমানের প্রাণের চেয়ে প্রিয় ইসলামিক শরিয়তের বিরুদ্ধে কোন আইন বা অর্ডিন্যান্স পাশ হইলে তাহা কিছুতেই এ দেশের মুসলমানেরা মানবে না। শরিয়তের খেলাপ শাসনতন্ত্রে স্থান পাইলে তাহা মুসলমানেরা

সম্পূর্ণভাবে বর্জন করিবে। হিন্দু, খৃষ্টান, বৌদ্ধদের ধর্মীয় বিধান রক্ষা করার বিধান অবশ্যই থাকিতে হইবে।

(২) শুক্রবারের পরিবর্তে স্কুল-কলেজ প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রবিবার দিন ছুটি নির্দ্ধারণ করায় মুসলমানদের মনে দারুণ বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে। তাই সরকারের প্রতি সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের দাবী অনুযায়ী শুক্রবার পুনরায় ছুটির দিবস ঘোষণার দাবী জানাইতেছে।

(৩) প্রাইমারী শিক্ষায় কোরান ও দীনিয়াত চিরাচরিত ব্যবস্থা অনুযায়ী বাধ্যতামূলক শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করার জোর দাবী জানাইতেছে। শরিয়তের ব্যবস্থা অনুযায়ী বিনা বিচারে কাহাকেও আটক রাখা জায়েজ নাই, অতএব বিনা বিচারে কোন ব্যক্তিকে যাহাতে আটক রাখা না হয় তজ্জন্য এই বিরাট জলশা সরকারের নিকট জোর দাবী জানাইতেছে। সকল প্রকার ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান যেমন গুরুদুয়ারা, গির্জা, মন্দির, মসজিদ, দরবার ও মাজারের পবিত্রতা রক্ষাকল্পে সরকারকে যত্নবান হইয়া উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানাইতেছে।

(৪) সন্তোষে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী কর্তৃক প্রস্তাবিত ও আয়োজিত ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয় পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার জন্য সরকারের প্রতি সকল প্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করিতেছে।

জজ আমদানী

স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলাদেশের প্রশাসনে আমদানীকৃত উপদেষ্টাদের মধ্যে চারজন জজ (বিচারপতি) অন্যতম। কুষ্টিয়ার স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের বিচারক মিঃ আর, কে বিশ্বাসসহ অন্য তিনজন বিচারক পদে বহাল আছেন। ট্রাইব্যুনালের বিচারক ছাড়াও তাঁরা ঐ সকল জেলার 'জেলা জজের' পদেও বহাল আছেন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে সরকারের বিচার বিভাগে বিদেশী কেন? একটা স্বাধীন দেশে বিচার বিভাগের দায়িত্বপূর্ণ পদে বিদেশী আমদানী বোধহয় বাংলাদেশেই প্রথম। সত্যিই কি বাংলাদেশে বিচারকের ঘাটতি পড়েছে? দেশে খাদ্য-বস্ত্র, তেল-নুনের ঘাটতি দেখা দিলে তা অন্য দেশ থেকে আমদানী করে পূরণ করা হয় বলে জানা আছে। কিন্তু কোন দেশ বিচারকের ঘাটতি বিদেশ থেকে আমদানীকৃত বিচারকের দ্বারা পূরণ করছে বলে কেউ শোনেনি। তাই ঐ সকল এলাকার জনগণের দাবী অবিলম্বে বিদেশী বিচারকগণকে সরিয়ে বাংলাদেশের বিচারালয়ে বাঙ্গালী বিচারক নিযুক্ত করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের বিচার বিভাগকে বিদেশী প্রভাব থেকে মুক্ত করা হোক।

কে এই ব্যক্তি?
তনুশ্রী স্ত্রীর বরে যিনি ফুলছেরাত পার হলেন

যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ আজ অসংখ্য সমস্যার সম্মুখীন। তবু এক শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীর অহেতুক দুর্নীতি, পক্ষপাতমূলক আচরণের জন্য বহু ঘরে ঘরে হাহাকার ও হতাশার কালো মেঘ নেমে আসছে। বাংলাদেশ বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের একজন প্রকৌশলী কর্মকর্তার সাম্প্রতিক কালের কার্যকলাপ সকল মানুষের মনে আজ একটি জিজ্ঞাসার উদ্রেক করছে কে সেই ব্যক্তি?

হানাদার আমলে যে একজন কুখ্যাত প্রকৌশলী নিজে ও তার অর্ধাঙ্গিনীসহ ঘরে বাইরে গোটা দেশে সাড়ে সাত কোটি মানুষের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছিল, স্বাধীনতা উত্তরকালে দেশের দুর্ভাগ্য যে সেই ভাগ্যবান ব্যক্তিটি আবার চোরাগলিপথে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি উন্নয়ন সম্পদের মত এত গুরুত্বপূর্ণ একটি দপ্তরের প্রধান পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। বন্যার কবলে প্রতি বছর যেখানে ২ হাজার কোটি টাকার মূল্যবান শস্য সম্পদ বিনষ্ট হচ্ছে আর গণজীবনে নেমে আসছে অকথ্য কষ্ট আর দুর্ভোগ– সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত রক্তভেজা বাংলার বুকে তবুও গণস্বার্থ বিরোধী কার্যকলাপে মেতে আছেন এ সৌভাগ্যবান কর্মকর্তা ব্যক্তিটি। যেখানে শহর উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলোতে লাখ লাখ টাকা ব্যয় করতে এই কর্মকর্তার উৎসাহের অন্ত নেই সেখানে বন্যা নিয়ন্ত্রণে তার মোটেই উৎসাহ নেই। তাই দেখা যায় জরুরী ভিত্তিতে বন্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে যে সব প্রকল্প তদানীন্তন ইপি ওয়াপদা প্রায় অর্ধ সমাপ্ত করে এনেছিল সেগুলো তিনি বন্ধ করে দেওয়ার জন্য কোমর বেঁধে লেগেছেন। কারণ, যে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের উপর এ দায়-দায়িত্ব ছিল তাদের দিয়ে কাজ করালে তার নিজের একজন শ্যালক এ কাজ পেতে পারেন না।

উল্লেখযোগ্য যে, শত বঞ্চনার ভিতর দিয়েও বৈদেশিক চাপে ও আভ্যন্তরীণ দাবীকে অস্বীকার করার উপায় না দেখে তদানীন্তন পাক-সরকার ইতিপূর্বেই দেড় কোটি টাকা ব্যয়ে গঙ্গাবাঁধ পরিকল্পনার আনুসাঙ্গিক কাজ কর্ম সমাধা করে এনেছিল ; এতে পরিকল্পনা খুবই সহজসাধ্য হয়ে উঠেছিল বলে ওয়াকিবমহলের ধারণা। কিন্তু এই কর্মকর্তাটি কাজে যোগদান করার পর পরই শোনা যায় বন্ধুরাষ্ট্র (?) ভারতের প্ররোচনায় ভারত থেকে বিশেষজ্ঞ আনিয়ে এ কাজ করা হবে বলে বগল বাজাচ্ছেন এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়কেও ভারত ভ্রমণে উৎসাহিত করছেন। এদেশের নিরীহ মানুষের চোখে ধূলো দেবার জন্য তিনি ভারত থেকে মোটা অর্থ ঋণ পাওয়া যাবে তার ফাঁকা আশ্বাসবাণী আওড়াচ্ছেন। দেশে অর্থ নেই বলেও অপেক্ষা করছেন। কথিত আছে ইতিপূর্বে এভাবে বহু কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি ও পরবর্তীকালে তা বন্ধ করে দেওয়ার পুরা কৃতিত্ব তিনি আগেও অর্জন করেছেন বহু ক্ষেত্রেই।

গঙ্গাবাঁধ প্রকল্প সম্পন্ন করার দায়িত্ব অর্পিত হয় 'এসোসিয়েড কন্‌সালটিং ইঞ্জিনিয়ার্স' নামে একটি প্রতিষ্ঠানের উপর এবং এ সংস্থার শতকরা ৯৯ জন কর্মী এদেশের মাটিতেই জন্মেছেন। অথচ এই কর্মকর্তাটি এ সংস্থার উপর হঠাৎ বিরূপ হয়ে উঠেছেন এবং এতে 'পাকিস্তানী' গন্ধ শুঁকে বের করেছেন। ফলে এ কাজে চুক্তিবদ্ধ সংস্থাটিতে কর্মরত ২৫০টি পরিবার আজ অনাহারের সম্মুখীন হয়ে উঠছেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে গঙ্গা নদীর পানি ব্যবহার করে রাজশাহী, পাবনা, কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা, ফরিদপুর এবং বরিশাল জেলার প্রায় ২০ হাজার বর্গমাইল জুড়ে অর্থাৎ বাংলাদেশের শতকরা ৩৭ ভাগ এলাকার আড়াই কোটি (গোটা জনসংখ্যার ১/৩ অংশ) লোক প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হতে পারতো। কারণ, এর জন্য চাষীদের আর কিছু করতে হতো না। প্রকল্প বাস্তবায়িত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এতদাঞ্চলে বর্তমান উৎপাদন যেখানে মাত্র সাড়ে আট কোটি মণ চাউল সেখানে উৎপন্ন হতো সাড়ে বাইশ কোটি মণ চাউল। আশ্চর্যের বিষয় দেশের বর্তমান খাদ্য পরিস্থিতিতে যেখানে বিদেশের দিকে খাদ্যের জন্য আমাদের চাতক পাখীর মত চেয়ে থাকতে হচ্ছে– যেখানে প্রতি বৎসর ৩ লাখ করে জনসংখ্যা বাড়ছে, বর্ধিত জনসংখ্যার জন্য আরও খাদ্য যোগাতে জাতীয় সরকার হিমশিম খাচ্ছে সেখানে বাঙ্গালীর ভাগ্যাকাশের এই ক্রান্তিলগ্নে এ ব্যক্তিটি কি সত্যিই একটি দুষ্ট গ্রহের মত আবির্ভূত হয় নাই?

উল্লেখ না করে পারা যায় না এই কর্মকর্তা ব্যক্তিটি যখন যেখানে কাজ করেছেন সেখানেই তার বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও অসদাচরণের

অভিযোগের পাহাড় জমা হয়েছে ; বস্তুতঃ কুকীর্তি, জাল, জুয়াচুরি অপকর্মের জাজ্জল্যমান রেকর্ড স্থাপনে এ ভদ্রলোকের জুড়ি এদেশে মেলা কষ্টকর। কিন্তু মামার জোরে আর তন্বী স্ত্রীর বলে সকল বাধা এড়িয়ে-মাড়িয়ে তিনি সর্বদাই বিজয়ীর বেগে বেড়িয়ে হোমড়া-চোমড়াদের প্রীতি ও আস্থাভাজন হিসেবে বহাল তবিয়তে বিরাজ করছেন। শোনা যায় গত দশকের গোড়ার দিকে সাভারে যখন বেতার ট্রান্সমিশন কেন্দ্রের উদ্বোধন করা হয় তখন সকল উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সম্মুখেই এ তনুশ্রী মহিলা আয়ুব খাঁর পার্শ্বচারিণী ছিলেন ; পরবর্তীকালে ইয়াহিয়া খাঁর বান্ধবী বলেও তিনি সুপরিচিত ছিলেন। হানাদার আমলে এ মহিলা দালালটি বহু মা-বোনের ইজ্জত নষ্ট করার জন্য দায়ী বলে চিহ্নিত রয়েছেন। বর্তমান মন্ত্রীসভায় কয়েকজন প্রভাবশালী সদস্য তাকে নিয়ে সরকারী নৌযানে নৌবিহারে যেতে অনেকে দেখেছেন, তাছাড়া বিভাগীয় মন্ত্রী প্রবর কুমকুমকণ্ঠি এই শিল্পীর গানে একজন বিশেষ সমঝদার বলে সকল মহলে আখ্যায়িত।

মোজাফফর দল নাকি আন্দোলন করবে!

মোজাফফরের দল আন্দোলন করবেন। ক্ষেপে-রেগে অস্থির হবার চেষ্টা তারা করছেন। কারণ? কারণ আছে। বাংলাদেশের স্বর্গ থেকে ভারতের কূটকৌশলে রাশিয়ার বিদায় পর্ব সমাপ্ত হওয়ায় এখন মোজাফফর মনিসং-এর উপর দায়িত্ব পড়েছে সরকারকে বুঝিয়ে দিতে হবে কত ধানে কত চাল।

তাই তারা ক্ষেপে ক্ষেপামী দেখাচ্ছেন। জাতীয় কমিটির বৈঠক ডেকে কি প্রস্তাব নেয়া হবে মোজাফফর-মতিয়া তার আভাস দিয়েছেন,

যোগাযোগ করুন ঃ

চট্টগ্রামে 'হক কথা'-র জন্য

যোগাযোগ করুনঃ

৫৯৯, রামজয় মহাজন লেন (দোতলা)

খাতুনগঞ্জ

ফোন ঃ ৮২০১৭, ৮৩৬৩৪

আন্দোলন করবেন তারা।

সেদিন বায়তুল মোকাররমে মিটিং ডেকে 'খোদাকে হাজের নাজের জেনে' মোজাফফর সাহেব বক্তৃতা করে বললেন, দেশের রাজনীতিতে যত গোঁজামিল দেবে দাও–আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে তা চলবে না। মোজাফফর বলেন, ডলারওয়ালাদের সাথে দহরম-মহরম করলে রুবলওয়ালারা তোমাদের ছেড়ে দেবে না একথা মনে রেখো।

মোজাফফর ন্যাপের এ হুমকি আসল ঘটনাকে প্রকাশ করে দিয়েছে যে, বাংলাদেশে রাশিয়ার স্বার্থ বিপন্ন হয়ে পড়ায় রাশিয়ার এ তাঁবেদাররা দালালীর মধ্যেও কিছুটা ঝাল মেখেছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবের মগজ ধোলাই কমপ্লিট হয়েছে বলে তাদের যে ধারণা ছিল সে ধারণা গেছে ভেস্তে। ডলারওয়ালা আমেরিকার সাথে শেখ মুজিব সরকারের দহরম এখন এদের সহ্য হচ্ছে না। বেচাইন হয়ে লম্ফঝম্ফ শুরু করলে মোজাফফর ন্যাপের কপালে দুঃখ আছেই। আগামী ইলেকশনে আওয়ামী লীগের সাথে ঐক্যফ্রন্ট করে নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার খায়েশ একদিকে, অন্যদিকে রাশিয়ার স্বার্থ ইফাজতে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে মোজাফফর মনিসিং ঘরের বউ এর মত মার খেয়েও মিনসের পিছনে হাটবে।

বিনা ক্ষতিপূরণে জমি জাতীয়করণ হবে না

১০০ বিঘায় জমি সিলিং করেও আওয়ামী লীগ সরকার শতকরা দুইজন ভুস্বামীর উপর হাত দিতে ভয় পাচ্ছে, এ থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠছে বর্তমান সরকার ও সরকারী দলটির ধনিকতোষণ নীতি।

১৯৫৪ সালে এই আওয়ামী লীগ জমিদারী উচ্ছেদের নির্বাচনী ওয়াদা পূরণে করতে গিয়ে জমিদার শ্রেণীকে প্রচুর অর্থের ক্ষতিপূরণ দানের সিদ্ধান্ত নিলে যুক্তফ্রন্টের শরীক দলগুলির সাথে আওয়ামী লীগের গণমুখী অংশের বিরোধের সূত্রপাত ঘটে। ক্ষতিপূরণ দিয়ে ধনী জমিদারের স্বার্থ রক্ষার উদ্যোগ নিয়ে আওয়ামী লীগ জমিদার শ্রেণীকে মুনাফাখোরী ব্যবসায়ে টেনে এনে এদের বানায় ধনবাদী শোষক। সেই অভিশাপের জের আজও আমাদের টানতে হচ্ছে।

আজ আবার জমির সিলিং ১০০ বিঘায় নির্ধারণ করে সরকার নতুনভাবে কৃষি-আশ্রয়ী জনগণকে প্রতারিত করতে চাইছে। পাকিস্তান আমলের নাজিমুদ্দিন সরকারই ১০০ বিঘায় জমির সিলিং নির্ধারণ করেছিল। 'বিপ্লবী' সরকারও সেই মাত্রায় ডিটো মারলেন। এটা নির্মম পরিহাস।

নাজিমুদ্দিন সরকার ও তৎপরবর্তী সরকারগুলি ধনিক জোতদারের হাতে রাখবার জন্য জমির সিলিং কার্যকরী করেনি। কার্যতঃ আজ আবার একই নাটকের পুনরাভিনয় পরিলক্ষিত হচ্ছে। সরকারের বিরাট সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক বুলির অন্তরালে বাহবারম্ভে হলো লঘুক্রিয়া। জমির সিলিং প্রতিক্রিয়াশীল যুগের মাত্রা ছাড়িয়ে এগুলোনা এক বিঘাও আর সিলিং বাস্তবায়নেও সেই একই দশা। না জানি আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক বুনিয়াদ–জোতদার মহাজনেরা বিগড়ে যায়।

ভূমি-রাজস্বমন্ত্রী সেরনিয়াবাত সম্প্রতি বলেছেন, জমির সিলিং কার্যকরী করার মত আইন নেই। আবার বলেছেন, বাড়তি জমি কেড়ে নিয়ে বণ্টন করতে তিন বৎসর সময় লাগবে। অথচ শেখ মুজিব নিজেই বলেছেন, তার দলের রাজনৈতিক আয়ু তিন বৎসর।

সব চাইতে বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, এবারও আওয়ামী লীগ সরকার জমি সরকারের হাতে নেবার জন্য ক্ষতিপূরণ দেবেন।

এদিকে বেনামে জমি হস্তান্তর চলছে সমানে। সরকার টিমেতালে এগিয়ে হয়তো দেখবেন, দেশে ১০০ বিঘার বেশী জমি কারুরই নেই।

হক-কথা

১লা ভাদ্র, শুক্রবার

এটাই কি পররাষ্ট্রনীতি!

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দালাল ইন্দোনেশীয় প্রেসিডেন্ট সুহার্তোর পররাষ্ট্রমন্ত্রী আদম মালিকের সাথে দহরম-মহরম করে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্প্রতি দেশে ফিরে সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে সুহার্তো-আদম মালিক চক্রের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। ৪০ হাজার মণ চাউলের ব্যবস্থা ছাড়া মার্কিন উপনিবেশ ও সামরিক আস্তানা থাইল্যান্ডে পররাষ্ট্রমন্ত্রী সামাদ আজাদ কি বলে এসেছেন, তা তিনি প্রকাশ করেননি। নিকটতম প্রতিবেশীর সাথে সম্পর্কের নামে নির্বিচারে সাম্রাজ্যবাদের পদলেহীদের সাথে বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠতা এমন এক পর্যায়ে উপনীত হয়েছে, যাকে নিঃসন্দেহে আখ্যা দেওয়া যায়, আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদী

ষড়যন্ত্রের সহায়তার নামান্তর বলে। দেশের পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে জোটনিরপেক্ষতা, পঞ্চশীলা, বান্দুং ও লুসাকা ঘোষণার মত নির্দেশ-নীতিমালা আওড়ে কার্যতঃ সাম্রাজ্যবাদের হুকুম তামিলের পর্যায়ে বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতিকে নামিয়ে আনার জন্য ক্ষমতাসীন সরকার যে চক্রান্তে নেমেছে, তার ফল শুভ না হওয়াই স্বাভাবিক।

জোট নিরপেক্ষ সম্মেলন জর্জটাউনে শুরু হলেও পররাষ্ট্রমন্ত্রী খোড়া যুক্তি দেখিয়ে তাতে অংশ নেয়নি। সুনামগঞ্জ সফরের জন্য তাঁর পর্যাপ্ত সময় থাকলেও আন্তর্জাতিক ফোরামে অংশ নিয়ে তাতে নিজের ভূমিকার সম্ভ্রমান উদাহরণ পেশ করতে এরা চান না। বরং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় রাশিয়া ও আমেরিকার এলাকা ভাগাভাগির খেলা থেকে উৎসারিত অর্থনৈতিক লেবেন আঁটা রাজনৈতিক সামষ্টিক সম্মেলনে যোগদানের জন্য এদের গোপন প্রস্তুতি এখনি শুরু হয়ে গেছে।

জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনে দক্ষিণ ভিয়েতনামের বিপ্লবী সরকারকে অন্তর্ভুক্ত করা হোক এরা এই ন্যায়নীতির পক্ষটি সমর্থন না করে প্রকারান্তরে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দখলকারকে সমর্থন করে চলেছে, অথচ এরা চাচ্ছে এতদসত্ত্বেও সবাই এদেরকে সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী ভেবে সমর্থন দিক।

বাংলাদেশের বিপ্লবী উত্থানকে যথাসম্ভব বিপ্লবী বৈশিষ্ট্যে এগিয়ে নিয়ে যাবার সামান্যতম চেষ্টা এরা করেছে, এটা মিথ্যা। কারণ, বিদ্যমান শোষণ-নির্যাতন বিরোধী গণসংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা যেরূপ অনবদ্য সম্ভাবনা ও প্রতিশ্রুতিতে ভাস্বর ছিল, এদের সাম্রাজ্যবাদ ঘেঁষা নীতির দরুণ তা সহসাই মিইয়ে গেছে। এর বদলে তারা ফিরে পেয়েছে তাদের সাবেক প্রভু মার্কিন ও সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদকে।

সম্প্রসারণবাদী ভারতকে দিয়ে বিদেশে বাংলাদেশের বক্তব্যকে প্রচার করতে গিয়ে এরা দিয়েছে অজ্ঞতা ও মূর্খতার পরিচয়। বিশ্বের গণসংগ্রাম ও সত্যিকার মুক্তিআন্দোলনগুলোর প্রতি ভারত সরকারের আসল মনোভাব বান্দুং সম্মেলন বানচাল করা, ইসরাইলের সাথে এদ্দিন পর্যন্ত দহরম-মহরম, নিজ দেশে মুক্তিকামী জনগণকে নির্বিচারে দমনের মধ্যে পরিস্ফুট। এই ভারতের পাপী মুখ থেকে বাংলাদেশের কথা প্রচারিত হবার ফলে বিশ্বের কাছে বাংলাদেশের মর্যাদা নষ্ট হয়েছে এবং প্রমাণিত হয়েছে যে বাংলাদেশ ভারতের আশ্রিত রাজ্য।

প্রাচ্যে ষড়যন্ত্রের সুপরিচিত সাম্রাজ্য মার্কিন, বৃটিশ, রুশ, জার্মান গোয়েন্দা দলের স্বর্গভূমি থাইল্যান্ডে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির ব্যাখ্যাবলে ঘোষণা করে বিশ্বের সত্যিকার প্রগতিশীল জনতা ও জাতিগুলোর কাছে বাংলাদেশ আরও হেয় প্রতিপন্ন হয়েছে।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে নিজেদের বিশ্বাসের অঙ্গীভূত-প্রভু হিসাবে গ্রহণ করে সরকারী দলটি বহু আগে থেকেই সাম্রাজ্যবাদের লেজুড় হিসাবে নিজেদের পরিচয় রেখেছে। সমাজতন্ত্র বিরোধী আন্তর্জাতিক ইঙ্গ-জার্মান-মার্কিন ষড়যন্ত্রের সাথে হাত মিলিয়ে সাবেক গেস্টাপো অধ্যাপক ও জন স্টোনহাউজের মত এজেন্টদের সাথে এদের মিতালী বিশ্বের প্রগতিশীল দেশসমূহকে না বিগড়িয়ে পারবে না।

অধিকন্তু, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তৃতীয় মহাযুদ্ধের প্রস্তুতি স্বরূপ অবস্থান ভাগবাটোয়ারার যে ব্যাপার চলছে, বাংলাদেশকে তার মধ্যে ঠেলে দিয়ে এই সরকার দেশটিকে দুই ধুরন্ধর শয়তানের

লোফালুফিতে ব্যবহৃত খেলনায় পরিণত করেছে। মার্কিন অথবা সোভিয়েত সাম্রাজ্যবাদ কেউ পূর্ব দিক থেকে, কেউ পশ্চিম দিক থেকে প্রভাব বলয় বৃদ্ধি করে এদেশকে করে তুলবে তৃতীয় মহাযুদ্ধের যুদ্ধ ঘাঁটি– যে যুদ্ধ হবে জনগণের মুক্তিসংগ্রামের অগ্রগতিকে ৫০ বৎসর পেছনে ঠেলে দেবার উদ্দেশ্যে পরিচালিত।

এতসব অঘটন ঘটিয়েও পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদ যদি প্রত্যহ সকালে-বিকালে নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতির বুলি কপচান, তবেই কি পররাষ্ট্রনীতি কলঙ্কমুক্ত হবে? বস্তুতঃ তা হবার উপায় নেই। দেশে আর বিদেশে শোচনীয় ব্যর্থতা ছাড়া প্রবঞ্চক এই সরকারটির গোলক ধাঁধা নীতির প্রতিদান আর কিছু নেই।

কার স্বার্থে ভারত এসেছে?

জনসেবায় নিবেদিত প্রাণ, কারেন্ট লীগের, জনসেবার অন্যতম বিশেষ নিদর্শন, মজলুম জনতার মুখপত্র সাপ্তাহিক 'হক-কথার' সম্পাদক জনাব ইরফানুল বারীর গ্রেপ্তার ঘটনাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এবং উদ্দেশ্যমূলক। জনাব বারীকে গ্রেপ্তার করে সরকার জনমত ও সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের আর একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করলো। সাপ্তাহিক গণশক্তির অফিসে অনেক আগেই তালা ঝুলছে।

সরকারের দুর্নীতি ও দমননীতির সমালোচক মাত্রেই নাকি পাকিস্তানের বন্ধু দালাল। গত ৭ই জুনের বহু বিঘোষিত গুরুত্বপূর্ণ বেতার ভাষণে প্রধানমন্ত্রী সাহেব কৃতজ্ঞতায় ভরপুর হৃদয়ে গদ্‌গদ্ কণ্ঠে ভারতের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে যা বললেন তার অর্থ হলো, ভারতের প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের বিরুদ্ধে কেউ কিছু বললেই সে দেশের শত্রু, পাকিস্তানের দালাল। দেশপ্রেমিক নেতারা ও রাশিয়ার নগ্ন দালাল বলে পরিচিত একটি বিশেষ রাজনৈতিক দল ভারত ও রাশিয়ার প্রশংসায় একেবারে অজ্ঞান। তাদের ভাষায় ভারত, বাংলাদেশের জন্য যা করেছে তা ইতিহাসে নজিরবিহীন। তবে কথা হলো, ভারতের নিকট বাংলাদেশকে নাকি কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। কিন্তু ভারত যা করেছে তা কি বাঙালীদের, নাকি নিজের স্বার্থের গরজে? সত্য কথা বলতে গেলে, ভারত বাংলাদেশ আন্দোলনে অদ্যাবধি যে পরিমাণ লাভবান হয়েছে তাতে ভারতের উচিত বাংলাদেশের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা। কারণ, যথা – (১) ভারতে আশ্রয়প্রাপ্ত বাংলাদেশের শরণার্থীদের সাহায্য সামগ্রী আত্মসাৎ করে ভারত পশ্চিমবাংলার দীর্ঘ দিনের খাদ্য ঘাটতি পূরণ করেছে এবং তার আর্থিক অচলাবস্থার মোকাবেলা করেছে। শরণার্থীদের দোহাই দিয়ে সে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা লুটছে। যে কোন সচেতন শরণার্থীই এর সত্যতা সমর্থন করেন।

(২) স্বাধীন বাংলার জন্ম মাধ্যমে ভারত তার জন্য শত্রু পাকিস্তানকে পঙ্গু করতে সমর্থ হয়েছে।

(৩) ভারতীয় প্রতিক্রিয়াশীল শাসকচক্রের অত্যাচারের স্টিমরোলারে নিষ্পেষিত পশ্চিম বাংলায় রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দেয়। গত ২৫ বছরে নয়াদিল্লীর শাসকচক্র পশ্চিম বাংলায় রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনতে পারে নাই। এমতাবস্থা চলতে থাকলে, অচিরেই পশ্চিমবাংলা স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করত। কিন্তু ভারত, বাংলাদেশ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়ায় সে সম্ভাবনা সাময়িকভাবে হলেও দূর হয়েছে এবং গত নির্বাচনে 'গণতন্ত্রী' (?) কংগ্রেস পশ্চিম

বাংলায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে সেখানে আরও কিছুদিন দমননীতি অব্যাহত রাখার সনদ লাভ করেছে।

(৪) পাকিস্তান বাহিনী আত্মসমর্পণ করার পর ভারত, বাংলাদেশের মানুষের অর্থ খরিদ করা, কয়েক হাজার কোটি টাকার অত্যাধুনিক পাকিস্তানী সমর অস্ত্র ও প্রায় ৪০ হাজার সামরিক গাড়ী বাংলাদেশ থেকে ভারতে নিয়ে গেছে। ভারতীয় সৈন্যরা এ দেশের অনেক মিল-কারখানার মূল্যবান যন্ত্রপাতি লুট করেছে।

(৫) শিল্পে অনুন্নত ও কাঁচা মালে সমৃদ্ধ বাংলাদেশে ভারত অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ লাভ করছে। অতএব দেখা যাচ্ছে, ভারত অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক ক্ষেত্রে লাভবান হয়েছে অনেক বেশী পরিমাণ। এর পরও যদি কেউ বলে, "ভারতের নিকট বাংলাদেশকে কৃতজ্ঞতা থাকা উচিত" তবে

পাপ থেকে কারো ক্ষমা নেই। ক্ষমতাসীনেরাও একদিন জনতার আদালতে জবাবদিহি করতে বাধ্য হবে।

অপ্রিয় হলেও বলতে হয় সে ভারতের দালাল।

গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য সংবাদপত্রের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে ; সে ভূমিকা হলো গঠনমূলক সমালোচনার মাধ্যমে সত্যের মূল্যায়ন– সরকারী দালালী নয়। সাপ্তাহিক 'হক-কথা'ও এই ভূমিকা পালনের চেষ্টা করছে। দুঃখের সাথে বলতে হয় এদেশের প্রায় সবগুলি সংবাদপত্রই সরকারের বিজ্ঞাপনে পরিণত হয়েছে এবং 'হক-কথা' সহ মাত্র গুটি কয়েক পত্রিকা এর ব্যতিক্রম। অর্থনৈতিক দুরাবস্থা, দুর্নীতি ও সরকারের দমননীতি চরম অবস্থায় উপনীত হয়েছে। অথচ এর মূলোচ্ছেদই ছিল স্বাধীনতার মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু স্বাধীনতাত্তোরকালে খাদ্যাভাব, আর্থিক দুরাবস্থা, দ্রব্যমূল্য কালোবাজারী, চোরাকারবার, সীমান্ত দিয়ে পাচার, ঘুষ-দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, সরকারী দমননীতি আগের তুলনায় কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সীমান্ত চোরাচালান– মিত্র তোষণ নীতির ফলে খাদ্যদ্রব্য উধাও; নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সাধারণের ক্রয় ক্ষমতার উর্ধ্বে, চট্টগ্রামে ভারতীয় সৈন্য বাহিনীর নগ্ন অত্যাচার ; এদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারতের কৌশলগত হস্তক্ষেপ এবং এদেশকে একটি তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করার ভারতীয় অশুভ অপচেষ্টা জনমনে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে। বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা ও খসড়া শাসনতন্ত্র নাকি ভারতীয় মুরুব্বীদের অনুমোদনের জন্য নয়াদিল্লী সফর করছে। একটি স্বাধীন দেশের জনগণের মনে এটা এক বিরাট জিজ্ঞাসা। জনমনের এই জিজ্ঞাসাই প্রতিফলিত হয়েছে 'হক-কথায়' এবং সরকারের কোপানলে পড়েছেন বেচারা সম্পাদক জনাব ইরফানুল বারী।

স্বাধীন বাংলায় ইন্দ্রাধীন প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন কারেন্ট লীগের জনসেবার গোপন তথ্য এবং অন্যান্য খবরাখবর জনগণের নিকট ফাঁস করে দেওয়ার ফলে সরকারের জনসেবা ও তার লাল-সবুজের খেলার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে এই নির্দয় পত্রিকাটি ও তার ঠোঁটকাটা সম্পাদক জনাব বারী। এটাই সম্ভবতঃ জনাব ইরফানুল বারীর গ্রেফারের প্রধান কারণ। সরকারের জনসেবায় মুগ্ধ হয়ে যদি কেউ 'নাতে সরকার' (যেমন নাতে রসুল) পেশ করেন; তবে কি তাঁকে গ্রেফতার করতে

হবে। জনসেবার পাল্লায় চলতি লীগ সরকার আইউব দশককেও হারিয়ে দিয়েছে। কনভেনশন লীগের দেশপ্রেমিকরা গত দশ বছরে যা কামাতে পারেনি, চলতি লীগের দেশপ্রেমিকরা মাত্র ৮ মাসে তার অনেক বেশী কামিয়েছে জনসেবার মাধ্যমে। যার ফলে দারিদ্র্য, খাদ্যাভাব, অর্থাভাব, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, সীমান্ত পাচার, কালোবাজারী, দুর্নীতি, দমননীতি, স্বজনপ্রীতি, হত্যা, লুট প্রভৃতি কল্যাণমূলক (মামুবাদীদের কাছে) কার্যকলাপ আগের তুলনায় বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারী আমলা, চলতি লীগ, প্রলেতারিয়েত লীগ, মামুবাদী লীগ, লাল লীগ, স্বেচ্ছা লীগ, মুজিব লীগের জনসেবার বহর দেখে জনমনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে স্বাধীনতার সংজ্ঞা কি? লক্ষ কণ্ঠের এই প্রশ্নের ভাষা দিতে গিয়েই মিত্রদের স্বার্থের খাতিরে, অদৃশ্য অশুভ ইঙ্গিতে গ্রেফতার হয়েছেন জনাব বারী। মওলানা ভাসানীর তারবার্তার উত্তরে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব মান্নান নাকি জানিয়েছেন যে, জনাব বারী একজন দালাল। অতীতে সে নাকি এনএসএফ-এর সদস্য ছিল এবং দৈনিক পয়গাম পত্রিকায় চাকুরী করতো। এই তার অপরাধ– উদ্ভট তথ্য সুরির সাক্ষী মাতাল। পূর্বসূরীদের ঐতিহ্য বজায় রাখতে বর্তমানে সরকার সজাগ আছে সন্দেহ নেই।

দেশপ্রেম ও জনসেবা চলতি লীগের একচেটিয়া মনোপলি নয়। রাষ্ট্রের বাইরের যে কোন শক্তির নির্লজ্জ সমর্থনই দালালী এবং দালাল মাত্রেই সাজা পাওয়া উচিত এবং পাবেও। তবে কেউ সরকারী আদালতে আর কেউ গণআদালতের কাঠগড়ায়। বিচারকেরও মাফ নেই। সত্য কথা বলতে কি এদেশে দালালের সংখ্যাই বেশী। কেউ পাকিস্তানের দালাল, কেউ ভারতের, কেউ রাশিয়ার, কেউ আমেরিকার। চীনের দালাল একেবারে নেই একথাও নিশ্চয় করে বলা মুশকিল।

পাকিস্তান আমলের দুর্নীতি, দমননীতি ও বর্তমান সরকারের দুর্নীতি-দমননীতি এক ও অভিন্ন। এদেশের গত ২৫ বছরের ইতিহাস, বিশ্বাসঘাতকতা ও শোষণের ইতিহাস ; বর্তমান সরকারেরও আট মাসের ইতিহাস ধাপ্পাবাজীর ইতিহাস ও সাপ্তাহিক বাংলাদেশ (ফরিদপুর থেকে প্রকাশিত)-এর ভাষায়, 'বাংলাদেশকে ফকির করার ফিকির।' জনস্বার্থে কথা বলে ইত্তেফাক ও তার সম্পাদক যথেষ্ট নাজেহাল হয়েছিল। বর্তমানেও তার পুনরাবৃত্তি ঘটছে। সরকারের ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে এ দেশবাসী ভারত বিরোধী সংগ্রামে এক বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। বাঙ্গালী পাইলট ও বাংলা শার্দুল ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে অভূতপূর্ব কৃতিত্ব প্রদর্শনপূর্বক নয়া রেকর্ড সৃষ্টি করে। তারাই আবার ১৯৭১ সালে পাকিস্তান বাহিনীর সাথে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হতে দ্বিধা করেনি। এবং স্বাধীনতা যুদ্ধে বিশ্ব রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। শোষণ ও দমননীতি বজায় রাখতে গিয়ে পাকিস্তানের শোচনীয় পরাজয় ঘটেছে। সরকারের দমননীতি অব্যাহত থাকলে দেশে যদি কোন বিপর্যয় নেমে আসে তার জন্য সরকারকেই দায়ী থাকতে হবে। তাই বর্তমান সরকারের উচিত ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা। সাপ্তাহিক 'হক-কথা'র সম্পাদক সৈয়দ ইরফানুল বারীকে অনতিবিলম্বে, বিনাশর্তে মুক্তি না দিলে গণবিক্ষোভের উত্তাল তরঙ্গে– চলতি লীগের বাইসের নৌকা অচিরেই ডুবে যেতে পারে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে দুর্বার সংগ্রামের ঐতিহ্যের অধিকারী জনগণের কাছে আকুল আবেদন, 'হক-কথা' সম্পাদকের আশু মুক্তির দাবীতে জনমত গড়ে তুলুন।

আপনার চিঠি

এটা কিসের পূর্বাভাস?

জনাব,

এই সত্যটা কে না জানে যে, প্রতিবেশী বন্ধুরাষ্ট্র ভারতের জনসঙ্ঘ দল একটি মুসলিম বিরোধী সাম্প্রদায়িক দল। কিছুদিন পূর্বে স্বয়ং ইন্দিরা গান্ধী বলেছেন ওই দলটিই নাকি ভারতে মুসলিম বিরোধী দাঙ্গার সৃষ্টি করে। এমনকি এই দলটিকে ভারতে বেআইনী ঘোষণা করার জন্যও নানারূপ সুপারিশ করা হইয়াছে।

এটাও সকলের জানা আছে যে, এই দলই সমগ্র ভারত, বাংলাদেশ, বার্মা, সিংহল, থাইল্যান্ড, পাকিস্তান ও তিব্বত নিয়ে এক বিশাল রাম রাজ্য (হিন্দুরাজ্য) প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখে এবং এটাই এই দলের পরিকল্পনা। এর উপর ভিত্তি করিয়াই এই দলের সকল কর্মসূচী প্রণীত।

এই কারণে এই দলের কোন সদস্য বা প্রতিনিধিদল কোন দেশে আজ পর্যন্ত কোনরূপ সরকারী নিমন্ত্রণ বা কোন সরকারী অভ্যর্থনা পায় নাই।

কিন্তু কয়েকদিন যাবৎ এই বাংলাদেশে ঐ কুখ্যাত মুসলিম বিরোধী (এটা ধর্মনিরপেক্ষ বিরোধী) দুইজন সদস্য সফরে আসিয়াছিলেন এবং সরকারী মন্ত্রীদের দ্বারা অভ্যর্থনার পর অভ্যর্থনা পাইয়াছেন এবং তাহারা আদমজী পাটকলও পরিদর্শন করিয়াছেন।

ইহার অর্থ কি? যে পার্টির নাম শুনিলে আজও পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানরা আতঙ্কিত হয়, যে পার্টির নামে ভারতের কোটি কোটি মুসলমান ভয়ে দিশেহারা হয়, তাহারা আজ এই ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশে এত সম্মানীত হইয়া উঠিল কেন?

এর রহস্য কি? যেখানে ভারতের প্রধানমন্ত্রীও ইহাদেরকে সাম্প্রদায়িক বলিয়া ঘৃণা করেন সেখানে এই মুসলিমবিদ্বেষী দল এই ৯৫% মুসলমান দেশে এত সম্মান কেন পাইয়াছে? তবে কি এখানেও ভারতের মত শুদ্ধি আন্দোলন আরম্ভ করা হইবে?

প্রভুর বাড়ীর বিতাড়িত কুকুরটিকেও প্রভুর প্রতিভূরূপে পূজা করার এহেন হীনমন্যতায় বাংলাদেশ সরকারকে কেন পাইয়া বসিল আমরা বুঝিতে পারি না।

আবদুর রশিদ
ঢাকা

খাজনার চেয়ে বাজনা বেশী

জনাব,

বাংলাদেশ সরকারের ১২ই জুলাই, ১৯৭২ ইং তারিখের এক হ্যান্ড আউটে প্রকাশ 'যে সকল কৃষি পরিবারের বসত বাড়ীসহ মোট ২৫ বিঘা কিংবা তার কম কৃষিজমি আছে, তাহাদেরকে ১৩৭৯ বাং সনের ১লা বৈশাখ হইতে ঐ সকল জমির কোন ভূমি-রাজস্ব (খাজনা) দিতে হইবে না। ভূমি-রাজস্বের (খাজনা) অনুসঙ্গগুলি যথা উন্নয়ন ও ত্রাণ কর, শিক্ষা কর এবং স্থানীয় কর (লোকাল রেইট) জনগণের বৃহত্তর কল্যাণের জন্য সরকার মাফ করেন নাই এবং পূর্বের ন্যায় ঐ সকল কর ভূমির মালিক প্রত্যেক কৃষক পরিবারকেই যথারীতি পরিশোধ করে দাখিলা নিতে হইবে।'

বর্তমান বাংলাদেশ সরকার আওয়ামী লীগ দ্বারা গঠিত। আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ওয়াদায় এই কথা বলা হয় নাই যে, '২৫ বিঘা পর্যন্ত খাজনা মাফ দেওয়া হইবে, কিন্তু উহার আনুষাঙ্গিক কর মাপ দেওয়া হইবে না অথবা দিতে হইবে।'

আইয়ুব খাঁর আমলে এই সব কর ধার্য হইয়াছে। এবং উহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদও হইয়াছে এবং উহা মাফের জন্য বিরামহীন আন্দোলনও হইয়াছে।

বছর বছর দৈব দুর্বিপাক, অতি বৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, পোকা কর্তৃক ফসল নষ্ট এবং চাউল, ধান ও অন্যান্য দৈনন্দিন আবশ্যকীয় নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্রের দাম অত্যাধিক বৃদ্ধি পাওয়ায়, তদুপরি আইয়ুব সরকার উল্লিখিত করগুলি ধার্য করায় সব রাজনৈতিক দলগুলি উহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বাকী করের জন্য দেওয়া সার্টিফিকেটগুলি বাতিল করিয়া দেওয়ার জন্য তীব্র আন্দোলন করিয়াছেন। আওয়ামী লীগ ও কৃষক সমিতিই এই আন্দোলনের পুরোভাগে ছিল।

অবশ্য বাংলাদেশ সরকার ২৫ বিঘা কি উহার উর্ধ্বের জমির মালিকগণের বাকী করের জন্য যত সার্টিফিকেট দেওয়া হইয়াছিল, ঐ সব সার্টিফিকেটের দায় হইতে সকলকে মুক্তি দেওয়ায় সারা বাংলাদেশই বর্তমানে সরকারের নিকট কৃতজ্ঞ।

ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে 'আনুষাঙ্গিক কর' খাজানা হইতে তিন গুণেরও বেশী।

নির্বাচনী ওয়াদায় "খাজনা মাফ দিতে ওয়াদা করা হইয়াছে, আনুষাঙ্গিক কর মাপের কথা বলা হয় নাই।" এই কূট তর্কের আশ্রয় নিলে জনসাধারণ আদৌও সন্তুষ্ট হইবে না। বরং ওয়াদা খেলাপ হইয়াছে বলিয়াই তাহারা বিশ্বাস করিবে।

তবে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস 'জনগণের বৃহত্তর কল্যাণের জন্য' খাজনাটা বিদায় আদেশ দিয়া আনুষঙ্গিক কর মাফ দিলে, জনসাধারণ বিনা আপত্তিতে ও হাসিমুখে উহা গ্রহণ করিবে।

আশা করি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ইহা বিশেষভাবে বিবেচনা করিবেন। ইতি–

আছাদল হোসেন
রায়ের বাজার, ঢাকা

আজ বাংলার গ্রামে-গঞ্জে, শহরে-বন্দরে শুধুই হাহাকার। খাদ্যাভাব ও বস্ত্রাভাবে আজ লক্ষ লক্ষ মানুষ মৃত্যুর মুখোমুখি। এর জন্য দায়ী কারা? জানতে হলে পড়ুন ঃ

মওলানা ভাসানী
প্রণীত
আওয়ামী লীগের কথা ও কাজ
ওয়াদাভঙ্গের
এক অতুলনীয় নজীর
মূল্য ঃ ০·৪০ পয়সা

মুরিদের দরবার

ভাসানীর-বিশ্বাস

মোহাম্মদ হোসেন

মওলানা ভাসানী এই দেশের জনসাধারণকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে অতি প্রথম উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। আমরা আজ যে স্বাধীনতা পাইয়াছি তাহার আন্দোলনের অগ্রদূত হইলেন মওলানা ভাসানী। চৌদ্দ বৎসর পূর্বে কাগমারী সম্মেলনে দুই প্রদেশের আঞ্চলিক বৈষম্য লক্ষ্য করিয়া এই অগ্নি পুরুষটি 'আস্‌সালামো আলাইকুম' জানাইয়া

পশ্চিমাদের সহিত সম্পর্ক ছেদ করিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু তখন তাহার এই প্রস্তাবটিকে সকলেই হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিল। আবার দেশের বর্তমান ক্ষমতাসীনেরা যখন একচেটিয়া ভোটে বিজয়ী হইয়া ক্ষমতায় বসিতে ব্যস্ত ছিলেন ঠিক সেই সময় তিনি স্বাধীন পূর্ব-পাকিস্তানের শ্লোগান দিলেন। তিনি বলিলেন, আমার একটি মাত্র দাবী, তাহা হইতেছে স্বাধীনতা। স্বাধীনতা ব্যতীত জাতির অস্তিত্ব সম্ভব নয়। অগণিত মেহনতি মানুষ সেদিন তাঁহার স্বাধীনতা ঘোষণাকে পূর্ণ সমর্থন জানাইয়াছিল। পরে সাত কোটি মানুষের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ যখন সত্যি সত্যিই ক্ষমতালিপ্সু বর্বর ইয়াহিয়া সরকারের সহিত সমঝোতায় আসিতে সক্ষম হইলেন না তখন বাধ্য হইয়া মওলানা ভাসানীর সেই 'লাকুম দিনুকুম ওয়ালিয়াদীন' বাণীটি মানিয়া লইলেন। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর মওলানা ভাসানীর সেই, একদফা দাবীই আদায় হইল।

এখন তাঁহার দ্বিতীয় পর্যায়ের দাবী হইতেছে সমাজতন্ত্রের পূর্ণ রূপায়ন। বাংলাদেশ সরকারও জোরেসোরে প্রচার চালাইতেছেন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার স্বপক্ষে। তাহারা হিন্দুস্থান ও রাশিয়ার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াই যে এই কাজে অগ্রসর হইতেছেন তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। অবশ্য বাংলাদেশ সরকার বিশ্বের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মতই ধর্ম নিরপেক্ষতার ভূমিকা অবলম্বন করিয়াছেন। বাংলাদেশে ধর্মের নামে শাসন, শোষণ, অত্যাচার, উৎপীড়ন অতীত ইতিহাসকেও অতিক্রম করিয়াছে। অতএব ইসলামকে পরিত্যাগ করিয়া নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণই উত্তম বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। ইসলামের নামে বর্বর ইয়াহিয়া যে নির্মম অত্যাচার করিয়াছে তাহা হালাকুখানের বাগদাদ আক্রমণের চাইতেও ভয়াবহ ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের হিটলার-মুসোলিনীর পৈশাচিকতাকে ও ছাড়াইয়া গিয়েছে। মানবতা বিরোধী এহেন ক্রিয়াকলাপের জন্যই শিক্ষিতমহল ইসলামের নাম শুনিতেই শংকিত হইয়া উঠিতেছে।

কিন্তু একটি বিষয় খুবই লক্ষণীয় ও ভাবিবার রহিয়াছে তাহা হইতেছে- ইসলাম একটি সত্যময় ত্যাগের আদর্শ যাহা মানুষকে সুন্দর ও মানুষের কর্মকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে সক্ষম। যদি স্বার্থবাদী মুষ্টিমেয় লোকের দোষে সেই আদর্শটির সঠিক প্রয়োগ না হইয়া থাকে তবে ইহাকে দায়ী করার কোন মানেই থাকিতে পারে না। মওলানা ভাসানী ইহার যথার্থতা উপলব্ধি করিতে পারিয়া যারপর নাই দুঃখিত। চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে আল্লাহ্‌র রসূল (সঃ) যে আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন উহা যে যুগের সঙ্গে তাল মিলাইয়া চলিতে পারে- সর্ব যুগে সর্ব দেশের মানুষের সময়োপযোগী প্রয়োজন মিটাইতে পারে তাহার নজির ইতিহাসেই বহন করিয়া আসিতেছে। তাই ইসলামের গতিশীলতা মানব জীবনে অনস্বীকার্য।

কমিউনিস্টরা মনে করেন মওলানা তাহাদের বস্তুবাদ মতবাদেই বিশ্বাসী। কিন্তু আসলে তাহাদের এই ধারণা ভুল। তিনি সমাজতান্ত্রিক দেশের জন কল্যাণমূলক পদ্ধতি ও কৌশলগুলি মানিয়া লইতে প্রস্তুত। কিন্তু তৎসঙ্গে ধর্মীয় মূল্যবোধের সম্মান ও স্থান দেওয়ার পক্ষপাতি। কারণ, আল্লাহ্‌ বিশ্বাসী প্রতিটি মানুষ চরিত্রবান হইলে সবরকম কু-কর্ম হইতে দূরে থাকিতে পারে। আল্লাহ্‌ ভীতি তাহাদিগকে খুনখারাবী, মদ, সুদ জুয়া, পরস্ত্রীহরণ, লুণ্ঠন প্রভৃতি অপকর্ম হইতে বিরত রাখে। তাছাড়া পরকালে প্রত্যয়ী প্রতিটি মুমিন

মুসলমানের কার্যাবলীই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য হইয়া থাকে। ইহার গুণে মানুষ একাত্ম বোধের অনুরাগে সিক্ত হইয়া উঠে। সংবেদনশীলতা ও সেবার মনোবৃত্তি পরস্পরের সুখ-দুঃখকে সমবন্টন করিয়া নিতে গভীর অনুপ্রেরণা যোগায়। মওলানা ভাসানী বলেন, ইসলামের আসল রূপ নবীর (দঃ) সময় আনসারদের মধ্যেই মূর্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাহারা মানব সমাজের খেদমতের জন্য জীবনের আরাম আয়েশকে উপেক্ষা করিয়া আদর্শের যে নজির স্থাপন করিয়াছেন পৃথিবীর বুকে তেমনটি আর কেহ পারে নাই। এক ভাই আর এক ভাইয়ের মনঃতুষ্টির জন্য প্রফুল্লচিত্তে নিজের স্ত্রীকে পর্যন্ত তালাক দিয়া তাহার হাতে তুলিয়া দিয়াছেন। অর্থাৎ নিজের যথা সর্বস্ব মানুষের সেবার জন্য বিলাইয়া গিয়াছেন। সেই অতুলনীয় আদর্শটি আজ সমাজ কর্তৃক উপেক্ষিত। মওলানার দৃঢ় বিশ্বাস, ইসলামের সার্বজনীন কল্যাণকর আদর্শের সত্যিকারের বাস্তবায়ন মানব জাতিকে উন্নতির চরমে পৌঁছাইয়া দিতে সক্ষম।

কমিউনিস্টরা মনে করেন, গভীর জ্ঞান-বুদ্ধির প্রভাবে মানুষ জাগ্রত বিবেকের অধিকারী হয়। তারই গুণে মানবতা বিরোধী কাজ করিবার সময় বিবেকে বাধে। অতএব মানুষ শিক্ষার গুণে আল্লাহ্‌ ভীতি ছাড়াই সকল প্রকার অপকর্ম হইতে বিরত থাকিতে পারে। তাহাদের এই বক্তব্যের বিপক্ষে আবার বলা যায় আল্লাহ্‌ বিশ্বাসী মানুষ অদৃশ্য এক মহা শক্তির প্রভাবে প্রভাবান্বিত। তাই দুনিয়াদারীর জন্য লোভ-লালসা, ঈর্ষা, হিংসা, বিদ্বেষ, অহঙ্কার প্রভৃতির শিকার হইতে সে নারাজ। কিন্তু বস্তুবাদীরা দুনিয়াদারীকেই চরম ও পরম ভাবিবার দরুণ বস্তু জগতকে জীবনের যথাসর্বস্ব মনে করিয়া প্রবৃত্তির অনুগামী হইতে বাধ্য।

মহাগ্রন্থ কোরআনে আছে, আসমান ও জমিনে যাহা কিছু আছে সকল কিছুর মালিকই আল্লাহ্‌। সুক্ষভাবে বিচার বিশ্লেষণ করিলে কোরআনের এই বাণীটি সকলের নিকট সত্যময় হইয়া উঠিবে। (পরবর্তী সংখ্যায় সমাপ্ত)

ভাসানীর বাণী

ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ইসলামী শিক্ষা বন্ধ রাখলে বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানেরা তাহা কখনো বরদাস্ত করিবে না।

অতীত ইতিহাস লক্ষ্য করিলে প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় যে, বাংলাদেশের মুসলমানদের বংশধরদের অনেকেই হিন্দু ছিল। তাহারা উচ্চ বর্ণের হিন্দু ও ব্রাহ্মণদের অত্যাচার ও উৎপীড়নে অতিষ্ট হইয়া পবিত্র ইসলাম গ্রহণ করিয়া মুসলমান হইতে বাধ্য হইয়াছিল। আজ হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সম্পর্ক যাহাতে স্থায়ী হয় তজ্জন্য সচেতন থাকিতে হইবে। ভবিষ্যতে যাহাতে উচ্চবর্ণের হিন্দু ও সামাজ্যবাদ-পুঁজিবাদী শোষক শ্রেণীর লোকের নির্যাতন ও শোষণের যাঁতাকলে ফেলিয়া আমাদের এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে তিক্ততা সৃষ্টি করিতে না পারে তাহার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ইহার জন্য মুসলমান কৃষকদের উচিত গ্রামের হিন্দু কামার, তাঁতী, মুচি, ঢোম, মেথর প্রভৃতি গোত্রের প্রতি মৌখিক দরদ না দেখাইয়া তাহাদের দৈনন্দিন জীবনের দুঃখ-দৈন্য দূর করিবার জন্য সংবেদনশীল মনোবৃত্তি লইয়া আগাইয়া আসা। প্রতিটি মুসলমানকে মনে রাখিতে হইবে আমরা যে রব্বুল আলামীনের সৃষ্টি

তাহারাও সেই অদ্বিতীয় আল্লাহ-পাকেরই সৃষ্টি। সুতরাং তাহাদের প্রতি অযথা অন্যায় অত্যাচার করিলে আল্লাহর গজবে ধ্বংস হইতে হইবে।

মুসলমানেরা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ইসলামের আসল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হইতে পারিলে তাহাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বিষ সংক্রমিত হইতে পারিবে না। ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ইসলামী শিক্ষা বন্ধ রাখিলে বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানেরা তাহা কখনো বরদাস্ত করিবে না। উচ্চ শিক্ষিত আলেম-ওলামা ও প্রফেসরদের দ্বারা কোরআন-হাদিস, ফেকা ও রসূলের (সঃ) আদর্শের ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া মুসলমানদের ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে সঠিক ধারণার বশবর্তী করা। নতুবা যে কোন দমননীতিকে উপেক্ষা করিয়া মুমিন-মুসলমানেরা সরকারের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন আরম্ভ করিবে।

শুধু মুসলমানদেরই নয়–হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান প্রভৃতি সকল ধর্মাবলম্বীদের প্রতিই সরকার দায়িত্ব পালন করিবে।

বিনা বিচারে কাহাকেও একদিনের জন্যও আটক রাখা নেহায়েত অন্যায়। অখণ্ড ভারতে এবং ভারত বিভক্তির পর যাহাতে বিনা বিচারে কাহাকেও আটক রাখা না হয় তাহার জন্য আমরা আন্দোলন করিয়াছিলাম। বর্তমান সরকারের আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠানও ইহার বিরুদ্ধে তুমুল সংগ্রাম করিয়াছে। তাই বিনা বিচারে আটক রাখার ব্যবস্থাকে এই দেশের জনগণ কিছুতেই বরদাস্ত করিবে না। নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে সুযোগ্য বিচারকের দ্বারা বিচার করিয়া দোষী সাব্যস্ত হইলে কাহাকেও শাস্তি প্রদান করিলে তাহাতে কাহারো আপত্তি থাকিবে না।

ধান, চাউল, আটা, তেল, নুন ইত্যাদি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষের দাম মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলিয়া গেলে তিন বছর কেন এক সপ্তাহও বাঁচিবে না। কিন্তু সেই সমস্ত জিনিষের দাম দিনের পর দিন এত বাড়িতেছে যে, যাহা কল্পনাও করা যায় না। ইহার ফলে কোটি কোটি কৃষক, মজুর তথা মেহনতি মজলুম মানুষ মৃত্যুর কবলে পতিত হইয়াছে। এই সমস্যা প্রতিকারের জন্য প্রতিটি রাজনৈতিক দল, ছাত্র-কৃষক-শ্রমিকদের প্রতিষ্ঠানের নৈতিক দায়িত্ব সারা দেশময় খাদ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষের দাবীতে পূর্বের মত ভুখা মিছিল বাহির ও জনসভা করিয়া সারা বিশ্বের শান্তিপ্রিয় মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

১৯৪৩ সালে খাদ্যের অভাবে অখণ্ড ভারতে পঞ্চাশ লাখ মানুষ মারা গিয়াছিল। বাংলাদেশে তাহার চাইতেও বেশী খাদ্যাভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। ভূমিহীন মজুরেরা কৃষকদের বাড়ীতে খাটিয়া অতিকষ্টে দিন কাটাইত, আজ তাহারা সমস্তই বেকার। তাহাদের খাটাইবার সরকারী-বেসরকারী ব্যবস্থা না থাকায় পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছে। দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস বাংলাদেশের সর্বত্রই রাহু বিস্তার করিয়াছে। এই অবস্থার আশু প্রতিকার না হইলে সারাদেশময় চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, হাট-বাজার লুণ্ঠন ইত্যাদি সমাজ বিরোধী কাজ আরও বৃদ্ধি পাইবে।

পচা ভুট্টার ছাতু ও গুঁড়া দুধ খাইয়া গ্রাম দেশের বহু লোকের পেটের পীড়া আরম্ভ হইয়াছে– অতি সত্বর ইহার বিতরণ স্থগিত না রাখিলে ১৯৪৩ সালের সরকারের নজরখানার বাজরার খিচুরী খাইয়া যেমন লক্ষ লক্ষ লোক মরিয়াছিল এবারও তাহারই পুনরাবৃত্তি ঘটিবে।

তাই বাংলাদেশের ৬২ হাজার গ্রামের কৃষক, মজুর, কামার, কুমার, জেলে, তাঁতী সকল শ্রেণীর দরিদ্র জনতার প্রতি আমার আকুল আবেদন যে, আপনারা গ্রামে গ্রামে ঐক্যবদ্ধ হউন, বাঁচার দাবীতে সংগ্রাম আরম্ভ করুন, সরকারকে জানিয়ে দিন আমরা ভিক্ষা চাই না; কাজ চাই। প্রতিদিন অন্ততঃ চার টাকা মজুরীতে খাটিবার ব্যবস্থা চাই–গ্রামেও শহরের মত পূর্ণ রেশনিং ব্যবস্থা চাই। আপনারা সরকারকে আরও জানিয়ে দিন যে, আমরা গ্রামের শতকরা ৯৭ জন লোক আপনাদের ভোট দিয়া গদিতে না বসাইলে শুধু শহরের মুষ্টিমেয় লোক যাহারা ২০ টাকা মণ দরে আটা, ৩০ টাকা মণ দরে চাউল, ৩.৫০ টাকা দরে সোয়াবিন ও ২.১২ টাকা দরে চিনি পায় তাহাদের ভোটে কিছুতেই মন্ত্রী-মেম্বরের পদ লাভ করিতে পারিতেন না। যদি ইহাই আপনাদের ন্যায্য-বিচার হয় যে, শহরের লোক পূর্ণ রেশন পাইবে এবং গ্রামের একশত ঘর লোকের ভিতর মাত্র পাঁচ-সাত ঘর লোক প্রতি মাসে ৪ সের চাউল, ৩/২ সের গম পাইবে তাহা হইলে আগামী নির্বাচনের সময় শহরের ঐ মুষ্টিমেয় সুযোগপ্রাপ্ত লোকদের উপরই আপনাদিগকে নির্ভর করিতে হইবে। গ্রামের সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষক, মজুর, কামার, কুমার, তাঁতী, জেলে, মাঝি প্রভৃতি দরিদ্র শ্রেণীর ভোট দ্বিতীয়বার আপনাদের ভাগ্যে জুটিবে না। আমাদের ভাগ্য গড়ার দায়িত্ব আমরাই গ্রহণ করিব।

'হক-কথা'র প্রতিবাদ

[গত ২১শে জুলাই তারিখের 'হক-কথা'য় প্রকাশিত একটি হক সংবাদের প্রতিবাদে চট্টগ্রামের জাদরেল আওয়ামী লীগ নেতা জনাব হান্নান ৫ই আগস্টের দৈনিক 'আজাদীতে' রীতিমত বলিষ্ঠ এবং সতেজকণ্ঠে প্রকাশিত হক খবরটির সত্যতা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। পত্রিকার ৯ই আগস্টের সংখ্যায় বেগম এম আর খান অন্য একটি বিবৃতিতে খবরটি যে সম্পূর্ণ হক তা স্পষ্টভাবে জানান। পাঠকের অবগতির জন্য আমরা দুটো পত্রই তুলে ধরলাম।]

চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব এম. এ. হান্নান এক বিবৃতিতে বলেন যে টাঙ্গাইল হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'হক-কথা'র গত শুক্রবারের সংখ্যায় তাঁহার সম্পর্কে একটি বানোয়াট ও সম্পূর্ণ মিথ্যা সংবাদ প্রকাশ করা হইয়াছে। তিনি উহার তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জ্ঞাপন করিয়াছেন।

তিনি বলেন যে, তিনি অবৈধভাবে একটি বাড়ী দখল করিয়া আছেন মর্মে প্রকাশিত সংবাদ সম্পূর্ণ কাল্পনিক ও ভিত্তিহীন।

এ ব্যাপারে চ্যালেঞ্জ প্রদান করিয়া তিনি বলেন যে, সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্তৃপক্ষের সম্মতিক্রমে সাময়িককালের জন্য তিনি সপরিবারে ডিস্ট্রীক্ট কাউন্সিলের রেস্টহাউজে বাস করিতেছেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, চরম বিদ্বেষ ও উস্কানিমূলক এই সংবাদটিতে জনসাধারণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপপ্রয়াস রহিয়াছে।

০ ০ ০

চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব এম. এ. হান্নান 'হক-কথা'য় তাহার সম্পর্কে প্রকাশিত খবরের প্রতিবাদে যে বিবৃতি প্রদান করেন, দৈনিক আজাদীর গত ৫ই আগস্ট সংখ্যায় উহা প্রকাশিত হয়।

এ বিবৃতির জবাবে মরহুম আলহাজ্ব এম. আর. খানের পত্নী (হাজী) আয়েশা খানম দৈনিক 'আজাদীতে' প্রেরিত এক পত্রে উহার প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়া বলেন যে, জনাব হান্নান তাহার দখলকৃত বাড়ীটিকে চট্টগ্রাম জিলা পরিষদের রেস্টহাউস বলিয়া বর্ণনা করিলেও উহা সত্য নহে।

বেগম আয়েশা খানম বলেন যে, তাহার স্বামী মরহুম এম, আর, খান স্থানীয় আসকার খান দীঘির পূর্ব পার্শ্বস্থ পাহাড়সহ কথিত বাড়ীটি ক্রয়পূর্বক বিগত ৬/৮/৬৯ ইং তারিখে তাহার দখল গ্রহণ করেন। কিন্তু সাবেক পাকিস্তান নৌ-বাহিনীর পদস্থ অফিসাররা জোরপূর্বক ঐ বাড়ী ১৯৭১ সালের গোলযোগ পর্যন্ত দখল করিয়া রাখে। তিনি বলেন যে, স্বাধীনতা যুদ্ধকালে সান্ধ্যআইন বলবৎ থাকাকালে হানাদার বাহিনী ৩/৪/৭১ ইং তারিখে তাঁহার তিন সন্তানসহ স্বামীকে ধরিয়া নিয়া যায় এবং অদ্যাবধি তাহাদের কোন খোঁজ পাওয়া যায় নাই।

তিনি বলেন, স্বাধীনতা অর্জনের পর প্রথমদিকে তিনি স্বামী-সন্তানের খোঁজে ব্যস্ত থাকাকালে জনাব হান্নান কথিত বাড়ীটিতে বসবাসের জন্য আগমন করেন।

সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রসহ বারবার জনাব হান্নান সাহেবকে উপরোক্ত ঘটনাবলী জানাইয়া বাড়ীটি ছাড়িয়া দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি সম্মত না হওয়ায় বেগম এম, আর, খান এই ব্যাপারে স্থানীয় প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন বলিয়া বিবৃতিতে উল্লেখ করেন।

বেগম আয়েশা খানম আরো বলেন যে, গত জুন মাসে তিনি ঢাকায় গিয়া বঙ্গবন্ধুর সহিত সাক্ষাতপূর্বক সকল ঘটনা বিবৃত করেন এবং বঙ্গবন্ধু সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোনে জনাব হান্নানকে অবিলম্বে গৃহ ছাড়িয়া দেওয়ার জন্য বলিলে তিনি (জনাব হান্নান) এক মাসের সময় চাহেন।

তিনি বলেন, জনাব হান্নান কর্তৃপক্ষের বাহানা দিয়া নানা অজুহাতে এখনো ঘর দখল করিয়া আছেন এবং তিনি (বেগম আয়েশা) নিঃসহায় অবস্থায় কালাতিপাত করিতেছেন।

বেগম আয়েশা মানবতার খাতিরে উপার্জনক্ষম ব্যক্তিহীন পরিবারের বর্তমান দূরাবস্থার কথা বিবেচনা করিয়া উক্ত বাড়ী তাহাকে প্রত্যার্পণ করার জন্য জনাব হান্নানের প্রতি অনুরোধ জানান।

চীনের প্রতি ভাসানীর আবেদন

আমি বিভিন্ন প্রচার সংস্থার মাধ্যমে জানিতে পারিলাম যে চীন সরকার বাংলাদেশের জাতিসংঘের সদস্যপদের দাবীকে ভেটো দেওয়ার হুমকি দিয়াছে। ইহা যদি সত্যি হয় তবে বড়ই পরিতাপ ও দুঃখের বিষয়। তাই আমি কালবিলম্ব না করিয়া যাহাতে চীন সরকার ও চীনের জনগণ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়া ইহার জাতিসংঘের সদস্যপদের দাবীকে সমর্থন করেন তাহার জন্য চীন সরকারের নিকট জরুরী আবেদন জানাইতেছি।

একখানা খোলা চিঠি

প্রিয় বন্ধু,

মহান করুণাময় খোদার কাছে আপনার রোগমুক্তি ও দীর্ঘায়ু কামনা করে কয়েকটি প্রশ্ন পেশ করছি–

আপনার এয়ার ইন্ডিয়ান বোয়িং ৭০৭ ভাড়া করা বিমানযোগে স্বপরিবারে ও সেক্রেটারীয়েটের কয়েকজন সদস্যসহ চিকিৎসার জন্য প্রসিদ্ধ লন্ডন ক্লিনিকে ভর্তি হয়েছেন। রাণীর ব্যক্তিগত চিকিৎসক স্যার এডওয়ার্ড ম্যুর আপনার সকল চিকিৎসাও করেছেন।

কিন্তু আপনার দেওয়া চারটি স্তম্ভের মধ্যে সমাজতন্ত্র অন্যতম। সে সমাজতন্ত্রে আপনি বিশ্বাসী। আপনি চিকিৎসার জন্য বাংলাদেশের চিকিৎসকের উপর নির্ভরশীল না থেকে লন্ডনে পাড়ি দিলেন কেন?

বাংলাদেশের চিকিৎসকের উপর আপনার আস্থা না থাকলে, আমরা সাড়ে সাত কোটি কাঙ্গালী বনাম বাঙ্গালী কেমন করে এদের উপর আস্থা রাখতে পারি–তার জবাব দেবেন কি?

আপনি আমাদেরকে সম্বোধন করেছেন, 'ভাইয়েরা আমার' তাহলে আপনার চেয়েও কঠিন রোগে আক্রান্ত অগণিত ভাইদের চিকিৎসার ভার এদেশের চিকিৎসকের উপর ফেলে রাখলেন কি করে?

আপনার সুযোগ সামর্থ আছে তাই আপনি সরকারীভাবে লন্ডন গিয়ে অস্ত্রোপচার করার সুযোগ পেলেন। কিন্তু রোগ-শোকে, চিকিৎসার অভাবে দিনের পর দিন আমরা যারা ধুঁকে ধুঁকে মরছি, রোগ মুক্তির জন্য তেমন সুযোগ্য চিকিৎসকের হাতে চিকিৎসার ইচ্ছে আমাদের মনে কি জাগে না?

আপনি আমাদের ভোটেই নির্বাচিত হয়ে আজকের সম্মানিত আসনে সমাসীন। আপনি বঙ্গবন্ধু ও জাতির পিতার দাবীদার! আপনি সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের বিশাল জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, বাংলাদেশকে আপনি জীবন দিয়েও ভালবাসেন। তাহলে রোগ মুক্তির জন্য মাতৃভূমির চিকিৎসকদের চিকিৎসার সুযোগ না দিয়ে দেশ ত্যাগ করে বিদেশী চিকিৎসকদের নিকট আত্মসমর্পণ করলেন কেন? এটা কি কোন আত্মবিশ্বাসী দেশপ্রেমিকের দৃষ্টান্ত?

আপনার কাছে সশ্রদ্ধ আবেদন, বাংলাদেশ আপনার ঘোষিত সমাজতন্ত্রের দেশ, ধনী, গরীব তথা দেশের সকল শ্রেণীর মানুষের সমান অধিকার। সুতরাং আপনার চিকিৎসার জন্য আপনি যতটুকু সুবিধা পেয়েছেন শুধু চিকিৎসাই নয়– আপনি ও আপনার সহকর্মীবৃন্দ জীবন ধারণের যেরূপ সুযোগ-সুবিধার অধিকারী, এদেশের কৃষক, মজুর, দিন ভিখারী ও সর্বোপরি সকল শ্রেণীর দরিদ্র মানুষ কি তাহার কিঞ্চিৎ পরিমাণও পায়?

জীবনের দাম আপনার কাছেও যতটুকু, নগণ্য হলেও আমাদের কাছেও ততটুকুই। আপনিও যে আল্লাহ্ পাকের সৃষ্টি আমরাও সেই অদ্বিতীয়েরই সৃষ্টি। আপনার সুখানুভূতি, দুঃখানুভূতি রয়েছে ; আমাদেরও তেমনি রয়েছে। আপনি যেমন সুস্থ্য দেহ নিয়ে বাঁচতে চান, আমরা ও তেমনি সুস্থ্য দেহ নিয়ে বাঁচতে চাই। আপনি যেমন মানুষ, আমরাও তেমনি রক্ত-মাংসে গড়া মানুষ।

তবে তফাৎ শুধু এইটুকু, আপনি দেশের কর্ণধার– আমরা তা' নই।

আরেকটি কথা– অস্ত্রোপচারের আগে আপনি নাকি বলেছেন, "আল্লাহ্ তুমি আমার দেশের গরীবদেরকে দেখো। আচ্ছা আপনার প্রার্থনা কি হাস্যকর বিদ্রূপাত্মক নয়? রোগে-শোকে, খাদ্যাভাবে দেশের লোক মরে যাচ্ছে আর আপনি লন্ডনের ক্লিনিক থেকে দেশের রোগাক্রান্ত ভুখা-নাঙ্গা-দরিদ্র জনতাকে দোয়া করছেন। বলিহারি আপনার প্রার্থনা!

পরিশেষে, অস্ত্রোপচার যদি আপনার প্রধান উদ্দেশ্য না হয়ে রাজনৈতিক কারণই দেশ ত্যাগের কারণ হয়ে থাকে, তবে আর আমাদের বলার কিছু নেই।

বিচারের নামে প্রহসন

ময়মনসিংহ জেলার শেরপুর থানাধীন ভাতশালা গ্রামের গৃহবধূ সুশীলা সূত্রধর-এর উপর দখলকার আমলে পাক–দালালরা বর্বর অত্যাচার চালিয়েছিল।

স্বাধীনতার পর তিনি মেডিক্যাল সার্টিফিকেটসহ শেরপুর থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। থানার কর্তারা অজ্ঞাত কারণে ঘৃণ্য আসামীদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন শুরু করে। থানার দারোগা উক্ত গৃহবধূকে ডেকে এনে বিবাদীদের সাথে আপোষ মীমাংসা করার জন্য অন্যায়ভাবে চাপ দেয়। থানার

ওসি চার্জশীট না দেবার হুমকি দেন। অবশেষে ছাত্রদের হস্তক্ষেপে থানার ওসি একটা চার্জশীট দিলেও তা মিথ্যা ছিল। আসামীরা জামালপুর আদালত থেকে জামিন পেয়ে ফিরে এসেছে।

ইহা কি সত্য?

॥১৩১॥

গণভবনের অভ্যন্তরে চির-অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও পরিকল্পনামন্ত্রী জনাব তাজুদ্দিন সম্প্রতি বাকবিতণ্ডার পর হাতাহাতিতে লিপ্ত হতে যাচ্ছিলেন। শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হবার উদ্যোগ নেবার পূর্বে তাঁরা যে প্রশ্নটি আলোচনা করছিলেন, তা কি ভারত-রুশ অক্ষ সংক্রান্ত নয়? তাই যদি সত্য হয়ে থাকে, তবে উভয়ে উভয়কে প্রতিবেশী দেশের দালাল বলে কি আখ্যায়িত করেননি?

॥১৩২॥

কয়েকদিন পূর্বে ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ল্যাবরেটরীর মাইক্রোস্কোপ চুরি করার সময় দুইজন চোর হাতেনাতে ধরা পড়ে যায়। উত্তম-মধ্যমের পর তারা পূর্বে যে আরো অনেক জিনিষ চুরি করেছে তা স্বীকার করে। বিশ্ববিদ্যালয়ে watch & ward section তাদেরকে (চোরদ্বয়কে) থানায় সোপর্দ করে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, উপাচার্য সাহেবের নির্দেশক্রমে ২৪ ঘন্টার মধ্যে উক্ত চোরদ্বয়কে ছেড়ে দেওয়া হয়। কেননা, তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক আওয়ামী লীগভুক্ত ঠিকাদারের পরিচিত লোক।

॥১৩৩॥

কুমিল্লা জেলা আওয়ামী লীগের জনৈক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা উত্তরবঙ্গের একটি সিগারেট কোম্পানীর ডিলার। এই ডিলারশীপটি পূর্বে একজন অবাঙ্গালীর ছিল। বর্তমানে উক্ত আওয়ামী লীগ কর্মকর্তা পুরনো কার্ড বাতিল করেছেন কিন্তু নতুন কার্ড ইস্যু করেন নাই এবং সমস্ত সিগারেট কালোবাজারে বিক্রী করছেন। ফলে ধূমপায়ীরা প্রতি দশটি সিগারেটের একটি করে প্যাকেট ১ টাকা হতে ১.৫০ টাকা মূল্যে কিনতে বাধ্য হচ্ছেন। অথচ এর ন্যায্য মূল্য ০.৫০ টাকার নিচে। নেতার এহেন কার্যকলাপ প্রত্যেকেই জানেন কিন্তু যেহেতু তিনি ক্ষমতাসীন দলের একজন নেতা (ইনি আবার একজন অধ্যাপকও বটে) সেহেতু 'দলবিহীন' জনসাধারণ কিছু করতে পারছে না।

॥১৩৪॥

সরকারী নির্দেশানুযায়ী পাক-আমলের সকল পদোন্নতি বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের এনাটমী ও হিষ্টলজী বিভাগের জনৈক লেকচারার পাক-আমলে পদোন্নতির বলে সিনিয়র লেকচারার হয়েছিলেন। কিন্তু সরকারের ঘোষণার পর তিনি আজও সিনিয়র লেকচারার হয়ে আছেন। সবার পদোন্নতি বাতিল হলেও উক্ত সিনিয়র লেকচারারের পদোন্নতি বাতিল কেন হল না সেটা একটা প্রশ্ন।

॥১৩৫॥

একমাত্র নয়নপুর্ব (কুমিল্লা জেলা) সীমান্ত দিয়ে দৈনিক কমপক্ষে ৪০ মণ দুধ প্রতিবেশী 'মিত্ররাষ্ট্রে' পাচার হচ্ছে। ফলে ০.২৫ পয়সা হতে ০.৩৭ পয়সার স্থলে (নয়নপুরে) দুধের দাম হচ্ছে ১.০০ হইতে ১.৫০ টাকা। তাছাড়া ডিমের হালি সীমান্তের অপর পারে ০.৫০ টাকা, এপারে ১.০০-১.২৫ টাকা। ডিমগুলি কিন্তু সব এপারের।

সম্পাদক ঃ সৈয়দ ইরফানুল বারী, ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ঃ মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী
মুদ্রণে ঃ শান্তি প্রেস, সন্তোষ, টাঙ্গাইল।

প্রতি কপি পঁচিশ পয়সা সাপ্তাহিক চাঁদার হার : ষান্মাসিক-৬.০০ বার্ষিক-১০.০০

হক-কথা

(WEEKLY THE HAQ-KATHA)

প্রকাশক ও পৃষ্ঠপোষক ঃ মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

প্রথম বর্ষ ২৬শ তম সংখ্যা ; শুক্রবার ; ৮ই ভাদ্র, ১৩৭৯ ; ২৫শে আগষ্ট, ১৯৭২ ; ১৫ই রজব, ১৩৯২ ; সন্তোষ, টাঙ্গাইল।

আমি ভাতে মারবো– পানিতে মারবো

নির্মম পরিহাস সত্য হলো

'পানি আর ভাত' – এ দুটোতে পাঞ্জাবী দখলকার বর্বর বাহিনীকে 'মারবার' শ্লোগান হেঁকে জনতার চাপে ১৯৭১-এর ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমান স্বাধীনতার দাবীতে সাড়া দিয়েছিলেন। আমি ভাতে মারবো– আমি পানিতে মারবো– বলে হুঙ্কার ছেড়ে তিনি আশ্রয় নিয়েছিলেন ৩২নং ধানমণ্ডিতে পাকিস্তানের পুঁজিপতি হারুন গোষ্ঠীর সাহায্যে নির্মিত বাসভবনে। সেখান থেকেই তিনি চলে গেলেন বন্দীবীরের বেশে।

এদেশের মানুষ ভাতে-পানিতে পাঞ্জাবী মারার সময়ক্ষেপক পথ ধরেনি, অস্ত্রের ভাষায়, অস্ত্রের আঘাতে পাঞ্জাবীদের উৎখাত করেছে। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, আজ তিনি এদেশের জনগণকেই তাঁর নিজস্ব কায়দায় ভাতে-পানিতে মারতে শুরু করেছেন।

ভাত যেন দুর্লভ স্বপ্ন

আজ এদেশের শতকরা ৫০ জন মানুষের কাছে ভাত যেন দুর্লভ স্বপ্ন। পচা আটা, ভুট্টা, ঘেচু, শাক-লতা খেয়ে খেয়ে এদেশের ৬৫ হাজার গ্রামের কোটি কোটি মানুষ ভাতের কথা ভুলতে বসেছে। অনাহার বুভুক্ষার কষাঘাতে এদেশের মাটির মানুষদের চেহারা হয়ে গেছে কঙ্কালসার। তাদের মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাতে ভয় হয়।

বাঁচবার, চারটা ভাত পাবার দাবী ছাড়া অন্যান্য রাজনৈতিক আন্দোলনে যারা কোন প্রেরণা অনুভব করে না, এদেশের সেই গরীব কৃষক, ভূমিহীন ক্ষেতমজুর, দিনমজুর আর ছিন্নমূল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষেরা আজ আবার চাবুকের ঘা খাচ্ছে, দিন দিন প্রতিদিন এই চাবুকের ঘা হচ্ছে তীব্রতর।

অন্নকষ্টে সন্তান মরছে, অনাহারে শুকিয়ে মরছে গৃহবধু, পুরুষগুলো দিশাহারা হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ছে এখানে-সেখানে, যত্রতত্র। দুর্ভিক্ষের কালোছায়া নেমে এসেছে সারা দেশের উপর।

তাঁর বাগাড়ম্বর আজ মিথ্যাবুলি হিসাবেই জনগণের কাছে মূল্যহীন। আজ এই মুমূর্ষ, নিরন্ন মানুষের কানে প্রেতকণ্ঠের মত সেদিনের হুঙ্কার বাজছে আমি ভাতে মারবো, আমি পানিতে মারবো।

পানিও এসেছিল। চড়া পড়া অগভীর নদীর বুকে বর্ষার জলস্রোত বইতে না বইতেই ভেসে গেল সিলেট, রৌমারী, চিলমারী, সিরাজগঞ্জ,

চাঁদপুর, ফরিদপুর, গোয়ালন্দ, দিনাজপুর। অর্ধকোটি মানুষ হয়ে পড়লো বন্যাদুর্গত। সিরাজগঞ্জ বাঁধের কয়েক লক্ষ টাকা যারা মেরে দিয়েছে রিলিফের নামে তাদের আরও কোচড় ভরবার সুবিধা হলো। মরার উপর খাড়ার ঘায়ের মত বন্যার্তরা হারালো আশ্রয়, সম্বল স্বস্তি।

পানিও তাদের মারলো। কিন্তু তাঁকে কিছুই ছুঁতে পারলো না। তিনি সব কিছুর উর্ধ্বে-সুখের চিলিকোঠায়।

দ্রব্যমূল্য

চালের দর এখন একশো থেকে একশো দশ। ডালের সের দু'টাকা, সর্ষের তেল দেশে নাই। সোয়াবীন সাফ। কেরোসিনের আকাল বেড়েই চলেছে।

দ্রব্যমূল্য হ্রাসের বড় বড় বুলি বিলীন হয়ে গিয়ে জনগণের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে রূঢ় বাস্তবতা। তারা দেখছে তাদের ডাল-ভাত তাদের পাত থেকে কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে।

কে নিচ্ছে-কারা নিচ্ছে? সরকারের কাছে জবাব তার পাওয়া যায়নি। তারা মৃত্যুমুখ মানুষের অবশ-বিবশ দেহের উপর নর্তন করছে। কাপালিকের মত জিকির তুলছে ঃ মুজিববাদ-মুজিববাদ।

আর কত?

চালের মণ চল্লিশ থেকে একশোতে এসেছে। লুঙ্গির দাম চার টাকা থেকে এসেছে ষোলতে। এবার জিজ্ঞাসা করতে হয় আর কত হে বন্ধু পিতা!

জান নিচ্ছ, জিহ্বা কি বড় কথা?

যদি বলা হয়, যে ভারতের টাকার দাম ছিল আমাদের অর্ধেক, সে ভারতীয় টাকা এখন আমাদের টাকার দ্বিগুণ দামে পৌঁছেছে। আগে বাংলাদেশের আট আনার জিনিষ ভারতে এক টাকা ছিল, এখন সেই জিনিষ বাংলাদেশে দু'টাকা। ভারতের এক টাকা দিয়ে এখানকার দু'টাকার জিনিষ কিনে ভারত দেড় টাকায় বেচলে যে পঞ্চাশ পয়সা লাভ থেকে যায়– আর এই চক্রজালে বাংলাদেশকে নিঙড়ে উজাড় করে দিচ্ছে ভারতের বেনিয়ারা– এ কথা বললে সরকারের গা জ্বলে ওঠে। তারা কেতাবের হিসাব দেখতে চান। দেখাবার কিছু না থাকলে বলেন, জিহ্বা উপড়ে ফেলবো।

কিন্তু ক্ষমতাসীনেরা, অনাহারে রেখে তোমরা জান কবজ করছো, জিহ্বা কি আর বড় কথা হলো?

ভাঙো এ শৃঙ্খলবেড়ী

অনাহারে পাঁচ হাজার, মুজিববাদ কায়েমের নামে ত্রিশ হাজার মানুষকে এই ক্ষমতাসীনেরা হত্যা করেছে ১৬ই ডিসেম্বরের পর। এই নরহত্যার পুরীতে অতিষ্ট হয়ে ৭ কোটি মানুষ পাগলপারা হয়ে উঠেছে। তারা মুক্তি চায়। তারা মুক্তির নামে প্রতারণা করার জন্য দায়ী দস্যুদের কাছে শেষ জবাব চায়। মৃত্যুপুরীর শৃঙ্খলবেড়ী ভেঙে তারা বেরুবেই।

লড়াইয়ের ডাক এসেছে সাথী

বুভুক্ষ নিরন্ন মানুষের স্রোত নেমে এসেছে রাস্তায়। তাদের এ বাঁধভাঙ্গা স্রোত রোধ করে কার এমন শক্তি।

ক্ষমতার মসনদকে কাঁপিয়ে স্লোগান জাগছে দেশের সর্বত্র ভুকা মিছিলে ঃ ভাংগো এই শাদ্দাদী কুশাসন।

শোষকদের পক্ষাবলম্বনকারী শাসকদের বিষদাত উপড়াবার কৌশল ও দক্ষতা আজ জনতার জানা। ইটের বদলে পাটকিল না হয়ে যাবে না।

হুশিয়ার!

বুভুক্ষ-নিরন্ন মানুষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য ল্যাজ পাকাচ্ছে হিংস্র ক্ষমতাসীনেরা। হুশিয়ার! ক্ষুধার্ত মানুষকে অন্ন না দিয়ে তাকে পিটিয়ে শান্ত রাখার পরিণতি শুভ হবে না।

প্রচণ্ড গণবিস্ফোরণে শাদ্দাদ আর শাদ্দাদদের সকল রক্ষাকর্তার শক্তি ধূলায় মিশে যাবে চক্ষের পলকে।

ভাসানীর ডাক

৩রা সেপ্টেম্বর ভুখা মিছিল বের করুন

১৯শে আগস্ট। মওলানা ভাসানী রাজবাড়ী যাবার পথে আরিচা ঘাটে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা প্রদান করেন। মওলানা বলেন, পাকিস্তানী শাসক ও শোষকগোষ্ঠী গত ২৩ বৎসর বাংলাদেশকে শোষণ করে যে পরিমাণ সোনা-রূপা, চান্দি, মালামাল পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার করেছে তার চেয়ে বেশী সম্পদ হিন্দুস্থান সরকারের সৈন্যবাহিনী ও মাড়োয়ারী শোষকেরা গত ৯ মাসে হিন্দুস্থান নিয়েছে। তিনি বলেন, এক শ্রেণীর বিশ্বাসঘাতক ও অর্থলোভী লোক আওয়ামী লীগের নাম ভাঙ্গিয়ে বহু অর্থ জোগার করেছে– বাড়ী–গাড়ী, টেলিভিশন ও গ্রামে

শেখ মুজিব, তুমি দেশে ফিরে এসে ন্যাশনাল কনফারেন্স ডাকো– সকলে মিলে এই দুর্ভিক্ষের মোকাবেলা করি

জমি-ক্রয় করে রাতারাতি বড়লোক সেজেছে। অন্যদিকে যারা বুকের রক্ত দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করেছে তারাই অন্নাভাবে মৃত্যুর দ্বারে উপস্থিত হয়েছে।

তদুপরি, গ্রাম বাংলায় চুরি–ডাকাতি, রাহাজানি গুপ্ত হত্যা, লুণ্ঠন ইত্যাদি সমাজ বিরোধী কাজ অহরহ ঘটছে– মানুষের জীবনের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা নেই। তিনি বলেন যে, সরকারের লালবাহিনী, রক্ষীবাহিনী, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ও অন্যান্য সাদা-কালো বাহিনীরা এসব সমাজ বিরোধীদের শায়েস্তা করতে পারছে না।

সমাজের ঘুষখোর, চোর, টাউট, গুন্ডাদের জব্দ করার কোন যোগ্য ব্যবস্থা নেই। মওলানা জোর দিয়ে বলেন, ভয়ভীতিকে উপেক্ষা করে প্রতি গ্রামে, ইউনিয়নে, থানায়, মহকুমায় ও জেলায় সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তুলুন– কৃষক, মজুর, কামার, কুমার, তাঁতী, মাঝি, বুদ্ধিজীবী, ছাত্র-জনতা সর্বশ্রেণীর বাঙ্গালী ভাইবোনেরা একত্রিত হয়ে ৩রা সেপ্টেম্বর হতে ভুখা মিছিল বের করে জনসভা করুন, মন্ত্রী, মেম্বর, এমসিএ এবং থানা, মহকুমা ও জেলা প্রশাসকের নিকট উপস্থিত হয়ে আওয়াজ তুলুন ১০ টাকা মণ দরে আটা, ২০ টাকা মণ দরে চাল দিতে হবে–স্বাধীনতা অর্জনের পূর্বে অর্থাৎ ১৬ই ডিসেম্বরের পূর্বে সরিষার তেল, কেরোসিন, কাপড়, চিনি, গুড়, মসল্লা, লবণ ইত্যাদি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষ যে দরে বিক্রী হতো সেই দামে দিতে হবে।

মওলানা ঘোষণা করেন যে, ধর্ম নিরপেক্ষতার নামে ধর্মের স্বাধীনতাকে খর্ব করা চলবে না। তিনি বলেন, বাংলাদেশের শতকরা ৮৬ জন ধর্মভীরু মুসলমানদের দাবী– রবিবারের পরিবর্তে শুক্রবার দিবস স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, অফিস বন্ধের ঘোষণা করতে হবে। কৃষককুলকে রক্ষার জন্য পাটের সর্বনিম্ন মূল্য ১২০ টাকা ধার্য করার জন্য তিনি সরকারের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।

মওলানা বলেন যে, প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ হিন্দুস্থানী নাগরিক বাংলাদেশে অবাধে যাতায়াত করায় এবং অনির্দিষ্টকালের জন্য এখানে বসবাস করায় বাংলাদেশের অর্থনীতির উপর দারুণ চাপ পড়েছে। তাই তিনি বিনা পাসপোর্টে যাতে কেউ বাংলাদেশে আসতে না পারে তার সুষ্ঠু ও দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করার

জন্য সরকারকে অনুরোধ করেছেন।

মওলানা আরো উল্লেখ করেন যে, ইদানিং পশ্চিমবাংলা ও আসামের লক্ষ লক্ষ হিন্দু-মুসলমান বাংলাদেশ দরদী হয়ে উঠেছেন। তাদের সত্যি যদি বাংলাদেশের প্রতি প্রীতি ও দরদ থাকে এবং বাংলাদেশের সঙ্গে যদি একাত্মতা বোধ করে তারা বাংলদেশে বসবাস করতে চায় তাহলে তাদেরকে দিল্লীর মোহ এবং সম্পর্ক ছিন্ন করে কলকাতাসহ ১৫টি জেলা বাংলাদেশের সঙ্গে পুনরায় সংযুক্ত করতে হবে।

আজ বাংলার মানুষ অন্নাভাবে মরছে

রাজবাড়ীর বিশাল জনসমুদ্রে ভাষণ দিতে গিয়ে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত কৃষক, মজুর ও সকল শ্রেণীর মেহনতি দরিদ্র মানুষের করুণ অবস্থা ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, আজ বাংলার মানুষ হা-অন্ন হা-অন্ন করে মরছে। তিনি বলেন, সরকার ১৪৪ ধারা জারী করে জনতার দাবী আদায়ের মাধ্যম এই বিপুল গণজমায়েতকে ভেঙ্গে দিতে পারেন–লালবাহিনী, রক্ষীবাহিনী, সেচ্ছাসেবক বাহিনী ইত্যাদি হাজারো রকমের বাহিনী দ্বারা মজলুম মানুষের মুক্তিসংগ্রামের পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে পারেন। কিন্তু আজ মানুষের পেটে অন্ন নেই, পরনের কাপড় নেই, দুর্নীতির কবলে পতিত মানুষ ধুঁকে ধুঁকে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হচ্ছে। দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, লোভ-লালসার শিকার হয়ে বর্তমান শাসকচক্র জনতার এই দুঃখ-দৈন্যকে উপেক্ষা করে চলেছে। তাই দুর্নীতির এই কঠিন নাগপাশ ছিন্ন করতে মজলুম মানুষ আজ সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে। মওলানা জোর দিয়ে বলেন, এদেরকে সরকারের দমননীতি কেন, দুনিয়ার কোন শক্তিই সংগ্রামের পথে বাধার সৃষ্টি করতে পারবে না।

তিনি উল্লেখ করেন, পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই দুই শ্রেণীর মানুষ– একদল শোষক আর একদল শোষিত মজলুম মানুষ-একশ্রেণী ধনী ও সবল আর একশ্রেণী গরীব ও দুর্বল। যারা ধনী তারাই শাসক, সমস্তন্ত, তারাই মন্ত্রী, মেম্বার, এমসিএ হয়ে দেশের ক্ষমতার গদী আকড়ে ধরে দরিদ্রকে শোষণ ও কুশাসনের যাতাকলে ফেলে নিষ্পেষিত করছে। দুনিয়ার মেহনতি গরীব মানুষদের ডাকে ধনীরা কোন দিন সাড়া দেয়নি– বার বার আবেদন-নিবেদন করে ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে ফিরে এসেছে। তাই সাম্রাজ্যবাদী শোষকগোষ্ঠীর নিকট আমাদের কোন আপোষ বা মীমাংসা নেই– তাদের মূলোচ্ছেদ ঘটানোই আমাদের কাম্য।

মওলানা বলেন, বাংলাদেশের ৬২ হাজার গ্রামের দরিদ্র কৃষক-মজুর ও সর্বশ্রেণীর মেহনতি মানুষ চেয়েছিল খেয়ে-পড়ে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় মোটা ভাত ও কাপড়। মুজিব সরকার তাদের ভোটেই নির্বাচিত হয়ে ক্ষমতায় সমাসীন। কিন্তু এদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোট নেওয়া হয়েছিল মুজিব তা পালন করতে পারেনি। আজ বাংলা শশ্মানে পরিণত হয়েছে। সর্বত্রই দুর্ভিক্ষের কালোছায়া নেমে এসেছে। চালের দাম ১১০ টাকা থেকে ১২০ টাকায় উঠেছে। জীবন ধারণের জন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় অন্যান্য জিনিষের দামও মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে। গ্রামের মানুষ শহরের মানুষের মত রেশন পায় না। তারা এখন মৃত্যুর মুখোমুখি। সরকার সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করে এই সব করুণ সংবাদ প্রকাশে বাধা দিচ্ছে। চোরাকারবার অবাধ গতিতে চলেছে, তা প্রতিরোধের ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ। চোরাকারবারী বন্ধ করতে না পারলে দেশের খাদ্য সঙ্কট আরও তীব্র হতে তীব্রতর হতে বাধ্য।

আজ যে দুর্ভিক্ষ বাংলাদেশে দেখা দিয়েছে একে প্রতিরোধ করতে না পারলে ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে অখণ্ড বাংলায় যেরূপ লাখ লাখ মানুষ অন্নাভাবে, বস্ত্রাভাবে শুকিয়ে মরেছে এবার তার চেয়ে বেশী লোক মারা

যাবে। এই ভয়াবহ পরিণতির কবল থেকে জাতিকে রক্ষার জন্য মওলানা ভাসানী শেখ মুজিবকে দেশে ফিরে এসে ন্যাশনাল কনফারেন্স আহ্বান করার নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, "শেখ মুজিব তুমি দেশে ফিরে এসে ন্যাশনাল কনফারেন্স ডাকো– সকলে মিলে এই দুর্ভিক্ষের মোকাবেলা করি।"

ফরিদপুরের জনসভায় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাবাবলী গৃহীত হয়েছে।

(১) এই সভা দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষাবস্থার জন্য গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে এবং এই ভয়াবহ অবস্থার কবল থেকে গরীব মানুষকে বাঁচানোর জন্য গ্রামাঞ্চলে পূর্ণ রেশনিং ব্যবস্থা চালু ও বিনামূল্যে খাদ্য সরবরাহের জন্য সরকারের নিকট জোর দাবী জানাচ্ছে। এই সভা সকল প্রকার চোরাকারবারী, চোরাচালানী, মজুতদারী, মুনাফাখোরী বন্ধের জন্য দাবী জানাচ্ছে।

(২) এই সভা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে, আওয়ামী লীগ সরকার জনগণের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হয়ে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, কৃষক সমিতি, বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশন, বাংলা শ্রমিক ফেডারেশন, বাংলা ছাত্র ইউনিয়ন ও বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীদের উপর নির্যাতন শুরু করেছে– মিথ্যা মামলা দায়ের, গুপ্ত হত্যা, ফ্যাসীবাদী হামলার মাধ্যমে এই নির্যাতন চালানো হচ্ছে। এই সভা ইহা বন্ধ করার জোর দাবী জানাচ্ছে।

(৩) এই সভা আগামী শাসনতন্ত্রে কৃষক-শ্রমিকের সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জোর দাবী জানাচ্ছে, অন্যথায় বাংলাদেশের জনগণ এই শাসনতন্ত্র গ্রহণ করবে না। আগামী ১০ই অক্টোবরের মধ্যে শ্রমিক–কৃষকের আশা–আকাঙ্ক্ষা সম্বলিত শাসনতন্ত্র প্রদান না করলে দেশব্যাপী আন্দোলন শুরু করা হবে।

(৪) এই সভা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করার ও বিনাবিচারে সাংবাদিকদের আটক রাখার তীব্র প্রতিবাদ করছে ও অবিলম্বে 'হক-কথা'র সম্পাদক ইরফানুল বারীর মুক্তি দাবী করছে।

(৫) এই সভা পাংশা বাজারের গতমপুরে চন্দনা নদীর মোহনায় যে বাঁধ দেওয়া হয়েছে উহাতে কালুখালী-কামারখালী পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল পানিতে প্লাবিত হওয়ায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে ও অবিলম্বে এই বাঁধ অপসারণের জোর দাবী জানাচ্ছে।

(৬) এই সভা আগামী ৩রা সেপ্টেম্বরে খাদ্যের দাবীতে ভুখা মিছিল বের করার জন্য মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী যে আহ্বান জানিয়েছেন তার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছে এবং উক্ত দাবী দিবসকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার জন্য শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র-জনতার প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছে।

(৭) এই সভা লক্ষ্য করছে যে, টেণ্ডু পাতার অভাবে হাজার হাজার বিড়ি শ্রমিক বেকার হয়ে পড়েছে। এই সভা বেকার শ্রমিকদের বাঁচানোর জন্য ভারত হতে বিড়ি আমদানীর পরিবর্তে টেন্ডু পাতা আমদানীর জোর দাবী জানাচ্ছে।

(৮) এই সভা আহত-নিহত মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারবর্গের পুনর্বাসনের ও ক্ষতিপূরণ দেয়ার জোর দাবী জানাচ্ছে।

(৯) এই সভা রাজনৈতিক নেতা, এমসিএ ও রিলিফ কমিটির চেয়ারম্যানদের ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের পূর্বে ও বর্তমান সময়ের আয়ের হিসাব প্রকাশের জোর দাবী জানাচ্ছে। যারা অসদুপায়ে সম্পদ ও অর্থ সংগ্রহ করছে তাদের কঠোর শাস্তি প্রদানের জোর দাবী জানাচ্ছে।

(১০) এই সভা কৃষকদের পাটের সর্বনিম্ন মূল্য ১২০ টাকা বেধে দেওয়ার স্বপক্ষে জোর দাবী জানাচ্ছে।

এই সভায় মওলানা ভাসানীসহ কাজী জাফর আহমেদ, আলমগীর সিদ্দিকী, মজিবর রহমান চিন্তি, গাজী সামসুল হক ও আরো অনেক নেতৃবৃন্দ বক্তৃতা করেন।

আমেরিকা চালনা বন্দর পেলো

গত ২৮শে জুলাই 'হক-কথা'র ২২তম সংখ্যায় 'রাশিয়ার সাথে চট্টগ্রাম বন্দর নিয়ে দ্বিতীয়বার কাবিননামা হলো' শীর্ষক সংবাদে আভাস দেয়া হয়েছিল যে চট্টগ্রাম বন্দরকে রাশিয়ার কাছে দীর্ঘমেয়াদী ইজারা দেওয়ায় আমেরিকা ক্ষুব্ধ হয়েছে এবং চালনা বন্দর হাত করতে চাইছে।

এখন জানা গেছে ভারতও তাতে রাজী হওয়ায় বাংলাদেশ সরকার চালনা বন্দর ও সমুদ্র এলাকা আমেরিকাকে ছেড়ে দিতে রাজী হয়েছে।

তবে আমেরিকা স্বয়ং চালনায় নামছে জাতিসংঘ সাহায্য সংস্থা আনরতের মাধ্যমে। এ ব্যাপারে সচিবালয়ে চুক্তির খসড়াও হয়ে গেছে।

মনিসিং-এর বিরুদ্ধে মস্কোর চার্জশীট

সোভিয়েত রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি বাংলাদেশের তথাকথিত কমিউনিস্ট পার্টির মনিসিং-এর বিরুদ্ধে চার্জশীট পাঠিয়েছে বলে জানা গেছে। আশ্চর্য হবার কিছু নেই, সম্প্রতি সদলবলে বারীন দত্তকে সরকারী দলের নেতা বানিয়ে মস্কো ও পূর্ব ইউরোপ সফরের পর দেশের পথে ফেরার উপক্রম করতেই তাকে আটক করা হয়েছে মস্কোতে। বারীন বাবুর উপর দিয়ে ঝড়টা কাটাবে, মনিদা' ভেবেছিলেন কিন্তু ক্রেমলিন আসল ঘুঘুকেই ধরেছে চিকিৎসার জন্য।

বাংলাদেশের চিকিৎসার জন্য বারীন বাবু ঔষধের কৌটা নিয়ে নীরবে ঢাকা এসে নেমেছেন। কিন্তু বাংলাদেশকে দাওয়াই দেবার আগে মিথ্যাবাদী তথাকথিত মনিপন্থী কমিউনিস্ট দলের চিকিৎসা করা দরকার মস্কোর পার্টি কমরেডরা দেরীতে হলেও এ সত্য উপলব্ধি করেছেন।

বাংলাদেশে সিআইএ'র খেল এই মনিসিং-রা খতম করে দিয়েছেন, সোভিয়েতকে সংশোধনবাদ বলে অভিযুক্ত করে পরিকল্পিত পাল্টা কমিউনিস্ট আন্দোলন নাকি এদের রাজনীতির প্রভাবে শেষ হয়ে গেছে, বাংলাদেশের আওয়ামী লীগ এই মনিপন্থী দলকে যমের মত ভয় করে সরকারের অভ্যন্তরে একদল শক্তিশালী সোভিয়েত লবী গড়ে তুলেছে– ইত্যাকার হাজারো কথা বলে বলে মনিপন্থী কমিউনিস্ট দলের প্রধান মনিসিং বাংলাদেশ সম্পর্কে সোভিয়েত পার্টি ও নেতাদের অতিমাত্রায় আশ্বস্ত করে তুলেছিল। এদের চাটুকারিতার দরুণ সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে এবং এখানে বিদ্যমান ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সামাজিক ভিত্তি সম্পর্কে পুরোপুরি অন্ধকারে থেকেছে। আর তারই ফলশ্রুতি হিসাবে, মনিসিংয়ের সার্টিফাই করা ব্যক্তি পররাষ্ট্রমন্ত্রী সামাদের একটি দৌড় সফরের পরপরই, সোভিয়েত ইউনিয়ন আকস্মিকভাবে বাংলাদেশে পায়ের তলার মাটি হারিয়ে ফেলেছে।

ভুল তথ্য পরিবেশন করে আন্তর্জাতিক 'দরদী দেশকে' নাজুক অবস্থায় ফেলার চার্জশীট আনা হয়েছে মনিসিং-এর বিরুদ্ধে। শোনা যাচ্ছে, এখন মস্কোতে তাকে কঠিনভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে পূর্বাপর সমস্ত বিষয় সম্পর্কে এবং তার বক্তব্য সত্য কিনা এখানকার দূতাবাসের মাধ্যমে সরেজমিনে তা তদন্ত করা হচ্ছে।

এই জবানবন্দীর ফল যা দাঁড়াবে, তার ভিত্তিতে মস্কো তাদের মনিসিং দল সম্পর্কে ভবিষ্যতের চিন্তা ভাবনা স্থির করবে। ধারণা করা হচ্ছে যে, বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে সোভিয়েত স্বার্থ রক্ষার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন এখন মরিয়া হয়ে উঠেছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন 'হুট আউট' হয়ে যাবার মুহূর্তেও এখানকার মনি-মোজাফফরের চৈতন্য না ঘটায় মস্কো আসল ব্যামোটি টের পেয়েছে। ব্যামোটি হচ্ছে, গায়ের ধূলোটি না ঝেড়ে থিওরীতে দিগ্বিজয় করা।

মস্কো এবার জবর টাস্ক মানে কর্তব্য নির্ধারণ করে দিয়েছে মনি-মোজাফফরের দলকে আন্দোলন করতে হবে। আওয়ামী লীগের ডলার প্রেম ছুটিয়ে দিয়ে ক্ষীণস্রোতা রুবলমুখী করতে হবে তাকে। এ বিরাট দায়িত্ব নিয়ে মনিপন্থী কমিউনিস্ট ও মোজাফফর দলের গলা শুকিয়ে কাঠ। তবু যখন করতে হবে, তাই [illegible] কম্পিত হস্তে খসড়া করা একখানা ৩০ দফার স্মারকলিপি পেশ করেছে অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রীর কাছে। আওয়ামী লীগের পিছু পিছু বাছুরের মত নেচে কুদে দিন কাটানোর দিন গত হওয়ায় এই স্নিগ্ধরক্ত বীরেরা কিন্তু ভয়ে জড়সড়। সমর্থক ও কর্মীর লাইন থেকে ঝুপ ঝুপ, টুপ টুপ করে লোকেরা কেটে পড়ছে।

নড়বড়ে দলটাকে মনি -মোজাফফর সহসাই কঙ্কালের দশায় দেখতে পাবেন, তখনই তাদের দিতে হবে ছুট, কারণ, বঙ্গপিতা ফিরে এলে 'গেল গেল সব গেল' অবস্থা দেখে আওয়ামী লীগ কিলের রাজনীতি শুরু করবে। তখন ঘর ছেড়ে পথে নামতে উদ্যত 'বধুকেই' প্রথম পাকড়াও করা হবে।

মস্কোতে মনিসিংকে হাসপাতালের আশেপাশেই রাখা হচ্ছে, ঠিক বেডে নয়। চিকিৎসার পর ফিরে এলে এই বিশাল কমিউনিস্টের দশা কি হয়, তা লক্ষ্য করা কৌতুকবহ হবে বৈকি!

এমসিএদের দুর্নীতিবাজ আমলা চাই

দুর্নীতিপরায়ণ আমলা না হলে এমসিএ-দের এখন চলে না। স্বরূপকাঠির এমসিএ শাহ সাহেবের তদ্বিরে থানার ভাল সিও (উন্নয়ন) বেহুদা বদলী হলেন। তার স্থলে যিনি এলেন তিনি শাহ সাহেবের ভাগ্য গড়ার পথ সুগম করে দিচ্ছেন।

স্বরূপকাঠি নদীর পূর্ব তীর হতে কাউখালী অবধি জেলাবোর্ডের পুরাতন রাস্তা মেরামতের জন্য বরাদ্দ ২৫ হাজার টাকা কেটে এমসিএ সাহেব ইন্দুর হাট থেকে নিজ বাড়ী বার্লহারী পর্যন্ত পাকা রাস্তা বানিয়েছেন, টেস্ট রিলিফের তিনবারের বরাদ্দ ৫, ১৫ ও ২৫ হাজার টাকা রিজার্ভে রেখেছেন কোলকাতার শ্রী নিকেতন হোটেলের অপকীর্তি ঢাকার উদ্দেশ্যে। মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের ডাকাত নামে আখ্যায়িত করে দুনিয়া থেকে সরিয়ে ফেলা, এলাকার জনগণের উপর অত্যাচার চালানোর জন্য ৯ বার হাজত ভোগী, প্রধান পাক-আমলে চাঁদপুর-ঢাকায় মিলিটারীকে পুলের কাঠ সরবরাহকারী,মাতাল লবণ লুটকারী চীনিপান্না মিয়াকে আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর উপপ্রধান নিয়োগ করেছেন। ১০টি আমদানী লাইসেন্স চুনু মিয়া চুনুর পিতা হাবিবুর রহমান হাওলাদার তদীয় বেহাই এমসিএ সাহেবের ভায়রা ভাই স্বরূপকাঠির এমএ গণি সাহেবের ছেলে ঢাকা কলেজের বিএসসির ছাত্র জাহিদ হোসেন শহীদের নামে আর বাকী কটি পরমাত্মীয়দের নামে দেয়া হয়েছে।

ইন্দিরা প্রেমের নজীর দিতে হচ্ছে দুর্নীতিবাজ এমসিএদের

গফরগাঁও থানার এমসিএ আবুল হাশেম সাহেব বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গরীব কৃষকের মধ্যে বন্টনের জন্য সরকারী ঋণের

টাকা থেকে কৃষকদের কাছ থেকে জোর করে 'পউস' পত্রিকা প্রকাশ করার পরিকল্পনা দিয়ে টু-পাইস ইনকাম করেছেন।

বর্তমানে জনাব হাশিম সাহেবের মাসীর প্রতি ভয়ানক দরদ বেড়ে গেছে মাসীকে খুশী করার জন্য, তাছাড়া ভারতমুখী বাংলাদেশ সরকারকে খুশী করার জন্য তিনি 'ইন্দিরা নিকেতন' নাম দিয়ে মেয়েদের জন্য একটি নিজস্ব নিকেতন গড়ার পরিকল্পনা নিয়েছেন। কারণ, টু পাইস আরও দরকার। বাংলাদেশের যেখানে বহু মহিয়সী মহিলা রয়ে গেছেন, তাছাড়া বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মহিলা যেখানে নির্যাতিতা সেখানে কি বাংলাদেশের কোন মহিয়সী মহিলার নামে সে নিকেতন করা যেত না? মায়ের চেয়ে মাসীর প্রতি দরদ কেন বেশী? আজ তাই আমাদের সাধারণ মানুষের মনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। হাসিম সাহেব রিলিফের টাকা মেরে, 'পউস' এর নাম নিয়ে টাকা মেরেও কি তৃপ্তি পাননি? বর্তমানে তাই তিনি নতুন ফন্দি নিয়ে নেমেছেন।

স্বাধীনতার পূর্বে হাসিম সাহেবের মাত্র একটি ঘর ছিল। বর্তমানে সেখানে দালান উঠেছে। পয়সা হয়েছে বেশুমার। ভবিষ্যতে আরও অনেক কিছুই হবে।

গত স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় উক্ত থানার ১১নং লংগাইর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব আরফান আলী সাহেব ভারত সীমান্তের কাছাকাছি থেকে ফিরে ঘোষণা দিয়েছিলেন তিনি নাকি 'থানা পলিটিক্যাল এডভাইজার'। সিলও বানিয়েছিলেন। সব কয়টি ইউনিয়ন থেকে চাঁদা তুলেছেন বাংলাদেশ সরকারের নামে। পঞ্চাশ হাজার টাকা। বাংলাদেশ সরকারের এ ধরনের কোন পদ ছিল কিনা তা আমরা ভারতের মাটিতে শুনিনি। স্বদেশে এসে শুনলাম প্রথম আরফান সাহেবের কাছেই।

প্রতিবাদ করার কোন উপায় ছিল না। কারণ, তিনি আওয়ামী লীগের লোক, আবার 'পলিটিক্যাল এডভাজার' ও বটে। এমসিএ হাসেম সাহেব ফিরে আসার পর উক্ত পঞ্চাশ হাজার টাকার হিসাব নিতে বলা হলে তিনি বললেন "আমি হিসাব নেব"। কিন্তু পকেটে কিছু পড়ে গেছে। হায়! কোথায় আর এমসিএ সাহেবের হিসাব নেওয়া। সবাই বহাল তবিয়তেই আছেন।

রিলিফ বণ্টনের স্বজনপ্রীতির জন্য এমসিএ সাহেবের সাথে ক'জন বাংলা ছাত্র ইউনিয়নের কর্মীর কথা কাটাকাটি হয়। এর জন্য তিনি পুলিশ দ্বারা ওদের গ্রেফতার করান এবং সাথে রিভলবার দিয়ে চালান দেওয়ান। পরে অবশ্য ওরা জামিনে মুক্তি পায়।

শুধু 'ইন্দিরা নিকেতনই' নয় বর্তমানে তিনি মুজিববাদ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট গড়ার মহাপরিকল্পনার কথাও ভাবছেন। সম্প্রতি তাঁর মুখেই একথা জানা গেছে।

লুটপাট সমিতির মেম্বাররা আজ তাঁর আশেপাশের হোমড়া-চোমরা। তিনি ছাত্রনেতা আলাল আহমেদ ও ছাত্রনেতা গফরগাঁও কলেজের সহ-সভাপতি আবদুস ছালামকে দু'টি ইমপোর্ট লাইসেন্স দিয়েছেন ও সমস্ত সিগারেট কোম্পানীর পারমিট লাইসেন্সও তাদের নামে। বর্তমানে ব্ল্যাকের ব্যবসা ভালই চলছে। হায়রে মুজিববাদ তুমি আর কতদিন এমনি রূপ নিয়ে টিকে থাকবে?

আবার লবণ কর

লবণ শিল্পের উপর থেকে আরোপিত কর উঠিয়ে দিয়ে বর্তমান সরকার বাহবা অর্জন করেছিল। কিন্তু আমলাতান্ত্রিক ঘাঘুরা সেই কর নিরবে আরোপ করেছে বলে সংবাদ পাওয়া গেছে। ১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭২ তারিখ হতে ৩০ শে জুন ১৯৭২ তারিখ এই সাড়ে চারটি মাস মাত্র কর প্রত্যাহার করা হয়েছিল। ১লা জুলাই ১৯৭২ তারিখ হতে নতুন বাজেট অনুসারে এই কর মণপ্রতি ২.৫০ টাকা হারে

পুনরায় আরোপ করে লবণ শিল্পের ধ্বংস ডেকে আনতে এক গভীর ষড়যন্ত্র আরম্ভ হয়েছে। এতে সমুদ্রোপকূলবর্তীর ৫০ হাজার লবণ উৎপাদকের জীবনে আবার দুর্বিসহ করভার নেমে এসেছে। তারা লবণ উৎপাদনে নিরুৎসাহ হয়ে পড়েছে। অনতিবিলম্বে এ কর রহিত না হলে লক্ষ লক্ষ সমুদ্রোপকূলবর্তী পরিবার ধ্বংস হয়ে যাবে– সরকার বাহাদুরের কি সেদিকে নজর নেই?

স্বর্ণ প্রবাহ আমাদের হাড় গড়িয়ে দেবে

এক ভরি খাঁটি সোনার দাম এখন ৮৫০ টাকা

এক ভরি খাঁটি স্বর্ণের দাম এখন ৮৫০ টাকা। বাজারে ৩৪০ টাকা দরে যে স্বর্ণ বিক্রি হচ্ছে তার সবটা স্বর্ণের পরিমাণ এখন মাত্র শতকরা ৪০ ভাগ। খাদের পরিমাণ শতকরা ৬০ ভাগ। কবিতে [illegible] মজুত ফুরিয়ে গেলে এবং টাকার ও [illegible] গেলে প্রচুর পরিমাণ খাদ মিশিয়ে স্বর্ণের 'দর'কে কম দেখানোর চেষ্টা করা হয়। বাংলাদেশে এ অবস্থাটি এখন চরম হয়ে দেখা দিয়েছে।

পাকিস্তান আমলে ৮০ ভাগ খাঁটি, ২০ ভাগ খাদ মিশানো স্বর্ণই ছিল মানসম্মত 'ক্যারেট'। মুক্তিযুদ্ধের সময় এটা এসে দাঁড়ায় শতকরা ৬০ ভাগ খাঁটি, ৪০ ভাগ খাদ। স্বাধীনতার পরপরেই এই অনুপাত শতকরা ৫০ ভাগ খাঁটি ও ৫০ ভাগ খাদে নেমে আসে। আর বর্তমানে তিন মাসের মধ্যে স্বর্ণের উপাদানে শতকরা ৪০ ভাগ খাঁটি ৬০ ভাগ পেতল সন্নিবেশিত হয়।

স্বর্ণের দাম ও প্রকৃত দামের ভিত্তিতে হিসাব করলে দেখা যায় আগে ১ টাকায় যে স্বর্ণ পাওয়া যেত এখন সে স্বর্ণ সাড়ে তিন থেকে পৌণে চার টাকা। এ থেকে স্পষ্টত বোঝা যায় টাকার দাম ৩০/৩৫ পয়সায় নেমে এসেছে।

বর্তমানে ভারতের তুলনায় বাংলাদেশে স্বর্ণের দাম দেড়গুণ, দুগুণ বেশী। ভারতে বিভিন্ন ক্যারেট হলো (স্বর্ণ শিল্পীদের ভাষায় 'ক্যারেট' হলো স্বর্ণের ওজন-একক নয়) খাদের অনুপাত স্বর্ণ প্রচলিত রয়েছে তন্মধ্যে ৯৫ঃ৫, ৮০ঃ২০, ৬০ঃ৪০ রয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধের পূর্বে আওয়ামী লীগ সংগ্রাম কমিটিগুলো স্বাধীনতা যুদ্ধের নামে মা-বোনদের স্বর্ণালঙ্কার একমত জোর করে কেড়ে ভারতে পগার পার হয়েছিল। এসব স্বর্ণ পড়েছে ভারতীয়দের হাতে। ৮০ঃ২০ ক্যারেটের সে স্বর্ণ এখন ৪০ঃ৬০ ক্যারেট হয়ে এখানে চোরাপথে ফিরে এলে সাবেক একভরি স্বর্ণ এখানে দুই ভরিতে পরিণত হবে। এর দাম দাঁড়াবে ৬৮০ টাকা। অথচ সংগ্রাম কমিটি ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের কাছ থেকে ভারত সরকার স্বর্ণগুলোর ভরি অনধিক ২০০ টাকায় কিনেছিল।

স্বর্ণের স্বাভাবিক ধর্ম হচ্ছে যেদিকে দর বেশী স্বর্ণ মজুত সেদিকে ধাবিত হয়। তবে স্বর্ণ মজুত কত রাখা যাবে, তা নির্ভর করে দেশজ সম্পদের উপর।

ভারত থেকে আমাদেরই স্বর্ণগুলো আংশিক এদেশে ফিরে এলে স্বর্ণগুলো লুটপাট ও চোরাপথে কামাই করা অর্থের মালিকদের হাতে পড়বে। আর স্বর্ণ ভাঙ্গিয়ে যে টাকা হবে, সে টাকা এখানকার পাট কিনে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা নিয়ে যাবে ভারতে। এসব পাট ও অন্যান্য সামগ্রী পাচার করে ভারত বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সমর্থ হবে।

যেমন– আমাদের সাবেক একভরি স্বর্ণ বর্তমান ক্যারেটে দু'ভরিতে দাঁড়ালে ভারতীয়রা পাবে কমপক্ষে ৬৮০ টাকা বাংলাদেশী মুদ্রা। ৬৮০ টাকা দিয়ে ৪০ টাকা মণ দরে তারা কিনতে পারবে ১৭ মণ পাট। ১৭ মণ পাট বিদেশে তারা ২০০ টাকা দরে রপ্তানী করে অর্জন করতে পারবে ৩৪০০ টাকার বৈদেশিক মুদ্রা। ভারত এই বৈদেশিক মুদ্রা দিয়ে বিশ্বের যে কোন স্থান থেকে

আন্তর্জাতিক ক্যারেটের খাঁটি গিনি সোনা কিনতে পারবে কমপক্ষে পনের ভরি। সে সোনা বাংলাদেশে একভরিতে খাদসহযোগে তিন ভরিতে দাঁড়াবে।

কই-এর তেলে কই ভাজার প্রবাদ আমরা শুধু শুনেছি। এবার ভারতের প্রভুদের কৃপায় হাড়ে হাড়ে বুঝতে হবে এবং বুঝতে হচ্ছেও।

পছন্দসই লোকই চাকুরী পেল

পটুয়াখালীর ডেপুটি কমিশনারের অফিসের একটি ষ্টেনো-র পদ খেয়াল-খুশীমত পূরণ করা হয়েছে। খুলনায় যে বাছাই বোর্ডটি ছিল তা এখন নিষ্ক্রিয়। ২৯শে মে একটি প্রহসনমূলক ইন্টারভিউ নেয়া হলেও হাতের লোক আবু জাফর চাকুরীটি পেয়ে গেলেন। প্রাপ্ত অভিযোগে প্রকাশ, এই স্বজনপ্রিয়তার জন্য জনাব তাসেমুদ্দিন ও জনাব সায়েদ উদ্দিন এ দুইজনই দায়ী। একজন ষ্টেনো হলেও সায়েদ উদ্দিন বরিশালের চর এলাকায় শতাধিক একর সরকারী খাস জমি হস্তগত করার মত প্রভাব রাখেন। এই প্রভাব দিয়েই নিজের ভাইকে যথাস্থানে অধিষ্ঠিত করতে তার অসুবিধা হয়নি।

বানরতন্ত্রের ছড়া

ইরফান

গাছের ডালে বানরগুলি করছে লাফালাফি
বলতো এবার ফুলবাগানের থাকবে কিছু বাকী ?
তাড়া দিলে খিঁচিয়ে ওঠে,
খেতে দিলে মাথায় ওঠে,
–মিছেই শুধু ভেবে ভেবে মরি
বল্‌তো বাংগাল কি করি ?

মারতে তাদের আছে বারণ
যদি, জানতে চাই কি সে কারণ
প্রভুরা সব অমনি তখন
উঠবে হেঁকে, মরণ! মরণ!
তবে আমরা জানি কিসের জোরে এত বাড়াবাড়ি
বলেই যদি ফেলি তা'হলে ভাঙ্গবে হাটে হাঁড়ি।
তবু শোন বলি বলি, বলেই ফেলি ভাই,
বানরগুলো হয়েছে আজ সমাজতন্ত্রের চাঁই।
শাখায় শাখায় এদিক সেদিক
করে লম্প ঝম্প,
সমাজতন্ত্রের ঠাকুর দাদার
হয় যে হৃৎকম্প।
হাকিম ওরা, হুকুম আছে,
ওদের নখে দাঁতে ?
ফুলের কলি ঝড়লো যদি
ওদের, কি আসে যায় তাতে ?
মোদের দাবী হারিয়ে যে যায় ওদের ভাষার তোড়ে।
এমনি করেই ওরে বাংগাল তুই কি যাবি ম'রে ?

মুজিববাদী স্বেচ্ছাসেবকের নাকে খত

জনসাধারণের উপর অন্যায়ভাবে অত্যাচার পরিচালনায় ফেনী মহকুমার সোনাগাজী থানা আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক প্রধান ছাদেক হোসেনের জুড়ি নেই।সম্প্রতি চরখোয়াজ গ্রামের দু'জন অধিবাসীকে ধরে এনে উক্ত ছাদেক অন্যায়ভাবে মারপিট শুরু করে। এলাকার ক'জন বিবেক সম্পন্ন লোকের হস্তক্ষেপে তারা আহত অবস্থায় উদ্ধার পায়।

পরে জনসাধারণের বিচারে ছাদেক হোসেনের ১০০ টাকা জরিমানা হয় এবং প্রকাশ্যে জনসমক্ষে সে কৃত অপরাধের জন্য করজোড়ে ক্ষমা ভিক্ষা করে।

এরপরেও কিন্তু তার দৌরাত্ম শেষ হয়নি। লোকটি এখন সিগারেট এজেন্সী নিয়ে টুপাইস কামাচ্ছে কৃত্রিম সঙ্কট সৃষ্টির মাধ্যমে।

হক-কথা

৮ই ভাদ্র, শুক্রবার

বাংলার বিদ্রোহী কণ্ঠ

বাংলার বিদ্রোহী কণ্ঠ মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী আবার সংগ্রামের ডাক দিয়াছেন– আগামী ৩রা সেপ্টেম্বর সমগ্র বাংলাদেশে তাঁহার আহ্বানে 'খাদ্যের দাবীতে, বাঁচার দাবীতে' শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-জনতা ভুখা মিছিল বাহির করিবে। বাংলাদেশের জনগণের বাঁচার সংগ্রামে এই দিনটি নবপর্যায়ের সূচনা করিবে। মওলানা সাহেব খুব সঠিক ভাবেই সঠিক সময়ে এই সংগ্রামের ডাক দিলেন। বাংলাদেশ পাক-হানাদার মুক্ত হইবার পর আট মাস অতিক্রান্ত হইল অথচ সরকার আজ পর্যন্ত জনগণের কোন সমস্যারই সমাধান করিতে পারেন নাই। একের পর এক সমস্যা ও সঙ্কটের দুর্বহ বোঝা জনগণের বুকের উপর জগদ্দল পাথরের মত চাপিয়া বসিয়াছে। স্বাধীনতার পর চাউলের মূল্য ৩০ টাকা, ৪০ টাকা হইতে ১২০ টাকা পর্যন্ত উঠিয়াছে। আমরা দিনের পর দিন, মাসের পর মাস আশা করিয়াছিলাম সরকার ইহার একটা বিহিত করিবেন। কিন্তু ধৈর্যের একটা সীমা আছে। জনগণের ধৈর্যের বাঁধ যে কোন মুহূর্তে আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণের মত ফাটিয়া পড়িতে পারে। লক্ষ লক্ষ ডিনামাইট বিস্ফোরণের মত জনতার এই বাঁধ ভাঙা বিক্ষোভের ফলে যে নৈরাজ্য ও উশৃঙ্খল বদ্রোহের সূচনা হইতে পারে– তা রোধ করার শক্তি হয়তো কাহারো না থাকিতে পারে। সুতরাং জনমনে আজ যে বিক্ষোভের আগুন ধিকি ধিকি করিয়া জ্বলিতেছে তাহাকে সুসংগঠিত ও সুশৃঙ্খলভাবে প্রকাশের সুযোগদানের জন্যই এই ভুখা মিছিল।

আগামী পৌষ মাসের আগে কৃষকরা কোন প্রকার চৈতালী ফসল অথবা আমন ধান তুলিতে পারিবে না। চাউলের মূল্য ইতিমধ্যেই স্থান বিশেষে ১২০ টাকায় পৌঁছিয়াছে। অতএব খাদ্য সঙ্কট চরম অবনতির বিন্দুতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ইহার আশু প্রতিকার না করিলে ৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের চাইতেও ভয়াবহ অবস্থার সূচনা হইতে পারে। বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে মরিবে। সুতরাং ৩রা সেপ্টেম্বরে সরকারের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ সংগ্রামে নামিতে হইবে। সরকারকে জানাইয়া দিতে হইবে বাংলাদেশের শ্রমিক, কৃষক, কামার, কুমার, জেলে, মাঝি, তাঁতী, ছাত্র, যুবক, মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত, স্বল্পবেতনভুক সরকারী কর্মচারীরা না খাইয়া মরিতে রাজী নয়। ভুখা মিছিলে সর্বস্তরের ভুখা-নাঙ্গা-মেহনতী মানুষকে শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খলভাবে অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। তাদের প্রতি আবেদন, শান্তিপূর্ণভাবে মন্ত্রীর বাড়ী, এমসিএ'র বাড়ী, জেলা, মহকুমা প্রশাসকের বাড়ী উপস্থিত হইয়া দাবী জানাইতে হইবে।

দাবী করিতে হইবে ২০ টাকা মণ দরে চাউল, ১০ টাকা মণ দরে আটা ও গ্রামাঞ্চলে পূর্ণ রেশনিং ব্যবস্থা চালু করিতে হইবে। কেবল চাউলের দাবীই নহে– সস্তা দরে ভোজ্য তৈল এবং উলঙ্গ-অর্ধালুঙ্গ মানুষের দেহাচ্ছাদনের কাপড় দাবী করিতে হইবে। আজ সারাদেশে ঔষধের বড় অভাব, স্বল্প মূল্যে অথবা বিনামূল্যে রোগের চিকিৎসার জন্য চাই ঔষধ-মাথা গুজিবার ঠাঁই হিসাবে চাই বাসস্থানের ব্যবস্থা। সুতার অভাবে হাজার হাজার তাঁতী বেকার হইয়া অনাহারে মরিতে বসিয়াছে। তাহাদের কর্মসংস্থানের জন্য চাই সুতা, কামারদের কর্মসংস্থানের জন্য চাই লোহা। সরকার বিনাবিচারে মিথ্যা অভিযোগে বহু লোককে মাসের পর মাস কারাগারে আটক রাখিয়াছেন। অপরাধ যত বড়ই হোক বিনাবিচারে কাহাকেও আটক রাখার অধিকার

সরকারের নাই। ইহা গণতন্ত্রের ঘোর পরিপন্থী। সরকার দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন। সুতরাং বিনাবিচারে আজও যাহারা আটক রহিয়াছে তাহাদের মুক্তি দাবী করিতে হইবে। গরীব দুঃস্থ মানুষ, আশ্রয়হারা-গৃহহারা মানুষ রিলিফ পায় নাই। রিলিফ দ্রব্য আত্মসাৎ করিয়া একশ্রেণীর লোক রাতারাতি বড়লোক হইয়া গিয়াছে। ইহাদের কঠোর শাস্তি দাবী করিতে হইবে। বাংলাদেশের জনগণের সবচাইতে প্রিয় বস্তু তাহার জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব নিয়ে দেশী-বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীলরা ছিনিমিনি খেলা শুরু করিয়াছে। ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ, সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সকলেই আজ বাংলাদেশের জনগণের উপর প্রভুত্ব বজায় রাখিতে চায়। কিন্তু বাংলাদেশের জনগণ তো উপনিবেশের দাস-নাগরিক হইবার জন্য এত রক্ত দেয় নাই। তাই স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ন করার দেশীয় তাঁবেদার দালাল গোষ্ঠী ও বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী ও উপনিবেশবাদী গোষ্ঠীর ষড়যন্ত্র অবসানের দাবী জানাইতে হইবে– দাবী জানাইতে হইবে লন্ডনে ও জেনেভায় বসিয়া বাংলাদেশের জনগণের দৃষ্টিপথের বাহিরে যাইয়া আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের কাছে ডলারের বিনিময়ে দাসখত লিখিয়া দেওয়া চলিবে না। বাংলাদেশের বাজার আজ বিদেশী পণ্যে ছাইয়া গিয়াছে– বিশেষতঃ ভারতের পণ্য বাংলার বাজার দখল করিয়া বসিয়াছে। সুতরাং দেশীয় শিল্পের বিকাশের পথ আজ রুদ্ধ। লক্ষ লক্ষ লোক তাই আজ বেকার। বেকারত্বের অবসানের জন্য দেশীয় শিল্পের বিকাশের দাবী জানাইতে হইবে। সীমান্তের মধ্য দিয়া পাট পাচার হইয়া যাইতেছে। বাংলাদেশের পাট শিল্প ধ্বংসের পথে। আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের পাট ও পাটজাত দ্রব্যাদির চাহিদা হ্রাস পাইয়াছে। ভারত সেই স্থান দখল করিতেছে। সবই পাট পাচারের ফল। সুতরাং পাট পাচার বন্ধ করার দাবী জানাইতে হইবে। চাউলের মূল্য যখন ১২০ টাকায় পৌঁছিয়াছে তখন পাটের মূল্য ৪০ টাকাও নহে। ৩ মণ পাট বেচিয়া কৃষক ১ মণ চাল কিনিতে পারে না– তাই প্রতি মণ পাটের মূল্য ১২০ টাকা ধার্য করার দাবী জানাইতে হইবে। সরকার শ্রমিকদের ২৫ টাকা মজুরী বাড়াইয়া বাহবা কুড়াইতে চাহেন অথচ ভাবিয়া দেখেন না নিত্যপ্রয়োজনীয় প্রতিটি জিনিসের দাম পাঁচ হইতে দশ গুণ বাড়িয়াছে। শুধু তাহাই নহে সরকার জাতীয়করণকৃত কারখানার শ্রমিকদের দাবী আদায়ের হাতিয়ার ধর্মঘটের অধিকার প্রদানের জন্যও দাবী উত্থাপন করিতে হইবে।

মনে রাখিতে হইবে সর্বহারা মানুষের সংগ্রাম বানচাল করিবার জন্য প্রতিক্রিয়াশীল ধনীক গোষ্ঠীর ষড়যন্ত্রের অন্ত নাই। সুতরাং সকল প্রকার উস্কানীর মুখেও ভুখা মিছিলে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিতে হইবে। অন্যথায় সংগ্রাম বিপথগামী হইবে। এবারে জনতার সংগ্রামকে কোনক্রমে বিপথগামী অথবা প্রতিক্রিয়াশীল স্বার্থে ব্যবহৃত হইতে দেওয়া যাইবে না। জনতার চেতনার মানের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া এবারের সংগ্রামকে স্তরে স্তরে, ধাপে ধাপে সাফল্যের সিংহদ্বারে লইয়া যাইতে হইবে।

চীন ভেটো দেবে কিনা?

জাতিসংঘে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে নিরাপত্তা পরিষদ আঁধবেশনে চীন ভেটো দেবে কিনা– এটা এক কল্পনা সাপেক্ষে প্রশ্ন। চীন যদি ভেটো দেয়, তাহলে কেন দেবে, এ নিয়ে রাজনৈতিক মহলে যে জল্পনা তার যুক্তিগুলো পূর্বাপর পরিস্থিতির আলোকে বিচার করা দরকার।

সর্বপ্রথম একটি বিষয় উপলব্ধি করা আবশ্যক যে, পাকিস্তানের দখলকার থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত করার জন্য যে গণসংগ্রাম পরিচালিত হয়েছিল, তা যদি হস্তক্ষেপ মুক্ত পরিবেশে সম্পন্ন হতো, তাহলে আজ এদেশ ভারত-রাশিয়া-আমেরিকার দাবাখেলার গুটিতে পরিণত হতো না।

মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানীও বলেছেন, মুক্তিযুদ্ধের শেষভাগে ভারতীয় ফৌজ অভিযান না চালালেও পরবর্তী ৬ মাসের মধ্যে, বড় জোর ৯ মাসের মধ্যে আমরা নিজ শক্তিতে দেশ মুক্ত করতে সমর্থ হতাম।

যদি তাই হতো, আজ আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদায় আমরা বলীয়ান হয়ে পেতাম সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিস্থিতি, যা জাতীয় বিকাশের জন্য সহায়ক হতো। আজ আমাদের দেশের অভ্যন্তরে ভারত-রাশিয়ার নগ্ন হস্তক্ষেপ আমাদের স্বাধীনতার অর্থ ও তাৎপর্যকে করে দিয়েছে ম্লান। এ পরিস্থিতিতে হস্তক্ষেপ না করার নীতিতে অটল চীনের বন্ধুত্ব সম্পর্ক আমাদের হাফ ছেড়ে বাঁচবার সুযোগ দিতো।

বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে ভারত-রাশিয়ার অংশগ্রহণ এবং বিশেষ করে অংশগ্রহণের পদ্ধতি চীনকে আমাদের প্রতি বিমুখ করেছে, এ ছাড়া সার্বভৌম দেশগুলোর স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামে সাহায্যদান চীনের পররাষ্ট্রনীতির মূল তিন স্তম্ভের একটি।

সন্দেহ নেই, বাকী দুই স্তম্ভের মধ্যে উপনিবেশবাদ বিরোধী– জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম ও জনগণের সর্বাঙ্গীন সামাজিক মুক্তির জন্য পরিচালিত জনযুদ্ধের প্রতি সাহায্যদানে চীন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কিন্তু আজ ১৯৭২ সালের শেষার্ধে এসে আমরা যখন পুনরায় বাইরের অশুভ প্রভাব থেকে দেশকে এবং শোষণমূলক সমাজব্যবস্থার জোয়াল থেকে জনগণকে উদ্ধারের জন্য আরেকটি সংগ্রামের প্রয়োজন তীব্রভাবে অনুভব করছি; আমরা বার বার বলছি, ত্রিশ লাখ জীবনের বিনিময়েও আমরা কিছু পাইনি প্রভু বদল ছাড়া। সেক্ষেত্রে আজ একথা আমরা স্বীকার না করে পারবো না যে, জনগণের স্বতঃস্ফূর্ততার উপর নির্ভর করে আমরা যে মুক্তিযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলাম, তা বর্হিশক্তির হস্তক্ষেপে আমাদের নিজেদের সুস্পষ্ট রাজনৈতিক চেতনার অভাব, বাংলাদেশকে হস্তগত করার জন্য বিভিন্ন লোভী মহলের বিভিন্নমুখী চেষ্টা– আমাদিগকে কাম্য লক্ষ্যের অনেক পশ্চাতে রেখে দিয়েছে।

বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে চীনের সমর্থন না পাওয়ায় আমরা ক্ষুব্ধ ও হতাশ হয়েছি। আমাদেরকে সমর্থন করতে না পেরে চীনারাও উৎফুল্ল– তাও ঠিক নয়। কেননা, বাংলাদেশ ও এর মুক্তি সংগ্রামকে সমর্থন করতে পারলে বিশ্বব্যাপী তাকে আজকের নাজুক অবস্থায় পড়তে হতো না এবং দেশে মুক্তিকামী আন্দোলনের নেতাদের কাছে চীনকে ব্যাখ্যা দেবার ঝামেলাও পোহাতে হতো না।

কিন্তু সাময়িক বাহবা অপেক্ষা চিরসত্য একটি নীতির প্রতি অবিচল থাকার জন্য চীনাদের পূর্বাপর চেষ্টার প্রশংসা এদেশের মানুষও একদিন করেছে। আমাদের মুক্তি সংগ্রামের বিচ্যুতিগুলো এড়াতে পারলে আমরাও যে চীনাদের এক্সপেকটেশন বা বাঞ্ছনার মাত্রায় উঠে তাদের সমর্থন লাভ করতে পারতাম, তাও হয়ত অসম্ভব ছিল না। কারো কারো মতে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা থেকে বাংলাদেশের জনগণ ছাড়া আর কেউ কোন ফায়দা না লুটুক– এটাই ছিল চীনাদের বাঞ্ছনা। পরিস্থিতির কারণেই হয়ত আমরা এটাকে রোধ করতে পারিনি। তাই ১৬ই ডিসেম্বরের পর ভারত নিয়ে গেছে ২৫ হাজার কোটি টাকার সম্পদ, রাশিয়া আমাদের ঘাড়ে পা রেখে পাকিস্তান আমলের ঋণ আদায়

করছে, বাংলাদেশকে ভারতীয় মনোপলি-বাজদের অবাধ বাজার হিসাবে ভারত ব্যবহার করছে, রাশিয়া বাংলাদেশকে পেয়ে তার 'এশীয় পরিকল্পনা' বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিচ্ছে, সর্বোপরি এই টানাহেচড়ার খেলায় বিশ্বসাম্রাজ্যবাদের প্রধান নায়ক মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তার হৃত জমিদারী আবার পুনরুদ্ধার করেছে। আজ আমরা হতাশ হয়ে লক্ষ্য করছি, এত বড় একটি সশস্ত্র লড়াইয়ের পরও আমরা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার ন্যূনতম শর্তটুকুও পূরণ করতে পরিনি এবং আমরা পরিণত হয়েছি বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের হাতের মোয়ায়।

ভারতের মত লুটপাট, রাশিয়ার মত শাইলকী মহাজনী, আমেরিকার মত নব্য উপনিবেশবাদী শোষণ চীনারা কোথাও করেছে তার বড় শত্রুও তাকে এমন অপবাদ দিতে পারবে না।

আমরা চীনাদের বাঞ্ছনা পূরণ করতে পারিনি, আমরা যতদূর পেরেছি ততদূর করেছি, যতদূর বাকী আছে বলে আমরা মনে করবো ততদূর এগিয়ে যাবার জন্য আমরাই চেষ্টা ও উদ্যোগ নেবো।

এই ভিত্তিতে চীন ও বাংলাদেশের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের সম্ভাবনা যাচাই করলে দেখা যাবে, চীন জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে যে বক্তব্য রেখেছে তা আমাদের প্রতি চীনের পূর্ববর্তী মনোভাবের সুস্পষ্ট পরিবর্তনের ইঙ্গিতবহ।

ভারতীয় সেনাবাহিনী ১৬ই ডিসেম্বরে এসে বাংলাদেশকে পাকিস্তান ফৌজের হাত থেকে নিজ হাতে নিয়ে নিলে চীনা বেতার প্রচার করেছে যে, ভারত 'পূর্ব পাকিস্তানকে' দখল করে নিয়েছে। ভারতীয় সেনাবাহিনী আনুষ্ঠানিকভাবে প্রত্যাহারের ঘোষণার পর চীনা বেতার প্রচার করেছে যে, বাংলাদেশ রুশ সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা চালিত ভারতের আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হয়েছে। এরপর পৌণপৌণিক বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ভারতীয় সৈন্যের আনাগোনা, বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভাগ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে ভারতের খবরদারী ও মুরুব্বীয়ানার ঘটনাগুলো চীন লক্ষ্য করে এসেছে।

লক্ষ্য করার বিষয় যে বাংলাদেশকে জাতিসংঘে অন্তর্ভুক্তির প্রশ্নে নিরাপত্তা পরিষদের বিতর্কে চীনা রাষ্ট্রদূত হুয়াং হুয়া বাংলাদেশকে আশ্রিত রাজ্য বলেননি, এটা জাতিসংঘের কাঠামো হেতু চীনা ভূমিকার শিথিলতা বলে মনে করা যেতে পারে। ভারতের আশ্রিত রাজ্য ভূটানও জাতিসংঘে আসন পেয়েছে। বাংলাদেশ যদি ইতিমধ্যেও আশ্রিত রাজ্যের স্ট্যাটাস কাটিয়ে না উঠে থাকে, তাহলেও জাতিসংঘে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তির পথ বন্ধ হতে পারে না।

সে যাই হোক চীনারা অভিযোগ করেছে যে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতীয় সৈন্যের উপস্থিতি। পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দী নিয়ে ভারতের সহায়তায় বাংলাদেশে পরাজিত পাকিস্তানের উপর অবৈধ চাপ চালাচ্ছে এবং সাধারণ পরিষদের প্রস্তাব বাংলাদেশ মেনে নেয়নি।

এ শর্তগুলির মধ্যে প্রথমটি বাস্তবায়িত হলে আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা কিঞ্চিৎধিক অর্থবহ হবে। দ্বিতীয় শর্তটি দু'ভাবে ব্যাখ্যা করা যায় ঃ (১) যুদ্ধবন্দী দিয়ে বর্হিশক্তি এ উপমহাদেশে যে ফায়দা তুলবার চেষ্টায় লিপ্ত তা রোধ করা হোক (২) যুদ্ধবন্দী প্রশ্নে বাংলাদেশ ভারতের হুকুমদারীতে চলছে, এটা এ দেশটির স্বাধীনতার প্রতি আঘাত। তিন নম্বর যুক্তিটিও দু'ভাবে ব্যাখ্যা করা যায় ঃ (১) চীনও স্বয়ং জাতিসংঘে অন্তর্ভুক্ত হবার আগে

জাতিসংঘের প্রস্তাব মেনে নেয়নি, তাই এটা একটা অন্যায় যুক্তি (২) ১৯৭১ সালের ৭ ও ২১শে ডিসেম্বরের সাধারণ পরিষদের প্রস্তাবের প্রতি ১০৪টি দেশের সমর্থন ছিল, যুদ্ধ অবসান ও যুদ্ধংদেহী পরিস্থিতি প্রশমিত করে পারস্পরিক আলোচনার সুপারিশ করা হয়েছে। ১০৪টি দেশের আহ্বানের প্রতি সাড়া দিতে বাংলাদেশ প্রস্তুত কিনা, তা যাচাই কর; এবং উপমহাদেশের পরিস্থিতিকে নিজেদের স্বার্থে লাগানোর জন্য বর্হিশক্তির চেষ্টা ব্যর্থ করে পারস্পারিক আলোচনার দ্বার উন্মুক্ত করা (স্মরণ করা যেতে পারে, চীন সিমলা চুক্তিকেও অভিনন্দন জানিয়েছে)।

এ থেকে বোঝা যায় যে, চীনারা আমাদের কাছে প্রকারান্তরে স্বাধীনতার প্রমাণ চেয়েছে। এ প্রমাণ চেয়েছে চীন অন্যভাবেও। রাষ্ট্রদূত কায়সারের মাধ্যমে পাট ক্রয়ের প্রস্তাবও এদিকে একটি পরীক্ষা ছিল।

ভারত সব পাট লুট করে নিয়ে যাওয়ায় এবং ভারত অনুমতি না দেওয়ায় বাংলাদেশ চীনের কাছে পাট রপ্তানী করতে পারেনি। পাট রপ্তানীর অধিকারটুকুও অর্জন করতে না পারা একটি জাতির জন্য নিঃসন্দেহে দুঃখজনক। চীন এর পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থাপন করেছে আরও তিনটি প্রশ্ন।

চীন যদি জাতিসংঘে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভেটো প্রয়োগও করে, তবে তা হবে আমাদের পররাষ্ট্রনীতি ও রাষ্ট্রীয়নীতির দেউলিয়াত্বের ফলশ্রুতি। তবে পরবর্তী বৎসর আবার একই পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়া ছাড়া আমাদের জন্য পথ থাকবে না।

সরকার দুশমন বলেই চীনকে ভাবছেন, তাহলেও সে সৎ দুশমন, তার আয়নায় নিজের অবয়ব দেখে ত্রুটি অপনোদোনে উদ্যোগী হলে ভালই হতো।

রাষ্ট্রদূত কায়সারকে পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত হিসাবে পাকিস্তান না পাঠিয়ে বাঙ্গালী হিসাবে বাংলাদেশে পাঠিয়ে চীন বাংলাদেশের প্রতি পরোক্ষ স্বীকৃতি দিয়েছে বলে পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব সামাদ উল্লেখ করেছেন। শুধু তাই নয়, চীন ইদানীং বাংলাদেশকে পূর্ব পাকিস্তান বলছে না, তবে ব্যবহার করছে তথাকথিত শব্দটি। জাতিসংঘের দু'টি শাখা সংস্থা–বিশ্বস্বাস্থ্য সংগঠন (হু) এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)-তে বাংলাদেশ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে চীনের উপস্থিতিতেই। এটাকে চীনের নমনীয় ভূমিকার প্রমাণ হিসাবে ধরা যায়। এসব সংস্থায় স্থান দিতে চীনের পক্ষ থেকে যদি চরম বাধা না এসে থাকে তাহলে মূল জাতিসংঘেও চীনের পক্ষ থেকে বাধা আসার কারণ নেই।

স্বাধীনতার ন্যূনতম প্রমাণও যদি উপস্থাপন করা না গেল, সেটা আমাদের জন্য দুঃখজনক। সরকার সচেষ্ট হবেন কি?

টাঙ্গাইলে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (রব সমর্থক) -এর কর্মীসভা

গত ৬ই আগস্ট টাঙ্গাইলে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের এক কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার প্রধান অতিথি ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় সংসদ সদস্য এবং জেলা শাখার সভাপতি খন্দকার আবদুল বাতেন তার ভাষণে শ্রেণী সংগ্রামের মাধ্যমে শোষক শ্রেণীকে উৎখাত করে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান। সভা শেষে বাবু মনিন্দ্র মোহন ঘোষকে সভাপতি ও নাজমুল হক কিসলুকে সাধারণ সম্পাদক করে ছত্রিশ সদস্য বিশিষ্ট শহর শাখা ছাত্রলীগের একটি শক্তিশালী কমিটি গঠন করা হয়।

আপনার চিঠি

বদরগঞ্জে নক্সাল দমন ?

জনাব,

২৮শে জুলাই ভোরবেলা বাংলাদেশ বাহিনী ও বাংলাদেশ পুলিশবাহিনীর আনুমানিক সাড়ে সাত শতের একটি দল রংপুর জেলার বদরগঞ্জ থানার লোহানীপাড়া ইউনিয়নসহ পার্শ্ববর্তী কয়েকটি গ্রামে কার্ফু দিয়ে বাড়ী বাড়ী তল্লাশী করে তফ্‌মূল লাহানী নামে বদরগঞ্জ থানা ন্যাপের সদস্যসহ অপর এক গ্রামবাসীকে গ্রেফতার করেন।

অভিযোগে প্রকাশ, 'নক্সাল কোথায় ? ধরিয়ে দাও–' বলে গ্রামের বহু নিরীহ জনসাধারণকে প্রহার করা হয় এমন কি তাদের গুলি করে হত্যার হুমকিও দেয়া হয়। কিন্তু নক্সাল কি ? কে নক্সাল ? আর কোথায়ই বা তাদের অবস্থান বলতে না পারায় তাদেরকে প্রহার করা হয় বলে তারা মনে করেছে।

এছাড়া বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হবার পর আরও দু'বার উক্ত এলাকাগুলোতে বাংলাদেশ বাহিনী ও ভারতীয় বাহিনী মিলিতভাবে 'নক্সাল' দমন অভিযানে গিয়ে নিরীহ জনসাধারণকে হয়রানির অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসী মনে করছেন যে রংপুর জেলার (মোজাফফর দলের) জনৈক নেতার অদৃশ্য প্রভাবের ফলেই গ্রামবাসীর ভাগ্যে নেমে এসেছে নির্মম নির্যাতন। কারণ, উক্ত ন্যাপ নেতার চাচা মোঃ সোলায়মান শাহ্ লোহানী পাড়া ইউনিয়ন শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান এবং পাক-বাহিনীর সহযোগিতায় উক্ত গ্রামগুলি কয়েকবার 'অপারেশন' করে ব্যাপক হত্যা, ধর্ষণ ও লুণ্ঠনে সক্রিয় সহযোগী ছিল বলে মুক্তিবাহিনী কর্তৃক তার বাড়ী দু'বার আক্রান্ত হয় এবং সে পালিয়ে জীবন রক্ষা করে।

স্বাধীনতার পর-দালাল মোঃ সোলায়মান শাহ রংপুর শহরে উক্ত মোজাফফর নেতার বাসায় আশ্রয় নিয়ে আছে। এ ব্যাপারে অত্যাচারিত গ্রামবাসীর পক্ষ থেকে রংপুর জেলা 'দুর্নীতি দমন বিভাগে' আবেদনও করা হয়েছিল। কিন্তু আবেদনের পর আজ প্রায় পাঁচ মাস পর্যন্ত দালাল ব্যক্তিটিও উক্ত ন্যাপ নেতার বাসভবনে আশ্রয় নিয়ে রংপুর 'ক্যান্টনমেন্টে' জ্বালানী খড়ি সরবরাহ করে বেশ দু'পয়সা রোজগারের একটা পথও করে নিয়েছে। এ ব্যাপারে গ্রামবাসীর পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীর কাছে একটি 'খোলা চিঠি'ও তাঁরা দিয়েছিল।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে দালাল চাচা কি করে অদ্যাবধি ন্যাপ নেতা ভাতিজার মক্কেল হয়ে আছেন ? 'দুর্নীতি দমন বিভাগ' এবং কোতয়ালী থানা কর্তৃপক্ষ কি ক্যান্টনমেন্টে জ্বালানী খড়ি সরবরাহের মুনাফার মোহ পড়ে ঘুমাচ্ছে ? 'খোলা চিঠি' পাওয়ার পর সরকারই বা নীরব কেন ? আরও প্রকাশ উক্ত ন্যাপ নেতা গ্রামগুলোর বহু নিরীহ লোকজনের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসায় মিথ্যে ডাকাতি ও চুরি মামলা দায়ের করাচ্ছে। নক্সাল দমন অভিযান বোধহয় এরই অনতম দিক।

ইতি–

ওবায়দা লোহানী, রংপুর।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের তপস্বীরা সমাজতন্ত্র নির্মাণ করতে এসেছে

'বিড়ালের কাছে শুটকি জিম্মা' রাখার মতই বাংলাদেশ সরকার তাদের বহুল প্রচারিত ও কথিত জাতীয়করণ কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কাছ থেকে ধার করে বিশেষজ্ঞ এনে হাজির করেছে।

শিল্প-কারখানাগুলোর প্রশাসক পদে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে অযোগ্য ও দুর্নীতিবাজ ব্যক্তি নিয়োগ, কাজ ফেলে ফ্যাসিবাদী লালবদর বাহিনীর দিনমানে কুচকাওয়াজের তালিম গ্রহণ, শিল্পখাতের ব্যবস্থাপনায় পুঁজিবাদী মানসিকতার মার্কিন ঘেঁষা আমলা নিয়োগ, সর্বোপরি গোপনে গোপনে সাবেক মালিকদের হাতে কলকারখানা তুলে দেবার চেষ্টা তদ্বিরের মধ্য দিয়ে জাতীয়করণ কর্মসূচীর যে হাল দাঁড়িয়েছে তাকে ষোলকলায় রূপদানের জন্য এখন এসেছে পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিশেষজ্ঞরা।

এরা জাতীয়করণ কর্মসূচীকে সফল করে গেলে তারই উপর ভিত্তি করে দাঁড় করানো হবে সমাজতন্ত্রের ইমারত।

পুঁজিবাদী সামাজিক গণতন্ত্র দিয়ে সমাজতন্ত্রের সম্ভাবনা ধ্বংসের আন্তর্জাতিক চক্রান্তে বাংলাদেশের ক্ষমতাসীনেরা জড়িয়ে পড়েছে বলে 'হক-কথা' ইতিপূর্বে যে চাঞ্চল্যকর রিপোর্ট প্রকাশ করেছিল, এটা হচ্ছে তার অন্যতম প্রমাণ।

ভাসনীর বিশ্বাস

মোহাম্মদ হোসেন

(পূর্ববর্তী সংখ্যার পর)

পৃথিবীর সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির আদর্শ মানুষের মৃত্যু ঘটিলে অনুরূপ লোকের অভাবে স্বৈরতন্ত্র কায়েম হইতে পারে। কারণ, ব্যক্তি বিশেষের মালিকানার চিরবিলুপ্তির অভাবহেতু স্বার্থবাদীদের দ্বারা সমাজতন্ত্রের আসল রূপটির পরিবর্তে অন্য একটি পর্যায় আসিতে পারে। কিন্তু আল্লাহ্‌র মালিকানায় সেই রূপ সম্ভব নয়। এই জন্যই মওলানা ভাসানী তাহার মতে অটল ও অচল রহিয়াছেন। তিনি আল্লাহ্‌র মালিকানার সমাজতন্ত্র ছাড়া অন্য কোন ব্যবস্থায় বিশ্বাসী নহেন।

ক্যাপিটালিজমে উৎপাদনযন্ত্রের মালিকানা ব্যক্তি বিশেষের হাতে ন্যস্ত। আর সোশ্যালিজমে উৎপাদনযন্ত্রে সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। আপামর জনসাধারণ রাষ্ট্রের সম্পদ সমভাবে নিজেদের মধ্যে বণ্টন করিয়া নেয়। তাই রাষ্ট্রের সম্পদের মালিক জনসাধারণই হয়।

ইসলামী আদর্শে সকল প্রকার সম্পদের মালিক একমাত্র আল্লাহ্। অথচ আল্লাহ্ সেই সম্পদ নিজের জন্য কিছুই ব্যবহার করেন না। তিনি প্রয়োজনের উর্ধ্বে। তাঁহাকে ক্ষুধা ও তন্দ্রা স্পর্শ করিতে পারে না। তাই সকল কিছুই তাঁহার বান্দাগণই ভোগ করিয়া থাকে। আল্লাহ্‌র মালিকানাধীন সমাজতন্ত্রে কোন ব্যক্তির উল্লেখ থাকে না। সকল কিছুই আল্লাহ্‌র রাহে বিলীন হইয়া যায়। কিন্তু সেই সর্বশক্তিমান কোন কিছুই গ্রহণ করিতে আসেন না। গ্রহণ করে মানুষ। অথচ এহেন

মুরিদের দরবার

জনকল্যাণমূলক আদর্শটি প্রতিষ্ঠার বিপক্ষে কমিউনিষ্টদের যুক্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়াসগুলি নিছক বাতুলতা বৈ কিছু নয়।

ষ্ট্যালিন বলিয়াছেন, 'ব্যবহার বর্জিত থিওরি বন্ধ্যা স্ত্রীর মত।' মানুষ যদি মুখে মুখে ইসলামের রীতিনীতির কথা প্রচার না করিয়া ইহাকে সমাজ নিষ্ঠা ও সততার সহিত প্রয়োগ করিত তবে মানুষের ইহ ও পরকালীন মঙ্গল সাধিত হইত। মওলানা আবুল কালাম আজাদের মত মনীষীদের কোরআনের দার্শনিক ব্যাখ্যার আলোচনা করিয়া মওলানা ভাসানী প্রমাণ করেন যে, মানব সভ্যতার গতি

আধ্যাত্মিক মূল্যবোধে পুষ্ট সমাজতন্ত্রের দিকে ধাবিত হইতে বাধ্য। মিঠাই ছাচে ঢালিয়া হাতী, ঘোড়া, পাখী ইত্যাদি অনেক কিছু তৈরী করা যায়। কিন্তু জলীয় বাষ্পের ছোঁয়ায় এইগুলি গলিয়া যায়। বস্তুবাদের উপর নির্ভরশীল আদর্শ তথা 'কমিউনিজম', তদ্রুপ নির্দিষ্ট সময়ান্তে পৃথিবীর বুক হইতে মুছিয়া যাইবে। কারণ, বস্তুবাদের যেখানে চরম উন্নতি সেখানেই ইহার অবনতি। বস্তুবাদ যখন মানুষের উন্নতির দ্বিতীয় কোন পথ আবিষ্কার করতে অক্ষম হইয়া পড়িবে তখনই মানুষ নতুন একটি আদর্শের জন্য উদ্গ্রীব হইয়া উঠিবে। সেই সময় ইসলামই মানবজাতির নিকট সত্যরূপে প্রতিভাত হইবে।

বাংলাদেশে ইসলামের নামে যাহারা শাসন করিত তাহাদের পতন হইয়াছে। তবে মওলানা ভাসানী বিশ্বাস করেন যেখানে জাতির পতন সেখান হইতে উত্থানের সৃষ্টি। গর্ভ বেদনা চরম হইলে সন্তান প্রসব সম্ভব হয়। আর প্রসব-কারিণীও অসহনীয় যাতনার হাত হইতে রেহাই পায়। যেখানেই অশান্তি সেখানেই মানুষ শান্তির জন্য ব্যাকুল। উত্থান-পতন ইতিহাসের নিয়ম। তাই অন্যায়, অত্যাচার, জুলুমের পরিবর্তে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য ইয়াজিদের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইতে হযরত হোসেন (রাঃ) যে যুদ্ধ করিয়াছিলেন উহাতে বাহ্যতঃ ইসলামের পরাজয় ঘটিলেও মূলতঃ ইহার আদর্শের জয় হইয়াছিল। তাই মওলানা মোহাম্মদ আলী বলিয়াছেন ইসলাম জিন্দা হোতা হ্যায় হর কারবালা কি বাদ! মুসলমানদের আদর্শের পতনের যুগেও মওলানা ভাসানী উৎফুল্লচিত্তে মওলানা মোহাম্মদ আলীর এই বাণীটিকে স্মরণ করেন। রাশিয়া, জাপান, ইটালী, ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড, কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, চীন প্রভৃতি দেশের সাংবাদিকগণ সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে তাহার ধারণা কি জানিতে চাহিলে মওলানা ভাসানী সুস্পষ্ট ভাষায় বলেন, যাহা কিছু এদেশের মানুষের জন্য কল্যাণকর তাহার সবকিছুই তিনি গ্রহণের পক্ষপাতি। কিন্তু আল্লাহ্‌র মালিকানায় রাষ্ট্রের সকল প্রকার সম্পদ উৎসর্গ করিতে হইবে। ছোট বড় সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য প্রয়োজনমাফিক উহার বন্টন করিতে হইবে।

আল্লাহ্ নাই–বলিলেই সর্বশক্তিমানের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় না। এই 'নাই'এর মধ্যেই তাঁহার অস্তিত্ব বিরাজ করিতেছে। আমাদের চোখের সম্মুখে যে সকল বস্তু রহিয়াছে উহারও আসলে কোন আকার বা অস্তিত্ব নাই। অথচ 'নাই' হইয়াও আবার আছে। যে কোন একটি বস্তুকে খন্ড খন্ড করিতে থাকিলে এমন একটি স্তরে গিয়া পৌঁছান যাইবে যখন বস্তুটিকে খালি চোখে আর দেখা যাইবে না। অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখিয়া আবার উহাকে ভাগ করিতে থাকিলে 'অণু' হইতে পরমাণু, আবার 'পরমাণু' হইতে এমন এক পর্যায়ে উপনীত হইবে যখন উহার অস্তিত্বই মুছিয়া যাইবে ইহাতে প্রমাণিত হয় আসলে কোন বস্তুরই আকার নাই। অথচ 'নাই' হইতেই সকল কিছুর উৎপত্তি।

আর ইসলামের তৌহিদী কালেমার তাৎপর্যও এই-ই। 'লা-ইলাহা।' কিছুই নাই, 'ইল্লাল্লাহ্' আল্লাহ্ ব্যতীত। অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য মাবুদ নাই। এই তৌহিদী কলেমার আত্মিক উপলব্ধিতে মানুষ দুনিয়ার পাহাড়-পর্বততুল্য বাধা-বিপত্তিকে উপেক্ষা করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইবার অসীম ঐশী শক্তির প্রেরণা পাইয়া থাকে। জীবনের উত্থান-পতনকে হাসিমুখে বরণ করিয়া নিতে পারে। হতাশায় নিরাশ না হইয়া পূর্ণোদ্যমে কাজে নামিবার অনুপ্রেরণা পায়। কিন্তু বস্তুবাদী নাস্তিকের জীবনে চরম বিপর্যয় ঘটিলে পিছনে কোন অদৃশ্য ঐশী

শক্তি থাকে না। ফলে চরম হতাশাগ্রস্থ হইয়া পড়ে।

মওলানা ভাসানীর প্রস্তাবিত সমাজতন্ত্র আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ পুষ্ট সমাজতন্ত্র। দেশে সমাজতন্ত্রের আবহাওয়া প্রবাহিত হইতেছে তাহা হইতে ইহা নিঃসন্দেহে বেশী কল্যাণকর। ইহার পূর্ণ বাস্তবায়ন করিলে জাতি অবশ্যই সাম্য, শান্তি ও মুক্তির অদ্বিতীয় পথ খুঁজিয়া পাইবে। ভুল পথে অগ্রসর হইয়া বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইলে সত্যের অনুসন্ধান করিবার স্পৃহা জাগে না। তাই ভুলভ্রান্তিই আমাদিগকে সত্যের অন্বেষণে নিয়োজিত করে। দেশের শাসকবর্গ যে সমাজতন্ত্র কায়েমের পরিকল্পনা করিতেছেন উহারই ব্যর্থতা মওলানা ভাসানীর আধ্যাত্মিক জীবনবোধে পুষ্ট সমাজতন্ত্রকে স্বাগতম জানাইবে।

ভাসানীর বাণী

জালেম ও শোষক যে কোন ধর্মের, যে কোন বর্ণের, যে কোন দেশের বা সমাজের হউক না কেন তাহারা আল্লাহর শত্রু, সমাজের দুশমন। ইহা সর্বদাই শোষিত ভাই-বোনেরা মনে রাখিবেন। অন্তঃকরণ হইতে সর্বপ্রকারের ভয়ভীতি দূর করিয়া জালেম ও শোষকের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে জেহাদ করিতে না পারিলে শোষিত মজলুম মানুষের দুঃখ দুর্দশা কিছুতেই দূর হইবে না এবং শোষণমুক্ত সমাজ গঠনও সম্ভব হইবে না। পৃথিবীর সকল দেশে রাজতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র প্রভৃতি কোন না কোন সরকারে বিদ্যমান আছে। সরকারবিহীন অবস্থায় কোন দেশই চলিতে পারে না। সরকার গঠিত হইতে পারে দুইভাবে–হয়, জনগণের সমর্থনে নতুবা সামরিক বাহিনীর সমর্থনে। সামরিক বাহিনীর সরকার যতই শক্তিশালী হউক না কেন স্থায়ীভাবে দেশ শাসন করিতে পারে না। কারণ, জনগণের পূর্ণ সমর্থন সামরিক সরকারের প্রতি থাকে না। কিন্তু এক শ্রেণীর সরকার জনগণের আস্থা হারাইয়াও পুলিশবাহিনী, সৈন্যবাহিনী প্রভৃতি সামরিক শক্তির সাহায্যে জনগণের উপর দমননীতির ষ্টিম রোলার চালাইয়া শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকিতে চায়। সেই অবস্থায় জনগণের কর্তব্য সরকার উৎখাত করিতে অথবা জনগণের ইচ্ছা মাফিক শাসন পরিচালনা করিতে সরকার যাহাতে বাধ্য হয় তজ্জন্য সংবদ্ধভাবে চাপ সৃষ্টি করা। এই জন্য দেশের কৃষক, মজুর, কামার, কুমার, জেলে, মাঝি, তাঁতী ও সর্বোপরি সকল শ্রেণীর লোককে সংঘবদ্ধ করিয়া সংগঠন গড়িয়া সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন চালাইবার জন্য ক্রমান্বয়ে শক্তি সঞ্চয় করা দরকার। প্রত্যেক গ্রামে, ইউনিয়নে, থানায়, মহকুমায়, জেলায় সংগঠন গড়ার কাজ শেষ হইলে সরকারের সতর্ক করিয়া ঘোষণা করিতে হয়-আগামী এত দিনের মধ্যে জনগণের ন্যায়সঙ্গত ১, ২, ৩ ইত্যাদি দফা না মানিয়া জনগণের কল্যাণমূলক কর্মসূচী গ্রহণ না করিলে দেশের আপামর জনসাধারণ ঐক্যবদ্ধভাবে সরকারের সহিত যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া আন্দোলন আরম্ভ করিবে। তাহাতেও যদি সরকারের চৈতন্য উদয় না হয়, তাহা হইলে গণবিপ্লব সৃষ্টি করিয়া সরকারের আদেশ-নিষেধ অমান্য করিবার কর্মসূচী গ্রহণ করিতে হয়। সংগঠন শক্তিশালী না করিয়া সংগ্রামের চরম অধ্যায় আরম্ভ করিলে সংগ্রাম অনেক সময়ই ব্যর্থ হয়। তাই বাংলাদেশের জনগণের প্রতি আমার আকুল আবেদন, আপনারা প্রত্যেক গ্রামে, ইউনিয়নে, থানায়, মহকুমায়, জেলায় দেশের সর্বশ্রেণীর

মানুষকে লইয়া সংগঠন গড়িয়া তুলুন, শক্তি সঞ্চয় করুন। দুর্নীতি ও শোষণের কবল হইতে দেশকে রক্ষা করার জন্য আসনি সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হউন।

৩রা সেপ্টেম্বর হইতে ভুখা মিছিল বাহির করিয়া গণজমায়েত-এর মাধ্যমে মন্ত্রী, এমসিএ-দের বাড়ী ও থানা, মহকুমা, জেলা প্রশাসকদের অফিসে উপস্থিত হইয়া কৃষক, মজুর ও সকল শ্রেণীর দরিদ্র জনতার বাঁচার দাবী আদায় করুন।

৯৬ টাকার উর্ধে মণপ্রতি
দর ধার্য না হলে পাট থাকবে না

সরকার পাটের নিম্নতম দর বেঁধে না দেওয়ায় সারা বাংলাদেশব্যাপী বাজারে উঠা নতুন পাট ব্যবসায়ী, ফড়িয়া শ্রেণীর হাতে যাচ্ছেতাই দরে চলে যাচ্ছে। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, পাটের মণ এখন বিশ ত্রিশের কোঠায় আবদ্ধ। পাট ব্যবসা ও বাণিজ্য জাতীয়করণের পর কমসে কম ১০টি পাট সংস্থা বৎসরে ৬৩ লাখ টাকা অফিস ভাড়া দিয়ে কিছুই যে করছে না তার প্রমাণ হলো পাটের দর বেঁধে দেওয়ার ক্ষেত্রে উদাসীনতা।

আসলে ভারত বাংলাদেশকে পাটের ন্যূনতম দর যা ধার্য করতে বলবে, সরকারও সে দরটি ধার্য করবে। অবশ্য ভারতে ইতিমধ্যে পাটের দর মণপ্রতি প্রায় ৪৮ টাকা বেঁধে দেয়া হয়েছে। বর্তমানে প্রচলিত বেসরকারী মুদ্রা বিনিময় হার অনুযায়ী বাংলাদেশের ১০০ টাকা ভারতের ৫০ টাকার সমান। বাংলাদেশে কমপক্ষে ৯৬ টাকা মণ প্রতি দর ধার্য না করলে দু'দেশের পাটের ক্রয়মূল্য সমান হবে না।

বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে বাংলাদেশ মন্ত্রীসভার মধ্যে একটি অংশ পাটের দর মণপ্রতি ৪০ টাকা ধার্য করার পক্ষপাতি অন্য অংশটি ২৮/৩০ টাকায় দর বাঁধতে প্রস্তুত। অবশ্য ভারত এখন বিদেশে বাজার যাচাই করছে। বাংলাদেশ থেকে পাট পাচার করে বিদেশে রপ্তানী করে মোটা মুনাফার উদ্দেশ্য নিয়ে ভারত শীঘ্রই বাংলাদেশকে পাটের একটা দর বলে দেবে। এ দরটি কোন অবস্থাতেই ভারতের চাইতে বেশী হবে না, বরং হবে অনেক কম। চোরাপথে পাট নিয়ে ভারতের বন্দরে জাহাজে তোলা অবধি চোরাই পাটের মণ যেন খরচ সমেত ৪০ টাকা না দাঁড়ায় ভারত সে ব্যবস্থা করবে। এর ফলে ধারণা করা হচ্ছে যে, ঘন ঘন ভারত সফরে গমনকারী মন্ত্রীর যে দরের প্রস্তাব দিচ্ছেন, অর্থাৎ ২৮/৩০ টাকায় চূড়ান্ত দর ধার্য হবে।

বাংলাদেশ সরকার পাট ব্যবসা থেকে মধ্যসত্বভোগী ফড়িয়া দালাল ইত্যাদি উৎখাতের ওয়াদা দিলেও তা আজ মিথ্যায় প্রতিপন্ন হয়েছে। সরকার পাটের দর বেঁধে না দেওয়ায় এবং সরকারী পাট ক্রয় সংস্থা কম দরে পাট ক্রয় করায় ফড়িয়া, দালাল ও সাবেক পাট ব্যবসায়ীরা ভারতীয় মাড়োয়ারীদের সাথে লাইন করে সরকারী দরের চাইতে কিছু বেশী দামে পাট ক্রয় শুরু করেছে।

আগামী এক মাসের মধ্যে গোপনে পাট পাচার সহস্র গুণ বেড়ে যাবে।

ভারতীয় ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশের সরকারী দরের চাইতে দেড়গুণ বেশী দামেও পাট কিনে নিতে পারবে। তার কারণ, ভারতীয় বন্দরে পৌঁছানো পর্যন্ত তারা বাংলাদেশী মুদ্রায় মণপ্রতি ৯৬ টাকায় দাম ও খরচ পোষাতে পারলেও নিজ দেশের পাটের মতই তারা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারবে। আরও কমে কিনতে পারলে তো কথাই নেই।

জাল নোট

ভারতে বাংলাদেশের যে পাঁচ, দশ ও এক টাকার নোট ছাপানো হয়েছে সেগুলোর কোটি কোটি টাকার জাল নোট বেরিয়ে গেছে ভারত থেকে। 'জাল' বলে বর্ণনা করা হলেও আসল ও জালের মধ্যে নম্বর ছাড়া তফাৎ কিছুই নেই। পাটের মওসুমে এই জাল নোটের খেল সীমা ছাড়িয়ে যাবে। যদি ভারতীয়রা একশ কোটি টাকার পাট কিনে পাচার করে তবে তার মধ্যে ৫০ কোটি টাকার মতই জাল নোট থাকবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। বাজারে অতিরিক্ত টাকা ঢুকে পড়লে জিনিসপত্রের দাম আরও বেড়ে যাবে।

প্রতিকার কি?

এই নিশ্চিত বিপর্যয়ের গোলক ধাঁধা থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য চেষ্টা করার ক্ষমতা ও অনুমতি বাংলাদেশ সরকারের নেই।

মওলানা ভাসানী প্রতি দেড়মণ চাউলের দামের সমান পাটের মণপ্রতি দর ধার্য করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কম করে ধরলেও, চালের মণ যদি ৮০ টাকা হয় তাহলে পাটক্রয়ের ন্যূনতম দর দাঁড়াবে ১২০ টাকা। তাহলে ভারতীয়রা ৯৬ টাকার গরম দেখিয়ে পাট লুট করতে পারবে না।

কিন্তু বাংলাদেশ সরকার এটা করে নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করবে না, কারণ প্রভুর আজ্ঞা নেই।

প্রেতাত্মা নয়, ভারতীয় সৈন্য
সশরীরে রয়েছে

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ কম্যান্ড পয়েন্টই শুধু নয়, এমনকি সামরিক হেলিকপ্টার ও বিমানগুলোও ভারতীয় সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রণ করছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের গোলযোগ বলে কথিত দমন অভিযানকে কেন্দ্র করে এখনও চট্টগ্রামে, অনুরূপভাবে রাজশাহী সীমান্তে বাংলাদেশ ভূমিতে অসংখ্য ভারতীয় সৈন্য রয়ে গেছে। পাগড়ী-দাঁড়ি বিশিষ্ট শিখ সেনারা চট্টগ্রামে রেল, বাস, বিমানে আহলাদ ও আবদার খাটাতে যেয়ে নিজেরাই 'তোমহারি দোস্ত ফৌজ' বলে নিজেদের পরিচয় দিচ্ছে। সাদা পোষাকে এদের চলাচল করার হুকুম থাকলেও বিশেষ বিশেষ সময় দ্রুত ধাবমান সামরিক জীপে শশ্রু ও পাগড়ী দেখা যায়। রক্ষী ও বিডিআর-এর ট্রাকে ড্রাইভারের পাশে অধিনায়ক হিসাবে এদের আসীন দেখা গেছে। ঢাকা থেকে প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে, ঢাকা শহরেও ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীদের ক'জন সৈন্যকে সশস্ত্র অবস্থায় দেখা গেছে বিভিন্ন স্থানে, জুলাইয়ের তৃতীয় পক্ষে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সৈনিকদের অনেকেই বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ইউনিট বলে কথিত কতিপয় সৈন্যদলের সাক্ষাত পেয়েছেন অপারেশন জোনে। রহস্যজনক ইউনিটগুলো ভারতীয় সৈন্যদল বলে এলাকাবাসী মনে করছে।

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সিদ্ধার্থরায়ের সফরের পর থেকে সীমান্তে সীমান্তে জেলা প্রশাসকদের মধ্যে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হচ্ছে তদনুযায়ী ভারতীয় সৈন্যরা হরহামেশা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ছে এবং তাদের 'দায়িত্ব' সম্পাদন করছে।

এছাড়া দু'দেশের মৈত্রী সহযোগিতা চুক্তির ভিত্তিতে পরবর্তী সময় স্বাক্ষরিত প্রোটকল চুক্তি অনুসারে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মূল কমান্ডের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে প্রকাশ্যেই ভারতীয় সামরিক উপদেষ্টারা রয়েছে।

জুলাইয়ের শেষ ভাগে বাংলাদেশ স্থলবাহিনীর চীফ অব স্টাফ সিলেট সফরে যাবার সময় যে হেলিকপ্টারে গিয়েছিলেন তাতেও দু'জন

ভারতীয় সামরিক ব্যক্তি ছিলেন। হেলিকপ্টার বিগড়ে যাবার পর উদ্ভয়ন অবস্থায় তারা মেরামত করে দিয়েছি-এ খবর বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে।

আলবদর পালক
এমসিএ

আওয়ামী লীগের কর্মকর্তাদের দুষ্কর্মের বিরুদ্ধে কথা বললে নাকি সবাই দেশদ্রোহী হয়ে যায়। পাক আমলে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধেও কথা বললে পাকিস্তানের সংহতি বিপন্ন করা হতো এবং ভারতের দালাল হয়ে যেত সবাই। সেই পাকিস্তানী ভূত এখন আওয়ামী লীগ নেতাদের ঘাড়ে পুরাদমে চেপেছে। এখন সেই ভূতে পাওয়া মানুষগুলি অর্থের লোভে এতই বেহুশ যে দালালের বিরুদ্ধে কথা বললেও তারা সহ্য করতে পারেন না। যারা দালালদের বিরুদ্ধে কথা বলে তাদেরকে বাংলাদেশের শত্রু আখ্যায়িত করে খুন করে ফেলার ও জেলে পুরে রাখার হুমকি দেখায় আর তাদের ছত্রছায়ায় রাজাকার, আলবদর, আল-শামস আর শান্তি কমিটির সভাপতি থেকে শুরু করে সদস্য পর্যন্ত সবাই অবস্থান করছেন। এইসব দালালদের নিকট থেকে জমিজমা, ঘরবাড়ী অথবা মোটা অঙ্কের টাকা নিয়ে তাদেরকে তারা আশ্রয় দিয়েছেন। আওয়ামী নেতাদের ছত্রছায়ায় এত দিন আত্মগোপন করে থাকার পর সেই সব দালালরা এখন আবার তাদের স্বমূর্তিতে সক্রিয় হয়ে উঠেছেন। তাদের অত্যাচারে এখন সোনাগাজী থানার দেশপ্রেমিক জনসাধারণ আজ আবার নিজভূমে পরবাসী। এই দালালদের শায়েস্তা করার জন্য জনসাধারণ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাছে আবেদন, নিবেদন করার পরও কোন প্রকার ফল হয়নি। কিছুদিন পূর্বে দালাল আশ্রয়দানের ও রিলিফ আত্মসাৎ-এর অভিযোগে সোনাগাজী থানা আওয়ামী লীগের সেক্রেটারী জনাব আবদুল সালামকে ক্রুদ্ধ জনতার রোষানলে পতিত হয়ে প্রায় একমাস যাবত হাসপাতালে শয্যাশায়ী থাকতে হয়। কিন্তু স্থানীয় এমসিএ, প্রশাসক এবং পুলিশ বিভাগের বদৌলতে দেশপ্রেমিক জনসাধারণকেই উল্টো শায়েস্তা করা হলো। বহু আলবদর, রাজাকার এখন আওয়ামী লীগার সেজে তাদের তোঘলকী রাজত্ব চালাচ্ছে। সোনাগাজী থানার জামাতে ইসলামীর প্রাক্তন সভাপতি, থানা শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান, হানাদার আমলের উপনির্বাচনের এমপিএ পদপ্রার্থী কুখ্যাত দালাল ও ত্রাস সৃষ্টিকারী আবুল বশর মোঃ শামসউদ্দিনসহ বহু রাজাকার এখন প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সরকারের পক্ষ থেকে একে দালাল বলে ঘোষণার পরেও গ্রেফতার করা হয়নি।

টেলিফোন সমাচার

টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ টেলিফোন লাইন স্বাধীনতার পরে আর সম্পূর্ণ ভাল হয় নাই। মাত্র একবার কয়েক ঘন্টার জন্য ঠিক হয়েছিল। বিভিন্ন এলাকায় বহু তামার তার চুরি হওয়ার ফলেই এমন অবস্থার সৃষ্টি। গত মার্চ, এপ্রিল এবং মে মাসে টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ লাইনের মোট ২০ হাজার টাকার তামার তার চুরি যায়। এ ব্যাপারে এ পর্যন্ত কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই।

গোপালপুরে এক নতুন এক্সচেঞ্জ খোলার পর টাঙ্গাইলের সঙ্গে একদিন মাত্র কথা হয়েছিল তারপর আজ পর্যন্ত তাহা বন্ধ।

টেলিফোন এক্সচেঞ্জের দূরাবস্থার শেষ নাই। ২০০ লাইনের এক্সচেঞ্জে মাত্র ৬ জন অপারেটর। টেলিফোন উঠিয়ে অনেকক্ষণ

বসে থাকার পর তবে উত্তর মেলে। একই অপারেটরকে একই সঙ্গে ট্রাঙ্ককল ও লোকাল কল পাস করতে হয়। বিকেল ৪টায় ডিউটিতে বসে সকাল ৮টায় উঠে যেতে হয়।

যখনই ঢাকায় ট্রাঙ্ককল বুক করা হয় তখনই জবাব আসে ঢাকার লাইন খারাপ। ঢাকার সঙ্গে টাঙ্গাইলের সরাসরি যোগাযোগের কোন ব্যবস্থা নাই।

এক্সচেঞ্জের ২০০ লাইন প্রায় পূর্ণ। অথচ কর্তৃপক্ষ এখনও এদিকে খেয়াল দেওয়ার সময় পাচ্ছেন না।

চাঁদাদাতাদের নামের তালিকা

মওলানা ভাসানীর আহ্বানে সাপ্তাহিক পত্রিকা 'হক-কথা'র সুষ্ঠু প্রকাশনার জন্য নিজস্ব প্রেস খরিদের নিমিত্ত তহবিল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত সদস্যবৃন্দের সমন্বয়ে গঠিত এডহক কমিটিঃ

আহ্বায়ক

মোঃ তোজাম্মেল হক

সদস্যবৃন্দ ঃ

১। সৈয়দ মোশারফ হোসেন ২। জামাল হায়দার ৩। শামসুল হুদা ৪। ফজলুল হক ৫। ইয়াকুব আলী খান ৬। বিলায়েত হোসেন।

চাঁদাদাতার নাম		পরিমাণ
১।	জনাব আখতার হোসেন	২.০০
২।	জনাব মোঃ ইউসুফ	৫.০০
৩।	জনাব মহাম্মদ আলী	১০.০০
৪।	জনাব সালেহ আহমদ	১০.০০
৫।	জনাব সাইফুল আলম	৫.০০
৬।	জনাব নফী আহমদ	১.০০
৭।	জনাব আব্দুর রাজ্জাক	১.০০
৮।	জনাব মোস্তাফিজুর রহমান	২.৫০
৯।	জনাব দেওয়ান রশীদ মিয়া	১.১০
১০।	জনাব রফিকুজ্জামান	২.০০
১১।	জনাব আব্দুল মান্নান	২.০০
১২।	জনাব করিম চৌধুরী	২.০০
১৩।	জনাব শামসুল হুদা	৩.০০
১৪।	জনাব ইয়াকুব আলী খান	৫.০০
১৫।	জনাব জামাল হায়দার	২.০০
১৬।	জনাব বিলায়েত হোসেন	৫.০০
১৭।	জনাব মোঃ তোজাম্মেল ইসলাম	১.০০
১৮।	জনাব এনাতুল হক	৫.০০
১৯।	জনাব মজিবর রহমান	৫.০০
২০।	জনাব আলী হায়দার চৌধুরী	১.০০
২১।	জনাব মোখলেছুর রহমান	১.০০
২২।	জনাব আলতাফ হোসেন	১.০০
২৩।	জনাব আব্দুর রশীদ	১.০০
২৪।	জনাব শামসুজ্জামান খান	৩.০০
২৫।	জনাব সিরাজুল ইসলাম	১.০০
২৬।	জনাব (নাম দিতে ইচ্ছুক নন)	২.০০
২৭।	জনাব জিতেন্দ্র নাথ বিশ্বাস	১.০০
		৮৯.০০

৩রা সেপ্টেম্বর সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট

শিক্ষা সমস্যার সমাধান, দুর্নীতি উৎখাত, ফ্যাসীবাদী ষড়যন্ত্র প্রতিরোধ, সর্বোপরি খাদ্যের দাবীতে ৩রা সেপ্টেম্বরের ভুখা মিছিলের সমর্থনে বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে সারা বাংলাদেশব্যাপী সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পূর্ণ ধর্মঘট পালন করুন।

সম্পাদক ঃ সৈয়দ ইরফানুল বারী, ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ঃ মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী
মুদ্রণে ঃ শান্তি প্রেস, সন্তোষ, টাঙ্গাইল।

প্রতি কপি পঁচিশ পয়সা সাপ্তাহিক চাঁদার হার : ষান্মাসিক-৬.০০ বার্ষিক-১০.০০

হক-কথা

(WEEKLY THE HAQ-KATHA)

প্রকাশক ও পৃষ্ঠপোষক ঃ মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

প্রথম বর্ষ ২৭তম সংখ্যা ঃ শুক্রবার; ১৫ই ভাদ্র, ১৩৭৯; ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৭২; ২২শে রজব ১৩৯২ ঃ সন্তোষ, টাঙ্গাইল।

আগামী রবিবার ৩রা সেপ্টেম্বর ভুখা মিছিল

নিপীড়িত ভাগ্যহত অনশনবন্দী জাগো

জাগো অনশনবন্দী
ওঠরে যত
জগতের লাঞ্ছিত ভাগ্যাহত
জাগো–

কালঘুম ভেঙ্গে জাগতে হবে আজ। ডাক এসেছে বাংলার বিদ্রোহী কণ্ঠের কাছ থেকে। দুর্ভিক্ষের করালগ্রাসের কবলে পতিত প্রিয় মাতৃভূমির ততোধিক প্রিয় সাতকোটি মানুষকে মহামৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাবার ডাক এসেছে। স্বাধীনতার স্বর্ণটপকূল থেকে আমাদের আজ সীমাহীন লাঞ্ছনা ও দুর্গতি, অনাহার ও বুভুক্ষার সীমানায় টেনে নিয়ে চলেছে কাপালিকুল। মৃত মানুষের বুকের উপর বসে শয়তানের আরাধনায় ধ্যানকারী কাপালিকের মত যারা বাংলার তিরিশ লাখ মানুষের আত্মবলিদানকে কাজে লাগিয়ে গদীতে আরোহণ করেছে, তারাই আজ আটমাসে প্রভু ভারতের হাতে দেশের সম্পদাবলী সমর্পণ করে, লুটপাট সমিতি, চোরাকারবার, চোরাচালানকে প্রশ্রয় দিয়ে, অবাধে লক্ষ লক্ষ ভারতীয়কে এদেশে এনে স্থায়ীভাবে বসতি করতে এবং অস্থায়ীভাবে সামরিক অবস্থানের পর বেসুমার খাদ্যসামগ্রী সম্পদাবলী নিয়ে সীমান্ত পার হতে দিচ্ছে। এর পরিণতিতে বাংলার বুকে আজ দুর্ভিক্ষ। এ দুর্ভিক্ষের যুপকাষ্ঠে বাংলার অসহায় মাটির মানুষদের হত্যার ষড়যন্ত্র রুখতে ডাক এসেছে আজ।

এ ডাকে সাড়া দিয়ে আগামী রবিবার দেশব্যাপী সংগঠিত হবে ভুখা মিছিল, ঘেরাও অভিযান, অন্নের দাবীতে। অন্নের দোহাই দিয়ে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের সাথে আরও বৃহত্তর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ার সরকারী চক্রান্তের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা বিপন্নকারী দুর্নীতিপরায়ণ শাসন ব্যবস্থা ও রাঘববোয়ালদের বিরুদ্ধে গণসংগ্রামের সূচনা হিসাবে শুরু হচ্ছে এ আন্দোলন। এ আন্দোলনের পুরোধা হচ্ছেন, জনগণের স্বার্থের সংগ্রামে অবিচল, অদম্য সাহসী সৈনিক, বাংলার মেহনতি মানুষের নয়নমনি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। তাঁর এ আন্দোলনের ডাকে সাড়া দিয়ে এগিয়ে এসেছে ১৭টি রাজনৈতিক-কৃষক-শ্রমিক ও ছাত্র সংগঠন। আগামী রবিবার দেশের সর্বত্র শহর-বন্দর-গঞ্জ-গ্রামের জনগণকে মিছিল করে সরকারী আস্তানা, থানা, এসডিও, সিও, এমসিএদের ঘেরাও করার আহ্বান জানিয়ে

ঘোষণা করা হয়েছে গণমুক্তি সংগ্রামের প্রারম্ভ কর্মসূচী।

যেখান থেকে ১৯৬৮-র ৬ই ডিসেম্বর আন্দোলন শুরু করে মওলানা ভাসানী ভেঙ্গে দিয়েছিলেন ডিক্টেটর আইয়ুবের তখতে তাউস, সৃষ্টি করেছিলেন এমন এক পরিস্থিতি যে পর্যায়ে ষড়যন্ত্র মামলায় আটক মুজিব মুক্তিলাভ করেছিল– সে আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু ঢাকার পল্টন ময়দানে আগামী রবিবার মওলানা ভাসানী জনসভা করবেন ১৯৬৮-র ৬ই ডিসেম্বরের মতই। জনসভা থেকে ভুখা মিছিল নিয়ে তিনি ঘেরাও করবেন গণভবন (সাবেক গভর্ণর হাউজ)।

শহরে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত অফিস সাজিয়ে, পত্রিকায় পত্রিকায় প্রেস রিলিজের কাগজ পাঠিয়ে রাজনীতি করেন, শ্রমিক-কৃষকের সাথে একাত্ম হয়ে কলকারখানা আর ক্ষেতখামারে যেসব সংগঠন মানুষের বাঁচার দাবীকে, গণমুক্তির দাবীকে বিশ্বাসের অঙ্গীভূত করে কঠোর সংগ্রাম চালিয়ে আসছে, তারাও এগিয়ে এসেছে মহীরুহরূপী মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে সংগঠিত সর্বদলীয় খাদ্য সংগ্রাম কমিটির আন্দোলনের সমর্থনে।

স্বাধীনতার পর থেকে ক্ষমতাসীনদের বারংবার সাবধান করে দেওয়া সত্ত্বেও জনগণের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা থেকে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ নিবৃত্ত হয়নি। মোজাফফরের দল ও মনিসিং-এর দলহীন কেন্দ্রীয় কমিটিও সরকারী দলের সাথে একযোগে জনগণের স্বার্থ ও অধিকারকে জলাঞ্জলি দিয়ে চালিয়েছে নির্লজ্জ দালালী। বাংলাদেশের পূর্ণবুক শূন্য করে দেবার আন্তর্জাতিক লুটপাট সমিতির স্থানীয় সহযোগী সেজে এরা যে অপরাধ করেছে, জনতার আদালতে অদূর ভবিষ্যতেই বিচার হবে তার।

জনগণের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে শাদদাদী তখতে তাউসে এবং তার আশেপাশে যারা ভীড় জমিয়েছে তারা ছাড়া দেশের আপামর জনসাধারণ, অনাহারে ক্লিষ্ট কৃষক-শ্রমিক জীবনের দুর্ভাগে দিশাহারা মধ্যবিত্ত মেহনতি কর্মচারী, গরীব পিতা-মাতার সন্তান ছাত্রসমাজ, সমাজতন্ত্রের নামে যেকোন ভাওতাবাজী রুখবার শপথে উজ্জীবিত তরুণ সমাজ এগিয়ে এসেছেন আজ নিজেদের মৌলিক অধিকার ও বাঁচার অধিকার নিশ্চিত করতে।

বিধ্বস্ত দেশে কিছু নেই কিছু নেই চীৎকার জুরে ক্ষমতাসীনের আর তাদের গণবিরোধী সহযোগীরা এ আট মাসে নিজেদের মোটা ভুড়িকে করেছে আরও স্ফীত। স্বাধীনতা সংগ্রামকালে যে শ্রমিক-কৃষক রক্ত দিয়েছে, আজ তাদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে এই জুলুমবাজেরা বাড়াচ্ছে নিজেদের ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স, সুখ, বিলাস ও বৈভব। স্বাধীনতার সুফল আর বিপুল সম্ভাবনাকে এরা নিজেরা লুটেপুটে শেষ করেছে এবং তুলে দিয়েছে নিজেদের প্রভুর বিরাট গালে। আজ শ্মশানে পরিণত এদেশকে নিয়ে তারা শুরু করেছে নয়া চক্রান্ত। বিক্ষুব্ধ জনগণকে বাগে রাখার জন্য তারা বাংলাদেশের বুকে সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধ ঘাঁটি বসাতে চাইছে, যেন সাম্রাজ্যবাদী প্রভুরা নিজেদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার ফাঁকে ফাঁকে এই তাঁবেদার সরকারকে টিকিয়ে রাখতে পারে তখতে তাউসে।

এ চক্রান্তের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংহত করা, জনগণের বাঁচার অধিকার নিশ্চিত করা, কৃষক-শ্রমিকের ভাত-কাপড়ের সমস্যা ঘুচানো, চালের দাম ৩০ টাকা, আটা ১০ টাকায় কমিয়ে আনার দাবী নিয়ে আজ জনগণের লড়াই শুরু হয়েছে। মওলানা ভাসানী ক্ষতাসীনদের বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, আমি এখনও নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে বিশ্বাসী। অথচ জনগণের ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য যে সোনার ছেলেরা বাবা-মার কোল, সুখের জীবন সব বিসর্জন দিয়ে কৃষক-শ্রমিকের পাশে দাঁড়িয়ে সংগ্রাম

করছে, তাদের উপর মুজিব সরকারের অত্যাচারের স্টিমরোলার চলছে, ঐসব তরুণদের হত্যা করা হচ্ছে নির্বিচারে। মুজিববাদের নামে এ যাবৎ ৩০ হাজারের বেশী লোক হত্যা করা হয়েছে। মওলানা ভাসানী হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন, ঐসব তরুণরা অস্ত্রের বলে গণবিপ্লব ঘটিয়ে সাচ্চা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে বদ্ধপরিকর। আজ যদি তাদের উপর, শ্রমিক-কৃষকের উপর মুজিবী ফ্যাসিবাদ বন্ধ না হয়, নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন যদি মুজিব সরকারের চৈতন্য না ঘটায় তবে এদেশে সংঘটিত হবে প্রচণ্ড শক্তিশালী সশস্ত্র গণবিপ্লব।

মওলানা ভাসানী আহ্বান জানিয়েছেন, 'শেষবারের মত বলছি, জনগণের কাছে কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমতা চাও। লুটেরাদের ঠেকাও। লুটপাট সমিতি ভেঙ্গে দাও। জনগণের কাছ থেকে নেওয়া প্রতিটি পয়সার হিসাব দাও। ভারতীয় সম্প্রসারণকে ঠেকাও। ঠেকাও রুশ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে। আমরা কারো গোলাম হয়ে বাঁচতে চাই না।

বাংলার বিদ্রোহী কণ্ঠের এ বজ্রকঠিন পথনির্দেশ অনুসরণ করে আগামী রবিবার সারাদেশে জাগবে অনশন বন্দী জনতা, ভাগ্যাহত লাঞ্ছিত মানুষ নেমে আসবে রাজপথে। আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করে সোচ্চার করবে বাঁচার দাবী। জনতার রুদ্ররোষ থেকে রেহাই নেই জালেম শাসকের।

ভারতীয় সৈন্য ছেয়ে যাচ্ছে

তারাই বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর অভ্যন্তরে হানাহানির সূত্রপাত ঘটিয়েছে

চট্টগ্রামে বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর সৈনিকদের সাথে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একটি প্রচণ্ড সশস্ত্র সংঘর্ষ ঘটে গেছে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টেও নৌ ও স্থল সেনাদলগুলোর মধ্যে তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছে বলে জানা গেছে।

চট্টগ্রামের সংঘর্ষে বেশ কিছু সংখ্যক সৈনিক ও নৌ-সেনা হতাহত হয়েছেন।

বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীগুলোকে পঙ্গু করে দেবার উদ্দেশ্যে সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীগুলোর মধ্যে ভারতীয় চরেরা স্বাধীনতার পর থেকেই কাজ করে চলেছে। এসব ঘটনা হচ্ছে তারই ফলশ্রুতি।

বাংলাদেশের বাহিনীগুলোর মধ্যে রেষারেষি জাগিয়ে তোলার ক্ষেত্রে সবকয়টি বাহিনীর সবকয়টি ইউনিটে ট্রেনিংদান ও প্রশাসনের দায়িত্বে নিযুক্ত ভারতীয় অফিসাররাই দায়ী বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

এসব উপদেষ্টা ও কর্তারা এক বাহিনীর কাছে অপর বাহিনী সম্পর্কে যা খুশী তাই মিথ্যা কাহিনী শুনিয়ে প্রতিটি বাহিনীকেই অপর বাহিনী সম্পর্কে ক্ষেপিয়ে তুলছে। বিমান বাহিনী এসব পাচ্ছে, তোমরা স্থলবাহিনী কিছুই পাচ্ছো না– অথবা তোমরা বিমান বাহিনী কিছু পাচ্ছো বলে স্থলবাহিনীর ব্যাটারা চক্রান্ত করছে– এ ধরনের কেচ্ছা ফেঁদে ভারতীয় অফিসারা তাদের কাজ উদ্ধার করে নিয়েছে।

অথচ বাস্তব সত্য ব্যাপারটি হলো, বাংলাদেশের স্থল, নৌ ও বিমান এই তিনটি বাহিনীই যারপরনাই অসুবিধার মধ্যে কাজ করে চলেছেন। বরং বিমানবাহিনীর আমলা অফিসারদিগকে দিয়ে বিমানবাহিনীর বৈমানিক ও অধস্থন কর্মচারীদের উপর অমর্যাদাকর হীন প্রশাসন চালানোর জন্য ভারতীয় উপদেষ্টারা পরোক্ষভাবে অফিসারদের মাথায় তেল মাখছেন।

বাংলাদেশের বাহিনী তিনটির অভ্যন্তরে ও পরস্পরের মধ্যে যে রেষারেষি চলছে ভারতীয় উপদেষ্টারা বাংলাদেশ সরকারের কর্মকর্তাদের কাছে তা জানিয়েছেন।

সরকারের ধারণা হলো, তিনটি বাহিনীর মধ্যে মোটামুটিভাবে একটি বিদ্রোহাত্মক অবস্থা বিরাজ করছে– যা যে কোন সময় বিস্ফোরণের রূপ নিতে পারে।

এ পরিস্থিতিকে সামাল দেবার জন্য কি করা দরকার তাও ভারতীয় উপদেষ্টারা বাতলে দিচ্ছেন সরকারকে।

দেশে একদিকে আন্দোলনের জোয়ার অন্যদিকে নিজ সেনাবাহিনীতে 'বিপজ্জনক' রেষারেষির পরিস্থিতিতে ভারতীয় সৈন্যদের এনে দেশে রাখা বুদ্ধিমানের কাজ হবে বলে ভারতীয় উপদেষ্টারা মত দিয়েছেন।

বশংবদ বাংলাদেশ সরকারও তদানুযায়ী ভারতীয় সৈন্যদের আসতে আহ্বান জানিয়েছে।

ফলে যশোর ক্যান্টনমেন্ট আবার ভরে গেছে ভারতীয় সৈন্যে। ময়মনসিংহ শহরে তাবু ফেলে ভারতীয় সৈন্যরা অবস্থান করছে। চট্টগ্রামে আরও নতুন সৈন্য আমদানী করা হয়েছে। বিশেষ করে ঢাকায় বাংলাদেশ বাহিনীর ভেক ধরে বহু ভারতীয় সৈন্য বিভিন্ন স্থানে আস্তানা করেছে।

ধারণা করা হচ্ছে, যশোরে ২৫ হাজার, চট্টগ্রামে ১০ হাজার, ঢাকায় ৫ হাজার, ময়মনসিংহে ২ হাজার ভারতীয় সৈন্য এসে পড়েছে। অন্যান্য জেলার খবর এখনও পাওয়া যায়নি। তবে সিলেট ও কুমিল্লা সীমান্ত পথে ভারতীয় সামরিক যানবাহনের আনাগোনা বেশীমাত্রায় পরিলক্ষিত হয়েছে।

৮ মাসের খতিয়ান থেকে
জবাব চাই নিকাশ চাই

১। কোলকাতা থাকাকালে বাংলাদেশ সরকারের হাতে সঞ্চিত অর্থের ব্যয়ের হিসাব দেখাও।

২। ভারত কর্তৃক লুণ্ঠিত ২৫ হাজার কোটি টাকার সম্পদ ফিরিয়ে আনার কি ব্যবস্থা হয়েছে।

৩। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নেবার জন্য দায়ী ভারতীয় সৈন্যদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে কি!

৪। চট্টগ্রাম বন্দরের সমুদ্র এলাকায় রাশিয়া ভূমধ্যসাগরের উপকূলের মত গোপন সামরিক ঘাঁটি গড়ে তুলছে কেন?

৫। চালনা বন্দর আমেরিকার কাছে পত্তন দেয়া হচ্ছে কেন?

৬। ৫ হাজার মানুষ অনাহারে মরলো কেন!

৭। ৫০ হাজার নিরপরাধ মানুষকে মুজিববাদ কায়েমের নামে হত্যা করা হলো কেন?

৮। সীমান্ত বাণিজ্যের নামে সীমান্ত এলাকায় ১০ মাইল করে দেশের ৫৪০০০ বর্গমাইল আয়তনের চার ভাগের একভাগ ১৪০০০ বর্গমাইল ভারতের মুখ গহ্বরে তুলে দেয়া হলো কেন?

৯। কোন অধিকারে তাজউদ্দিন সরকার বাংলাদেশের মুদ্রমান কমিয়ে ছিল?

১০। বাংলাদেশের টাকার মান ভারতীয় টাকার অর্ধেকে পৌঁছালো কেন?

১১। রাশিয়া পাকিস্তান আমলের পাওনা বাংলাদেশের ঘাড়ে পা রেখে আদায় করলো কেন?

১২। জাতীয় শিপিং কর্পোরেশনের কাঁধে ভারতের পছন্দসই লোক চেপেছে কেন?

১৩। বাংলার দূত নামক জাহাজে ভূত চেপে চতুর্থ ইঞ্জিনিয়ার বাঙ্গালী তরুণের মাথার উপর ইঞ্জিনের টুকরা খসিয়ে ফেললো–ভারতীয় ইঞ্জিনিয়াররা কি এর জন্য দায়ী নয়?

১৪। বাংলাদেশ থেকে চুরি করে নেওয়া তিনটি জাহাজ ভারত থেকে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে না কেন?

১৫। ডাকোটা বিমান দুর্ঘটনার জন্য দায়ী ভারতীয়দের শাস্তি হলো না কেন?

১৬। বাংলাদেশ বিমানের বিরুদ্ধে চক্রান্ত কারা চালাচ্ছে, মন্ত্রী তা খুলে বললেন না কেন?

১৭। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী পঙ্গু কেন?

১৮। খাদ্য আন্দোলন দমনের জন্য আবার ভারতীয় সৈন্য আমদানী করা হয়েছে কেন?

১৯। পার্বত্য চট্টগ্রামের পার্বত্যবাসী নিরীহ মানুষদের কেন হত্যা করা হলো?

২০। রাজশাহীতে কেন বহু গ্রাম পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে?

২১। বাংলাদেশে কেন ২৫ হাজার ভারতীয় গুপ্তচর চরে বেড়াচ্ছে?

২২। কেন মেঘালয় সীমান্তে ভারতীয় সৈন্যরা বাংলাদেশের সীমান্ত খুটি তুলে ফেলেছে?

২৩। ৬ মাসের খাদ্য মজুত আছে বলে সরকার ভাওতা দিল কেন?

২৪। আজ দুর্ভিক্ষ লেগেছে, তার জন্য দায়ী কে?

২৫। ১২০ টাকা মণ দরে চাউল কিনে খাবার সামর্থ এদেশের শতকরা ক'জন মানুষের আছে?

২৬। কাফনের অভাবে বিনা কাপড়ে লাশ দাফন হচ্ছে কেন?

২৭। মানুষ নিজেদের সন্তান বিক্রি করছে, আত্মহত্যা করছে, অনাহারের তাড়নায় সোনার সংসার জ্বলে ছাই হচ্ছে, এর জন্য দায়ী কি সরকার নয়?

২৮। বাংলাদেশের শাসনতন্ত্র আগষ্টে দেবার কথা কি ছিল না?

২৯। গণপরিষদ নামীয় বস্তুটির কি অধিকার আছে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের– যার অধিকাংশ সদস্য জনতার আদালতে দুর্নীতিবাজ বলে আখ্যায়িত।

৩০। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মার্কিন চক্রান্ত জোটে বাংলাদেশ অংশ নিচ্ছে কেন?

৩১। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে কি স্বতন্ত্র কিছু নেই? ভারতের পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করে দেশের সর্বনাশ করা হচ্ছে কেন?

৩২। সরকারী দলের জেলা থেকে ইউনিয়ন কাঠামো অবধি নেতার মধ্যে শতকরা ৪০ জন পাক আমলের দালাল কেন?

৩৩। পাটের নিম্নতম দর ঘোষণা না করে কেন হাজার হাজার মণ পাট ভারতে পাচার করা হলো?

৩৪। চালের মণ ১২০ টাকায় পৌঁছালো কেন?

১ কোটি লোক অনাহারে মারা যাবে

'ন্যাপ' প্রধান মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী দেশে একটি ভয়াবহ আসন্ন দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাবে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন যে, সরকার অনতিবিলম্বে ইহা প্রতিরোধের কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন না করলে এক কোটি লোক না খেয়ে মারা যাবে। দুর্ভিক্ষের মারাত্মক পরিণতি থেকে জাতিকে রক্ষার জন্য তিনি বর্তমান সরকার ভেঙ্গে অবিলম্বে সর্বদলীয় ভিত্তিতে একটি সরকার গঠনের পরামর্শ দেন।

তিনি বলেন যে, এই ব্যবস্থা কার্যকরী করা হলে বাংলদেশকে সীমাহীন সমস্যার কবল থেকে উদ্ধার করা সম্ভব হবে।

তিনি উল্লেখ করেন আগামী মাঘ মাসের পূর্বে কৃষকের ঘরে রবি শস্য উঠার কোন প্রকার সম্ভাবনা নেই, এ বৎসরে পানির অভাবে অথবা পলি পড়ায় আমন ধানের ক্ষতি হয়েছে খুব তাই বাংলার ঘরে ঘরে আজ যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে তার ভয়াবহ পরিণতি মারাত্মক আকার ধারণ করবে।

বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ও বাংলাদেশ কৃষক সমিতির আহ্বায়ক মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর আহ্বানে

দুর্ভিক্ষ ও দুর্নীতি রোধের জন্য সর্বদলীয় সরকার গঠনের আহ্বান–

বাংলাদেশের বর্তমান নিদারুণ খাদ্য সংকট, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি এবং ভয়াবহ দুর্ভিক্ষাবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশে একটি ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচী গ্রহণকল্পে ২৬শে আগস্ট বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকায় অনুষ্ঠিত উক্ত সর্বদলীয় সম্মেলনে মওলানা ভাসানী সভাপতিত্ব করেন এবং ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, বাংলা জাতীয় লীগ, শ্রমিক-কৃষক সমাজবাদী দল, বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি (লেনিনবাদী), বাংলার কমিউনিষ্ট পার্টি, বাংলাদেশ জাতীয় লীগ (আতাউর রহমান খান গ্রুপ), সোসালিষ্ট প্রভৃতি রাজনৈতিক দল এবং বাংলাদেশ কৃষক সমিতি, বাংলা শ্রমিক ফেডারেশন, বাংলা মজদুর ফেডারেশন, সংযুক্ত শ্রমিক ফেডারেশন, বাংলাদেশ বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন, বাংলা ছাত্রলীগ, ফরওয়ার্ড ষ্টুডেন্ট ব্লক, সমাজবাদী ছাত্র জোট, গণতান্ত্রিক যুবলীগ ও বাংলাদেশ যুব ফেডারেশন প্রভৃতি গণসংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ যোগদান করেন। দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর উক্ত সম্মেলনে বাংলাদেশে বিরাজমান বর্তমান দুর্ভিক্ষাবস্থায় ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীকে আহ্বায়ক নির্বাচিত করে সর্বসম্মতিক্রমে 'সর্বদলীয় খাদ্য সংগ্রাম কমিটি' গঠন করা হয়। উক্ত সর্বদলীয় 'খাদ্য সংগ্রাম কমিটি' সম্মেলনে যোগদানকারী ৭টি রাজনৈতিক দল থেকে দুইজন করে এবং ১২টি গণসংগঠন থেকে একজন করে প্রতিনিধি গ্রহণ করা হয়। সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামী সেপ্টেম্বরে কমিটির এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে এবং উক্ত বৈঠক আন্দোলনের পূর্ণ কার্যসূচী গ্রহণ করা হবে। আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক আরো অন্যান্য সংগঠনের প্রতিনিধিদের কো-অপ্ট করার অধিকার এই কমিটির থাকবে বলে সম্মেলনে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সম্মেলনে আরো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, প্রয়োজনবোধে আগামী কিছুদিনের মধ্যে দেশের সামগ্রিক অবস্থা পর্যালোচনা করে একটি পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচী গ্রহণের জন্য এই কমিটি আরো ব্যাপক ভিত্তিক সর্বদলীয় জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

মওলানা ভাসানীর আগামী ৩রা সেপ্টেম্বর সারা দেশব্যাপী জনসভা ও ভুখা মিছিলের যে কর্মসূচী ঘোষণা করেছেন সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী সকল রাজনৈতিক দল ও গণসংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ উক্ত কর্মসূচীকে সফল করে তোলার জন্য সহযোগিতা করার কথা ঘোষণা করেছেন।

সমাজতান্ত্রিক দেশের সাথে বাণিজ্যে অন্তর্ঘাত

পাটকল কর্পোরেশনের আমলারা লক্ষ লক্ষ টাকার বৈদেশিক মুদ্রা পকেটস্থ করছে

পাটজাত সামগ্রী রপ্তানী, বিক্রয় ও রপ্তানীকৃত পাট সামগ্রীর দর নির্ধারণের ক্ষমতাপ্রাপ্ত জুট মিলস কর্পোরেশনের শীর্ষ ব্যক্তিদের ভাগ্য রাতারাতি বদলাচ্ছে, বিদেশী ব্যাংকে বৈদেশিক মুদ্রায় তাদের পুঁজি বাড়ছে।

গত জুলাই মাসে কর্পোরেশন ভারতীয় দরের চাইতে শতকরা ৮ ভাগ ও বাংলাদেশের জন্য ধার্যকৃত দরের শতকরা ১৪ ভাগ কমে সুদানের কাছে পাট সামগ্রী বিক্রি করেছে। এই একটি লেনদেনে ১৫ লক্ষ টাকার বৈদেশিক মুদ্রা হারিয়েছে বাংলাদেশ। উক্ত কর্পোরেশনের যে অফিসাররা দর বাঁধেন, সেই একই অফিসাররা রপ্তানী বিক্রয় সম্পন্ন করেন, তাই তাদের দুর্নীতি সীমাহীন। বোধগম্য কারণেই তারা দর কমিয়ে নিজেদের পছন্দসই বিদেশী ক্রেতা যোগাড় করেন। ধার্যকৃত দর ও তাদের বিক্রয় দরের মধ্যে যে ব্যবধান তাই হলো এদের পকেটে পুরার বস্তু। বিশেষতঃ টেণ্ডার লেন-দেনের ক্ষেত্রে এ কেলেঙ্কারী সবচাইতে মারাত্মক হয়ে ওঠে। সুদানের সাথে টেণ্ডার কারবারে ১৪ শতাংশ বা তার অংশবিশেষ ঐ সব দুর্নীতিপরায়ণ আমলার পকেটস্থ হয়েছে যারা টেণ্ডারে পৃথক পৃথক মিলকে প্রতিযোগিতা করতে দেয়নি। পৃথক পৃথক মিলকে টেণ্ডার দিতে দিলে কোন অবস্থানেই তারা ইপিসি দরের নীচে নামতে পারতো না, ফলে ঐ ১৪ শতাংশ গচ্ছা এদেশকে দিতে হতে না।

আর মজার ব্যাপার হচ্ছে শুটকি প্রহরার দায়িত্ব– পিআইডিসি ও বিআইডিসি, পাট কল বিভাগের সাবেক কর্তা ও বর্তমান জুট মিল কর্পোরেশনের বিশেষ অধিকার ম্যানেজার বিক্রয় চুক্তি সম্পাদন অফিস খোলার জন্য নিউইয়র্ক, লন্ডন ও মধ্যপ্রাচ্য সফরে গেছেন। এ ব্যক্তিদ্বয় আইয়ুব-মোনেমী আমলে পিআইডিসি জুট মিলগুলোর ব্যর্থতা ও দুর্নীতির জন্য দায়ী বলে অভিযোগ রয়েছে।

দেশের বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের প্রধানতম সংস্থায় এদের নিযুক্ত অত্যাশ্চর্য ও বিস্ময়কর। সে যাই হোক বিদেশে কর্পোরেশনের যে নয়া অফিস খোলা হচ্ছে তা কি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের চোখে ধূলা দিয়ে দর কেলেঙ্কারীর মাধ্যমে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার ব্যক্তিগত আয়কে নিরাপদে রাখার ব্যবস্থার জন্য নয় কি?

এই দুর্নীতিবাজ আমলারা সমাজতান্ত্রিক দেশের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য লেনদেন ঘাটতি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নির্ধারিত দর অপেক্ষা শতকরা ২৩ ভাগ বেশী দর দাবী করছে। কারণ, ঐসব দেশের সাথে বাণিজ্যে উপরিবর্ণিত কায়দায় দুর্নীতি চলে না, ফলে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো বাংলাদেশ থেকে পাটজাত দ্রব্য ক্রয়ের ইচ্ছা সত্ত্বেও পিছু হটছে। এইভাবে যদি সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো তাদের পণ্য তুলা, সার, কাঁচালোহা, ইস্পাতের কড়িবরগা, যন্ত্রপাতি, জ্বালানী ইত্যাদির দর বাড়িয়ে দেয় যা একান্তই সম্ভব, তাহলে এর জন্য দায়ী হবে কে?

সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ থেকে বাংলাদেশ যে কেনাকাটা করে তার মাত্র শতকরা ২০ থেকে ২৫ ভাগ মূল্য পাটজাত সামগ্রীর মূল্য থেকে শোধ করা হয়। পাটের ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো বীতশ্রদ্ধ হয়ে যদি তাদের পণ্যগুলোর দাম বাড়ায় তবে কি বাকী ৭৫/৮০ ভাগ আমদানীকৃত পণ্যের জন্য বাংলাদেশকে অতিরিক্ত বৈদেশিক মুদ্রা গচ্ছা দিতে হবে না?

এদেরকে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গড়ে তোলার জন্য নিয়োগ করা হয়েছে না সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির সম্ভাবনা ধ্বংসের জন্য নিয়োগ করা হয়েছে– সরকার জবাব দেবেন কি?

মস্কোপন্থী ন্যাপ

বাংলাদেশে জামাতের প্রেতাত্মা

ইসলামের নামে জামাতে ইসলাম এবং সমাজতন্ত্রের নামে মস্কোপন্থী ন্যাপের কার্যকলাপের বিশেষ মিল লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য কিছু যে গড়মিল নেই তা নয়। জামাত আর মস্কো ন্যাপের লক্ষ্য আর উদ্দেশ্য যে এক তা তাদের কার্যকলাপ দেখলে কারো বুঝতে

অসুবিধা হয় না যে, এই সুখী এবং সম্পদশালী রাজনৈতিক দল দু'টি একই ধাতে গড়া। জামাত নামাবলী গায়ে দিয়েছিল ইসলামের আর মস্কো ন্যাপ নামাবলী গায়ে দিয়েছে সমাজতন্ত্রের। কেউ পশ্চিমা পুঁজিপতিদের শোষণের প্রতিবাদ করলে জামাত প্রশ্ন তুলতো পাকিস্তানের সংস্কৃতির। আর মারোয়াড়ী পুঁজিপতিদের চোরাচালানীর কেউ প্রতিবাদ করলে মস্কো ন্যাপ প্রশ্ন তুলছে ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রীর। জামাত সবসময়েই চেষ্টা করছে পশ্চিম পাকিস্তানী পুঁজিপতিদের পূর্ব বাংলায় আমদানী করে পাঞ্জাবীদের শোষণ পোক্ত করার। মস্কো ন্যাপ চেষ্টা করছে বাংলাদেশে ভারতীয় মাড়োয়ারীদের আমদানী করে ভারতীয় পুঁজিপতিদের শোষণ পোক্ত করার। (প্রমাণ ঃ মস্কো ন্যাপের গত জাতীয় সম্মেলন ১৯৬৪ সালের শত্রু সম্পত্তি আইন বাতিল করার দাবী তুলেছে। এই আইন বাতিল করলে যারা লাভবান হবে তাদের শতকরা ৯১ জন ভারতীয় মাড়োয়ারী। এতে ভারতীয় পুঁজিপতি মাড়োয়ারীরা শুধু আর্থিক লাভবানই হবে না, এরা স্থায়ীভাবে শোষণ করার জন্য বাংলাদেশে ফিরে আসতে পারবে) এর নাম মস্কো ন্যাপের সমাজতন্ত্র। অর্থাৎ মস্কো ন্যাপের সমাজতন্ত্রের অপর নাম মাড়োয়ারী সমাজতন্ত্র। যেমন জামাতে ইসলামের অপর নাম পাঞ্জাবী ইসলাম। অধ্যাপক প্রধান জামাতের দলীয় কাজের জন্য ছিল যেমন অনন্ত ভাণ্ডার, অধ্যাপক প্রধান মস্কো ন্যাপের পার্টি গড়ার খরচ দেখলে মনে হয় যেন এদেরও আছে অনন্ত ভাণ্ডার। জামাতের কাজ ছিল ইসলাম ও সমাজতন্ত্রের অপব্যাখ্যা করা। মস্কো ন্যাপের কাজ তেমনি সমাজতন্ত্র ও ইসলামের অপব্যাখ্যা করা। গরবানী পার্টির কর্মীদেরকে বলতো কম্যুনিস্ট। ভাসানী ন্যাপ সমাজতন্ত্রের আসল ব্যাখ্যা দেওয়ায় মস্কো ন্যাপ ভাসানীপন্থী কর্মীদের বলছে সাম্প্রদায়িক। এমনি বহু ধরনের ভণ্ডামীর মিল এই দুই দলের মধ্যে আছে। তবে মাত্র একটি জায়গায় এদের গড়মিল লক্ষ্য করা যায়। তা হচ্ছে– জামাত পাকিস্তানের সমস্ত সরকারকে গোপনে করেছে সমর্থন কিন্তু প্রকাশ্যে করেছে বিরুদ্ধাচারণের অভিনয়। আর মস্কো ন্যাপ বাংলাদেশ সরকারকে প্রকাশ্যে করছে সমর্থনের অভিনয় কিন্তু গোপনে করছে বিরুদ্ধাচারণ।

কিন্তু ইয়াহিয়া নাটকের শেষ অংশে জামাত প্রকাশ্যে ইয়াহিয়ার ঘাড়ে সওয়ার হয়ে দেশপ্রেমিক বাঙ্গালীদের গণহত্যার উস্কানী দিয়েছিল। মস্কো ন্যাপ বঙ্গ-পিতার ঘাড়ে সওয়ার হয়ে কোন উস্কানী দিচ্ছেন তা অবশ্য আলিমুল গায়েবই বলতে পারেন।

কাপড়ের বাজারে আগুন

নেপথ্য কাহিনী শুনুন

কাপড়ের বাজারে আগুন লাগার নেপথ্য কাহিনী অনুসন্ধান করে জানা গেছে যে, বাংলাদেশ সরকার সুতামিল জতীয়করণ করে খোলাবাজারে সুতা সরবরাহ বন্ধ করার পরেই সমগ্র কারবারটি কালোবাজারে পরিণত হয়েছে।

এই কালোবাজারী প্রতিরোধের জন্য সরকার যে সব কমিটি বানিয়েছেন তাও দুর্নীতির সাবেক বুনটের সাথে গিরো বেঁধে এমন বজ্রআটুনি টেনেছেন যে তার ধকলে বস্ত্র ক্রেতা জনসাধারণের নাভিশ্বাস উঠে গেছে।

ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থা (বিসিক) হস্তচালিত তাঁত ও ক্ষুদ্র বয়ন কলগুলোর সুতো যোগানোর দায়িত্ব নিয়েছে। এ সুযোগে বিসিক কর্মচারীরা এবং এতদসংশ্লিষ্ট অন্যান্য কমিটি দিনকে রাত রাতকে দিন বানিয়ে পাঁচ টাকার সুতা ৭ হাত ঘুরাবার ফিকির আঞ্জাম করে তার দাম নিয়ে তুলেছে পঁচিশ টাকায়।

এখন শুনুন এদের কর্মকাণ্ডের কায়দাগুলো কেমন ঃ

প্রকৃত তাঁতীরা সুতো পেলে তা দিয়ে কাপড় বানিয়ে বাজারে ছাড়বে, তাই প্রকৃত তাঁতী কারা এবং তাদের চালু তাঁতের সংখ্যা

বিসিক কর্মচারিরা পাঁচ টাকার সুতো ৭ হাত ঘুরিয়ে তার দাম নিয়ে তুলেছে পঁচিশ টাকায় ভূত সুতোয় নয় সরিষায়! সুতো ভারতে খোলা বাজারে বিক্রি করলে অন্ততঃপক্ষে দ্বিগুণ লাভ দাড়ায়

নিরূপণের জন্য বিসিক কর্মচারীরা গ্রামে তদন্তে যায়। কিন্তু তারা গিয়ে দুর্নীতিবাজ রিলিফ মেম্বর ও চেয়ারম্যানদের বাড়ীতে অতিথি হয়ে বসেন। মেম্বর সাব যা বলে দেন তাই লিখে তারা ফেরত আসেন। এসব কর্মচারীরা 'ভুয়া নামে তাঁত চালু রয়েছে' দেখিয়ে সুতো বরাদ্দের টোকেন দেয়। আর এ সুতো চলে যায় কালোবাজারে। প্রকৃত তাঁতী সারা সপ্তাহের মধ্যে মাত্র এক দু'দিন তাঁত চালাবার সুতো হাতে পেলেও, বাকী সুতো তাকে কিনতে হচ্ছে অনেক বেশী দামে।

চট্টগ্রামে যে ঘটনা ঘটছে তা অত্যাশ্চর্য। ঘুষ খেয়ে ভুয়া দামে টোকেন তো দেয়া হচ্ছেই, এমনকি ২/৩ বৎসরের শিশুর নামেও তাঁত দেখানো হয়েছে। এসব দ্বিতীয়, তৃতীয় জরীপের ও তদন্তের বেলায়ও ঘটছে। সুতরাং ভূত সুতোয় নয়, সরিষায়। চট্টগ্রামে শতকরা ৯৫টি তাঁত ভুয়া দেখানো হয়েছে বলে সরেজমিনে খবর নিয়ে জানা গেছে। আর এর ফলে দেশের অন্যান্য স্থানের কালোবাজারীরা চট্টগ্রাম থেকে সুতো সংগ্রহ করে কয়েক গুণ বেশী দামে বিভিন্ন জেলায় তাঁতীদের কাছে সরবরাহ করছে। এ দুর্নীতির মূল জন্মদাতা হিসাবে যে চৌধুরী সাহেবরা আছেন, তাদের বাসায় গভীর রাতে অসাধু ব্যবসায়ীরা উপঢৌকনসহ ধর্না দেয়।

এবার সুতো বিলি বন্টনের ফিকির দেখুন ঃ

হস্তচালিত তাঁত সুবিধাদি বন্টন কমিটি নামে যে কমিটি রয়েছে, তার কীর্ত্তি হলো সেক্রেটারি সাহেবেরই কীর্ত্তি। প্রকৃত তাঁতীরা টোকেন জমা দিয়ে এক সপ্তাহ পরেও সুতো পায় না। অথচ যারা কালোবাজীরাতে লিপ্ত সে সব ভুয়া টোকেনধারীরা টোকেন জমা দিয়ে পরের দিনই সুতো পেয়ে যাচ্ছে। এটা হলো কালোবাজারীদের বাজার ঠিক রাখার জন্য আমলাতন্ত্রের সুদক্ষ সহযোগিতা।

তাঁতের সংখ্যার উপর নির্ভর করে সুতো দেওয়া হয়– কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, সুতোর পরিমাণ ঘুষের অঙ্কের উপর নির্ভর করে।

তাঁতীদের যে টোকেন দেয়া হয় তাতে তাঁতের সংখ্যা লিখবার ঘর নেই, অথচ অফিসে যে ডুপ্লিকেট বা নকল থাকে তাতে তাঁতের সংখ্যা লিখবার রেকর্ডে বেশী সংখ্যক তাঁত দেখিয়ে তাঁতীদের নেওয়া টোকেনের এক কোণে বেসরকারী "টোকা"র মত কম তাঁত লিখে। এই দুইটি সংখ্যার মধ্যকার ব্যবধান সংখ্যার তাঁতের জন্য বরাদ্দ সুতোগুলো বন্টন কর্মচারীরা খুব সহজেই মেরে দিচ্ছে।

বিসিক যত সংখ্যক তাঁত, বয়ন কারখানা ও বয়ন রং কারখানাকে সুতো দিচ্ছে, তা যদি সত্যি সত্যি থাকতো, তাহলে কাপড়ের উৎপাদন কমপক্ষে ১০০ গুণ বৃদ্ধি পেতো। তাই নিঃসন্দেহে বলা চলে, তাঁত হয়তো রয়েছে একটি সে তাঁতের জন্য টোকেন দিয়ে কর্মচারীরা তাদের পছন্দসই লোকের নামে ৯৯ খানাই ভুয়া সুতোর পারমিট দিয়ে দেয়।

কালোবাজারীরা হয়ত তাঁতের ঘর ও বিকল তাঁতের কাঠ ইত্যাদি দেখাতে পারবে, কিন্তু কত কিস্তি সুতো নেবার পরও তাঁত চলছেন না সেটা খুঁজে বের করলে সব রহস্য

দিবালোকের মত পরিষ্কার হয়ে যাবে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, প্রকৃত তাঁতীরা যদি সরকারী কেতাবে লেখা সংখ্যার শতকরা এক ভাগ হয়ে থাকে তাহলে দেশে সুতোর যোগান ও সরবরাহ বেড়ে দর কমে যাওয়ার কথা। তাও হচ্ছে না।

সুতো ব্যবসার সাথে জড়িত লোকেরা সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, কিছু সুতো কালবাজারে এখানো চলছে। কিন্তু বিপুল পরিমাণ সুতো বাইরে পাচার হয়ে যাচ্ছে। কারণ, এখানে সরকারী দরে পাওয়া সুতো ভারতে খোলাবাজারে বিক্রি করলে অন্ততপক্ষে দ্বিগুণ লাভ দাঁড়ায়।

পাক আমলে যে সব ব্যক্তি নিজ ঘরে রাজাকার, মোজাহিদদের বিরানী পোলাও দ্বারা আপ্যায়িত করেছে, তারাই এখন রাজাকাররা তাদের তাঁত পুড়িয়ে দিয়েছে বলে আবদার জানিয়ে এবং টু-পাইস খরচ করে বিসিক থেকে সুতোর টোকেন বাগিয়ে নিচ্ছে।

দেশব্যাপী এ খেল অপ্রতিহত ধারায় চলছে। এর ফলেই কাপড়ের দাম বেড়ে জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছে এবং গেছে।

কনভেনশন লীগার আওয়ামী লীগার

রংপুরে সাবেক কনভেনশন মুসলিম লীগের এক কুখ্যাত পাণ্ডা এখন আওয়ামী লীগের জান-কবুল ভক্ত। তাই মুজিববাহিনীর লেঠেল, ভাতিজা মুক্তিযুদ্ধে মারা গেছে সুবাদে এই শেখ আকবর দালালীর অভিযোগ তো এড়িয়ে গেছেনই, অধিকন্তু পরিত্যক্ত সম্পত্তিগুলো আরামে দখল করে ভোগ করতে শুরু করেছে। পাকিস্তানের করাচীতে চলে যাওয়া ব্যক্তির মুখরোচক রেষ্টুরেন্ট, রংপুরে ২১৭৯ হোণ্ডা মোটর সাইকেল, নাসের পাঞ্জাবীর অফিস, সবই তার দখলে। এসব ঘর ও দোকানপাটের মূল্যবান জিনিষপত্র গায়েব করে লোকটি অজস্র অর্থ কামাচ্ছে।

দুর্নীতি দমন বিভাগের গোচরীভূত করার পরেও এ ঘটনার বিহিত হয়েছে কিনা জানা যায়নি।

হক-কথা

১৫ই ভাদ্র, শুক্রবার

অনশন বন্দী হে জনতা

অনাহারে মৃত্যুবরণের মূর্তিমান বিভীষিকা এসে দাঁড়িয়েছে অনশনের বন্দীশালায় আবদ্ধ এদেশের ৭ কোটি দরিদ্র সর্বহারা মানুষের শিয়রে। অনাহারে-বুভুক্ষার সর্বগ্রাসী অনল পুড়িয়ে দিচ্ছে মানুষের মনন, মানসিকতার সুকুমারবৃত্তি আর জীবন নিয়ে বেঁচে থাকার শাশ্বত অধিকারকে। রক্তনদী সাঁতরিয়ে স্বাধীনতার উপকূলে পৌঁছেও মানুষ আবার পরাধীন হয়েছে, অন্নের ধান্ধায়। এ কঠিন শৃঙ্খল টুটাতে হবে। জনতার ভাগ্যের চাবিকাঠি নিয়ে ক্ষমতার মসনদে সমাসীন শাদ্দাদদের বুঝিয়ে দিতে হবে, অনাহারে মানুষ হত্যা করে তারা বিচার এড়াতে পারবে না।

চালের দর ১০০ টাকার মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। দেশের প্রায় সর্বত্র আড়াই টাকা দিয়ে এক সের চাল কেনার, আর তা দিয়ে উদরপূর্তির ক্ষমতা এদেশের শতকরা ৮০ জন মানুষের নেই। দেশের এই শতকরা ৮০ জন মানুষ অনাহারে দিন কাটানো আর মুখে রক্তবমি তুলে মৃত্যুবরণ করা ছাড়া আর কোন পথ খুঁজে পাচ্ছে না।

দেশের ধনিক-বণিক শ্রেণীকে মানুষের প্রাণ হরণের মৌসুরী পাট্টা দিয়ে যে ক্ষমতাসীনরা দলের অসৎ লোকদের খেদমত করছে, অনাহার, রোগ-জরায় মৃত্যুর মিছিলকে উপেক্ষা করে যারা তাদের জগন্নাথকে ৪২ লাখ টাকায় বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়ে সপরিবারে পেটের পাথর সরাতে পাঠাচ্ছে বিদেশে, যারা লুটপাট সমিতি গড়ে চৌদ্দ পুরুষের খরচ

উদ্ধার করছে ও টাকার অঙ্ক লক্ষ থেকে কোটিতে পৌঁছানোর জন্য যারা সরকারী ক্ষমতার অপব্যবহার করছে– সমাজতন্ত্রের বুলির আড়ালে চরম পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটাচ্ছে, তাদের সুখের স্বর্গে ত্রাসের আতঙ্ক সৃষ্টি করে আজ জনতাকে হুঙ্কার তুলতে হবে জবাব দাও বেঈমান।

দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে না খেয়ে মানুষ মরার খবর আসছে প্রত্যহ। সরকারী প্রচারযন্ত্র আর আহ্লাদে আটখান ভাবের নবাব মন্ত্রীরা জোরসে করতালি বাজিয়ে জনতার মুমূর্ষু চীৎকারকে ধামাচাপা দিচ্ছে। এ অমানুষিক শাসনলীলার নজীর জার শাসিত রাশিয়া, সামন্ত শাসিত চীন ছাড়া আর কোথাও খুঁজে পাওয়া ভার।

জনগণের কাঁধে ভর করে, হাজারো গাল ভরা বুলি শুনিয়ে এই শাদ্দাদরা বেহেশতে উঠেছে। বুভুক্ষায় যখন মানুষ দিশেহারা, অনাহারে শিশু বৃদ্ধ-নারী-পুরুষের আহাজারি উঠেছে তখন এই বেহায়ারা তাদের আজব নেতার নামে আজববাদ কায়েমের নির্লজ্জ অভিযানে নেমে জনগণের দাবী-দাওয়া উত্থাপনের পথ রোধ করে একদলীয় ফ্যাসিস্ট শাসন কায়েমের জন্য লিপ্ত হয়েছে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রে। কাজীর কেতাব আর গোয়ালের দশার মধ্যে দিন রাতের মতন ব্যবধান– এদের শাসনেই প্রকট হয়ে উঠেছে।

দেশের বিভিন্ন স্থানে এ যাবত কমপক্ষে পাঁচ হাজার লোক মারা গেছে অনাহারে। অর্ধাহারে ধুঁকে মৃত্যুর কঠিন যন্ত্রণা যে মানুষ একবার সংবেদনশীল হৃদয় নিয়ে না ভাববে আজ এ পরিস্থিতিতে তাদের শাদ্দাদের দোসর ছাড়া কিছু বলার উপমেয় নেই।

মৃত্যুর~ শোচনীয় কঠিন মৃত্যুর এ প্লাবনকে রোধ করতে হবে আজ, নইলে ৭ মাসে দেশকে উচ্ছন্নে দেবার কৃতিত্বমানেরা তাদের খেল বন্ধ করবে না। নির্যাতত জনতার ক্ষুব্ধ মিছিলের পুরোভাগ থেকে জননেতা মওলানা ভাসানী দলমত নির্বিশেষে সবার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন, গণহত্যার নবতর ষড়যন্ত্র রুখতে। ৩রা সেপ্টেম্বর দেশব্যাপী সংগঠিত হবে মুমূর্ষু নিরন্ন মানুষের বাঁচার দাবী সোচ্চার করার ভুখা মিছিল। দেশবাসীর প্রতি মুমূর্ষু মানুষগুলোর পক্ষ থেকে আমরাও দাবী জানাচ্ছি, ৩রা সেপ্টেম্বরের মানবিক আন্দোলনে যোগ দিয়ে কুম্ভকর্ণের নিদ্রা টুটিয়ে আওয়াজ তুলুন— অনাহারে হত্যার ষড়যন্ত্র–রুখবোই। অনশনবন্দী জনতা অনশনের অন্ধ কারা ভাঙ্গতে না পারলে তাদের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের সকল ভবিষ্যত পথ থেকে যাবে চিররুদ্ধ।

সরকারী খাদ্য গুদাম শূন্য

দুর্ভিক্ষ লেগেছে

সরকারী গুদামগুলোর বুক খাঁ খাঁ করছে, সঞ্চিত খাদ্যের সরকারী মজুত ফুরিয়ে গেছে। বিরাট বিরাট গুদামগুলোতে এখন মওজুত রয়েছে একমাত্র আটা ও গম। চিনির মওজুত ফুরিয়ে যাবার কথা সরকার আগেই জানিয়ে দিয়েছেন রেশনে চিনি বন্ধ করে। চালের মজুত নিঃশেষিত হয়ে যাওয়ায় সরকারের টনক নড়েছে। বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য এনে মওজুত বাড়াতে সময় লাগবে প্রচুর। পর্যাপ্ত খাদ্য-শস্য সংগ্রহ করার সম্ভাবনাও সীমিত।

সবকিছু মিলিয়ে বাংলাদেশ এসে দাঁড়িয়েছে এক চরম দুর্ভিক্ষের মুখোমুখি। বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় চাল প্রতি সের তিন টাকা পর্যন্ত উঠে গেছে। আটা ও গমের দামও বাড়ছে হু হু করে।

দেশের বহু মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা দিয়ে কেনা ও বিদেশী রাষ্ট্রের দানে পাওয়া চালের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় নেহাত কম ছিল না। সরকারী ঘোষণা অনুযায়ী কমপক্ষে ৬ মাসের খাদ্যশস্য মওজুত রয়েছে দেশে কিন্তু

এ ঘোষণার পর দু'মাস যেতে না যেতেই সরকারী গুদামে ছুচোর কীর্তন শুরু হয়ে গেছে।

সরকারী গুদামের চাল ফুরিয়ে যাবার কথা চেপে রাখার চেষ্টায় সরকার দোষ চাপাচ্ছেন পরিবহন ব্যবস্থার উপর। পরিবহনমন্ত্রী পাল্টা জানিয়ে দিয়েছেন যে খাদ্য পরিস্থিতির ভয়াবহ রকম অবনতির জন্য তাঁর দফতর মোটেই দায়ী নয়।

অন্যদিকে তথ্যমন্ত্রী মিজানুর রহমান চৌধুরী এখানে-সেখানে জোরগলায় বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছিলেন যে চালের দর ষাটের উপরে উঠলেই বিমান থেকে খাদ্য ফেলা শুরু হবে। আজ দেশের সর্বত্র চালের দর একশ ছাড়িয়ে একশ বিশের কোঠা ছাড়াছাড়ি করছে, কিন্তু বিমান থেকে বস্তা বস্তা খাদ্য ফেলার নাম-গন্ধও নেই। সেই তথ্যমন্ত্রীর মুখে ভেল্কিবাজীর তথ্য আর এখন শোনা যাচ্ছে না। খাদ্যশস্যের মওজুত ফুরিয়ে যাবার এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির দায়িত্ব গ্রহণ করতে আওয়ামী লীগ সরকারের কোন বাহাদুরই রাজী হচ্ছে না। শেখ সাহেব লন্ডন থেকে জেনেভায় গিয়ে বসেছেন। লন্ডনে ১২ দিন থাকার কথা। সেখানে থেকেছেন ২৭ দিন। জেনেভায় ১০ দিন থাকার কথা। সেখান থেকে সংবাদ পাঠাচ্ছেন, "দেশে ফেরার জন্য আমি ব্যাকুল।" কিন্তু দেশে ডাক্তার মিহিসুরে বলছে, দরকার হলে শেখ সাহেব আরও কিছুদিন থাকবেন জেনেভায়। খাদ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে যে, ঢাকার বাইরে যত্রতত্র ঘুরে অভয় দান করা তার পক্ষে সম্ভব হবে না। সুতরাং ঢাকায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতা দানের পর তিনি ঘাপটি মেরে চুপ করে গেছেন। পরিবহনমন্ত্রী আগেই গা ঝেড়ে নিরাপদ অবস্থানে সরে গেছেন। সিনিয়র মন্ত্রীদের মধ্যে তাজুদ্দিন সাহেব সামনে পড়ে দু'চারবার কৌশলে 'খাদ্যশস্য' কথাটি উচ্চারণ করছেন, নতুবা গণতন্ত্র ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের এপার-ওপারে লাফালাফি করে তাঁর ইহকাল ও ভবিষ্যতকাল রক্ষার চেষ্টায় মশগুল।

অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী সৈয়দ নজরুল ফাঁপড়ে পড়ে সমগ্র দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছেন অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী বিষয়ক মন্ত্রিসভা সাব কমিটির উপর। একদিন অন্তর বৈঠক চালাচ্ছেন তারা বেহুদা। এই সাব কমিটি আবার নিজেদের দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলতে চাইছে। সরকারী হ্যান্ডআউটে একটা পুরনো সংবাদের পুরনো কাসুন্দি ঘেটে বলা হয়েছে যে, খাদ্য পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য আসল সংস্থাটি হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর সেক্রেটারিয়েটে অবস্থিত 'জরুরী কার্যক্রম কক্ষ'। খাদ্য পরিস্থিতি দেশের কোথায় কি দাঁড়াচ্ছে, সারাক্ষণ তার খোঁজ নেয়া, প্রতিকার ঠিকমত হচ্ছে কিনা তা লক্ষ্য করা হচ্ছে এ কেন্দ্রের দায়িত্ব। দায়িত্ব এড়ানোর এ পালা কাউকে নির্দোষ হবার সুযোগ দিয়েছে বলে মনে করার কারণ নেই। দেশে স্তূপীকৃত বিপুল পরিমাণ চাল কোথায় গেল, বারো ও আউশ মওসুমের ফসল কোথায় গেল তার হিসাব এ সরকারকে দিতে হবেই।

মেরুদণ্ডহীন মনি মোজাফফরের দলটি ছাড়া দেশের সকল রাজনৈতিকগণ ও শ্রমিক সংগঠন বিপুল আকারে ভারতে খাদ্য পাচারের বিরুদ্ধে সরকারকে সতর্ক করে আসছিল। সরকার এই বাস্তব অবস্থাটিকেও ঢাকতে চেয়ে এসব অভিযোগকে ভারত-বিরোধী সাম্প্রদায়িক প্রচারণা, স্বাধীনতা বিরোধী ষড়যন্ত্র বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু আজ মন্ত্রীদের বোলচাল ফুরিয়ে গেল কেন?

দেশব্যাপী চরম দুর্ভিক্ষাবস্থা দেখা দেওয়ায় জরুরী অবস্থা ঘোষণার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। এমতাবস্থায়, আওয়ামী লীগ সরকার সাবেক পাকিস্তানী শাসকদের ন্যায় ঘরের পরিস্থিতি থেকে জনগণের দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত বলে চীৎকার

পারছেন। কিন্তু সব ষড়যন্ত্রের চাবি-কাঠি এদের হাতেই জমা, দেশকে ভারতের গোলামে পরিণত করে এ দেশের মানুষদের দাস সমাজে পরিণত করার চেষ্টা তারা কতদিন ধরে করেছেন, সে হিসাব দিলেই সব ল্যাঠা চুকে যাবে।

সিলেটের ধান

বাংলাদেশের অন্যতম শস্যভাণ্ডার সিলেটের বোরো ধানে সিলেট ছাড়াও কুমিল্লা, নোয়াখালী জেলা ও ময়মনসিংহের ঘাটতি পূরণ হতো। এবারও সিলেটে প্রচুর বোরো ধান হয়েছে। ধানের মওসুমে সিলেটে ধানের মন আগের বৎসরও ছিল ১৫/ ১৬ টাকা। এবার ধান উঠার পরেই লক্ষ লক্ষ মণ ধান খড়কুটোসহ ভারতে পাচার হয়ে যায়। এখন সিলেটের মত শষ্যভাণ্ডারেও চালের দাম ১০০ টাকার উপরে।

সিলেট প্রতীক মাত্র। শুধু সিলেট নয়, সারাদেশ থেকেই লাখ লাখ মণ চাল ও ধান এমনিভাবে ভারতে পাচার হয়েছে। টাকার মূল্যমানের বিভিন্নতা ভারতীয় চোরাকারবারীদের চোরাচালানের ব্যবসাকে করেছে লাভজনক।

চোরাকারবার ও ভারতে খাদ্যশস্য পাচারই যে খাদ্য মওজুত পরিস্থিতিকে এ দশায় এনেছে সরকার তা প্রকারান্তরে হলেও স্বীকার করেছে।

দেশের খাদ্য মওজুত ফুরিয়ে যাওয়ায় সরকারের টনক নড়েছে। কুমিল্লা-ফেনীর সীমান্ত অঞ্চল ও আরো কয়েকটি জেলার সীমান্তে কার্ফুগোছের ১৪৪ ধারা দিয়ে সরকার চেষ্টা করছে চোরাকারবার রুখতে। কিন্তু মৃত সন্তানের শিয়রে ডাক্তার এনে লাভ নেই।

আজ বাংলার গ্রামে-গঞ্জে, শহরে-বন্দরে—শুধুই হাহাকার। খাদ্যাভাব ও বস্ত্রাভাবে আজ লক্ষ লক্ষ মানুষ মৃত্যুর মুখোমুখি। এর জন্য দায়ী কারা? জানতে হলে পড়ুন

মওলানা ভাসানী

প্রণীত

আওয়ামী লীগের কথা ও কাজ

ওয়াদাভঙ্গের এক অতুলনীয় নজীর

মূল্য ঃ ·৪০ পয়সা

আপনার চিঠি

চিকিৎসার সুযোগ

জনাব,

আধা সরকারী অনেক দফতরে কর্মচারীরা এবং তাদের পরিবারবর্গ প্রয়োজনমত পূর্ণ চিকিৎসার সুযোগ পেত। বাংলাদেশ সরকারের অর্থ দফতরের বিজ্ঞপ্তি নং এমএফ ৪/৫৯/৭২/১৭৪ তাং ৮.৪.৭২ অনুযায়ী ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১-এর পূর্বে সব সরকারী ও আধা সরকারী অফিসে যেসব সুবিধা ভোগ করতো তা বলবৎ থাকবে। অথচ সম্প্রতি সরকার এক বিজ্ঞপ্তি নং এমএফ/আর ডব্লিউ/১৭৮/৭২/৪০১ তাং ২২.৭.৭২ইং দ্বারা জানিয়েছেন যে প্রত্যেক সরকারী, আধা সরকারী কর্মচারী মাসে ১৫ টাকা হিসাবে চিকিৎসা ভাতা পাবে। এ সম্পর্কে আমাদের নিম্নলিখিত বক্তব্য ঃ

১। সরকারী দফতরের আমলারা কোন বিজ্ঞপ্তি জারী করার পূর্বে তা অন্য কোন বিজ্ঞপ্তি বা আইনকে লঙ্ঘন করে কিনা তা পরীক্ষা করা এবং বিভাগীয় কর্মচারীদের প্রতিনিধিদের সাথে আলাপ-আলোচনা করা।

২। নাগরিকদের মৌলিক অধিকার বলে যে সুযোগ একবার দেওয়া হয় তা ছিনিয়ে নেয়া যায় না। তাই সরকার চিকিৎসার সুবিধা নষ্ট করে আমাদের মৌলিক অধিকারকে ক্ষুণ্ন করতে পারেন না।

৩। যার পরিবারে ১০ জন লোক আছে সেও ১৫ টাকা পাবে, আর যে একা সেও ১৫ টাকা পাবে এটা একান্তই নীতি বহির্ভূত।

৪। যখন ঔষধপত্রের দাম দিন দিনই বেড়ে চলেছে অর্থাৎ টাকার অভ্যন্তরীণ মূল্য কমে যাচ্ছে তখন সরকার প্রয়োজনীয় সুযোগসুবিধা বন্ধ করে আমাদের চরম দুর্ভোগের মুখে ঠেলে দিচ্ছেন।

৫। সরকার একান্ত যদি খরচ কমাতে চান তবে বড় বড় পদগুলো বিলোপ করে বড় বড় অফিসারদের অবসর দিতে পারেন। তাতে সরকারী কোষাগারের খরচ এক তৃতীয়াংশ কমে যাবে।

ইতি

একজন নিম্নবেতনভুক কর্মচারী, ঢাকা।

দোহাই ঠাকুর এবার থামো

তিনি যেন এখন আবার জমিদারের নায়েবী ফিরে পেয়েছেন। বরিশালের বিরাট অঞ্চল তার দাপটে সন্ত্রস্ত। কার মাথা যায়, কাকে কাঠগড়ায় উঠতে হয়, কাকে মুক্তিপণ গুণতে হয় তা জানেন তিনি। রাজাপুর থানার তারবুনিয়া নিবাসী সাবেক চেয়ারম্যান সুধীর ঠাকুর এককালে জমিদার ভোজেশ্বর পাল চৌধুরীর নায়েব হিসাবে অনেক নিরীহ প্রজার চামড়া তুলেছেন। মোনেম আমলে চেয়ারম্যান নমিনেশনের জন্য লাটভবনে কম করে হলেও একশ দরখাস্ত তিনি দিয়েছেন। ১৯৬৫ সালে 'জাতীয় পরিষদ' নির্বাচনের সময় লীগ স্পীকার সাতুরিয়া ইউনিয়নের জন্য মেম্বর কেনা করতে যে টাকা দেন সুধীর ঠাকুর তা গ্রহণ করেন।

১৯৭১-এর ২৫শে মার্চের পর তিনি গ্রামে কিছুদিন ত্রাসের রাজত্ব চালান। অবস্থা বেগতিক দেখে পাড়ি দিলেন ভারতে। অবশ্য ১৯৫০ সাল থেকে সেখানেই তার পরিবারবর্গ বাস করছে।

গত মার্চ-এপ্রিলে ফিরে এসে তিনি এমন কাণ্ড শুরু করেছেন যে, তাকে ঠেকানো না হলে, দীর্ঘ ২৪ বছরের চেষ্টায় অর্জিত হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির সৌধ ধ্বংস করবে। তার নেতৃত্বে বিশেষ শ্রেণীর লোকজনের একটি বাহিনী রয়েছে, যারা সংখ্যাগরিষ্ঠদের উপর হত্যা, লুটপাট, মামলা দায়েরের অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে।

তার হেডকোয়ার্টার ইদানীং কাঠপট্টির গ্রীন বোর্ডিং-এ।

তার অত্যাচারে জর্জরিত এলাকা এখন বিস্ফোরণোন্মুখ।

জামাতী দালালের নিরাপদ আশ্রয়

আওয়ামী লীগ

দেশ থেকে দালালের ভূত তাড়াবার জন্য আওয়ামী লীগ সর্ষে বলে নিজেদের পরিচয় দিলেও তাতেই ভূত বাসা বেঁধেছে। এখন সর্ষের ভূত তাড়ায় কে?

স্বাধীনতার পর পরই বরিশালের কোতোয়ালী থানার মুসলিম লীগার ও জামাতে ইসলামীরা আওয়ামী লীগের ভেতর ডেরা বেঁধেছে।

চন্দ্রমোহন এলাকায় মাষ্টার আবদুল ওয়াজেদ শরীফ জামাতে ইসলামের পাণ্ডা ছিলেন, এখন আওয়ামী লীগের কর্তা হয়ে শহরে ছুটোছুটি

হইতে কচুরীপানা পরিষ্কার, মশা-মাছি মারার জন্যে নালা-নর্দমা ও ঝোপ-জঙ্গল পরিষ্কার করাইয়া সরকার যদি প্রত্যেক দীন মজুরকে প্রতিদিন ১ সের চাউল ও ২ সের আটা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন তবেই তাহারা কোন রকমে জীবন বাঁচাইতে পারিবে। এই দাবী শুধু ভূমিহীন মজুরেরাই একক শক্তিতে আদায় করিতে পারিব না। সমস্ত রাজনৈতিক দল, শ্রমিক সংগঠন ও কৃষক সমিতিকে হতভাগ্য মরণাপন্ন ভূমিহীন কামলাদের-যাহাদের ঘরবাড়ী, গরু-বাছুর বিক্রয় করিয়া খাইবার মত কিছুই সম্বল নাই তাহাদিগকে বাঁচাইবার জন্য সারা দেশময় গণআন্দোলন করিয়া সরকারের উপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করিতে হইবে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যেভাবে প্রতিদিন চুরি-ডাকাতি-রাহাজানি সংঘটিত হইতেছে এবং গুপ্ত হত্যার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে তাহা সবার জীবনের পক্ষে খুবই উদ্বেগজনক। এরূপ অরাজকতা ও গুপ্ত হত্যাকে প্রতিরোধ করিতে না পারিলে দুষ্কৃতিকারীদের হাতে অসংখ্য অমূল্য জীবনের অকাল মৃত্যু ঘটিবে। সরকার ওয়াকিবহাল হওয়া সত্ত্বেও গ্রামবাংলার নিঃসহায় মানুষের জানমাল রক্ষার্থে কোন প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন না করিয়া নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকা পালন করিতেছে। পরন্তু সরকারী কর্মকর্তারা পন্থী নামে অভিহিত করিয়া সুকৌশলে সরকারী দায়িত্ব ও কর্তব্য এড়াইয়া যাবহার চেষ্টা করিতেছে। এমতাবস্থায় দেশে সর্বদলীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করিয়া জনসাধারণকে সকল প্রকারের ভয়ভীতি হইতে মুক্ত করিয়া দুষ্কৃতিকারীদের হাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম আরম্ভ করিতে হইবে। সরকারের নিকট প্রত্যেক এলাকা হইতে সর্বশেষ দাবী পেশ করিয়া জানাইতে হইবে যে, দেশের আপামর জনসাধারণের জানমাল রক্ষার দায়িত্ব পালন করিতে সরকার সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়াছে। অতএব একদলীয় সরকার ভাঙ্গিয়া দিয়া সকল দলের সকল মতের লোকের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা নতুনভাবে সরকার গঠন করিতে হইবে। দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ করিতে যে সর্বদলীয় খাদ্য সংগ্রাম কমিটি গঠন হইয়াছে উহার প্রতি জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল দলের সকল মতের বাঙ্গালী ভ্রাতা-ভগ্নিগণ পূর্ণ সহযোগিতা করিবেন। সংগ্রাম পরিষদ দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটি আপনাদের মধ্যে কিভাবে বাংলাদেশের সর্বত্র সংগ্রাম পরিচালনা করিতে হইবে তাহার গঠনতন্ত্র তৈয়ার করিয়া পাঠাইবে।

দুইটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইব যে, সাম্প্রদায়িক ও উচ্ছৃঙ্খলতা যেন সারা দেশময় কিছুতেই ছড়াইয়া না পড়ে। কারণ, একবার উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দিলে পুনরায় শৃঙ্খলা আনিতে বহু সময় লাগিবে। তাই দেশবাসীর নিকট আমার অনুরোধ ও আকুল আবেদন আপনারা সংঘবদ্ধ হইয়া সরকারের অন্যায়-অবিচার, স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হইয়া গণআন্দোলন আরম্ভ করুন। চোরাকারবারী, সমাজবিরোধী ও দুষ্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। ছোট বড় সকল শ্রেণীর মানুষের সুখ-দুঃখ সমানভাবে বণ্টন করিয়া ভোগ না করিলে দুর্ভিক্ষকে কিছুতেই প্রতিরোধ করা যাইবে না। রিলিফের মাল যাহারা চুরি করিয়া বিক্রয় করিয়াছে অথবা আত্মসাৎ করিয়াছে তাহারা আল্লাহ ও দেশের সকল শ্রেণীর লোকদের মহাশত্রু। অতএব ঐ সমস্ত লোকদিগকে সমাজ-জামাত হইতে সম্পূর্ণরূপে বয়কট করার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

বর্তমানে বাংলাদেশের অধিকাংশ লোক চরিত্র হারাইয়া ফেলিয়াছে। মিথ্যা, জাল, জুয়াচুরি, টাউটগিরী, চুরি-ডাকাতি, রাহাজানি প্রভৃতি জঘন্য কাজে লিপ্ত। দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা সমস্ত ধ্বংস করিতেছে। ইহার আশু প্রতিকার না হইলে দেশের ভবিষ্যত আরও খারাপ হইবে।

তাই কৃষক-মজুর, কামার-কুমার, জেলে-মাঝি, ছাত্র-শিক্ষক সকল শ্রেণীর মানুষের নিকট আমার আরজ আপনারা প্রত্যেক এলাকায় যাহাদিগকে লইয়া সংগ্রাম পরিষদ গঠন করিবেন, তাহারা যাহাতে আদর্শ চরিত্রের লোক হয়, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। চরিত্রহীন ও আদর্শহীন লোক দ্বারা যে কোন সংগ্রাম বা আন্দোলন আরম্ভ করি না কেন তাহা কিছুতেই সাফল্যমণ্ডিত হইবে না।

মুরিদের দরবার

মোজাহাদা

শামসুল হক

সাধনা ব্যতিরেকে সিদ্ধিলাভ হয় না, কষ্ট ব্যতিরেকে মিষ্ট পাওয়া যায় না, মোশাহাদা না করিয়া মোজাহাদা হাছেল করা যায় না– এ কথাগুলি সর্ববাদী সম্মত সত্য। এই জন্যই কোরআন পাকের মধ্যে বার বার মানুষকে কষ্টের মধ্যে ঢুকিতে, কষ্ট দেখিয়া পিছপা না হইতে তাগিদ করা হইয়াছে। কিন্তু বিনা উদ্দেশ্যে, বিনা আদর্শে কষ্ট করায় কোন ফল নাই–উদ্দেশ্য আল্লাহকে রাজী করান। আদর্শ নবী-জীবন পালন করা। কোন কষ্টে ফল আছে? আল্লাহকে রাজী করার উদ্দেশ্যে নবী-জীবনের আদর্শ অনুসারে মনের বিরুদ্ধে সংযম অভ্যাস করিতে (নফছের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে) যে কষ্ট হয় সেই কষ্টেই মিষ্ট পাওয়া যায়, সেই কষ্টেই ফল লাভ হয় এবং তাহাকেই বলে মোজাহাদা অর্থাৎ আল্লাহর দিদার।

মানুষকে মানুষ হইতে হইলে প্রথমে তাহাকে (১) দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইতে হইবে (২) তারপর তাহার নফছে আম্মারার সঙ্গে জেহাদ করিয়া রিপুগুলিকে দমন করিয়া সংযম অভ্যাস করিতে হইবে। (৩) মন যা চায় মনকে সেদিক হইতে ফিরাইয়া রাখিয়া খোদার ভয়ে, খোদার ভক্তিতে, খোদার রেজামন্দির কাজে লাগানোর নামই তো তাক্ওয়া। তাক্ওয়া হাছেল করার পথে অতি বড় সহায়ক হয় সৎ সংসর্গ এবং আল্লাহর জেকের অর্থাৎ আল্লাহর যাবতীয় মহৎ গুণাবলী স্মরণ করিয়া সদাসর্বদা মনে, মুখে আল্লাহকে ইয়াদ রাখা। এই তরতিব ও এই নিয়মানুসারে কাজ করিলেই মানুষ, মানুষ পশুর চেয়েও অধম হইয়া পড়ে।

ভ্রম সংশোধন

গত ২৫শে আগস্ট সংখ্যার 'হক-কথা'য় '৩রা সেপ্টেম্বর সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট' সংবাদটির তারিখে ভুল হয়েছে। আসলে বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন ৩রা সেপ্টেম্বরের সকল ভুখা মিছিলের সমর্থনে ২রা সেপ্টেম্বর সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পূর্ণ ধর্মঘট পালন করার আহ্বান জানিয়েছেন।

ভাসানীর সফরসূচী

ন্যাপ প্রধান মওলানা ভাসানী দেশের বিভিন্ন অঞ্চল পরিদর্শন ও জনসভার এক বিস্তৃত কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। জানা গেছে তিনি বর্তমান মাসের ৫ তারিখে মেহেরপুর, ৭ তারিখে বগুড়া, ৮ তারিখে রংপুর ও ৯ তারিখে গাইবান্ধা সফর করবেন। শরীর সুস্থ থাকলে

১৩ তারিখে বরিশাল, ১৪ তারিখে পিরোজপুর এবং ১৫ তারিখে পটুয়াখালীতেও যাবেন বলে জানা গেছে।

বরিশাল খাদ্য অফিস এখন দুর্নীতির আখড়া

খাদ্য বিভাগের বরিশাল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক কার্যালয়ে মহাপ্রভু আমলা আর তার অনুগত বশংবদ কর্মচারীরা মিলে খাদ্য বিভাগের শাখাটিকে দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত করেছেন।

খাদ্য সরবরাহ পৌছলে ওজন ও হিসাবের গরমিল বিনষ্ট হয়েছে ইত্যাদি কারণ দেখিয়ে এরা অবৈধভাবে ভাগ্য গড়ে চলেছেন।

এদেরে সম্পর্কে অভিযোগ করা হলেও কোন ফায়দা হচ্ছে না। ঢাকা থেকে তদন্ত এলে তারা তদন্তকারীর পকেট বোঝাই করে ছেড়ে দেন। ঢাকায় রিপোর্ট যায় সব বিলকুল ঠিক।

এদের কর্মকান্ডে যারা সয়ে উঠতে না পারে সে সব কর্মচারীরা বদলি, চাকুরি খতমের হুমকি ইত্যাদির সম্মুখীন হচ্ছে।

আই এ্যাম এমসিএ স্পিকিং

আরও ৩০ লাখ লোক মারবো কিন্তু বেশী দেরী হয়ে যাচ্ছে

কয়েকদিন আগে এমসিএ হাবিবর রহমান আফিল জুট মিলে গিয়েছিলেন শ্রমিকদের ছবক দিতে। অবশ্য মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল দালাল মিল প্রসাশনিক আছলাহ উদ্দিনকে শক্তি যোগানো। কেননা, আজকাল তিনি আছলাহ উদ্দিনের 'আমব্রেলা' হিসাবে কাজ করেছেন। আর তাতে মালাপানিও মন্দ জুটছে না।

শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে

এমসিএ সাহেব বলেন, জানেন আপনারা (অর্থাৎ শ্রমিকরা) বাংলাদেশে আরও ত্রিশ লাখ লোক মারা হবে, মানে হত্যা করা হবে, বুঝলেন! আমি এ খবর আনঅফিসিয়ালি বলছি না, অফিসিয়ালি বলছি। আর ভাসানী ন্যাপ ও বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নে যারা আছে তারা সব নকশাল। তাদেরকে হত্যা করার নির্দেশ স্বাধীনতার পরই হয়েছিল, কিন্তু বড্ড দেরী হয়ে গেছে। এই সমস্ত নকশালদের অবিলম্বেই খতম করা হবে। সুতরাং সাবধান! আই এ্যাম এমসিএ স্পিকিং।

জনাব হাবিবুর রহমান এখন খুলনার বহুল আলোচিত আওয়ামী লীগ নেতা। পাক সরকারের আমলে হঠাৎ গজিয়ে ওঠা এই নেতা বর্বর সেনাবাহিনীর আমলেও একমাত্র আওয়ামী লীগের গণপরিষদ সদস্য যিনি খুলনা বেতার কেন্দ্র থেকে পাকিস্তানের সংহতির পক্ষে বিবৃতি দিয়েছিলেন, ইনিই একমাত্র সদস্য যিনি স্বাধীন হওয়ার পর বহু অপকর্মের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে অভিযুক্ত। ইনিই খুলনার গণপরিষদ সদস্যদের মধ্যে প্রথম, যিনি সবসময়ই প্রশাসন কর্তৃপক্ষের স্বাভাবিক কাজে বিঘ্ন ঘটিয়ে নিজের ক্ষমতা জাহির করে থাকেন। এমনকি কোন আসামী ধরা পড়লে এই এমসিএ সাহেব থানায় যান পুলিশের উপর মেজাজ দেখিয়ে আসামী ছাড়াতে। পাক আমলের দালালদের পুলিশ গ্রেফতার করলে এমসিএ সাহেব তৎক্ষণাৎ থানায় যান তদবির করতে। সেখানে গিয়ে তার প্রথম বুলি হোল "ডু ইউ নো আই এ্যাম এসসিএ?"

ময়মনসিংহ ফরেস্ট অফিস ঘোড়ায় চড়িয়া মর্দ

ঘোড়ায় না-ই-বা চড়লেন, তবে অফিসারকে ঘোড়ারোগের দাওয়াই দিলে তাঁর চোখে আপনি ঘোড়া সওয়ার। ময়মনসিংহ ফরেস্ট অফিসে ১০০ টাকার টিএ বিলের জন্য কর্তাকে ২০ টাকা হিস্যা দিলে ঘোড়া বিল পাশ। অথচ সমগ্র ডিভিশনে একটা ঘোড়া আপনি খুঁজে পাবেন না।

বড় কেরানী মারফৎ হিস্যাটা না গেলে টিএ বিল কেন, আপনার বকেয়া পে বিলও পাবেন না। ডিএফও সাহেবের ধমক আপনি খাবেন যদি বার বার একই নিবেদন নিয়ে দরখাস্ত করেন। 'আগে টাকা পরে কাজ' নীতিই নাকি সবচেয়ে ভাল।

বাড়াবাড়ি করলে সাজোর অবজেকশন। কৈফিয়ত। বদলী। পার্সেনটেজের হার বাড়লে আপনি বেশী রেঞ্জ, বেশী স্টাফ পাবেন। আর কি চাই।

ডিএফও-র বাসায় ১৪ জন জন চাকর। ৬ জন ফরেস্ট গার্ড। ১ জন ফরেস্টার, ৩ জন মালি। সরকারী চাকর ২ জন। মোট ২৬ জন।

একচোখা নীতির দরুণ মন্ত্রীর ভাতিজীর স্বামী কানা মিয়া বিনা বিজ্ঞাপন, বিনা পরীক্ষায় রসুলপুরে একজিকিউটিভ হয়ে পোস্টিং পেলেন। সবই এক তেলেসমাতি। বস্তুত ময়মনসিংহ ডিএফও অফিস এক দুর্নীতির ডিপু।

একখানা খোলা চিঠি

প্রিয় বন্ধু!

আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে আপনার দরবারে কয়েকটি প্রশ্ন পেশ করছি।

আপনি যখন ভোটে নির্বাচিত হয়ে ক্ষমতার গদী আঁকড়ে ধরতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন ঠিক সেই মুহূর্তে জননেতা মওলানা ভাসানী ঐতিহাসিক পল্টনে বাঙ্গালী জাতির 'স্বাধীনতার' স্লোগান দিলেন। তখন দেশের কোন কোন বুদ্ধিজীবী ও আপনার লীগ জননেতার সেই স্বাধীনতার ঘোষণাকে হাস্যকর বলে মনে করেছিলেন। কিন্তু দূরদৃষ্টি সম্পন্ন রাজনীতিবিদ মওলানার কথাই বাস্তবে পরিণত হলো। তাই ইতিহাস সাক্ষ্য দিবে স্বাধীনতার সত্যিকারের অগ্রদূত হচ্ছেন মওলানা ভাসানীই।

ইদানীং আপনার সহকর্মীরা বেশ জোরেশোরে 'স্বাধীনতা নস্যাৎকারী' 'সাম্প্রদায়িক' ইত্যাদি অহেতুক মিথ্যা কতকগুলো অভিযোগ সেই মহান নেতার বিরুদ্ধে প্রচার করে চলেছে। কিন্তু দেশবাসীকে ধোঁকা দিয়ে বোকা বনানোর দিন শেষ হয়ে গেছে। সচেতন জনতা নিজেরাই অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে যাচাই করে নিয়েছেন কে খাঁটি আর কে খাদ।

আপনি কি আজ ক্ষমতায় সমাসীন হয়ে ভুলে গেলেন জনসম্মুখে আপনার সেই প্রতিশ্রুতির কথা? আপনার কি কিছুই মনে পড়ছে না? দেশের মেহনতি দরিদ্র মানুষের জীবনের দুর্বিসহ দুঃখ দৈন্য দূর করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। ৩০ টাকা দরে চাল, ২০ টাকা দরে আটা ও জীবনধারণের অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষ পাকিস্তান আমলের চেয়ে সুলভে দেওয়ার অঙ্গীকার করেছিলেন। বলেছিলেন, এদেশের অধিকার বঞ্চিত সর্বহারা মানুষকে অন্ততঃ খেয়ে-পড়ে বাঁচার জন্য মোটা ভাত ও কাপড়ের ব্যবস্থা করবেনই! সেই আশায় বুক বেঁধে এই সর্বহারার দল একচেটিয়া ভোট দিয়ে আপনাকে জয়যুক্ত করেছিল। কিন্তু এর বিনিময়ে তারা কি পেল আর আপনিই বা তাদের কি দিলেন? অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস। বাংলার মানুষের অন্তরঙ্গ বন্ধুর দাবিদার আপনি- বন্ধু হয়ে বন্ধুদের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে আপনার বিবেকে একটুও বাধছে না। রাষ্ট্রের পিতা বলে গর্বে স্ফীত হচ্ছেন কিন্তু 'সন্তানদের' তিলে তিলে মৃত্যুর

মুখে ঠেলে দিতে একটুও দ্বিধান্বিত হচ্ছেন না। সুন্দর কথা আর উচ্ছসিত আবেগ সর্বস্ব বক্তৃতায় আর আমাদের পেট ভরছে না বন্ধু।

আপনার প্রতিটি কথারই উল্টো ফল পাচ্ছি আমরা। তাই নয় কি? চাল, ডাল, আটা, তেল, নুন ইত্যাদির দাম আগে যা ছিল তার চেয়ে আপনার আমলে তিন-চার গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। চোরাকারবারী, দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে চোখ রাঙ্গিয়ে অনেক গরম কথা বলেছেন, কিন্তু ফল হয়েছে উল্টো। অথচ এ সম্পর্কে কেউ প্রতিবাদ করলেই প্রতিবাদকারী হয়ে যায় দালাল, নতুবা সাম্প্রদায়িক। নিজের বুকে নিজে হাত দিয়ে দেখুন, আপনার দ্বারা বাংলাদেশের আপামর মানুষের কোন উন্নতি হয়েছে, না তারা আরো অবনতির চরমে, নৈরাজ্যের অন্ধকারে পৌঁছেছে। আপনি নিজেই এর উত্তর পেয়ে যাবেন।

ভারত, রাশিয়া, আমেরিকার সাথে আপনি মাখামাখি করুন আপত্তি নেই–কিন্তু আমাদের জীবন নিয়ে আর ছিনিমিনি খেলবেন না। খাদ্যাভাবে, বস্ত্রাভাবে মা-বোনসহ মরতে বসেছি। আর কত! ধৈর্য্য-সহ্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেছে। তাই হেয়ালিপনা রেখে দেশে ফিরে আসুন- বিদেশী রাষ্ট্রের প্রভাব-প্রতিপত্তি হতে মুক্ত থেকে বাংলাদেশের গণজীবনে শান্তি ফিরিয়ে আনতে তৎপর হোন।

আর একটা কথা বলেই এ চিঠি শেষ করছি বন্ধু-তা হচ্ছে মহান নেতা মওলানা ভাসানীর বিরুদ্ধে অহেতুক মিথ্যা অভিযোগ বন্ধ রাখুন নতুবা আপনার পতন অনিবার্য। আপনার হাতে অস্ত্র আছে আমাদের হাতে নেই–কিন্তু জনমতের জয় যে অবধারিত তা স্বাধীনতার সংগ্রামেই প্রমাণিত হয়েছে।

আপনারা আমাদের ভুখানাঙ্গা রেখে আমাদের উপর দমননীতি চালিয়ে যাবেন আর আমরা নীরবে তা সহ্য করব– সে ধারণা পরিত্যাগ করুন।

অন্যায়- অত্যাচারের বিরুদ্ধে মানুষ যুগ যুগ ধরে জেহাদ করে আসছে–করবেও। ইনশাল্লাহ দুনিয়ার কোন শক্তিই এর গতিকে রোধ করতে পারবে না। তাই আগে থেকেই সাবধান হওয়া কি ভাল নয়?

ইহা কি সত্য?

॥ ১৩১ ॥

পাক-বাহিনী কর্তৃক বিধ্বস্ত রেসকোর্স ময়দানের মন্দিরটি পুনঃনির্মাণ নিয়ে সম্প্রতি বাংলাদেশ হাইকোর্টে বেশ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। অবৈধ ভারতীয় নাগরিক আইনজীবী এস আর পাল মহাশয়ের খায়েশ ছিল হাইকোর্ট প্রাঙ্গণে মন্দিরটি পুনঃনির্মাণ করা। বাংলাদেশ ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র বিধায় হাইকোর্ট প্রাঙ্গণে মসজিদের পাশাপাশি মন্দির থাকা বাঞ্ছনীয় এই ভেবে সমাজে বিবেকের কণ্ঠস্বর বলে পরিচিত আইনজীবীগণ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব ছিলেন। কারণ, এদের অনেকেই লিগ্যাল এডভাইজার্স হওয়ার তালে আছেন পাছে তাদের এই সাধ মিটে যায় এই ভয়ে তারা নীরব। কিন্তু আপত্তি তুলেছিলেন সর্বহারা কেরানী ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীবৃন্দ। যাই হোক পরিশেষে বেগতিক অবস্থা লক্ষ্য করলেন শেখ মুজিব নিজে। মন্দিরটি আগের জায়গায়ই নির্মিত হবে।

॥ ১৩২॥

বাংলাদেশ সীমান্ত খাঁ খাঁ করছে। সীমান্তে প্রহরা বলতে আছে দু'চারটে চৌকি ঘাঁটি। তাও সর্বত্র নয়।

ভারতের মেঘালয় রাজ্য সীমান্তে বাংলাদেশ-ভারতে সীমান্ত চিহ্নিত করে যে খুঁটিগুলো

রয়েছে তার ওপারে ভারতভূমি। ভারতীয় অংশে পাহাড়-টিলা। সৈন্যদের থাকার অসুবিধা খানিকটা হয় সেখানে। আগে ভারতীয় সৈন্যরা ভয়ে এ পাহাড়ের ওপাশের চাল থেকে মাথাই তুলতো না।

সম্প্রতি তারা পাহাড় ছেড়ে সমতলে ঘাঁটি করার জন্য বাংলাদেশের এদিকে সদলবলে নেমে আসে। বাংলাদেশ রাইফেলস বাহিনীর লোকেরা এতে ক্ষীণ আপত্তি জানায়। কারণ, ভারতীয় সৈন্যদের সাথে জোরগলায় কথা বলতে মানা আছে সরকারের তরফ থেকে।

বাংলাদেশ রাইফেলস সৈনিকদের এ অনুযোগ ভারতীয়রা গ্রাহ্যের মধ্যে আনেনি। পরে বাংলাদেশের সৈনিকরা অধিকারের কথা তুললে ভারতীয় সৈন্যরা সীমান্ত চিহ্নিতকরণ খুঁটিগুলো উপড়ে দূরে ফেলে দেয় এবং জোর করে বাংলাদেশের মাটিতে এসে তাবু ফেলে।

অবশ্য এটাই ভারতীয় সৈন্যদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য তারা নরমের যম। শক্ত হাতে পড়লে এদের কি হয়, বিডিআর-এর পুরনো সৈন্যরা তা জানেন, করতেও পারেন। কিন্তু সরকারের হুকুম নেই।

॥ ১৩৩॥

ময়মনসিংহ জেলার দুর্গাপুর সীমান্তে ভারতীয় লোকজন এসে বাংলাদেশের জমির ফসল কেটে নিয়ে গেছে।

সম্প্রতি ভারতীয় নাগরিকরা এসে এদেশের কৃষকদের কষ্টে ফলানো ধান কাটতে শুরু করলে বাংলাদেশের কৃষকরা সংঘবদ্ধ হয়ে ভারতীয়দের বাধা দেয়। ভারতীয়রা মার খেয়ে প্রায় ভাগছিল ঠিক এ সময় ভারতীয় সৈন্যরা সীমান্তরেখা অতিক্রম করে বাংলাদেশের কৃষকদের আক্রমণ করে ও বেপরোয়া গুলীবর্ষণ শুরু করে।

সশস্ত্র ভারতীয় সৈন্যদের সাথে নিরস্ত্র গ্রামবাসীদের পেরে উঠবার কথা নয়। নিরস্ত্র গ্রামবাসীর উপর ভারতীয় সৈন্যরা নির্বিবাদে মারপিট চালাতে শুরু করে।

এ সুযোগে ভারতীয় লোকেরা জমির ফসল কেটে সীমান্ত পার হয়ে চলে যায়। বাংলাদেশের কৃষকের রক্ত পানি করা শ্রমে সোনা ফলানো মাঠ খাঁ খাঁ হয়ে পড়ে রইল ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রীর প্রতীক রূপে।

(১৩৪)

মিলিটারী ইঞ্জিনিয়ার সার্ভিসেস-এর মধ্যে জনৈক বেসামরিক অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার, জনৈক এসডিও (ই/এম), জনৈক ইউডিসি ও জনৈক এজিই ঢাকা ক্যান্ট দখল আমলে পাক-বাহিনী ও অবাঙ্গালীর সাথে প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করলেও এখন বহাল তবিয়তে টিকে আছেন। প্রথম ব্যক্তিটি দখলকার আমলে বেতন ছাড়াও গোয়েন্দাগিরির জন্য এক হাজার টাকা করে পরিশ্রমিক পেতো। স্বাধীনতার পর সিএমইএস (আর্মি) দপ্তরে বদলি করা হয়েছে তাকে। উপরিবর্ণিত দালালদের নিয়ে তিনি একটি চক্র গঠন করে স্বজনপ্রীতি, পক্ষপাতিত্ব, ঘুষ, নিজ ভাইকে কন্ট্রাক্টারি দানের পর্ব চালাচ্ছেন। মিলিটারীর আত্মসমর্পণের পূর্বে সিএমইএস (এয়ার) অফিসের সব কাগজপত্র তিনিই নাকি পুড়িয়ে ফেলেছিলেন।

সম্পাদক ঃ সৈয়দ ইরফানুল বারী ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ঃ মওলানা আবদুল খান ভাসানী
মুদ্রণে ঃ শান্তি প্রেস, সন্তোষ, টাঙ্গাইল।

প্রতি কপি পঁচিশ পয়সা সাপ্তাহিক চাঁদার হার : ষান্মাসিক-৬.০০ বার্ষিক-১০.০০

হক-কথা

(WEEKLY THE HAQ-KATHA)

প্রকাশক ও পৃষ্ঠপোষক ঃ মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

প্রথম বর্ষ ২৮শ তম সংখ্যা; শুক্রবার ২২ শে ভাদ্র ১৩৭৯; ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭২; ২২শে রজব ১৩৯২, সন্তোষ, টাঙ্গাইল

সরকারী দলিলপত্রে জ্বীনের হাত লেগেছে

পাপের ঠেলা এবার সামলাও গোঁসাই

বাংলাদেশ সরকারের সচিবালয়, প্রধানমন্ত্রীর দফতর, সামরিক দফতর সর্বত্র সরকারী দলিল নিয়ে মাদারীর খেল শুরু হচ্ছে। সরকারী দলিলশালাগুলোতে অশরীরী প্রেতাত্মা ঘুরে বেড়াচ্ছে।

খুব সযত্নে সাজিয়ে রাখা দলিলপত্র সবার অলক্ষ্যে কারা ঘাঁটছে! শুধু তাই নয় মূল্যবান কাগজপত্র ও দলিল উধাও হচ্ছে। ফাইলপত্র স্থানচ্যুত হচ্ছে। এক একটি গুরুত্বপূর্ণ ফাইলের উপর একাধিকবার জ্বীন চড়াও হচ্ছে।

এ চাঞ্চল্যকর তথ্যের সূত্র ধরে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও দফতরগুলোতে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, রাজধানীর পৌরসভার কর্মকর্তাদের বিদেশ সফরের রিপোর্টের ফাইল থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক চিঠিপত্রের ফাইল এবং চুক্তিমালার অনুলিপির ফাইলগুলোতে জ্বীনের হাতে লেগেছে।

বিভিন্ন বর্ণ ও চরিত্রের অতিচেনা ও বর্ণচোরা গোছের যে সব সাম্রাজ্যবাদ, সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ বন্ধু সেজে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সাদর সম্ভাষণ পেয়ে অনুপ্রবেশ করেছে, তাদের নিযুক্ত গুপ্তচরেরা এখন সারাদেশে বিশেষভাবে সরকারের ঘরে তৎপর হয়ে উঠেছে।

এর প্রত্যেকটি শক্তি বাংলাদেশকে এককভাবে নিজের পায়ে সমর্পণ করানোর জন্য অন্যান্য শক্তির সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে পাগলের মত কাগজপত্র ঘেঁটে পাল্টা কায়দা ও কৌশল গ্রহণের চেষ্টা চালাচ্ছে।

যদিও এখন পর্যন্ত জ্বীনের আলামত কাগজপত্রের উপর সীমাবদ্ধ তবে সময় যতই যাবে, এদের তৎপরতার পরিধি বেড়ে যাবে। গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের উপর এদের হাত পড়বে। আজ ফাইল থেকে কাগজ যাচ্ছে, কাল হয়তো গুম হবে সেক্রেটারী, পরশু দিন যে প্রধানমন্ত্রীর উপর হাত পড়বেনা তা কে বলবে।

বাংলাদেশের উপর ভারত, বৃটিশ, রাশিয়া আর আমেরিকার যুগপৎ খেলা চলেছে। এসব ষড়যন্ত্রের জটিলতা 'হক-কথা' ক্রমান্বয়ে প্রকাশ করে এসেছে।

রাশিয়া বাংলাদেশকে দিয়ে তার এশীয় নয়া উপবিবেশ পাকাপোক্ত করার স্বপ্ন দেখছে। আমেরিকা বাংলাদেশের কাঁধে চেপে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভিয়েৎনাম পরবর্তী আস্তানা

বানাতে চাইছে বাংলাদেশকে, ভারত বাংলাদেশকে আশ্রিত রাজ্য হিসেবে ব্যবহার করে তার দক্ষিণ-এশিয়ায় নয়া শ্রীবিজয়া সাম্রাজ্যের ভিত গড়তে চাইছে। বৃটিশ-পশ্চিম জার্মানী বাংলাদেশকে সমাজতন্ত্রের পথ থেকে বিচ্যুত করে সামাজিক-গণতন্ত্রের মাধ্যমে নয়া ফ্যাসিবাদী-সাম্রাজ্যবাদ নির্ভর শোষণ ক্ষেত্রে রূপান্তরিত করতে চাইছে।

সবাইকে খুশী রাখার উপায় নেই এমন জটিল পরিস্থিতিতে। দক্ষিণ ভিয়েৎনামের থিউ সরকার, কম্বোডিয়ার স্পরিট মাতাক চক্র, উত্তর কোরিয়ার চুংহী পার্ক চক্র পুরোপুরি আমেরিকার হাতের মুঠোয় থেকেও আমেরিকাকে খুশী রাখতে পারছে না।

শোষণ আর প্রভুত্বের নেশায় উন্মাদ সাম্রাজ্যবাদীদের সবাইকে বা এককভাবে কাউকে খুশী রাখার ব্যর্থ চেষ্টায় ব্যাপৃত হলে দেশ হয়ে পড়ে শশ্মান। বাংলাদেশের উপর নেমে এসেছে এই অভিশাপ।

জননেতা মওলানা ভাসানী ক্ষমতাসীন সরকার বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমানকে এই ঘোরতর জটিলতায় জড়িয়ে পড়ে দেশের সর্বনাশ ঘটানো থেকে নিবৃত্ত হবার জন্য হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন।

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে রুশ-মার্কিন প্রসূত চক্রান্ত ঘোরতর হয়ে উঠেছে। ইন্দোনেশিয়ায় আমরিকা, আলজিরিয়ায় রাশিয়া ঘানায় আমেরিকা এ ধরনের চক্রান্তের সূত্রপাত ঘটিয়ে দেশের বরেণ্য নেতৃবৃন্দকে চিরতরে পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে কায়েম করেছে নিজেদের একচেটিয়া প্রভুত্ব। সাম্রাজ্যবাদী অপশক্তিগুলোকে কাউকে ডান-হাতে, কাউকে বা-হাতে তুলে খেলবার বিপজ্জনক খেলায় যে সব রাষ্ট্রনায়ক অবতীর্ণ হয়েছিল, সাম্রাজ্যবাদের শক্তিদ্বন্দ্বের পরিণতিতে তাদের প্রাণ হারাতে হয়েছে এবং সে সাথে দেশের সর্বনাশ ঘটে গেছে চূড়ান্তভাবে।

বাংলাদেশের উদ্ভবের পর থেকে নীতিবিবর্জিত সাম্রাজ্যবাদীরা এক এক করে সবাই এসে পিড়ির কোণা দখল করেছে। ক্ষুদ্র পিড়িখানির উপর এখন ঠেলাঠেলির অন্ত নেই। আর এর মাঝে পড়ে বাংলাদেশের অবস্থা কাহিল হয়ে উঠেছে।

পাকিস্তানের শৈশবাবস্থায় দেশটিতে প্রভুত্ব কায়েমের জন্য বৃটিশ-মার্কিন দ্বন্দ্বের সূত্রপাত ঘটেছিল। লিয়াকত আলী খান বৃটিশের খপ্পর থেকে আমেরিকার খপ্পরে চলে যাবার চেষ্টায় মরিয়া হয়ে উঠে। এ চেষ্টার পরিণতি ঘটেছিল মর্মান্তিকভাবে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ পাকিস্তানে আমেরিকার প্রভাব তবু রোধ করতে পারেনি।

বিভিন্ন ভড়ং ও বেশভূষায় আন্তর্জাতিক রুশ-মার্কিন, ইঙ্গ-জার্মান-ভারতীয় গোয়েন্দারা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। এরা বিশেষ বিশেষ লোক, বিশেষ করে সরকারী আমলা আর সরকারের উপর প্রভাবের অধিকারী এদেশীয় লোকদের স্থানীয় গুপ্তচর হিসাবে নিয়োগ করে অঢেল পয়সা ঢালছে।

এর ফলে বাংলাদেশ হয়ে উঠেছে আন্তর্জাতিক গোয়েন্দা চক্রের অন্যতম পাদপীঠ – লেবানন, লাওস ও সুইজারল্যান্ডের মত।

দিন যতই যাচ্ছে এদের মুষ্টি দৃঢ়তর হচ্ছে। একদিন আমাদের কণ্ঠে এদের হাত সাঁড়াশির মত চেপে বসবে। শেখ মুজিবকে অত্যন্ত উচ্চ মূল্য দিয়ে আগুন নিয়ে খেলবার মাশুল দিতে হবে। জনগণ ও দেশের ভাগ্যে কি নেমে আসবে তা ভবিতব্যই জানে।

অনাহারে মানুষ মরছে-গদীতে থাকার অধিকার তোমাদের নেই

জনতা সাগরে জেগেছে ঊর্মি

অনশনের রুদ্ধকারা ভেঙ্গে মানুষ জেগেছে, টালমাটাল হয়ে উঠেছে ঊর্মিমুখর জনতা

সমুদ্র। অন্নের দাবীতে, বাঁচার দাবীতে গত রবিবার চালনা থেকে শ্রীমঙ্গল, রাঙ্গামাটি থেকে রংপুর অবধি দেশের সর্বত্র অনাহারে বিক্ষুব্ধ হাজার হাজার মানুষ নেমে এসেছে রাস্তায়।

জনতার মিছিলের পুরোভাগে জননায়ক মওলানা ভাসানী। তিনি ঘোষণা করলেন, "দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত বাংলার মানুষ অনাহারে মরছে, গদীতে থাকার অধিকার তোমাদের নেই– কারণ, জনগণের কল্যাণের জন্য জনগণের ইচ্ছাধীন সরকার হবে – জনগণকে বাদ দিয়ে সরকার চলতে পারে না – বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের দাবীদাওয়াকেই প্রাধান্য দিতে হবে। অন্নহীন মানুষকে অন্ন, বস্ত্রহীন মানুষকে বস্ত্র দিতে হবে, অন্যথায় সরকারের গদীতে থাকার কোন অধিকার নেই।"

"অনাহারে অসহায় মানুষকে হত্যা করতে দেওয়া হবে না। মানুষের জীবনের স্বস্তি, সুখ-শান্তি হরণ করে ক্ষমতাসীন আর তাদের অনুসারীদের নিরাপদ বালাখানায় থাকতে দেওয়া হবে না। জনগণের শান্তিতে ব্যাঘাত হলে শাসক-শোষকদের ঘুম আমরা কেড়ে নেবোই। অবিলম্বে জনগণের জীবনে সুখ-স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে এ মুহূর্তে অনাহার রোধ না করলে পৃথিবীতে কোন শক্তি নাই তোমাদের রক্ষা করে। বিলম্ব হলে দেশের মেহনতি মানুষের স্বার্থরক্ষায় অবতীর্ণ তরুণরা সশস্ত্র বিপ্লব ঘটিয়ে বসবে। সুতরাং সরকার, তোমাদের জন্য সময় নেই।"

গত ৩রা সেপ্টেম্বর (রবিবার) ক্ষুধার্ত, অনাহারক্লিষ্ট দেশবাসীর পক্ষ হয়ে জননেতা মওলানা ভাসানী ক্ষমতাসীনদের উদ্দেশ্যে একথা ঘোষণা করেছেন।

"জনগণেই জন্য যা করতে হয় আমি করবো। জনগণের অনুকষ্ট দূর করার জন্য কর্মসূচী নাও, আমি সহযোগিতা করবো, জনগণের কল্যাণ করতে চাও – তোমার লুটপাট সমিতি আগে ভাঙ্গো, সকল অপহৃত সম্পদের হিসাব দাও, ক্ষমা চাও জনগণের কাছে – গঠন করো জাতীয় সরকার। জাতীয় ভিত্তিতে উদ্যোগ নিয়ে আসন্ন দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তর ঠেকাও – নইলে মানুষ বাঁচবে না।"

সেদিন ঢাকায় ছিল একটানা বর্ষণ। আকাশের মেঘরাজ্যে বাজছিল ক্রোধ-হুঙ্কার। সে সাথে গর্জে উঠছিল পল্টন, ঢাকার রাজপথ ঃ বাঁচতে এবার দিতে হবে; নইলে রক্ষা নেই, রক্ষা নেই।

অশীতিপর বৃদ্ধ জননেতা ক্ষুধাপিপাসায় কাতর অবস্থায় টাঙ্গাইলের গ্রামের বাড়ী থেকে শহরে পৌঁছেই জনসভায় দাঁড়ালেন। সারা নগরী যেন উৎকর্ণ হয়ে শুনলো গরীবের চিরসাথী জননেতার কথা।

মওলানা সাহেব বলেন, ভুখা মিছিলকে আওয়ামী লীগের লোকেরা স্বাধীনতার বিপক্ষে ষড়যন্ত্র বলে অপপ্রচার করে চলছে। অথচ অতীতে যখন মানুষের দুঃখ-দুর্দশা চরম আকার ধারণ করেছে তারাও তখন ভুখা মিছিল বের করেছে। সেদিন যদি আওয়ামী লীগ নেতার ভুখা মিছিলে স্বাধীনতা নস্যাতের প্রশ্ন না উঠে থাকে, তবে আজ আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গিয়ে নস্যাতের ষড়যন্ত্র বলে অভিহিত করছে কেন?

মওলানা বলেন, মানুষ না খেয়ে মরছে – বস্ত্রাভাবে উলঙ্গ রয়েছে, কাফনের কাপড়ের অভাবে কলার পাতা দিয়ে মুর্দা দাফন করা হচ্ছে। রেডিও এই সংবাদ দেয় না। বক্তৃতা-বিবৃতি দিলে সংবাদপত্রে উঠে না। বিশ্বের মানুষের নিকট বাংলার দুর্ভাগ্যের কথা পৌঁছানোর কোন উপায় নেই। তাই বিশ্বের দরবারে বাংলার করুণ চিত্র উন্মোচিত করতে আমরা ভুখা মিছিলের সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক অধিকারকে বেছে নিয়েছি।

মওলানা সাহেব লালবাহিনী, গণবাহিনী ও সেচ্ছাসেবক বাহিনীদের উদ্দেশ্য করে বলেন

তোমার গরীবের ছেলে, তোমরা কৃষকের ছেলে তাই আওয়ামী লীগ সরকারের নির্দেশে খেলার পুতুল হয়ে ভুখা মিছিলের বিরুদ্ধে কিছু করো না। মওলানা সাহেব হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন যে, সরকার আজ যে বাহিনীকে গণ মানুষের কণ্ঠরোধ করতে ব্যবহার করছে আগামী ৮ মাসের মধ্যেই তারা সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করবে।

মওলানা সাহেব বলেন, আমি হুমকির ভয়ে ভীত নই– সরকারের যদি গুলি করার অধিকার থাকে - তবে আমারও গুলি খেয়ে শহীদ হবার মনোবল আছে।

চীন সম্পর্কে উল্লেখ করে তিনি বলেন, চীনের ভেটো দেওয়ার জন্য তিনি কোন মতেই দায়ী নন। কেননা, চীনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক শেখ মুজিবের সঙ্গে সম্পর্কের চেয়ে কোন অংশে বেশী নয়। তিনি বলেন, ভারতের গোলামী করে চীনের স্বীকৃতি পাবে না।

ভারতের প্রভুত্বে পদাঘাত

মওলানা সাহেব অভিযোগ করেন যে শেখ মুজিবের সরকার বাংলাদেশকে ভারতের লেজুড় ও কলোনীতে পরিণত করেছে। তিনি বলেন, বাংলার মানুষ ভারতের শর্তহীন বন্ধুত্ব কামনা করে, প্রভুত্বে পদাঘাত করে। বিদেশী কোন অনুশাসন বা গোলামীকে ১ দিনের জন্যও বাঙ্গালী জাতি বরদাস্ত করবে না। গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ হওয়ার জন্য বাংলার ৩০ লাখ লোক প্রাণ বিসর্জন দেয়নি।

অধ্যাপক মোজাফফরের বক্তব্যের সমালোচনা

অধ্যাপক মোজাফফর আহম্মদ মওলানাকে দেশ ছেড়ে যাবার উপদেশ দিয়েছে। তার তীব্র নিন্দা করে মওলানা সাহেব বলেন যে, এদেশ কারো পৈতৃক সম্পত্তি নয়। তিনি বলেন, ১৯৪২ সালে স্যার জ্যাকশনও তাকে দেশত্যাগ করতে বলেছিলেন, তার পরিবর্তে তিনি কারাকেই শ্রেয় মনে করেছিলেন।

অধ্যাপক সাহেবের উদ্দেশ্য মওলানা সাহেব বলেন যে, বই পড়ে থিউরি আওড়িয়ে রাজনীতি হয় না, মানুষের চিত্ত জয় করতে হয়। তিনি বলেন, গ্রামে গ্রামে গিয়ে মানুষের দুঃখ-দুর্দশা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানার্জন করুন।

মওলানা সাহেব অভিযোগ করেন যে, শেখ মুজিবর রহমান, নজরুল, তাজউদ্দিন, মনিসিং প্রমুখ ভারতের লেজুড় হয়ে কাজ করছে, এতে এ সরকারের পতন ডেকে আনবে।

আরও ৭৫ লাখ দাবী করছে ভারত

বাংলার দূতে বিশ্বপ্রেম কোথায় আছে দেখাও

'হক-কথা'য় সংবাদ প্রকাশিত হবার পর ভারতীয় দূতাবাস ও বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন যুগপৎ প্রতিবাদের ছড়াছড়ি শুরু করলেন যে, ভারতের বিশ্বপ্রেমকে বাংলার দুত করে আনা হয়েছে। এর জন্য কোন দাম এখনও যদি সাব্যস্ত না হয়ে থাকে তবে ২০ বৎসরে জাহাজটির কত দাম ভারত নেবে শিপিং কর্পোরেশন তার ব্যাখ্যা দিলেন না কেন? এটা কি সত্য নয় যে, বাংলাদেশকে জাহাজখানা গছিয়ে দিয়ে ভারত এখন তার জন্য ১ কোটি ৭৫ লাখ টাকা দাবী করেছে। জাহাজ যখন আনা হচ্ছিল তখন ভারতের ভাবসাবে ' কোটি খানেক টাকা দিও' অভিব্যক্তি প্রকাশ পাচ্ছিল। এখন টোপ গিলে বসার পর দাবী করা হচ্ছে আরও ৭৫ লাখ টাকা টাকা।

শিপিং কর্পোরেশনের পাবলিক রিলেসন্স অফিসার 'হক-কথা'র সংবাদের প্রতিবাদ করতে গিয়ে বলেছেন, বাংলার দূত ভারতে ১০ টি বৎসর মাল টেনেছে। জাহাজটি সম্পূর্ণ নিখুঁত ও অক্ষত রয়েছে। জাহাজটি নির্বিঘ্নে

১০টি বৎসর কাজ দিতে পারবে। যদি তাই হয় তবে, বাংলার দূত বাংলাদেশে আসার দেড় মাসের মধ্যে বাংলাদেশ শিপিং করর্পোরেশন ৭০ হাজার টাকা মূল্যের খুচরা যন্ত্রপাতি ঐ জাহাজের জন্য কেন ক্রয় করলো?

সমুদ্রগামী জাহাজে রাডার-জেনারেটর থাকতেই হয়। বাংলার দূত হস্তান্তরের সময়ে বাংলার দূতে বিনষ্ট ও অকেজো একটা রাডার জেনারেটরের খোলস ছিল মাত্র। আর একারণেই বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন ঐ জাহাজের মাষ্টারকে বৃটেন থেকে বৎসরে প্রায় ১৬ হাজার টাকা ভাড়ার রাডার-জেনারেটর ভাড়া করার নির্দেশ দিয়েছে। এছাড়া ঐ জেনারেটর বসাতেও খরচ লাগবে অনেক।

যে রাডার-জেনারেটর ভাড়া করা হবে সেটি বাংলাদেশের নাবিকদের কাছে অপরিচিত ও নতুন। এটি চালনার কৌশল শিক্ষা নেবার জন্য উক্ত জাহাজের অফিসারকে ব্যয়বহুল ট্রেনিং-এ অংশ নিতে হবে। বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের পাবলিক রিলেসন্স কর্মকর্তা এ সত্যগুলো অস্বীকার করতে পারবেন কি?

আমরা জবাব চাচ্ছি জনগণের পক্ষ থেকে ঃ

১. বাংলার দূত হস্তান্তরের পূর্বে বাংলাদেশ সরকারের কোন অনুমোদিত যোগ্যতাসম্পন্ন সার্ভেয়ার জাহাজটি সার্ভে ও পরীক্ষা করেছিলেন কি? যদি করে থাকেন তবে তার নাম ও পরীক্ষার তারিখ প্রকাশ করা হোক।

২. বাংলার দূত গ্রহণের পূর্বে বাংলাদেশ সরকারের কোন টেকনিক্যাল উপদেষ্টা কমিটি এ জাহাজ গ্রহণ অনুমোদন করেছেন কি? যদি করে থাকেন তবে টেকনিক্যাল উপদেষ্টা কমিটির সদস্যদের নাম প্রকাশ করা হোক। ভবিষ্যতে জনসাধারণ আগ্রহ সহকারে তাদের পরামর্শ ও সুপারিশ জানাতে পারবে।

৩. বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন একটি অপারেশনাল বা বাধাধরা কার্যক্রম পরিচালনার সংস্থা মাত্র। সরকারের পক্ষ থেকে এ সংস্থা জাহাজ সংগ্রহের আলোচনা করলো কি করে? জাহাজ মন্ত্রণালয় কি ছিল না?

৪. বাংলাদেশ সরকার বা বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন বাংলার দূত সংগ্রহের পূর্বে বাকীর ভিত্তিতে পুরানো জাহাজ ক্রয়ের জন্য বিশ্ববাজার থেকে টেণ্ডার আহ্বান করেছিল কি? যদি করে থাকেন তবে কখন ? যদি না করে থাকেন, কেন করেনি?

৫. জাহাজ শিল্প ও জাহাজ সংস্থা বিশেষজ্ঞদের প্রচলিত ধারণা হলো যেকোন জাহাজ লাইনার সার্ভিসে ২৫ বৎসর কাজ দিতে পারে। বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের কর্তারা মোট ২০ বৎসরের লাইনার সার্ভিসেই সন্তুষ্ট (ইতিমধ্যে ১০ বৎসর ভারতে কেটেছে আর ১০ বৎসর এখানে চালানো যাবে বলে প্রত্যাশা।) ভারতের লক্কর মার্কা এ জাহাজ বাকী ১৫ বৎসর কাজ দিতে পারবে না। বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের কর্তারা তা ভাল করে জেনেই ১০ বৎসরের কথা কি বলেননি?

৬. ইউরোপ যাবার পথে বাংলার দূতের চতুর্থ ইঞ্জিনিয়ার তার ডিউটি রুমে যন্ত্রের অংশ ভেঙ্গে পড়ে আহত হয়ে হাসপাতালে গেছেন। জাহাজ থেকে ইঞ্জিনের অংশ খুলে পড়ার মত নড়বড়ে পুরানো বলেই কি এ দুর্ঘটনা ঘটেছে? না বাঙালী তরুণ অফিসারকে খতম করে দেবার জন্য ভারতীয় পদস্থ ইঞ্জিনিয়ারদের ষড়যন্ত্রের ফলে এটা ঘটেছে।

নেপালের গলা ভারত ফাঁসি জড়িয়ে দিচ্ছে

আগষ্টের শেষভাগে কমপক্ষে ১০০ সশস্ত্র ব্যক্তি আক্রমণ চালিয়েছে নেপালের সীমান্ত পল্লীর উপর। ক্ষুদ্র পার্বত্য দেশ নেপালের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরী বিরাটনগরের ৫০ কিলোমিটার দূরে সংঘটিত এ হামলায় নেপালের একজন জাতীয় পুলিশ কর্মচারী

প্রাণ হারিয়েছেন। নেপাল সরকারের ঘোষণা ও বিবৃতিতে লক্ষ্য করা গেছে এক অস্বস্তি এবং আতঙ্ক।

১৯৬১-৬২ সালের দিকে রাজা মহেন্দ্র পার্লামেন্ট বিলোপ ঘোষণার পর যে সব রাজনীতিক ভারতে পালিয়েছিল তাদের দ্বারাই এ আক্রমণ পরিচালিত হয়েছে বলে পর্যবেক্ষকমহল ধারণা প্রকাশ করছে। আক্রমণকারীরা পুলিশের হাতে মার খেয়ে পালিয়ে গেছে ভারতীয় পল্লীর দিকে।

এ থেকে একটি বিষয় দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, ভারতীয় সীমান্তের সন্নিহিত ক্ষুদ্র দেশ নেপাল নিজের স্বাতন্ত্র ও স্বাধীনতা বজায় রেখে বাঁচতে চাইলেও সম্প্রসারণবাদী ভারত ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নিয়ে নেপালকে স্বতন্ত্র ভূমিকা থেকে ফিরিয়ে এনে নিজের বংশবদে পরিণত করার জন্য ঘৃণ্য চেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে।

যেসব রাজনীতিক ভারতে বসে ভারতের ইঙ্গিতে, ভারতের স্বার্থে নেপালকে ভারতের পুতুল হিসাবে কাজ করছে তারা নেপালে গঠিত ভারতীয় কংগ্রেসের শাখাতুল্য রাজনৈতিক সংগঠনের নেতা। নেপালের অভ্যন্তরে প্রধানমন্ত্রী বিস্তার সরকারের বিরুদ্ধে জনৈক সাবেক ভারতপন্থী প্রধানমন্ত্রী যখন আন্দোলন শুরু করেছে এবং নেপালের ছাত্র-সাধারণ রাজনৈতিক অধিকারের দাবীতে সংগ্রাম পরিচালনা করে বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ইত্যাদি অচল করে দিয়েছে – ঠিক তখন ভারতীয় ভূখণ্ডের দিক থেকে নেপালের উপর আক্রমণ পরিচালনার অর্থ সুস্পষ্ট।

নেপালের জনগণকে ভারতে আশ্রিত আন্দোলনমুখী করে তুলে সহজে বিস্তার সরকার ও নেপাল রাজাকে অপসারণের পন্থা বাৎলে দেবার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে আগষ্টের শেষভাগে সংগঠিত তৎপরতায়।

ভারতের খপ্পর থেকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের হুকুমদারী থেকে নেপালকে রক্ষার জন্য বিস্তা সরকারের আগেও এ আমলে যেসব ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সেকালের প্রগতিশীল আন্দোলনগুলো যেন সেই ধারা বজায় না রেখে পুরোপুরি ভারতীয়দের হাতে আত্মসমর্পণ করে, এতোদ্দেশে পরিচালিত হচ্ছে গভীর ষড়যন্ত্র।

বিস্তা সরকারকে অপসারণ করার প্রয়োজন নেপালী জনগণ অনুভব করলে তারা দেশের অভ্যন্তরে আন্দোলনের মাধ্যমেই তা করতে পারবে। কিন্তু ভারতের সম্প্রসারণবাদীরা আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের দাবার ঘুটি হয়ে নেপালকে তার স্বাতন্ত্র ও স্বাধীনতার কক্ষ থেকে টেনে-হিচড়ে নিজেদের পদতলে নামাতে চাইছে – নেপালের আন্দোলনকে কাজে লাগিয়ে।

ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের বিষাক্ত লেহনে ভারতের পাদমূলে সমুদ্রবক্ষে অবস্থিত শত লাখ মানুষের দেশ শ্রীলঙ্কার আজ হৃদকম্প উপস্থিত হয়েছে। নেপাল এতদিন দিন কাটাচ্ছিল কোন প্রকারের। আজ তার উপরও নেমে এসেছে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের রাহুগ্রাস।

নেপাল সরকারের প্রতিবাদের উত্তরে ভারত বলেছে প্রতিবেশীর স্বাধীনতার বিরুদ্ধে কাজ করা ভারতের নীতি নয় – নেপাল সভয়ে এ চাপা হুঙ্কার স্বীকার করে বলেছে, তাই যদি হয় তবে আমরাও খুশী।

কিন্তু নেপাল সরকার ও সচেতন জনগণ জানে কারা তাদের স্বাধীনতাকে নিজেদের পদতলে বিসর্জন দেবার আহ্বান জানাচ্ছে, হয়ত ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের নিজস্ব কায়দার পূর্ণগ্রাস নেপালের উপর অচিরেই শুরু হয়ে যাবে। দেবদুলাল বন্দোপাধ্যায়রা গলা কাঁপিয়ে স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতার মহান আদর্শের গৎ গাইতে শুরু করবেন নেপালের জনগণের উদ্দেশ্যেও।

দক্ষিণ-এশিয়ায় শান্তির ধ্বজায় ভারত হয়ত শান্তি সত্যি চায় কিন্তু তার সে শান্তি প্রভুর শান্তি। সে চায় নিঃশক্তি দেশগুলোকে কবরের নিস্তব্ধতায় ঠেলে দিয়ে তার উপর বসে মৌন ঋষির মত ধ্যান করতে। কিন্তু এই ঋষির মৌনতা কি ঐকান্তিকতা না ভন্ডামী বাংলাদেশের জনগণ তা সত্যি উপলব্ধি করতে পারছে।

মামুর জোরে মার্সিডিজ

মামুর জোরে, বিশেষতঃ এমসিএ মামুর জোরে এডিশনাল এটর্নী জেনারেলও হওয়া যায়। মিথ্যা দলিলকে পদাধিকার বলে সার্টিফিকেট দিয়ে পয়সাও আমদানী করা যায় প্রচুর। আর এর বদৌলতে নড়বড়ে একখানা গাড়ী ৯ মাসের ব্যবধানে একখানা মার্সিডিজ ও কয়েকখানা হাল মডেলের চকচকে গাড়িতে পরিণত হয়। এ ফিকির কত দিন চলবে ভাগ্নে ?

মোচওয়ালারা মন্ত্রীর চেয়ে পাওয়ারফুল

সাবেক পাক পিডব্লিউডি (বর্তমান বিপিডব্লিউডি) স্পোর্টস ক্লাবের মোহাম্মদপুরস্থ আসাদগেট সংলগ্ন পেট্রোল পাম্পটি মোচওয়ালা লম্বা চুলওয়ালারা দখল করে নিয়েছে। এদিকে পাম্পের ১০ জন কর্মচারী আজ ১৮ মাস যাবৎ বেকার ঘুরে ফিরছেন। এ কর্মচারীরা ১৯৭১-এর অসহযোগ পালন করেন। এলাকা বিপজ্জনক বলে ২৫ শে মার্চের পর পালিয়ে যান। এরপর জনৈক অবাঙ্গালীর হাতে পেট্রোল পাম্পটি দেয়া হয়। স্বাধীনতার পর কর্মচারীরা ফিরে আসেন। তারা এসে পাম্প পাহারা দেন। ২/৩ দিনের মধ্যে পাম্প চালু করার জন্য বামা ইন্টার্ণের কাছে পিডব্লিউডি থেকে পত্র লিখিয়ে আনেন ১৯৭১-এর ৩০ শে ডিসেম্বর। জানুয়ারীর ৮ তারিখে মোচওয়ালারা এসে পাম্প দখল করে কর্মচারীদের তাড়িয়ে দেয়। তারা জানায় যে, বার্মা ইষ্টার্ণ ও পিডব্লিউডি উভয়ের মৌখিক অনুমতি নাকি রয়েছে। অথচ স্পোর্টস ক্লাবের নয়া কমিটি পাম্প উদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছেন। পূর্বশর্ত ও বিভাগীয় কমিশনারের চেষ্টা ও হুকুমের পর আজ আড়াই মাস যাচ্ছে। মোচওয়ালারা ওদের চাইতে ক্ষমতাশালী বলে মনে হচ্ছে।

অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রীর কাছে ভাসানীর স্মারকলিপি

গত রোববার ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (ভাসানী গ্রুপ) উদ্যোগে অনুষ্ঠিত জনসভায় গৃহীত প্রস্তাব এবং ভারপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রীর নিকট হস্তান্তরিত স্মারকলিপিতে বর্তমান সরকারের পদত্যাগ দাবী করা হয়েছে। এছাড়া জাতীয় কনভেনশন ডাকা, জরুরী সর্বদলীয় জাতীয় সরকার ও সর্বদলীয় দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি গঠনের দাবীও জানানো হয়। প্রস্তাবিত সরকার জনগণকে সংঘবদ্ধ ও সক্রিয় করে তুলে নিম্নলিখিত আশু পদক্ষেপ গ্রহণ করবে বলে স্মারকলিপিতে আশা প্রকাশ করা হয়।

প্রস্তাবের বিবরণঃ

১. চাল, ডাল, তেল, লবণ, কাপড় প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় জিনিষের জন্য দেশের সর্বত্র পূর্ণাঙ্গ রেশন-এর ব্যবস্থা করা। যদি আধ পেটা খেতে হয়, দেশের প্রতিটি লোকই আধপেটা খাবে।

২. ঘুষখোর, দুর্নীতিবাজ ও মুনাফাখোরদের শিকড়সহ উপড়ে ফেলার ব্যবস্থা নেবে। দুর্নীতিবাজ এমসিএ, আমলা, রাজনৈতিক কর্মীদের স্বাধীনতার পূর্বে ও পরের হিসাব-নিকাশ নেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৩. সমগ্র জিনিসপত্র ন্যায্যমূল্যে বিক্রি হবার ব্যবস্থা করবে।

৪. চোরাচালান আর চোরাকারবারীর ভিত উপড়ে ফেলবে। ভারতের শাসকগোষ্ঠীর সাথে সম্পাদিত সীমান্ত বাণিজ্যচুক্তি বাতিল করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৫. সাম্রাজ্যবাদের ও অন্যান্য বিদেশী শক্তির কর্তৃত্বকে চূর্ণ করে সত্যিকারের স্বাধীন বৈদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক নীতি প্রতিষ্ঠা করবে। ভারতের সঙ্গে সম্পাদিত সকল অর্থনৈতিক কিংবা সামরিক চুক্তি বাতিল করবে।

৬. দেশের সর্বস্তরে উৎপাদন বৃদ্ধির সংগ্রামে মেহনতি মানুষের উদ্যোগ ও কর্তৃত্বের পথ খুলে দেবে। শ্রমিক-কর্মচারী ও ক্ষেতমজুর যাতে নূন্যতম মাসিক তিনশত টাকা মজুরী পায় তার নিশ্চয়তা বিধান করবে।

৭. খোদ কৃষকের হাতে জমি–এই নীতির ভিত্তিতে কৃষি ও ভূমি-ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৮. কৃষকদের বকেয়া খাজনা ও কৃষি ঋণের হাত থেকে মুক্তি দিয়ে তাদের কৃষিজাত দ্রব্যাদি বিশেষ করে পাটের ন্যায্যমূল্য পাওয়ার নিশ্চয়তা বিধান করবে। বর্তমান দ্রব্য মূল্যের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে প্রতি মণ পাটের মূল্য ১২০ টাকা ধার্য করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে।

৯. বন্যা সমস্যাকে সর্বপ্রধান জাতীয় সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করে তার সমাধানের জন্য আশু ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১০. দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। দেশরক্ষা ব্যবস্থাকে অবশ্যই স্বয়ংসম্পূর্ণ ও আত্মনির্ভরশীল করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১১. সংগঠিত জনগণের সহযোগিতায় দুর্বৃত্তদের শায়েস্তা করে শান্তি-শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করবে।

১২. জনগণের প্রতি অপরাধকারীদের যোগ্য শাস্তি দেবে।

১৩. রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষতা নীতির প্রতি অবিচল থেকে সমস্ত প্রকার ধর্মশিক্ষা ও ধর্মপালনের নিশ্চয়তার ব্যবস্থা করবে।

১৪. সাম্প্রদায়িকতা ও আঞ্চলিকতার মূল উৎপাটন করবে।

১৫. পাকিস্তানে আটক বাঙ্গালীদের ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করবে।

১৬. জাতিসংঘে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তির উপযোগী ব্যবস্থা নেবে।

১৭. ভারতের ও অন্যান্য প্রতিবেশী রাষ্ট্রের জনগণের সঙ্গে প্রকৃত বন্ধুত্ব শক্তিশালী করে তুলবে।

১৮. অনতিবিলম্বে শাসনতন্ত্র প্রনয়ণ করে তার ভিত্তিতে নিয়মতান্ত্রিক সরকার গঠনের ব্যবস্থা করবে। শ্রমিক-কৃষক ও মেহনতি মানুষের স্বার্থ সংরক্ষণের নিশ্চয়তা বিধান করবে।

সন্দ্বীপে এখন নরক যন্ত্রণা

শেখ সাহেব, এদের সামলান!

সন্দ্বীপের সারিকাইত, মাইটভাঙ্গা প্রভৃতি এলাকার ৫ জন প্রবীণ-আওয়ামী লীগের সন্দ্বীপের বুকে বর্তমানে সংঘটিত ঘটনাবলীর জের টেনে এক পত্রে লিখেছেন।

দু'এক দিন নয়, ১০/১২ বছর ধরে আওয়ামী লীগ শাসনের চেহারা দেখে আমরা বীতশ্রদ্ধ। 'দরকার বশতঃ লোকহত্যা করে পথের কাটা সরানো– এটাই কি স্বাধীনতা'– তাদের অভিজ্ঞতা ঃ কথায় কথায় ষ্টেনগান নিয়ে তেড়ে আসা, এটা কি সরকারী আদেশ?

দীর্ঘ চিঠির উপসংহারে তাঁরা লিখেছেন, সরকারের কাছে বহুবার জানানো হয়েছে, কিন্তু আজ আর কালি নেই, কলম মুষড়ে আসছে।

তাঁদের আকুল ফরিয়াদ ঃ শেষে নিরুপায় হয়ে 'হক-কথা'র শরণাপন্ন হলাম, আমাদের এই দ্বীপবাসী জনগণের মর্মন্তুদ কাহিনী সারা দেশের মানুষকে জানিয়ে দিন।

সারিকাইতের সামছুল হক রিলিফের চাল চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছে। আওয়ামী লীগের অসৎ নেতৃত্বের চাপে তার বিচার হয়নি। প্রতিটি ইউনিয়নেই চলছে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। সাতঘড়িয়ার সত্যেন, গনেশ কর্মকার ও কামালউদ্দিন মুক্তিবাহিনীর নাম ভাঙ্গিয়ে জনসাধারণের উপর চালাচ্ছে নির্মম অত্যাচার।

মুজিববাহিনীর নামে দুলাল চন্দ্র, অমর কর্মকার, নারায়ণ চন্দ্র, মৃণাল বাবুরা সারা দ্বীপে সৃষ্টি করেছে এক শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশ। "বলার ইচ্ছে ছিল না, সাম্প্রদায়িক চেতনাকে আমরাও ঘৃণা করি। তবুও কি অসহায় অবস্থায় পড়ে বলছি ভেবে দেখুন"– এ কথা লিখে তারা জানাচ্ছেন মুসলমানদের মধ্যে যারা বুদ্ধিজীবী, সামাজিক সৎচরিত্র তাদেরকে এরা অহরহ দালাল বলছে। এদের বিরুদ্ধে মিথ্যা ষড়যন্ত্র তো রয়েছেই, উপরন্ত জনগণের মধ্য থেকে মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টার ব্যর্থ হয়ে চক্রটি গুপ্তহত্যার ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে। অতীষ্ঠ হয়ে অনেক সমাজকর্মী আওয়ামীলীগার দ্বীপ ছেড়ে চলে গেছেন, অন্যত্র বাস করছেন।

"বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, এসে তদন্ত করে আপনারা দেখুন, এই স্বাধীন বাংলায় এই দ্বীপে পাঞ্জাবিদের কায়দায় কারা আমাদের মা-বোনের উপর হিংস্র হায়েনার মত নির্যাতন করছে। আবারও বলছি, সাম্প্রদায়িকতাকে তাড়াবার জন্য আমরা আওয়ামীলীগরা, ন্যাপকর্মীরা এক শতাব্দীর এক চতুর্থাংশ ব্যাপী সংগ্রাম করেছি। আজ আমাদের স্বপ্ন সার্থক হতে চলছে। কিন্তু তদন্ত করে দেখুন জেনে রাখুন, কারা আজ এই সম্প্রীতির পবিত্রতার উপর আঘাত হানছে।"

শুনছি, মুসলমান বুদ্ধিজীবী শিক্ষিত লোকদের একটা তালিকা হয়ে গেছে। এদের সরিয়ে ফেলতে পারলে, নব্য ফ্যাসিস্টরা দ্বীপের নেতৃত্ব পাবে বলে আশা করছে।

ইতিমধ্যে যাদের হত্যা করা হয়েছে তাদের মধ্যে আবদুল খালেক সওদাগর অন্যতম। রাতের অন্ধকারে তাকে মেরে দু'লাখ টাকার অলঙ্কার ও অর্থ অপহরণ করেছে মুজিববাহিনী। হাইস্কুল পলিটিক্সে বি. কম, বিএড মোহাম্মদ কামালকে হত্যা করা হয়েছে। ছাত্রদের সন্তানের মত জেনে তিনি পড়াতেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে হাইস্কুলটি আজ গো-শালা। তৃতীয় শিকার শফিউল্ল্যা সওদাগর। শফিউল্ল্যা সওদাগরকে লক্ষ্য করে গুলী ছোঁড়া হলে তার শ্যালক ভগ্নিপতিকে বাঁচাতে গিয়ে গুলী বুকে নিয়ে মরেন। শফিউল্ল্যা বেঁচে যান।

সংগ্রামকালে আওয়ামী ভিত্তিক কমিটিকে সংগ্রাম পরিষদে রূপান্তর করা হলে গণআদালত বসলো। স্থানীয়ভাবে ট্রেনিংপ্রাপ্ত মুজিববাহিনী শুরু করলো এক নারকীয় উৎসব। ষ্টেনগান বুকে ঠেকিয়ে বেপরোয়া পাইকারী হারে লোকজনকে হাজির করলো গণ আদালতে। আদায় করলো হাজার হাজার টাকা। টাকা না থাকলে দিতে হয়েছে জান। যার হাতে অস্ত্র নেই, তারাই হল এদের শিকার।

রমজান মাসে দক্ষিণ সন্দ্বীপ হাইস্কুল প্রাঙ্গণে সমবেত মুজিববাহিনী এক উৎসুক ১৩ বছরের কিশোরকে গুলী করে হত্যা করলো। ঈদের দিনে ঘেরাও অভিযানের সাথে চলল সান্ধ্য আইন। ছালামত নামে জনৈক আওয়ামী লীগারকে হত্যা করলো তারা। অথচ সালামতের দু'ছেলে তখন মুক্তিবাহিনীতে।

মুজিববাহিনীর উদ্যত ষ্টেনগানের ভয়ে এবং জান কবজের তালিকায় নাম থাকায় অনেক আওয়ামীলীগার ও দেশপ্রেমিক-সমাজকর্মী বউ, ছেলে-মেয়ে ফেলে কোথাও পালিয়ে আছেন।

মদের আড্ডা জমেছে এখন যত্রতত্র। প্রগতিশীল কর্মীদের ও ছাত্রদের নকশাল বলে হত্যা করা হচ্ছে।

গোপনে নমিনেশন এনে চোর-বদমায়েশ ও লুটেরাগুলো বানিয়েছে পঞ্চায়েৎ কমিটি।

হাজী মতিউর, মৌলবী ইউনুছকে রাতের অন্ধকারে হত্যা করে দেড় লক্ষ টাকার অলঙ্কার ও নগদ অর্থ লুট করা হয়েছে।

ডাকাতি চলছে চমকপ্রদভাবে। ১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চ থেকে ১৯৭২ সালের জুলাই পর্যন্ত ডাকাতি ও হত্যাকাণ্ড হয়েছে অনেক। সবকটিই ধনী ও মধ্যবিত্ত এমনকি নিম্নবিত্ত মুসলমানের বাড়ীতে। হিন্দু জোতদার, মহাজন, ব্যবসায়ীদের একজনও যদি ডাকাতির খপ্পরে পড়তো, তবু না হয় কথা ছিল। ডাকাত কেবল মুসলমান চিনছে কেন?

সন্দ্বীপ থানা প্রধানের কাছে যে পুলিশ আছে তা দিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের পাহারাই চলে না। বিচারপতির কাছে মামলা গেলে তিনি পাঠান আওয়ামী লীগের দুর্দান্ত সম্পাদক চৌধুরীর কাছে। তিনিই দণ্ডমুন্ডের কর্তা। আর আওয়ামী লীগ খোল নেউচা বদল করে এখন হয়ে উঠেছে জাতীয় বাহিনী।

পত্র লেখকগণ প্রশ্ন করেছেন, বলুন শেখ সাহেব, ভারতপ্রেমই কি এদেশের জন্য দেশপ্রেম? তাঁরা প্রশ্ন করেন, শেখ সরকার দেশ চালায়, না হিন্দু প্রধান মুজিববাহিনী চালায় দেশ। তিন লাখ অধিবাসী অধ্যুষিত প্রাকৃতিক দুর্যোগে বারবার বিপর্যস্ত সন্দ্বীপের বুকে স্বস্তি ফিরিয়ে দেবে কে?

গ্রাম থেকে বলছি

সোহরাব হোসেন

থাকতো যদি আমার কাছে টাকা
চলে যেতাম রাজধানীতে ঢাকা।
আমলাদেরে বল্‌তেম বেটা এটা হচ্ছে কি?
কোন দেশেতে আছে এমন তেলের দরে ঘি।
কোন দেশেই বা আছে এমন ধোঁকার বাহার,
মরতে দেবনার মাঝে পায়না আহার
আজো যেথা লক্ষ মানুষ করছে হাহাকার,
খাচ্ছে কারা? 'শাহবাগে' হিসেবটা দাও তার।
ওরা কারা অট্টালিকার খুশিতে ঝলমল্,
গাড়ী ছাড়া হয়না কেনা ঘি, চিনি, আর ফল।
নালার পাড়ে ঘর বেঁধেছে ওরা আবার কারা,
সমাজতন্ত্রে আছে কোথা ধনী ও সর্ব্বহারা?
রাজার দেশের প্রজা ওরা 'না' কি ভাই-ভাই,
অট্টালিকা কুঁড়েঘরে মিল খুঁজে না পাই।
সস্তা জিনিষ মংগা দামে হচ্ছে বেচা-কেনা।
মুখোশধারী 'তন্ত্রবাদী' যাচ্ছে এবার চেনা।
মুক্তিসেনা পায়না খানা দুঃখে ভরা মন,
দালাল'রা কেন করছে আবার মধুর আলাপন।

সাভার এখনও নরক

শোষক নিপীড়ক বদলায়নি

আইয়ুবের আমলে যারা জনসাধারণের উপর অত্যাচার করেছে, ইয়াহিয়ার আমলে তারাই যমরূপে বিরাজ করেছে সমাজে, শেখ সাহেবের আমলে সেই একই লোকজন জনগণের জীবনকে অতীষ্ঠ করে তুলেছে ঢাকার সাভার থানাধীন তেতুলঝরা ইউনিয়নে। জনসাধারণ অভিযোগ করে বলছেন, এত রক্তক্ষয় আর সংগ্রামের ফল কি তাহলে এ-ই দাঁড়ালো?

থানা কনভেনশন লীগের সেক্রেটারী ছলিমউদ্দিন শেখ মুজিবের লিফলেট মামলায় সরকারী সাক্ষী হয়েছে আইয়ুব আমলে। ইয়াহিয়া আমলে শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান হয়ে সে রাজাকার নিয়ে এলাকা পুড়িয়েছে, সেই লোকটিই এখন এমসিএ-র কৃপায় তেতুলঝরা ইউনিয়ন পঞ্চায়েতের প্রধান হয়েছে।

রিলিফের টাকা আর দালাল রক্ষার মাশুলে লোকটির মোটা পেট আরও মোটা হচ্ছে।

তার আত্মীয় রাজাকার কমাণ্ডার আশ্রাব আলী পঞ্চায়েত নেতার দুষ্কর্মের সহযোগী রয়ে গেছে এখনো।

বড় দালাল ছলিমউদ্দিন তিন স্ত্রী ও ২৫ ছেলে-মেয়ে নিয়ে কোন কাজ ছাড়াই কি করে রাজার হালতে দিন কাটাচ্ছে তা দেখবার কেউ কি নেই?

হক-কথা

২৩শে আষাঢ়, শুক্রবার

ব্যর্থ সরকার সরে দাঁড়াও

প্রাচুর্যের বাংলাদেশে আজ চরম শূন্যতা বিরাজ করছে। অন্নভাণ্ডার এখানে শূন্য। গ্রামে গ্রামে মানুষ আদিম যুগে ফিরে গেছে, কটি বস্ত্র ছাড়া তাদের পরিধেয় নেই। ঔষধের ও চিকিৎসার অভাবে গণমানুষের যন্ত্রণা আরো বেড়েছে। সর্বোপরি আয়-উপার্জনের পথ ক্রমেই রুদ্ধ হয়ে আসছে। শূন্য থালা, শীর্ণদেহ, নিরাভরণ গাত্র, জরায় জর্জরিত কঙ্কালসার মানুষ আজ বাংলাদেশের প্রতীক। জন-জীবনে এই দুর্দশার সূত্র ধরে নেমে এসেছে অপরিমেয় হতাশা। স্বাধীনতা আজ ভুখানাঙ্গা মানুষের কাছে অর্থহীন।

সকল সঙ্কট, সকল অসুবিধার জন্য পাকিস্তানী শাসকরা যেমন বেহিসাবে ভারতের উপর এবং বিরোধীদলের উপর দোষ চাপাতো, আজ এই বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠী ও মুজিব সরকার একই পথ ধরে নিজেদের চরম ব্যর্থতাকে ঢাকা দেবার প্রয়াস পাচ্ছে। তারা সারাক্ষণ তাদের বিদেশী প্রভু ভারত-রাশিয়া-আমেরিকার সাথে স্বল্পমেয়াদী, দীর্ঘমেয়াদী, গোপন ও প্রকাশ্য অসংখ্য ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে এবং ভারতের বিকল্প হিসাবে পেয়েছে চীনকে। বিরোধী দলের ভাগ্য পাকিস্তান আমলের মতই রয়ে গেছে। আওয়ামী শাসকরা পাকিস্তানী শাসকদের সুরে প্রচার করছে যে, তারা ছাড়া দেশপ্রেমিক আর কেউ নেই। জামাতে ইসলামী যেরূপ লীগ শাসনকে বিরোধিতার নামে সমর্থন করে যেত, আজ আওয়ামী লীগ সরকার পেয়েছে তেমনি মোজাফফর দল, মনিসিং দলকে। পাকিস্তান সরকার প্রচার করতো যত হিন্দু সব আওয়ামী লীগে আশ্রয় নিয়েছে, তেমনি বর্তমান শাসকদের চোখে সরকারের বিরোধিতায় অবতীর্ণ গণসংগঠনগুলো আলবদর, রাজাকার ছাড়া আর কিছু নয়। এসব অলীক প্রচারের আশ্রয় নিয়ে সরকার নিজেদের পায়ের তলার মাটি নিজেরাই সরিয়ে ফেলেছে। কারণ, নিরন্ন মানুষ অন্ন চেয়ে ভুখা মিছিলে শরীক হয়েছে এবং হবে, তারা নিজেরা জানে আলবদর, রাজাকার, সাবেক মুসলিম লীগ, জামাত-পিডিপি ওয়ালারা শাসকদের পক্ষাবলম্বনের চিরাচরিত চরিত্রের গুণে ইতিমধ্যে আওয়ামী লীগের নৌকা ভরে দিয়েছে। মোমেন খানের জনসভায় ভাড়াটে শ্রোতারা তখন আওয়ামী লীগের ভাড়া খাটে, বরং আরেকটু দু:সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে তারা মানুষ গুম খুন করছে। রিলিফ নিয়ে নিজেরা মারামারি করে আওয়ামীলীগাররা মরছে। অতিষ্ঠ গ্রামবাসী কম্বল চোরদের মেরে পেটে কম্বল ঢুকিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু এসবের পূর্বাপর দায়িত্ব আওয়ামী লীগের। বিরোধী দলগুলো শুধু জনগণকে প্রয়োজনীয় নেতৃত্ব দিয়ে দাবী আদায়ে সহায়তা করছে।

জনগণের এই সচেতনতা জনগণের মধ্যে ব্যাপ্তি লাভ করায় আজ আওয়ামী লীগ জনগণের মধ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। সারা দেশ জুড়ে কয়েক গণ্ডা মন্ত্রীর অহর্নিশ চীৎকারও তাদের নাও-এ অনুকূল হাওয়া যোগাতে পারছে না।

জনগণকে খাদ্য-বস্ত্র-বাঁচার নূন্যতম সংস্থান করে দিতে ব্যর্থ এ সরকারের কাছে জনগণ আর কি প্রত্যাশা করতে পারে? এদের কাছে প্রত্যাশা করার আর কিছুই নেই। জনগণের

সমর্থন বর্জিত সরকার পরগাছার মত সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনে বিপদের কারণ। কেননা, জনসমর্থন হারিয়ে এরা বিদেশী শক্তির উপর নির্ভর করে। তাদের গোপন ষড়যন্ত্রকে বিনাশর্তে মেনে নিয়ে ক্ষমতায় টিকে থাকতে চায়।

বস্তুতঃ তাই দেখা যাচ্ছে আজ টাকার মূল্য ৩০ পয়সায় নামিয়ে, চালের দর চল্লিশ থেকে ১০০ তে উঠিয়ে, মানুষকে বিবস্ত্র রেখে এ সরকার গণসমর্থন হারাবার পর থেকে এদেশের অভ্যন্তরে আবার ভারতীয় সৈন্য ঢুকতে শুরু করেছে। সরকারী মহলের মধ্যে চাপা গুঞ্জন হলো, পঁচিশ হাজার ভারতীয় গুপ্তচর ইতিমধ্যে বিভিন্ন ভড়ং নিয়ে চেপে বসেছে বাংলাদেশের প্রতিটি স্থানে। আমেরিকায় সাথে গোপন চক্রান্ত চালাচ্ছে সরকার। রাশিয়ার সাথে দহরম মজায় রাখতে গিয়ে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে খর্ব করতেও সরকার দ্বিধা করছে না।

বস্তুতঃপক্ষে বিরোধী দলের উপর এ সরকার যতগুলো দোষ চাপাচ্ছে, সেগুলো যে সরকারের নিজের কর্মকাণ্ডের উল্টো গীত এটা জনগণ বেশ বুঝে নিয়েছেন।

দেশের বুকে আরেকটি ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সূত্রপাত হয়ে গেছে। ক্ষুধার্ত জনতার উপর লাঠি ও গুলী চালনার কসরৎ চলছে। এই শিখণ্ডী সরকারকে জনগণ আর এক মুহূর্তের জন্যও চায় না।

অবিলম্বে ব্যর্থ সরকারের উচিত পদত্যাগ করা এবং জনগণ তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া এই শিখণ্ডীর হাত থেকে মুক্তি পেয়ে নিজেদের সমস্যা দূর করার জন্য ঐক্যবদ্ধ উদ্যোগ নিয়ে দেখিয়ে দেবে, বিদেশী প্রভুর উপর নির্ভর করে নয় বরং নিজ দেশের জনগণের উপর শতকরা একশো ভাগ নির্ভর করেই জনতার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে টিকানো সম্ভব।

ওপার বাংলা দিল্লী ছাড়ো

এপারের বাঙ্গালী

বাংলাপ্রেম আর বাঙালীত্বের অগ্নিপরীক্ষায় অবতীর্ণ হবার জন্য মওলানা ভাসানী ওপার বাংলা অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তাঁর আগষ্ট মাসের সম্মেলনের বক্তৃতায়। এপার বাংলার বাঙালীরা পিণ্ডির সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে মুক্ত হয়েছে। ওপার বাংলার জনগণের কর্তব্য হচ্ছে দিল্লীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তাদের বাংলাপ্রীতি ও বাঙালীত্বের বাস্তব প্রমাণ রাখা।

এবার বাংলার বাঙালীরা ১৯৪৭-এ দেশ বিভাগের পর নিজের বুকের রক্ত ঢেলে হলেও মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা রেখেছে। রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাংলা ভাষায় মর্যাদা আদায় করেছে। পশ্চিমবঙ্গের জনগণ আজো তা পারেনি। দেবনাগরী হরফের হিন্দির গোলামী চলছে তাদের রাষ্ট্রীয় জীবনে। বাংলা ও হিন্দির মধ্যে ব্যবধান হ্রাস করে বাঙালীকে হিন্দিপ্রধান করে তোলার জন্য দিল্লীর একটানা ষড়যন্ত্র পশ্চিম বাঙালীরা সয়ে যাচ্ছে বলেই দেখা যাচ্ছে। অথচ এটা তাদের মুখের সোচ্চার বাঙালীত্ব ঘোষণার সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ।

পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট সাংবাদিক মুক্ত ঢাকার রাজপথ দিয়ে হেটে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলছে এ ঢাকাকে বিশ বছর আগেও দেখেছিলুম এখনও দেখলুম। কি ছিল ঢাকা কি হয়েছে। বিশ্বাস করতে মন চায় না। শান্ত স্নিগ্ধ জীবনও দেখলুম। কেন যে আপনারা ছুটে এলেন।

এপার বাংলার বাঙালীরা কেন ছুটে এসেছে পিন্ডি থেকে তা বাংলাভাষা আন্দোলনের মধ্যে স্পষ্ট। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীকারের দাবীতে এপার বাংলার মানুষদের কোন কৃত্রিমতা ছিল না।

সেই সাংবাদিক আরও বলছেন, দিল্লীর সাথে থাকছি, থাকবো। আমরা তো এর একশতাংশও পাইনি গত দু'যুগে।

ওপার বাংলার মানুষ এই না পাওয়ার বেদনাকে ক্ষোভে রূপান্তরিত করুক, বাংলার ভাষা ও সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও রাজনীতির উপর দিল্লীর মসনদের নির্মম শাসন-জুলুমবাজীর বিরুদ্ধে ফেটে পড়ুক প্রচণ্ড আক্রোশে। এপার বাংলার উত্থানকে আহ্বান জানিয়ে তারা যে বিউগল বাজিয়েছিল আজ নিজের শ্রবণ ইন্দ্রিয় দিয়ে তারা তা শুনুক। আমাদের মুক্তির উল্লাসের অংশীদারও তারা হোক। জীবনের প্রান্তে বাঞ্ছিত পরিবর্তন এনে জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী তাই চেয়েছেন। উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন ওপার বাংলার মানুষদের প্রতি – এসো এবার সত্যিকার বাংলা গড়ি।

পশ্চিমবাংলার মানুষদের উপর দিল্লী মসনদের নির্মম জুলুমের ফিরিস্তি বিরাট। সুলভ শ্রমশক্তি সত্ত্বেও যেখানে বিকাশ ঘটেনি শিল্পের। সর্বভারতীয় মনোপলিরাজদের পুঁজি পশ্চিমবঙ্গের রক্ত শুষে নিয়েছে ও নিচ্ছে। পুলিশ, মিলিটারীর গুলীতে প্রাণ হারাচ্ছে অর্থনৈতিক অধিকারকামী তরুণেরা। রাজনীতির অঙ্গনে ইন্দিরাশাহীর গুপ্তঘাতকেরা প্রতিপক্ষের নেতা থেকে সাধারণ কর্মী পর্যন্ত সবার প্রাণসংহার করছে এক এক করে। গ্রামে গ্রামে ঘেরাও ও দমন অভিযান চালিয়ে পুলিশ-মিলিটারী লাগিয়ে সন্দেহজনক তরুণদের গ্রেফতার, পাকফৌজের কায়দায় বন্দীর চোখ বেধে অজ্ঞাতস্থানে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা পশ্চিমবঙ্গে নিত্যদিন ঘটছে। দিল্লীর শোষণে পশ্চিমবঙ্গ শ্মশান। চাকুরি- বাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য, সম্পদ বন্টন ও রাজনৈতিক ক্ষমতার বৈষম্যের খতিয়ান টানলে তা তদানীন্তন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার বৈষম্যের খতিয়ানকে ছাড়িয়ে যাবে বহুগুণে।

মুসলিম লীগের মতই কংগ্রেস খোলাসে উঠা বদলে ক্রমান্বয়ে শাসন চালিয়ে যাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ ও এর মত কয়েকটি হতভাগ্য অঞ্চলের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীল আস্তানাগুলো একজোট। পশ্চিমবঙ্গের উপর বছরে তিনবার করে কেন্দ্রের প্রত্যক্ষ শাসন জারী হবে যদি লীগের মোনেম খানের মত কংগ্রেসী পাণ্ডারা পশ্চিমবঙ্গে শাসন ক্ষমতায় না আসতে পারে।

পশ্চিমবাংলা সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের মতই শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া সত্ত্বেও বাঙালীদের জন্য চাকুরি নেই সর্বভারতীয় পরিসরে। যদিও থাকে তা কেরানী বাবু পর্যন্ত। এর উপরে চাকুরির কি সুখ বাঙালী বাবুরা তার স্বাদ কোনদিন পায়নি, কোনদিন পাবে না।

পশ্চিমবঙ্গের বাঙালীদের এই দুঃসহ অবস্থা এপার বাংলার বাঙালীরা লক্ষ্য করে এসেছে। দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে তারা লক্ষ্য করেছে পশ্চিমবাংলার মরণ যন্ত্রণা। কিন্তু এপার বাংলার বাঙালীরা এতকাল নিজেরাই ছিল পিণ্ডি মসনদের কুশাসনের শিকার। 'আপনি আচরি ধর্ম পরকে শেখাও'-এ সদোপদেশ অনুসরণ করেছে এপারের বাঙালীরা। তারা ৩০ লাখ জীবন দিয়ে নিজের বাসভূমিকে মুক্ত করেছে। প্রতিষ্ঠা করেছে স্বাধীন বাংলাদেশ।

এপার বাংলার মানুষেরা আজ তাদের ভূমিকা সম্পন্ন করেছে। আজ তারা হয় প্রত্যয়, বলিষ্ঠতা নিয়ে আহ্বান জানতে পারে, এসো ওপারের নিপীড়িত ভাইয়েরা, এবার তোমরা মুগ্ধ হয়ে এসো। এপারের বাঙালীরা পিণ্ডির গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ থেকে যদি ওপার বাংলার বাঙালীদের স্বাধীন হবার ডাক দিতো, তা হাস্যকর হতো। তবে এ বাংলার মানুষ আজ সমাত্রা পেরিয়ে এসেছে। আজ ডাক দিতে পারে নির্দ্বিধায়।

আমরা পিণ্ডির গোলামী করছিলাম। আমাদের উপর চলছিল অত্যাচার, নিপীড়ন, শোষণ ও বঞ্চনা। আমাদের এ দুর্ভোগের জন্য ওপার বাংলার মানুষ, বিশেষতঃ বুদ্ধিজীবী, লেখকদের, বেতার শিল্পীদের, বক্তাদের দুঃখের অন্ত ছিল না। আমাদের প্রতি তারা বার বার আহ্বান জানিয়েছেন, বাঙালীত্বের স্বকীয়তা ব্যাখ্যা করেছেন। গভীর

কৃতজ্ঞতাবোধ নিয়ে আমরা আমাদের নিজস্ব উপলব্ধির উপরে ওপার বাংলার এই দরদকে গ্রহণ করেছি। নিজেদের চেতনায় জাগিয়েছি উৎসাহ, যদিও আমরা তখনো বলবার সুযোগ নেইনি, তবু আশা রেখেছি মনে, ওপার বাংলা-এপার বাংলা মিলে আমরা জনগণ গড়ে তুলবো এক শান্তির নীড়।

এপার বাংলা-ওপার বাংলা বলে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালীরা যখন কোরাস তুলতেন আমরা রুদ্ধ কম্পিত বুকে তা শুনতাম, আমাদের আকুল ইচ্ছে জাগতো, সাড়া দিই। কিন্তু আমরা দেইনি। কারণ, আত্মসচেতন এপার বাংলার মানুষ 'নিজের আচরি ধর্ম পরকে শেখাবার' নীতিতে চির অটল।

বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে বেরিয়ে আসার পর পরেই দিল্লীর মসনদের নির্মম শাসকরা ওপার বাংলার বেতারের কণ্ঠ চেপে ধরেছে, পত্র-পত্রিকার কলমকে নির্বাক করে দিয়েছে, রহস্যজনকভাবে ওপার বাংলা থেকে 'এপার বাংলা – ওপার বাংলা' রোল ও ধ্বনি গেছে বন্ধ হয়ে।

আমরা ভিন্ন কিছু ভাবতে নারাজ। আমরা ভাবতে নারাজ, দিল্লীর ইঙ্গিতে সময়ের প্রয়োজনেই ওপার বাংলা ইতিপূর্বে ইত্যকার কোরাস শুনিয়েছিল। আমরা এখনো বিশ্বাস করি, ওপার বাংলার নিপীড়িত, নির্যাতিত বাঙালীদের বুকে এখনো বাংলার দরদ ও প্রীতি গুমরে মরছে। ওদের কাঁধে নয়, টুটিতে ইন্দিরার হাত পড়েছে বলেই আজ তারা নীরব, এটাই আমরা বিশ্বাস করি।

জননেতা মওলানা ভাসানী আহ্বান জানিয়েছেন, দিল্লীর তখতে তাউসের ভিত কাঁপিয়ে পশ্চিমবঙ্গের ১৪টি জেলার বাঁটি বাঙালীরা মুক্ত হও, এসো এক সাথে মিলি, তারপর গড়ি বাংলাদেশ।

মওলানা ভাসানী বলেছেন, বাংলাদেশ ভাগের জন্য এপার বাংলার মানুষ দায়ী নয়। এপার বাংলা থেকে যাওয়া-উদ্বাস্তুরাই এ অঘটন ঘটিয়েছে। ওপার বাংলার মানুষ আজ পূর্ব কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনায় দগ্ধ যেমন, এপার বাংলা অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে ভুল শোধরে নিয়েছে। আজ ওপার বাংলার মানুষদের ভুল শোধরাবার দিন।

আমাদের উদ্দেশ্যে ইতিপূর্বে তারা যে আহবান জানিয়েছিলেন, আমাদের অন্তরের অন্ত:স্থলে তা চিরদিনের জন্য গ্রথিত হয়ে আছে। ইন্দিরার ফ্যাসিস্ট হাত ওপারের মানুষের কণ্ঠরোধ করলেও, এপার থেকে আমরা ওপার বাংলার ভাইদের গাওয়া আবাহনী একই সুরে আবার পুনরাবৃত্তি করবো। জলদ গম্ভীর কম্পিত কণ্ঠে আমরাও বলবো, এপার বাংলা-ওপার বাংলার আর্থিক বন্ধন কোন লৌহ কঠিন প্রাকার দিয়ে ছেদ করা যাবে না, কোন বর্বর অত্যাচারীর নির্যাতন ওপার বাংলার মানুষের আত্মপরিচয় ভুলিয়ে দিতে পারবে না – যুগ যুগ ব্যাপী এক পরিবেশ, এক আবহাওয়া-জলবায়ু, এক নদীর জলে এক মাটির ফসলে জন্ম নিয়েছে যে বন্ধন, সে বন্ধন আবার ফিরে আসবেই। ওপার বাংলার বাঙালীরা ভারতীয় নয়। সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে '৪৭-এর দেশমাতৃকার বক্ষকর্তনকে আমরা মানবো না, মানি না।

এপার বাংলার মানুষ ওপার বাংলার বাঙালীদের জালিমশাহী, নাদিরশাহীর কবল থেকে উদ্ধার করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ওপার বাংলার বাঙালীদের উপরই আজ নিজেদের ঘোষিত অঙ্গীকার পূরণের দায়িত্ব পড়েছে। আমরা সহায়ক ভূমিকা পালন করবো তাদের সমর্থনে।

ওপার বাংলার বাঙালীদের কাছে বাঙালী জাতীয়তাবাদ, বাংলাদেশ ও বাঙালী স্বকীয়তার অনেক কথা আমরা শুনেছি, আজ চাই তার প্রমাণ। আমরা আশা করবো এ প্রমাণ রাখতে তারা বিলম্ব করবেন না।

আপনার চিঠি

একটি আবেদন

জনাব,

আমি বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন সংস্থার (নির্মাণ) বিভাগের একজন কার্য-সহকারী। ১৯৬৭ ইং সালে প্রয়োজনের অন্ধ তাগিদে বিএডিসি-তে কাজে যোগদান করি। তখন আমাদের বেতনের স্কেল দেওয়ার কথা ছিল না। তারপর আমরা কার্য-সহকারীগণ বহু লেখালেখি, বহু অনুরোধ-উপরোধের পর ১৯৭০ সালে "সংস্থার" কর্মচারী ইউনিয়নের সাথে বোর্ড অব ডাইরেক্টরস-এর এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, তাতে কার্য-সহকারীদের ১৯৭০ সাল হতে নিয়মিত বেতনের স্কেল ও সংস্থার দেয় অন্য সকল সুযোগ দেওয়ার কথা ছিল (যা অন্য সকল কর্মচারী পেয়ে থাকে)। কিন্তু দুঃখের বিষয় ১৯৭০ /৭১/৭২ও শেষ হতে চলল সেই চুক্তির ফল আজও প্রকাশ পায়নি। প্রকাশ থাকা ভাল যে নির্মাণ বিভাগের সকল প্রকার সুযোগই পেয়ে থাকেন, পাচ্ছে না কেবল কার্য সহকারীগণ। কারণ, কেন তাদের পদবী কার্য সহকারী হলো, কার্য সহকারী না হলে পিয়ন অথবা দারোয়ান হলেই হয়ত কিছু পাওয়ার আশা ছিল।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও যদি সেই সব ঘৃণ্য আমলাতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন অফিসারদের খামখেয়ালির কোন পরিবর্তন না ঘটে, যাদের অমনোযোগের দরুণ শত শত কর্মচারীর জীবন হতাশার নিষ্ঠুর ছোবলে পতিত ও দরিদ্র কর্মচারীদের সংসার বিপন্ন হচ্ছে। তাহলে আমরা মনে করবো ৩০ লক্ষ লোকের বুকের তাজা রক্ত, মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা বৃথা। মহান নেতা 'বঙ্গবন্ধু' বলেছেন শোষণহীন সমাজব্যবস্থা কায়েম করার জন্য। তাই আজ আমাদের জিজ্ঞাসা বিএডিসি-র এই খামখেয়ালী আমাদের প্রতি বিমাতাসুলভ আচরণ নয় কি?

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু বিপ্লব মুজিবুর রহমান বলেছেন, বাংলার ঘরে ঘরে কৃষি বিপ্লব শেখ শুরু করার জন্য। আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে কৃষি কর্মচারীদের বঞ্চিত করতে থাকলে কিভাবে কৃষি ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসতে পারে? বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন সংস্থা সরকারের একটি বৃহত্তম সংস্থা, সেখানে আমাদের মত মাত্র ২০০- ২২৫ জন কার্য-সহকারীদের বেতনের স্কেল, ঘর ভাড়া, যাতায়াত ভাড়া ও বিএডিসি-র দেয় অন্য সকল সুবিধা দিলে সরকার কিংবা সংস্থার কোন ক্ষতি হবে বলে মনে হয় না।

আমাদের প্রতি একতরফা বিচারের দরুণ দিন দিন আমাদের কর্মস্পৃহা হ্রাস পাচ্ছে এবং আমরা অল্প বয়সেই বৃদ্ধ হতে চলেছি।

মহান কর্তৃপক্ষ ও সরকারের প্রতি আমাদের নিম্নলিখিত আবেদন পেশ করছি।

১. আমাদের ১৯৬৮ হতে সকল প্রকার সুযোগ সুবিধার আবেদন।

২. আমাদের প্রমোশ- এর ব্যবস্থা করা হোক।

৩. আমাদের স্বল্পস্থায়ী ট্রেনিং দেওয়া হোক।

কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন উপরে বর্ণিত বিষয়গুলি গভীর সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করে সরকার আমাদের বেতনের স্কেল ও সকল প্রকার সুবিধা দিয়ে 'বাঁচার মত বাঁচতে দেওয়া হউক।'

নিবেদক

জনৈক কার্যসহকারী (নির্মাণ)

বিএডিসি

রাজাকার কনভেনর এখন রেশন ডিলার

চট্টগ্রামের সাতকানিয়া থানার ১৪ নং আমিরাবাদ ইউনিয়ন ত্রাণ কমিটির লোকেরা চাকুরি-ব্যবসা ছাড়াই মোটা পয়সা কামিয়ে নিয়েছেন। এখন কেউ কিনছেন দোকান, কেউ জমি, কেউ গাড়ী।

রাজাকার কনভেনরকে ইউনিয়নের রেশন ডিলার বানিয়ে মুজিববাদীরা তাকে ইচ্ছামত কাজে লাগাচ্ছে টুপাইস বানাবার ব্যাপারে।

আওয়ামী টাউটরা রিলিফের শ্লিপ দেয় তাদের সমর্থক ও আত্মীয়স্বজনকে। গরীবরা অনাহারে থাকলেও তাদের ভাগ্যে মিলছে না কিছুই।

রিলিফের মাল খোলা বাজারে পাওয়া যাচ্ছে, যত খুশী সংগ্রহ করতে পারবেন, কোন বাধা নেই, তবে হ্যাঁ, পয়সার জোর অবশ্যই থাকতে হবে।

অথঃ নাজমা আতহার কাহিনী

পাকিস্তান কাউন্সিলের পূর্বাঞ্চলীয় অধিনায়িকা মিসেস নাজমা আতহার ২২/৫/৭২ থেকেই বাংলাদেশ পরিষদে এডিশনাল একজিকিউটিভ ডিরেক্টর পদে কাজ করেছেন। তাকে ১লা জানুয়ারী থেকে ২১ শে মে পর্যন্ত ছুটি দেয়া হয়েছে। (তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের ৪ (৩) /৭২- ১৪৮ (২) তাং- ঢাকা আগষ্ট ৫, ১৯৭২ আদেশ দেখুন।) ২১ দিন তাকে বেতন ছাড়া ছুটি এবং বাকী পুরো সাত মাসের বেতন তিনি পেলেন। ২২/৫ থেকেও যদি কাজ তিনি করে থাকেন তাহলে অবশিষ্ট তিন মাস তিনি কাজ করলেন কোথায়?

আসল ব্যাপারটি এবার শুনুন : কুখ্যাত মহিলা দালাল নাজমা আতহারের বিরুদ্ধে মুজিবনগর বেতার সুনির্দিষ্ট অভিযোগ এনেছিল। স্বাধীনতার পর নাজমা আতহার পালিয়ে বেড়ান। ২২/৫/৭২ তারিখে বাংলাদেশ পরিষদ আদৌ গঠিত হয়নি। মিসেস নাজমা আজও অফিস করে না। তাঁর অধস্তন কর্মচারীরা তাকে দেখেননি। বাংলাদেশ পরিষদে এডিশনাল একজিকিউটিভ ডিরেক্টর নামে কোন পদ নেই।

তাহলে এগুলো হল কি করে? সবই আমলাতন্ত্রের খেল। আমলাদের মন খোশ রাখতে পারলে নাজমা আতহাররা ঘরে বসেই, অথবা লুকিয়ে থেকেই বেতন পেতে পারেন।

আর সরকারী হিসাব পরীক্ষণ বিভাগ যা সামনে পাবেন তাই 'অডিটেড' সীল মেরে দেবেন – বাস্তবের সাথে তাদের সংযোগ নেই বলেই এ ধরনের ঘটনা ঘটছে অহরহ।

কার কি মাথা ব্যথা। পয়সা তো যাচ্ছে জনগণের।

মুরিদের দরবার

আধ্যাত্মিক ও বাস্তবতা

মোহাম্মদ হোসেন

আধ্যাত্মিকতাকে অলৌকিক ক্ষমতা মনে করা হয়। অনেকে আবার মনে করেন ইহার বদৌলতে এমন আজগুবি কাণ্ড ঘটানো সম্ভব যা সাধারণ মানুষের শক্তির বাইরে। কিন্তু আসলে তা নয়। আত্মোন্নতি ও আত্মোপলব্ধির মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তার অসীম ক্ষমতা, মহিমা, দয়া ও সর্বোপরি সৃষ্টি রহস্য উদ্‌ঘাটন করে পরমকরুণাময়ের নিকট পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ

করাকেই আধ্যাত্মিকতা বলা চলে। এই আধ্যাত্মিক সাধনার সফলতা অর্জন করতে যাবতীয় লোভ-লালসা ত্যাগের সর্বাধিক প্রয়োজন। হিংসা-দ্বেষ, গর্ব, অহংকার পরিহার করে মানুষকে সেবার মনোবৃত্তি নিয়ে এগিয়ে যেতে হয় আল্লাহ্ পাকের সর্বোচ্চ সৃষ্টির আসনের দিকে। আত্মিক জ্ঞান ও শিক্ষা লাভ না করলে মানুষের প্রকৃত মর্যাদা হয় না। ইহা ব্যতীত মানুষ মানুষত্ব লাভ করে না, নিজেকে পার্থিব ভোগ লালসার উর্দ্ধে রাখতে সক্ষম হয় না।

স্কুল-কলেজের শিক্ষায় পার্থিব জগত সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন করা যায়। সংসার-যাত্রা নির্বাহের পথে নানা প্রকার সমস্যার সমাধানপূর্বক বাস্তবতার সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায়। কিন্তু আত্মিক জ্ঞানের চরম উৎকর্ষ সাধন, সৃষ্টিকর্তার নিকটে নিজেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমর্পণ শুধুমাত্র বাস্তব জগতের শিক্ষা দ্বারা সম্ভব নয়।

অবশ্য এ কথা ঠিক যে, বাস্তব জগত ও বাস্তব জ্ঞান ছাড়া আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাভ করা যায় না। ইহাতে যাদের আপত্তি থাকে তারা এই বাস্তব জগতের বাইরে গিয়ে আধ্যাত্ম সাধনায় মনোনিবেশ করাটাই সমীচীন মনে করেন। অনেকেই আবার আত্মিক সাধনায় সফলতা অর্জন করেও সমাজে জীবনযাপন করছেন। কেহ কেহ বা পার্থিব জগতকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে বসে আছেন। মারিফত বা আধ্যাত্মিকতার গভীরে প্রবেশ করেও কেহ কেহ আবার বাস্তবতাকে অস্বীকার করে আল্লাহর ধ্যানে নিমগ্ন। বাস্তবিক পক্ষে ইহারা আল্লাহর দরবারে ক্ষমতালিপ্সু ব্যক্তি। ইহাদের দ্বারা মানব সমাজের কোন অনুপকার হয় না সত্য কিন্তু সমাজ ইহাদের নিকট অনেক কিছুই আশা করে। ইহাদের নিস্তব্ধতার জন্য আধ্যাত্মা শিক্ষা গ্রহণের ইচ্ছুক মানুষ ব্যথিত। আবার অনেক সাধক এই সাধনায় সফলতা লাভ করে বাস্তবতার অন্তরালে আত্মগোপন করেছেন ; যদিবা কোন কোন সাধারণ মানুষ তাদের আত্মিক জ্ঞানের সন্ধান পেয়ে মরুভূমির দিশাহারা পথিকের মত ব্যাকুল চিত্তে এই সকল মহাপুরুষদের নিকট থেকে সত্যপথের সন্ধান জানতে উদগ্রীব কিন্তু সাধারণ মানুষ আত্ম-পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ায় তারা তাদেরকে প্রকৃত পথের সন্ধান দিতে সাহসী নহেন।

আধ্যাত্মিক সাধনার জন্য কঠোর তপস্যায় নির্জন অবস্থায় সন্যাস জীবনযাপন করতে বাস্তববাদী মানুষেরও কোন আপত্তি নেই। কিন্তু তাদের আন্তরিক ইচ্ছা থেকে যায় যারা এই শিক্ষার সফলতা অর্জন করেছেন সেই সকল মহাপুরুষ সন্যাস জীবন থেকে বাস্তব জীবনে ফিরে এসেছেন। সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁরা যেন পার্থিব জগতের সাধকে দ্বন্দ্ব-কলহ, হিংসা-দ্বেষ, লোভ-লালসা থেকে মুক্ত করে প্রকৃত সত্যের সন্ধান দেন। মানুষের জীবনকে সার্থক ও সুন্দর করে গড়ে তোলার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

যারা প্রকৃতপক্ষেই আল্লাহ পাকের সৃষ্টির রহস্য উপলব্ধি করেছেন, আল্লাহ পাকের সত্য সাধনার সাফল্য অর্জন করেছেন তাঁরা পুনরায় বাস্তবজীবনে ফিরে এসেছেন। মানুষের সেবায় আত্মোৎসর্গ করেছেন। ধ্যান ও তপস্যার মাধ্যমে যা কিছু সত্য রূপে আবিষ্কার করেছেন তার দ্বারা আল্লাহর সৃষ্টির উন্নতি সাধনের আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছেন। যেমন চেষ্টা করেছিলেন হযরত মুহাম্মদ (দঃ)। তিনি হেরার গুহায় সন্যাস জীবনযাপন করে

সফলতা লাভ করে বাস্তবে ফিরে আসেন। সংসার ধারায় মনোনিবেশ করেন। মানুষের কল্যাণের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালান। প্রকৃতপক্ষে আধ্যাত্ম জগতের আবিস্কারক হযরত (দঃ)। তিনি ছিলেন আধ্যাত্ম জগতের শিরমণি। এই নীলাকাশের নীচে এই পৃথিবীর মাটিতে যত মহাপুরুষ আধ্যাত্ম বা মারফত সাধনায় সফলতা অর্জনে সক্ষম হয়েছেন উর্ধ্বে হযরত মুহাম্মদের (দঃ) স্থান। তিনিই সকলের শিক্ষার গুরু। তাঁর নিকট থেকে হযরত আলী (রাঃ) এই মারিফত শিক্ষার চরম সাফল্য অর্জন করেন। রসূলের (দঃ) ওফাতের পর হযরত আলীর মত আধ্যাত্ম শিক্ষায় চরম উৎকর্ষ কেহ লাভ করতে পারেননি। সুতরাং স্পষ্টতই প্রতীয়মান হচ্ছে রসূলুল্লাহর (দঃ) নিকট থেকে হযরত আলী (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ)-র নিকট থেকে যথাক্রমে এই শিক্ষা বিস্তার লাভ করে। হযরত আবদুল কাদির জিলানী (রঃ), হযরত খাজা মঈন উদ্দিন চিস্তী (রঃ) সেই আধ্যাত্মিকতার চরমে পৌছতে সক্ষম হন। তাহাদের আহ্বানে লক্ষ লক্ষ মানুষ এই শিক্ষার দিকে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। সেই শিক্ষার আলো আজও বিশ্বের বুকে ছড়িয়ে আছে। তার উপর ভিত্তি করেই মানব সভ্যতা গড়ে উঠেছে।

কিন্তু এখন কথা হলো বাস্তব জগতকে পরিত্যাগ করেই কি আধ্যাত্ম জগতেই না, তা নয়। দেহের সাথে আত্মার যে সম্পর্ক, বাস্তবতার সঙ্গে আধ্যাত্মিকতারও সেই রূপ সম্পর্ক। দেহই যদি না থাকে আত্মার বাসস্থান কোথায়? সেইরূপ বাস্তবে না থেকে আধ্যাত্মিকতার আস্বাদ পাবে কি রূপে? অনেকে আল্লাহ পাওয়ার নেশায় বাড়ীঘর ছেড়ে সংসারত্যাগী হয়। আধ্যাত্মিকতা বা মারিফতের গভীরে প্রবেশ করে কি যেন এক অনিবার্য আকর্ষণে মুগ্ধ হয়ে জড় জগতের সুখ শান্তি ও কর্ম ব্যস্ততার কথা ভুলে যান। আল্লাহর সেই ঐশ্বীশক্তি তাঁদের হৃদয়ে বিরূপ ভাব ও অনুভূতির সঞ্চার করে কে জানে? তবে ইহা অতি সত্য কথা, সংসার জীবনের আগে দুনিয়ার প্রতিটি লোকই যদি এই আত্মিক শিক্ষা ও পরীক্ষার জন্য কিছুকাল নির্জন সাধনায় থেকে পুনরায় বাস্তব জীবনে ফিরে আসতে সক্ষম হতো, তাহলে সমাজের প্রভূত কল্যাণ ও মানুষের নৈতিক চরিত্রের বিশেষ উন্নতি সাধন হত। আমরা দ্বীন ও দুনিয়া উভয়েরই কল্যাণ চাই। "হে প্রভু, আমাদিগকে ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ দাও"–এই হচ্ছে আমাদের প্রকৃত প্রার্থনা। ইহকাল ছাড়া পরকালের আশা কল্পনাতীত।এই জন্য আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনে বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি নিজেকে জানে সে খোদাকেও জানে।" অতএব স্পষ্টই প্রতীয়মান হচ্ছে মানুষকে ইহকাল ও পরকাল সম্পর্কে গভীর জ্ঞানার্জন করে আত্মোপলব্ধির মাধ্যমে অতি প্রথম আমি কে? –এই প্রশ্নটির মীমাংসা করে সত্য সাধনায় এগিয়ে যেতে হবে।

পবিত্র কোরআনে উল্লেখিত আছে— মানুষকে আল্লাহ পাক তাঁর নিজের সাদৃশ্য সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং মেঘ ও নদীর উৎসস্থল যেমন সাগর ঠিক তেমনি মানুষের উৎসস্থল হলো আল্লাহ পাক। মেঘ ও নদীর পানির গতি যেমন সাগরের দিকে তেমনি সৃষ্টির গতিও সৃষ্টিকর্তার দিকে। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে রয়েছে– "আমরা আল্লাহর জন্য

এবং তাঁহার দিকেই ফিরে যাব।" কিন্তু আল্লাহ পাকের নিকট যারা স্বজ্ঞান ও সম্মানের সাথে প্রত্যাবর্তন করবেন? যারা এই প্রত্যক্ষ জগতে বাস্তববাদী ও সংসারী হয়েও আত্মিক জ্ঞানের আলোকে মানুষের কল্যাণ সাধনে আত্মো-নিয়োগ করেছেন এবং যারা আত্মার উন্নতি সাধন করেছেন তাঁরাই। ইসলাম সারা জীবনের জন্যে সন্ন্যাসবাদ বা নৈরাশ্যবাদ সমর্থন করে না। ইহার আদর্শ বাস্তবভিত্তিক। আবার শুধু বাস্তববাদী হয়ে ভোগ-বিলাসের প্রাচুর্যে কালাতিপাতের পক্ষপাতিত্ব ইসলাম নয়। আধ্যাত্মিকতা ও বাস্তবতার সংমিশ্রণ চাই।

সুতরাং স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে আধ্যাত্মিকতা ও বাস্তবতা একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। একের অভাবে অপরের কল্পনা করা ধারণাতীত এবং ইসলামের প্রকৃত মাহাত্ত্ব উপলব্ধি করাও সম্ভব নয়। কাজেই উভয়ের উপরেই মানুষকেই ভিত্তি করে আল্লাহ-রসূলের তৌহিদে বিশ্বাস এনে সত্য সন্ধানে এগিয়ে যেতে হবে।

তবেই মানুষের জীবন সার্থক ও সুন্দর হবে।

ভাসানীর বাণী

দারিদ্রতাকে শেষ করে দাও, শোষণকে নির্মুল করে দাও। সবার মুখে হাসি ফুটতে দাও– তবেই আমার কাজ ফুরাবে।

জালিয়াতির শেষ নেই
চট্টগ্রামের ভেল্কিবাজ ঢাকা এসে উঠেছে

দেশসেবার নামে আত্মসেবার একটা প্রচণ্ড বেগ দেশ স্বাধীন হওয়ার পর অনেকের মধ্যেই পরিলক্ষিত। কিন্তু গদীনসীন সরকারের ছত্রছায়ায় দেশসেবার নামে আত্মসেবার যে নজীর চট্টগ্রামের জনাব জলিল এবং জনাব জহীরুদ্দিন সাহেব দেখিয়েছেন তা সত্যিই অতুলনীয়।

পাঞ্জাবি মালিকানাধীন ক্লিয়ারিং ও ফরওয়ার্ডিং ফার্মে খাতুনগঞ্জের 'মোহাম্মদ আনোয়ার এণ্ড কোম্পানী' দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পরই পরিত্যক্ত সম্পত্তি বলে ঘোষিত হয়। আবদুল জলিল নামক এক ভদ্রলোক ছিলেন ঐ কোম্পানীর হিসাবরক্ষক এবং চট্টগ্রাম শহরের জনাব জহীরউদ্দীন ছিলেন ঐ কোম্পানীর আয়কর উপদেষ্টা।

আয়কর উকিল ও জহীর উদ্দীন সাহেবের সক্রিয় সহযোগিতায় ভেলকীবাজীর মত রাতারাতি হিসাবরক্ষক জনাব আঃ জলিল বনে গেলেন কোম্পানীর অংশীদার প্রশাসক পদে। জাল অংশীদারনামা পাকাপোক্ত হয়ে গেল – শুরু হলো লুটের মালের ভাগাভাগি।

'বক্স টেকস্‌টাইল মিল লিঃ'এবং ৬০ বেল কটনইয়ার্ণ ছিল মোহাম্মদ আনোয়ার এণ্ড কোম্পানীর জিম্মায়। রাতারাতি জনাব জহীর উদ্দীন সাহেব লেটার প্যাড ছাপিয়ে বনে গেলেন পরিত্যক্ত বক্স টেকসটাইল মিলের প্রতিভূ। মহামান্য চট্টগ্রামের এডিসি সাহেবকে বোকা বানিয়ে অথবা অন্যভাবে জনাব জহীর উদ্দীন সাহেব ঐ মালামালের বন্দোবস্ত করলেন। ADC/Dev/MB/72 তাং ১০ই মে এই পারমিশনে উনি ৬০ বেল সুতা জালাল সওদাগর ও অন্যান্যদের কাছে প্রায় ১৯৬০০০ (এক লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার) টাকায় বিক্রি করে সম্পূর্ণ টাকা নিয়ে ডুব মারলেন। অথচ বিক্রীত অর্থ সরকারী খাতেই জমা হওয়ার কথা।

জনাব জহীর উদ্দীন সাহেব এর পর চট্টগ্রামে থাকা সুবিধে মনে করলেন না। নিজের

বসতভিটা ছেড়ে উনি ঢাকায় এমসি এ -দের ছত্রছায়ায় বহাল তবিয়তেই আছেন।

প্রকাশ থাকে যে, জনাবা খোদেজা জহীরউদ্দীন আওয়ামী লীগ মহিলা পুনর্বাসন (চট্টগ্রাম) সংস্থার সাথে জড়িত।

জনমনে আজ জিজ্ঞাসা, জনাব জহির উদ্দীন সাহেবের এই বিরাট অর্থ আত্মসাতের কোনো বিহিত হবে কি?

'মিলিটারী' এমসিএ-র জিল্লাতির খতিয়ান

নড়াইলী এমসিএ লড়াইতে গিয়ে বনগাঁ-র টালিখোলা ক্যাম্পে দায়িত্ব পালনকালে নিজপকেটে বহু টাকা পুরেছেন। তারই অংশ সাড়ে ১৮ হাজার টাকা দিয়ে লোহাগড়ার জমিদার বাড়ী তিনি কিনেছেন। এ বাড়ীর পাশে আরেকটি বাড়ী করার জন্য তিনি সিএন্ডবি-র ইটখোলা থেকে মাত্র ৭০ টাকা হাজার দরে ৫০ হাজার ইট কিনে স্তুপ দিয়ে রেখেছেন।

তাঁর ভাই আবদুর রহমান একখানি আমদানী লাইসেন্স বাগিয়েছেন।

আরেক ভাই ধলা মিয়াকে লোহাগড়ার রিলিফ চেয়ারম্যান বানিয়েছেন। ১ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকার মাটিকাটায় মাত্র ৫০ হাজার টাকা লাভ হয়েছে। আগে ধলা মিয়া খেতখামারে খাটতো, এখন দশ হাজার টাকার সুজুকী মোটর সাইকেল দৌড়ায়।

এমসিএ-র কৃপায় জনৈক বন্ধু মাছ ও চামড়ার দুখানা লাইসেন্স পেয়েছে। ভগ্নিপতি সরোয়ার সিমেন্টের, ভগ্নিপতি আজিজুর কাপড়কাঁচা সোডার লাইসেন্স বাগিয়েছে। ভগ্নিপতি এরফানউদ্দিন মাত্র দুখানা রেশন দোকান করেছেন। ফরিদপুর থেকে নাবালক ভাগ্নেকে নিজ গ্রামে এনে মডিফাইড রেশনিং ডিলার করা হয়েছে। আরেক ভগ্নিপতি মোবারক মিয়াও এই ডিলারী পেয়েছেন। ভাইপো তবিবুর রহমান একই ডিলারশীপ বাগিয়েছে। আরেক ভাইপো কলেজ-ছাত্র কবীর নারিকেল তেল আমদানীর লাইসেন্স পেয়েছে।

বাংলাদেশ রেডক্রসের সেরা কর্তা থাকাকালে সহযোগীদের দ্বারা লক্ষাধিক টাকার গুড়াদুধ ও চিনি বিক্রি করে তিনি নিজের চেহারা মোবারক 'সোন্দর' করেছেন।

মিলিটারী এমসিএটির দুর্নীতির ঠেলায় লোহাগড়া মোকামের ব্যবসায়ীরা ত্রাহি মধুসূদন ডাক ছাড়ছেন। তার এক সহকর্মী তিনপুত্র, এক স্ত্রী ও এক কন্যার নামে একখানা করে লাইসেন্স নিয়েছেন।

নড়াইল আওয়ামী লীগের আরেক শাহানশাহ বাদশা আমদানী লাইসেন্স এবং ভাইদের নামে তিনখানি এম-আর ডিলারশীপ নিয়েছেন।

যেভাবে শনৈঃ শনৈঃ এগিয়ে যাচ্ছে তাতে মোটামুটিভাবে নড়াইল আওয়ামী লীগের কর্মকর্তারা অচিরেই এ অঞ্চলে শোষণহীন সমাজব্যবস্থার মাধ্যমে 'সমাজতন্ত্র' কায়েম করে ফেলবেন, তাতে জনগণের কোন সন্দেহ নেই।

একটি নরম পত্র

প্রিয় বন্ধু,

লণ্ডন ক্লিনিকে অস্ত্রোপচার করে আপনি সপরিবারে জেনেভায় বসে স্বাস্থ্য উদ্ধার করছেন। আপনার স্বাস্থ্য মজবুত থাকা জরুরী প্রয়োজন। কেবলমাত্র বঙ্গের বন্ধুই নন, বঙ্গের পিতাও বটে! সুতরাং আপনার স্বাস্থ্যকে মজবুত রাখার দায়দায়িত্ব আমাদের সবারই। পিতা এবং বন্ধু এই দ্বৈত ভূমিকা পালন করতে যেয়ে আপনার শরীরের উপর যথেষ্ট ধকল

গেছে সন্দেহ নেই। সুতরাং আপনি যদি গরীব দেশের রক্তপানি করা সামান্য অর্থ নিজের রক্ত শুদ্ধি এবং বৃদ্ধির জন্য খরচ করেন তাতে এই দেশের গরীব আপামর জনসাধারণের কোনই আপত্তি নেই।

আপনি নাকি ১৩ তারিখে ফিরে আসছেন আমাদের মাঝে। ঠিক নয় মাস আগে আর একবার আপনি আমাদের মধ্যে এসেছিলেন। কিন্তু এই দুই আসার মধ্যে কত দুস্তর পার্থক্য, কত সমুদ্র ব্যবধান। সেদিন বাংলাদেশের প্রতিটি প্রাণ মৃত্যুর বেদনা, ধ্বংসযজ্ঞের ভয়াবহতা, অত্যাচার আর নির্মমতাকে দূরে ঠেলে দিয়ে আপনাকে বরণ করেছিল। আপনি ছিলেন প্রতিটি প্রাণের বন্ধু, জাতির পিতা, সকলের একান্ত আপনজন। সাড়ে সাত কোটি প্রাণই আপনার যে কোন ইচ্ছার জন্য যে কোন ত্যাগে প্রস্তুত ছিল। সেদিন আর আজ। মাত্র নয় মাসের ব্যবধানে আপনি আমাদের মন থেকে, আমাদের হৃদয় থেকে মুছে গেলেন সম্পূর্ণরূপে। আপনি বলেছেন, আপনি বাংলাদেশকে ভালবাসেন আর বাংলার মানুষও আপনাকে ভালবাসে। কিন্তু যাদের পেটে খাবার নেই, পরনে বস্ত্র নেই, জীবনের নিশ্চয়তা নেই তাদেরকে কেবলমাত্র ভালবেসে ছেদো কথা শুনানো যে কতটুকু হাস্যকর সেটা কি কখনো ভেবেছেন? আপনার রাত্রে সামান্য ঘুমের ব্যাঘাত ঘটেছে সেটা দেশের প্রতিটি দৈনিকে একটি প্রধান খবর হয়েছে, কিন্তু প্রতিদিন যে শত শত মানুষ গুপ্তহত্যার শিকার হচ্ছে আর না খেতে পেয়ে অকালে মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নিচ্ছে সে খবর মাথাকুটেও কি কোন পত্রিকা স্থান পাচ্ছে? হায়রে আজব সমাজতন্ত্র! মিথ্যা আশ্বাস, গালভরা বুলি আর খেলাখেলা হুহুঙ্কার না দিয়ে আপনি সত্যি একটু ভাবুন, একটু চিন্তা করুন, একটু বিশ্লেষণ করুন। কেন এমন হল? আমরা কি এর জন্যই এত বিরাট ত্যাগ স্বীকার করেছি? কতকগুলো লোক ক্ষ্যাপা কুকুরের মত, ক্ষুধার্ত হায়নার মত দেশকে আর দেশের মানুষকে খুবলে খুবলে খাচ্ছে আর মাঝে মাঝে রক্তাক্ত হিংস্র দাঁত বের করে অট্টহাস্যে হেঁকে উঠছে 'জয় মুজিববাদ'। আর আপনি – আপনি দেশের নেতা হয়ে, জাতির পিতা হয়ে চরম নৈরাজ্যে হোচট খাওয়া, ক্ষুধায় মৃতপ্রায় আর অনাচার, অত্যাচারে জর্জরিত মুখথুবড়ে পড়ে থাকা কোটি মানুষের উপর এই পৈশাচিক বীভৎস্যতাকে কেবলমাত্র সামান্য কয়েকটি কথার ফুলঝুরি দিয়ে ঢাকতে চাচ্ছেন।

আপনি নৌকায় স্থান দিয়েছেন চরিত্রহীন, ব্যক্তিত্বহীন লম্পট দানবদের। এরা সবাই আপনার বাছাই করা লোক, আপনার পেয়ারের লোক। কিন্তু হালটা ছিল আপনার হাতে। আপনি সেটাকে শক্ত করে ধরতে পারলেন না, সেটাকে গন্তব্য পথের দিকে নিয়ে যেতে ব্যর্থ হলেন। জমাট অন্ধকারে, প্রচণ্ড কুয়াশার মধ্যে নৌকাকে ফেলে রেখে আপনি চলে গেলেন বিদেশে, পাথর সারাতে সপরিবারে।

সাড়ে সাত কোটি প্রাণ বজ্র শপথ নিয়ে আপনার সঙ্গে ছিল। একটি লোকের প্রতি এরকম আনুগত্য, এত স্থির বিশ্বাস খুব কম লোকেই পায়। অথচ আপনি আমাদের আনুগত্যকে, আমাদের বিশ্বাসকে দুর্বল হাতে, দ্বিধান্বিত চিত্তে ভ্রান্ত পথে চালিয়ে দেশকে চরম দুর্যোগ আর অকল্পনীয় দুর্ভোগের মধ্যে টেনে এনেছেন।

আপনার চারিদিকে আপনি যেসব এলোমেলো লোকদের জমায়েত করেছেন কিংবা আপনি যাদের জমায়েত হবার সুযোগ দিয়েছেন তারা

সবাই কুমীরের হা নিয়ে, বসে আছে। এদের কেউ আপনার বন্ধু, কেউ আপনার ভাই, কেউ আপনার শিষ্য, কেউবা আপনার গুভানুধ্যায়ী। তারা আপনার নীরবতার সুযোগে বলিষ্ঠতার অভাবে দেশকে সম্পূর্ণ গিলে ফেলার উপক্রম করছে এবং এই লুণ্ঠীতা ধর্ষিতা এ বিধ্বস্ত দেশকে নুতনভাবে ধর্ষণ করে শেষ জীবনীশক্তিকেও নিংড়ে নিচ্ছে। অথচ আপনি?

সামরিক শাসনের ৯ মাসে মানুষ মরেছে অগুণতি, কুকুর-বেড়ালের মত প্রাণভয়ে ছুটে বেরিয়েছে, অনিশ্চয়তা আর আতঙ্কের মধ্যে মুহূর্ত গুণেছে– কিন্তু এখন কি আমরা সত্যিই ভাল আছি? – তখন রাজাকার, আলবদর, দালালদের ভয় রাত্রির ঘুম আর দিনের স্বস্তি কেড়ে নিয়েছিল। আজ তারাই যেন ভিন্ন নামে নতুন বেশে আমাদের খাদ্য, আমাদের বস্ত্র, আমাদের নিরাপদ আশ্রয় কেড়ে নিয়ে আবার আমাদের কঠিন মৃত্যুর নির্মমতার মধ্যে, অনিশ্চয়তার অন্ধকারে আর আহাজারির সমুদ্রে নিক্ষেপ করেছে। শুধু পতাকা বদল আর নেতা বদল ছাড়া দেশের মানুষ কি পেয়েছে? এ স্বাধীনতা এসেছে কেবলমাত্র কিছু সংখ্যক লোকের জন্য যারা আওয়ামী লীগের ছত্রছায়ায় লুটপাট, দুর্নীতি আর রাহাজানির সমুদ্রে অবগাহন করে রাতারাতি অজস্র অর্থ, প্রচুর বিত্ত-বৈভবের অধিকারী হয়েছে। তারাই সমগ্র দেশে অতিকায় লোভের এক দানবকে ছেড়ে দিয়েছে। আর আপনি বঙ্গের বন্ধু হয়ে, জাতির পিতা হয়ে নিশ্চুপ নীরবে দানবের নারকীয়তা নিরাপদ দূরত্ব থেকে লক্ষ্য করছেন।

আপনি স্পষ্টই জানেন আপনার চারিদিকে যারা আছে তারা সবাই দেশকে খেয়ে দেশের সেবা করার ভান করছে। অথচ আপনি কিছুই করছেন না, করতে পারছেন না। কিন্তু কেন? আমাদের এত বড় বিশ্বাস, এত বড় আশা আর মহৎ ইচ্ছার অপমৃত্যু ঘটিয়ে আপনি হিংস্র হায়নাদের হাতে, বিকট দানবদের হাতে, নৌকার হাল ছেড়ে দিলেন কেন? জবাব দেবেন কি?

ধানমণ্ডির বাড়ীটিতে কি হচ্ছে ?

ধানমণ্ডির সেই বাড়ীটিতে কি হচ্ছে এখন?

৬ নং রোডের বাড়ীটিতে দখলদার আমলে রাও ফরমান আলী, কর্ণেল ছৈদ উদ্দিন, মুজাফর আহমদ ও হর্তাকর্তারা নারী ও মদ নিয়ে রাত কাটাতেন।

ভারতীয় বাহিনী যখন দেশের ভিতর এলো, দেশের সাথে ৬নং রোডের বাড়ীটিও সমস্ত আজ্ঞামসহ গেল ভারতীয় সেনানায়কদের হাতে।

আর এখনও এ-বাড়ী সারারাত গুলজার। এখন এ বাড়ীর রাতের অতিথিদের মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ সরকারের সেক্রেটারীরা এবং এমসিএ-রা। নারী-মদের অফুরান যোগান সেখানে। অনাহারে যখন মানুষ মরছে দেশে তখন সেখানে ছুটছে শারাবন তাহুরা ও হুরীর জৌলুষ।

এসবের আয়োজন করছেন বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত দালাল। জাফর ব্রাদার্স ও সেতু কর্পোরেশন নামক যে দুইটি অবাঙ্গালী (পাকিস্তানী) প্রতিষ্ঠান খোদ মালিকদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে ইদানীং যে হৈ চৈ পড়েছে তার পেছনে রয়েছে এই ৬ নং বাড়ীর অবদান।

সেই কুখ্যাত দালাল এই সংস্থা দুটো চালিয়ে বাংলাদেশ আমলেও পাকিস্তানে টাকা পাঠিয়েছে আর তাতে সহায়তা করেছে নারী মাংস ও সুরালোলুপ আমলা ও এমসিএ-রা।

ইহা কি সত্য?

॥ ১৩৫ ॥

তেজগাঁও সেন্ট্রাল টেলিগ্রাফ ষ্টোরের সহকারী প্রকৌশলী জনাব আবদুল মান্নান জবরদস্ত এলেমদার লোক। সবাই যখন এলোমেলোভাবে টু-পাইস কামাবার ফিকিরে আছেন তখন তিনিই বা ফেরেশতা বনবেন কেন? সুতরাং আর কিছু না পেয়ে আপাতত তিনি টেলিগ্রাফের তার বেচেই পকেট বোঝাই শুরু করেছেন। পাক আমলে তিনি চুরির দায়ে সাসপেণ্ড হন। কিন্তু যেহেতু তিনি পাক আমলে সাসপেণ্ড হয়েছিলেন সেটাই মূলধন হয়ে সুদে-আসলে তার পদোন্নতির কারণ হয়েছে এবং সেই সঙ্গে তিনি রীতিমত দেশপ্রেমিকও বনে গেছেন।

তিনি গত মাসের ১১ তারিখে ঢাকা কোর্ট থেকে প্রায় সোয়া বারো মণ তামার তার গায়েব করে মৌলভীবাজারের দেউড়ীতে বিক্রী করে পূর্ব সুনাম অক্ষুণ্ন রেখেছেন। বিষয়টি ষ্টোরের বড় কর্তার নজরে আনলেও এ পর্যন্ত কোন রকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। তবে কি তিনিও ... ?

॥ ১৩৬॥

সরকারী নার্সিং শিক্ষার্থীরা ১৩ই আগষ্ট দাবীমিছিল নিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বাসভবনে গেলে স্বাস্থ্যমন্ত্রী উকিল সাহেব একেবারে 'দেশী' ভাষায় "কুত্তার বাইচ্যা, শুয়োরের বাইচ্যা" বলে ছাত্রছাত্রীদের তাড়িয়ে দেন। গণতান্ত্রিক দেশের গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী মন্ত্রীর ভদ্রতার নমুনা পেয়ে ছাত্রছাত্রীরা হতবাক।

তাদের মন্তব্য কামারকে উড়োজাহাজের মডেল গড়তে দিলে এ না হয়ে যায় কোথায় ?

॥ ১৩৭॥

২৯-৯-৭১ তারিখে কালিয়াকৈর থানায় কেইস মূলে মুক্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে যে এজাহার দেয়া হয়েছিল, তার এজাহার দাতাটি কে?

ঐ থানার চাপাইর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান হেলাল উদ্দিন আহমদই কি ঐ এজাহার দেননি? তিনি ও তার শ্যালক কাইউম মোল্লা নয় মাস ব্যাপী কি দালালী করেননি ?

আর এখনও কি আওয়ামী লীগের সাথে লাইন করে তিনি বুক ফুলিয়ে চলছেন না?

দালালদের সাথে গোপনে কারা হাত মিলাচ্ছে সরকার তা দেখবে কেন?

॥১৩৮॥

খুলনার মৌলবী পাড়া পূর্বপাড়া বানিয়াখামার-এর পাক আমলের শান্তি কমিটির সেক্রেটারী কুখ্যাত হাফিজ মিয়া কম করে হলেও কয়েক শত নারী ধর্ষণ এবং কয়েক হাজার টাকাসহ বহু জিনিষপত্র লুট করার পরও তার বাড়ীতে বসবাস করছেন। পাক আমলে হাফিজ মিয়া মেয়ে ধরে সামরিক ছাউনিতে চালান দিত। সে সমস্ত মেয়েদেরকে আর ফিরে পাওয়া যেত না। আর বহু লুটকৃত মালের মালিকানা জাহির করে তিনি তার ভাগ্যের রাতারাতি পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। অথচ দেশ স্বাধীন হবার পর দালাল হাফিজ মিয়া তার বাসায় বাস করছেন। অনেক অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও তাঁকে এখনও গ্রেফতার করা হয়নি, কারণ তিনি বর্তমানে মুজিববাদের পরম ভক্ত।

সম্পাদক ঃ সৈয়দ ইরফানুল বারী ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ঃ মওলানা আবদুল খান ভাসানী
মুদ্রণে ঃ শান্তি প্রেস, সন্তোষ, টাঙ্গাইল।

প্রতি কপি পঁচিশ পয়সা সাপ্তাহিক চাঁদার হার : ষান্মাসিক-৬.০০ বার্ষিক-১০.০০

হক-কথা

(WEEKLY THE HAQ-KATHA)

প্রকাশক ও পৃষ্ঠপোষক ঃ মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

প্রথম বর্ষ ২৯শ তম সংখ্যা; শুক্রবার ; ২০শে ভাদ্র, ১৩৭৯ ; ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৭২ ; ৬ই শ্রাবণ ১৩৯২ ; সন্তোষ টাঙ্গাইল

সমাজতন্ত্রী রক্তপিপাসু ডঃ আদম মালিক

'এলেন-দেখলেন-জয় করে নিলেন'

এবার সখি সোনার মৃগ দেয় বুঝি দেয় ধরা!

মায়াবী সোনার হরিণ এবার ধরা দিলেন। ইন্দোনেশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী আদম মালিক এসে ঘুরেই শুধু যাননি–তিনি সীজারের মতো এলেন, দেখলেন-জয় করে নিলেন।

আদম মালিক ইন্দোনেশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রীই শুধু নন। আদম মালিক ইন্দোনেশিয়ার ১৬ লাখ সমাজতন্ত্রী হত্যা, ৭ লাখ মানুষকে বন্দী করার বর্বর নাটকের অন্যতম হোতা। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অন্যতম প্রধান হুকুমের তাঁবেদার।

বাংলাদেশের আসল সুতোতে টান পরেছে এবার। বাংলাদেশের পেট থেকে রাজনৈতিক এ্যাপেন্ডিসাইটিস আর পিত্তপাথর সরানোর আলামত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়ায় আমেরিকা তার হারানো জমিদারী ফিরে পাবার জন্য বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে থাইল্যান্ড-ইন্দোনেশিয়াকে সাথে নিয়ে যে চক্রান্তের জাল ছড়িয়েছিল-বাংলাদেশের ক্ষমতাসীনরা আকর্ণ বিস্তৃত হা করে সে টোপ গিলে নিয়েছে। মার্কিন চক্রান্ত সম্পর্কে 'হক-কথা' পাঠকবর্গকে প্রথম থেকে অবহিত করে আসছিল। পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যে মধ্যস্থতার জন্য ইন্দোনেশিয়াকে ডেকে আনার ফলে এর প্রথম পর্বটি সমাপ্ত হলো। এখন পরবর্তী পর্বগুলো? এজন্য অপেক্ষা করতে হবে এ দেশের ভাগ্যাহত মানুষদের।

রাশিয়া চাচ্ছিল তার অনুচর ভারত ব্রেজনেভের এশীয় সাম্রাজ্যের স্বপ্ন-যৌথ নিরাপত্তা পরিকল্পনার সাথে সঙ্গতি রেখে ভারত-বাংলাদেশ-পাকিস্তানকে নিয়ে রাশিয়ায় নেতৃত্বে জোট গড়ে তুলুক-যা হবে ভারত-রাশিয়ার অবাদ শোষণ আর নির্মম শাসনের ক্ষেত্রে। ভারত চাচ্ছিল রাশিয়ার ঐ পরিকল্পনার নাম করে নিজের শ্রীবিজয়া সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করতে। অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট জোটকে মস্কোর অনুগত না হতে দিয়ে দিল্লীর অনুগত রাখা।

পক্ষান্তরে আমেরিকা চেয়েছে, তার মজবুত আস্তানা পাকিস্তানের সাথে বাংলাদেশের মার্কিন ভক্তদের নেতৃত্বাধীন সরকার মৈত্রী গড়ে তুলুক। তবে এ মৈত্রী স্থাপনে মধ্যস্থতা

করবে আমেরিকারই কোন এজেন্ট-ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড বা সুইজারল্যান্ডের কোন সরকারী ব্যক্তি। ইন্দোনেশিয়ায় আদম মালিকের মাধ্যমে পাকিস্তানের হাত ধরতে যাবার এই চেষ্টা বাংলাদেশকে করে তুলবে মার্কিন আস্তানা।

এ দেশের ক্ষমতাসীন মহলের মধ্যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অনেক দাস রয়ে গেছে। এরাই এই মিলনপর্বের প্রস্তুতি পর্ব সমাধা করেছে এবং আদম মালিক আসার পরে মহানন্দে তুবড়ি দিয়েছে।

পাকিস্তানের ব্যাপারে আগ্রহশীল পক্ষ হিসাবে চীন কি চেয়েছিল?—এ প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণ করা যাক। চীন ভারত-রাশিয়ার সমমুখী অথচ ভিন্ন প্রকৃতির উভয় চক্রান্তের বিরোধিতা করেছে। আমেরিকা এ অঞ্চলে পুনরায় তার জমিদারী কায়েম করুক-চীন তারও বিরোধিতা করে আসছে। সিমলা চুক্তির মাধ্যমে ভারত পাকিস্তানের সাথে আলোচনার সূত্রপাত করলে চৌএন লাই ওটাকে অভিনন্দন জানিয়েছিল এবং চৌ-এর বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে বিরোধসমূহ নিষ্পত্তির ব্যাপারে জাতিগুলোর দ্বিপাক্ষিক চেষ্টাকে চীন সব সময় সমর্থন করে। এ থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে, ভারত পাকিস্তানের সাথে তার সমস্যাসমূহ নিষ্পত্তি করুক, ভারত বাংলাদেশের সাথে তার সম্পর্ক ও সমস্যা নিষ্পত্তি করুক, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ সরাসরি নিজেদের সমস্যা ও সঙ্কট নিষ্পত্তি করুক চীন তাই চেয়েছে। ভারত যদি পাকিস্তানের ও বাংলাদেশের মধ্যকার সমস্যা নিষ্পত্তির নামে মোড়লিপনা করতে আসে, ভারত এ থেকে তার স্বার্থোদ্ধার করবেই—যা হয়েছিল ১৯৬৫-র যুদ্ধের পর তাসখন্দ চুক্তিতে। রাশিয়া তখন তার বর্তমান এশীয় অভিযান শুরু করতে মনস্থ করেছিল। চীন নিজেও কোন দ্বিপাক্ষিক বিরোধে মধ্যস্থতা করে না এবং নিজের সমস্যার ক্ষেত্রেও সে সরাসরি আলোচনা চালায়—আমেরিকা, জাপানের সাথে তার সম্পর্ক স্থাপন এর উদাহরণ।

এখন লক্ষ্য করে দেখা যাক বাংলাদেশ কোন ছকে এবং কার ইঙ্গিতে অগ্রসর হচ্ছে।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী সাম্প্রতিক পাক-ভারত প্রতিনিধি বৈঠকের বেশ কিছুদিন পূর্বে এবং সিমলা চুক্তির পর বলেছিলেন, বাংলাদেশ যদি পাকিস্তানের সাথে আলোচনায় বসতে চায় তবে ভারত তাতে মধ্যস্থতা করতে রাজী আছে।

পাকিস্তানের সাথে বাংলাদেশ দিল্লীর মাধ্যমে কখন আলোচনা করতে যাবে, কখন এগুবে, কখন পিছিয়ে আসবে রুশ-ভারত পরিকল্পনা স্ট্রাটেজীর খাতায় তা সবিস্তারে লিখিত আছে। এতদসত্ত্বেও বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কিন অর্থ সচিব কোনালীর সফরের পর 'মহান প্রতিবেশী' শ্লোগান দিয়ে ইন্দোনেশিয়ায় দৌড়াতে শুরু করলে ইন্দিরা গান্ধী বুঝলেন পানি কিন্তু গড়াচ্ছে অন্য দিকে। পাকিস্তানের সাথে বাংলাদেশ আমেরিকার মাধ্যমে আলোচনায় বসতে যাচ্ছে-এটা আঁচ করে ইন্দিরা গান্ধী তাঁর হালখাতা বহির্ভূত প্রস্তাব দিলেন। চিড়িয়া যেন সব অবস্থাতেই মুঠিতে থাকে, এজন্যই তিনি বললেন, বাংলাদেশ পাকিস্তানের সাথে আলোচনা করতে চাইলে ভারত তার ব্যবস্থা এখনি করে দিতে পারে।

বাংলাদেশের ক্ষমতার শীর্ষে উপবিষ্ট ব্যক্তিরা আমেরিকার বহু পুরাতন সাঙাৎ। পুরাতন প্রভুর ডাক অস্বীকার সে করবে কেন? ভারতও অবশ্য আমেরিকার খাই মিটিয়ে নিজের জন্যও হালুয়া-রুটির কিছু ব্যবস্থা করতে পারে—কিন্তু সন্দেহাতীত তাঁবেদার পাওয়া গেলে আমেরিকা দ্বিচারি ভারতকে কাজে লাগাতে চায় না। এক্ষেত্রে ইন্দোনেশিয়াকে দিয়ে কাজ হবে বুঝতে পেরে ভারতের কথা আমেরিকা শুনলো না। বিশেষতঃ বিদেশে চিকিৎসা সফরকালে বঙ্গ-পিতার উপর মার্কিন

মহলের চাপ যে মাত্রায় পৌঁছেছিল তাতে বাংলাদেশ বাধ্য হলো ইন্দোনেশিয়ার মাধ্যমে আমেরিকার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সুযোগ দিতে।

পাকিস্তানের সাথে সরাসরি সমস্যা নিষ্পত্তির সুযোগ এক্ষেত্রে ঘটলো না। বাংলাদেশের দেশীয় ও বৈদেশিক নীতিতে ভারতের মতই আরেকটি ফ্যাক্টর এসে যুক্ত হলো—এটা হলো ইন্দোনেশিয়া।

রহস্যময় সোনার মৃগ বাংলাদেশ তার আসল প্রভু আমেরিকার কাছেই ধরা দিল। অবসান হলো কল্পনার।

কিন্তু এর উদ্দেশ্যে কি?

সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে ইতিহাস নিস্তব্ধকারী গণহত্যার মাধ্যমে খতম করে দিয়েছে ইন্দোনেশিয়ার সুহার্তো-আদম মালিক চক্র। বাংলাদেশে তাদের মাধ্যমে আমেরিকার রাজনৈতিক অনুপ্রবেশ পাকাপোক্ত হবার ফল কি দাঁড়াবে?

রুশ-মার্কিন-ভারত-ইন্দোনেশিয়া স্বার্থের সংঘাতে বাংলাদেশ কি ষড়যন্ত্রের আস্তানায় পরিণতি হবে?

অথবা রুশ-মার্কিন স্বার্থের আঁতাত এবং ভারত-মার্কিন-ইন্দোনেশিয়া সমঝোতার ভিত্তিতে বাংলাদেশ পরিণত হবে নির্বিচার শোষণ ও লুণ্ঠনের ক্ষেত্রে?

আপাততঃ মনে হচ্ছে, শেষোক্তটিই ঠিক। কেননা, মনি-মোজাফফরগোষ্ঠী ইন্দোনেশিয়ার আদম মালিকের মধ্যস্থতাকে নির্বিকার চিত্তে গ্রহণ করে এ ব্যাপারেও সরকারের সাথে সহযোগিতা করার সদিচ্ছা প্রকাশ করেছে তবে এদের সিদ্ধান্তের কোন মূল্য নেই। মস্কো ও ক্রেমলিন আগামী দু'এক সপ্তাহের মধ্যে মনি-মোজাফফরকে যে নির্দেশ পাঠাবে তা যদি উল্টো হয় তবে মনিসিং-মোজাফফরদের বোলচাল ঘুরে যেতে পরে।

অবশ্য সপ্তাহকালের মধ্যেই জানা যাবে মস্কোর অভীষ্ট কি এবং বাংলাদেশের গতি কি হবে।

কিন্তু গতি যাই হোক বাংলাদেশের ভাগ্যাকাশে আবার কালো মেঘ জমে উঠেছে। সমাজতন্ত্রী নিধনের আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে রাজনৈতিক পূবালী হাওয়ায়।

ম্যান্ডেট নিয়ে প্রত্যাবর্তন

দেড় মাসেরও বেশী সময় বাইরে কাটিয়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী নয়াদিল্লী ঘুরে দেশে ফিরলেন। ভারতীয় বিমানযোগে তার যাত্রা, ভারত ঘুরে তার প্রত্যাগমন কোন তাৎপর্য যদি বহন করে থাকে, এ সফরের রাজনৈতিক দিকটি ভারতের নির্ধারিত কক্ষপথ পরিক্রমণ ছাড়া সে তাৎপর্য আর কিছু নয়।

প্রধানমন্ত্রীর সফরের রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করায় অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী কোন কোন মহলের উপর ক্ষোভ ঝেড়েছেন। কিন্তু এ সফর যে ছিল পুরোপুরি রাজনৈতিক সফর ১৪ই সেপ্টেম্বরের পর থেকে তা দিবালোকের মতই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

বিদেশ সফরকালে প্রধানমন্ত্রীর সাথে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত লণ্ডনে সাক্ষাত করেছেন। দেখা করেছেন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী হীথ, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডগলাস হিউম, রহস্যজনক মার্কিন প্রফেসর, আন্তর্জাতিক ক্ষমা প্রদর্শন সংস্থার প্রধান, দেশী কর্মকর্তারা, মন্ত্রী ও এমসিএ-রা। আর সর্বোপরি ভুট্টো তাঁর সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ করেছিলেন। সরকারী ভাষ্যমত তিনি কথা বলেননি। বিবিসির সংবাদানুযায়ী ভুট্টোর সাথে পত্রালাপও হয়েছে।

তাঁর বিদেশ সরফরকালে বাংলাদেশ সফরে এসেছেন ইন্দোনেশিয়ার আদম মালিক এবং দক্ষিণ এশিয়ার জন্য নিবেদিতপ্রাণ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রধান নিক্সন প্রেরিত একটি টিম। ইতিমধ্যে ভারতের সাথে রাশিয়ার আলোচনা হয়েছে। পাকিস্তানের সাথে প্রতিনিধি পর্যায়ের বৈঠক হয়েছে ভারতের-

নয়া দিল্লীতে। কাশ্মীরে সীমান্ত রেখার ফয়সালা হয়েছে; ভারত যতদূর দখল করেছে তা সে রেখে দেবে–এই ভিত্তিতে। কাশ্মীরী নেতা শেখ আব্দুল্লাহ বলেছেন, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর হাতের পুতুল পাকিস্তান ও ভারতের কোন অধিকার নেই কাশ্মীরের উপর তাদের ইচ্ছা চাপিয়ে দেওয়ার।

তদুপরি পররাষ্ট্রমন্ত্রী সামাদ সাহেব মধ্যপ্রাচ্য ঘুরে জেনেভা চক্কর দিয়ে এসেছেন। প্রধানমন্ত্রীর কায়রো ঘুরে দেশে ফেরার কথা ছিল-তা পরিত্যাগ করা হয়েছে।

জাতিসংঘে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তির প্রশ্নে চীন ভেটো দিয়েছে। ভেটোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তুলে আওয়ামী লীগ পায়ের নীচের হারিয়ে ফেলা মাটি কিছুটা আবার যোগাড় করতে পেরেছে।

পায়ের তলায় যোগাড় করা এ মাটির জোরে আওয়ামী লীগ সরকার বিরোধী দলকে স্তব্ধ করে দেবার পায়তারা করছে। আর এই শুভ মুহূর্তেই তিনি ফিরলেন।

চীনা ভেটোর প্রতিবাদ দিয়ে দেশের তীব্র খাদ্যসঙ্কট, কোন কোন অঞ্চলের দুর্ভিক্ষকে চাপা দেবার খুশীতে আওয়ামী লীগ উৎফুল্ল। এবারও বিজয়ীর বেশে তার প্রত্যাবর্তন ঘটলো।

আগরতলা মামলা ফেরত শেখ মুজিবের প্রতিপত্তি ১৯৭১ পর্যন্ত ছিল অক্ষুণ্ন। 'পশ্চিম পাকিস্তান' ফেরত শেখ মুজিবের প্রতিপত্তি ছিল ৭ মাস, জেনেভা ফেরত শেখ মুজিবের প্রতিপত্তি ক্রমহ্রাস মান সূত্রের হিসাবে ক'দিন থাকে তা দেখা যাবে আগামী ক'দিনের মধ্যে।

দেশে খাদ্য-বস্ত্র সঙ্কট, মুদ্রাস্ফীতি সমস্যা, অনুৎপাদন সঙ্কট, ভূমি সংস্কার সঙ্কট সবই রয়েছে। অনাহারে মানুষ মরছে, মুর্দা দাফন হচ্ছে কলাপাতা দিয়ে, মুদ্রাস্ফীতির অভিশাপে নিম্ন-আয়ের লোকদের জীবন হয়ে উঠেছে দুর্বিসহ।

জয় মুজিব শ্লোগান তুলে কলকারখানার চত্বরে লালবাহিনীরা কুচকাওয়াজ করেছে। গত ক'মাস উৎপাদনের কাজে তাদের হাত লাগেনি। বেতন তারা নিয়েছে পুরো। শিল্পের সঙ্কট তো এখানেই শেষ নয়, কলকারখানায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বের কোন্দলের দরুণ লেগেছে জেলাওয়ারী দাঙ্গা। চট্টগ্রামে মুজিবের ডান হাত আর বাঁ হাতেরা দেশবাংলা পত্রিকা নিয়ে জবর খেল দেখিয়ে শুরু করেছে চরম সাম্প্রদায়িকতা। মুজিবের অনুসারী তথাকথিত বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রীদের কাগজে রসূলুল্লাহকে বলা হয়েছে লম্পট। মুজিবের অনুসারী তথাকথিত মুজিববাদীরা হঠাৎ করে ইসলাম প্রেমিক হয়ে মুসলিম বাংলার শ্লোগান হেঁকে সারা চট্টগ্রামে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা করে তুলেছে বিপন্ন। ভূমি সংস্কারের জন্য বেলেমেউচা অনেক গড়ে হলেও বিড়ালের গলায় ঘন্টি লাগাতে সেরনিবেয়াত সাহসী নন। কারণ, সর্বোচ্চ সংবিধানিক আসনে উপবিষ্ট ব্যক্তিটিরই কয়েক হাজার একর (বিঘা নয়-একর) জমি রয়ে গেছে–এগুলো এবং আওয়ামী নেতাদের ইত্যকার বাড়তি জমিগুলোর গোপন সদগতি না হওয়া পর্যন্ত ভূমি সংস্কারের ঢোল রাস্তাতেই বাজবে, কালীঘরে উঠবে না।

তাই আওয়ামী লীগ নেতারা সারা দেহের রক্ত মুখে এনে স্বাস্থ্য দেখানোর মত যেটুকু নতুন 'জনপ্রিয় ব্রত' অর্জন করেছেন, সেটুকু নিঃশেষ হতে বেশিদিন সময় লাগবে না। তারপর আবার থোড় বড়ি খাড়া... খাড়া বড়ি থোড় দশায় এনে দাঁড়াবে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক ভাগ্য।

আওয়ামী লীগের এই ভাগ্য আরও কিছু কালের জন্য মুলতুবি রাখার প্রয়োজনে ইন্দিরা স্টাইলে পুরাতন কংগ্রেস থেকে নবকংগ্রেসে উত্তরণের নাটক এখানেও সাজানো মঞ্চে অভিনীত হবার দরজায় আছে কিনা দিল্লী বৈঠকে ইন্দিরা-মুজিব তাই বিবেচনা করেছেন।

অবশ্য মুজিববাদের রাবিশ নিয়ে আরও কিছুদিন টিকতে পারা যাবে বলেই তাদের সিদ্ধান্ত হয়েছে। তবে মুজিববাদীদের ব্যবহার করার শেষ কয়টি দিনে মুজিববাদীদের ফ্যাসিস্টের মত অনিবার্যভাবে ব্যবহার করা হবে। এদের দিয়ে আর ক্ষমতার রথ টানতে পারা না গেলে তখন ডাক পড়বে এদেশে সৃষ্ট নবকংগ্রেসের ভেকধারী 'বিপ্লবীদের'– তখন হবে আরেক নাটক। দিল্লী বৈঠক এদেশের বিরোধী দল নিধনের জন্য শেখ মুজিবকে কত দূর ম্যান্ডেট দিয়েছে তা শীগগীরই বুঝা যাবে। কিন্তু দিল্লীর ম্যান্ডেট ধরে যত দূর অগ্রসর হবে মুজিব সরকারের জনতার ম্যান্ডেট ততটাই খর্ব হবে। দিল্লীর প্রদত্ত নির্দেশ একশত ভাগ পালনের পর দিল্লীর দেওয়া ইলেকশন স্ট্রাটেজী কোন কাজ দেবে না যদি ইলেকশন আদৌ হয়।

কে এই কর্নেল চিত্ত?

জনৈক কর্নেল চিত্ত ভারতীয় প্রভুদের ইচ্ছানুসারে বাংলাদেশের রাজধানী রক্ষার গ্যারিসন–প্রধানতম সেনানিবাস ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের সর্বাধিপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। ১লা আগস্ট, ১৯৭২ থেকে তার নিয়োগ কার্যকরী হয়েছে।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরে সংঘাত ও সংঘর্ষ বাধিয়ে দিয়ে ভারতীয়রা এই সংঘাতের সুযোগে নিজেদের পছন্দসই লোকদের উপরে তুলে আনছে। চিত্ত চৌধুরীর পদোন্নতি ও দায়িত্ব বৃদ্ধি হচ্ছে এই ষড়যন্ত্রের ফল। ভারতীয়রা বলেছে যে এই চিত্ত চৌধুরী বাংলাদেশ সরকারের বিশ্বস্ত থাকবে। ভারতের প্রতি বিশ্বস্ততা রক্ষায় যার জুড়ি নেই, তিনি ভারতের আশ্রিত রাজ্য বাংলাদেশে ভারতের স্বার্থ ও দখলকার টিকিয়ে রাখতে কার্পন্য করবে কেন?

কর্নেল চিত্তের নিয়োগের পর থেকে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট এক ভুতুড়ে বাড়ীতে পরিণত হয়েছে।

এই লোকদের বিশ্বস্ত অনুচরেরা মুক্তিযুদ্ধের সময় বীরত্ব ও ঐশ্বর্য প্রদর্শনকারী অন্যান্য কমান্ডারদের পেছনে ছায়ার মত বিচরণ করছে। সবগুলো গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে চিত্ত চৌধুরীর গুপ্তচরেরা সর্বক্ষণ প্রহরায় থাকছে। এর অনিবার্য পরিণতিতে সেনানিবাসে অবস্থানরত সৈনিকদের মধ্যে সন্দিগ্ধভাব ও হতাশা ছড়িয়ে পড়ছে আরও বেশি করে।

কিছুদিন আগে এই চিত্ত চৌধুরী নামক কর্নেল ফরিদপুর গিয়ে, আকস্মিকভাবে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে আসেন বলে খবর এসেছে। এই চিত্ত চৌধুরীই সেই চিত্ত চৌধুরী বলে ধারণা করা হচ্ছে।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে জনৈক কর্নেল চিত্ত চাকুরী করতেন। ২৫শে মার্চ, ১৯৭১-এর পর তিনি পশ্চিম পাকিস্তানেই আটকা পড়ে যান। তিনি সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছেন বলে কোন খবর পাওয়া যায়নি। ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের উপর যে কর্নেল চিত্ত সম্রাট হয়ে চেপে বসেছেন, তাকে পাকিস্তান আর্মির সেই কর্নেল চিত্ত বলেই নাকি পরিচয় দেওয়া হচ্ছে। অথচ পাকিস্তানে আটক কর্নেল চিত্ত এখানে এলো কেমন করে এটা এক বিস্ময়।

ধারণা করা হচ্ছে, ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা রুথলেস র‍্যাড ও ভারতীয় সামরিক গোয়েন্দাচক্র একটা বানোয়াট কাহিনীর ভিত্তিতে এই কর্নেল চিত্তকে হাজির করেছে। বলা হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের সময় ঐ চিত্ত উদ্ধার পেয়েছেন বলে প্রচার করা হবে। ধরা যাক, মুক্তিযুদ্ধের সময় আসল চিত্ত উদ্ধার পেয়েছেন, কিন্তু এ্যাদ্দিন তিনি কোথায় ছিলেন? ভারতের গোয়েন্দা ঘাঁটিতে, মগজ তরবিয়ত করার জন্য? তিনি কোন যুদ্ধে নেতৃত্ব দেননি।

আর যদি পাকিস্তানে আটক কর্নেল চিত্ত সেখানে নিহত হয়ে থাকেন তবে এ চিত্ত কি

ভারতের গোয়েন্দা ঘাঁটিতে তৈরী চিত্তের প্রেতাত্মা?

অবশ্য ঢাকা ক্যান্টনমেন্টকে যে রহস্য আর ভীতিময় পুরিতে পরিণত করা হচ্ছে তাতে কর্নেল চিত্তের কাঁধে প্রেত সওয়ার হবার আলামত বিলক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে।

ভাসানীর বিবৃতি

আমি গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে, একদিকে যখন সরকারের চরম ব্যর্থতা ও দুর্নীতির ফলে খাদ্যাভাবে মানুষ দিন দিন ধুঁকে ধুঁকে মরছে, অন্যদিকে সরকার জনগণের এ অর্থনৈতিক সঙ্কট সমাধানের কোন প্রচেষ্টা গ্রহণ না করে চরম ফ্যাসীবাদী কায়দায় গণবিক্ষোভকে দমন করতে চাচ্ছে। এই সুযোগে বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি জনগণের বহু রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতাকে নস্যাৎ করার জন্য গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। বন্ধুর বেশে এইসব সাম্রাজ্যবাদী, সংশোধনবাদী ও সম্প্রসারণবাদী শক্তিসমূহ বাংলার মানুষকে চিরদিনের মত গোলামীর শৃঙ্খলে আবদ্ধ করতে তৎপর হয়ে উঠেছে আর আমাদের সরকার এইসব বিদেশী শক্তির দাবার গুটি হিসাবে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে মিশিয়ে দিয়ে বিদেশী প্রভুর নির্দেশে একের পর এক জনগণের সকল গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নিচ্ছে। সম্পূর্ণ ফ্যাসীবাদী পন্থায় তারা সন্ত্রাস, গুপ্তহত্যা, বাড়ীঘরে হামলা ও অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে বিরোধী দলীয় কর্মীদের নিশ্চিহ্ন করার অশুভ চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছে। ক্ষুধা মানুষের খাদ্যের দাবীতে কথা বলার অধিকার নাই। অসহায় মানুষের অভাব অভিযোগের কথা জানিয়ে দেশে যে দু'একখানা বিরোধী দলীয় সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হত, চরম স্বৈরতান্ত্রিক পদ্ধতিতে একে একে তারও কণ্ঠরোধ করে দেয়া হচ্ছে। সাপ্তাহিক 'গণশক্তি' তালাবদ্ধ করা হয়েছে। 'হক-কথা' সম্পাদক জনাব ইরফানুল বারীকে মিথ্যা অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কয়েকদিন আগে সাপ্তাহিক 'মুখপত্রের' সম্পাদককে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং গুণ্ডাবাহিনী লেলিয়ে দিয়ে অফিস জবর দখল করা হয়েছে। সর্বশেষ বাংলাদেশে সর্বাধিক প্রচারিত 'হক-কথা'সহ পাঁচটি সাপ্তাহিক পত্রিকা বন্ধ করে দেবার নোটিশ জারী করা হয়েছে। এক কথায় সরকার বিরোধী সকল সংবাদপত্রের টুটি টিপে হত্যা করতে এই সরকার বদ্ধপরিকর। নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের সকল পথ আজ রুদ্ধ। জনগণের অর্থনৈতিক জীবন ও গণতান্ত্রিক অধিকার উভয়ই আজ চরম সঙ্কটের সম্মুখীন।

দেশের এই পরিস্থিতিতে আমরা কিছুতেই চুপ করে বসে থাকতে পারি না। দলমত নির্বিশেষে সকল গণতন্ত্রকামী মানুষের কাছে তাই আমার আকুল আবেদন, আসুন ১লা অক্টোবর সারা দেশব্যাপী সভা ও শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রার মাধ্যমে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দিবস পালন করি।

সর্বদলীয় খাদ্য

সংগ্রাম কমিটির সভা

গত ১২ই সেপ্টেম্বর ৭২ সাল সর্বদলীয় খাদ্য সংগ্রাম কমিটির এক সভা সন্তোষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সর্বদলীয় খাদ্য সংগ্রাম কমিটির আহ্বায়ক মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

এই সভা বাংলাদেশে বিরাজমান বর্তমান দুর্ভিক্ষাবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সারাদেশব্যাপী গণআন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে। এই সভা লক্ষ্য করছে যে ইতিমধ্যে অন্ন-বস্ত্র-বাঁচার দাবীতে দেশের জনগণ ক্রমশঃ সংগ্রামমুখর হয়ে উঠছে। গত ৩রা সেপ্টেম্বর মওলানা ভাসানী আহূত ক্ষুধা মিছিলের কর্মসূচীর সাফল্যে এই সভা মনে করে যে ভারতের শাসক ও শোষকগোষ্ঠীর উপর নির্ভরশীল সাম্রাজ্যবাদের বিশেষ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রতি মোহগ্রস্থ, জোতদার, মহাজন, চোরাচালানী, মওজুতদার, কালোবাজারী, দুর্নীতিপরায়ণ এমসিএ, আমলা প্রভৃতির পৃষ্ঠপোষক এই সরকারের ভ্রান্তনীতিই এই সর্বগ্রাসী খাদ্য সঙ্কটের জন্যে দায়ী। এই সভা লক্ষ্য করছে এই শাসকগোষ্ঠী মানুষের অন্ন-বস্ত্র ও বাঁচার দাবীকে দমননীতির মাধ্যমে টুটি টিপে হত্যার পথ গ্রহণ করছে। ক্ষুধা মিছিলের উপর হামলা, বিরোধী দলীয় কর্মীদের উপর গুম, খুন, গ্রেপ্তার এবং নানা ধরনের নির্যাতন চলছে, এর চাইতে দুঃখজনক আর কিছুই হতে পারে না।

জনতার আশা-আকাঙ্খার বিশ্বস্ত সাথী সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপরও নগ্ন হামলা চালানো হচ্ছে। আজকের এই সর্বদলীয় সভা শাসকগোষ্ঠীকে সতর্ক করে দিচ্ছে যে দমননীতি বন্ধ করে এই সর্বগ্রাসী খাদ্য সঙ্কট সমাধানের জন্যে শাসকগোষ্ঠী অগ্রসর না হলে এদেশের জনগণ তুমুল গণআন্দোলনের মাধ্যমেই তার দাঁত-ভাঙ্গা জবাব দেবে।

কক্সবাজারে তেজস্ক্রিয় সম্পদ
কার ভাগ্যে জুটবে ?

কক্সবাজারের সমুদ্রতটে বিপুল পরিমাণ তেজস্ক্রিয় খনিজ সম্পদের মজুদ আবিষ্কৃত হয়েছিল পাকিস্তান আমলে। এই অমূল্য সম্পদ আবিষ্কারের কথা সরকার চেপে যাচ্ছিলো। মওলানা ভাসানী সংবাদপত্রের মাধ্যমে এ তথ্য জানিয়ে দিয়েছিলেন জনগণকে।

বৃহৎশক্তি, পারমাণবিক শক্তির অধিকারী ও অভিলাষী দেশগুলো যারা বিশ্বে তেজস্ক্রিয় পদার্থের সন্ধানে হন্যে হয়ে ঘুরছে, পাকিস্তান সরকার গোপনে আমেরিকাকে এই অমূল্য সম্পদ দিয়ে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য তার মদদ দেবার গোপন ষড়যন্ত্র করেছিল। বাংলাদেশের জনগণের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ায় সে ষড়যন্ত্র সফল হয়নি।

এই অমূল্য সম্পদের দায়িত্ব আজ ন্যস্ত হয়েছে বাংলাদেশ সরকারের উপর। এই অমূল্য সম্পদ আহরণ করে তা কাজে লাগানো অথবা বিক্রি করার দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে এ সরকার আবার কার খপ্পরে পড়বে, তা বিরাট সন্দেহের ব্যাপার।

বিশ্বের যে ক'টি দেশে এ ধরনের তেজস্ক্রিয় পদার্থের খনি রয়েছে, সাম্রাজ্যবাদীরা সে দেশগুলোকে ছিন্নভিন্ন– লণ্ডভন্ড করে এ সম্পদ হরণ করে নিয়ে যায়। বঙ্গের ভাগ্যে আজ যে অমানিশা নেমেছে তার মূলে রয়েছে তেজস্ক্রিয় পদার্থের আধার।

ক'দিন আগে প্রাকৃতিক সম্পদমন্ত্রী তেজস্ক্রিয় সম্পদের কক্সবাজার খনির কথা স্বীকার করেছেন। ব্যস ঐ পর্যন্তই। কিন্তু এ সম্পদকে বিদেশী কোন শক্তির হাতে তুলে দেবার জন্য এবং বিদেশী শক্তিকে এ সম্পদের লোভ দেখিয়ে ডেকে আনার জন্য গোপন আলোচনা চলছে। অমিত সম্ভাবনার এ প্রকল্পটির বাস্তবায়ন পাকিস্তান সরকার করেনি, শুধু গড়িমসি চালিয়ে গেছে।

বাংলাদেশ সরকারের সাম্প্রতিক বয়ানেও সেই একই গড়িমসির আভাষ পাওয়া গেছে।

এখন নতুন ফতুয়া তুলে বলা হচ্ছে রূপপুর আণবিক শক্তি প্রকল্পের নীলনকশা পুরোপুরিভাবে বদল করার কথা সরকার ভাবছেন। কেননা, সীমিত সরবরাহের বহু মূল্যবান ধাতু শক্তির উৎস হিসাবে রিএ্যাক্টর ব্যবহার করতে বাংলাদেশ সরকার রাজী নন। সস্তা কোন জ্বালানি ব্যবহারপযোগী পদ্ধতির কথাই সরকার ভাবছেন।

সত্তার তিন অবস্থার কথা সরকারের জানা না থাকার কথা নয়। তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে শক্তি আহরণের ব্যবস্থা না হলে রূপপুর প্রকল্প সাধারণ পাওয়ার হাউজের চেয়ে কোন উন্নত কিছু হবে না। সে অবস্থায় এ প্রকল্প সম্পর্কে জনমনে বদ্ধমূল বিরাট ধারণা ভঙ্গ হবে। তেজস্ক্রিয় পদার্থ দ্বারা বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রকল্পটি চালানো হলে তা উত্তরবঙ্গের বিরাট জনপদের জন্য পর্যাপ্ত বিদ্যুত সরবরাহ করতে পারবে।

বিশ্বস্ত সূত্রে প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, সরকার জ্বালানি সংক্রান্ত বিকল্প বিবেচনার ধুয়া তুলে রূপপুর আণবিক শক্তি প্রকল্পকে ঘোড়াশাল ও শাহজীবাজারের মত থার্মাল পাওয়ার স্টেশনের রূপ দেবার চক্রান্ত করছে।

দেশে তেজস্ক্রিয় পদার্থের মওজুদ থাকতে সরকার দ্বিধা করছেন কেন, তা বুঝে উঠা দুষ্কর। তেজস্ক্রিয় ইউরিয়ার আকরিক থেকে খাঁটি ইউরিয়া আহরণের প্লান্ট বসানোর জন্য যে কোন দেশ থেকেই সাহায্য পাওয়া সম্ভব। কিন্তু প্রশ্ন, শান্তির জন্য বাংলাদেশের ইউরিয়া ব্যবহারের প্রশ্ন সরকার এড়িয়ে যাচ্ছেন কোন উদ্দেশ্যে?

ভারত পারমাণবিক মারণাস্ত্র তৈরীর জন্য লাফঝাপ দিচ্ছে। আমেরিকা-রাশিয়া তা বানিয়ে চলছে অনবরত। এখন জিজ্ঞাস্য হলো, বাংলাদেশের ইউরিয়া নেবে কারা? রাশিয়া, আমেরিকা না ভারত।

ভাসানীর জরুরী আবেদন

বাংলাদেশের জনসাধারণের নিকট আমার বিশেষ আরজ হিন্দুস্থান, রাশিয়া, আমেরিকা প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী দেশের চক্রান্ত ও শোষণের জন্য বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু যাহারা দেশ বিভাগের পর হইতে আজ পর্যন্ত আমাদের প্রতিবেশী হিসাবে সমানভাবে সুখ-দুঃখ ভোগ করিয়া আসিতেছে তাহারা দায়ী নহে। তাই কোন শত্রুপক্ষের উস্কানিতে বা কুপরামর্শে তাহাদের উপর যেন কোন প্রকার অত্যাচার উৎপীড়ন না হয় তজ্জন্য বাংলাদেশের প্রত্যেক এলাকার দেশ দরদী ভাই-ভগ্নিরা আন্তরিকবাবে চেষ্টা করিবেন।

–মোঃ আব্দুল হামিদ খান ভাসানী

ছহি বড় মনিনামা

মহা কমিনিস্ট পার্টির কেচ্ছা

আমামেরিকার সংগ্রামী নেত্রী ও কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য এঞ্জেলা ডেভিসকে রাশিয়ার তাসখন্দ বিশ্ববিদ্যালয় ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত করেছে।

বাংলাদেশের মহা কমিনিস্ট মনিসিং তার সাম্প্রতিক রাশিয়া সফরকালে একটি উপাধি পেয়েছেন। উপাধিটি কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে নয়, ডক্টরেট নয়। রাশিয়ার এক অখ্যাত উদ্যানে গমন করলে সেখানকার উদ্যান কর্মীরা বাংলাদেশের এই নিঃসঙ্গ রুশপন্থী কমিনিস্টকে 'অনারারী উদ্যানবিদ' খেতাব দেন। কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা রাজনীতি প্রশিক্ষণের কোন শিক্ষালয় মনিসিং-এর সফরকে কোন আমলেই আনেনি।

আমেরিকার কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যা এঞ্জেলা রাশিয়ার কাছে যদ্দুর গুরুত্ব পাচ্ছে, বাংলাদেশের একটা 'ইয়াবড়' কমিউনিস্ট পার্টির 'মহানেতা' তার শতকরা একভাগ গুরুত্ব পাননি তাদের কাবা রাশিয়ার কাছে।

একটা কলম বয়ে আনার দায়িত্বটুকুও নয়

মনিসিং ফিরে এলে তাদের সমর্থক খবরের কাগজসহ বিভিন্ন কাগজে ফলাও করে খবর বের হলো ঃ সোভিয়েত রাশিয়া বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমানের জন্য একটি বিচিত্র ধরনের গাছের কলম পাঠিয়েছে উপহার হিসাবে। বহু রকমের ফল-ফুল হয় এ গাছে– এ গাছের নাম মৈত্রী বৃক্ষ।

ধারণা করা গিয়েছিল– যাক মনিসিং বুঝি মস্কোর কিঞ্চিৎ আস্থা অর্জন করতে পেরেছেন। অন্ততঃ একটা কলম উপহার পাঠাবার দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত করেছে। কিন্তু, হা হতোস্মি।

ঢাকাস্থ রুশ দূতাবাস হেঁ হেঁ করে তেড়ে এলো। দূতাবাসের সেকেন্ড সেক্রেটারী টেলিফোনে, তারপর অফিসে-বাসায় ধাওয়া করে মাসিমাকে বললেন, এটা কি করেছেন? মুজিব এখনো আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি।

হ্যাঁ আপনাদের চাইতেও। আপনাকে দিয়ে উপহার পাঠাবে কেন রুশ গভর্ণমেন্ট। পত্রিকায় প্রতিবাদ পাঠান। শিগগিরই। আজকেই।

মনিসিং নাকে-চোখের পানি এক করে আবার নিজ কণ্ঠস্বরের প্রতিবাদ করতে নামলেন।

বললেন খবরটা ভুল হয়ে গেছে। কমিউনিস্ট পার্টির মহারথীরা কাগজে কাগজে ধর্ণা দিলেন। বললেন খবরটার একটু সংশোধনী না ছাপালে অসুবিধে হয়ে যাচ্ছে।

সে খবরের সংশোধনী ছাপা হলো। রাশিয়ার অমূলক উদ্যানে সফর করতে গিয়ে মনিসিং এ গাছ দেখতে পান। গাছটি ভাল লেগেছিল তার। (ভাল জিনিষ ভালবাসার পালকে দিতে হয়)। বঙ্গবন্ধুকে একটা কলম দিতে পারলে বঙ্গবন্ধু খুশী হবেন। এ ভেবে উদ্যানের কর্মচারীদের তিনি অনুরোধ করলেন একটা কলম দেবে ভাই। একটা কলম যদি দাও তাহলে একজনকে নিয়ে দিতাম।

উদ্যান কর্মীরা বাধ সাধলো না। অনারারী উদ্যানবিদ মনিসিংকে নিজহাতেই কলম বাঁধতে হলো। ক'দিন পরে (জবাবদিহি করে ফিরবার পথে) কলমটি কেটে তিনি নিয়ে এলেন। রাশিয়া সরকার বা কোন সংস্থা এ কলম পাঠায়নি। বঙ্গবন্ধুকে খুশী করার জন্য এতিমের মত ওটা মেগে এনেছেন।

আসল খবর

রাশিয়াকে ভুল তথ্য দিয়ে দিয়ে বাংলাদেশের ব্যাপারে রাশিয়ার পার্টি ও সরকারকে বিপাকে ফেলাবার দায়ে মনিসিংকে জবাবদিহির জন্য মস্কোতে পাকড়াও করা হয়েছিল। সেখান থেকে ফিরে এসে মনিসিংহীদের অবস্থা আরও খারাপ হয়ে গেছে। হতচ্ছাড়া রাশিয়া ছাড়-এদের ব্যাপারে রাশিয়ানদের আর কোন ভাষা নেই।

মনিসিংকে আন্দোলনের একটা দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এটা পালন করতে না পারলে মস্কোর সরাসরি লাথি এদের উপর পড়বেই।

মনি-মোজাফফরের দল ভাই আন্দোলনের তবলা বাজাচ্ছে, তাগ ডুগ ডুমম তাগ ডুগ ডুগ। কিন্তু অবস্থা বড়ই খারাপ। মস্কোই দাওয়াই বেচার আসরে লোক জুটবে না। অন্তর্যামির মত রাশিয়া এদের ক্ষমতা লক্ষ্য করছে। মোজাফফর বেতাল হলেও তালের মানুষ। মনিসিং বুঝছেন পরীক্ষকের মত রাশিয়ার নজর রয়েছে এদের কাজের অগ্রগতির উপর।

আওয়ামী লীগের সাথে মিলে নিজেদের হাতে উল্টে দেওয়া পাথর আবার উল্টো পিঠ করার চেষ্টায় মনি-মোজাফফর কাঁধ লাগিয়ে ঠেলছেন। কিন্তু পাথর নড়ছে না। প্রভুর চক্ষুর সামনে এহেন দশায় আপাদমস্তক থামতে থাকা ছাড়া মনিসিং আর কিছুই করতে পারছেন না।

রিলিফের পয়সায় কন্ট্রাকটারি

ফেনী থানার ৩নং পূর্বচন্দ্রপুরের মানুষ না খেয়ে মরছে। গ্রামে যে রিলিফ গিয়েছিল তা থেকে জনৈক রিলিফ সদস্য তার মহামান্বিত প্রতাপ খাটিয়ে কন্ট্রাকটারির পয়সা যোগাড় করেছেন। দু'মাস আগে একবার কম্বল ধরা পড়েছিল। চেয়ারম্যান, সেক্রেটারি সে যাত্রা গোখরা সাহেবকে বাঁচিয়ে দিলেন। ক'দিন আগে তিনি আবার টাকা ও চাল চুরি করে ধরা পড়েন। গরীব মানুষ গণকমিটির শরনাপন্ন হলে তারা সাহেবকে শহরে চলে যেতে বলেন। চেয়ারম্যান, সেক্রেটারী হচ্ছেন তার চাচাত ভাই ও ফুফাতো বোনের জামাতা। এখন বাকীরা একই উপায়ে ভাগ্য গড়ছেন।

জেগে আছে জনতা

গোলাম মোহাম্মাদ মস্তফা

চরমপত্র দিচ্ছি তোমায় শোনো:
বিষবৃক্ষ উপড়ে ফেলো
পুষ্পো বীজ বুনো।
আমরা তোমায় বন্ধু মানি
বৃথাই প্রমাদ গুণো
দেয়া নেয়ার হিসাব করে
লাভ হবে কি কোনো।
দেয়ার চাইতে নিবেই বেশী
ডাকাত তুমি বন্ধুবেশী
মৈত্রী নামের মালা পরে
দিচ্ছো এ ঘর ফতুর করে
করছো আহার দুঃখীলোকের
মিত্র তাও দুঃখ-শোকের
আজব কাণ্ড-জবর খেলা
শিল্পী মেরে শিল্পমেলা!
দান-খয়রাতে দরাজহস্ত
এ যুগের দাতাকর্ণ
দিন-দুপুরেই লুটো সমস্ত
বন্ধুর রূপা স্বর্ণ
ধরা পড়ে গেছে তোমার চাতুরী
আসোনি বন্ধু সেজে
মিঠে কথা বলে বুকে মারো ছুরি
পুরাতন খেলা এ-যে!
ভাইকেও ক্ষমা করে নাই যারা
বন্ধু সে কোন ছার
ছলবল যতো করে দেখো সারা
অন্যায় আবদার
এ-জাত শিখেছে অস্ত্র ধরতে
প্রয়োজন দেখা দিলে
এ-জাত শিখেছে আবার মরতে
নর-নারী সবে মিলে।
নস্যাৎ করে দেবো সমস্ত কৌশল
সাবধান হয়ে যাও দোসৃত
কাজে লাগবেনা কোনো বিমান ও নৌকা
গণবাঘ ছিঁড়ে খাবে গোশ্‌ত।

হক-কথা

২৯শে ভাদ্র, শুক্রবার

ঋণাত্বক রাজনীতির সূত্রপাত

রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের মোকাবেলায় ততোধিক অন্তর্গামী রাজনীতি নিয়ে বুঝবার সুযোগ থাকতেও এদেশের ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ কেন মাঝে মধ্যে অতিদম্ভে আত্মহারা হয়ে উঠে এবং প্রায়শঃই রাজনীতি বিবর্জিত মন্তব্য উচচারণে প্রবৃত্ত হয়। একাধিকবার আমরা জনতার সামনে সে প্রশ্ন তুলে ধরেছি। ইদানীং প্রভু আওয়ামী লীগ আর পরিষদ দল মনিসিং-মোজাফফর সেই পুরনো তালে গায়ের জোরে তবলা ঠুকছেন। তাদের একমাত্র ইচ্ছা, সজোরে তবলা পিটুনীর আওয়াজে জনগণ সবকিছু ভুলে তাদের দিকে হা করে চেয়ে থাকবে। বাস্তবে এদের আশা পূর্ণ হবার লক্ষণ কিছু নেই কিন্তু।

মোজাফফর-রা একাধিকবার মওলানা ভাসানীকে দেশ ছেড়ে চলে যাবার উপদেশ খয়রাত দিয়েছে। এখন হয়ত তারা ইতিপূর্বেকার অন্যান্য ঘটনার মত এই রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে জব্দ করার জন্য সরকারী যন্ত্রের নির্বিচার হস্তক্ষেপ এবং অত্যাচারের স্টীম রোলারকে আহ্বান জানাবে। আশ্চর্য নয়, তারা ইতিমধ্যে সভা-সমাবেশ করে ইত্যাকার আহ্বান জানিয়েছে। এবং এর মাধ্যমে জনতার কাছে মনি-মোজাফফর দল তথাকথিত একমাত্র স্বীকৃত বিরোধীদল হিসাবে নিজেদের চেহারা পরিষ্কার করে দিয়েছে।

দেশের মানুষকে ভুখা রেখে যে সব বিষণ্ন বিবর্ণ মুখের উপর রাজনীতির লম্বা কথা উচ্চারণের মত হীনকৃতকর্মের জন্য আওয়ামী লীগ লজ্জা পেয়েছিল- মনি-মোজাফফরের উৎসাহে সেই লজ্জা তাদের ঘুছে গেছে। চরম ব্যর্থতা ও দেউলিয়া নীতির জন্য আওয়ামীরা এখন বিন্দুমাত্র অনুশোচনা করেছে না। বরং তারা লজ্জার মাথা খেয়ে আসরে নেমে চীৎকার করেছে চীনা ভেটোই সবকিছুর জন্য দায়ী। জনগণের ভাত-কাপড়ের অভাবের দিকে তারা ভ্রুক্ষেপ দিতে নারাজ।

চীনকে কষে গালি দিলে মানুষের পেট যদি ভরতো, তাহলে সানন্দে আমরাও তাতে অংশ নিতাম। কিন্তু হাওয়ার বিরুদ্ধে লড়তে গেলে, ডনকুইকসটের মত হাস্যকর অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে, এরা সে কথা বুঝতে নারাজ। বাহুবীয় ব্যাপার বাদ দিয়ে বাস্তব ব্যাপারে আগ্রহী হবার জন্য আমরা একাধিকবার আহ্বান জানিয়েছি সরকারের প্রতি। ঢাকার সুদৃশ্য ও সুসজ্জিত সেক্রেটারিয়েটে বসে 'চোরাচালান চলছে না', 'লুটপাট হচ্ছে না' 'বাংলাদেশে ভারতীয় সৈন্য নেই' বলে সরকারী-প্রেসনোট ছেড়ে সব সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। সামন্তবাসীর চোখের উপর দিয়ে খাদ্যশস্য, মাছ, পাট পাচার হচ্ছে, সরকার কাকের মত নিজের চোখ বন্ধ রাখলেও সচেতন জনগণের চোখে সেই অযাদু ঘুমের আছর নামে না।

রাজনীতির দেউলিয়াত্ব প্রকাশ পায় এভাবে, কেউ চাপায় না। আর এ দেউলিয়াত্বের চরম প্রকাশ হলো, প্রতিপক্ষের প্রতি রাজনীতিবিবর্জিত উক্তির মাধ্যমে।

আমরা আগেও বলছি, এখনো বলবো, দেশপ্রেম কারো একচেটিয়া সম্পত্তি নয়। এক নিঃশ্বাসের দৌড়ে দেশপ্রেমের কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া যায় না। এদেশের মাটি আর মানুষকে অন্তর দিয়ে ভালবেসে, সকল স্বার্থের উর্ধ্বে, সকল প্রভুভক্তির উর্ধ্বে উঠে সুসময় আর দুঃসময়- সর্বদা রাখতে হয় দেশপ্রেমের নজীর। এই আওয়ামী লীগের মতই ধস নামানো জনপ্রিয়তা নিয়ে মুসলিম লীগ একদা পাকিস্তান কায়েম করেছিল। মুসলিম লীগের নেতৃমণ্ডলী গাড়ী-বাড়ী কলকারখানা আর ব্যাংক ব্যালেন্সের বেদীমূলে দেশপ্রেমকে বিলিয়ে দিয়েছে। আজকের আওয়ামী লীগের দশাও তাই। মস্কোর প্রাভদা পরে আর ক্রেমিলন থেকে মাসের শুরু আর মাসের শেষভাগে ফরমান এনে সাচ্চা দেশপ্রেমের কসরত দেখায় তাদের অবস্থা আরো করুণ। পরিষদ আর প্রভু মিলে স্বাধীনতার ন'মাসে দেশপ্রেমের যে খেল দেখিয়েছে তাতে এদেশের জনগণ তাদের মত দেশপ্রেমের দোহাই শুনতে চায় না।

সমাজতন্ত্রের নামে ধাপ্পাবাজী, জনকল্যাণের নামে জনপ্রতারণা, সরকারী ক্ষমতা অপব্যবহার আর জনগণের দিকে পিঠ দিয়ে নিলর্জ্জ দালালী ছাড়া এ তিনটি সরকারী দল কিসের অঙ্গীকার আর রাখতে পেরেছে- জনগণ তা খুঁজে পায় না।

সচেতন জনতাকে ভেড়ার পালের মত নির্বোধ ভেবে এরা আজ চালাতে চাইছে এমন শাসন- যেখানে কেউ টু শব্দটি করবে না। কিন্তু সে আশা বৃথা। জাগ্রত জনতা ধাপ্পাবাজদের চিনে ফেলেছে। এমন ঋণাত্মক রাজনীতি ছাড়া এদের আর ভরসা কি।

ভেটো রাজনীতি

সমাচারেৎ

নিক্সন চীন গেছেন। জাপানী প্রধানমন্ত্রী তানাকাও ২১শে সেপটেম্বর চীন যাচ্ছেন। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ঘোলাটে হয়ে উঠলেই ক্রেমলিনের প্রধান ব্যক্তিরা মার্কিন হোয়াইট হাউসে, হোয়াইট হাউসের প্রধানরা মস্কোর ক্রেমলিনে ছুটেন। ইন্দিরা গান্ধী প্রেসিডেন্ট ভুট্টোকে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে সিমলায় হাজির করেছেন। আর এর মধ্যে শেখ মুজিব চীন যাবেন কথাটা উঠতেই অনেকে মওলানা ভাসানীর সাহসের প্রশ্ন তুলে কুপমুণ্ডকতার পরিচয় দিয়েছে নিদারুণভাবে।

শেখ মুজিবের গরজ থাকলে সে গরজই শেখ মুজিবকে যে পথে ঠেলার ঠেলে নেবে। তবে মওলানা ভাসানী শেখ মুজিবকেও চেনেন, জানেন আন্তর্জাতিক রাজনীতির গতিপ্রবাহের জোয়ার ভাটার ক্ষণমুহূর্ত।

জাতিসংঘে বাংলাদেশ প্রশ্ন উত্থাপিত হবার আগে এবং পরে জনাব সামাদ সাহেবরা যা বলছেন, এ দুয়ের মধ্যে সঙ্গতি খুঁজে পায় সাধ্য কার। এ যেন মঞ্চপর্বে আয়োজিত এক সুব্যবস্থিত নাট্যাভিনয়। নাট্যকারের লিখে রাখা নাটকের পাঠ শুধু মুখস্ত বলে যাওয়া এবং প্রয়োজন ও দক্ষতামত ভাবভঙ্গি করার কসরৎ। সামাদ-নজরুল সব সাহেব মিলে চীনের সাথে এদেশের নাড়ীর সম্পর্ক খুঁজতে খুঁজতে কেউ ঐতিহাসিক, কেউ প্রত্নতত্ত্ববিদ হয়ে উঠেছিলেন এর আগে। এখন সবাই চীনের চৌদপুরুষ উদ্ধারের দৌড়ে চ্যাম্পিয়নশিপ অর্জনে ব্যস্ত। এ দুয়ের মধ্যবর্তী পর্যায়ে যে ঘটনা ঘটে গেছে– তা হলো জাতিসংঘে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তির বিরুদ্ধে চীনের ভেটো প্রয়োগ।

এই ভেটো বাংলাদেশের অভ্যন্তরে একটা 'বিজয়ের' উৎসব ডেকে এনেছে দেখে প্রশ্ন জাগে, বাংলাদেশ যে সদস্যপদ নয়, কামনা করছে চীনা ভেটোই। আর যথার্থ প্রাপ্তির পর এখন কাড়ানাকাড়া বাজিয়ে উৎসব চলছে।

তাহলে লন্ডন টাইমস পত্রিকার ৩০শে আগষ্ট সংখ্যায় তাদের জাতিসংঘে সংবাদদাতার যে ডেসপ্যাচ ছাপা হয়েছে, তাই কি ঠিক?

সংবাদদাতা বলেছেন, বাংলাদেশ সদস্যপদ চায়নি। চেয়েছে দরখাস্ত পর্ব সমাধা হোক, এর বেশী কিছু নয়। বাংলাদেশের মুরুব্বীদের কাছে বাংলাদেশ বলে রেখেছিল আমাদের আবেদন নিয়ে হৈ চৈ করতে হবে–দরকার হলে আবেদনখানা ভেটোর মুখে ঠেলে দিতে হবে। সংবাদদাতার অভিমত, সাধারণ পরিষদের সেপ্টেম্বর মাসের অধিবেশনে যুদ্ধবন্দীসহ বিভিন্ন কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে বাংলাদেশ নারাজ। এ দিকটি বাঁচিয়ে বাংলাদেশ তার অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক প্রয়োজনে সদস্যপদ ছাড়া অন্য কিছু প্রত্যাশা করেছে।

আজকের অবস্থা দেখে সংবাদদাতার মন্তব্য মন্দ লাগছে না। আওয়ামী লীগ আর মনি-মোজাফফর গং-এর রাজনীতির মন্দা বাজারে তেজীভাব আনবার একটা চমৎকার সুযোগ এনে দিয়েছে চীনা ভেটো। আওয়ামী লীগ তার জনতার রুদ্ররোষে অর্ধছিন্ন পতাকাকে সজোরে তুলে ধরেছে, ভুখ মিছিল আন্দোলনকে দাবিয়ে দেবার জন্য ভেটো প্রতিবাদ আন্দোলনের ডাক দিয়ে। মনি-মোজাফফররা মস্কোর অনুকরণে নৃত্য ভৈরবীর আয়োজন করেছে। আওয়ামী লীগাররা সাম্রাজ্যবাদ চীনকে খতম করে দেবার কথা বলছে। মোজাফফর-মনিসিং-এর দল মূল চীনের অভ্যন্তর থেকেও মাওবাদ নিশ্চিন্ন করার অভিযানমূলক গল্পকাহিনী শোনাচ্ছেন।

অবশ্য আমেরিকার গুতোয় বাংলাদেশে পায়ের তলায় মাটি হারানোর দশায় পৌঁছে সোভিয়েত ইউনিয়ন এ মাটি আঁকড়ে রাখার লাস্ট চান্স হিসাবে ভেটো পলিটিক্সকে গ্রহণ করেছে। এতে সরকারের বৈঠক ঘরে (বন্দরে

অবশ্যই নয়) খালি চা-এর একটা নেমতন্ন রাশিয়া সমায়িকভাবে জোগাড় করে নিতে পেরেছে বটে কিন্তু নিরন্ন কঙ্কালসার মানুষদের কাছে এই ড্রয়িংরুম পলিটিক্সের আবেদন কখনো পৌঁছাতে পারবে না।

মনি-মোজাফফর আওয়ামী লীগের মন্দা রাজনীতিতে তেজীভাব সঞ্চারের পটভূমিতে জাতিসংঘের অভ্যন্তরে সংঘটিত ঘটনা প্রবাহ বিশ্লেষণে করে দেখা যাক ঘোলা পানিতে মৎস্য শিকার কারা করেছে।

ভেটো প্রদানের পর চীনা প্রতিনিধি হুয়াং হুয়া বলেছেন সোভিয়েত ইউনিয়ন ভাবোটেজড দি কজ–রাশিয়া এ প্রশ্নটিকে অন্তর্ঘাতের মধ্য দিয়ে বিনাশ করেছে।

চীনা বেতার বলেছে সোভিয়েত রাশিয়া বাধ্য করেছে চীনকে ভেটো দিতে। এই প্রথমবার চীনা বেতার বাংলাদেশকে বিশ্লেষণহীনভাবে শুধু বাংলাদেশ বলে উল্লেখ করেছে। চীনা বেতারের সুদীর্ঘ বিশ্লেষণে প্রতিপাদ্য ছিল একটি বিষয়। প্রতিপাদ্যটি হলো জাতিসংঘের প্রস্তাবমালার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনের জন্য যারা উস্কানি দিয়ে বেড়ায় তারা শান্তির মিত্র নয়-এটা রাশিয়ার প্রতি ইঙ্গিত। এবং রাশিয়া তার জানা সকল কূট-কৌশল প্রয়োগ করে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে চীনারা যেন ভেটো দিতে বাধ্য হয়।

লণ্ডন টাইমস বলেছে চীনারা হেরে গেছে কূটনীতির খেলায়। যা সম্পূর্ণই রাশিয়ার চাল।

রাশিয়ারা চীনকে হারাবে– আমেরিকা রাশিয়াকে হারাবে এটা তাদের বৃহৎশক্তির দ্বন্দ্ব। এটা তারা করবেই। রাশিয়া তা করুক। কিন্তু বাংলাদেশের প্রতি ঘোষিত বন্ধুত্বের অঙ্গীকারটি রাশিয়া যদি আন্তরিকভাবে রক্ষা করতো তাহলে বাংলাদেশের সদস্যপদের সম্ভাবনা নস্যাত হতো না। এখন প্রশ্ন করতে হয়, রাশিয়া তা করেছে কি?

চীন আগেই ঘোষণা করেছিল, বাংলাদেশ সরকার জাতিসংঘের প্রস্তাব না মানলে সদস্যপদ লাভে চীন বাধা দেবে। চীনের এ ঘোষণার ফলে সম্মুখবর্তী প্রতিবন্ধক কি আছে তা নিশ্চয়ই জানা হয়ে গেছে। এমতাবস্থায়, জাতিসংঘের কূটনীতিতে বহু বৎসরের অভিজ্ঞতার অধিকারী রাশিয়া নির্দিষ্ট প্রতিবন্ধকটি কৌশলে অতিক্রম করার পথই বেছে নিতে পারতো।

কিন্তু নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশন যখন বসলো, রাশিয়াকে দেখা গেল যে বাংলাদেশের প্রশ্নে তৎক্ষণাৎ একটি সমধান দাবী করছে। রাশিয়ান প্রতিনিধি ইসরায়ীলীন বলেন, এ প্রশ্ন নিয়ে বিলম্ব করা যায় না।

জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ সভাপতি বেলজিয়াম রাষ্ট্রদূত মিঃ লঙ্গারস্টেট নিশ্চয়ই রাশিয়ার এ ধরনের অকূটনৈতিক আচরণে বিস্মিত হয়েছেন। তিনি বুঝালেন, এমন একটি প্রশ্নে, জানা প্রবন্ধক সামনে রেখে তাড়াহুড়ার মধ্যে সিদ্ধান্ত নিতে যাওয়া ভুল। ধীরে সুস্থে এবং ভেটোহীন পরিবেশে প্রশ্নটি সামনে রেখে একটা আপোষ করার চেষ্টা হওয়া উচিত।

অন্তর্ভুক্তি কমিটির সম্মুখে বাংলাদেশ প্রশ্ন উপস্থাপিত হলে বেলজিয়াম ও ইতালী একটা মীমাংসার চেষ্টা চালালে পরিস্থিতি বিচার বিবেচনার জন্য সুযোগদানের উদ্দেশ্যে ১০ দিনের বিরতি ঘোষিত হলো। এদিন কয়টি নিরাপত্তা পরিষদের লবী তৎপরতার জন্য কাজে লাগিয়েছে ভারত-রাশিয়া-বৃটেন।

২১ শে আগস্ট অন্তর্ভুক্ত কমিটি বৈঠকে বসলে তিনটি আফ্রিকান রাষ্ট্রসহ জাপান, বেলজিয়াম, ইতালী, ফ্রান্স বাংলাদেশের প্রশ্নে সিদ্ধান্ত গ্রহণ অক্টোবরের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত স্থগিত রাখার জাপানী প্রস্তাব গ্রহণের মনোভাব প্রদর্শন করে। এই প্রস্তাব পাশ সকরার জন্য দরকার ছিল মোট ৯টি ভোট। আমেরিকা বসেছিল, ৮টি দেশ যদি রাজী হয় তবে নবম ভোটটি সে দেবে। চীন নিজে তাতে ভোট দিলে

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে সাধারণ বিতর্ক শেষ না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশে প্রশ্নে সিদ্ধান্ত গ্রহণ স্থগিত থাকতো এবং ইতিমধ্যে উপমহাদেশের পরিস্থিতি বাঞ্ছিত সমাধানের দিকে অগ্রসর হতে পারতো।

ইতিপূর্বে এক নিবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছিল, চীন বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রমাণ চেয়েছে। আমরা তা উপস্থাপনে ব্যর্থ হয়েছি। এ ব্যর্থতা যদ্দিন থাকবে ততদিন চীনকে হুমকি দিয়ে ফায়দা হবে না।

অন্তর্ভুক্তি কমিটির সর্বশেষ বৈঠকে চীন, জাপান প্রস্তাবটিকে সমর্থন করেনি। কারণ, তাতে জাতিসংঘ প্রস্তাব বাস্তবায়নের শর্ত জড়িত ছিল না। লন্ডন টাইমস পত্রিকার সংবাদদাতার মত হলো, চীন মনে করেছিল এ প্রস্তাব সমর্থন করলে জাতিসংঘ প্রস্তাব পরিপূরণের নীতির থেকে বিচ্যুতি ঘটবে। কিন্তু ২ মাসের মূলতবী প্রস্তাব যদি পাস হয়ে যেতো তাহলেও বাংলাদেশ নিজের ভূমিকা নিজে সাব্যস্ত করার সুযোগ পেতো।

ঘোষিত নীতির প্রতি অটল থাকার নিজের ঝোঁককে কৌশল ও পরোক্ষ কূটনীতি দ্বারা চীন সমর্থন নিয়ে যেতে পারতো ২ মাসের মূললতবী প্রস্তাব সমর্থন করে। লন্ডন টাইমসের মতে, চীন এখানেই ভুল করেছে।

২৪ ঘণ্টা পর নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশন শুরু হলে চীন এ ভুল বুঝতে পেরে অন্যান্য কূটনীতিককে জানালো যে, এখন সে জাপানী প্রস্তাব সমর্থন করতে রাজী। কিন্তু রাশিয়ার চাপে প্রস্তাবের উদ্যোক্তা জাপান তখন মত বদলে ফেলেছে। এবং রাশিয়া, তৎক্ষণাৎ বাংলাদেশ প্রশ্নে সিদ্ধান্ত নিতে হবে–এই গোঁ ধরে বসলো। এমতাবস্থায় চীনের পক্ষে তার বক্তব্যের ধারা রক্ষার জন্য ভেটো প্রয়োগ ছাড়া উপায় রইলো না।

ফল দাঁড়ালো এই– চীন আমাদের 'দুশমন' হিসাবে ভেটো দিল কিন্তু আমাদের 'বন্ধু' রাশিয়া ভেটোটি আদায় করে আমাদের মাথার উপর ফেলেছে।

চীন সরাসরি বাধা দেবার পরিবর্তে সময় চাইছিল, এটা কি চীনা ভূমিকার শৈথিল্যের লক্ষণ নয়? চীনা ভূমিকার এই বাস্তবানুগ শৈথিল্যকে আমাদের বন্ধুরা আরও বিকশিত হবার সুযোগ দিলে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ পেতো। কিন্তু বন্ধুরা তা করেনি, করতেও চায়নি। চীন আমাদের সম্মুখে এসে দাঁড়ালে রাশিয়া আমাদের ঘাড় ধরে তার সাথে আমাদের ঠোকর খাইয়েছে। আর এই ধাক্কার কথা গোপন রেখে, দেখো, আমাদের বন্ধুকে চীনারা মেরেছে বলে রাশিয়া মহানন্দে কাড়া না কাড়া বাজিয়ে তুলেছে।

জাতিসংঘে লবীতৎপরতা ও কৌশলপূর্ণ পদক্ষেপের বদৌলতে এতদপেক্ষার নাজুক ও ঘোরতর সঙ্কটগুলোর সমাধান হয়েছে, এমন নজীর যথেষ্ট। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এ নজীরের পুনরাবৃত্তি ঘটেনি একটি কারণে, চীন বিরোধী পলিটিক্সে তেজীভাব আমদানীর সুযোগ যারা পেতে চেয়েছে, তারা চীনের ভেটোই চেয়েছে।

কিন্তু সব কিছুর মাত্রা আছে। আছে একটি শেষ সীমা। ভারত-রাশিয়ার স্বীয় স্বার্থবাদী বিশ্ব রাজনীতির গুটি হিসাবে বাংলাদেশকে ব্যবহার করার এই মর্মান্তিক নজীর আমাদিগকে কোন্ অবস্থায় ঠেলে দিয়েছে তা আমরা ভেবেছি কি?

আর এ বাস্তব দশার সত্যিকার অর্থ উপলব্ধি করেই মওলানা ভাসানী বলেছেন, ভারতের করদরাজ্য হিসাবে থেকে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদে ১২ বৎসরেও চীনের সমর্থন পাবে না। যে ভুল ঘটেছে, আমাদের পক্ষ থেকে আমরা, চীনদের পক্ষ থেকে চীনারা তা সংশোধনের চেষ্টা করুক। এই চেষ্টা আন্তরিক হলে সরকারের সাথে মওলানা ভাসানী সহযোগিতা করতে রাজী আছেন।

মুজিবকে নিয়ে যাওয়ার কথাটি এ অর্থেই তাৎপর্যহ।

ভারতের সাথে অধীনতামূলক মিত্রতা চুক্তি, রাশিয়ার সাথে খাতওয়ারী অধীনতা চুক্তি করে বাংলাদেশ কোন পর্যায়ে নেমেছে জনগণ জীবন দিয়ে তা উপলব্ধি করছে। এর বিপরীতে চীন সফরে যাওয়ার কথা এমন কোন পাপের কথা নয়। বিশেষতঃ মওলানার আগে শেখ মুজিবেরই যখন "চীন সফর করে চীন দেখা না হলে কিছুই দেখা হয় না" বলে প্রশংসা করেছেন।

অবশ্য ভারত রাশিয়ার কথা ছাড়া ছকের বাইরে একটি পা দেবার ক্ষমতা ও শক্তি বর্তমান ক্ষমতাসীনদের না থাকার কথা।

তাই তারা ভারত রাশিয়ার ছক বহির্ভূত পথের কথা শুনে চিল্লিয়ে উঠেছেন। তবু শেখ মুজিবর রহমান ইচ্ছে করলে এ ছক ভাঙ্গতে পারেন। বিরাট ঝুঁকি নিয়ে দেশের স্বতন্ত্র ও স্বাধীন ভবিষ্যত শেখ মুজিব নিশ্চিত করবেন কিনা এখন সেটাই প্রশ্ন।

ভারতীয় বিমান থলির বিড়াল

জনাব,

গত ১৯শে আগস্ট শনিবারে প্রকাশিত ঢাকার পত্রিকায় "ভারতীয় হাই কমিশন প্রকাশিত খবরের প্রতিবাদ করেছে" শিরোনামায় টাঙ্গাইল থেকে প্রকাশিত জনপ্রিয় সাপ্তাহিক 'হক-কথা'য় জিজ্ঞাসিত কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়েছে। তন্মধ্যে একটি উত্তরের প্রতি আমাদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছে। তাতে ভারতীয় হাই কমিশনের প্রেস রিলিজের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে "চুক্তি মারফতে বাংলাদেশ যে দুটি ভারতীয় ফকার বিমান কিনেছে তা চলাচলের উপযুক্ত কিনা ভারত সরকার তা অবহিত নন।" আমরা জানি যেখানে ভারতের লাভালাভের প্রশ্ন সেখানে ভারত সরকারের অবহিত না থাকারই কথা। কারণ, ভারত সরকার যদি অবহিতই থাকলেন তবে বন্ধুকে অচল মাল গছাবেন কি করে? কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাসা হলো বাংলাদেশ সরকারের প্রতি- ভারত সরকার যেখানে না জেনে দুটোই পুরাতন বিমান গছিয়ে দিলেন, সেখানে বাংলাদেশ সরকার তার দায়িত্ব সম্পর্কে কতটুকু সচেতন ছিলেন। ভারতের না জেনে গছিয়ে দেয়া অপরাধ নয়–কারণ, এ হচ্ছে না জানার ভান করে লাভের অঙ্ক বাড়ানোর একটি অতি পুরাতন পন্থা। কিন্তু আমাদের সরকার ভারত থেকে বিমান ক্রয় করেছেন। আমরা যা কিনবো তা অল্প দামে দেখেশুনে ভাল জিনিসই আনার চেষ্টা করবো। এটাই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সাধারণ নিয়ম। তাই যদি হয়, আমাদের



সরকার চড়া দাম দিয়ে এ পুরাতন বিমান কি করে আনলেন? আমাদের বৈমানিকরা যতই অজ্ঞ হোন না কেন, অন্ততঃ বিমান নতুন কি পুরাতন তা চেনার মত যোগ্যতা তাদের আছে। তাহলে সরকার কি বিমানগুলো পরীক্ষা না করেই এনেছেন?

যদি সরকার বিমানগুলো পরীক্ষা না করেই এনে থাকেন তবে তা সরকারের দায়িত্বহীনতার পরিচায়ক। আর যদি পরীক্ষা করে না জানার ভান করেন তবে তা হবে সজ্ঞানে এ দেশের মেহনতি মানুষের গলায়

বন্ধুত্বের নামে ভারতীয় ঋণের ফাঁস পরিয়ে দেয়ার সামিল। এখন আমরা কি সরকারকে দায়িত্বহীন বলবো না গলায় ফাঁস দিয়ে বন্ধুত্ব মজবুত করছেন বলবো?

মমিনুল হক
নোয়াখালী

বন্দর ছাত্রলীগের অফিস নিয়ে

চট্টগ্রামের বন্দর উত্তর আবাসিক এরাকায় ১৩ই আগস্ট বিকাল সাড়ে পাঁচটায় মরহুম ছাত্রলীগের দুই উত্তরাধিকার দলের মধ্যে অফিস দখল নিয়ে তুলকালাম কাণ্ড ঘটে গেছে।

আজববাদীরা সংখ্যায় কম হলেও লাঠির জোর তাদের আছে। রববাদীরা সংখ্যায় বেশী হলেও লাঠির জোর তাদের কম। ফলে 'কেহ কারো নাহি পারে দশায়' দ্বন্দ্ব অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। বন্দর মরহুম ছাত্রলীগের লণ্ডভণ্ড কার্যালয়ে এখন বৃষ্টি কাতর ছাগল রাত্রি যাপন করছেন।

'হক-কথা' সম্পাদকের মুক্তি দাবী

সম্প্রতি রংপুর ডোমার থানা শাখার ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, কৃষক সমিতি ও বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ এক যুক্ত বিবৃতিতে অবিলম্বে 'হক-কথা' সম্পাদক জনাব ইরফানুল বারীর বিনা শর্তে মুক্তি দাবী করেছে। বিবৃতিতে সরকারের অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপের ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে খর্ব করার তীব্র সমালোচনা করা হয়। বিবৃতিতে 'গণশক্তি' পুনঃ প্রকাশের সুযোগ দানের জন্য সরকারের নিকট দাবী জানানো হয়। বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন জনাব মোজাম্মেল হোসেন, আনোয়ারুল হক, রেজাউল করিম রাজু ও জনাব আবদুল খালেক।

কিন্তু অনাহারে মানুষ মরছেই, নজরুল সাহেব!

নজরুল সাহেব চাঁটগায়ে বলে এসেছেন, বাংলাদেশ সরকার অনাহারে একটি লোককেও মরতে দেবে না।

ঢাকা-চট্টগ্রাম ট্রাঙ্ক রোডের পাশে সীতাকুণ্ড-মিরেশ্বরাই এলাকার কবরগুলোর খোঁজ তিনি রাখেন কি? গ্রাম্য এলাকায় অনাহারে মৃত্যুবরণকারী লোকদের জন্য ট্রাঙ্ক রোডের পাশে কবরস্থান করা হয়েছে। তাদের শিয়রে ফলক পুঁতে লিখে দেওয়া হয়েছে, স্বাধীন বাংলাদেশে অনাহারে তোমার মৃত্যু হলো। নজরুল সাহেব, সিলেটে অনাহারে ৯০ জন লোকের মৃত্যুর খবর পড়েননি, সে ক্যামন কথা!

যশোর-কুষ্টিয়ার সীমান্ত অঞ্চলে মানুষ অনাহারে মুখ থুবড়ে রাস্তায় পড়ে পড়ে মরছে, অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী সে খবর রাখেন না বুঝি।

নজরুল সাহেবের নির্বাচনী এলাকা ময়মনসিংহে যে মানুষেরা না খেয়ে মরেছে, তাদের সংখ্যা ১০০ জনের উপর-নজরুল সাহেব তাও ভুলে থাকতে চান।

খুলনায় বেকার শ্রমিকরা অনাহারে মুখে রক্ত তুলে মরছে, শিল্প দফতরের মন্ত্রী সে খোঁজ রাখেন না। মানুষকে বুদ্ধু মনে করে, যা খুশি তাই বলে বেড়ানোর ফল কি হয় নজরুল সাহেবরা ১৯৬৯-এ তার নজীর দেখেননি? ১৯৭১-এ তারও আলামত প্রত্যক্ষ করেনি?

রক্ষীপ্রকৃতি সেয়ানারা কারা? জবাব দাও

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যখন-তখন হিন্দুস্থানী ফৌজ চালান দেবার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে রক্ষীবাহিনীর পোষাক করা হয়েছে হুবহু ভারতীয়দের মত। রক্ষীবাহিনীর গাড়ীগুলোও ভারতীয় রং ও প্যাটার্ণের। এগুলোতে যেসব বাংলাদেশী নম্বর ছিল সম্প্রতি তা ঘষে মেজে তুলে ফেলা হয়েছে। সুতরাং জল ও পানি মিলিয়ে একাকার করে জনগণের চোখে ধূলো দেবার চেষ্টা করছে তাঁবেদার সরকার।

বাংলাদেশে বর্তমানে বিচরণরত শতকরা ৫০ ভাগ 'রক্ষী' সৈন্য হিন্দুস্থানী হিন্দী ভাষায় কথা বলে, এরা পোষাকের সাথে জবানও হিন্দুস্থানী পেয়েছে কিনা বলা মুশকিল।

বাংলাদেশ রক্ষীসেনাদের পায়ে ক্যানভাস কাপড়ের জুতোই ভরসা, ইদানীং তাগড়া ও সেয়ানা 'রক্ষীদের' পায়ে বুট জুতো দেখা যাচ্ছে।

বাংলাদেশের রক্ষীদের মত পোষাক হলেও হাবশী কালো বর্ণের 'সেয়ানা রক্ষীদের' উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে বিভিন্ন স্থানে। যা দেখা গিয়েছিল ডিসেম্বর ও জানুয়ারীতে।

সেয়ানা রক্ষীদের গাড়ী বোঝাই হয়ে সীমান্ত পথে ভারতের দিকে চলে যেতে দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশের রক্ষীরা কি হর-হামেশা ভারত সফরে যাচ্ছে সদলবলে?

মওলানা ভাসানীর সফরসূচী

জননেতা মওলানা ভাসানী আগামী ১৮ই সেপ্টেম্বর গৌরনদী, ১৯শে সেপ্টেম্বর বরিশাল ও ২০শে সেপ্টেম্বর মাদারীপুর জনসভায় বক্তৃতা করবেন।

বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, ঈশ্বরদী, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, নিলফামারী, সৈয়দপুর ইত্যাদি অঞ্চলেও তিনি ঈদুল ফেতর-এর পর ঝটিকা সফর করবেন এবং জনসভায় বক্তৃতা দেবেন বলে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে।

মুরিদের দরবার

হে মহাকাল

যুগীস মুতারাক্কি

মহাকাল, তুমি যুগের পর্দা একটু সরিয়ে দাও,
আমি একবার সমরখন্দে যাবো।
বোখরার সাথে মিতালী আমার বহু যুগের,–
ব্যাকুল হৃদয় হাহাকার করে বিচ্ছেদে।
শ্যাওলা পড়েছে মিনারে এবং গম্বুজে ;
অস্ত্রে আমার মরচে ধরেছে, মনেতে নয়।
স্বপনের ঘোরে আজান শুনেছি উজবেকের,–
কাজাখস্তানে মিলাদের ধ্বনি মূর্চ্ছা যান।
মহাকাল, তুমি নিঠুর হয়োনা ,পিছিয়ে যাও;
ইসমাইলের মাজারের পানে ফিরে তাকাওঃ
হাদিস সেখানে গুমরিয়ে কাঁদে, –মজলুমের
ব্যথার সায়রে মুমূর্ষু আজ অবহেলার।
কাফেরের রাঙা কিংখাবে ঘোড়া ইতিহাসের
পাতা উল্‌টিয়ে গাফেলীর ঘুম ভেঙে গেছে।
মোমেনের দীল্ বন্দী সেখানে, মোনাফেকের
জিন্দাখানা ভেঙে গড়বার এসেছে। ডাক্।
হোক সে উষ্ণর প্রান্তর ঘেরা বর্ণভূমি,–
গমের শীষের সবুজ-সোনালী সমারোহ,
আমার মনের রাগ-রাগিনীর ছন্দ আজ
সমরখন্দে এশার নামাজ পড়তে যায়।
কাফেরের সাথে দ্বন্দ্ব আমার, মিতালী নয়;

অস্ত্র আমার গণ-জাগরণী বিপ্লবের।
মহাকাল, বলো, আর কতকাল চুপটি রই
কাফেরের রাঙা কিংখাবে মোড়া ইতিহাসে?
মোমেনের লোনা অশ্রুত ভেজা কাহিনীতে,
মহাকাল, তুমি লুকিয়ে থেকো না–মাথা তোল
লোহিত সাগরে জোয়ার এসেছে–জেগেছে 'ভু'
গাফেলীর ঘুম ভাঙ্গুক আজারবাইজানের।
পাঞ্জেগানার আজান উঠুক মসজিদে,
সিয়ামের ডাক দিকে দিকে দাও রমজানের
মোমেন আবার এক কাফেলায় সামিল হোক,
সমরখন্দে আবার উঠুক ইনকেলাব।

ভাসানীর বাণী

সোনার বাংলাকে শ্মশান করিয়াছে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ সরকার ও পশ্চিম পাকিস্তানের জালেম ও শোষকগোষ্ঠী সরকার। কিন্তু গত ৯ মাসে বন্ধুত্বের নামে হিন্দুস্তানের সৈন্যগণ ও আন্তর্জাতিক খ্যাতনামা মাড়োয়ারী এবং অন্যান্য শ্রেণীর চোরাকারবারীগণ বাংলাদেশের সোনা-রূপা, রেডিও-টেলিভিশন, মূল্যবান পাট, সরিষা, কলাই, তিল, কালজিরা, মাছ, তরিতরকারী, স্কুল-কলেজের লাইব্রেরীর বইপুস্তক, বিজ্ঞান বিভাগের গবেষণামূলক দুর্লভ যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য মূল্যবান আসবাবপত্র, পিতল, তামা-কাসার তৈজসপত্র, ভেড়া-বকরীর চামড়া ইত্যাদি এবং বাংলাদেশে যুদ্ধের জন্য যে সমস্ত মূল্যবান সমরাস্ত্র ছিল তাহার মোট মূল্য আমাদের পক্ষে দেওয়া সম্ভব না হইলে পাকিস্তানের শোষকগোষ্ঠী গত ২৩ বৎসরে বাঙ্গালীদিগকে শোষণ করিয়া যে পরিমাণ ধন-সম্পত্তি পশ্চিম পাকিস্তানে লইয়া গিয়াছিল তাহার চেয়ে শত শত গুণ বেশী নিয়াছে ইহা বলিলে মোটেই সত্যের অপ্রলাপ হইবে না। বর্তমানে বাংলাদেশে যে ভয়াবহ খাদ্য ও অর্থসঙ্কট দেখা দিয়েছে তাহার নজীর বাংলার ইতিহাসে মোটেই পাওয়া যাইবে না। বৃটিশ সরকারের আমলে চাউল ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্য যাহা ছিল পাকিস্তান সরকারের আমলে তাহার চেয়ে তিন– চার গুণ বৃদ্ধি পাওয়ায় সারা বাংলাদেশে অপামর জনসাধারণ পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে সভা-সমিতি, ভুখা মিছিল, ধর্মঘট ইত্যাদি নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে করিয়াছে। ইহার দরুণ পাকিস্তান সরকার ক্ষিপ্ত হইয়া কখনও কখনও জননিরাপত্তা আইনের নামে পুলিশী জুলুমের দ্বারা হাজার হাজার ছাত্র-যুবক-কৃষক-শ্রমিকে বিনা বিচারে কারাগারে রাখিয়া কষ্ট দিয়াছে। কিন্তু বড়ই দুঃখের ও পরিতাপের বিষয় এই যে, বর্তমান আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠানের ও আওয়ামী লীগ সরকারের বহু কর্মকর্তাগণ পাকিস্তান সরকারের নির্মম অত্যাচার ভোগ করা সত্ত্বেও বর্তমানে তাহারাই বিরোধী দলকে ভূয়া আইনের দোহাই দিয়া এবং বাংলার স্বাধীনতার মহা শত্রু বলিয়া বিরোধী জনসাধারণের নিকট হেয়-প্রতিপন্ন করিবার জন্য দিবারাত্রি মিথ্যা প্রচার চালাইয়া যাইতেছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহু নিরপরাধ মানুষকে আহত-নিহত করিয়াছে। কালিহাতী থানার ভুখা মিছিলের উপর অতর্কিতে গুন্ডা লেলাইয়া দিয়া কাগমারীর মওলানা মোহাম্মদ আলী কলেজের ছাত্র খলিলুর রহমানকে প্রকাশ্য দিবালোকে নির্মমভাবে হত্যা করিয়াছে। অন্যান্য স্থানেও অনুরূপ আক্রমণ হইতেছে এবং ভবিষ্যতে বিরোধী দলকে সম্পূর্ণ নির্মূল করিয়া ফেলিবে বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিতেছে।

আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠান ও সরকার প্রচার করিয়া বেড়াইতেছে যে, বাংলাদেশে তাহারা খাঁটি গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা না করিয়া কিছুতেই ছাড়িবে না। তাহাদের কথা ও কাজের ভিতর আসমান ও জমিন পার্থক্য। ইহা আজ বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের মধ্যে একমাত্র আওয়ামী লীগের লুটপাট সমিতির মন্ত্রী-মেম্বর যাহারা গত ৯

মাসে রিলিফের মালামাল ও অবাঙ্গালীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়া লক্ষ টাকার মালিক সাজিয়াছেন তাহারা ব্যতীত সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবে। আওয়ামী সরকার ও প্রতিষ্ঠান বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ সরকার, পাকিস্তানের স্বৈরাচারী কনভেনশন মুসলিম লীগ সরকার প্রভৃতি ভূতপূর্ব সরকার সমূহের চেয়ে অনেক বেশী স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি, চোরাকারবারী ইত্যাদি সমাজ বিরোধী কাজে উন্নতি লাভ করিয়াছে। দমননীতির দিক দিয়া চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। বিশেষ করিয়া সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও দেশের আপামর জনতার বাক-স্বাধীনতা হরণ করিতে উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছে। সরকারের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে কেহ কিছু বলিলে তাহাকে চিরকালের জন্য দুনিয়া হইতে বিদায় দেওয়া হইবে বলিয়া লুটপাট সমিতির মেম্বর সাহেবানেরা ভয় প্রদর্শন করিয়া বেড়াইতেছে।

রাখে আল্লাহ্ মারে কে?

এখন সময় থাকিতে আওয়ামী লীগ সরকার রাশিয়া, হিন্দুস্থান, আমেরিকা প্রভৃতি বিদেশী রাষ্ট্র যাহাদিগকে আপনারা ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলিয়া মনে করেন, তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব করিতে থাকুন তাহাতে আমাদের কোনই আপত্তি নাই। কিন্তু বন্ধুত্বের নামে বাংলাদেশে স্থায়ী প্রভুত্ব কায়েমের জন্য যে ভাবে শোষণের যাতাকলে পিষিয়া আমাদিগকে মৃত্যুর দ্বারে উপস্থিত করিয়াছেন তাহা উপলব্ধি করিয়া সত্বর বিদেশীদের প্রভুত্বকে অস্বীকার করিয়া স্বাধীন বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করিতে আন্তরিকভাবে চেষ্টা করুন। অন্যথায় বাংলাদেশের কৃষক, মজুর, কামার, কুমার, জেলে, মাঝী, তাঁতী ঐক্যবদ্ধ হইয়া বিদেশী শত্রু ও চোরাকারবারীদিগকে চিরকালের জন্য বাংলার মাটি হইতে উৎখাত করিবেই–করিবে।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী সরকারের রাজত্বে সূর্য অস্ত যাইত না বলিয়া প্রবাদ ছিল। সেই সরকারকেও বাংলার মাটি হইতে উৎখাত করিতে বাঙ্গালীরাই প্রথম জেহাদ আরম্ভ করিয়াছিল। জনগণ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী সরকারের বন্দুক ও কামানের ভয়ে ভীত হইয়া কখনও স্বাধীনতার আন্দোলন পরিত্যাগ করে নাই। হিন্দুস্থান, রাশিয়া, আমেরিকার শক্তির উপর নির্ভর করিয়া বর্তমান বাংলাদেশ সরকার যতই হুঙ্কার দিক না কেন ইনশাল্লাহ্ বাঙ্গালীরা বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করিতে কোন কিছুতেই ভয় পাইবে না। হিন্দুস্তান ও অন্যান্য দেশের একচেটিয়া বাজার বাংলাদেশকে কিছুতেই হইতে দিবে না। হিন্দুস্তান অথবা অন্য কোন দেশের একজন সৈন্যকেও বাঙ্গালীরা বাংলাদেশের মাটিতে স্থান দিবে না।

এক শ্রেণীর স্বার্থপর লোক যাহারা লুটপাট করিয়া গত ৯ মাসে সোনার বাংলাকে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত করিয়াছে তাহারাই বলিয়া বেড়াইতেছে 'ভুখা মিছিল করে যারা স্বাধীনতার শত্রু তারা', 'ভুখা মিছিল করে যারা চীনের দালাল তারা।'

চীনের সঙ্গে আমার, আমার কৃষক সমিতি ও ন্যাপ পার্টির কোন সংশ্রব নাই। আমি বারবার বলিয়াছি চীন সরকার ভেটো দিয়া বাংলার জনমতকে অস্বীকার করিয়াছে। আমি ইহার জন্য সংবাদপত্রেও তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছি। চীন দেশে অতি প্রথম শেখ মুজিবর রহমান, আতাউর রহমান খান, মানিক মিঞা ভ্রমণ করিতে যায়। আমি তখন ঢাকার সেন্ট্রাল জেলে আবদ্ধ ছিলাম। তাহারা ফিরিয়া আসিয়া 'চীনে কি দেখে এলাম' বলে যে বর্ণনা সংবাদপত্রে দিয়াছিল তাহাই পাঠ করিয়া প্রথম চীন সরকারের কথা অবগত হই। দ্বিতীয়বার যখন মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী চীনে যান এবং সেখান হইতে ফিরিয়া চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাইকে স্বাগতম জানাইয়া

ঢাকার পল্টন ময়দানে যে ঐতিহাসিক সভা করেন তাতে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মিঃ শহীদ সোহরাওয়ার্দী চীৎকার করিয়া শ্লোগান দিয়েছিলেন চৌ এন লাই জিন্দাবাদ, চীন-পাকিস্তান ভাই ভাই।

১৯৪৭ সালে আমি যখন এশিয়া সম্মেলনে দিল্লীতে যাই ভারতের প্রধানমন্ত্রী স্বর্গীয় পণ্ডিত জওহর লাল নেহেরু আমাকে বলিয়াছিলেন–"মওলানা তুমি যেভাবেই হোক চীন যাইবে। চীনে না গেলে মানুষ চরিত্র ও কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা অল্প দিনের মধ্যে এত বেশী উন্নতি করিতে পারে তাহা অন্য কোন দেশ দেখিয়া বুঝিতে পারিবে না।" আমি সেই সময় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশগুলি ভ্রমণ করিয়াছি; সর্বত্রই শুনিয়াছি, চীন-হিন্দি ভাই ভাই।

বর্তমানে যখন আমরা বাংলাদেশের মরণাপন্ন মানুষকে দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস হইতে রক্ষা করিবার জন্য বাংলাদেশ ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সরকার ও জনতার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সভা-সমিতি, ডুখামিছিল ইত্যাদি আরম্ভ করিয়াছি সেই সময় আওয়ামী লীগের মুজিববাহিনী, লালবাহিনী, রক্ষীবাহিনী ও নানা রং বেরঙ্গের বাহিনী আমার বিরুদ্ধে সারাদেশে তোলপাড় করিয়া বেড়াইতেছে–চীন ভেটো দিয়াছে তজ্জন্য আমাদিগকে দায় করিয়া। চীনে প্রায় আশি কোটি লোকের বাস। চীন সরকার দুনিয়ার কাহাকেও তোয়াক্কা করিবে না ইহা সকলেই জানে। এমতাবস্থায় চীন কি করে না করে তাহার জন্য আমরা কেন দায়ী হইব?

চীনের সহিত বাংলাদেশ সরকার ও হিন্দুস্থান সরকারের বন্ধুত্ব ও ব্যবসা-বাণিজ্য অল্পদিনের মধ্যেই যদি পুরাদমে শুরু হইয়া যায় তাহা হইলে হিন্দুস্থান ও কোন নেতাই বলিবে না একমাত্র ভাসানীর দ্বারাই ইহা সম্ভব হইয়াছে। চীনের ভেটো-প্রদানের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের মোসাহেবগণ প্রতি মাসে একবার করিয়া প্রতিবাদে দিবস পালন করুন তাহাতে আমার ও আমার পার্টির কোন আপত্তি নাই। কিন্তু আমি আপনাদিগকে বার বার সাবধান করিয়া দিতেছি যে আমার বিরুদ্ধে মনিসিং ও প্রফেসর মোজাফফর সাহেবরা যেরূপ লাগামহীন মুখে গালাগালি করিয়া বাংলাদেশকে স্বীয় পৈতৃক সম্পত্তি ভাবিয়া আমাকে হিজরত করিবার উপদেশ দেয় তাদের পথ কিছুতেই অনুসরণ করিবেন না। বর্তমানে বাংলাদেশের ৬২ হাজার গ্রামে গ্রামে খোঁজ নিয়ে দেখুন মনিসিং ও মোজাফফর সাহেবের দল 'গায়ে মানে না নিজেই মোড়ল' সাজিয়া রাজনীতি করিতেছেন। তাহারা অত্যাধিকভাবে হিন্দুস্থানের দালালী করিতে গিয়া বাংলাদেশের ৯৯ জনেরও বেশী মুসলমান কৃষক ও ৯৫ জনেরও বেশী শ্রমিকের নিকট 'মায়ের চেয়ে দরদ বেশী তারেই বলে ডাইনী' প্রবাদে পরিণত হইয়াছে।

আমার রাজনীতির সহিত মার্কসবাদ ও লেনিনবাদের কোন সম্পর্ক নাই। কারণ, আমি কমিউনিজমের কোন বই পুস্তক পড়ি নাই, বিদ্যাবুদ্ধিও নাই, আমি একজন গোড়া মুসলমান-এই সমস্ত বয়ান করিয়া মনিসিংয়ের দল মনে করিয়াছিল ভাসানীর রাজনীতি চিরকালের জন্য খতম হইয়া গিয়াছে। অতএব বাংলাদেশে আমাকে থাকিতে দেওয়া না দেওয়া প্রফেসর মোজাফফর ও মনিসিং-এর মর্জির উপর নির্ভর করে।

কিন্তু আমি মুসলমান ইংরেজ আমলে ও পাকিস্তান আমলেও ছিলাম। চীন ও অন্যান্য দেশে ভ্রমণ করিয়াছি মুসলমান হিসাবেই। ইনশাল্লাহ মুসলমান হিসাবেই থাকিব এবং মুসলমান থাকিয়াই মরিব। পবিত্র ইসলামের আদর্শ অনুযায়ী হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন, পার্শি যে কোন ধর্মের, যে কোন বর্ণের বা গোত্রের, যে কোন দেশের মানুষই হউক না কেন আমার হাতের দ্বারা, আমার

মুখের দ্বারা এবং আমার কাজের দ্বারা কোন প্রকার কষ্ট যাহাতে না পায় তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে জীবনে কখনো ভুলি নাই–ভবিষ্যতেও ভুলিব না। কিন্তু যাহারা শতকরা ৮৬ জন মানুষের ধর্মীয় শিক্ষাকে হাতের তুবড়িতে উড়াইয়া দিয়া দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে চান তাহারা পাগল না হইলেও মাথা খারাপ তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

যতদিন মন্ত্রীত্ব থাকে ততদিনই সেই দলের কর্মকর্তা ও মন্ত্রী সাহেবান ক্ষমতার জোরেই অনেক কথা বলিয়া থাকেন। কিন্তু যেদিন মন্ত্রীত্বের অবসান হয়–তাহার পর হইতে দেখা যায় ভাসানীর ছত্রছায়ায় আশ্রয় লইয়া পুনরায় বিরোধী দল গঠন করিতে উৎসাহী হন। আমি কাহারও বিশ্বাসঘাতকতা কোন দিনই মনে রাখি না। তাই যাহারা কখনো ঘাড়ে চড়ে, কখনো পায়ে পড়ে ডিগবাজী যতই খেলুক না কেন আমার সারা জীবনের আদর্শ ও কর্মসূচী বহাল রাখিয়া দুনিয়ার নির্যাতিত সর্বহারা মানুষের মুক্তির সংগ্রাম চালাইয়া যাইবই। ভয়ে কোন দিন কোন সরকার বা সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ, সামন্তবাদ প্রভৃতি শোষকগোষ্ঠীর নিকিট মাথা নত করি নাই, ইন্‌শাল্লাহ্-জীবনে কখনো করিবও না।

অন্ধকার রাত্রিতে গুলি করিয়া অথবা ছোড়া-ডেগার দিয়া লালবাহিনী, রক্ষীবাহিনী, মুজিববাহিনী প্রভৃতি সরকারী বাহিনী আমাকে সংগ্রামের পথ হইতে ফিরাইতে পারিবে না। এক ভাসানী মারা গেলে লক্ষ লক্ষ ভাসানী বাংলাদেশে শুধু নয় সারা জাহানে জন্ম নিবে। কত মন্ত্রীসভা গত ২৪ বৎসরে জন্মগ্রহণ করিয়াছে আবার ধূলায় লুটাইয়া গিয়াছে। বর্তমান মন্ত্রী মহোদয়গণ ও আওয়ামী লীগের চেলাচামুণ্ডারা আমার বিরুদ্ধে যতই মিথ্যা প্রচার ও হত্যা করার হুমকি দেখান না কেন আপনারা যদি আল্লাহ্‌র দরবারে তওবা করিয়া লুটপাট সমিতির সদস্যদিগকে কঠোর হস্তে দমন করিতে না পারেন তাহা হইলে আপনাদের ভবিষ্যত স্বৈরাচারী পাকিস্তান জালেম সরকারের মতই হইবে। জয় সর্বহারা মানুষের অবধারিত। নহুরুম মিনাল্লাহে ওয়া ফতহুন কারিব।

দিকে দিগন্তে রক্তিম ওই বিদ্রোহী মহাকাল

পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙো

পরাধীনতার শৃঙ্খল বেড়ী আবার নেমে এসেছে সাড়ে সাত কোটি মানুষের উপর। ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ বাংলাদেশকে চিরদাসত্বের শৃঙ্খলে বাঁধবার ষড়যন্ত্র শেষ করেছে। এ দেশের ক্ষমতায় আসীন কেনা গোলাম তাঁবেদারদের দিয়ে ভারত তার সম্প্রসারণবাদের রথ চালিয়ে দিয়েছে। ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের রথের চাকায় পিষ্ট হয়ে অনাহার, অত্যাচার, শোষণ, নিপীড়নে হাজার হাজার মানুষ মরছে। এ দেশের বুকে আরেকটা মহা মৃত্যুর প্লাবন বইয়ে দেবার আগে সম্প্রসারণবাদী ভারত তার এ অভিযান থামাবে না।

আজ একদিকে মৃত্যুর আর পরাধীনতার শৃঙ্খল অন্যদিকে অবিরাম সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের পতাকাকে সমুন্নত রাখার কঠোর কঠিন পথ। আজ জনতাকে পথ বেছে নিতে হবে।

ভারতীয় গোলামীর বিরুদ্ধে এ দেশের জনগণের সোচ্চার প্রতিবাদ আর বিদ্রোহের কণ্ঠস্বরকে স্তব্ধ করে দেবার জন্য ভারতের কেনা গোলামের সহিংস্র থাবা বিস্তার করছে। ভারতীয় গোলামীর বিরুদ্ধে কথা বললে প্রতিটি টুটি চেপে ধরবে এই তাঁবেদাররা।

ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের টুটি ছিঁড়ে তাজা রক্ত পান করে আজ বুঝিয়ে দিতে হবে, এ দেশের বুকে শোষণ, লুণ্ঠন আর ত্রাস সৃষ্টির জন্য কোন পরাক্রমশালী তাতার বাহিনী এসে টিকতে পারবে না। ভিয়েতনাম মার্কিন

সাম্রাজ্যবাদের কবর রচনা করছে। বাংলার মেহনতি মানুষও রচনা করবে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের গোর।

মাত্র এক লক্ষ কেনা গোলামকে নিয়ে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ এ দেশের উপর তার উপনিবেশ স্থাপনের কাজ শেষ করে এনেছে। আজ প্রকাশ্যে ভারতীয়রা বলছে বাংলাদেশ আমাদের রাজ্য। আজ সোচ্চারে ভারতীয় সৈন্যরা বলছে, হাজার বছরে আর বাংলাদেশ মাথা তুলতে পারবে না।

জনতার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ভারতের কাছে দেশকে বিক্রি করে দিচ্ছে। এ দেশের সম্পদরাজীর উপর এ দেশ ও জনতার যেন অধিকার নেই। আমরা যেন আশ্রিত। ভারতীয়দের দয়ার উপর বেঁচে আছি। স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম পর্যায় শেষ হয়েছে। স্বাধীনতা যুদ্ধ আজো শেষ হয়নি। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরের পরে গত ৯ মাসে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ আমাদের অর্থনীতির জীবনীশক্তি চুষে শেষ করে ফেলেছে। এ দেশকে আজ থাকতে হবে চির কাঙাল। রাজনৈতিক দিক থেকে এদেশ আজ ভারতের আশ্রিত ভুটানের মত। তারই নির্দেশে এখানে চলে শাসন। তাই ভারত বিরোধী প্রতিটি ব্যক্তি আজ ক্ষমতাসীনদের তাঁবেদার কেনা গোলামদের চোখে দেশদ্রোহী।

অথচ জনগণ জানে কারা দেশদ্রোহী, কারা এ দেশের ইজ্জত-মর্যাদা, স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বকে লুটিয়ে দিয়েছে ইন্দিরার পদতলে।

স্বাধীনতার সংগ্রামকে আরেক পরাধীনতায় শেষ করেই এই চণ্ডালরা থামেনি। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আর সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের বন্ধুত্ব অর্জনের নামে তাদের প্রভুত্বের ও শোষণের হাতকে টেনে এনেছে এ দেশের বুকে। ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের শ্রীবিজয়া সাম্রাজ্য, রাশিয়ার এশীয় নিরাপত্তা জোট, আমেরিকার দক্ষিণপূর্ব এশীয় জোট গঠনের দুঃস্বপ্নের চক্রান্তের মধ্য দেশকে ঠেলে দিয়ে বাংলাদেশের জনগণের নিরাপত্তাকে বিনাশ করেছে ক্ষমতাসীন তাঁবেদাররা। বাংলাদেশে সাম্রাজ্যবাদীরা অচিরেই যুদ্ধঘাঁটি বসিয়ে শুরু করবে তৃতীয় মহাযুদ্ধের প্রস্তুতি। অনাহার, বুভুক্ষা এদেশের মানুষের জীবনের দাম কমিয়ে সাম্রাজ্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদী যুদ্ধের কামানের খোরাক হিসাবে অতি সস্তায় এ দেশের জনগণকে ব্যবহার করতে শুরু করবে।

শান্তি, সুখ, স্বচ্ছন্দ ও স্বাধীনতার মর্যাদা নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াবার জনগণের আকুল ইচ্ছাকে পদদলিত করে তাঁবেদার সরকারটি আজ এদেশের বুকে দোজখের আগুন জ্বালিয়ে তুলছে।

এ দোজখের আগুনে উত্তপ্ত হয়ে প্রচণ্ড আক্রোশে জনগণ ফেটে না পড়লে তাদের বরণ করতে হবে চির পরাধীনতা। চাপরাশির তকমার চেয়ে তলোয়ারকে, গোলামীর দরজার চেয়ে শহীদী দরজাকে বড় মেনে এ দেশের মুক্তিপাগল মানুষ বার বার ফুঁসে উঠেছে অন্যায়, অবিচার, বিদেশী শোষণ, বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে। ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের বুকে ত্রাস সৃষ্টি করে মহাপরাক্রমে সুপ্ত জনতা জাগছে!

লেনিনের রাশিয়া, হোচিমিনের ভিয়েতনাম, অগাস্তিনা ন্যাটোর এ্যাঙ্গোলার শপথ নিয়ে চির দুর্জয়।

বাঙ্গালীরা আবার জাগছে।
বন্ধুরা চলো দুর্গম পদভরে
ঝাণ্ডা উড়াই রক্তে রক্তে লাল
যাত্রা শুরুর ডাক ওঠে অন্তরে
দিক দিগন্তে রক্তিম ওই
মহাকাল বিদ্রোহী।

সম্পাদক ঃ সৈয়দ ইরফানুল বারী ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ঃ মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী
মুদ্রণে ঃ শান্তি প্রেস, সন্তোষ, টাঙ্গাইল।

প্রতি কপি পঁচিশ পয়সা **সাপ্তাহিক** চাঁদার হার : ষান্মাসিক-৬.০০ বার্ষিক-১২.০০

হক-কথা

(WEEKLY THE HAQ-KATHA)

প্রকাশক ও পৃষ্ঠপোষক ঃ মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

প্রথম বর্ষ ৩০শ তম সংখ্যা শুক্রবার ৫ই আশ্বিন ১৩৭৯ ঃ ২২শে সেপ্টেম্বর ১৯৭২ ১৩ই শাবান, ১৩৯২ ঃ সন্তোষ, টাঙ্গাইল।

ঠগ কে তাজুদ্দিন সাহেব, জনগণ না আপনারা?

সেই গোপন ৭টি চুক্তি

অর্থমন্ত্রী তাজুদ্দিন আহম্মদ তাঁর লন্ডন-নিউইয়র্ক ভায়া কলকাতা সফরকে 'তাৎপর্যহীন' বলে বর্ণনা করে ঢাকা বিমানবন্দর ছেড়ে কলকাতার দমদম বিমানবন্দরে পা রেখেই তাৎপর্যপূর্ণ কথা ছেড়েছেন। তাঁর প্রধানমন্ত্রীত্বের আমলে ঠগ ভারত বাংলাদেশকে সুবিধামত বাগে পেয়ে গোপন সাতখানি চুক্তি গোপনে স্বাক্ষর করিয়ে নিয়েছিল, সেগুলির পীড়ন ও দংশনে বাংলাদেশের আপামার জনসাধারণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠবার সাথে সাথে তাজুদ্দিন গংরা মুছিবতে পড়েছেন। ভারতীয় প্রভূদিগকে আশ্বাস দিয়ে তাজুদ্দিন কলকাতায় বলেছেন, কতিপয় ঠগের কার্যকলাপে বাংলাদেশকে ভুল বুঝা ভারতীয় প্রভুদের উচিত হবে না। বাংলাদেশকে বিভিন্নভাবে একশ বছরের জন্য ভারতের কাছে বন্ধক রেখে তাজুদ্দিন মন্ত্রীসভা মহাপুরুষের কাজ করেছে এবং এই বন্ধকী শৃঙ্খলের প্রতিবাদে যারা মুখর হয়েছে, তারা তাজুদ্দিনের চোখে ঠগ, জুয়াচোর ইত্যাদি। অন্তর্যামী নীরবে এসব ঘটনা দেখে না হেসে পারবেন না।

এখন জানা যাচ্ছে, ভারত বাংলাদেশকে মোট ৮খানি অধীনতামূলক সম্পর্কের চুক্তিতে আবদ্ধ করেছে। মুক্তিযুদ্ধের ন'মাসে ভারত যে সাহায্য দিয়েছে, তার প্রতিটি সাহায্য দিয়েছে পরে পরিশোধ করে দেবার শর্তে, লিখিত চুক্তি অনুযায়ী। এসব চুক্তির শর্ত এত হীন এবং লজ্জাকর যে তাজুদ্দিন সরকার ও বর্তমান সরকার জনগণের ভয়ে তা প্রকাশ করছে না। সরকারটি ভারতে থাকাকালে যে ৭ খানা চুক্তি হয়েছে, তার ভদ্র-শর্তগুলি প্রকাশ্যে এনে ইন্দিরা গান্ধীর সফরকালে ঢাকায় ৮ম চুক্তিখানি স্বাক্ষরিত হয়। এতে স্বাক্ষর দেন শেখ মুজিবর রহমান। 'ভদ্র' শর্তগুলি পর্যবেক্ষকদের কাছে একটি সামরিক ও অধীনতামূলক মিত্রতা চুক্তির নামান্তর বলে প্রতীয়মান হয়েছে। এ থেকে ধারণা করা সম্ভব যে, পূর্ববর্তী ৭টি চুক্তি কতটা জঘন্য ছিল।

সরকারের অভ্যন্তরে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও গুতোগুতি শুরু হওয়ায় গোপন চুক্তির কিছু কিছু তথ্য প্রকাশ হয়ে পড়েছে। যতদূর জানা গেছে– এসব চুক্তিতে ভারত কতকগুলি ব্যাপারে বাংলাদেশকে নিজের ইচ্ছামত পরিচালনার কর্তৃত্ব লিখিয়ে নিয়েছে।

(১) বাংলাদেশে ভারত তার ইচ্ছামত, তার

পছন্দসই লোক দিয়ে, পছন্দসই নেতৃত্ব পাঠিয়ে একটি সামরিক বাহিনী গঠন করবে, যারা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আধা-সামরিক বলে পরিচিত হবে, কিন্তু এদেরকে গুরত্বের দিক থেকে ও সংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশের মূল সামরিক বাহিনী থেকে বড় ও তাৎপর্যপূর্ণ রাখা হবে।

ধারণা করা হচ্ছে, এই বাহিনীটি হচ্ছে রক্ষীবাহিনী। ভারতীয় সৈন্যের পোষাক, ভারতীয় সেনামণ্ডলীর নেতৃত্ব ও ভারতের অভিরুচি অনুযায়ী বিশেষ শ্রেণীর লোককে শতকরা ৮০ জন এবং 'বিশেষ বাদ'এর সমর্থক ২০ জন করে নিয়ে এই বাহিনী গড়ে তোলা হচ্ছে। অস্ত্র, গাড়ী, পোষাক, সুযোগ-সুবিধার দিক দিয়ে এই বাহিনীটি মূল বাহিনীকে ছাড়িয়ে গেছে। এ বাহিনীটি ব্যবহার করা হবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে। ভারত বিরোধী কোন সরকার ঢাকায় ক্ষমতায় বসলেও এ বাহিনী দিয়ে তাকে উৎখাত করা হবে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিরোধী রাজনীতির সমর্থকদের এই বাহিনী দিয়েই দমন করা হবে। এই বাহিনীর মধ্যে ভারতপ্রেমিক বিশেষ শ্রেণীর লোকেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় কোনদিন এদেরকে ভারতের বিরুদ্ধে লাগানো যাবে না। এদেশের জনগণ কোনদিন বিপ্লবে অবতীর্ণ হলে, রক্ষীবাহিনীর পোষাকগুণে ভারতীয় সৈন্যরা লাখে লাখে রক্ষীবাহিনী সেজে এদেশের অভ্যন্তরে জনগণকে দমন করতে পারবে।

(২) বাংলাদেশ ভারতের কাছ থেকে যে সামরিক সাহায্য নিয়েছে তা পরিশোধ করতে হবে বিভিন্ন ভাবে ঃ (ক) ভারত ছাড়া অন্য কোন দেশের কাছ থেকে বাংলাদেশ অস্ত্র কিনতে পারবেনা। মাঝে মাঝে ঘোষণা করা হবে ভারত থেকে এত কোটি টাকার অস্ত্র কেনা হলো। এর দাম ভারতই ঠিক করে দেবে। সরবরাহ দেওয়া হবে অর্ধেক অস্ত্র। সরবরাহকৃত অস্ত্রও ভারত ইচ্ছামত নিজ দেশে নিয়ে যেতে পারবে। অর্থাৎ একই অস্ত্র বারবার দেখিয়ে ১৯৭১-এর পাওনা এবং ভারতের সম্পূর্ণ যুদ্ধ খরচ আদায় করা হবে।

অভ্যন্তরীণ গোলযোগ দমনের অস্ত্র ছাড়া কোন ভারী অস্ত্র, সাজোয়া গাড়ী বা ট্যাঙ্ক বাংলাদেশকে দেয়া হবে না।

(৩) বাংলাদেশের বহির্বাণিজ্য ভারতের নিয়ন্ত্রণে থাকবে। ভারতের অনুমতি ছাড়া কোন পণ্য বিদেশে রপ্তানী করা যাবে না। কোন পণ্য কত দরে বাইরে রপ্তানী করতে হবে ভারত সেই দর বেধে দেবে। এসব পণ্য ভারত নিজে কিনতে চাইলে বাংলাদেশ আর কারো সাথে সে পণ্য বিক্রির কথা আলোচনা করতে পারবে না। বাংলাদেশের আমদানী তালিকা ভারতের কাছ থেকে অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে। (বাংলাদেশে বিদেশী পণ্য আমদানীর ব্যাপারে ভারত উদার থাকবে-যে সব পণ্য ভারতকেও আমদানী করতে হয় সেগুলি আমদানী করানো হবে বাংলাদেশকে দিয়ে। বাংলাদেশ তার বৈদেশিক মুদ্রার তহবিল ভেঙে বিদেশ থেকে যে সব সামগ্রী আমদানী করবে সেগুলি ভারত নিজে আমদানী করবে না। চোরাচালানের মাধ্যমে ভারত বাংলাদেশ থেকে সেই মালগুলি ভারতীয় টাকায় যোগাড় করবে। বিলাতের 'সেভেন ও ক্লক' ব্লেডের বেলায় এবার এটা ঘটেছে। ভারত 'সেভেন ও ক্লক' আমদানী করেনি। বাংলাদেশকে দিয়ে বিপুল পরিমাণে-দেড় কোটি টাকার ব্লেড আমদানী করিয়েছে-এখন ভারত নিখরচায় সেই ব্লেড পেয়ে গেছে)।

(৪) বাংলাদেশের বাৎসরিক ও পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনাগুলি ভারতকে দিয়ে অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে। (বাংলাদেশ যেন স্বাবলম্বী না হতে পারে ভারত সেভাবে পরিকল্পনাগুলি কেটে ছিঁড়ে ঠিক করবে। আইয়ুবী আমলে বাংলাদেশে পরিকল্পনায় অর্থ ব্যয় হয়েছে কিন্তু সবই অনুৎপাদশীল খাতে। "পশ্চিম"

পাকিস্তানে সব অর্থ ঢালা হয়েছে উৎপাদনশীল খাতে। ভারতও বাংলাদেশের উন্নয়নকে অনুৎপাদনশীল রেখে দিতে চায়। ইতিমধ্যে সরকার কর্তৃক ঘোষিত বাৎসরিক উন্নয়ন কর্মসূচী ও বাজেটে একই অবস্থা দেখা গেছে। আগামী মহাপরিকল্পনা এখন ভারতের কাছে পাঠানোর জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। তাতেও অনুৎপাদনশীল খাত প্রাধান্য পাবে)।

(৫) বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি ভারতের পররাষ্ট্রনীতির অন্তবর্তী রাখতে হবে। অভ্যন্তরীণ রাজনৈতির ক্ষেত্রে ভারতের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে।

(৬) বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার চুক্তিগুলি বাংলাদেশ একতরফাভাবে অস্বীকার করতে পারবে না। তবে ভারত এ চুক্তিগুলির কার্যকারিতা অস্বীকার না করলে বৎসর-বৎসরান্তে এ চুক্তিমালা বলবৎ থাকবে।

(৭) ডিসেম্বর যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে স্বাক্ষরিত চুক্তিটিতে বলা হয়েছিল যে, ভারতীয় সৈন্যরা যে কোন সংখ্যায়, যে কোন সময় বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারবে এবং বাধাদানকারী যে কোন মহলকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারবে। ভারতীয় বাহিনীর এ ধরনের অভিযানের প্রতি বাংলাদেশ সরকার স্বীকৃতি দিচ্ছে। ভারত চুক্তিটি নাকচ না করলে বৎসরান্তে এ চুক্তি কার্যকরী থাকবে।

মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাসে ভারত মোটামুটি এ ধরণের চুক্তিগুলি সম্পাদন করে নিয়েছিল। এ চুক্তিতে স্বাক্ষর দিয়েছিলেন তাজুদ্দিন আহমদরা।

বাংলাদেশকে বেকায়দা অবস্থায় পেয়ে এমনি ঠগ ও শঠতাপূর্ণ চুক্তিতে তাকে বাঁধা হয়েছিল। আজ এ সকল চুক্তির মরণফাঁস ছিন্ন করার জন্য যারা সংগ্রাম শুরু করেছেন প্রভুগৃহে পর্দাপন করে তাজুদ্দিন সাহেব তাদের ঠগ জুয়াচোর বলে অভিহিত করলেন। একেই বলে ভাগ্যের নির্মম পরিহাস।

প্রভুর মনতুষ্টির জন্য তাজুদ্দিন সাহেবেরা যা খুশী তা বলে দেশের জনগণকে গালাগালি করতে পারেন, কিন্তু বাচালতা দিয়ে অপরাধ ঢাকা যায় না। বাংলাদেশকে ভারতের পদপ্রান্তে সমর্পণের দাসখত লিখিয়ে লোকদের জনতার দরবারে অচিরেই জবাবদিহি করতে হবে।

হুঁসিয়ার গুণ্ডাশাহী

আওয়ামী লীগের গুণ্ডাশাহী জনগণের মুখে ভাত যোগাবার নূন্যতম দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়ে কুখ্যাত মুসলিম লীগ সরকারের কায়দায় বিরোধী দলের উপর পোষা গুণ্ডাদের দ্বারা আক্রমণ চালিয়ে দেশে গুণ্ডামীর রাজত্ব শুরু করেছে।

জননেতা মওলানা ভাসানীর সাম্প্রতিক বরিশাল সফরকালে আগাইলঝরায় স্বতস্ফূর্তভাবে আয়োজিত জনসভার উপর আওয়ামী লীগের গুণ্ডাবাহিনী বর্বর আক্রমণ চালিয়ে জনসাধারণ ও ন্যাপ কর্মীদের আহত করে।

মুজিব সরকারের লালিত গুণ্ডারা বৃদ্ধ জননেতা মওলানা ভাসানীর গাড়ীর উপরও আক্রমণ চালাতে চেষ্টা করে।

আওয়ামী গুণ্ডাবাহিনীর হামলা শুধু আগাইলঝাড়ায় নয়, আওয়ামী গুণ্ডারা টাঙ্গাইলে ভুখা মিছিলে বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীকে প্রকাশ্যে বেয়নেট চার্জ করে হত্যা করেছে। এই গুণ্ডাবাহিনী কুমিল্লায় ভুখা মিছিলের উপরও হামলা চালিয়েছিল।

ভাত-কাপড়ের কষ্টে দিশাহারা মানুষের উপর নিপীড়নমূলক শাসন বজায় রাখার জন্য রূপমহলের গুণ্ডামীর ঐতিহ্যের অধিকারী মুজীবী গুণ্ডাবাহিনী আবার জনগণ ও জননেতাদের উপর বর্বর অত্যাচার ও আক্রমণের অভিযান শুরু করেছে।

গুণ্ডাবাহিনী নিয়ে ক্ষমতায় টিকে থাকার চেষ্টা মুসলিম লীগের সরকারগুলিও করেছিল, কিন্তু পরিণতি শুভ হয়নি। জনগণ নির্মম পদাঘাতে গুণ্ডাবাহিনীকে খতম করেছে।

মুজীবী গুণ্ডাবাহিনীর এবং এদের লালনকর্তা জুলুমবাজ সরকারের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে মওলানা ভাসানী বলেছেন, অবিলম্বে এই গুণ্ডামী বন্ধ না করলে জনগণ গুণ্ডা শায়েস্তা অভিযান শুরু করবে।

তিনি বলেছেন, ফ্যাসীবাদী হামলার সঙ্গত ও বিহিত বিচার না হলে এই গুণ্ডামীর সকল পরিণতির জন্য আওয়ামী লীগ সরকারকেই দায়ী হতে হবে।

লুটপাট সমিতির বিচার না করলে জনগণ শায়েস্তা শুরু করবে

ভারত-রাশিয়ার কবর রচনা করো

বরিশালে জনসমুদ্রে জননেতা মওলানা ভাসানীর ঘোষণা

বাংলার বিদ্রোহী কণ্ঠ জননেতা মওলানা ভাসানী শোষক দুর্নীতিবাজ শাসকগোষ্ঠীর প্রতি হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেছেন, তিন মাসের মধ্যে দুর্নীতিবাজ এমসিএ ও আওয়ামীলীগারদের শাস্তি দেওয়া না হলে ৩ মাস পর জনগণ লুটপাট সমিতির এসব সদস্যদের রাস্তার উপর জবাই করবে।

১৯শে সেপ্টেম্বর বরিশালে হেমায়েত উদ্দিন ময়দানে বিশাল জনসভায় বক্তৃতাদানকালে বাংলার জনগণের চিরসাথী বৃদ্ধ জননেতা আরও বলেন, দেশে আজ দুটি জাতি রয়েছে। একটি ধনিকের জাত। একটি গরীবের গোষ্ঠী। তিনি হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন যে, ৩ মাস পর গরীবরা শোষক ও অত্যাচারীদের অন্যায়ভাবে অর্জিত দোকানপাট, বাড়ী-ঘর, জোত-জমি সব কেড়ে নেবে।

বর্তমান পরিস্থিতির জন্য ভারতই দায়ী। জনতার তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে জননেতা সবিস্তারে হিসাব দিয়ে বলেন, গত ২৫ বৎসরে পাকিস্তান বাংলাদেশ থেকে যা লুট করেছে, ভারত সাত-আট মাসে নিয়েছে তার চাইতে বেশী।

বাংলাদেশের উপর দুর্ভিক্ষ নেমে আসার পটভূমি ব্যাখ্যা করে জননেতা বলেন যে, বাইরে থেকে আমদানী করা খাদ্যশস্য থেকে ভারত ১৭ লাখ টন খাদ্য নিয়ে গেছে।

মওলানা ভাসানী বলেন, ভারতীয়রা এদেশ থেকে ঔষধপত্র, অন্যান্য রিলিফ সামগ্রী বিপুল পরিমাণে পাচার করে নিয়ে গেছে। চাল, ডাল, তেল, পাট, চামড়া, মশলাও চলে যাচ্ছে ভারতে।

এ জনসভায় সভাতিত্ব করেন শ্রীসুনীল কুমার দত্ত।

জনগণের দুর্দশার কথা উল্লেখ করে জননেতা আবেগ কম্পিত স্বরে বলেন, আওয়ামী লীগ ওয়াদা করেছিল, ক্ষমতায় গেলে তারা ২০ টাকা মণ দরে চাল ও ১০ টাকা মণ দরে গম দেবে। কিন্তু স্বাধীনতার ৮ মাস পর আজ ৩২ টাকার চাল ১২০ টাকা হয়েছে।

মওলানা ভাসানী হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন, জনগণের দুর্দশার উপর ক্ষমতার সিংহাসন নিরাপদ থাকবে না। অত্যাচারের স্টীম রোলার চালিয়ে জনগণকে অধিকার আদায় থেকে নিবৃত্ত করা যাবে না।

মওলানা ভাসানী বলেন, গণবিরোধী কোন শাসকগোষ্ঠীই জনতার দরবারে জবাবদিহি না করে রেহাই পায়নি। জনগণের জীবনে চরম হতাশা সৃষ্টির জন্য দায়ী বর্তমান অত্যাচারী সরকারকেও জনতার কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

এ পর্যায়ে তিনি বলেন, প্রতিটি দুর্নীতিবাজ এমসিএ, আওয়ামীলীগার, লুটপাট সমিতির মেম্বরের বিচার করো। না হলে ৩ মাস পর জনগণ রাস্তার উপর ফেলে এদের জবাই করবে।

আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও মেঘালয়ের

বাঙ্গালীদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে জননেতা বলেন, দিল্লীশাহীর নির্মম অত্যাচার, শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠভাবে সংগ্রাম শুরু করো। মওলানা ভাসানী স্বীয় রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার উল্লেখ করে বলেন, একদিন না একদিন ওই চারটি রাজ্যের বাঙ্গালীরা দিল্লীর জিঞ্জির ভেঙে চলে আসবেই।

জনতা তুমুল হর্ষধ্বনি করে মওলানা ভাসানীর এ ঘোষণাকে অভিনন্দিত করে।

বাংলাদেশের জনগণে উপর ভারত ও রাশিয়ার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভুত্ব, এ দেশের জনগণের জীবনকে দুঃস্বপ্নের মত ভয়ঙ্কর করে তোলার ক্ষেত্রে ভারত-রাশিয়ার ভূমিকা ব্যাখ্যা করে মওলানা ভাসানী বলেন, বাংলাদেশের বুক থেকে কোনদিন বিদেশী অত্যাচারী ও গণনিপীড়ক, শোষক, প্রবঞ্চক ফিরে যেতে পারেনি।

রোববারের বদলে শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটি ঘোষণার দাবী জানিয়ে মওলানা ভাসানী বলেন, শতকরা ৯৬ জন মানুষ মুসলমান, তাদের ন্যায্য অধিকারের প্রতি নজর রাখতে হবে। নইলে জনতা যেদিন রুদ্ররোষে ফেটে পড়বে সেদিন জালিমশাহীর অস্তিত্ব থাকবে না।

তাস-এর খবর ছড়িয়ে তাসের ঘর টিকিয়ে রাখা যাবে না বন্ধু

বাংলাদেশের সর্বত্র যেদিন অনাহারক্লিষ্ট মানুষ আওয়ামী লীগ সরকারের ব্যর্থ নীতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে ভুখা মিছিল বের করেছে, সেদিন রাশিয়ার বার্তা প্রতিষ্ঠান 'তাস' রাশিয়ার কমিউনিষ্ট পার্টির পত্রিকা প্রাভদা থেকে একটি সংবাদ বাংলাদেশে প্রচার করেছে। খবরটির সারমর্ম হলো, বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ সরকার চালের সুষ্ঠু বন্টন নিশ্চিত করেছে। মানুষের জীবনে সুখ ফিরে আসছে। অল্প ক'মাসে আওয়ামী লীগ সরকার যা করেছে, তা প্রশংসনীয়।

ঢাকা থেকে বসে প্রাভদা পত্রিকার সংবাদদাতা এ খবর পাঠিয়েছেন নিজের হেডকোয়ার্টারে। মোক্ষম সময়ে 'তাস' আবার তা রিলে করেছে বাংলাদেশে।

কমিউনিষ্ট পত্রিকার কাগজ প্রাভদায় যা ছাপা হয়, যে বক্তব্য স্থান পায়, তা হচ্ছে তাদের সরকারী ও রাষ্ট্রীয় বক্তব্য। এর একটি শব্দও কমিউনিষ্ট পার্টির অনুমোদন ছাড়া প্রকাশিত হয় না।

রাশিয়ার কমিউনিষ্টরা বাংলাদেশের মানুষকে মস্কো থেকে বসে যে উপদেশ দিয়ে আসছে, তার ধরনধারণ সবকিছুই আমাদের জাতীয় সার্বভৌমত্বের পরিপন্থী। তারা ক্ষমতাসীন সরকারকে সমর্থন দিচ্ছে বলে এসব হস্তক্ষেপকে আওয়ামী লীগ ও আওয়ামী সরকার গায়ে মাখছে না।

স্বাধীনতার পর পরই রাশিয়ানরা আরেকটি সংবাদ প্রচার করেছিল-বাংলাদেশে এবং বিশ্বের সর্বত্র। সে খবরটি রাশিয়ার ঢাকাস্থ দূতাবাস সরকারীভাবে প্রচার করে। তাতে এ দেশের অনেক রাজনীতিবিদের নাম উল্লেখ করে বলা হয়েছিল যে, এরা হচ্ছে বাংলাদেশের জাতীয় দুশমন। এদের উৎখাত করার জন্য রাশিয়া সরকার ও দূতাবাস বাংলাদেশ সরকারকে প্রকাশ্যে আদেশ দিয়েছিল। একই সংবাদে রাশিয়ার দূতাবাস আরও বলেছিল, আওয়ামী লীগ, মোজাফফর ন্যাপ ও মনিসিং-এর কমিনিষ্ট দল ছাড়া কোন দেশপ্রেমিক দল বাংলাদেশে নেই। এ দেশের যেসব সাচ্চা কমিউনিষ্ট ভারতসেবক মনিসিং-এর মুখে লাথি মেরে ১৯৬৬ সালে বেরিয়ে গিয়েছিল, দূতাবাসের ইস্তেহারে বলা হয়েছিল যে, মনিসিং নাকি তাদের বের করে দিয়েছিলেন, অথচ এটা হচ্ছে ডাহা মিথ্যা-যা মনিপন্থী কমিনিষ্টরা হর-হামেশা মস্কোর

প্রভুদের শুনিয়ে খুশী রাখে।

রাশিয়া বলে দেবে, এ দেশে কে দেশপ্রেমিক, তারপর আমাদের দেশ চালাতে হবে, এ স্বাধীনতার চেয়ে মৃত্যু অনেক ভালো।

রাশিয়ান দূতাবাসের এই আস্পর্ধার বিরুদ্ধে দারুণ হৈচৈ হয়েছিল, কিন্তু তাঁবেদার সরকার এর কোন প্রতিবাদ জানায়নি। বরং আওয়ামী লীগ, মনি-মোজাফফরের দল সেই ইস্তেহারের গৎ বাধা সুর এখনও গাইছে। তারা ছাড়া দেশের শতকরা ৮৫ জন দেশের শত্রু-আজো তাদের মুখে এ বুলি শোনা যাচ্ছে।

ভুখা মিছিলের দিনে রাশিয়ার প্রচারযন্ত্র আবার বাংলাদেশের জনগণকে পথ বাৎলাবার স্পর্ধা দেখিয়েছে।

সরকার ব্যাঙ্ক-বীমা-শিল্প জাতীয়করণ করে বিরাট সম্ভাবনার দ্বার খুলেছে, চালের সরবরাহ ঠিক রয়েছে, জনগণ এখন পরিতৃপ্ত, আওয়ামী লীগের প্রতি জনগণের নিরঙ্কুশ সমর্থন আছে, মনিসিং কমিনিস্ট দলের শক্তি বিরাট, তারা সরকারকে বলেছে একযোগে কাজ করতে, আসলে রুশপন্থীদের সাথে কাজ না করলে আওয়ামী লীগ পেরে উঠবে না, এসব কথাই ছিল সংশ্লিষ্ট সংবাদটির বিষয়বস্তু।

মস্কো প্যাটার্ণে শিল্পকারখানা জাতীয়করণের ফলে একটা টাউট শ্রেণী নতুন পুঁজিপতি হিসাবে বার্মা-মিসরের মত এখানে আত্মপ্রকাশ করছে, বুর্জোয়া নেতৃত্বের বিষময় ফল সমাজের রন্ধ্রে দুর্নীতির নরক জ্বালিয়ে তুলছে, এ দেশে মানুষ না খেয়ে মরছে প্রতিবেশী সম্প্রসারণবাদী ভারতের কৃপায়, জনগণ এখন অতিষ্ঠ হয়ে বিক্ষোভে ফেটে পড়তে চাইছে। এসবের জন্য দায়ী আওয়ামী লীগের প্রতি মানুষ খাপ্পা। মনিপন্থী কমিউনিষ্টরা নয়াপল্টনের এয়ারকণ্ডিশনড্ ও ভ্যালভেট ঝোলানো অফিস আর ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা ছাড়া কোথাও নেই, বাংলাদেশকে মস্কো-দিল্লী অক্ষের চিরপদানত রাখার চক্রান্তকে এ জনতা সফল হতে দেবে না। এই অধীনতার বিরোধিতা তারা করছে এবং করবে– এসব সত্য পরিস্থিতির উল্টোটাই প্রাভদার সংবাদদাতার চোখে পড়েছে। মস্কোর আদেশ অনুযায়ী তাদের প্রয়োজনেই লেখা হয়েছে রিপোর্ট।

এখানকার রুশপন্থীরা ব্যর্থ হওয়ায় রাশিয়ার রাজধানী মস্কোতে বসে বাংলাদেশ আর এখানকার জনগণকে মস্কোর মর্জি মাফিক চালানোর চেষ্টা– এই হীনবীর্যদের মানুষের করুণার উদ্রেক করবে মাত্র। আওয়ামী লীগকে ব্ল্যাঙ্ক চেক লিখে দিয়ে মনি-মোজাফফরের রাজনীতি শেষ হয়ে গেছে। আন্তর্জাতিক পরিসরে মস্কোর দশা একই। তাদের রাজনৈতিক অনুসারীরা ব্যর্থ হয়ে সুখ-সন্ধানী পারাবতে পরিণত হলে মস্কো সর্বত্র নামে খবরদারিতে। আর তার পরিণতিতে মিসর, সিরিয়া, ইয়েমেনের মত, বলিভিয়ার মত, পাল্টা চড় খেয়ে মস্কোকে নিজ ঘরে সিধিয়ে যেতে হয়।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে রাশিয়ার ব্ল্যাঙ্ক চেক পলিটিক্সের দেউলিয়াপনা প্রকাশ হয়ে পড়তে বাকী নেই। মস্কো-মনিসিং দ্বন্দ্ব, মোজাফফর-মনিসিং কামড়াকামড়ি সবার সামনেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাই জিজ্ঞাসা করতে হয়, আর কেন এ ব্যর্থ চেষ্টা বন্ধু?

বাংলাদেশ থাকবেই স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী হিসাবে, সত্যিকার স্বাধীনতা নিয়ে। বাংলাদেশে রাশিয়ার তাসের ঘর ভেঙ্গে গেছে। 'তাস'-এর খবর দিয়ে তাসের ঘর টেকানো যাবে না আর।

কদমবুচি সম্পাদক ইন্দোনেশিয়া বানাবেন

ঢাকার কদমবুচি সম্পাদক এ্যাহ্ যা একটা তামাসা করে বসলেন না! কূল রাখার বালাই

তার নেই, তাই তামাশায় শ্যাম রাখার চেষ্টায় তিনি উদগ্রীব। মুজিবের প্রত্যাবর্তনের দিনে নিজের কাগজের পাতায় 'আইস বক্স' সাপ্লিমেন্ট বের করে তিনি প্রথম পৃষ্ঠা শেষ পৃষ্ঠা জুড়ে শুধু ষাষ্ঠাঙ্গ প্রণতিপাত করলেন। শেষ পৃষ্ঠায় গিয়ে কদমবুচি সম্পাদক এ দেশের বুকে ইন্দোনেশিয়ার মত-চাই কি তদপেক্ষা ভয়াবহ রক্তসাগর বইয়ে দিয়ে মুজিবকে পাকাপোক্ত রাখার শপথ নিলেন। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পা-চাটা ভৃত্যের মত তার কলম দিয়ে বেরুলো ঃ গণতন্ত্রের পথ থেকে মুজিবকে কেউ বিচ্যুত করার জন্য বাড়াবাড়ি করলে, ইন্দোনেশিয়ায় দশ লাখ লোক হত্যা করা হয়েছিল, এখানে যে, আরও কত ভয়াবহ রক্তপাত হবে, তা কল্পনা করা যায় না। তার মতে, ইন্দোনেশিয়ার মার্কিন দাশ সুহার্তো এবং নরপশু আদম মালিক গণতন্ত্রকে রক্ষা করেছে। গণতন্ত্রের জন্য ইন্দোনেশিয়ার ১০ লাখ লোককে হত্যা করা হয়েছে। এ হত্যাকাণ্ডে কোন দোষ হয়নি। এটা উত্তম কাজ। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ষড়যন্ত্রে মার্কিন দালালরা ইন্দোনেশিয়ায় গণহত্যা চলিয়েছে– কদমবুচি সম্পাদক সে কথা চেপে গেলেও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কম পয়সায় ভাড়া করা এ দালালটি নিজের অজ্ঞাতে পরোক্ষভাবে একথা ফাঁস করে দিয়েছে যে, তার দেশী প্রভু ও বিদেশী প্রভুরা বাংলাদেশকে ইন্দোনেশিয়ায় পরিণত করতে চাইছে।

শেখ মুজিব লন্ডন যাবার দিন ঢাকা বিমানবন্দরে এক হাস্যকর ঘটনার অবতারণা করেছিল এই সম্পাদকটি। বিমান ছাড়ার কিছুক্ষণ আগে রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত মুজিবের সাথে আলাপ করে সবে সেরেছেন। এমন সময় কোত্থেকে ফুপানি কান্নার আওয়াজ তুলে, চোখ মুছতে মুছতে, কোত্থেকে একটা সঙ মার্কা লোক ছুটে এলো এবং মুজিবের পায়ে মাথা রেখে প্রাণপণে কদমবুচি করা শুরু করলো। চারিদিকে বিস্ময়াবিষ্ট মানুষ। এ কি! এ আর কিছু নয়। ইনি ঢাকার 'নামজাদা' দৈনিক পত্রিকার প্রধান সম্পাদক। সঙ সম্পাদকটি নিখুঁত অভিনেতার মত চোখ মুছতে মুছতে আবার বেড়িয়ে গেলেন। সেদিন থেকে তাঁর নাম হয়েছে কদমবুচি সম্পাদক।

এ পত্রিকা মুজিবের প্রিয়। এ পত্রিকার সম্পাদক তাঁর প্রিয়। মুজিব সরকার দেশে কি ধরনের সাংবাদিক আর সাংবাদিকতা চান, এটা হচ্ছে তার প্রতীক।

কদমবুচি সম্পাদকটির বহির্প্রভু সম্পর্কে সন্দেহ কার নেই। ইদানীং স্বার্থক চেহারা নিয়ে তার আত্মপ্রকাশ ঘটেছে, নির্লজ্জ মার্কিন দালালীর মাধ্যমে। তার দেশী প্রভুও এতে সন্তুষ্ট। কারণ, রতনে রতন চেনে।

ও-আদেশ সবার জন্য নয়

'মদ আর জুয়া চলবে না'– বাংলাদেশে সরকারের প্রধানমন্ত্রীর এরূপ ভাষণের পর কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালীর ডাকসাইটে এমসিএ জনাব গোকি (গোলাম কিবরিয়া) সাহেব কুমারখালী শহরে প্রকাশ্যে মদ পানের সময় হবিবুর রহমান নামীয় জনৈক বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন কর্মী কর্তৃক ধৃত হন। 'এমসিএ হয়ে প্রধানমন্ত্রীর আদেশের প্রতি তিনি কেন সম্মান প্রদর্শন করেননি' এরূপ এক প্রশ্নের জবাব দানকালে জনাব গোকি বলেন, "মদ ছাড়া কখনো কোন রাষ্ট্র চলতে পারে না। কেননা, বিদেশী রাষ্ট্রের বন্ধুদের সম্বর্দ্ধনাসূচক ভোজসভায় মদ না হলে চলে না। বাংলাদেশের প্রতি মুসলিম জাহানের স্বীকৃতি লাভের আর দেশের সাধারণ মানুষ যাতে মদ্যপানে অযথা অর্থ ব্যয় না করে সেজন্যই প্রধানমন্ত্রী ওরূপ ভাষণ দিয়েছিলেন। জনাব গোকি একজন এমসিএ, কাজেই তিনি সাধারণ মানুষ নন। তাই প্রধানমন্ত্রীর ঐ

আদেশ তাঁর প্রতি প্রযোজ্য নয়।" জনাব গোকি সাহেবের এরূপ নছিহতেও বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন কর্মী কর্ণপাত করেননি। শেষ পর্যন্ত জনতার সামনে জনাব গোকি সাহেব নিজের হাতে নিজের দুকান ধরে পাঠশালার অপরাধী শিশু-ছাত্রের মত গুণে একশবার উঠ-বোস করার পরে হাত জোড় করে জনতার কাছে মাফ চেয়ে নেন।

অর্থনৈতিক চিরদাসত্বের বন্ধন

বাংলাদেশ মাথা তুলতে পারবে না

ভারতীয় স্টেট (কেন্দ্রীয়) ব্যাঙ্ক ও কেন্দ্রীয় সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রায় ২ হাজার ভারতীয় ব্যবসায়ী বাংলাদেশের সীমান্তরেখা বরাবর সম্পদ পাচারের এক স্থায়ী নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ও সীমান্তবর্তী ভারতীয় রাজ্যগুলোতে কমপক্ষে আরও ১৫ হাজার ভারতীয় সুদখোর মহাজন ও ব্যবসায়ী এই নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত হয়ে কাজ করে চলেছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর পরই ভারত সরকারের ইঙ্গিতে ভারতীয় শিল্প বণিক সমিতির একটি 'বেসরকারী' প্রতিনিধিদল বাংলাদেশে এসে রাজধানী ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা বন্দর নগরীসহ ছোটখাটো শহর ও গঞ্জগুলি সফর করেছিল।

এরা এ দেশের বিশেষ শ্রেণীর লোকের সাথে 'গদী' ও 'মোকাম' স্থাপনের প্রশ্নে আলোচনা শুরু করলে এখানকার ব্যবসায়ী মহল উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে।

সবকিছু ফাঁস হয়ে পড়বে, এই ভয় থেকে ভারত সরকার তখন এই প্রতিনিধি দলটির দায়িত্ব অস্বীকার করে নয়াদিল্লীতে সরকারীভাবে এক বিবৃতিতে বলেছিল যে, উক্ত প্রতিনিধি-দলের সফরের সাথে ভারত সরকারের কোন সম্পর্ক নেই। তারা কোন ওয়াদা বা চুক্তি করলে তারা তা নিজ দায়িত্বেই করবে।

ভারত সরকার এভাবে কৌশলে গা বাঁচিয়ে ঐ ব্যবসায়ী চক্রকে সরেজমিনে এগিয়ে দিয়েছিল।

এই ব্যবসায়ীরা ভারত সরকারের কাছে বিভিন্নভাবে সাহায্য পেয়েছে। মুক্তিযুদ্ধকালে ভারতীয় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক শরণার্থীদের কাছ থেকে ৫০ টাকা দরে পাকিস্তানী ১০০ টাকা ক্রয় করে রেখেছিল— ঐ টাকা বিপুল পরিমাণে ঐ ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। মাড়োয়ারীদের গদী থেকেও এসব টাকা যোগাড় করা হয়েছিল। এছাড়া সীমান্তবর্তী প্রদেশগুলির ট্রাক-বাস মালিক সমিতিগুলোর প্রতি গোপন সরকারী নির্দেশ দেওয়া হয় যে, তারা অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এই ব্যবসায়ীদলের সাথে যেন সহযোগিতা করে।

এপারে-ওপারে স্থায়ী এজেন্ট নিয়োগ, পরিবহনের সু-ব্যবস্থা আর সরকারী সমর্থন লাভ করে দু'হাজার ভারতীয় ব্যবসায়ী এমন এক কাঠামো গড়ে তোলে যে বাংলাদেশের সম্পদরাজী অনবরত ভারতে পাচার করার নিশ্চয়তা দিতে পারবে।

গত ফেব্রুয়ারী-মার্চ নাগাদ কেন্দ্রীয় ভারত সরকারের সাথে এদের যে অলিখিত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তা কোলকাতা শিল্পবণিক সমিতি কার্যালয়ে বাছাই করা ব্যবসায়ীদের সভায় আলোচিত হয়েছিল। প্রকাশ, এদেরকে ছয় মাসের সময় দেওয়া হয়েছিল তাদের কর্মদক্ষতা প্রমাণের জন্য। ছ' মাসের মধ্যে এরা যদি দক্ষতা প্রমাণ করতে না পারে তবে সর্বভারতীয় ব্যবসায়ীদের বদলে শুধু দাক্ষিণাত্যের টিকিধারী বিশ্বস্ত ব্যবসায়ীদের এ লাভজনক কারবারে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হবে।

পক্ষান্তরে, এই ব্যবসায়ীচক্র ভারত সরকারের উপর কতিপয় শর্ত চাপিয়েছিল, তা হচ্ছে, সীমান্ত রেখার একটি স্থিরীকৃত অবাধ বাণিজ্য এলাকার ব্যবস্থা করা, বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী সব জেলা থেকে ভারতে ট্রাক চলাচলের রাস্তা বেঁধে দেওয়া ইত্যাদি। বাংলাদেশের সম্পদরাজী হরণের এই চক্রটির চাপে ভারত সরকার বাংলাদেশের সাথে সীমান্ত চুক্তি স্বাক্ষর করে। এ চুক্তিতে ১৪০০ মাইল সীমান্তে ১০ মাইল করে মোট ১৪০০০ বর্গমাইল ভূখণ্ড অবাধ বাণিজ্যের নামে ভারতের মুখে তুলে দেওয়া হয়। বাংলাদেশের মোট আয়তন ৫৪ হাজার বর্গমাইল সীমান্ত চুক্তির মাধ্যমে দেশের চারভাগের একভাগ অঞ্চল অর্থনৈতিকভাবে চলে যায় ভারতের হাতে। ভারত সরকার বাংলাদেশের সুবিধার কথা না ভেবে, নিজের নিয়োজিত ব্যবসায়ীদের সুবিধা অনুযায়ী ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে পুরাতন রাস্তা মেরামত, নতুন রাস্তা নির্মাণ, ডাইভারশন টাইপ রাস্তা নির্মাণ করে। বাংলাদেশ থেকে ভারতে মালামাল পাচারের জন্য এখন রাস্তার সংখ্যা কমপক্ষে ২'শ। গড়পড়তা প্রতি ৭০ মাইল এলাকার সম্পদ পাচারের জন্য একটি করে রাস্তা রয়ে গেছে।

ভারত সীমান্তে সীমান্ত প্রহরীদের সাথে এই সরকারী ব্যবসায়ীদলের কার্যক্রমের সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে ভারতীয় সামরিক চৌকি-ঘাঁটিগুলোর আশেপাশে এ ব্যবসায়ীদের এক-একটি আস্তানা গড়ে উঠেছে। সাধারণ চোরাকারবারীদের কাছ থেকে ভারতীয় সীমান্তরক্ষীরা পয়সা খায়। কিন্তু এদের পাচার করা চালানের জন্য কিছু চাইতে বারণ আছে। এছাড়া প্রয়োজন পড়লে, ভারতীয় সীমান্তরক্ষীরা এদের পাচার করা মাল কাঁধে করে বয়ে সীমান্তবর্তী গুদামে নামিয়ে দেয় অথবা ট্রাকবদলের সময় ভিন্ন ট্রাকে তুলে দেয়। এই ব্যবসায়ীদের দ্বারা পাচার করা চালানের সাংকেতিক নাম আছে। কোন কোন এলাকায় এই চালানগুলোকে সরকারী আমদানী বলে অভিহিত করা হয়।

ভারত সরকারের লালিত 'বেসরকারী' ব্যবসায়ীচক্রের 'সরকারী আমদানীর' বদৌলতে স্বাধীনতার পর তৃতীয় মাস থেকে আজ নবম মাস পর্যন্ত মোট ছয় মাসে বাংলাদেশ থেকে কয়েক হাজার কোটি টাকার সম্পদ চলে গেছে ভারতে।

এদের প্রতি ভারত সরকারের নির্দেশ হলো, যা পাবে তাই কিনবে। মাটি পানি বাতাস ছাড়া বাংলাদেশ থেকে এমন কিছু বাদ থাকছে না যা তারা পাচার না করছে।

ধান-চাউল

বাংলাদেশে খাদ্য ঘাটতি ছিল ২০ লাখ টন। এখন সরকারী হিসাব মতই ৩৫ লাখ টন খাদ্য ঘাটতির সম্ভবনা দেখা দিয়েছে। ২০ লাখ টনের ঘাটতি পূরণের জন্য সরকার লাখ পনের টন খাদ্য যোগাড় করে দেশে এনেছিল। তাহলে দাঁড়াচ্ছে ঃ ভারতীয় এই ব্যবসায়ীচক্র এদেশ থেকে গত ছ'মাসে পুরনো মজুদ ও নতুন আমাদানী করা ৩০ লাখ টন খাদ্য ভারতে পাচার করেছে। এছাড়া নতুন মওসুমে জমিতে যে ধান ফলছে, তাও ভারতীয় ব্যবসায়ীচক্র ভারতে পাচার করেছে। ফলে আগামী বৎসরে এ দেশের খাদ্য ঘাটতি ৫০ লাখ টন ছাড়িয়ে যাবে। এর ফলে বাংলাদেশ হবে চির ঘাটতির দেশ। আমাদের এ চির ঘাটতি যতদিন বজায় রাখা যাবে, ততদিন ভারতের দক্ষিণা গম পাবার জন্য আমরা তার কাছে মাথা নত করে থাকবো। এবং ভারত বিদেশ থেকে কম দামে খাদ্যশস্য আমদানী করে বেশী দামে বাংলাদেশের কাছে বিক্রি করে মুনাফা লুটবে প্রচুর।

পাট

মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতের ব্যবসায়ী আর আওয়ামীলীগাররা পাট ভারতে পাচার করেছে। স্বাধীনতার পর এই ব্যবসায়ী চক্রটি সুসংগঠিতভাবে পাট পাচার শুরু করেছে। এরা নতুন পাট মওসুমে কমপক্ষে ২০০ কোটি টাকা দামের পাট ভারতে সরাবে বলে পরিকল্পনা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক বাজারে আজ বাংলাদেশ পাট বিক্রেতা দেশ হিসাবে যতদূর সুপরিচিত, ভারত তার চাইতে বেশী। বাংলাদেশের পাট লোপাট করে সে বিদেশে রপ্তানী করে কাড়ি কাড়ি অর্থ রোজগার করছে। পাট লুণ্ঠনের ফলে বাংলাদেশের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে পড়বে। কেননা, পাট দ্বারা অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রাই বাংলাদেশের অর্থনৈতিক জীবনীশক্তি হিসাবে কাজ করবে বলে আশা করা হয়েছিল।

বাংলাদেশ পাটের অর্থ থেকে বঞ্চিত হলে এ দেশের বিদেশী দেনা পূরণের শক্তি বাংলাদেশের থাকবে না। সুতরাং বাংলাদেশ ভারত ছাড়া অন্য দেশ থেকে দ্রব্যসামগ্রী কিনতে সাহসী হবে না। তখন নিশ্চিতভাবে বাংলাদেশ ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের বাজার হবে।

চামড়া

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ট্যানারীগুলো ছিল অবাঙ্গালী মালিকদের। তাদের অনুপস্থিতিতে এ দেশের কাঁচা চামড়া সংরক্ষণ ও পাকা করে বিদেশে রপ্তানীর কার্যকরী ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করেননি। আর এ সুযোগে ভারতের ঐ ব্যবসায়ী চক্র বাংলাদেশের চামড়া ভারতে পাচার করে ভারতকে বিদেশী মুদ্রা খরচ করে চামড়া আমদানীর অসুবিধা থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। গত ছয় মাসে কমপক্ষে ৫০ কোটি টাকা দামের মজুদ ও নতুন চামড়া ভারতে পাচার হয়েছে।

একইভাবে এ দেশের কাসা, পিতল, রূপা, ইত্যাদি মূল্যবান ধাতুর জিনিসপত্র উধাও হয়ে গেছে সীমান্তের ওপারে। বাংলাদেশে যত কাপড় মজুদ ছিল তা দিয়ে দেশের দেড় বৎসরের চাহিদা মিটতো। কিন্তু এক টানেই তা চলে গেছে ভারতে।

বাংলাদেশের অবাঙ্গালী ক্ষুদ্র শিল্প মালিকরা শত শত ছোট কলকব্জা এই বিদেশী ব্যবসায়ী চক্রের হাতে তুলে দিয়েছে। এসব যন্ত্রপাতি ভারতে পাচার হয়েছে, নতুবা এসব কলকব্জা নিয়ে ভারতীয় শোষকদের এজেন্টরা এখানে বসে গেছে।

যানবাহন

বাংলাদেশের যে সব গাড়ী-বাস, মোটর, ট্যাক্সি, হোন্ডা হারিয়ে গেছে, কেউ তার খোঁজ দিতে পারছে না—সেগুলো এখন কোলকাতার রাস্তায় চলাচল করছে।

কোলকাতার রাস্তায় ট্যাক্সি মোটরগুলো চলছে আর বাংলাদেশের ট্রাক ও বাস ব্যবহৃত হচ্ছে বাংলাদেশের সীমান্তের ওপারে 'সরকারী চালান' নামের চোরাচালান স্থানান্তরের কাজে।

বাংলাদেশে ফেলে যাওয়া সাবেক পি আই এর আধাভাঙ্গা ক্ষুদ্র ষ্টল বিমানটি মেরামত করে ভারতে পাচার করা হয়েছে। বাংলাদেশের জাহাজ নিয়ে গেছে ভারত সরকার। বাংলাদেশের যানবাহন গেছে ভারতে। এছাড়া অভ্যন্তরীণ নৌপথের বহু পন্টুন ও গাধাবোট বাংলাদেশের অস্ত্র বোঝাই করে ভারতে সেই যে পাচার হয়েছে আর ফিরে আসেনি।

মুদ্রা কারবার

ভারতীয় সরকারী ব্যবসায়ী চক্রটিকে সহায়তা দানের উদ্দেশ্যে ভারত সুকৌশলে বাংলাদেশের মুদ্রাকে অর্ধেকেরও কম দামে নামিয়ে দিয়েছে। মুদ্রামানের এই হ্রাসের দরুণ ভারতীয় ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশ থেকে যা-ই নিচ্ছে তাতেই লাভ হচ্ছে প্রচুর।

ভারতীয় ব্যবসায়ীদের হাত পড়েনি এমন একটি গ্রামও নেই বাংলাদেশে। আর যেখানেই তারা হাত দিয়েছে সেখানেই মোটা গাছটি থেকে শুরু করে, তাঁতীদের তৈরী কাপড়, চাষীর পাট, জমির ধান, মওসুমি ফল, বিলের মাছ সবকিছু এক নাগাড়ে কিনে ফেলেছে। তারপর ধীরে ধীরে পাচার করেছে ভারতে।

ভারতীয় ব্যবসায়ী চক্রকে দেওয়া ছয় মাসের সময়সীমা উত্তীর্ণ হয়েছে। ভারত সরকার এখন নিশ্চিত যে, বাংলাদেশকে অর্থনৈতিকভাবে পদানত রাখবার যে কৌশল কাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে কোন সরকারী ব্যবস্থা দিয়েই আর ভাঙ্গা যাবে না। আধা সরকারী আধা গোপন এই কাঠামোতে দিনরাত মাস-বছর ধরে বাংলাদেশের বুক শুষে যাবে। এ দেশের বুক থাকবে চির শূন্য। রাজনৈতিক পরাধীনতাকে স্থায়ী করার জন্য অর্থনৈতিক পরাধীনতা কায়েম করা হলো। এ জিঞ্জির সহজে ভাঙ্গা যাবে না।

আমি স্বপ্ন দেখি

আমি স্বপ্ন দেখি-
যুগ, যুগ বঞ্চিত ক্ষুধিত মানুষের মিছিল
এগিয়ে চলে। চলে নির্ভিক ভাবে।
বোমা, বুলেট,বেয়োনেট, সম্মুখে বাঁধার পাহাড়
তবুও স্তব্ধ হবেনা এর গতি।
বক্ষে ওদের এত জ্বালা—
কণ্ঠ ওদের উদগারিছে মুহুর্মুহু ওকি
শতাব্দীর রুদ্ধমুখ আগ্নেয়গিরির
সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত জ্বলন্ত উত্তপ্ত লাভা
চিরকাল নীরব নিশ্চুপ থাকা মানুষেরা
সহসা পেল যেন কোথা হতে
এ জ্বলন্ত অগ্নিময় ভাষা।
কণ্ঠে ওদের দুর্বার দুরন্ত যৌবনের
জয় গান-
বক্ষে বাজে স্বপ্ন সুমহান ;
সুদূর প্রভাতের কোন সুউজ্জ্বল সূর্যের
কে পারে রুধিতে দু'বার এ জনতরঙ্গে
ভুয়া,মিষ্টি তোষণে কিংবা বুলেটে-বেয়োনেটে।

হক-কথা

৫ই আশ্বিন, শুক্রবার

হক-কথার কণ্ঠস্বর

'হক-কথা'র কণ্ঠস্বর রোধ করার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার আর ভারতপ্রেমিক মক্কোওয়ালাদের চাপে তাঁবেদার সরকার ও ভারতের ক্রীড়নকরা উঠেপড়ে লেগেছে। 'হক-কথা' পত্রিকা বন্ধ হতে পারে কিন্তু হক-কথা—চিরসত্য কথার মৃত্যু হবে না।

বাংলার বিদ্রোহী কণ্ঠ মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক মতবাদে বিশ্বাসী পত্র 'হক-কথা' ইতিপূর্বে আরও তিনবার বন্ধ হয়েছিল। পাকিস্তান আমলে যে সরকারগুলি 'হক-কথা'র কণ্ঠ চেপে ধরেছিল, জনগণও তাদের লাথি দিয়ে উৎখাত করেছে ক্ষমতার আসন থেকে। এবার 'হক-কথা' বন্ধ করার চক্রান্তে যারা সফল হবে, জনতার দরবারে তাদের বিচার হবে। রায় ব্যতিক্রম হবার কিছু সম্ভবনা নেই।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর থেকে 'হক-কথা' এ দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের অতন্দ্র-প্রহরী হয়ে জনগণের মণিকোঠরে স্থান নিয়েছে। বাংলাদেশের জনগণের কষ্টার্জিত স্বাধীনতাকে খর্ব করার জন্য দেশী-বিদেশী চক্রান্তের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছে 'হক-কথা'। অতি বাস্তব সত্য ঘটনাবলী সাহসিকতার সাথে জনগণের কাছে তুলে ধরে এ পত্রিকা এ দেশের রাজনৈতিক সাংবাদিকতার ইতিহাসে সংযোজন করেছে নয়া অধ্যায়। এ দেশের সংবাদপত্রের ইতিহাসে প্রচার সংখ্যার সকল রেকর্ড ভঙ্গ করে 'হক-কথা' অর্জন করেছে সীমাহীন জনপ্রিয়তা। 'হক-কথা' তাই পত্রিকা নয়—'হক-কথা' একটি আন্দোলন। প্রচণ্ড শক্তিধর আন্দোলন।

গণভিত্তিক সাংবাদিকতার আদর্শ 'হক-কথা'।

কমপক্ষে পনের হাজার সংবাদদাতা সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে 'হক-কথা'র সাথে করেছেন সহযোগিতা। হক-কথা পত্রিকা 'অভিজাত সংবাদপত্র পাঠক'-এর মান্ধাতার শ্রেণীচক্র ভেঙেছে। এ দেশের মুটে-মজুর, কিষাণ-শ্রমিক, রিকশাওয়ালা, কামার-কুমার,তাঁতী, জেলে, ছাত্র, শিক্ষক, অধ্যাপক সবার কাছে হয়েছে সমাদৃত। 'হক-কথা' তাই এ দেশের প্রথম গণপত্রিকা।

অতীতে পূর্ব পর্যায়ের প্রকাশনাকালে এবং বর্তমানে চতুর্থ প্রকাশনা মেয়াদে 'হক-কথা' জনগণের স্বাধীনতার গণঅধিকারের বলিষ্ঠ প্রবক্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। দেশীয় শাসকগোষ্ঠী যখন দেশের কষ্টার্জিত স্বাধীনতাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলার জন্য বিদেশী শক্তিকে প্রশ্রয় দিয়ে বসে তখকার দুঃখজনক পরিস্থিতিতে জনগণ হয়ে পড়ে বিস্ময়াবিষ্ট, হতাশ এবং নিরুপায়। বাংলাদেশের জনগণের এই নিরুপায় অবস্থায় 'হক-কথা' বলিষ্ঠ আশ্বাস নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে সোচ্চার কণ্ঠস্বর নিয়ে।

এই পত্রিকাকর বন্ধ করে দেবার জন্য সরকারের অত্যুৎসাহী মহলের লম্ফঝম্ফ জনগণের মধ্যে কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে-সরকার তা ভাল জানেন। জনগণকে পুনরায় নিরুপায় অবস্থায় ফেলবার জন্য এবং সে সুযোগে দেশ ও জনতাকে নিয়ে ইচ্ছামত ফুটবল খেলবার ইচ্ছা নিয়েই ভারতের সরকারী ও বেসরকারী তাঁবেদাররা চেষ্টা চালাচ্ছে।

'হক-কথা' বন্ধ করার পাপে পাপী অতীতের সরকারগুলোর গণবিরোধী চক্রান্তের পরিণতি কী হয়েছিল বর্তমানের ক্ষমতাসীনরা তা ভেবে দেখবেন এবং জনগণের উপর, তাদের মত প্রকাশের স্বাধীনতার উপর আঘাত আনা থেকে বিরত থাকবেন, এটাই একমাত্র সময়োচিত সুবুদ্ধি হতে পারে।

কিন্তু এই সৎ পরামর্শ অপেক্ষা ভারতের চাপ ও ভারতপ্রেমিক মস্কোওয়ালাদের চাপ যদি বড় হয়ে থাকে, তবে আজ এ মুহূর্তে 'হক-কথা' সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করে দিতে চায় যে, দেশের উপর টেনে আনা পরাধীনতার কালো অমানিশা টুটিয়ে জনগণ সত্যিকার স্বাধীনতার সু-প্রভাত অচিরেই হাজির করবে। সেদিন আর খুব বেশী দূরে নয়, যেদিন 'হক-কথা' আবার তার গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা নিয়ে জনগণের কাতার থেকে সোচ্চার হবে। যেদিন সবকিছু থাকবে– এ দেশ, এ মাটি, এ জনতা-থাকবে না শুধু ভারতের ঐসব ক্রীড়নক, কেনা গোলমরা যারা জনগণের অকৃত্রিম বান্ধব 'হক কথা'কে বন্ধ করে দিয়েছিল। সেদিন তাদের দেখা যাবে ইতিহাসের গলিত আস্তাকুঁড়ের অতলে।

আসুন আমরা মরা মানুষের হাড় দিয়ে আরেকটি ইন্দিরা মঞ্চ গড়ি

ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী ষোলকলায় পূর্ণ হয়েছে, এটা কেউ অস্বীকার করছে না। ভারতীয় সেনারা মেঘালয়ে সীমান্ত ঘাঁটি ও খুঁটি উপড়াবার পর, ভারতপ্রেমিক মনিসিং-এর এককালের রাজনৈতিক আস্তানা ময়মনসিংহের দুর্গাপুর থেকে ভারতীয় সৈন্যদের ছত্রছায়ায় ভারতীয় লোকেরা ধান কেটে জবরদস্তি নিয়ে যাওয়ার পর, রাজশাহী সীমান্তের এপারে অভ্যন্তর ভাগে সব কেনাকাটির পর মাড়োয়ারী ভারতীয়রা জমির ধান-ফসল জমিতেই কিনতে শুরু করেছে-সারা বাংলাদেশের ভূত ভবিষ্যত ইয়াবড় হা করে ভারত গিলে ফেলছে-এর পরও যদি মৈত্রী ষোলকলায় পূর্ণ না হয়ে থাকে তাহলে কখন হবে।

অবশ্য আওয়ামী লীগ এবং তাদের সর্বনাশের সাথী মনি-মোজাফফরদের মতে এ পূর্ণতা পূর্ণিমা- আলো ঝলমল স্বপ্নিল পরিবেশ এনে দিয়েছে। আমাদের মতে এ পূর্ণতা এনেছে ঘনঘোর অন্ধকার, এ পূর্ণতা অমাবস্যার।

বাংলা-ভারত মৈত্রীর আলোর প্লাবন যারা দেখছে তাদের ব্যক্তিগত জীবনের দিকে তাকালে তাদের উপলব্ধির কারণ স্পষ্ট হয়ে উঠে। ক্ষেতজিরাত করে যে আওয়ামী নেতারা সংসার চালাতো টানাহেচড়ার মধ্যে, তাদের আজ গাড়ী-বাড়ী হয়েছে। মনিসিং কমিউনিষ্ট দলের যে সব নেতা ভারতে গিয়ে পালিয়ে থাকতো বছরের পর বছর তারা এখন শহরের অভিজাত এলাকায় শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ভ্যালভেট সজ্জিত বেহেশতী অফিস করেছে। নিজেদের হাইসোসাইটি মার্কা সন্তানদের সদলবলে মস্কো পাঠাচ্ছে উচ্চ শিক্ষার্থে (ভাবখানা এই, এ দেশে পড়াশুনা আর থাকা মনুষ্য সন্তানের পক্ষে সম্ভব নয়- থাকতে পারে ইতরজনেরা)। মোজাফফর দলের নেতারা গাড়ী চাপছেন, তাদের বগলদাবা 'শান্তি'র পায়রা এখন তাদের সুখের পায়রা করে তুলেছে। ভারতের অধীনতামূলক মিত্রতার দালালীর বদৌলতেই তাদের এই প্রাপ্তি। তারা এ মৈত্রীকে বেহেশতী মেওয়া না বলবেন তো বলবে কে?

অথচ জনগণের কাছে এ মৈত্রীর অর্থ ভিন্ন। তারা দেখলো পাকিস্তানী বর্বরদের কোনঠাসা করে ফেলবার পর সবার আগে ইষ্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট, তারপর বাঙ্গালী ফৌজ, তারপর মুক্তিবাহিনীর গেরিলাদের এগিয়ে দিয়ে ৫/৭ মাইল পেছন থেকে অতি নিরাপদে কামান দাগতে দাগতে ভারতীয় সৈন্যরা এসে ঢুকলো বাংলাদেশে। মুক্তিপাগল বাঙ্গালী তরুণরা মরণপণ লড়াই করছিল যখন, তখন ভারতীয় ফৌজ পাকসেনাদের বাঙ্কারগুলোতে জড়ো করা টাকা-পয়সা, অস্ত্র ও স্বর্ণালঙ্কার ট্যাকে পুরেছে। ১৬ই ডিসেম্বরের পর থেকে সারাদেশে ভারতীয় বাহিনী কেনাকাটার উৎসব শুরু করলো বাঙ্কার থেকে লুট করা পাকিস্তানীদের যুদ্ধ টাকা দিয়ে। এরপর ক্রমাগত চললো বাংলাদেশের যানবাহন, অস্ত্র, অর্থ, মূল্যবান ধাতু, মূল্যবান বস্ত্র, জিনিষপত্র ভারতে পাচার করার লুটতরাজ। একটানে ৪ হাজার কোটি টাকার অস্ত্র, ১০ হাজার কোটি টাকার সম্পদ পার হয়ে গেল সীমান্তের ওপারে।

তারপর মৈত্রীর বাণী নিয়ে এলো ভারতীয় মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীরা। হলো আরেক দফা লুণ্ঠন। তারপর শুরু হলো ভারত সরকারের দ্বারা সংগঠিত ব্যবসায়ী দস্যুদলের নিয়মিত লুণ্ঠন।

এ মৈত্রী আমাদের গরীব জনগণকে অনেক কিছু দিয়েছে- দিয়েছে ১ টাকার চাল সোয়া দুই টাকা হবার আশীর্বাদ, ৪ টাকার লুঙ্গি বারো টাকা হবার খেদমত, আট আনার মাছ দু'টাকা হবার সেবা। এ দেশের সরল মানুষদের প্রয়োজন অনেক কম। মোটা ভাত, মোটা কাপড় আর মৃত্যুর পর একটু শেষ-কৃত্য-এই তারা চেয়েছে। কিন্তু ভারতীয় বন্ধুত্বের অভিশাপ তাদের এই সামান্য চাহিদাটুকুকেই করে তুলেছে আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্নের মত।

মুজিব-ইন্দিরা সরকার মিলে ইন্দিরা মঞ্চ নির্মাণ করেছে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে। কিন্তু সারা বাংলাদেশে ইন্দিরার বিজয় রথের লৌহকঠিন চাকার নীচে কোটি কোটি মানুষ নিস্পিষ্ট হয়ে মরণ চীৎকার ছাড়ছে, গলায় দড়ি দিয়ে মরছে, না খেয়ে রাস্তায় পড়ে মরছে। তাদের হাড় দিয়ে একটা আশ্চর্য ইন্দিরা মঞ্চ তৈরী করা হলে ভারতীয় মৈত্রীর আসল অর্থ স্পষ্ট হয়ে উঠতো।

জনগণ যদি এই মৈত্রীর পূর্ণতাকে ঘনঘোর অমাবশ্যা বলে ভাবে, তাহলে তাদের দোষ দিয়ে লাভ কি?

আস্পর্ধার খেসারত

৫০ হাজার টাকা

প্রধানমন্ত্রীর ডানহাতরূপী সাবেক নীতিবাগিশ ছাত্রনেতার একটি খরচের বিল একাউন্ট্যান্ট

জেনারেল অফিসে এসেছিল সম্প্রতি। ১৬/১৭ হাজার টাকার এ বিলটিতে প্রদর্শিত ব্যয়ের কারণ সন্তোষজনক না হওয়ায় এই সরকারী হিসাব পরীক্ষা দপ্তর বিল পাশ করে দিতে আপত্তি জানায়।

এজি অফিসের এই আপত্তির কথা শুনতে পেয়ে নীতিবাগিশ ব্যক্তিটি অগ্নিশর্মা হয়ে পড়েন। তিনি ক্ষেপে চীৎকার শুরু করেন, কার বিল আটকিয়েছে, চেন না আমাকে? আমার বিল আটকানো! আস্পার্ধা কত! দেখে নেবো।

সারা সরকার, অর্থ দফতর তোলপাড় করে তিনি হুঙ্কার ছাড়তে শুরু করলে সবাই ঘাবড়ে যায়। তিনি এজি অফিসকে উচিত শিক্ষা দেবার জন্য আরও ৫০ হাজার টাকার বিল পাঠান, যে বিলের ব্যাপারে ঘোরতর আপত্তি থাকা স্বাভাবিক।

একটি আপত্তিকর বিলের ঘাড়ে আরেকটি আপত্তির মোটা অঙ্কের বিল চাপিয়ে দেওয়ায় এজি অফিস হতভম্ব বনে যায়। কিন্তু করার কিছু ছিল না। কারণ, টেলিফোন গরম করে হুঙ্কার, আর সেক্রেটারী, ডেপুটি সেক্রেটারীদের দৌড়াদৌড়িতে অবস্থা বেসামাল হয়ে উঠে।

শেষ পর্যন্ত এজি অফিস সে বিল দুটি পাশ করে দেয়। আস্পর্ধার শাস্তি হিসাবে ৫০ হাজার টাকা আদায় হলো সরকারী কোষাগার থেকে।

অর্থমন্ত্রী তাজুদ্দিন আহমদ কিছুদিন আগে এজি অফিস পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। তিনি সরকারী কর্মচারীদের মেডিক্যাল বিলের গোজামিলগুলো বের করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবার নির্দেশ দিয়ে এসেছেন। কিন্তু তার দফতরের নাকের ডগার উপর ঘুষি বাগিয়ে ক'দিন আগে যে ভূয়া বিলে ৫০ হাজার টাকা চলে গেল সে ব্যাপারে তিনি কিছুই করলেন না।

এটা সরকারী প্রশাসন না মগের মুল্লুক, ওয়াকেবহালরা তাই ভাবছে।

মুক্তিপন চায় এরা

জনাব

আমার পিতা জনাব নজরুল হক ভুঁইয়া ওরফে সুরুজ কারী গৌরীপুর বাজারের একজন অন্যতম ব্যবসায়ী। বিগত ২৪/২৫ বৎসর যাবৎ উনি এক্সপোর্ট-ইম্পোর্ট ব্যবসা চালাইয়া আসিতেছেন। বদন্যতা, সহজ-সরলতা ও ভদ্রতার জন্য আমার পিতা এতদঞ্চলে সকলেরই শ্রদ্ধেয়। স্বাধীনতা সংগ্রামকালে বিভিন্ন এলাকার গেরিলা-মুক্তিযোদ্ধাদেরকে তিনি ও আমরা আহার,



বাসস্থান ও অকাতরে বহু টাকা দিয়া সাহায্য করিয়াছি। আমার সহোদর ভাইসহ জ্ঞাতি ভাইদের প্রায় ২৫/২৬ জন মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশ নিয়াছিল।

কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় স্বাধীনতার দীর্ঘ ৭ মাস পর আমাদের এলাকার কতিপয় স্বার্থান্বেষী, সমাজদ্রোহী, পরশ্রীকাতর, ময়ুরপুচ্ছ কাকদের দুরভিসন্ধিতে আমাদের এলাকার সরকারী লীগের পাতিনেতা ফরহাদ চৌধুরীর ইঙ্গিতে আমার পিতাকে মসজিদ ঘর হইতে আচম্বিতে গ্রেফতার করিয়া কুমিল্লা জেলে পাঠায়। মাসাধিক কাল অতীত ও প্রায় পাঁচ হাজার টাকা ব্যয় হইল তবুও তাঁহাকে ছাড়িতেছে না। আমার পিতা যে পাঞ্জাবিদের দালাল নন বা কোন প্রকার রাজনীতির ধারা ধারে না এই মর্মে স্থানীয় জনগণ 'সাফাই-দস্তখত' দিয়াছেন তবুও তিনি ছাড়া পাইতেছেন না। কিন্তু কেন?

'দালাল' বলিয়া গ্রেফতার করাইবার কারণ গৌরীপুরে উৎকৃষ্ট ব্যবসাস্থলে আমাদের একটি ভিটা আছে। ঐ ঘরটিসহ ভিটাটি উক্ত নেতা চাহিয়াছিলেন-দেওয়া হয় নাই বলিয়াই প্রতিশোধমূলক এমন ঘৃণিত কাজ তিনি করিয়াছেন। বর্তমানে সরকারী দালাল মারফত আমাদেরকে জানানো হইয়াছে যে, আমাদের উক্ত ভিটাটি বিনামূল্যে যেন ফরহাদ চৌধুরীকে সাফ কবলা করিয়া দেই। অন্যথায় ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা মুক্তিপন যদি না দেই তাহা হইলে নাকি আমার পিতা ইহজীবনেও ছাড়া পাইবে না। কেমন কথা! সোনার বাংলায় আইন আছে বিচার নাই কেন? ফরহাদ চৌধুরী সাহেব দাউদকান্দি থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি, পানি ও বিদ্যুৎ মন্ত্রী জনাব খোন্দকার মোস্তাক আহম্মদ সাহেবের সাক্ষাৎ শ্যালক-তার দাপটে এলাকা তটস্থ। কেবল স্বাধীনতার পর তিনি কয়েক লক্ষ টাকা বানাইয়াছেন।

অতএব, প্রার্থনা আপনার বহুল প্রচারিত পত্রিকায় বিষয়টি তুলিয়া ধরিলে হয়ত আমাদের ও আমাদের মত ভুক্তভোগীদের কিছুটা উপকার হইবে।

বিনীত-

১। মোফাজ্জল হক ভুঁইয়া
২। মনিরুল হক ভুঁইয়া
৩। মোহসেনারা বেগম (লাকী)
গৌরীপুর বাজার, কুমিল্লা।

মানিকগঞ্জ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি সম্মেলন

গত ১১ই সেপ্টেম্বর মানিকগঞ্জ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির মহকুমা সম্মেলন বিপুল সংখ্যক প্রতিনিধি ও ডেলিগেটদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি ও সভাপতি ছিলেন যথাক্রমে জনাব সামসুল হক ও কাজী নজিবর রহমান। নিম্নলিখিত সদস্যদের নিয়ে মানিকগঞ্জ মহকুমা ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়েছে।

১। কাজী নজিবর রহমান এডভোকেট
সভাপতি
২। মোহাম্মদ মঈনুল হক এডভোকেট
সহ-সভাপতি
৩। ডাঃ কেরামত আলী
সহ-সভাপতি
৪। মোঃ কোরবান আলী
সহ-সভাপতি
৫। আবদুল মতিন বিশ্বাস
সম্পাদক
৬। মোহাম্মদ আবদুল জব্বার
সহ-সম্পাদক
৭। জানে আলম চৌধুরী
সাংগঠনিক সম্পাদক
৮। মিস দিল আরা হাফিজ
সাংগঠনিক সম্পাদক
৯। শামসুল হক
সাংগঠনিক সম্পাদক
১০। মোঃ বজলুর রহমান
দপ্তর সম্পাদক
১১। আবুল কাশেম বিশ্বাস
কোষাধ্যক্ষ

উপরোক্ত ১১ জন ছাড়াও আরও ১৮জন সদস্য এই কার্যকরী কমিটিতে নেওয়া হয়েছে।

মওলানা ভাসানীর উত্তরবঙ্গ সফর প্রমাণ করো

ভারত এ দেশ ছারখার করছে না

এ দেশের সমুদয় সম্পদ ভারত ছারখার করে ফেলছে। অথচ ক্ষমতাসীনেরা তাদের প্রভু ভারতকে কোন কথা বলছে না।

জননেতা মওলানা ভাসানীর উত্তরবঙ্গ সফর উপলক্ষে উত্তরবঙ্গের গ্রাম-গঞ্জ-শহরে সৃষ্টি হয়েছে এক ইতিহাস। বাঁধ ভাঙ্গা জনতার স্রোত স্থানে স্থানে তাদের প্রাণপ্রিয় নেতা, চিরসাথী বৃদ্ধ মওলনা ভাসানীকে বরণ করেছে প্রাণঢালা সম্বর্ধনার মাধ্যমে।

অনাহারক্লিষ্ট, অভাব অনটনে দিশাহারা রোগাপাণ্ডুর এদেশের মাটির মানুষেরা এসে ভীড় জমিয়েছে আশার কথা শুনতে। তারা শুনেছে, তাদের মায়ের কথার প্রতিধ্বনি। এ দেশের মানুষের পূর্ণ বুক শূন্য হবার আর অত্যাচার-অবিচার সীমাহীন বেড়ে যাবার বাস্তব কাহিনী।

জননেতার এ সফর ছিল ঝটিকা সফর। তবু জনতার টানে তাকে নির্ধারিত স্থান ছাড়াও বহু স্থানে বক্তৃতা করতে হয়েছে।

৫ই সেপ্টেম্বর মেহেরপুর, ৬ই সেপ্টেম্বর সকালে কুষ্টিয়া, বিকেলে পোড়াদহ, ৭ই সেপ্টেম্বর বগুড়া, ৮ই সেপ্টেম্বর রংপুর, ৯ই সেপ্টেম্বর গাইবান্ধায় জনতার সাগরে জেগেছিল ঊর্মি। অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অবিচার, শোষণ, বঞ্চনা, লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে, চিরবিদ্রোহী জননেতার কথা শুনার জন্য দূরদূরান্ত থেকে মানুষের স্রোত ছুটে এসেছিল জনসভাস্থলে। পোড়াদহের জনসভার সময় মুষলধারায় বৃষ্টি হচ্ছিল। সব প্রাকৃতিক দুর্যোগকে উপেক্ষা করে লাখো মানুষ নিশ্চল হয়ে শুনেছে জননেতার কথা।

সমস্যা জর্জরিত গণজীবনের প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে জননেতা মওলানা ভাসানী বলেছেন, ১০০/ ১২০ টাকা করে চাল খাবার জন্য, ২০ টাকা দরে লুঙ্গি কিনবার জন্য এ দেশের মেহনতি মানুষ রক্ত দিয়ে স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেনি। এ দেশের জনগণ সুখী-স্বাচ্ছন্দ শোষণমুক্ত পরিবেশ লাভের জন্যই সংগ্রাম করেছে।

সরকারের প্রতি চ্যালেঞ্জ দিয়ে মওলানা ভাসানী বলেছেন, ভারত আজকের এই দুর্দশার জন্য দায়ী নয়, ভারতীয় শোষণ এই দুরবস্থা সৃষ্টি করেনি-এটা প্রমাণ করো। তিনি বলেন, জনগণ নিজ চোখে ভারতীয়দের লুণ্ঠন ও তস্করবৃত্তি দেখে আসছে। সীমান্তে মাড়োয়ারীদের মালপাচারের আড়ত জনগণ নিজেরাই দেখছে, এ দেশের সমুদয় সম্পদ ভারত সাবার করে ফেলছে। অথচ ক্ষমতাসীনেরা তাদের প্রভু ভারতকে কোন কথা বলছে না।

মওলানা ভাসানী বলেন, পাটের দাম আজো ধার্য করা হয়নি। সব পাট চলে যাচ্ছে ভারতে। পাট ভারতে পাচার হবার ফলে দেশ ফতুর হয়ে যাচ্ছে– সেদিকে ক্ষমতাসীনদের খেয়াল নেই।

তিনি বলেন, ৬২ হাজার গ্রামের ৬ কোটি মানুষের জীবনে নেমে এসেছে অবর্ণনীয় দুর্দশা। চাষী ক্ষেতমজুর মেহনতি মজদুরদের জীবন সম্পর্কে তিনি বলেন, আমি দেখেছি, ভাতের মুখ দেখার সৌভাগ্য তাদের হচ্ছে না। কচু-ঘেচু খেয়ে মানুষ দিন কাটাচ্ছে। সরকারের দেউলিয়া নীতির দরুণ বাজারে সরবরাহ করা সব চাল চলে যাচ্ছে ভারতে। ভারতের মাড়োয়ারীরা এ দেশের জমির ফসল জমি থেকে তুলে সীমান্তের ওপারে পাচার করে ফেলছে।

তিনি উল্লেখ করেন যে, অনাহার-বুভুক্ষায় মানুষের দেহ কঙ্কালসার হয়ে যাচ্ছে। এ দেশের মানুষদের দিকে তাকাতে ভয় হয়। দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস গ্রামাঞ্চলে কিভাবে নেমেছে সরকার তার খোঁজ রাখছে না। গদীতে বসে শুধু বলে চলেছে, দুর্ভিক্ষ লাগবার সম্ভবনা নেই।

দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত মানুষের উপর ঘাড়ার ঘা-এর মতো চোর, বদমাশ, গুণ্ডা, ডাকাতদের ত্রাসের রাজত্ব চলছে। মওলানা ভাসানী বলেন, আওয়ামী লীগের ছত্রছায়ায় থেকে টাউট, গুণ্ডা ও বদ-প্রকৃতির লোকেরা

জনগণের উপর এখনও অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। এসব গুণ্ডা টাউটের অত্যাচার থেকে জনগণকে রক্ষা করার ক্ষমতা এই ব্যর্থ সরকারের নেই। মুজিব সরকার এসব বদটাউট ও অসৎ লোকদের দিয়েই তার শাসন চালাচ্ছে।

জনগণের জীবনে নিরাপত্তাহীনতার উপর জোর দিয়ে মওলানা ভাসানী বলেন যে, অভাব-অনটন, অনাহার-বুভুক্ষায় মানুষ পাগলের মত হয়ে গেছে, সন্তান ও স্ত্রীর মুখে মানুষ ভাত তুলে দিতে পারছে না। এর উপর আওয়ামী লীগের বজ্জাত টাউটদের অমানুষিক পীড়ন ও অত্যাচার চলছে। তিনি বলেন, খামোশ হয়ে যাও! এসব অত্যাচার বন্ধ করাও সরকার। নইলে জনতা রুদ্ররোষে ফেটে পড়লে কেউ তোমাদের রক্ষা করতে পারবে না।

গ্রাম-বাংলায় মহাজনদের বর্বর অত্যাচার ও নির্মম শোষণের উল্লেখ করে মওলানা ভাসানী বলেছেন, শোষণের রাজত্ব শেষ করার জন্যই জনগণ সংগ্রাম করেছিল। এখনও যদি শোষণের অবসান না ঘটে থাকে তবে জনতা এবার সত্যিকার পথ বেছে নিয়ে দেখিয়ে দেবে শোষণের ভিত্ কি করে উপড়াতে হয়।

মওলানা ভাসানী বলেন, হিন্দুস্থানী সৈন্য আর মাড়োয়ারীরা সুই-সুতা থেকে শুরু করে লবণ-মরিচ পর্যন্ত সব কিছুই লুট করেছে এবং এখনও করছে। এ দেশের সম্পদের প্রতিটি তিল তারা হাতড়ে নিয়ে যাচ্ছে। এসব সম্পদ আবার উচ্চমূল্যে বাংলাদেশে পাঠিয়ে বাংলাদেশের উপকার করার খতিয়ান প্রচার করছে।

জনতার অকুণ্ঠ সমর্থন ধ্বনির মধ্যে মওলানা ভাসানী ঘোষণা করেন, লুণ্ঠন আর শোষণের জবাব দিতে হবে। এ দেশের মানুষ কোন লুটেরা ও দস্যুশক্তিকে ছাড়বে না। অনাহার-বুভুক্ষায় কষ্ট পেয়ে হাজার হাজার মানুষ মরছে, অন্নকষ্টে মানুষ গলায় দড়ি দিচ্ছে– এসব করুণ মৃত্যুর জন্য দায়ী ভারত আর তার এখানকার তাঁবেদার সরকার। এ মৃত্যুর হিসাব হবে। এর নিকাশ দিতে হবে অচিরেই।

বাংলাদেশের বাঙ্গালীদের মত পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরার বাঙ্গালীরাও শোষিত ও নির্যাতিত হচ্ছে দিল্লীর মসনদের শাসকদের হাতে। মওলানা ভাসানী বলেন, সত্যিকার বাংলাদেশ গড়তে হলে ভারতের ফ্যাসিষ্ট শাসন থেকে ওপারের বাঙ্গালীদেরও মুক্ত করতে হবে।

ওপারের বাঙ্গালীদের উদ্দেশ্যে মওলানা ভাসানী বলেন, সংগ্রাম ছাড়া মুক্তি নেই। ভারতীয় দিল্লী শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্ত হবার জন্য তোমরা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ো। আমরা তোমাদের পাশে থাকবো।

প্রতিটি জনসভায় বিশাল জনতা– জবাব দাও জবাব দাও সোনার বাংলা শ্মশান কেন? পশ্চিমা শোষকের বদলে ভারতীয় শোষক কেন এলো? এসব প্রশ্ন উত্থাপন করে মুহুর্মুহু শ্লোগান দেয়।

বিভিন্ন সংবাদপত্র ও সংবাদ প্রতিষ্ঠানের লোকও এসব জনসভায় উপস্থিত ছিলেন। লোকে লোকারণ্য এই ঐতিহাসিক জনসভাগুলোর খবর দৈনিক সংবাদপত্র-গুলোতে পরিবেশিত হয়নি-সংবাদপত্রের উপর মুজিব সরকারের দমননীতির প্রকৃষ্ট প্রমাণ হিসাবে।

ভাসানী চরিত

মোহাম্মদ হোসেন

মওলানা ভাসানী বিশ্ববাসীর নিকট রাজনীতিবিদ বলেই পরিচিত। তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও কর্মসূচীর সুস্পষ্ট

আভাষ পাই তাঁর তেজস্বী বক্তৃতায়, তার ব্যক্তিত্বে, তার বিশ্বমানবতা বোধে। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি সঙ্কীর্ণ কোন গণ্ডীতে আবদ্ধ নহে,

মুরিদের দরবার

খুবই ব্যাপক, একান্তই অপরিসীম। অনেকেই এই অগ্নিপুরুষটির সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে না মিশে, ক্রিয়াকলাপ, দৃষ্টিভঙ্গি ও আদর্শকে পুংখানুপুংখরূপে না বুঝেই তাঁর বহুবিধ সমালোচনা করে থাকেন। ইহা নিছক নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছুই নহে।

সত্য আর মিথ্যা কথা দু'টোর যথার্থতা প্রমাণ করতে হলে দোষমুক্ত জ্ঞান ও বুদ্ধির যেমন প্রয়োজন ঠিক তেমনি দরকার নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি ও সুক্ষ্ম বিবেকের। তা'না হলে দড়িকে সাপ বলে ভুল হবার সম্ভাবনাই বেশী। মানুষ কিসে আনন্দ পায় তাতেই তার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। মানুষের সত্যিকার ভিতরের দিকটিই আসল। বাইরের দুনিয়ায় মানুষ নানাভাবে নানাপ্রভাবে প্রতিপত্তি লাভ করে থাকে। আমাদের মন অনেক সময় বিবেকের কষ্টিপাথরে যাচাই না করেই অনেক মানুষকে সমর্থন করে। দুনিয়ায় এমন মানুষও অনেক আছে যাদের কথা শুনতে দুই দণ্ড দেরী করতে ইচ্ছা হয় আবার কারো শত অনুরোধেও তেমনটি ইচ্ছা হয় না। মানব মন বড়ই বিচিত্র। বিবেচনা শক্তিও বৈচিত্রময়। কিন্তু আমরা যদি কলুষমুক্ত জ্ঞান ও মনের অধিকারী হয়ে ব্যক্তিগতভাবে একটা বস্তুর যথাযথ মাত্রায় ওয়াকেবহাল হয়ে উঠা সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ করি তবেই উহাতে সফলতা অর্জনে সক্ষম হই-নচেৎ নহে। সেইরূপ একটি লোকের চরিত্রকে অঙ্কন করার পূর্বে তার ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন, রাজনৈতিক জীবন, আধ্যাত্মিক জীবন,বাহ্যিক ও আত্মিক জ্ঞান সম্পর্কে পুংখানুপুংখভাবে অনুসন্ধান চালিয়ে-তার সকল কিছুকে নিরপেক্ষভাবে বিচার বিশ্লেষণ করলে তার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়।

মওলানা ভাসানী সম্পর্কে আজকাল নানাবিধ সমালোচনা হয়ে থাকে। তাই তাঁর নীতি ও আদর্শ সমাজ ও মানুষের জন্যে কতদূর কল্যাণকর উহার বিশ্লেষণ করবার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। কারণ, বিশ্বশান্তি আর ভ্রাতৃত্বের জন্য যা সত্যিই কার্যকরী সেই মত ও পথ অবশ্যই বিশ্বমানব দু'দিন পরেই হোক আর আগেই হোক গ্রহণ করবে। কার্লমার্কস, এঙ্গেলস, লেলিন ও মাওসে তুঙ যে ভাবে মানুষের অন্তরে তাদের চিন্তাধারার খাঁটি বীজ ঢুকিয়ে দিয়েছিল সেই পথ ও মতকে জাতি বাস্তব কর্মের ভিতর দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছে বলেই তারা সত্যিকারভাবে সুখী হয়েছে। কিন্তু তাদের বস্তুবাদী চিন্তাধারা ও কর্মসূচীর চেয়ে আরো উন্নত ধরনের কোন মত ও পথ পেলে নিশ্চয়ই তারা পূর্বোক্ত মত ও পথকে বর্জন করবে। কারণ, সভ্যতার অগ্রগতির দিকেই মানব জাতির যাত্রা। মানব সভ্যতাকে একটা অনুশাসনে দাবিয়ে রাখা মানবতা বিরোধী বলেই গ্রাহ্য হবে। সৃষ্টির সেই অনাদিকাল হতে মানব মন উন্নত হতে উন্নততর পথের দিকে ধাবিত। আদর্শ, সে আদর্শ যত বড়ই হোক না কেন উহা যদি জাতি ও বিশ্ব সমাজের শান্তি ও কল্যাণের জন্যে শাশ্বত না হয় তবে উহা কোন দিনই টিকে থাকবে না। মানুষ উহাকে ছেড়ে দিয়ে যে আদর্শের আবেদন শাশ্বত তার দিকেই ধাবিত হবে।

তাই মওলানা ভাসানী যে আদর্শে উদ্দীপিত হয়েছেন উহা প্রকৃত পক্ষেই খাঁটি ও বিশ্বমানবের। (ক্রমশ)

ভাসানীর বাণী

বাংলাদেশ স্বাধীন করিয়াছে বাংলাদেশের কৃষক, শ্রমিক, কামার, কুমার প্রভৃতি সাড়ে সাত কোটি জনতা। আজ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিদেশী শাসক ও শোষকগোষ্ঠীর চক্রান্তের ফলে ধ্বংসের পথে পতিত হইয়াছে। ৩০ লক্ষ বাঙ্গালীর রক্তের বিনিময়ে যে স্বাধীনতা অর্জন হইয়াছে তাহা যে কোন ত্যাগের বিনিময়ে রক্ষা করিতেই হইবে। তাই আমি বাংলাদেশের আপামর জনতার নিকট আকুল আবেদন জানাইতেছি যে, প্রত্যেক এলাকায় ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ও কৃষক সমিতির শাখা গঠন করুন। মাতৃভূমির স্বাধীনতা ও সর্বহারা গরীব কৃষক, কামলা,ক্ষেতমুজুর, ছাত্র-যুবক সকল শ্রেণীর রাজনৈতিক,অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক,সামাজিক সকল প্রকারের মুক্তির একমাত্র উপায় সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই সম্ভব। তাই কাল বিলম্ব না করিয়া পাড়ায় পাড়ায়, মসজিদে মসজিদে সভা-সমিতি করিয়া জাতীয়তাবোধ জাগাইয়া তুলুন ও ধর্মের প্রতি যাহাতে সকল শ্রেণীর আস্থা থাকে তজ্জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করুন।

চোরাকারবারী, ঘুষখোর পাকিস্তান আমলে যাহা ছিল তাহার চেয়ে অনেক বেশী হইয়াছে। পাকিস্তানের ১০০ টাকার মূল্য পূর্বে হিন্দুস্থানী টাকায় ১৩০ টাকা ছিল, বর্তমানে বাংলাদেশের টাকার মূল্য এতই কম হইয়াছে যে ১০০ টাকার বিনিময়ে ৫০/৬০ টাকার বেশী হিন্দুস্থানী টাকা পাওয়া যায় না। ইহার আশু প্রতিকার জনসাধারণকেই সংগ্রাম করিয়া করিতে হইবে। চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী বাংলাদেশের মুসলমানগণ আল্লাহপাকের আদেশ অনুযায়ী মক্কা মোয়াজ্জমায় উপস্থিত হইয়া পবিত্র হজ্জ্ব সমাধা করিয়াছে। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় এই যে এবার বোধ হয় মুসলমানদের অদৃষ্টে হজ্জে যাওয়া সম্ভবপর হইবে না। কারণ, এখন পর্যন্ত সরকারী ঘোষণা বা ব্যাংকে টাকা জমা দিবার কোন নির্দেশ বাংলাদেশ সরকার প্রদান করেন নাই। আশা করি প্রত্যেক জেলা, মহকুমা হইতে সভা-সমিতি করিয়া সরকারের নিকট পবিত্র হজ্জে যাওয়ার জোর দাবী জানাইয়া বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর নিকট তাহা পাঠাইবেন। বিলম্ব করিলে আল্লাহর হুকুমানুযায়ী এই ফরজ কর্তব্য পালন করা এবার আর সম্ভব হইবে না।

মনিসিং-এর রাজনীতি নিয়ে দলে কোন্দল

ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ সমাজতন্ত্রের ভাওতাবাজীর মাধ্যমে বাংলাদেশকে সর্বস্বান্ত করে দিচ্ছে, ভারতের কাধে সওয়ার হয়ে রাশিয়া এই অঞ্চলে তার রাজনৈতিক ভবিষ্যতকে খোলাসা করার যে আশা পোষণ করছে, ভারতের অসৎচরিত্রের দরুণ তাও ভেস্তে যাবে। ইদানীং মনিসিং-এর কমিনিস্ট পার্টির মধ্যে সাংঘাতিক রকম গুতোগুতি শুরু হয়েছে এ নিয়ে।

ভারতকে অন্ধভাবে সমর্থন দিয়ে এবং সেই সুবাদে ভারতের বাংলাদেশীয় এজেন্ট আওয়ামী লীগকে অন্ধভাবে সমর্থন দিয়ে মনিসিং দলের রাজনৈতিক ভবিষ্যত নষ্ট করে ফেলেছেন বলে তার দলের ভিতর থেকে অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে।

মস্কো থেকে ফিরে মস্কোর নির্দেশ অনুযায়ী মনিসিং তাঁর দলকে 'প্রচণ্ড আন্দোলন' গড়ে তোলার আদেশ দিলেই এ গোলযোগের সূত্রপাত হয়। পার্টির ফিল্ড ক্যাডাররা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, এই রাজনীতি নিয়ে তারা

আন্দোলন দূরে থাকুক, জনগণের সাথে সংযোগ রক্ষা করতেও পারবেন না।

এদের অভিযোগ হলো, ভারতের লুটপাট, শোষণ, বঞ্চনার চিত্র জনগণ নিজেদের চোখে দেখছে, এমন পরিস্থিতিতে ভারতকে সমর্থন করে রাজনৈতিক আন্দোলন করতে গেলে জনসাধারণ এদের ভারতের এক নম্বর দালাল হিসাবে পাকড়াও করে মাটির সাথে মিশিয়ে দেবে।

ভারতকে সমাজতন্ত্রের দুর্গ, সমাজতন্ত্র কায়েমের আদর্শ, বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টিকারী প্রগতিশীল শক্তি হিসাবে অভিহিত করে মনিসিং তার গ্রুপটিকে রাজনীতি দিয়ে আসছিলেন। মস্কোর স্বার্থের চাইতে তার কাছে ভারতের স্বার্থ বড়– বিবিধ কারণে। এখন বাস্তব অবস্থা তাকে চাপ দিচ্ছে ভারত বিরোধী রাজনীতি শুরু করার জন্য। কিন্তু মনিসিং তা পারবেন না। কারণ, ভারতকে সমর্থনের সাদা দলিলে তাঁর এত সই ও টিপসই পড়ে গেছে যে তাঁর পক্ষে অবস্থাটা হয়ে দাঁড়িয়েছে ঃ জলে কুমীর ডাঙ্গায় বাঘের অবস্থা।

মনি কমিনিস্ট দলের মধ্যে রাজনৈতিক মতপার্থক্য কোন দিনই বরদাশত করা হয় না। পার্টির মধ্যে যারা এখন ভারত ও আওয়ামী লীগ সম্পর্কে প্রশ্ন তুলছেন, তাদের নিজ এলাকায় বেশী পয়সা দিয়ে ভারত অনুগত ক্যাডার নিযুক্ত করা শুরু হয়ে গেছে। অর্থাৎ ধুরন্ধর মনিসিং ভারতের সেবা ছাড়বেন না, ছাড়তে যদি হয় তাহলে প্রশ্ন উত্থাপনকারী বেয়াড়াদের তিনি সরিয়ে দেবেন।

বিভিন্ন এলাকায় ভারতের সন্দিগ্ধ ক্যাডারদের অপসারণের চেষ্টা শুরু হতেই কমিনিস্ট দলটার ভেতরে মহা কামড়াকামড়ি বেধে গেছে! মনিসিং সাফ বলে দিয়েছেন ভারত ও আওয়ামী লীগকে ছাড়া রাজনীতি চলবে না। তাঁর এ ঘোষণা পার্টির অভ্যন্তরে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের সুযোগ শেষ করে দিয়েছে। ফলে বহু ক্যাডার এখন মনি দলের থেকে তল্পি গুটাচ্ছেন। তাঁরা মেরুদণ্ড রেখে রাজনীতি করার আশা নিয়ে অন্য গ্রুপে ঢুকে পড়বেন।

পার্টির মধ্যে ভাঙ্গন অবশ্যাম্ভাবী হয়ে উঠায় মনিসিং বুঝেছেন যে, তার ছোট গ্রুপটির অস্তিত্বেই বিরাট জিজ্ঞাসা প্রশ্নের পাদমূলে এসে দাঁড়িয়েছে। আরামের রাজনীতি অব্যাহত রাখার জন্য তার কিছু মোটা বুদ্ধির ক্যাডার দরকার। মোজাফফরের দল থেকে তিনি এখন ক্যাডার টানবার চেষ্টায় আছেন। মোজাফফর সাহেব ফুল ট্যাট্রন মার্কা যে গুটি কয়েক কর্মী জুটিয়েছেন, তারা কমিনিস্ট দলের ফুল মেম্বরশীপ, চাই তো ডিষ্ট্রিক্ট কমিটির সেক্রেটারী ইত্যাদি এবং মাসোহারা লাভের লোভে মোজাফফরের দল ছেড়ে মনিসিং-এর দলে চলে যেতে চাইছেন। এটা শিক্ষিত অধ্যাপক প্রবরকে ক্ষ্যাপিয়ে তুলেছে। ক্যাডার নিয়ে টানাটানিতে দু'দুলের অবস্থাই সঙ্গীন।

মোজাফফর সাহেব তাই উঠেপড়ে লেগেছেন কমিনিস্ট দল সম্পর্কে কর্মীদের মন বিষিয়ে তুলতে। ওদিকে মনিসিংও মোজাফফর দল সম্পর্কে কুৎসা প্রচার করে কর্মী ভাগাবার চেষ্টা করছেন।

এই সাংগঠনিক অন্তর্দ্বন্দ্বের ফল হচ্ছে চমৎকার। আন্তরিকতাসম্পন্ন ক্যাডাররা চক্ষু চড়াক করে রাজনীতির এসব বিজনেসম্যানদের চরিত্র প্রত্যক্ষ করছেন। অচিরেই ভাল ক্যাডারগুলো টুপটাপ করে মনি-মোজাফফরের মঞ্চ ছেড়ে কেটে পড়বেন। ইতিমধ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে দল ত্যাগ শুরু হয়ে গেছে।

ভারতপ্রেমের রাজনীতি নিয়ে মনি-মোজাফফর একসময় চুলাচুলি বন্ধ করে আফসোসে মাথায় হাত মারবেন। কিন্তু তখন বড্ড দেরী হয়ে যাবে।

ভারতীয়রা ১০০ টাকা দরে পাট কিনে নিয়ে যাচ্ছে।

ভারতীয় ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশের সীমান্ত অঞ্চলে বসে এখন ৬০/৬৫ টাকা (ভারতীয়) মণ দরে পাট কিনছে। বাংলাদেশের টাকায় ভারতীয় ৬০/৬৫ টাকার দাম হলো ১০০/১০৮ টাকা। 'হক-কথা' ইতিপূর্বে এক রিপোর্টে বলেছিল বাংলাদেশ সরকার ৯৬ টাকার উর্ধ্বে পাটের নিম্নতম দর ধার্য না করলে পাট দেশের মধ্যে থাকবে না, সবই ভারতে চলে যাবে।

এখন পাট ক্রয়ের মওসুম শুরু হয়ে গেছে। সরেজমিনে পাট বাজারের অবস্থা যাচাই করে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আমাদের কাছে প্রেরিত খবর হলোঃ বর্তমান সরকার শতকরা ৩০ ভাগ পাটও দেশের অভ্যন্তরে রাখতে পারবে না। সব পাটই ভারতে চলে যাচ্ছে।

পাট চাষীরা দর চায়, যার কাছে বেশী দর পাবে তার কাছেই তারা পাট বেচবে। এ জন্যই সরকারকে বারবার তাগিদ দেয়া হয়েছিল। পাটের নূন্যতম দর বেঁধে দিতে। কিন্তু আজ পর্যন্ত সরকার পাটের ন্যূনতম দর বেঁধে দেননি।

ভারতে প্রতি বৎসর ৭৩ লাখ গাঁট পাটের দরকার হয়- দেশের বিভিন্ন প্রয়োজনে। এ বৎসর ভারতে পাট উৎপন্ন হয়েছে ৫১ লাখ গাঁট। ভারতকে তার নিজের প্রয়োজন পূরণ করার জন্য বাইরে থেকে ২২ লাখ গাঁট পাট আমদানী করতে হবে। রপ্তানীর জন্য ভারতের এক ছটাক পাট থাকারও কথা নয়। কিন্তু কোলকাতা ও বোম্বাই থেকে প্রত্যাগত সফরকারী ব্যবসায়ীরা জানাচ্ছেন যে, এই দুটি ভারতীয় বন্দর, বিশেষত কোলকাতা বন্দরে জাহাজগুলোতে অনবরত পাট তোলা হচ্ছে বিদেশে রপ্তানীর জন্য। ভারত এই পাট কোথায় পেল?

ভারত বাংলাদেশ থেকে যেন অবাধে পাট নিয়ে যেতে পারে, জাতীয়করণ করা পাটশিল্পের স্বার্থের সাথে ভারতীয় স্বার্থের অনিবার্য সংঘর্ষ যেন না বাধে-বাংলাদেশের ভারতপ্রেমিক সরকার এখন পর্যন্ত তারই নিশ্চয়তা বিধান করে চলেছেন।

আগষ্ট মাসের শেষ ভাগে রংপুর এলাকা থেকে হাজার হাজার মণ পাট ভারতে পাচার হয়েছে। ভারতীয় ব্যবসায়ীদের এদেশীয় সেবকরা দেশের অভ্যন্তর ভাগ থেকে পাট কিনে সীমান্ত অঞ্চলে মাড়োয়ারীদের আড়তে পৌঁছে দিচ্ছে। বাংলাদেশ প্রতি বৎসর প্রায় ৩০০ কোটি টাকার পাট ও পাটজাত সামগ্রী বিদেশে পাঠাতো। এবার ১০০ কোটি টাকার বেশী পাট, পাটজাত সামগ্রী রপ্তানীর সুযোগ ঘটবে না– নতুন পাট থেকে।

ইহা কি সত্য?

॥১৩৯॥

কয়েক দিন পূর্বে পটুয়াখালী জেলার জনৈক এমসিএ সাহেব জেলে আটক (আইনগত ভাবে) একজন অপরাধীর জন্য জামিননামায় লিখিতভাবে 'ষ্ট্রংলি রিকমেন্ডেড্' সুপারিশ করেন। বিপক্ষের আইনজীবী বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন যে, এমন জঘন্যভবে বিচার বিভাগের উপর হস্তক্ষেপের নজীর কোথায়ও আছে বলে তাঁর জানা নেই। তিনি উক্ত এমসিএ সাহেবকে আইনগতভাবে দোষী সাব্যস্ত করা ও শাস্তি বিধানের পক্ষে মত প্রকাশ করলেও সেটা বাস্তবে কার্যকরী করা সম্ভব হয়নি। কারণ, তিনি একজন এমসিএ।

॥১৪০॥

চট্টগ্রাম জিলার জিলা প্রশাসক পদাধিকার বলে চট্টগ্রাম জিলাবোর্ডের প্রশাসক পদটিও দখলে রেখেছেন। উনি জেলাবোর্ডের জেলা প্রকৌশলীর এককালের কলেজবন্ধু। বাল্যবন্ধুর কৃপাদৃষ্টির জন্য জিলা প্রকৌশলী সাহেব দুই বৎসর আগে নির্মিত একটি পুলের উদ্বোধন করাচ্ছেন জিলা প্রশাসককে দিয়ে। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের ব্যয়ভার বহন করার জন্য বরাদ্দ হয়েছে মাত্র ২ হাজার টাকা।

॥১৪১॥

বৎসর দুই আগে তৎকালীন জিলা কাউন্সিলের (বর্তমান জিলাবোর্ড) চেয়ারম্যান সাহেবের কক্ষের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য ব্যয় করা হয়েছিল ১২০০০ টাকা এবং বর্তমানে সেই কক্ষকে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ও মেঝে ১ ইঞ্চি পুরু লাল কার্পেটে মোড়ানোর জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ১০০০০ টাকা। যদিও বাংলাদেশ সরকার নানা প্রকার বিলাসিতা বর্জনের আদেশ দিয়েছেন, তবু দেখা যায় এদের বিলাসিতা ও আমলাতান্ত্রিক চালচলনের শেষ নেই। নিম্নপদস্থ কর্মচারী ও দেশের বুভুক্ষ জনসাধারণের মনে প্রশ্ন জাগে এটাই কি সমাজতন্ত্র!

॥১৪২॥

সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া থানার শান্তি কমিটির চরম সন্ত্রাসবাদী দালাল ও প্রাক্তন পাকিস্তানী দারোগা জনাব বাসিরুদ্দিন ভুঞা তৎকালে পাঞ্জাবী সৈন্যের ছত্রছায়ায় বহু অপকীর্তি করলেও বর্তমানে বহাল তবিয়তেই আছেন। দারোগাগিরি করে তিনি সিরাজগঞ্জ শহরে দুইখানি রাজভবন তৈরী করেছেন। কুষ্টিয়া ও রাজশাহীতে তার রাজকীয় আন্দরকিল্লা রয়েছে। এছাড়া তার নিজ গ্রাম কানসোনায় দেড়শত বিঘা জমি রয়েছে। দেশ স্বাধীন হাওয়ার পর তিনি ঢাকার মিরপুরে পাঁচ বিঘা জমির উপর সাদ্দাদের ফেরদৌস তৈরী শুরু করেছেন। পাক-আমলে শান্তি কমিটির চেয়ারম্যানরূপে সিরাজগঞ্জ হতে যে সমস্ত সুটকেস, সোনার দামী অলংকার, কাপড়চোপড়, ঘটিবাটি ও অন্যান্য মূল্যবান পণ্য-দ্রব্য আনিয়েছিলেন তা এখনও তার বাড়ীতে মওজুদ রয়েছে।

১ লা অক্টোবর

প্রতিবাদ দিবস পালন করুন

ন্যাশন্যাল আওয়ামী পার্টির এক জরুরী বিজ্ঞপ্তি দ্বারা প্রত্যেক জেলা, মহকুমা, থানা ও ইউনিয়ন কমিটিকে সরকারের ফ্যাসীবাদী হামলা ও জনগণের কণ্ঠকে চিরতরে রুদ্ধ করার ষড়যন্ত্র ও সংবাদপত্রের উপর বিধি-নিষেধ জারীর বিরুদ্ধে ১লা অক্টোবর শোভাযাত্রা করার আহ্বান জানানো হয়েছে। উক্ত দিবসে ন্যাপ প্রধান মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী পল্টনের জনসভায় ভাষণ দিবেন বলে জানা গেছে।

ন্যাপের কাউন্সিল অধিবেশন স্থগিত

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির এক বিশেষ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ৩০শে সেপ্টেম্বর ও ১লা অক্টোবর সম্ভোষে পার্টির কেন্দ্রীয় কাউন্সিল অধিবেশন হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু অনিবার্য কারণবশতঃ উহা স্থগিত রাখা হ'ল। নির্ধারিত দিন-তারিখ পরে জানানো হবে।

সম্পাদক ঃ সৈয়দ ইরফানুল বারী ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ঃ মওলানা আবদুল খান ভাসানী; মুদ্রণে ঃ শান্তি প্রেস, সন্তোষ, টাঙ্গাইল।